ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; পৌষ ১৩৭৪——জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অসংসারী (উপন্যাস)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬২, ১২১, ২৩৪, ৩৫৯

অঙ্গার (কবিতা)—অশোক ভট্টাচার্য ২২৯, ৪৭৪

অঙ্গু নামে ডাকো (গল্প)—নারায়ণ সেনগুপ্ত ... ৫০১

আঁনার কলি : ইতিহাস না অলীক—কৃষ্ণা বসু ... ৮৭

আমার গান (কবিতা)—গীতি সেনগুপ্ত ... ১৮৪

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : বাঙলা ও বাঙালী (প্রবন্ধ)—শিবাজী গুপ্ত ২৩০

আধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বৌদ্ধবাদ (প্রবন্ধ)—আনন্দ ভিক্ষু ... ১৪২

উজ্জয়িনীতে 'প্রাচ্যবাণীর' সংস্কৃত নাট্যাভিনয়—পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ... ১৪০

একটি নিখুঁত অপরাধীর কাহিনী (অনুবাদ সাহিত্য)—আশীষকুমার চক্রবর্ত্তী ... ৯৩

একটি স্বপ্ন (গল্প)—সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৫৬

একটি কথা (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্ন্যাল ... ৪৭৩

কোন এক গাছের উত্তাপে (কবিতা)—মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু ... ১২

কঠোপনিষদের সাধন পথ (প্রবন্ধ)—শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪, ১১৭, ২২২, ৩৬৮ ৫৫০

কিশোর জগৎ— ৯৭, ১৭৯, ৩০০, ৪১২, ৫১২ ৬১৫

কোন কুলবধুর কথা (গল্প)—সমীরণ রুদ্র ... ১৪৪

কল্পনার নীড় থেকে—শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ... ১৭৪

কুকুরের মৃত্যু (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ৩৩৯

খেলাধুলা—শৈল চট্টোপাধ্যায় ... ৫৩৭

খেলাঘর—সুমিতা সান্যাল ... ৫৭৮

গান—গোপাল রায় ... ৯২

গীতায় পরাভক্তি—খগেন্দ্র চাঁদ ... ১০৫

গ্রহজগৎ—বিমলকুমার সুর ১৭১, ২৮৬, ৪৩০, ৪০০

গায়ত্রী উপাসনা (প্রবন্ধ)—শ্রীঅনিলবরণ রায় ... ৫১১

গরল (গল্প)—শ্রীসুখেন্দু চক্রবর্তী ... ৫৫২

ঘরে বাইরে (গল্প)—বিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫১৭

চৈতী হাওয়ার দুপুরে (কবিতা)—স্বামী সত্যানন্দ ৩৫৬ (খ)

চাঁদেরে বাসিয়া ভালো (কবিতা)—গীতি সেনগুপ্ত ... ৫১০

চেতনা (কবিতা)—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৫১১

চলার পথে (কবিতা)—অমরনাথ বসু ... ৫৭৯

জবান বন্দী (গল্প)—শ্রীসুনীল চন্দ্র ... ১৮৫

জীবনের দুইতীরে (গল্প)—শিবপ্রসাদ সরকার ... ২২

জন্মান্তর বাদের প্রাচীনতা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ... ৩২

জন্মতিথির তীর্থে (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ৪৪

তুমি যখন জাগবে স্বপ্ন থেকে (কবিতা)—সুরেশ ভট্টাচার্য ... ৫৩

দুঃসংবাদ (প্রবন্ধ)—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ...

দর কষাকষি (কবিতা)—শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪১

দুঃখের হলুদ বৃন্তে (কবিতা)—নচিকেতা ভরদ্বাজ ... ৫৬

ধাতুক্ষয় ও তার নিবারণ (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ১৯

নরহরির বৈরাগ্য (গল্প)—শ্রীযমুনা ঘোষ ...

নিমতলার দেয়ালে (কবিতা)—নচিকেতা ভরদ্বাজ ... ৫

নির্বাণ (প্রবন্ধ)—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২০

নির্বাক (কবিতা)—জগদীশচন্দ্র দাস ... ৪১

নিজেরে হারাতে গিয়ে (কবিতা)—সুবোধ সেন ... ৫১

প্রেমিক বৈরাগী (রমন্যাস)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৯, ১০৯, ২১৭, ৩৩৪, ৪৩৬, ৫৪

পত্রলেখা— ১০৩, ১৯২, ৫১২৫ ১৯ ৬

পথের বাঁকে (উপন্যাস)—শ্রীমদন চক্রবর্ত্তী, ৮২, ১৩২, ২৪৯, ৩৭ ৪৯১, ৫

পট ও পীঠ—শ্রী 'শ' ১৯৭, ৩০৯, ৪১৯, ৫২১, ৬

পুরুষকার (কবিতা)—শ্রীবিমলজ্যোতি দাস ... ৬

প্রতিবিম্ব (কবিতা)…জগদীশচন্দ্র দাস ... ৪

পলাতক (গল্প)—অরুণ দে ... ৪

প্রত্যাশা (কবিতা)—আইভি রাহা ... ৪

পাপপুণ্য পেরিয়ে (গল্প)—সমীরণ রুদ্র। ... ৫

প্রেম (কবিতা)—শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ... ৫

প্রহেলিকা—শ্রীযমুনা ঘোষ ... ৬

পথিক (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ৫৯

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ—পুষ্পদেবী সরস্বতী ১৩, ১২০, ২১৬, ৩৮৫, ৪ ৫

বিশ্বভাষা পরিক্রমা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫, ১২৯, ২৯৪, ৩৪০, ৪৮৪, ৫৫

বরং আকাশ দেখ (কবিতা)—শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ...

বিশ্ববেষ্টন—(ভ্রমণকাহিনী)—সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৭, ১৪৭, ২৫৬, ৩৯৫, ৪৬১ ৫৮০

বৃত্ত—কুমারবসু ৬০২

বাইশে শ্রাবণ (কবিতা)—সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৪৬

বরেণ্য বিস্মৃতি (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ১৩৯

বঞ্চিতা (গল্প)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ১৬৫

বন্ধুবরেষু (গল্প)—অলক সান্যাল ২৭৯

মধুমিতা : তোমাকে (কবিতা)—শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ৮

মফঃস্বল (কবিতা)—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৩০

মেয়েদের কথা— ৭২, ১৫৩, ৩৭১, ৪৯৫, ৫৮৬, ৫৯৫

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব-বঙ্গানুবাদ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য— ১৭৫, ২৪৬, ৩৫১, ৪৪৮ ৬০৭

মার্টিন লুথার কিং (কবিতা)—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ... ২৭৮

মুক্তির স্বরূপ ও আনন্দরূপ (প্রবন্ধ)—জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী ... ৪৩৩

মল্লিকা (গল্প)—জগদীশচন্দ্র দাস ... ৪৫৩

শূন্যের ছায়া (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ৭১

শাঁখারী (কবিতা)—শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৭০

শাশ্বতআঁখি (কবিতা)—রমাদেবী কাব্যতীর্থ ... ৪০৫

শুধু ছায়া (কবিতা)—মদন মোহন বিশ্বাস ... ৪৯০

সন্ধ্যাগমে (কবিতা)—আশুতোষ সান্যাল ... ১৭

সাধিকা শবরী (নাটিকা)—শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩১

সাময়িকী— ৮৯, ২৮৯, ৩৭১, ৫০৪, ৬২৭

সুন্দর (কবিতা)—শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ... ১৬৪

সর্বভুক মহাকাল (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ... ২৪৮

সাম্প্রতিক বাংলা (কবিতা)—কৃষ্ণচন্দ্র দে ... ৩৫৭

সঙ্গীত-কথা ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৩৯৩

সাধকের সাথে (আলোচনা)—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৫৭২

সে যে আমার কাছে নেই (কবিতা) শ্রীনীরদবরণ মুখোপাধ্যায় ... ৬১০

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ পনেরো টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্ণে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ-১৩৭৫

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

দুঃখবাদ

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

দুঃখমেবাস্তি ন সুখং তস্মাত্তদুপলভ্যতে।
তৃষ্ণার্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্তিপ্রভবং সুখম্॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

"এই সংসারে দুঃখই প্রচুর, সুখ নহে, সেইজন্যই দুঃখের অনুভবই অধিক হয়ে থাকে। তার মধ্যে বিষয় বাসনায় দুঃখ জন্মে আর দুঃখ নাশের পর সুখ হয়।"

"মানুষ চায় সুখ, আনন্দ, দুঃখকে সে ভয় করে এড়াতে চায়, কিন্তু চাওয়া আর পাওয়া এক নয় ফলে কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ, এই জানিবার আকাঙ্ক্ষা হতেই ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ। ভারতীয় দর্শনের মূল দুঃখবাদ (Pain is the fundamental fact of বলেন—"জীবন দুঃখময়, মৃত্যুই জীবনের নিয়তি।" সোপেনহাওয়ার বলেন—"জীবন দুঃখময়, মৃত্যুই জীবনের নিয়তি।" কিন্তু জীবনের এই দুঃখ নিবারণের উপায় তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ দুঃখবাদে কিন্তু ইহার শেষ পরিণতি অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের আনন্দ রসঘন মধুর উপলব্ধিতে ("The principle systems of philosophy in India starts from conviction that the world is full of suffering and this suffering accounted and removed")। জীবনের দুঃখ নির্ব্বাণের ও আনন্দ-প্রাপ্তির পথ খুঁজিতে যাইয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ

সেই উপায়ই ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্র।...তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন জীবের ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব, আকাশ কুসুমের মত অলীক।"

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী।

স্বামী বিবেকানন্দ—"অনুভবের এ সবই মিথ্যা, অবিদ্যা মাত্র। জীবন এক দুঃখময় অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ, নিত্য ভঙ্গুরশীল এই জগৎ। বেদান্ত জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দেয় না, জগৎকে ব্যাখ্যা করে, ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে না, আসল ব্যক্তিত্ব কি তাহা দিয়া ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত বলেনা এ জগৎ অলীক বা ইহার অস্তিত্ব নাই বরং বলে এ জগৎ কি তাহা বোঝ, যাহাতে জগৎ তোমাকে আঘাত করিতে না পারে।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই যা ছিলুম তা হলুম। মায়া কি? যা দেখছো, চিন্তা করছো সবই মায়া। এক কথায় কামিনীকাঞ্চনই মায়ার আবরণ। মানুষের স্বধাম পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। এক বৈ আর কিছু নয়। ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি প্রথমে দুটো বোধ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না অভেদ অদ্বৈতম্। বাজীকর সত্য, খেলা সব অনিত্য স্বপ্নের মত। এই ব্রহ্মের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, কিন্তু এ অবস্থায় বরাবর থাকা যায় না। ব্রহ্মানুভূতি মুখে বলা যায় না, সে অবস্থায় এক বোধ হয়, সাধারণ জীব এই জ্ঞান লাভ করিলে মুক্ত হয় বটে, কিন্তু আর ফেরে না বা শরীর বেশীদিন থাকে না।" বুদ্ধদেব—"এই জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ আট প্রকার—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সম্প্রযোগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ ও পঞ্চ উপাদান।" "তাঁহার কথার সারমর্ম্ম হইল "জীবন দুঃখময়। এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। উহা করা যায়। দুঃখের কারণ আছে। সেই কারণের নাশেই দুঃখের নাশ হয়। মূল কারণটি হইল বাসনা, বিষয়ে আসক্তি। আসক্তির কারণ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ, তারও কারণ দেহ মনে "আমি" বোধ। এ সব কিছুর মূল কারণ অজ্ঞান।" "তোমার স্বরূপকে জান। বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার মোহে আত্মা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সদিচ্ছা ও সংকল্পের দ্বারা প্রবৃত্তিকে জয় করলে আত্মানুভূতি আসে। হৃদয় প্রসারিত করো, যুক্ত করো অনন্ত প্রবাহের সঙ্গে।" "সর্ব্বগ্রাসী অহঙ্কার বর্জ্জন করিলে তুমি মনের যে নির্ম্মল প্রশান্ত অবস্থা লাভ করিবে ঐ অবস্থা তোমাকে সম্পূর্ণ শান্তি, মঙ্গল ও জ্ঞান দিবে।" "তোমার বিবেকী মনুষ্য-প্রকৃতি এবং সত্যের মধ্যে তোমার "আমির" কল্পনা ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে, এই কল্পনা দূর কর, তুমি বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পাইবে। জীব জগৎ ও সর্ব্ব বস্তুর মূলে এক সত্তা বিদ্যমান। এক মৃত্তিকা যেমন প্রয়োজনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ পূর্ব্বক নানা কাজে ব্যবহৃত হয়, তেমনি এক সত্য বিভিন্ন সংশয়াত্মক মনের দরুণ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপাদি প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি ভেদ জ্ঞান তিরোহিত সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন। যিনি সংযমী, সত্যবাদী, পবিত্র, মিতভাষী, সরল, কর্ম্মে পটু ও সদাচারী তিনিই সুখ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন।"

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই দুঃখবাদকে স্বীকার করেছেন। ঐ মহাগ্রন্থে দুঃখসাগর পার হবার পন্থা নির্দ্দেশিত হয়েছে। আস্তিক, নাস্তিক, ভারতীয় সব দর্শনেই দুঃখকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার মূল কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। সংসারে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ, দৌর্মনস্য আছে বলেই দুঃখ নিরোধের জন্য মানুষের সতত চেষ্টা। যোগবাশিষ্ঠও এই দুঃখকে স্বীকার করেছেন। এই মায়াময়-দুঃখ, কঠিন সংসার-কাতর জীবের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা অবিদ্যা নিরাকরণ এবং আত্মজ্ঞান লাভ। বশিষ্ঠ অদ্বৈতবৈদান্তিকের মত বলেন—সেই পরমকে লাভের পথ বিদ্যা বা জ্ঞান, অন্য কোনও পথই আর নেই। আত্মাকে জানতে হলে একমাত্র জ্ঞানই অনুষ্ঠেয়, অন্য কোন উপায়ের কোন উপযোগিতা নেই; ভক্তির পথ বশিষ্ঠের নয়, কৃপার প্রশ্নও ওঠে না। তাঁর মতে আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু, আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় তা ছাড়া ত্রিভুবনে আত্মাকে পাওয়ায় আর কোন পথই নেই। শঙ্করাচার্য্যের মতন বশিষ্ঠ কিন্তু সন্ন্যাসের উপর জোর দেন নাই। বুদ্ধ ও শঙ্কর মানুষকে গৃহধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে সন্ন্যাস নিতে বার বার বলেছেন কিন্তু বশিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মত নিষ্কাম কর্ম্মযোগে বিশ্বাসী। "ন ক্রিয়ায়াঃ পরিত্যাগো না ক্রিয়ায়াঃ সমা-

শ্রয়ং" কর্মকে পরিত্যাগ করবে না, তাতে লিপ্তও হবে না। পদ্মপত্রে নীর সম জীব নিরাসক্ত হয়ে জীবনযাপন করবে। কর্মের বাসনা যতক্ষণ অন্তরে জাগ্রত, ততক্ষণ বাহিরের কর্ম ত্যাগ বৃথা।

আত্মজ্ঞানের জন্য সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই, এই সংসারেই কর্মজালের মধ্যেই মানুষ মুক্তির স্বাদ লাভ করতে পারে। অন্তরে শান্তি লাভ হলেই সংসার অরণ্য স্বরূপ আর মনে শান্তি লাভ হলেই সংসার অরণ্য স্বরূপ আর মনে শান্তি না থাকলে অরণ্যও সংসারের বঞ্ঝাটে ভরে ওঠে।"

ডাঃ মতিলাল দাশ।

শ্রীঅরবিন্দও এই চরম দুঃখবাদকে স্বীকার করেছেন ("The whole world know spiritual thinker and materialist alike, that the world for the created or naturally evolved being in the ignorance or the inconscience of Nature is neither a bed of roses nor a path of joyous Light. It is a difficult journey, a battle and struggle an often painful and chequered growth, a life beseiged by obscurity, falsehood and suffering, It has its mental, vital, physical joys and pleasures, but these being only a trancient taste which yet the vital self is unwilling to forego and they end in distaste, fatigue or disillusionment. What then ? To say the divine does not exist is easy, but it leads no where it leaves you where you are with no prospect of issue,"—Sri Aurobindo), তিনি একটি বিশেষ মূল্যবান কথা বলেছেন ভগবানকে অস্বীকার করা সোজা, কিন্তু তাতে কোন লাভ তো হয়ই না, তার অগ্রগতির দ্বারও রুদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ নীচে নেমে যায় এবং এরাই শেষে অসুর হয়ে পড়ে। বেদ, এই জগৎকে "কুহক" বা মায়াময় বলে স্বীকার করেছেন, গীতা তো স্পষ্টই দুঃখবাদকে স্বীকার করেছেন।

কাস্য দৃশো যামুন সন্তি দোষাঃ কাস্তা দিশো যামুন
দুঃখদাহঃ।
কাস্তা প্রজা যামুন ভঙ্গুরত্বম্ কাস্তা ক্রিয়া যামুন
নাম মায়া॥ বশিষ্ঠ

—"কোথায় সে দিক যেখানে নেই দোষ! কোন সে দিক যেখানে নেই দুঃখদাহ, কোথা সে প্রজা যাদের নেই মৃত্যু? কোন্ সে ক্রিয়া যেখানে নেই মায়া।" এই প্রসঙ্গে লীলাবাদীদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। লীলাবাদীরা বলেন "এক এবেদং সর্বং," সেই তিনিই সব, "বাসুদেবঃ সর্বম্" সবই বাসুদেব, "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভুতানি" জীবের উৎপত্তি বাস ও লয় আনন্দেই; রসময় রসাস্বাদনের জন্য জগৎ সৃষ্টি করে রসাস্বাদন নিজেই করছেন—এই সব বড় বড় কথা শুনতে খুবই ভালো লাগে বটে কিন্তু এসব হল স্বপ্নবিলাসী অবাস্তববাদী কবির প্রলাপ, বস্তুবাদীর কথা নয়। এ জগৎ জড় এবং অজ্ঞানই তার মূল; এই বাস্তব জগতে আমরা দেখি ঠিক উল্টো, মনে হয় জগৎটা যেন শয়তানের হাতে চলে যাচ্ছে, ভগবানের কোন চিহ্নই যেন আর নেই, সবই অসতে ভরা, দুর্জনে ভরা, যেখানে প্রকৃত সাধুদের কোন স্থানই আর নেই, যুগ ধর্মানুযায়ী কলিকালে ধর্ম যেন আর অবশিষ্ট নেই, এখন অসুরদের রাজত্ব ও জয়। কল্পনা ও বাস্তবের আকাশ পাতাল পার্থক্য আমরা অহরহই দেখছি। আমি এমন খুব বড় লীলাবাদীকে জানি যিনি শেষ জীবনে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে শেষে মায়াবাদী হয়ে গেলেন, আর জন্ম নিতে চাইলেন না, এই হ'ল লীলাবাদীদের শেষ পরিণাম। যে উপলব্ধিকে ভিত্তি করে লীলাবাদীরা বলেন সবই বাসুদেব, সে তত্ত্ব তো অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব তা তো স্থুল জড় শরীরে উপলব্ধি করা অসম্ভব, সে তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াতীত এবং একমাত্র তা গভীর সমাধির মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করা যায় আর অন্য কোন পথই নেই ("অধিমানস চেতনায় প্রবেশ, অধিষ্ঠান এবং সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে যথার্থ "আনন্দ" স্তরে পৌছান এক গভীর সমাধির মধ্য ব্যতীত অসম্ভব অধিমানস বা অতিমানসে অত সহজে পৌছান যায় না। অধিমানস বা অতিমানস প্রাপ্তির বহু পূর্ব্বে আসে আত্মার উপলব্ধি, এ সব চরম বস্তুর সম্বন্ধে এখন চিন্তা করো না।" শ্রীঅরবিন্দ), তা তো এই জড় জগতের নয়, তা চিন্ময়, মৃন্ময় নয়, সে তত্ত্ব

প্রমাণ করাও সুকঠিন (Of course, a supritual experience can not be proved in that way (like a chair) for it does not belong to the order of physical facts and is not physically visible or touchable, Sri Aurobindo.) তবে একথা সত্য তার জের বা রেশ স্থূল শরীরে থাকে এবং তা জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটায় এতে কোন সন্দেহই নেই, এখানে কোন শক্তির অবতরণের কথা উঠছে না, তা অন্য ব্যাপার। সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাক্যে ভুল নেই কিন্তু যাকে এই আনন্দ স্বরূপ বলা হয় তা ভাগবতসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বা শুদ্ধ চেতনা (চেতনা চেতসাং—বহু চেতনার মধ্যে একমাত্র চেতনা); তা সর্বব্যাপী হলেও আদৌ জড় বস্তু নয়, জড় দেহে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না ("মানুষ নিজের মধ্যে পুরুষোত্তম চেতনা বলে যে কোন বস্তুকে আয়ত্ত করতে পারে তা আমি জানি না, কারণ গীতা বলেছে পুরুষোত্তম হলেন পরম পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষরের অতীত, তিনি ধরে রয়েছেন এক এবং বহুকে। গীতার বাণী হ'ল মানুষ পেতে পারে ব্রাহ্মী-চেতনা, নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে পুরুষের শাশ্বত অংশ বলে।" শ্রীঅরবিন্দ) এবং এ উপলব্ধিও হয় কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই মাত্র এবং তা লাভ করতে হলে গভীর সমাধির মধ্য দিয়ে যেতে হবে সমস্ত সৃষ্টির অতীত তবেই হবে এই সব উপলব্ধি, তার আগে নয়, এটা শুধু আমার কথা নয়, শ্রীঅরবিন্দ, ঠাকুর, রমণ মহর্ষি, শাস্ত্র, সকলেই ঐ একই কথা বলেছেন; ব্রহ্মজ্ঞান থাকা কালীন আমি বহুবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি ব্রহ্মকে স্থূল শরীরে উপলব্ধি করতে, আমি তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত কেউই তা পারেন নি, ভবিষ্যতে তা সম্ভবও হবে না। এই জড় শরীরের রূপান্তর যে অসম্ভব তা শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেছেন ("এই মর্তলোকে অতিমানসের আবির্ভাব কিন্তু মানুষের বর্তমান যে দেহ সে দেহে সচ্চিদানন্দময় পুরুষকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।" শ্রীঅরবিন্দ) এবং তা যত দিন সম্ভবপর না হবে ততদিন পর্যন্ত সমস্ত লীলাবাদীদেরই শেষ পর্যন্ত মায়াবাদে এসে পৌছাতে হবে। ব্রহ্ম হতে নেমে এলে তার রেশ বা প্রতিক্রিয়া শরীরে সব সময়েই থাকে কিন্তু তা ব্রহ্ম নয়, তাঁর প্রতিক্রিয়া। আমি নিজেই এসব উপলব্ধি করেছি এতে মিথ্যের কোন স্থানই নেই। এই জড় জগৎ ভগবানের বিকৃত রূপ, স্বরূপ নয়। বর্তমানে মানুষ—(শ্রীঅরবিন্দ মনুষ্য জন্মের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—"আত্মবান হওয়া ভগবানকে পাওয়া ও নিজের ভিতরে লুক্কায়িত দেবত্ব প্রকাশ মনুষ্যের চরম সিদ্ধির পন্থা, যে মানুষ ভগবানকে পায়নি, তার পক্ষে নিজের ভিতরে দেবত্ব প্রকাশ করার দুরাকাঙ্ক্ষা আকাশে কুসুম ফোটানোর কল্পনা মাত্র।" শ্রীঅরবিন্দ) প্রায় পশুর পর্যায়ে নেমে এসেছে; মনে হয় যেন পশুরও অধম হয়ে যাচ্ছে ("ঊর্দ্ধমুখী নয় যে জীব তারা ভগবানের ব্যর্থ সৃষ্টি তবে তারা প্রকৃতির তৃপ্তি সাধন করে বটে। প্রকৃতি তাদেরই বংশবৃদ্ধি করে থাকে, কারণ তারাই তার স্থায়িতা দৃঢ় করে, তার সাম্রাজ্যের আয়ু বাড়িয়ে দেয়।" শ্রীঅরবিন্দ); পশুত্ব ছাড়া ভগবান মানুষকে মনন শক্তি বলে একটি বস্তু বা শক্তি দিয়েছেন, কিন্তু মানুষ আজ এই মনন শক্তিকে বিকৃত করে ধীরে ধীরে জগৎটাকে এক বিরাট ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে চলেছে যা থেকে তাদের উদ্ধার করা অসম্ভব। এদের উদ্ধার করা বড় কঠিন। এরা কারো কথা শোনে না, মানে না, মনে করে এরাই একমাত্র জ্ঞানী আর সাধুরা সব অন্ধ, ফলে যাঁরা এই পশ্বধমদের উদ্ধার করতে আসেন তাঁদের দুর্ভোগ ও দুর্গতির আর অন্ত থাকে না। এই জন্যই মুক্ত মহাপুরুষরা, তা মায়াবাদী বা লীলাবাদী যে কেউই হোন, সহজে জন্ম নিতে চান না, এ জগৎকে পাল্টান, মানুষকে দেবত্বে বা স্বরূপে ফিরিয়ে নেয়া অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সব দুর্ভোগ মাথায় করে নিয়েই মুক্ত মহাপুরুষরা আবার জন্ম নেন। মায়াবাদী মুক্ত মহাপুরুষগণ যে জন্ম নেন ইতিহাস ও পুরাণে তার প্রমাণ আছে। শঙ্কর ভাষ্যে আছে—"ব্রহ্মবিদ্যামপি যেষাঞ্চিৎ ইতিহাসপুরাণয়োঃ দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ"—ব্রহ্মবিদগণও দেহান্তর স্বীকার করেন তবুও এসব জেনেও এই সব পশ্বধমদের মুক্ত করার জন্য তাঁরা জন্ম নেন। "বিরাট এক অন্ধের দেশ এই পৃথিবী। এখানে সত্য দৃষ্টি অধিকারীরা প্রায়ই উন্মাদ বলে অভিহিত হন পৃথিবীতে মানুষ এদের কথা শুনতে চায় না, এদের

বিশ্বাসও করে না। নানেজের মত ওঁরা উপহাসের পাত্র। কিন্তু তবুও হার মানে না সত্যকার খাঁটি মানুষ। আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়েও আলোর স্বপ্ন দেখেন। ওঁরা সবাই নানেজ, আমরা সবাই অন্ধ; আর "অন্ধের দেশ" হ'ল আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু সভ্যতার অভিশাপ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ মানুষ একথাও অস্বীকার করা যায় না। তাই দেখা যায় প্রকৃত দৃষ্টির অধিকারী যাঁরা, সাধারণের কাছে প্রায়ই তাঁরা হ'ন উপহাসের পাত্র। অন্ধের দেশের মানুষ ওঁদের বোঝে না। গ্রহণ করে না ওঁদের কথা। আসলে এই পৃথিবীটাই এক বিরাট অন্ধের দেশ, নানেজরা যুগে যুগে আসেন এখানে মহত্তর সত্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রতিদানে পায় ঘৃণা ও বিদ্বেষ। কিন্তু তবুও এগিয়ে চলে ওঁরা, দুঃখ ও বেদনার কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরে চলে।"

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য—Country of the Blind, H. G. Wells,

বন্ধং প্রবৃত্তিতো বিদ্ধি মুক্তং বিদ্ধি নিবৃত্তিতঃ।
প্রবৃত্তিরেব সংসারো নিবৃত্তি র্মুক্তি রিষ্যতে॥

"প্রবৃত্তির দ্বারা জীব বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করেন। পণ্ডিতগণ প্রবৃত্তিকেই সংসার এবং নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন।" "অনাদিমায়য়া সুপ্তো—অনাদি মায়ার ঘোরে সমস্ত জীবই গভীরভাবে সুপ্ত, এ মায়ামোহ ভঙ্গ করে জেগে উঠে প্রবুদ্ধ হওয়া তো খুব সহজ নয়—" এই যে আমাদের জীবনের যাত্রা অমৃতের দেশে অমৃত স্বরূপ হইতে আরম্ভ, পথ চলিতে চলিতে হয়তো সেই স্বরূপ হইতে অনেকখানি দূরে আসিয়া সরিয়া পড়িয়াছি, সেই অমৃত স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি আর সেই অমৃত স্বরূপকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থই মৃত্যুর হাতে পড়িয়া নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করা। এই যে বাহিরের দিকে অন্তহীন গতি এটাই মৃত্যুদেশের পথ; সে পথ হইতে যাঁহারা ফিরিয়া তাকান তাঁহারা ফিরিয়া আসেন মৃত্যুহীন দেশে, তাঁহারাই লাভ করেন "অমৃতত্ব" পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তম পরাকাষ্ঠা পরমা গতি। অনৃতের দ্বারা বহির্মুখ মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা আমাদের সত্য দৃষ্টি আবৃত হইয়া আছে, আমাদের বুদ্ধিও যখন বহির্মুখী হইয়া তর্কপর হয় তখন সে হিরণ্ময় পাত্রের ন্যায় সত্যের মুখ ঢাকিয়া রাখে। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি সকলকে বাহিরের দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখীন করিতে হইবে, তবেই হইবে সত্যের অনুভূতি লাভ ইহাই উপনিষদের সাধনা, ইহাই সকল অধ্যাত্মসাধনের মূল কথা।

ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত।

আত্মনাম্ কতং পাপম আত্মনা সংলিখিস্সতি। আত্মনা অকতং পাপম্ আত্তনাব বিশুদ্ধি, শুদ্ধি অশুদ্ধি পাচাতম্ নাঞ্ঞো অঞ্ঞো বিশোধয়ে।" ধম্মপদ।

"মানুষ আপনা আপনি পাপ করে আপনাকে আপনই ক্লেশ দেয়। আপন দেখাতেই পাপ থেকে বিরত হয়, আপনার দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়। শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আত্মকৃত। একে অন্যকে কখনও উদ্ধার করিতে পারে না।" ভৃগু বারুণী সংবাদে বলা হয়েছে—"ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছু ভৃগু পিতা বরুণকে ব্রহ্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করায় বরুণ উত্তর দেন "ব্রহ্মজ্ঞান কেহ কাহাকে দিতে পারে না, ইহা তপস্যা দ্বারা লাভ করিতে হয়।" "যে রাগরত্তানু পতন্তি সোতং সয়ং কতং কম্মটেকোবজালং এতম্পি ছেত্বা বা বদন্তি ধীরা অনপেক্খি খনো সকব দুকখং পহায়।" ধম্মপদ।—"ঊর্ণনাভ যেমন নিজ রচিত জালে আবদ্ধ হইয়া তন্মধ্যে নিজেই নিপতিত হয়, রাগাসক্ত ব্যক্তিও সেই রকম আপনার রচিত রাগস্রোতের অনুসরণ করিয়া থাকে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই বাসনা জাল ছেদন করতঃ অনাসক্ত হইয়া সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন।" কামনা বাসনাই যে সর্ব্ব দুঃখের মূল তা সমস্ত দর্শনেই স্বীকার করেন। তাই বুদ্ধদেবও এখানে সেই একই কথা বলেছেন; তবে তিনি বলেছেন গীতায় অনাসক্ত কর্ম্মযোগের কথা। বুদ্ধদেব বলেন—"সর্ব্বত্থ বিমুক্ত মানসো"—সকল প্রকারে অনাসক্তমনা হইলে নির্ব্বাণ লাভ হইবে।" বুদ্ধদেব যে শুধু সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার কথাই বলেছেন সে কথা মিথ্যা, কি করে সংসারের প্রত্যেকটি প্রাণীর মঙ্গল হয় তাহাই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলে জগতের প্রায় সকলেই শ্রদ্ধা করেন, তিনি যদি কেবলমাত্র নির্ব্বাণ বা সন্ন্যাসীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তাহলে এই জগৎ-

বাসীর শ্রদ্ধা লাভ তাঁর অদৃষ্টে কখনই ঘটতো না। ধরে নিলাম তিনি সংসার বিরাগী ছিলেন, তাতে তো বিশেষ কিছু আসে যায় না,—"গুপ্তো মুক্তা প্রগটোনশতা" ("He who is silent is safe, he who goes to the public is lost.") ; যাঁরা জগতের মঙ্গলকামী, জগতে কিছু মঙ্গল করতে ইচ্ছুক তাঁদের লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকাই শ্রেয় ; ("He who is too great must lonely live"—Sri Aurobindo) ; শ্রীঅরবিন্দও স্বীকার করেন, নির্জ্জনবাসী এক মহাত্মা জগৎকে উল্টে দিতে পারেন, সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করতে পারেন, —"নিঃস্বার্থ ও দ্বিধাহীন একটি মানুষের চিন্তাও হয়ে উঠতে পারে একটি সমগ্র জাতির চিন্তা। একটি মাত্র বীর পুরুষের সংকল্প সাহস সঞ্চার করতে পারে লক্ষ লক্ষ কাপুরুষের হৃদয়ে।"—শ্রীঅরবিন্দ।

ব্রহ্মজ্ঞানীদের সম্বন্ধে জন সাধারণের একটা বিরাট ভ্রান্ত ধারণা আছে যে তাঁরা স্বার্থপর, শুধু নিজেদের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তাঁরা, জগতের সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু তা সত্য নয় ; সাধন কালে সিদ্ধি লাভের আগ পর্যান্ত তাঁদের একটু স্বার্থপর হতে হয় বটে কিন্তু তা সিদ্ধি লাভের আগ পর্য্যন্ত মাত্র তার পরে নয়, নিজে মুক্ত না হলে অপরকে মুক্ত করা যায় না, সন্ন্যাস না হলে মুক্তি লাভ করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ—"সন্ন্যাস না হ'লে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না একথা বেদ বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হবো, তাদের কথা আদপেই শুনিনি। ও সব প্রচ্ছন্ন ভোগীদের স্তোক বাক্য। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই।" ব্রহ্মজ্ঞানীরাই জগতের প্রকৃত কল্যাণকামী। শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টই বলেছেন—"নির্ব্বাণ লাভ হলে ভগবানের আদেশে আরো বেশী কাজ করা যায়, ব্রহ্মের মধ্যে অহমিকার বিসর্জ্জনই ব্যষ্টির সার্থকতা।" ব্রহ্মজ্ঞান সংসারের কোলাহলের, কাজ কর্ম্মের মধ্যে থেকেও লাভ করা যায়, আমি নিজে করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছি, যদিও সে পথ অতীব সুকঠিন কদাচিৎ কেউ তা পারে কিন্তু তা সম্ভব কিন্তু তার জন্য ত্যাগ, বৈরাগ্যের একান্ত প্রয়োজন, ত্যাগ ছাড়া, বৈরাগ্য ছাড়া, ঐকান্তিকতা, সরলতা ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানীরা নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হন না, কারণ মুক্তি তখন তাঁদের করতল গত হয়ে গিয়েছে, মুক্ত মহাপুরুষের ব্যক্তিগত কামনা বাসনা থাকতে পারে না, তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন কি করে অন্যদের মুক্ত করা যায়, কিন্তু সত্যকার কেউ তা চায় না। "ভারতবর্ষে" আমার প্রবন্ধগুলি পড়ে কয়েকজন আমাকে পত্র লিখেছিলেন কিন্তু সত্যকার চাওয়া তাদের কারোও ছিলনা, আমাকে জেনে শুনেও অযথা পণ্ডশ্রম করতে হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানটি আমারকাছ থেকে কেড়ে নিলেও (১০-৯-১৯৬০) কি করে ব্রহ্মজ্ঞান সহজে শীঘ্র লাভ করা যায় তার অভ্রান্ত পথ বলে দিতে পারি। কিন্তু ভগবানকে লোকে তো চায় না, তারা চায় কামনা বাসনার উপকরণ, মুক্তি তাদের কাছে উপহাসের বিষয় মুক্ত মহাপুরুষরাও তাই, এদের উদ্ধার করা অসম্ভব।

"Heaven's call is rare rare the heart that leeds." Sri Aurobindo. যে সত্য সর্বজনীন তারও গ্রাহক ও ধারক মুষ্টিমেয়ই হয়। যা বিজ্ঞানগম্য তার গ্রাহক কোটিকে গে টিক। অনির্ব্বাণ। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ"—কদাচিৎ সত্যকার কেউ ভগবানকে পেতে চায় কিন্তু সাধনার পথ—সিদ্ধিলাভের পথ যে সোজা তা কেউই বলেন নি, শ্রীঅরবিন্দ বার বার একথা বলেছেন ("Nobody ever said that the spiritual change was an easy thing Yoga itself is not easy, if it were so it would be a multitude and not only a few that would be practising it "Sri Aurobindo), বুদ্ধদেব বার বার বলেছেন "গম্ভীরাং প্রজ্ঞাপারমিতাং"—তাহাকে সহজে লাভ করা যায় না, বহু কষ্টে প্রজ্ঞাপারমিতাকে লাভ করা যায় ("One can not have the crown of spiritual victory without the struggle or reach the highest without the ascent and its Labour. Of all it can be said, "Difficult is that road hard to tread like the edge of a razor,—Sri Aurobindo) তথাগতত্ব, বুদ্ধত্ব, স্বয়ম্ভুত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা অতি দুরূহ, তাহা চিন্তার অতীত, তুলনার অতীত, তাহা অপ্রমেয়—"গম্ভীরা সুদুর্ব্বোধা" তা যদি সহজ হ'ত তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানী বেরিয়ে আসতো।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে ক্ষুরস্য ধারা, যোগের পথ বিঘ্ন সঙ্কুল, বাধা বিপত্তিতে ভরা, এই উত্থান পতনময় বাধাবিঘ্ন সমন্বিত যোগের পথ অবলম্বন করে বহু লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। স্বামী বিবেকানন্দ "বাধা যতই হবে ততই ভাল। বাধাইতো সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই।" বুদ্ধদেব বলেন—"দুর্লভ এমন কোন বস্তুই এ জগতে নাই যাহা উদ্যমশীল বীর্য্যবানের যত্নে সিদ্ধ না হয়।" সিদ্ধ মহাত্মা ফকীর মিয়া মির বলেন—"সেই আত্মজ্ঞানের আলো প্রতিটি মানুষের অন্তরেই জ্বলছে। কেউ বা সে সে আলো দেখেও দেখেনা কেউ বা সে আলোর তলাতে থেকেও থাকে তিমিরাবৃত। একটা বিরাট জাল পেতেছেন মেহেরবান খোদাতালা। সে জালটা হ'ল মায়ার জাল, মোহের জাল। সেই জালটা ছাড়িয়ে বাইরে যে বেরিয়েছে তার পথ খোদাতালা নিজে এসে দেখান।" "তপো ব্রহ্মেতি" তপস্যাই ব্রহ্ম, "তপসা ব্রহ্ম-বিজিজ্ঞাসস্ব" ব্রহ্মকে জানতে হলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে তপস্যাই একমাত্র উপায়, অন্য কোন পথই আর নেই। "নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি", তপস্যা বিহীন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় না। "ক্রতুময়ঃ অয়ং পুরুষঃ"—"পুরুষ ইচ্ছাময়। যিনি যাহা কামনা করেন সঙ্কল্প হইতেই তাহা পূর্ণ হয়। শুধু যা তা ইচ্ছা ও কামনা করিলেই কাম্য লাভ হয় না। ঘনীভূত ইচ্ছা ও কামনার নামই সংকল্প এবং এই সংকল্পই হইল কাম্য লাভের উপায়।" এ হ'ল অষ্টাঙ্গ যোগের পথ, এই যোগের পথে সিদ্ধিলাভ করতে বা গুরু কৃপায়, দীক্ষায় কাউকেই আমি সিদ্ধিলাভ বা মুক্তি লাভ করেছেন বলে দেখিনি। যোগের পথ যে সুকঠিন তাতে কোন সন্দেহই নেই। একথাও সত্য যে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেন তাঁরা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট (destined), কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাঁরা মুক্তি লাভ করবার জন্য তপস্যা করে এসেছেন, সেই সুকৃতির ফলেই তাঁদের মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। দুই এক জন্মে মুক্তি লাভ করা যায় না, যায় না এই জন্য যে সংস্কার বা মায়া ভেদ করার মত যে শক্তির দরকার তাদের তা থাকে না ; সেইজন্যেই তাদের মুক্তি হয় না। যাঁরা বেপরোয়া, যাঁরা সমস্ত বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েও অটল ভাবে সাধনা করতে প্রস্তুত থাকেন মাত্র তাঁদের পক্ষেই এক জন্মই পর্য্যাপ্ত, এমন কি দুই এক বৎসরই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু এরূপ সাধক বিরল, কদাচিৎ দুই এক জন মেলে। এ হ'ল অষ্টাঙ্গ যোগের পথের পরিণাম। এই যোগের পথ ছাড়াও মুক্তি বা ভগবানকে লাভ করবার অন্য বহু পথ আছে, মধ্যম পথও আছে আবার সহজ পথও আছে। শ্রীঅরবিন্দ দৈব কৃপা স্বীকার করেন, তিনি বলেছেন—"কদাচিৎ এমন হয় যে কোন সাধকের আর অন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, কেন না তার যোগ সাধনার বাকী অংশটাকে অবিরাম সেই দিব্য সংস্পর্শের ও সেই দিব্য প্রেরণার ফলে আত্মন্ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তবে এ রকম সাধকের সংখ্যা খুব কম। তাঁরা সত্য সত্যই মহান পুরুষ যাঁদের পক্ষে এ স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞানই যথেষ্ট, যাঁদের দরকার হয় না কোন লিখিত গ্রন্থ বা জীবন্ত শিক্ষাদাতার আশ্রয় গ্রহণ।" দৈব কৃপায় বিনা কষ্টে অতি অল্প ও শীঘ্র সাধনায় মুক্তি লাভ করা যায়, আমি নিজে তার প্রমাণ। মহাকালী আমার সাধনার দুয়ার প্রথমে খুলে দেন, তিনিই আমাকে ঘরছাড়া করেন, তাঁর স্পর্শ অধিমানস জগৎ, শান্তি (peace) তাঁর কৃপায় আমি লাভ করি, তিনিই আমার সাধনার পথ সোজা করে দেন। তাঁরই কৃপায় প্রায় দশ মাসের চেষ্টায় আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি (২, ৮, ১৯৬০, বেলা ২টা থেকে প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত) ; বুদ্ধদেব সহ একীভূত হই (৬, ৬, ১৯৬২, বেলা প্রায় ২টা) ; পুরুষোত্তমের কৃপা পাই সমাধির মধ্য দিয়ে (২৬, ১২, ১৯৬০ বেলা, ২॥০টা হতে ৩॥০টার মধ্যে) ফলে আমাকে এই সব লাভ করতে মোটেই কষ্ট পেতে হয় নি, কোন রকম বাধা বিঘ্ন বা পতনাদির মধ্য দিয়ে সাধন কালে যেতে হয় নি, অতি সহজেই আমি মুক্তি লাভ করেছিলাম আমাকে জোর করে হারান হয়েছে কিন্তু আমি হার মানিনি ; আমি কর্ম্মযোগ, মন্ত্রজপ ও ত্রাটক তিনটিই এক সঙ্গে করেছিলাম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ত্রাটক অভ্যাসই মুক্তি লাভের সহজ পন্থা, এতে দীক্ষা বা কারো কৃপার কোন প্রশ্ন ওঠে না, ঠিকমত অভ্যাস করতে পারলেই মুক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী, তবে তা ঠিক ঠিক করা চাই নতুবা নয়, এই জন্য তন্ত্রে বা বৌদ্ধ মহাযানীদের পন্থায় ত্রাটকের এত আদর। এ কথা স্বামী

বিবেকানন্দও স্বীকার করেছেন—"প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে, কি ভাবে আঘাত করিতে হয় তাহা জানা থাকিলে, বিশ্ব প্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয় ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয় ইহাই রহস্য।' ত্রাটক মনের শক্তিকে একাগ্র করে ভ্রূমধ্যে এবং ত্রাটকে একবার সিদ্ধিলাভ করতে পারলেই ঐ কেন্দ্রীভূত চেতনাকে দুই এক মাসের মধ্যেই অতি সহজেই সহস্রার ভেদ করান যায়, তা একবার যে কোন প্রকারেই হোক, করতে পারলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবেই। একথা শ্রীঅরবিন্দ এবং রমণ মহর্ষি বলেছেন, আমি নিজে এই করেই প্রায় দশমাসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলাম এবং এটাই সহজে লাভ করবার নির্ভুল পন্থা। মুক্তিকামী সাধককে বুদ্ধদেবের একটা কথা মনে করে সদা চলতে হবে যেটা স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই আবৃত্তি করতেন—

"পথ যদি না থাকে তবুও এগিয়ে যাও। ভীত হোয়ো না, কোন উদ্বেগ যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে। একলাই এগিয়ে চল তুমি—যেমন করে চলে গণ্ডার গণ্ডার, সিংহ বিচলিত হয় না কোন শব্দে, বাতাসকে বাঁধা যায় না জাল দিয়ে, পদ্মপত্রে জল জমতে পারে না। গণ্ডার একলাই চলে যায়—তুমিও চলো।"*

---

* অনেকগুলি উক্তি আমি নিয়েছি দুঃখের বিষয় নামগুলি মনে নাই।

মধুমিতা : তোমাকে

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

মধুমিতা, তুমি জীবনে আমার একদিন এসেছিলে
দুটি মন যেন ভেসে চলেছিল আকাশের ওই নীলে,
যেখানে পাখীরা খুশীর আবেগে প্রাণ খুলে গান গায়
রূপালী চাঁদে জ্যোছনা যেখানে কাছে ডাকে দু'জনায়।

মধুমিতা, তুমি ভেবে দেখ সেই উদার আকাশ তলে
আঁচলে লুকানো বকুলের মালা দিয়েছিল মোর গলে।
তোমার মুখের সে মধুর হাসি ভুলিতে পারিনি আজো
এখনো আমার হৃদয় বীণায় সুর হ'য়ে তুমি বাজো।

মধুমিতা, আমি দেখিনি তো ভেবে কেন যে এমন হয়
সবচেয়ে যাঁকে আপন ভেবেছি সেই আজ কেউ নয়!
একদিন তুমি চলে গেলে যবে বহুদূরে হাসি মুখে
সজল নয়নে করেছি কামনা থাকো যেন চিরসুখে।

মধুমিতা, তুমি হারিয়ে গিয়েছ অচেনা লোকের ভীড়ে
এ কপোত মন কেঁদে মরে তবু আপনার ছোট নীড়ে।
এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল যদি না হ'ত মোদের দেখা
বিরহের দাগ থাকিত না মনে—চোখেতে জলের রেখা।

এখন তোমার স্মৃতি মোরে ডাকে কেমনে তোমায় ভুলি,
ছিঁড়ে গেছে মালা, ঝরে গেছে হায় সেদিনের ফুলগুলি!

———

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তিন

অসিতের সুরথদাকে কথা দিতেই হ'ল যে, ফিরবার পথে তাঁর ওখানে তু'দিন থেকে তবে কাঠগুদামে নামবে। না দিলে প্রেমলের আশ্রমের জন্যে ডাণ্ডি পাওয়া সম্ভব নয় বললেন তিনি সখেদে। একদিনের পরিচয়, কিন্তু মনে হ'ল অসিতের যেন কতদিনের চেনা! এ-অভিজ্ঞতা ওর বিদেশেও হয়েছে প্রথম যৌবনে। কিন্তু সে ভোগজগতের লেনদেনে, প্রাণশক্তির স্তরে। ওর বৈরাগী তৃষ্ণার খবর এমন এককথায় বুঝে নিয়েছে কজন? মীরাবাঈয়ের একটি গান ও গেয়েছিল সুরথদার ওখানে রওনা হবার আগে: "ঘায়লকী গতি ঘায়ল জানে।" সুরথদা শুনে উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুটি চরণ উদ্ধৃত ক'রে:

পুষ্প দিয়ে মারো যারে জানে না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে।

বলেছিলেন: "ভাই, ঠাকুরের বাঁশির ডাক শোনা বাণ খেয়ে পড়ার চেয়েও সাংঘাতিক, কেন না এ হ'ল যাকে বলে ধনে প্রাণে মারা—সব থেকেও সব খোয়ানোর আনন্দ। তুমি যেন এই টানে দেউলে হওয়ার আনন্দের অধিকারী হতে পারো, ওর মতন এই প্রার্থনা করি।"

* * *

আলমোরার শৈলমালা কেমন যেন রিক্ত, শুষ্ক—ইংরাজীতে যাকে বলে jaunt; কিন্তু অসিত ডাণ্ডি চ'ড়ে গহন অরণ্যের মর্মভেদ করতে চলেছে—যেখানে লতাপাতা নানারঙা বন্য ফুলের আগুন লেগেছে। সঙ্কীর্ণ হাঁটাপথের রাস্তাকে প্রশস্ত করবার কথা হচ্ছে। হ'লে যাত্রীর সুবিধা হবে বাসও চলবে অবধারিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মনোরমা নির্জনতার অঙ্গহানিও হবেই হবে। সুরথদা বলেছিলেন: "সভ্যতার বরে আমরা অনেক কিছু লাভ করেছি মানতেই হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক কিছুই হারিয়েছিও বটে—বিশেষ ক'রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রেমলদের আশ্রমে তুমি পাবে অনাহত তপোবনের শান্তি সুষমা, কিন্তু বাস ট্রাক মোটরভ্যান শারাবাঁক্ এদের অভ্যাগম হ'তে না হ'তে সে গভীর নিস্তব্ধতায় ভাস্বিন রূপশ্রী জখম হবেই হবে।"

প্রেমলের আশ্রমের কাছে বনস্থলীর সৌন্দর্য আরো মঞ্জুল হয়ে উঠল। অদূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৈলমালা অসিতের নয়নমনকে মুগ্ধ ক'রে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কানে বেজে ওঠে এ-নৈঃশব্দ্যের গাঢ় শঙ্খ—ডাণ্ডি দাঁড় করিয়ে পকেট ডায়রিতে লিখল:

উদার গম্ভীর তুষারমন্দির-শঙ্খে মুক্তিমৃদঙ্গে
দিকে দিগন্তরে ধ্বনিয়া অন্তরে কে জাগে নৃত্যবিভঙ্গে!
গভীর ওম্-আনন্দে
উছলি' স্বপ্ন-অনন্তে
দাও চিরাশ্রয় হে দিব বরাভয়, তোমার আলোকিত অঙ্কে।
তোমার দুন্দুভি-তূর্য
স্বননে ব্যোমে জলে সূর্য
তোমার ইঙ্গিতে মায়াবী সঙ্গীতে কুসুম বিকশিল গন্ধে।
এসো চিরোজ্জ্বল কান্তি!
বিছায়ে তুঙ্গ প্রশান্তি
বাজাও শঙ্কর, তাল দীপঙ্কর অভয়-ডম্বরু ভঙ্গে॥

২

চার

অসিত ডাণ্ডি থেকে নামবার আগেই কানে এল ললিতার উল্লসিত অভ্যর্থনা :

"জয় জয় জয়! বাপী! দেখ সে! কে এলো! উলু উলু উলু!"

প্রেমল ছুটে এল মন্দির থেকে। পিছনে ললিতা ও প্রণব। প্রেমল ওকে আলিঙ্গন ক'রে বলল: "কাল এলে না কেন?"

"সুরথদাকে কি জানো না?"

"তা বটে, মনে ছিল না। গানের আসর হয়েছিল নিশ্চয়ই?"

"শুধু গানের নয় প্রাণেরও। কত কী-ই যে বললেন সুরথদা! কথা শুনলে মনেই হয় না তিনি নামজাদা বৈজ্ঞানিক।"

ললিতা টুপ করে বলল: কথা শুনে কি মনে হয় দাদা, যে তুমি জাত-বৈরাগী!"

প্রণব বলল: "কথা কাটাকাটি পরে হবে। ঐ ফের বৃষ্টি নামল ব'লে। চলো, ঘরে চলো। মা পথ চেয়ে আছেন।"

"তিনি কেমন আছেন?"

"সম্প্রতি পায়ের ব্যথাটা বেড়েছিল। তুমি আসবে খবর পাওয়ার পর থেকে কমেছে অনেকখানি।"

ললিতা (হেসে): "মা বললেন: তোমার সঙ্গে এক ঝলক ধন্বন্তরি আলো নামার ফলেই ঘটেছে এ-অঘটন।"

প্রণব বলল: বেশি উচ্ছ্বাস ভালো নয়। তবে অসিতই বিপদে পড়বে। শুধু পায়ের ব্যথা কমলে কী হবে?

অসিত: কী হয়েছে তাঁর?

প্রণব: সে নানা উপসর্গ। মা পই পই ক'রে মানা করেছেন তোমাকে তাঁর অসুখের ফিরিস্তি দিতে।

পাঁচ

মন্দিরটির ডান পাশেই মা-র ঘর। শুধু একটি খাট ও কয়েকটি দেয়াল কুলুঙ্গি। একটি দোর দিয়ে বেরুলেই মন্দিরের সামনের আধঢাকা বারান্দা। বারান্দার সামনেই ঠাকুরঘর। অন্দরে কৃষ্ণরাধার বিগ্রহ। সদরে একটি বুদ্ধমূর্তি। ব্যস। আর কিছুই নেই। ঘটা কি সাজ কি চালচিত্র।

ওদিকে আর একটি দোর খুলে বেরুলে একটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বারান্দা—কাঁচের সার্সিওয়ালা জানলায় সুরক্ষিত। বারান্দা বেয়ে পরিক্রমা ক'রে ফিরে আসা যায় মন্দিরের বারান্দার অন্য দিকে—একটি অর্ধবৃত্ত শেষ হয়েছে বারান্দার চওড়া ব্যাসরেখার দুই প্রান্তে। এ বারান্দায় পড়েছে আরো দুটি ছোট ঘরের প্রবেশপথ। একটি প্রেমলের শোবার ঘর, অন্যটি বসার। মাটিতে কম্বলাসন, সামনে একটি এক হাত উঁচু, দেড়গজ লম্বা কাঠের চৌকি। মাটিতে আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে এই টেবিলেই সে লেখে বা পড়ে। অসিত রইল প্রেমলের শোবার ঘরে। প্রেমল শুত মার ঘরে মাটিতে এক খড়ের তোষকের উপর কম্বল পেতে। প্রণবের কুটির কাছেই, ললিতার কুটিরও। সবচেয়ে আরাম ললিতার ঘরে। অন্য কোনো ঘরেই কার্পেট নেই। তাই ললিতা চেয়েছিল অসিতের জন্য নিজের ঘরটা ছেড়ে দিতে। কিন্তু প্রেমল রাজী হয় নি, বলেছিল: না, ও দু'দিনের জন্যে এসেছে, যতটা পারে মার কাছাকাছি থাকুক। আসবাবের বিলাস ও ঢের ভোগ করেছে, করবেও পরে। এখানে ও একটু ভোগ ক'রে যাক যা আর কোথাও পাবে না—দুর্ভোগের মধ্যে শান্তিপ্রসাদের জলযোগ।"

বলা হয় নি, কিন্তু বলাই চাই যে, মা-র ঘরে আর একটি বাসিন্দা এক কুকুর। শুধু বাসিন্দা নয় মা-র বিছানায়ই শোয় মার কোলের কাছে।

ছয়

অসিত এর আগে তিন চারটি আশ্রমে গিয়ে পাঁচ সাত দশ দিন ক'রে কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথাও এত আরাম পায় নি। বাইরের দিকে অবশ্য আরাম বলতে যা বোঝায় তার উপকরণ কিছুই ছিল না। না ছিল আসবাবপত্রের জৌলুষ, না ভোজনবিলাস। কেবল একটি মাত্র আসর বসত খাওয়ার সময়ে—সকালবেলা কফির সঙ্গে ব্রাউন ব্রেড ও মাখনযোগে নানা আলোচনা। সকালে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে হ'ত এই কথালাপ প্রাতরাশের পরিবেশে। তারপর প্রণব যেত তার ঘরে পাহাড়ীদের ওষুধ দিতে। ললিতা রাঁধত রান্নাঘরে। প্রেমলকে আশ্রমের

অনেককিছুরই দেখাশুনো করতে হ'ত। দুপুরবেলা আহারের পর অসিতের একটি ব্যসন ছিল—ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা। ভাদ্র মাসে সাড়ে সাত হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ে কনকনে শীত। দুপুরবেলাও দিব্যি কম্বলমুড়ি দিয়ে নিদ্রা। "দাদার আমার চাইই চাই বিউটি স্লীপ" বলত ললিতা। ভাগ্যে অসিত নিজের নরম কম্বল ও বালাপোষ এনেছিল! প্রেমল প্রণব এমন কি ললিতাও পাহাড়ীদের রুক্ষ কম্বলই গায় দিত। কেবল মা-র জন্যে ছিল লেপের ব্যবস্থা। ভারতের প্রাচীন আদর্শ ওরা পুরোপুরিই মেনে নিয়েছিল—বিলাসবর্জন, শুচি পরিচ্ছন্নতা তথা কৃচ্ছ্রসাধনা। কৃচ্ছ্রের জন্যেই কৃচ্ছ্র নয়—বিলাসের উপকরণ কমানোই ছিল লক্ষ্য। প্রেমল প্রায়ই গেটের নানা উক্তি উদ্ধৃত করতে ভালোবাসত। থেকে থেকে ঘোষণা করত তাঁর একটি অনুজ্ঞা: you must do without—you must do without"-প্রেমল প্রায়ই বলত—বিলাসে ওর আপত্তির প্রধান কারণ এই যে বিলাসীর ইচ্ছাশক্তি—will power প্রায়ই দুর্বল হ'য়ে পড়ে। বলত অসিতকে ঘড়ি ঘড়ি: "অনেক ইদানীন্তই আমাদের শাস্ত্রের নানা নিষেধকে বাড়াবাড়ি বলেন সৌখিন 'সহজিয়া' হ'তে যেয়ে। এই যে, যেহেতু বাইরের সব কিছুই বাহ্য, সেহেতু বিলাসে ভয় কি? যথেচ্ছ ভোজনে দোষ কি? নরম বিছানায় শুলে ক্ষতি কি?…ইত্যাদি। যারা সংসারী তাদের পক্ষে ক্ষতি নেই, মানি। কিন্তু যারা সাধক তাদের পক্ষে উদার হ'য়ে দেহের সব আরামকেই বিধাতার দান ব'লে বরণ করার বিপদ আছে। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। দেখতে হবে নিজের অন্তরের তল পর্যন্ত খুঁজে কোথাও সুখের আসক্তি ঘুপটি মেরে ব'সে আছে কি না। সাধনার ফলে যে আত্মপ্রসাদ জ'মে ওঠে তার স্নিগ্ধতা ও সৌম্যতা sevenity—বজায় রাখা যায় না আসক্তির মোহ সাধকের মনকে পেয়ে বসলে।" এ ধরণের মাষ্টারি কথা অসিতের ভালোই লাগত—কিন্তু সে "কঠোর" করতে অভ্যস্ত ছিল না ব'লে মাঝে মাঝে গৃহসুখের অভাব বোধ করত বৈ কি। কিন্তু যখন দেখত বিলাসিনী ললিতাও হাসিমুখে "কঠোর" করছে—দুবেলা রাঁধছে, তখন লজ্জা পেত ভাবতে যে আরাম বিনা তার এখনো একটু কষ্ট মতন হয়।

কিন্তু "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" বলত প্রেমল প্রায়ই সুরধ্বার প্রতিধ্বনি ক'রে। অসিত দেখল—কথাটা সত্য—অক্ষরে অক্ষরে। তাই কয়েকদিন বাদেই আশ্রমের রুক্ষতা—austerity—তার বেশ গা-সওয়া মতন হ'য়ে এল। এমন কি শক্ত বিছানায় শুয়েও মনেই হ'ত না কলকাতার মোটা নরম Dunlop তোষক ইত্যাদির কথা। কেবল খুব ভোরে উঠতে হ'ত এই যা। কিন্তু না উঠেই বা করে কি? ভোরবেলার পূজায় যোগ না দিলে মান থাকে না যে।

কিন্তু ওর সব ক্ষতিপূরণ করেছিল প্রেমল ও ললিতার সঙ্গ। দিনের পর দিন হু হু ক'রে কেটে যেত ওদের সাহচর্যে। মা-র সঙ্গও ওকে প্রেরণা দিত বৈ কি। কিন্তু তাঁর শরীর সে সময়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল ব'লে সন্ধ্যাবেলায় ভজনের সময়ে ছাড়া তাঁর স্নেহস্পর্শ পেত না। আর এক চিরসরস—"তাজা বতাজা" আনন্দ ছিল—প্রত্যহ বিকেলবেলা ঘণ্টা খানেক প্রেমল প্রণব ও ললিতার সঙ্গে নানা আলোচনা। তারপরই যেত সবাই মিলে মার ঘরে। মা কখনো কখনো বলতেন নিজের সাধনায় এক আধটা উপলব্ধির কথা। কিন্তু বেশি কথা বলার মতন তাঁর অবস্থা ছিল না সে সময়ে। তাই কাশীর মতন তাঁর সঙ্গে স্নিগ্ধ হাসি গল্প জ'মে উঠত না।

আলমোরার প্রাকৃতিক পরিবেশ ওর তেমন মন টানে নি। সমুদ্র বা পাহাড় ওকে সময়ে সময়ে মুগ্ধ করলেও ও আশৈশব ভালোবেসে এসেছে নদীকে—আর নদীর নদী হ'ল গঙ্গা। গঙ্গাকে সাথী পেলে ওর মন যেমন ভ'রে উঠত হিমালয় ওকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারত না।

কিন্তু এটুকু বুঝতে ওকে বেগ পেতে হয় নি যে আলমোরাই প্রেমলের আপন পীঠস্থান—শুধু গুরুস্থান ব'লেই নয়, হিমালয়ের শুদ্ধ মহিমা তার মনকে শান্তিতে ভ'রে দিত। অসিতের হিমালয় সম্পর্কে ধ্রুপদ ধামারটি সে রোজই একবার ক'রে শুনতে চাইত সকালে উঠেই:

উদার গম্ভীর তুষার-মঞ্জীর-শঙ্খে মুক্তিমৃদঙ্গে
দিকে দিগন্তরে ধ্বনিয়া অন্তরে কে জাগে নৃত্যবিভঙ্গে!

ওদের সাধনার আবহ ঘন হ'য়ে উঠত প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে। মা পাশের ঘরে বিছানা থেকে শুনতেন ওদের আরতি ও স্তব। স্তব করত সকলেই। অসিতও যোগ দিত। আরতি করত প্রেমল। প্রণব—শুধু ধ্যান।

অসিতকে প্রতিসন্ধ্যায় আরতির আগে হয় নামগান না হয় ভজন কীর্তন করতে হ'ত। প্রেমল শুধু কীর্তন করত: বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। চণ্ডিদাসের "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব" গানটি গাইতে গাইতে প্রেমলের গৌর মুখ লাল হ'য়ে উঠত আবেগে। প্রেমল সুগায়ক ছিল না, কিন্তু ওর ভাব ও আন্তরিকতায় সবাই মুগ্ধ হ'ত। অসিতের কয়েকটি গান ছিল ওর বিশেষ প্রিয়: "মেরে দিলমে দিলকা প্যারা হৈ মগর মিলতা নহী," "গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী", "দীন দয়াল গোপাল হরি" "চাকর রাখোজী"...ইত্যাদি। কিন্তু ওর সব চেয়ে ভালো লাগত অসিতের বৃন্দাবনের লীলা-র গান। এ-গানটি শুনতে শুনতে ওর মুখচোখের ভাবই বদলে যেত। বলত ওকে প্রায়ই যে, ভারতবর্ষে এসে অবধি এমন গান আর শোনে নি কোনোদিন।

[ক্রমশঃ

কোন এক গাছের উত্তাপে

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

অথচ আশ্চর্য দেখো মৃত্যুকেও মহিমা বিলায়
দৃষ্টি কাড়ে দার্শনিক বাস্তবিক কিংবা কুসুমিত
সকলেই একবাক্যে বলে ওঠে, আহা কি সুন্দর!
কবে যেন প্রাণ ছিল প্রাণে ছিল আলোর বাসনা
ঋতুমতী ঋতুতে ঋতুতে।
বসন্ত বাতাসে হাত খুশি দিতো কুলুতে পরাগে।
সে এখন অচিরপ্রভায়
কেমন নিষ্কম্প দেখো যেন কোন ভামিনী মানিনী
পায়ে তার টলমলো সোণের অবিরল ঢেউ।
সবচেয়ে সবুজের ঘেরাটোপে একক তাপসী
সাধনায় রিক্তহয়ে উর্ধ্বমুখী হাজার হাতেতে,
ডিমের কুসুম হয়ে সূর্য হবে হাঁটি হাঁটি পায়
বি-পূর্বে বিলীন হয়, তখন সে অপূর্ব আরতি।
যদিও বিজ্ঞান এসে নাকে নাড়ে, এতো মরা গাছ।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

প্রথম অধ্যায়, চতুর্থপাদ

১ শ্লোকের শেষাংশ

এই ইন্দ্রিয়ে বশেতে রাখিলে পাইবে ব্রহ্মে লয়
বিষ্ণুর পরম পদসে জানিও এ ভাবে লভিতে হয়।

সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ (২)

শরীর স্থূল ও প্রকট রূপেতে তবু তা জানিও নয়
অব্যক্ত বলে শরীরে কখন বলা জেন নাহি হয়।
গো বলে দুগ্ধে বেদেতে বোঝায়
গাভী হতে দুধ সৃজন যে হয়
তেমনি জানিও সূক্ষ্ম জীবেতে শরীর মিশায়ে রয়
তাইত সূক্ষ্ম বলা হেথা হল বুঝিয়াছ নিশ্চয়।

তদধীনত্বাদর্থবৎ (৩)

এই অব্যক্ত ব্রহ্ম অধীন সার্থক তাই হয়
সৃষ্টির আগে জগৎ সূক্ষ্ম অব্যক্ত হয়ে রয়
এই অব্যক্ত সাহায্য লইয়া
আকাশ অক্ষর কথন বা মায়া
অবিদ্যা বলি বলেন বা কেহ ঈশ্বরাধীন সে রয়
সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত শুধু একথা কখনো নয়।

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ (৪)

অব্যক্তকেই হইবে জানিতে এমন কথা ত নাই
সাংখ্যের প্রকৃতি বলিয়া তাহাকে ভুল করিওনা ভাই
প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে চিনিলে
কত যে প্রভেদ ইহাই জানিলে
সাংখ্য দর্শনের ইহাই ইচ্ছা প্রকৃতি স্বরূপ জানো
কঠোপনিষদেতে নাই এই কথা অব্যক্তকে আগে চেনো।

৫ শ্লোক

বদতি ইতি চেৎ ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ

শঙ্কর বলে উপনিষদেতে এই কথা জেন বলে
অব্যক্তকে হইবে চিনিতে জেনো ভুল তাহা হলে
যাঁহাকে জানিতে বলেছেন সবে
পরমাত্মা সে বিরাজেন সবে

কঠোপনিষদে—

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্
তথাহরসম্ নিত্যম্ অগন্ধবৎ চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্
নিশম্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। (কঠ) ১।৩।১৫

শব্দ স্পর্শ রূপ ব্যয়হীন রস হীন সেই জন
নিত্য গন্ধ হীন অনন্ত অনাদি মহত ধন
তত্ত্ব সত্য সেই
ধ্রুব সে নিত্য যেই
তাঁহারে জানিলে মৃত্যু হইতে মুক্ত হওয়া যে যায়
তাঁহারে চিনিলে মানুষ সকল দুঃখে মুক্তি পায়।

কঠোপনিষদ্ ১।৩।১১

পুরুষান্ন পরং কিংচিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ

ইহার পরেতে আর কিছু নাই ইহাই পরম গতি
এই আত্মাই বিরাজেন সবে সবাকার প্রাণপতি
সবার মাঝেতে গূঢ় ভাবে থাকি
আপনারে সদা রাখে যেই ঢাকি
নয়ন তাঁহার দরশন আর পরশন নাহি পায়
যাঁহারে চাহিলে সব যায় পাওয়া তাঁহারে সকলে চায়
পুরুষ প্রকৃতি ইহারে জানিলে
হবেনা কখন ব্রহ্মে না মেলে।

(৬)

ত্রয়াণামেব চ এবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ

তিনটি বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন এইখানে করা হয়
জীবাত্মা আর অগ্নি এবং পরমাত্মাকে কয়
"অব্যক্ত এবং প্রকৃতির নয়
জেনো মনে ইহা স্থির নিশ্চয়"
প্রথম প্রশ্ন করে নচিকেতা হে মৃত্যো মোরে বলো
অগ্নিরে পূজি স্বর্গ লভিতে কোন পথে তুমি চলো।

[ক্রমশঃ]

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অধ্যায়, প্রথম বল্লী

নচিকেতার পরলোক সাধন।

একাদশ মন্ত্র (১।১।১১)।

মন্ত্র—যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎ প্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু—
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥

অর্থ—(যম বলিলেন :—) "তোমার পিতা উদ্দালক, যিনি অরুণের পুত্র, তোমার প্রতি পূর্ব্বে যেমন স্নেহ পরায়ণ ছিলেন, তোমাকে চিনিতে পারিয়া ভবিষ্যতে সেইরূপ স্নেহশীল হইবেন। মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত তোমায় দর্শন করিয়া, তিনি আমার আদেশে ক্ষোভশূন্য হইবেন এবং অতঃপর বহুরাত্রি সুখে নিদ্রা যাইবেন।"

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে নচিকেতার পিতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ডাক নাম যে গৌতম ছিল তাহা দশম মন্ত্রে নচিকেতা স্বয়ং বলিয়াছেন। যম যে তাহা অবগত ছিলেন সে কথা জানাইবার জন্য তাঁহার বংশ পরিচয় দিলেন। তিনি (নচিকেতার পিতা) শরীর হিসাবে অরুণের পুত্র এবং দত্তকরূপে বাজশ্রবার পুত্র বলিয়া উদ্দালক নামে বিখ্যাত ছিলেন। দুই বংশেরই পিণ্ডদানের তিনি অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজে পোষ্যপুত্র হইলেও মহারাজ হ'ন এবং তাঁহার সেই বংশীয় পিতার কার্য্য সমাধা করিবার জন্য বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু তাঁহার নিজ জীবনে বংশরক্ষা সার্থক হয়, যখন তাঁহার নচিকেতার মত পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'ন এবং সেই পুত্রকে যমের ন্যায় উপযুক্ত গুরুর হস্তে দান করিয়া, তিনি তাঁহার শরীরের পিতা অরুণের ঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করেন। কিরূপ অদ্ভুত উপায়ে উদ্দালক নিজ পিতৃস্থানীয় দুই জনেরই ঋণ পরিশোধ করেন তাহা এখানে যম ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। যমের উক্তিতে এই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

যমরাজের মুখের বাণী হইতে নচিকেতা যেমন তাঁহার বংশের পূর্ব্বকথা স্মরণে পাইলেন, সেইমত নিজের ভবিষ্যৎও যমের কৃপা প্রদত্ত বরগুলি হইতে ক্রমশঃ ধারণা করিতে পারিবেন। তিনি কি সত্যই তাঁহার পিতার কাছে ফিরিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন? পুত্র যদি পিতার শান্তিবিধান না করে ও পিতার সহিত যোগসূত্র রক্ষা না করে, তাহা হইলে আর্য্যধর্ম্ম আজ কোথায় ভাসিয়া যাইত! আমাদের মনে হয়, যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে নচিকেতা গুরুকৃপা সার্থক করিতে না পারিতেন তাহা হইলে সেই গুরু প্রদত্ত বরগুলি তাঁহার রক্ষা কবচ হইয়া তাঁহাকে অধোগতি হইতে বাঁচাইত, যেমন শ্রীচণ্ডীতেও প্রথমেই কবচের প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদির উল্লেখ পাই। নচিকেতার অর্জ্জিত প্রথম বর তাঁহাকে অন্ততঃ কর্ম্মমার্গে দৃঢ় করিল, দ্বিতীয় বর (পরে দেখিব) যজ্ঞ সাধনে কৃতকার্য্য করিল ও এইরূপে তাঁহার পিতামহ ও পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম্মজীবনে তাঁহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝাইল যে মানব মাত্রেই এইরূপে ইহজীবনের বন্ধনদ্বয় তমোগুণ ও রজোগুণকে বশে রাখিয়া নচিকেতার মত তৃতীয় বর অর্থাৎ মোক্ষের জন্য নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। এইরূপে কঠোপনিষদের এই প্রথম বল্লী যে সমস্ত উপনিষদখানির সাধনপথের ভিত্তিভূমি তাহা মনে করিয়া আমরা নচিকেতার অনুসরণ করিতে চাই।

দ্বাদশ মন্ত্র (১।১।১২)।

মন্ত্র—স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।

উভে তীর্ত্বা২শনয়া পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥

অর্থ—(নচিকেতা বলিলেন :—) "স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই। আপনি সেখানে নাই। সুতরাং জরাও নাই যে মৃত্যুভয় দেখাইবে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ই অতিক্রম হইয়া যায় (অর্থাৎ সেখানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নাই)। সকল প্রকার দুঃখের অতীত হইয়া সেখানে 'আমোদে' থাকা যায়।

ব্যাখ্যা—মানুষের স্বর্গবাস হইলে তাহার শরীর সে ধরাধামে ছাড়িয়া যায়। সেইজন্য শরীরের যে অভাব, যাহা ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা থাকে না। শরীর থাকে না, অতএব শীর্ণ কে হইবে? মৃত্যুও সেখানে নাই, অতএব মৃত্যুভয় না থাকিলে জরা কেমন করিয়া আসিবে? জীর্ণ শীর্ণ হওয়ার কোন বালাই নাই, অতএব জীব সেখানে পরমানন্দে বাস করে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, শরীর যখন থাকে না তখন আনন্দ উপভোগ করে কে? "শরীর" থাকে না বটে, কিন্তু "দেহ" থাকে। শরীর শীর্ণ হয়, তাই তাহাকে শরীর বলা হয়। "দেহ" বলিতে জীবের সূক্ষ্ম দেহ ও তাহার চাহিদা বুঝায়। সূক্ষ্ম দেহ বলিতে পঞ্চকোষাত্মক দেহ। তাহার মধ্যে অবশ্য শরীর অন্নময় কোষের প্রধান অংশ। প্রাণ ও মন, জল ও অন্নের সূক্ষ্ম অংশজাত বটে, কিন্তু শরীর পাত হইলে, আর সূক্ষ্ম অন্ন-জল না জুটিলেও সূক্ষ্ম দেহস্থিত প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্ম দেহের শেষ প্রান্তস্থিত আনন্দময় কোষ হইতে নিজ পুষ্টি, আনন্দ, আহরণ করে। আনন্দময় কোষকে উহারা "দে" বলিতে থাকে ও সেই কোষ হইতে উত্তর পায় "হ" অর্থাৎ নিশ্চয়ই দিতেছি। তাই দেহ নাম সার্থক হয়, যতক্ষণ-মরণের পরও আনন্দময় কোষ নিম্নস্থিত-কোষগুলির নিকট, ইহ-জীবন সঞ্চিত আনন্দ পরিবেশন করিতে থাকে। যখন সে আনন্দ ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়, "দেহ" নাম নিরর্থক হইয়া যায়, তখন সূক্ষ্মদেহ অস্থির হইয়া পুনরাবর্তন করে এই সংসারে।

অতএব স্বর্গে সূক্ষ্ম দেহ থাকে এবং তাহাই আনন্দ উপভোগ করে। তবে কেনোপনিষদে কি করিয়া "অনন্ত" স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে তাহা শেষ দুইটি মন্ত্রে, বিশেষ করিয়া শেষ মন্ত্রে, উক্ত হইয়াছে। নচিকেতা এক্ষণে সেইদিকে ধাবিত হইয়া এখানে ত্রয়োদশ মন্ত্রে সেই শিক্ষার ভিক্ষা জানাইলেন যাহাদ্বারা অমরত্ব বা অনন্তস্বর্গ পাওয়া যাইতে পারে।

ত্রয়োদশ মন্ত্র (১।১।১৩)

মন্ত্র—

স ত্বমগ্নিং স্বর্গমধ্যেষি মৃত্যো:
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥

অর্থ—(নচিকেতা পূর্ব্বমন্ত্রের ক্রম অনুসারে আবার বলিয়াছেন :—) "হে মৃত্যু! স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন রূপ অগ্নি, যে অগ্নি দ্বারা লোকে স্বর্গলোকবাসী হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে, তাহা আপনি অবগত আছেন। আমি শ্রদ্ধাবান্, তাহা আমাকে বলুন। আমি দ্বিতীয় বর দ্বারা এই যজ্ঞীয় ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান প্রার্থনা করি।

ব্যাখ্যা—নচিকেতা পুনরাবর্ত্তনের নিয়ম জানিতেন, সেইমত প্রথম বর চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে যাহা জানিতেন না অর্থাৎ সংসারে থাকার অবস্থাতেই যে কর্ম্ম বা যজ্ঞ সাধন করিলে অনন্ত স্বর্গ এখান হইতেই সুগম হয় তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনন্ত স্বর্গ বিষয়ে প্রসঙ্গ কেনোপনিষদের শেষ দুইটি মন্ত্রে পাই এবং অনন্ত স্বর্গ শব্দও শেষ মন্ত্রে উল্লিখিত আছে। সেখানে "তপস্যা, দম, ও কর্ম্ম" অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া যে অনন্ত স্বর্গ পাওয়া যায়, তাহার বিধান আছে। এক্ষণে সে পথ প্রথম হইতেই না পাইলে, অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্তির আর একটা পথ আছে তাহা জ্ঞাত করা হইতেছে। যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ দ্বারা অনন্ত স্বর্গ লভ্য, তাহাই এখানে জিজ্ঞাস্য।

মনে হয় আর্য্যধর্ম্মীগণ, আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া, বর্ণাশ্রমের নিয়মের অধীন থাকিয়া, স্বর্গ প্রাপ্তির প্রার্থী ছিলেন না। তাঁহারা স্বাধীনভাবে কি প্রকারে নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া, স্বর্গের অমরত্ব পাওয়া যায়, তাহার অভিলাষী হইয়া পড়েন। মনে হয়, এই সময়ে বোধ করি, বর্ণের বন্ধন ও আশ্রমের শৃঙ্খলা সেকালের সমাজেও শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাই অনেকে শাস্ত্র অনুযায়ী পূজা-অর্চ্চনার পথ ধরিয়া নিজ

পারলৌকিক উন্নতি সাধনে তৎপর হইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য এই বর ভিক্ষা খুবই শোভন হইল।

পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নচিকেতার চিন্তার ধারার অনুসরণ করি। আত্মহারা হইলে তবে পরে স্বীকার করা যায় যে আনন্দ পেলাম। তাই জীবনের স্বর্গ বা "স্ব"তে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ইহা ক্ষণিক হইতে পারে অথবা স্থায়ী হইতে পারে। পূর্ব্বমন্ত্রে কিছুকাল লভ্য স্বর্গের কথা বলা হইয়াছে। সে আনন্দ, "মোদতে" অর্থাৎ আমোদ প্রমোদের মত। এই সংসারের আমোদ প্রমোদ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত ও মনুষ্যসম্পর্কে বিরচিত যে ক্রীড়া কৌতুক জীবনকে সরস রাখে, তাহাই মরণের পর স্বর্গে, পুরাতন পড়ার মত, যতদিন আনন্দ দেয়, ততদিন সূক্ষ্মদেহ সেখানে তৃপ্ত থাকে। তারপর আবার নূতন চাষ-আবাদের আনন্দের আশায় এখানে জীব ফিরিয়া আসে। এই প্রকার আনন্দলোভীরা বিশ্বাস করেন যে জগৎমণ্ডলই আনন্দের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। মানবাত্মা ইন্দ্রিয় ও জগৎ ব্যাপারে নিজকে অধিষ্ঠান না করিলে এ আনন্দ আসে কি করিয়া?

এ প্রকার আনন্দ মানুষ "ভোজন" করে। এই আনন্দেই মানুষের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বিলয়। "অশনায়া মৃত্যু" (বৃহদ-উপ, ১।২।১) অর্থাৎ ভোজন ইচ্ছাই মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস। ভোজনের উপর যাঁহাদের মন পড়িয়া থাকে, ভোগের জন্য যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ ভোজন বা ভোগরূপে আনন্দের প্রার্থী যাঁহারা, তাঁহাদের স্বর্গে গিয়াও সোয়াস্ত নাই, সেখান হইতে পুনর্জন্মে প্রত্যাগমন করেন, সূক্ষ্মদেহের তৃপ্তি ফুরাইলে আর গত্যন্তর থাকে না।

অতএব নচিকেতা এ প্রকার আনন্দ চান না। তিনি ভোজনবিলাসীর স্বর্গ চাননা। তিনি চান ভজনশীলের স্বর্গ। "ভজন" কথাটি এই মন্ত্রের তৃতীয় পংক্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভোজনের ভজন না করিয়া ভজনকে ভোজন করিয়া যে চিরস্থায়ী আনন্দ ও অনন্ত স্বর্গ পাওয়া যায় তাহারই তিনি প্রার্থী। এই আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায় তাহা জানিবার জন্য তিনি যমরাজকে "অধ্যেষি" বলিয়া ধরিয়াছেন। "অধ্যেষি" বলিতে অধ্যয়ন করেন বা অবগত আছেন বলিয়া নির্ণীত হয়। ইহার মধ্যে একটা গোপন বক্তব্যও আছে। যমরাজ জানেন যে যাঁহারা ভজনকে ভোজন করিয়া জীবনযাপন করেন, তাঁহারা আর পূর্ব্বের মত, আনন্দের জগৎমণ্ডলে অধিষ্ঠানতত্ত্ব ধরিয়া চলেন না, তাঁহারা ভজনের আলোয় গূঢ়তরতত্ত্ব অবগত হ'ল যে আনন্দ জীবসত্তায় "অধ্যাস" বা প্রকাশমান হইতেছে আত্মা হইতে। অধিষ্ঠানতত্ত্বের পরিবর্ত্তে অধ্যাসতত্ত্বে তাঁহাদের আস্থা স্থাপন হয়। আর জগতের পানে আশায় আশায় ছুটিয়া বেড়ান না। স্বীয় অন্তরের গভীরতর আবাসে যে ভগবৎ আকর্ষণ পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে তাহারই প্রতিবিম্বমাত্র যে বহির্জগতে পড়িয়াছে তাহা জানিয়া আর কি কেহ ছায়া লইয়া থাকিতে চায়? এইরূপে আনন্দ অভিযানের সার্থকতা আত্মপ্রকাশ করিলে, মানুষ জগৎপানে বিমুখ হয় আর আমোদপ্রমোদে মন উঠে না, সংসার বিষের মতন প্রতীত হয়, তখন সে আর ক্ষণস্থায়ী স্বর্গের কাঙাল নহে, নচিকেতার মত স্বর্গের অমৃতত্ব চায় যাহার শেষ নাই। আনন্দ ভোজন করিলে মৃত্যু। ভজনের দ্বারা আনন্দের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করিলে তাহার আর প্রতিক্রিয়া হয় না, তখন আর পুনরাবর্ত্তন নাই। অনন্ত-স্বর্গ প্রাপ্তির ইহাই উপায়। ইহার সম্বন্ধে কিরূপ বিচার বিমর্ষ করিলে, কিরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিলে পর, মানুষের ইহা সাধনসাপেক্ষ হয় তাহাই নচিকেতা যমের নিকট জানিতে চাহিতেছেন। কারণ, নচিকেতা জানেন, যমরাজ নিশ্চয়ই এই কৌশল ধরাইয়া দিতে পারিবেন যাহাতে মানুষ অনন্ত স্বর্গের পানে স্বচ্ছন্দে অধিরূঢ় হইতে পারিবে।

চতুর্দ্দশ মন্ত্র (১।১।১৪)।

মন্ত্র—প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতম্ গুহায়াম্॥

অর্থ—(এখানে যম বলিতেছেন :—) এ সব কথা শাস্ত্রের কথা হইলেও মানুষের হৃদয় গুহায় নিহিত আছে জানিবে অর্থাৎ নিজের নিজের সাধনা দ্বারা জানিতে হয়, পালন করিতে হয় ও অনুরূপ হইয়া যাইতে হয় (শেষ পংক্তি)।

অমরত্ব শুধু প্রাপ্তি হইলে হয় না, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয় (তৃতীয় পংক্তি)। হে নচিকেতা! অমরত্ব প্রাপ্তির যজ্ঞবিধি আমি বিশেষভাবে জানি (দ্বিতীয় পংক্তি)। তুমি একাগ্রমনে শুন ও শিক্ষাকর, আমি তোমাকে ইহা প্রাণভরিয়া বলিতেছি (প্রথম পংক্তি)।

ব্যাখ্যা—ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শুধু "প্রজানন্" শব্দটি লক্ষ্য করিতে হয়। যম বলিতেছেন, "আমি জানি"। শুধু তাহাই নহে। তিনি এই বাক্যের দ্বারা আরও বলেন, "যাহাতে এই জ্ঞানের জন্ম হয়, আমি সেইরূপ শিক্ষা দিতে পারি।" তার চেয়েও বড় কথা, যম বলিতে চান, "আমার কাছ হইতে যে ইহা আদায় করিতে পারিবে তাহার প্রজ্ঞানঘন উপলব্ধ হইবে"। এ সবকথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য হইলেও আমরা আভাসে যাহা জানিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

[ক্রমশঃ]

সন্ধ্যাগমে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বৃথা কেটে যায় দিন!—আজি এ সন্ধ্যায়
সহস্র ধিক্কার হানি নিজেরে কেবল।
ভাষাহীন কতো আশা মর্মে লীয়মান,
কতো যে স্বর্ণাভ স্বপ্ন হয়নি সফল—
ভাবি তাই! রূঢ় সত্য কহিতেই হবে,—
যতো দুঃখ এ ললাটে—নহে ততো সুখ;
হাসিয়াছি যতোবার—তার চেয়ে বেশী
ক'রেছি ক্রন্দন;—জানি, বলিবে নিন্দুক
'নিদারুণ দুঃখবাদী'?
শাশ্বত প্রথায়
চলিয়াছি জাগতিক জীবধর্ম পালি';
নগণ্য সংসার-কীট—ক্ষুদ্র পল্লীছায়
পাতিয়াছি আরো ক্ষুদ্র এই গৃহস্থালি!
উঞ্ছ আহরণ লাগি' ধাই দিগ্বিদিকে
নীড়-ছাড়া উৎকণ্ঠিত পক্ষীর মতন
উর্দ্ধশ্বাসে; তার দীর্ঘ দিবাশেষে
আসি ফিরে;—কোথা গান! কোথায় কূজন!
শুষ্ক রুক্ষ প্রীতিহীন যান্ত্রিক সংসার,—
নাহি তার কোনোখানে প্রাণের বন্ধন;
স্বাদশূন্য অসুন্দর বৈচিত্র্য বিহীন
যায় কেটে ক্ষীয়মাণ বিফল জীবন!
দুঃসহ কুশ্রীতা-ঘেরা হীন পরিবেশে
মীনসম আছাড়িয়া মরি অহরহ
মৃত্তিকায়!—সুন্দরের চির পূজারীর
চিরন্তন এ লাঞ্ছনা কেন স্রষ্টা, কহ?
খেটে ছুটে করি শোধ জনমের ঋণ;
দুঃস্বপ্ন জর্জর মোর যামিনী-প্রভাত;
তারপর চির সুপ্তি সুরধুনী-তীরে,
অর্থহীন অস্তিত্বের যবনিকাপাত!
এই লাগি' রুধিরাক্ত জীবন-সংগ্রাম?
এরি তরে এ তিক্ততা, নিগ্রহ আত্মার,
সর্বগ্রাসী এ বর্বর জঠরযন্ত্রণা?
কে বলিবে! কোথা আলো! সব অন্ধকার
মহাশূন্যে যাযাবর বিহঙ্গের দল
যায় উড়ে শান্তিনীড় করিতে সন্ধান
সন্ধ্যাগমে। এ বিজনে ওদেরি মতন
কী যেন আশ্রয় খোঁজে নিরালম্ব প্রাণ!

নরহরির বৈরাগ্য

শ্রীযমুনা ঘোষ

বেলা এগারটার সময় অফিসে গিয়ে নরহরি দেখলে হাজিরা লেখার খাতা সাহেবের ঘরে চলে গেছে। একটু ইতস্ততঃ করে ঘর থেকে বেরিয়ে সাহেবের ঘরের দরজার পর্দার সামনে এসে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে পর্দার অন্তরাল হতে দেখলে সাহেব বসে তখন আপন মনে ধূমপান করছে।

নরহরি পর্দাটা সরিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলো। তারপর পকেট থেকে কলমটা বার করে যখন সই করতে যাচ্ছে, তার দিকে চেয়ে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলে,—" "কটা বাজলো নরহরিবাবু—?

সাহেবের কথায় নরহরি একটু থতমত খেয়ে গেল এবং লেখনী সমেত হাতটা কেঁপে উঠলো। মাথার প্রশস্ত টাকের পিছনটা বাম হাত দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে মৃদুস্বরে নরহরি উত্তর দিলে,—"আজ্ঞে, আজ আমার একটু লেট হয়ে গেছে স্যার—

হাতের সিগারেটে দুইটা টান দিয়ে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসপটের ওপর রাখতে রাখতে গম্ভীর স্বরে মিঃ চৌধুরী বল্লেন,—"আপনার তো রোজই লেট নরহরিবাবু—

একটু তোতলাতে তোতলাতে নরহরি উত্তর দিলে,—আজ্ঞে কি করি বলুন না। "আজ কাল যে রকম লাইন মারতে হয়—তার উপর আজ রেশনের দিন—"

—"রেশান তো আমাদেরও আছে মশাই।"

নরহরি উত্তর দিল,—"আজ্ঞে আমায় নিজে গিয়ে আনতে হয়—"

মিঃ চৌধুরী একটু হাসলেন। তারপর বল্লেন—"নরহরিবাবু, রেশানের চালে কিন্তু আপনার চেহারাটী তো বেশ ফুলে উঠছে। আর আমরা মশাই রেশানের চালে একেবারে শুকিয়ে ইঁদুরটী হয়ে যাচ্ছি।

সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে নরহরি বলে উঠলো,—আজ্ঞে, মোটা আমি একটুও নই স্যার! আপনি বিশ্বাস করুন। দেহটা আমার একেবারে জলে ভর্ত্তি। হার্ট ও আমার খুব খারাপ, যে কোন মুহূর্ত্তে ফেল করতে পারে। ডাক্তার বলেছে—যত গোল বাধিয়েছে আমার এই বিরাট ভুঁড়িটা—

একটু বিদ্রূপের সুরে মিঃ চৌধুরী বল্লেন,—"তাই নাকি! আপনার শরীর একেবারে জলে ভর্ত্তি—! হার্ট ও খুব খারাপ। এতো একটা ভাবনার বিষয়—"

নরহরির মুখ হতে আর কোনরূপ বাক্‌নিস্পত্তি হলো না। পকেটে কলমটা পুরে মিঃ চৌধুরীর টেবিলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে পিছু হটে ঘর থেকে চলে গেল। নিজের ঘরে ফিরে এসে আপনার সীটে ধপাস করে বসে পড়লেন। জ্যৈষ্ঠের অত্যধিক গরমের জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়ে আর্দ্র পাঞ্জাবীর আস্তিনটা গুটিয়ে বুকের বোতামগুলো খুলে দিয়ে পাঞ্জাবীটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে ডাক দিলেন, বেচুরাম! বেচুরাম! ও, বাবা বেচারাম, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দে বাবা—আর যে পারছি না।

বেচুরাম অফিসের চাপরাশি।

নরহরির আহ্বানে দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে, অবনীবাবু বল্লেন—"বেচুরাম, নরহরিবাবুকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে আগে বাচাও—তা না হলে এখনি কি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন।"

অবনী রায়ের কথায় বেচুরাম হেসে ফেললে। তারপর একগ্লাস ঠাণ্ডাজল এনে নরহরির হাতে দিলে।

এক নিঃশ্বাসে জলটী শেষ করে শূন্য গ্লাসটা হাতে

ধরে বেচুরামের মুখের দিকে চেয়ে একটা তৃপ্তিসূচক আঃ! ধ্বনি উচ্চারণ করে বল্লেন,—"বাঁচালি বাবা, তুই আজ আমায় বাঁচালি! উঃ! যা গরম পড়েছে। তৃষ্ণায় ছাতিটা আমার একেবারে শুকিয়ে গেছলো। বলে জিজ্ঞেস করলেন, দুটো পান খাওয়াবিনি বাবা! বলে পকেট থেকে একটা আধুলি নিয়ে বেচুরামের হাতে দিলেন।

মিনিট কয়েক পরে বেচুরাম দুইখিলি পান এনে নরহরির হাতে দিল।

একটু হেঁসে নরহরি বল্লেন,—"এনেছিস বাবা! দে, দে! বলে পান দুটো বেচুরামের হাত থেকে নিয়ে মুখে দিলেন। তারপর পকেট থেকে একটা রূপার কৌটো বার করে তা থেকে একটু তাম্বুল নিয়ে মুখে দিয়ে পানটী বেশ রসযুক্ত করে তুললেন।

বেচুরাম বাকী পয়সা ফেরৎ দিতেই নরহরি একটী সিকি নিয়ে বেচুরামের হাতে দিলেন।

বেচুরাম যেন ইহারই প্রত্যাশায় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কারণ সে জানে, এই বাবুটীর কিছু কিছু ফায়-ফরমাস পূরণ করলে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় না। তাই হাস্যোজ্জ্বল মুখে দক্ষিণাটী পকেটে পুরে জিজ্ঞেস করলে, "আজ আপনার এত লেট্ কেন হলো স্যার?"

মুখের পানটী চিবোতে চিবোতে নরহরি উত্তর দিলেন—সে কথা শুনে তোমার আর কি হবে বাবা! যাও! যাও! নিজের কাজে যাও তো বাপু—

অবনী রায়ের পাশ হতে দুঃখীরাম জিজ্ঞেস করলে, "নরহরিদা, আজ বৌদি কি রান্না করে খাওয়ালেন?

দুঃখীরামের কথায় নরহরি যেন একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো।

নরহরির অবস্থা দেখে সকলেই মুখটিপে হাসতে আরম্ভ করেছে। তাই অবনী একটুকরো হাসির ঝিলিক মুখে লাগিয়ে বল্লে,—"আজ বোধ হয় নরুদা আমাদের একটু ভাল মাছটাছ বাজার থেকে এনেছেন। তাই রান্না করে খাওয়া সারতে দেরী হয়ে গেল, না নরুদা?

নরহরি উত্তর দিলেন, "হুঃ! খাওয়ালেন! সে আর বলেন কেন মশাই—অতবড় দজ্জাল মেয়েমানুষ আমি বাপের জন্মে দেখিনি। আমার জীবনটা একেবারে শেষ করে দিলে মশাই—

নরহরির কথাগুলির ভঙ্গিমা দেখে যতীনবাবু হেসে ফেল্লেন। বল্লেন,—ব্যাপার কি নরুদা? আপনি যে একেবারেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন,—

—"আর বলবেন না! বলবেন না মশাই! আজ আমায় সমস্ত কাজই পণ্ড করে দিলে। কার মুখ দেখে যে সকালে ঘুম ভেঙেছিল, হুঃ!"

অবনী রায় উত্তর দিলে,—"কার আর মুখ দেখবেন, পাশেই তো ছিলেন, আমাদের বৌদি—"

বিকৃত মুখে নরহরি উত্তর দিলেন, "থাক!" থাক। আর বৌদিকে নিয়ে অত গরব করতে হবে না। বুড়ো বয়েসে বিয়ে করার শাস্তি হাড়ে হাড়ে পাচ্ছি। মনে হয়েছিল, বয়েসে বিয়ে করি, একটা পার্টনার হবে। অংশীদার তো বটেই, উপরন্তু আমার সহযোগী, সহকর্মী সব কিছুই হতে পারে। যাই হোক, বয়েস তো হচ্ছে, আর আমার এই শরীর। সংসার চালাতে পারবে এবং আমার দেখাশোনারও একটা লোক হবে। তা কচুটি! কচুটি। ও-সমস্ত মেয়েমানুষের দ্বারা তা হবার নয় ভাই; তা হবার নয়। সে গুড়ে বালি।"

নরহরিকে নিয়ে সকলেই একটু আনন্দ করতে ভালবাসে। তাই হাস্যোজ্জ্বলমুখে পাশ থেকে অবনী জিজ্ঞেস করলে, "কি হলো নরুদা, অত রাগ করছেন কেন? ছেলেটার কি আবার জ্বর এলো নাকি?

—"কি আর হবে! রাগ কি আর সাধে করি ভাই! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে যায়। 'আচ্ছা বলুন তো মশাই, আমি তো একটা মানুষ না কি গরু? সেই ভোর চারটে থেকে উঠে মশাই এই বিরাট শরীর নিয়ে লাইন দিতে শুরু করি। আর শেষ কখন জানেন, শেষ হয়, এই অফিসে এসে। তবে আমি একটু রেহাই পাই —আচ্ছা বলি,—আজ রেশানের দিন। চাল নেই ঘরে একদানাও—ছেলেটাকে বললুম, জানেন মশাই, "ভোঁদা তুই আজ দুধটা নিয়ে। আমি রেশানটা এনে দিয়ে বাজারে যাব তা না হলে রেশানে লাইনে দাঁড়াতে হবে, আমার অফিস যাওয়া হবে না। ওমা! কোথায় ছিলেন তার গর্ভধারিণী জানি না মশাই—এলেন একেবারে রণরঙ্গিনী যেন চামুণ্ডারূপিণী। এসেই বল্লে কি জানেন,—"ভোঁদা দুধটুধ আনতে পারবে না। ইচ্ছে হয়, তুমি গিয়ে

দুধ নিয়ে এসো—ছেলে বেটা তো একে পায়, আরে চায়—

একটু চুপ করে থেকে মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেম,—"ভোঁদা যে দুধ আনতে যাবে না—তবে খাবে কি? ঘরে চাল তো একদানাও নেই। আজ রেশান আনতে হবে, সেটা কি ভুলে গেছ—বলি ও হাঁড়িতে দেবে কি?

—"বাস্! আর যায় কোথায়? যেন বারুদের স্তূপে একটা শলাকা নিক্ষিপ্ত হলো। আমায় বল্লে কি জানেন! মনে হলে মাথার রক্ত যেন টগবগ করে ওঠে। বল্লে, বুড়ো বয়েসে বিয়ে করতে তখন লজ্জা করেনি! প্রাণের সখ মেটাতে বিয়ে করেছিলে, আনন্দ ভোগ করতে—যাও, দুধ এনে দিয়ে রেশান তুলে তবে বাজারে যাবে। হুকুম হলো যেন হারম্যাজিষ্ট্রী।

আমি না কি বুড়ো বয়েসে বিয়ে করেছি প্রাণের সখ মেটাতে। যদি বুড়ো বয়েসে বিয়ে না করতুম, তবে তুমি যেতে কোথায়—। আমায় কি অফিস যেতে হবে না—?

—"উত্তর দিলে, চুলোয় যাক তোমার অফিস এটা ভোঁদার সংসার নয় যে, ভোঁদা দুধ আনতে যাবে"—এটা বোঝে না—যদি অফিসই চুলোয় যায় তবে ডান হাত উঠবে কিসের জোরে—। বোঝার শক্তি নেই! গেলুম, দুধ, রেশান সব এনে তবে বাজারে। আর বাজারে গেলেই তো বাজারওলারা আমার জন্যে সব জিনিষ নিয়ে বসে থাকে না—। তাই আসতে দেরী হলো—এই নাকি আমার অপরাধ—। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রান্না করছিল, আমার সাড়া পেয়েই রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। এসেই বল্লে,—"আমাকে জব্দ করবার জন্যে দেরী করে বাজার এনেছো তাই ছেলেগুলো না খেয়ে স্কুলে চলে গেল। খাওয়াচ্ছি তোমায় মাছ ভাত রান্না করে—উনুনে আজ জল ঢেলে দোব—দেখি, কি করে খাও তুমি—সে কি চীৎকার মশাই—আমারও মেজাজটা খুব গরম হয়ে ছিল, একে বাজার থেকে ভেতেপুড়ে এসেছি। অফিসের দেরী হয়ে গেছে। কিছু না বলে স্নান করে একেবারে সোজা চলে এসেছি অফিসে—সেই রাত্রে বাড়ী ফিরব—আচ্ছা জব্দ হবে—

দুঃখীরাম বল্লে,—"বলেন কি নরুদা, আজ ভাত না খেয়েই চলে এসেছেন অফিসে—। স্রেফ্ উপোস—?

অবনী বল্লে,—"ভয় নেই নরুদা, আমরাই আজ আপনাকে খাওয়াব—

যতীনবাবু বল্লেন,—"আজ তা হলে এক হাত হয়ে গেছে! বলুন—?

—"সে আর বলেন কেন? আপনারা তো দিব্যি মজা মারতে আছেন মশাই—

*　　　*　　　*

নরহরি ছিল অত্যন্ত অলসতা প্রিয়, ভীরু, কোমল প্রকৃতির মানুষ। হাসি, গল্প, আর পান তো সর্ব্বদাই মুখে লেগে থাকত। বৈঠকখানা ঘরটী ছিল তার একটি আড্ডাখানা। ছেলের দল দিনান্তে একবার নরুদার কাছে না এলে দিনটাই তাদের ব্যর্থ হয়ে যেত। কারণ নরহরি ছিল, সকলেরই অতি প্রিয়। সেদিন অফিস থেকে ফিরে নগ্নগাত্রে বৈঠকখানা ঘরে চৌকীর উপর একটি তাকিয়া পায়ে ও একটি মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে পান চিবুচ্ছে আর মাঝে মাঝে বামহাতটা নিজের বুকের উপর বুলিয়ে উচ্চারণ করছে,—উঃ! বড্ড গরম। আর তো পারা যায় না। সৈন্য-সামন্তের দল সকলেই একে একে এসে নরুদার কাছে উপস্থিত হয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে মোহনবাগান যে দুই গোলে জয় লাভ করেছে তারই জোর সমালোচনা চলছে। নরুদা আমাদের ভোজটা কবে হবে?

—"হবে রে। হবে। এত তাড়া কেন?

—"না নরুদা, দেরী করলে চলবে না। কালই আমরা সকলে খাব—?

—"কালই। এত তাড়াতাড়ি। বেশ তাই হবে। কিন্তু কি খাওয়া হবে—?

—"সকলেই সমস্বরে বলে উঠল,—"কেন। মুরগী—

এমন সময় ভজুয়া নরহরির পুরাতন ভৃত্য একটি কাচের প্লেটে খান চারেক কচুরী ও ভাল ডিস্কাপে করে চা এনে হাজির হলো।

নরহরি তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, এনেছিস বাবা—দে। দে। খাই। আজ কেমন খিদেটাও পেয়ে গেছেরে—বলতে বলতে উঠে বসে ভজুয়ার হাত থেকে খাবারের প্লেটটা নিয়ে সদ্ব্যবহারে মনোযোগ দিলেন।

এই দৃশ্যে তরুণদের হৃদয়ে বড় ব্যথা বাজলো। নরহরিকে বল্লে,—"আচ্ছা নরুদা, আপনি একটা বিয়ে করুন না কেন—। তা হলে তো এত কষ্ট হয় না—

—হাঁসতে, হাঁসতে নরহরি উত্তর দিলে,—"এই বুড়ো বয়েসে কে আমায় মেয়ে দেবে রে—

—"কেন নরুদা, মেয়ের কি অভাব—। বলেন তো, আমরাই এনে দিতে পারব—

—"দূর পাগল। চল্লিশের পর আর কি কেউ বিয়ে করে নাকি? বাঁচবই বা ক'দিন—

—না নরুদা, আপনি যে ক'দিনই বেঁচে থাকুন, বিয়ে আপনাকে করতেই হবে—

—"বিয়ে কি অমনি করলেই হলো নাকি?

—না নরুদা আমরা আপনার কথা শুনব না, বিয়ে আপনাকে করতেই হবে। আমরা আর আপনার কাজ করতে পারব না।

দূর পাগল, লোকে আমায় মেয়ে দেবে কেন। প্রথমেই তো আমার চেহারা দেখে তারা পালাবে তারপর খাবে কি? আমার আছে কি? চাকরী তো আজ বাদে কাল খতম্। তখন নিজেই বা খাব কি? আর স্ত্রী পুত্রকেই বা খাওয়াব কি—

উৎসুক হয়ে তরুণের দল জিজ্ঞেস করলে, তবে আপনার এত বিষয় সম্পত্তিগুলো কি করবেন—?

—"বিষয় আছে কোথায়? আপনি খেতে পাইনা, আবার শঙ্করা—আসবে সব যেন বন্যার জল। স্ত্রীপুত্র! হুঃ!" বলে নরহরি পুনরায় শয্যা গ্রহণ করলেন।

—"বাঃ! এতদিন ধরে চাকরী করছেন। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা, আপনার বাবার বিষয়, এগুলো সব কি হবে—?"

—"কেন, তোরা আছিস। কত চ্যারিটি ফাণ্ড আছে। রামকৃষ্ণ মিশন আছে। দেবার কি অভাব যে—

• • •

একদিন সকালে নরহরি ঘুম থেকে উঠে সদর দরজা খুলতেই দেখতে পেলে, অতি কৃশকায় এক ভদ্রলোক বাহুমূলের তলায় ছাতাটী ধরে তাহার জন্ম দাঁড়িয়ে আছে। নরহরিকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে একটু হেসে বল্লে,—"আমি আপনার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি। আপনিই তো নরহরি মুখার্জি—?"

—"আজ্ঞে হাঁ! কি প্রয়োজন বলুন— •

—"একটু ঘরে গিয়ে বসে কথা বললে ভাল হয় না" ভদ্রলোক উত্তর দিলে—

—"আমার এখন ঘরে যাবার সময় নেই। আপনার প্রয়োজনটা এখানেই মেটাতে পারেন।

—"আজ্ঞে, আমার কন্যাটীর বিবাহের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

—তা আমি কি করব—?

—"শুনলুম আপনি বিবাহ করবেন।"

—"যেখান থেকে শুনেছেন, সেইখানে যান।

—"দেখুন, আমি বড় অসহায়! কন্যাটীকে কোথাও পাত্রস্থ করতে পারছি না।"

—"বাঃ! বেশ তো! চমৎকার কথা আপনার! কন্যাটীকে কোথাও পাত্রস্থ করতে পারছেন না বলে আমার গলা বাড়াতে হবে—"

—মিনতিভরা সুরে উত্তর এলো,—"নরহরিবাবু; আমি বড় অসহায় এবং অভাবগ্রস্ত! কন্যাটীকে আপনি উদ্ধার করুন। আমি শুনেছি, আপনার উদার হৃদয়, কোমল চিত্তের কথা—"

—"দেখুন, আপনার ও সমস্ত কথায় কিছু হবে না। বিবাহ আমি করব না।"

—"নরহরিবাবু, আপনি এই গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি একটু দয়া করুন, আমার কন্যাটীকে বিবাহ করে—"

—"আচ্ছা মশাই তো আপনি! আপনার কন্যাকে কোথাও পাত্রস্থ করতে পারছেন না বলে কি আমাকে বিয়ে করতে হবে নাকি—!"

—"দেখুন, আমি বড় গরীব!"

—গরীব তো কি হবে! ওসব হবে না মশাই! বিয়ে-টিয়ে আমি করব না।

নরহরি আপন মনেই বলছে, সকালবেলা আচ্ছা বিপদেই তো পড়া গেছে। যত সব—ওই হারামজাদা, পাজি, নচ্ছারগুলোর এই কীর্তি। হতভাগারা কিনা আমার পেছনে লোক লাগিয়ে দিয়েছে। আজ আসুক

শালারা—কালকেই না সব আমার ঘাড় মট্‌কে মুরগী গিলে গেছে—

—"নরহরিবাবু—!" ভদ্রলোক ডাক দিল,—

—"না মশাই না! কেন সকালবেলা বিরক্ত করছেন? আপনাকে তো বলে দিয়েছি—"

—"নরহরিবাবু, আমার প্রতি একটু সদয় হোন। কন্যাটীকে উদ্ধার করুন।"

—বিরক্ত হয়ে নরহরি বল্লে,—আপনাকে তো বলে দিয়েছি, বিয়ে আমি করব না। আপনি এখান হতে চলে যান। তা না হলে আমায় শেষে পুলিশ ডাকতে হবে। উঃ! কি বিপদেই পড়েছি! দরজা আমার না খোলাই ছিল ভাল!

ভদ্রলোক অচল! সচলতার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না।

—আবার ডাক হলো "নরহরিবাবু—"

—"ওসব বিয়ে-টিয়ে হবে না মশাই! আপনি এখান থেকে যাবেন কি না—!'

যাঁহাকে পুলিশের ভয় দেখান হলো, সে কিন্তু আপনার কার্য্য সিদ্ধ ব্যতীত পাদমেকং ন গচ্ছামি করে নরহরির বৈঠকখানায় এসে চৌকীর একটি কোণে আসন দখল করলো।

দৈনন্দিনের কাজ শেষ করে সংবাদপত্রটী হাতে নরহরি এসে চৌকীর উপর বসলো।

ভজুয়া চা দিয়ে গেল।

নরহরি গরম চা-এর কাপে একটা চুমুক দিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বল্লে,—"আপনি অকারণ কেন মশাই এখানে এসে বসে আছেন! আপনাকে তো বলে দিয়েছি—অন্যত্র যান—

—"কি করব বলুন! আপনারা যদি সকলেই একথা বলেন, তাহলে আমরাই বা যাই কোথায়?"

নরহরি চীৎকার করে উঠলো। কেন মশাই, অত বাজে কথা বলছেন? আপনার কথাই তো বলে যাচ্ছেন, বলি আমার কথাটি কি শুনতে পাচ্ছেন না? বিবাহ আমি করব না,! করব না! করব না! এই সকালবেলা আপনাকে বলছি—

—কিন্তু কন্যাটীকেই বা নিয়ে যাব কোথায়—আপনি যদি দয়া না করেন! আর বৃদ্ধ বয়েসে একটি সেবা করবার লোকেরও তো প্রয়োজন আপনার—আর সেটা স্ত্রী না হলেই বা কে করবে বলুন? আমার কন্যাটী বড় ভাল। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। তবে কোন পাশ-টাশনয়—কেন মিথ্যে কথা বলব মশাই, এই সকালবেলা—

—"বৃদ্ধ বয়েসে দেখবার ভাবনা আপনাকে করতে হবে না। সেজন্যে আমার ভজুয়া আছে।

—"নরহরিবাবু, স্ত্রীর কাজ কি চাকরের দ্বারা সম্ভব হয়!

—"সে চিন্তায় আপনার দরকার নেই। বয়েসটা আমার জানেন চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। এই বয়েসে বিয়ে করে আমি মরব নাকি! আপনাদের আর কি গাছে তুলে মই কাড়তেই তো জানেন মশাই—

—কিন্তু আমার কন্যাটীরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

—বিবাহ আমি করব না। আমার কি আছে! আপনার মেয়ে যদি এতই কণ্টক হয়ে থাকে, তবে গংগার জল তো এখনও শুকিয়ে যায় নি—

—"আমার বিষয় সম্পত্তি কিছু চাই না নরহরিবাবু—আপনি তো আছেন! এবং আপনার চাকরীটীও আছে, তাহলেই আমার হলো।"

সকল কিছু বাদ প্রতিবাদের পর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নরহরিকে একদিন যূপকাষ্ঠে মাথা গলাতে হলো।

• • •

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব্বটা শেষ করে বিশ্রামান্তে শুয়ে শুয়ে নরহরি চিন্তা করছে, আর তো পারা যায় না। উঃ! জীবনটা শেষ হয়ে গেল! ভগবান! শেষে কি আমার কপালে এই লেখা ছিল! স্ত্রীর কি কোন দায়িত্বই নেই! একদিন শুনেছিলুম, বৃদ্ধ বয়েসের স্ত্রী জীবন সঙ্গিনী! সেবাকারিণী! স্ত্রীর মত সেবা করতে আর কেউ পারবে না! হুঁঃ! সেবা আমার করছেই বটে! সারাটা দিন যেন ঘূর্ণিপাকে ঘোরাচ্ছে—আর নাকে, কানে গরম তেল ঢালছে! হতভাগা ছোঁড়াগুলোকে এত করে পুষতুম, তাদের জন্যে কি না করেছি আমি? যখনই যা বলেছে—শেষে কিনা আমারই পেছনে বাঁশ দিলে।

হাঁটুজলে ডুবিয়ে মারলে! বেশ হয়েছে! খুব হয়েছে! তোদেরও সব বাড়ী ঢোকা বন্ধ হয়েছে। তখন সবাই মনে করেছিলি, নরুদার বিয়ে দিয়ে কেষ্টবিষ্টু হবি—বলি, 'হু'! হু এইবার—দেখি তোদের মুরদ কত! তার বেলা কেউ নেই—

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়লো।

একটি শিশুর ক্রন্দনের সুর কানে এলো—

সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে গিন্নীর মধুবর্ষণও কানে এলো—বলি ছেলেটাকে কি একবার ধরতে পারছে না, কাঁদছে—কার ধ্যানে মগ্ন আছ! দিবারাত্র শুয়ে আছ—

নরহরির হৃৎকম্প হলো।

তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করছে, ইতিমধ্যে পটলা ঘরে ঢুকে সেল্‌ফ বেয়ে উপরে উঠে আচার চুরি করতে গিয়ে সর্বসমেত পড়ে ক্ষণভঙ্গুর বস্তুগুলির অকাল মৃত্যু ঘটালো।

নরহরি পটলার দিকে চেয়ে বল্লে, "কি করলি? হলো তো—এইবার তোর মা—

পটলার মার তীব্রস্বর কানে এলো,—ওরে ও পুটী, বলি, তোর বাপ কোথায় গেছেরে! তোরা কি কিছু দেখতে পারছিস না! সব যে দক্ষিণদোরে গেলরে—

নরহরি যা ভয় করছে, পটলা কিনা তাই ঘটালে। একে জিনিষভাঙা! তায় আবার রক্ত ঝরা—তাড়তাড়ি ছেলেটাকে খাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে নরহরি পটলার হাতটা ধরে রক্ত মুছিয়ে দিয়ে ভেটল্ লাগাচ্ছে, এমন সময় পুঁটী ছুটতে ছুটতে এসে সুসংবাদ দিলে, বাবা, বাবা, শিগীর এসে, দাদা সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেছে—

পটলার হাতের সেবা করতে করতে নরহরি পুঁটির মুখের দিকে চেয়ে বিকৃত মুখে বল্লে, "বেশ হয়েছে। যত সব অকালকুষ্মাণ্ডের দল আমার কাছে এসে জুটেছে। কোথায় উঠেছিল?

—"কোথাও ওঠেনি। সাইকেলে চড়া শিখতে গিয়ে পড়ে গেছে।

পুঁটীর মুখের দিকে চেয়ে নরহরি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো! তারপর জিজ্ঞেস করলে, "সাইকেল পেলে কোথায়?

—"কেন, মা যে দাদাকে পয়সা দিয়েছে।"

নরহরির গায়ে কে যেন জলবিচুটী লাগিয়ে দিল। পুঁটিকে মুখ খিঁচিয়ে বল্লে, "এইবার তাহলে মাকে গিয়ে বলো, হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে। যত সব ঝঞ্ঝাট আমার উপর। একটা পান আনতে পয়সা দিলে না, বল্লে, পয়সা কোথায় পাব—পান খেতে হবে না। এখন পয়সাটা বেরুলো কোথা থেকে—মাটি কুঁড়ে এলো সেটা—হুঃ! যত সব বলে নরহরি ঘরের বাইরে পা দিতেই সামনে পড়লো গিন্নী—নরহরি যেন ভূত দেখলে—

—"ওগো, আমি তোমার পানের পয়সা দিচ্ছি। তুমি আমার ভোঁদাকে হাসপাতালে আগে নিয়ে যাও গো—তা না হলে ও ছেলে আমার আর বাঁচবে না গো—

গিন্নীর কান্না বাঁচিয়ে নরহরি বল্লে,—হাত-পা ভাঙলে কে আবার কোথা মরে যায়! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে, একথা তো কোথাও শুনিনি—

কিন্তু গিন্নীর কান্নটা আর বাঁচানো গেল না। মড়াকান্না তুলে মেদিনী কাঁপিয়ে উত্তর দিলে,—"ওগো, তোমার শাপেই আজ আমার সংসার এমন হলো—বাপ হয়ে ছেলে মেয়ের এমন শত্রু হয়! অমন করে তুমি আমার বাছাদের বলো না। চাই না তোমার বিষয় সম্পত্তি—আমরা না হয় ভিক্ষে মেগে খাব—

মুখভঙ্গি করে নরহরি বল্লে,—খুব হয়েছে! আর মড়াকান্না তুলতে হবে না—হুঃ! সকাল থেকে একটু বসতে সময় দিলে না! মুখটা আমার পান অভাবে পচে গেল।

বিকেলের দিকে নরহরিরা স-পুত্র বাড়ী ফিরেই শুনতে পেলে, পুঁটীর মার চীৎকার,—বাবারে! মারে! আমার কি কেউ নেই রে—? সকলেই কি মরে গেছে রে—!

—"কেউ মরেনি! কেউ মরেনি! সকলেই জীবিত আছে। সামনেই সশরীরে হাজির—। এখন হুকুম হোক —নরহরি কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে, কি! হয়েছে কি? এমন করে চেচাচ্ছ কেন? বলি হলোটা কি?

কি'র উত্তরে নরহরি জানতে পারলে যে, নরহরির মত পাষণ্ড, খুনী, নিষ্ঠুর লোক নাকি এ জগতে আর নেই—

এই সার্টিফিকেটখানা পেয়ে নরহরি আপন মনেই উচ্চারণ করলে, কিন্তু বিয়ের সময় সবই তো শুনেছিলুম উল্টো! মুখে জিজ্ঞেস করলে,—"কি হয়েছে ছাই তাই বলো না—এখন কি করতে হবে?"

সমস্ত কিছু বাক্যবিন্যাসের পর পুঁটি পিতাকে জানিয়ে দিলে, উনুন ধরাবার জন্যে তার গর্ভধারিণী নাকি পাঁচ বছরের খুকী হয়ে রান্নাঘরের মাচায় উঠে ঘুঁটে পাড়ছিলেন। এবং নামবার সময় সেখান থেকে পড়ে কুমড়ো পটাস হয়ে নরহরির নাম বিস্মরণ করাচ্ছে—

নরহরির সমস্ত হাত পা যেন শিথিল হয়ে গেল। একখানি চেয়ারের উপর ধপাস্ করে বসে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচনে বল্লে "নাঃ! আর পারা যায় না। এ সংসার স্ত্রী, পুত্রের প্রতি নরহরির মায়া মমতা আর নেই। কালই নরহরি সমস্ত ত্যাগ করে কাশী যাত্রা করবে। জীবনের শেষটা ৺বাবা বিশ্বনাথের পায়েতেই সঁপে দিয়ে শান্তি লাভ করবে।

—

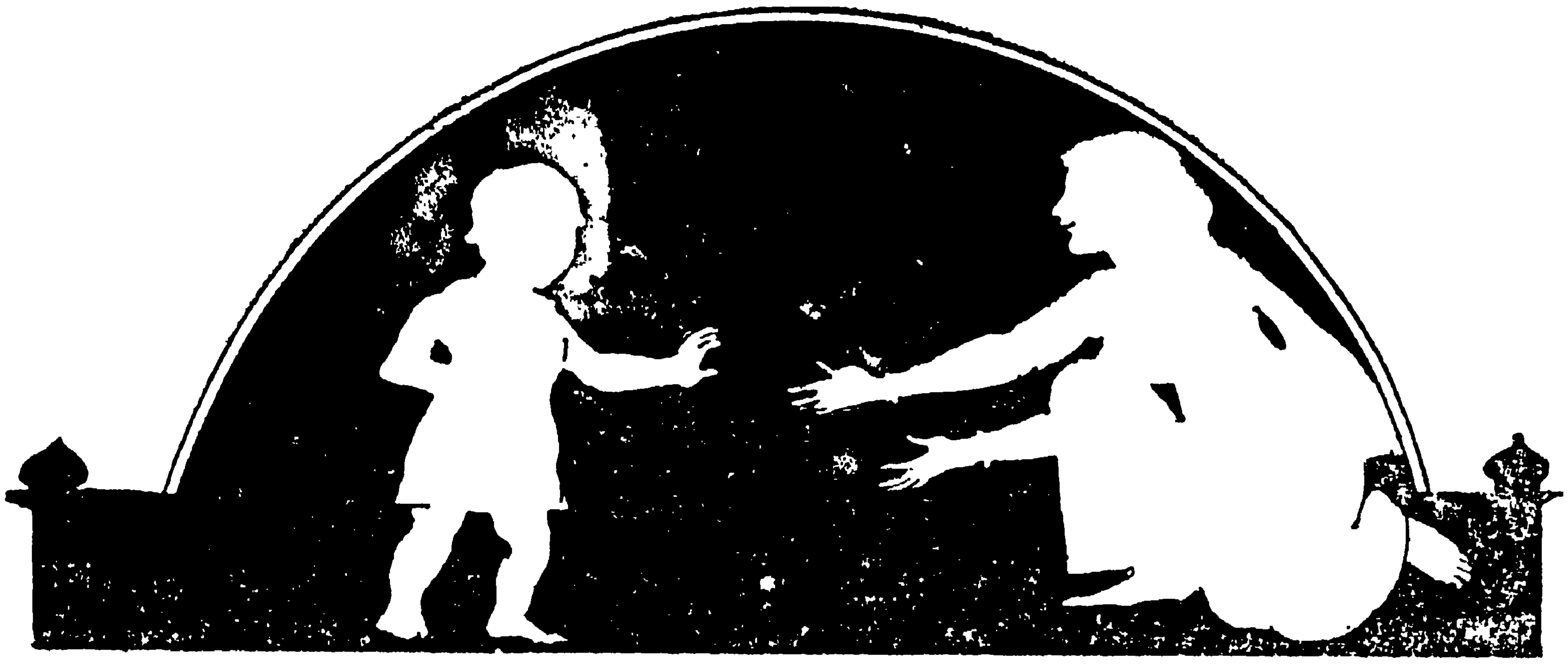

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মেরু পর্বত বা তিএন্‌শান্‌ পর্বতের পশ্চিমাংশে যে ভূখণ্ডে আর্যজাতিদের আদি বাস ছিল, সে-অঞ্চলে তাঁরা যে বাইরে থেকে এসেছিলেন, তার কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না ; সেই ভূখণ্ডে বহু কাল থেকে তাঁরা যেন স্বাভাবিক ভূমিজাত সন্তান বা Growth of the Soil-রূপে বসবাস ক'রে আসছিলেন। কিন্তু এখান থেকে হিমালয় পর্বতমালা বরাবর ভারতের পূর্ব দিকে তাঁদের ক্রমাগত প্রসার অর্জনের বহু বিবরণ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। এমন কি আদি আর্যদের বিভিন্ন শাখার পরবর্তীকালে পশ্চিম দিকে প্রসারলাভেরও বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আইসল্যাণ্ড অতিক্রম ক'রে উত্তর আমেরিকাতেও কলম্বস-পূর্ববর্তী যুগেই স্বর্ণতাম্রকেশ ভাইকিংদের অভিযানের কাহিনী প্রসঙ্গত স্মরণীয়। সেই সুপ্রাচীন ভারত-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিকরা—যারা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল—আর পতঞ্জলি-বর্ণিত আর্য ব্রাহ্মণরা মূলত এক জাতি। ভারত-ইউরোপীয় দুঃসাহসী অভিযাত্রী আত্মার প্রকাশ দুরন্তভাবে ব্যক্ত হয় আসাম থেকে আইসল্যাণ্ডে। এই অভিযানের উৎসভূমি ছিল স্বর্গে বা সোভিএট মধ্য এশিয়ায়।

প্লাতোনের বর্ণিত কাহিনী ছাড়াও গিরীন্দ্রশেখরের কাছে আগত লিথুআনীয় পণ্ডিতের কথা অনুযায়ী লিথু-আনীয় জাতির কাহিনী সুরু হয় ১১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। গ্রিকদের উদ্ভব প্লাতোন্‌-বর্ণিত কাহিনী অনুসারে প্রায় ১০০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব সালে। তা চলে আরো কিছু আগে থেকে মূল আর্য জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-জাতিগুলির দিগ্বিদিকে অভিপ্রয়াণ সুরু হয়। সেই সময়ে তারা বিশেষ সভ্য ও শক্তিশালী ছিল না। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব দশম সহস্রকে অতলান্ত মহাদেশের ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিহ্ন হলে তার পর থেকে আর্য জাতিগুলি বিশ্বপ্রাধান্য লাভ করে। এই প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে।

চীনা ও মিশরীয় সভ্যতা বিশ্ববিস্তারের ব্যাপারে কখনই আর্যদের সমকক্ষতা অর্জনে বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হয় নি। ভাষাভিত্তিক বিশ্বগঠনের আলোচনায় আর্যদের যে গুরুত্ব, আর্য ভাষা সমূহের যে-অবিসংবাদিত প্রাধান্য, তার সঙ্গে অন্য কোন ভাষাগোষ্ঠীর কোন তুলনা চলে না। সেমীয় বা তুর্কি জাতিগুলি একদা ভারত-ইউরোপী দেশ বহু ক্ষতি করলেও এখন আর্যোদয়ের তুলনায় তারা সূর্যের পাশে জোনাকির মতো নিষ্প্রভ। ধর্মক্ষেত্রে এখনও সেমীয়দের বিরাট্‌ বিশ্বপ্রাধান্য আছে বটে, কিন্তু আর্য জ্ঞান-সাধনার পরিচ্ছন্ন সূর্যকরোজ্জ্বল চেতনা আরো সম্প্রসারিত হলে সেমীয় ধর্মবোধের বিভীষিকা নিশ্চয় অপসারিত হবে।

মহাপ্লাবনের আগে মিশর আগে মেক্সিকো বা মেখিকো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় আটলান্টিস জাতি বা ক্রোমাঞঁ মানবগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল। সুপ্রাচীন কালে তাদের বংশধর অল্‌মেক্‌, তলতেক্‌, আস্তেক, ইন্‌কা প্রভৃতি জাতিগুলির সঙ্গে যে পথে বা যেমন ক'রে হোক, ভারতীয়দের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। W. H. Prescott-লিখিত ও John Foster Kirk-সম্পাদিত The Conquest of Mexico গ্রন্থ পাঠে এ-বিষয়ে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া আমেরিকা মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের অতি স্পষ্ট বর্ণনা প্লেটোর বই-এ আছে।

বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্তী কোন ইতিহাস খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ বেদের চেয়ে প্রাচীন কোন সাহিত্য রচনার খোঁজ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের প্রাপ্ত পুঁথির চেয়ে মিশরের মৃতের পুস্তক The Book of the

Dead প্রাচীনতর হতে পারে, কিন্তু ঋক্‌গুলির মুখে মুখে প্রথম রচনা প্রাচীনতর কালে। এখন বৈদিক সভ্যতাকে প্রাচীনতম ব'লে মনে করতে হবে; মিশর ও চীনের সভ্যতা তার কাছাকাছি যায়।

এবার ভারতীয়-আর্যভাষাসমষ্টির প্রাচীন অবস্থা উত্তীর্ণ হবার পরের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

ভারতীয় জন-সাধারণ আর্য সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য-অনার্য নির্বিশেষে মুখ্যতঃ উত্তরভারতে আর্য ভাষা গ্রহণ করল, এ-রকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু এ-ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও প্রমাণ রহিত। পৃথিবীর কোথাও একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিজেদের মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে পরভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করেছে, এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আর্যভাষীরা সংখ্যায় বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করেছেন এবং তাঁদের বাসভূমির প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনার্যদের বাসভূমি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে এবং তারা সংখ্যায় কমে গিয়ে পশ্চাদপসরণ করেছে, এই ধারণাই যুক্তিসঙ্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের অত্যাচারে রেড ইণ্ডিয়ানদের ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারাও মাতৃভাষা বিসর্জন দিচ্ছে না। লাতিন আমেরিকায় স্পেনীয়-পোর্তুগিজ ঔপনিবেশিক ও তাদের দ্বারা ধর্মান্তরিত বর্ণসঙ্করদের বংশ বৃদ্ধি প্রবল; কিন্তু সেখানেও সংখ্যাল্প লাল মানুষরা তাদের মাতৃভাষা বিসর্জন দেয় নি। উত্তরাপথে আর্য ও অনার্য-মিশ্র বর্ণসঙ্কররা আর্য ভাষা গ্রহণ করলেও বিশুদ্ধ অনার্য জাতিগুলি কোন সময়েই তাদের মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে আর্যভাষা গ্রহণ করে নি। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষা আর্য সভ্যতার বিস্তারের পরেও চলতে লাগল। কিন্তু অনার্য দ্রাবিড় আর উত্তর ভারতীয় আর্য-অনার্য সর্ব জাতি শেষ পর্যন্ত এক বৃহৎ হিন্দু সমাজের অন্তর্লীন হল। এই সর্বভারতীয় নবগঠিত হিন্দু সমাজ হচ্ছে আসলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের সমষ্টি। যে বিরাট ভারতীয় হিন্দু সমাজ গঠিত হল, তার মধ্যে বৈদিক আর্যরা জাতি হিসেবে চিরকালের মতো হারিয়ে গেল।

হিন্দু সমাজ এই ভাবে বহু জাতির সমষ্টি এমন-কি মিশ্র জাতির সমষ্টিরূপে গঠিত হলেও বর্ণাশ্রম তথা বর্ণভেদের সাহায্যে শোণিত-মিশ্রণ বৌদ্ধ যুগের আগে খুব ব্যাপক হয় নি। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপে পরিগণিত হয়ে এক বিরাট হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর বৈদিক সভ্যতার পতন হল এবং অর্জুনের যে-শঙ্কা গীতার প্রথমে ব্যক্ত হয়েছিল তা বাস্তবে রূপ গ্রহণ করল। বর্ণসঙ্করের আধিক্যে ভারতীয় আর্যভাষী জনগোষ্ঠী সম্ভবত প্রথমবার বিচলিত বোধ করল। পৌরাণিক যুগে হিন্দুসমাজ প্রকৃত অর্থে গঠিত হল এবং বর্ণবৈচিত্র্যই হল তার ভিত্তি। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও বর্ণাশ্রম ভেঙে যায় নি ব'লে ব্যাভিচারজাত বর্ণসঙ্করকে অতিক্রম ক'রে হিন্দু সমাজ আবার দৃঢ়তা লাভ করল। এই সমাজে আর্য এক বিশিষ্ট এবং প্রধান উপাদান; কিন্তু আর আগের মতো একমাত্র উপাদান নয়। পৌরাণিক যুগের বিপুল আলোড়নের মধ্যে পাণিনি যেমন সংস্কৃত ভাষাকে সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধলেন, তেমনি বর্ণাশ্রম ধর্মও সনাতন ধর্মের বন্ধনে আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মঙ্গোল, যবন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানকে নানা বর্ণের স্তরে স্তরে সজ্জিত ও আবদ্ধ করল। এ-কাজ বুদ্ধদেবের সময়ে সমাধা হয়ে গেছে। আর্য ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে অনার্য প্রভাব গ্রহণ করেছে তখনই। পরবর্তী যুগগুলিতে আরো বেশি ক'রে। লোকের মুখে মুখে সংস্কৃত ভাঙা মিশ্র ভাষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্বতন্ত্র কথ্যভাষার সৃষ্টি করল যেগুলি ক্রমশ সাহিত্যিক মর্যাদাও লাভ করে। তাদের নাম: মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা। এদের কালানুক্রমিক বিভাগ চারটি :—

(১) খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক; এই সময়ে অশোকের শিলালিপিসমূহে লিখিত আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষাসমূহ ও পালি ভাষার উদ্ভব ও প্রসার।

(২) খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক; এই সময়ে অশোক-পরবর্তী শিলালিপিগুলির প্রাকৃত ভাষা উদ্ভূত হয়।

(৩) খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক; সংস্কৃত নাটক ও অন্যান্য রচনার সাহিত্যিক প্রাকৃতের উদ্ভব এই যুগে হয়; এই সময়ে প্রাকৃত ভাষাগুলির ব্যাকরণ রচিত ও ভাষাগুলির শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

(৪) খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতক; এই সময়ে পালি ও প্রাকৃত ব্যাকরণবদ্ধ ভাষাগুলি আরো ভেঙে অপভ্রংশ,

অপভ্রষ্ট, অবহট্‌ঠ ইত্যাদি ভাষাগুলির জন্ম হয়। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ক্রমশ আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষা-স্তরের দিকে এগিয়ে যায়।

পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ—মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা-স্তরে আমরা এই তিনটি শাখার বহু ভাষা দেখতে পাই। এগুলি সব সময়ে ঠিক একের পর এক বা একটা থেকে আর একটা—এমন কোন ক্রম বা নিয়ম মেনে গ'ড়ে ওঠে নি। এই তিনটি ভাষাগুচ্ছের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একাধিক যুগের ভাষা প্রচলিত, এমন দেখা গেছে।

পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ রচিত হয়; পালি ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ আছে বৈদিক ও সংস্কৃতের মতো; পালির সাহিত্যও বিরাট্‌ ও উৎকৃষ্ট। প্রাকৃত ভাষাগুলোরও নিজস্ব ব্যাকরণ আছে, কিন্তু তাতে লিখিত সাহিত্যের প্রাপ্ত পরিমাণ খুব অল্প। অপভ্রংশ ভাষারও সাহিত্য এবং ব্যাকরণগত পরিচয় আছে যদিও বৈদিক, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতের মতো বিশিষ্ট অপভ্রংশ ব্যাকরণ নেই। অপভ্রংশ ও তার রকমফের অবহট্‌ঠ ভাষায় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির উদ্ভবের পরেও। বররুচির "প্রাকৃত-প্রকাশ" ব্যাকরণে প্রাকৃত ভাষাগুলির শ্রেণী বিভাগ আছে। বিখ্যাত পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরী "দেশী নাম-মালা" ব্যাকরণে অপভ্রংশ ভাষাগুলির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা-স্তরের শেষ বা চতুর্থ উপস্তরের মধ্যে অপভ্রংশ ভাষাসমষ্টির জন্ম। ভারতের নানা অংশে নানা রকম প্রাকৃত চলত। পরে সেগুলি থেকে অপভ্রংশ ভাষাসমূহের উদ্ভব হয়। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিতে উপভাষা-ভেদ আছে। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা সরাসরি বৈদিক ও সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়নি; লোকের মুখে আবহমান কাল থেকে ভাষা পরিবর্তিত হয়ে আসছিল; সেই পরিবর্তনশীল ভাষাস্রোত কখনও পালি, কখনও প্রাকৃত, কখনও অপভ্রংশ রূপ ধরেছে। ব্যাকরণের বাঁধনে সেই ভাষাস্রোতকে জায়গায় জায়গায় বাঁধা হয়েছে পালি, প্রাকৃত নামে। ভাষাস্রোত সেই ব্যাকরণবদ্ধ রূপের পাশ কাটিয়ে নিজের বেগে প্রবাহিত হয়ে গেছে। এমন ক'রে ক্রমশ নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে।

প্রথম মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা-উপস্তরে চারটি আঞ্চলিক প্রাকৃত বা উপভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের সাধারণ রূপগুলি থেকে একটি আদর্শ সাহিত্যিক-রূপ গড়ে ওঠে যার নাম পালি ভাষা। এ-ভাষা প্রধানত বৌদ্ধদের সাহিত্য প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হত। বৌদ্ধধর্ম ও পালি ভাষা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে বিজড়িত। আঞ্চলিক প্রাকৃতগুলির নাম :—

(১) উত্তর পশ্চিমা (২) দক্ষিণ পশ্চিমা (৩) প্রাচ্যমধ্যা (৪) প্রাচ্যা।

অশোকের শিলালিপিগুলিকে এই চারটি উপভাষাগত ভাগে বিভক্ত করা যায়। দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিশ্রণে পালি ভাষা উদ্ভূত হয়। এ-ভাষা দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে। উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বৌদ্ধ সংস্কৃতে প্রচার করা হত। এর উৎপত্তি দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা-উপস্তরে।

দ্বিতীয় উপস্তরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বৌদ্ধ সংস্কৃত। দ্বিতীয় উপস্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন অশ্বঘোষের নাটকে ও খরোষ্ঠী ধম্মপদে পাওয়া যায়। অশ্বঘোষের নাটকের প্রাকৃতে তিনটি প্রধান উপভাষার পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলি থেকে পরবর্তী কালের মাগধী-শৌরসেনী-অর্ধ-মাগধীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার খোতানে খরোষ্ঠী ধম্মপদ পাওয়া যায় যা থেকে এক কালে মধ্য-এশিয়ায় আর্য অবস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় উপস্তরে গান্ধারী প্রাকৃত, নিয়া প্রাকৃত এবং সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। কেবল সাহিতিক প্রাকৃতগুলির জন্যে রচিত ব্যাকরণ পাওয়া যায়। প্রধান সাহিত্যিক প্রাকৃত চারটি :—

(১) পৈশাচী (২) মাহারাষ্ট্রী (৩) শৌরসেনী (৪) মাগধী।

এ ছাড়া কেবল জৈনদের রচনায় অর্ধমাগধী ব্যবহৃত হত। জৈনদের ব্যবহৃত মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীতে অর্ধ-মাগধীর প্রবল আধিপত্য থাকত; এ-দুটি ভাষা বা উপ-ভাষাকে জৈন মাহারাষ্ট্রী ও জৈন শৌরসেনীও বলা হয়। গৌণ প্রাকৃত ভাষা আরো অনেকগুলি ছিল। গান্ধারী প্রাকৃত প্রথম উপস্তরের উত্তরপশ্চিমা উপভাষার বংশধর। শক-কুশানদের খরোষ্ঠী প্রত্নলিপিতে এর নমুনা পাওয়া যায়।

নিয়া প্রাকৃত চীনা তুর্কিস্থানের শান্‌শান্‌ রাজ্যের

সীমান্তে প্রচলিত ছিল। শুধু তুখারীয় আর্যভাষীরা নয়, ভারতীয়-আর্যভাষীরাও এই যুগে (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক) চৈনিক তুর্কিস্থানে বাস করত। নিয়া নামক স্থানে এটি রাজভাষারূপে প্রচলিত ছিল। স্থানীয় নাম অনুসারে ভাষার নামকরণ হয়েছে

পৈশাচী প্রাকৃত উত্তর-পশ্চিমা উপভাষা ও তার বংশধর গান্ধারী প্রাকৃতের সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন। এটি পাঞ্জাবে ও ও পাখতুনিস্থানে বা ইংরেজ-শাসিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে ব্যবহৃত হত। অর্ধমাগধীর একটি প্রাচীন রূপ অশ্বঘোষের নাটকে পাওয়া যায়। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। শৌরসেনী প্রাকৃত দক্ষিণ পশ্চিমা উপভাষার সাহিত্যিক রূপ এবং মথুরা বা শূরসেন বা ভারতের মধ্যদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মাগধী প্রাকৃত পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত হত।

"প্রাকৃত" শব্দের অর্থ, জনসমাজের প্রকৃতির অনুরূপ ভাষা। ব্যাপক অর্থে মধ্য ভারতীয়-আর্য সব ভাষাই প্রাকৃত ভাষা। কিন্তু কেবল সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলিই প্রকৃতপক্ষে "প্রাকৃত" ভাষা। সংস্কৃত নাটক সমূহ, গাথা সপ্তশতী ও জৈন শাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে অনুশীলিত মধ্য ভারতীয়-আর্য তৃতীয় উপস্তরের সাহিত্যিক ভাষাই "সাহিত্যিক প্রাকৃত।" এটি এক কৃত্রিম লেখ্য ভাষা, কেবল সাহিত্যের কাজে ব্যবহৃত। মুখের ভাষা অপরিবর্তিত আকারে প্রাকৃত সাহিত্যে গৃহীত হয় নি কিম্বা প্রাকৃত সাহিত্যের ভাষাও সাধারণ লোকে মুখের কথায় অষ্ট প্রহর ব্যবহার করত না।

সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি যে-সব কথ্য ভাষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সময়ের অনুপাতে ও অতিপাতে আগের তুলনায় সে-সব ভাষা খুব দ্রুত বিবর্তিত হয়ে ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন করছিল, যা না হলে নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষা ও উপভাষাসমূহের জন্ম হতে পারত না। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির যথেষ্ট আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্যে আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের কাজে পালি, বৌদ্ধ সংস্কৃত ও শেষ পর্যন্ত রাজসভাগুলিতে পাণিনীয় সংস্কৃতের ডাক পড়ে। পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত ব্রাহ্মণেরা পছন্দ করতেন না। ফলে শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃতের জয় হল।

গৌতম বুদ্ধের সময় থেকে ভারতে পৌরাণিক যুগের অবক্ষয় আরম্ভ হল। অশোকের সময়ে বৌদ্ধ যুগ পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অশোকের সময়ে ভারতে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচুর শোণিত-মিশ্রণ সাধিত হয়। তার পর বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। চলে। গুপ্ত রাজ বংশের আমলে 'হিন্দু সভ্যতা'র শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায় এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁস পরিলক্ষিত হয়। আর্য সভ্যতার উজ্জ্বলতম দিনগুলির সঙ্গে হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলির তুলনা কতক পরিমাণে করা চলে যদিও বৈদিক ও ঔপনিষদিক ঋষি আর বাল্মীকি ও ব্যাসের সঙ্গে কালিদাসের সমকক্ষতা চলে না একথা মানতেই হবে। গ্রিক-রোমক সংস্কৃতির তুলনায় ফরাসি-ইতালীয় রেনেসাঁসও কতকটা নিম্নস্তরের বৈ কি।

পাণিনীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ বিকাশও গুপ্ত যুগে দেখা গেল। পরে হর্ষবর্ধনের সময়ে বিশেষ ক'রে উত্তরাপথে আবার প্রচুর রক্তমিশ্রণ সাধিত হয়—এবার বিকৃত তন্ত্রাচারের উৎপাতে আরো খরাপ ভাবে। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান অভিযাত্রী সিন্ধু নদ অতিক্রম করলে ভারতে বৌদ্ধ যুগ চূড়ান্ত ভাবে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। এরপর হিন্দু প্রভাব ও বর্ণাশ্রম পুনরুজ্জীবিত হয় বটে, কিন্তু ওদিকে মুসলিম প্রভাবের যুগ বা তুর্কি যুগ সুরু হয়ে গেছে আর এদিকে অসংখ্য উপ-বর্ণের সৃষ্টি হয়ে সমাজে সংসক্তির বিশেষ অভাব ঘটেছে। তা হলেও শঙ্করাচার্যের প্রভাবে ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি জাতীয় ঐতিহ্য, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি অনেক পরিমাণে আবিকৃত রাখতে পেরেছিল। ঐ প্রচণ্ড বৌদ্ধ-হিন্দু-ইসলাম সংঘর্ষের যুগে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বারবার বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ও উপভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে জাতিমিশ্রণ ও বহিরাগত প্রভাব দুই কারণে। অর্বাচীন সংস্কৃতে বহু অনার্য শব্দ প্রবেশ করে, মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষান্তরেও সে-প্রভাব দেখা যায়। আর, নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় ইসলামি শব্দ ও প্রত্যয় প্রবেশ করতে থাকে। বহিরাগত প্রভাব কাজ করেছে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আলোড়নের দ্বারা ভাষাগুলিকে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঠেলে দিয়ে। কিন্তু জাতিমিশ্রণের ফলে

ভাষাগুলি প্রচুর তদ্ভব শব্দ গঠন ক'রে তাড়াতাড়ি বদলে গেছে।

প্রাকৃত বৈয়াকরণ মাহারাষ্ট্রীকে মূল প্রাকৃত ধ'রে তার আদর্শে অন্যান্য প্রাকৃতের লক্ষণ বিচার করেছেন। মাহারাষ্ট্রী বৈদিকের এবং শৌরসেনী সংস্কৃতের অনুগামী ছিল। সংস্কৃত নাটকে উচ্চ বংশীয়া স্ত্রীলোকেরা শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলতেন। মাগধী প্রাকৃত সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মুখে। এটি একেবারে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা যা হাস্যকৌতুকের জন্যে রচিত। লোকসাহিত্যে পৈশাচী প্রাকৃতের কদর ছিল। প্রাকৃত বৈয়াকরণরা অপভ্রংশকে অন্যতম প্রাকৃত ব'লে উল্লেখ করেছেন। তা অযৌক্তিক নয়।

চতুর্থ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা-উপস্তরে অপভ্রংশ ভাষাগুলির আবির্ভাব। প্রাকৃত বৈয়াকরণরা এগুলিকে লৌকিক ভাষা ব'লে উল্লেখ করেছেন। শৌরসেনী অপভ্রংশ শৌরসেনী প্রাকৃতের সাক্ষাৎ বংশধররূপে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। প্রাচীন অপভ্রংশ সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের আগে গ'ড়ে উঠেছিল যা কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে দেখা যায়। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে খ্রীষ্ট জন্মের আগেই অপভ্রংশ নামটি ভাষার প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ অশিক্ষিত লোকের মুখে তখনই অপভ্রংশ ভাষা প্রচলিত। প্রাচীন ও অর্বাচীন অপভ্রংশের প্রভেদ সম্বন্ধে আচার্য সুকুমার সেন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :—

"মধ্য ভারতীয়-আর্যের যে-সর্বজনীন রূপটি অ-শিষ্ট লোকসাহিত্যের বাহক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই প্রাচীন অপভ্রংশ এবং প্রাচীন অপভ্রংশের যে-অর্বাচীন রূপটি আধুনিক ভারতীয়-আর্যের অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা, তাহাই অর্বাচীন অপভ্রংশ বা লৌকিক বা অবহট্ঠ। প্রাকৃত-ব্যাকরণের অপভ্রংশ কতক অংশে প্রাচীন এবং কতক অংশে অর্বাচীন অপভ্রংশ।" (ভাষার ইতিবৃত্ত।)

গ্রিআর্সন প্রতিটি প্রাকৃতের পরবর্তী এক একটি অপভ্রংশ স্তর কল্পনা করেছেন। অর্বাচীন অপভ্রংশে বিরাট লোকসাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে শৌরসেনী ছাড়া মাগধী প্রভৃতি অপভ্রংশের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সংস্কৃতবিরোধী জৈন, বৌদ্ধ এবং অ-সংস্কৃতভাষী জনসমাজ আসাম থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত অঞ্চলে অর্বাচীন অপভ্রংশে সাহিত্যচর্চা করেছে নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষা-স্তর গঠিত হবার পরেও।

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার কোন উত্তরপশ্চিমা উপশাখার সঙ্গে ইরানীয়-আর্য ভাষার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই উপশাখা থেকে কাশ্মীরি ভাষার বিবর্তন। অপভ্রংশ-স্তর ভেদ ক'রে নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের কিছু আগে থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ গঠিত হয়ে গেছে। মোটামুটি দশম শতক থেকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির উদ্ভব ধরা হয় বটে, কিন্তু কোন কোনটি অষ্টম শতক থেকে গঠিত হয়েছে, আবার অসমিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ'ড়ে উঠেছে। প্রাচ্য প্রাকৃত থেকে বিবর্তিত সিংহলি ভাষা ও ভ্রাম্যমাণদের ভাষা জিপ্‌সি একটু ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত। কারণ, মূল ভারতীয়-আর্যভাষী এলাকার সঙ্গে এই ভাষা দুটির ভৌগোলিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

প্রধান নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির মধ্যে সিন্ধি সবচেয়ে প্রাচীনপন্থী। পাঞ্জাবির সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। পাঞ্জাবিও অনেকটা প্রাচীনপন্থী। আদি বাংলা ভাষা থেকে উড়িয়া ভাষা ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়। অসমিয়া ভাষা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে বাংলা ভাষার অধিকারচ্যুত হয়ে।

গ্রিআর্সন নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, দু ভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন হ্যের্নলে (Hoernle) সাহেবের অনুসরণে। এই বিভাগের যাথার্থ্য স্বীকার ক'রে নিলেও এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীতে এখন আর ঐ ভাষাগুলিকে নিয়ে মেল-বন্ধন করা যুক্তি যুক্ত নয়। এ বিষয়ে "ভূমিকা" অংশে আলোচনা করা হয়েছে। এমন-কি উর্দু আর হিন্দিও এখন পরস্পর থেকে এত পৃথক্ হয়ে যাচ্ছে, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, যে, দুটিকে এক গোত্র বন্ধনে আবদ্ধ করার অসুবিধে দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকটি আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাকে এখন স্বতন্ত্ররূপে বিবেচনা করা সমীচীন।

ভারতীয়-আর্য ভাষার বিবর্তনের আলোচনা এখানে শেষ হল।

প্রসার

ভারতীয়-আর্য শাখার আধুনিক বংশধর ভাষাগুলির বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান ও তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার আগে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গঠনে সহায়তা লাভের জন্যে একবার ব্যাপকভাবে বহির্বিশ্বে ও বিশেষভাবে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। ভাষা যে জাতীয় আত্মার নির্দেশক, এ-তত্ত্ব ইউরোপেই উদ্ভূত। সুতরাং এ-তত্ত্ব ইউরোপে তথা ইউরোপ-প্রভাবিত পাশ্চাত্য জগতে কতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সে-খবর নেওয়া দরকার।

বর্তমান ইউরোপ যে বর্তমান ভারতের চেয়ে সভ্যতায় অনেক বেশি উন্নত ও অগ্রসর, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। প্রাচীন কালে যাই হয়ে থাক না কেন, এখন ভারত জীবনের সব ক্ষেত্রে, এমন-কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও, ইউরোপের চেয়ে পশ্চাৎপদ, এ-কথা অতিরিক্ত দাম্ভিক না হলে যে কোন ভারতীয়ের সবিনয়ে মেনে নেওয়া কর্তব্য। ভাষা ও সাহিত্য তথা চিন্তাশীলতা ও মনীষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ-যুগে ইউরোপ ভারতের পথপ্রদর্শক। সেই ইউরোপে ভাষা ও জাতি সম্পর্কিত ব্যাপারে কি হয়েছে এবং হচ্ছে, তার আলোচনা প্রয়োজন। [ক্রমশঃ]

মফঃস্বল

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

এখানে পথ তো ইটে আর পিচে
কংক্রীট ঢাকা নয়—
সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ-চূড়ায়
অপরূপ নীলাকাশ,
কিশোরী মেয়ের মত এ-মাটি যে
স্বপ্নের বিস্ময়
আবৃত তার ওড়নার ফাঁকে
কচিপাতা নীল ঘাস।

সকালে সূর্য, চাঁদ সন্ধ্যায়,
প্রান্তর শুয়ে থেকে
তারার আলোয় গা ভাসিয়ে—মন,
আবার ঘুমিয়ে যায়,
দক্ষিণ হাওয়া ঝর্ণার মত
পাল তুলে এঁকে বেঁকে
প্রবাহিত ;—থাকি আমি এ মাটির
হৃদয়ের পিপাসায়।

সাধিকা শবরী

শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[নাটিকা]

প্রথম দৃশ্য

স্থান মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রম। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। আশ্রমমধ্যস্থ একটী বেদিকায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত মহর্ষি মাতঙ্গ। সময় সায়ংকাল। আশ্রমমধ্যস্থ একটী কোণে ঘৃত দীপ জ্বলছে। মহর্ষির তখনও পূর্ণ জ্ঞান আছে। তিনি প্রথমে দুই কর জোড় করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তাঁর পার্শ্বে তাঁর পালিতা কন্যা শবরী শোকাকুল চিত্তে গুরুর সেবায় নিযুক্তা। মহর্ষি বললেন :—

মহর্ষি। হে নারায়ণ! হে পতিতপাবন! এতদিন তোমার আগমন আশায় বসে ছিলাম। কবে তুমি এই ধরণীর গ্লানি মোচন করতে এই ভবধামে অবতীর্ণ হবে বলে। আর তোমার সেই নররূপ দর্শন করে মানব জন্ম সার্থক করব বলে দীর্ঘ দিন অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু প্রভু! আর তো দেখা হোল না—হে নররূপী নারায়ণ শ্রীরাম! তোমার নামই জপ করতে করতে এই ধরণীর সকল মায়া কাটিয়ে পর পারে চলে যাচ্ছি—ওগো কৃপাসিন্ধু, অন্তিমে যেন তোমার নামের গুণে তরে যাই—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা শ্রীরামচন্দ্রঃ সচ্চিদানন্দপুরুষঃ
নমঃ বিষ্ণুতেজসে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণায় নমস্তুতে।"

যাবার সময় আমার ঘনিয়ে আসছে—এই সৌন্দর্য্যময়ী মায়ার আধার ঘেরা ধরণীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে?···কিন্তু·· যাবার আগে একটা যে কর্ত্তব্য আছে সেটা বলে যাই—শবরী—ও শবরী মা আমার। কই। এধারে আয়তো মা।—এসেছিস্!—একি! তোর চোখে জল?

শবরী। কই—না—তো!

মহর্ষি। না—তো—বললেই কি আর আমার চোখকে ফাঁকী দিতে পারিস মা—

শবরী। (নীরব)

মহর্ষি। কাঁদিস্ নে মা কাঁদিসনে—তুই কাঁদলে আমি যে পরপারে গিয়েও শান্তি পাব না মা—

শবরী। (উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে) পি-তা—গু-রু—

মহর্ষি। শবরী মা আমার—এতটুকু থেকে তোকে লালন পালন করে আসছি—আজ তুই বড় হয়েছিস—আমার আজন্ম তপস্যার ফল দিয়ে তোকে শিক্ষা দিয়েছি। আজ তুই সব কিছু বুঝেও আমার যাবার সময় মায়ায় ঘিরে আমার যাত্রাপথকে দীর্ঘ করে দিতে চাইছিস্ মা—

শবরী। কিন্তু-পিতা—

মহর্ষি। চেয়ে দেখ, আমি অতি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার সকল কর্ত্তব্যকর্ম্মও সারা হয়ে গেছে—এই জীর্ণ স্থবির দেহটাকে নিয়ে শুধু শুধু আর বয়ে বেড়ানো কত কষ্টকর—তাই ভেবে দেখ তো মা!

শবরী। পিতা·· তাহলে আমি কি কোরব? এই শূন্য নির্জ্জন আশ্রমে আমি একা কি কোরে থাকবো।

মহর্ষি। তোকে যে এই আশ্রমেই থাকতে হবে মা! এই আশ্রমের সম্পূর্ণ ভার যে তোর ওপর—নইলে ওই মূক অসহায় গৃহ পালিতগুলির মুখ কে চাইবে—ওই পুষ্পবীথিকায় কে জল সিঞ্চন করবে?

শবরী। না-না-না—পিতা—তোমায় ছেড়ে আমি একলা থাকতে পারব না—না কিছুতেই না। আমি

আমার বাপ-মাকে কখনও দেখিনি—তুমিই একাধারে পিতার স্নেহ একধারে মাতার স্নেহ দিয়ে আজীবন ঘিরে রেখেছ—আজ আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে থাকবো পিতা--কেমন করে থাকবো—

মহর্ষি। পারবি রে পারবি—। আশৈশব তোকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে ব্রহ্মবিদ্যা দান করে এসেছি—আজ তুই মায়ার মোহে এমন কথা বলছিস মা—

শবরী। তুমি থাকবে না পিতা—এ ভাবতেও আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে—না-না পিতা…(ক্রন্দন)

মহর্ষি। যাতে তুই একলা থাকতে পারিস তার ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি।

শবরী। পিতা—

মহর্ষি। কাঁদিস্ নে মা কাঁদিসনে—তুই যদি কাঁদিস্—তবে এই আশ্রমের প্রতিটী তৃণলতা, পুষ্পবীথি, ওই অবলা জীবগুলিও কাঁদবে—তাই তাদের মুখ চেয়ে তোকেই তো আমার এই আশ্রমের ভার নিয়ে ওদের দেখতে হবে মা, আজ থেকে এই আশ্রমের ভার তোর ওপর ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে যেতে পারব। আর আমি আমার অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেলাম তুই সত্যের পথে থেকে, সাধনার দ্বারা তোর ইষ্ট লাভ করে পরম ব্রহ্মে লীন হবি!

শবরী। না পিতা-আর আমি কাঁদব না—

মহর্ষি। না আর কাঁদিসনে—মিথ্যা কেঁদে মনকে ব্যথায় ভরিয়ে তো কোনই ফল হবে না মা—এ জগতে সবি নশ্বর। দুদিনের তরে হেথায় ঘর সংসার পাতা—মিথ্যা মায়ার আকর্ষণে পড়ে থাকা। এ সবি অনিত্য! যা নিত্য, সত্য সেই পথের কথাই তোকে বলে যাই—। মা, এজগৎ প্রপঞ্চে, তুমি কে, আমি কে, কে পুত্র, কে কন্যা কে পিতা, কে মাতা—এ সবই ছায়ার মত। জন্ম মৃত্যু নিয়েই এর খেলা।

শবরী। পিতা, তপস্যার দ্বারা কি এই মৃত্যুকে রদ করা যায় না—?

মহর্ষি। হাঁা—মা, তপস্যার দ্বারা রদ্ করা যায় বৈকী কিন্তু মা বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করা কি যুক্তিযুক্ত কাজ মা—। স্বয়ং ভগবানও এই নিয়মের অধীন—অন্যের কথা কি বলব মা। কাজেই মিথ্যে মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে থেকে কি লাভ মা।

শবরী। পিতা—তোমার স্নেহময় কোলে পরম নির্ভাবনায় এতদিন কাটিয়ে আজ কেমন করে—বোন্—

মহর্ষি। আরে বেটী!—শোন্—শোন্—আজ যাবার আগে তোকে একটা জিনিষ দিয়ে যাব যার ওপর পূর্ণ নির্ভর করলে আর কিছুর ভাবনা থাকবে না—। শোন্—স্বয়ং নারায়ণ ভূ-ভার হরণ করবার জন্য মা'ব দেহে এই ধরাধামে জন্মেছেন। কিন্তু মা আমার আর চাক্ষুষ তাঁকে দেখা হয়ে উঠলো না।

শবরী। শ্রীভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এই এই ধরাধামে?

মহর্ষি। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ—শ্রীভগবান রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হোয়েছেন।

শবরী। কোথায় জন্মেছেন পিতা—? কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে?

মহর্ষি। কিন্তু মা তোকে কোথাও যেতে হবে না। তিনি নিজেই আসবেন এই আশ্রমে। শবরী, মা আমার, তুই তাঁর জন্য দীর্ঘ দিন ধরে প্রতীক্ষা করে থাকবি--তিনি আসবেন—তাঁকে দর্শন করে তোর জীবনমন ধন্য হ'য়ে যাবে।

শবরী। কি রূপ তাঁর গুরু—

মহর্ষি। নব দুর্ব্বাদলসম শ্যাম কান্তি—পদ্মপলাশ লোচন—আজানুলম্বিত ভুজ…উন্নত শরীর…পৃষ্ঠে তূণ হস্তে শরাসন—অপরূপ রূপে তিনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হোয়েছেন।

শবরী। পিতা, পিতা, গুরু, গুরু—আমার একি হোল! তাঁর নাম শুনে হঠাৎ আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠলো কেন? হৃদয়ে কি এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছে…।

মহর্ষি। দেবে রে দেবে—তুই রাম নামে ডুবে থাকিস্—রাম মন্ত্র জপ, রাম মন্ত্র ধ্যান জ্ঞান করে থাকবি—দেখবি তোর সকল ভয় ভ্রান্তি দূর হ'য়ে যাবে। মা শবরী—তিনি শীঘ্রই আসবেন। প্রিয়তমা সীতা দেবীর অন্বেষণে এই আশ্রম তাঁর শুভাগমনজনিত শ্রীচরণ রেণুতে পবিত্র হবে।—হাঁা—শোন—তুই তাঁর শুভাগমন আশায় অতি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করবি। তোর এই দেহ, মন, আত্মা সব কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে একাগ্রমনে উৎকর্ণ

হ'য়ে জেগে থাকবি—জানবি—তিনি নিশ্চয়ই আসবেন—তোর গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা হবে না!

শবরী। সত্যই দর্শন পাব?

মহর্ষি। হ্যাঁ,—নিশ্চয়ই দর্শন পাবি মা। তবে তাঁর দুর্লভ দর্শন পাবার পর তুই তাঁরই সামনে জলন্ত অগ্নিতে তোর ওই নশ্বর দেহ বিসর্জন দিয়ে আমার নিকট ব্রহ্মলোকে চলে আসবি—আমি তোর জন্য উদ্গ্রীব হোয়ে প্রতীক্ষা করব মা—।

শবরী। পিতা, আপনার বাক্য আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

মহর্ষি। মা একবার তোর কাকুমণিকে ডাক তো? যাবার আগে তোর কথা বলে যাই—

শবরী। যাই পিতা,—(বাহির হইতে যাবে এমন সময় শাক্যমুনি ও তাঁর পুত্র সত্যকামকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া) পিতা—কাকুমণি আপনার কাছেই আসছেন?—

মহর্ষি। আসছে…আঃ…শাক্য এলে…তোমায় আজ আমার বড় প্রয়োজন ভাই…

শাক্যমুনি। কি বলছ দাদা…

মহর্ষি। ভাই, আমার এই বিদায় বেলা তোমায় একটা অনুরোধ করব বল-বল রাখবে? (হাত ধরে)

শাক্য। কি অনুরোধ দাদা তোমার সব কথাই আমি রাখতে প্রস্তুত আছি।

মহর্ষি। শাক্য ভাই (হাত ধরিলেন) তোমার ওপর শবরীর দেখাশোনার ভার দিয়ে গেলাম। তুমি ওকে দেখো?

সত্যকাম। জ্যেঠু আপনি কোথায় চলে যাবেন?

মহর্ষি। আমি আর এখানে থাকব না, বাবা? আমি ওই অনন্তে চলে যাব। তাঁহলে শাক্য তুমি ওর ভার নিলে?

শাক্য। সে কি দাদা এ কথা তুমি বল্লেও নিতাম না বল্লেও নিতাম। শবরী কি তেমন মেয়ে ওর মত—

মহর্ষি। ওকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে পালন করেছি। জেনো, কালে ওর নাম সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠবে। তুমি ওকে দেখো ভাই আর মা শবরী আমি তোর কাকুমণিকে সব কথা বলে গেলাম যখন যা জানবার প্রয়োজন হবে সব জেনে নেবে। আয় মা কাছে আয়—আরও কাছে—। সংসারের সব বন্ধন কাটিয়ে গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলাম—তার মাঝে তুই-ই ছিলি একমাত্র বন্ধন। আজ যাবার আগে তোকে আমার অন্তরের পরিপূর্ণ আশীর্বাদ দিয়ে যাই আর আমার সময় নাই—যা—যা বলে গেলাম ঠিক মত চলবি মা—(কিছুক্ষণ নীরবে থেকে) ওই রবি পশ্চিম গ গে ঢ'ল পড়ছে—আমার সময় আসন্ন—দে তো মা জপের মালাটা আমার হাতে (শবরী জপের মালা দিলে।) মা—মা—তারা—ব্রহ্মময়ী…আঃ! নারায়ণ! মা—শ-ব-রী আমি আ-বা-র তোকে—আশীর্বাদ করছি—গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করে সনাতন ধর্মে নি-ষ্ঠা-রে-রে-খে সাধনার দ্বা-রা ইষ্ট লা-ভ কর মা—আঃ না-রা-য়-ণ—শ্রী-রা-ম-মা-মা…দুর্গা…দু…

(মহর্ষি মহাপ্রস্থান করিলেন উপর হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইল)

শবরী। পিতা পি-তা পি-তা…

(বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল।)

পট পরিবর্তন

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শবরী তার আশ্রম মধ্যে মহর্ষি মাতঙ্গের সমাধিবেদিকার নিকট বসে বসে মালা গাঁথছিল। একটি ঘৃত দীপ জলছিল—সুগন্ধ ধূপ তার গন্ধ দিয়ে সে স্থান পূর্ণ করে দিচ্ছিল। পিছন দিক থেকে সত্যকামের প্রবেশ।)

সত্যকাম। একলা এই নির্জন কুটিরে কি করছ সখি?

শবরী। (সত্যকামের পানে তাকিয়ে) দেখছ না-কি করছি?

সত্যকাম। আজকাল যখনি আমি দেখি তুমি হয় মালা গাঁথছ নয় ধ্যান করছ—এমনি একটা না একটা নিয়ে বসে আছ। কই? আগের মত তো তেমন ভাবে আর খেলা কর না—সেই বকুল বীথিকার তলে বকুল ফুল চয়ন করে মালা গেঁথে আর আমায় পরাও না—সখি—তোমার হল কি? ওঃ! আগে কত ভাল বাসতে—আর আজ?

শবরী: সত্যকাম, শৈশবের কথা সে শৈশবেই শেষ হয়ে গেছে এখন সে নিয়ে তো আর আক্ষেপ করা চলে না।

সত্যকাম। সখি, তুমি এত রূঢ় হয়ে গেলে কেন? আগে তো কই এমন ভাবে কথা বলতে না?

শবরী। তখন তুমিও ছোট ছিলে আমিও ছোট ছিলাম। এখন তো আমাদের এমন নির্জনে একলা কথা বলা ঠিক নয় সত্যকাম! এখন তোমার কাজ অধ্যয়ন, তপস্যা করা।

সত্যকাম। অধ্যয়ন, তপস্যা সে সবই আছে শবরী —কিন্তু যৌবনের ধর্ম এড়িয়ে যাব আমি কেমন করে? সখি, তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী মূর্তি অনন্ত যৌবনে ভরা বসন্ত আমায় পাগল করে দেয়—

শবরী। সত্যকাম! তুমি এখন যাও—তোমার প্রেমের কাহিনী শোনবার এখন আমার সময় নেই—।

সত্যকাম। শবরী! সখি···কেন, কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছ? যে আমার প্রাণময়ী মানস সুন্দরী—তোমায় ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব···? বল···বল···এ তোমায় সম্ভাষণ না···ছলনা···

শবরী। সত্যকাম। এখন তোমায় কোন কথা শোনবার আমার সময় নেই—দেখতে পাচ্ছ না আমি এখন কোন্ ব্রতে ব্রতী?

সত্যকাম। আচ্ছা। তোমার ব্রতই সমাপন কর।

(সত্যকাম নীরবে প্রস্থান করিল)

(শবরী মৃদু হেঁসে তার অর্দ্ধ সমাপ্ত মালাটী শেষ করে পুষ্পপাত্রে রাখলে। তারপর একে একে সমস্ত উপকরণ সেই সমাধিবেদিকায় অর্পণ করতে করতে—)

শবরী। নমঃ গুরবে নমঃ—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেনং চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ঃ"

হে গুরু! হে পরম পিতা···আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অর্ঘ্য তোমার শ্রীপদে অর্পণ করলাম—তুমি সেই পরম লোক থেকে আমায় তোমার স্নেহস্পর্শ দিয়ে আশীর্বাদ কর!—যেন, এই সংসারের সমস্ত প্রলোভন থেকে, এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে নিজেকে সংযমী রাখতে পারি।

(নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করে)

কর্তব্য কঠিন এই সংসার! তিলে তিলে জীবনকে সেই কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় নিয়োজিত করে যেন সফলতা লাভ করতে পারি—জানি, সে বড় দুরূহ কাজ—তবুও এগিয়ে যেতে হবে—

(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া)

বাধা—শুধু বাধা পলে পলে পথকে ঘিরে রাখে—নিয়তির কঠিন আঘাত মানুষকে করে দেয় পথভ্রষ্ট ধরাশায়ী —পিতা, পিতা, তুমি আমার আজ সামনে নেই—এ আশ্রম শূন্য, সংসার শূন্য, যে দিকে তাকাই কোন ভরসা পাই না, শুধু তোমার স্মৃতি সর্ব স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! গুরু, পিতা···তুমি আমায় অলক্ষ্যে থেকে ছায়ার মত পথ দেখিয়ে নিয়ে চল! এই দুর্বল মনে দুর্বার সাহস সঞ্চারিত কর।—পিতা, তুমি এস! শূন্য নির্জন আশ্রমে আমি কেমন করে থাকি··(কাঁদিতে লাগিল)

(সহসা ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ পাইল ও আকাশবাণী শ্রুত হইল)

"শবরী···মা আমার···দুর্বলতা পরিহার করে আমার নির্দেশিত পথে গমন কর।—তুমি একা নও, তুমি অবলা নারী নও, তুমি দুর্বলা নও—তোমার মধ্যে যে অসীম পরম শক্তির বীজ আছে—তাকে জাগরিত কর—তুমি অতি পুণ্যশীলা—তোমার নিকট স্বয়ং নারায়ণ নররূপে আবির্ভাব হবেন। তোমার জন্ম সার্থক, কর্ম সার্থক—মা শবরী, তোমার গুরুর বাক্য কখনও নিষ্ফল হবে না—আর যখনই মনে সন্দেহ জাগবে—দুর্বলতা জাগবে তখনি আমি ছায়ার মত তোমায় নির্দেশ দিয়ে যাব—কোন ভয় নাই মা—"

(মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল)

শবরী। পিতা···পিতা···কই, কোথা তুমি।

ধরিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

কিছুক্ষণ পরে উঠিতে উঠিতে···

পিতা, তোমার স্নেহের সুর এখনও আমার কানে বাজছে। পিতা, পিতা, তোমার বাক্য আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব—কিন্তু একি! স্বপ্ন—স্বপ্ন—না-না জাগ্রতে কেমন করে স্বপ্ন হবে! এ দৈববাণী···হ্যাঁ, এ দৈববাণী। নইলে পরলোকগত পিতা কেমন করে চাক্ষুষ সামনে আসবে—হ্যাঁ, এ দৈববাণী—ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত আমায় সদা ঘিরে রেখেছে। পিতা—তোমার শবরী মরণ পণ কোরেও তোমার বাক্য পালন করবে—হে নারায়ণ, পতিতপাবন, কলুষ নাশন-সর্ববিঘ্নহারী শ্রীরামচন্দ্র

আজ থেকে তোমারি জন্য শবরী সকল কিছু ঐহিক সুখ সম্ভোগ ত্যাগ করে বসে থাকবে।

(ধীরে ধীরে কুটির মধ্যে প্রবেশ করিল)

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ—একটী বৈরাগী একতারা বাজাইয়া বনপথ ধরিয়া আশ্রমের পানে আসিতেছিল :

বৈরাগী গাহিতেছিল।

মুক্তি দে—মুক্তি দে গো—মুক্তি দে মা মুক্তকেশী।
(তোর) বিড়ম্বনা আর সহে না ঘুচিয়ে নে গো
মোহের ফাঁসী ॥

ভেবেছিলাম বিজন ঘরে
সঙ্গোপনে পূজবো তোরে
নয়নজলে ধুইয়ে চরণ ডাকবো তোরে উমাশশী ॥

ছেড়ে দিলি ভবের হাটে
কি যন্ত্রণায় জীবন কাটে
সকল আশায় বাদ সাধিলি এই রীতি তোর
সর্বনাশী ॥

মায়া মোহের এ সংসারে
ফেলে দিলি ঘোর আঁধারে
পথ পাইনে হাতড়ে মরি এবার কোলে নে মা
আসি ॥

এই দীন অভাজন কেঁদে কয়
দাও মাগো পদাশ্রয়
এবার যদি না নিস কোলে হবে বিষম দ্বেষাদ্বেষী ॥

(তাহার পাশ দিয়া জনৈক পথিক চলিয়া যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া বৈরাগী কহিল :)

বৈরাগী। বাবা! একটা পথের নির্দেশ বলতে পার?

পথিক। কোন্ পথের নির্দেশ চাইছ বৈরাগী বাবা?

বৈরাগী। পথ তো অনেক বাবা—কিন্তু সে পথের কথা বলছি না—বলছি মহাত্মা মাতঙ্গের আশ্রম কোথায় বলতে পার?

পথিক। ওঃ! তুমি মাতঙ্গ ঋষির আশ্রম খুঁজছো? তা বাবা—তা আর বলতে পারিনে খুব পারি।

বৈরাগী। কোন্ পথে গেলে তাঁর দেখা পাব?

পথিক। তাঁর তো দেখা পাবে না বাবা! তিনি তো আর ইহলোকে নেই—ব্রহ্মলোকে চলে গেছেন? তবে—হ্যাঁ, তাঁর পালিতা কন্যা মন্ত্রশিষ্যা শবরী এখন সেই আশ্রমে আছে। গেলে, দেখা করতে পারবে।

বৈরাগী। মহাত্মা মাতঙ্গ ঋষি নেই? হাঃ মা জগদম্বা—বড় আশা করে এসেছিলাম—আমার সব নিষ্ফল করে দিলি?—আচ্ছা বাবা কোন্ দিকে তাঁর আশ্রমটা বলে দাও না—আমি একবার তাঁর পালিতা কন্যার সাথেই দেখা করে যাই—

পথিক। এই পথ ধরে সিধে খানিকটা গেলেই বাঁ-ধারে তাঁর আশ্রম।

বৈরাগী। আচ্ছা—বাবা খুব উপকৃত হলাম—

(দু'দিকে দুজনে চলিয়া গেল)

(দৃশ্যান্তর হইতে দেখা গেল মহাঋষি মাতঙ্গের আশ্রম, সেই আশ্রমমধ্যস্থ কক্ষে প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া শবরী আহুতি দিতেছিল।)

শবরী। ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় স্বাহা, বলিয়া পূর্ণপাত্র সহ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিল। তারপর মাতঙ্গের সমাধির নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়া কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং একটী আসনে গিয়া উপবেশন করিয়া কহিল :—

হে ইষ্টদেবতা কতদিনে তুমি আসবে—হে রাম কবে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করে কৃতকৃতার্থ হব প্রভু—আর কতদিন—

ধ্যানস্থ হইয়া কিছু সময় থাকার পর হঠাৎ বিপরীত দিক হইতে নৃত্য করিতে করিতে মায়া, লালসা, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ ও সত্যকামের বেশ ধারণ করিয়া কামের প্রবেশ।

মায়া। চেয়ে দেখ সখি—

শবরী : কে কে, তুমি—

মায়া। আমি মায়া—এ জগৎ সংসার আমার অঙ্গুলি হেলনে চলে—

শবরী। তা'-তুমি—

মায়া। হ্যাঁ গো আমি তোমার সঙ্গে সই পাতাতে এসেছি।

শবরী। মায়া—বাঃ।—বেশ নামটী তো তোমার—

মায়া। আমার যে সই নামেই আকর্ষণ—আর রূপ—

শবরী। রূপ—! তোমার রূপের তুলনা নেই—বিশ্বচরাচর তোমার মায়ার আলোয় ঝলমল্ করছে!

মায়া। আর—

শবরী। আর যেন এই সংসারকে কিসের এক মোহিনী আকর্ষণে টানতে চাইছে—যেন এ হৃদয়ের মধ্যে থেকে কি যেন ভালবাসতে চাইছে—।

মায়া। সই—এমন ভরা যৌবনে এ সংসারকে ভাল না বেসে পার? কিন্তু সখি—এ সন্ন্যাসিনীর বেশ কি তোমার মত সুন্দরীর শোভা পায়?

শবরী। কিন্তু মায়া—এ আমার কি হোল? তোমার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের সমস্ত সুর পাল্টে গেল কেন? আমার অটল সঙ্কল্প শিথিল হয়ে যাচ্ছে কেন?—এই ধরণী যেন স্নেহ মায়ায় আমার নতুন করে কিসের এক আকর্ষণে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেললো—এই আশ্রমের তৃণলতা ফল ফুল যেন এক অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু—একি হোল আমার সখি—

মায়া: মনের মধ্যে যে প্রলোভন উঁকি মারছে বুঝতে পারছ না—

শবরী। ওকে? দিব্য কাঞ্চন বরণ—।

মায়া। ওই তো প্রলোভন?

শবরী। তুমি প্রলোভন?

প্রলোভন। হ্যাঁ, আমি প্রলোভন—তোমার মনের মোহনীয় ইচ্ছা পূরণ করাই আমার কাজ।

মায়া। লালসা কি জাগছে সখি—

শবরী। লালসা—হ্যাঁ—আমার মনকে কি এক কামনায় হাত ছানি দিয়ে টানছে—

মায়া। সখি, এ সংসারকে এখন কেমন লাগছে!

শবরী। সুন্দর! সুন্দর এই জগৎ সংসার! কিন্তু সখি—আমার এই অঙ্গ সৌষ্ঠবে এত লাবণ্য কোথা থেকে এলো, এত মধুরতা কোথায় ছিল এতদিন! সখি, বিরহানলে হৃদয় যে ছটফট করছে—কি যেন পেতে চায়—

মায়া। প্রথম যৌবনের জোয়ার—তোমার মন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় সখি—সেই খানে যেখানে তোমার প্রেমাস্পদ রয়েছে ওই হৃদয়ের গোপনস্থানে।

শবরী। গোপনস্থানে প্রেমাস্পদ রয়েছে—

মায়া। হ্যাঁ গো—নারীর কামনা যে পুরুষ—সেই পুরুষের সঙ্গসুখই তো নারীকে পূর্ণ করে দেয়—তাই চেয়ে দেখ—তোমার সামনে কে?

(সত্যকামের রূপ ধরিয়া কামের প্রবেশ)

কাম: শবরী—

শবরী। কে, কে তুমি সত্যকাম! একদিন তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তার জন্যে আমায় ক্ষমা কর—কিন্তু আজ তোমার একি রূপ! পুড়িয়ে দিতে চাও আমাকে—

মায়া। সখি এমন সুযোগ আর পাবে না—সত্যকামকে তোমার হৃদয় সঙ্গী করে নাও—

শবরী। কিন্তু—আমি যে চির সন্ন্যাসিনীর ব্রতে ব্রতী—

মায়া। সন্ন্যাসিনী হবে? তোমার এত রূপ, এমন যৌবন, হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা সব জলাঞ্জলি দিয়ে—

কাম। শবরী—কঠোর সন্ন্যাস ব্রত কি এতই সুখকর। না—এই সৌন্দর্য্যময়ী ধরণীতে তুমি নারী আমি পুরুষ আমাদের দু'য়ের মিলনে সংসারে যে অনাবিল আনন্দ ঝরে পড়বে যা থেকে আবার এক নতুনের জন্ম হবে সেটা সুখকর!

শবরী। দাঁড়াও! আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও—(স্বগতঃ) মায়ার আকর্ষণ। প্রলোভন—লালসা-কাম—এরাই এ দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মোহের জাল বিস্তার করছে—একি। সহসা আমার একি হোল?—এতদিনের সংযত সাধনা মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চায়।…না, না—এই সুখ! এই এত অফুরন্ত আনন্দ, কামনার পরিতৃপ্তির উৎস!—চির সন্ন্যাসিনী হোয়ে কঠোর তপশ্চারণ করে কি লাভ? এমন সুন্দর ধরণী—ভোগের এমন অর্ঘ্য পত্রে পুষ্পে, আলোয় অন্ধকারে ঝরে পড়ছে—মনভরা যৌবনের উদ্দাম কামনা—এ থেকে বঞ্চিত হব? না-না…এমন দেহের আত্মসুখ সম্ভোগকে অবহেলা করে কঠোর শুষ্ক তপস্যা করা যৌবনধর্ম্ম নয়! জনান্তিকে) এস সত্যকাম, আমি স্থির করেছি - তোমায় আমার হৃদয় মন্দিরে বসিয়ে পরিপূর্ণ সুখ সম্ভোগে মগ্ন হই—

কাম। আঃ—পরিপূর্ণ সুখ! অপরিমিত আনন্দ! এস, এস শবরী তোমার প্রেমউচ্ছলা বুকভরা কামনা নিয়ে

আমার হৃদয় মন্দিরে এস দু'জনের মিলন উৎসবে ফুলের বাসরে মধু যামিনী উদ্‌যাপন করি—আমাদের এই মিলনে প্রেমের বন্যায় ধরণী প্লাবিত হোক—

শবরী। এস, এস—প্রিয়তম—বাস্তবের এই খেলাঘরে আমরা দু'জনে ফুলের বাসরে অনাবিল সুখ সম্ভোগ করে এ জীবনকে পুর্ণ করি—

(বিবেক ও কর্ম্মের প্রবেশ)

বিবেক। সাবধান নারী! এ তুমি কি করছ? ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় তোমার ইহপরকাল নষ্ট কোর না—মনে রেখো তুমি যে ব্রতে দীক্ষা নিয়েছ—সে ব্রত অসম্পূর্ণ রয়ে গেলে তুমি অভিশাপগ্রস্ত হবে—

শবরী। কে তুমি?—আমার মনের মধ্যে থেকে অহরহঃ এমন করে আঘাত দিচ্ছ? না-না—তোমাকে চাই না—আমার এমন যৌবন, এমন রূপ, হৃদয়ভরা ভালবাসা—এ সব পরিত্যাগ করে—তোমাদের ওই কঠোর ধর্ম্ম পালন করতে পারব না—

বিবেক। কি বললে মা—ভেবে দেখ—নিজের সঙ্গে বিচার করে দেখ তুমি কে? তুমি কি তোমার নিজের—না—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গুরুর পুজার বলি? গুরুবাক্য লঙ্ঘন কোর না মা। স্মরণ রেখো—ভবিষ্যতে তাহলে তোমাকে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হতে হবে। শুধু কি তাই—গুরু কোপানলে পুড়ে ছাই হোয়ে যাবে না ইহকাল না, পরকালে কিছুই পাবেনা—সাবধান!—

কর্ম্ম। ওঠো মা জাগো—কর্ম্ম কর—ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও—বিলাসের আলসে লালসে মগ্ন না থেকে কর্ম্ম কর—সৎকর্ম্ম। জীবনকে জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা কর—তোমার তপঃপ্রভাবে জগৎ মুগ্ধ হোক—নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরবে গৌরান্বিত হোয়ে জগতে অক্ষয় অমর কীর্ত্তি রেখে যাও—আদর্শ শক্তিময়ী নারীর আদর্শস্থানীয়া হোয়ে।

সত্যকাম। শবরী—শবরী—এত কি ভাবছ সখি? প্রাণেশ্বরী! তুমি ওই আহাম্মুক বিবেক আর কর্ম্মের কথায় তোমার প্রাণের জ্বলন্ত প্রেমকে অবহেলায় নষ্ট হ'তে দিও না—তোমার অন্তরের কামৈশ্বর্য্যকে ভোগের দ্বারা ভোগ কর—তোমার ঈপ্সিতের কাছে তাকে নিবেদন করে ধন্য হও প্রিয়ে!

শবরী। সত্যকাম—সত্যকাম—

সত্যকাম। এই তো আমি তোমার পাশে। শবরী, বাল্যের লীলা সহচরী, চঞ্চল সে শুভদিনগুলির কথা একবার স্মরণ কর প্রিয়ে—সেই একসঙ্গে পুষ্পচয়ন বকুল ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিয়ে সেই—

মোহ। শবরী—তুমি যে দেবতার ভোগের বস্তু! প্রকৃতির খেলাঘরে তুমি তো নিবেদিত একটি পুষ্প! সুবাসিত রেণু সৌরভে তোমার দ্বারে ভ্রমর এসেছে—দাও—দাও তাকে তোমার অনন্ত যৌবনভরা বসন্তের ডালি প্রেমের সাথীকে। আর বিচার কিসের—সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সেই সুন্দর—

শবরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ···আমি দেব, আমি দেব আমার সর্ব্বস্বকে তোমার পায়ে বিলিয়ে দেব···

বিবেক। কি করতে ছুটে চলেছ শবরী একবার ভেবে দেখ? জ্বলন্ত অগ্নি শিখা—লকলক জিহ্বা বিস্তার করে তোমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। পতঙ্গের মত লেলিহান অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে দগ্ধ কোর না মা—

শবরী। না···না···হ্যাঁ···না—না! সত্যকাম আমি পারব না—আমি পারব না···

বিবেক। শবরী! ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় নিজেকে পঙ্কল পঙ্কে ডুবিও না—এতদিনের সংযম সাধনাকে ক্ষণিকের জৈব মোহে কামের সেবায় নিয়োজিত করে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্নকে হারিও না মা। তোমার হৃদয়ের মধ্যে ঐশীশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সারা জগৎকে মুগ্ধ, চকিত করে দাও, তোমার মহীয়সী নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ—প্রতি নারীর আদর্শস্থানীয় হোক।

কর্ম্ম। মা—গুরুবাক্য শিরে ধরে—কর্ম্মের মধ্য দিয়ে পূর্ণের প্রকাশ হোক তোমার মাঝে। তুচ্ছ ইন্দ্রিয় পরবশ হয়ে কামের মোহিনী মায়ার বশবর্ত্তী হোয়ে লালসার মোহে পড়ে নিজেকে স্বখাত সলিলে ডুবিয়ে দিও না মা—তোমার হৃদয়ের মধ্যে সে অনির্ব্বাণ পূত প্রেম আছে তাকে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ কর—দেখবে, তোমার হৃদয় মন এক অনির্ব্বচনীয় প্রশান্তিতে চিরদিন উজ্জ্বল হোয়ে বিরাজ করবে।

শবরী। হ্যাঁ,—না,—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

কর্ম্ম। তাই বলি মা—ধর্ম্মকে ধরে, একাগ্র তপপ্রভাবে ইষ্টের পানে ধাবিত হও তাতে যদি মৃত্যুও হয়—সে মৃত্যু অক্ষয় স্বর্গ!

শবরী। কি করি—একদিকে কাম, মোহ, মায়া আর সংসারের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু, ইন্দ্রিয়ের সুখশান্তি! আর অপরদিকে কঠোর তপোনিষ্ঠা! মন বেছে নে—কোন্ পথের পথিক হবি? এমন নিদারুণ কঠিন সমস্যা কে বিচার করে বলে দেবে—কোন্‌টা আমার শ্রেয়ঃ। পিতা…পিতা…তোমার শবরী আজ সংশয় সঙ্কুল নিমজ্জমান তরণীতে অকূল দরিয়ার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে—তুমি বলে দাও—বলে দাও—কই তোমার শবরীকে তো কিছু বল্লে না…না…না…পিতা…তোমার শবরী তোমার বাক্য লঙ্ঘন করে ইন্দ্রিয়ের সেবা করতে গিয়েছিল—তাকে তোমার অভিশাপানলে দগ্ধ করে দাও, ভস্ম করে দাও—

(কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি সব মন থেকে চলে গেল)

(সহসা দৈববাণী শ্রুত হইল)

শবরী মা—অনুশোচনাতেই তোমার হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে গেছে—তুমি শ্রীরামের আরাধনায় মগ্ন থেকে নিজেকে তাঁর চরণে অর্পণ কর—

শবরী। পিতা—পিতা—আলো পেয়েছি—আঁধারের মাঝে পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় রূপ আমার নয়নে জেগেছে—সরে যা সরে যা মনের পাপগ্রন্থিগুলো—জয় রাম—জয় রাম—

বৈরাগীর প্রবেশ।

গীত

জয় রাম শ্রীরাম জয়হে সত্যব্রত ধারী—
পাতকী তারণ তুমি নারায়ণ জয় হে কেশব মুরারি॥
তব কৃপাপ্রেম পরশ আশে চেয়ে আছি অনিমেষে
তোমারেই ভালবেসে বসে আছি জীবন ধরি॥

শবরী। কে…কে…তুমি

বৈরাগী : আমি…আমি…আমি তোমার সন্তান মা—

পট পরিবর্ত্তন

(পট পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল—সময় ঊষাকাল। শবরী পুষ্পচয়ণ করিতেছে। তার সারা অঙ্গে একটা পবিত্র দ্যুতি।)

শবরী। দিন হ'তে দিন, রাত হতে রাত এমনি করে কত বছর অতীত হ'য়ে গেল। কই! কোথায় সেই আরাধ্য দেবতা? সেই সুন্দর শ্যামকান্তি জ্যোতির্ম্ময়! আমি যে তোমা লাগি পল-পল উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে আছি—তুমি আসবে বলে। কই প্রভু এখনও কি তোমার আসার সময় হয় নি। তোমারি জন্য প্রতি দিনের গাঁথা মালা নীরস হ'য়ে পড়ে ঝরে পড়ছে—নয়নাশ্রু ঝরে ঝরে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে! গুরু বাক্য কি নিস্ফল হয়ে যাবে? এতদিনের ব্রহ্মচর্য্য পালন, এতদিনের কঠোর সংযম তপশ্চারণ কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? আর কত দিন প্রভু আর কত দিন—

(শবরী পুষ্প আহরণ করিয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর গুরুর সমাধিতে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিল)

ওগো পিতা, গুরু, তোমার বাক্য কি কখন মিথ্যা হয়! না-না-না! নিশ্চয়ই প্রভু আসবেন—। যেন আকাশে বাতাসে তাঁর সেই শ্রীচরণ ধ্বনি শ্রুত হ'চ্ছে—মন, তুমি দুর্বল হোয়ো না—এই দেহের সমস্ত সত্তাকে একীভূত করে তাঁর ধ্যান কর—

(সঙ্কল্পের আবির্ভাব)

সঙ্কল্প। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক মা—

শবরী। কে, কে তুমি—

সঙ্কল্প। আমি তোমার মনের বন্ধু—নাম সঙ্কল্প—

শবরী। সঙ্কল্প!

সঙ্কল্প। হ্যাঁ-মা, আমি সঙ্কল্প। যে যা মনে করে বিশ্বাসের খোঁটায় বল রেখে এগিয়ে যায়-আমিই তাকে সর্বসিদ্ধি আনিয়ে দিই!

শবরী। বাবা…তাহলে আমাকে কৃপা করে আমার মনে বল দিয়ে সেই পথে নিয়ে চল—সেথানে আমার ঈপ্সিত রয়েছে?

সঙ্কল্প। মা তুমি পুণ্যবতী, তোমার মনের আশা সফল হবে, তুমি যে পথে চলেছ সেই পথে তোমার সিদ্ধি অনিবার্য্য। আশীর্বাদ করি তোমার মনের একাগ্রতায় ভক্তি, বিশ্বাস হৃদয়ে ভরে রেখে একদিন তুমি জগতের মহীয়সী বরণীয়া বলে বন্দিত হবে। আর তোমার তপঃপ্রভা একদিন জগতের সকল নারীর শিক্ষণীয় আদর্শরূপে প্রচারিত হবে।

(মন থেকে অপসারিত হইল)

শবরী। ওঁ নমঃ নারায়ণবাসুদেবায় ভগবতে
ওঁ নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় পূর্ণব্রহ্মসনাতনায়
নমস্ততে॥

(মনের মধ্যে সিদ্ধির আবির্ভাব হইল।)

…কে…কে তুমি—

সিদ্ধি। আমায় চিনতে পারছ না মা-আমি তোমার সকল কাজে সফলতা এনে দি তাই আমার নাম সিদ্ধি। আজ তোমার সঙ্কল্পে তুষ্ট হ'য়ে তোমায় আশীর্বাদ করে যাই —তুমি তোমার ব্রতে সিদ্ধি লাভ কর মা।

(প্রস্থান)

শবরী। কোথা প্রভু—আর কতদিন—

(গায়ত্রীর আবির্ভাব)

গায়ত্রী। শবরী…

শবরী। কে, কে তুমি মা সারা বিশ্বের সর্বশক্তি নিয়ে প্রভাতের মত স্নিগ্ধ শান্ত মধুর স্নেহের ধারায় আমার মনকে ভরিয়ে দিলে—কে-তুমি—মা—

গায়ত্রী। আমি গায়ত্রী…বৎসে—

শবরী। চিরমাতৃহীনাকে মাতৃত্বের মাধুরিমায় ভরিয়ে দিয়ে কন্যার স্নেহে এমন করে ভালবেসে—

গায়ত্রী। মায়েরা চিরকালই পুত্রকন্যাদের স্নেহ দিয়ে থাকে মা—

শবরী। কিন্তু মা তোমার স্নেহভরা ডাকে আমার বুভুক্ষু হৃদয় পরিপূর্ণ হোয়ে গেল। যেন কতকালের হারান স্নেহ আজ কানায় কানায় ভরিয়ে দিলে এই ক্ষুদ্র হৃদয় মনকে।…কিন্তু, একি! প্রভাত অরুণময় রক্তাভ পট্টাম্বর পরিধানে, পূর্ণ জ্যোতিঃ সারা অঙ্গে বিচ্ছুরিত, স্নিগ্ধতায় পরিপ্লুতা—কে তুমি মা—

গায়ত্রী। আমি তোমার মা—গায়ত্রী—

শবরী। কিন্তু একি মা—তোমার সেই কমনীয়া স্নিগ্ধতা-ময়ী রূপের পরিবর্তে একি—প্রখর উগ্র তীব্র জ্যোতিঃ! বুঝি এখনি সারা বিশ্বটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে!… তোমার পানে সে তাকাতে পাচ্ছি না। একি…একি… কোথায় গেল সেই তীব্র অগ্নিবর্ষী অনলশিখার উগ্রতা—এ আবার কি নতুন রূপে পরিবর্তিত হোল—ঘোর কৃষ্ণাবর্ণা আলুলায়িতকেশা…

গায়ত্রী। শবরী! আমি গায়ত্রী—এ আমার তিনরূপ। ব্রহ্মবিদ্‌গণের আরাধ্যা দেবী। যে ত্রি-সন্ধ্যা আমার ভজনা করে আমি তাকে ব্রহ্মত্ব দান করি। আমার তিন মূর্তি—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে—আমার রূপ পরিবর্তিত হয়—। আমায় জানলেই এ সংসারে সব জানা হয়—এই তিন মূর্তি থেকেই আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন মূর্তিতে আমি বিরাজ করি। আমিই এই জগৎ সৃষ্টিকারিণী মহামায়া নামে খ্যাতা। আমিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্রী। আবার আমিই প্রকৃতিরূপে জড়ের অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে নিবদ্ধ থেকে জীব সৃষ্টি করি-অঘটন-ঘটন-ঘটাই। আমার স্তুতি করে যে-সেই ব্রাহ্মণ কারণ আমিই পূর্ণব্রহ্ম-বা ব্রাহ্মণী, আমিই বিষ্ণু বা পরম বৈষ্ণবী, আমিই মহেশ্বর বা মহেশ্বরী। তাই আমিই ব্রহ্মত্ব দান করি। যে সত্যাশ্রয়ী ত্রিসন্ধ্যা আমার ধ্যান করে সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আর তাই ব্রাহ্মণ জগতে এত বন্দনীয়—তাই তার তেজে, তার প্রতিভায় জগৎ মুগ্ধ—আর দেবতাদেরও উর্দ্ধে তার স্থান চিরকাল অক্ষয় অমর হ'য়ে থাকবে।

শবরী। মা… মা…

গায়ত্রী। শবরী! তোর তপস্যায় আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। তাই আশীর্বাদ করার সাথে সাথে এই বর প্রদান করি—তুই আজ হ'তে জগতে ব্রহ্মবাদিনী শবরী বলে বন্দিতা হবি? আর আয় মা-এই অক্ষয় সিন্দুর তোর ললাটে পরিয়ে দিলাম—এই চিহ্নই ব্রহ্মত্বের প্রতীকরূপে তোকে সবাই পূজা করবে। (প্রস্থান)

শবরী। মা • মা…

গাহিতে গাহিতে বৈরাগীর প্রবেশ

জয় রাম, ভজ রাম, রাম নাম গাহরে
আকুল হইয়ে রাম নাম লইয়ে সর্বাঙ্গেতে মাখরে।
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রামমন্ত্র জপরে—
তনু মন প্রাণ সব দিয়ে পদে রাম নামে বিভোর হওরে।
প্রেমময় রাম—রাম গুণধাম
অচিন্ত্য অব্যয় লও তাঁর নাম
স্মরণে কথনে চিত্ত অবিরাম ভালবেসে বিরহ পাথারে—
ডুব দাও নামে নবদুর্বাদল শ্যামে আপনারে বিলায়ে
তাঁহারে।

বৈরাগী। গাও মা গাও নেচে নেচে রাম নামে ডুবে যাও—

শবরী। বৈরাগী বাবা! এমন মধুর গান—

বৈরাগী। হ্যাঁ মা রাম নামে মধু ঝরে—নয়নের অশ্রু গলে পড়ে—অনাবিল প্রশান্তিতে আত্মা বিভোর হোয়ে যায়! মা মনকে বৈরাগী করে তোল—দেখবে, এ মন আর থাকবে না—সদাই নাম রসে প্রাণ মাতোয়ারা হ'য়ে যাবে।

শবরী। আর একটা গান গাও—

বৈরাগী। জয় হে নীলোৎপাল কমল লোচন—
জয়, জয়, জয় হে শ্রীরাম জয় রাম
ভক্ত-জন-মন রঞ্জন সব সন্দেহ ভঞ্জন
জয়, জয়, রাঘব রঘুপতি তনু শ্যাম।
অধম তারণ পতিত পাবন
বিঘ্ননাশন ভক্ত-রক্ষণ গুণধাম।

(শবরী সমাধিমগ্ন হইল এবং বৈরাগী গাইতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

শাক্য মুনির আশ্রম।

শাক্য মুনি ও তাঁর স্ত্রী বেদবতী ও কন্যা অনুরাধা। সময় অপরাহ্ণ।

শাক্যমুনি। তাই তো বেদবতী, শবরী তো পূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠলো—মহর্ষি মাতঙ্গের স্নেহে লালিতা পালিতা কন্যা স্থানীয়া। মৃত্যুর পূর্বে তো অনুরোধ করে গেছেন ওর ওপর যেন একটু লক্ষ্য রাখি। তাই মনে করছিলাম কি—যে, শবরীর বিয়ের ব্যবস্থা আর না করলেই নয়। তা ছাড়া পরলোকগত মহর্ষির আশ্রমে একাকী এমত অবস্থায় থাকাও তো সমীচীন নয়—আর নিরাপদও নয়।—

বেদবতী। সে তো খুব ভাল কথা গো—আর আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে? মহর্ষি ছিলেন আমাদের বড়ই আপনার জন। তাঁর প্রয়াণে সত্যিই আমরা বড়ই অসহায় বোধ করছি—

শাক্য। আহা! তাঁর সেই মধুর মিষ্ট কথাগুলি আজো মনে হ'লে চোখ ভ'রে জল আসে! তা—এক কাজ কর অনুরাধাকে পাঠিয়ে দাও শবরীকে ডেকে আনতে। যা সৃষ্টিছাড়া মেয়ে একটা কথাও কানে নেয় না—তবুও তার একটা মতামত তো নিতে হবে?

বেদ। তার আবার মতামত কি গো?—আমরা যা কোরব তাই ও মেনে নেবে। তাছাড়া বিয়ের কথা কেউ মুখ ফুটে কি বলে—সময় হ'লে অভিভাবকদেরই ব্যবস্থা করতে হয়। ওটা আমাদেরই কর্তব্য গো—তা যাক, আমি বলছিলাম কি,—আমাদের সত্যকামের সঙ্গে দিলে কেমন হয়? আর পাল্টা ঘরও তো বটে।

শাক্য। তা অবশ্য খুবই ভাল হয়। দেখতে শুনতে রূপে গরিমায় মা লক্ষ্মীর মত—কিন্তু ওর মধ্যে যে একটু কথা রয়ে গেল—শবরী যে মহর্ষির পালিতা—

বেদ। ওঃ। তুমি—তাই ভাবছ বুঝি—সে ভয় তোমার নেই—তুমি সমাজ এবং জাতিচ্যুত হবে না। ওর বিষয় আমি সব শুনেছি মহর্ষির কাছে। সেই জন্যেই তো বললাম—সে আমাদের পাল্টা ঘর—

শাক্য। কিন্তু—তা না হয় হোল। বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছ কি—ওর ভিতরে কি যেন একটা খেলা করে বেড়ায়! দিনে দিনে ওর কি অপরূপ জ্যোতিঃ ভরে উঠছে—

বেদ। তা তো আর কিছু আশ্চর্য্য নয়গো—সোমত্ত বয়েস—ওই বয়সে অমন হয়। তা বাপু, তুমি—আমার সত্যকামের সঙ্গে ব্যবস্থা কর। ও রকম বয়সে 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে' না—

শাক্য। না-না বেদবতী, তোমরা যা ভাবছো ও তা নয়—! দেখছো না অত উপোস তিয়েশ করেও ওর স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হোয়ে বরং দিনে দিনে রূপের জৌলুষ বাড়ছে!

বেদ। যৌবন এলে মেয়েমানুষের অমন হয়। দেখছ না, সদাই বিমর্ষ ভাব?—আমরা মেয়েমানুষ আমরা মেয়েমানুষের মনের কথা বুঝি।

শাক্য। না, তোমার কথা মেনে নিতে পারলাম না কিন্তু তোমরা তাহলে ওকে ঠিকমত চিনতে পারনি। ওর ভেতরে ঐকীশক্তির জ্যোতিঃ পড়েছে।

বেদ। থাম বাপু! আর বকিও না—তার চেয়ে মা-বাপ হারা মেয়েটার একটা হিল্লে করে দাও। মহর্ষির কথা রাখাও হবে—আর ওরও সুখে শান্তিতে জীবন

কাটবে। আর নেহাৎ যদি তোমার সন্দেহ জাগে তো ওর সঙ্গে কথা কয়েই দেখ না কেন!

শাক্য। বেশ! তাই হোক,—ওরে ও অনু—অনুরাধা? শোন তো মা—

(অনুরাধার প্রবেশ)

অনু। আমায় ডাকছ বাবা?

শাক্য। হ্যাঁ, মা—একবার তোর শবরীদি'কে ডেকে আনতো? বলবি বাবার কি বিশেষ দরকার আছে।

অনু। আচ্ছা বাবা—

(প্রস্থান)

শাক্য। এইবার ভাল করে যাচিয়ে নাও! আমি জানি ও মহর্ষি মাতঙ্গের মন্ত্রশিষ্যা—পালিতা, কন্যা স্থানীয়া! ওর ভিতর মহর্ষির শক্তি ওতোপ্রোতঃ ভাবে বিরাজ করছে—বেদবতী—পূর্ণভাবে বিরাজ করছে।

(অনুরাধার শবরীকে লইয়া প্রবেশ।)

বেদ। বেশ তো ওই তো ওরা এসে গেছে—

শবরী। আমায় ডেকেছেন কাকুমণি—

শাক্য। হ্যাঁ মা আমিই ডেকে পাঠিয়েছি, কিন্তু—তবে প্রয়োজনটা তোর কাকীমার—

বেদ। হ্যাঁ—মা তোর সঙ্গে একটা কথা আছে—

শবরী। বল না—

বেদ। দেখ মা—যদি তুই আমাকে তোর ঠিক গুরুজন বলেই জেনে থাকিস—তাহলে আমি যা বলব—এবং যা করতে যাব তা'তে তোর কোন বাধা থাকবে না তো?

শবরী। কি এমন কথা কাকীমা—যদি রাখবার মত হয় তা নিশ্চয়ই রাখব।

বেদ। মহর্ষি মাতঙ্গ মৃত্যুর পূর্বে তোকে দেখাশুনার ভার আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন—কাজেই তোর ভাল-মন্দ শুভাশুভ ওগুলোতো আমাদেরি দেখতে হবে মা—তাই বলছিলাম কি—

শবরী। থামলে কেন বল—

বেদ। বলছিলাম—কি—তুই আমার ঘরের বৌ হ' আমার সত্যকামের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে—তোদের দু'জনকে এককরে বেঁধে দিয়ে আমরা দুই বুড়োবুড়ি পরম নিশ্চিন্তে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে ভগবানের নাম করি। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে দু'জনে একই সঙ্গে খেলা করেছিস—একসঙ্গে বেড়িয়েছিস—দু'টিতে একঅঙ্গ একমন!—

শবরী। তুমি কি বোলছ কাকীমা,—এ যে অসম্ভব! কাকীমা তুমি আমাকে ক্ষমা কর—তোমার এ প্রস্তাব আমি রাখতে পারলাম না। আমি মনে মনে স্থির করেছি—বিয়ে আমি করব না—

বেদ। বিয়ে করবি না?—সে আবার কেমন কথা মা—কথায় বলে—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রাস্ত স্থবিরে কালে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা—"

স্ত্রীলোককে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করে থাকে—কোনকালেই মেয়েমানুষের স্বাধীনতা নেই—আর তুই বলিস্ কিনা বিয়ে করবি না—

শবরী। তাই তো মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করেছি কাকীমা—

বেদ। কি আমার ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশের বেটী এলোরে—বলি বিয়ে তো করবি না—বিয়ে না করে কি করবি শুনি? বলি, এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে, সংসারে বাস করে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ কাজ করে, বিয়ে না করে কি শান্তিটা পাবি? বুঝে দেখ মা—সংসার ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই-খান থেকেই মানুষের সব কিছু হয় সংসারকে ভালবেসে, সংসারের সকল কার্য নিঃস্বার্থ ভাবে করে—দেব-দ্বিজে, স্বামী-পুত্রে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা ঢেলে দিয়ে নিষ্কাম ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলেই তো তার পূর্ণতা আসে—এর বাড়া আর মেয়েমানুষের প্রত্যাশা কতটুকু? এর বাড়া জীবনে আর উদ্দেশ্য কত-টুকু থাকতে পারে মা—

শবরী। সবই মানি কাকীমা—তুমি যা বলছ সবই সত্য কিন্তু ও-সব আমার দ্বারা সম্ভব নয়! কাকীমা—যারা এই সংসারে সংসারী সেজে সমাজের, সংসারের কাজ করতে পারবে ও-সব তাদের জন্যে। আমার ও সব ভাল লাগে না—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আমি আমার অতিথির জন্য বসে বসে দিন গুনছি—কবে আসবে—কবে নারী জীবন তাঁর দর্শনে সফল হবে—

বেদ। অতিথি?—সে আবার কে? ও বুঝেছি!

তাহলে অন্য কাউকে আগে থাকতেই ভালবেসে মরেছ? তাই তো বলি—

শবরী। হ্যাঁ, ভালবেসেছি। তেমন ভাল কেউ কাউকে কোনদিন বাসতে পারে না। তুমিও যদি তাঁকে দেখতে ভাল না বেসে পারতে না!

বেদ। এঁ্যা—কি বললি? তোর যত বড় মুখ নয়, তত বড়—

শবরী। ঠিকই বলেছি কাকীমা তাঁর অনন্ত কোটী প্রভায়—রূপ ঝলমল করছে। ক্ষুদ্র জগতে তাঁর রূপ ধরে না—এই চর্ম্ম চক্ষু দিয়ে সে রূপ দর্শন করা যায় না। অন্তর্দৃষ্টি চাই অন্তর্দৃষ্টি চাই—

বেদ। যদি সেই রূপেই এত মজেছ তবে বিয়ে করব না বলে এতদিন এত ঢলানি কেন? বলি, আমার সত্যকামের চেয়েও সে রূপবান্ গুণবান্?

শবরী। কার সাথে কার তুলনা! "অযোধ্যার রঘুর সাথে বাঁশ বনের ঘুঘুর তুলনা"—কাকীমা তার রূপ গুণের তুলনা নেই সে অতুলনীয়—

বেদ। আমায় তাকে দেখাতে পারিস্—

শবরী। আমি নিজেই দেখিনি তা তোমায় দেখাব! শুধু জানি তিনি আসবেন আমার হৃদয় পরাণ ভরে দিয়ে আমার মনোমন্দির আলো করে বসবেন—সেই তাঁর আসার আশাতেই বসে বসে প্রতিটী প্রহর গুনছি। প্রত্যহ তাঁর জন্য ফুল তুলি, মালা গাঁথি, আর প্রত্যই সেই মালা অবেলায় শুকিয়ে যায়—জানি না কবে তিনি আসবেন—কবে তাঁর পূত চরণ স্পর্শে এই অপবিত্র দেহ মন পবিত্র হবে—

বেদ। কার কথা বলছিস্ শবরী—কে সে?

(শাক্য মুনি ঘাড় নাড়িতে ছিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিতে ছিলেন)

শবরী। কার কথা আর বলব কাকীমা—বলছি সেই পদ্মপলাশ লোচন শ্যামসুন্দর তনু যাঁর সেই নর নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের কথা—করুণায় যাঁর হৃদয় ভরা—তিনি আসবেন—তাই আমি তাঁর আসার আশায় দিন গুনছি—

বেদ। তিনি আসবেন এখানে? হা হতোঽস্মি। কোথায় চিত্রকূট পর্ব্বত আর কোথায় দণ্ডকারণ্য!

শবরী। হ্যাঁ, তিনি আসবেন—গুরুবাক্য মিথ্যা হবার নয়—তিনি আসবেন, তিনি আসবেন, তিনি আসবেন—

(প্রস্থান)

বেদ। তোকে চিনতে পারিনি শবরী—তুই ছাই-চাপা আগুন। আমার সকল ধৃষ্টতা ক্ষমা কর মা—ক্ষমা কর। তোকে আশীর্ব্বাদ করি—তুই তোর সাধনায় সফলতা লাভ কর—

শাক্য। কি হোল বেদবতী—আর আগুন নিয়ে খেলা করতে যাবে…হেঁ, হেঁ, হেঁ,

(পট পরিবর্ত্তন)

[পট পরিবর্ত্তিত হইলে দেখা গেল—আশ্রম মধ্যস্থ একটী তরুতলে একতারা হাতে উপবিষ্ট বৈরাগী।]

বৈরাগী। নাঃ! কোথাও যেন স্থির হয়ে থাকতে পারি না—কে যেন এই হৃদয়ের মধ্যে থেকে কি এক করুণ রাগিণী বাজিয়ে আমায় অস্থির করে তোলে?

বৈরাগী গাহিল

কে গো তুমি বাজাও বাঁশী
আমার হৃদয় মনে
আমি রইতে নারি সেই সুরে গো
তোমার প্রেমের টানে।
ঘর আমারে বাঁধলো না হায়
পথ সে শুধুই ডাকে
পথে গেলে ঘরের কথা
মনের মাঝে থাকে
বাহির ঘরে টানাটানি
মুক্তি আর মায়ার বাঁধনে।

হায়রে ঘর! হায়রে পথ! কোথায় পথ! কোথায় তার নিশানা! অনিশ্চিতের অন্ধকারে শুধুই টানাপোড়েন—।

শবরী। কিসের টানাপোড়েন বৈরাগী বাবা!

বৈরাগী। কিসের আর মা—এই জীবনের। পথকে আপন ভেবে ঘরের মায়া কাটিয়ে পথে পথে খুঁজে মরি পরশ পাথরের সন্ধানে। কোথায় সেই ধন! কেউ বলতে পারে না। তখনি ভাবি—তাইত বোধহয় ঘরকে ঘর করে থাকলে বোধহয় মিলত সেই ধন। মায়ায় এই হৃদয়টা তখন ছটফট করতে থাকে। আবার পরক্ষণেই সে ভাব কেটে গিয়ে ভাবি—পথ আমার ভাল। চোখের

জলে একতারা বাজিয়ে মনের আনন্দে দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে—

শবরী। বাবা মনকে বৈরাগী করে তুললেই তো সেই পথের নিশানা আপনি মিলে যায়।

বৈরাগী। যায় বৈ কি মা!—কিন্তু সবার ভাগ্যে কি তা মেলে। সবই তাঁর কৃপা। কৃপাসিন্ধু তিনি—

শবরী। তাই যদি হয় তবে আমার ইষ্ট-দর্শন মিলছে না কেন?

বৈরাগী। মিলবে মা তোমার ঠিকই মিলবে। তোমার মনের মধ্যে আসল যে বৈরাগী সে যে সর্বস্ব বিলিয়ে দৃঢ় হ'য়ে বসে আছে!

শবরী। কিন্তু কই! তাঁর দর্শন তো এখনো পেলাম না।

বৈরাগী। পাবে মা পাবে—আর তোমায় বেশীদিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি এসে গেছেন। তাঁর জন্য তোমার ভাণ্ডারে যা আছে সব কাণায় কাণায় ভরে রেখে দাও - ভরে রেখে দাও—

(বলিতে বলিতে চলিয়া গেল)

শবরী। আর কতদিনে তুমি আসবে প্রভু আর কত-দিনে তুমি আসবে! বাল্য থেকে যৌবন—সেও যেতে বসেছে। আর কতদিন তোমার আসার আশাপথ চেয়ে বসে থাকব।...কিন্তু ওগো প্রেমময় দয়াল রাম! তুমি কি না এসে থাকতে পার? রাত্রির পর দিন যেমন ভাবে আসে তুমিও ঠিক তেমন ভাবেই একদিন এসে দাঁড়াবে। ওই সন্ধ্যা হোয়ে এল—ঘর-ফেরা পাখীরা ঘরে ফিরছে, যাই তাঁর নাম গানে নিজেকে ডুবিয়ে দিই।

(পট পরিবর্তন)

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ, সময় ঊষা—নদীতে স্নান সমাপণ করিয়া সূর্য্যের স্তব গান গাহিতে গাহিতে বনপথ দিয়া তাপসগণ চলিয়া গেল।

(ওঁ জবাকুসুম...)

কিছুক্ষণ পরে একদল কাঠুরিয়া বালক মাথায় কাঠ ও হাতে কুঠার লইয়া গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

গীত

কাঠ কাটি মোরা—কাঠ কাটি
খট—খটা খট খট—
বুড় অশথ শাল পলাশের
ছিঁড়ি মাথার যত জট।
খেজুর পাতা তালের গুঁড়ি
তেঁতুল বাবুর বেজায় ভুঁড়ি
ওই যে হোথায় বসে আছেন
লাট বাবু যে বট।
এইসা জোরে কুড়ুল মেরে
ওদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরে
মাথায় করে নে যাই দূরে
আমরা চট পট।

(প্রস্থান)

* * *

(কোন আশ্রম মধ্য হইতে শ্রুত হইতেছে :
"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—"
চারিদিক শান্ত সৌম্য পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে। শবরী ঊষাকালে স্নান সমাপন করিয়া পবিত্র মনে ইষ্ট-দেবের নাম জপ করিতে করিতে পুষ্পচয়ন মানসে আশ্রম সমীপস্থ কাননে উপস্থিত হইল। হস্তস্থিত সাজীতে পুষ্প ভরিবার জন্য পুষ্প শাখা ধরিয়া :—)

শবরী। একি? একি আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপার! গাছে একটিও ফুল নেই—সবই ফলে পরিণত হ'য়ে গেছে। এমন তো কখনও দেখি নাই। যে গাছে হাত দিই সেই গাছেই শুধু ফল, ফল ছাড়া আজ একটিও ফুল নাই গাছে? —তাই তো?—তবে কি...তবে কি...আজ আমার এত দিনের প্রতীক্ষা—এতদিনের চোখের জল সার্থক হোয়ে উঠবে? এতদিনে কি এই অভাগিনীর হৃদয় মন্দিরে তোমার পূতচরণ ধ্বনির শিঞ্জিনী বাজবে?...যাই দেখি আশ্রমে গিয়ে - মন সেই দিকেই ছুটে চলেছে...

* * *

[মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রমমধ্যস্থ বেদিকায়
উপবিষ্ট শ্রীরাম লক্ষ্মণ]

রাম। ভাইরে লক্ষ্মণ! কি সুন্দর এই আশ্রম! যে

যুগ যুগ ধরে এই আশ্রম মহা পবিত্রতায় ভরা—কিন্তু শূন্য আশ্রম কারেই বা জিজ্ঞাসা করি—জানকীর কথা।

লক্ষ্মণ। তাই তো প্রভু! বৃথাই এই আশ্রমে আসা। কিন্তু কে যেন এদিকে আসছে—

শবরীর প্রবেশ

শবরী। কে, কে তোমরা—(বিহ্বল দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল তারপর শ্রীরামের চরণ প্রান্তে উপবেশন করিয়া) নবদূর্ব্বাদল কান্তি—তুমিই সেই আমার ইষ্টদেবতা শ্রীরাম! অঙ্গজ্যোতিতে দশদিক দীপ্ত! পিতা, পিতা গুরু গুরু, তোমার বাক্য আজ মহাসত্যে পরিণত হয়েছে! আজ এই পূত আশ্রম মহাপবিত্রতায় ভরে গেছে। আজ আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ নরদেবতা শ্রীরাম লক্ষণ—এই দীনহীনার আরাধ্য দেবতা এতদিন পরে কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন। কি আনন্দ! কি আনন্দ…আজ আমি কি দিয়ে পূজবো! কি কথায় তুষ্ট করব! সব যে তাল-গোল পাকিয়ে গেছে…

শ্রীরাম। কে তুমি মা‥ গৈরিকবসনা ব্রহ্মরূপিণী তপস্বিনী…

শবরী। আমি…আমি শবরী…মহাঋষি মাতঙ্গের পালিতা কন্যা…

শ্রীরাম। তুমিই শবরী? মহামুনি মহর্ষি মাতঙ্গের পালিতা কন্যা! মা তোমার মত সিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনী মায়ের আমার চরণতলে পড়ে থাকা শোভা পায় না! মা আমি তোমার সন্তান! মায়ের মত স্নেহাস্পর্শদানে তৃপ্ত কর মা—

শবরী। তুমি নারায়ণ! এক অংশে চারি অংশ নিয়ে এ ধরণীতে এসেছ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কামনায়। প্রভু, কতই চাতুরী জান! বোস, আগে আমার অশ্রুজলে তোমার চরণ ধুইয়ে দিই, আমার এত-দিনের বন্ধনহীন বেণী দিয়ে তোমার ওই রাঙা পদ মুছিয়ে দিই!

শ্রীরাম। থাক, থাক মা—তোমার ভক্তিতে আমি পরিতৃপ্ত।

শবরী। তা কি হয় প্রভু! আজ যে তোমরা আমার অতিথি গো? ওই দেখ প্রতিদিনের তোলা ফুলের মালা শুকিয়ে ঐখানে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে—

লক্ষ্মণ। মা—তোমার মত নিস্পৃহ, তোমার মত ত্যাগী, তোমার মত ব্রহ্ম শক্তি স্বরূপিণী নারী জগতে দুর্লভ! মা—

শবরী। কিন্তু…কিন্তু…আমার যে অনেক কথা ছিল বলবার! অনেক কথা—সব যেন গোলমাল হোয়ে গেল…

শ্রীরাম। মা—তুমি স্থির হও মা—স্থির হও—

শবরী। হ্যাঁ, স্থির হব…ওগো তুমি নররূপী নারায়ণ ভূভার হরণকারী সেই গোলক বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসেছ এই শোক তাপময় দুঃখব্যথা জর্জ্জরিত ধরণীতে। ক্লিষ্ট জীবকে উদ্ধার করবার জন্য রামনামের গুণে সবাই মুক্তি পাবে। তোমার শ্রীচরণ স্পর্শে অহল্যার পাষাণ মূর্ত্তি মুক্তি পেল—আচণ্ডালে দিলে প্রেম—কোলে টেনে নিলে বিদগ্ধ ধরিত্রীর যত পাপীতাপীকে—

শ্রীরাম। মা তোমার ব্যথা, অভিমান আমি বুঝেছি।

শবরী। বুঝেছ এই ক্ষুদ্রা নারীর অন্তরের কথা!

শ্রীরাম। তুমি তো ক্ষুদ্রা নও মা! তুমি যে মহাশক্তি রূপিণী মহীয়সী মাতা! স্বয়ং গায়ত্রী দেবী স্বেচ্ছায় যার অন্তরে বাহিরে বিরাজমান—সে তো তুচ্ছ নয়। সে যে মহাশক্তির আধার। ওঠ মা—এই আশ্রম—

শবরী। হ্যাঁ প্রভু! এই আশ্রম মহর্ষি মাতঙ্গের—গুরুদেব অতীব নিষ্ঠা সহকারে যাগযজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় সমগ্র জীবন আপনারই আসার অপেক্ষায় অতিবাহিত করে ব্রহ্মলোকে চলে গেছেন।

লক্ষ্মণ। পরম ব্রহ্মজ্ঞ এই মাতঙ্গ—

শবরী। তারপর যাবার পূর্ব্বে এই অজ্ঞান অবলা জ্ঞানহীনাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানোপদেশ দিয়ে চলে গেলেন: "শবরী, মা আমার, নররূপে নারায়ণ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন—কিন্তু আমার আর দর্শন হোল না—দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু বার্দ্ধক্য এসে যাবার নিশানা দিয়ে গেল। কিন্তু মা তুই অপেক্ষায় থাকবি—তিনি আসবেন। এই আশ্রমে তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ পড়ে পবিত্র হবে।" সেই থেকে তোমার আসার আশায় দিন গুণছি…

লক্ষ্মণ। মা তোমার একাগ্রতা, তোমার ত্যাগ, তোমার সাধনা, তোমার গুরুভক্তি জগতে সকল নারীর

আদর্শস্থানীয়া হোয়ে চিরদিন ধ্রুবতারার মত জল্ জল্ করবে।

শবরী। এস, আমার সাথে মহর্ষির আশ্রম পরিদর্শন করবে এস। ওই দেখ, গুরুদেবের যাবজ্জীবন তপঃ-প্রভাবে হিংস্র জন্তুগুলি হিংসা ত্যাগ করে একই সঙ্গে বাস করছে। এই পুষ্পরাজি যতদিন বৃক্ষে থাকে ততদিন মলিন গন্ধহীন হয় না। মহর্ষি যাগযজ্ঞে ও কঠোর তপস্যায় সারাজীবন অতিবাহিত করে গেলেন - আজ ওই চরণরেণু স্পর্শে এই আশ্রম পবিত্র হোল।

শ্রীরাম। পরম পবিত্রচিত্ত এই মহর্ষি মাতঙ্গ। মা আজ এই আশ্রমে এসে প্রাণে প্রভূত শান্তি পেলাম। কিন্তু মা—আমার এই বুকে তীব্র আগুন জ্বলছে। আমার প্রাণ প্রিয়তমা জানকীর শোক আমার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি সীতার অন্বেষণে এসেছিলাম, সীতা হারা হয়ে পাগলের মত ঘুরছি—সীতা বিহনে এ পৃথিবী শূন্য। বলতে পার মা—আমার জানকীর সন্ধান!

শবরী। পারি—লঙ্কার রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক ছলনা করে হরণ করে নিয়ে গিয়ে অশোক কাননে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাকে বাধা দিতে গিয়ে জটায়ু আজ পক্ষহীন হোয়ে দিন গুনছে তোমার সাক্ষাৎ কামনায়—তুমি জটায়ুর সঙ্গে দেখা করে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর সেখানে কপিরাজ সুগ্রীবের সহায়তায় সীতার উদ্ধার সাধন কর প্রভু—

শ্রীরাম। মা, তোমার কাছে সীতার সংবাদ জানতে পেরে পরম পরিতুষ্ট হলাম! তাহলে এবার আমি আসি।

শবরী। সে কি প্রভু! এখন তো তোমার যাওয়া হবে না। তুমি অতিথি—আগে অতিথির সেবার ব্যবস্থা করি—তারপর—

শ্রীরাম। মা—তোমার স্নেহ যত্নে আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছি—এখন আমার জানকীর উদ্ধারের নিমিত্ত মন বড় উতলা হোয়ে উঠেছে।

শবরী। ক্ষণেক অপেক্ষা কর—গুরুর কাছে আমি যে সত্যে আবদ্ধ আছি তা' আমাকে পালন করতে দাও। আজ কি আনন্দ কি তৃপ্তি—গুরুবাক্য শিরে ধরে আজ শবরী পরম পূর্ণতা লাভ করবে। ওগো, আজ অন্তর বাহির আমার প্রেমানন্দে একাকার হোয়ে গেছে। নর-রূপে নারায়ণ ভবসাগরের কাণ্ডারী ভবসাগর পার করবার জন্য আমার সম্মুখে! ওগো দুঃখহরণ! সকল সুখ দুঃখের ব্যথা বিরহের অতীত আজ শবরী জীবনে ও মরণে তোমার ধ্যানে তন্ময় হোয়ে গুরুবাক্য সত্যে পরিণত করতে প্রস্তুত! আজন্ম ব্রহ্মচারিণী আমি—একমাত্র রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম রাম মন্ত্র জপ, নিদ্রায় জাগরণে। আজ আমি সেই পূর্ণের শ্রীচরণকমলে নিজেকে সঁপে দিয়ে ধন্য। প্রভু, আমার চিতা প্রস্তুত করাই আছে। আর তুমি তারক ব্রহ্ম রাম—নররূপে নারায়ণ সম্মুখে—ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আসি—

(দেখা গেল শবরী আশ্রম মধ্যস্থ তরুবীথি, পশুপক্ষী এদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে)

শ্রীরাম। শবরী তুমি সাক্ষাৎ গায়ত্রী—তোমার তপঃ-প্রভায় সুদূর ব্রহ্মলোক পূর্ণ হয়ে গেছে—তুমি স্বয়ংপূর্ণা!

শবরী। ওরে আশ্রম নিবাসী তৃণলতা মৃগাদি অচল সচল সকলের কাছে আজ শবরী চিরজনমের মত বিদায় নিচ্ছে। মা বসুন্ধরা তোমার কোলে, তোমার বুকে কতই মা দৌরাত্ম্য করেছি—মাগো সর্ব্বংসহা আজ তোমায় শেষ প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলেছি সেই লোকে—আশীর্ব্বাদ কর মা যেন সফলতা লাভ করতে পারি।

(ফিরিয়া আসিল)

শবরী। প্রভু আমি প্রস্তুত!

শ্রীরাম। শবরী—আত্মহত্যা মহাপাপ। তুমি এ হতে নিরস্ত হও মা!

শবরী। এ তো আত্মহত্যা নয় প্রভু! এ সত্যরক্ষা! গুরুর আদেশ পালন করা।

শ্রীরাম। কিন্তু—

শবরী। কিন্তুর কিছু নাই প্রভু! তুমি নিজে কি করেছ? পিতৃসত্য পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে কেন এসেছ? রাজার দুলাল, নররূপে নারায়ণ কেন বনবাসী—চীরধারী—বল—বল প্রভু!

শ্রীরাম। স্বীকার করি সব। কিন্তু শবরী—

শবরী। না—না—না প্রভু! গুরুবাক্য আমায় রাখতেই হবে—তুমি ওতে বাধা দিও না—আমি পূর্ণানন্দে

পূর্ণের সম্মুখে নির্ভয়ে অমর ধামে চলে যাব—হাসতে হাসতে—

বৈরাগীর প্রবেশ

গীত :

বৈরাগী। জয়—পূর্ণের জয় পূর্ণের মাঝে লভ অভয়
জনম মরণ আলোছায়া মত কিসের শঙ্কা
কিসের ভয়।

শবরী। বৈরাগী, বৈরাগী, এসেছ, এসেছ আজ এই আশ্রমের ভার তোমার উপর দিলুম—এখন চলি—

(ধূ, ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল
চিতার মধ্যে শবরী ঝাঁপাইয়া পড়িল পলকে সব ভস্ম হইয়া গেল।)

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ। শবরী—শবরী—

(স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল)

শ্রীরাম। যাও মহীয়সী মাতা! তোমার মুক্ত আত্মা ব্রহ্মপদে বিলীন হোয়ে যাক।

ওই···ওই···দেখরে লক্ষ্মণ? শবরীর মুক্ত আত্মা মহর্ষি মাতঙ্গের চরণ বন্দনা করে ব্রহ্ম পদে বিলীন হোয়ে গেল। ধন্য—ধন্য শবরী, ধন্য তোমার সাধনা, ধন্য তোমার তপঃশক্তি! ধন্য ভারতভূমি তোমার বুকের উপর কত ধ্যানী, জ্ঞানী নিরলস সাধনা ও ত্যাগ, জ্ঞান ও প্রেম দিয়ে পূর্ণ করে গেল। শবরীও তাই পরিপূর্ণা, তাই তার মৃত্যু নেই—সে অমর। ওগো ভারতভূমি তোমার কোলে এমনি ধারা তপঃপ্রবাহ যুগ যুগ ধরে বয়ে যাক। শবরীর আদর্শ ভারত নারীর আদর্শ স্থানীয়া হউক আজ রবিদ্যুতি রবিতেই পুনর্মিলিত হোল সাগরের জল সাগরেই ফিরে গেল।

বৈরাগীর। মৃদু কণ্ঠের স্বর শোনা গেল

জয়—পূর্ণের জয়—

যবনিকা

বরং আকাশ দেখ

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

তোমার সংকীর্ণ সীমা স্বর্গ হ'তে
আমি আজ পলাতক :—অন্য এক দিগন্তের মায়া মুগ্ধ
দুপুরের
সোনালী স্বপন চোখে নিয়ে আমি আজো বেঁচে আছি,—
বুকে নাচে উদ্দাম বসন্ত হাওয়া—সুরেলা ফাগুন।

খুঁজেও পাবে না তুমি আমার ঠিকানা।
আমি আজ দেশান্তরী—! যাযাবরী জীবন মিছিলে
যদিও তোমার মুখ মাঝে মাঝে আমার নয়নে ভেসে
ওঠে;
মনের 'ইজেলে' যদিও তোমারও মূর্তি রূপায়িত,
তবু আমি স্মৃতিকে ভুলেই বাঁচতে চাই।

স্মৃতির কি অসহ্য যন্ত্রণা,
যৌবনে সে আগুন ধরায়।
তাই বলি যদিও আমাকে তুমি মনে মনে জপ করো
তাও ভুলে যাও। ভুলে যাও আমার ঠিকানা।
বিষণ্ণ দিনের শেষে সব ক্লান্তি ভুলে
বরং আকাশ দেখো,—দেখো শুধু নীল মেঘে
রঙের আল্পনা।

বিশ্ব বেষ্টন

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শুক্রবার ন'টা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে ডন এ্যাণ্ডারসনের সংগে চললাম স্যানফ্রানসিস্কো বিমান বন্দরের দিকে। পথে 'এঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের' অফিসে গিয়ে সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ ও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলাম। এঁদের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা বিশেষ প্রশংসনীয়। বিমান-বন্দরে পৌঁছে যথেষ্ট অবকাশ থাকায় ওখানে একটা হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজনও সেরে নিলাম। থরে থরে খাবার সাজানো ; 'বুফে' ডিনারের মত যা' পছন্দ যতো ইচ্ছে নিয়ে নাও। নিউ অরলিন্সের বিমান ছাড়বে বেলা একটা পঁয়ত্রিশে। এটি 'ন্যাশনাল এয়ার লাইন্সের' ধূম্রপুচ্ছ বিমান। ওড়ার পথে বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়ছিলো বিমানের ডানায়। কাংবোশেখীর দমকা হওয়ায় মধ্যে

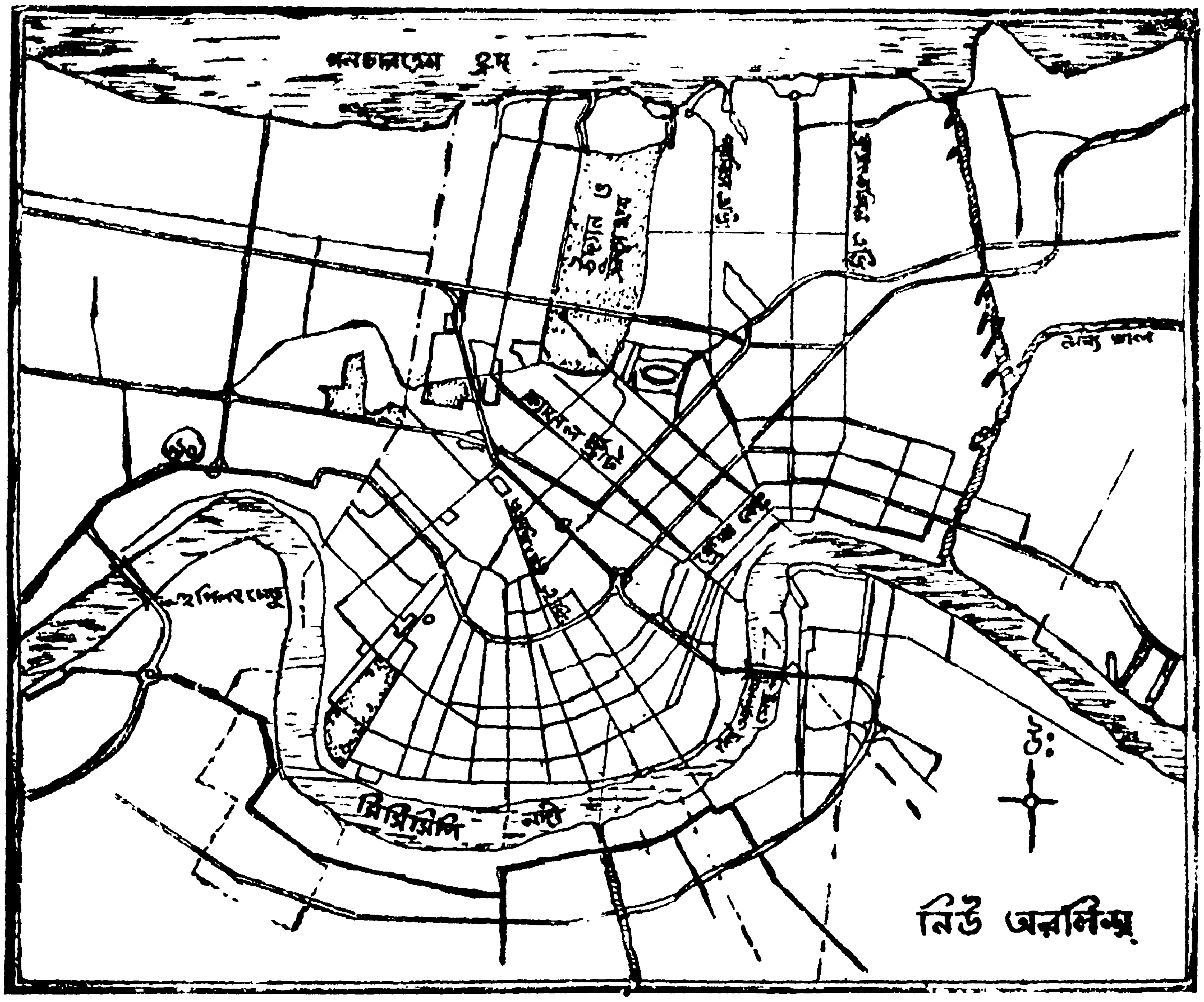

মিসিসিপির মোহনায়—নিউ অরলিন্স্

পড়ায় ঝাঁকুনি লাগছিল বিমানে এবং বিমান বিহারী-দের কোমরে বেল্ট বাঁধতে হয়েছিল, কাপ্তেনের নির্দেশ অনুযায়ী। এমন চললো বেশ কিছুক্ষণ। স্যানফ্রানসিস্কো ছেড়ে সোজা দক্ষিণ পূর্ব মুখে চললাম। ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের 'শিয়ারা নিবেদা' জঙ্গল পার হ'য়ে 'নিবেদা' রাষ্ট্রের 'ডেথভ্যালী-জাতীয় স্মৃতি মহোত্থানে'র উপর দিয়ে 'কলো রাডো' নদী পার হ'য়ে 'রকী' পর্বতমালা উল্লঙ্ঘন করে 'এ্যারিজোনা' ও 'নিউ মেক্সিকো' রাজ্য অতিক্রম করে 'টেক্সাসের' 'ডালাস' সহরের পাশ দিয়ে 'লুসিয়ানা' রাজ্যে প্রবেশ করলাম। মিসিসিপি নদীর মোহনার কাছটা স্যাঁতসেঁতে। নিম্নভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিমান। কোথাও নদীর জলধারা সর্পিল রেখায় এসে মিশেছে বৃহত্তর জলধারায়। কোথাও খাড়াই খাদের মধ্যে দিয়ে চলেছে ক্ষীণকায়া খরস্রোতা স্রোতস্বিনী। নিউ অরলিন্সে বিমান যখন নামলো তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি ঝরছে। বিমান বন্দরে আমায় নিতে আসার কথা ছিল লুসিয়ানা রাজ্যের স্বাস্থ্য এঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের প্রধান মিঃ ট্রিগারের। যেহেতু তাঁকে 'মায়ামী'তে জলকল সম্মেলনে যোগদিতে যেতে হ'য়েছিল, তাই তিনি নিজে আসতে পারেন নি। তবে বিমান বন্দরে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখেছিলেন। লেখা আছে, আমার 'জাং হোটেলে' থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কার সংগে কথা কইতে হবে জানিয়ে। বিমান বন্দর থেকে লিমোশিনে চ'ড়ে 'ক্যানাল' ষ্ট্রিটের ওপর 'জাং হোটেলে' চলে এলাম। অভ্যর্থক বেল-বয়কে ডেকে আমায় সাত তলায় রাস্তার ধারে ৭১৫ নং ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। রাতের বিছানা ভাড়া নিলে দশ ডলার তিরিশ সেন্ট (১০'৩০): ঘর এয়ারকণ্ডিশন করা, টি, ভি, সেট লাগানো। ঘরে রাখা টেলিফোনের আলাদা চার্জ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় কোথাও যাওয়া হ'ল না। কাছেই রুজভেল্ট হোটেলে খবর নিয়ে জানলাম যে বাসে করে নগর পরিক্রমা সকাল ন'টায় সুরু হয়। দু'তিন ঘণ্টা পর পর টুর লেগেই আছে।

নগর পরিক্রমার কর্মকর্তা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—

"রাতের নিউ অরলিন্স্ দেখতে যাবেন ?"

—ফিরবো কখন ?

—ফিরতে রাত একটা হবে।

বিখ্যাত নাইট ক্লাব, ফ্রেঞ্চ কলোনী, ইত্যাদি দেখিয়ে আনবো। নাইট ক্লাবে ঢুকতে কিন্তু পৃথক প্রবেশ মূল্য আছে আর পানীয় নিজের খরচে খেতে হবে।

—ধন্যবাদ ; অতরাত্রে ফেরার সুবিধা হবেনা। কাল সকালেই যাবো স্থির করলাম। আর তখনই টিকিট কাটবো। হোটেলে গিয়ে কয়েকটা চিঠি লিখলাম ও নিদ্রার অবকাশে টেকনিক্যাল ডাইরেক্টরী নিয়ে ভারতীয় নামের ভদ্রলোকের ঠিকানা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা টেলিফোন করলাম 'ডক্টর প্যাট'কে। তিনি ছিলেন না। রাত দশটা নাগাদ আবার টেলিফোন করলাম। তখনও তিনি নেই। শ্রীমতী টেলিফোন ধর ছিলেন। তাঁকে আমার পরিচয় ও আসার খবর দিতে বললাম।

নগর পরিক্রম :—

পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সেরে গেলাম 'রুজভেল্ট হোটেলে'। হেঁটে তিনচার মিনিটের পথ, গত রাত্রে পথে এক পানশালায় এক বৃহদাকার নিগ্রো-মিশ্রণের সাদা চামড়ার একটা ছেলেকে দারোয়ানী করতে দেখেছিলাম। আজও সে সেখানেই দাঁড়িয়ে। নগর পরিক্রমায় পাঁচরকম অঞ্চলে যাবার কর্মসূচী রয়েছে। আমি সকাল নটা থেকে এগারোটা আবার বেলা এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত দুটি টুর নিলাম। অর্থাৎ দুই ও তিন নম্বর টুর। দর্শনী লাগলো সাড়ে পাঁচ ডলার। এই ভ্রমণপর্ব পরিচালনা করেছেন দুজনে। একজন চালক অপরজন বক্তা। উভয়ে উভয়ের করণীয় কাজ বদলে নিতে পারেন। সকাল নটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত ক্যানাল ষ্ট্রীটের উপর পূর্ব্বাংশে ও বেলা এগারোটা পর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে দেখাবার কথা।

দ্বিতীয়াংশে যখন রুজভেল্ট হোটেলে বাস বদল করছি দেখা হ'ল প্রদীপ্ত বাগচীর সংগে। তিনি বোম্বাইএ এক পেট্রোল কোম্পানীর অফিসে কাজ করেন। বর্ত্তমানে প্রশিক্ষণে এসেছিল কোম্পানীর নিউইয়র্কের বড় অফিসে। সপ্তাহ প্রান্তিক ছুটি ও তার সংগে কয়েকদিন ছুটি ভোগ ক'রে নিউইয়র্ক থেকে নিউ অর্লিন্সে বেড়াতে এসেছেন। বনিতা ও দুহিতা এই অবকাশে গেছেন তাঁরা আত্মীয়ের

বাড়ী ক্যানাডার বৃহত্তম মহানগরী মন্টিয়ালে। সেখানে ১৯৬৭ সালে বিরাট এক সম্মিলন সুরু হ'য়েছে। বৈকালে পরিদর্শন পর্ব সেরে উনি আমার হোটেলে এলেন। তিনি অনেক সূত্রে আমাদের পরিচিত। উনি হ'লেন রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন সেক্রেটারী অমিয় চক্রবর্তীর মাসতুতো ভাই ও অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্রের ভাগ্নে। পরের দিন বৈকালে আমরা ঠিক করলাম যে নদীবক্ষে ষ্টীমার যোগে নৌবিহার ক'রে আসবো। উনি বিকাল আড়াইটার সময় টেলিফোনে খবর দেবেন—যাবেন কিনা।

সকাল দশটা নাগাদ ক্যানাল ষ্ট্রীটের মাঝখান দিয়ে যে বাস চলে তাতে চ'ড়ে বাসরুটের শেষ পর্য্যন্ত ঘুরে আসার বাসনা হ'ল। বাসে চড়ে সস্তায় নানা জায়গা ঘুরে আসা যায়। দ্রুতগামী ট্যাক্সীতে গেলে সব দেখা হ'য়ে ওঠেনা। ঐ ক্যানাল ষ্ট্রীটের মাঝখান দিয়ে আগে ট্রাম ছিল। আজ তা' তুলে দেওয়া হ'য়েছে। ক্যানাল ষ্ট্রীটের বাসে ৩০ সেন্ট দিয়ে ঐ রাস্তা ধ'রে চললাম।

উত্তর পশ্চিম মুখে গিয়ে কয়েকটা বড়ো রাস্তা ঘুরে বাস এসে থামলো 'পঞ্চারত্রেন হ্রদে'। এই হ্রদটি মিসিসিপি নদীর সংগে স্লুইস গেট দিয়ে যুক্ত। এই হ্রদের জল লবণাক্ত ও পানের অযোগ্য। ময়লা জল ফেলায় দূষিত হ'য়ে চলেছে ক্রমে ক্রমে। স্বাস্থ্য-দপ্তর থেকে পৌর প্রতিষ্ঠানকে দূষণ প্রতিরোধের জন্য চাপ দিচ্ছে। সহজে মনে রাখবার জন্য আমি বলি 'পাচ চার তিন হ্রদ'। এই হ্রদে শহরের বৃষ্টির জল পাম্প করে ফেলা হয়। হ্রদের ধারে আজ রবিবারে বেজায় ভীড়। কেউ এসেছে হাওয়া খেতে, কেউ জল কেলিতে, কেউ নৌকা চালাতে, কেউ ছিপে মাছ ধরতে, কেউ ডুবুরীর কাজ শিখতে, কেউ পিকনিক কার্পেট বিছিয়ে পিকনিক করতে। কেউ সলিল সাক্ষী ক'রে প্রেম করছে। আমি খানিকক্ষণ নানা ক্রিয়া কলাপ দেখে ফিরলাম তখন দুপুর পার হ'য়ে গেছে। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে একটু গা গড়িয়ে নেবার ইচ্ছে। হোটেলের কাউন্টারে চাবি নিতে একটি মেসেজ পেলাম যে পারঘাটায় বাগচী সাহেব হাজির থাকবেন। আহারাদির পর কিঞ্চিৎ শয়ন ও বিশ্রামের পর বাগচী সাহেবকে ধরবার চেষ্টা করলাম, পেলাম না। বাইরে বাস বা ট্যাক্সীর জন্য অপেক্ষা করছি। দেখি যে আমাদের হোটেল থেকে ভারতীয় ধাঁচে শাড়ী পরে দুটি বাচ্চা ও কর্তাকে নিয়ে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারখানা বুঝতে একটু সময় লাগলো। ওঁরাও আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। ওঁরা চলেছেন মিসিসিপি নদীতে পরিদর্শন জাহাজ President-এ চড়ে নৌভ্রমণে। উনি হ'লেন ডক্টর মেরহোত্রা, জয় ভগবান মেরহোত্রার আত্মীয়। লুসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সাহায্য নিয়ে সপরিবারে এসেছেন। প্রায় বছর খানেক আছেন। ছেলেরা ছোট ব'লে শিশুশিক্ষার সমস্যা নেই।

মিসিসিপির বুকে :—

বাগচী আগে থেকে এসে জাহাজে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। পাড় থেকে হাত নেড়ে যাবার ইঙ্গিত দিলাম। টিকিট কেটে জাহাজে চড়লাম। টিকিটের দাম মাথাপিছু তিন ডলার ক'রে। ডঃ মেরহোত্রা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে পোস্ট্ ডক্টরেট কাজ করতে এসেছেন লুসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আগামী আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে ফিরবেন। তাঁর কাছে সংবাদ পেলাম আর দুজন বাঙ্গালী ডক্টর এখানে কাজ করছেন, দুজনেরই পদবী সরকার। আমরা সবচেয়ে উঁচু ডেকটায় না গিয়ে তার তলার ডেকটায় রইলাম। বাচ্চা-দুটো মাকে বিরক্ত করতে লাগলো কেবল যা দেখে তাই খেতে চায়। তারা ঠাণ্ডা জল খাবে, কোকাকোলা খাবে, পাতলা আলুভাজা খাবে। ডঃ মেরহোত্রার (মালহোত্রা নয়) সংগে আলাপ করিয়ে দিলাম। দুজনেই উত্তর প্রদেশের লোক এমনকি শ্রীমতী বাগচীও। ইনি আগ্রার, উনি এলাহাবাদের। নদীর এক কূলেই বন্দর গড়ে উঠেছে। বিপরীত পাড়ে জলকলের নদীকূলের পাম্পিং স্টেশন ও মিলিটারী জাহাজ, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি রাখার সামরিক কাজেই অনেক দীর্ঘ কূল ব্যবহার করা হচ্ছে। সহর সংলগ্ন বন্দর থেকে কলা, তুলো, গম প্রভৃতি বিদেশে চালান হয়। তীব্র আওয়াজ ক'রে প্রেসিডেন্ট বন্দরের মায়া ত্যাগ করে পুব মুখে চললেন। নৌভ্রমণে দেখি নানা দেশের জাহাজ জেটিতে নঙ্গর ক'রে আছে। আমি উৎসুক চোখে দেখছিলাম 'জল জওহর' কি 'জল আজাদ' দেখতে পাই কিনা। একটি ভারতীয় জাহাজের সন্ধান মিললো, নাম

'বিল্বমঙ্গল'। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বহু যুদ্ধ জাহাজ ও ডুবো জাহাজ এখানে রাখা আছে সত্য তবে 'সেক্রোমেণ্টো' নদীতে যতো আছে তত বেশী নয়। নিউ অর্লিন্স্ হ'ল অতলান্তিক মহাসাগরের সংগে সংলগ্ন আর 'সেক্রোম্যাণ্টো' প্রশান্ত মহাসাগরের সংগে যুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের আশংকা প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকেই বেশী,অতলান্তিক থেকে নয়। তাই বোধহয় এই সামরিক ব্যবস্থা। 'কাইজারের' বিরাট কারখানা পর্যন্ত গিয়ে জাহাজ মোড় ঘুরে বিপরীত দিকে চলতে লাগলো। নিউ অরলিন্সের নবনির্মিত সেতুর তলা দিয়ে চললাম। কয়েকটি রঙিন ছবিও তোলা হ'ল। জাহাজে দ্রুত গম ভর্তি করার জন্য দীর্ঘ 'সাইলো' (Silo) খাড়া রয়েছে। মুটের মাথায় বস্তা দিয়ে বা ক্রেন দিয়ে তুলে ভর্তি করে না। Flexible pipe দিয়ে জাহাজের খোলে হুড় হুড় ক'রে ভর্তি ক'রে দেয়। নিউ অরলিনসের নতুন সেতুটি প্রসারণী সেতু হিসেবে হাওড়ার সেতুকে (রবীন্দ্রসেতু) এক ধাপ পেছিয়ে রেখে গেছে।

নিউ অরলিনসের সেতু ছ বছর হ'ল তৈরী হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই যান চলাচলের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম ক'রে গেছে। এটা দেখার আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আগামী সোমবার আমার কাজের জায়গা থেকে সেতুর কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন কোরব স্থির করলাম। এখান থেকে NASA (National Aeronautical & Space Administration) কারখানার বিরাট বাড়ী দেখা যায়। ফিরে আবার যখন জেটিতে এলাম তখন দেখি বহু লোক যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। সামনেই—এক বহুতল বাড়ী তৈরী হচ্ছে। যেহেতু এটি বিরাট নদীর ধারে তাই নদী ও হ্রদ থেকে বহু ঝিনুক পুড়িয়ে চুন বার করা হয়েছে। বহু ঝিনুক রেলের স্লিপারের তলায় দিয়ে ব্যালাষ্টের কাজ করানো হচ্ছে। যেহেতু সহরের মধ্যে মাল বহনের রেল-রাস্তা তাই দ্রুতগামী ট্রেন যায় না। অতএব ঝিনুকের ব্যালাষ্ট দিয়ে বেশ কাজ চলছে। কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি আজও।

নদীর ধারে বেশ খানিকক্ষণ বেড়িয়ে মেরহোত্রার দুই ছেলে পীযূষ ও পংকজকে নিয়ে মেরহোত্রা দম্পতি বাসে চলে গেলেন। তাঁকে বলেছিলাম সরকারদের খবর দিতে তাঁরা যেন আমায় টেলিফোন করেন। বাগচী ও আমি দু'জনে এলাম আমার 'জাং হোটেলে'র কামরায়। নানা পারিবারিক কথাবার্তা হ'ল। পরের দিন তিনি চলে যাবেন তাই তাঁকে নৈশ ভোজনে নেমন্তন্ন করলাম। তিনিও নিউইয়র্কে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্যে অগ্রিম নেমন্তন্ন ক'রে রাখলেন। নিউ ইয়র্কে যেতে আমার বহু দেরী। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়বো এই নিউ ইয়র্ক থেকেই।

নিগ্রো ডাক্তার বন্ধু :

রাতের ভোজ সেরে বিছানায় প্রায় শুয়ে পড়েছি আর T. V. Set খুলে ছবি দেখছি আর গান শুনছি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

কে অত রাত্রে ডাকে ? টেলিফোনের অপর প্রান্তের ভদ্রলোক বললেন,—"আমি ডাক্তার প্র্যাট। আমার স্ত্রী আপনার টেলিফোন ধরেছিলেন। আমি কাজে যাওয়ায় আপনার সঙ্গে সংযোগ ঘটেনি। আপনি কি ব্যস্ত আছেন ?"

—একটুও না।

—কেমন করে দেখা হবে ?

—নতুন জায়গা। আমি তো পথঘাট চিনি না।

—আমি যদি আটটা নটা নাগাদ আপনার এখানে পৌছোই।

—অতি উত্তম প্রস্তাব।

ওঁকেই আমি গতকাল সন্ধ্যায় ও আজ সকালে টেলিফোনে ডাকছিলাম আমার এখানে পৌছোবার খবর দিতে। 'লস্ এ্যানজেলিসে' থাকার সময় লস্ এ্যানজেলিস্ পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও আমার প্রদর্শক প্রেষ্টন ডিক্রোয়েট তার 4166 ফেয়ারওয়ে বুলিভার্ডের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পরিবারের সংগে আলাপ করিয়ে ও তাঁর ভগ্নীপতি নিউ অর্লিনসের ডাক্তার প্র্যাটকে আমার নিউ অর্লিনসে যাওয়ায় খবর দিয়ে আমায় তাঁর টেলিফোন নম্বরও টুকিয়ে দেন। আমি যে 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। পথের মায়ার বাঁধনে যে বন্দী হতে পারিনা। যাই হোক পরিচয়ের পরিধি যদি বিস্তৃত করাই যায় ; তো করাই হ'ক। তাতে ক্ষতি কি ? বিশেষ ক'রে আমার ঔৎসুক্য ছিল এই নিগ্রো ও আধা নিগ্রোদের মধ্যে গিয়ে কিছু জানি।

প্র্যাটদের ভেতর শ্বেত রঙের যে কিছু মিশ্রণ হ'য়েছে

তা বোঝা যায়—ত্বকের ঘোর কৃষ্ণত্ব কিছু ফিকে হওয়ায়। কিন্তু দেখলাম এই নিগ্রো সম্প্রদায়ে যদি শ্বেতকায় মেয়ে জন্মায় (রেওয়ার সাদা বাঘের মত অর্থাৎ সব সন্তানই সাদা বাঘ হয় না) তাদের একটু দম্ভ বেশী ও রূপের গরবও কিঞ্চিৎ উগ্র হয়। ডাঃ প্র্যাটের স্ত্রীকে দেখলে বোঝা যাবে না রংএ নিগ্রো ব'লে। কিন্তু পুরু ঠোঁট ও একটু অনুন্নত নাসায় ও চোখের মণিতে নিগ্রো বংশ ধারায় পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘণ্টাখানেক বাদে প্রায় রাত দশটায় আমার ঘরের দরজায় টোকা। দরজা খুলেই দেখি বেঁটে খাটো কালো কোলো চেহারার ভদ্রলোক বললেন—

—আমিই ডাঃ প্র্যাট।

—বড় প্রীত হ'লাম আপনার সংগে পরিচিত হ'য়ে।

—আমার স্ত্রীরও আমার সংগে আসার কথা ছিল আপনাকে তুলে নিতে। তিনি এখনও একটি 'বেবি সিটার' খোঁজ করতে পারেননি। তাই তিনি বাড়ীতে রয়ে গেলেন। আমি যাবার সময়ে একজন 'বেবি সিটার' সংগে নিয়ে যাবো। ছেলেদের কাছে তাকে বসিয়ে আমার স্ত্রী আমাদের সংগে আসবেন।

—ছেলেরা বুঝি খুব ছোট ? ওদের বড় দিদি নেই ?

—ওদের দিদি নেই। তবে ছেলেরা খুবই ছোট। একটি দুবছর, অপরজন পাঁচ বছরের। যদিও বড়োটি মেয়ে। তবে তার দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা হয়নি। আরও দশ বছর বাদে হয়তো নেবে। আপনার এখানে কেমন লাগছে ?

—ভালোই—খুবই ভালো।

—কতোদিন থাকবেন ?

—এক সপ্তাহের কর্মসূচী। শুক্রবার সন্ধ্যায় সপ্তাহের কাজ সেরে চ'লে যাবো মেক্সিকোয়।

—সেখানে কি আছে ?

—প্রাচীন মায়া সভ্যতার নিদর্শন। যেহেতু এতদূর এলাম, দক্ষিণে একটু ঘুরে গেলে ক্ষতি কি ?

—ঠিক কথাই।

যদি কোন হদিশ পাওয়া যায় এই আশায় জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার প্র্যাটকে—

—আপনি কখনও গেছেন সেখানে ?

—কখন না। এর নামই শুনিনি।

—ওঃ।

—কিছু যদি মনে না করেন আমার স্ত্রীকে তুলে নিতে যাবার পথে একটী 'বেবী সীটার'ও নিয়ে যাবো। ছোট ছেলেদের জিম্মা দিয়ে আমরা বেরুবো।

—ঠিক আছে। অতি আনন্দের সঙ্গে।

আমরা এলাম একটা বাড়ীর দরজায়। ষ্টিয়ারিং থেকে হাত ছেড়ে ডাকতে প্র্যাট নেমে গেল ও কয়েক মিনিট বাদে একটা লম্বা ছিপছিপে ছিটের জামা ও হাফ প্যান্ট পরা নিগ্রো তরুণীকে নিয়ে গাড়ীতে চড়ল। ওর গায়ের কালো রংয়ের গাঢ়ত্ব কয়েক পোঁচ কেটে গেছে। মেয়েটী পেছনে এসে বসল। গাড়ী আবার ছাড়লো। রাতের বেলায় এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে বিরাট কম্পাউণ্ড দেওয়া একটী একতলা বাড়ীর সামনে এসে বাড়ী থামলো। আমরা সবাই নেমে এলাম। আমায় বৈঠকখানায় বসিয়ে তার রঙিন টি, ভি, সেটটী চালিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে ডেকে আনতে গেল। প্রসাধন পর্বে চিরদিনই মেয়েদের একটু বেশী সময় লাগে। জানিনা পৌরাণিক যুগে ইন্দ্রসভায় নামার আগে স্বর্গের অপ্সরী উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকারও ঐ রকম দীর্ঘ সময় লাগতো কি না! তখন সময় ছিল প্রচুর। তা' নিয়ে মাথা কেউ ঘামাতো না। এই প্রথম আমি রঙিন টি, ভি, লোকের বাড়ী চলতে দেখলাম। এ পর্যন্ত আমার মার্কিন বন্ধুদের বাড়ীতে দেখিনি। যাই হোক রঙিন ছবি দেখছি—আর দেখছি দরজার দিকে কখন উদয় হবেন প্র্যাট দম্পতি। শ্রীমতী প্র্যাটকে দেখারও উৎকণ্ঠা রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ বসার পর শুধু এলেন ডাক্তার প্র্যাট।

বড় বিনয় প্রকাশ ক'রে বললেন—এখুনি আসছেন শ্রীমতী। আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর দুজনে এলেন। তার আগে উগ্র গন্ধের এক তরল ঘ্রাণ নাকে এসে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত এলেন উগ্র প্রসাধনে প্রদীপ্তা শ্রীমতী প্র্যাট। রং দুধে আলতা হ'লে কি হয় মুখের নিগ্রো গড়ন যায়নি। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। হাতখানা কিন্তু নিগ্রো ছেলেমেয়েদের মত কড় নয়।

গাড়ীতে উঠে প্র্যাট বললো, 'আমরা এখন আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে যাচ্ছি নিমন্ত্রণে'।

—অনাহুত হ'য়ে নিমন্ত্রণ বাড়ী যাওয়া কি ভাল দেখাবে ?

—নিমন্ত্রণ মানে খাওয়া দাওয়া নয়। রবিবার সবাই একজায়গায় মিলি। তবে সে জায়গা এমন যে সেখানে নিমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। আমাদেরও ওদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা যে এ সব লৌকিক আচরণের প্রয়োজনও নেই। গত সপ্তাহে আমাদের এখানে মিলনসভা ব'সেছিল। আজ ওদের বাড়ী।

—আমি তো ওদের চিনি না।

—তাতে কিছু এসে যাবে না। ওরা গেলে বেশী খুশী হবে। আমি টেলিফোনে ব'লে রেখে দিয়েছি যে আমার এক ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে আসতে পারি।

—তাই নাকি। তোমার দূরদর্শিতায় তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি না। তুমি সাইকিয়াট্রিষ্ট (psychiatrist) তো নও ?

—আমি প্রসূতি চিকিৎসক। যেখানে যাচ্ছি তারাও দু'পুরুষ প্রসূতি চিকিৎসক।

কথা বলতে বলতে আমরা তিনজনে নিগ্রো ডাক্তারের বাড়ী এলাম। বাইরে গাড়ী রেখে কম্পাউণ্ডের গেট খুলে একটু হেঁটে বাইরে কলিংবেলের বোতাম টিপতেই দরজা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খুলে গেল। হঠাৎ একটা কোলাহলের ও উগ্র ঘাম ও মদমেশা গন্ধের এক ঝলক বাইরে বেরিয়ে এল। আর বেরিয়ে এল খানিকটা গরম হাওয়া। ঘরে ঢুকে দেখি সাদা, কালো, গোলাপী ও পাঁশুটে রংয়ের নানা বয়সী ছেলেমেয়েতে ঘর ভরতি। বড় ডাইনিং টেবিলের চারদিকে সব চেয়ার ভরতি। সবার হাতেই খালি, ভর্তি ও আধা খালি গেলাস। অনেকে রয়েছেন দাঁড়িয়ে; কয়েকজন ব'সেছেন বেঁকে টেবিলের ওপর। আমরা যেতেই শ্রীমতী প্র্যাটকে পেয়েই সকলেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত। আমাদের সঙ্গে 'হাই' হাউ ডু ইউ ডু, ব'লে প্রশ্ন ও মৃদুহাসি বিনিময় হ'ল। আমরা একটি পাশের ঘরে এসে দু'জনে চেয়ারে বসলাম। আরও কয়েকজন ছিল। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। গৃহস্বামীকে ডেকে এনে পৃথকভাবে পরিচয় করিয়ে দিল। গৃহস্বামী গেলাস ভর্তি ক'রে এনে আপ্যায়িত করতে চাইলেন। তাকে বিনীতভাবে বললাম—অভ্যাস নেই। একটু উগ্রর বদলে একটু মধুর পানীয় আনান। সে চ'লে গিয়ে একগ্লাস 'কোক' নিয়ে এল। আর সামান্য টুকিটাকি খাবার যেমন পেটিস, স্যাণ্ডউইচ, কাজুবাদাম প্রভৃতি। আগেই ব'লে রেখেছিলাম যে রাত বারোটার পরই আমায় ফিরিয়ে দিতে হবে। রাত বারোটা বাজতেই আমার উসখুসুনি ও ঘড়ির দিকে নজর দিতে দেখে সে বলল 'চলো তোমায় 'ক্ষাং হোটেলে' পৌঁছে দিয়ে আসি।'

—ধন্যবাদ, বারোটা বেজেছে। কাল সকালে উঠতে হবে।

এবার আমরা দুজনে বেরিয়ে এলাম। শ্রীমতী প্র্যাটকে ও অন্যান্য ভদ্রলোক ও মহিলাদের শুভরাত্রি জানিয়ে এলাম। শ্রীমতী প্র্যাট রয়ে গেলেন। তিনি আবার শ্রীমতীকে নিতে ফিরে আসবেন। গাড়ী ক'রে এলাম প্রথমে ডঃ প্র্যাটের ডাক্তারি প্রাকটিস্ করার চেম্বারে। তার কাছেই ইয়েল লকের চাবি ছিল। তা দিয়ে ঘর খুলে আলো জ্বালিয়ে সমস্ত দেখালো। নিচের তলায় তিনজন ডাক্তার বসেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বন্ধু। বাড়ীটি সম্পূর্ণ হয় নি। এতে আরও দুতিন জন বসতে পারেন। প্রত্যেকেরই একটি রোগী দেখার ঘর, অপেক্ষা করার ঘর ও ডাক্তারের নিজের বসার ঘর। রোগী পরীক্ষার ঘরে পরীক্ষার পর রোগীকে ডাক্তারের ঘরে এসে তাকে ও তার অভিভাবকদের প্রেসক্রপসন লিখে বা উপদেশ দেওয়া হয়।

—এখানে ডাক্তারের 'ভিজিট' কত প্রশ্ন করায় ডাক্তার প্র্যাট আমায় বললেন—চেম্বারে এলে চার থেকে ছ' ডলার। রোগীর বাড়ীতে রোগী দেখতে গেলে ছ' থেকে দশ ডলার ভিজিট দিতে হয়। ডাক্তারের অভিজ্ঞতা ও নাম-ডাকের উপর ভিজিটের মূল্যেরও কিছু তারতম্য হয়, বিশেষ ক'রে বেশীর দিকে।

গত সেপ্টেম্বরের এক রাত্রে ভীষণ বৃষ্টিপাতে ও বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় এই নীচু অঞ্চল জলে ডুবে যায়। এতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এতে বহু ওষুধ ও আসবাব পত্র সব নষ্ট হ'য়ে যায়। বাড়ী ভাড়ার প্রসঙ্গ হ'তে কোন্টাতে লগ্নি করলে লাভ বেশী এ বিষয়ে কথা হ'তে লাগলো।

আমি বললাম—জায়গাটা দেখছি ভালই। এটা একটা বিজিনেস্ সেণ্টার। এখানে পাঁচ ছ'তলা বাড়ী করলে আমার মনে হয় আয় বেশী হবে। নীচের তলায় গ্যারেজ ও জলে নষ্ট হয় না এমন জিনিষের গুদাম, দো' তলায় চেম্বার আর তার উপরের তলাগুলোয় বাসের ব্যবস্থা হোটেল বা নার্সিংহোম প্রভৃতি হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে যদি একটা বাড়ীতে শুধু ডাক্তারী কমপ্লেক্স রাখা হয় তো নীচের তলায় ডাক্তারদের গ্যারেজ ও এম্বুলেন্স। দোতলা, তিন তলায় ডাক্তারদের চেম্বার চার তলায় নার্সিং হোম। তার উপরের তলায় ডাক্তার ও নার্সদের থাকার জায়গা। এ ব্যবস্থায় কোন বাড়ী থেকে কর্তাগিন্নী ছেলে মেয়েরা এসে একই জায়গায় রবীনের চোখ দেখিয়ে, পেগীর দাঁত দেখিয়ে, পোট্রিশিয়ার পেট দেখিয়ে ও কর্তার ব্লাড প্রেসার দেখিয়ে আসতে পারেন। তাতে স্থান হ'তে স্থানান্তরে ছুটোছুটির কোন হাঙ্গামা নেই।

—সত্যই এই পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সুন্দর। আমি আমার সহ-ব্যবসায়ী বন্ধু ডাক্তারদের বলব।

—তুমি এই বাড়ী তৈরি ব্যাপার সমবায়ের মাধ্যমেও করতে পার। লাভ হ'লে যৌথ লাভ; আর লোকসান হ'লে যৌথ লোকসান। তবে কষ্ট হবে কম, কেননা সবাইয়েরই তো কিছুনা কিছু ক্ষতি হবে। তবে এতে লোকসানের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এইসব আলোচনা করতে করতে আমি 'জাং হোটেলে'র দরজায় হাজির। ডাঃ প্র্যাটকে আমার অন্তরের শুভেচ্ছা ও শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় দিলাম। কবিডর দিয়ে ঢুকে 'লিফ্‌টে ওঠে পুরু গালচের ওপর দিয়ে খানিকটা হেঁটে আমার ঘরের দরজায় এসে হাজির। আসার সময় কাউণ্টার থেকে আমার ঘরের চাবিটা চেয়ে নিয়েছিলাম। চাবি দিয়ে দরজা খুলে, আলো জ্বেলে বিছানায় শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। কাপড় বদলাবার ফাঁকে টেলিভিশন সেটটা চালিয়ে দিলাম।

পৌর প্রতিষ্ঠানে :—

কর্মসূচী অনুযায়ী সোমবার সকাল আটটায় পৌর প্রতিষ্ঠানের অফিসে হাজির দিতে হবে। তারা এ সপ্তাহের চারদিন কি ব্যবস্থা করেন দেখা যাক। সকালে পৌছতে দেখি তখনও অফিস ভাল ক'রে বসেনি। জল ও ময়লা কলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেনারাল ই, এম, হিউস্ সাহেব আসেন সকাল ন'টায়। নবনির্মিত বহুতল বাড়ীতে নানা তলায় নানা দপ্তর আছে। সেগুলো এই অবকাশে ঘুরে দেখে এলাম। ওদের এখানে আহারেরই বা কোন্ জায়গা সেটাও ঘুরে দেখে এলাম। সামনে বিরাট প্রাঙ্গণ পার হ'লেই জাতীয় গ্রন্থাগার। ন'টায় হিউস্ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় পত্র দিয়ে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে দশপাতা এখানের জ্ঞাতব্য বিষয় জানবার প্রশ্নাবলী রয়েছে। তা' থেকে কয়েকটা জিজ্ঞাসা করতে তিনি খানিকটা বললেন ও তারপর তার এক সহকর্মীকে ডেকে পাঠিয়ে আমার কর্মসূচী অনুযায়ী পরিদর্শন ও পর্যাবেক্ষণের ও প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর-দানের ভার দিলেন। তিনি প্রথমেই অফিসের বিভিন্ন বিভাগে ও বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা এই চারদিন আমাকে তাঁদের কাজের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবারও ব্যবস্থা করলেন।

নিউ অর্লিনস্ সহর মিসিসিপির মোহনা থেকে প্রায় নব্বই মাইল উজানে গড়ে উঠেছে। মুখ্য জায়গাটি সরার মত। উপুড় করা সরা নয়। সমস্ত বর্ষার জল সহরের ভেতর জমা হবার কথা। কিন্তু চোদ্দ ফুট ব্যাসের পাইপ দিয়ে অনবরত জল পাম্প ক'রে 'পানচারত্রেন (Panchatrain) হ্রদে' ফেলে দেওয়া হয়। খালটির জলের লেভেল পার্শ্ববর্তী জমির লেভেলের চেয়ে উঁচুতে। বর্ষায় বা ইঁদুরের গর্তের দরুণ বাঁধ ভাঙ্গলেই বিপর্যয়! কয়েক বছর আগে বাঁধ উপচে জল এসে সারা সহরটিকে প্লাবিত করেছিল। তাই মাটির বাঁধের ভেতরের দিকের আরও মজবুত করা হয়। ইস্পাতের 'শীট পাইল' ঠুকে সার সার বসানো হ'য়েছে। বাঁধের জল যাতে উপচে না পড়ে তাই ইস্পাতের 'শীট পাইলের' মাথার দুপাশে কংক্রীটের টানা টোপর পরানো, কেননা মাটির বাঁধ একবার ওপচালে মাটি কেটে জলের তোড়ে বাঁধ ধ্বসে পড়ে যাবে। কূল উপছে নগরীর নিম্নাঞ্চলে জল প্লাবন সুরু হবে; মানুষ ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও প্রচুর হবে। পৃথিবীর মধ্যে এতবড় বর্ষার জল পাম্প করার ব্যবস্থা কোথাও নেই। বর্ষকাল ছাড়াও ভিজে মাটির চোঁয়ানি জল ড্রেন বেয়ে আসে ও তাকে অল্প বিস্তর পাম্প করতে হয়।

এখানের 'সুয়্যারেজ ও ওয়াটার বোর্ডের' জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ১৯৬৪ সালের মূলধন লগ্নীর জন্য ১৩০ লক্ষ ডলার ব্যয় বরাদ্দ ক'রেন। তার মধ্যে দেখা যায়—ময়লা জলের নল স্থাপনের ও ময়লা শোধনের জন্য পানীয় জলের আনুমানিক ব্যয়ের দ্বিগুণ রাখা হয়েছিল। তার বিশদ বিবরণ হ'ল :—

কোন্ খাতে	কত ডলার
পানীয় জল—	২,৮৭১,০০০
ময়লা জল নিষ্কাশন—	৭,৭৭৯,০০০
বর্ষার জল নিষ্কাশন—	২,২৩০,০০০
সাধারণ—	২,০৪৩,০০০
মোট—	১২,৯৩৩,০০০

এখানের জল সরবরাহ ও ব্যবহৃত জল নিষ্কাসনের সমস্যা জটিল হয়েছে নগরীর আয়তন বৃদ্ধির ফলে। নগরীর জল সরবরাহ ও ব্যবহৃত জল নিষ্কাসনের ক্রমোন্নতির মান জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে যথোপযুক্ত উন্নত হয়নি ও পঁয়ষট্টি বছর আগে স্থাপিত জল ও ময়লা জলের নল এত পুরাতন ও অচল হ'য়ে গেছে যে তাদের আশু বদলানোর প্রয়োজন। কিন্তু আর্থিক নানা বাধায় সেটা সম্ভব হয়নি। এখানের জনস্বাস্থ্য বিভাগের চাপ দেওয়ার ফলে এখন ময়লা পরিশোধনাগার স্থাপনের পর্ব চলেছে। আগে ময়লা জল হ্রদে ও অবশেষে নদীতে ফেলে নিষ্কৃতি লাভ হ'ত।

এখানের জলকল ক্যারলটন (Carralton) দেখতে গেলাম। এখানের জলকলের বিস্তারের পরিধি বিরাট ভাবে বাড়ানো হয়েছে। আগে যেখানে দিনে ১১·২ কোটী গেলন জল পরিশুদ্ধ হ'ত সেখানে এখন ২৩·২ কোটী গেলন জল পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে। নদীতীরস্থ পাম্পিং ষ্টেশনেরও দিনে ৯ কোটী গেলন থেকে ৩৩ কোটী গেলনে উন্নীত করা হয়েছে। কোলকাতায়ও পলতা থেকে ৯ কোটী গেলন পানীয় জল আসে চল্লিশ লক্ষেরও বেশী লোকের জন্য। নিউ অর্লিনস সহরে জনসংখ্যা সাত লক্ষ মাত্র।

নিউ অর্লিন্সের ব্যাপার একটু প্রাচীন। তাই কর আদায় সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না; ট্যাক্স মকুবও বেশ কিছু আছে এবং অনাদায়ী করও বেড়ে চলেছে। ১৯৬৪ সালের মোট জলের শতকরা ৫৮·৪৬ ভাগ জল বিক্রি করা হয় ও বাকী শতকরা ৪১·৫৪ ভাগের মধ্যে পৌর প্রতিষ্ঠান ও দাতব্যশালায় শতকরা ৫·৫৩ ভাগ, গন্ধ নালার জন্য শতকরা ৩·৬৬ ভাগ, বিনা মিটারে বাড়ীতে জল, রাস্তা ধোওয়া, ময়লা জল ও ড্রেন সাফ করার, বাজার ও জনসাধারণের ব্যবহারের ভবনগুলি ধৌত করা প্রভৃতির জন্য শতকরা ৩২·০৩ ভাগ জল ব্যবহারের অংশ ব'লে গণ্য হয়।

নিউ অরলিন্স্ সেতু :—

পরিদর্শন পর্ব সেরে সদ্য-পাতানো বন্ধুকে নিয়ে 'ওয়াটার ও সুয়েজ বোর্ডে'র অফিস থেকে টেলিফোন করলাম 'মিসিসিপি ব্রিজ অথরিটি'র একজিকিউটিভ ডাইরেক্টারকে। আগামী কাল তাঁর সংগে তাঁর সুবিধামত কোন সময়ে দেখা করা ও নিউ অর্লিন্স সেতু সম্বন্ধে কিছু আলাপ আলোচনা করা। একজিকিউটিভ ডিরেক্টর হ'লেন মিঃ চার্লস এম মেকলে। তিনি সকাল ন'টায় সাক্ষাতের সময় ঠিক করলেন। পরের দিন পরিদর্শন পর্ব সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সুরু করতে বললাম। মতলব যে এই পরিদর্শন শেষে আমরা 'মেকলে' সাহেবের কাছে যাতে সকাল ন'টা নাগাত পৌছতে পারি। সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ সকালবেলায় জাং হোটেল থেকে আমায় তুলে নিয়ে 'অর্লিন্স্ প্যারিসের সীমানার সন্নিকটে একটা ছোট 'ময়লা কলে' নিয়ে এলেন। এখানে শোধিত ময়লা জল মুখ নিকাসী খাল দিয়েই দুই প্যারিসের (অর্থাৎ মৌজা) সীমারেখা ধরে বোর্নী হ্রদে গিয়ে পড়ছে। পঞ্চারত্রেন হ্রদ বোর্নি হ্রদের সংগে সংযুক্ত। ভদ্রলোক আমার প্রতি জিনিষটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখালেন। সামান্য ছোট পরীক্ষাগার তাও দেখতে হবে। যেখানে ময়লা-শোধিত জল পড়ছে সেখানে লাল রং-এর শেওলা গজিয়েছে। কি রকম মাছ ঐ দূষিত জলে বেঁচে থাকতে পারে আলোচনা করতে লাগলো। তখন প্রায় সাড়ে আটটা। মেকলে সাহেবের কাছে ন'টায় পৌছান সম্ভব নয়। তাই এখান থেকে টেলিফোন ক'রে অনুরোধ জানালাম 'সকাল সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে পরিদর্শন ব্যাপারে এত দূরে আছি যে ন'টায় পৌছান সম্ভব হবে না। যদি এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌছাই—তখন কি আপনার সংগে দেখা করা সম্ভব হবে ?

তিনি সানন্দে রাজী হ'লেন। আমারও ভাবনা কাটল। ভয় ছিল যদি না দেখা করেন। পরে বুঝলাম তাঁরই আমার সংগে দেখা করার প্রয়োজনই বেশী। সে কথা পরে বলছি।

পরিদর্শন সেরে 'এডি' বলল ফেরার পথে তাঁর বাড়ী পড়ে। সেখানে আমায় একবার নিয়ে যাবেই। ও বাড়ীতে মেম সাহেবকে কিছু বলে যাবে।

নিরুপায় হ'য়ে বললাম—"চলো"।

ফাঁকায় বিরাট কম্পাউণ্ড দেওয়া কাঠের একতলা বাড়ী। সেখানে বর্তমান সভ্যতার সকল সামগ্রীই বিদ্যমান; অর্থাৎ 'রেফ্রিজারেটর', 'TV সেট' 'ওয়াশিং মেসিন, মোটরকার প্রভৃতি।

শ্রীমতীর সংগে আলাপ হ'ল। এর ছোট মেয়েটি কোলে ঝাঁপিয়ে এলো। কোন ভয়ডর নেই। ওদের বাড়ীতে যাবার জন্য পেড়াপিড়ি এড়িয়ে সামান্য মিষ্টিজল পান ক'রে চললাম মিসিসিপি ব্রিজ অথরিটির অফিসের দিকে। এখানে বেশী এক্সপ্রেস ওয়ে নেই। তাই যেতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগলো। আমরা যখন পৌঁছলাম এগারোটা বেজে গেছে। সেতু সম্বন্ধে আমার আগমনের কারণ তাঁকে বললাম। হাওড়া সেতুর তৃতীয়ত্বের সম্মানের স্থান অপহরণ করেছে এই নবনির্মিত নিউ অর্লিন্স সেতু। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান ক্যানাডার কুইবেক সেতু ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের 'ফোর্থএর সেতু'। আবার একটা নতুন সেতু ভাগীরথীর ওপর তৈরী করার পরিকল্পনা অনেকদিন যাবৎ চলেছে। (নতুন সেতুতে নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পরিকল্পনাও রয়েছে যা সদ্য ভবিষ্যতের সেতু নির্মাণের কাজে লাগতে পারে)।

—আপনার ব্রীজের প্রজেকট রিপোর্ট আছে?

উনি তাঁর মেয়ে সেক্রেটারিকে ডেকে একখণ্ড আনিয়ে বললেন—

—এতে চলবে?

আমি একটু নেড়ে চেড়ে সূচীপত্র ও নক্সাবলী দেখে বললাম—'খুব ভালই চলবে। তবে একটা অনুরোধ আমি নিত্য ঘুরে ঘুরে চলেছি; তাই এটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি দিয়ে দয়া করে পোষ্টাফিসের মারফৎ পাঠালে বাধিত হব। এয়ার মেলে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। আমার তো ফিরতে দু'মাসেরও বেশী হবে। সারফেস মেলই (Surface Mail) যথেষ্ট।

তিনি 'মিসিসিপি ব্রীজ অথরিটী'র নানা বৎসরের বার্ষিক বিবরণী দিলেন ও সংক্ষেপে এই পরিকল্পনার ইতিহাস বললেন:

জেফারসন প্যারিস ১৯৫২ সালে ২০শে জুন এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন Mississippi River Bridge Authority স্থাপনার জন্য। ৩রা জুলাই নিউ অর্লিন্স্ মহানগরীও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লুসিয়ানার রাজ্য সরকারের Act 7 অনুযায়ী 'সেতু ও খেয়া সংসদ' গঠিত হয় এবং রাজ্যপথ তহবিল নং ২-এর (State Hyway Fund No. 2) কিয়দংশ এই সংসদের হাতে দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালের ২ শে জানুয়ারী U. S. Engineers-এর নিকট সেতু নির্মাণে অনুমতি চাওয়া হয় এবং সেতুর দু' পাশের গঠনের ব্যয় নিউ অরলিন্স্ মহানগরী, রাজ্য সরকার ও সেতু সংস্থা ভাগাভাগি করে নিতে রাজী হন। সাড়ে ছ' কোটি ডলারের রেভেন্যু বণ্ড (Revenue Bond) বিক্রীও শুরু হয়।

১৯৫৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী সেতুস্তম্ভ নির্মাণের ভার ঠিকেদারকে দেওয়া হয়।

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ৯নং সেতুস্তম্ভ শেষ হয় ও অন্যান্য স্তম্ভের কাজও পূর্ণ বেগে চলতে থাকে।

১৯৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল সেতুর উদ্বোধন করা হয় কিন্তু যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত অংশে চালু থাকে। ঐ বছরের ১৮ই অক্টোবর সেতুটী আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া হয়।

আড়াই কোটী গাড়ী তিন বছর সাত মাসে এই সেতুর উপর দিয়ে পারাপার করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে পাঁচ বছরেই এই সেতুর যান চলাচল বহন ক্ষমতা অতিক্রম ক'রে গেছে। এ সম্বন্ধে (Non-Engineer) অ-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরের অভিমত হ'ল 'সেতু স্তম্ভের গায়ে স্তম্ভ তুলে সেতুটীকে আরো চওড়া কর।'

আমার তখন পঞ্চতন্ত্রের কীলোৎপাটী বানরের কথা মনে হ'ল—

"অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি"

আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম নেই। এইটিই চা

ব্যবস্থা—যার ফলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত না হয়ে—অত্যন্ত ব্যাহত হ'চ্ছে। তবে ওদের দেশে কচিৎ কখনও এ রকম ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের ওখানে এইটিই চালু ব্যবস্থা।

আমি তাঁকে বললাম, 'প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি একটি অসম্ভব প্রস্তাব!' এঁরা বিখ্যাত উপদেষ্টা এসিলিয়ারের উপদেশ নিচ্ছে তারা সেতুস্তম্ভের ভারবাহিকা ক্ষমতা পরীক্ষা ক'রে দুপাশের বর্তমান সেতুস্তম্ভ থেকে 'ভার' ঝুলিয়ে সেতু চওড়া করা সম্ভব কিনা বিচার ক'রে দেখছেন।

সেতুটির মধ্যিখানের উত্তান (Span) হ'ল ১৫৭৫ ফুট। নিউ অর্লিনসের দিকে প্রসারণী বাহু হ'ল ৮৫০ ফুট ও পশ্চিমকূলের বাহুর দৈর্ঘ্য হ'ল ৫৯১ ফুট। সেতুটি প্রস্থ মাত্র ৫২ ফুট। ডান ও বাঁ পাশ মিলিয়ে মোট পাঁচটি যান চলাচলের ফ্যালি। মধ্যের ফালিটী সকাল বিকেল গাড়ী চলাচলের চাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিকে ব্যবহৃত হবার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ সকালে শহরের দিকে যাবার তিনটী লেন ও সহর থেকে আসার দু'টী। বৈকালে সহর থেকে ফেরার সময়ে তিনটী লেন ব্যবহৃত হয় এবং সহরে যাবার দুটী।

আমি 'মেকলে' সাহেবকে বললাম, 'এত নতুন সেতু যখন, একটু কম চওড়া হ'য়ে গেছে ব'লে মনে হয় না?'

—এ ব্যবস্থা আমরা আসবার আগেই হ'য়েছে। আমার ওপর সেতুটি এখন কোন উপায়ে আরও চওড়া করানোর ভার। সেই কাজই বর্তমান চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সেতুর ওপর দিয়ে একসপ্রেস ওয়ে চ'লে গেছে। এখানে উপশুল্ক (Toll) আদায় করার একদিকেই টোল প্লাজা রাখা হ'য়েছে। মোটর গাড়ী পার হবার জন্য—আগে ছিল ৩৫ সেন্ট, পরে কমিয়ে ৩০ সেন্ট করা হয়। ১৯৬৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যপাল এই উপশুল্ক একেবারে উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। পৌরপতির সংগে এই বিষয়ে মতদ্বৈধ হয়। মেয়র উপশুল্ক তুলে দেবার বিপক্ষে। রাজ্যপাল বলেন—'মেয়রকে তো নামতে হচ্ছে না আসন্ন নির্বাচনে। এদিকে আমায় জনতার বিরুদ্ধ-সুরের সম্মুখীন হ'তে হবে।'

যাই হ'ক আমায় তাঁর নতুনপরিকল্পনার কথা বললেন। এখানে মিসিসিপি সেতুর জন্য জনকয়েক নিজস্ব পুলিস রাখা হ'য়েছে। সেতু ও সেতুর উত্তর অংশের উপর সম্পূর্ণ খবরদারী করার ভার এই আরক্ষ বাহিনীর। মাথায় লাল আলো দেয়া ঘোর কালো রংয়ের আরক্ষবাহিনীর বিশেষ গাড়ী আছে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে চলে। তাঁর ইচ্ছা সেতুর মাথায় টেলিভিসনের প্রেরক যন্ত্র বসানো। একজিকিউটিভ ডিরেক্টর তিনি ঘরে বসে টেলিভিশনের যন্ত্রে সেতুর ওপর ক্রিয়াকলাপ যখন ইচ্ছে অবলোকন করতে পারবেন। সেটি পরিচালক পরিষদ অর্থাভাবের জন্য আপাততঃ নামঞ্জুর করেছেন। তিনি আমায় সেতুর ওপর নিয়ে ইস্পাতের মই বেয়ে সেতুস্তম্ভের ওপর নামাবেন ও গঠন বৈশিষ্ট্য দেখাবেনই।

আমরা এ-গাড়ী না ও-গাড়ী ক'রে অবশেষে পুলিশের গাড়ীতেই গেলাম। সেখানে মাঝসেতুতে গিয়ে পুলিশ বাহিরে বেরিয়ে হাত দেখিয়ে যান চলাচল স্থগিত করার পর আমরা রাস্তা পার হ'য়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে তলার গঠনবৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখলাম। জলের ওপর থেকে অনেক উঁচুতে তোলা এই সেতু। হাওড়ায় রবীন্দ্র সেতুর মত মাঝখানটা তোলা নয়, সম্পূর্ণ সমভূমিক।

সকালের পরিদর্শন শেষে অফিসে ফিরে এলাম। তখন কফি এল।

ভারতে মেকেলে পরিবার :

এবার তাঁর ব্যক্তিগত কথা। তিনি বললেন—'তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও কানাডায় মানুষ হ'য়েছেন ও পরে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে কাজের জন্য এসেছেন। ওঁর বাপ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন এবং ওঁর ঠাকুর্দা বাংলা সরকারের অধীনে সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি কলকাতায় মারা যান ও ক'লকাতার কোন এক গোরস্থানে তাঁকে গোর দেওয়া হয়। তাঁর ইচ্ছে জানা ক'লকাতায় গোরটি কোথায় আছে।'

—'সমাধি পাথরের ওপর স্মরণ কবিতায় টুকরো সংগ্রহ করতে কলিকাতার নানা গোরস্থানে আমি কয়েকবার গেছি। আমার বিশ্বাস আমি তোমার ঠাকুরদার সমাধি বের করতে পারবো।'

—যদি পার তো বিশেষ বাধিত হবো। এখানের যত

সেতু সংক্রান্ত রিপোর্ট আছে তা তোমায় ডাকে পাঠিয়ে দেবো।

বিশ্ববেষ্টন সেরে আমি ক'লকাতায় ফিরে প্রথমে গেলাম জাতীয় গ্রন্থাগারে। সেখানে তেমন সুবিধে হ'ল না। এলাম এসিয়াটিক সোসাইটী গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারিক শিবদাস চৌধুরী আমায় কয়েকটা সন্ধান দিলেন। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পেয়ে গেলাম। সার্কুলার রোডের গোরস্থানে মেকলে সাহেব চির সমাহিত। Bengal Past and Present বইয়ে ঐ সমাধিগুলির নক্সা দেওয়া একটি বিবরণী আছে এবং কে কত নম্বর গোরে চিরনিদ্রিত আছে তারও সংবাদ লিপিবদ্ধ। কলকাতায় ফিরে একদিন অফিসের কাজের শেষে ঐ গোরস্থানে গেলাম। সন্ধ্যে হ'য়ে যাওয়ায় সন্ধানের সুবিধে হ'ল না। পরের দিন বেলা থাকতে গিয়ে পৌর প্রতিষ্ঠানের গোরস্থানের তদারককারীরও সন্ধান মিললো না, তবে ঐ থানের মালী আমায় নিয়ে চললো। নক্সার নকল থেকে আমি নিজেই যথাস্থানে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি গোরের পাশে জংগল গজিয়ে গেছে। জংগলে ও নোংরা ময়লায় গোটা গোরটাই ঢেকে গেছে। মালী গোর সাফা করে দিল। তখন আমি কয়েকটি ছবি নিলাম। যা স্মারকলিপিতে লেখা ছিল চিঠিতে তাকে তা লিখে পাঠালাম। মালী আর্জি পেশ কোরল যে একটা মাসোহারা বন্দোবস্ত করতে; তাহ'লে ওরা গোরটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

আমি শুনলাম, কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না। ফিরে এসে পরের দিন মেকলে সাহেবকে একখানা চিঠি লিখি। তিনিও বিশেষ পুলকিত হ'য়ে তার একটা জবাব দেন। তার প্রয়োজনীয় অংশের নকল হ'ল :—

Dear Mr. Chatterjee :

It was indeed a pleasure to have had the opportunity to meet you and to discuss with you the chareteristics of the Greater New Orleans Mississippi River Bridge and to provide you with data which you thought might be helpful to you. I am glad to learn that the data arrived finally in Calcutta.

I am greatly indebted to you for the time and trouble which you took to locate my grandfather's grave in Calcutta and to send me the information contained in your letter as well as the two photographs of the grave. It is the first concrete information which has come to me or to my sisters regarding this grave and it is of course extremely gratifying to me to find that it is so well preserved, even though at times overgrown with weeds. Thank you so much for clearing the weeds and having the grave plot put in such excellent shape. My grandfather as you can see was one of the many Britishers who devoted their adult lives, and many of whom sacrificed a long life in order to serve the people of India. I am of course very proud of the fact that he distinguished himself and was awarded the CIE. I hope one day that I might visit his grave and if I do so that I may find you in residence in Calcutta at the time.

I have had negatives made of the two photographs and have had copies produced which I am sending to my cousins who live in Duolin, Ireland, and to my two sisters in order that they too might share in the knowledge that their grandfather's grave has been located and has been marked.

I expect to be in Rome from Septmber 25th through September 29th in attendance at the Convention of the International Bridge, Tunnel & Turnpike Association and hope that if you find it convenient to attend the Convention that you will look me up so that we might have an opportunity to again meet.

Thanks again for your wonderful gift to me of the photographs and of the informa-

tion contained in your letter. If I can be of further help to you in regard to data concerning our bridge I am sure you will feel free to call on me to provide it.

With kind regards, I am

Sinceriy yours,
Charles S. Macaulay

ইতিহাস :—

নিউ অর্‌লিনসকে কেউ বলে, 'আমেরিকায় প্যারিস'। কেউ বলে 'জলবেষ্টিত বাঁধ দিয়ে ঘেরা মরূদ্যান' যার ৩৬৫ বর্গমাইল বিস্তৃতির মধ্যে ১৯৯ বর্গমাইল হ'ল জল। একে বলা হয় 'Crescent নগরী'। মিসিসিপির হাঁসুলীবাঁকের মধ্যে এই নক্র-শার্দূলসেবিত এক মহা নগরী। এটি ২৯° ৫৬ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°৮৪ পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানে গড় তাপমাত্রা ৬৯°৫ ° F.

প্রথম স্পেনীয় নৌ অভিযাত্রী দল যে মিসিসিপির মোহনায় এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওয়ালসী মুলারের (Wallasee Muller) ১৫০৮ সাল প্রকাশিত মানচিত্র থেকে। হয়তো ১৫০২ সালে আঁকা ক্যানটিনো (Cantino)-র নক্সা থেকে কিছুটা গ্রহণ করা হয়েছিল।

সাদা চামড়ার লোক যিনি মিসিসিপি প্রথম দর্শন করেন তিনি হলেন ডি. সোটো (De Soto) সে ঘটনা ঘটে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে। মার্ক টোয়ায়েন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বিবরণ দিয়েছেন। তাঁরই বই থেকে একটুখানি তুলে দিই।

When De Soto stood on the banks of the Missisippi, it was still two years befcr Luther's death, eleven years before the burning of Serventes, thirty years before the St. Barth lomew's slaughter ; RABELAIS was not yet published ; Don Quixote was not yet written ; Shakespeare was not yet born ; a hundred long years must still elapse before Englishmen would hear the name of Oliver Cromwell.

ইতিহাসে লেখা আছে স্পেনীয় রাজকীয় অভিযানে 'ডি ভাসা' মিসিসিপির মোহনা পার হ'য়ে মেক্সিকোর দিকে যান। মিসিসিপির সাগর সংগমের কাছে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই 'লা সালের' অধিনায়কত্বে এক নৌ অভিযাত্রী দল পাঠান। লা সালের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ও তিনি স্থলপথে কানাডা যাবার সময় তার এক সহযাত্রী কর্তৃক পথে নিহত হন। নানা অভিযাত্রী ও ঔপনিবেশিক দলের চেষ্টার পর ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব আর্লিন্‌সের নামে এই নতুন উপনিবেশ 'La Nowvella Orlens—স্থাপিত হয়। আজ যে আসল ফ্রেঞ্চ কোয়াটার ব'লে সুপ্রসিদ্ধ সেটিই আদি উপনিবেশ অঞ্চল।

সহরে জনসংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগলো। সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী ছাড়াও দাস, বণিক ও নাবিক ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সহরটির উন্নতি হ'তে লাগল। দাসেরা এলো আফ্রিকা ও ফরাসী পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ থেকে, জার্মানী থেকে। এরা সাধারণতঃ রোমান ক্যাথলিক ও কুইবেকের বিপশের অধীনে এ-অঞ্চলের ধর্মযাজনা পরিচালিত হ'ত। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'উরসুশান' ধর্ম যাজকেরা স্ত্রী শিক্ষা ও আর্তের সেবার জন্য 'উরসুলীন কনভেণ্ট' খুললেন। ওখানে মেয়েদের দুর্ভিক্ষ মেটাতে কুইবেক থেকে ধর্মযাজক মহোদয়রা ফরাসী তরুণীদের এখানে বধূ হ'তে পাঠালেন। এদের বলা হ'ত "filles a la Cassette"। আসার সময়ে ফরাসী সরকার এদের প্রত্যেককে এক সিন্দুক জামা-কাপড় উপঢৌকন দেন। তাই এই নাম। যদিও প্রথমত এদের এখানে ভালো লাগেনি অদ্ভুততর স্থানীয় খাদ্যের জন্য। প্রধান খাদ্য এখানে ছিল ভুট্টা। এই সুন্দরী মেয়েরা পাউরুটি ও কেক খেয়ে মানুষ। তাদের এ ভালো লাগবে কেন? তবে মানুষেরা সহনশীলতায় সবই সয়ে যায়। এখন এখানের আহার সারা আমেরিকার এক রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য হিসেবে গণ্য হ'য়েছে।

পঞ্চদশ লুই ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের 'ফন টেনব্লু'র সন্ধি ও ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের সন্ধি অনুযায়ী 'নিউ অরলিন্‌স্‌' ও 'লুসিয়ানায়' (Lusiana) কিয়দংশ স্পেনকে দেওয়া হয়। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এ সংবাদ ফরাসী রাষ্ট্র কর্মচারীরা পান। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ডন আউটোনিও উলোয়া' Don Antonio Ulloa স্পেনীয় কমিশনার হিসেবে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দু'বছর বাদে জনগণ 'উলোয়ায়' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তার

অপসারণ দাবী করে। ফলে উলোয়াকে নগরী ত্যাগ করে তীরের তরীতে আশ্রয় নিতে হয়। রাতে কে যেন নোঙর খুলে দেওয়ায় সে তরণী মেক্সিকো উপসাগরের দিকে চলে যায়। তার আর সন্ধান কেউ রাখেনি। মাত্র দুবছর এই অঞ্চল বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত থাকে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্ট ও রেলীর অধিনায়কত্বে চল্লিশটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে উপস্থিতির ফলে স্পেনীয় জেনারেল এই অঞ্চল স্পেনের শাসনে আনতে সমর্থ হন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর স্পেনীয় শাসন ক্রমে শিথিল হ'য়ে পড়ে।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট অগ্নিকাণ্ডে নগরপ্রায় দগ্ধ হ'য়ে যায়।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে স্যান্ ইফডিফুশো (San Ifde Fouso) সন্ধি অনুযায়ী লুসীয়ানা ফরাসীর অধীনে আসে। অধিবাসীর কেউই এ সংবাদ জানলো না যতদিন না ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে 'পিয়ারী লওসা' (Pierre Laussat) ঔপনিবেশিক অধিকর্তা হ'য়ে আসেন। জনগণ স্পেনীয় শাসনের পরিবর্তে ফরাসী শাসন শুভ্র মনে গ্রহণ করতে পারেনি—যদিও এখানের পুরানো অধিবাসী ফরাসী দেশীয়।

প্রাচীন 'লুসিয়ানা' অঞ্চল বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সতেরোটি রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কেন্টাকী' যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হ'ল তখন 'কেনটাকী'য় জোৎদার ও আড়ৎদারেরা বায়না ধরলেন, যদি 'নিউ অরলিনস্' বন্দরের উপর, বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যথেচ্ছ গতায়াত না থাকে তা' হ'লে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধ ছিন্ন করবেন। তখন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন্ নেপোলিয়ানের দরবারে দূত পাঠালেন, নিউ অর্লিনস বন্দরটী বিক্রী করার জন্য যাতে যুক্তরাষ্ট্র কিনে নিতে পারেন। সেখান থেকে খবর এল পশ্চিম আমেরিকার মূল্য কিছুই নেই—নিউ অর্লিনস্ ছাড়া—"Without New Orleans all of western America is valuless to us." তখন দেড় কোটি ডলারে সম্পূর্ণ লুশিয়ানা অঞ্চল নিউ অর্লিন্স্ সমেত কিনে নেওয়া হল। মিসিসিপি উপত্যকার 'নিউ অর্লিনস্' হ'ল তোরণ। এই উপত্যকার উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার সারা বিশ্বে রপ্তানী করা হয় এবং এখানে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় মাল এরই জলপথে মুখ্যত: আনা হয়।

সহরের 'ক্রীয়োল' (Creole) অংশটি আমেরিকান রাজ্যপাল ক্লেয়ারকের্নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়, কেননা ভদ্রলোক এ অঞ্চলের বিবরণ, এ অঞ্চলের ভাষা, ও এ অঞ্চলের লোকদের কিছুই জানেন না। উপরন্তু তিনি সদাসর্বদা আমেরিকান পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন, তাদের উপদেশে সব কাজ করতেন ও তাদেরই প্রায় সমস্ত সরকারী কাজে ঢুকিয়ে দিতেন। নতুন উপশুল্ক প্রয়োগ ও ইংরাজিকে রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে চালানোর জন্য এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়; ফলে সংঘর্ষ ও মাঝে মাঝে খণ্ড যুদ্ধও সুরু হয়। অবশেষে এরা মার্কিন ইউনিয়নের (Markin Union) মধ্যে যেতে চায় এবং স্থির হয় তারা নিজেদের 'রাজ্যপাল' নিজেরাই নির্বাচিত করতে পারবে।

'নিউ অরলিনস্' তখন অতি ক্ষুদ্র সহর—নদীর ধারে 'ফোর্ট সেন্ট চার্লস' থেকে 'ফোর্ট সেন্ট লুই' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই অঞ্চলে মোট বার চোদ্দশো বাড়ী ছিল। সেখানে তখন দশ হাজার লোক বসবাস করতো: তার মধ্যে চার হাজার শ্বেতকায়, আড়াই হাজার স্বাধীন নিগ্রো ও বাকী ক্রীতদাস সম্প্রদায়।

বন্দরের সুবিধা থাকায় এখানে শিল্প গ'ড়ে উঠতে সুরু করে। সেই সময় দুটী কাপড়ের কল ও একটী চিনির কল স্থাপিত হয়। আমেরিকানদের প্রচেষ্টায় নগরীর উন্নতি পর্ব সুরু হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এটী করপোরেশন ভুক্ত হয় ও নগরীর সীমানাও নির্ধারিত হয়। পৌর সরকারের অধীনে তখন একজন মেয়র, একজন কেরাণী, একজন কোষাধ্যক্ষ ও চোদ্দজন অলডার ম্যান। ঐ বছরেই College of New Orleans (পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত) স্থাপিত হয়।

কয়েক বছরের মধ্যে নগরীর বহু উন্নতি সাধিত হয়। প্রাচীনকালে অর্থাৎ জলকলের আদিপর্বে মিসিসিপির জল নিয়ে জলকল থেকে জল কাঠের পাইপের মধ্যে দিয়ে সরবরাহ করা হ'ত। এখান থেকেই প্রথম ষ্টীমবোট 'মিসিসিপি' নদী দিয়ে উজানে চলতে সুরু করে।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত হয় ও 'নিউ অরলিনস্' এই অঞ্চলের রাজধানী রূপে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। তখন জনসংখ্যা ছিল ২৪,৫৫২। এই সময় বৃটিশ নৌবাহিনীর আক্রমণ 'নিউ অরলিন্সে' চলে। নিউ অরলিন্সের যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষ অত্যন্ত বিধ্বস্ত হ'য়ে আমেরিকানদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

এই সেঁতসেঁতে সহরে এসিয়াটিক কলেরা, পীতজ্বর ও মাঝে মাঝে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হ'য়ে বহু প্রাণহানি হত। এর পর বাণিজ্যিক উন্নতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য প্রায় ২ কোটী ডলারে ওঠে। নানা দেশের জুয়াড়ী, আসামী, বদমায়েস, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, ছিন্‌তাইওয়ালা ও গুণ্ডারা এই আইনহীন নদীমাতৃক সহরে সমবেত হতে সুরু করেন।* বদমায়েসির বিখ্যাতি আজও তার ঘোচেনি। বিশেষ ক'রে কেনেডী হত্যার ব্যাপারেও এখানের দল জড়িয়ে রয়েছে ব'লে জনশ্রুতি। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, যা' পরে "তুলেন বিশ্ববিদ্যালয়" নামে পরিচিত (Tulane) হয়। এখানকার প্রাচীন স্পেনীয় ও ফরাসী ঔপনিবেশিকদের বংশধরদের সঙ্গে আমেরিকান্‌দের দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। এরা ভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের উন্নতির পরিচয় দিতে লাগলো।

এই নিউ অর্লিনস্-এর কালো দিকটা দেখে একশো বছরেরও আগে কর্ণেল ক্রিশি ১৮২৮ সালের নিউ অরলিনস্-এর বর্ণনা দিয়েছেন একটি কবিতার মাধ্যমে। এই কবিতাটির নাম—

"New Orleans in 1828"—A Rhapsody—

By Colonel James R, Creecy.

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিউ অরলিনসএর অধিবাসী সংখ্যা মাত্র ১০২,১৯২ ছিল। রাস্তার জমা আবর্জনা মাটিতে পোঁতা ময়লা জল বেরুবার পথ না থাকায় খানা ডোবার পরিবেশে পীতজ্বরের ও নানা সংক্রামক ব্যাধির উপদ্রব সইতে হত এই সহরবাসীদের। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৭ পর্যন্ত নিউ অরলিনস্ নগরীর ইতিহাসের এক কালিকাময় অধ্যায়। ১৮৬০ সালের পয়লা জানুয়ারী দাসপ্রথা বিলোপ আইন (Emancipation Proclamation) যদিও ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়েছিল কিন্তু তেরোটি প্যারিসে (Parisa) যেখানে ফেডারেল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন ছিল, সেখানে ক্রীতদাসের মুক্তি দেওয়া হ'ল না।

লুসিয়ানা পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত হ'ল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। নিগ্রো ও নিগ্রোদের শ্বেত উস্‌কানিদারদের প্রাধান্য রোধ করার জন্য Knights of the White Camellia ও কু ক্লুক্স্ ক্ল্যান (Ku Klux Klan) দল কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও প্রায় বলপ্রয়োগে তাদের আইনসম্মত যোগ্য অধিকার গ্রহণ করতে বাধা দিত। ভাগ্যান্বেষী উত্তরের অধিবাসীদের লুসিয়ানায় এসে প্রাচীন অধিবাসীদের সংগে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। এর ওপর মহামারী আর মিসিসিপি নদীর প্লাবনে নিউ অর্লিনসের উন্নতি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়।

১৯০৫ সালে আবার পীত জ্বরের (yellowfever) সংক্রমণ সুরু হয়। সেই সময়ে Dr. Carlos Finlay আবিষ্কার করেন যে মশার সাহায্যে এই রোগের বীজাণু সংক্রামিত হয়। আইন করে জল আহরণের চৌবাচ্চাগুলির ওপর মশা নিরোধক জাল দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে না ঐ আবদ্ধ জলে মশা জন্মাতে পারে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত লুসিয়ানার উন্নতির যুগে Huc Y. P, Lopts এর অধিনায়কত্বের প্রস্তাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ে রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু হাসপাতাল স্থাপন ও বৃদ্ধি, বিমান বন্দর স্থাপন চলে। সমুদ্র প্রাচীর তোলা, সেতু নির্মাণ, স্কুলের ছাত্রদের বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণ ও নতুন রাজধানী 'বেটন রুজে' (Baton Rouge) স্থাপন প্রভৃতি কাজের সংগে তিনি সংযুক্ত ছিলেন।

নিউ অর্লিনসের মেয়রের সংগে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মেয়র ওয়ামসলে (Walmsly) পরাজিত হন। ১৯৩৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বেটন রুজে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। দ্বিতীয় মহাসমরে এটির সমৃদ্ধি ও সম্মান প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এখানেই সৈন্যাবাস ও নৌবহরের আস্তানা গড়ে ওঠে। এর ফলে গৃহ সমস্যার উদ্ভব হয়। নানা বহুতল বসত বাড়ী ও হোটেল নির্মাণ সুরু হয়। যুদ্ধের পর অনেকে এ স্থান ত্যাগ করেন সত্য তবুও অনেকেই এখানে থেকে যান।

'ভিউকেয়েরী' অর্থাৎ 'ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার্স' যেটি আগে

প্রাচীন প্রাচীর বেষ্টিত নগর ছিল সেখানে উন্নতির ম ত্রা কিছু বিস্মিত হয়। সেখানে 'ক্রেয়োল' (অর্থাৎ প্রাচীন ফরাসী ও স্পেনীয়দের শ্বেত বংশধরেরা) তাদের প্রাচীন নামকে কিছু অমরত্ব দিয়েছেন 'ক্রেয়ল কফি', 'ক্রেয়ল কুইসিন', 'ক্রেয়ল রান্না', 'ক্রেয়ল প্রাতরাশ' (Creole dijenner)

এখন এখানে চলেছে ফ্রীওয়েরের ধুয়ো। নতুন মিসিসিপি সেতুকে কেন্দ্র ক'রে নানাদিকে এগিয়ে চলেছে।

(ক্রমশঃ)

নিমতলার দেয়ালে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

হৃদয়-অরণ্যে তবু শোনো সেই বসন্তের নীল ব্যাকুলতা,
রহস্যের ছায়াচিত্রে রূপরঙ্ রেখার উৎসার,
পলাশ কামনা কত—রূপ আর অরূপের দ্বন্দ্বের সততা
এখনো উৎকীর্ণ ত্যাখো এ দেয়ালে, কান পেতে শোনো
—সেই অজস্র মৃতের
মৌন মুগ্ধ পদধ্বনি : এ দেয়াল সাক্ষী থাকল তার
নিমতলার এ দেয়াল—বিস্মৃত নানা জীবনের
অজস্র দৃশ্যের রঙ—এখানে যে সমস্ত সূর্যের মল্লার
এক আগুনে সমর্পিত। তবু মুগ্ধ শেষ সূর্য আরেক
দিনের
ত্রিকোণ চূড়ায় কাঁপল। রাত্রি আনবে শান্তির প্রসার।

বিধবা কাঁদছে শোকে। আছড়ে পড়ল পুত্রহীন পিতা।
প্রিয় বিরহিত কার কণ্ঠস্বর শোনো শোনো।
—জীবনের জানি না ঠিকানা,
তবু মনে হয় আজ এখানে সে কী মধুর প্রজ্ঞা পারমিতা।

স্তিমিত আলোয় ভস্মে ভীরু এক ভোরের ঘরানা
আমাকে মন্দ্রিত করে। বেশ, তবে তাই হোক।
—তারও মৌন চিৎ
তাহলে সহস্র জিহ্বা দীপ্ত বহ্নি ছুঁয়ে থাক।
আর আমি কখনো কাঁদব না
নিমতলার দেয়ালেও কাল ভোরে ছবি আঁকবে নির্মল
সবিতা

সব অর্থ বুঝি না তবু নিমতলার আশ্চর্য গভীর কবিতা
আমাকে তন্ময় করে। বিবর্ণ দেয়ালের পাতায় পাতায়
কত যে বিচিত্র লেখা—কত সুর-ছন্দের নিরালা।
জীবন উদ্দাম নদী—সব তার দীপ্ত গতি—ঢেউয়ের কল্লো
এখানে আশ্চর্য সব স্পষ্ট শোনা যায়।
একটি প্রদীপ যেন সম্মোহিত,—দিন রাত্রি জ্বালা
আকাশের অন্ধকার আবিষ্কার করে দিতে নিজেই সে
কখন হিন্দো

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীর ও সদাশিব দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছিল।

সদাশিব দিল্লীতে ভারত সরকারের অধীনে কেরানীর চাকুরী করে বহুকাল ধরে। বর্ত্তমানে বড় বাবু। বয়স হবে পয়তাল্লিশ। সমীর সদাশিবের সমবয়সী এবং স্কুল ও কলেজের সহপাঠী—কিন্তু হলে কি হয় সমীর কোনদিনই সদাশিবকে বন্ধু বলে মনেই করতো না, কারণ দুজনের প্রকৃতি ছিল একেবারে উল্টো। অথচ মজা এই যে, সদাশিব বরাবরই সমীরকে খুব ভালবাসতো, এক কথায় বলতে গেলে সে ছিল সমীরের ভক্ত। সমীর স্কুলের টীমে ফুটবল খেল্‌তো সদাশিব তার হাতঘড়ি এবং জামা নিয়ে মাঠের একপাশে বসে বসে সেই খেলা দেখতো। সমীর কলেজের থিয়েটারের হিরো সেজে সমস্ত ষ্টেজ মাতিয়ে ফেল্‌তো। সদাশিব অবাক হয়ে ভাব্‌তো, সমীর কি করে এত সুন্দর প্লে করে। আবার পরীক্ষায় যখন সদাশিব ভালভাবে পাস করে ক্লাসে উঠতো, তখন সমীর নানারকম দরবার করে শেষ মুহূর্ত্তে খেলোয়াড়দিগের প্রমোশন পেত। এ হেন সমীর ১৯২৮ সালে বি-এ-র টেষ্ট পরীক্ষা না দিয়ে ষ্ট্রাইক করে কলেজ থেকে বিতাড়িত হোল,—স্কটিশ কলেজের ইতিহাসে সেই হোল প্রথম ষ্ট্রাইক, এবং সেই বছরই সদাশিব ডিস্‌টিংসানে বি-এ পাশ করে ইংরাজীতে এম-এ পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলো। একবছর এম-এ পড়ার পরেই সদাশিব পেলে সরকারী চাকুরী এবং পড়া ছেড়ে কয়েক বৎসর কলিকাতায় কাজ করে শেষে ভারত সরকারের অধীনে চাকুরী নিয়ে দিল্লীতে চলে গেল। অন্যদিকে সমীর হোল নিরুদ্দেশ। কিছুকাল পরে খবরের কাগজে দেখা গেল, সমীর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় জড়িত হয়ে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেছে, এবং এরই কিছু পরে একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে সদাশিবের হোল বিয়ে। তখনও সদাশিবের ঠাকুরমা জীবিত ছিলেন। তিনি দেখে শুনে মনের মতন নাতবৌ করলেন,—ফরসা রং, খাড়া নাক, ভাসা-ভাসা বড় বড় চোখ, গোল মুখ, বয়স হবে দশ কি এগারো। নাম তার গৌরী। ঠাকুরমা বল্লেন, শিব-গৌরীর মিলন ঠিক যেন হরপার্ব্বতীর মিলন। কথাটা ঠিকই, কারণ সদাশিব ছেলেবেলা থেকেই মোটা-সোটা, ভুঁড়িওয়ালা, নিরীহ গোছের আপনভোলা মহাদেব।

সমীর বল্লে দিল্লীর স্বাস্থ্য কি রকম রে?

সদাশিব বল্লে, স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। এই দেখনা কেন, তোমার বউদির রোজই নানা রকম অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। ওঁর জন্যে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা ডাক্তার খরচ আমার বাঁধা। মোটে ত দুশো আশী টাকা মাইনে পাই, তা থেকে শতকরা দশটাকা হিসেবে আটাশ টাকা লাগে এই কোয়ার্টারের ভাড়া, ডাক্তার ওষুধের খরচ আরও তিরিশ টাকা গেলে—

বাধা দিয়ে সমীর বল্লে, বাস্তবিক। একটু থেমে বল্লে আচ্ছা, তোর এই অঞ্চলে সোসাইটি কেমন? এখানে বাঙ্গালী আছেন কতগুলি?

সদাশিব বল্লে, ঠিক জানি না ভাই। আমার পাশেই আছেন নীরোদবাবু, বাড়ী বর্দ্ধমান জিলায় রায়ান গ্রামে, ওঁর বড় ছেলেও এখানে মিলিটারী একাউণ্টসে না কোথায় যেন—। তা ছাড়া ঐ সাম্‌নে ওদিকে আছেন মেদিনীপুর জেলার এক ভদ্রলোক, তিনি—

বাধা দিয়ে সমীর বল্লে, দেখ, কাল পরশু দুদিন চেষ্টা করে যা বুঝলুম তাতে এখুনি কোয়ার্টার্স পাবার কোন লক্ষণই দেখলুম না তারপর আবার ব্যাচিলারকে কোয়ার্টার্স দিবে কিনা জানিনা, তা বেশ করে বুঝে দেখ

তোর যদি অসুবিধে হয়, তাহলে না হয় কাছাকাছি একটা হোটেলে গিয়েই উঠি।

দরজার পরদা সরিয়ে দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে গৌরী এলেন বেরিয়ে। বল্লেন, আমাদের কোনই অসুবিধে নেই ঠাকুরপো, তবে আপনার যদি অসুবিধে হয়—

ফের আপনার, আমি বলেছি না যে, আপনি বল্লে কথার জবাব দেব না, বলতে বলতে ক্যাম্বিশের চেয়ার ছেড়ে সমীর উঠে দাঁড়িয়ে গৌরীর হাত থেকে এক বাটী চা নিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়লো। গৌরী অন্য বাটীটা স্বামীর হাতে দিয়ে একটা বেতের মোড়া টেনে তাদের সামনেই আসন গ্রহণ করলে।

সমীর বল্লে, বসলেন যে বড়, আপনার চা কোথায়?

গৌরী বল্লে, আমি ত চা খাই না ঠাকুরপো, আজ প্রায় দু'বছর হোল, ডাক্তার মশাই চা ছাড়িয়েছেন। চা খেলে বড় অম্বল হয়।

দুঃখের কথা, অম্বল হয় ত বুঝলুম, কিন্তু চা না খেলে আসর জমবে কেমন করে? বাটীতে একটা চুমুক দিয়ে সমীর উত্তর দিলে।

এর পর নানা কথা বলে পূর্ব্বের ব্যবস্থাই বহাল রইল, অর্থাৎ যতদিন না সমীর সরকারি কোয়াটার্স পায় ততদিন সদাশিবের বাড়ীতেই থাকবে, এবং থাকা খাওয়া ঘর ভাড়া ইত্যাদির জন্য নগদ মাসিক একশো টাকা করে দেবে, অর্থাৎ পেয়িং গেষ্ট। টাকার হিসেবে সদাশিব মনে মনে খুসি হোল; গৌরী খুসী হোল, বাড়ীতে একটা আমুদে লোক থাকবে বলে, আর সমীর ভাবলে, থাক্ গে বাবা, মাইনে এবং ডিএ মিলিয়ে মাসিক সাড়ে তিনশ টাকা পেয়ে একশো টাকা ফেলে দিয়েই খালাস, কোন ঝঞ্ঝাট করতে হবে না, নইলে এই দিল্লীতে—

সমীরের বর্ত্তমানে এক বিধবা পিসীমা ছাড়া আর কেউই নেই। ঐ পিসীমাই তাকে মানুষ করেছেন, মানুষ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন, নিরুদ্দেশ হওয়ার পর 'তোমার পিসিমা শয্যাগত' গেল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, সমীর ধরা পড়ার পর গায়ের গয়না বেচে মকোদ্দমা চালিয়েছেন, খালাস হয়ে এলে বিবাহের চেষ্টা করেছেন এবং ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে পুনরায় ধরা পড়ার পর পিসিমা নিজে কলকাতা ছেড়ে মনোদুঃখে কাশীবাসী হয়েছেন। এর পর ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন ভারতে একজন কংগ্রেসী মন্ত্রী, যিনি নিজে অহিংস হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবীদের বরাবরই সুনজরে দেখতেন, তিনি সমীরের খোঁজ পেয়ে পঁয়তাল্লিশ বছরের সমীরকে সরকারী অফিসে কনফিডেন্সিয়াল এসিস্ট্যান্টের পদে বসিয়ে দিয়েছেন। এই চাকরী নিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লী আসার পথে সমীর একবার কাশীতে নেমে পিসিমার পায়ের ধুলোও নিয়েছিল। সেই সময় পিসিমা আরও একবার বিয়ের জন্য বলেছিলেন, কিন্তু সমীর তাতে কোন রকম সাড়া দেয় নি। পিসিমা জানতেন, সমীর তাকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করে খুবই, কিন্তু তাঁর যে-কথাগুলো সমীর পালন করতে অরাজী, সেই কথার কোন উত্তর সে দেবে না। সমীর সম্বন্ধে পিসিমা পুরোপুরি হতাশ হয়েই ছিলেন। দিল্লীতে চাকরী নেওয়ার সংবাদে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেও ভাইপোকে সংসারী করবার কোন সুযোগ তিনি করতে পারলেন না।

চাকরী নিয়ে সমীর দিল্লীতে যেদিন প্রথম এল তার দিন দুই পরে একদিন অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখা হোল প্রাক্তন সহপাঠী সদাশিবের সঙ্গে। সেই মোটা সোঁটা, গোলগাল সদাশিব এখন আরও ভারিক্কি, আরও যেন থপ্‌থপে হয়ে পড়েছে।

দুজনেই দুজনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল! দু'জনের দেখা হয় নি বোধ হয় বছর কুড়ির মধ্যে, কিন্তু চিনতে ওরা পরস্পরকে প্রথমেই পেরেছে। সমীর সেই পূর্ব্বের মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গীতে সদাশিবের কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে, কি রে সদা, তুই এখানে? একেবারে বুড়ো হয়ে গেছিস্ যে রে!

বিস্মিত এবং সেই সঙ্গে পুলকিত সদাশিব আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি? তুমি এখানে কোথায়? কি করছ এখন?

বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দুজনের মধ্যে অনেক কথা হোল। সমীর হোটেলে থেকে অফিস করছে এই কথাটা শুনে সদাশিব হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বলে ফেল্লে, হোটেলে কেন? আমার ত কোয়াটার্স রয়েছে, সেইখানেই এসো-না। বলেই সে মনে মনে আফশোষ করেছিল। এমনই একটা প্রস্তাব সে সহসা করে বসল যার ফলে সংসার খরচ বাড়বার সমূহ আশঙ্কা।

কিন্তু কথাগুলো বলে সে কেমন একটা আনন্দও পেলে। সেই সমীর, সে এবার সদাশিবের আশ্রয়প্রার্থী হবে।

সমর কথাটায় বেশী গুরুত্ব না দিয়ে বল্লে, তোর বাড়ী যাব? তা যেতেও পারি, কিন্তু তোর ওখানে যাই বা না যাই, হোটেল আমাকে ছাড়তেই হবে। এখন যেখানে আছি সেখান থেকে এই অফিসটা এত দূর হয় যে সত্যিই বড় অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেছি।

সদাশিব চেপে গেল। ও যদি না আসে তাহলেই মঙ্গল। মিছামিছি কতকগুলো খরচ বাড়িয়ে লাভ কি?

সমীর বল্লে, তোর কোয়াটার্স এখান থেকে কত দূরে রে?

কাছেই। সিকি মাইলও নয়। আস্তে আস্তে হাঁটলে আট দশ মিনিট লাগে।

বাস্! তাহলে—তা হলে তোর ওখানেই থাকতে পারি। পেয়িং গেষ্ট রাখবি, মাসে মাসে তোকে যদি শ'খানেক টাকা দি? অসুবিধে হবে?

ঢোঁক গিলে নিজের টাকে হাত বুলিয়ে সদাশিব বল্লে, তুমি—তোমার কাছ থেকে টাকা নেব?

কেন নিবি না? আমার খরচটা আমি নিজে হাতে না করে তোর হাত দিয়ে করাব। এতে দোষ কি? লজ্জাই বা কোথায়?

আচ্ছা। সদাশিব ঘাড় হেঁট করে খুসি মনে সায় দিয়েছিল।

দুই

সেই সদাশিবের বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমীরের সঙ্গে বউদির খুব ভাব হয়ে গেল।

বৌদি বল্লে, ঠাকুরপো, আপনাকে এই প্রথম চোখে দেখলুম বটে কিন্তু বিয়ের পর থেকে আপনার গল্প এত শুনেছি যে, আপনি আমার মোটেই অচেনা ছিলেন না।

সমীর আপত্তি করে বলেছিল, আপনার স্বামীকে আমি তুই বল্‌বো, আর আপনি তাঁর সহধর্ম্মিণী হয়ে আমাকে 'আপনি' বল্‌বেন, এটা কখনই হতে পারে না। অতঃপর আপনি বল্লে আমি কিন্তু কোনো জবাবই দেব না।

সদাশিবের দেশ থেকে আনা একুশ বাইশ বছরের ছোট একটি বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ে এ বাড়ীতে রান্না বাসন মাজা ইত্যাদি সমস্ত কাজই করতো। মেয়েটা কখনও মুখ তুলে চেয়ে কথা কয় না, গায়ের রং মিশ্ কালো, মুখে প্রচণ্ড রকম বসন্তের দাগ এবং একটা চোখ কানা। মাথায় কাপড় তুলে মেয়েটা এগিয়ে এসে গৌরীকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, কি তরকারী কুটব দি'দ?

গৌরী তাকে নানারকম ফর্দ ঠিক করে দিয়ে শেষে বল্লে, ঠাকুরপো, টকের ডাল খাবেন, আমাদের রেণু যা সুন্দর টকের ডাল রাঁধতে পারে—

সমীর বল্লে, মন্দ কি, যা গরম, টকের ডাল ত বেশ ভালোই হবে। তা ছাড়া পিসিমা কাশী যাওয়ার ফলে মেসে হোটেলে থেকে ও জিনিষ বহুকাল জোটে নি। টকের ডালই ভালো। রেণুও এ কথায় খুসি হয়ে চলে গেল। কারণ এ বাড়ীতে অম্ল রোগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ টকের ডাল জিনিষটে বড় একটা রান্না হয় না, যদি এই নবাগন্তুকদের জন্য টকের ডাল রাঁধতে হয়, তাহলে রেণুর আজ লাভ বই লোকসানই নেই। সেও ত ভাগ পাবে।

সেদিন তৃপ্তিমুখে নৈশভোজন শেষ করে দুই বন্ধুতে বাইরের বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়েছিল, দ্বিতীয় দিন থেকে সমীর ঠিক করলে যে সে খাটিয়া নিয়ে সামনের লনে ঘাসের জায়গায় শোবে, সদাশিব ও গৌরী শোবে বারাণ্ডায়, আর রেণু শোবে বাড়ীর ভেতরের বারাণ্ডায়। পেয়িং গেষ্ট হওয়ার বন্দোবস্ত কায়েম করে সমীর ওখানেই রয়ে গেল।

কিন্তু সমীরের মধ্যাহ্ন ভোজন ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনে সদাশিবের সঙ্গে বড় একটা হোত না। সে ছিল এক হঠাৎ-বড় কংগ্রেসী কর্ত্তার কন্‌ফিডেন্সিয়াল এ্যাসিট্যান্ট, তাকে সকাল আটটার মধ্যে সেই অফিসারের বাংলোর গিয়ে বেলা এগারোটা-বারোটা পর্য্যন্ত হাজিরা দিতে হোত, তারপর বিকেলে তিনটে নাগাদ একবার হয়ত অফিসে গিয়ে নাম সই করতে হোত না হয়ত আবার সন্ধ্যের পরে এসেই অফিসারের বাড়ীতেই কাজকর্ম করতে হোত। ওর অফিস যাওয়ার কোন বাঁধা ধরা নিয়মই ছিল না, কাজেই মধ্যাহ্ন ভোজনের কোন বাঁধা সময় ছিল না। সেটা হোত প্রায়শঃই বেলা বারোটা একটার সময়।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সমীর বুঝতে পারলে যে, সদাশিব বেশ একটু কৃপণ ধরণের লোক, কঞ্জুষ বলাও চলে। একটি পয়সাও সে হিসেব করে খরচ করে। বিড়ি সিগারেটের কোন খরচই তার নেই, থিয়েটার বায়স্কোপের বালাই নেই, কোন ক্লাব বা উৎসবে সে আদৌ মেশে না, সেটা বোধ হয় চাঁদা দেওয়ার ভয়ে এবং হয়ত বা সভা সমিতিতে আমল পায় না বলেও বটে, এমন কি জামা কাপড় পর্য্যন্ত দশদিনের মধ্যে ধোপার বাড়ী পাঠায় না। দেশ থেকে রেণুকে আনিয়ে রেখেছে এই জন্য যে, তাকে কোনো মাইনে দিতে হয় না। শুধু খাওয়া পরা দিলেই চলে। বাজার সে নিজে হাতেই করে। এ বাড়ীতে সকালে জলযোগের জন্য বিশেষ কোন খরচই হয় না, কিন্তু কেক বিস্কুট মাখন রুটির বন্দোবস্ত যদি সমীর নিজের পয়সায় করে তাহলে সদাশিব ও গৌরী খুশিই হয়। সদাশিব কিছুই বলে না, গৌরী একটু লজ্জিত হয়, বলে আবার এই খরচ করছো কেন ঠাকুরপো। সমীর বলে, এ আর এমন কি খরচ, আর তা ছাড়া আমার পয়সা খাবেই বা কে? পঞ্চাশ টাকা পিসিমাকে পাঠিয়ে দিলেই আমার ছুটি। অতএব সকালের প্রাতরাশ সমীরের খরচেই হতে সুরু হোল, আর সমীরও এতে কিছু মনে করতো না, কারণ চিরকালই সে বেহিসেবী, বেপরোয়া। কলেজ থেকেই সে পাঁচশো পঞ্চান্ন সিগারেটের টিন টেবিলে খুলে রেখে দিত বন্ধুদের জন্য সুবিধে পেলেই ডবল ডিমের মামলেট সে সকলকেই খাইয়ে দিত, আবার অভাব পড়লে যার তার কাছে টাকা সে ধার করতো, এবং কার কাছে কি ধার করেছে, তা সে কষ্ট করে মনেও রাখতো না। পকেটে টাকা থাকলে যে কোন প্রার্থীকে অকাতরে ধার দিত, এবং ধার নেওয়ার পরক্ষেণেই ভুলে যেত, কাকে ক'টাকা দিলে।

আট দশদিন পরে একদিন কি একটা কাজে আটকে পড়ে সমীর বাসায় এলো বেলা দেড়টার পর। এসে দেখে গৌরী আর রেণু দুজনে সামনের বারাণ্ডায় বসে গল্প করছে। সমীরকে আস্‌তে দেখেই গৌরী বল্লে, এত দেরী কেন ঠাকুরপো? আমাদের বুঝি ক্ষিদে পায় না?

মাথা থেকে টুপিটা নামাতে নামাতেই সমীর চোখ কপালে তুলে বলে, তার মানে? তুমি কি বউদি আমার জন্য না খেয়ে থাকো না কি?

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বৌদি বল্লে, আর থাক, বেশী দরদ দেখাতে হবে না।

ঘরে ঢুকে জামা কাপড় বদলে স্নান ধুতি পরে গামছা কাঁধে নিজের পেশী বহুল বুকের ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে ভেতর বাড়ীর রোয়াকে এসে সমীর বল্লে, না না বউদি, এ বড়ই অন্যায় তোমরা সব খেয়ে দেয়ে কাজ চুকিয়ে নিবে, আমার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকলেই আমি খুসি হব! নইলে ওরকম করে বেলায় খেয়ে আবার রোগ করলে সদা আমায় গদা নিয়ে তাড়া করবে। খবরদার ওরকম করে অসময়ে খেয়ে শরীরটি নষ্ট করো না।

রেণু একহাতে সুগন্ধি তেল, অপর হাতে সাবান এবং রবারের ছোবড়া নিয়ে এগিয়ে এসে বল্লে, উঠানে দেব, না স্নানের ঘরে যাবেন?

সমীর বল্লে, উঠানেই দাও। এর পর খুব তাড়াতাড়ি স্নান কোরে চিরুণী ও ব্রাস সহযোগে চুলগুলো পেছন দিকে টেনে ব্যাক্ ব্রাস করতে করতে সমীর এসে রান্নাঘরের সামনের বারাণ্ডায় পাতা আসনে বসেই বল্লে, বউদি, তুমিও কেন এক সঙ্গেই বোসো না আর রেণুও ঐখানে নিক, বেলা প্রায় দুটো বাজে।

বউদি ইতস্তত করে বল্লে, না থাক্ তুমি খেয়ে নাও।

হঠাৎ সমীর কেমন গোঁ ধরে বল্লে, না না, তোমরা শুকো মুখে বসে থাকবে, আর আমি রাক্ষসের মতো গিল্‌তে থাক্‌বো, তা হয় না। তোমরাও বোসো না হলে আমার খাওয়ায় নজর লাগবে। এর পর একতিলও অপেক্ষা না করে রান্নাঘরের দিকে মুখ তুলে সমীর বল্লে, রেণু, তোমার বউদিরও জায়গা করে দাও, আর তুমি নিজেও খেতে বোসো, খাওয়ায় আবার লজ্জা কিসের?

রেণু সমীরের ভাতের থালা এনে তার সাম্‌নে নামিয়ে বাটীগুলো থালা থেকে তুলে সাজিয়ে দিয়ে বউদির মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই সমীর বল্লে আবার দেখছো কি, যা বল্লুম করে ফেল।

গৌরী বল্‌লে, দে তুই, একসঙ্গেই খাওয়া যাক্, বেলা হয়ে গেছে। সেদিন তিনজনেই একসঙ্গে খেতে বস্‌লো। সমীর ও গৌরী বসলো রোয়াকে, আর রেণু

রান্নাঘরের ভেতরেই কলাই করা কাঁসিতে ভাত নিয়ে বসেছিল।

অর্দ্ধেক খাওয়ার পরেই সমীর তার গেলাসের সব জলটা খেয়ে শেষ করে দিলে। গৌরী বল্লে তাইতো, রেণুও খেতে বসে গেছে, আচ্ছা আমিই দিচ্ছি উঠে।

সমীর বল্লে, না না উঠ্তে হবে কেন, ঐ ত তোমার গেলাস ভর্ত্তি আছে ঐ থেকে একটু ধার দিলেই চল্বে।

গৌরী বল্লে না ভাই, ও থেকে আমি এক চুমুক খেয়েছি যে।

বয়ে গেছে, এই বলে সমীর লম্বা করে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে গৌরীর গেলাসটা তুলে নিয়ে তাই থেকে অর্দ্ধেকটা জল নিজের গেলাসে ঢেলে নিলে। হঠাৎ দেখা গেল, রান্নাঘর থেকে একচক্ষু রেণু অবাক হয়ে সমীরের কাণ্ডটা দেখছে। বেচারা পাড়াগাঁয়ের সেকেলে মেয়ে!

এরপর সমীর নানারকম গল্প করে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করলে, গৌরী অন্যমনস্ক হয়ে ভাতের গ্রাসগুলো গলাধঃকরণ করে চললে, আর রেণু বেচারা তার একমাত্র চক্ষু এদের দিকে নিবদ্ধ রেখে থাবা থাবা ভাত নিজের মুখে চালনা করতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়ার পরে নিজের ঘরে বসে সমীর যখন পর পর দুটো সিগারেট ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিলে, তখন গৌরী এসে ঘরে ঢুকলো। কোনরূপ ভণিতা না করেই বল্লে, ঠাকুরপো, ও রকম এঁটো জল খাওয়ার মতো কাণ্ড আর কোরো না। রেণুটা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কি মনে করবে বল ত?

সমীর যেন অবাক হয়ে গেল, বল্লে, কেন, কি আবার মনে করবে?

গৌরী বল্লে, না ভাই, তুমি বোঝো না, শেষে ফট্ করে ও যদি ওর দাদাকে কিছু বলে বসে, তাহলে—

গৌরীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে সমীর বল্লে, ও, আচ্ছা। গৌরী চট্ করে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর দু'দিন পরে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে সমীর সিগারেট ধরিয়ে ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় কাৎ হয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এক দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ শিখ এসে বল্লে, সাব, মৈ ফরচুন-টেলার হুঁ।

এই সব ফরচুন-টেলারদের সমীর কোনদিনও বিশ্বাস করতো না, কিন্তু হাতে সময় থাক্লে সে এদের নিয়ে রঙ্-তামাসা করতেও ছাড়তো না। বুড়োকে দেখে সমীরের বড় ভাল লাগ্লো, কৃত্রিম আগ্রহ দেখিয়ে বল্লে-বৈঠিয়ে জী।

ফরচুন-টেলার ঘরে ঢুকে বেতের মোড়াটার ওপোর বসে রূপার চশমা বার করে চোখে লাগাতে লাগলো, সমীর চীৎকার করে বউদিকে ডাক দিলে। বৌদি ঘরে এসে ঢুকতেই সমীর বল্লে, বউদি হাত দেখাও।

গৌরী বল্লে, না ভাই ঠাকুরপো, ও সব হাত দেখিয়ে কি হবে, সমস্ত বাজে।

সমীর বল্লে, বাজে ত সবই, কিন্তু তবুও যখন এসেছে, তখন দেখাও না।

মুখে বাজে বল্লেও গৌরীর বেশ একটু কৌতূহল ছিল। একদিন সে সদাশিবকে বলেছিল হাত দেখানোর কথা, সদাশিব ওর কথায় আমোল দেয় নি, বোধ হয় খরচের ভয়ে। আজ গৌরীর সেই কথা মনে পড়ে গেল।

ফরচুন-টেলার গৌরীর হাতখানা নিজের হাতের ওপোর রেখে হিন্দীতে বল্লে, মায়িজীর নসিব খুব ভালো, বহুৎ রোজ বাঁচিবে। সত্তর বচ্ছর।

গৌরী বল্লো ও বাবা, এই ত মোটে চৌত্রিশ।

সমীর বল্লো পাইজী, দেখিয়ে ভাই ইন্‌কা লেড়কা-উড়কা কি হবে?

সলাজ হাসি হেসে গৌরী বল্লে, ঠাকুরপোর যেন কি!

গণৎকার হিসেব করে বল্লে দুই লেড়কা আউর এক লেড়কী। এর পর গৌরী বল্লে, বাবুজীর হাত দেখুন গণকঠাকুর।

অতঃপর গণকঠাকুর সমীরের হাত দেখে বল্লে, বাবুজী খুব মস্ত বড় চাকুরী করবে, অনেক টাকা, অনেক যশ এবং ভালো স্বাস্থ্য থাকবে। আয়ুও—

গৌরী বল্লে, সাদি হবে কবে সেইটে আগে বলুন।

গণকঠাকুর সন্দিগ্ধনেত্রে গৌরীর দিকে চেয়ে সহাস্য রহস্যে উত্তর দিলে, আবার সাদি, এক জরু

গৌরী হেসে উঠ্‌লো, তাই নাকি ঠাকুরপো, আমাদের লুকিয়ে—

সমীর বল্লে, সে কি হে, কি বল্‌ছো তুমি—

গণৎকার একটু বোকা, সে ভেবেছিল গৌরী বুঝি সমীরের স্ত্রী। বাংলা সে তেমন বোঝে না, তাই বৌদি ঠাকুরপো এই সব সম্বোধনের মর্ম সে গোড়া থেকে ধরতেই পারে নি। এবার ভালো করে মুখ তুলে অনুধাবনের চেষ্টা করে তার আন্দাজটা ঠিক কি ভুল তাই বোঝবার চেষ্টা করছিল। ফলে এমন একটা ইঙ্গিতের সৃষ্টি হোল, যার অর্থ সমীর ও বৌদি দুজনেই বুঝতে পারলে এবং বুঝতে পেরে বউদি বেশ একটু লজ্জিতই হোল।

এমন সময় দেখা গেল একচক্ষু রেণু দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী রেণুকে ডেকে বল্লে, রেণু, হাত দেখাবি আয়।

রেণুর হাত দেখাবার ইচ্ছে ছিল খুব, অথচ সলজ্জভাব। গৌরী তাকে ধরে টেনে এনে গণকের সামনে বসিয়ে দিলে। সমীরের সঙ্গে যে সম্বন্ধটা গণৎকার আন্দাজ করছে, সেই বিশ্রী পরিস্থিতির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই গৌরী বোধ হয় ব্যস্ত হয়ে রেণুকে গণকের সামনে এনে খাড়া করে দিলে।

গণক ওর মুখের দিকে চেয়ে চেহারা এবং পোষাক থেকে সঠিক অনুমান করে বল্লে, এ বিধবা, এবং ভবিষ্যৎ বড় ভালো নয়।

রেণু বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লো। সমীর বুঝলে গণককে নিয়ে আনন্দ করার যে মৎলব তার ছিল, তা হোল' না, কেমন যেন সব গুলিয়ে বিশ্রী হয়ে গেল। তাকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করার জন্য বল্লে বউদি, আমার কোটের পকেট থেকে ব্যাগটা দাও ত।

গৌরী কোন দ্বিধা না করে সমীরের ঝোলানো জামা থেকে ব্যাগটা বার করে ওর হাতে দিলে। সমীর একটা আধুলী বার করে গণককে দিয়ে দিলে।

গণক আপত্তি জানাতেই আর একটা সিকী দিয়ে সমীর বল্লে, আউর নেই। গণৎকার চোখ থেকে চশমা খুলে বারো আনা পয়সা পকেটে পুরে, তার কাগজ-পত্তরের বাণ্ডিলটা বগলে করে সেলাম দিয়ে চলে গেল।

গৌরী বল্‌লে, আচ্ছা ঠাকুরপো, বাজে বাজে পয়সা ন কর কেন বলত?

সমীর বল্‌লে, মজা।

ভারী মজা। যত সব বাজে লোক নিয়ে।

হাসতে হাস্‌তে সমীর বল্‌লে, বারো আনা খরচ কর বৌদির যদি দুটো লেড়কা আর একটা লেড়কী হয় তাহ আর লোকসান কোথায়, লাভই ত!

আচ্ছা—আ—গৌরী ঠোঁট বেঁকিয়ে উচ্চারণ কর তারপর ঘর থেকে বিনা ভণিতায় বেরিয়ে গেল।

তিন

সেদিন ছিল রবিবার। রবিবার ও ছুটির দিনে সদা নিয়মিতভাবে দুপুরে ঘুমায়। বৈকালে চা খেয়ে বেশীর দিন পাশের কোয়াটার্সের নীরোদবাবুর সঙ্গে গল্পগাছা ক কোন কোনদিন বিড়লা মন্দিরে বেড়াতে যায়।

সেদিন দুপুরে সদাশিব ঘুমাচ্ছে, সমীর বৌদিকে ডে বলে, বৌদি, কুতবমিনার যাবে?

বউদি বল্‌লে, কুতব? নাম শুনেছি বটে, কিন্তু কখ যাওয়া হয় নি।

সমীর কপালে চোখ তুলে বল্‌লে, কত বছর এখ রয়েছ, এখনও কুতব যাও নি, সে কি? এর পর কোন না করে লুঙ্গিপরা অবস্থাতেই জামাটা গায়ে দিয়ে সাই নিয়ে সে বেরুলো। আজ তিন দিন হোল সে একটা সাইকেল কিনেছে। বেরোবার সময় বলে গেল, এ ট্যাক্সি আন্‌ছি। সদাকে তুলে তৈরী হয়ে নাও, কোরো না।

পনর মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে হাজির। সদ চোখে মুখে জল দিয়ে রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় বে দেখে জোরে সাইকেল চালিয়ে সমীর আস্‌ছে আগে আর পেছনে পেছনে ট্যাক্সি।

সদা একটু বিরক্ত হয়েই সমীরকে বললে, এ কি নেই, একেবারে গাড়ী এনে ফেল্‌লে? একটু চা-টা হবে—

সমীর বল্‌লে, হবে'খন, দোকানে কি কুতবেই যাবে, এখন বেরিয়ে পড়।

সাইকেলটা ঘরের মধ্যে তুলেই সমীর প্যা গলিয়ে নিয়ে বুশ্‌কোর্ট পরে তৈরী হয়ে বললে, নে

আর দেরী করিস নি। নেপথ্যে গৌরীকে ডাক দিয়ে বল্‌লে, বউদি আর দেরী কত, গাড়ী এসে গেছে। একটু থেমে হাঁক দিলে, রেণু, এক গেলাস জল দে ত—

হৈ চৈ হাঁকাহাঁকি করতে সমীর ওস্তাদ। রেণু এক গেলাস জল আন্‌তেই সমীর গেলাসটা নিয়ে চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিয়ে বল্‌লে, কি রে তুই যাবি না ?

সলজ্জ হাসি হেসে রেণু মুখ নিচু করে বল্লে, কাজকর্ম সব রয়েছে—

সমীর বল্লে, ও সব হবে'খন পরে, তুই নে তৈরী হয়ে নে—

সদা বল্লে, সবাই মিলে গেলে বাড়ীতে থাকবে কে ? আজকাল আবার চুরি হচ্ছে—

সমীর বল্লে, সে ব্যবস্থা করছি, নীরোদ বাবুদের বলে যাবো, ওঁরা একটু নজর রাখবেন। নইলে আমরা সবাই মিলে যাবো, আর রেণু বেচারী বাড়ী বসে থাকবে, তাও কি আবার হয় নাকি ?

রেণু খালি গেলাস নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে এক তাড়া দিয়ে সমীর লাফিয়ে চলে গেল নীরোদবাবুদের বাড়ীর দিকে।

বিরক্ত হয়ে সদাশিব বল্লে, সমীরের সব ভালো, কিন্তু ছেলেমানুষীটা এখনও গেল না। সমীর যেতে যেতে কথাটা শুনেছে। একবার দাঁড়িয়েই বল্‌লে, আশীর্ব্বাদ কর ভাই, যেন ঐ ছেলেমানুষীটাই চিরকাল থাকে। বলেই সে নীরোদবাবুদের বাড়ীতে চলে গেল। সমীরের কথাগুলো গৌরী তার ঘর থেকে শুন্‌লে, জানলায় ঝোলানো পর্দ্দার পাশ দিয়ে দেখলে খরগোসের মত লাফাতে লাফাতে সমীর ওদিকে চলে গেল। অজান্তেই ওর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

বেলা চারটে নাগাদ ওরা চারজনেই কুতবে পৌছাল। ওখানকার একটা বড় রেস্তোরাঁয় চা ডিম ইত্যাদি খেয়ে নিলে। রেণু বিধবা, তার জন্য সমীর কিনে দিলে ফল আর লস্যি, অর্থাৎ ঘোলের সরবৎ। রেণু এতে প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল, বলেছিল যে সে বিকেলে কিছুই খায় না, কিন্তু সমীর ওর কথা শোনে নি। সদাশিব কোনো কথাই কয় নি, কারণ সে জানতো, যে ঝি-চাকরদের বিকেলে কোন কিছু খেতে না দেবার যে চিরাচরিত রীতি আছে, সমীর সে রকম কোন নীতিকথাই মানে না। এর পর পৃথ্বীরাজের স্তম্ভ দেখে ওরা কুতবের দরজায় এসে উপস্থিত হলো।

একসঙ্গে সবাই উঠছে। প্রথমে যাচ্ছে সমীর, পেছনে গৌরী তারপর রেণু, সব শেষে সদাশিব। সদাশিব প্রথমে উঠ্‌তেই রাজী হয় নি, শেষে বল্‌লে, আচ্ছা আমি পেছন পেছন যাই, যদি কেউ উঠ্‌তে না পারে—

কতকগুলো সিঁড়ি পার হওয়ার পর অন্ধকার গভীর হয়ে এলো গতিবেগও হোল' মন্থর। সমীর ডাকছে, সদা সদা, আস্‌ছিস্‌ ত রে ?

সদাশিব বলে, হ্যাঁ, চল।

সমীর বলে, বউদি—

গৌরী বল্‌লে, বড় অন্ধকার যে—

পেছন থেকে সদা বল্‌লে, তখুনি বলেছিলুম, কেন মরতে এলে এখানে ? সদাশিব রীতিমত চটেছে।

সমীর হেসে গড়িয়ে পড়লো, বল্‌লে, এই ত মজা। একটু থেমে কোন শব্দ না করে সে পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে আন্দাজে বউদির হাত ধরবার চেষ্টা করলে, তাকে অন্ধকারে উঠতে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে।

বউদির গায়ে হাত ঠেকতেই গৌদি থেমে গেল। সমীর বল্‌লে, এসো এসো, সব দাঁড়িয়ে গেছ নাকি ?

এই সময় হল্‌লা করতে করতে একদল ছেলে ওপোর থেকে আস্‌ছিল। তাদের হাতে ছিল টর্চ।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে পাশ দিলে। তারা চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে ওদের পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। টর্চের আলোয় সমীর পেছনে ওদের দলটিকে দেখে নিলে। এর পর অন্ধকার পেয়েই জোর করে গৌরীর হাত ধরে টানতে টানতে ওপোরে উঠতে লাগলো।

গৌরী প্রথমটায় অস্বস্তি বোধ করলে, কিন্তু সেই সঙ্গে এল একটা নির্ভরতার ভাবও। উঃ, সমীরের হাতটা কি শক্ত, যেন ইস্পাতের সাঁড়াশী। গৌরী ভাবলে, পুরুষের হাতই বটে!

মাঝে মাঝে ফোঁফরের কাছে অল্প আলো হয়। সমীর গৌরীর হাত ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, দেখতে পাচ্ছ সব, এবার আলোয় চটপট উঠে এসো। পুনর্ব্বার হাঁক দেয়—সদা—

হাঁপাতে হাঁপাতে সদাশিব উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আর কতদূর ?

সমীর বলে, আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দর—

বৌদি বলে, সুন্দর নয়, সুন্দরী,-রবি ঠাকুর বলে গেছেন।

সমীর বলে, নিয়ে যাচ্ছি আমি, তুমি ত নও, তাই সুন্দর বলাই উচিত।

আবার অন্ধকার হলেই সমীর গৌরীর হাত ধরে তোলে। এবার আর গৌরী কোনো অস্বস্তি বোধ করে না।

কুতবের ওপোরে উঠে, সমীর বলে, আঃ, কি সুন্দর জায়গা! সদাশিবকে লক্ষ্য করে বলে, আচ্ছা সদা, এতদিন দিল্লীতে রয়েছিস, একবারও কুতবে আসিস নি ?

রেলিংটা ভালো করে চেপে ধরে সদা বলে, দূর এ সব ঘোরাঘুরি আমার ভালো লাগে না। কি হবে বলত এখানে এসে ?

রেণু অবাক হয়ে এক চক্ষে চারি পাশের বিরাট প্রান্তর হাঁ করে দেখতে থাকে। নীচে বড় বড় মানুষগুলো যেন পুতুলের মত মনে হয়, শ্রেণীবদ্ধ গাড়ীগুলো খেলা ঘরের গাড়ীর মত, একখানা বড় বাস গাড়ী দেখতে ঠিক যেন এক একটা দেশলাইয়ের বাক্স, শ্রেণীবদ্ধ চালা ঘরগুলো ঠিক যেন তাসের ঘর।

সদাশিব বল্লে, চল, আর নয়। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সমীর বল্লে, সন্ধ্যে হোল ত বয়েই গেল। বলেই বল্লে, একটা মজা দেখবে ?

গৌরী বল্লে, কি ?

সমীর ব্যাগ খুলে গোটা কতক আনি বেছে নিয়ে একটা নীচে ফেলে দিলে।

প্রায় আধ মিনিট সময় লাগলো আনিটা পড়তে। পড়ার পরেই একটা ছেলে দৌড়ে এসে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ওপোরের দিকে তাকাতে লাগলো।

আর একটা, আর একটা! নীচে আনি কুড়োবার জন্য অর্দ্ধনগ্ন ছোকরাগুলোর মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি মারামারি লেগে গেল।

সদা বল্লে, কি হচ্ছে ও সব ? শেষকালে একটা মারামারি বেঁধে গেলে আমরা দায়ী হয়ে পড়বো।

গৌরীর মনঃস্ফূর্তি। স্বামীর কথা শুনে তার চৈতন্য হোল। বল্লে, না ঠাকুরপো আর না। গরীবের ছেলেগুলোকে ওরকম করে ভিখারী বানিও না। সমীর কিন্তু থামে না, একটার পর একটা সে ফেলেই চলল।

এর কিছুক্ষণ পরে ওরা নেমে এলো। আসবার সময় সব আগে সদাশিব, পেছনে গৌরী আর রেণু, সব শেষে সমীর।

কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই গৌরী পেছিয়ে পড়লো, রেণু রইল সদাশিবের ঠিক পেছনে এবং গৌরীর ঠিক পেছনেই সমীর।

অন্ধকারে গৌরী স্পষ্ট অনুভব করলে, সমীর তার কাঁধের ওপোর হাত দিয়ে তাকে ধরে ধরে নামছে।

নীচে নেমে এসে পড়ন্ত সূর্য্যের আলোয় যখন সমীর গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তখন দেখলে তার কপালে ঘাম জমে গেছে, এবং গৌরীর মুখখানা আরও যেন বেশী লাল হয়ে উঠেছে।

সমীর হাসতে হাসতে বললে, আর একবার উঠবে নাকি ?

ব্যস্ত হয়ে সদা বললে, না, আবার কি ?

হাসতে হাসতে সমীর বললে, তুই বিশ্বাস করিস সদা যে, আবার ওখানে আজই উঠবো।

সদাশিব বললে, তোমার কাছে কিছু'ই বিচিত্র নয়।

এরপর সকলে মিলে গেল পাশের মন্দিরে। ছোট্ট রাম-সীতার মন্দির, সেখানে প্রসাদরূপ ভিজে ছোলা নিয়ে সমীর তার ভাগটা অর্দ্ধেক দিলে বৌদিকে, অর্দ্ধেক রেণুকে। রেণু প্রথমটা নেমে না, তারপর হাত বাড়িয়ে নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে নিলে।

এরপর ওরা গেল হাউস-ঘাটে। এটা একটা বড় কুণ্ড, অনেকটা চৌবাচ্চার মতো। স্থানীয় ছেলেগুলো টের পেয়ে গেছে যে, বাবু খুব পয়সা ছড়ায়। তারা দল বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে আসছে। এখানকার ছেলেরা খুব উঁচু থেকে ঐ চৌবাচ্চার জলে ডাইভ করে যাত্রীদের খেলা দেখায়, পয়সা নেয়। দুটো ছেলেকে ইসারা করতেই তারা ডাইভ খেলে এবং তারপর আট আনা করে দুজনে সমীরের কাছ থেকে এক টাকা বখসিস নিয়ে নিলে।

ওদের ডাইভ দেখে সমীর বললে, এর চেয়েও উঁচু জায়গা থেকে আমরা ঝাঁপ খেয়েছিলুম কর্ণফুলি নদীর মধ্যে, চট্টগ্রামের ডকের কাছে।

গৌরী বললে, দেখ ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে আমি কোন কথাই কইবো না।

অপরাধ? সমীর প্রশ্ন করলে।

গৌরী বললে, কতদিন বলেছি তোমার ঐ সব দিনের গল্প বলতে, কিন্তু একদিনও তোমার সময় হোল না সেই সব কথা বলার। তুমি জানো, আমি তোমাদের বিপ্লবী-দের সমস্ত বই পড়ে শেষ করে ফেলেছি, আর তোমার কাছ থেকে সজীব বর্ণনা শুনতে আমার সাধ, কিন্তু তুমি তা মোটেই শোনাচ্ছ না।

সদাশিব বললে, বাস্তবিক সমীর, তোমার ঐ সব কাজের জন্য তোমাকে আমি খুব বড় বলে মনে করতুম, আর এখন দেখি তুমি কেবল রাতদিন ফষ্টি-নষ্টি নিয়েই আছ।

সমীর হো হো করে হেসে বললে, বা রে, এখন এই স্বাধীন ভারতেও কি আবার মারপিট করবো নাকি? এখন একদল লোকের সঙ্গে দেশের সমগ্র লোকের বোঝাপড়া ভোট দিয়ে, তর্ক করে, প্ল্যান মাফিক কাজ হবে, আর আমরা অর্থাৎ পূর্ব্বে যারা সৈনিক ছিলুম, তারা এখন ফূর্তি করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবো। যে স্বাধীনতা আমাদের কাম্য ছিল তা ত এসেছে; এখন এর মেণ্টেন্যান্স যে পারে করুক।

কিন্তু তোমাদের জহরলালজী কি বলছেন, সদাশিব প্রশ্ন করলে।

যাই বলুন, এখন যুদ্ধে জয় হয়ে গেছে। এবার সৈনিকরা নিশ্চয়ই বিশ্রাম করবে।

[ক্রমশঃ

শূন্যের তারা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

শূন্যের কোলে দোলে যত তারা
যুগযুগান্ত ধরি',
আমি শুধু ভাবি,—এমন করিয়া
কে তা'দের তোলে গড়ি'!
দূরে থরে থরে ঝিক্ ঝিক্ করে
সারা অম্বর ব্যেপে,—
তা'দেরই আলোক আঁধারে ধরায়
ওঠে শুধু কেঁপে কেঁপে :
চল জলে ঝলে, মাঠের ফসলে
চুপে চুপে বারে বারে
বোনে মায়া জাল, ফলেরে রসাল
করে বুঝি আলো-ধারে!
পথের চলার পিপাসা বাড়ায় ;
আলো শুধু আলো নহে ;
আলোর ভিতরে গোপনে গোপনে
প্রেমেরই প্রবাহ বহে।
শূন্যের প্রেম নীরবে নিভৃতে
মাটিরে মধুর করে।
বিস্ময়ে ভাবি শূন্যের দাবি
কী ভাবে মাটির ঘরে
চির মহিমায় প্রতিষ্ঠা পায়!
যোগাযোগ কে বা রাখে!
যত তারা হেরি, তত প্রাণ মোর
মুগ্ধই হ'তে থাকে।

২

অসীম শূন্য যত দূরে চাই,—
অনাদি অন্তহারা ;
তা'রই বুকে জলে অনন্ত পলে
অসংখ্য যত তারা।
আলোর পাহারা, তিমিরে হারাতে
দেবে না কিছুতে কা'রে ;
আলোর ফোয়ারা খুলিয়া ধোয়ায়
নিয়ত তমিস্রারে!
আলোকে আঁধারে এত মেশামেশি—
ঘেষাঘেষি অনিবার
ভয় যে ভুলায় রহস্যমাখা
ঘিরে রাখা অজানার।

তারায় তারায় কা'র আঁখি-তারা '
ঝলকিত হ'তে থাকে?
তিমিরে তিমিরে কা'র কা'লো কেশ
দুলিছে লক্ষ পাকে?
এলানো বেণীর আড়াল রাখিয়া
রহস্যময়ী কে সে
আকাশ—মাটির মিতালি-পাতানো
মাধুরী মোহিনী-বেশে
ভুলিছে শুধু? ভাবিয়া ভাবিয়া
দিশাহারা হয় হিয়া।
শুধু তারা নয়, কে খেলিছে খেলা
নিখিল বিশ্ব নিয়া?

৩

তারারে মানুষ জড় যদি ভাবে,—
ভাবে যদি আলোহীন
কি বা আসে যায়? কি বা আসে যায়
রাতেরে ভাবিলে দিন?
মহাশূন্যের তারার ধারার
অনিবার লীলা যত
তবু যে চলিবে ; তারারা ঝলিবে
গগনে অব্যাহত।
অনাদি কালের অনাদি ধারায়
ফুটিয়া টুটিয়া শেষে
যোগে বা বিয়োগে—গুণনে বা ভাগে
অনামা—অনাদি দেশে
আপাত অদল-বদলে তবু তো
যা' আছে রহিবে তা-ই।
শূন্যের কোলে তারা যত দোলে,
তত যে ভুলিয়া যাই।
তারার পিছনে যা'র তারা-আঁখি
অনিবার জেগে থাকে,
ভুলায়—দুলায়—মিলায় লীলায়,
কে হেথা ভুলিবে তা'কে!
লক্ষ যুগের লক্ষ বাঁধনে
আপাত চেতনে—জড়ে
সে মহাশক্তি মহোল্লাসে কি
মহালীলা নাহি করে?
তারার আলোকে তা'রই উদ্ভাস
লভিছ না অন্তরে?

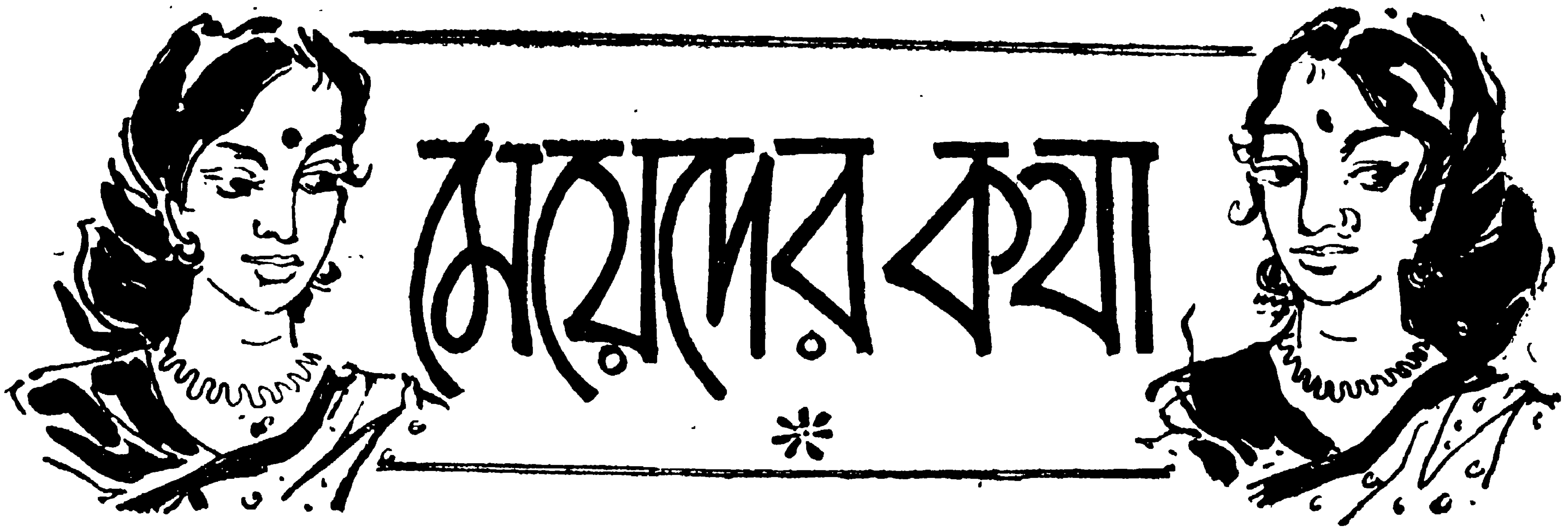

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নারীর স্নেহ ভালোবাসার কাছে পুরুষ মানুষ কেমন করে আত্মসমর্পণ করে সে কথা কবি বলেছেন। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পুরুষ মানুষ যেন কত ভয়ানক, কত শক্তিশালী, কত দুর্দান্ত। কিন্তু আসলে তা নয়। 'গোড়ায় গলদ' বইতে কমল বল্‌ছে ইন্দুকে—"তুই যা মনে করিস ভাই, পুরুষ মানুষ নিতান্তই বাঘ ভালুকের জাত নয়। বাইরে থেকে খুব ভয়ংকর দেখায়, কিন্তু ওদের বশ করা খুব সহজ। একবার পোষ মানলে ঐ মস্ত প্রাণীগুলো এমনি গরীব গোবেচারা হ'য়ে থাকে যে দেখে হাসি পায়।"

'গোড়ায় গলদ' উপন্যাস কবি সমাপ্ত করেছেন নারীর স্তব গান ক'রে। সেখানে কবি লিখেছেন—নারী না হ'লে পুরুষের ঘর অন্ধকার। নারী চরিত্রের নানা বিচিত্ররূপ আছে। কেউ বা স্রোতস্বিনীর মত স্নিগ্ধ নম্র, কেউ বা দীপ্তির মত বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, প্রখর। কারো বা চোখে ছলছল জলের আভাস। কারো বা কথায় বিদ্যুতের ঝলক। অনেক সময় নারী মুখে রাগ দেখায়, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যেন পায়ে ধ'রে মিনতি জানায়। পুরুষ যেন পিপাসা, নারী যেন পিপাসার অমৃত। পুরুষ যেন ক্ষুধা, নারী যেন তৃপ্তি। নারীর কথা বল্‌তে গিয়ে কবি ভাবেন তার হাতে যেন যথেষ্ট কথার সম্বল নেই। নারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে কবির কথার ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। কবির চোখে সব মেয়েকেই ভালো লেগেছে, তা সে আলোর দীপ্তিই হ'ক আর স্রোতস্বিনীর জলধারাই হ'ক, সে গৌরীই হ'ক বা সে কালোই হ'ক।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় কবি বলেছেন নারীর প্রেম পুরুষকে এক অভাবনীয় রাজমর্যাদা দান করে। সংসারের চোখে যে সব চেয়ে মূল্যহীন, প্রেমের মধ্যে তার চেয়ে মূল্যবান সংসারে আর কেউ নেই। যে যাকে ভালোবাসে সে তার কাছে জগতের সমস্ত সম্পদের সমস্ত গৌরবের বাড়া। প্রেম মানুষকে দেয় চরমতম সম্মান। কবি লিখেছেন—

"হেথা আমি কেহ নহি,
সমুদ্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্রভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শত সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া নাহি জানি
কী কারণে অয়ি মহিয়সী মহারানী—
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান।"

কবি লিখেছেন—*

"আজি—
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ সুধা পানে
অংগ মোর হয়েছে অমর।"

নারী পুরুষকে দিয়েছে রাজার সম্মান, দিয়েছে দেবতার অমরতা। নিতান্ত যে তুচ্ছ তাকেও সে আপনার প্রেমের রাজ্যে একচ্ছত্র রাজত্বে অভিষেক ক'রে নিয়েছে, প্রেমের অমৃত পান করিয়ে তাকে দেবত্বে অভিষেক করেছে।

"স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতায় কবি স্বর্গের অপ্সরীর চেয়েও এই মর্ত্যের মানবীর শ্রেষ্ঠতার কথা বর্ণনা করে লিখেছেন—নারী পুরুষের জন্যে ছোট বেলা থেকে শিব পুজো করে। তারপরে যেদিন সে তাকে পায়, সে দিন তাকে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত, দেব পূজার পুণ্য ফলের মত, আপনার জীবনে বরণ ক'রে নেয়। যে দিন নারী গৃহে আসে, তার পরদিন থেকে সে সুখে দুঃখে পুরুষের সংগিনী। তার যত দুঃখ দুর্দিন, তার মধ্যে সান্ত্বনা সঞ্চার ক'রে রাখে নারী। ঠিক যেমন সমুদ্রের শিয়রে চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের কালোবুক আলো হ'য়ে ওঠে ঠিক তেমনি সংসারের সমস্ত দুঃখ বেদনা অপমানের আবর্ত নারীর প্রেমে পুরুষ সহ্য করতে পারে। পুরুষের বেদনার ওপরে নারীর স্নিগ্ধ হাতের সেবা যেন প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। তার মুখের প্রেমচ্ছবি জীবনের সমস্ত কালোকে আলোকিত ক'রে তোলে। কবি বলেন মানুষ মিথ্যেই স্বর্গের অপ্সরীর কল্পনা করেছে। মর্ত্যের তুচ্ছতম নারীও যে স্বর্গের অপ্সরীর চেয়ে ভালো। কারণ তার প্রাণে আছে প্রেম ও ভক্তি, আছে প্রেমের বেদনা। তার কাছে মানুষ পেয়েছে প্রেমের পরম মূল্য। যে নারীর প্রাণে প্রেমের বেদনা নেই তেমন অপ্সরীর জন্যে কবির লোভ নেই। কবির যে মাঝে মাঝে এই পৃথিবীকেই স্বর্গ ব'লে মনে হয় সেও এই মর্ত্যের প্রেয়সীরই জন্যে। বসন্তের জ্যোৎস্না রাতে ঘুমহারা কোকিল যখন রাতকে দিন ব'লে ভুল ক'রে দূরের বন-শাখায় ডাকতে থাকে, যেদিন ফুলের গন্ধ ব'য়ে নিয়ে আসে দক্ষিণের বাতাস, সেদিন প্রেয়সীকে বাহুবন্ধনে বেঁধে কবির যে আনন্দ, সেই কবিকে স্বর্গ সুখের স্বাদ জানিয়ে দেয়। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন সুখের জন্যে কবির মনে কোন আকাঙ্খা নেই।

কবি আপন বিরামের নীড় খুঁজে পেয়েছেন নারীরই প্রীতি স্নিগ্ধ অন্তরে। 'দিন শেষে' কবিতায় কবি যে দেশের বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে আছে শ্বেত পাথরে গড়া পথ, তার দুপাশে বকুল গাছের সার। ঝরা বকুলের ফুলে সে পথ ছাওয়া। তার দুধারে সারি সারি নিকেতন, আর বেড়া দেওয়া উপবন। দূরে দেখা যায় মন্দিরের ত্রিশূল, বিকাল বেলাকার অস্ত সূর্য্যের রঙে রঙীন মেঘের প্রতিফলিত আলোতে ঝলমল করছে। রাজপ্রাসাদ থেকে পূরবী রাগিণীর সুর ভেসে আসছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আছে সেই তরুণী। সে জল ভরতে এসেছে ঘাটে। কবি পথিক যখন তাকে প্রশ্ন করল এ কোন দেশ, তখন সে কোন জবাব না দিয়ে ভরা ঘট কাঁখে নিয়ে নতমুখে চলে গেল। তার ভরা কলসের জল, তার দ্রুত পায়ের ছন্দে ছল্‌কে ছল্‌কে পড়তে পড়তে গেল। এই তো কবির দিনশেষের বিরামের যোগ্য মনের মত দেশ। জীবনের লাভ ক্ষতি কীর্তি, খ্যাতি, উচ্চাশার পিছনে ছোটা, সব কিছু ফেলে কবির মন চায় এই দেশে বিশ্রাম করতে। লজ্জিতা তরুণী যেখানে পথের বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, সেইখানেই কবির ঘর বাঁধবার ইচ্ছা। ওই তরুণীর প্রেমে ঠাঁই পেলে কবির আর কোন দুরাশার প্রতি লোভ নেই। নারীর প্রেমকেই কবি জীবনের সব চেয়ে বড় লাভ ব'লে জেনেছেন। নারীর প্রেমেই কবির অন্তরাত্মার একান্ত পরিতৃপ্তি। এই যে ঝরা বকুলে ছাওয়া পথ, উপবনে ঘেরা নিকেতনে শোভিত পুরী—রাজ-প্রাসাদের পূরবী রাগিণীর সুর আর মন্দির চূড়ায় সন্ধ্যার সূর্য্যালোক—সব কিছু মিলে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য-লোকের বর্ণনা দিয়েছেন এসব কিছুই নারীর প্রেমের নিভৃত বিরাম-নিকেতনের বর্ণনা। এ সুন্দর পুরী নারীরই প্রীতি স্নিগ্ধ অন্তর। এইখানেই কবির দিন শেষের বিশ্রাম।

"যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচা কেনা ফেলে যাই এখনি
…　　…　　…

যেখানে পথের বাঁকে
ভরাঘট লয়ে কাঁখে
গেল চ'লে নত আঁখে তরুণী
এইখানে বাঁধো মোর তরণী।"

পুরুষ যখন বাইরের সংসারে ব্যথা পেয়ে ঘরে ফিরে আসে তখন নারী আপন অন্তরের সান্ত্বনা নিয়ে তার সব ক্ষোভ দূর ক'রে দেয়। যুগলের রচিত এই ঘরের মধ্যে নারী পুরুষকে একচ্ছত্র রাজার মত ক'রে রাখে। এখানে বাইরের সংসারের কোন অধিকার নেই। এই ঘরখানিতে যে প্রদীপ জ্বলে তার আলোতে যতটুকু আলোকিত হয়, সেইটুকুই হ'ল যুগলের সংসার সীমা। এর বাইরের সংসার এর বাইরেই প'ড়ে থাকে।

"একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধার যতটুকু
আলো ক'রে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে।"

হয়ত' নারী প্রতীক্ষা ক'রে আছে তার প্রিয়তমের জন্যে উৎসবের আয়োজন ক'রে, হয়ত' সে রাণীর মত সেজে ব'সে আছে তার রাজাকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে, কিন্তু যেদিন পুরুষ বাইরে থেকে আহত চিত্ত নিয়ে ঘরে ফিরে আসে সেদিন নারী মুহূর্ত্তে তার উৎসবের কথা ভুলে গিয়ে তার প্রিয়তমকে আপন বুকের সান্ত্বনার মধ্যে টেনে নেয়। সেদিন গাঁথা মালা পড়ে থাকে, সোনার বীণায় যে নূতন তার পরিচয়ে রেখেছিল মিলন উৎসবে বাজাবে বলে, তাও পড়ে থাকে একধারে। যে প্রদীপ জ্বেলেছিল তা নিভিয়ে দেয়। শুধু বেদনাকাতর প্রিয়তমের মাথাটি আপনার বুকে টেনে নেয়। প্রেমের উৎসব সেদিন আর হয় না। সেদিন নারী উৎসব ভুলে গিয়ে নিয়ে আসে একান্ত সান্ত্বনা। তার হৃদয়বীণার উৎসবের সোনার তারটি সেদিন আর বাজে না। বেদনার মধ্যে, নিরুৎসবের মধ্যে এই যে নারীর সঙ্গে মিলন, পুরুষের কাছে এ সমস্ত উৎসবের বাড়া হ'য়ে ওঠে। এমনি করে পুরুষের পরম দুর্দিনকে পরম দুর্লভ সুন্দর সুদিন ক'রে তোলে নারী।

(সান্ত্বনা—চিত্রা)

কবির আশার সীমানা এসে থেমেছে নারীর প্রেমে। জগতে কামনার আর যত ধন আছে, তার মধ্যে এমন কোন ধনই নেই যা পেলে মন বলতে পারে যে আর চাইনে। কীর্ত্তি, খ্যাতি, বিলাস, প্রমোদ, সম্মান, রত্নহার, প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য—এ সমস্ত উপভোগ করেও মন বলে যে আরও চাই, কিন্তু প্রিয়াকে পেলে মন ছোট একখানি গৃহ-কোণ নিয়েই সম্পূর্ণ খুশী।

"বিশ্ব মথন সফল যতন
সফল রতন হার
সব পাই যদি তবু নিরবধি
আরো পেতে চায় মন
যদি তারে পাই—তবে শুধু চাই—
একখানি গৃহ কোণ।

(আশার সীমা—৫ম খণ্ড)

এই নারীর আসল সৌন্দর্য্য কোন্‌খানে সেকথা সন্ধ্যা সঙ্গীতের কিশোর কবির চোখেই ধরা পড়েছিল। রূপ মুগ্ধ কিশোর কবিকে সেখানে নারী ফাঁকি দিতে পারেনি। পর জীবনে নারীর সৌন্দর্য্যের প্রতি কবির যে দৃষ্টির গভীরতা আমরা দেখতে পাই, কবির কৈশোর কাব্যেই তার সূচনা দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যা সঙ্গীতে কবি নারীর মধ্যে করুণাকেই ব'লেছেন সৌন্দর্য্য। যে নারী করুণাহীন তার রূপের মধ্যে কবি সৌন্দর্য্য দেখতে পান নি। কবি লিখেছেন—

"প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
করুণারে করেছ পীড়ন
প্রতিদিন ঐ মুখ হ'তে
ভেঙে গেছে রূপের মোহন।
কুবলয় আঁখির মাঝারে
সৌন্দর্য্য পাই না দেখিবারে
হাসি তব আলোকের প্রায়
কোমলতা নাহি যেন তায়
তাই মন প্রতিদিন কহে
নহে নহে এজন সে নহে।
শোন বঁধু শোন আসি
করুণারে ভালোবাসি
সে যদি না থাকে তবে
ধুলিময় রূপরাশি।

তোমারে যে পূজা করি
তোমারে যে দিই ফুল
ভালোবাসি ব'লে যেন
কখনো ক'রো না ভুল।
যে জন দেবতা মোর
কোথা সে আছে না জানি
তুমি তো কেবল তার
পাষাণ প্রতিমা খানি।
তোমার হৃদয় নাই
চোখে নাই অশ্রু ধার
কেবল রয়েছে তব
পাষাণ আকার তার।

(পাষাণী, সন্ধ্যা সঙ্গীত)

কিশোর কবির এই কবিতা প'ড়ে মন উৎসুক হ'য়ে ওঠে, এ কোন পাষাণীর কথা কবি লিখেছেন। কবি যে অভিজাত ধনী বংশে মানুষ হয়েছেন, সেখানকার দুনিয়ায় এমনি পাষাণীর দেখা পাওয়া হয় ত' সত্যিই কবির জীবনে ঘটেছিল। কিন্তু তার নাম খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় আজ আর নেই। কিন্তু থাক্, নামে কী দরকার। সংসারের সব পাষাণীরাই কবির এই তিরস্কারের পাত্রী। হৃদয়হীন নারীর রূপ যেন প্রাণহীন পাষাণের প্রতিমা। তার প্রতি কবির কোন লোভ নেই।

কিন্তু যেখানে কবি নারীর মধ্যে এই করুণা দেখেছেন সেখানে তার ক্ষণিকের প্রভাব কবির চিরজীবনকে প্রভাবিত করেছে।

কিশোর কবির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বিদেশিনী নারীর। দুদিনের সেই পরিচয়, কিন্তু সেই দুদিন কবির কাছে শত শত বছরের চেয়েও বেশী মূল্যবান্। তার অর্থ শত বছরের সময়কেও অতিক্রম ক'রে যায়। এ দুদিন কতটুকুই বা সময়। প্রকৃতির রাজ্যে এ দুদিনে কোনই পরিবর্তন ঘটে নি, যা যেমন ছিল তা তেমনিই আছে। যে গাছের পাতা শরতে ঝ'রে পড়েছিল এ দুদিনে তা আবার মুকুলিত, অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে নি। শৈল শিখরে যে তুষার পড়েছিল, তার এক কণাও গলে যায় নি কিন্তু কবির কাছে এ দুদিনের মূল্য চিরন্তন কালের বুকে চির অঙ্কিত হ'য়ে রইল।—

"কিন্তু এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া—
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া—
দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে।"

(দুদিন, সন্ধ্যাসঙ্গীত।)

আবার ঔৎসুক্য জাগে, এ কোন বিদেশিনী মমতাময়ীর কথা কবি লিখেছেন? কবির জীবনী থেকে মনে হয় নিশ্চয় কবির কৈশোর সঙ্গিনী ইংল্যাণ্ডের ডাঃ স্কটের মেয়েদের কথা। তাদেরই মধ্যে কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে কবি এই কবিতা লিখেছিলেন। সেই প্রবাসে কবি যে আতিথ্য, যে স্নেহ ও প্রীতি ঐ পরিবারের মেয়েদের কাছে পেয়েছিলেন, কবির জীবনের সেই পুণ্য স্মৃতি তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। এই জাতীয় জীবন-স্মৃতিই পরবর্তী জীবনে কবির রচনায় প্রকাশ পেয়েছে—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

কিশোরের স্বপ্ন একদিন ভেঙে গেল, আকাশে-বাতাসে নারীর চঞ্চল পায়ের অদৃশ্য ধ্বনি যে কবি শুনতে পাচ্ছিলেন, হয় ত' তা কবির কাছে ঈষৎ অস্পষ্ট হ'য়ে গেল, কিন্তু তাই ব'লে নারীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা ম্লান হ'ল না। উষালোকের অস্পষ্টতায় যাকে রঙীন রঙে রাঙিয়ে কবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাকেই যখন পরিণত যৌবনে স্পষ্ট দিনের প্রত্যক্ষ আলোকে কবি দেখলেন, তখন তাঁর শ্রদ্ধা আরও গভীরতর হ'য়ে উঠল। তখন তিনি বৈজ্ঞানিকের মতই নারীকে বিচার এবং বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেন। কিন্তু এই বিশ্লেষণের ফলে অসুন্দরকে না দেখে তিনি সুন্দরকেই দেখতে পেলেন। অস্পষ্ট আলোয় যে ছিল মোহময়ী স্পষ্ট দিবালোকে সে হয়ে উঠল মহিমময়ী।

[ক্রমশঃ]

যুগে যুগে রূপসাধনা

মীরা রায়

প্রকৃতির রাজ্যে রূপের লক্ষ্য আকর্ষণ, আকর্ষণের লক্ষ্য সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রেরণায় ও সৃষ্টি রক্ষার যে প্রবৃত্তি পরস্পর পরস্পরকে লোভনীয় ও আকৃষ্ট করে তোলে সেই প্রবৃত্তি রূপসাধনার জন্মদাত্রী। সৃষ্টির তাগিদে রং গন্ধের বিজ্ঞাপন মেলে দিয়ে গাছপালা মিলনের দূত কীটপতঙ্গকে আহ্বান জানায়। এটি প্রকৃতি জগতের আর এক রূপসাধনা।

মানুষের বেলায় রূপচর্চার অর্থাৎ তার নিজেকে বিশিষ্ট রূপদান করবার চেষ্টায় নানাবিধ অলংকরণের প্রয়োজন ঘটে; সভ্যতার প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই অলংকরণের বা সৌন্দর্যসৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে উন্মেষ ঘটেছে তার পরিচয় বহন করে এসেছে যুগের সাহিত্য। সাজসজ্জার বেলাতে নারীর কথাই আগে মনে আসে কিন্তু সৃষ্টির কাজে দ্বৈত ভূমিকায় নারী পুরুষের কাছে একজনের কাছে আর একজনকে লোভনীয় করে তোলবার ইচ্ছাটা পারস্পরিক, তাই পুরুষের পক্ষেও অলংকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। যান্ত্রিক সভ্যতায় সদা কর্মব্যস্ত সময় সংক্ষিপ্ত বর্তমান যুগ জীবনধারণের পক্ষে দুরূহ সংগ্রামপূর্ণ, তাই বিস্তারিত রূপচর্চার অবকাশ এ যুগে খুব কম, কিন্তু প্রাচীন যুগে সহজ সরল জীবনযাত্রায় রূপসাধনার যথেষ্ট অবকাশ থাকায় নারী পুরুষ উভয়েই চিত্তের এই সুকুমার বৃত্তিচর্চায় আত্মনিয়োগ করত; তাই রূপচর্চার আলোচনা করতে গেলে প্রাচীন যুগের রূপানুশীলন তত্ত্বটাই প্রধান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীনকালে সাজসজ্জার কথার উল্লেখ পাওয়া যায় চীন, এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া আর মিশরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। সেকালের চীনদেশে বস্ত্রশিল্পে, পুষ্পসজ্জায়, কেশবিন্যাসে ব্যাপক সৌন্দর্য চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। মিশরের পুরোহিতরা তিসির তেলের সঙ্গে নানা ফুলের মঞ্জরী, ধুনো ইত্যাদি মিশিয়ে সুগন্ধি তেল তৈরী করতেন যা মিশরীয় নারীপুরুষ অঙ্গরাগের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করত। মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা মিশরের নারীকুলের সৌন্দর্য চর্চার মুখপাত্র ছিলেন, তাঁর দেহচর্চায় নানাবিধ ফুলের রং ব্যবহার করা হ'ত, এবং সেযুগে মিশরীয়রা সবুজ রং, গাঢ় কালো কাজল ইত্যাদি চোখের নীচে ও পাতায় লাগিয়ে এক সম্মোহনী দৃষ্টি দিয়ে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করত। এ ছাড়া তারা হাতে ও

পায়ে লাগাত পুষ্পরেণু। অঙ্গসৌষ্ঠব রচনায় ইহুদী নারীদের মধ্যে এবং মধ্যপ্রাচ্যে মুস্লীম রাজ্যগুলিতে যে বিভিন্ন রকমের প্রয়োগ প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তার পরিচয় রয়েছে ইসলাম ধর্মের কোরাণশরীফে।

মধ্যযুগে পারস্য ও আরবে রূপচর্চার সমধিক পরিচয় পাওয়া গেছে। পারস্যের কন্যা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান গোলাপ নির্যাস থেকে আতর সৃষ্টির প্রথম পথপ্রদর্শিকা। পারস্য থেকেই ভারতে আতর ও নানাবিধ সুগন্ধের প্রথম আমদানী হয়। বস্‌রার গোলাপ সেকালের সৌন্দর্যসাধনার এক বিশিষ্ট উপকরণ ছিল। যে সব সুরভিত গন্ধদ্রব্য বিভিন্ন গাছপালা থেকে তৈরী হ'ত তার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হ'ত পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায়। ক্রমে ইউরোপের ও ভূমধ্য সাগরীর দেশগুলি প্রাচ্যের এই সম্পদগুলির সন্ধান পাওয়ায় সেখান থেকে বণিকের দল বাণিজ্যের লোভে প্রাচ্যের বন্দরগুলিতে পাড়ি জমাবার চেষ্টা চালাতে থাকে। ঠিক এই কারণেই ভারতভূমির টানে ভাস্কো-ডাগামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতে পদার্পণ ক'রে ভারতে পশ্চিমী বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। ক্রমে ইউরোপের নানাদেশীয় বণিকের দল গন্ধদ্রব্য ইত্যাদির লোভে ভারতে এসে বসবাস সুরু করে এবং এর পরবর্তী ফলস্বরূপ ভারত তথা প্রাচ্যের বুকে রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তনের খেলা আরম্ভ হয়, অর্থাৎ পশ্চিমের ঔপনিবেশিক তন্ত্র এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কায়েমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রধান কারণ ইউরোপের সৌখীন সমাজে প্রাচ্যদেশীয় গন্ধ দ্রব্যাদির সাজসজ্জার উপকরণের বিরাট চাহিদা ছিল।

গ্রীক সাম্রাজ্যের ও রোম সাম্রাজ্যের চরম গৌরবের দিনে সে দেশগুলির অঙ্গরাগ চর্চাও গৌরবের শীর্ষদেশে উঠেছিল। সম্রাট নীরোর স্ত্রী রানী পাপিয়া দেশের অত্যন্ত দুর্দ্দশার সময়েও চরম বিলাসিতা ও রূপচর্চায় মগ্ন থাকতেন। রোমের রমণীগণ গলদেশীয় একরকমের সাবান ব্যবহার করে এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে কেশবিন্যাস করতেন তার প্রচুর পরিচয় বহন করছে সে যুগের রোমান চিত্রকলা। গ্রীসদেশীয় নারীদের মধ্যে আর এক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ চূড়া বাঁধার রীতি প্রচলিত ছিল। গ্রীসদেশের প্রাচীন ছবিগুলিতে এই কবরী-রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। ইউরোপের সংগ্রহশালায় প্রাচীন রোমান আমলের বিভিন্ন প্রসাধন পাত্রের নিদর্শন আছে। ইউরোপের সবচেয়ে সৌখীন ও অলংকরণ প্রিয় জাতি ফরাসীদের সাজসজ্জা ও রূপসাধনার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া গেছে। সাজসজ্জার বিবিধ উপকরণ উৎপাদনে প্রমোদনগরী ফ্রান্স আজও জগতে সর্বপ্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত। ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই প্রসাধন কলায় অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজপরিবারের মেয়েদের গায়ের রং পরিষ্কার করবার জন্য স্পেন থেকে কোকো এবং ভ্যানিলা ক্রীম আমদানি করা হ'ত। সম্রাট নেপোলিয়ান ও রানী জোসেফাইন সৌন্দর্য-চর্চার জন্য সে যুগে বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। অষ্ট্রীয়ার রানী এ্যানও প্রসাধন বিলাসিনী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করবার জন্য সুরাস্নান করতেন; এই প্রণালীতে স্নানপর্ব অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় তাঁর রাজ্যের অন্যান্য নারীগণ ভেড়ার দুধে স্নান করতেন। ইংলণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথও দেহচর্চা ও সৌন্দর্য সাধনায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। ইতিহাসেও তাঁর এই সৌখীন মনোবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ডে রূপচর্চা এত ব্যাপক ও ভীষণভাবে প্রচলিত হ'তে থাকে যে দেশের যুবসমাজের চরম বিলাসী মনোবৃত্তির নিরোধকল্পে সরকারকে বাধ্য হয়ে পার্লামেণ্টে প্রসাধন নিয়ামক আইনের খসড়া আনয়ন করতে হয়।

সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপ ছাড়া আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে আদিম ও বর্বর উপজাতি মানুষদের মধ্যে তাদের সমাজোপযোগী সাজসজ্জার ও অঙ্গরাগের প্রভূত প্রমাণ ইতিহাস বা ভ্রমণোপাখ্যানের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। বুনো ফুলের সাজ, পাখীর পালক, পুঁথি-কড়ির গহনা, তামা পিতলের আভরণ, শিকার করা জীবজন্তুর ছাল, চামড়া, হাড় ইত্যাদি আদিম উপজাতিদের এক বিচিত্র বন্য রূপসজ্জার প্রধান উপকরণ ছিল। সময়ে সময়ে এদের সজ্জাপদ্ধতিতে নৃশংসতার চরম পরিচয়ও পাওয়া গেছে। গায়ের চামড়ায় খোদাই করে উল্কি কেটে চিত্র বিচিত্র এঁকে সমস্ত শরীরকে সৌন্দর্যসাধনায় নিয়োগ করা হয়। আগেকার যুগে চীন ও মঙ্গোলিয়ায় মেয়েদের ছোট থেকেই লোহার জুতা পরিয়ে পদযুগলকে পিষ্ট ও খর্বাকৃতি করে

রাখার মধ্যে নৃশংস রূপচর্চার আর একরকমের নিদর্শন পাওয়া যায়। লৌহ পাদুকায় নিষ্পেষিত সঙ্কুচিত পদদ্বয় চীনা নারীদের একসময়ে পরম রূপবতীত্বের চিহ্ন ছিল। পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে জাভা, বালী, সুমাত্রা, বোর্নিও ইত্যাদি দেশগুলিতে অতি পুরানো আমল থেকে বৌদ্ধধর্মীয় আঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের অপূর্ব সৌন্দর্য চর্চার আভাষ পাওয়া গেছে। এই দেশগুলির মেয়েদের মধ্যে কেশবিন্যাস ও বেশবিন্যাসে নতুন রকমের অভিনবত্ব দেখা গিয়েছে; এদের অনুকরণে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ও বর্মার মেয়েরা আজও কেশবিন্যাস করে থাকে, এই বিন্যাসেই মভার্ণ যুগের ছোঁয়াচ আছে।

এশিয়ার পূর্বে সর্বশেষ বিন্দুতে রয়েছে জাপান দ্বীপ-পুঞ্জ। এ দেশটি সৌখীন সৌন্দর্যচর্চার জন্য বিখ্যাত। পুষ্প সজ্জায় জাপান পৃথিবীর সকলদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেছে। জাপানী নারীদের 'কিমোনো' পরিচ্ছদ, গ্রন্থী-বিহীন কবরী রচনা, জুতার বৈশিষ্ট্য ও ছাতার সৌন্দর্য সমস্ত পৃথিবীর দেশে দেশে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। রূপচর্চার সঙ্গে সূক্ষ্ম শিল্পসৃষ্টির এক অপূর্ব কৌশল করায়ত্ত করতে পেরেছে। ফুলের দেশের রাণী জাপান পৃথিবীর বৃহত্তর শহর টৌকিও ও তার মধ্যমণি 'গিনজয়ে' গেলে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ও শিল্পকলাকে কিভাবে রূপ-সাধনায় প্রয়োগ করা হয়েছে তা বোঝা যায়। বেশবাস পারিপাট্যে জাপান ও চীন অনেক বিষয়ে বিশ্বের পথিকৃৎ। সম্রাট্ হুয়ানতির পত্নী সাম্রাজ্ঞী সিলিং রেশম শিল্পের স্থাপয়িত্রী, যে রেশমবস্ত্র নারী পুরুষের রূপচর্চার একটি প্রধান উপকরণ। চীন ও জাপান এই রেশমশিল্পে বিশ্বে অগ্রাধিকার স্থান দখল করেছে।

বিদেশের কথা ছেড়ে দেশের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট রূপচর্চার প্রচলন ছিল। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে এবং বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে প্রসাধন রীতিনীতির উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের প্রসাধন সম্পর্কিত নির্দেশের মধ্য দিয়ে সে যুগের সাজ সজ্জার একটি চিত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকগুলিতে নারী-পুরুষের সৌন্দর্য সাধনার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। কুমারসম্ভবে উমা মহেশ্বরের বিবাহে, রঘুবংশে অজ ইন্দুমতীর বিবাহে, ঋতুসংহার কাব্যে, ভাসের বাসবদত্তা নাটকে, শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতে বর্ণাঢ্য রূপচর্চার আলেখ্য খুঁজে পাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, অমর-কোষ অভিধানে যে সব অঙ্গরাগের উল্লেখ আছে তার মধ্যে আছে কালাগুরু, শুক্লগুরু, হরিচন্দন, মনঃশিলা, লোধ্ররেণু, ধূপধুনার সুবাস, কুঙ্কুম, কজ্জল, গোরচনা, অলক্তক ইত্যাদি। হিন্দু দেবদেবীর পূজায় এইগুলির আজও প্রচলন আছে।

দক্ষিণ ভারত থেকে চন্দনের ও অগুরুর আমদানী হয়ে আজ সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মহিলারা গরমকালে চন্দন প্রলেপ, বর্ষাকালে কালাগুরু, শরতে শেফালিরেণু, হেমন্তে দারুচূর্ণ, শীতকালে দুধসর-ননীর প্রলেপ এবং বসন্তে প্রিয়ঙ্গুপরাগ, কুঙ্কুম আর মৃগনাভি দিয়ে সমস্ত শরীর সুসজ্জিত ও সুরভিত রাখত। অধরোষ্ঠ রাঙাবার জন্য তারা লাক্ষারস, কপালে হরিতালের তিলক, চোখে কজ্জল, কেশে ধূপধুনার সুবাস ব্যবহার করত।

অলংকরণ ব্যাপারে নারী অপেক্ষা পুরুষ কিছু কম ছিল না। এ যুগে পুরুষের অলঙ্কার শুনলে আশ্চর্য লাগবে। অথচ ভারতের ইতিহাস পুরাণে রাজা বা বিশিষ্ট পুরুষদের অলঙ্কার তাদের চরিত্রোপযোগী মর্যাদা দিতে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁরা মাথায় পরতেন চূড়ামণি মুকুট; কাণে কুণ্ডল, মোচক, কীল, কণ্ঠে মুক্তাবলী, সপ্তসূত্রহার; আঙুলে কণ্টক, অঙ্গুলিমুদ্রা; হাতে হস্তাবলী বলয়; কব্জীতে উচিতিক; বাহুতে কেয়ূর অঙ্গদ; বক্ষে ত্রিসর; কোমড়ে সরল সূত্রক, আজকের দিনে অবশ্যই এগুলি বিলুপ্তপ্রায়। নারীদের শিরোভূষণ ছিল সিঁথিপাটি; কণ্ঠে মুক্তাবলী, ব্যালপংক্তি, মঞ্জরী, রত্নমালিকা, হেমসূত্র; বক্ষে মণিজাল বন্ধন; বাহুতে অঙ্গদ, বলয়; হাতে বজুর, স্বদিতিক; আঙুলে কটক, কলসখ, হস্তপাত্র, সুপুরক; কোমড়ে কাঞ্চী, মেখলা, কুলক, রসনা, কলাপ, পায়ে নূপুর, কিঙ্কিনী, রত্নজালক, জানুতে পদপত্র; পায়ের পাতায় অঙ্গুলিয়ক ও তিলক। এগুলিরই নানা পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ বর্তমানের অলংকরণ পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে, যদিও এদের তালিকা ও ওজন ক্রমশঃই হ্রাস পেয়ে আসতে আসতে আজ নামমাত্রে এসে দাঁড়িয়েছে।

এর সঙ্গে ছিল বস্ত্র ও বর্ণসমারোহ। পুরুষের রাজসিক বেশে ছিল কিংখাব, পট্টাম্বর, চীনাংশুক, এবং নারীদের ছিল মেঘডম্বর, লক্ষ্মীবিলাস, উদয়তারা, আসমানতারা, অগ্নিপাট,

মসলিন, নীলাম্বরী ইত্যাদি বস্ত্র। অলংকার ও বেশভূষার সঙ্গে বর্ণসৃষ্টি করে সামঞ্জস্য প্রয়োগ রূপতত্ত্বে একটি আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। সাদা আর নীল রং মিশিয়ে তৈরী হ'ত পাণ্ডু, সাদা আর লালে গোলাপী, হলুদ আর নীলে সবুজ, নীল আর লালে কষায়, লাল এবং হলুদে গৌর রং তৈরী করে চরিত্রানুযায়ী বেশবাসে প্রয়োগ করে চরিত্রগুলির যথাযথ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেষ্টা করা হ'ত। যেমন বিদ্যাধরীদের সজ্জার রং ছিল শ্বেতবর্ণ, গন্ধর্বদের লালবর্ণ, অনার্য সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল নিকষ বর্ণ ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ কেশচর্চা ও সুন্দর কবরী রচনার জন্য বরাবরই বিখ্যাত। অজন্তার চিত্রকলায় বিভিন্ন ছাঁদের চুল বাঁধার নিদর্শন রয়েছে। মাথার ওপর সুউচ্চ চূড়া, ঘাড়ে লুটোনো শিথিল কবরী, 'কৃষ্ণকেশাধ্বৈতকবেণী 'আলুলায়িত কেশকুন্তলা' ইত্যাদি বিভিন্নরকমের কেশ-বিন্যাস নারীর রূপচর্চার এক বিশেষ অঙ্গ। এ ছাড়া হাতের, পায়ের, নখের, চোখের, নাকের, ওষ্ঠের, গাত্রবর্ণের ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ অঙ্গের সেবা সেকালের রূপচর্চায় বিশেষ স্থানদখল করেছিল।

সংস্কৃত পৌরাণিক যুগের পর হিন্দুরাজত্বকালে, বিশেষ করে পরবর্তী মুস্লিম নবাব বেগমদের ব্যাপক রূপসাধনা করতে দেখা যায়। আকবরের সময় আতর 'খোশবাই'-এর ছড়াছড়ি ছিল। জাহাঙ্গীরমহিষী নূরজাহান আতর-ই-জাহাঙ্গীর, নামে বিশেষ সুগন্ধি গোলাপসার আবিষ্কার করেন, তিনি 'দুদামী' পেশোয়াজ, 'পাঁচ তোলিয়া' বস্ত্র, বাদলা কিনারী নূরমহলী (Lace), ফরস্-ই-চন্দনী উপাধান ইত্যাদি অত্যন্ত বিলাস বহুল বস্ত্র পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। এছাড়া বহুমূল্যের রত্নালঙ্কার তো ছিলই। তাঁর পরবর্তীকালে সাজাহান, মমতাজ, রোশেনারা, জেবউন্নিসা, ইত্যাদি বাদশাবেগম ও নবাবজাদীরা চরম বিলাসিতাপূর্ণ সৌন্দর্যচর্চার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ভারতে মুস্লিম যুগ চরম 'রূপচর্চা ও বিলাসিতার' যুগ। ইংরাজ আগমনের সময় থেকে ভারতের রাষ্ট্রজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন চলতে থাকে এবং ভারতীয় রূপচর্চার সনাতন ধারাটিও ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আজ যন্ত্রণাক্লিষ্ট ভারতীয় জীবনে আগেকার মত রূপচর্চার সময় সুযোগ বা আর্থিক সহায়তা একেবারেই নেই। যেটুকু জোর করে অনুকরণ বৃত্তির তাগিদে মেকীর পসরা সাজাতে হয় তাতে নিছক রূপচর্চার সৌখীন সুস্থ সহজ মনোবৃত্তির পরিচয় থাকেনা। ফাঁকির বাজারে ফাঁক ঢাকতে আমদানী বিদ্যার নির্লজ্জ প্রকাশ আমাদের গোটা জাতটাকে যেন নির্মমভাবে উপহাস করতে থাকে। নকলের রূপাভিসারের পালা চলেছে সমস্ত দেশজুড়ে, এরই মাঝে ভারতীয় রূপসাধনার সনাতন ঐতিহ্য আজ আমরা খুইয়ে বসে আছি। যে রূপচর্চা জাতির সুস্থ সজীব প্রাণের স্পন্দন, সে স্পন্দন বিশ্বের দরবারে মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থী ভারতের হৃৎপিণ্ডে কবে থেমে গিয়েছে তা সবার অলক্ষ্যেই থেকে গিয়েছে।

রূপচর্চা

সুপর্ণা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চিবুকের উপর মেয়েদের রূপ ও মুখশ্রী সৌন্দর্য্য নির্ভর করে অনেকখানি। কাজেই নিয়মিতভাবে বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম ও উপযুক্ত পরিচর্য্যায় চিবুককে সুন্দর সুগঠিত রাখতে না পারলে যৌবনেই মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই চিবুকেব নীচের দিক দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে। তার ফলে তাঁদের মুখের ও কণ্ঠের শ্রী-শোভা নিতান্তই অকালে নষ্ট হয়ে যায়। চিবুক এমনিভাবে দু'ভাঁজ হওয়াকে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-চিকিৎসক ও রূপচর্চাবিশারদের দল ইংরাজীতে নাম দিয়েছেন—'ডব্‌ল্ চিন্' (Double Chin)।

দু'ভাঁজ চিবুকে মুখের কমনীয়তা থাকে না। চিবুক দু'ভাঁজ হয়—শয়নের দোষে, চলাফেরা করার এবং আহারের দোষে। তাছাড়া কণ্ঠদেশের উপরিভাগে অর্থাৎ

থুত্নীর নীচের অংশে যাতে মেদ না জমে, এ সম্বন্ধে গোড়াতেই সচেতন ও মনোযোগী হওয়া দরকার।

চিবুককে সুস্থ-সুন্দর ও কমনীয় রাখতে হলে, তার ব্যায়াম-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে সদা-সজাগ থাকতে হবে। চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানো, শয়ন-বিশ্রামের সময় সর্ব্বদা মাথাটিকে সিধা-খাড়াভাবে রাখবেন। মাথা যদি একান্তই হেলে তো পিছন-দিকে। সামনের দিকে মাথা কখনো যেন না ঝোঁকে এবং চিবুকও যেন কখনো সামনের দিকে হেলে না থাকে। শয়নের সময়েও সতর্ক থাকতে হবে। উঁচু বা শক্ত বালিশ মাথায় দিয়ে শুলে, পিঠের মেরুদণ্ডের সঙ্গে মাথা সমান-রেখায় রাখা সচরাচর সম্ভব হয় না—ঘাড় কতকটা বেঁকে থাকে। তার ফলে, মুখে নানা রেখা বা Wrinkles এর আবির্ভাব ঘটে এবং চিবুকে ভাঁজ পড়ে। চিবুক হয়ে ওঠে—'ডবল্ চিন্' বা দু'ভাঁজ। আধুনিক চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ রূপচর্চ্চা বিশারদের মতে, এধরণের বেয়াড়া উপসর্গ থেকে রেহাই পাওয়া এবং মুখশ্রী রক্ষার একমাত্র উপায় হলো—দেহের অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুঠাম—সুন্দর করে তোলার জন্য যেমন বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম—বিধি আছে চিবুকের সৌন্দর্য-শোভা রক্ষার জন্যও তেমনি বিশেষ বিধি নিত্য-নিয়মিত ভাবে কিছুক্ষণ চিবুকের ব্যায়াম-পরিচর্য্যা-সাধন প্রয়োজন।

চিবুকের ব্যায়াম-সাধনে প্রথম বিধি—প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে অথবা প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর, চেয়ার, টুল কিম্বা শয্যার উপর দেহটিকে সিধা-খাড়া রেখে আসন গ্রহণ করে, ঘাড় তুলে অন্ততঃপক্ষে দশ-পনেরোবার ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে সামনে ও পিছনে মাথা নাড়বেন। এমনিভাবে মাথা নাড়বার সময় দেখবেন, ঘাড়ের গোড়ায় বেশ একটু টান পড়বে। এই টানেই ব্যায়ামের উপকারিতা। নিত্য-নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনের সময়, প্রথমে দুই-তিন সপ্তাহ দশ-পনেরোবার সামনে ও পিছনে মাথা নাড়বেন। তারপর ক্রমে মাত্রা বাড়িয়ে বিশ-ত্রিশবার··· এমন কি, পঞ্চাশবার পর্য্যন্ত এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাস করতে পারেন।

চিবুকের ব্যায়াম-সাধনে দ্বিতীয় বিধি—সমতল খাট, তক্তাপোষ কিম্বা ঘরের মেঝের উপর মাদুর বা সতরঞ্চি বিছিয়ে, সেই শয্যায় চিৎ হয়ে শুয়ে ঘাড়ের নীচে থেকে মাথাটিকে হেলিয়ে ঝুলিয়ে দিন। এভাবে ঝুলিয়ে দেবার পর, ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি ক্রমশঃ উর্দ্ধে তুলুন। এমনভাবে তুলবেন, যেন চিবুক এসে বুকে ঠেকে। তারপর আবার আগেকার মতো মাথা ঝুলিয়ে দিন। এমনি ভঙ্গীতে এ ব্যায়ামটি নিত্য-নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-পনেরোবার অভ্যাস করুন। অনুশীলনকালে, গোড়ার দিকে দশ-পনেরোবারই যথেষ্ট···তবে পরে প্রথম ভঙ্গীটির মতোই, এ ব্যায়ামটিও পর্য্যায়ক্রমে মাত্রা বাড়িয়ে চিত্র-চল্লিশ···এমন কি, পঞ্চাশ-বারও করা যেতে পারে। নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে, দো-ভাঁজ চিবুকের (Double Chin) মেদ ক্রমশঃ ঝরে যাবে এবং চিবুক, দিনে দিনে বেশ সুশ্রী-সুগঠিত হয়ে উঠবে।

আপাততঃ এই দুটি ব্যায়াম ভঙ্গীরই মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় সুশ্রী-সুগঠিত চিবুকের ব্যায়াম সম্বন্ধে সহজ-সরল ও ঘরোয়া ধরণের আরো কয়েকটি বিশেষ-ভঙ্গীর প্রসঙ্গালোচনা করবো।

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলুম যে সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী 'কৌচিং' (Couching) রীতির আরো কয়েকটি বিচিত্র নতুন

'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative pattern) নমুনার পরিচয় দেবো—এবারে তাই তারই কিছু 'প্রতিলিপি' (Designs) প্রকাশ করা হলো।

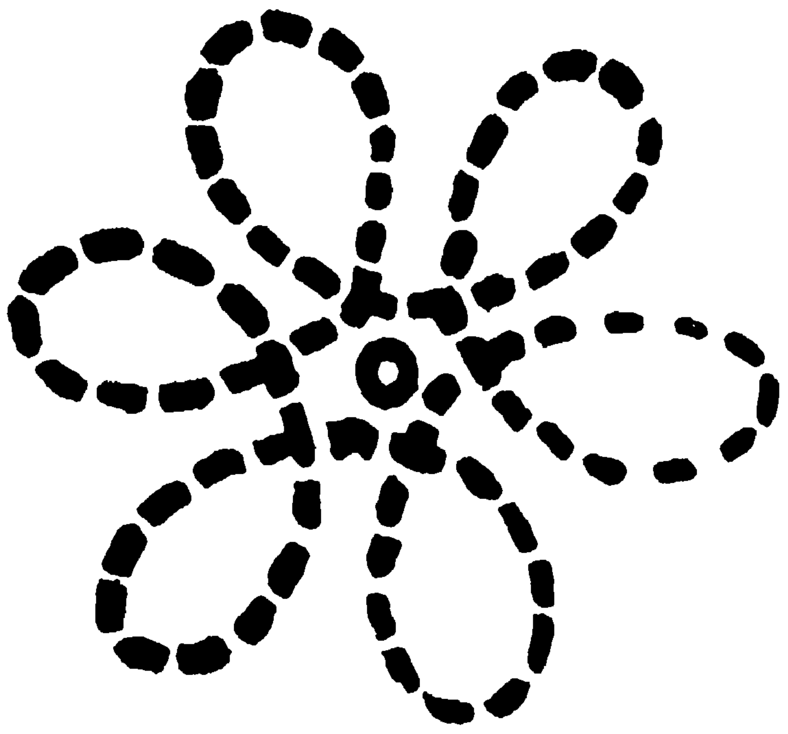

ছ

উপরের 'ছ' চিহ্নিত চিত্রে অভিনব ছাঁদের যে 'আলঙ্কারিক-নক্সাটি' দেওয়া হয়েছে, 'কৌচিং'-রীতিতে বিশেষ ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে সহজ-সুন্দর উপায়ে অনায়াসেই সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের উপরে সৌখিন-ধরণের ব্লাউজ, স্কার্ফ, টেবিল-ক্লথ, পর্দা, কুশন-কভার, টেবিল-ম্যাট, ন্যাপকিন্, হাত-ব্যাগ, বটুয়া-থলি, টি-কোজি, ছোট ছেলেমেয়েদের রম্পার, ফ্রক, সান-সুট, নিকার-বোকার, এ্যাপ্রন, বিব-ক্লথ, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি নানা রকমের সৌখিন-সামগ্রী অলঙ্করণের কাজে ব্যবহার করা যাবে। 'কৌচিং'-রীতিতে এ-ধরণের 'আলঙ্কারিক-নক্সা' রচনা করা খুব একটা দুঃসাধ্য বা পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার নয়। তাছাড়া অভিনবত্ব এবং মনোহারিতার দিক দিয়েও এ-ধরণের 'কৌচিং'-সেলাইয়ের কাজ করা বিচিত্র-নক্সাদার বিভিন্ন সুচীশিল্প-সামগ্রীগুলি যে আত্মীয়-বন্ধু আর ছোট-বড় সকল বয়সের লোকজনের প্রিয় হয়ে উঠবে—সে কথাও বলা যেতে পারে। তবে সুচীশিল্প-সামগ্রীর কদর অবশ্য বিশেষভাবে নির্ভর করবে মূলতঃ, সুচীশিল্পীর দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, সযত্ন-প্রয়াস, রুচির উৎকর্ষতা এবং নক্সা-বাছাইয়ের অভিনবত্বের উপরেই অনেকখানি। কাজেই এ-ধরণের কাজে যাঁরা হাত দেবেন, সেই সব সুচীশিল্পানুরাগিণীদের প্রত্যেকেরই উপরোক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন থাকা একান্ত দরকার।

এমনি-ধরণের সহজ-সরল 'কৌচিং' সুচীশিল্প-পদ্ধতি অনুসারে বিচিত্র অভিনব ছাঁদের আরো যে সব নক্সা-রচনা করা যায়, প্রসঙ্গক্রমে নীচের 'জ'-চিহ্নিত চিত্রে তেমনি-ধরণের একটি 'আলঙ্কারিক-নক্সার' নমুনা দেওয়া হলো।

জ

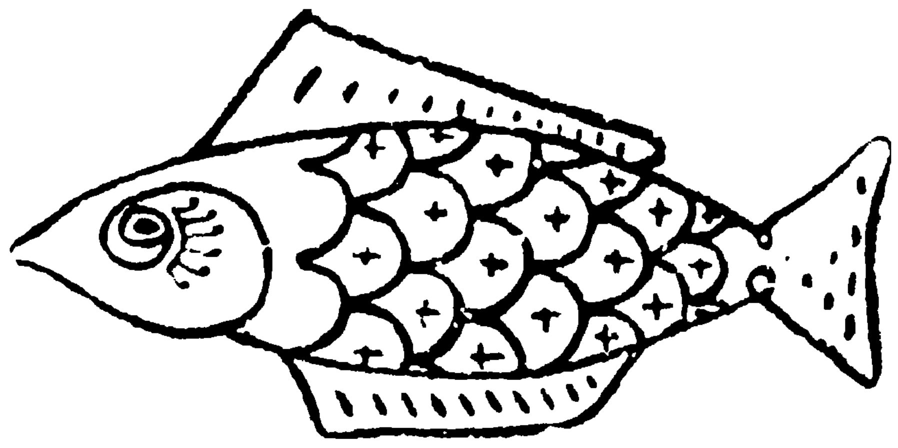

উপরের ছবিতে আলপনার ছাঁদে রচিত মাছের যে 'আলঙ্কারিক-নক্সা'র নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকেও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত 'কৌচিং'-সুচীশিল্প পদ্ধতি অনুসারে সহজেই সুতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের বুকে নিখুঁৎ-পরিপাটিভাবে রূপদান করা যাবে। এ নক্সাটি রচনার সময়, 'কৌচিং'-পদ্ধতি অনুসারে সেলাইয়ের ফোঁড় কোন্ অংশে এবং কি ধরণে তুলতে হবে, উপরের নক্সাটি লক্ষ্য করে দেখলেই তার মোটামুটি হদিশ সুস্পষ্টই বুঝতে পারবেন। তবে এ-ধরণের 'আলঙ্কারিক-নক্সা' সেলাইয়ের কাপড়ের কোন্ জায়গায় এবং কিভাবে সাজিয়ে বসানো হবে, সে বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সুচীশিল্পানুরাগিণীর ব্যক্তিগত অভিরুচি, প্রয়োজন এবং উপযোগিতার উপরে। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নির্দ্দেশ দেওয়া সমীচীন নয়। তাহলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে এ-ধরণের নক্সার সাহায্যে সৌখিন-সুন্দর ও অভিনব-ছাঁদে যে কোনো সুচীশিল্প-সামগ্রীর 'কেন্দ্রস্থল,' চারিদিকের কোণের অংশ এবং কিনারার 'পাড়' (Running Border) রচনা ও অলংকৃত করা যেতে পারে।

স্থানাভাবের কারণে—আপাততঃ, এবারে এই পর্য্যন্তই ...আগামী সংখ্যায় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত 'শেভ্রন্' (Chevron) এবং 'রুমানিয়ান ষ্টিচ' (Roumanian Stitch) সুচীশিল্প-পদ্ধতিতে এমব্রয়ডারী কাজের উপযোগী কয়েকটি বিচিত্র নূতন নক্সার নমুনা প্রকাশের বাসনা রইলো।

পথের বাঁকে

শ্রীমদন চক্রবর্তী

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে মনীষা বলেছিল, যেয়োনা।

সে পথের স্মৃতিকে পেছনে ফেলেই শেষ পর্যন্ত চলে আসতে হয়েছিল।

সে পথ, আজ জীবন পথের বেঁকে যাওয়া মনটাকে কাঁপিয়ে তুললো। সেই করবী চারাটা, লাল থোকা থোকা ফুলের সমারোহে দুলে উঠেছিল মনীষার মাথার ওপরে। চলে আসার স্মৃতিটা কামড়ে ধরল দূর বিসারী আকাশের গায়ে লেপটে থাকা মনটাকে।

জটিল রাঙ্গা মাটির পথ দু'টো জট পাকাতে থাকল চিন্তার আড়ষ্টতাকে, পাকে পাকে।

মনীষার কালো তারা ভরা চোখ দু'টো আদ্র'তার আভাষে করুণা উদ্রেকের ক্ষীণ আশা নিয়ে এগিয়ে এসে-বলেছিল, যেয়োনা…

সেই টিনের আটচালা ঘরের পাশ ঘেঁষে লাল সরু পথটা করবী চারাটার অবস্থিতিকে নিতান্ত অনাদরে বাড়তে দেবার মত একফালি জমিন্ ছেড়ে দিয়ে আর একটা শাখা পথকে ঠেলে দিয়েছিল পশ্চিম দিকের শিবতলার মাঠের একেবারে মাঝখানে।

স্মৃতির রোমন্থনের অলস অবসরে আট চালার পাঠশালাটা ভেসে উঠল দৃষ্টি পথে। পাঠশালার সামনের খোলা মাঠটায় সেই কুঁজো নটবর গরু বেঁধে দিয়ে সূর্যের প্রখর রৌদ্রের ঝাঁঝে ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে শেওড়া গাছের জঙ্গলের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো। তারপর যূথী আসতো তরকারীর খোসা আর ভাতের ফেন হাতে নিয়ে।

পড়ুয়াদের দৃষ্টি যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করে দ্রুতপদের যাত্রা পথকে নিয়মিত করে নিয়েছিল হাঁড়িওয়ালা হাবু।

ততক্ষণে যূথী বনবীথিকায় নৃত্য সুরু করে দিতো জাবর কাটার ইচ্ছায় নুয়ে পড়া বোবা গরুটাকে সঙ্গী করে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে এল নীচে। ঝিমিয়ে পড়া চলমান জগতটা যেন হাহাকার করে উঠল। অনেকগুলো পেঁজা পেঁজা বিক্ষিপ্ত চিন্তার জালে ঘুরপাক খেতে থাকল মন।

সামনের একতলা বাড়ীর জানলায় নতুন রঙ করা গ্রীলের ওপর নেটের পর্দার মানান-সই সূচীশিল্প আভিজাত্যের তরঙ্গ তুলে দুলে উঠল বার কয়েক।

পেছনের ফিকে সবুজ নিয়ন আলোটা রঙ বাহারের দাবী নিয়ে যেন ঘোষণা করল, সহরের তুলনা বিহীন অস্তিত্বের কথা।

ফুলদানির ফুলগুলোও অলীক সজীবতায় মাথা তুলে জেগে উঠছে।

বাইরের দুরন্ত হাওয়ায় বৃষ্টির ছিটেগুলো জানলার উন্মুক্ত পথ দিয়ে শেষ আঘাতের আশায় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় সারা শরীরটার ওপর।

ভাল লাগল সুহাসের। জানলার কাছে উঠে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাল করে অনুভব করতে লাগল প্রকৃতির দুরন্ত দাপটকে।

বাইরের প্রকৃতিতে ঘনিয়ে এল ঘন কালো অন্ধকার। রাস্তার আলোগুলো নেভান। শরীরের জাগতিক অনুভূতিতে একটা শিহরণ জাগল।

গায়ের জামা ভিজে গেছে জলে। নিয়নের আলোয় জল লাগা কার্পাস বস্ত্র বিদ্রূপ করে উঠল বেগ্‌নে আভায়।

ঘরে এসে ঢুকলেন ভবনাথবাবু। ভিজে ছাতাটা রাখলেন এক পাশে। পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত-মুখ মুছে নিয়ে বসলেন চেয়ারটায়।

মুখে কোন কথা নেই ভবনাথবাবুর। সুহাসেরও তাই। দু'জনই বুঝছে দু'জনের অবস্থা। গত তিন দিনের আলোচনার পর কোন উচ্চারিত শব্দের অপেক্ষা না রেখেই নির্লিপ্ত ভাব-গাম্ভীর্যে দু'জন বুঝছে দু'জনকে।

বাইরে শ্রাবণের ঝম্ ঝম্ ধারা আকাশ কাঁপিয়ে, বাতাসকে ব্যাকুলতায় ভরিয়ে, আকুল করে তুলেছে গৃহবদ্ধ মানুষের মনকে। শুধু আপন রাজত্বে চলে গেছে দু'টো প্রাণী—সুহাস আর ভবনাথবাবু।

বন্ধ ঘরটায় দু'জনের চিন্তা-লাটাই সুতো ছেড়ে চলেছে আপন আপন সমস্যার সূত্র ধরে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে অপরেরটার দিকে আর ভাবছে কোন্ পরিণতিতে শেষ হবে এ চলার পথ?

ভবনাথবাবু শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন, বললেন, আপনার দিকটা ভাল করেই ভেবে দেখলুম সুহাসবাবু। কিন্তু এমনই দুঃখের বরাত যে অপরের দুঃখে হাত বাড়িয়ে দেবার সামর্থ্যটুকুও বাস্তবিকই একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। আপনার জন্যে আমার···

বলে, কথা শেষ করতে না পেরে আবার চিন্তা লাটাইয়ের সুতো ছেড়ে যেতে লাগলেন মনে উত্তেজনা না আসা পর্যন্ত।

সুহাস যেমন বসে ছিল, তেমনিই রইল অন্য দিকে তাকিয়ে। ভাবতে লাগল, কিইবা বলবেন ভবনাথবাবু—বলার আছেই বা কি? কিছু বলতে গেলেও 'ব্যাঙ্ক-গ্যারান্টি'র দরকার এখন। দোষ নেই ওনার।

শিথিল মানসিক গ্রন্থিতে উত্তেজনার কোন আভাষ না রেখেই ভবনাথবাবু বললেন, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের চাইতেও, বিশ্বাস করুন সুহাসবাবু, আপনার কথাটাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। আপনার জন্যে অনেক কিছু করার ছিল আমার, কিন্তু···

বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না ভবনাথবাবু। কি যেন বলতে গিয়ে কোথায় আটকে গেল। আন্তরিকতার আবেগে হারিয়ে গেল সুর। ভাবটা শুধু গুমরে রইল মনের আবেষ্টনীতে।

ভবনাথবাবুর কণ্ঠের আর্দ্রস্বর ব্যথা নিয়ে বেজে উঠল সুহাসের মনে। সে বুঝল, নিজেরই ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যার স্থিতি নেই সে অপরের দুঃখে অকারণেই জর্জরিত হয়ে দুঃখ আর ব্যথার বোঝা বাড়িয়ে চলেছে!

ভবনাথবাবু আবার সুরু করলেন, স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেও স্থির থাকতে পারছি না সুহাসবাবু। অস্থিরতার পরিবেশ আজও আমাকে স্থির চিন্তার অবকাশ দিল না। আপনার একটা কিছু···

শেষ করতে না পারার শেষ কথাটা তুলে নিল সুহাস। বলল, আমার চিন্তা আপনাকে বেশ বিচলিত করেছে বুঝতে পারছি। আমার পিছিয়ে যাওয়া জীবনটা কোন দিনই এগোত না। আর এগিয়ে আসা জীবনটারও পিছিয়ে যাবার কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু আমি ভাবছি আপনার জীবনের কথা। যে জীবনটা পিছিয়ে যাবার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেনি, যে জীবনটা জন্মক্ষণেই চেয়েছিল শুধু মাত্র এগিয়ে যেতে আর সঙ্গের সকলকে নিয়ে সমৃদ্ধির তীরে পৌছতে। আজ এই সিদ্ধান্তের সন্ধিক্ষণে আমার মনে হচ্ছে, কক্ষচ্যুত একটা নক্ষত্র অসহায়ভাবে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। নিজের অবস্থিতি ভুলে গিয়ে সে চমকে উঠছে সামনের বিরাট একটা বিস্ফোরণের আশঙ্কায়।

শিশুর মত অসহায়ভাবে কেঁদে উঠলেন ভবনাথবাবু। বললেন, যে কথাটা বলবো বলবো করেও বলতে পারিনি, সে কথাটা বলার একটা সুযোগ করে দিলেন আপনি। আমি চললাম। আপনার জীবনটাকে সর্বপ্রকারেই রিক্ত করে দিয়ে চললাম। শুধু আমার জীবনের অপ্রয়োজনের বোঝা বাড়ানো এই বইগুলো ফেলে গেলাম। এই আবর্জনা দিয়ে কোন দিন কোন প্রয়োজন যদি আপনার মেটে তাহলে অন্তর থেকে সুখী হব আমি।

বলে, কোন আলোচনা বা উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই তিনি ছাতাটি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সুহাস স্থির দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ভবনাথবাবুর ফেলে-যাওয়া বইগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে সে উঠে এসে দাঁড়াল র‍্যাকের সামনে। থরে থরে সাজান বই। এ-গুলোর প্রতিটি অক্ষর আজও ভবনাথবাবুর কণ্ঠস্থ।

"সিভিল প্রসিডিওর কোড্", "ল অফ্ লিমিটেশন",

"সুপ্রিম কোর্ট ডাইজেষ্ট", "ল অফ এভিডেন্স", "পেনাল্ কোড্", "বিজিনেস্ অর্গানিজেশন", "কোম্পানিস্ অ্যাক্ট", "মেডিকেল জুরিস্প্রুডেন্স", "ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড্", "আর্ট অফ ক্রশ-এগ্জামিনেশন", "ইনসলভেন্সী অ্যাক্ট", "মোহামেডান ল", "হিন্দু ল", "কনসটিটিউশন", "ক্যালকাটা উইকলি নোটস্", "লেটারস্ পেটেন্ট", "ক্রিমিন্যাল ল জার্নাল", "ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্", "লিগাল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাক্ট" "হিন্দু স্কুল অফ্ দায়ভাগ", "সিভিল রুলস্ এণ্ড অর্ডার"......

সুহাসের দৃষ্টিপথে চক্রাকারে ঘুরে গেল সোনালী অক্ষরে লেখা নামগুলো। অন্য র‍্যাকগুলোর দিকে যাবার উৎসাহ জাগল না মনে। সামনের চেয়ারটায় বসে সে ভাবতে লাগল, এই বইগুলোর একদিন প্রাণের চাইতেও বেশী মূল্য ছিল ভবনাথবাবুর কাছে। এর এক একটি সংগ্রহের পেছনের ইতিহাস ভেসে উঠল সুহাসের মনে।

মামলায় জিত হল। অনধিকারে পড়ে থাকা সম্পত্তি অধিকারে এল ভবনাথবাবুর চেষ্টায়। মক্কেল খুসি হয়ে একতাড়া নোট দিতে গেল ভবনথবাবুর হাতে। ভবনাথবাবু টাকা না নিয়ে একটা ফর্দ করে দিলেন সুহাসের হাতে। এর অর্থ সুহাসের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই ফর্দ হাতে মক্কেল সমেত বেরিয়ে পড়ল সে। তারপর ফিরে এসেই চেম্বারের ঐ তাকটা ভরিয়ে দিল নতুন নতুন মলাটের বইয়ের সারিতে।

আর একটা তাকের দিকে দৃষ্টি পড়তেই হু হু করে উঠল সুহাসের মন। ঐ মোটা বই দু'টো, বড় বড় লাল অক্ষরে সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবী নিয়ে গদাই-লস্করী চালে বসে আছে সারির মধ্যে। গরীব মক্কেল, ফী দেবার অক্ষমতা জানিয়েছে সে অনেকদিন আগে। তার মামলার আর্গুমেণ্টের দিন প্রয়োজন পড়ল ঐ দু'টো বইয়ের। বই চাইই। বইয়ের অভাবে হয়ত গরীব লোকটা পথের ভিখারী হয়ে যেতে পারে।

সুহাসের বেশ মনে পড়ে। ভবনাথবাবু সুহাসের মুখের দিকে পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কের অসহায় দৃষ্টি নিয়ে একবার তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর পাশের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে স্ত্রী মনোরমা দেবীর নামে একটা চিঠি লিখে সুহাসের হাতে দিয়ে বললেন, আপনার বৌদিদির হাতে চিঠিটা দিলে যা হাতে পাবেন সেটা বিক্রী করে এই বই দুটো কিনে নিয়ে সোজা কোর্টে চলে যাবেন।

বলে, একটা শ্লিপে নাম লিখে দিলেন দু'টো বইয়ের।

মনোরমা দেবী চিঠিটা হাতে পেয়ে কোন কথা বললেন না। পড়া শেষ হতে অব্যক্ত বেদনার ভারে অশ্রু ছলছল চোখে কানের দুল দু'টো খুলে দিয়ে দিলেন সুহাসের হাতে। সে পরিবেশের সংঘটনে দুল হাতে নিয়ে সুহাসকেও একটু বিচলিত হতে হয়েছিল।

তারপরেই কর্তব্যের তাড়ায় সুহাস বেরিয়ে গেল। যাবার পথে একবার তাকিয়ে দেখল, সদর দরজায় অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মনোরমা দেবী।

সোনা আর কানে ওঠেনি মনোরমা দেবীর। তার বদলে ঐ বই দু'টো চেম্বারের কপালে লাল অক্ষরে লাল বাতি জ্বালালো।

দুল দেবার দৃশ্যটা সুহাসের দৃষ্টি পথে অনেকদিন, অনেকবার, অনেকরকম ভাবে দুলে উঠছে।

ভবনাথবাবুকে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে শুনতে হয়েছে, ওদিকে ভাববেন না সুহাসবাবু। একটা বড় দেশ তৈরী হতে সময় লাগেনা কিন্তু একটা উকিল তৈরী হয় কি করে জানেন? wait, learn and then earn. এ দিন কি আর থাকবে? এখন শুধু তৈরী হওয়া। তারপর দেখবেন, বৌদির...

বলে থেমে গিয়েছিলেন ভবনাথবাবু। বোধহয় চিন্তা করেছিলেন, তাঁরই অধীনস্থ করনিককে ব্যক্তিগত কথা না বলাই ভাল।

বই দু'টোর দিকে তাকিয়ে সুহাস ভাবতে লাগল, স্থির সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়েছে চেম্বার আর রাখা যাবে না, গৃহস্বামীকেও যখন সেই মর্মে সংবাদ জানানো হয়েছে তখন আর দুটো দিনের জন্যে মায়া বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। সে স্থির করল পরের দিন সকালেই ঘর ছেড়ে দিয়ে বইগুলো ভবনাথবাবুর বাড়ীতেই পৌছে দিয়ে চলে যাবে এ শহর ছেড়ে।

ক্যাম্প খাটটা একপাশে বিছিয়ে নিয়ে শয্যা গ্রহণ করল সুহাস। দীর্ঘ বিশটা বছরের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো এক একে ভীড় জমাতে জমাতে পার করিয়ে দিল বিনিদ্র রজনী

পাখী-ডাকা ভোরেরও আগে উঠে পড়ল সুহাস। রাতের এমনি সময়ে কতদিন ঘুম ভেঙ্গে গেছে সুহাসের। অতিরিক্ত কাজের চাপে ভবনাথ বাবু মাঝে মাঝে এখানেই থেকে যেতেন আর সারারাত ধরে পড়াশুনা করতেন ঐ চেয়ারটায় বসে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতায় ভরে উঠল সুহাসের মন। তবু সে চেষ্টা করতে লাগল এ পল্লীর ঘুম ভাঙার আগে বই জিনিষপত্তর সব বের করে নিয়ে ঘর খালি করে বেরিয়ে পড়বে ভবনাথবাবুর উদ্দেশ্যে।

ঘর তালাবন্ধ করে তাড়াতাড়ি সুহাস বেরিয়ে পড়ল পথে একটা ঠেলাগাড়ী আনবার জন্যে।

ঠেলা গাড়ী মিলল। সেটিকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেও লেগে গেল ঠেলার ওপরে বই সাজাতে। মাঝে মাঝে সামনের একতলা বাড়ীটার দিকে সে তাকাতে লাগল, কেউ দোর খুলে বেরিয়ে এসে দেখে না ফেলে এই ভয়ে।

পল্লীর সকলে দেখুক তাতেও আপত্তি নেই সুহাসের কিন্তু সামনের বাড়ীর গোবিন্দ বাবুর দেখে ফেলাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না সে। সাধনার ক্ষেত্র, শিক্ষার মন্দির, অর্থনৈতিক অজগরের পাকে পাকে, তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে লজ্জায় অধোবদনে নিরুদ্দিষ্ট হবে রসহীন যজ্ঞশালার পথে, আর ঠিকাদার গোবিন্দবাবু সামনে দাঁড়িয়ে শরীর আওয়াজে অহমিকায় মুচ্‌কি হাসবেন সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয় সুহাসের মন।

তাড়াতাড়ি হাঁফাহাঁফির সঙ্গে দুরন্ত পদক্ষেপে সুহাস আর ঠেলাওয়ালা মিলে বোঝাই করল ঠেলা তারপর সুহাসেরও পিছু ঠেলাতে গড় গড় করে এগিয়ে চলল চাকা।

রাতের আবছা অন্ধকারে ঘরের মালপত্তর বের করার ব্যস্ততা দেখে কিসের যেন সন্দেহ প্রকাশ ক'রে ঠেলাওয়ালা বার কয়েক তাকিয়ে দেখল সুহাসের মুখের দিকে এবং অজানা আশঙ্কায় গন্তব্য স্থলে পৌছবার তাগিদে দ্রুতপদে এসে হাজির হল ভবনাথ বাবুর বাড়ীর সামনে।

আশ্বস্ত মনে সুহাস এসে পৌছল। আসার পথে পেছন ফিরে সে দেখেছিল, সামনের একতলা বাড়ীর দরজা জানালা তখনও বন্ধ।

ডাকাডাকিতে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল ভবনাথ-বাবুর মেয়ে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাকে দেখতে পেয়ে সুহাস তার হাতে চেম্বারের চাবি দিয়ে বলল—এ চাবিটা বাবার হ'তে দিও আর বলো বাড়ীওয়'লার কাছে পাঠিয়ে দিতে। অন্ধকার থাকতে থাকতে চলে আসা তাই ডেকে চাবি দিয়ে বিরক্ত করলাম না বাড়ীওয়ালাকে। আর এই ঠেলা ভর্তি বই, র‍্যাক, চেয়ার, টেবিলগুলো ঘরের ভেতরে রেখে ঠেলাওয়ালাকে একটা টাকা দিতে বলো।

বলে, হন্ হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হয়ে গেল সুহাস।

একটু পরেই কৃষ্ণা দৌড়ে এসে গতিরোধ করল সুহাসের। বলল, মা ডাকছেন আপনাকে, চলুন।

একটু ইতস্ততঃ করে কৃষ্ণার সঙ্গে সে এসে ঢুকল মনোরমা দেবীর ঘরে। ঢোকার সময় সুহাস দেখল খালি উঠোনটার ওপর পায়চারী করছেন ভবনাথবাবু। সুহাসকে দেখতে পেয়েও কোন কথা বললেন না তিনি। সুহাস একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভবনাথবাবুর ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে।

সুহাসকে দেখে চোখের জল ফেললেন মনোরমা দেবী। বললেন, কর্তাকে নিজের বড় ভাইয়ের মত আজ প্রায় বিশ বছর ধরে সামলে নিয়ে বেড়ালেন। কিন্তু শেষ দিকটায় কি যে হয়ে গেল, কর্তা তাঁর কর্তব্যের কোন দিকটাই পরিষ্কার করে কাউকে দেখাতে পারলেন না। এটা আমার কাছে একটা বড় দুঃখ হয়ে রইল। কেননা আপনাকে চিরকালই আমাদের নিজেদের একজন বলেই জেনে এসেছে সকলে। সেই জানার মধ্যে দিয়ে জীবনটা যদি শেষ হতো তবু বুঝতাম সুরুরও শেষও আছে। কিন্তু মাঝ পথে এমন বিপাকে পড়ে আপনাকে চলে যেতে হচ্ছে একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় এটা চিন্তা করে আমার নিজের শত দুঃখের মধ্যেও আমি স্থির হতে পারছি না।

সুহাস মনে মনে মনোরমা দেবীর মনের ঔদার্যের প্রশংসা না করে পারল না।

মনোরমা দেবী আর ভবনাথবাবু দু'জনেই নিজেদের শত দুঃখের মধ্যেও যে অপরের জন্যে বার বার বিচলিত হয়েছেন সেজন্যে তাঁরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। সত্য

কথা, এই দুর্দিনে ছোট ছোট ছেলে পুলে নিয়ে ভাড়া বাড়ীতে বাস করে কপর্দক শূন্য হয়ে কি করে দিন কাটাবেন, এইটাই এখন সব চেয়ে বড় কথা। এ সময়ে সুহাসেরও নিজের লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি না গিয়ে এদের সমস্যার কথাই বড় হয়ে দাঁড়াল।

তাই সে বলল—আমার কথা চিন্তা করবেন না বৌদি। আমার একার সমস্যা! আমি দেশের বাড়ীতে গিয়ে উঠছি। ভাত-কাপড়টা কোন রকম ঠিকই জুটে যাবে। তবে বলতে পারেন, যে আশা নিয়ে এতগুলো বছর পড়ে রইলুম সে আশা অপূরণ রেখেই চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কি করা যাবে? যে আশা-স্তম্ভের ছায়ায় এতদিন দাঁড়িয়ে রইলুম সেই স্তম্ভটাই যে ভেঙে পড়ে গেল!

একথা শুনে মনোরম দেবীর চোখের জল আর বাঁধ মানল না।

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সুহাস বলল, মানুষের সব দিন সমান যায় না বৌদি। আজ হয়ত আপনার চরম দুঃখের দিন। কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে এই নাবালক অসহায় শিশুগুলো। আপনাকে শক্ত হতেই হবে।

বলে, খানিকটা চুপ করল সুহাস।

দশ বছরের বালিকা কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে ছিল সুহাসেরই পাশে। মায়ের চোখের জল দেখে অবুঝ কান্নায় তারও চোখ জলে ভরে এসেছিল।

মনোরমা দেবী সুহাসের কথায় কৃষ্ণার দিকে একবার তাকিয়ে কান্না থামাবার অভিপ্রায়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সুহাসের উদ্দেশ্যে বললেন, কিন্তু আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, মাঝে মাঝে খবর দিতে যেন ভুল করবেন না। বইগুলোও সব ফেরৎ দিয়ে গেলেন যাবার সময়। সুতরাং খবর জানাবার দাবী করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি আমার?

সুহাস খানিকটা চুপ করে থেকে মনোরমা দেবীকে প্রণাম করে ও কৃষ্ণাকে আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই মনোরমা দেবী বললেন, এদিকে কোন সময় যদি আসেন দেখা করতে ভুলবেন না।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সুহাস বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে।

ভবনাথবাবু কিসের উত্তেজনায় তখনও পায়চারী করে চলেছেন। তিনি সুহাসকে দেখতে পেয়ে একবার থামলেন, তারপর আবার পায়চারী করতে সুরু করলেন।

একটু দাঁড়িয়ে সুহাস এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, দাদা আমি চললাম।

ভবনাথবাবুর মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

সুহাস মাথা নীচু করে খানিকটা অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

আনারকলি ঃ ইতিহাস না অলীক

কৃষ্ণা বসু

মোগলযুগ ভারতের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সে যুগের ইতিহাসে কোন কোন মহীয়সী নারীর তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নূরজাহান, মমতাজ, জাহানারা এঁরা কেউ-ই সুলতানা রিজিয়ার মত দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নি, তবুও রাজদরবারে এঁদের প্রভাব ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দেয়। সম্রাট-মহিষী বা সম্রাটকন্যা না হ'য়েও সে যুগের কাহিনীতে যে রহস্যজনক নাম সবচেয়ে বেশী আলোড়ন এনেছিল, তা' আনারকলি।

এই রহস্যময়ী নায়িকা আনারকলির ঐতিহাসিক তথ্য অস্পষ্ট কাহিনীর উপর ভিত্তিশীল। মোগলযুগে মহামতি আকবরের যে ঐতিহাসিক তথ্য আছে, তাতে আনারকলির কোন উল্লেখ নেই। এমন কি জাহাঙ্গীর, যার জন্য আনারকলিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, তাঁর আত্মজীবনীতেও আনারকলি অনুপস্থিত। কিন্তু তবুও কি ক'রে লাহোরের ইরাবতী তীরে আট দেওয়ালে ঘেরা আনারকলির সুন্দর স্মৃতিসৌধ গ'ড়ে উঠল'? কি ক'রে আকবরপুত্র সেলিমের সম্রাট হবার আগের পরিচয় দেয়? কি ক'রেই বা বলে এটা সেলিমের সৃষ্টি? কি ভাবেই বা এতে লেখা হ'ল? "যদি একবার আমার প্রিয়ার মুখটি দেখতে পেতাম, হে মহান্ স্রষ্টা, জীবনের অন্তিম দিন অবধি তোমারই প্রশংসা ক'রে যেতাম—প্রেম মুগ্ধ সেলিম। —ত' কেয়ামৎ শুক্র্ গয়াম্ কির্দগার-ই-খেশ—রা আহ্, আগর মান্ বাজ্ বিনাম্ রুই য়ে য়ার—য়ে খেশ রা—মজনু সেলিম—"

কি ভাবে এর প্রচলন হ'ল এবং কোথায় এ কাহিনীর প্রথম উল্লেখ তা' দেখতে গিয়ে দেখা যায় যে একজন বৈদেশিক পরিব্রাজকই এই রোম্যান্সের প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ইনি হ'লেন উইলিয়াম ফিঞ্চ। আর যে বইতে এর উল্লেখ আছে, তার নাম "ভয়েজ্ টু ইস্ট্ইণ্ডিজ্"। ফিঞ্চ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে লাহোরে এসেছিলেন আর তাঁর মতে সেই সময়েই নাকি ইরাবতী তীরে স্মৃতি সৌধটি তৈরী হ'চ্ছিল। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি আহরণ ক'রেছিলেন এক অনবদ্য প্রেমকাহিনী। সমাধিটি যাঁর, তিনি সাধারণ ভাবে মৃত নন, নিহত। সম্রাট আকবরের কঠোর আদেশে তাকে হত্যা করা হ'য়েছিল জীবন্ত কবর দিয়ে। মেয়েটির নাম নাদিরা, আফ্গানিস্থানের এক সাধারণ ঘরের মেয়ে। রূপ ছিল আর ছিল উদ্ভিন্ন যৌবন। তাই আফগান শাসকের চোখে পড়তে তার বেশী দেরী লাগে নি'। এই সময়ে আকবর একবার গেলেন কাবুল সফরে। প্রৌঢ় মোগল সম্রাটের চোখেও রং লাগল চঞ্চলা বনহরিণীর নৃত্যছন্দে। তারপর সম্রাট যখন দিল্লী ফিরলেন, উপঢৌকনের ডালিতে নর্তকী নাদিরা। আফগান শাসক ভবিষ্যৎ গোছালেন। মোগল অন্তঃপুরিকা নাদিরার নতুন নাম হ'ল সরফুন্নিসা, মানে নারী-গৌরব, তবে আকবরের আদরের ডাক নাম আনারকলি, মানে ডালিম কুঁড়ি। দোর্দণ্ড প্রতাপ আকবর বাদশাহের তখন সান্ধ্য বিনোদন মিষ্টি মদির আঙুর রসে আর ডালিম কুঁড়ির নৃত্যছন্দে। কিন্তু যুবরাজ সেলিম আনারকলির প্রেমমুগ্ধ, সম্রাটের অজান্তে গোপন অভিসার চালালেন রাতের অন্ধকারে ইরাবতী তীরে, প্রাসাদের প্রমোদ কাননে। আনারকলিও তখন তরুণের প্রেমে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা বিস্মৃত, "প্যার্ কিয়া তো ডরনা কেয়া"। কিন্তু ঘটনাগুলো গোপন রইলো না বেশী দিন, জানাজানি হ'য়ে গেল। মন্ত্রী আবুল ফজল জানালেন সম্রাটকে, ব'ললেন এ সব শোভন নয় ভারত সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর জীবনে। প্রমাণ স্বরূপ একদিন দেখালেন সম্রাটকে এক নৃত্য আসরে। শিস মহলের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিচ্ছবি, নৃত্যরতা আনারকলির কাজল কালো চোখে আবেশের আহ্বান, আর কামনার স্মিত হাসি, সেলিমের ঠোঁটে চোখে কাম শিখা লেলিহান। তবে শিস মহলের ঘটনার আরও এক গল্প বলে যে আনারকলি নাকি একেবারে সেলিমের কোলে গিয়ে আছড়ে

প'ড়েছিল আর সেটা নাকি, আবুল ফজলের লোকেরা অত্যধিক সুরাপান করিয়ে দিয়েছিল ব'লে। যাই হোক আকবরের স্বভাবতঃই পছন্দ হ'ল না শিসমহলের ঘটনা, আনারকলি হ'ল শৃঙ্খলিত। তবে সেলিম নাকি সেখানেও গভীর নিশীথে উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু সম্রাটের কাছে ধরা পড়ে যায় আর তাও সেই আবুল ফজলেরই চক্রান্তে। তারপরই হয় সম্রাটের সেই দুর্দান্ত আদেশ। জীবন্ত সমাধি, আট দেওয়ালের নিরন্ধ্র সংগঠন। আনুমানিক ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এ ত' হ'ল কাহিনীর এক কথন। আরও অনেক কাহিনী আছে এই রহস্যনামকে ঘিরে। কেউ ব'লছেন আনারকলি নর্তকী ছিল না মোটেই, ছিল এক আফগান শাসকের মেয়ে। এই আফগান নায়ক আকবরের অধীনে কাবুলের শাসন কর্তা ছিলেন। একবার কাবুল ভ্রমণকালে মোগল সম্রাট তার রূপে মুগ্ধ হন আর যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করেন। স্বভাবতঃই তা' কাজে পরিণত হয় আর মেয়েটির বিবাহোত্তর নাম হয় আনারকলি। সেলিম আর আনারকলি বেশ সুখেই ছিল, তবে প্রথম প্রসবের সময়েই রাজকুমারীর মৃত্যু হয়, আনুমানিক ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ এই কাহিনীতে সেলিম ও আনারকলির অবৈধ সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু তা' হ'লেও প্রশ্ন থাকে তদানীন্তন ঘটনার অনুলিপিতে যুবরাজ সেলিমের এই বৈধ বিবাহের উল্লেখ নেই কেন? এই ঘটনা অনুলেখনে বাধা ছিল কোথায়? যুবরাজ সেলিম কেন এত বেশী রুষ্ট ছিলেন আবুলফজলের প্রতি? কেন ইতিহাস বলে আবুল ফজল যুবরাজ সেলিমের চক্রান্তেই পরবর্তীকালে নিহত হ'য়েছিলেন?

এখানেই শেষ নয়, আরও আছে কাহিনী। আর এক কথন ব'লে এই স্মৃতিসৌধ হ'ল সেলিমের এক বেগম সাহিব-ই-জামালের। তিনি সম্রাট আকবরের এক ওমরাহের কন্যা। কোন একবার মীনাবাজারে যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে তার দেখা। তবে সম্রাট আকবরের নাকি বিশেষ সম্মতি ছিল না এই বিবাহে। এদিকে ওমরাহের পক্ষে সম্ভব ছিল না শাহজাদার কামনাকে অস্বীকার করা। তাই গোপনে এই বিবাহ ঘটেছিল। তারপর সেলিম যখন ভারত সম্রাট হ'লেন, তখন এই বেগমের নামই হ'ল মালিকা-এ-আলিয়া-সুলতানা সাহিব-ই জামাল। তবে তিনি বেশীদিন বাঁচেন নি। প্রসব হ'তে গিয়ে তাঁর জীবনদীপ নির্বাণ। এই কাহিনীর কোথাও কিন্তু আনারকলির নামের কোন উল্লেখ নেই আর এও বলা নেই কেন এই বিবাহের কথা ঐতিহাসিক অনুলিপিতে অনুপস্থিত। অনুল্লিখিত সেলিমের আত্মজীবনীতে।

শাহজাহান-পুত্র দারাশিকোর লেখা "সাকিনা-তুল-আউলিয়াতে" এই আনারকলি নামের এক নতুন অবতারণা করা হ'য়েছে। তিনি ব'লেছেন যে লাহোরের ইরাবতী তীরে যে সময়ে বহুরকম ফলের গাছের সমারোহ ছিল, আর ডালিমগাছের বাহুল্য হয়ত' কিছু বেশীই ছিল। তাই এই নামের জন্ম। কিন্তু ঐ সমাধি সৌধটা কার? এ বিষয়ে দারাশিকো নীরব। কোন কোন মহল মনে করেন যে ঘটনাটা আসলে সেলিমের বিরোধীদলের কারুর রটনা।

তবে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সেলিমকে নিয়ে কোন একটা ব্যাপার হয়ত' ঘটেছিল, যা' সকলেই গোপন করার চেষ্টা করে গেছেন। তবে ইতিহাস বলে যে যৌবনের গোড়ায় সেলিম তাঁর পিতার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন না এবং তাঁদের দুজনের বহু বিরোধ হ'য়েছে, যার মোকাবিলা করার জন্যে সময়ে সময়ে অস্ত্রও ধরতে হ'য়েছে। আর তা' ছাড়া আকবরের বিশ্বস্ত আবুল ফজলকে সেলিম চিরকাল ঘৃণা ক'রেছেন এবং আবুল ফজল যে সেলিমের চক্রান্তেই নিহত হ'য়েছিলেন তা' ইতিহাস প্রমাণ দেয়। এর কারণ কি আনারকলির কাহিনী? আকবরের হয়ত' আদেশ ছিল যে সেলিমের এ কাহিনী হবে না লিপিবদ্ধ, আর সেলিম পরবর্তী জীবনে নূরজাহানের প্রাধান্যকে স্বীকার ক'রতে গিয়ে "তুজাকে জাহাঙ্গীরীতে" মুছে ফেল্লেন আনারকলিকে। শুধু লাহোরের ইরাবতী তীরে যুগ যুগান্তর ধ'রে মজনুন সেলিম ব'লে চলল "তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের লজ্জা জড়ানো ছন্দ ওগো।"

———

সাময়িকী

চালের বাজার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশন এলাকায় প্রতি সপ্তাহে ৭৫০ গ্রাম করিয়া চাল দিতেছে তার সঙ্গে ১২৫০ গ্রাম গম দেওয়া হয়।

কিন্তু ২ কিলো চাল গমে কোন লোকের পুরা এক সপ্তাহ পেট ভরে না। কাজেই সর্বত্র প্রায় সব মানুষকেই কালো বাজারে চাল কিনিতে হয়।

দু'টাকা কিলো দরে বাজারে প্রচুর চাল পাওয়া যায়। কিন্তু পুলিশ এই চাল বিক্রয়ে বাধা দিতেছেন।

যাহারা বিনা টিকিটে চাল আনিয়া কেনা বেচা করে তাহাদের ধর পাকড় করা হইতেছে ও চাল কাড়িয়া লওয়া হইতেছে।

কেহই সখ করিয়া কালো বাজারে চাল কেনে না। রেশন দোকানে যে চাল ১,২০ কালো বাজারে তাহা ২ টাকার কমে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় বেশী কড়া-কড়ি করিলে লোক না খাইয়া মরিবে। সাধারণ লোকের উপায় কি?

গঙ্গাসাগর মেলা

গত পৌষ সংক্রান্তির দিন ২৪ পরগণা জেলার গঙ্গা-সাগরে স্নানের মেলা হইয়া গিয়াছে। বৎসরে একদিন তথায় প্রায় দশলক্ষ লোক যাইয়া স্নান করিয়া পুণ্য লাভ করে। এই উপলক্ষে নানারূপ দুর্ঘটনাও ঘটিতে দেখা যায়।

নৌকা ও জাহাজ ডুবি, জেটি ভাঙ্গিয়া পড়া, স্রোতে মানুষ ভাসিয়া যাওয়া এ সকল প্রতি বৎসরের ঘটনা। বিস্ময়ের কথা কোন বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হইয়া গঙ্গা সাগরে ভাল ব্যবস্থার চেষ্টা করেন না। যে ছোট দ্বীপে মেলা হয় তাহার খানিকটা সাগর জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেশে ধনী দাতার অভাব নাই। কেহ চেষ্টা করিলেই সাগর দ্বীপে স্থায়ী ব্যবস্থা ও যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। কেন যে তাহা হয়না জানি না! আমাদের শাস্ত্রে আছে বৎসরের যে কোন দিনে ওই স্থানে স্নান করিলে পুণ্য লাভ করা যায়। ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণাংশ অনুন্নত ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ, ক্যানিং, মথুরাপুর প্রভৃতি কয়েকটি বড় সহরের কথা বাদ দিলে ওই দিকে বেশী লোকের বাস হয় নাই। সাগরে একটি স্থায়ী তীর্থস্থান হইলে এ অঞ্চল ক্রমে সমৃদ্ধ হইত। আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসেবকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রী সভায় কংগ্রেস

গত ডিসেম্বর মাসে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি-সভা ত্যাগ করিয়া মাত্র দুইজন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রী সভা গঠন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি তাঁহার মন্ত্রী সভায় আরো ৪ জন পুরা মন্ত্রী ও ৪ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রহণ করেন। তখন মন্ত্রী সভার সদস্য সংখ্যা হইয়াছিল ১১। গত ১৫ই জানুয়ারী কংগ্রেস দলের ৬ জন এম-এল-এ ডাঃ ঘোষের মন্ত্রী সভায় যোগদান করিয়াছেন।

তাঁহাদের নাম—

১) খগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত

২) বিজয় সিং নাহার

৩) রবীন্দ্র লাল সিংহ

৪) ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র

৫) আবদুস সত্তার ও

৬) ডাঃ বিনোদ বিহারী মাঝি।

কংগ্রেস দল মন্ত্রী সভায় যোগদান করায় বিধান সভায় ভোটাভুটিতে এই মন্ত্রী সভাকে পরাজিত করা কঠিন হইবে। কিন্তু শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু প্রভৃতি বিরোধী নেতারা এ মন্ত্রী সভা স্থায়ী না করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত কি হইবে তা এখন বলা কঠিন।

কংগ্রেস অধিবেশন

গত জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে হায়দ্রাবাদে লাল বাহাদুর নগরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীকামরাজ নাদারের স্থানে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। তিনি পূর্বে হায়দ্রাবাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার কংগ্রেসীদিগকে অন্যদলের সহিত একযোগে মন্ত্রী সভা গঠন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সমিতির নাম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। তাহার সদস্য সংখ্যা ২১। সভাপতি ছাড়া ৭ জন নির্বাচিত ও ১৩ জন সভাপতি কর্তৃক মনোনীত। নির্বাচনে যে ৭ জন জিতিয়াছেন তাহাদের নাম রাম সুভগ সিং, সি, বি, গুপ্তা, হিতেন্দ্র দেশাই, শ্রীসুব্রহ্মণ্যম, মোহন লাল সুখাদিয়া, সাদিকালি ও বি, পি, নায়েক। কংগ্রেস সভাপতি যে ১৩ জনকে মনোনীত করিয়াছেন তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অতুল্য ঘোষ আছেন। তবে তিনি এবার কোষাধ্যক্ষ হন নাই। এস, সে, পাতিল কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

রাজন্যভাতা সমস্যা

কুড়ি বৎসর পূর্বে দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে দেশে যে সকল দেশীয় রাজ্য ছিল সেগুলি ভারত রাষ্ট্রের অধীন করা হইয়াছে। ফলে সকল দেশীয় রাজ্যের রাজাকে পেন্সন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পেন্সনের পরিমাণ এত বেশী যে বর্তমানে তাহা দেওয়া কষ্টকর। সে জন্য স্থির হইয়াছে রাজাদের পেনসন হয় একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইবে না হয় খুব কমিয়া যাইবে। কি ব্যবস্থা হইবে তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয় নাই।

করর্পোরেশনের নূতন কমিশনার

শ্রীতুলসী গোপাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান কর্মকর্তার এখন নাম হইয়াছে কমিশনার। পূর্বে নির্বাচিত সদস্যদিগকে কমিশনার বলা হইত। এখন তাহাদিগকে কাউন্সিলার বলা হয়। তাহাদের সংখ্যা বর্তমানে ১০৬ জন।

নূতন মিউনিসিপ্যালিটি

২৪ পরগণা জেলার বারাসাতের নিকট অশোক নগর কল্যাণগড় এলাকায় একটি নূতন মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইল। স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এই নূতন মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করিয়াছেন। প্রায় তিনবর্গ মাইল স্থান লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি হইবে এবং তাহার লোক সংখ্যা ৮১ হাজার। অঞ্চলটি ক্রমে সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইবে আশা করা যায়।

শোক প্রকাশ

কলিকাতা করপোরেশনের এক সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

১। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র নন্দিনী কৃপালনি।
২। সাংবাদিক অধীর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। উপন্যাস লেখক রামপদ মুখোপাধ্যায়।
৪। সেনাপতি পি. আর. এম. বাপাত।
৫। প্রিন্সিপাল হরিমোহন ভট্টাচার্য্য।
৬। ডঃ বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
৭। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন।

সম্মান

গত ২৬শে জানুয়ারী যাঁহারা ভারত সরকারের সম্মান পাইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ডঃ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ ও সমাজসেবী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রশান্তবাবু যৌবনে বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন এবং পরবর্ত্তী কালে সারাজীবন সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বর্তমানে সমগ্র ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংখ্যা বিজ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি ‘পদ্মবিভূষণ’ উপাধি লাভ করিয়াছেন। এবার প্রথম শ্রেণীর উপাধি ‘ভারতরত্ন’ কেহই পান নাই। বাংলা দেশ যে সকল বাঙালীর জন্য বর্তমানে গৌরব অনুভব করে ডাঃ মহলানবীশ তাঁহাদের অন্যতম। বয়স বর্তমানে ৭০ বৎসর হইলেও তিনি সারাদিন কাজ করিয়া থাকেন।

শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণার আড়িয়াদহের দরিদ্র অধিবাসী। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তিনি উচ্চ শিক্ষালাভ করেন নাই। সামান্য সরকারী চাকুরীতে ঢুকিয়া গত ৫০ বৎসর কাল তিনি আড়িয়াদহ গ্রামে

সমাজসেবার কাজ করিতেছেন। ৭৫ বৎসর বয়সেও তিনি অবিবাহিত এবং সারাদিন তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত কয়েকটি হাসপাতালের জন্য কাজ করিয়া থাকেন। সর্বাপেক্ষা বড় কথা তিনি অতি অল্প পরিমাণ আহার করিয়াও দেহ ও মনকে সবল ও সুস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বৃদ্ধের কর্মক্ষমতা দেখিলে তরুণের দলকে বিস্মিত হইতে হয়। ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দান করিয়াছেন।

অধ্যাপক সুশীলকুমার দে

কলিকাতাবাসী খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার দে গত ৩০শে জানুয়ারী সকালে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর মাত্র চারদিন পূর্বে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং ১ বৎসর পূর্বে এক মাত্র কন্যা মারা গিয়াছেন। তাঁহার ৯৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯১৯ সালে বিলাত যান এবং সারাজীবন অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। ইংরাজীর এম. এ. হইলেও তিনি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান বই লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার দান অতুলনীয় বলা যায়। তাঁহার বন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে গমন করিয়া ছিলেন।

মহাজাতি সদনে শহীদ চিত্র—

কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যুতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় মহাজাতি সদন নামে যে জাতীয় গৃহ নির্মিত হইয়াছে প্রতিবৎসর প্রজাতন্ত্র দিবসে তথায় কতকগুলি করিয়া দেশভক্তের চিত্র রাখা হয়। এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসে তথায় ১১খানি চিত্র রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে দেশ ভক্ত কবি ৺সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র অন্যতম। সাবিত্রীবাবু এম-এ পড়ার সময় দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সারাজীবন অসংখ্য দেশাত্মবোধক কবিতা লিখিয়া বাংলাদেশকে জাগাইয়া দিয়াছেন। শুধু কবি নহেন, লেখক হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শাসন ও বিচার বিভাগ—

পশ্চিমবংগের নূতন মন্ত্রী হইয়া ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র গত প্রজাতন্ত্র দিবসে পশ্চিমবঙ্গের বিচার ও শাসন বিভাগ দুইটি আলাদা করিয়া দিয়াছেন। বহুদিন যাবৎ এই দুইটি বিভাগকে আলাদা করার কথা চলিতেছিল। ডাঃ চন্দ্র এই কাজ সম্পাদন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইলেন।

মাধব শ্রীহরি আণে—

মহারাষ্ট্রের নেতা মাধব শ্রীহরি আণে গত ৫০ বৎসর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশ সেবা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে রাজ্যপালের পদও প্রদান করা হইয়াছিল। গত ২৬শে জানুয়ারী তিনি 'পদ্মবিভূষণ' সম্মান লাভ করেন। কিন্তু ওই দিন অপরাহ্ণে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল

যুব সম্প্রদায়ের জীবনে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনতার ফলে যে সঙ্কট ও অস্থৈর্য্য দেখা দিয়েছে তারই পটভূমিতে গঠিত হয়েছে "অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল"। ৫।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ঠিকানায় শহরে এর কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বারাসত গভঃ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার মহাশয় এর সভাপতির পদে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি ভারতীয় দর্শন সভার সাধারণ সম্পাদক ও UNESCO-এর ভারতের যুব সমিতিরও সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে স্বার্থহীন সমাজ সেবায় যুব শক্তিকে সংহত করিবার চেষ্টাই মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য। এরই প্রথম চেষ্টা হিসাবে দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটে আড়িয়াদহ গ্রামে মহামণ্ডলের অন্যতম সদস্য সংগঠন "কর্মব্রতী সংস্থায়" গত ২৩শে থেকে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত একটি যুব শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রধানতঃ ডিগ্রী ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রেরা (১৭৬ জন) এই শিবিরে যোগ দিয়াছিল। এদের মধ্যে ২১ জন পরিচালক শিক্ষার্থী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীও ২৪ তারিখে শিক্ষার আসরগুলি ও একটি সম্মেলনে যোগ দেন। তা ছাড়াও বহু দর্শক ও শ্রোতা শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। প্রায় ৫০০ কিশোর-কিশোরীও তাদের বিশেষ সূচীতে অংশ গ্রহণ করে।

শিবিরের সূচীতে ছিল জনসংযোগ, ব্যায়াম, কুচ

কাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, খেলাধুলা, ব্রতচারী, স্কাউটিং, চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী, প্রার্থনা ও বিভিন্ন শিক্ষার আসর। ভারতীয় কৃষ্টি, সমাজ ও নৈতিক চেতনা, স্বাস্থ্য, সমাজতন্ত্র, ধর্ম, কর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তিন দিনে ২১টি আলোচনায় যোগ দেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী অভ্জানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডঃ শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ।

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব

গত ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৮ তারিখে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত হয় কল্পতরু উৎসব। এই উৎসবে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হন। এই ধর্ম সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রধানবক্তা শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও তাঁহার ধর্মোপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার ভাষণে সমবেত ভক্তমণ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে দেশের বর্তমান সঙ্কটে ভগবান্ রামকৃষ্ণের বাণী ও তাঁহার আধ্যাত্মিকতার গভীর তাৎপর্য দেশবাসীকে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করেন।

গান

রচনা—গোপাল রায়

জীবনের জলসায় আমি এক শিল্পী
ব্যথা পাই তবু গান গাই।
অন্তর ভরা কোন বেদনার সুরভি
সুরে সুরে তারে ছড়ায়ে যাই॥
এ জীবনে যত ব্যথা
বেঁধে তারে ছন্দে,
ভ'রে প্রাণ গান গাই গভীর আনন্দে।
কোন্ তারা কোন্ খানে
ঝ'রে গেল অভিমানে
সে হিসাব আমি
কভু রাখি নাই॥

আমার চলার পথ
চলে গেছে কোন্ সুদূরে
তা তো জানিনা
আমি রাখিনি, রাখিনা তার
কোন ঠিকানা।
পান্থ পাখির মত দুদিনেরই জন্য
ধরণীর বুকে বাসা বেঁধে আমি ধন্য
প্রেমেরি বন্ধনে এ মাটির অঙ্গনে
ভালবেসে আমি চলে যেতে চাই॥

অনুবাদ সাহিত্য

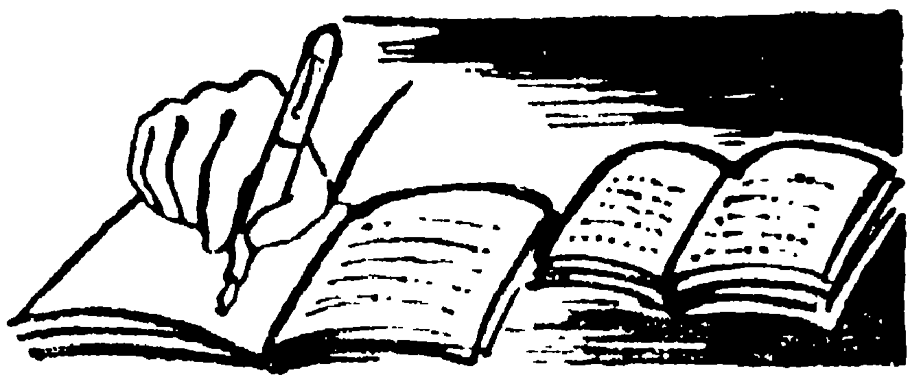

একটি নিখুঁৎ অপরাধের কাহিনী (The perfect Crime)

[আলবার্টো মোরাভিয়া]

অনুবাদক—আশিসকুমার চক্রবর্ত্তী

আসলে সে ছিল আমার চেয়ে শক্তিশালী। যখনই কোন মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হোত—আর তাকে যখন রিগামন্টীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম সে মেয়েটিকে আমার কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যেত। বরাবর এই ঘটে আসছে। আমি আমার মেয়ে বন্ধুদের তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম তাকে দেখাতে যে এ ব্যাপারে আমারও হাত যশ কিছু কম নয় অথবা এও হতে পারে যে বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তার সম্বন্ধে আমি নীচু ধারণা করতে পারতাম না। তাকে বন্ধু হিসেবেই দেখতাম। তার এই ব্যবহার হয়ত আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হোত যদি সে অন্তত: ভদ্রতার আবরণের আড়ালেও কাণ্ডগুলো ঘটাত। কিন্তু তা নয় আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমারই নাকের ডগায় আমার মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতো বা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভবিষ্যতে দেখা সাক্ষাৎ করার সময় ঠিক করতো। এসব ক্ষেত্রে সব ভদ্র ব্যক্তিই যা করে আমিও তাই করতাম অর্থাৎ পথ ছেড়ে দিতাম যাতে কোন গণ্ডগোল না হয়, তাতে যে মহিলাটি সম্বন্ধেই অশ্রদ্ধা দেখান হয় সেটা আমার খেয়াল থাকত না। দুই একবার আমি এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছি কিন্তু তা এত মৃদু যে সে সেটা গ্রাহ্যই করেনি। এমনিতে নিজে আমি খুবই শান্ত, বাইরে থেকে মনের ভাব কেউ বুঝতে পারে না ; এমন কি প্রচণ্ড রাগে বুকের মধ্যে যখন রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে তখনও বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। প্রতিবাদ করলে রিগামন্টী বলেছে "আমাকে দোষ দিলে কি হবে, নিজের দোষ দেখ। তোমার মেয়ে বন্ধুরা যদি আমাকেই পছন্দ করে তাহলে বুঝতে হবে এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমার যোগ্যতা বেশী" কথাটা খানিকটা সত্যি বিশেষ করে শারীরিক সামর্থ্যে কারণ সে ছিল আমার চেয়ে ঢের লম্বা চওড়া ও জোয়ান।

সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রায় চার পাঁচবার এই রকম ঘটার পর আমি রিগামন্টীকে এত ঘৃণা করতে শুরু করলাম—যে মদের দোকানে আমরা একই সঙ্গে কাজ করতাম যাতে তার মুখ দেখতে না হয় সে জন্য কাউন্টারের সামনেই হোক বা একই টেবিলে একই খরিদ্দারের কাজেই হোক আমি হয় তেরচা ভাবে দাঁড়াতাম বা পিঠ ফিরিয়ে থাকতাম। কিন্তু ঘৃণায় তার মুখ না দেখতে চাইলে কি হবে মনে মনে আমি তার কথাই ভাবতাম বেশী বিশেষ করে তার চেহারা সম্বন্ধে। ক্রমেই আমি টের পেতে লাগলাম যে ওকে আর আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

পর ঐ ছোট্ট কপাল, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ—লম্বা বাঁকান নাক—আর সরু গোঁফওয়ালা ভরাট মুখটা আমার অসহ্য লাগতে লাগলো। ওর ঐ নাকটাই আমার খুব মজার লাগতো। ঐ উদ্ধত নাকটাকে এক ঘুষিতে মচাৎ করে ভেঙ্গে দেওয়ার একটা অদম্য ইচ্ছা মনে জাগতো। কিন্তু এটা শুধুই আমার দিবাস্বপ্ন। কারণ আমি হচ্ছি রোগা পট্‌কা—রিগামন্টী এক আঙ্গুলের ধাক্কায় আমাকে কাৎ করে ফেলতে পারে।

ঠিক বলতে পারি না, কি করে ওকে খুন করার

কথাটা হঠাৎ আমার মাথায় এলো। সম্ভবতঃ যেদিন সন্ধ্যায় আমরা একসঙ্গে আমেরিকান ছবি "একটী নিখুঁৎ খুনের কাহিনী"—দেখলাম তার পর থেকেই রিগামন্টীকে খুন করার চিন্তা আমার মাথায় ঢোকে। প্রথমে ঠিক তাকে খুন করবো—এ চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। যদি খুন করতাম তা হলে কি করে করতাম এই চিন্তাই আমাকে পেয়ে বসলো। হাতে কাজ নেই রিগামন্টী হয়ত বারে বসে কাগজ পড়ছে—আমি তার পেছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি "ঐ বরফ ভাঙ্গা হাতুড়ীটা দিয়ে ওর মাথায় এক ঘা লাগালে কেমন হয়?" অবশ্য ঠাট্টার ছলেই আমি এসব ভাবতাম। এ যেন অনেকটা প্রেমে পড়ে যাওয়ার মত—সারাদিন শুধু প্রেমাস্পদের কথা চিন্তা করা—দেখা হলে কি বলবো—কি ভাবে আদর করবো—সেই অলস কল্পনা। শুধু আমার ক্ষেত্রে প্রেমদম্পটী ছিল রিগামন্টী—আর আমার অলস কল্পনা ছিল তার মৃত্যু কামনা নিয়ে।

তাকে খুন করার একটা নিখুঁৎ পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করে ফেললাম। কিন্তু পরিকল্পনা তৈয়ারী করার পরই সেটাকে কাজে লাগাবার অদম্য ইচ্ছা জাগলো। প্রথম প্রথম মন থেকে জোর করে এই চিন্তা দূরে সরানোর চেষ্টা করতে থাকলেও—সে প্রতিরোধও বেশী দিন টিকলো না। পরিকল্পনা অনুসারে নিজের অজান্তেই কখন যে কাজ সুরু করে দিয়েছি—নিজেও সেটা বুঝতে পারিনি। একদিন কফি খেতে খেতে রিগামন্টীকে বল্লাম যে আমি এমন একটি মেয়েকে জানি- যে তার জন্য পাগল। মেয়েটি সুন্দরী আর তাকে রিগামন্টীও চেনে না। প্রায় সপ্তাহ-খানেক রোজই তার কানের কাছে ঐ একই কথা আউড়ে গেলাম অবশ্য প্রতিদিনই নতুন নতুন রং চড়িয়ে। আর রিগামন্টীকে দেখাতে লাগলাম আমার যেন হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম সে উদাসীন ভাব দেখাত, বলতো—

"যদি সে মেয়েটা সত্যই আমাকে ভালবাসে—এখানে তো আসতে পারে, কফি খাইয়ে দিই।" কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পারলাম সে বিচলিত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝেই সে ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞাসা করতো—

"এবার বল—এখনও সে মেয়েটা আমাকে ভালবাসে?"

আমি বলতাম "নিশ্চয়ই।"

"ও আমার সম্বন্ধে কি বলে"—রিগামন্টীর প্রশ্নে কৌতুহল।

"ও বলে যে তোমাকে তার খুবই ভাল লাগে।"

"কিন্তু আমার কী ভাল লাগে?"

"তোমার সব কিছুই তার ভাল লাগে। তোমার নাক—তোমার চুল—তোমার মুখ, কফি মেসিনের সামনে তুমি যে ভাবে কাজ কর, তোমার সব কিছু, তার কাছে ভাল লাগে।" রিগামন্টীর যত কিছু আমি ঘৃণা করতাম—শুধু যে জন্যই আমি তাকে খুন করতে পারতাম তার সব কিছুই যেন এই কাল্পনিক মেয়েটার ভাল লাগে। আত্মগর্বে রিগামন্টীর বুক ফুলে উঠত। এবং বুঝতে পারলাম রিগামন্টী এই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে—শুধু অহংকারের মাথা খেয়ে কিছুই বল্‌তে পারছে না। অবশেষে একদিন চটে গিয়ে বলে ফেল্লো—"দেখ—হয় তুমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও—নয়ত কানের কাছে গালগল্প থামাও।" আমিও এতদিন এই কথাটাই শোনার অপেক্ষায় ছিলাম—এবং সেই মুহূর্ত্তেই পরদিন সন্ধ্যায় মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব কথা দিলাম।

আমার প্ল্যানটা ছিল খুবই সরল। সাধারণতঃ রাত দশটায় আমাদের দোকান বন্ধ হয় কিন্তু মালিক প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত দোকানে বসে হিসেব নিকেশ করে। রিগামন্টীকে আমি Viterbo রেলওয়ের বাঁধের কাছে নিয়ে যাব। কারণ ঐখানটায় ঐ মেয়েটী আসবে বলে আমি রিগামন্টীকে বলেছি। সোয়া দশটার ট্রেন—যখন যাবে সেই শব্দের আড়ালে আমি ওকে পিস্তল দিয়ে গুলি করবো। দশটা কুড়িতে আমি দোকানে ফিরে যাব। 'এ্যালবি' রাখবার জন্য একটা পার্শ্বেল ফেলে গেছি এই অজুহাতে মালিককে দেখা দিয়ে আসবো। সাড়ে দশটার সময় দারোয়ানের ঘরে গিয়ে শোব সেই রাতের মত।

রিগামন্টীকে খুন করার এই প্ল্যানটা আসলে আমার দেখা একটা সিনেমার বই থেকে নেওয়া; বিশেষ করে ট্রেনের শব্দের আড়ালে পিস্তলের আওয়াজ চাপা দেওয়া ব্যাপারটা। আমার বিফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ছিল আর ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কাকেও অস্বীকার করা যায় না

কিন্তু তবুও তার প্রতি আমার যে পুঞ্জীভূত ঘৃণা সেটা যে একটা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে এতেই ছিল আমার তৃপ্তি। আর তার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতেও আমি প্রস্তুত ছিলাম।

পরদিন ছিল শনিবার আর আমরা সারাদিনই খুব ব্যস্ত রইলাম। সেটা একপক্ষে ভালই হোল। কারণ রিগামন্টীও আমার কাছে মেয়েটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে আমাকে উত্যক্ত করার সুযোগ পেল না। আর আমিও আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে বেশী চিন্তা না করে থাকবার সুযোগ পেলাম। রাত দশটার সময় বারে আমাদের কাজ শেষ হোল। উদ্দি-টুর্দি ছেড়ে আমি আর রিগামন্টী মালিককে শুভরাত্রি জানিয়ে বাইরে এলাম। যে জায়গাটায় গিয়ে রিগামন্টীকে খুন করবো বলে ঠিক করেছিলাম তার পাশেই ছিল ছোট্ট একটা টিলা। টিলাটার পাশেই ছিল একটা নির্জন জায়গা, প্রেমিকাদের বিশেষ প্রিয় জায়গা। অত রাতে ওখানে কেউ উপস্থিত ছিল না। এটা এপ্রিল মাস। আবহাওয়া খুবই ভাল, আকাশও পরিষ্কার হয়ে আসছে, চারদিকে আবছা চাঁদের আলো।

রাস্তা দিয়ে শুধু আমি আর রিগামন্টী হাটছি। রিগামন্টী খুবই উঁচু মেজাজে আছে আর মাঝে মাঝে আমার পিঠ চাপড়াচ্ছে। আমি কিন্তু তার পাশে পাশে হাঁটছি কাঠের পুতুলের মত শক্ত হয়ে। ডান হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে আছি পিস্তলটা যেটা আমার জ্যাকেটের ভেতর দিকে বুক পকেটের মধ্যে রয়েছে। আমরা বড় রাস্তাটা ছেড়ে আর একটা ঘাসে ঢাকা রাস্তায় এসে পড়লাম। এই রাস্তাটা ঠিক রেলের বাঁধের নীচে দিয়ে চলে গেছে। এ জন্য এই জায়গাটা অন্য জায়গায় চেয়ে আরও একটু বেশী অন্ধকার। খুন করার প্ল্যান করবার সময় এটাও আমি ভেবে রেখেছি। রিগামন্টী আমার আগে আগে হাঁটছিল। অবশেষে আমরা নির্দ্ধারিত জায়গায় গিয়ে পৌছুলাম। খানিকটা দূরে লাইট পোষ্টে একটা বাতি মিট মিট করে জ্বলছিল। আমি বল্লাম "মেয়েটা এইখানে আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছে, তুমি দেখো মেয়েটা এক্ষুণি এসে পড়বে।"

রিগামন্টী সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বল্লো "বারম্যান হিসেবে তোমার যা যোগ্যতা মেয়ে মানুষের দালাল হিসেবে সে যোগ্যতা আরও বেশী।" কথাটা শুনে তার প্রতি আমার বিরাগের ভাব না কমে বরং বেড়েই চলে।

জায়গাটা সত্যিই খুব নির্জন। আমাদের পেছন দিকে চাঁদ উঠেছে, তারই আবছা আলোয় আমাদের পায়ের নীচে কুয়াশায় ঢাকা মাঠটা ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। কিছু দূরে মাঝে মাঝে অন্ধকার ঝোপঝাড় আর পলিমাটির স্তূপ। জোলো কুয়াশায় আমার একটু শীত শীত লাগছিল। যাতে ভেস্তে না যায় সে জন্য আশ্বস্ত করতে রিগামন্টীকে বল্লাম "মেয়েটার পক্ষে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে এখানে আসা সম্ভব নয়। কারণ সে চাকরী করে। তার মালিক চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেও বেরুতে পারে না।"

রিগামন্টী বলে উঠলো "না-না ঐ তো সে আসছে," ঘুরে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক এদিকে এগিয়ে আসছে। আগে না জানলেও পরে জেনেছিলাম ঐ জায়গাটায় এক ধরণের স্ত্রীলোক খদ্দের পাকড়ে বেড়ায়। দূরে স্ত্রীলোকটিকে দেখবা মাত্র আমার চিন্তাধারা অন্য দিকে বইতে লাগলো। ভাবলাম রিগামন্টীর সঙ্গে যে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দেবার কথা সে আমার মনগড়া নয় বাস্তবেও তার অস্তিত্ব আছে। ইতি মধ্যে রিগামন্টী বুক ফুলিয়ে তার দিকে এগিয়ে চললো। কাজেই আমিও তার সঙ্গ নিলাম। তখনও স্ত্রীলোকটি কয়েক পা দূরে। আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে যখন সে লাইট পোষ্টটার নীচে এসে দাঁড়াল তখন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখে ভয়ে প্রায় শিউরে উঠলাম। স্ত্রীলোকটির বয়স কম পক্ষে ৬০ বছর, পাগলের মত অদ্ভুত বড় বড় চোখ দুটোর চার পাশে কালো কালো দাগ, মুখে পুরু করে পাউডার লাগানো। ঠোঁট দুটোতে টক্ টকে করে লাল রং মাখানো আর একটা কালো রং-এর রিবণ গলায় বাঁধা রয়েছে রুক্ষ চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে। এ সেই ধরণের স্ত্রীলোক যার অন্ধকারে থাকাই ভাল, যাতে চেহারাটা দেখা না যায়। আর এটা ভেবেই আশ্চর্য্য লাগে যে এই বয়সে আর এই রকম চেহারা নিয়ে খদ্দের পাকড়ায় কি করে! রিগামন্টী তাকে ভাল করে দেখবার আগেই তার স্বভাব সুলভ নির্লজ্জ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেছে "মহাশয়া আপনি কি আমাদের খোঁজেই?"

আর স্ত্রীলোকটিও নির্লজ্জের মত উত্তর দিল "হ্যাঁ নিশ্চয়ই।"

এর মধ্যে রিগামন্টী ভাল করে স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেল আর বুঝতে পারলো নিজের ভুলটা। রিগামন্টী সভয়ে এক পা পিছিয়ে এসে তোতলাতে তোতলাতে বললো "ইয়ে আজ রাত্রে আমি যেতে পারছি না"—তারপর আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললো "এই যে আমার বন্ধু এঁকে নিয়ে যাও।" বলেই সে লাফ দিয়ে পড়লো বাঁধের নীচের সেই রাস্তাটার উপর তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম রিগামন্টী ভেবেছে প্রতিশোধ নেবার জন্য এই রকম একটা পেত্নীকে নিয়ে এসেছি তার জন্য এর আগে যখন অনেক সুন্দরী মেয়েকে এনে দিয়েছি তার জন্য। আর এও বুঝতে পারলাম ঘটনা স্রোতের আকস্মিক পরিবর্তনে আমার প্রতিশোধ স্পৃহাও কেন জানিনা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি তখনও স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে আছি। স্ত্রীলোকটি মিষ্টি করে হাসবার চেষ্টা করে বললো "একটা সিগারেট দাও দেখি", আমার কাছে তার হাসিটা মনে হোল সার্কাসের ক্লাউনের দাঁত খিঁচনী। স্ত্রীলোকটির জন্য এবার আমার দুঃখ হোল, দুঃখ হোল আমার নিজের উপর এমন কি রিগামন্টীর উপরও। যে রিগামন্টীর উপর আমার এমন মারাত্মক ঘৃণা ছিল, সেটাও যে কি করে উবে গেল বুঝতে পারলাম না। আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল। খুনী হওয়ার হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে বলে স্ত্রীলোকটিকে আমি মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

"না আমার কাছে সিগারেট নেই কিন্তু এটা নাও এটা বেচে কমসেকম তুমি হাজার লিরা পাবে" এই বলে পিস্তলটা তার হাতে দিয়ে বাঁধের ধারের রাস্তাটার উপর লাফিয়ে পড়লাম। পরে বড় রাস্তার দিকে ছুটতে লাগলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে। Viterbo ট্রেন গর্জন করে এসে পড়লো কামরার পর কামরা ছুটে চলেছে—আলোকিত জানালাগুলি জোনাকীর মত দৌড়ে দৌড়ে সরে যাচ্ছে আমি দূর থেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। শেষে বাড়ী গেলাম।

পরদিন বারে যখন রিগামন্টীর সঙ্গে দেখা হোল সে বললো "আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। যাহোক আমি কিছু মনে করিনি। রসিকতাটা ভালই হয়েছে।" আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম সহসা বুঝতে পারলাম তাকে আর আমি ঘৃণা করছি না—যদিও সেই একই লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ যেন নিজেকে খুব হাল্কা বলে মনে হোল। বসন্তের হাল্কা হাওয়া যেটা দরজার পর্দাটাকে দুলিয়ে দিয়ে গেল সেটা যেন এক ঝলক আমার মধ্যেও ঢুকে গেল।

বাইরে রোদের মধ্যে টেবিলে দুজন খদ্দের বসেছিল তাদের দেবার জন্য রিগামন্টী আমার হাতে দুকাপ কফি দিল। রিগামন্টীর হাত থেকে কাপ দুটো নেবার সময় আমি আস্তে আস্তে বললাম "সন্ধ্যের সময় থাকতে পারবে? এ্যামেলিয়াকে আজ আসতে বলেছি।"

রিগামন্টী একটু সময় নিয়ে কফি মেশিনের জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করে। পরে খুব সহজ ভাবেই বলে "আমি খুব দুঃখিত আজ সন্ধ্যায় আমি থাকতে পারছি না।"—তার গলায় তিক্ততার কোন চিহ্নই ছিল না।

আমি কাপদুটো নিয়ে বাইরে চলে এলাম কিন্তু মনে মনে আমি যেন একটু হতাশ হলাম। আজ সন্ধ্যায় রিগামন্টী আমার সঙ্গে থাকবে না আর এ্যামেলিয়াকেও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে না, যেমন করে ও আমার অন্য মেয়ে-বন্ধুদের আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

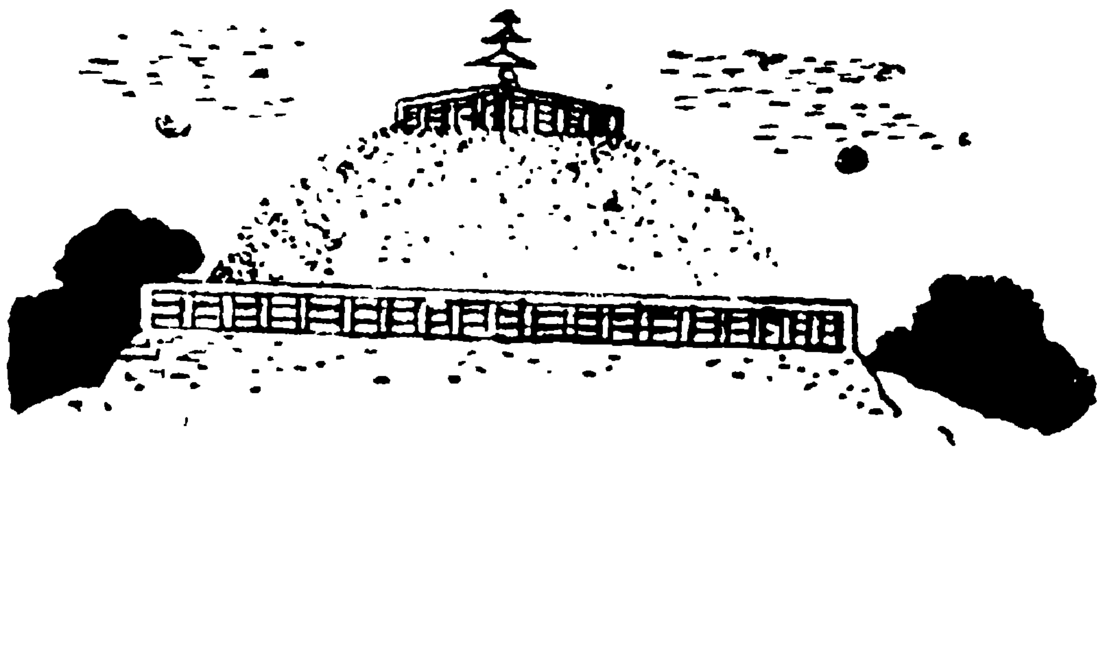

ভাষার ভাবনা

শ্রীজ্ঞান

আমাদের দেশ, এই ভারতবর্ষ এক বিরাট দেশ। এ দেশে যেমন নানা জাতির বাস, তেমনি নানা ভাষার প্রচলন রয়েছে। এই সব ভাষার মধ্যে কয়েকটি ভাষা, যেমন—বাংলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বেশ পুষ্ট ও শক্তিশালী, তেমনি অনেকগুলি ভাষা আবার বেশ দুর্বল ও খুবই সীমাবদ্ধ।

আমাদের দেশে নানা ভাষার প্রচলন থাকলেও অতীতে অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীনতাকালে ভাষা নিয়ে বিশেষ কোনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর একটি জাতীয় ভাষার প্রশ্ন দেখা দেয় এবং অনেক বিতর্ক ও আলোচনার পর সংসদে ভোটাভুটির মাধ্যমে হিন্দী ভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই ভোটের ব্যাপারে দেখা যায় যে হিন্দী ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট সমান সমান হয়ে যায়। তখন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি, হিন্দী ভাষী বিহার প্রদেশের শ্রদ্ধেয় নেতা, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতির "কাষ্টিং ভোট" হিন্দী ভাষার স্বপক্ষে দেওয়ায়, হিন্দী ভাষা মাত্র এক ভোটের গরিষ্ঠতায় জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়।

হিন্দী ভাষার এই সংকীর্ণ জয় লাভের পর থেকে হিন্দী ভাষাকে অনেকটা জোর করে ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত করে ভারতের একমাত্র সংযোগরক্ষাকারী ভাষারূপে চালাবার চেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু দেশের অ-হিন্দী ভাষী বিরাট জনসাধারণ ইংরাজীর ন্যায় ঐশ্বর্যশালী এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাকে পরিত্যাগ করে হিন্দীর মতন ভাষাকে ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করতে নারাজ। তাই হিন্দী ভাষাকে যখনই ইংরাজী ভাষা উঠিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করবার জোর চেষ্টা হয়, তখনই বিক্ষোভ ফেটে পড়ে দেশের দিকে দিকে। এসব খবর তোমরা নিশ্চয়ই জান। আর হিন্দী ভাষা বিরোধী বিক্ষোভ যে কি প্রচণ্ড আকার নেয়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, তা তো তোমরা খবরের কাগজের মারফৎ জানতে পার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের জাতীয় ভাষা কি হবে? ইংরাজী ভাষা যত ঐশ্বর্য্যশালী ও উন্নত হোক না কেন তা বিদেশী ভাষা বলে অনেকেরই ইংরাজীকে জাতীয় ভাষার সম্মান দিতে আপত্তি হবে। ইংরাজীর পরেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনীষীর রচনাপুষ্ট ঐশ্বর্য্যময়ী বাংলা ভাষার নাম করা যেতে পারে। কিন্তু এই ভাষা যতই উন্নত ও সমৃদ্ধ হোক না কেন, এর পরিসর খুবই সীমাবদ্ধ বলে বাঙ্গালীর গৌরব এই বাংলা ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষার মর্য্যাদা দিতে নেতারা প্রস্তুত নন। হিন্দী সম্বন্ধে আগেই বলেছি অ-হিন্দী-ভাষীদের আপত্তির কথা। অন্যান্য ভাষাগুলির কোনটিরই একক গরিষ্ঠতা বা সর্ব-সমর্থন লাভের যোগ্যতা নেই। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাই যে ভারত তথা বিশ্বের সবশ্রেষ্ঠ ভাষার জন্ম এই

ভারতবর্ষে এবং সে ভাষার নাম সংস্কৃত ভাষা। এরকম সর্বৈশ্বর্য্যময়ী সমৃদ্ধ ভাষা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কিন্তু এ ভাষা অতি প্রাচীন, অলঙ্কার ভারাক্রান্ত এবং এর ব্যাকরণ দুরূহ বলে কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণে আপত্তি করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাকে আরও সংস্কৃত করে সাধারণ-বোধ্য সহজ, সরল রূপ দেওয়া কি সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই সম্ভব। অতীতে বৈদিক আর্য্য ভাষাকে সংস্কৃত করে যে ভাষার জন্ম হয়েছিল তারই নাম "সংস্কৃত"। এই ভাষাকে আবারও সংস্কৃত করলে যে ভাষার জন্ম হবে তাকেই "আধুনিক সংস্কৃত" নাম দিয়ে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করলে কারুরই আপত্তি হবে না বলেই মনে হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অধুনা লক্ষ্য করা যায় যে বিশ্বের গৌরব এই সংস্কৃত ভাষাকে আধুনিক ভারতীয়রা যেন অবহেলা করছেন—এ ভাষা শিক্ষার আগ্রহ যেন ক্রমশই কমে আসছে। এরকম হওয়া কিন্তু উচিত নয়। আমাদের এক অমূল্য সম্পদকে আমরা আজ অবহেলা করে হারাতে বসেছি। আমরা আজ ভুলতে বসেছি যে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করেই গড়ে উঠেছে এ যুগের সমস্ত ভারতীয় আধুনিক ভাষা। তাই সংস্কৃতকে অবহেলা করলে চলবে না। বরং সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে ঐ ভাষাকে সহজ ও সরল করবার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা সংস্কৃত ভাষাকে উত্তমরূপে শিক্ষা কর। তাতে তোমাদের ভাষার ওপর দখল বেড়ে যাবে, ভাবের গভীরতা আসবে, মানসিক উন্নতিও হবে। ইংরাজী ভাষাকেও কিন্তু পরিত্যাগ করলে চলবে না। এই ভাষা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী। এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলে বিদেশে যেমন সুবিধা পাবে, ঘরেও তেমনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করার সুবিধাটুকুও পাবে। আর সর্বোপরি নিজের মাতৃভাষার চর্চা সব সময় করে চল এবং চেষ্টা কর নিজ ভাষার উন্নতি সাধন করবার যাতে আমাদের গর্ব, আমাদের আশা এই বাংলা ভাষা একদিন ভারতের জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি পায়।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

—এক—

"বাহবা—বাহবা—খাশা!"

কামানের মুখে আগুন দিলে কামান যেমন গর্জ্জন করে, সেদিন সহরের ফুটবল খেলার মাঠে তেমনি হাজার হাজার লোক গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো—"বাহবা—বাহবা—খাশা!" সেদিন 'শক্তিসঙ্ঘ' আর 'যুবক সঙ্ঘে'র মধ্যে শিল্ডম্যাচের শেষ খেলা চল্‌ছিল। দুইদিন সমান সমান গিয়েছে, কেউ কাকেও হারাতে পারে নি; কোন গোলও হয়নি। তৃতীয় দিনে দুই দলই পণ ক'রেছে, খেলায় জিতবেই। মাঠে লোকে লোকারণ্য। চেয়ারে, গ্যালারীতে, উঁচু উঁচু বক্সে—কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। অনেকে গাছের মাথায় চড়ে খেলা দেখ্‌ছে। শেষে গাছেও আর জায়গা রইল না। সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে খেলা দেখ্‌ছিল। মাথার উপর দিয়ে যে ছোট এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল সে দিকেও কেউ লক্ষ্যই করল না। যুবক সঙ্ঘের ফরোয়ার্ড খেলোয়াড়েরা তখন বল নিয়ে শক্তি সঙ্ঘের গোলের দিকে এগিয়ে আসছিল। শক্তিসঙ্ঘের ফরোয়ার্ডগণ তাদের গতিরোধ করতে পারল না—লেফ্‌ট্‌ হাফ্‌ ব্যাকও কিছু করতে পারল না। যুবক সঙ্ঘ প্রতিপক্ষদলের গোলের কাছাকাছি এসে পড়ল। চারদিকে রব উঠ্‌লো—'গোল—গোল!'

এমন সময়ে শক্তি সঙ্ঘের সেণ্টার হাফ্‌ব্যাক তীরের মতো ছুটল, বাজের মত ক্ষিপ্র গতিতে বলটা ধরল। তার জোড়ালো পদাঘাতে বলটা আধখানা মাঠ পার হ'য়ে শক্তি সঙ্ঘের খেলোয়াড়দের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। উন্মত্ত দর্শকগণ আনন্দে লাফিয়ে উঠে করতালি দিতে দিতে সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"বাহবা—বাহবা—খাশা।"

শক্তিসঙ্ঘের সেণ্টার হাফ্‌ব্যাক শ্যামল চক্রবর্ত্তী শিল্ডের খেলায় সেইদিনই প্রথম খেলতে নেমেছিলেন। আগে তাঁকে কোনদিন কলকাতার মাঠে কেউ খেলতে দেখে নাই।

তিনি একাই এক সহস্র। যেখানে বল সেইখানেই শ্যামল, যেখানে শ্যামল সেখান দিয়ে বল নিয়ে যেতে পারে এমন খেলোয়াড় না ছিল শক্তিসঙ্ঘের, না ছিল যুবক সঙ্ঘের। কি ডান, কি বাঁ—তাঁর দুই পা-ই সমান চল্‌ছিল। কি আক্রমণে, কি বাধাদানে তাঁর মত খেলোয়াড় মাঠে আর ছিল না। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের পায়ের উপর থেকে তিনি এমন কৌশলে বল কেড়ে নিয়েছিলেন, যে লোকে দেখে অবাক হচ্ছিল।

তখনও হাপ-টাইম হতে তিন চার মিনিট বাকি ছিল। যুবক সঙ্ঘের ফরোয়ার্ড দল ভীষণ বেগে আক্রমণ করল। পাঁচজন ফরোয়ার্ড দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত অগ্রসর হ'তে লাগল। বলটা তাদের পায়ে পায়েই র'য়ে গেল। শক্তিসঙ্ঘের খেলোয়ারেরা বহু চেষ্টা করেও তাদের কাছ থেকে বলটা কেড়ে নিতে পারলো না—তারা ক্রমেই পিছু হটতে লাগলো, চারদিকে তখন একটা ভীষণ চাঞ্চল্য জেগে উঠ্‌লো। জলের ঢেউয়ের মত দর্শকের দল দুলতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো—আনন্দে তারা চীৎকার করে উঠলো—"হুর্‌রে—হুর্‌রে—হুর্‌রে!"

শ্যামলও পিছু হট্‌ছিলেন,—কিন্তু মুহূর্তের জন্য একবার থমকে দাঁড়ালেন এবং পরক্ষণেই এমন বেগে ও কৌশলে যুবকসঙ্ঘের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে আক্রমণ করলেন যে সে বল ছেড়ে তিন হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ল। শ্যামল বল নিয়ে বিপক্ষদলের গোলের দিকে ছুট্‌লেন। সে কি ভীষণ বেগ—যেন পাহাড়ের শিখর থেকে খসে-পড়া বরফের স্তূপ নীচে নেমে আস্‌ছে। যুবক সঙ্ঘের খেলোয়াড়, শক্তিসঙ্ঘের খেলোয়াড়—সকলেই তখন শ্যামলের পিছনে পিছনে ছুট্‌ছে। যুবকসঙ্ঘের ব্যাকের খেলোয়াড়কে কৌশলে ফাঁকি দিয়ে শ্যামল গোল লক্ষ্য ক'রে বলটা মারলেন। বল গোলপোষ্টের গা ঘেঁসে উপরকার 'বার'-এর আধ ইঞ্চি নীচ দিয়ে গোলে ঢুকলো।

সঙ্গে সঙ্গে রেফারীর বাঁশী বেজে উঠ্‌লো;—উন্মত্ত দর্শকগণ 'গোল'—'গোল' বলে চীৎকার ক'রে উঠলো,—ছাতি, ছড়ি, রুমাল, টুপী আকাশে উড়্‌তে লাগলো। কয়েকটা গ্যালারি ভেঙ্গে পড়লো, কতকগুলি চেয়ার উল্টে গেল। যারা নীচে বেঞ্চের উপর বসেছিল তারা দাঁড়িয়ে উঠে একসঙ্গে করতালি দিতে লাগলো।

আবার দুই দলের খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ স্থানে এসে দাঁড়ালো। যুবকসঙ্ঘের খেলোয়ারদের মুখ গম্ভীর, নয়নে নয়নে অগ্নিশিখা—প্রতি পদক্ষেপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। শক্তিসঙ্ঘের খেলোয়াড়রা হাসিমুখে মাঠে এসে দাঁড়ালো। মুখ দেখে সকলেই বুঝল তারা যে শুধু নিজেদের গোলটাকেই বাঁচাবে তা নয়, বিপক্ষের ঘাড়ে আরও দু'একটা গোল না দিয়ে ছাড়বে না।

রেফারীর বাঁশী বাজল—আবার খেলা আরম্ভ হ'লো। আরম্ভেই দেখা গেল দুইদলই প্রাণপণে লড়ছে; কেউ কাউকে এতটুকু ক্ষমা ক'রবে না, এতটুকু মমতা দেখাবে না। দু'টি প্রতিযোগিদলের মধ্যে ভীষণভাবে বল পরীক্ষা আরম্ভ হলো—মনে হলো যেন পাহাড়ের সঙ্গে পাহাড়ের সংঘর্ষ হচ্ছে। শ্যামলকে বাধা দেবার জন্য যুবকসঙ্ঘ দলের দুইজন খেলোয়াড় প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা ক্রমেই হতাশ হ'য়ে পড়লো; শ্যামলকে আটকানো তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। শ্যামল আবার বল নিয়ে ছুটলেন। আবারও বিপক্ষদলের সকল খেলোয়াড়কে পরাস্ত ক'রে, সকল বাধা অতিক্রমণ ক'রে একেবারে যুবকসঙ্ঘ দলের গোলের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সুদৃঢ় পায়ের এক আঘাতে বলটা কামানের গোলার মত গোলের ভিতরে ঢুকে গেল। যুবকসংঙ্ঘের গোলকিপার তাঁকে বাধা দিতে এসে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। চারদিকে রব উঠ্‌লো—"গো-ও-ল! গো-ও-ল!"

হাফ্ টাইমের বাঁশী বেজে উঠ্‌লো। বাঁধভাঙ্গা বানের জলের মত দর্শকগণ চারিদিক থেকে ছুটে এসে মাঠে প্রবেশ ক'রল। উন্মত্ত দর্শকেরা আনন্দে হৈ হল্লা শুরু ক'রে দিল—পুলিশের বাধা, ভলাণ্টিয়ারদের আপত্তি কিছুই গ্রাহ্য করলো না। সকলের মুখেই এক কথা,—এমন খেলা তারা কোনদিনই দেখে নাই।

হাফ্ টাইমের পর যখন দু'দলের খেলোয়াড়েরা আপন আপন স্থানে এসে দাঁড়ালো, তখন সকলে অবাক হ'য়ে দেখলো যে একজন কনেষ্টবল একখানা চিঠি এনে শ্যামলের হাতে দিল। এই কনেষ্টবলই সেদিন খেলার মাঠের প্রবেশ দ্বারের কাছে নিযুক্ত ছিল। শ্যামল চিঠিখানা দেখে একটু অবাক হলেন এবং কনেষ্টবলকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন। কি যে কথা হলো তা কেউ শুনতে পেল না;

শুধু লক্ষ্য করল যে কনেষ্টবল গেটের দিকে আঙ্গুল দিয়ে শ্যামলকে কি যেন দেখালো। গেটের বাইরে তখন দু'তিনখানা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। একখানা গাড়ির ঘস্ ঘস্ শব্দে মনে হচ্ছিল যে সেখানা তখনই চলে যাবে।

শ্যামল চিঠিখানা খুলে পড়লেন এবং রেফারীর অনুমতি নিয়ে একছুটে গেটের দিকে গেলেন। খেলা আরম্ভ হবার তখনও একটু দেরী ছিল। শ্যামলকে মাঠের বাইরে যেতে দেখে দর্শকগণ বিস্মিত হলো; বলতে লাগলো—"ব্যাপারটা কি?" কেউ বা বলল—"খেলার মাঝখানে শ্যামলকে যদি চলে যেতে হয় তবে তো খেলাই মাটি! "আর একজন বললো—" শুধু কি তাই! শিল্ডখানা তবে এবার শক্তি সঙ্ঘের ছেলেদের হাতে এসেও ফস্কে যাবে। শ্যামল না থাকলে যুবক সঙ্ঘ তো চোখের নিমেষে গোল দুটো শোধ দেবে।"

সহসা দর্শকগণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। তাদের মুখে বিস্ময়ের অস্ফুটধ্বনি বেজে উঠলো।

কি ভয়ানক ব্যাপার! প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার লোকের সম্মুখে তিনজন লোক বলপূর্বক শ্যামলকে একখানা মোটর গাড়িতে টেনে তুলছিল। শ্যামল প্রাণ-প্রণে চেষ্টা ক'রেও তাদের হাত ছাড়াতে পারলেন না। চক্ষের নিমেষে শ্যামলের মাথা ও মুখ একটা থলির মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দস্যুরা তীব্রবেগে মোটর গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ হয়, ব্যাপার দেখে সেই বিশাল জনতা তেমনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা আর কোন বাধাই মানলো না। তারা জলের স্রোতের মত খেলার মাঠে ছুটে এলো, প্রবল বেগে গেটের দিকে অগ্রসর হলো, ঝড়ের মত গেট দিয়ে বাইরে রাস্তায় চলে এলো। দুর্বল যারা—তারা সবলের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কেউ বা ঘুসি তুলল, কেউবা উচ্চৈঃস্বরে গালাগালি দিতে লাগলো। কেউবা যেদিকে দস্যুদের গাড়ি চলে গিয়েছিল, সেই মোটর গাড়ির সন্ধানে এদিকে সেদিকে পাগলের মত ছুটতে লাগলো।

সেই গোলমালের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঙ্ঘের খেলোয়াড়দের সঙ্গে যুবক সঙ্ঘের খেলোয়াড়দের মারামারি আরম্ভ হলো। শক্তি সঙ্ঘের সভ্যরা বলতে লাগলো—"একাজ আর কেউ করে নি, যুবক সঙ্ঘেরই কাজ। খেলায় জিততে পারবে না বলে গুণ্ডা লাগিয়ে শ্যামলকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।" যারা খেলা দেখছিল, তারাও মাঠে দাঁড়িয়ে দু'দল হ'য়ে এই কথা নিয়েই বাদানুবাদ করছিল। চারদিকে তখন এমন ভয়ানক কোলাহল ও কলহ আরম্ভ হ'লো যে কে কার কথা শোনে। ছাতিতে ছাতিতে, ছড়িতে ছড়িতে, হাতে হাতে দুইজনে মারামারি বেধে গেল। সেদিনের মত খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। নম্বরের হেঁয়ালি:

রাস্তার দুদিকে বাড়ীর সারি—একদিককার বাড়ীর নম্বরগুলি সব বিজোড়-সংখ্যা·· এদিকে সব শেষের বাড়ীর নম্বর হলো ১৭। ৩৭ নম্বরে দর্জ্জীর দোকান। অন্যদিককার বাড়ীর নম্বর সব জোড়-সংখ্যা। এদিকের ১৮ নম্বরে মুদিখানা···১৮ নম্বরের এ বাড়ীটি ঠিক ওদিককার ১৭ নম্বরের বাড়ীর সামনাসামনি। ১০ নম্বরে থাকেন তোমাদের খুব-জানা এক ভদ্রলোক। মুদিখানার সামনে দিয়ে ১০ নম্বর বাড়ীতে আসতে হলে আমার বাড়ী পেরিয়ে তবে আসবে। আমার বাড়ীর নম্বর কত, বলতে পারো?

বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

তিন অক্ষরের এমন একটি শব্দ—যেটি একত্রে প্রাচীন ভারতের একজন অন্যতম দার্শনিক মুনির নাম বোঝায় শেষের অক্ষর বাদ দিয়ে, প্রথম দুটি অক্ষর নিলে বোঝায়—আমাদের অতি-পরিচিত একটি জন্তু এবং বিশেষ ঋতু

বিশিষ্ট একটি শব্দ। শব্দটির শেষ দুই অক্ষর মিলে যা বোঝায়, সেটি মেলে ডাক্তারখানায় আর বাজারের দোকানে। শব্দটির প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর জোড়া দিলে যা বোঝায়, সেটি শহুরে-লোকজনের কাছে খুবই পরিচিত। বলো তো তোমরা, তিন-অক্ষরের সেই শব্দটি আসলে কি?

রচনা: কমলেশ দে (কলিকাতা)।

গত মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালির উত্তর:

১। ৪৫ (৫+৮+১২+২০)

২। রুমালের চার কোণ থেকে একটি কোণ কাঁচি দিয়ে কেটে দিলেই পাঁচটি কোণ রচনা করা যাবে।

গত মাসের ২টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

গোবিন্দ, নরেন্দ্র, পরিতোষ, জাহ্নবী, চিন্ময়ী, আশুতোষ ও নারায়ণী সিংহ (শ্রীরামপুর), মলিন, শোভনা, কৃষ্ণ, চরণদাস, রাজেশ, চিরঞ্জীব ও পল্টু (কলিকাতা), দেবনাথ, শ্রীপদ, চৈতন্য, গিরিমোহন ও চাঁদমোহন রায় (বর্দ্ধমান), মুরারি, ছবি, সতী, কুন্দমালা ও পবিত্র সেনগুপ্ত (রৌরকেল্লা), বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), শচীন মিত্র, সুনীল বসু, সত্যেন্দ্র শর্ম্মা, জ্যোতি গুপ্ত ও শ্যামল মজুমদার (গড়িয়া), দোলন, রোচনা ও ফণীন্দ্র সাহা (কলিকাতা,) সঞ্জীব, সুনীরা, পূরবী, সুমা, সমীর ও সন্দীপ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), পুপু, ভুটিন ও রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ছোট্টু, লাট্টু, টুটুন, লিন্টু ও ঝুমুর রায়চৌধুরী (দিল্লী), দেবেশ, গণেশ, অলকেশ ও পুলকেশ মল্লিক (কলিকাতা), গিলু, রামু, মাণিক, সত্যবান, মণিমোহন ও বুলু দাসগুপ্ত (বারাসত)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

বিশ্বনাথ ও দেওকীনন্দন সিংহ (গয়া), অরুণ, অশোক, নমিতা, কল্যাণী, শ্যামাদাস, রাজীব ও পুরন্দর সেন (আসানসোল), জয়া, মহামায়া, অন্নপূর্ণা, কালিদাস, পৃথ্বীশ, সুমোহন ও কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (রাঁচী), দীপঙ্কর, সুলোচনা ও বাচ্চু হালদার (কলিকাতা), টোবি, রাণা, বুনা, টাবলু ও হাবলু সোম (কানপুর), প্রকৃতি, সুনন্দা, সুষমা, হাসি, মালা, প্রকাশ, পরমানন্দ ও অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

ছুটির ঘণ্টায়

চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় আরেক-ধরণের আজব মজার খেলার কথা। এ খেলাটির-কায়দা কানুন রপ্ত করে নিয়ে ছুটির দিনে নিপুণ ভঙ্গীতে যদি তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে ঠিকমতো দেখাতে পারো তো, শুধু মজাই নয়, তাদের সবাইকে রীতিমত তাক্ লাগিয়েও দিতে পারবে খুব সহজ উপায়ে।

এ খেলাটি দেখাতে হলে যে সব টুকিটাকি সরঞ্জাম প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। এ সব সরঞ্জাম জোগাড় করা এমন কিছু কঠিন বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়···নিতান্তই ঘরোয়া সামগ্রী—আমাদের অনেকেরই ঘরে মিলবে। এ কারসাজি দেখানোর জন্য কাঁচের তৈরী একটি গেলাসে ঠাণ্ডা জল ভরে নাও। তারপর সেই গেলাসের জলের বুকে ছড়িয়ে দাও—মিহি-ছাঁদের ছোট-ছোট কয়েক টুকরো কর্পূরের দানা। গেলাসের জলে কর্পূরের দানাগুলি ছড়িয়ে দেবার অল্পক্ষণ বাদেই দেখবে—সেগুলি ক্রমশঃ আপনা-থেকেই চক্রাকারে গেলাস-ভরা জলের চারিদিকেই ভেসে বেড়িয়ে দিব্যি সহজ-সুন্দরভাবে ঘুরপাক খেতে সুরু করেছে। এমনিভাবে বেশ কিছুক্ষণ ঘূর্ণীপাক খেয়ে বেড়ানোর সময় যদি তোমরা সেই গেলাসের জলে তৈলাক্ত কোনো কাঠি বা চামচ ডুবিয়ে দাও, তাহলেই দেখবে যে অবিলম্বে জলের বুকে ভাসমান কর্পূরের ছোট-ছোট দানাগুলির গতি যেন যাদুমন্ত্রের বলে থমকে যাবে এবং ঘুরন্ত-দানাগুলি ক্রমেই পিছু হটে সরে গিয়ে গেলাসের কানার গায়ে সেঁটে বসবে—আগের মতো সহজ-গতিতে গেলাসের জলের বুকে আর ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে পারবেনাকো!

ঠাণ্ডা-জলের বদলে, কাঁচের গেলাসটি যদি গরম-জলে ভরে নিয়ে কর্পূরের দানাগুলিকে ভাসিয়ে দাও, তাহলে দেখবে বিজ্ঞানের বিচিত্র-বিধানে সেগুলি বেশ দ্রুতগতিতে ঘূর্ণীপাক খেয়ে বেড়াতে সুরু করেছে। তবে গরম-জলে ভাসমান কর্পূরের দানাগুলির গতি, ঠাণ্ডা-জলের চেয়ে দ্রুত হলেও খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না। বরং, ঠাণ্ডা-জলে ভাসানো হলে, কর্পূরের দানাগুলি অপেক্ষাকৃত বেশীক্ষণ ধরে সহজ-গতিতে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াবে।

এবারের খেলাটির এই হলো আজব কারসাজি। আগামী সংখ্যায় আরেকটি নতুন-ধরণের মজার খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

এশিয়ায় কবে শান্তি আসবে ?

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার মাধ্যমে একটা প্রশ্নের উত্থাপন করছি।

আমাদের এদেশে তা' বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের কথাই বলুন, কিংবা এশিয়ার কথাই বলুন যে আগুন জ্বলছে, তা কি কখনও নিভবে না? সেদিন একটা বই দেখলুম যেন 'নো পিস্ ইন্ এশিয়া।' বড় বড় ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই লেখা হয়েছে বইটা। পড়বার সুযোগ পাইনি। দরকারও নেই কিন্তু বইটার নামটা যে খুব সত্য বা সার্থক তা প্রত্যেক পদক্ষেপে অনুভব করছি। অনেকদিন ধরেই করছি। এশিয়ার দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।

সে আগুন যে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনে কেমনভাবে উৎকটরূপে প্রকট হয়ে পড়েছে তার সংসামান্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। কিছু দিন আগে অফিস থেকে বাড়ী পৌছে শুনলুম—আমাদের প্রতিবেশী যোগানন্দ রায় পাগল হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক বৃদ্ধ। শেষ বয়সের তাঁর একটি মাত্র ছেলে। বয়স কুড়ি একুশ হবে। চাকুরী পেয়েছে নতুন। কলকাতায় চাকুরী করে। রোজ সকালে যায়। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসে। সেদিন সে ফিরে আসে নি। বৃদ্ধ চীৎকার করছেন—তাঁর ছেলেকে ওরা মেরে ফেলেছে। নইলে সে ফিরে এল না কেন? পরের দিন অবশ্য ছেলে বাড়ী ফিরে এল। একরাত হাজতে কাটিয়ে। একশত পচিশ টাকার জরিমানার শাস্তি নিয়ে। আগের দিনে দুর্বৃত্তেরা যখন ট্রাম পোড়ায় সে তখন বাড়ী ফেরার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ছিল। তাঁর শরীরে নানা স্থানে মারের চিহ্ন।

যোগানন্দের পাশের বাড়ীতে থাকেন নিত্যগোপালের মা। নিত্যগোপাল পুলিশে চাকুরী করেন, মেসে থাকেন। মাঝে মাঝে মাকে দেখতে গ্রামে আসেন। নতুন চাকুরী পেয়েছেন, তাই খুব মন দিয়ে কাজ করছেন। সে দিন বাড়ী আসবেন বলে মাকে চিঠি লিখেছিলেন নিত্যগোপাল। কিন্তু এলেন না। তাঁর জন্য দুশ্চিন্তা করতে করতে তাঁর মা শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়লেন। ঐ রকম সময় একজন খবর নিয়ে এল নিত্যগোপালের মায়ের কাছে:—পটকার আঘাতে নিত্যগোপাল গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। তখন তাঁর কান্না কে দেখে? দু'বছর আগে নিত্যগোপাল যখন কলেজে পড়তেন, খাদ্য আন্দোলন করে মার খেয়েছিলেন। তাঁর মা ভেবেছিলেন, কলেজ ছেড়ে ছেলেটা একটা চাকুরী-বাকুরী পেলেই তিনি নির্ভাবনায় দিন কাটাতে পারবেন। কিন্তু সে হলো না। তাঁর যে ছেলে খাদ্য আন্দোলন করে একদিন পুলিশের মার খেয়েছিলেন, সেই আজ পুলিশ হয়ে দুর্বৃত্তের বোমায় আহত হয়েছেন। আপনি ছাত্র হোন, শিক্ষক হোন, পুলিশ হোন, রিপোর্টার হোন, মন্ত্রী হোন, নিরপেক্ষ পথচারী হোন—যেই হোন, আপনার রক্ষা নেই। আপনাকে কেউ-না-কেউ কোথাও-না-কোথা থেকে এসে ঘায়েল করবেই। সারা এশিয়ায় চলছে এই সংকট, এই অশান্তি। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি কোথায় ও নেই? ক্ষুদ্রতার লড়াই ছেড়ে কোন উন্নত আদর্শে এদেশের মানুষ কি অনুপ্রাণিত হবে না? এদেশে শান্তি কি ফিরবে না?

বিনীত—
মহীতোষ রায়
বাঁশবেড়িয়া

এত ধর্ম্ম ধর্ম্ম কেন ?

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কোণারের পত্রখানা পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তিনি যে ধর্মভারাক্রান্ত রচনাবলীতে বিরক্তি-বোধ করিয়াছেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। তাঁহার মত অনেকেই হয়ত এমন বিরক্তি অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু বাঘা-বাঘা লেখকদের লেখায় বিরক্তি প্রকাশের সাহস তাঁহাদের কাহারও ছিল না। নিত্যানন্দ বাবুর দুঃসাহস সত্য সত্যই প্রশংসনীয়।

আমি নিত্যানন্দ বাবুর সূত্র টানিয়া আরও দু'একটি কথা বলিতে চাই। "ভারতবর্ষ" যে বর্ত্তমান কালের অর্বাচীন-প্রিয় পত্রিকাগুলি থেকে ভিন্ন পথে চলিয়াছে, এখনও চলিতে পারিতেছে তাহার জন্য বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধগুলি, কিশোর বিভাগের শ্রীজ্ঞানের লেখা প্রভৃতি বহু ভারত-সন্তানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করিবে এমন প্রত্যাশা রাখি। যে সকল পাণ্ডিত্য ও ধর্মপিপাসু লেখকরা ধর্মতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা অতি সহজেই দেশের তরুণ তরুণীদের সামনে ব্রহ্মচর্য, দেহ গঠন, চরিত্র-গঠন, প্রভৃতির আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারেন। দেশের তরুণ তরুণীদের জীবন সুগঠিত না হইলে যে দেশটা গোল্লায় যাইবে তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না? তবে তাহাদের মুখে এত ধর্ম ধর্ম কেন? শুধু ধর্ম ধর্ম না করিয়া কিছু বাস্তব আদর্শ সকলের সামনে তুলিয়া ধরা উচিত। ভারতবর্ষের জ্ঞানগর্ভ রচনা লেখক মনীষীদের কাছে আমার এই বিনীত জিজ্ঞাসা রাখিয়া বিদায় লইতেছি।

বিনীত—
নিবারণ চক্রবর্ত্তী
বারুইপুর

ভাষা প্রশ্নে ভাবতে হবে

সবিনয় নিবেদন,

ভাষা নিয়ে আমাদের দেশে প্রচুর হট্টগোল হচ্ছে। আপনার পত্রিকা মারফৎ আমার সামান্য বক্তব্য নিবেদন করছি।

আদর্শ গণতন্ত্রের দেশ সুইট্‌সার ল্যাণ্ডের উত্তর পশ্চিম অংশে ফ্রেঞ্চ, উত্তর পূর্বাংশে জার্মান ও দক্ষিণে ইটালিয়ান ভাষা প্রচলিত। তার এই তিন অংশে ধর্ম মতের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু ধর্মান্ধতা নেই। ইংরেজী ভাষা সেখানকার স্কুলগুলির ক্লাশ ৬ হতে শিখানো হয়—যাতে করে আন্তর্জাতিক ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজের সুবিধা হয়। সেখানে কোন এক অংশের ভাষাকে অন্যের উপর চাপানর চেষ্টা নেই। তাতে জাতীয় ঐক্যের কোন রকম হানির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠাই দেখা যায়।

যেখানে ধর্মান্ধতা গুপ্তব্যাধির মত রাষ্ট্র শরীরে আশ্রয় নিয়ে ঘাঁটি মেরে আছে, সেখানে একটা কোন ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে তার দুর্বল প্রলেপে ভিতরের ব্যাধি ঢাকতে যাওয়া বৃথা। সমভাষীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছে। একাধিক ধর্ম ও একাধিক ভাষা থাকলেও রুশিয়া দেশে এরূপ কোন আরষ্ট প্রচেষ্টার অভাবেও কোনো অনৈক্যের সুযোগ নেই। সেখানে জাতীয়তার জীবনময় প্রেরণা এবং রাষ্ট্রগৌরব ও বীর্যাবত্তা সব কিছু ঠিক রেখেছে। শক্তিমান স্বামী বহু পত্নীক সংসারে যেমন আরাধ্য, শক্তিশালী ঐশ্বর্য্যময় রাষ্ট্রও তেমনই বহুভাষাভাষী জনগণের কাম্য।

সেজন্য বলি, নতুন একটা ভাষার বাঁধনে 'বেঁধে ধরে পীরিতে'র মত আমাদের হিন্দীর ডোরে বাঁধতে যাওয়ার চেষ্টা নিরর্থক। আমাদের নিরীহ অর্দ্ধভুক্ত ছেলে-মেয়েদের ওপর অকারণ একটা বোঝা চাপিয়ে তাদের ভালর নামে মন্দ করা হবে। তাদের তথাকথিত অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তাদের অনেকেরই ভবিষ্যতের পথ রোধ করা হবে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থেকে ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে চেতন থেকে নির্ভীকতার সঙ্গে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে দিতে হবে।

বিনীত—
ডঃ প্রফুল্ল কুমার সরকার

সবিনয় নিবেদন,

কিছুদিন যাবৎ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'বিশ্বভাষা পরিক্রমা' প্রবন্ধখানি মনোযোগ সহকারে পড়িতেছি। প্রবন্ধখানিতে লেখক ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর আদিম পরিচয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপুর্ণ তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর রামায়ণ-মহাভারতের যুগের ভারতবাসীর ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতি; প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অধিবাসীদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যগুলি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াই করিয়াছেন। বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের ঐতিহাসিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণ অতি বিচক্ষণতার সহিত করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি ভারতীয় তথা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সভ্যতার উপর প্রখর আলোক সম্পাত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। 'বিশ্বভাষা পরিক্রমা' তাহার সার্থক হইবে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৩৭৪ কার্ত্তিক মাসের প্রবন্ধে লেখকের

কয়েকটী উক্তি অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়াতে এই পত্রখানি লিখিতেছি, পাঠকবর্গের তরফ হইতে ইহা প্রেরণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

লেখক লিখিয়াছেন 'কৃষ্ণ' ইচ্ছা করিলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিতেন—কর্ণের আসল পরিচয় ব্যক্ত করিয়া। এবিষয়ে আমার মনে হয় অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধকে রোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। 'কৃষ্ণ' যে তাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, এইখানেই তিনি সাধারণ মানুষের সমান হইয়াছেন। লেখক 'তাঁহাকে' সাধারণ মানুষ হিসাবেই দেখাইতে চান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মুসোলিনী এবং হিটলারকে প্রলোভন দেওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে বিরত করা যায় নাই তাহার প্রমাণ ভিত্তিক তথ্যাদি সংবাদপত্রে (ইদানীংকালের অমৃতবাজার পত্রিকায় দ্রষ্টব্য) লেখক নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন। ইহাছাড়াও কর্ণের —কুন্তী-পুত্র পরিচয় দেওয়া কি কৃষ্ণের পক্ষে সাধারণ মানুষ হিসাবে সম্ভব ছিল! ইহা দ্বারা অর্জুনাদির সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট হইত না কি? তখনকার দিনের আর্য্য-সমাজে এই পরিচয় নিশ্চয়ই নিন্দনীয় ছিল। তাহা না হইলে কুন্তীই বা এমন কাজ করিবেন কেন? শান্তনুপত্নী সত্যবতীর তো এইরূপ করার প্রয়োজন পড়ে নাই। ব্যাসদেবকে তিনি পুত্র হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়াছেন; কারণ মনে রাখা প্রয়োজন সত্যবতী আর্য্য কন্যা ছিলেন না এবং আজও ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কানীন পুত্রের স্থান অসম্মানের নয় (বিকর্ণ রচিত দণ্ডকশর্বরী দ্রষ্টব্য) এইরূপে অর্জুনাদির সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট করিলে 'কৃষ্ণ' কি বিশ্বাসহন্তা হইতেন না? 'কৃষ্ণের' পক্ষে ইহা অকর্ত্তব্য ছিল।

লেখক লিখিয়াছেন 'যদু' বংশের প্রতিপত্তি বর্ধনই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর 'কৃষ্ণে'র যদুবংশের রক্ষণাবেক্ষণ করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয়না যে তাঁহার উদ্দেশ্য ঐরূপ কিছুই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ' তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনা পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ইহার পর লেখক লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণগণই 'কৃষ্ণের' প্রতি দেবত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে মহীয়ান করিয়া গিয়াছেন। কারণ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন 'কৃষ্ণ' ব্রহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক।

আমার জিজ্ঞাস্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 'কৃষ্ণের' দেবত্ব আরোপের এই কারণ লেখক কোন্ ভিত্তিতে পাইলেন? মহাভারতকার সত্যবতী গর্ভজাত হওয়া সত্ত্বেও নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাভারতে কৃষ্ণের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কোথাও দেবত্বের ভূমিকা নাই। কুরু-কৌশলী, রণনীতি নিপুণ, কূটনীতিজ্ঞ হিসাবেই পাইয়া থাকি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোথাও ধর্ম, ন্যায়, সত্য ইত্যাদির অলৌকিক ক্রিয়া নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অর্জুনাদির জয় লাভের কারণ—সুযোগ ও কৌশলের সদ্ব্যবহার এবং ইহা সম্ভব হইয়াছে কৃষ্ণের সুকৌশল পরিচালনায়। দুর্য্যোধনাদির এই সুকৌশলী পরিচালক বা backing ও guiding এর অভাবই পরাজয়ের একমাত্র বা প্রধানতম কারণ। ব্রাহ্মণ হইয়াও মহাভারতকার নির্বিকারচিত্তে এই সত্যবর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠ করা সত্ত্বেও 'কৃষ্ণ'কে স্বয়ং ভগবান বলিয়া ভারতবাসীর জ্ঞান করে তাহার একমাত্র কারণ ব্রাহ্মণগণের কারসাজী, লেখকের এই উক্তি আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। ভারতবাসী তাহা হইলে নিতান্তই নির্ব্বোধ। তাহাদের যুক্তি বিচার বিবেচনার অভাব ছিল বলিয়াই লেখক মনে করেন।

আমার অভিমত অনুরূপ। আমি তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। 'কৃষ্ণ' ভগবান রূপে ভারতবাসীর মনে স্থান লাভ করার প্রধানতম কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনকে নিষ্কামকর্ম্মের উপদেশ দান। শ্রীমদ্ভগবতের বাণী অতি উচ্চকোটি দার্শনিক উপলব্ধির ফল। যে ব্যক্তি ঐরূপ উচ্চাদর্শের নীতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় (তাহা যদি যুদ্ধক্ষেত্রেও না হয়) ঝঞ্ঝা প্রমত্ত পরিবেশে প্রচার করিতে পারেন, তিনি হয় অতিমানব অথবা দানব। কৃষ্ণকে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, পাষণ্ড, দানব বলিতে আপত্তি থাকিত না, যদি না তিনি এ যুদ্ধে অপূর্ব্ব সংযম প্রদর্শন করিতেন। মনে রাখা প্রয়োজন রণ-নীতি-নিপুণতা 'কৃষ্ণ' চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়াও তিনি 'সুদর্শন চক্রে'র ন্যায় অভিনব অস্ত্রের একক অধিকারী ছিলেন। অথচ বহুবার প্রক্ষোভিত (provocated) হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই (আজকের দিনে পরমাণবিক অস্ত্রের অধিকারীরা কি সেই আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারিবেন?) মনে হয় এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে সৃষ্টি নাশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই আশঙ্কায়ই তিনি অস্ত্রনিক্ষেপকার্য হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়াছিলেন। এই অপরিসীম আত্মসংযমই তাঁহাকে দেবত্ব দান করিয়াছে। ভারতবাসী চিরদিনই যুক্তিবাদী এবং বিবেচনাশীল তাই বলিয়া অনুভূতি হীন নয়। স্বামিজীর ভাষায় 'কৃষ্ণ' ছিলেন বুদ্ধের ন্যায় সংবেদনশীল, শঙ্করের ন্যায় মস্তিষ্কের অধিকারী এবং ইসলামের সংহতি বিদ্যায় নিপুণ। একাধারে এই ত্রিশক্তি সম্মেলনই 'কৃষ্ণ'কে 'শ্রীকৃষ্ণে' পরিণত করিয়াছে।

—কৃষ্ণে মতিরস্তু—

ইতি,

শ্রীমতী ইন্দিরা দাশ
৮ গোপীনাথ সাহা ষ্ট্রীট শ্রীরামপুর

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

... বিধান সরণী (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

মাঘ—১৩৭৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

গীতায় পরাভক্তি

ঋষভ চাঁদ

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪তম ও ৫৫তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনের নিকট এক গহন, অভিনব রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবে যুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়েছে যে, আত্মার প্রসন্নতা লাভ করেছে যে, যে শোকও করে না, আকাঙ্ক্ষাও করে না, যে সর্বভূতে সমদর্শী ও সমভাবাপন্ন, সে আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করে।

ভক্তির দ্বারা সে আমায় জানে, আমি কে ও কতখানি সে তত্ত্বতঃ জানে। এইরূপে আমাকে তত্ত্বতঃ জেনে তদনন্তর আমার মধ্যে প্রবেশ করে।

গীতোক্ত পরাভক্তি প্রাকৃতহৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসময় ভক্তি নয়। মানবহৃদয়ের সরল, নিষ্কাম ভক্তি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির উল্লেখ করেছেন বার বার, স্পষ্ট করে বলেছেন বহুবার যে ভক্তির দ্বারা

ভগবান্ সহজলভ্য। ভক্তি সাধকের অহং গ্রন্থিকে শিথিল করে, তার কামনা-বাসনাকে নির্মূল করে, তার অন্তর-চেতনাকে প্রসারিত করে। তবে প্রাকৃত হৃদয়ের ভক্তির স্বভাবই হচ্ছে যে তা উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ভাবের উচ্ছলতা তাতে অপরিহার্য। অত্যন্ত সংযত করে রাখলেও কিছু না কিছু উন্মাদনা ও উদ্বেলন তাতে থাকেই। সেইজন্য শ্রুতির উপদেশ হচ্ছে "শান্ত উপাসীত," অর্থাৎ শান্তভাবে উপাসনা করতে হবে। যা সত্তাকে চঞ্চল করে, অধীর করে, বিহ্বল করে তা সর্বতোভাবে পরিহার্য। শান্তরসই শ্রেষ্ঠ রস। শান্তির মধ্যেই সর্বক্ষম শক্তি নিহিত থাকে, শান্ত চেতনাতেই তা অমোঘভাবে কার্যকরী হতে পারে। অবতার ও অবতারকল্প পুরুষের কথা স্বতন্ত্র, তবে অধিকাংশ যোগী বা সাধকের পক্ষে আধ্যাত্মিক প্রগতির অনিবার্য সর্ত হচ্ছে অন্তরে এক অচলপ্রতিষ্ঠ শান্তি, এক প্রগাঢ় সমতা। ভাগবত প্রেম, ভাগবত আনন্দ, ভাগবত জ্যোতিঃ ও শক্তি সাধকের আধারে নামাতে হলে সে আধারকে করতে হবে নিষ্কম্প, নিস্তরঙ্গ, নির্বিকার। এই অবস্থাই শ্রুতির প্রার্থনাতে লক্ষিত হচ্ছে—"স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ"—"স্থির অঙ্গ সকল ও শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা যেন তোমার স্তব-স্তুতি করতে পারি।"

তাহলে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে অহংকেন্দ্রিক প্রাকৃত প্রাণের ভাব-বিহ্বল ভক্তিকেও গীতা পরাভক্তি বলছে না। যে ব্রহ্মভূত হয়নি, পরাভক্তি তার পক্ষে সুদূরপরাহত। মানুষের অন্তরাত্মা যখন তার চেতনাকে অনন্ত ও অতলস্পর্শী করেছে, সর্বভূতে নিজকে এবং নিজেকে সর্বভূতে দেখেছে, তখনই যদি পরমপুরুষ তার লক্ষ্য হন তবে সে তাঁকে পরাভক্তির দ্বারা পেতে পারে।

এখানে জ্ঞানযোগী বৈদান্তিক একটা প্রশ্ন তুলতে পারেন। তা হচ্ছে এই যে, যোগী যখন ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ করেছে তখন সে পরম অদ্বয়তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই সাযুজ্য মুক্তিতে ভগবান্ ও ভক্ত এই দ্বৈত-বোধ কেমন করে আসতে পারে? আর দ্বৈতবোধ না থাকলে ভক্তির অনুভূতি যে সম্ভবপর নয়। দ্বৈতবোধ যদি মেনে নেওয়া যায় তবে গীতার বৈদান্তিক ভিত্তিই যে টলে পড়ে। বৈদান্তিকের মতে অদ্বয় ব্রহ্মভাবে সমস্ত ত্রিপুটিরই বিলয় হয়—প্রেম, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কিছুই থাকে না। গীতা এই সমস্যার সমাধান কেমন করে করেছে?

গীতা ব্রহ্মশব্দ অক্ষরব্রহ্ম বা অক্ষরপুরুষের অর্থে ব্যবহার করেছে। ক্ষরপুরুষ, অক্ষরপুরুষ ও পুরুষোত্তম, গীতার এই বিভাব-নির্দেশ ঔপনিষদীয় প্রণালীরই অনুরূপ। অক্ষরপুরুষ বা অক্ষরব্রহ্ম যুগপৎ বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত। অক্ষরপুরুষ ক্ষরপুরুষের দ্রষ্টা ও ভর্তা, কিন্তু ভোক্তা ও ঈশ্বর নয়। অক্ষরের আদি অন্তহীন নিশ্চল স্থিতির বুকেই চলছে প্রকৃতির অবিরাম লীলানৃত্য, ক্ষরের অপরিচ্ছিন্ন শক্তি-প্রবাহ। এই ক্ষয়শীল জগদ্ব্যাপার থেকে চেতনাকে সরিয়ে গভীরে নিয়ে গেলে পাওয়া যায় অক্ষরের সর্বব্যাপী স্থাণুত্ব। অক্ষর কূটস্থ, সে শক্তির জোয়ার-ভাটার বাইরে। সে নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন। সাধকের চেতনা সমাধিদ্বারা অক্ষরের শাশ্বত শান্তিতে পৌঁছলে, বিশ্বের জীবন-চাঞ্চল্য তার কাছে প্রপঞ্চ বা মায়া বলে প্রতীয়মান হয়। সে অক্ষরকেই নিঃশ্রেয়স্ বলে চেপে ধরে, তারই গভীর হতে গভীরতর প্রদেশে আত্ম-নিমজ্জন চায়। অক্ষরই পরম সত্য, অক্ষরই ধ্রুব, অক্ষরই অমৃত, সমাধিলব্ধ এই আকস্মিক অনুভূতিকেই চরম উপলব্ধি বলে মনে করে।

গীতা কিন্তু অক্ষরকে পরম সৎ বা চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে না। অক্ষরের নিত্য নিথর, স্থিতিতে চির-বিলয়কে সে পরম পুরুষার্থ বলে না। গীতা বলে অক্ষরেরও পরে রয়েছেন পুরুষোত্তম, "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।" পুরুষোত্তমই পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণসত্য, ইনিই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরাৎপর। এঁরই এক বিভাব অব্যক্ত, এক বিভাব সর্বানুস্যূত ও সর্বোত্তীর্ণ অক্ষর, আর এক এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপার। ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম, শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্, ইনিই প্রজ্ঞানঘন, সর্বেশ্বর, আবার ইনিই বিশ্বকর্মা ও বিশ্বমূর্তি। গীতার মতে পুরুষোত্তমই সর্বাধার, সর্বগত, সর্বরূপ ও সর্বাতীত সত্য। এই পুরুষ বা পুরুষোত্তমকে পাওয়াই পরম পুরুষার্থ। গীতা উপনিষদের সমন্বিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যুগোপযোগী করে' প্রগতিশীল মানব-চেতনার সামনে ধরেছে। বেদে ও উপনিষদে পুরুষকেই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ও অন্য অনেক সূক্তে এই পুরুষেরই নির্দেশ করা হয়েছে। তাঁকে কখন দেব বলে, কখন পুরুষ বলে, কখন পরমপুরুষ বলে

অভিহিত করা হয়েছে। পুরুষ অক্ষর ব্রহ্মের উচ্চতর ও পূর্ণতর সত্তা, পুরুষ ছাড়া যে আর কিছুই নাই, পুরুষই যে পরম কাম্য পরমার্থ, তা বিশেষ করে ঘোষণা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের ১০।৯০।১ সূক্তে আছে :

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

পুরুষের অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু অনন্ত পদ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সমাবেষ্টন করে দশাঙ্গুল পরি মিত ঊর্ধ্বে অবস্থিত আছেন।

এই পুরুষ সর্বরূপ ও সর্বগত হয়েও সর্বোত্তীর্ণ, সর্বের অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত। সৃষ্টি মাত্র তাঁর এক অংশে স্থিত—"একাংশেন স্থিতং জগৎ।"

ঋগ্বেদের আর একটি সূক্তে আছে :

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

১০।৯০।৩

বিসৃষ্টির এই সমস্ত মহিমা পুরুষেরই, কিন্তু এই মহিমায় অনুপ্রবিষ্ট ও অনুস্যূত হয়েও তিনি এর বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই সমস্ত মহিমা—উপনিষদ যাকে বরিষ্ঠ বিশ্ব বল্‌ছে—পুরুষের এক পাদ মাত্র।

উপনিষদ বল্‌ছে : "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ।
সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

পুরুষের বড়ো আর কিছুই নাই, তিনিই পরম তত্ত্ব, তিনিই পরম গতি।

তিনি "অক্ষরাৎ পরতঃ পরং"—অক্ষরেরও' পর। তিনিই পরাৎপর।

এই পরমপুরুষ বা গীতোক্ত পুরুষোত্তমকে কেমন করে জানা যায়? ব্রহ্মভূত হয়ে যে নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখে, যে প্রসন্নাত্মা, তারই চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয় পরাভক্তি। পরাভক্তির দ্বারা সে ব্রাহ্মী-স্থিতির পরম শান্তি থেকে পুরুষোত্তমের পূর্ণসত্তা, পূর্ণপ্রেম, পূর্ণশক্তি এবং অনন্ত সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই পুরুষোত্তমই ভগবান্, ইনিই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—আনন্দে ও অমৃতে সমুজ্জল। ইনিই পরম তত্ত্ব, পরম ঋত, পরম রহস্য, পরম ধাম।

শঙ্করাচার্য্য গীতার অক্ষরব্রহ্মকে সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর মতে কূটস্থ (কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে—গীতা) হচ্ছে কূটো রাশিঃ ইব স্থিতঃ অর্থাৎ কূট রাশির মত স্থিত, অথবা কূটো মায়া বঞ্চনা জিহ্মতা কুটিলতা ইতি পর্য্যায়ী অনেক মায়াদি প্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ সংসার বীজানন্ত্যাদ্ ন ক্ষরতি ইতি অক্ষর উচ্যতে (শঙ্করাচার্য্যের গীতা ভাষ্য)। অর্থাৎ কূটের অর্থ মায়া, যার পর্য্যায়বাচী শব্দ হচ্ছে বঞ্চনা, ছল, কুটিলতা আদি। অনেকমায়াদিপ্রকারে স্থিতঃ যে সে কূটস্থ। সংসার বীজ অন্তর্হিত হয় কিন্তু কূটস্থ ক্ষয়িত বা নষ্ট হয় না, সেইজন্য কূটস্থকে অক্ষর বলা হয়।

স্পষ্টই এই কষ্টকল্পিত অর্থ গীতার অভিপ্রেত নয় এবং গীতার সমস্ত শিক্ষাকে বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত করে। এ বিষয়ে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা সঙ্গত ও সমীচীন। "কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনোভোক্তা সত্বক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে।" কূট শব্দের অর্থ পর্বত বা পর্বতশৃঙ্গও হয়। এই অর্থ নিলে কূটস্থের ব্যাখ্যা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

পুরুষোত্তমকে মায়োপহিত বা মায়া উপাধি যুক্ত ঈশ্বর বলে নির্দেশ করা ও অক্ষর ব্রহ্মকেও মায়ার অধীনস্থ করা সমস্ত বেদ-বেদান্তের কেন্দ্রীয় সত্যের অপলাপ করা মাত্র। উপনিষদ্ বলছে "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ"—পুরুষের পরে আর কিছুই নাই, গীতায় পুরুষোত্তম বলছেন "মত্তঃ পরতরং নাস্তি"—আমার পরতর আর কিছুই নাই, আমিই পরমাত্মা, আমিই ঈশ্বর। মায়া ঈশ্বরের সর্জনশক্তি (মম মায়া, আত্মমায়য়া-গীতা); ঈশ্বর মায়ার অধীন নন; হ'লে তাঁর ঈশিত্ব থাকে না।

অতএব দেখা গেল যে ব্রহ্মভূত মানবাত্মা যদি অক্ষর-ব্রহ্মের চির-নীরব, নিষ্ক্রিয় সত্তায় আত্ম-নিমজ্জন না ক'রে তারও ঊর্ধ্বস্থ সর্বোত্তম অদ্বয় সদ্বস্তুর অভিমুখে যাত্রা করে তবে পরাভক্তিই তার একমাত্র পথ ও পাথেয়। পরাভক্তি দ্বারাই সে ভগবানকে জানতে পারে ও তাঁর সঙ্গে পূর্ণভাবে যুক্ত হতে পারে।

এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের বুঝতে হবে : শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে পরাভক্তির দ্বারা যোগী তাঁকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে। তত্ত্বতঃ এই শব্দটি শ্রীকৃষ্ণ একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। এখানেও ৫৫তম

শ্লোকে এটা দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা যাক্ এই শব্দের কোনো বিশিষ্ট অর্থ আছে কি না।

পরব্রহ্মকে মূলতঃ সারতঃ জানার নাম জ্ঞান। আর তাঁর সমগ্রত্বে তাঁকে জানা তাঁর অনন্ত বিভাব ও বিভূতিসহ তাঁকে জানা, তাঁকে যুগপৎ নির্গুণ ও সগুণ ("নির্গুণো গুণী"), নিরাকার ও সাকার, এক ও বহু, নিষ্ক্রিয় ও কৃৎস্নকৃৎ এবং এ-সবেরও অতীত অনির্দেশ্য ও অনির্বচনীয় তৎরূপে জানাকে গীতা বলছে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে সিদ্ধদের মধ্যেও তাঁকে তত্ত্বতঃ জানে এমন যোগী বিরল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বড়ো সুন্দর, বড়ো বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "ব্রহ্মজ্ঞানেরও পর আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ...বিজ্ঞান কি না তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"

"আমি নিত্য ও লীলা দুই-ই লই। তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায় তিনি স্বরাট, তিনি বিরাট। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তিনিই আবার জীবজগৎ হয়েছেন।" "আমি দুই লই, তা না হলে ওজনে কম পড়ে।"

—কথামৃত

"ওজনে কম পড়ে," অর্থাৎ মূলতঃ সচ্চিদানন্দকে জানলেও তাকে সমগ্রতঃ (সমগ্রং মাম্) জানা যায় না যদি বিজ্ঞানের উপলব্ধি না হয়। জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায়, কিন্তু সে নির্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম; তার সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির লীলা-লাস্য, অবর্ণের অনন্ত বর্ণ-বিলাস, অরূপের রূপ-বৈচিত্র্যকে জানা বিজ্ঞান। একেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তত্ত্বতঃ জানা। জীবজগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে নয়, পরম পুরুষই তাঁর অদ্বয় অরূপ স্থিতি থেকে কেমন করে জীব-জগৎ হয়েছেন তা জানাই সত্যিকার জানা। ব্রহ্ম সত্যং জগৎসত্যং ("নাম রূপে সত্যং"—শ্রুতি) শ্রুতির এই পূর্ণদর্শনই পূর্ণজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানই পূর্ণাদ্বৈত। সৃষ্টির পেছনে পুরুষের ইচ্ছা কি (স ঐচ্ছত), এই আত্ম-প্রকাশের দিব্য উদ্দেশ্য কি, প্রকাশধারা কি, প্রকাশ ভঙ্গি কি এই সমস্ত জানা বিজ্ঞান। তত্ত্বতঃ জানা হচ্ছে এই বিজ্ঞানের দ্বারা জানা। এইভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া যায়, তাঁর মধ্যে প্রবেশ করা যায়—"বিশতে তদনন্তরম্।" তাঁর মধ্যে থেকে, পরাভক্তি দিয়ে তাঁর প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে তাঁর লীলার যন্ত্র হওয়া যায়।

পুরুষোত্তমে বা পরব্রহ্মে চিরতরে লীন হওয়া মানবাত্মার পরম লক্ষ্য নয়, কারণ সে যে "মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—জীবলোকে জীবভূত হয়ে সে যে আমারই সনাতন অংশ। পরাৎপরের মধ্যে তার নিত্যস্থিতি, পরাৎপরের মধ্যে তার নিত্য গতি, পরাৎপরের মধ্যে তার শাশ্বত জীবন-ধারণ ও জীবন-ক্রিয়া। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে সে পুরুষোত্তমের সঙ্গে চিরযুক্ত—সালোক্য, সামীপ্য ও সাধর্ম্য তার অবিভাজ্য চেতনার নিরবচ্ছিন্ন সমন্বিত উপলব্ধি। সে পুরুষোত্তমের আত্ম-মহিমার অভিব্যক্তির যন্ত্র, জাগতিক ক্রম-বিকাশে তাঁর অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির, প্রেম ও আনন্দের সুতপুতনু বাহন। অদ্বৈত চেতনার মধ্যেও সে রস-ঘন ভগবানের প্রেমানন্দে স্বচ্ছন্দ-রমণ করে ও তাঁর অমোঘ ইচ্ছাকে পার্থিব জীবনে পূর্ণ করে। ভূতে ভূতে সে তার প্রিয়তমকে দেখে, জানে ও ভজনা করে। তাঁর লীলাসহচর হয়ে রসে রসে, বর্ণে বর্ণে, ছন্দে ছন্দে তাঁরই চিৎসত্তায় আত্ম-প্রসারিত এই বিশ্বকে নব নব রূপে রূপায়িত করে। তাকে অসৎ থেকে সতে, আঁধার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে উন্নয়ন রূপ তার জীবনব্রত উদ্‌যাপন করে।

আর একটা লক্ষ্য করার বিষয়; তত্ত্বতঃ জানা হচ্ছে যুগপৎ "যাবান্" ও "যশ্চাস্মি" জানা। "যশ্চাস্মি" জ্ঞানসূচক ও "যাবান্ বিজ্ঞানসূচক। যাবান্ অর্থাৎ কি করে জীব জগৎ হয়েছি—আমার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বরূপত্ব; আর যশ্চাস্মি আমি যে সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় সত্তা—এই পূর্ণ জ্ঞানই বিজ্ঞান।

এই হল গীতোক্ত পরাভক্তির পরমানন্দময় সংসিদ্ধি।

———

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাত

মা সচরাচর সকালবেলা জপ করতেন তাঁর বিছানায়। জন্মাষ্টমীর আগের দিন তিনি বললেন তাঁর শরীর অনেকটা ভালো, তিনি শুনলেন প্রেমলের সঙ্গে অসিতের আলোচনা বা তর্কাতর্কি। অসিত খুশী হ'য়ে মাকে প্রণাম ক'রে প্রেমলকে বল্ল: "কিন্তু তা'হলে সাবধান প্রেমল! I will rite to the occastion—I must."

প্রণব (হেসে): অমন কথা বোলো না। ও তোমাকে আস্ত রাখবে না তা'হলে।

ললিতা: ই-স্! দাদু আমার কি সোজা তার্কিক না কি—গোলড্‌স্মিথ বলেছিলেন না সেই বিখ্যাত পাদ্রীর কথা:—For e'vn though vanquished he could argue still!

প্রণব: তাহ'লে আমরা হব পাড়াগেঁয়ে বেচারীদের দল—rustics—যারা সে পাদ্রীকে দেখে থ' হয়ে যেত। আহা তারপরের শ্লোকটা and still they gazed—

প্রেমল (পাদপূরণ ক'রে):—

And still they gazed, and still the wonder grew
That one small head could carry all he knew!

ললিতা: আস্পর্ধা! আমি rustic—পাড়াগেঁয়ে? যে ফ্রেঞ্চের ফুলঝুরি কেটে বলতে পারে—বলতে পারে: De l'audace, toujours de l'audace *

মা: গুরুর সামনে এমন যা মুখে আসে তাই বলে?

প্রেমল (হেসে): আর একটু ফ্রেঞ্চ প'ড়েই ধরাকে সরা! কিন্তু হে গরবিনী! এ-যুগে ফ্রেঞ্চের দিন গত। এ হ'ল রাশিয়ার যুগ। যদি রাশিয়ানে বুকনি ঝাড়তে পারতো তা'হলেও বা বুঝতাম।

মা: না। সংস্কৃত সংস্কৃত। দেবভাষাই শিখলি না রে মেয়ে, দেবভূমিতে জ'ন্মে। আর দেখ্‌তো দুলালকে, মার মার কাট কাট দেশ থেকে এসে কেমন রপ্ত করল বাঁশির ভাষা—'মুরলীরস তরলীকৃত'—তারপর কি যেন?

প্রেমল: মুরলীরস-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনম্।
মম খেলতু মদ-চেতসি মধুরাধরমমৃতম্॥

ললিতা (রাগত): তা গুরু যদি না শেখায় শিষ্যা কী করবে শুনি, মুখ বুঁজে থাকা ছাড়া?

প্রণব (অসিতকে): দেখছ তো মুখ বুঁজে থাকার নমুনা?

মা: হয়েছে হয়েছে, এবার ভালো কথা হোক। (ললিতাকে) তোর গুরুকে কফি দিবি কখন?

ললিতা: আগে অতিথিকে দিয়ে তবে তো? দেবভাষা দেবভাষা করছ—জানো না মুনি-ঋষিরা বলতেন অতিথি সাক্ষাৎ দেবতা—যেখানে গুরু মাত্র দেবদূত।

প্রেমল: ধন্যবাদ মিষ্টভাষিণী যে অপদেবতা বলো নি।

ললিতা: ছি ছি! ঠাট্টা ক'রেও এমন কথা বলে! তুমি যে কী বাপী! (ব'লেই ছুটে এসে ওর পায়ে মাথা রাখে)।

প্রেমল (হেসে): বা রে বা! উনি ঠাট্টা করতে পারেন—শুধু গুরু বেচারীই—ও কী! কান্না! এবার

* চাই চোখ ধাঁধানো বীর্য—বীর্য—বীর্য—বীর্য।
'—(ফরাসী বিপ্লবে Dantorn-এর বিখ্যাত দম্ভোক্তি)

"ছি ছি" বলার পালা কার শুনি ? (ললিতার মাথা বুকে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে) পাগলামি করে না। ওঠো (মাথায় গাল রেখে গাঢ় কণ্ঠে): ওঠো মা, তোমার কথায় কি আমি কিছু মনে করতে পারি ?

ললিতা (চোখ মুছে উঠে ব'সে জোর করে মুখে হাসি টেনে অসিতের দিকে চেয়ে): কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি ভাই ! তোমারই একটা গজল আছে না—ঐ সা হো ছি জাতা হৈ ? (প্রসঙ্গান্তর আনতে) বলো এখন ঐ মুরলীরসে-র মানেটা কী।

অসিত: "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" ও শ্লোকটি আমি প্রায়ই গাই বাংলায়ও (সুর ক'রে)

মুনিরও মানসকমল কোমলি দল মেলে যার
মুরলী-স্বনে,
তার সুমধুর অধরামৃত করুক লীলা এ-মুগ্ধ মনে।

* * * *

অসিত: জানো প্রেমল, কাল রাতে আমি কী পড়ছিলাম ? স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন—সুরথদা বইটি আমাকে দিয়েছেন উপহার।

মা: কোন্ ব্রহ্মানন্দ ? রাখাল মহারাজ ?

অসিত: হ্যাঁ মা। তিনি মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে একটি শ্লোক আওরে বলেছেন: ঠিক কথা, এই-ই তো চাই—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতিস্তপোঽধমো ভাবঃ বাহ্যপূজাঽধমাধমা॥

ললিতা: মানে কী বলো দাদা, নৈলে আমি কাল থেকে রান্নাটান্না রেখে শুধুই সংস্কৃত পড়ব তখন বুঝবে ঠেলা ক্ষিদের চোটে।

অসিত (হেসে): এর মানে হ'ল—সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সর্বত্র ব্রহ্মকে দেখা, তারপরে মধ্যম—ধ্যান ধারণা, তারপর জপ বা স্তব—অধম; সবশেষে বাহ্যপূজা—অধমাধমা।

ললিতা: কী বলবে এবার বাপী ? এ তো আর শয্যা নয় যে ঘাবড়ে দেবে ? সাক্ষাৎ মহানির্বাণ তন্ত্র—শিব আওড়েছেন, পার্বতীর কাছে, তাই না ?

প্রেমল (ভ্রুকুটি ক'রে): ব্রহ্মানন্দ স্বামী এ-শ্লোকটির নজির না দিলেও পারতেন। (অসিতের দিকে তাকিয়ে) তোমাকে বোধহয় কাশীতে একবার বলেছিলাম—আমরা নানা সনাতন নজির দিয়ে প্রায়ই ভুল করি—ভুল বুঝে।

অসিত: ভুল বুঝে !

প্রেমল: তাছাড়া আর কী বলব ? কোনো প্রাচীন বিধানের ঠিক বিচার করতে হ'লে দেশকালপাত্রের কথা ভাবতে হবে—অর্থাৎ কোথায় বলা হয়েছিল (পাত্র), কখন বলা হয়েছিল (কাল) আর কাকে বলা হয়েছিল কোন্ ক্ষেত্রে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যুদ্ধ করতে, উদ্ধবকে বললেন অকিঞ্চন হ'তে। শঙ্করাচার্য একবার বললেন—ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং—(ললিতাকে) অর্থাৎ গুরু শিষ্য মিত্র বন্ধু কেউ নেই শুধু আছি আমি সোঽহং সাক্ষাৎ শিব যিনি আনন্দকে জেনে আনন্দী হয়েছেন। তারপরেই—"গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং"—তুমি কাশীতে গেয়েছিলে মনে আছে ? কী ? না সব থেকেও তার কিছুই নেই যার মন গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়ে না। বেশি দূরে যাবার দরকার কি ? পরমহংসদেব নানা পণ্ডিত ও প্রচারককে বলেছিলেন সাধনা না ক'রে লেকচার দেওয়া বৃথা। তাঁর নানা শিষ্যকেও বলেছিলেন যো সো ক'রে আগে কালীদর্শন করা চাই—তার পর ভিখিরি-বিদায়ের পালা। কিন্তু বিবেকানন্দকে ব'লেছিলেন মনে আছে কি: সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে থাকতে চাস কি রে ? এ তো হীন বুদ্ধির কথা। আমি চাই তুই মস্ত অশ্বত্থ গাছের মতন বহু ত্রিতাপে তাপিত জীবনকে আশ্রয় দিবি, অভয় দিবি, তোর ছায়ায় এসে তারা জুড়োবে।

মা: ঠিক কথা। কিন্তু অসিত এসবই জানে। তুমি ওর আসল প্রশ্নের উত্তর দিলে কই ? ওকে বলো না কেন—বাহ্যপূজায় কত কি তুমি পেয়েছ—ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণের কথা।

প্রেমল (সভয়ে): চুপ চুপ, মা ! অসিতকে কি তুমি চেন না ? ও রেডিয়ো মারফৎ হাটে বাজারে ছড়িয়ে দেবে এ খবর হরির লুটের মতন।

মা (হেসে): না। ও বলবে না। ওকে তুমি বলতে পারো, কারণ ও এখন বুঝবে—তোমায় বলছি আমি।

প্রেমল (অসিতের মুখের দিকে তাকিয়েই ললিতার দিকে ফিরে) তুমি বলো।

ললিতা (খিল খিল ক'রে হেসে): বাপী! তুমি যে কী fuss করো ঘড়ি ঘড়ি! ঠাকুরের লীলা—তাঁর ভক্তকেও বলতে বাধে তোমার? দাদাও তো তোমার আমার মতনই ভগবানের কৃপা চায়। আচ্ছা, শোনো ভাই, আমিই বলছি। আমরা মন্দিরে ঠাকুরকে ভোগ দিই তো? হালুয়া ভোগ? একবার হ'ল কি, রোজকার মতন ভোগ ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে রেখে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ধ্যানে বসেছি এমন সময়ে বাপী বলল: "চলো তো দেখি ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণ করছেন কি না।" মা কিছু বললেন না, শুধু মুচকে হাসলেন ওঁর বিছানায় বসেই। আমরা গিয়ে দেখি—(চোখ বড় বড় ক'রে) বলব কি ভাই, দেখি কি—থালায় সাজানো গোল হালুয়া ভোগের একধার থেকে এক খাবল হালুয়া স্রেফ উবে গেছে। শুধু তাই নয় বাকি হালুয়ার গায়ে স্পষ্ট ছোট্ট আঙুলের ছাপ! যেন বালগোপাল—

প্রেমল: হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না।

অসিতের গায়ের মধ্যে শির শির করে ওঠে। ও পড়েছিল নানা বইয়েই ঠাকুরের এ ভাবে প্রসাদ গ্রহণ করার কথা। গিরিশ ঘোষকে এক বৈষ্ণব বলেছিলেন গিরিশ বাবু বিশ্বাস করেন নি। ওর মনে হয়—এও তো তাঁর নরলীলার একটি ছন্দ হ'তে পারে। এমন আরো কত জনের কথা পড়েছে ও, কত সাধুর জীবনীতেই, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে নি, ভেবে এসেছে সব গল্প, কল্পনা বা তিল পরিমাণ সত্যকে তাল ক'রে বাড়িয়ে রটানো। ভাবতেই মন খুশী হ'য়ে ওঠে, ও প্রেমলের পিঠে চাপড় মেরে বলে: "তবু তুমি কেবলই বুদ্ধের মতন—ঠাকুরের কৃপাকে অবিশ্বাস করবে!"

প্রেমল: আমি কৃপাকে অবিশ্বাস করেছি কবে? আমি কি তোমাকে বৃন্দাবনে বার বারই বলি নি আমি কী ভাবে বারবারই গুরুর প্রসাদে ঠাকুরের করুণার স্বাদ পেয়েছি? অবিশ্বাসী আসলে তুমিই ভাই যে কিছুতেই গুরুর মধ্যেকার দেবতাকে মান দিতে চাও না।

অসিত: আমাকে তুমি কেন ক্রমাগতই ভুল বুঝে বেঁকে বসো—বলতে পারো? আমি কি তোমাকে বলি নি বারবারই যে আমি শুধু যে সাধুর আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের করুণার স্বাদ পেয়েছি তাই নয়, শিশুর সংস্পর্শে সমুদ্রের দৃশ্যে, রামধনুর রঙে, কবির কাব্যে, গুণীর গানে আরো কত কিছুর মাধ্যমে পেয়েছি ভাগবতী কৃপার আভাস। শুধু, গুরুর নানা মানবিক খুঁৎ আমার চোখে পড়ে এই অপরাধে তুমি আমার সম্বন্ধে রায় দিলে যে, আমি প্রকৃতিতে অবিশ্বাসী—বলবে: গুরুপাদকে পুরোপুরি মানতে না পারলে ভগবানের কৃপাকে অমান্য করা হ'ল?

প্রণব: এখানে আমি তোমার সঙ্গে একমত অসিত! কারণ তোমার আমার মতন ভক্তিমার্গীর নামে এ-অপবাদ রটানো খুবই অন্যায় যে, আমরা কৃপাকে আদৌ মানতেই চাই না।

অসিত: ধন্যবাদ প্রণব। কারণ আমার বহু চ্যুতি ত্রুটি সত্ত্বেও আমি নিজেকে ভক্তিমার্গী ব'লেই সনাক্ত করি। তাই বুদ্ধের দীপ্ত ব্যক্তিরূপ আমার মন টানলেও আমি বহু চেষ্টা ক'রেও তাঁকে ভালবাসতে পারি নি—যেমন ধরো পেরেছি খৃষ্টদেবকে। বলতে কি, যে-বুদ্ধ গুরু ও করুণাকে কবি কল্পনা ব'লে বরখাস্ত ক'রে দিয়েছেন তাঁকে প্রেমল যে কেমন ক'রে এমন বিষম ভক্তি করতে পারল—আমি ঠিক বুঝতে পারি না—ধাঁধা লাগে।

প্রেমল: অসিত, বুদ্ধ একবার বলেছিলেন যে, বনে অগুন্তি গাছে যত পাতা আছে তাদের সংখ্যা আর কারুর হাতে কায়কাষ্টি গাছের পাতার সংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত তাঁর অনুক্ত প্রজ্ঞা ও উক্ত জ্ঞানবাণীর মধ্যেও সেই অনুপাত ধরা যেতে পারে।

অসিত: তুমি আমাকে সত্যি অবাক্ করলে এবার। আমি বুদ্ধের অনুক্ত প্রজ্ঞার সম্বন্ধে কোনো রায়ই দিতে চাই নি। যে-গুপ্ত জ্ঞানের তহবিল সম্বন্ধে কিছুই জানি না তার মহিমাকে নাকচ করব কোন্ স্পর্ধায় বলো? আমার আপত্তি শুধু তাঁর এই জজিয়তি রায়-এ যে, বাইরের কোনো agency—ভাগবতী শক্তি, গুরুশক্তি বা কৃপাশক্তি—মানুষকে তার তন্হা বা বাসনার ঊর্ধ্বে ওঠার বল জোগাতে পারে না। আরো একটু পরিষ্কার

ক'রে বলব কি?—আমি বলতে চাই'ছি যে, বুদ্ধের 'তপস্যাকেই মুক্তির একমাত্র পথ' বলাটা আমার কাছে গাজোয়ারি—dogmatic মনে হয়, কেন না করুণাও যে আমাদের মুক্তির দিকে এগিয়ে দিতে পারে এ-সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া যে সব অবতার-কল্প মহাপুরুষ ভাগবতী করুণা আছে এ-অঙ্গীকার করেছেন তাঁরা কেউই বুদ্ধের চেয়ে কম জ্ঞানী তপস্বী নন।

প্রেমল: কিন্তু এইমাত্র তোমাকে কী বললাম—স্রেফ ভুলে গেলে? বুদ্ধ করুণাবাদ বা গুরুবাদকে নামঞ্জুর করেছেন কবে কার কাছে ও কোথায়—দেখতে হবে না? আমার মনে হয় যে, তাঁর সময়ে শাস্ত্রের নানা বুলি আওড়ে চলতি লোকাচারকে মানতে মানতে মানুষ তামসিক হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই তিনি তাদের ধমকে ফেরাতে চেয়েছিলেন ক্লৈব্য ছেড়ে বীর্য উদ্যমের দিকে। কিন্তু বুদ্ধের কথা ঠিক হোক বা ভুল হোক তার সঙ্গে কৃপা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কী সম্বন্ধ শুনি? যে সব উপলব্ধি আমার বার বার হয়েছে গুরুর প্রসাদে? তারা আর কারুর অঙ্গীকার বা অস্বীকারের তোয়াক্কা রাখবে কেন? আমি কি তোমাকে বলি নি যে, আমি গুরুদেবের মধ্যে দিয়ে বার বারই ইষ্টের কৃপা পেয়েছি?

প্রণব: কৃপা বলতে তুমি ঠিক কী বোঝো বলবে একটু খুলে?

প্রেমল: সুরথদাও একবার আমাকে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন। তাতে আমি বলেছিলাম যে, আমাদের আমিকে ভগবানের অগ্নিযজ্ঞে আহুতি দিলে যে বিস্ফোরণ হয় তারই নাম কৃপা।

প্রণব: উপমাটি শুনতে চমৎকার মানি। কেবল জিজ্ঞাসা করি—আমরা ওই আগুনে নিজেদের আহুতি দিতে যাব কেন? জগতের কী লাভ হবে যদি, ধরো, ভগবানের অগ্নিযজ্ঞে তুমি আমি বা অসিত আহুতি দিয়ে পুড়ে স্রেফ ছাই হ'য়ে যাই?

প্রেমল: উত্তরে আমি বলব—প্রতি গ্রহ সূর্যের অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে আহুতি দেবার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের তাপসমৃদ্ধি বাড়তে বাধ্য। কোনো যথার্থ আত্মাহুতিই ব্যর্থ হ'তে পারে না।

ললিতা (আহ্লাদে হাততালি দিয়ে): তুমি চমৎকার কথা বলো বাপী—একেবারে দুর্দান্ত বাগ্মী! সাধে কি দাদা বেচারি ফি বার তর্কে হেরে যায়?

প্রেমল: আর তুমিও কিছু কম দুষ্টু নও বৎসে! এক ঢিলে দুপাখী মারায় তোমার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু আমি অসিতের কাছে বেশি জোর'লো বক্তৃতা করলে কি আর রক্ষে আছে? ধরো যদি কোথাও আমার কোনো একটু ভুলচুক হয় ও আমার সেই কথাটাকে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে না কি? (অসিতকে) দোহাই তোমার অসিত, আমার কথাবার্তা তোমার ডেঞ্জেরাস ডায়রিতে টুকে নিও না খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতে। আমাদের আশ্রমে আমরা কোনো খবরের কাগজ আসতে দিই না লক্ষ্য ক'রে থাকবে হয়ত?

অসিত: করেছি। কিন্তু কেন দাও না?

মা: কারণ খবরের কাগজে মন বিক্ষিপ্ত হয়—বিশেষ ক'রে সাধকদের।

অসিত: মানি মা। কিন্তু—মানে—জগতে কোথায় কী ঘটছে সাধকেরা জানবেন না আদৌ!

প্রেমল: ভাই, এ-জানা-না-জানার 'পরে কি বেশি কিছু নির্ভর করে তোমার আমার মতন নিরীহ বেচারী মানুষের ক্ষেত্রে! যাঁরা দিক্‌পাল মঞ্চে মঞ্চে বক্তৃতার ফেরি ক'রে বেড়ান—তাঁদের পক্ষে জানা হয়ত দরকার—বলতে পারি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি অকুতোভয়েই যে, এ-বিশ্বজ্ঞতারও সাড়ে পনেরো আনা না হোক অন্ততঃ বারো আনা মায়া—make-believe. তুমি কালই একটি চমৎকার গান গাইলে:

এম্‌নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কী কুহক ক'রে—
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে!

একেবারে bull's eye! চমৎকার! আর মহামায়ার এ-কুহকের (হেসে) আর মহামায়ার এ-কুহকের রূপ রাগ সুর তাল অগুন্তি। তাঁর একটি প্রধান কারসাজি হ'ল নিত্য, বস্তুকে আবছা রেখে অনিত্য বস্তুকে নিত্যের মান দেওয়া—তাই সারা জগতেই দেখতে পাবে মানুষ এই ঠিকে ভুল করছে—হাল্কাকে ভাবছে ভারি, ভারিকে হাল্কা।

মা: ঠিক বলেছ দুলাল। তাই তো তুচ্ছকে নিয়ে মাতামাতি ক'রে ক্রমাগত আমাদের মনের এত "বাজে খরচ" হয়—পরমহংসদেবের ভাষায়। ফল যা হবার:

আমরা যতই সভ্যভব্য হই ততই বাড়তে থাকে মনের প্রাণের এই বাজে খরচ। (অসিতকে) পরিণামে কী হয় দেখতেই তো পাচ্ছ—দেউলে অবস্থা: বাইরে যত enlightened হই অন্তরে ততই আঁধার ছেয়ে আসে। নয় কি বাবা? বলো তো, বুকে হাত দিয়ে।

প্রণব: একেবারে bull's eye মা! অক্ষরে অক্ষরে। একটি মস্ত প্রমাণ—খবরের কাগজের দুর্দান্ত প্রতিপত্তি শুধু অনিত্য বস্তুর ফেরি ক'রে। আর এই trash ফেরি করতে কাগজওয়ালারা কী প্রাণান্ত পরিশ্রম করেন ভাবো একবার! এ-অনিত্যবস্তু আজকাল ক্রমশ রূপ নিচ্ছে নেশার দিকে—চমকের, উত্তেজনার, বিভীষিকার। তাই হাবিজাবি খবরের চেয়েও বেশি আদর আজকাল sensational খবরের যাতে মন শিউরে ওঠে। কাজেই মনও গ'ড়ে উঠছে এই সবেরই গ্রাহক হ'য়ে—নিত্যবস্তুকে ভুলে অনিত্যকে ফাঁপিয়ে। ফল কী হয় দেখতেই তো পাচ্ছ—যে-জ্ঞানে আত্মার মুক্তি, প্রাণের শান্তি, মনের শুদ্ধি—যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে—যা জানলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়—সেই জ্ঞানই থেকে যায় অজ্ঞাত, অখ্যাত, অবজ্ঞাত। (থেমে) প্রত্যহ আমরা কত সময় নষ্ট করি খবরের কাগজ পড়তে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই, শোনো। গত যুদ্ধে, ১৯১৭ সালে, একবার আমি কুরুক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্যে স্বদেশে ফিরে আসি। এর ঠিক আগে পনেরো দিন কুরুক্ষেত্রে একটিও খবরের কাগজ হাতে আসে নি। লণ্ডনে ফিরে দেখি—আমার মা আমার জন্যে গোছা গোছা times সাজিয়ে রেখেছেন এক মাসের—ফিরে আমি পর পর পড়ব ব'লে। কিন্তু লণ্ডনে ফিরে পুরোনো সংখ্যাগুলির একটিও পড়ি নি আমি। ঠিক যেমন মানুষ মৃতদেহ ছুঁতে চায় না, তেম্‌নি আমার মন চায় নি এ-শবদেহের ম'ত বাসি মাল ছুঁতে। কিন্তু ভেবে দেখ—এ-পনেরো দিন লণ্ডনে থাকলে অন্ততঃ পনেরো ঘণ্টা ধ'রে পড়তামই তো এসব খবর যা দুদিনেই ম'রে ভূত হয়ে যায়? এরই নাম আমি দিতে চাই—অনিত্যের ভাঁওতা—যা আমাদের কোনো কাজেই আসে না, অথচ—হায় হায়—আমরা ভাবি—বিষম জরুরি—না জানলেই নয়! এর নাম মায়া নয় তো কী—বলবে আমায়? যদি খবরের কাগজ-ওয়ালারা সত্যিকার খবর পরিবেষণ করত—অর্থাৎ নিত্যবস্তুর—তাহ'লে কি সে সব পুষ্টিকর পথ্য পাতে পড়তে না পড়তে বাসি হয়ে যেত এ ভাবে?

(মৃদু হেসে) কিন্তু তারা কোত্থেকে সত্যিকার খবর দেবে বলো—যাদের মেলে না হাটে বাজারে, মীটিং-কনফারেন্স, হুল্লোড়ের রঙ্গমঞ্চে? সে-সংবাদ পেতে হ'লে ডুব দিতে হবে—তুমিই গাও না—"ডুব দে রে মন, কালী ব'লে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে?"

(থেমে) কিন্তু এই যে নিরন্তর অনিত্যবস্তুর খবরা খবর নিয়ে মাতামাতি, এর শোচনীয়তার একটু আভাষ পাই আমরা যখন বাজে কাজ ছেড়ে কাজের কাজী হ'য়ে সাধনা করতে বসি। কারণ তখন দেখতে পাই—যে এই সব অজস্র তুচ্ছ খবরের হাজারো হিজিবিজিই আমাদের "হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে" কিলবিল করতে থাকে—মাইক্রোবের ঝাড়ের মতন। আর আমরা ডুকরে কেঁদে উঠি: "ধ্যান করতে বসি, ধ্যান হয় না; জপে মন বসে না; প্রার্থনায় হৃদয়ে সাড়া দেয় না, ফলে সাধনা হ'য়ে যায় খান খান!" না হ'য়ে পারে? সকালবেলা খবরের কাগজ আসতে একটু দেরি হয়েছে তো মন উচাটন!—কী হ'ল, কাগজ আসতে কেন এত দেরি হচ্ছে!! তারপর যেই কাগজ আসা অমনি লাফিয়ে উঠে ডুবে যাওয়া—কে কোথায় কাকে খুন করেছে, কে কাকে ঠকিয়েছে, কোথায় কত বোমা পড়েছে, কতগুলি মেয়ে গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে···এই নিত্যবস্তুকে হেনস্থা ক'রে অনিত্যবস্তুকে নিয়ে মেতে ওঠার পাগলামি আজকের মানুষের প্রায় স্বধর্ম হ'য়ে দাঁড়ায় নি কি? এই সেদিনই ললিতাকে পড়াচ্ছিলাম—পাস্কালের (শেল্‌ফ্‌ থেকে Pascal-এর Pense'e টেনে নিয়ে) এই যে: "Les hommes sont si ne'ce'ssaivement fous, que ce scvait 'e' tre fou pav un autre four de folie, de n'e'tre pas fou"

ললিতা (ছেলে মানুষি বিজ্ঞ ভঙ্গিতে); সত্যিই ভারি চমৎকার কথা মা! তুমি দেবভাষা জানলেও এ-ভাষার তো খবর রাখো না, তাই শোনো বলি: এর মানে—আমরা এম্‌নিই জন্ম-পাগল যে কেউ যদি পাগল না হয় তাকে আরো পাগল ভাবি। কোথায় এক গল্প

পড়েছিলাম—এক অন্ধদের দেশে এক চক্ষুষ্মান্ মানুষ এসে কী বিপদেই পড়েছিলেন!—তিনি জগৎ সম্বন্ধে যাই বলেন না কেন, কানারা হেসে উড়িয়ে দেয় প্রলাপ ব'লে।

প্রণব (হেসে)। বার্নার্ড শ-র সম্বন্ধে এক গল্প আছে। তিনি গিয়েছিলেন এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তাঁর চোখ পরীক্ষা ক'রে বলে—চোখ normal, নির্দোষ। শ তো রেগেই আগুন: "কী! আমি অসামান্য শ!—আমার চোখ কি না নর্মাল?" ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: "রাগ করবেন না স্যর! নর্মাল চোখের মতন abnormal অঘটন ঘটে কালে ভদ্রে—লাখে না মিলয় এক।" তখন শ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন—"বাঁচা গেল" ব'লে।

(সকলের কলহাস্য)

প্রেমল (হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে); কিন্তু আসলে এ হাসির কথা নয় অসিত, কান্নারই কথা—বিশেষ ক'রে তোমার-আমার মতন সত্য সাধকের পক্ষে। কারণ অনিত্যের চাপে নিত্যবস্তুর যে শ্বাসকষ্ট সুরু হয়েছে দেখতেই তো পাচ্ছ চোখের সামনে। ধর্ম—যা ধারণ করে—হ'য়ে দাঁড়াল আজ abnormal, চোরাবালি! ফলে মানুষ দল বেঁধে ছুটেছে শক্তিমদে মাতাল হ'য়ে—কোথায় কেউ জানে না। তার জপ মন্ত্র আজ কী? না, "গতি গতি গতিই সার—লক্ষ্য না-ই বা থাকল কী যায় আসে?" আর এই সব বুলিবাজদেরই নাম ডাক রটছে—জ্ঞানী। জ্ঞানীই বটে, যাঁরা রটাচ্ছেন যে, জীবন হচ্ছে একটা "tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing!"

অসিত। তোমার খেদ আমি বুঝি প্রেমল। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এই সব জ্ঞানীরা প্রশ্ন করতে পারেন। "এ জীবনের যে কোনো একটা লক্ষ্য বা purpose আছে তা আগে থাকতে a priori ধ'রে নেব কেন?"

প্রেমল। খতিয়ে তুমি ফের সেই প্রাচীন তর্ক তুলছ—অন্ধকারে দিশারি কে?—আত্মার আস্তিক বিশ্বাস, না মনের পোষ্যপুত্র বুদ্ধি যার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ?

অসিত। রোসো রোসো। বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য হ'ল এই। অন্ধকার আছে—মানি, কারণ প্রত্যক্ষ। বুদ্ধিও সসীম, বটেই তো—সে হাৎড়াচ্ছেও বটে। কিন্তু তবু সে আছে, আমাদের কাজেও লাগে প্রতিপদেই। কিন্তু এই আত্মাটি কে? কোথায় থাকেন তিনি? তাঁকে মেনে নেবই বা কেমন ক'রে? শুধু অন্ধ বিশ্বাসের এজাহারে?

প্রেমল। এ-প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর আছে। না মানতে চাও কে তোমাকে সাধছে মানতে? ঘুরে মরো না সাধ মিটিয়ে অন্ধকারে ঠোকর খেয়ে, কান্নাকাটি ক'রে। কেবল একটা কথা মনে রেখো: যাঁরা বিশ্বাসের এজাহারে আত্মা বা ভগবানকে প্রথমদিকে মেনে নেন তাঁরা মানবার সময় অন্ধ মতন থাকলেও দেখতে দেখতে যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন—মনের বস্তুবিচারী চক্ষুষ্মান্ বুদ্ধি তার পাত্তাই পায় না, বিচার করবে কি? তাই বিশ্বাসীরা প্রথমটা না জেনে মেনে নিলেও—শেষে বিশ্বাসের পথেই পৌছন পরা প্রজ্ঞায় ওরফে পরা ভক্তিতে। শুধু এই প্রজ্ঞা ও ভক্তির প্রসাদেই মানুষ অমৃত হ'য়ে উঠতে পারে। উপনিষদের মৈত্রেয়ী যার দিশা চেয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে: যে এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। অর্থাৎ তাঁকে জানলে চিনলে তবেই অমৃত হওয়া যায়।

অসিত। কিন্তু তাঁকে জানবার চিনবার পথটা ঠিক কী? জীবন ও বিধাতা দুই-ই রহস্যময়। নানা মুনির নানা মত—উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়তে হয় যে!

প্রেমল। উদ্‌ভ্রান্ত হবে কেন? সব তত্ত্বজিজ্ঞাসুকেই একপথে চালাতে চাও কেন? সত্যার্থীরা কেন চলবেন একই ধারায়—গড্ডালিকা-প্রবাহে? প্রতি মুনির পথেই চলুন না সে মুনির সমানধর্মীরা। এমন তো নয় যে যদু মুনির পথে চললে মধু মুনি তোমাকে শাপ দিয়ে ভস্ম ক'রে দেবেন?

প্রণব। কিন্তু প্রেমল, য়ুরোপে ঠিক এই শাস্তিই দেন কি চার্চের মুনিরা—ইনকুইজিশনের পুড়িয়ে মারা—বেত্রাঘাত—

প্রেমল (হাত তুলে): জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতবর্ষকেই বা আদর্শ ধরতে বাধা কি? ভারতে কি কোনো দিনও বিরুদ্ধ মতের পথিককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে? তাছাড়া ধর্মবিশ্বাস এখন সাবালক হয়েছে সারা জগতেই—যে যে-পথে ইচ্ছে চলতে পারে না কি আজ?

এই-ই তো চাই: ভক্তি সাধনার পথে চলুক ভক্তি-পন্থীরা, জ্ঞানের পথে জ্ঞানমার্গীরা, কর্মের পথে কর্মযোগীরা। জীবনে যে বৈচিত্র্যের শেষ নেই—সবাই মানে। এ-ও তো আনন্দেরই কথা। জীবন রহস্যময়? মানি। কিন্তু সব জলের মতন সাফ হ'লে মন-রূপ Othello-র occupation is gone বলতে হ'ত না কি? আমরা চাই কী? সন্ধানী হ'য়ে আনন্দ শান্তি সার্থকতার নিটোল তৃপ্তি—যেখানে সব সংঘর্ষ দ্বন্দ্বের অবসান—এই না? হাজারো পথে হাজারো ছন্দে হাজারো লক্ষ্যের পানে অন্তহীন আনন্দমণি কুড়োতে কুড়োতে চলুক না প্রত্যেকেই—এতে কার আপত্তি শুনি!

অসিত (সদীর্ঘশ্বাসে): কিন্তু এ-হাজারো পথে মণি কই ভাই? মরু পথে শুধুই যে ধুলো বালি কাঁকর।

প্রেমল (অসিতের কাঁধে চাপড় দিয়ে): এ ভ'ই তোমার রাগের কথা। অন্ততঃ তোমার অভিজ্ঞতার এজাহার এ নয়—যাকে মা উপাধি দিয়েছেন 'আনন্দময় শিশু', ললিতা—হাসিখুসির ফুলঝুরি। কিন্তু তবু তোমার আমার মতন কয়েকটি ভাগ্যবান ছাড়া আর সবাই যে মনমরা হয়ে মরুপথে চলে এমন কথাও বলা চলে না। আমি বলতে চাই—এ-দিনদুনিয়ায় অগুন্তি মানুষ অঢেল দুঃখকষ্ট পেলেও দিনে দিনে সুখ আনন্দও কিছু কম কুড়োয় না। আমাদের দেহ মন প্রাণ এমনি ধাতুতে গড়া যে জগৎজোড়া দারিদ্র্য বা অবিচারের পেষণ সত্ত্বেও অন্ততঃ শৈশবে কৈশোরে ও যৌবনে আমরা প্রায় সব কিছু থেকেই কমবেশি আনন্দ কুড়োতে কুড়োতে পথ চলি—দুচারজন জন্ম-রুগ্‌ণ বা পঙ্গু ভিক্ষুক ছাড়া। অন্তরে যে আলোর দিশা পাই তার ডাকে সাড়া না দিয়ে অনেক সময়েই হয়ত নানা প্রলোভনে মজি—ঢালুপথে গড়িয়ে পৌঁছই অন্ধকারের রসাতলে। কিন্তু তবু এই গড়ানোর মধ্যে দিয়েও কিছু না কিছু রস পাই-ই পাই—ওঠাপরার রস, দুঃখকষ্টের রস, দ্বন্দ্বসংঘর্ষের রস—এমন কি হাহুতাশের মঞ্চেও গ'ড়ে তুলি ড্রামার আনন্দ-উত্তেজনা! জ্ঞানীরা বলেন শুধু সেই পথে চলবে—যে পথে মরুপার হওয়ার সময়েও মেলে ভগবানের কিঞ্চিৎ কৃপার ছোঁওয়া যার প্রসাদে ধুলোবালি কাঁকরের মধ্যেও মুক্তামণি ঝিকমিকিয়ে ওঠে তাঁর রূপের ঝিলিকে। এ-বস্তুবিশ্বে আমাদের তিনি পাঠিয়েছেন এই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে—যেখানে ধূ ধূ শূন্যতার হাহাকার—সেখানেও পূর্ণতার আভাস পেয়ে ধন্য হ'য়ে ঘোষণা করতে: বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—আমি দেখেছি দেখেছি সেই সূর্যপ্রভ দেবদেবকে যিনি আমাদের অজ্ঞানের যবনিকার ওপারে থেকে আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন। হ্যাঁ—লুকোচুরি ছাড়া আর কী, তাঁর এই ডেকে স'রে গিয়ে শেষে ধরা দেওয়া—যাতে ক'রে পদে পদে তাঁকে পেতে পেতে ফ'স্কে গিয়ে হারিয়ে ফিরে-পাওয়ার আনন্দ দশগুণ হ'য়ে ওঠে। এরই তো নাম লীলা। তুমিই সেদিন গাইছিলে একটি চমৎকার গান—মনে নেই?—সেই রবীন্দ্রনাথের

তোমায় নতুন ক'রে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন—
ও মোর ভালোবাসার ধন!

ললিতা: তুমি যে বাক্যবিশারদ—কে না মানবে বাপী? কেবল কথা মানুষকে পেয়ে বসলে এক বিপদ হয় প্রায়ই—কথার ঢেউয়ে খেই হারিয়ে যায়। তাই সবই হ'ল, কেবল, হায় হায় দাদার আমার আসল প্রশ্নটারই উত্তর মিলল না?

প্রেমল: You are impossible! আমি তাহ'লে এতক্ষণ কী বললাম শুনি?

ললিতা: বললে তো একগঙ্গা কথা, কেবল বাহুপূজা কেন অধমাধম নয়—বুঝিয়ে বললে কই?

প্রেমল: বাঃ! বললাম না—নানা পথের মধ্যে বাহুপূজাও একটা পথ—অর্থাৎ তাদের কাছে এপথে চলা যাদের স্বধর্ম?

ললিতা: উঁহুঁ। Not convincing.

প্রেমল। তাহ'লে শোনো বলি—to carry conviction: এই বস্তু জগতে ঠাকুর আমাদের পাঠিয়েছেন এক নতুন খেলা খেলতে। এ-জগৎ ছাড়া আরো কত সূক্ষ্ম বিচিত্র জগৎ আছে যেখানে তাঁর হাজারো রূপ রস ভাবকে বরণ করে কৃতকৃত্য হওয়া যায়। মনে রেখো—সর্বত্র তিনি ব্যাপ্ত হ'লেও—(তেন সর্বমিদং ততম্—প্রতি পথের বাঁকেই তিনি উঁকি দেন এক এক নতুন রূপে। এখন, আমাদের বাস্তুবিশ্বে—material world-এ—তিনি চাইলেন যেন আরো এক অসম্ভবকে সম্ভব করতে: অর্থাৎ যেখানে মনে

হয় চেতনার চিহ্ন লেশও নেই, সবই অনড় অচল জড়—সেখানেও তিনি আমাদের ডাক দিলেন—আমরা সেই স্থাণুর বাইরের স্থূল আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর দেখা পাওয়ার সাধনা করব—যেন তাঁকে বলা চ্যালেঞ্জ ক'রে: "খুব পর্দার পর পর্দা বুনেছিলে ঠাকুর! এমন মোক্ষম লুকিয়েছিলে যে ভেবেছিলে তোমার দেখা পাব না, না? কিন্তু স্বভাবে আমি যে নাছোড়বান্দা ঠাকুর—তাই মরুভূমিতেও খুঁড়তে খুঁড়তে দেখা পেয়েছি অমৃতহ্রদের। কারণ এর আগেও বারবারই ঠেকে শিখেছি তো যে, তুমি ক্রমাগত লুকিয়ে থেকে আমাদের দুয়ো দিতে চাও। আমিও তাই শাসাচ্ছি তোমায়: "বহুৎ আচ্ছা, দেখি কেমন ক'রে তুমি লুকিয়ে থাকো।" অসিত ভাই, গাও তো ফের তোমার সেই কৃপার গানটি: ঐ গানটিতে তুমি তো নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়েছ, প্রেমের অভিমানের পথেই যেন কেমন করে পেয়ে গেছ প্রেমময়ীর দেখা—যদিও হয়ত আধা-অজান্তে।

অসিত গান ধরে:

(মাগো) কৃপা তোমার আছে জানা
চাইলে পরেই যত "না না!"
(তোমার) চাঁদের পানে হাত বাড়ালেই মেঘ-আড়ালের
কতই মানা!
(তোমার) ছলনা আর সইব না তো, রইব না আর
ধৈর্য ধরে:
(এবার) ডাকব তোমায় সাঁঝসকালে, জাগরণে,
ঘুমের ঘোরে।
(মাগো) যতই আমি তোমায় ডাকি,
বলবে তুমি: "কাছেই থাকি,"
(শুধু) ছুঁতে গেলেই যাও পালিয়ে, ধরতে গেলেই
নেই নিশানা।
(তুমি) কাছেই আছ—মানবো না আর কাছে থেকেও
রইলে দূরে,
(আমি) শুনব না আর তোমার কথা, সাধব তোমায়
সকল সুরে।
(দেখি) লুকিয়ে থাকো কেমন ক'রে
দেশে থেকেও দেশান্তরে
(এবার) জানব আলো চাওয়ার ধূপে চিনতে তোমার
ঠিক ঠিকানা।

গাইতে গাইতে ঘরের হাওয়াও যেন বদ্‌লে যায়। মা ভাবসমাধিতে স্থির হ'য়ে ব'সে। মুখে দিব্য হাসি। দু-চোখের কোণ থেকে শুধু দুটী সরু ধারা গাল বেয়ে নামছে। একটু বাদে মা বললেন ভাবমুখে: তুমি পারলে কই লুকিয়ে থাকতে ঠাকুর? পারবে কেমন ক'রে বলো যদি আমরা···সব ছেড়ে বলি—চাইনা এসব হাবিজাবি—চাই শুধু তোমাকেই।'···তখন···তখন কী হয়?···না, এই হাবিজাবিকে আর হাবিজাবি মনে হয় না—মনে হয় চিন্ময়। আমি যে দেখছি ঠাকুর তুমি—তুমি—সবই তুমি—যেদিকে চাই তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই।

আহা, চোখের ঠুলি ওদের খুলে দাও না ঠাকুর, ওদের দেখিয়ে দাও একবারটি। ওরা দেখতে পায় না ব'লেই না এত মিথ্যে তর্কাতর্কি করে! হাসি পায় ঠাকুর, ওদের পণ্ডিতি যুক্তি শুনে! যে-তুমি প্রতি অণুর বুকে জ্বলছ সেই তোমাকে কি না ওরা বলে নেই নেই নেই! হায় হায় হায়! বিজ্ঞের জাহাজেরা এর নাম দেয় বিজ্ঞে! ঠাকুর ঠাকুর!

বলতে বলতে তাঁর চোখ বেয়ে ধারাসারে বর্ষা নামল। তার পরেই পূর্ণ সমাধি···

ওরা সবাই উঠে সন্তর্পণে তাঁর খাটের কিনারায় মাথা রেখে প্রণাম করে।

[ক্রমশঃ]

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ মন্ত্র (১।১।১৫)

মন্ত্র—

লোকদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত—
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥

অর্থ—(উপনিষদে উক্ত হইতেছে :—) নচিকেতাকে যমরাজ সেই সৃষ্ট বস্তুর আদিভূত অগ্নি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন; কি প্রকারে ও কত সংখ্যক ইষ্টক সংগ্রহ করিতে হয় ও কিরূপে সমিৎ সজ্জা (অগ্নি যাহাতে ঠিকমত প্রজ্জ্বলিত হয় সেইভাবে কাষ্ঠ) রচনা করা হয় ইত্যাদি সমস্ত বলিলেন। নচিকেতাও ইহা অবগত হইয়া ঠিক মত তাহার পুনরুক্তি করিলেন। তখন যমরাজ নচিকেতার উক্তিতে তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন।

ব্যাখ্যা—ভাষা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু ভাবটি ধরা দুরূহ। যজ্ঞ ব্যবস্থা করিতে হইলে ইষ্টক দ্বারা বেদী নির্মাণ করিতে হয় ও তাহাতে সমিৎকাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহা আহুতি দিতে হয়। তাহার বর্ণনা করা হইল কি? সে কালে যাঁহারা যজুর্বেদীয় যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবার প্রণালী জানিতেন, তাঁহাদের কাছে এইটুকু আভাস মাত্র যথেষ্ট ছিল। অথবা আচার্য্যের নিকট যথাবিধি জানিয়া লইবার জন্য গোপনীয় ব্যাপার উহ্য রাখা হইল। এইরূপে ক্রিয়া সাধনের অনেক পদ্ধতিই ভারতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ সে বিষয়ে আক্ষেপ করিলে কোন ফল দেখি না। সেই কারণে "ইষ্টক" ও "সমিৎকাষ্ঠ" সম্বন্ধে মন্ত্রের ভাবগত তাৎপর্য্য যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

"ইষ্টক" বলিতে কি বুঝায়? "ইষ"কে "ট" অর্থাৎ স্থাপন, "ক" অর্থে করা। ইষ্টকের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য "ইষ"কে স্থাপন করা। "ইষ" বলিতে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ। মানুষের ইচ্ছা বলিতে "এষ" বলা হয়। আমার মধ্যে যে ইচ্ছা স্বতঃই আবির্ভাব হয় তাহা ভগবানের ইচ্ছার পর্য্যায়ভুক্ত বলিতে হইবে। আমি যে ইচ্ছা করি ও তাহাতে দগ্ধ হই তাহাকে "এষ" বলা হয়। কেনোপনিষদের প্রথমেই বলা হইয়াছে, "কেন ইষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" অর্থাৎ কাঁহার ইচ্ছা হওয়ায় আমার মন এই জগৎধামে আসিয়া পড়িল ও ইহার মধ্যে প্রকৃষ্টভাবে এষণার তরঙ্গ উঠিল? ভগবানের ইচ্ছা (ইষ) অপার্থিব শক্তি, তাহা আমাতে নিহিত আছে এবং আমি তাহাকে যেদিকে হউক, গতি দিতে পারি ও সে বিষয়ে আমি স্বাধীন। ভগবান্ আমার প্রতিরোধ করেন না। তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা আমি অর্থবান্ বা বিদ্বান্ হই, আমি কিন্তু সেই অর্থের বা বিদ্যার, যেমন করিয়া হউক, প্রয়োগ করিতে পারি। "পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা" (বৃহদ উপ, ৩।৫।১) আমাকে সর্ব্বদা উত্যক্ত করে, আমার স্বাধীন ইচ্ছা, এষণা, আছে বলিয়া। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা (ইষ) বড় খাঁটি, তাহা নিছক শক্তি, কর্ম্মের শক্তি, জ্ঞানের শক্তি। অফুরন্ত শক্তি। "ইষ" সম্বন্ধেই বলা চলে, "নীরবে নিভৃত রয়েছে আমার নীরব হৃদয়খানিতে"।

জীবনে আমাকে এষণা ছাড়িয়া ইষকে (ভগবানের ইচ্ছাকে) ধরিয়া থাকিতে হইবে। সেই ইষকে যদি জীবনে স্থাপিত করিতে পারি তাহা হইলে "ইষ্টক" সংগ্রহ হইল। ইহা একেবারে হয় না। প্রতিদিন, দুই বেলা, সন্ধ্যা বন্দনার পর এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়। দিবস ও নিশীথের সন্ধিস্থলে, সন্ধ্যা বন্দনার শুভ লগ্ন বলিয়া দুইবার অতি অবশ্য পালনীয়। কেহ বা তিনবার, কেহ বা পাঁচবার, নিজ নিজ শাস্ত্র অনুসারে সাধন করিতে পারেন। সারা

বৎসর করিলে পর তবে কিছুকাল জীবনে চলিবার মত সামর্থ্য বা বীর্য্য জন্মায় (প্রশ্ন উপ, ১।২ দ্রষ্টব্য)। সমস্ত বৎসর দুইবেলা ইষ্টক সংগ্রহ করিলে ৭২০টি ইষ্টক জমা হইতে পারে। যাহা দ্বারা যজ্ঞ বেদীর উপযোগী ইষ্টক সঞ্চয় হইতে পারে। তখন তাহা নির্ম্মিত করিয়া সেখানে "সমিৎকাষ্ঠ" জ্বালাইতে হয়। সমিৎকাষ্ঠ বলিলে সংসার-স্থিত নিজ জীবনতরুর সকল প্রকার, গীতায় উক্ত (১৫।১ ও ১৫।৩) অধঃশাখার "সুবিরূঢ়মূলম্" (এষণাকে) সমান করিয়া ছেদন পূর্ব্বক সমভাবে প্রজ্বলিত করা। যাহাতে তাহার অবশিষ্ট কিছু না থাকে। স্থূলভাবে কাষ্ঠ জ্বালাইলে তাহার সূক্ষ্মসত্তা, কয়লাকে, আবার জ্বালাইতে হয়। কিন্তু কাষ্ঠের স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত অংশ দাহ করিতে পারিলে সবটুকু ছাই হইয়া যায়। ইহাই যমের শিক্ষার ভাবগত তাৎপর্য্য যাহা নচিকেতা মানব হিতার্থে লাভ করিলেন। এমন করিয়া জীবনকে আহুতি দিবে, যাহাতে তোমার ইচ্ছা (কামনা এবং বাসনা) পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় ও ঈশ্বরের ইচ্ছা অনন্তকাল ধরিয়া তোমাকে ধরিয়া থাকে।

সেই জন্য ইষ্টক সাজানো সারাজীবন চলে। ভুল হইলেই বিপদ ঘটিতে পারে। যেমন সীতার জীবনে হইয়াছিল। রামায়ণে দেখিতে পাই, ইষ্টক রূপ রামের ইচ্ছার একটি গণ্ডী স্থাপন করিয়া সীতাকে অনুনয় করা হয়, তিনি যেন সেই সীমা অতিক্রম না করেন এবং ঐ স্থানেই থাকেন, যতক্ষণ না রামচন্দ্র "মায়ামৃগ"কে হস্তগত করিয়া ফিরিয়া আসেন। সীতা তাহা পারিলেন না। রাবণ ভিক্ষার জন্য সাধুবেশে উপস্থিত হইলে, তিনি সেই ইষ্টক ভূমি পার হইয়া রাবণের কাছে গেলেন। তাহার পর যে অনর্থপাত হইল, তাহা সারা রামায়ণে শেষ হইল কি? সীতাকে সারাজীবন নিজ ইচ্ছাকে দাহ করিতে হইল, কিন্তু সে ইষ্টক আর গড়িয়া উঠিল না। রামের ইচ্ছা আর তেমন করিয়া তাঁহার জীবনে, কাহারও সাহায্যে, স্থাপিত হইল না, বলিয়া, পরিশেষে তিনি পাতালে প্রবেশ করিলেন ও পুনরাবর্ত্তনের অপেক্ষায় রহিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নাকি দ্বাপরে আবার আসিলেন রাধারূপে কত জ্বালা সহ্য করিবার জন্য। এ সব পৌরাণিক কাহিনী এখানে অবান্তর।

মোট কথা, রামের ইচ্ছা মানবজীবনে স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তখন নিজের ইচ্ছা বলিদান দেওয়া। কি করিয়া রামের ইচ্ছাকে জানিব? নিজের জীবনবেদ পাঠ করিতে হয়, জীবনের প্রত্যেক আশ্রমে সেই মত চলিতে হয়, ক্রমে নিজ বর্ণ স্বীয় অন্তর চক্ষু দ্বারা উপলব্ধ হয়। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে, ইষ্টক নির্ম্মিত বেদীতে সমিৎকাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিতে থাকিলে, যাঁহা হইতে জীবন পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার হস্তে তাহাকে প্রত্যর্পণ করা যায়। এই ধর্ম্ম যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন না, অনন্ত স্বর্গলাভ তাঁহাদের সম্ভব হয় ও তাহার চেয়েও উদ্ধগতি, যেমন কেনোপনিষদের শেষ মন্ত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, তাঁহারা ক্রমে প্রাপ্ত হ'ন। এইরূপে কেনোপনিষদের প্রদর্শিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যাহাতে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার ঐক্য সাধন হইয়াছিল, কঠোপনিষদের জীবন যজ্ঞ সাথে সমন্বিত হইয়া নূতন কলেবর ধারণ করিল। ইহজীবনে কর্ম্ম ও যজ্ঞের এই প্রকার সারা অন্তরের অনুমোদন প্রয়োজন হয় এবং তাহা দ্বারা ইহলোকে থাকিয়া পরলোক সাধন চলিতে থাকে। যীশু বলিয়াছেন, "Ask for the kingdom of Heaven and every thing will be added unto it" অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যের প্রার্থী হও এবং সেই সঙ্গে আর সমস্তই পাইবে। এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের সমীকরণ নচিকেতা যে ভাবে যমের নিকট পাইয়াছিলেন তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

এই মন্ত্রের এইখানেই আলোচনা শেষ হইলে ভাল হইত। কিন্তু "সৃষ্টির আদিভূত অগ্নি" যাহার উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে ও তাহাতে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিষয়ে আরও একটু বলিতে হয়। এখানে বলা হইতেছে, সৃষ্টির আদিতে অগ্নি ছিল তাহা হইতে জল ও পরে ভূমি রচিত হইলে, এই ভূমণ্ডল সম্ভব হইল। সেই রূপ মানবসত্তায় বুদ্ধি স্থান পাইল, বুদ্ধি সরস হইয়া মন হইল, ও মন হইতে শরীররূপ আধার মানব সত্তায় সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। বেদগ্রন্থে সৃষ্টির এইরূপ উপক্রম বর্ণিত আছে।

যখন নচিকেতা যমের নিকট প্রথম বর চাহিলেন, তখন তিনি নিজের মনে অবস্থিত থাকিয়া নিজ পার্থিব আশ্রয়পানে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তাহার পর মনে যখন কোন বাসনা দেখিলেন না, কেবল "আগে চল্,

আগে চল্ ভাই” শুনিতে লাগিলেন তখন বুঝিলেন মনের বাসনা যেমন নিঃশেষ হইল, মন সোজা হইয়া “নমঃ” হইয়া গেল অর্থাৎ বিদায় প্রার্থনা করিল। [ব্যাপারটা চিত্রের ন্যায় বুঝিতে হয়। মন যেন একটি পাত্র যাহা মানবজীবনে (মাতৃগর্ভের ন্যায়) নিম্নমুখী থাকিয়া, সংসারভূমিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে নিজগুণে (ঘটের ন্যায়) উর্দ্ধমুখী হইয়া স্থাপিত হইল। অমনই আত্মার করুণা যাহা অজস্র ধারায় ইহার উপর নিরন্তর আকাশ হইতে বর্ষিত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ইহাতে ভরিয়া গেল, ও মন পরিস্নাত ও পূর্ণ হইয়া প্লাবিত হইতে লাগিল। এইরূপে মনের শূন্যতা গেল। তাই বলা হয়, মন এতদিনে “নমঃ” হইল।) মনরূপ পাত্রের কার্য্য ফুরাইল। মানবসত্তার চির অভ্যাসমত মনের মধ্যে অর্থাৎ তাহার শূন্যতার মধ্যে নব নব জীবন কল্পনা দ্বারা সঞ্চার করিয়া তাহা উপভোগ করা চলিত। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। এখন, যে মাটি ও জল দিয়া শরীর ও মনের ছাঁচে যেমন মানবসত্তার আকৃতি এককাল ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বুদ্ধিতে (অগ্নিতে) অর্পণ করিয়া, তাহার শেষ করা বা আত্মস্থ করা হয়। তাই মানুষ শরীর ও মনের কাঠামকে বুদ্ধিরূপ অগ্নিতে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হয় ও আর কাঠামের পূজা করিয়া নূতন মূরতি স্থাপন করা চলে না। যেমন বৎসরের পর বৎসর চলিতেছিল।

ইহা সন্ন্যাসের সূচনা। আগুনের পরশমণি যখন শরীর ও মনকে স্পর্শ করিল তখন মানুষ সেই অগ্নিবরণ গেরুয়া পরিধান করেন, দণ্ডে ভস্মীভূত দেহমনের শেষ ছাইটুকু নিজের স্মরণার্থে ধারণ করিয়া সৎসঙ্গ (বায়ু) ও চিদানন্দস্বরূপ (আকাশ তুল্য আত্মা) লক্ষ্য করিয়া ইহলোকে ছাড়িয়া থাকিতে চান, তাহা জীবনে হউক্ বা কালান্তরে হউক।

যাঁহারা সন্ন্যাস লইবার পর আর জীবন ধারণ করিতে চান না, সেই প্রকার সাধু অগ্নিতে জীবন পর্য্যন্ত আহুতি প্রদান করেন। জৈনদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দু সাধুদেরও এই পথ অবলম্বন করিতে দেখা যায়। গাজীপুরের স্বনামধন্য পাওয়ারী বাবা যজ্ঞানলে ঝাঁপ দিয়া নিজ জীবনের অবসান করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রচিত পাওয়ারী (অর্থাৎ যিনি পবন আহার করিয়া জীবিত ছিলেন) বাবার জীবন কাহিনীতে ইহা আমাদিগকে জানান। ইহাতে অনন্ত স্বর্গ পাওয়া যায় বলিয়া এইপ্রকার সাধুমহাত্মাগণ এই সুকঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যদিও এই আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের খুঁটিনাটি সবই বর্ত্তমান কালে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে অথবা সাধুদের মধ্যে গোপনীয়ভাবে জানা আছে।

আমাদের শুধু স্মরণে আছে এই সব কাহিনী। আরও মর্ম্মান্তিক সত্য ছিল, যখন হিন্দু রমণী স্বামীর মৃত্যুতে নিজ শরীর ও মনের সার্থকতার অবসান হইয়াছে জানিয়া মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। রাজপুত রমণীগণ স্বামী হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা হইলে “বীরস্বর্গ” প্রাপ্তির জন্য অভয় প্রাণে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন। আমরা এ সকল ক্রান্তিকারক (Revolutionary) প্রথার অনুমোদন করি না, তবে ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই প্রসঙ্গে বুঝিতে চাই। যমরাজ স্বয়ং যে এই প্রকার পরিণাম হইতে মানবজাতির দৃষ্টি ফিরাইতে চান ও শাস্তিপ্রদ (Reform বা আত্মানুশীলনের) পদ্ধতি দ্বারা, অগ্নি (বুদ্ধি) সহায়ে জীবনকে পরিশুদ্ধ করিতে, মানুষকে যত্নশীল হইবার জন্য বলেন, তাহা নচিকেতাকে উপদিষ্ট পরের দুইটি মন্ত্রে, বিশেষ করিয়া সপ্তদশ মন্ত্রে অবধারিত হইবে।

[ক্রমশঃ

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তাহার পরেতে দ্বিতীয় বরেতে প্রার্থনা পুনঃ করে
মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় ? থাকে বা থাকে না পরে
তোমার মতন সুধী কোথা পাই
তাইত তোমারে জিজ্ঞাসি তাই।
তৃতীয় বরেতে কন "ধর্ম' ও অধর্ম' হতে নয়
কার্য্য-কারণ ভিন্ন যেজন হবে না ও যাহা হয়
কেবা সেই জন বলুন আমায়
না জানিয়া মন তৃপ্ত যে নয়
পিতার প্রসন্নতা ও অগ্নি বিদ্যা সে করে দান
জীবাত্মা ও পরমাত্মা সে দুই নামে একই প্রাণ।

মহদ্বচ্চ (৭)

শঙ্কর কন মহৎ অর্থে বুদ্ধি জানিও হয়
উপনিষদেতে মহৎ শব্দে পরমাত্মারে কয়
দুই এক জেনো হয়
জ্ঞান তারে ছাড়া নয়
জ্ঞান হতে জানি মহৎ বুদ্ধি জানাসে সারাৎসার
ইহা ছাড়া যদি হয় কোন জ্ঞান তাহাত অন্ধকার।

চমসবদ্ বিশেষাৎ (৮)

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগমজোঽন্যঃ
(শ্বেতাশ্বেতর ৪.৫)

লোহিত্শুক্লা কৃষ্ণবর্ণা অজারূপ যেই ধরে
এক অজ হয়ে তাহার সাথেতে বিহারে পরস্পরে
পুরুষ তখন প্রকৃতি অধীন
আপনা ভুলিয়া রহে সেই দিন
ভোগ শেষে সেই তেয়াগি তাহাকে মুক্তি পথেতে ধায়
ভোগই বন্ধন মুক্ত যেজন সেই ত তাহাকে পায়।
অজা মানে যার নাহিক জনম প্রকৃতির নাম এই
লাল রজো গুণ সত্ত্ব গুণ সে শুভ্র সর্ব্বদাই
কৃষ্ণরং এতে তমো গুণ রয়
এই ভাবে তাহা বিভাগ যে হয়
ভোগ করে যেই সংসারী সেই ত্যাগে সে মুক্ত হয়
এই শ্লোক জেনো ঠিক এই কথা শুধু বলা জেনো নয়।
চমসবৎ যে চামচের মত বিশেষ চামচ নয়
সেকালে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি কালে ব্যবহার যাহা হয়
সাংখ্য বলেন এই
প্রকৃতি অধীনে নেই
বেদান্ত বলে ব্রহ্ম অধীন প্রকৃতি সে নিশ্চয়
ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি সৃষ্ট ব্রহ্মেতে তার লয়।

[ক্রমশঃ

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চার

কুতব থেকে ফিরে আসার দু'দিন পরেই সমীর তার অফিসারের সঙ্গে টুরে বেরিয়েছিল। প্রায় ষোল দিন পরে আবার ফিরে এলো। ইংরাজী মাসের পাঁচ তারিখে ফিরে এসেই অফিস থেকে মাইনে নিলে, নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা পিসিমাকে মণিঅর্ডার করলে এবং বিকেলে বাড়ী ফিরে সদাশিবকে একখানা একশো টাকার নোট দিয়ে দিলে।

সদাশিব বল্লে, তুমি একশই দিলে, এবার ত অর্দ্ধেক মাস তুমি ছিলেই না—

সমীর বল্লে, তাতে কি? বাইরে টুরে গিয়ে ত আমার নিজের পয়সায় খেতে হয় নি, বরং সব খরচ-খরচা বাদে আরও কিছু পকেটে এসেই গেছে।

পর দিন দুপুরে আহারাদির পর গৌরী বলেছিল, তুমি আমাদের পর ভাবো ঠাকুরপো, নইলে থাকো বা না থাকো, হিসেব করে যেন বাড়ীওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছ।

সমীর বল্লে, ঠিক উল্টো। তাহলে পিসিমাকে যে টাকা দিচ্ছি, সেটা কি তিনি যে আমায় মানুষ করেছিলেন বলে তার মাসোহারা বল্‌তে হবে। কেন, সদা তোমাকে টাকা দেয় না, বলেই সমীর থতমত খেয়ে থেমে গেল।

গৌরী এ কথার জবাব না দিয়ে বল্লে, এখানে কি আর কোনো ভালো বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী নেই ঠাকুরপো? ঐ যে তোমাদের বেঙ্গলী কর্ণার আছে, ওর সমস্ত বই আমার পড়া হয়ে গেছে। পড়বার মতো আর কোন বই-ই পাচ্ছি না। কথাটা বাস্তবিকই সত্য। গৌরী রোজ দুপুরে পড়পড়তা পঞ্চাশ ষাট পাতা বাংলা নাটক নভেল পড়ে। নতুন বইয়ের অভাবে একখানা বই সে দুবার তিনবার করেই পড়ে থাকে।

সমীর বল্লে, সব পড়া হয়ে গেছে? তাহলে এক কাজ কর, পাঁজী, ব্যাকরণ কৌমুদী, টেলিফোন গাইড এই সব পড়তে সুরু করো।

বউদি বল্লে, বলে যাও, বলে যাও, টাইম টেব্‌ল্, হ্যাণ্ড বিল, মুদীর দোকানের খাতা, পড়বার ত কত জিনিষ রয়েছে, কি বল?

ঐ অত করে পড়ে পড়েই তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে, গম্ভীর হয়ে সমীর উত্তর দিলে।

হ্যাঁ গো ডাক্তার সাহেব, গৌরী জবাব দিলে, এতদিনে তুমিই আমার রোগ ঠিক ধরেছ বটে!

তবে রোগের কারণ কি? সমীর প্রশ্ন করলে।

প্রশ্নটায় বউদি যেন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো, তারপর ভাবুকের মত গম্ভীর ভাবে বল্লে, মোটর গাড়ী দেখেছ ঠাকুরপো, মোটর গাড়ী? কোনো গাড়ী সুন্দর ভাবে চলে, আর কোনো গাড়ী চলেই না, যাত্রীকে কষ্ট দেয়, কেন বল দেখি?

কেন? গম্ভীর ভাবে সমীর প্রশ্ন করলে। কথার ভঙ্গীতেই সে বুঝে নিয়েছে বউদির কোনো একটা গভীর গোছের রূপক ব্যাখ্যা সুরু হবে। এমনধারা মাঝে মাঝে দু'একদিন হয়েছে। বউদি বল্লে, তবে শোন, গাড়ী চলার মধ্যে দুটো জিনিষ আছে। প্রথম হোল গাড়ী নামক যন্ত্রটা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে গাড়ীর চালক নামক মানুষটা। গাড়ীর যা খাদ্য সেটা তাকে পুরোপুরি দিতে হবে, তেল,

মবিল, জল এই সমস্ত; দ্বিতীয়ত', গাড়ীর চালকের খাদ্যও পুরোপুরী দিতে হবে, তার মাইনে, তার বিশ্রাম, তার মেজাজ ঠিক রাখবার সমস্ত উপকরণ। দেখ ঠাকুরপো, আমার গাড়ীটা তার খাদ্য ঠিক পায়। কিন্তু আমার মন নামক যে চালকটি আছে সে উপোষ করে দিন কাটায়। তাই আমার গাড়ীটা কেবলই বেগড়ায়। আর বেগড়ালেই ডাক্তার আসে। তখনও শুধু আমার দেহরূপ গাড়ীখানারই চিকিৎসা চলে, তাকে নানারূপ ভিটামিনের বড়ি খাওয়ায়, প্রোটিনের ইনজেকশান করে অর্থাৎ গাড়ীটাকে খুব তোয়াজ করে, কিন্তু এর ড্রাইভার যে-উপোষী সেই-উপোষীই থাকে। তাই গাড়ীখানা কোন দিনই ঠিকমত চলে না। এর যাত্রীরা কেবলই কষ্ট পায়, অর্থাৎ সংসারের লোক আমার অসুখের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হুঁ। সমীর গম্ভীর ভাবে গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখল। গৌরী একখানা বই হাতে করে কেবলই তার পাতা ওল্টাচ্ছে।

চেয়ার ছেড়ে সমীর উঠে দাঁড়ালো। টেবিলের ধারে গিয়ে একখানা চিরুনী নিয়ে আরশীর সামনে এসে চেপে চেপে মাথা আঁচড়াতে লাগলো। একটু পরে বল্লে, বায়োস্কোপ দেখবে বৌদি? একটা ভালো বই এসেছে।

ওসব পাট এ বাড়ীতে নেই, বউদি উত্তর দিলে।

বউদির চেয়ারের পেছনে এসে সমীর বল্লে, আচ্ছা বউদি দাদা কি তোমাকে মোটেই ভালোবাসে না। তোমার মনে যেন কি একটা দুঃখ আমি সর্বদাই দেখতে পাই!

বউদি নিরুত্তরেই রইলো, একটু পরে বল্লে, বাসেন, কিন্তু—

গৌরীকে থামতে দেখে সমীর বল্লে কিন্তু তাতে তোমার ক্ষিদে মেটে না, এই ত? একটু থেমে বল্লে—কি করবে বল ভাই, সারা দুনিয়ায় মানুষ যে কত রকম ক্ষুধায় সর্বদাই হাহাকার করছে, তা আর কি বলবো? কেউ পেট ভরে ডাল ভাত পায় না। আর কেউ বা প্রাণ ভরে সাধ মেটাতে পায় না। থেমে থেমে সমীর বল্লে, কি করবে আমারও মাঝে মাঝে বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠে, তাই সারাটা জীবন ভরে কেবলই অকাজ করে বেড়ালুম—শুধু গুলতান আর হুল্লোড়, বালি আর পাথর। আগুন আর গ্যাস,—সিগারেটের মিষ্টি ধোঁয়াটা মুখের ভেতর নিই বটে, কিন্তু থাকে না, নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, কোলের ওপোর পড়ে শুধু ছাই, ছাই আর ছাই।

পেছন ফিরে বউদি বল্লে, তুমি বিয়ে কর ঠাকুরপো। উৎসাহ করে বল্লে, দেখবো, ভালো মেয়ে দেখবো? আমার মাসিমার ছোট মেয়ে—

বয়স কত? গম্ভীর ভাবে সমীর প্রশ্ন করলে।

কুড়ি একুশ হবে।

একুশ দুগুনে কত? সমীর প্রশ্ন করলে।

বিয়াল্লিশ, হাসতে হাসতে গৌরী উত্তর দিলে।

তার ওপোর আরও তিন, যোগ কর বউদি, সমীর উত্তর দিলে, তবে আমার বয়স মিলবে। এতেও বল তাকে বিয়ে করতে?

তোমার ঐ এক কথা, গৌরী অভিযোগের সুরে বল্লে, তোমার চেহারা দেখলে আমার চেয়েও ছোট বলে মনে হয়।

হুঁ। সমীর গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়ে ক্যাম্বিশের চেয়ারটায় এসে গা এলিয়ে দিলে।

আচার খাবে ঠাকুরপো, ভালো আমের আচার? আমার মাসিমা দেশ থেকে পার্সেল করে পাঠিয়েছেন, আজই পেয়েছি। এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে একটা কাঁচের প্লেটে করে খানিকটা আচার ও একটা চামচ নিয়ে গৌরী এসে সমীরের সামনে ধরলে; সে তখন চোখ বুঁজে চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়েছিল।

ঠাকুরপো—

সমীর চোখ চেয়ে দেখ্‌লে, কি?

আচার। ওঠো, খেয়ে দেখ কি সুন্দর জিনিষ।

সমীর ওর হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে ইজি চেয়ারের হাতলের ওপোর রেখে হঠাৎ গৌরীর সুগোল সুন্দর হাতটি মণিবন্ধের কাছে ধরে তার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে নাম ধরে ডাকলে, গৌরী। ওর গলার স্বরটা অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপছিল।

শান্তভাবে গৌরী বল্লে, ছেড়ে দাও, কেউ দে

ফেলবে, কিন্তু হাতটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা সে করলে না।

সেই অবস্থায় সমীর ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো এক মিনিট, তারপর হঠাৎ তাকে টেনে নিজের ওপোর নিতেই কাঁচের প্লেটটা চেয়ারের হাতল থেকে ঝনঝন্ করে মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে গেল। শব্দ শুনে সমীর ওর হাতটা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে। গৌরী কিন্তু তেমন ব্যস্ত হয়নি, ধীরে সুস্থ উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর আঁচলটা ফেল্‌তে ফেল্‌তে ভাঙ্গা প্লেটের দিকে দেখ্‌তে লাগলো। সমীর বল্লে, ভেঙ্গে গেছে ?

ওসব জিনিষ বড়ই ঠুন্‌কো গো, একবার পড়লেই চৌচির হয়ে ভেঙ্গে যায়। গৌরী আস্তে আস্তে চিন্তাশীল-ভাবে উত্তর দিলে।

গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে যেন তার মন বোঝার জন্যই সমীর বল্লে, খেলা বউদি, খেলা, মনে কর না কেন খেলা। তাস খেল ত ? কেন খেল বল দেখি ? আনন্দ পাওয়ার জন্য। খেলা শেষ হয়ে গেলে আবার কাজের মানুষ। মনে কর এও একটা খেলা।

হতাশভাবে গৌরী বল্লে, তোমাদের কাছে তাস খেলা হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে রেস খেলা, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভিটে মাটী চাটী হওয়ার খেলা, আর ত কিছু নয়।

সমীর খপ করে তার হাতখানা ধরে বল্লে, রাগ কল্লে ভাই। কি করবো বল ? ক্ষিদের সময় নিঃস্ব লোক কেউ বা দোকানের ধারে মুখ বুঁজে মরে পড়ে থাকে, আর কেউ বা কাঁচের শো-কেশ ভাঙতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয় দলের ভূত আমার ঘাড়ে চড়তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চাপতে দিই নি। তোমার প্লেট ভাঙ্গার শব্দে সে পালিয়ে গেছে।

দিদিমণি, দরজার আড়াল থেকে রেণু ডাক দিলে, স্বরটা যেন প্রভুত্বব্যঞ্জক।

কি, গৌরী উত্তর দিলে।

শুনুন, রেণু ডাকলে।

ভেতরে আয় না, গৌরী রেণুকে ভেতরে আসতে বল্লে।

না, আপনি এদিকে আসুন, রেণু যেন এ বাড়ীর মনিব।

গৌরী আর সাহস পেলে না। পর্দ্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল। গৌরীর বিশ্বাস ছিল যে, রেণু তার ঝি, গৌরী ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় তার নেই, তার ওপরে সে তাকে যথেষ্ট যত্ন করে, একরকম প্রায় বন্ধুর মতই ব্যবহার করে। সে যদি দেখেও ফেলে, তাহলেও বিশেষ আপত্তি করবে না, কিন্তু দেখা গেল, রেণু এ সব কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না। গৌরীর মুখের ওপোর সোজা বলে দিলে, এ সব কি হচ্ছে দিদিমণি। আমি সমস্ত দেখেছি, সব শুনেছি।

গম্ভীর রাগতস্বরে গৌরী বল্লে, কি দেখেছিস।

যা দেখেছি দাদাবাবুকে বলবো, রেণু উত্তর দিলে।

রেণুর ভাব দেখে গৌরী মনে মনে ভীত হোল। এটা অবশ্য তার খুবই জানা ছিল যে সদাশিব গৌরীর বিশেষ কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু হঠাৎ মনে হোল যে, সমীরকে যদি এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হয়। 'পেয়ে মাণিক হারালেম', যদি এমন অবস্থা হয় !

একটু থেমে রেণুর পিঠে হাত দিয়ে গৌরী বল্লে, লক্ষীটি ছিঃ, ওসব কি বলবার কথা রে—

রেণু সবেগে তার পিঠ থেকে হাতের ছোঁয়া সরিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বয়সওয়ালা ওস্তাদ ঝি হলে হয়ত একগাল হেসে একখানা ভালো কাপড় কি একটা গয়নাই চেয়ে বসতো, কিন্তু রেণু ত তা নয়, সে যে বোকা !

গৌরী সক্রোধে বল্লে, দেখ রেণু, তুই যদি আমার কোনো বদ্‌নাম রটাতে চেষ্টা করিস, তাহলে—

রেণু বল্লে, ঘোড়ার ডিম, আমি মরবো, আপনি আমার কি করবেন।

দরজার পর্দ্দা সরিয়ে এগিয়ে এলো সমীর, হাসতে হাসতে বল্লে, রেণু তোকে আমি একটা ভালো সাড়ী আর একটা আংটী দেব, রাগ করিস্ নি।

রেণু হঠাৎ একটু বেশী ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে চলে গেল।

পরদার পাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে সমীর ইঙ্গিতে বউদিকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হবে ?

বউদি রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লে, চুলোয় যাক্ গে। তারপর কোন দ্বিধা না করে একরকম সমীরকে ঠেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে সমীরের পরিত্যক্ত ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো।

পেছন পেছন এল সমীর। এসেই নেওয়ারের খাট-

খাবার ওপোর বসে একটু চিন্তিতমুখে বলে, গৌরী, সদা আসবার আগেই ওকে ঠাণ্ডা কর, নাহলে বিপদ হবে।

স্প্রিং লাগানো পুতুলের মত গৌরী তড়াক্ করে চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে বললে, তুমি ঠাণ্ডা কর গিয়ে, আমি ও সব গ্রাহ্য করি না।

বউদির কথায় সমীরের মতো লোকও ঘাবড়ে গেল, কোন জবাব দিলে না। গৌরী আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে। টেবিলে বসানো টাইমপিস ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে আপন অভ্যাসমতই চলছিল। তার শব্দ ওদের দুজনেরই কানে আস্তে লাগ্‌লো।

খানিক পরে বউদি বললে, একটা গল্প শুন্‌বে ভাই! গলার স্বর এমন সহজ, এমন শান্ত যে, সমীর বেশ একটু বিস্মিতই হোল, মুখে বললে, বল।

বউদি বললে, দুজন পথিক সাহারা মরুভূমির ওপোর দিয়ে হাঁটছিল। একজনের হাতে ছিল একটা জলের কুঁজো কিন্তু একেবারে খালি, এক ফোঁটাও জল ছিল না, আর একজনের কুঁজোটা কোথায় যেন ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে গিয়েছিল, সে বেচারা হাঁটছিল নেহাৎই শুধু হাতে। হঠাৎ সেই গরম বালির মধ্যে জেগে উঠ্‌লো জমজমের ঝরণা। যে লোকটা খালি কুঁজো নিয়ে হাঁট্‌ছিল, সে তাড়াতাড়ি তার সেই শূন্য ভাণ্ড বালির ওপোর ফেলে দিয়ে সমস্ত ঝরণাটা একাই গ্রাস করে বস্‌লো, স্নান এবং পান চল্‌তে লাগ্‌লো নিতান্ত স্বার্থপরের মতো নিছক একাকী, এই দেখে তার অপর সঙ্গী কি করলে বল দেখি?

কি করলে? সমীর প্রশ্ন করলে।

কি করতে পারে বোঝো না? সে-সঙ্গী তার এত-দিনের মরুভূমির সঙ্গীকে, তার একমাত্র সহচারীকে নিদারুণ শত্রু বলে মনে করে তাকে খুন করার জন্য ক্ষেপে উঠলো—

তারপর, সমীর প্রশ্ন করলে।

আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো, বউদি হতাশকণ্ঠে উত্তর দিল।

এ ত রীতিমত হেঁয়ালি হয়ে গেল, সমীর উত্তর দিলে।

এ হেঁয়ালী বুঝবার ক্ষমতা সমীর মুখুজ্জের আছে বলেই গৌরী দেবী বিশ্বাস করে। একটু থেমে বললে, রেণুকে ঠাণ্ডা করতে পারে একমাত্র জমজমের ঝরণা, সেই ঝরণার জল যে পান করে, সে নয়।

সমীর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তারপর চিন্তিতমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে একটা যে-কোনো হোটেলের সন্ধান করে আসি, বলে ব্র্যাকেট থেকে প্যান্ট-খানা টেনে নিতে গেল।

গৌরী শুয়ে শুয়েই সমীরের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে তাস খেলা ফুরিয়ে গেল? কিন্তু আমি যে রেস খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলুম।

প্যান্টে হাত না দিয়ে সমীর ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, তাহলে আমি কি করতে পারি বল?

গৌরী উঁচু হয়ে বসে বল্লে, ছেলেবেলায় আমরা যখন তাস খেলতুম, তখন বাচ্চারা আমাদের খেলায় বিরক্ত করতে এলে আমরা দু'একখানা বাজে তাস তাদের হাতে দিয়ে ভুলিয়ে আবার নিজেরা খেলাতুম, আর তারা joker তাসখানা হাতে নিয়েই খুসি থাক্‌তো, joke বলে বুঝতেই পারতো না।

সমীর ফিরে এসে চেয়ারে বসলো, বললে, অসম্ভব, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে পচা গলি দিয়ে হাঁটতে এসেছো, গায়ে পায়ে একটু কাদা গোবর লাগবে না? কি, ভেবেছ কি তুমি? কঠিন কণ্ঠে গৌরী উত্তর দিলে।

ভেঙ্গে পড়ে সমীর বললে, বউদি, তুমি আমায় মেরে ফেল।

বউদি বললে, তুমি ত আমায় মেরেই ফেলেছ ভাই, এখন ঘাটে গিয়ে পুড়িয়ে এস না কেন? একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে ভিখারীর মতো নিঃস্ব হয়ে সমীরের কাছে এসে বললে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, কেবল বল যে তুমি এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না।

সমীর ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

বউদি ভিখারীর ন্যায় করুণ মিনতি ভরা কণ্ঠে বললে, বল, উত্তর দাও।

সমীর বললে, ছাড়তে কি আমি চাই, কিন্তু সব দিক

বজায় রাখি কেমন করে? বিশেষ করে দাদার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করা?

বড় বড় চোখ দিয়ে সমীরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে গৌরী বল্লে, ও আমার সাধুবাবা রে! কুতুবের অন্ধকারে বন্ধুর বউয়ের হাত ধরবার সময় এত সব ধৰ্ম্মজ্ঞান ছিল কোথায়? ভীরু কাপুরুষ কোথাকার!

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চেয়ারে এসে বসে বল্‌লে, যা ইচ্ছে তাই কর, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধই রইলো না। হোটেলে কি অন্য কোথাও বাসার সন্ধান করে এসে তোমার জিনিষপত্র নিয়ে আজই চলে যাও। বাস্‌, সম্বন্ধ চুকে যাবে।

সমীর শুধু বউদির মুখের দিকে তাকিয়েই রইল, কিন্তু ওঠবার কোন তাগিদই দেখা গেল না। গৌরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার পরদা সরিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

সমীর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাব্‌তে লাগলো। কি যে ভাবছিল তা সে নিজেও ঠিক জানে না। এতবার এত রকম বিপদ সে নিজে ইচ্ছে করেই বরণ করেছে, চাটগায়ের পাহাড়তলী থেকে মেদিনীপুরের বিয়াল্লিশের আন্দোলন, কিন্তু কখনও তার এরকম বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি, এভাবে সে কখনও শূন্যমন নিয়ে জড় হয়ে যায় নি, কিন্তু আজকের এই অসহায় অবস্থার হাত থেকে সে কোন মতেই অব্যাহতি পাচ্ছিল না। আরও এক কথা, আকাশ-পাতাল সর্বত্র সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সে দেখ্‌লে যে, তার জীবনে এক পিসীমা ছাড়া অন্য কোনো নারী এসে কখনও বাসা বাঁধতে পায় নি। জেলে মাঝে মাঝে একমাত্র পিসীমার জন্যই তার প্রাণটা কাঁদতো। শুধু তাই নয়, এই সব প্রেমঘটিত ব্যাপার অন্য কারুর কাছে শুন্‌লে সে উপহাসই করতো, হয়ত বা কখনও ধমক দিয়ে উড়িয়ে দিত, কিন্তু এতকাল পরে বাঁধা মাইনের চাকরী পেয়ে যুদ্ধজয়ের পরে গায়ে হাওয়া লাগাবার মনোভাব আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ আবার কি এক নতুন বিপদে সে পড়ে গেল? যে প্রেমকে সে এতদিন সগর্বে উপেক্ষা করে এসেছে, আজ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সেই ভূতকে সে না পারছে হেসে উড়িয়ে দিতে, না পারছে ধমকে ঠাণ্ডা করতে! সমীর কি বড় হয়ে গেছে নাকি?

বৌদি ঘরে এসে ঢুক্‌লো। বোঝা গেল, মুখে চোখে জল দিয়ে সে প্রকৃতিস্থ হয়েই এসেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে অনাবশ্যক এটা ওটা গুছিয়ে নিয়ে সমীরের কাছে এসে আস্তে বল্লে, রেণু রান্নাঘরে শুয়ে আছে; আমি তাকে কিছু বলি নি। তুমি যাও তাকে একটু সান্ত্বনা দাও, সব গোলমাল মিটে যাবে।

বউদির মুখের ওপোর নির্ব্বোধের চাউনি চেয়ে সমীর বল্লে ও, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জামার পকেট থেকে মণি-ব্যাগটা হাতে নিয়ে যেমনই সে পরদা সরিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌তে যাবে, বউদি চট্‌ করে এগিয়ে এসে ব্যাগশুদ্ধ সমীরের হাতটা চেপে ধরে বল্লে, এটা রেখে যাও, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সমীর তার বউদির দিকে দেখ্‌তেই বউদি বল্লে, মরুভূমিতে হেঁটে হেঁটে বেচারীর বুক পর্যান্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ও চায় ঝরণার জল, সোনা-রুপোর লোভ দেখিয়ে ওকে আর বেশী ক্ষেপিয়ো না। ব্যাগটা সমীরের হাত থেকে নিজে হস্তগত করে সমীরের পিঠে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, এ বার যাও।

চিন্তা ও শঙ্কায় জড়িত হয়ে সমীর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। গৌরী ওর দিকে একটুখানি দেখে সমীরের মণিব্যাগটা দুহাতে চেপে ধরে সেই ব্যাগটা নিজের বুকের ওপোর আকুলভাবে ঘষতে লাগলো, তারপর টলতে টলতে নেওয়ারের খাটিয়ার ওপোর এসে বসতে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। পেছনে কোনো দর্শক থাকলে দেখতে পেত, ওর পিঠটা খুব তাড়াতাড়ি উঠছে আর পড়ছে।

পাঁচ

রান্নাঘরের ধোয়া ভিজে মেঝের ওপোর রেণু খালি মাথায় শুয়ে আছে; উদাস শূন্য তার একচক্ষু দৃষ্টি। নিঃস্ব অনাথা, বিধবা সে, দাদাবাবু তাকে সেই অসহায় দুর্গতি থেকে সেই অনাদর, অনাহার, সকলের ঘৃণাভাজন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে যত্ন করে এনেছেন এই সুন্দর দিল্লীতে; একেবারেই নিজের ভগ্নিস্থানে বসিয়ে দুবেলা আহার দিচ্ছেন, মুখের মিষ্টি কথা দিচ্ছেন, তার দিদিমণিও তাকে নিজের লোক ভেবে সযত্নে সমস্ত চাবির গোছা তার কাছে ফেলে দিয়েছেন, এ বাড়ীর সর্বেসর্বা হয়েই সে রয়েছে। নিঃস্ব পর হলেও দাদাবাবু তার সঙ্গে কোনদিন

কোন বিসদৃশ ব্যবহার করেন নি। সদাশিব ত সদাশিব, একেবারে মাটির মানুষ! সেই দাদাবাবুর অন্নে পালিত হয়ে সে কেমন করে দাদাবাবুর ওপোর এই নিরাতিশয় বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করবে! দাদাবাবুর ঐ যে বন্ধু এই কতদিন গেল' এ বাড়ীতে এসে রয়েছে, ঐ বন্ধুটা যেন কি? রেণু জানতো না যে সমীর পয়সা দিয়ে এখানে থাকে খায়, তাই সে কেবলই মনে করতে লাগলো, ছি ছি, ভদ্দর লোক, বাবু লোক, শিক্ষিত লোক, সে কেমন করে যার পয়সায় থেকে খেয়ে চাকরী করে এত টাকা উপায় করছে, তারই বাড়ীতে এমন ভয়ানক অনাচার করতে পারে! ঐ লোকটা আবার রেণুকে বলেছে, কাপড় দেবে, আংটি দেবে! তোর ঐ কাপড় আর আংটির মাথায় মারি ঝাঁটা। তুই দিদিমণিকে নষ্ট করে আবার আমায় নষ্ট করতে চাস্ পোড়ারমুখো, হতচ্ছাড়া, হাবাতে মিন্সে কোথাকার! মনে মনে খুব খানিকটে গালাগালি দিয়ে রেণুর আবার উল্টো কথা মনে হোল, সে ভাবলে, যাকগে, ও সব বড় লোকের বড় কথা! আমার সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ কি? ঐ যে দিদিমণি, ওই বা কী মানুষ। তুই একটা বড় ঘরের মেয়ে, অমন ভালো লোকের বউ, তোর এমন মতিচ্ছন্ন ঘটলো কেন? দিদিমণি আগে বরাবর গোমড়া মুখ করে থাকতো, মাসের মধ্যে দশদিন তার রোগে রোগেই কাটতো, কিন্তু ঐ সমীর আসার পর থেকে সে যেন হাওয়ার ওপোর পাখা মেলে বেড়াচ্ছে। প্রায় দু'মাস হয়ে গেল, একদিনের জন্যেও তার শরীর খারাপ হয় নি। খারাপ লোকের এমনই হয়! আর এখন এই সমীর আসার পর থেকে রান্না বাড়ার কত ঘটাঘটিই যেন বেড়েছে। ঘর দোর সাজানো গোছানোর যেন মরসুম পড়ে গেছে! যে লোক কোনদিন স্বামীর একটা রুমাল কেচে দিত না, সেই হতচ্ছাড়ী এখন প্রায়ই সমীরের তোয়ালে, গামছা, লুঙ্গী, গেঞ্জী আনলা থেকে টেনে টেনে নিয়ে এসে সাবান লাগিয়ে নীল দিয়ে ভালো করে কেচে রোদ্দুরে টান টান করে নিজের হাতে শুকুতে দেয়। তারপর কত যত্ন করে পাট পিট করে আবার ঠিক জায়গায় তুলে রাখে। আজকাল আবার রোজ একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়। ছি ছি, লজ্জাও করে না। দিদিমণির সঙ্গে কথা কইতেই ঘেন্না হয়! বলি এমন মানুষও হয়! আর ঐ সমীরেরই বা দোষ কি? দিদিমণিই ত ওকে নষ্ট করেছে। কই সমীর ত তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। তারও ত কম বয়স, কিন্তু সমীর ত তাকে কোনদিনও কোন অন্যায় কথা বলে নি, বরং কত যত্ন করে কুতুবে বেড়াতে নিয়ে গেল, কত আগ্রহ করে সেখানে ফল আর ঘোল খাওয়ালে! সত্যি ছোট দাদাবাবু খুব ভালো লোক, কিন্তু রাক্ষসী মায়াবীর পাল্লায় পড়ে তিনিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। আহা ছোট দাদাবাবুর বিয়েটি পর্য্যন্ত হয় নি, একা এই বিদেশে—

রেণু—দরজার কাছে সমীর এসে দাঁড়িয়েছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে রেণু মাথা হেঁট করে বসে রইলো।

সমীর ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে এসে অনুনয়ের সুরে বললে, রেণু, এমন একটা অন্যায় হয়ে গেছে, যা তুমি ইচ্ছে করলে চাপা দিয়ে সব শান্তি করে দিতে পারো, আর তুমি যদি রাগারাগি কর, তাহলে আমাদের সকলেরই সমূহ বিপদ—

রেণু তার ডান হাত দিয়ে বাম পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা খুঁটতে লাগলো।

সমীর কাছে এসে উবু হয়ে বসলো, বললো রেণু, তুমি যেন দয়া করে তোমার দাদাবাবুকে কিছু বলতে যেও না। একদিন একটা ভুল হয়ে গেছে।

মাগো-মা-লোকগুলো কি নির্লজ্জই হতে পারে, রেণু মনে মনে ভাবতে লাগলো। আমি কি আর সত্যিই এ সব কথা দাদাবাবুকে মুখ ফুটে বলতে পারতুম!

সাহস পেয়ে সমীর আর একটু এগিয়ে এসে রেণুর মাথায় হাত দিতেই—রেণু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার পায়ে পড়ি ছোট দাদাবাবু, দিদিমণিকে যা করছেন করুন, আমাকে আর নষ্ট করবেন না। হঠাৎ যেন তার চোখ ফেটে জল এলো। উদ্গত অশ্রু দমন করার বৃথা চেষ্টা করে সে বললে, আপনারা সব পারেন, আপনারা—বলতে বলতে সে ঘরের অপর প্রান্তে দেওয়ালের দিকে সরে গেল।

রেণুর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সমীর প্রথম হোল লজ্জিত, তারপর মরিয়া হয়ে উঠলো, তার মনে হোল, কী? এত বড় স্পর্দ্ধা! তোর মনিব আমার স্পর্শটুকুর জন্য

সাধারণ্যিত, আর তুই—। কিন্তু মুখে এ সব না বলে বেশ একটু গম্ভীর ভাবে বল্লে, তাহলে তুমি শুনবে না, সদাকে তাহলে সব কথাই তুমি বলতে চাও ?

রেণু এর কোন সহজ উত্তর দিতে পারলে না। একটু চুপ করে থেকে এক বুক দম টেনে নিয়ে বললে, সে যা'হয় হবে, এখন আপনি এ ঘর থেকে যান, আমাকে জড়াবেন না, আমাকে রেহাই দিন।

রাগতঃ ভাবে সমীর বললে, তোমাকে জড়াতে কেউই চায় না, কিন্তু তুমি আমাদের রেহাই দেবে, আমাদের কথার মধ্যে তুমি খবদ্দার থাকবে না।

আপনার পায়ে পড়ি ছোট দাদাবাবু, আমাকে আর কিছু বলবেন না, আমি—

দরজার কাছে গৌরী এসে দাঁড়ালো। তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বললে, কি মানভঞ্জন হোল ?

গৌরীর কথায় ওরা দুজনেই চমকে উঠলো। কাঁদো-কাঁদো হয়ে রেণু বললে, দিদিমণি, আমাকে রেহাই দিন।

গৌরী বললে, আর থাক, ঢের হয়েছে। তারপর নাটকীয় ভঙ্গীতে জোড় হাত করে বললে, উপবাস ভঙ্গ করে চলে এসো দেবী, নিজেও খুসি হও, আমাদেরও রেহাই দাও। তারপর একেবারে ভেঙ্গে পড়ে বললে' ওঃ দুধকলা দিয়ে কি সাপই পুষেছিলুম! তুই কি এমনি করে আমার সংসারটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাস ? ওদের সকলকেই নিরুত্তর দেখে গৌরী বললে, দুনিয়ায় যার কেউ নেই, তাকে যত্ন করে কি দুনিয়ায় আমারও কেউ থাকবে না নাকি ?

রুক্ষ তিক্তকণ্ঠে রেণু বল্লে, কেন কেউ থাকবে না! আপনার একের ওপোর দু'জন হবে, তিনজন হবে, কত হবে। এই পর্য্যন্ত বলেই সে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

কি—যত বড় মুখ না তত বড় কথা, তুই বেরিয়ে যা, এখুনি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। পাজী বদমায়েস কানি মাগী কোথাকার—

ব্যস্ত হয়ে চাপা গলায় সমীর বললে, আঃ বউদি, কি হচ্ছে ? চেঁচামেচি করছো কেন ? নীরোদ বাবুদের বাড়ী থেকে ওরা যদি কেউ শুনতে পায়, ছি ছি—

পাক্ শুনতে। সাগরে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় ? আমি দেখতে চাই ঠাকুরপো তুমি ঐ কানি মাগীটার তেজ ভেঙ্গেছ, বলতে বলতে গৌরী ঘর থেকে বাইরে এসে রান্নাঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে শেকল লাগিয়ে দিলে।

রেণু ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললে। সমীর দরজার কাছে এসে চাপা গলায় দু তিনবার বউদি বউদি করে ডাক দিলে, কিন্তু বাহির থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। সমীর ক্রুদ্ধ বিরক্ত হয়ে রেণুর দিকে চেয়ে বললে, থাম তুই, কাঁদছিস কেন, আমি কি তোর কোন অনিষ্ট করছি না কি ?

রেণু দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

প্রায় মিনিট পাঁচেক এইভাবে চুপচাপ কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে খুব মিষ্টি করে সমীর বল্লে, রেণু, তোমার বউদির ওপোর রাগ কোরো না। আজ যে ব্যাপারটা হয়েছে তার একমাত্র সাক্ষী হচ্ছ তুমি। তুমি যদি একথা প্রকাশ করে দাও, তা'হলে বুঝে দেখ, ওর কতবড় বিপদ হয়ে যাবে। সদা ওকে তাড়িয়ে দেবে, আর ও একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। কাজেই ও পাগোল হয়ে গেছে। আর অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখ, তোমারই বা কি হবে ? দুনিয়ায় তোমারই কেউ নেই। সদা যদি তোমার দিদি-মণিকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে সে কিছু তোমাকে নিয়ে একলা এই বাসা বাড়ীতে থাকবে না, থাকতে পারে না; আর সে তেমন লোকও নয়—

সমীর যখন শান্তভাবে কথা বলতে সুরু করেছিল, তখন থেকেই রেণু ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল, এখন এই কথায় রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে কিন্তু মুখে কিছুই বল্লে না।

সমীর বলতেই লাগলো। বল্লে, দেখ, যারা তোমা[য়] বিপদের দিনে এনে তোমায় যত্ন করে রেখেছে, তাদে[র] সকলেরই অনিষ্ট করবে তুমি, আর সত্যিকার দোষী যদি কেউ থাকে তাহলে সে হচ্ছি আমি। কিন্তু আমার আ[র] কি অনিষ্ট তুমি করতে পার ? আমি না হয় এ-বাড়ী ছেড়ে কোনো একটা মেসে বা হোটেলে চলে যাবে ফুরিয়ে যাবে। তাহলে তুমি মিছামিছি, কার জন্যে এ হাঙ্গামা করবে ?

রেণু একটু নড়ে চড়ে দাঁড়ালো যেন কিছু বল্তে চায়।

কি, কি বল্‌ছো, মুখ ফুটে বল! সমীরের প্রশ্নে কি যেন এক ব্যাকুল মাধুর্য্য।

অস্ফুটকণ্ঠে রেণু বল্‌লে, আচ্ছা।

সমীর বল্‌লে, কি আচ্ছা? কি আচ্ছা রেণু?

রেণু বল্‌লে আমি কাউকেই কিছু বল্‌বো না, রেণুর গলাটা কেমন যেন ধরে গেছে।

সমীর বল্‌লে, বাঃ বেশ, এই ত বুদ্ধিমানের মত কথা, কিন্তু শুধু কথায় হবে না রেণু, আমার গা ছুঁয়ে বলবে তুমি একথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না। আমি তোমায় কিছু বলবো না, আমি এবং তোমার দিদিমণি তোমায় খুব বেশী করে যত্ন করবো, তোমার যা দরকার হবে—

সমীরের মুখের দিকে মুখ তুলেই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে রেণু বল্‌লে, বল্‌ছি ত, কাউকেই কিছু বলবো না।

সাহস পেয়ে সমীর একটু এগিয়ে এল। ছোট রান্না-ঘর, দু'পা এগিয়ে যেতেই সে রেণুর নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেল। বল্‌লে, আমার গায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে, জীবনে কোনদিন কখনও কাউকে আমাদের বিষয় বল্‌বে না।

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েই রেণু বল্‌লে, বল্লুম ত।

—ও হবে না, গায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, সমীরের কেমন যেন জেদ চেপে গেছে। চিরকাল যে পোর্টির সদস্য সে ছিল, সেই পার্টিতেও প্রায়শঃই এই রকম প্রতিজ্ঞা করা এবং করানো হোত।

রেণু ওর মুখের দিকে একবার শঙ্কিতভাবে চেয়ে দেখলে। ওর দৃঢ়তাব্যঞ্জক সরল আদেশ তার মনে একদিক দিয়ে আনলে পরাজয়, অপর দিক দিয়ে দিলে একটা নির্ভরতা। চট্ করে কিছু না ভেবেই সে হেঁট হয়ে সমীরের পায়ে হাত দেওয়ার উদ্যোগ করতেই সমীর সাঁ করে তার হাতের কব্জিটা ধরে বল্লে, ছিঃ, পায়ে হাত দিও না, হাত নিয়েই বল—

রেণুর আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্‌লো, সমীরের বলিষ্ঠ মুষ্টি থেকে নিজের বেপমান হাতখানা টেনে বার করে নিতে বোধ হয় যেন একটু চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু হাতটা ওর মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেল। কি যেন একটা বলার জন্য ওর ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠ্‌লো, তারপর—

সমীর কম্পিতকণ্ঠে বল্লে, বল।

রেণু তার হাত-ধরা অবস্থাতেই প্রতিজ্ঞাটা আর একবার উচ্চারণ করলে, কিন্তু কি যে বল্লে, সেই ভাষা ওরা দুজনের কেউই বুঝতে পারলে না।

রেণুর হাত ছেড়ে দিয়ে সমীর ওর পিঠের ওপোর একটা ফুলো চড় বসিয়ে বল্লে, বাঃ, বেশ মেয়ে। আমি তোমায় খুব ভালবাসি। তোমায় আমি একটা আংটী আর একজোড়া কাপড় কিনে দেব কেমন? কি রকম কাপড় নেবে?

যা খুসি হয় দেবেন, এই বলে রেণু গলায় কাপড় দিয়ে তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে সমীরকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। সমীর সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে ওর হাত ধরে তুলে হাত-ধরা অবস্থাতেই বল্লে, এত ভক্তি কেন রেণু?

ঝট্ করে দরজার শেকলটা খুলে হাসি-হাসি অথচ গম্ভীর মুখে গৌরী বল্লে, শাঁখ বাজাবো নাকি?

সমীর রেণুর হাতটা ছেড়ে দিতেই রেণু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে হেট মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সমীর ঘাড় হেঁট করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের বাইরের ঘরে এসে বসলো। গৌরীও পেছন পেছন বেরিয়ে এসে ও-ঘরে না গিয়ে কলঘরে ঢুকলো, আর রেণু, সে রান্নাঘরের শেল্‌ফে মশলার কৌটোগুলো নিয়ে অযথা নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জাতীয় ঐক্য বোঝাতে ভাষা, ধর্ম, আচার, সামাজিক ব্যবস্থা, আহার্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি যত কিছু জীবনোপকরণের সাদৃশ্যবিষয়ক সমতা বোঝাক, ঐ বিষয়গুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ইউরোপ ভারতের চেয়ে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ, সদৃশ, সুষম। শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের শতকরা আনুপাতিক হার ইউরোপে ভারতের কয়েকগুণ বেশি। ভারতের তুলনায় রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিও সেখানে অনেক বেশি প্রখর ব'লে একতার সুবিধা গ্রহণে ইউরোপীয়রা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি তৎপর। ঐক্য আছে অথচ ঐক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, এত নির্বোধ ইউরোপের লোকে নয়। তা সত্বেও ইউরোপে যে জাতিগত বা রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য কায়েম হয় নি তার কারণ, ভাষা পৃথক্ হলে যে এক জাতি হয় না, এ-সত্য সম্বন্ধে শিক্ষার আধিক্যের জন্যেই ইউরোপীয়রা অতি-সচেতন।

সমস্ত ইউরোপ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত, সামান্য কয়েক লক্ষ মুসলমান ও অবাঞ্ছিত ইহুদি জাতির লোক ছাড়া। ইউরোপীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য পানীয়, চালচলন মোটামুটি এক। ভারতে একাধিক শক্তিশালী ভাষাগোষ্ঠী আছে যাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষীণতম সাদৃশ্যও নেই। কিন্তু ইউরোপে প্রায় সকলে ইউরোপীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহ্য থেকে যে-ঐক্য আসে তাও ইউরোপে বেশ প্রবল। গ্রিক-রোমক-গোথিক স্লাভ প্রভাব, পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের প্রভাব, অস্ট্রীয় তথা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের বন্ধন, ফরাসি ভাষার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন, ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের সার্বভৌম সম্মোহনী শক্তি, লাতিন ভাষায় ব্যাপক ধর্মচর্চার প্রভাব—কোন কিছুই ভাষা ও জাতি হিসেবে ইউরোপকে একতাবদ্ধ করতে পারে নি।

ইউরোপীয় সভ্যতা একটি সুস্পষ্ট প্রচণ্ড শক্তি; সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে ইউরোপ একটি অখণ্ড শক্তি; কিন্তু এই শক্তি যে ইউরোপে জাতীয় ঐক্য তথা জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে নি, তার কারণ ভাষাগত প্রভেদ বহুভাষাভাষী সুশিক্ষিত ইউরোপকে ভাষার পার্থক্য ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সদা-সচেতন ও অতি-সচেতন রেখেছে। দুই মহাযুদ্ধ, রুশ বা কমিউনিস্ট আক্রমণের আশঙ্কা, উইনস্টন চার্চিলের মতো প্রতিভাধর বাগ্মী রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের অক্লান্ত প্রচার ও পরিশ্রম—সমস্ত নিষ্ফল ক'রে ইউরোপে ইউনাইটেড স্টেট্স্ অফ ইউরোপ বা ইউরোপীয় সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থা গঠিত হয় নি।

মানবজাতির সৌভাগ্যবশতই ইউরোপে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে নি এবং কোনদিন তা গড়ে উঠবার কোন সম্ভাবনা বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকেও দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক ইউরোপের ভৌগোলিক রাজনীতি নিয়ে পর্যালোচনা হলে ভারতের ক্ষেত্রে কোন্ পথ গ্রহণীয় এবং শেষ পর্যন্ত কোন্ পথে ভারতকে যেতে হবে, তা বোঝার সুবিধা হবে। তুলনামূলক সাহিত্য, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ভৌগোলিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভবের আগে এ-বিষয়ে বাস্তব অবস্থা বোঝা যেত না। কিন্তু এখন আমরা যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা সহজে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। অতএব, স্বয়ং হার্ডারের মহাদেশে পরিক্রমা আরম্ভ করা হল।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ইংরেজির মতো অত শক্তিশালী ভাষার নিকটতম সান্নিধ্য থেকেও, দীর্ঘকাল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নির্মমভাবে শাসিত হয়েও আইরিশ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত আইরিশ জাতি তার মাতৃভাষা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে ইংরেজ জাতির সঙ্গে মিশে গিয়ে ব্রিটিশ জাতিতে পরিণত হয় নি।

ইংরেজরা তাদের বিশাল সাম্রাজ্যে পরাধীন জাতিগুলিকে লুণ্ঠন ও শোষণের সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে আইরিশদের অংশীদার করার প্রলোভন দেখিয়েও স্বাতন্ত্র্য লাভের সাধনা থেকে নিরস্ত করতে পারে নি। বিভেদ প্রক্রিয়ায় দক্ষ ইংরেজ জাতি প্রোটেস্টাণ্ট-ক্যাথলিক ধর্মবিভাগের ভিত্তিতে আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্র এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ড নামে রাজ্য-দুটির স্বাতন্ত্র্য সম্পাদনে সমর্থ হলেও এইরে বা আইরিশ জাতি স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সম্ভবপর সব ত্যাগই স্বীকার করে। ইংরেজি ভাষার তুলনায় আইরিশ অতি দুর্বল ভাষা। তবু আইরিশ জাতি তাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে নি। আর্থিক সুযোগ সুবিধা এবং ধর্মীয় বিরোধের অজুহাতে উত্তর আয়ারভূমি এখনও ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে নি বটে, কিন্তু দুই আয়ার দেশের মিলনের জন্যে প্রবল আন্দোলন সমানে চলেছে।

জাতি গঠনে আইরিশদের মুখ্য প্রেরণা আসে তাদের ভাষা ও সিন ফেন (Sinn fein) আন্দোলন থেকে। এ-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনুপম ভঙ্গিতে যা বলেছেন তা প্রত্যেক বাঙালির অবশ্য স্মরণীয় :—

Ireland had its own tongue when it has its own free nationality and culture and its loss was a loss to humanity as well as to the Irish nation. For what might not this celtic race with its fine psychic turn and quick intelligence and delicate imagination, which did so much in the beginning for European culture and religion, have given to the world through all these centuries under natural conditions? But the forcible imposition of a foreign tongue and the turning of a nation into a province left Ireland for so many centuries mute and culturally stagnant, a dead force in the life of Europe. (The Ideal of Human Unity—pp. 259.)

"আয়ারল্যাণ্ডের নিজস্ব ভাষা ছিল যখন তার নিজের স্বাধীন জাতীয়তা এবং সংস্কৃতি ছিল, আর তার ক্ষতি ছিল মানবতার এবং আইরিশ জাতির ক্ষতি। কারণ, এই কেল্টিক জাতি তার সুন্দর আত্মিক প্রবণতা, ক্ষিপ্র বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম কল্পনা, যা সূচনায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং ধর্মের জন্যে অনেক কিছু করেছিল, তা দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় কি না করতে পারত জগতের জন্যে এতগুলো শতাব্দীর মধ্যে? কিন্তু জোর ক'রে একটা বিদেশি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া এবং একটা জাতিকে একটা প্রদেশে পরিণত করার ফলে আয়ারল্যাণ্ড এতগুলো শতাব্দীর জন্যে বোবা এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আবদ্ধ, ইউরোপের জীবনে এক মৃত শক্তিরূপে প'ড়ে থাকে।"

ভারতের হিন্দুস্থানি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশরূপে বাঙালি জাতিরও ঠিক ঐ অবস্থা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ সে-বিষয়ে ভারতীয়দের সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন মৃত্যুর অল্প দিন আগেও। ইউরোপ যে ভাষার বৈচিত্র্য কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি তা সমর্থন ক'রে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :—

Diversity of language serves two important ends of the human spirit, a use of unification and a use of variation. A language helps to bring those who speak it into a certain large unity of growing thought, formed temperament, ripening spirit. It is an intellectual, aesthetic and expressive bond which tempers division where division exists and strengthens unity where unity has been achieved. It is a means of national differentiation and perhaps the most powerful of all. For each language is the sign and power of the soul of the people which naturally speaks it. Therefore it is of the utmost value to a nation, a human group-soul, to preserve its language and to make of it a strong and living cultural instrument. A nation, race or people which loses its language, can not live its whole life or its real life. And this advantage to the national life is at the same time an advantage to the general life of the human race.

(Ibidem, pp. 257-58.)

"ভাষাগত বৈচিত্র্য মানব-আত্মার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, ঐক্যের উপযোগিতা এবং বৈচিত্র্যের উপযোগিতা। যারা সেই ভাষায় কথা বলে, তাদের বর্ধমান চিন্তা, সুগঠিত মানস, পরিণতিগামী আত্মাসমন্বিত এক নির্দিষ্ট বৃহৎ ঐক্যে সমবেত হতে ভাষাটি সাহায্য করে। এ হচ্ছে এক বুদ্ধিগত, শিল্পবোধসম্মত, প্রকাশক্ষম বাঁধন যা যেখানে বিভেদ আছে, সেখানে বিভেদকে সংযত করে এবং যেখানে ঐক্য অর্জিত হয়েছে সেখানে ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। এ হল জাতীয় বিভাগ নির্ণয়ের একটি উপায় এবং সম্ভবত স চেয়ে শক্তিশালী উপায়। কারণ প্রত্যেক ভাষাটি যে-জনগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবে সেটি ব্যবহার করে, তার আত্মার শক্তি এবং নির্দেশক। অতএব, কোন জাতির কাছে, মানবীয় যূথ-আত্মার কাছে, তার ভাষাকে রক্ষা করার এবং তাকে শক্তিশালী ও জীবন্ত সাংস্কৃতিক যন্ত্রে পরিণত করার মূল্য সর্বাধিক। কোন জাতি, সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী তার ভাষা হারিয়ে ফেললে তার জীবন সমগ্রভাবে বা প্রকৃতভাবে যাপন করতে পারে না। আর জাতীয় জীবনের এই সহায়কটি একই সঙ্গে মানব সম্প্রদায়ের সাধারণ জীবনযাত্রার পক্ষেও সহায়ক।"

ইউরোপ যেমন আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড থেকে উরাল পর্বত পর্যন্ত মোটামুটি ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত, যদিও সুবিন্যস্তভাবে বিভক্ত নয়, তেমনি ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রীক সমস্যাই মুখ্যত ভাষার ভিত্তিতে গঠিত রাজ্যগুলির সুবিন্যাসের সমস্যা। যদি ইউরোপ ভাষার ভিত্তিতে পরিপূর্ণভাবে সুগঠিত হয়, তা হলে সেখানকার অধিকাংশ রাজনৈতিক কলহ ও সীমান্তবিরোধ দূর হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার নিগূঢ় অর্থনৈতিক কারণ যাই হোক না, আশু কারণ ছিল জার্মানির দাবি অনুযায়ী পাশাপাশিভাবে অবস্থিত, সমস্ত জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাকে একত্র হতে না দেওয়া। এখনও ইউরোপে প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা হচ্ছে জার্মানভাষী সমস্ত এলাকায় একীকরণ সমস্যা। সমস্ত জার্মানি ভাষার ভিত্তিতে মিলিত হলে তার প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখীন হবার সামর্থ্য রুশদের নেই ব'লে তারা জার্মানদের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে বাধা দিয়ে আসছে। জার্মান ভয়ে কাতর রুশদের এই অগণতান্ত্রিক মনোভাবই ইউরোপের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সমস্যা। ইউরোপ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনায় এ-সত্য সহজে ধরা যায়।

ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে মুখ্য বিরোধ জার্মানভাষী আলসাস ও লোরেন এলাকা নিয়ে। ডেনমার্ক ও জার্মানির বিরোধ ছিল শ্লেস্‌উইক-হলস্টাইন এলাকা নিয়ে—অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনুসারে ওখানকার জার্মান জনসাধারণ স্বদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে কি না, এই ছিল প্রশ্ন। ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে পিরেনিজ পর্বতমালা-সন্নিহিত স্পেনীয়ভাষী এলাকা নিয়ে সীমান্তবিরোধ আছে। স্পেন ব্রিটেনের কাছে জিব্রালটার ফেরৎ চায়। স্পেনে কাতালোনিয়া এবং ফ্রান্সে প্রভাঁস রাষ্ট্র গঠনের দাবি আছে। বেলজিয়ম ভাষার ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত হতে চলেছে। এই ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ইউরোপে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহ আসলে সবই ভাষার ভিত্তিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সুবিন্যাসের সমস্যা। জার্মানভাষী এলাকায় বা মধ্য ইউরোপে এই সমস্যা সব চেয়ে উৎকট।

ইউরোপে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির সুবিন্যাস কি ভাবে হতে পারে, সে-আলোচনা ভারতের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কারণ ভারতেও ঐ এক সমস্যার এক সমাধান গ্রহণ করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

পথের বাঁকে

[উপন্যাস]

শ্রীমদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেশের বাড়ীতে এসেছে সুহাস দীর্ঘ বিশ বছর পরে। দীর্ঘদিন একটা আশা দীপ্ত জীবনের পাশে থেকে সে ভুলে গিয়েছিল সমাজ, সংসার সব কিছুই। ইতিমধ্যে জ্যেঠামশাই ও কাকা দু'জনেই মারা গেছেন। তিন কামরার একতলা বাড়ীর তিনটে ঘর এসেছিল উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া তিনজনের অধিকারে, জ্যেঠামশাই, বাবা ও কাকার। বয়সের হিসেবে মেজো হলেও সুহাসের বাবা মারা গেছেন সকলের আগে। জন্মক্ষণের পর থেকে মা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছিল সুহাস। জ্যেঠাইমার কোলে পিঠে চড়েই তার শৈশবটা কেটে গেছে।

সুহাস তার বাবার একমাত্র সন্তান। কাকা জ্যেঠার সন্তান-সন্ততির চাপে সুহাসের অধিকারের ঘরটা এখন সকলেরই নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজনের কাজে লাগছে। তাতেও এ সংসারের সংকুলান হয় না। হওয়ার কথাও নয়।

বয়সের ভারে জ্যেঠাইমা এক রকম চলৎশক্তি রহিত হয়েছেন। চোখেও ভাল দেখতে পান না। জ্যেঠামশাইয়ের দুই ছেলে ইতিমধ্যে বিয়ে করেছে। তাদের কিছু সংখ্যক ছেলেপুলেও এ বাড়ীর বসতি বাড়িয়েছে।

কাকীমার বরাত একদিক থেকে ভাল। আবার একদিক থেকে খুবই খারাপ। ভাগ্যে ছেলে মেলেনি তাঁর কপালে। তিনটে সন্তানই মেয়ে। ঘরের বা উঠোনের জায়গা জুড়ে বাস করবে না অধিকারের দাবীতে নতুন নতুন ছেলেপুলের দল। কিন্তু ভাবনা হচ্ছে, তিনটি মেয়েকে পার করার।

সংসারের অবস্থাও এ'দিকে মোটেই আশাপ্রদ নয়। কিছু জমিজমা আর একটু বাগান হল এ সংসারের মূলধন। জ্যেঠামশাইয়ের দুই ছেলের মধ্যে একজন হালে ঠিকাদারের কাছে কাজ পেয়ে সামান্য কিছু রোজগার করে। আর এক ছেলে সরকারের খাদ্য ও বণ্টন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কোন এক দোকানে কাজ করে। সে দেশের বাড়ীতে থাকতে পারে না। সহরের দোকানেই তার বাসা। নিজের স্ত্রী পুত্রের খরচও সে ভাল ভাবে চালাতে পারে না। বাজার সব সময়েই মন্দা চলেছে। তাই কোন মাসে সাড়ে উনত্রিশ টাকা, কোন মাসে পঁচিশ টাকা আবার কোন মাসে আঠাশ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়। দৈবাৎ কোন সময়ে বাড়ীতে এলে সহর থেকে কিছু ভাল জিনিষ সঙ্গে নিয়ে আসে ছেলে পুলেদের জন্যে।

সর্বসাকুল্যে তিন বিঘে ধান জমির ছিটে ফোঁটা চাল, বিঘে খানেকের মত নানা জাতের গাছের বাগানের গাছপালা, ফল মূল আর শুকনো ডালের কাড়াকাড়ি ভাগাভাগিতে এ সংসারের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েও বেঁচে আছে।

ঘর-দোরের অবস্থাও জরাজীর্ণ। আর কিছু দিন পরে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাড়ীর অধিবাসীদের অবস্থা আরো মর্মান্তিক। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পরণে প্যাণ্ট বা জামা কোনটাই নেই। বড় বড় মেয়েদের পরনের কাপড়ের চেহারা দেখলে লজ্জায় আপনা থেকেই মাথা নীচু হয়ে আসে। দীর্ঘদিন সহর বাসের ফলে সুহাসের কাছে এগুলো আরো বেশী করে বিসদৃশ হয়ে উঠল।

এ সংসারের চাহিদা অনেক। অনেকের অনেক প্রয়োজনই মেটেনা এখানে। সার্বজনীন চাহিদা তো অনেক দূরের কথা।

সুদীর্ঘ অদর্শনের ফলে বাড়ীতে পুনঃ প্রবেশে যথেষ্ট বাধা পেতে হয়েছিল সুহাসকে। অনেক পরিচয় দানের পর তবে সে পা দিতে পেরেছিল রোয়াকের ভাঙ্গা সিঁড়িটায়। ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে নুয়ে নুয়ে জ্যেঠাইমা এলেন। অনেকক্ষণ ধরে কুঞ্চিত চোখের পাতার ফাঁকে দৃষ্টি মেলে ধরে যাচাই করে নিয়ে মন রায় দিতে বলে উঠলেন, নদান না ?

সুহাসের ডাক নাম নদান। এ সংসারের জীবিত-মৃত সন্তানের সংখ্যা ধরে সুহাসের ঘটেছিল নবমতম আগমন। তাই জ্যেঠাইমা ঈশ্বরের নবম দানের কথা স্মরণ করে নাম রেখেছিলেন নদান। বাবা পাঠশালায় ভর্তি করে নাম দিয়েছিলেন সুহাস।

মা মারা যাবার দিন থেকেই জ্যেঠাইমা নদানকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। তাই ক্ষীণ দৃষ্টিতেও তিনি ভুল করলেন না নদানকে চিনে নিতে।

জ্যেঠাইমা ঘরে ডেকে নিলেন নদানকে। তারপর ফোক্‌লা দাঁতের অস্পষ্ট উচ্চারণে নানা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আলাপ জমিয়ে তুললেন তার সঙ্গে।

দরজার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন কাকীমা। ঘরে নতুন অপরিচিত লোক দেখে তিনি একটু থমকে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কাপড় ধরে মাথায় তুলে দিতে গিয়ে অসংকুলানের লজ্জায় সরে গেলেন সেখান থেকে।

ক্ষীণ দৃষ্টির জ্যেঠাইমা বলে উঠলেন, বাইরে ছোট নাকি রে ?

নদান বুঝল 'ছোট' অর্থাৎ ছোট বউ। কাকীমাই এ সংসারের ছোট বউ। তাই বিয়ের কনে থেকেই বড়'র দাবীতে আদর করে জ্যেঠাইমা ওনাকে ছোট বলেই ডাকেন।

জ্যেঠাইমার প্রশ্ন শুনে নদান বলল, ঠিকই ধরেছেন জ্যেঠাইমা, কাকীমা আমাকে চিনতে না পেরে লজ্জায় পালিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে দরজার সামনে ছোট ছোট উলঙ্গ কয়েকটা ছেলে মেয়ে জড়ো হয়ে দেখতে সুরু করেছে ঘরের অপরিচিত এই লোকটাকে। তাদের মধ্যে থেকে ক্ষীণ দৃষ্টির জ্যেঠাইমা অনেক চেষ্টা চরিত্তির করে টুনি নামের একজনকে চিনতে পেরে তাকে ডেকে বললেন, 'ছোট'কে ডেকে দেনা রে।

একটু পরে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ভাবে কাকীমা এসে ঢুকলেন ঘরে।

বোধহয় জ্যেঠাইমা ডেকেছেন বলে, পরিচিতের ভরসায় তাঁর আগমন।

সামনে দাঁড়াতেই নদান বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না কাকীমা ?

একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থেকে কাকীমা বললেন, আমাদের নদান না ?

জ্যেঠাইমা বললেন, 'ছোট,' তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে ওকে কিছু মুড়ি-টুড়ি খেতে দে।

"দিচ্ছি" বলে, কাকীমা বললেন, নে নদান, তুই জামা-টামা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নে। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

নদান, হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিলো। ছোড়দের মধ্যে হঠাৎ একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। অনেকে 'কাকা এসেছে' 'কাকা এসেছে' বলে দৌড়োদৌড়িও সুরু করে দিল।

তিনটি বয়স্কা মেয়ে পাশের ঘর থেকে রোয়াকের ওপর এসে সুহাসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের পরণে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র। ও-পাশের ঘর থেকে দু'টি বউ বার-কয়েক উঁকি মেরে সরে গেল।

কাকীমা এলেন হাতে একটা ভাঙ্গা কলাইয়ের কাঁসিতে মুড়ি আর কিছু কুচো নারকেল নিয়ে। একটা পিঁড়ে পেতে নদানকে বসতে দিয়ে তার হাতে ওগুলো দিলেন। তারপর মেয়েগুলোকে ডেকে বললেন, তোরা ওখেনে দাঁড়িয়ে কেন রে, এ আমাদের নদান, তোদের দাদা।

বলে, কাকীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ওদের দোষই বা কি ? সেই যে কবে চলে গেলি। ঝুনুটা তখন চার বছরের। আর রুনুটা তো তখন হয়ই নি।

ঝুনু মানে কাকীমার বড় মেয়ে। পরিচিতের তালিকা থেকে নামটা যেন অতি কষ্টে খুঁজে পেল সুহাস। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে মেয়েই কাকীমার অনুমান করল সে। এদের মধ্যে ঝুনু কোন্‌টা আবিষ্কার করা মুস্কিল।

জলযোগ পর্বের সমাপ্তির পরও বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল সকলের সঙ্গেই নানা কথায় নানা আলোচনায়।

সুহাস উকিলের ঘরে মুহুরীর কাজ করেছে শুনে সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।

জ্যেঠাইমা বললেন, নদান, আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই, তুই এখানেই থেকে যা। ও পাড়ার ভেলি সইয়ের সুন্দর একটা মেয়ে আছে। বয়েস অল্প, চমৎকার মানাবে তোর সঙ্গে। বলিস্ তো কালই আমি ছল করে মেয়েকে এখেনে এনে দেখিয়ে দিই। তবে আমি দিব্বি করে বলতে পারি যে একবার সে-মেয়েকে দেখবে সে অপছন্দ করতে পারবে না।

কাকীমাও উৎসাহিত হয়ে বললেন, চাস্‌তো, আমার বোনের ননদের একটা মেয়ে আছে তাকেও দেখিয়ে দিতে পারি।

কাকীমার এ কথায় জ্যেঠাইমা একটু বিরক্ত হয়েছেন বলে বোধ হল। ভাবখানা এই যে প্রতিযোগিতা করে নিজের বোনের ননদের মেয়েটাকে পার করার তাল।

সকলের উৎসাহ দমিয়ে দেবার জন্যে সুহাস বলল, অবশ্য আমি এখানেই থাকতে এসেছি কিন্তু বিয়ে করে আর বোঝা ঘাড়ে নেবার ক্ষমতা নেই আমার।

সুহাস এখানে থাকার মনস্থ করে এসেছে শুনে সকলেই আনন্দ পেল।

জ্যেঠাইমা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি বললেন, বলিস্ কিরে, এত বছর সহরের উকিলের কাছে মুহুরীগিরি করে এলি, আর বল্‌ছিস কিনা ক্ষমতা নেই!

বলে, তিনি ফিরিস্তি দিতে সুরু করলেন, অমুক পাড়ার অমুকের জামাই, তমুক পাড়ার তমুকের ভায়রাভাই, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও কয়েকজন, কেউ উকিলের, কেউ মোক্তারের মুহুরীগিরি করে দু'টো তিনটে করে বাড়ী করেছে, বিশ হাজার টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। আবার ওদের দলের কে নাকি আজও ঘোড়ায় টানা ফিটং চড়ে।

এ কথা শুনে সুহাস মনে মনে একটু হাসল। তারপর বলল, আমি হলাম এক হতভাগ্য উকিলের মুহুরী। আমি যা কপাল নিয়ে এসেছি তাতে আমাকেই খাওয়াবার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদের। বিয়ে করে মেয়ে আনা তো অনেক দূরের কথা।

এ কথায় কান দিল না কেউ। সকলেই মনে ভাবল, এটা পুরুষের বিয়ের কথা উড়িয়ে দেবার ছল মাত্র।

তাই ওঠবার সময় জ্যেঠাইমা আশা নিয়ে উঠলেন, সে কথাও জানিয়ে দিলেন।

আনন্দ আর উৎসবের মধ্যে দিয়ে একটা দিন কেটে গেল। সুহাস এরই মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে অনেকের। কাকীমার মেয়ে তিনটে প্রাণ ঢেলে সেবা যত্ন সুরু করে দিল নাদান-দার। বড় মেয়ে ঝুনু, মেজ রুণু আর ছোটটি বুলু। তার মধ্যে মেজ রুণু সব কাজে সব ব্যাপারে খুবই সপ্রতিভ। তার সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পাওয়া যায়। গ্রামের, আশপাশের গ্রামের এবং ইদানীং ঘটে গেছে এমন অনেক সংবাদ তার কণ্ঠস্থ।

জ্যেঠাতো ভায়ের দুই বউও উঠে পড়ে লেগেছে সুহাসের সেবা যত্নের ত্রুটি না হয় দেখবার জন্যে।

জ্যেঠাইমা আর কাকীমাও যতটা সম্ভব ওপর ওপর তদবির তদারক চালাচ্ছেন।

দেখা হল না শুধু জ্যেঠাইমা'র ছোট ছেলে বিজনের সঙ্গে। সে কোন বিজন কাননে ঠিকাদারীর তদারকীতে ব্যস্ত।

এরপরই একবার কাকীমা আর একবার জ্যেঠাইমা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যে যার অভিযোগ ও প্রতিকারের ব্যবস্থার দাবী করতে লাগলেন।

কাকীমা বললেন, অন্ততঃ একটা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা না করে দিলে তো পাড়ায় আর মুখ দেখানো যাচ্ছে না!

জ্যেঠাইমা প্রথম একচোট বৌদের নামে নিন্দে করে নিলেন। তারপর বললেন, বুড়ো হয়েছি, চোখে ভাল ঠাওর হয় না, আমার জন্যে যে রকম হোক একটা ছোট ঘর তুলে দে আর একটা চশমা তৈরী করিয়ে দে, নদান।

এঁদের উভয়েরই কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গীতে সুহাস বুঝতে পেরেছে যে কাকীমা ও জ্যেঠাইমার মধ্যে সদ্ভাব নেই মোটেই। বাইরের থেকে শুধু একটু মিল দেখাবার চেষ্টা করা হয় মাত্র।

সুহাস অকপটে এঁদের কাছে নিজের অবস্থা ও আগমনের কারণ জানিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে সব সময়। কিন্তু তার পরেরও অনুরোধ থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে কেউ বিশ্বাস করেননি তার অক্ষমতার উক্তিকে।

বিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সন্ধ্যের একটু পরে। নানান আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তার পর সেও জানালো, বাড়ীটাকে মেরামত করতে না পারলে আর রক্ষা করা যাবে না।

সুহাস মনে মনে ভাবল, তার অক্ষমতার কথা কেউ বিশ্বাস করবেনা। আগেকার দিনে মুহুরীগিরি করে কে বাড়ী করেছে সেই ধারণায় এরা ভেবেছে অনেক টাকা পয়সা জমিয়ে বাড়ীতে বসার মনস্থ করে এসেও কিছুই করতে চাইছেনা কারুর জন্যে। তাই শেষ চেষ্টার আশায় এরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু সুখ সুবিধের ব্যবস্থা করে নিতে চায়। যদিও সম্পর্কের দিক থেকে সকলেই সব দাবী করতে পারে তার কাছে এবং ক্ষমতা থাকলে সে দাবী পূরণ করাও তার উচিত কাজ, কিন্তু এখানকার ধরণধারণ এবং কথাবার্তা কেমন যেন বৈষয়িক সূত্রে বাঁধা।

কাকীমা ও জ্যেঠাইমা এই দু'পক্ষের প্রতিযোগিতা চলেছে এই ব্যাপারে। এবং এক পক্ষ সুবিধে আদায়ের জন্যে অপর পক্ষকে যে কতখানি হেয় করতে পারে তার পরিচয় সুহাস ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে।

জ্যেঠাইমা রুণুর চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়েও কথা বলতে ছাড়েননি। তাঁর ধারণা 'ছোট' গোপনে বেশ দু'পয়সা জমাচ্ছে। গাঁয়ে অনেক বাড়ী ঘরদোর তৈরী হচ্ছে। যে সব ঠিকাদাররা এই কাজ করছেন তাদের কাছে গোপনে রুণুর যাতায়াত ও রোজগার দুইই আছে। সুতরাং নদান যেন কোন রকমেই ওদের কোন সাহায্য করতে এগিয়ে না যায়। নাদানের কাছে জ্যেঠাইমা তার উক্তির প্রমাণ রাখবার জন্যে এও বলেছেন যে, রুণু যদি ভালই হবে তবে ঠিকাদারকে বলে বিজনের চাকরী করে দিল কি করে ?

সুহাস মনে মনে বুঝেছে যে কাউকে বলে যদি রুণু চাকরী করে দিয়েও থাকে তাতে সে যে খারাপ তা প্রমাণ হয় না আদৌ। তবু তার মনে এ প্রশ্ন উঠেছে রুণু বলে-ক'য়ে চাকরী করে দিল কেমন করে ? তার নিজেরও চাকরী করার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকায় এ প্রসঙ্গকে নিয়ে সময় মত রুণুকে নিয়ে আলোচনা করবে মনস্থ করল।

ইতিমধ্যে ছোট বোন বুলু এল গোপনে। সে এদিক ওদিকে তাকিয়ে সুহাসকে একা পেয়ে নীচু গলায় বলল, জানো দাদা, দুই বউ ওদিকে আলোচনা করছে যে তোমার প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও তুমি নাকি চেপে যাচ্ছো, অন্য কোন মতলবে।

সুহাসের ভাল লাগল না এ পরিবেশ। তাই সে বলল, দেখো বুলু, তুমি ছেলে মানুষ। গুরুজনদের ব্যাপার নিয়ে তোমার এ সব কথা আলোচনা করা উচিত নয়।

সুহাস দেখল, একথা বলায়, বুলু ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে মনে। তাই সে পরিবেশকে হাল্কা করার জন্যে বলল, বরং আমার খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যাক্, তোমাদের সহর সম্বন্ধে নানা গল্প শোনাবো।

বুলু কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুহাস খানিকটা চুপচাপ বসে রইল। তারপর ভাবল, ওরা যদি গল্প শুনতে আসে তহলে ভালই হয়। রুণুর কাছ থেকে কথায় কথায় চাকরীর ব্যাপারটা জানতে পারা যাবে।

অন্ধকার ঘরে এ পরিবেশের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চিন্তায় মগ্ন হতে ভবনথবাবুর স্ত্রী মনোরমা দেবীর কথা মনে পড়ল। তিনিও তো নারী। তাছাড়া সহরের মেয়ে তিনি। অথচ তাঁর হৃদয়ে মাতৃত্ব কানায় কানায় ভর্তি।

শুধু চলে আসার সময় পরিচিতের প্রতি কর্তব্য দেখাতে পারলেন না বলে কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভবনাথবাবুর বড় মেয়ে শুভার কথাও মনে পড়ল তার। বয়সে সে বুলুরই সমান হবে। বাইরের চলা ফেরার চাকচিক্য থাকলেও এমন বাচাল প্রাকৃতির নয় সে। বাবার কর্মচারী হলেও সুহাসকে কত সম্মান দেখাতো সে। শুধু মাত্র দাদা বলে সম্বোধন করা নয়, সুহাস যে তাদের বাড়ীর কেউ নয় এটাও বুঝতে দিতো না কাউকে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের দরজার সামনের খালি রোয়াকের ওপর মাদুর পেতে দেওয়া হল সুহাসের জন্যে। সেখানে শুয়ে শুয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে গেল তার।

এই বাড়ীতেই তার শৈশব কেটেছে। কৈশোরের প্রান্ত সীমায় এসে জগৎকে নতুন করে চেনবার সময়েই তার বাবা সব মায়া-বন্ধন কাটিয়ে চলে গেলেন এ পৃথিবী ছেড়ে। তখন থেকেই এ বাড়ীর কোন আকর্ষণ সুহাসকে আর বেঁধে রাখতে পারেনি। এ পরিবেশের হাত থেকে

মুক্তি নিয়ে সহরের কোন কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে জীবনযাত্রার ধারা পাল্টাতে চেয়েছিল সে।

সেই অল্প বয়সে এ বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় তাকে বাধা দেয়নি কেউ। কেউই সহানুভূতির স্পর্শ নিয়ে তাকে ধরে রাখতে চায়নি এখানকার মাটির বুকে।

মনে পড়ল মনীষার কথা। তার বাল্য সহপাঠিনী মনীষা। দেশ ছেড়ে চলে যাবার কথা শুনে সে বলেছিল, নিজের জিনিষ ছেড়ে চলে যাবার দরকারটা কি, অধিকারে রাখার চেষ্টা করো সব।

হয়ত গাঁয়ের মেয়ে বলে, অধিকার বজায় রাখার অভিজ্ঞতায় সে বলেছিল কথাগুলো। এই অধিকার বজায় রাখার হানাহানির বাইরে যে একটা জগৎ আছে, জীবন আছে, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি মনীষার।

আকাশের গায়ে নক্ষত্রগুলো একবার মিট মিট করে উঠল।

তবু মনীষার একটা আন্তরিক টান ছিল সুহাসের ওপর। কেন, বলা যায় না, এ সংসারের গণ্ডীর মধ্যে অতিষ্ঠ-হয়ে-ওঠা সুহাসের জীবনকে নানা ভাবে সান্ত্বনায় ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করত সে।

দয়াল কাকার মেয়ে মনীষা। দয়াল কাকা সুহাসদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সেই সুবাদে মনীষাও। তাছাড়া গাঁয়ের মেয়ে বউদের নিত্যই কাছাকাছি বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত লেগেই থাকে। তা সত্বেও সেদিন জ্যেঠাইমা মনীষার আসা এবং সুহাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাকে সুনজরে দেখতে পারেননি। আর সেই নিয়ে তিনি পাড়াতে এবং বাড়ীতে এমন ঝড় তুলেছিলেন যে সুহাস বাড়ী ছেড়ে চলে আসার মনস্থ করতে বাধ্য হয়েছিল।

সুহাস আজও বুঝতে পারে না, কি কারণে বা কি দৃষ্টিতে জ্যেঠাইমা, মনীষা আর তার মধ্যের এক অলীক সম্পর্কের ইতিহাস আবিষ্কার করেছিলেন।

অবশ্য মনীষা গোপনে দেখা করে সুহাসকে বলেছিল, ওটা কিছু নয়, তোমাকে তাড়িয়ে সম্পত্তি ভোগ দখল করার একটা ফন্দি তোমার জ্যেঠাইমার।

সুহাস কোন কথাটাকেই মন দিয়ে মেনে নিতে পারে নি। তাই সেই পরিবেশ ছেড়ে চলে যাবারই মনস্থ করেছিল সে।

পল্লীর নিস্তব্ধ অন্ধকারে আকাশের গায়ে দৃষ্টি রেখে অতীতকে ভাবতে বড় ভাল লাগছিল সুহাসের।

হঠাৎ নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে থালা বাসনের আওয়াজ তুলে রুণুর আবির্ভাব ঘটল রোয়াকের ওপর। রোয়াকের ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের মাটির উঠোনের এক কোণে থালা বাসনগুলো রেখে ঘটির জলে মুখ ধুয়ে আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে রোয়াকের ওপর উঠে এসে দাঁড়াল সে। তারপর সুহাসের দিকে দৃষ্টি পড়তে সে বলে উঠল, সহরের মানুষ, এই এঁদো জঙ্গলে এসে ঘুমোতে পারবে কেন?

সুহাস বলল, কে রুণু নাকি রে, আয়, এদিকে আয়, বোস। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে অনেক।

রুণু এগিয়ে এসে বিছানার ওপর বসল বটে কিন্তু বলল, এই রে, দাদা দেখছি আমাকে ঘর ছাড়া না করে ছাড়বে না। তুমি এখন আমার সঙ্গে গল্প জুড়বে আর কাল সকাল থেকেই জ্যেঠাইমা মন্ত্রর আওড়াতে সুরু করবে, বেহায়া মেয়েটা আমার নদানকে ভাঙ্গিয়ে নিলো আমার কাছ থেকে?

এ কথা শুনে ব্যথিত হয়ে উঠল সুহাসের মন। জ্যেঠাইমার দিকে তার যে মনটা জেগেছিল সে মনটা যেন কুঁকড়ে উঠে দংশন করতে থাকল তাকে।

হঠাৎ সুহাস বলল, না তোর ভয় নেই রে রুণু। আমি দু'একদিন পরেই এখান থেকে আবার চলে যাবো।

—তাহলে তো আরো ভাল হল। শুধু ভাঙ্গিয়ে নেওয়া নয়, আমার নদানকে একেবারে ভাগিয়ে দিল।

একথা শুনে সুহাসের একটু হাসি পেল। ভাল লাগল রুণুর উক্তি। সুহাস ভাবল, সকলে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে তাই রুণুর কথা বলার এই সাহস। তাছাড়া বোনেদের মধ্যে ও একটু সপ্রতিভ ও চালাক চতুর। সব দিক রক্ষা করেই সে নিজের মুখ রক্ষা করবে। তাই একটু সাহসে ভর করে সুহাস প্রশ্ন করল, আচ্ছা রুণু, ঐ পূর্ব দিকের বাড়ীতে দয়াল কাকারা এখনও আছেন?

—দয়াল কাকা মারা গেছেন প্রায় তিন-চার বছর আগে। এখন বাড়ীতে কেউ থাকেনা। সারা বছরই তালা চাবি দেওয়া থাকে। তবে দয়াল কাকার এক মেয়ে মাঝে মধ্যে আসে। দু'চার দিন থাকে আবার কোলকাতায় চলে যায়।

এইটুকু শুনেই কৌতূহলকে দমন করতে হল। সুহাস বুঝল, রুণুর সঙ্গে এ নিয়ে আর বেশী আলোচনা করা শোভন নয়। তাই সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে বলল, হ্যাঁরে রুণু, তোরা তো এ পাড়া সে পাড়া ঘুরে বেড়াস, বলতে পারিস, পিটুলীপাড়ার হরি মোহন পাঠশালার কেদার মাষ্টার কোথায় থাকেন ?

—ও, তুমি ঐ পাঠশালায় পড়তে বুঝি। ওটা এখন আর পাঠশালা নেই। ওখেনে তিন তলা বাড়ীর মস্ত বড় একটা ইস্কুল হয়েছে। কত এলে-বিলে পাশ মাষ্টারে ভর্তি। তোমার পাঠশালার ঐ কেদার মাষ্টারটা ছিল মুখ্যুর ডিম তাই ওটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে থাকে জলা বিলের ধারে ডোম পাড়ার কাছাকাছি। তামাক খেয়ে গুরুগিরি করা ঘুচে গেছে কিনা তাই বুড়ো বয়সে তামাকের গন্ধের লোভে হাটে খুলেছে একটা তামাকের দোকান।

কেদার মাষ্টারের জন্যে সুহাসের মনটা বেদনায় ভরে উঠল। সে ঠিক করল এখান থেকে যাবার আগে বাল্যের গুরু কেদার মাষ্টারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে। তাছাড়া কিছু পরিচিতজন ও কিছু পরিচিত জায়গাও দেখে যাবো। আর কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করে যাবো। সঙ্গে যেতে তোর আপত্তি আছে ?

—না।

—তোকে সঙ্গে নেব কেন জানিস্? আসবার সময় আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমার জন্মস্থান আমার কাছে বিদেশ হয়ে গেছে। রথতলার মোড় পর্যন্ত বাস আসছে আজকাল। তাছাড়া এত নতুন রাস্তাঘাট ও বাড়ী ঘর ভাঙ্গাচোরার ফলে পথ চিনে আসতেই পারছিলুম না। আর একটু হলেই ফিরে যেতে হচ্ছিল। তাই তোকে সঙ্গে নেবো। কি জানি, বেড়াতে বেরিয়ে ঘরের ছেলে হয়ত ঘরে ফিরতে পারবনা।

রুনু একটু অন্যমনস্ক থেকে কি যেন ভাবছিল। তাই সুহাসের কথা শেষ হতে বলল—আচ্ছা দাদা, তুমি চলে যাবে যাবে করছো, সত্যিই কি তুমি চলে যাবে ?

সুহাস ছোট্ট করে জবাব দিল, হাঁ।

আন্তরিকতার আর্দ্রস্বরে রুণু বলল, দাদা একটা সত্যি কথা আমাকে বলবে ?

অন্ধকারের মধ্যেও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুহাস তাকাল বোনের মুখের দিকে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রুণু বলল, কেন তুমি চলে যাবে এ বাড়ী ছেড়ে ?

—চাক্‌রীর খোঁজে।

—চাকরীর খোঁজেই যদি হয় তাহলে বাড়ী ছাড়তে হবে কেন ? এখানেই যে কোন একটা চাকুরী জুটিয়ে নিলে তো পারো। অবশ্য আর কিছুদিন আগে হলে আমিই তোমাকে চাকরী করে দিতে পারতাম।

—তুই এক ফোঁটা মেয়ে, চাক্‌রী করে দিতিস্ কিরে ?

এতে বোধহয় রুণুর আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তাই সে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে জোর গলায় বলে উঠল, আমিই ছোড়দার চাক্‌রী করে দিলুম তা জানো ? এখন সে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায় আবার উপরিও পায়।

—যা, তুই বাজে কথা বলছিস রুণু, তুই কি করে চাক্‌রী করে দিবি ?

—আমার বন্ধু নীহারি, তার মামা তখন এখেনে বাড়ী তৈরী করার বড় কাজ করতো। তাই নীহারিকে ধরে অনেক বলে ক'য়ে কাজটা করে দিয়েছিলুম। সে ভদ্দরলোক চাক্‌রী ছেড়ে চলে গেছে তাই, নইলে তোমারও চাকরী করে দিতুম, দেখতে ?"

সুহাস এই কথাটাই শুনতে চাইছিল। কিন্তু সব শুনে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। বেচারা রুণু, ছেলে মানুষ, এই বয়সে নিজের বান্ধবীকে ধরে ক'রে ছোড়দা অর্থাৎ বিজনের চাকরী করে দিল, আর জ্যেঠাইমা প্রশংসা করা তো দূরের কথা, এক রকম নিজের মেয়েরই নামে অত কুৎসিত কথা উচ্চারণ করলেন ?

সামান্য স্বার্থের আশায় মানুষ যে এত হীন হতে পারে, এ ধারণা সুহাসের ইতিপূর্বে ছিল না। তার আদালত-জীবনে কত ধরনের মামলার সংস্পর্শে সে এসেছে। কত খুন জখম, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিবাদের ফলে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা, কিন্তু এ ধরণের অভিজ্ঞতা তার জীবনে নতুন এবং ভিন্ন প্রকৃতির। আজ সে বুঝল পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

এমন সময় লণ্ঠন হাতে সশরীরে আবির্ভাব ঘটল

জ্যেঠাইমার। ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, বললেন, কোন আভাগীর বেটিটারে? নিজেদের তো সব খুইয়ে বসে আছে। দিন রাত্তির সব একাকার করে নিয়েছে। বলি, নদানটাকেও কি রাতের জীব করে তুলবি? ওকে কি একটু নিশ্চিন্দে ঘুমোতে দিবি না, না আমাদেরও জাগিয়ে রেখে ঘরছাড়া করবি?

সুহাস বুঝল, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিত। তাই সে বলল—রুণুর কোন দোষ নেই জ্যেঠাইমা। আমিই ওকে ডেকে পাড়া ঘরের সব খবর নিচ্ছলুম।

—তুমি না হয় ডাকলে, তোমার কি দোষ বাবা। তা বলে ঐ ধেড়ে কপালখেকোটা কি বলে তোমাকে রাত অবধি জাগিয়ে রাখে?

—আপনি ঠিক উল্টোটা বললেন, জ্যেঠাইমা। ও আমাকে জাগিয়ে রাখে নি, আমি বরং ওকে ডেকে এতক্ষণ অবধি বকালাম। বেচারী ঘুমে কতবার ঢ়লে পড়েছে, তাও এটা সেটা জিজ্ঞেস করে আমি আটকে রেখেছি।

রুণু বুঝল গতিক ভাল নয়। জ্যেঠাইমাকে থামিয়ে দেওয়া মানে তাঁকে অন্য পথে আত্মপ্রকাশ করতে দেওয়া! তাই এখান থেকে সরে পড়ার উদ্দেশ্যে সে উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় নীচু গলায় সুহাসকে বলল, কাল বেরুবার সময় আমাকে ডেকে নিও।

রুণু চলে যেতেই জ্যেঠাইমা আর একটু এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল, নদান, তুই ওদের অত লেই দিস্ না। মাথায় চড়ে বসবে। আর ওর মা মাগীটাকেও বলিহারী যাই। মেয়েদের একটুও নজরে রাখে না। এত বড় মেয়ে রাত-বিরোতে ঘরে নেই, কোথায় গেল দেখ্। আজ না হয় ভায়ের সঙ্গে গল্প করছে, তা করুক গে, কিন্তু কাল যে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে গল্প করবে না, সে কথা কে বলতে পারে?

জ্যেঠাইমার স্বরূপটি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল সুহাসের কাছে। সে মনে মনে বুঝল, জ্যেঠাইমাকে ঘাঁটিয়ে খুব সুবিধে হবে না। তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। তার চাইতে মান সম্মান বজায় থাকতে থাকতে এখানকার মায়া কাটানোই ভাল।

তাই সে জ্যেঠাইমার উদ্দেশ্যে বলল, আপনি শুতে চলে যান জ্যেঠাইমা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার নদানকে কেউ ভাঙ্গিয়ে নিতে পারবে না। যতই হোক আপনি আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন তো?

অন্ধকারে দেখা না গেলেও বোঝা গেল, জ্যেঠাইমা ফোকলা দাঁতে এক গাল হেসে নিলেন।

তারপর 'ছোট'র নাম করে আদ্য শ্রাদ্ধের মন্তর আওড়াতে সুরু করতেই সুহাস বলে উঠল, দেখুন জ্যেঠাইমা, এতদিন ধরে সহরের উকিলের মুহুরীগিরি করে এলুম আর মানুষ চিনতে পারবো না! আপনি যান, নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। আমার চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

আহ্লাদে গদ গদ হয়ে জ্যেঠাইমা বললেন, আমি শুয়ে পড়ছি বটে, কিন্তু যাবার আগে বলে যাই, 'ছোট'র থেকে সব সময়ে দূরে থাকবি। ও তোর বাবাকে যে কত কষ্ট দিয়েছে, কাল তোকে সব বলবো।

বলে, রাতের মত রেহাই দিয়ে তিনি ঘরে ঢুকে পড়লেন।

আবার অন্ধকারের বুকে সুহাসের চলল স্মৃতির রোমন্থন। জ্যেঠাইমা মনস্তত্ব বোঝেন। তাই বাবার দোহাই দিয়ে শেষ দাওয়াই চাপিয়ে গেলেন সুহাসের মনে। সুহাস জানে সব, প্রত্যক্ষ করেছিল অনেক কিছু। তাই সে মনের দুঃখে ও পরিবেশের যন্ত্রণায় নিজের অধিকারটুকুও ছেড়ে চলে গেল।

আজ সে বুঝল, তাকে এ বাড়ীর থেকে সরাবার মূলে ছিল জ্যেঠাইমার গোপন হস্ত। বাবার মৃত্যুর সময়েও অনেক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে ফেলে আজ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে দোষমুক্ত করতে চান ও সুহাসের মনকে কাকীমার ওপর বিরূপ করে তুলতে চান।

[ক্রমশঃ]

বরেণ্য বিস্মৃতি

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

অতীতের স্মৃতি, মধুময় প্রীতি
কেন নিতি নিতি চাই গো!
গাঢ় মমতার কুলায় আমার
চিহ্ন তাহার নাই গো!
ব্যর্থ আশায় আর নাহি চাই ঝুল্‌তে,
সুখ পেতে এবে সব কিছু চাই ভুল্‌তে,
চাহিব না আর মনের কথাটি খুল্‌তে,
প্রাণের দোসর কোথা আমি আর পাই গো!

২

যখন ছাড়িয়া এসেছি চলিয়া,
ফল তার পাবো এই তো!
কেন তবে আর করি হাহাকার,
সান্ত্বনা তাতে নেই তো!
অতীত ভুলিতে যাচিব অটুট্ ভ্রান্তি,
ভবিষ্য মাঝে খুঁজিব প্রাণের শান্তি,
বর্ত্তমানেতে দূরিব মনের ক্লান্তি;
যাবার পূর্ব্বে দিতে যাহা পারি, দেই তো!

৩

যেথা যবে থাকি সে-ই তো স্বর্গ,
তারে বেশী ভালো বাসবো!
নেহারি' গগন রহিয়া মগন
মনে অনুখন হাসবো।
বিশ্বপ্রকৃতি স্থান ভেদে নহে ভিন্ন,
জীবজগতের কেহ নহে কভু ঘৃণ্য,
পাপাখ্যাগুলি কবে হবে নিশ্চিহ্ন?
ধ্বংস দেখিতে ফিরে-ফিরে আমি আসবো!

৪

ধর্ম্মের দোষে মারা গেছে যারা
তারা প্রত্যহ রাত্রে
ঘুমের মাঝারে দেখায় আমারে
আঘাতের ক্ষত গাত্রে।
কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া শোনান্ কান্না,
অঙ্গ উরজ দেখাতে তবুও চান না!
ধর্ষিতা হয়ে সমাজেতে মান পান না!
পড়িবে না তারা হিন্দুর সৎপাত্রে!

৫

নির্দ্দোষীদেরে যারা বধ করে,
তাহারা সহজ নয় রে!
ইতিহাস সেই বার্ত্তা রটাতে
আজো সোচ্চারে কয় রে!
রজব্ আলি আনে গজব্ কাহার্ জন্য?
মোহাম্মদী বেগ কারে বধি' হয় ধন্য?—
বিস্মৃতি চাই, চাহি না কিছুই অন্য!
এত অনুভূতি প্রাণে আর নাহি সয় রে!

———

উজ্জয়িনীতে "প্রাচ্যবাণীর" সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

"উজ্জয়িনী"! পণ্ডিতবর্গ ও কবিকুলের কত আদরণীয় এই নামটি – কত ঐতিহ্যবিমণ্ডিত, কত অসীম সৌন্দর্য—মাধুর্য—ঐশ্বর্য—বিলসিত! ভারতবর্ষ, তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণমনস্বরূপ মহাকবি কালিদাসের পুণ্যস্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত এই ধন্য নগরীতে যাইয়া স্বয়ং ধন্য হইবার স্বপ্ন কে না দেখিয়াছে সানন্দে? আমাদেরও ত সেই একই স্বপ্ন ছিল আজীবন। কিন্তু কে জানিত যে ঈশ্বর-কৃপায়, তাহা বাস্তবে পরিণত হইবে এরূপ অকস্মাৎভাবে, এরূপ সগৌরবে?

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর মহাস্বপ্নের বৃত্তান্তও আজ কাহারও অবিদিত নাই। তিনি নিজে ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত ও মহাগবেষক। শতাধিক শ্রেষ্ঠ গবেষণাগ্রন্থের রচয়িতৃরূপে তিনি দেশবিদেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু, যাঁহারা সত্যই ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাঁহারা নিজেদের লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁহারা সর্বদাই ইচ্ছা করেন অপরের কল্যাণ ও উন্নতি। সেজন্য ডঃ যতীন্দ্রবিমল ও যে মধু তিনি আহরণ করিয়াছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত মধুকোষ হইতে, সেই মধুই জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করিয়া দিবার জন্য আজীবন প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার সুবিখ্যাত গবেষণাগার "প্রাচ্যবাণী" প্রতিষ্ঠা, সেইজন্যই তাঁহার অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ত্রিশটি অতি সুন্দর আধুনিক সংস্কৃত নাটক ও দ্বিসহস্রাধিক অতি মধুর সংস্কৃত সঙ্গীত ও কবিতা রচনা, সেইজন্যই তাঁহার ভারতের সর্বত্র ও বাহিরেও সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ব্যবস্থা। তাঁহার আকস্মিক ও অকাল মহাপ্রয়াণের পর, তাঁহার দ্বিতীয় জীবন, সমানধর্মা, প্রকৃত সহধর্মিণী, কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত "লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের" সর্বজনপ্রিয় অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী, তাঁহার পতি-দেবতার এই অসমাপ্ত কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এবং অতি সুষ্ঠু শোভনরূপে সেই মহাদায়িত্ব পালন করিয়া সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

"উজ্জয়িনীতে" সংস্কৃত নাটকাভিনয় করিবার ইচ্ছা ডঃ যতীন্দ্রবিমলের ছিল চিরকাল। কিন্তু, অনিবার্য কারণবশতঃ তাঁহা তিনি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্যই, বিশেষ করিয়া যখন সংস্কৃত কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী মহোদয়ের সস্নেহ সাহায্যে আমাদের উজ্জয়িনীর "সর্বভারতীয় কালিদাস-সমারোহে" সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সুব্যবস্থা হইল অকস্মাৎ, তখন ডঃ যতীন্দ্রবিমলের কথা প্রথমেই স্মরণ করিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল!

উজ্জয়িনীর এই "সর্বভারতীয়-কালিদাস-সমারোহ" বিশ্ববিশ্রুত। প্রতি বৎসরই নভেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় এই মহোৎসবটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহকাল ধরিয়া; এবং দেশ-বিদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ ইহাতে সাগ্রহে যোগদান করেন। এই মনোরম অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে মহাকবি কালিদাসের জীবনী ও কাব্যের সর্বদিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অমর নাটকগুলির অভিনয়ের বিশেষ ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে প্রতি বৎসর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নাট্যদল এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। সেজন্য আধুনিক সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের স্থান এই সমারোহে প্রায় নাই বলিলেও চলে।

তথাপি পরমকর্মকুশলা ডঃ রমা চৌধুরী তাঁহার স্বভাবসুলভ দূরদৃষ্টি-সহকারে প্রস্তাব করিলেন যে, এইবার তিনি মহাকবি কালিদাসের পুণ্য জীবনী-মূলক একটি স্বরচিত সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিবেন। "কালিদাস-সমারোহের" প্রাজ্ঞ কর্তৃপক্ষগণ এই সুষ্ঠু প্রস্তাবটি সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তখন আমাদের হাতে দুসপ্তাহ সময়ও

নাই; কারণ, তখন আমরা সবেমাত্র আমাদের পূজাবকাশের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক সফর হইতে ফিরিয়াছি, দেওঘর-কাণপুর-লক্ষ্ণৌ-দিল্লী-বারাণসীতে ডঃ রমা বিরচিত দশটি সংস্কৃত নাটকের সগৌরব অভিনয় করিয়া। তাহা সত্ত্বেও অক্লান্তকর্মী ডঃ রমা মাত্র ২।৩ দিনের মধ্যেই শ্রীকালিদাসের পুণ্য জীবনীমূলক একটি অভিনব, অতি সুন্দর, বৃহৎ সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন পরম কৃতিত্বের সহিত, আশ্চর্য তৎপরতার সহিত, অদ্ভুত, দূরদৃষ্টির সহিত; এবং তাহার নামটিও রাখিলেন মনোহর ও উপযুক্তভাবে-"কবি-কুল-কোকিলম্।"

এই অভিনব সংস্কৃত নাটকটি সত্যই বহুদিক হইতেই অভিনব। প্রথমতঃ; ইহার অপূর্ব, ললিত কোমল, সহজ-সরল, কবিত্বময়ী ভাষা। অবশ্য ডঃ রমার রচনা ও ভাষণের স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্নমধুর ছন্দোময়ী ভাষার সহিত সকলেই পরিচিত। তথাপি, মহাকবি কালিদাসের আশীর্বাদ ফলেই হয়ত, অত্যল্প সময়ের মধ্যে রচিত হইলেও, এই সংস্কৃত নাটকটির ভাষার সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য যেন ডঃ রমার পূর্ব পূর্ব রচনা সমূহকে অতিক্রম করিয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে বালক কালিদাসকে একটি নূতন ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। সাধারণের ধারণা এই যে, মহাকবি কালিদাস বাল্যকালে একজন অতি দুষ্ট, মূর্খ, দুর্দান্ত, "বয়ে যাওয়া ছেলেই" মাত্র ছিলেন; পরে হঠাৎ সরস্বতীর আশীর্বাদে ভালো হইয়া গেলেন। কিন্তু, ডঃ রমার চিত্রণে তিনি খানিকটা বালক রবীন্দ্রনাথের ন্যায়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অর্থাৎ, পাঠশালায় আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষিত না হইলেও, তিনি ছিলেন আজন্ম প্রকৃতি-জননীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত; এবং তজ্জন্য ব্যবহারিক-ব্যবসায়িক দিক হইতে অজ্ঞ হইলেও, তিনি সত্যই গণ্ডমূর্খ ও দুষ্টপ্রকৃতির ছিলেন না। এই দুইটি দিক হইতেই ডঃ রমার অভিনব নাটকটি পণ্ডিতবর্গের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

তাহার পর অভিনয়ের কথা। ডঃ রমা যদি মাত্র ২।৩ দিনেই এরূপ একটী অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তান আমরা কেনই বা মাত্র ৬।৭ দিনেই তাহা রপ্ত করিয়া ফেলিতে পারিব না? সত্যই, তাহাই করিতে হইল আমাদের, যেহেতু হাতে ত আর একটি দিনও সময় ছিল না। তদুপরি আমাদের যাত্রারম্ভের মাত্র পূর্বদিন আমাদের গায়কপ্রবর শ্রীপূর্ণেন্দু রায় আমাদের জানাইলেন যে, অনিবার্য-পারিবারিক কারণবশতঃ তিনি আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না কিছুতেই। তখন আর অন্য কোন গায়ক সংগ্রহ করার সময়ও নাই। কেবল আমাদের পরমাদরের গায়কপ্রবর শ্রীহিমন্ম রায় চৌধুরী মাত্র এব ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটী গান তৎক্ষণাৎ বসিয়া সানুগ্রহে টেপ-রেকর্ড করিয়া দিলেন বহু কষ্ট করিয়া। সেই ভরসা করিয়া, আমরা পঁচিশ জনের এক বিশাল দল যাত্রা করিলাম ১৩ নভেম্বর, ১৯৬৭ উজ্জয়িনীর উদ্দেশে সশঙ্কচিত্তে, মাতৃসমা ডঃ রমার সস্নেহ তত্ত্বাবধানে।

অতি সুদীর্ঘ দুর্গম পথ, তদুপরি রিজার্ভেসন-শূন্য তথাপি হাস্য-কৌতুকে, নানাবিধ দার্শনিক আলাপ আলোচনায় সেই সুদীর্ঘ, কষ্টসাধ্য পথও কাটিয়া গে স্বপ্নেরই মত। উজ্জয়িনীতে আমরা পৌঁছিলাম ১৫ নভেম্বর, ১৯৬৭। অত্যধিক সম্মান-সমাদর, স্নেহ-প্রী সহকারে সকলে আমাদের গ্রহণ এবং আমাদের জ সর্বদিক হইতেই অতি সুন্দর ব্যবস্থাদি করিলেন।

আমাদের 'কবি-কুল-কোকিলম্' সংস্কৃত নাটক উজ্জয়িনীতে মঞ্চস্থ করা হয় ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৭ র ১০টা হইতে ১টা পর্যন্ত উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ বি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধব মহাবিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গ এই মহতী সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না, এবং অন্ত তিন হাজার জ্ঞানিগুণিজন, অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী প্রভৃতি পূর্ণ তিনঘণ্টা কাল বসিয়া আমাদের অভিন রস আস্বাদন করিয়া আমাদের পরম কৃতার্থ করিলে পূর্বদিন ছাত্রগণ এরূপ অভিনয়-সভায় বহু গোলমাল বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেজন্য আমরাও বি ভয়ে ভয়েই ছিলাম কি ঘটে ভাবিয়া। কিন্তু ঈশ্বর কৃ আমাদের অভিনয় প্রথম মুহূর্ত হইতেই খুব জ উঠিল, এবং একজনও বিন্দুমাত্র গোলমাল ত করিে না, উপরন্তু, পূর্ণ তিনঘণ্টা ধরিয়া অত শীতের র প্রত্যেকেই বসিয়া সমস্ত অভিনয়টি দর্শন করিলেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। এরূপ উচ্চ-প্রশংসা ভ কচিৎ কদাচিৎ লাভ করিয়াছি। আমাদের মনে হয়

ইহার একটি প্রধান কারণ হইল, এই নাটকটির অতি সহজ-সরল অথচ ললিত-মধুর গীতময় ভাষা। এইজন্য, ঐরূপ মহতী সভার কাহারও নাটকটির অর্থ ও রস গ্রহণে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হইল না। এতদ্ব্যতীত, অভিনয়, টেপ-রেকর্ড করা সঙ্গীত ও শ্যাডো-লাইট্‌স্‌ও অতি সুন্দর হইয়াছিল ঈশ্বর কৃপায়। সব মিলিয়া একটি অতি উপভোগ্য অনুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া সকলেই সমস্বরে মত প্রকাশ করিলেন; এবং কেবল তাহাই নহে, উজ্জয়িনীতে এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুষ্ঠান পূর্বে অতি অল্পই হইয়াছে বলিয়াও সানুগ্রহে উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে সকলে বলিলেন। ইহাতে আমরা পরম ধন্য বোধ করিলাম।

অভিনয় শেষ হইল প্রায় রাত দুটায়। তখন বেহারের চীফ সেক্রেটারী মহোদয় শ্রীসুনি উপস্থিত সকলের পক্ষ হইতে "প্রাচাবাণী সংস্কৃত-পালি-নাট্যসঙ্ঘের" অভিনেতৃ-বর্গকে হার্দিক ধন্যবাদ ও সাধুবাদ প্রদান করেন। তখনও সেই প্রচণ্ড শীতের রাত্রেও সুবিশাল দর্শকমণ্ডলীর সকলেই সানুগ্রহে উপস্থিত থাকিয়া করতালি সহযোগে ও জয়-ধ্বনিপূর্বক আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইলেন। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের! শ্রীসুনিও আমাদের অভিনয় ও উচ্চারণের জন্য উচ্চ প্রশংসাপূর্বক, আবেগভরে বলিলেন যে, এই অপরূপ সুন্দর সংস্কৃত নাটকে বালক কালিদাসকে যেরূপ অভিনবরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা চিরকাল গবেষকগণের নূতন গবেষণার বিষয়রূপে বিরাজ করিবে, নিঃসন্দেহ। কারণ, একজন সম্পূর্ণ মূর্খ দুষ্ট দুর্দান্ত জন যে হঠাৎ দেবদেবীর আশীর্বাদে ভালো হইয়া গেলেন, জ্ঞানি-গুণিজন হইয়া গেলেন,—এরূপ দৈবঘটনায় বিশ্বাসী আধুনিক যুগে কেহই নাই। বরং এই সুন্দর নাটকটিতে যেরূপ প্রাণস্পর্শী ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, সেরূপই ছিল প্রকৃত ঘটনা। অর্থাৎ, বালক কালিদাস প্রকৃতি জননীর পাঠশালার একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে শৈশবেই কবি-জনোচিত প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী ছিলেন—পরে তাহারই বিকাশ দেখা যায়। এই প্রজ্ঞাপ্রসূত কথায় আমরা সকলেই পরম উদ্বুদ্ধ হইলাম।

সত্যই, সর্বদিক হইতেই এরূপ আনন্দজনক, উৎসাহ-জনক, মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান আমরাও আর অল্পই করিতে পারিয়াছি। এরূপ একটি সর্বশ্রেষ্ঠ, সুপ্রসিদ্ধ সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে, এরূপ একটি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-ভক্ত-জ্ঞানি-গুণিজন-পূর্ণ সভায় যে আমরা সকলের এরূপ নিবিড় সম্মান-সমাদর, এরূপ প্রগাঢ় স্নেহ ভালবাসা, এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-সাধুবাদ এরূপ অকুণ্ঠ আশীর্বাদ-শুভেচ্ছা লাভ করিব, তাহা আমাদের আশার অতীত ছিল। বিশেষ করিয়া যে অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছুই প্রস্তুত করিয়া আসিতে আমাদের হইল, তাহাতে আমাদের অনুষ্ঠানের এরূপ অভূতপূর্ব সাফল্য সত্যই শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপার এবং তাঁহারই শ্রেষ্ঠ সন্তান ডঃ যতীন্দ্রবিমলের সস্নেহ আশীর্বাদেরই ফল!

অভিনয় শেষে আমাদের একদল সুবিখ্যাত খাজুরাহ-মন্দির দেখিবার জন্য এবং অন্যদল গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্বে সর্বভারতীয়-কালিদাস-সমারোহের শ্রদ্ধেয় কর্তৃপক্ষবৃন্দ বহু আদর আপ্যায়ন করিলেন; উজ্জয়িনীর সমস্ত দর্শনীয় স্থান নিজেরা সানুগ্রহে সঙ্গে থাকিয়া মোটরযোগে আমাদের ঘুরিয়া দেখাইলেন। সত্যই, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের স্থাপিত হইল অবিচ্ছেদ্য প্রাণের সম্পর্ক। কি সৌভাগ্যবান্‌ আমরা! কি অনন্ত করুণা ঈশ্বরের!

কিন্তু আরও সৌভাগ্য ছিল আমাদের অদৃষ্টে, আরও ঈশ্বর-করুণা! কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াই আমরা সমস্ত সংবাদপত্র মারফৎ সংবাদ পাইলাম যে, আমাদের অভিনীত "কবি কুল-কোকিলম্‌" সর্বভারতীয়-কালিদাস-সমারোহের শ্রদ্ধেয় বিচারকমণ্ডলীর সর্ববাদিসম্মত বিচারানুসারে প্রথম পুরস্কার স্বরূপ "স্বর্ণকলস" প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ একটি শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পুনরায় বিভুচরণে অশেষ কৃতজ্ঞতাভরে প্রণত হইলাম। বাংলা দেশ পূর্বে এই সম্মান প্রাপ্ত হয়নি। সেজন্য, সর্বভারতীয়, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গালঙ্কৃত এরূপ একটী সুপ্রসিদ্ধ সমারোহে দীনহীনজন আমরাও যে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া বঙ্গজননীর সম্মানরক্ষা, তাঁহার সেবা করিতে যে এই ভাবে সমর্থ হইলাম, তজ্জন্য নিজেদের ধন্যাতিধন্য বলিয়া মনে করিলাম। সত্যই, আমরা অতি ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন। আমরা যে টুকু সাফল্য লাভ করিয়াছি, সে সবই শ্রীভগবানের অশেষ কৃপা, আমাদের প্রাণপ্রতিম ডঃ যতীন্দ্র-বিমলের সতত শুভাশীর্বাদ, এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়িগণের

নিরন্তর মঙ্গল কামনারই ফল মাত্র। ইহাতে আমাদের নিজেদের কৃতিত্ব, অথবা আত্মশ্লাঘার কিছুই নাই, সুনিশ্চিত।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী পণ্ডিত অনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সুনীল দাস, অনিন্দ্যসুন্দর চক্রবর্তী, অনিলকান্তি দত্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর রায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা রমা চক্রবর্তী, অলকা বসু, ভারতী দত্ত ও উর্মি চট্টোপাধ্যায়। সাজসজ্জা ও আলোক সম্পাতের ভার গ্রহণ করেন শ্রীদিলীপ ঘোষ ও শ্রীচিনু দাস।

"স্বর্ণকলস" প্রাপ্ত শিল্পিবৃন্দের সম্বর্দনার্থ একটী সুন্দর ভাবগর্ভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সানুগ্রহে পৌরোহিত্য করেন রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন রাজকীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ডঃ ননীলাল সেনগুপ্ত। সস্নেহ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীনরেন্দ্র দেব, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, কেশবচন্দ্র বসু, বঙ্গভাষা-প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ-সম্পাদক শ্রীজ্যোতিসচন্দ্র ঘোষ, সুবিখ্যাত জননেতা অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। তাঁহারা সকলেই এবং শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহোদয় যখন "কবি-কুল-কোকিলমে"র অংশ বিশেষের অভিনয় শুনিয়া একবাক্যে ডঃ রমাকে "কালিদাসের মানসী কন্যা" বলিয়া সাদরে অভিনন্দিত করিলেন, তখন আমরা সকলেই পরমানন্দিত হইলাম।

আমরা এই স্বর্ণকলস লাভের জন্য বহু সস্নেহ ও সানুগ্রহ অভিনন্দন পত্র পাইয়াছি; এবং তাঁহাদের সকলকেই আমাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। কেবল একটা অতিসুন্দর ও পরমোৎসাহব্যঞ্জক পত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছিনা। এইটি লিখিয়াছেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম, এ, পি, এইচ, ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সেনেটের সদস্য, জাতীয় সঙ্গীত নাটক একাদেমীর রত্ন-সদস্য।

"সুচরিতাসু,

গত বৃহস্পতিবার মহাজাতি সদনে আপনার বিরচিত সংস্কৃত নাটক "কবি-কুল-কোকিলম্"-এর অভিনয় দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। সংস্কৃত ভাষা যে এখনও ভারতবর্ষের একমাত্র সংযোগকারী (link) ভাষা হইতে পারে এই নাটকখানির অভিনয় দেখিয়া এই বিশ্বাস আমার দৃঢ়তর হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ এই কথাটি যদি বুঝিতে পারিতেন তবে আজ প্রদেশে প্রদেশে বহু বিবাদের অবসান হইত। সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের ভিতর দিয়া আপনি যে বিশ্বাসটি জাতির মনে জাগ্রত করিয়া দিবার নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য যে-কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তিই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আপনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, ইহাই কামনা করি।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিবেন। ইতি -

শুভানুধ্যায়ী—

স্বাঃ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য"

৭।১।৬৮

প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দরদী অধ্যাপকপ্রবরের এই সুচিন্তিত মতবাদ সর্বত্র গৃহীত হউক, জয়যুক্ত হউক ডঃ যতীন্দ্রবিমলের ও অধ্যক্ষা ডঃ রমার জীবন-সাধনা; সার্থক হউক "প্রাচ্যবাণীর" গীর্বাণ-বাণী-সেবা-প্রচেষ্টা—এই প্রার্থনা।

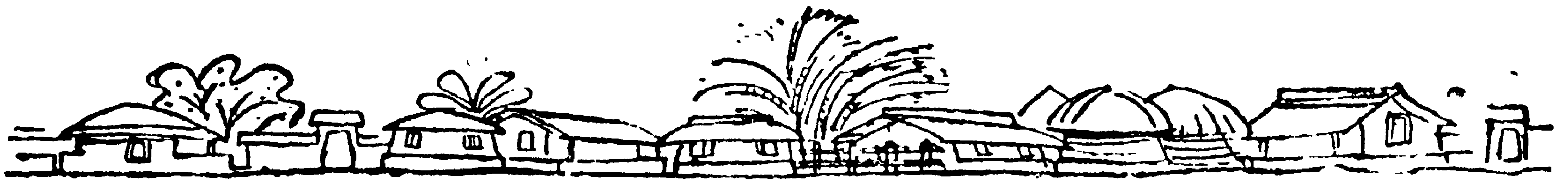

গল্প

কোন কুলবধূর কথা

সমীরণ রুদ্র

সেটা ছিল শ্রাবণ মাস, একটি নির্ঘুম বৃষ্টি পড়া রাত্রে ওরা দুজন পাশাপাশি দুটি পৃথক বিছানায় শুয়ে ছিল, অলোক ও অনীতা, স্বামী আর স্ত্রী। একই ঘরে শুয়েছিল এই অসুখী দম্পতি কিন্তু কেউই ঘুমোতে পারেনি। বাইরে অঝোর ধারে বৃষ্টি ঝরছিল। অনীতা ভাবছিল অলোকের ভেতরে স্বামী, বন্ধু ও সঙ্গী হবার মত সব গুণই তো ছিল তবু কেন অনীতা ওকে ভালবাসতে পারে নি? তবু কেন অনীতা হিম হয়ে যেত অলোকের ছোঁয়ায়, আর তার নিবিড় আলিঙ্গনে? এ কার দোষ? কেন অনীতা এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বিয়ের মাত্র দশ বছরের মধ্যেই? কেন সে নিজেকে ছুড়ে দিয়েছে এক স্থূল অন্য পুরুষের হাতে? কেন সেই অন্য পুরুষের কাছেই সে পুরোপুরি একজন নারী আর তার সন্তানের পিতা তার কাছে অসহ্য? কেন এমন হল? সেই নির্ঘুম রাতে সে তার মনের মধ্যে এক সন্ধানী আলো ফেলে ফেলে দেখছিল, কার দোষে এমনটি হল?

আর অলোক? অলোক কবি, সে গান রচনা করে, গান ভালবাসে। সে মনে মনে তখন রচনা করছিল

"বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে,
আমিও একাকী, তুমিও একাকী, আজি এ বাদল রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলন তিয়াসে ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে,
পল্লীর বঁধু বিরহী বঁধুরে মধুর মিলনে সম্ভাষে।"

কবি অলোক শুয়ে শুয়ে বৃষ্টি পড়া শুনছিল আর কবিতার ভাষায় ভাবছিল নিজের জীবনের কথা অথচ রজনী ছিল বাকী, ছিল কতো বন্দরের স্বপ্নভবিষ্যৎ, কিন্তু আজ মিথ্যা যেন সব, প্রতারণা নারীর শপথ···আলো আর আকাঙ্ক্ষার অজস্র প্রতিমা, রচেছিল স্বপ্ন কতো, তার কোনো সীমা, অন্ততঃ জানে নি নিঃস্ব হৃতরাজ্য যৌবনের আয়ু, এখন জড়তাগ্রস্ত একালের স্নায়ু।

ঘড়িতে ঢং করে রাত্রি একটা বাজল। তবু ঘুম নেই চোখে। অলোক অতীতের ঝাঁপিতে হাত দিল, যদিও স্মৃতি আজ বিবর্ণ, ধূসর, তবু তার মনে পড়ল সেদিন বিয়ের সময়কার সেই দোহারা চেহারার দীর্ঘকায় মেয়েটিকে, স্থিরে অস্থিরে যেন একটি নিষ্কলঙ্ক দীপশিখা, বিয়ের পর পাঁচটি বছর তাদের ভালই কেটেছে, ভালবাসার অগ্নিস্নানে, লাবণ্যের মধুর আবেশে। গর্জন নেই শুধুই তখন গুঞ্জরণ। এর মধ্যে তাদের ছেলে হল। নাম রাখল তার অজয়। তারপর একটি মেয়েও হল। নাম দিল অর্চনা। তারপরই ভালবাসার ঋতুবদল হল। এল প্রলয়ের ঝড়। একটি কটাক্ষেই তাদের সাম্রাজ্যের সর্বনাশ। মিলনের প্রথম দিনে যে সুরে বাঁশী বেজেছিল তা তার বাজল না। অনীতার মাদকতাময় রূপের মধ্যে যেন এক বাঘিনীর আত্মা এসে ভর করল। আঘাতে বেদনায় ও লজ্জায় অলোকের সব রুচি, শালীনতা আর শ্রী যেন বিকৃত হয়ে উঠল। চারিদিকে শুধু জ্বালা আর অবক্ষয়, সে আর সহ্য করতে পারছিল না। তার মন খুঁজছিল একটি প্রীতিময়ী নারীর হৃদয়, একটি অনুকূল মনের উৎসুক স্পর্শের প্রতীক্ষা। পেয়ে গেল সে শীলাকে। শীলা তার এক প্রতিবেশীর মেয়ে। এক রক্ষণশীল পরিবারের ভীরু মেয়ে সে। রাস্তায় বেরুবার অনুমতি যার মিলেছিল নেহাতই কলেজে পড়বার তাগিদে। এই কলেজে যাবার রাস্তাতেই অলোকের সঙ্গে শীলার আলাপ হল। অলোকের মনিহারী দোকানও এই রাস্তার উপরে। অলোক ঐ কলেজ থেকে একদিন গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। শীলাও এখন সেই কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে চলেছে। একদিন কেমন করে যেন আলাপ হল দুজনের, কি ছিল

বিধাতার মনে। তারপর "হেরি হেরি না পূরল আশা।" তারপর গঙ্গা নদী দিয়ে কত জল বয়ে গেল। সেই পথ দিয়ে কত মানুষের ভিড়। ওরা দুজন আরো কাছে এল। দেখল কত সিনেমা, কত থিয়েটার, বসে বসে হাওয়া খেল কতদিন গড়ের মাঠে, ভাল মন্দ খাদ্য খেল কত রেঁস্তোরায় ও হোটেলে বসে।

এম্নি এক হোটেলে অলোক শীলার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে বললে জান, দূরে মদিরা, কিন্তু কাছেই খাদ্য। আর খাদ্য ছাড়া প্রাণ বাঁচেনা। তুমি মনোহারিণী, দূরেও, কাছেও। আমাদের জীবনে কখনও কখনও এক রক্তিম আশ্চর্য সামান্যের ছদ্মবেশ পরে দেখা দেয়। তুমি সেই আশ্চর্য, অসামান্য নারী সামান্যের ছদ্মবেশে আমাকে ধরা দিয়েছ। আমার ক্ষণিকের মুঠিতেই শাশ্বত বাঁধা পড়েছে। তাই ভাবি এক একটা মন কি সুন্দর সোনামাখা, আর এক একটা মন যেন একতাল সীসে। অনীতার মন হচ্ছে সেই সীসে।" কুরঙ্গী যেমন করে বাঁশী শোনে তেমনি করে শুনেছে শীলা, হেসে বলেছে "তুমি পাশে থাকলে ঝড়ের রাতে মাঝি মাল্লাহীন ডিঙিতে আমি ভেসে পড়তে পারি সমুদ্রে। আর তুমি যদি দূরে থাক তাহলে চিরন্তন রাত্রি আমি শবরীর মত জেগেই কাটাই। জান, আমি সেই পৌরাণিক যুগের শ্রীরাধা। তোমার জন্যে ছিঁড়েছি আমি বুকের শিরা। তোমারই জন্যে ছিঁড়তে বসেছি বত্রিশ নাড়ীর পাক। চলো, তুমি কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আমি যাবো।" শীলা তাই করেছিল। অলোককে সুখী করার জন্যে সে তার নিজের ঘর ছেড়ে এসেছিল। অলোককে নিয়ে সে নতুন বাসা বেঁধেছিল। একটা অফিসে ষ্টেনো টাইপিষ্টের চাকুরীও সে যোগাড় করেছিল। অলোক কিন্তু অতটা পারে নি, তার নিজের বাড়ী সে ছাড়েনি। ছাড়েনি তার নিজের ছেলে মেয়ের প্রতি কর্তব্য। সংসারে যেমন খরচ খরচা সে আগে যোগাত তেমনি যুগিয়ে যাচ্ছিল। শুধু অনীতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক বা কথাবার্তা ছিল না। যত কথা তার তা ছিল সুধু শীলার সঙ্গেই। শীলা ছিল যেন তার আত্মার শিখা। অনীতাও ঘুমোতে পারছিল না। স্মৃতির পাতা সেও ওলটাচ্ছিল, যখন তার বয়স তেরো কি চোদ্দ, চোখের সামনে পৃথিবীটাকে যখন আরব্য উপন্যাসের মত মনে হত, তখন থেকেই তার ভাব শিশিরের সঙ্গে। শিশির তার পর নয়, সম্পর্কে কিরকম দাদা হয়। তার মাকে বা বাবাকে বলে শিশিরের সঙ্গে সে প্রায়ই বেড়াতে যেত চিড়িয়াখানায়, যাদুঘরে, লেকে। মধুরের অঞ্জন যদি একবার চোখে লাগে তখন সবই মধুময়।

ক্রমে ক্রমে সব কথা মানে ওদের ভালবাসার কথা—জানতে পারা গেল। প্রথমে প্রচ্ছন্নে রোপণ হয়েছিল, দ্বিতীয়ে গভীরে সঞ্চার, তৃতীয়তে অঙ্কুর। তারপরে যখন পল্লব জেগেছে তখনই কথা পল্লবিত হতে সুরু করেছে। কিন্তু তখন শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। অলোকের সঙ্গে এই সময়েতেই অনীতার বাবা ও মা তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর পাঁচবছর সে ভালই ছিল। শিশিরকে ভুলেই গেছল। কিন্তু হঠাৎ সেই গৌরবর্ণ, কান্তিমান পুরুষ আবার এসে উদয় হল তার জীবনে। তখনো শিশির বিয়ে করেনি। একদিন শহর ছাড়িয়ে নির্জন পথে চলতে চলতে অনীতা বললে শিশিরকে "শিশিরদা, তুমি কি চিরকুমারই থাকবে আইবুড়ো কার্ত্তিক হয়ে?" শিশির উত্তরে হেসে বললে "কার্ত্তিক চিরকুমার, তেমনি ভালবাসাও চিরনতুন। ভালবাসার বয়স নেই। ভালবাসা হল স্পর্শমণি। সে সবকিছুকেই সোনা করে।"

বেলাশেষের রঙিন আলোয় পাখির কাকলি-মুখর শ্যামল ঘাসের ওপর চলতে চলতে অনীতা বললে শিশিরদা, তুমি আমাকে আজো টানছো যেমন করে টানে দূর আকাশের উজ্জল নক্ষত্রলোক এই ছোট্ট মাটির পৃথিবীটাকে। শিশিরদা তুমি আমাকে নিয়ে চলো কোনো পাড়া পল্লীতে নয়, একেবারে লোকালয়ের বাইরে, অনেক—অনেক দূরে।"

হাসল শিশির, বলল "মানচিত্রে যে জায়গা আঁকা নেই সেই জায়গায়, কেমন? কিন্তু তুমি তো সেই পুরনো কথাই বলছ।" অনীতা বললে "কিন্তু পুরনোই ফিরে ফিরে আসে নতুন হয়ে। এখন সময় সময় ভাবি কেন কলঙ্কের কুলো তখন সাহস করে নিতে পারলাম না মাথায় আমার তোমার জন্যে?"

শিশির বললে "তুমি কি অলোককে ভালবাস না?"

অনীতা বললে "ভালবাসা কি কেউ বাসে? ভালবাসা

আপনি আসে। আর বিয়ে হল বাঁধন। বিয়ে মানে ভালবাসার অপমৃত্যু।"

এই সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো বাজল। হঠাৎ কি ভেবে অনীতার চোখে জল এল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অলোকের বিশ্রী লাগে এই কান্না। সইতে পারে না। সে নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে এল। অনীতার বিছানার ওপরে বসে ওর গায়ে হাত দিয়ে সে নাড়া দিল, বলল "এই, কাঁদছ কেন?" অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে শুধুই কাঁদতে লাগল, অলোক অনেক দিন পরে আজ আবার ওর পাশে ঘন হয়ে শুয়ে পড়ল, অনীতা অলোককে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে ওর ঠোঁটে চুমা খেল, মনে হল যেন দীর্ঘ পাঁচ বছরের ও শোধ তুলছে। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে নরম চাঁদের আলো। অনীতা সেই আলোয় অলোকের বুকের মধ্যে বন্দিনী হয়ে খুশিতে টলটলে চোখে হাসছিল, আর বলছিল উপস্থিততমই পরিপূর্ণতম, কেমন ঠিক বলেছি না? যা সত্য তাই উজ্জ্বল, তাই সুন্দর, তাই পবিত্র। আর তাইতেই অনন্তের স্পর্শ। দুর্গমের দুর্গ জয় করবো এই ছিল আমার বাসনা, আমি আজ বিজয়িনী।"

অলোক বললে "রাজেন্দ্রাণী হয়ে তুমি আমার সংসারে বিরাজ করবে তোমার দেহে মনে সেই প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতিই আমি দেখেছিলাম। তারপর আকাশ অন্ধকার করে কেমন যেন ঝড় উঠেছিল, তরী তীরে আসবার আগেই ডুবে যাচ্ছিল পূর্ণঘটের ঘাটে। কিন্তু আমি আশা হারাই নি। আমি জানতাম জীবনে অনেক অশান্তি, অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু সেটাই জীবনের শেষ কথা নয়। পথের বাধা তো থাকবেই কিন্তু সেই বাধার অপর প্রান্তে রয়েছে যে অনন্ত শান্তি।"

অনীতা বললে "এ কথা কি সত্যি যে শিশিরদা শীলাকে বিয়ে করছে এই শ্রাবণের আটাশ তারিখে রেজিষ্ট্রি করে?"

অলোক বললে "হাঁা, একথা সত্যি।"

অনীতা মধুর হেসে বললে "যাক্, আমাদের জীবনের অকল্যাণ ও অভিশাপ আর ধূমকেতু তাহলে এবার সরে গেল।" ওর মধু-ঝরা কথাতে অনেকগুলি সোনার বাটিতে রূপোর কাঠির আঘাতে যেন বেজে উঠল জলতরঙ্গ, অলোকের মনে হল ওদের জীবনের আকাশে জাগল বুঝি রামধনু। বাইরে তখন অন্ধকার আস্তে আস্তে আবছা হয়ে আসছে। সবুজ হয়ে জাগছে ভোর, অনীতার মনে হচ্ছিল প্রথমে সবুজ তারপর আস্তে আস্তে সোনা, তারপর হীরে, এ না জানি কেমন আলো!

ওদের ঘরের জানালার পাশে একটুকরো বাগান, জানালা দিয়ে দেখা গেল একত্র সংযুক্ত হয়ে দুটি পাখি এক বৃক্ষশাখায় কেমন বসে আছে। বসে আছে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে, সবুজ হয়ে, গায়ে গা লাগিয়ে। অবশ্য অলোক ও অনীতাও তাই বসেছিল গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে।

"তুমি আমার চিরকালের ইন্দ্রজাল, তোমার সঙ্গে আমার জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?"

এই কথা বলে কালো নিঝুম চোখে অলোকের দিকে তাকিয়ে রইল অনীতা, অলোক হেসে বলল "কি কথা বলো।"

অনীতা বলল "বিগতকালের সকল কিছু আজ চোখের সামনে দেখছি খুলে খসে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। যেমন শুচিতা, শুদ্ধতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা এইসব। একটা প্রচণ্ড কোলাহল এবং কলহ আধুনিক জীবনকে দিবারাত্রি অসহ্য জর্জরতায় জর্জরিত ক'রে রেখেছে। এ শুধু আমাদের বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে এই ছবি। মানুষ আজ নিঃস্ব রিক্ত ও সর্বস্বান্ত। বিবাহ আজ ভালবাসা হীন চুক্তি সর্বস্ব মাত্র। এ থেকে বাঁচবার কি কোন উপায় বা পথ নেই?" অলোক অনীতার ডাগর দীঘল চোখের দিকে চেয়ে বলল "তুমি ঠিকই বলেছ এ যুগ অশান্ত, ক্ষুব্ধ, উত্তপ্ত, ভোগ-স্পৃহার মাথা ভারী কিন্তু তবু বলবো মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ মানুষ শুধু দেহে বাঁচে না, মানুষ বাঁচে মনে। চিত্তলোকে সে অহরহ সততার অভিমুখে, সত্যের মুখে চলমান। সে চলা পুরুষ পুরুষানুক্রমে। সত্যের, সততার সংজ্ঞা নিয়ে যুগে যুগে বিরোধ হয়, পরিবর্তন হয়, কিন্তু ঐ মূল সুর অর্থাৎ মানুষের চিত্তের বা মনের সত্য অভিমুখিনতার কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু বাঁচা নয়, মানুষ সৎ হয়ে বাঁচতে চায়, শুদ্ধ হয়ে বাঁচতে চায়।" আঁচল ভরা হাসির জুঁই ছড়িয়ে দিয়ে অনীতা এবার উঠে চলে গেল সংসারের কাজে অর্থাৎ রাজেন্দ্রাণী হয়ে নিজের সংসারে বিরাজ করতে।

বিশ্ব বেষ্টন

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিউ অর্লিন্সকে বলা হয় 'America's most interesting city'. প্রাচীন কালের বিদিশার মত—

যেই যায় বিদিশায়
মনোমত নিধি পায়।

আজ যদি কেউ নিউ অরলিনসে আনন্দের উৎসের সন্ধান চান তো চলে যান সন্ধ্যার ঝোঁকে ফ্রেঞ্চকোয়াটারের ভিয়েক্স কেয়ারীতে (Vieux Carre), দেখবেন কত উর্বশী, মেনকা, ঘৃতাচী, রম্ভা সুরসভা থেকে নেমে ভূতলে এসে নিরাবরণা-নিরাভরণা অঙ্গের সামান্যতম আবরণটুকুও উন্মোচন ক'রে নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে সুর ও ছন্দের দোলায় সীধুপানরত অমৃতের পুত্রদের অমিত আনন্দ দান করছেন। স্তিমিত রঙিন আলোয় উদ্ভাসিত ইন্দ্রসভায় সুরাপানরত দেবগণের সামনে যেন সুন্দরী সুরাঙ্গণাদের স্বর্গীয় নৃত্য। পথ হেঁটে ধীরে ধীরে গেলে কোথাও বা আবহ সঙ্গীত, কখন বা কণ্ঠ সংগীতের সঙ্গে বিভিন্ন রঙের কেন্দ্রীভূত আলোকসম্পাতে উদ্ভিন্ন যৌবনা নৃত্যপটীয়সী বিবসনা বারলনাদের নৃত্য পানশালায় দেখা যাবে। ওরই পাশে প্রাচীন গির্জা—সেণ্ট লুই ক্যাথিড্রল। পাপ ও পুণ্যক্ষেত্রের যেন এক সমান্তরাল গতির মহাসমারোহ। গির্জায় পাদরীর কাছে পাপ স্বীকার করলেই মুক্তি।

ব্যবসা করতে চান? চ'লে যান তুলোর ফাটকা বাজারে। বিরাট অঞ্চল নিয়ে নতুন বাড়ীর সমাহারে Real Estate গ'ড়ে উঠেছে, তাতেও লেগে যেতে পারেন। খেলাধূলা করতে চান তো হ্রদ বা খাসের ধারে মাছ ধরতে, শিকার করতে, নৌকা চালাতে, বান্ধবীকে নিয়ে জলকেলি করতে, ডুব সাঁতার দিতে, বাইচ খেলতে চ'লে যান। যান উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গল্ফ খেলতে, টেনিস, ভলী ও বাস্কেট বল খেলতে; না হয় রাস্তা ধ'রে মোটরে ক'রে ঘুরে আসুন খানিকটা। এইখানেই পাবেন প্রাচীন ফরাসী ও স্পেনীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শেষ রেশ। এই ফ্রেঞ্চ কোয়াটারই ঐতিহাসিক কাহিনী বিমণ্ডিত অঞ্চল। ধর্মও যেখানে নষ্টামিও সেখানে; প্রেমও যেখানে নির্দয়তাও সেখানে। এই হ'ল চিরন্তন রীতি। তা সব মহানগরীর পক্ষেই প্রযোজ্য এবং বিশেষ ক'রে নিউ অরলিন্সের বেলায়ও।

নিউ অরলিনসেরই এক নিষ্কাম প্রেমের কাহিনী ও এক নৃশংস অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনীর কথাই বলব। একটী প্রেমের কাহিনী:—

এখানের এই প্রেমের কাহিনী মিলনাত্মক হয় নি। এটী হ'ল মহাকৃপণ জন ম্যাকডোনাগের কাহিনী। ম্যাগডোনগভিলে যখন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মারা গেলেন চিরকুমার জন ম্যাকডোনাগ তাঁর প্রচুর ধনরত্নের মধ্যে বেরুলো মেয়েদের পুরোনো এক নাচের চটী জুতো। এ কার চটীজুতো যার সোনালী আভা আজকালের প্রভাবে মলিন হ'য়ে গেছে? ভরত নিয়ে গিয়েছিল রামের পাদুকা সিংহাসনে বসাতে। বর্তমানের জন ম্যাকডোনাগ রেখেছিল এলিজাবেথের চটীজুতো হয়তো নিভৃত কক্ষে বক্ষে ধারণ করতে স্মৃতির অভিজ্ঞান স্বরূপ। অপরূপা সুন্দরী এলিজাবেথ জনসনের সঙ্গে জন ম্যাকডোনাগের পরিচয় হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে। দুজনের ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশার ফলে স্বভাবতই প্রেমের সঞ্চার হয়। বিবাহের প্রস্তাব যখন হয় তখন দু'তরফের পিতামাতারা ঘোরতর আপত্তি করেন। সে প্রেম মঞ্জরীতেই শুকিয়ে গেল। বর্তমান যুগের মত বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে নিজের ইচ্ছামত

মিলন না ঘটিয়ে চলে গেল এলিজাবেথ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজিকা হ'য়ে। আজীবন কুমারী থাকার ব্রত নিয়ে সেবা ধর্মে জীবন উৎসর্গ করল কুমারী এলিজাবেথ। ছেড়ে এল পিতামাতার স্নেহ মমতা, প্রীতি ও স্নেহের আকর্ষণ। এমনি ভাবে কাটিয়ে দিল তার আগামী চল্লিশ বছর। আজ বঞ্চিত ব্যক্তিগত প্রেম তার নৈর্ব্যক্তিক প্রেম ও প্রীতিতে পরিণত হ'ল। সে যখন ৩৫ বছর বাদে 'মাদার সুপিরিয়র' পদে উন্নীত, তাকে সম্বর্ধনা জানাতে নববর্ষে বহু জনসমাগম হয়। তার মধ্যে ছিলেন বৃদ্ধ জন ম্যাগডোনাগ। পঁয়ত্রিশ বছর ব্যবধানে এই আবার প্রথম দেখা। দুজনারই চোখে জল। জন আর মাত্র পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন চিরকুমার হ'য়ে। শিশুশিক্ষার জন্য যদি কিছু মূল্যবান কেউ ক'রে থাকেন নিউ অরলিনস ও বাল্টিমোরে তা হ'ল জন ম্যাকডোনাগ। তাঁর ধনের লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তির অর্ধেক তাঁর জন্মভূমি বাল্টিমোরে ও অপর অর্ধেক তাঁর কর্মভূমি নিউ অরলিনসের বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। ৩৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে আজও ১২টি চলছে। প্রতি বছর 'মে' দিবসে স্কুলের ছেলেরা লাফায়েৎ স্কোয়ারে তাঁর মর্মর মূর্তির সামনে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জমায়েত হয়। সত্তর বছরের বৃদ্ধ মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত দিনে আঠারো ঘণ্টা কাজ করে গেছেন। বিত্তশালী ব্যক্তিদের সামাজিক খ্যাতির মানদণ্ড ছিল কে কতজন ক্রীতদাস রেখেছে। তখনও ক্রীতদাস প্রথা চালু। ক্রীতদাসদের ওপর কি অমানুষিক অত্যাচার হ'ত তারও কাহিনী নিউ অরলিনসের 'ভূতের বাড়ীর কাহিনী'তে আমি বলব। জন কিন্তু তার ক্রীতদাসদের শনিবার অর্ধদিন ছুটী দিতেন। ব্যর্থ-প্রেমিকের হৃদয়ে যে মমতা ছিল তা ভূতের বাড়ীর নারীর হৃদয়ে ছিল না।

আমার মনে হয় হঠাৎ ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হওয়ায় সমগ্র আমেরিকাবাসীদের আত্মনির্ভর হ'তে হ'য়েছিল। তাই বাড়ীর মেয়েরা সব কাজ করে—পরের উপর নির্ভরশীল নয়।

'ভূতের বাড়ী' (Haunted House) :—

এ কাহিনী সভ্য জগতের লজ্জার কাহিনী, নির্দয়তার নিষ্ঠুর কাহিনী, নারী হৃদয়ের নিষ্করুণতার বেদনাদায়ক কাহিনী, ক্রীতদাস নির্যাতনের ঐতিহাসিক কাহিনী যা এব্রাহাম লিংকনকে সে প্রথা বিলুপ্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যে বাড়ীতে এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ঘটেছিল আজ সেখানে মানুষ যায় দেখতে মানুষের কালো নোংরা দিকের প্রতীকটাকে। মাদাম লীলরীর প্রাসাদে বহু ক্রীতদাস ক্রীতদাসী থাকতো। আগুন লেগে গেছে সেই প্রচুর বিত্ত, চিত্র ও সম্পত্তির আধারে। কে আগুন লাগালো? সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ রাঁধুনী নিগ্রো ক্রীতদাসী মেয়েটা। সে চেয়েছিল মাদাম লীলারীর যন্ত্রণা থেকে চির কালের জন্য মুক্তি পেতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে। সে বলেছিল 'আমি কিছু বলব না, আমার পায়ের রুধিরাক্ত শৃঙ্খলই বলবে কেন আমি একাজ করেছি।'

পথ লোকে লোকারণ্য। জানালার মধ্যে দিয়ে লেলিহান বহ্নিশিখা ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে। কালো ধুমায় ভরে গেছে অট্টালিকার প্রকোষ্ঠগুলো। পাড়ার ছেলেরা এসেছে বালতিতে জল ভ'রে নিয়ে আগুন নিভাতে। বহুলোক সাহায্য করার জন্য উদ্‌গ্রীব, যেন আগুন আশেপাশে, চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে। বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে এই বিরাট অট্টালিকা। অচঞ্চল মাদাম লীলারী, তিনি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনুগত ও কৃপাধন্য যুবকদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছিলেন কোন পথ দিয়ে দামী ছবি, মূল্যবান আসবাব, ব্রোঞ্জের মূর্তি, নানা ব্রোকেড নিয়ে বাইরে যেতে। ডঃ লীলরী ছিলেন পিছনে নীরব দর্শক হ'য়ে চির অনুগতের মত। প্রতিবেশী মশিয়ে মন্টুয়েল এখানে উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে ইনি এঁদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিলেন, এদের ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত ক'রে। তিনি প্রশ্ন করেন, যে ক্রীতদাসদাসীরা এই আগুনে নির্বিঘ্নে আছে কি না? লীলারী-দম্পতি উত্তর দেন 'নিজের চরকায় নিজে তেল দাও। প্রতিবেশীর ব্যাপারে নাক গলিও না।'

জজ কার্নেজী ও মিঃ ফার্নান্দেজ এতে আপত্তি জানান ও জোর ক'রে তাঁরা তিন তলায় গিয়ে দেখেন যে একটা ঘরে তালা বন্ধ। ডাঃ লীলরীকে দরজা খুলে দিতে বলেন। তিনি দরজা খুলতে আপত্তি জানান। এঁরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে প'ড়ে দেখেন শিকল দিয়ে বাঁধা ক্ষীণকায় ক্রীতদাসদাসীরা চিঁচিঁ করছে। পরের দিন

Labeille (The Bee) পত্রিকায় জেরোম বেয়ন (Jerome Bayon) এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, তা' পড়লে গা শিউরে ওঠে। মানুষ এত নৃশংস হ'তে পারে বিশেষ ক'রে রমণী! আর এই রমণীর স্বামীই বা কি? এই রকম পাজি মেয়ে মানুষটাকে শায়েস্তা করা দূরে থাকুক, তাতে ইন্ধন জোগায়? এরা চেয়েছিল এই আগুন তাদের কলঙ্কের সকল কাহিনী তাদের বাড়ী ঘর দোরের সঙ্গে ক্রীতদাসদেরও যেন নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দিয়ে যায়। নিয়তির কী অমোঘ বিধান! সেই কলঙ্কময় কাহিনী আগামী কালের ভ্রূকুটী ও ঘৃণার আস্পদ হ'য়ে বেঁচে রইল। আর বেঁচে রইলেন মাদাম লালরী তাঁর কুখ্যাতির জন্য। তখনকার দিনে সেই সম্পাদকীয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি যা প্রত্যক্ষদর্শীর চিত্র হিসেবে বিশেষ মূল্য পাবে ব'লে মনে হয় :—

"We saw where the collar and manacles had cut their way into the quivering flesh. For several months they had been confined in those dismal dungeons with no other nutriment than a handful of gruel and insuffIcient quantity of water, suffering the tortures of the damned and longingly awaiting death as a relief of their sufferings. Judge Canonge, Mr. Montreuil, and others made fruitless efforts to rescue these poor unfortunates, whom the infamous woman Lalaurie had doomed to certain death and hoping the devouring flames might thus obliterate the last traces of her nefarious deeds.

"The search continued. Two negresses were brought out with heavy spiked iron collars and irons on their feet. They could not walk and were supported. An aged negress was found bound in a kneeling position ; she had been in this cramped positions so long that she was helplessly cripple. Her head had been laid open by a blow from a sharp instrument.

"There were seven in all. Other slaves were there, three of them, the woman of the averted eyes—those that had been seen by the guests.

"As the mutilated slaves were taken from the house the crowd followed them to the streets, at least two thousand people followed them to the jail. A long wooden table in the jail yard was filled with instruments of torture which and been bronght from the house. There were instruments the purpose of which was so terrible that the newspapers only hinted at their uses.

'Oue of the seven women testified that Mme. Lalaurie would come sometimes to inflict tortues upon them while music and dancing were going on below.

"Another of the wome testified that Mme. Lalaurie once struck her own crippled daughter for bringing food to the starving slaves."

নির্দয় ও নিষ্ঠুর পরিবেশে মানুষ হ'য়েও যে স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক করুণা ছোট একটা বিকলাঙ্গ মেয়ের সঙ্গে জেগেছিল, তা' তথাকথিত প্রগতিশীলা নিষ্ঠুরা ফরাসী মহিলার মনে জাগে নি। মনস্তাত্ত্বিকরা বের করুন কেন এমন হয়।

"The mob returned from the jail and gutted the home and Mme. Laluoie fled to France."

There is a tradition that the place is haunted by spirits of the tortured slaves—and has greatly added to its interest.

এ অঞ্চলের লোকের ধারণা, এটা ভূতের বাড়ী। নির্যাতিত ক্রীতদাসদের আত্মা গভীর রাত্রির অন্ধকারে নির্জন প্রকোষ্ঠে যেন করুণ ক্রন্দনধ্বনি তুলে আর্তনাদ

করছে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের মত একটা ভীতি ও ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। মাদাম লেলারীর দাস-নির্য্যাতন ইতিহাসের কুখ্যাতির এক নিষ্ঠুরা প্রতিস্মৃতি হ'য়ে আজও বিরাজিত।

লোকাচার ও লোকসংগীত :—

এখানের লোক সংগীতের মধ্যে জড়িয়ে আছে প্রাচীন ফরাসী, স্পেনীয় ও আফ্রিকার নিগ্রো-কিংবদন্তী ও কাহিনীর প্রভাব।

যেমন—

Fais dodo Minette
Trois piti coohou dulaite
Fais do do, mon piti babe
Jiska l'age de quinze ans
Quan Quinze ans aura passe
Minette va so marier

Go to sleep kitten
Three little suckling pigs
Go to sleep my little baby
Until the age of fifteen years
When fifteen years have passed
Kitten will marry.

ঘুমিয়ে পড় বেড়াল ছানা মোর
তিনটি ছোট, শাবক শূয়োর।
শুতে চলো বুকের বাছা মোর
পনেরো বছর হয় নি আজও তোর।
পনেরো বছর পেরিয়ে যখন যাবে
বিয়ের বয়স তখন তুমি পাবে।

আহার পর্ব :—

এক সময় উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে নিউ অরলিনস সম্বন্ধে বলেছিলেন :—

"The city of the world where you can eat and drink the most and suffer the least." রন্ধনের উন্নতির কারণ হয়তো বহু জায়গা থেকে মেয়ে এসেছিল তাদের নানা অভিজ্ঞতায় সংযোগে নব নব আহারের পদ তৈরী কোরত। কুইবেকের মেয়েরা বৌ হ'তে এসে ভুট্টা সেদ্ধ খেতে নারাজ ওদেশে ফিরে যাবার জন্য বিদ্রোহ জানিয়েছিল। আজ কিন্তু নিউ অরলিনসের আহার্যের মধ্যে ভাত একটি অপরিহার্য অংগ। এখানে ফরাসী রান্নায় নানা পদ ও স্পেনীয় রান্নার ঝাল ঝোল অম্লে যুক্ত হ'য়ে রসনাতৃপ্তিকর বহু খাদ্যের নানা পদ প্রস্তুত হ'চ্ছে। বিশেষ ক'রে তরকারী-সর্বস্ব বাঙালীর জিবে বিশেষ তৃপ্তি আনে, একথা অনস্বীকার্য।

ক্রীয়োল আহারের বৈশিষ্ট্য "ক্রীয়োল ড্রিপড কফি।" এটি নাকি অনন্য। মদ্রাজীরা হয়তো তারিফ কোরত, বাঙালী তারিফ কোরত চা হ'লে। এই কফির সুখ্যাতির কথা প্রাচীন কিংবদন্তীর মত এই ভাবে চালু—

Black as devil,
Strong as death,
Sweet as love,
Hot as Hell!

Noir comme le Diable
Fort comme le Morte
Dour comme l'amour
Chand comme l'enfer!

শয়তানের মত কালো
মৃত্যুর মত কঠিন
প্রেমের মত মধুর
নরকের মত অসহ্য।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই এখানে শিক্ষায় ব্রত নিয়েছিলেন এখানের ঔপনিবেশিকেরা। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম Le Moniteur de la Louisiane নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্রথমে এটি সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, সপ্তাহে তিনবার করে প্রায় দু'দশক প্রকাশের পর দৈনিক পত্ররূপে প্রকাশিত হ'তে থাকে। বর্তমানে কত যে পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হ'চ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

গোরস্থান :—

নিউ অরলিনসের গোরস্থান যেন একটি 'মৃতের নগরী'। এত প্রচুর শ্বেত পাথর ও বেলে পাথরের সুন্দর কারুকার্য ও স্মরণলিপি শোভিত করে গড়ে উঠেছে যে মনে হয় যেন এখানে বহু মন্দিরের ঘন সন্নিবেশ হ'য়েছে! এখানে মরলে পুত্র কলত্রদের মহা বিপদ। সামান্য মাটি খুঁড়ে "মাটি থেকে এসেছ, মাটিতেই গেলে" এই সামান্য মন্ত্র

পড়া চলবে না। এখানে মাটি খুঁড়লেই জল বেরোয়। তাই মাটির ওপর দেওয়াল তুলে চৌবাচ্চার মত ক'রে মৃত ব্যক্তিকে রাখা কফিন নামিয়ে মাটি ফেলে ভর্তি ক'রে পাথর দিয়ে চাপা দিতে হয়! কবর দেবার জন্য জমি কিনতে হবে। এখানের কবর দানের জমির দামও চড়া ও শেষকৃত্য করার ব্যয়ও প্রচুর। মৃতের অনুগমন করার জন্য যদি পেশাদারী 'শোক ক্রন্দক' বহাল করা যায় তাতে খরচ আরও বেড়ে যাবে। মাটির সংগে দেহ গলে মিশে গেলে কবরের ঢাকা খুলে কফিন তুলে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বংশ পরম্পরায় সেই একই কবরখানা বারম্বার ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কবর দোতলা করা হয়। নীচের তলায় মৃতের অস্থি রেখে দেওয়া ও উপরে আবার কবর দেওয়া হয়। একটি স্মরণ কবিতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি হ'ল আমেরিকার বিখ্যাত অভিনেত্রী জেন প্ল্যাসাইডের স্মৃতিতে তার কবরের উপর লেখা। স্মৃতিফলক গড়িয়ে দিয়েছিল সেই থিয়েটারের ম্যানেজার জেমস্ ক্যাল্ডওয়েল।

There's not an hour
Of day or dreaming night but I am with thee,
There's not a breeze but whispers of the name,
And not a flower that sleeps beneath the moon
But in its hues or fragrance tills a tale of thee.

মার্ক টোয়াইনের মিসিসিপি :

এই মিসিসিপি নদীর উপর এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণী লেখেন 'মার্ক টোয়াইন'—Life on the Mississippi। মিসিসিপি একটী সাধারণ নদী নয় এটী পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী দৈর্ঘ্যে চার হাজার তিনশো (৪,৩০০) মাইল। বর্ষার জল নির্গমণের এত বড় বৃহৎ জলস্রোত পৃথিবীতে বোধহয় আর কোথাও নেই। এটী পানীয় জল সরবরাহ করে আটাশটী রাজ্যকে। মুয়ান্নোটী শাখা নদী এসে মিসিসিপির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এটী কানাডার বৃহত্তম নদী সেন্ট লরেন্সের তিনগুণ জল, রাইন নদীর পঁচিশগুণ জল, ইংলণ্ডের টেমস নদীর তিনশো আটত্রিশ গুণ জল বয়ে নিয়ে সাগরের পানে ধেয়ে যায়।

সিকাগোর যে-নদী মিচিগন হ্রদে পড়ছিল সে জলের মুখ ঘুরিয়ে মিসিসিপি নদীতে ফেলা হ'য়েছে। এর ফলে শিকাগো শহরের শোধিত ময়লা জল সারা মিসিসিপি বেয়ে মেক্সিকো উপসাগরে পড়ছে।

অদ্ভুত এই নদী! সাগর সংগমে গভীরতার হ্রাস না হ'য়ে সংকীর্ণ ও গভীরতর হ'য়েছে। ফলে জাহাজ চলাচল হ'য়েছে সুপ্রশস্ত, বন্দর গড়ে উঠেছে আদর্শ। গংগার মোহনায় দেখি জলের গভীরতা কম ও ব্যাপ্তি বেশী; এখানে ব্যাপ্তি কম, গভীরতা বেশী। জোয়ার ভাটারও তারতম্য মোহনার দিকে বিশেষ লক্ষণীয়। বছরে চল্লিশ কোটি ষাট লক্ষ টন (৪০,৬০,০০০,০০) পলি ব'য়ে নিয়ে যায় সাগরের দিকে এই মিসিসিপি। এই পলি শুকোলে ২৪১ বর্গ মাইল জমীকে এক ফুট ভরাট করা যেতো। তবে এই পলি থেকে জমি সাগরের দিকে মাত্র সিকি মাইলের সামান্য বেশী এগিয়েছে। এর ঘোলাজল দেখে ক্যাপ্টেন মেরিয়াট এটির নাম দিয়েছিলেন 'Great Sewer',

বর্ষায় জলাধিক্যে এর হাঁসুলি বাঁকের দু'কূল জুড়ে গিয়ে নদীপথের দৈর্ঘ্য হঠাৎ কমে যায়। একসময় দৈর্ঘ্য হ্রাসের মাত্রা তিরিশ মাইল পর্য্যন্ত উঠেছে। ফলে নদীতীরের নগরের জৌলুষ যায় নিভে, সহর আবার কখন গণ্ডগ্রামের পর্যায়ে অবনমিত হয় মিসিসিপি ও ইতিহাসের অমোঘ বিধানে। কখন আবার এই রাজ্যের সীমানা নিয়ে হয় রাষ্ট্রীয় যন্ত্রণা ও কলহ।

ভারতীয় পরিবেশে :

আমার দু'সন্ধ্যা অতি আনন্দে ভারতীয় পরিবেশে কেটেছিল। একসন্ধ্যা ডাক্তার জগদীশ সরকার ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী ইলা সরকারের সান্নিধ্যে। কাজ থেকে সবে ফিরে এসে টেলিফোন গাইড নাড়াচাড়া করতে S-এর আওতায় কোন Sen এর বদলে Sarkar-কে পেলাম। টেলিফোন করতে ডঃ জগদীশ সরকার টেলিফোন ধরলেন। আমার পরিচয় দিতে বললেন, "এক্ষুণি আমাদের এখানে আসতে হবে ও রাতের আহারের নিমন্ত্রণ নিতে হবে।" প্রথমে আহার পর্বে আমার

অনিচ্ছা তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে তুলে নিতে হ'ল। তিনি বললেন যে আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি 'জাং হোটেলে' আসছেন আমায় নিয়ে যেতে। শ্রীমতী তখনও ফেরেন নি। তিনি এলেই তিনি বেরুবেন। প্রায় তিন কোয়ার্টার বাদে ডাঃ জগদীশ সরকার তাঁর ছোট একটি নতুন কেনা গাড়ী নিয়ে এলেন। তিনি এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে post doctorate রাসায়নিক গবেষণা করেছেন। তাঁর স্ত্রীও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। আমরা প্রায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাঁদের একতলার ফ্ল্যাটে উঠলাম। কাছে ডঃ মেরহোত্র পরিবার বাস করেন। আমি তো দেখেই অবাক এই বিদুষী মহিলার—রন্ধন বিষয়ে অদ্ভুত কর্মনিপুণতায়। এর মধ্যে তিনি চপ, কপি আর চিংড়ি মাছ দিয়ে কালিয়া, পায়েস, ও আটা ময়দার লুচি ও ঘি-ভাত ক'রে ফেলেছেন। এখানে রাঁধার অনেক সুবিধে। প্রেসার কুকার ও কুকিং রেঞ্জে কয়েকটা পদ চড়িয়ে দিয়ে মিনিট পনেরো অন্যমনস্ক না থাকলেই সবই হ'য়ে যেতে পারে তারই উদাহরণ শ্রীমতী ইলা আমায় দেখিয়ে দিলেন। কথার মাধুর্য ও বিনয়ও যত তার চেয়ে রন্ধন নিপুণতায় কিছু কম নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সারাদিন পরিশ্রমের পর দেহের ক্লান্তি ও অবসাদ আসার কথা, কিন্তু এঁর মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখলাম। ভারতবর্ষ ও এখানের সংবাদাদি বিনিময়ের পর জানলাম, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কর্মসূত্রে কয়েকজন বাঙালী ও কয়েকজন ভারতীয় আছেন। এঁরা যে স্কলারসিপ্ পান তাতেই সংসার ও থাকা-খাওয়া চ'লে যায় ও কিছু সঞ্চয়ও হয়। সেই সঞ্চয় থেকে ইনি একখানি ছোট গাড়ী কিনেছেন তাতে দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেন, দুজনে এক সাথে আসতে পারেন। কোন মোটর বা বাস ভাড়া লাগে না। সময়ের অনেক সুবিধে হয়। বাসের সময় ধরা বাঁধা। বাস কাজের জায়গার সামনে পর্যন্ত তো যায় না।

আহারাদির পর আমরা গেলাম মেরহোত্রার বাড়ী। শ্রীমতী মেরহোত্রা আগামীকাল আমায় তাঁদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। তবে ডাঃ সরকারকে আমার হোটেল থেকে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন, কেন না [illegible] গাড়ী নেই।

রাত্রিবেলা আমায় হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় শ্রীমতী সরকারও আমাদের সঙ্গে এলেন। ইনি সহরের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান রাতের আলোয় দেখাতে দেখাতে চলেছেন। শেষ পর্বে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে। আমার হোটেল ক্যানেল স্ট্রীটের ওপর ও ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের খুবই কাছে। তখন ফ্রেঞ্চ কোয়াটারের পানশালা ও রেস্তোরাঁয় চলেছে, উদ্দাম কর্মতৎপরতা তার, কিছু ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। যৌন নিরাবরণতার এক উচ্ছল চিত্র সুর ও স্বরের আহাওয়ায় বীয়ারের ফেনার মত উথলে পড়ছে। এখানে মদ ব্যবহারের প্রাচুর্য প্রচুর।

আমার হোটেলের সামনে পৌঁছে দিয়ে ব'লে গেলেন কাল সন্ধ্যায় এসে নিয়ে যাবেন মেরহোত্রার ওখানে। যেহেতু ডাঃ সরকার আমার পরিবহনের ভার নিয়েছেন তাই তাঁরও পরেরদিন মেরহোত্রার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। পরেরদিন সন্ধ্যায় আমি ডাঃ সরকারের সঙ্গে গেলাম মেরহোত্রার বাড়ী। কলকাতার ছোট ছোট ফ্ল্যাটের মত বাড়ী। মাঝখানে সাধারণের উঠোন। এখানে কাশী-এলাহাবাদী অঞ্চলের ভারতীয় খাদ্য আহার করলাম। খুবই যত্নের সঙ্গে রেঁধেছেন শ্রীমতী মেরহোত্রা। একটু লাজুক স্বভাবের মেয়েটী। তবে খুব মিষ্টি ও নম্র স্বভাবের। ছেলেমেয়েরা বায়না ধ'রে, তবু একটুও বিরক্তি প্রকাশ করেন না।

শুক্রবার সন্ধ্যায় লুশিয়ানার বিমান বন্দরে লিমোশিনে আমার জন্য জাং হোটেলে ব'লে রেখেছিলাম, লিমোশিনে ক'রে বিমান বন্দরে এলাম। বিশ্রাম-হলে এসে PAA কাউণ্টারে আমার ব্যাগ দিয়ে দিলাম। কাউণ্টারেই আমাদের বিমানের কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। রাত সাড়ে আটটায় মেরিডা যাবার বিমানে চড়লাম। বিমানে চড়তে কাপ্তেন আবার আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে গেলেন। আমি তখন এই অবকাশে কিছু নোট ক'রে নিচ্ছিলাম। লুশিয়ানা থেকে প্রথমেই মেরিডা তারপর বিমান আরও দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে চ'লে যাবে। শেষের দিকে বিমানে সামান্য কাঁপুনি লাগছিল। মেরিডার কাছে এসে সেটা কেটে যায়।

[ক্রমশঃ

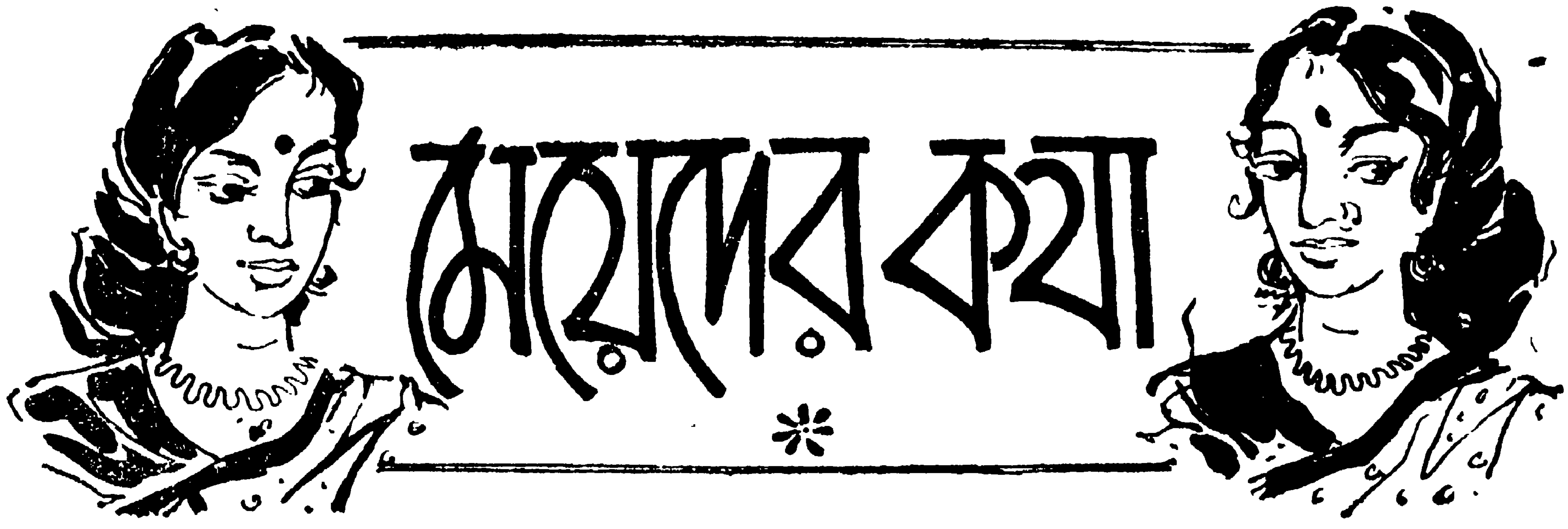

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবি দেখেছেন আমাদের দেশের পুরুষরা যখন দেশের কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা এমন ক'রে চিন্তা করে যেন দেশে শুধু পুরুষই আছে, নারী নেই। নারীকে সে সম্পূর্ণ ভুলে থাকে। তার বক্তৃতা, তার সভা, তার সমিতি তার মহৎ প্রচেষ্টা সব কিছু থেকে সে নারীকে ভুলে ব'সে থেকে, তাকে বাদ দেয়। এর চেয়ে ভুল, এর চেয়ে মিথ্যে, আর কী হ'তে পারে? দেশের অর্ধেক যে নারী। শুধুই অর্ধেক নয়, যেখানে দেশের হৃদয় সেই হৃদয়-শতদলে যে নারীই লক্ষ্মীর আসনে ব'সে আছে। তাকে বাদ দিয়ে দেশের কোন মহৎ মংগলই হ'তে পারে না। 'গোরা' উপন্যাসে কবি দেখিয়েছেন—গোরা যখন জেলখানার বাইরে তার কর্মের উন্মাদনায় মত্ত ছিল, তখন মেয়েদের কথা ভাববার তার অবসর হয়নি। কিন্তু কারাবাসের নিভৃত নির্জন দিনে তার সব চেয়ে যাকে মনে পড়ল, সে ঐ নারী। কবি লিখেছেন—"এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবর্ষে যে স্ত্রীলোক আছে সে কথা গোরার মনে উদয়ই হয় নাই। এই সত্যটিকে সে এতকাল পরে সুচরিতার মধ্যে নূতন আবিষ্কার করিল। একেবারে এক মুহূর্তে এতবড়ো একটা পুরাতন এবং প্রকাণ্ড কথাটাকে হঠাৎ গ্রহণ করিয়া তাহার সমগ্র বলিষ্ঠ প্রকৃতি ইহার আঘাতে কম্পিত হইয়া উঠিল। জেলের মধ্যে বাহিরের সূর্য্যালোক এবং মুক্ত বাতাসের জগৎ যখন তাহার মনের মধ্যে বেদনা সঞ্চার করিত তখন সেই জগৎটিকে কেবল সে নিজের কর্মক্ষেত্র এবং কেবল সেটাকে পুরুষ সমাজ বলিয়া দেখিত না। যেমন করিয়াই সে ধ্যান করিত, বাহিরের এই সুন্দর জগৎ সংসারে সে কেবল দুটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখ দেখিতে পাইত। সূর্য্য, চন্দ্র, তারার আলোক বিশেষ করিয়া তাহাদেরই মুখের উপর পড়িত। স্নিগ্ধ নীলিমা মণ্ডিত আকাশ তাহাদেরই মুখকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। —একটি মুখ তাহার আজন্ম পরিচিত মাতার, বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত, আর একটি নম্র সুন্দর মুখের সংগে তাহার নূতন পরিচয়।"

কবি দেখেছেন পুরুষের জীবনের দুই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, এক তার মা, আর তার প্রিয়া—। এই দুই দেবতাই পুরুষের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে, তাকে ধন্য ক'রে রেখেছে।

কবি লিখেছেন—"গোরা তখন ভাবে আবিষ্ট ছিল। সুচরিতাকে সে তখন একটি ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া দেখিতে ছিল না। তাহাকে একটি ভাব বলিয়া দেখিতেছিল। ভারতের নারী প্রকৃতি সুচরিতা মূর্তিতে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। ভারতের গৃহকে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। যে লক্ষ্মী

ভারতের শিশুকে মানুষ করেন, রোগীকে সেবা করেন, তাপীকে সান্ত্বনা দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌরবে প্রতিষ্ঠা দান করেন, যিনি দুঃখে দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকেও ত্যাগ করেন নাই, অবজ্ঞা করেন নাই, যিনি আমাদের পূজার্হ হইয়াও আমাদের অযোগ্যতমকেও একমনে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার নিপুণ সুন্দর হাত দুইখানি আমাদের কাজে উৎসর্গ করা এবং যাঁহার চির-সহিষ্ণু ক্ষমাপূর্ণ প্রেম অক্ষয় দানরূপে আমরা ঈশ্বরের কাছ হইতে লাভ করিয়াছি, সেই লক্ষ্মীরই একটি প্রকাশকে গোরা তাহার মাতার পার্শ্বে প্রত্যক্ষ আসীন দেখিয়া গভীর আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এই লক্ষ্মীর দিকে আমরা তাকাই নাই। ইহাকেই আমরা সকলের পিছনে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম। আমাদের এমন দুর্গতির লক্ষণ আর কিছুই নাই। গোরার তখন মনে হইল, দেশ বলিতেই ইনি, সমস্ত ভারতের মর্মস্থানে, প্রাণের নিকেতনে, শতদল পদ্মের উপর ইনি বসিয়া আছেন, আমরাই ইহার সেবক। দেশের দুর্গতিতে ইহারই অবমাননা, সেই অবমাননায় উদাসীন হইয়া আছি বলিয়াই আমাদের পৌরুষ আজ লজ্জিত।"

কবি দেখেছেন যেখানে পুরুষের পৌরুষ আছে সেখানেই নারী সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে আমরা যে নারীকে সম্মান করিনি, সেই হ'ল আমাদের বীর্যহীন কাপুরুষতার প্রধান চিহ্ন। সেই কাপুরুষতার পথ দিয়েই এসেছে আমাদের সমস্ত দুঃখ ও দুর্দশা।

কবি লিখছেন—"গোরা নিজের মনে নিজে আশ্চর্য্য হইয়া গেছে। যতদিন ভারতবর্ষের নারী তাহার অনুভব-গোচর ছিল না, ততদিন ভারতবর্ষকে সে যে কিরূপ অসম্পূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল ইতিপূর্বে তাহা সে জানিতই না। গোরার কাছে নারী যখন অত্যন্ত ছায়া-ময় ছিল, তখন দেশ সম্বন্ধে তাহার যে কর্ত্তব্য বোধ ছিল, তাহাতে কী একটা অভাব ছিল। যেন শক্তি ছিল কিন্তু তাহাতে প্রাণ ছিল না, যেন পেশী ছিল, কিন্তু স্নায়ু ছিল না। গোরা এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিল যে নারীকে যতই আমরা দূর করিয়া, ক্ষুদ্র করিয়া জানিয়াছি, আমাদের পৌরুষও ততই শীর্ণ হইয়া মরিয়াছে।"

কবি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সেবক ছিলেন। গোরার মতই তিনিও তাঁর দেশ সেবার মধ্যে নারীকে সেবা করবার ভার গ্রহণ করলেন। আমাদের এই কাপুরুষের দেশে কবি নারীর প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্যের ভার নিজহাতে নিলেন। নারীর সত্য মূল্য, তার দান, তার মর্য্যাদা নিয়ে পুরুষকবি দেশের মানুষকে সচেতন ক'রে দিলেন। এমনি ক'রে কবির স্বদেশ সেবার মধ্যে নারীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন একটা প্রধান অংশ হ'য়ে উঠল।

কবি এও দেখেছেন যে একলা পুরুষের সেবায় দেশের সার্থকতা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। গোরা বলছে সুচরিতাকে—"কেবল পুরুষের দৃষ্টিতেই তো ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হবেন না। আমাদের মেয়েদের চোখের সামনে যেদিন আবির্ভূত হবেন সেই দিনই তার প্রকাশ পূর্ণ হবে। তোমার সংগে এক সংগে এক দৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব, এই একটি আকাংক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে। আমার ভারতবর্ষের জন্যে আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি কিন্তু তুমি না হ'লে প্রদীপ জ্বেলে তাকে বরণ করবে কে? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তার কাছ থেকে দূরে থাক।"

কবির এই কথা যে কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছলতা নয়, সত্যিই যে একা পুরুষের সেবা শুধুই খাটুনি, একা পুরুষের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ দৃষ্টি একথা প্রমাণ করবার জন্যে যে কোন উদাহরণই দেওয়া চলে। পুরুষ যদি দেশের সেবার জন্যে কোন কারোকে নিজের আশ্রয়ে আশ্রয় দান করে, তখন তার সম্পূর্ণ অভাব মোচন করতে সে কখনই পারবে না, যদি নারী এসে তার হাতে হাত না মেলায়। যেখানে অভাব, যেখানে বেদনা, সেখানে নারীর উপলব্ধিতে তা যতখানি ধরা পড়ে পুরুষের উপলব্ধিতে তা ততখানি পড়ে না। পুরুষ বাইরে থেকে সেবা বা সাহায্য করতেই পারে, কিন্তু ভেতর থেকে সমস্ত অভাব মেটাতে পারে একমাত্র নারী। তাই যে কাজে নারী ও পুরুষ একত্রে মেলে, সেই কাজই অন্তর ও বাহিরে সর্বাংগ সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে।

কিন্তু তবু কবি একথা বলতে চাননি যে কাজের সুবিধার খাতিরেই পুরুষের নারীকে দরকার। নারীকে পুরুষের দরকার তার নিজের জীবনের আনন্দেরই তাগিদে। নারী পুরুষের জীবনে প্রয়োজনের অতীত আনন্দ নিয়ে

আসে ব'লেই নারীকে তার চাই। যেমন দেশের সেবা একা পুরুষের দ্বারা সম্পূর্ণ হবার নয় ঠিক তেমনি নারীকে ছাড়া পুরুষের জীবনও সম্পূর্ণ সার্থক হ'তে পারে না। শুধু কাজ, শুধু মতবাদ, শুধু আন্দোলন ও আলোচনা, এতে জীবনের সার্থকতা নেই। পুরুষের কাজ, তার চিন্তা, তার সমগ্র জীবন সার্থক ক'রে তুলতে পারে, একমাত্র উপযুক্ত সংগিনী নারী। একথা কবি বলেছেন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসেও। এই কথা বার বার ক'রে ব'লেও কবি যেন তৃপ্তি মানেন নি। এই সত্যের উপলব্ধি কবির মনে এত গভীর যে এই সত্যকে তিনি বার বার ক'রে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। গোরা যখন তার আগেকার ধারণা অনুসারে ধর্ম ও কর্তব্যের দোহাই দিয়ে সুচরিতার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করল, তখন তার সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। পুরুষ যখন তার মনোমত নারীর সংগ লাভ করে, তখনই সে সত্যিকারের কাজের যোগ্য হয়ে ওঠে। নারীকে বাদ দিয়ে একলা পুরুষ যখন দল বেঁধে কাজ করতে চায়, তখন সে কাজের চেয়ে অকাজই বেশি করে। কবি লিখেছেন—"গোরাকে আবার তাহার দলের লোকের মাঝখানে তাহার পূর্বাভ্যস্ত কাজের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইল। কিন্তু বিস্বাদ, সমস্তই বিস্বাদ, এ কিছুই নয়, ইহাকে কোন কাজই বলা চলে না, ইহাতে কোথাও প্রাণ নাই। এমনি করিয়া কেবল লিখিয়া পড়িয়া কথা কহিয়া দল বাঁধিয়া যে কোন কাজ হইতেছে না বরং বিস্তর অকাজ সঞ্চিত হইতেছে একথা গোরার মনে ইতি পূর্বে কোনদিন এমন করিয়া আঘাত করে নাই। নূতন লব্ধ শক্তির দ্বারা বিস্ফারিত তাহার জীবন আপনাকে পূর্ণভাবে প্রবাহিত করিবার অত্যন্ত একটি সত্যপথ চাহিতেছে। এ সমস্ত কিছুই তাহার ভালো লাগিতেছে না।" .

গোরা যখন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে একেবারে নির্মল, নির্মম, নিঃস্পৃহ, হ'য়ে দেশের সেবা করবে ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে চেষ্টা করছে, যখন সে নিজেকে সুচরিতার প্রভাব থেকে মুক্ত করবে বলে পণ করতে প্রয়াস করছে, তখন কবি লিখছেন "প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজনের মাঝখানে তাহার হৃদয়বাসী কোন গূঢ়-শত্রু তাহার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দিতেছিল, বলিতেছিল অন্যায় রহিয়া গেল। এ অন্যায় নিয়মের ত্রুটি নহে, মন্ত্রের ভ্রম নহে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা নহে। এ অন্যায় প্রকৃতির ভিতরে ঘটিয়াছে। এইজন্য গোরার সমস্ত অন্তঃকরণ এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইতে মুখ ফিরাইয়াছিল।"

মানুষের ন্যায় অন্যায় শুধুই বাইরের শাস্ত্র ও সমাজের বিধান মিলিয়েই দেখবার জিনিষ নয়। যেখানে তার প্রকৃতির প্রতি অত্যাচার, সেই হ'ল সবচেয়ে বড় অন্যায়। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক সময় এই ঘোরতর অন্যায় করতে উদ্যত হয়। কবি বলতে চান কোন মহৎ কর্তব্যের দোহাই দিয়েই নারীকে দূরে রাখা চলে না। নারীকে সংগে পেলেই মহৎ কর্তব্য সুসম্পূর্ণ হবে, নইলে সে কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এতো হ'ল কবির একটা যুক্তি। কিন্তু এ যুক্তির ওপরেও কবির যে কথা, সে হ'ল এই যে নারীকে না হ'লে যে পুরুষের জীবনই বিফল হবে। পুরুষের সমস্ত প্রকৃতি চায় নারীকে। এই জন্যেই অন্য যে ধর্মের সংগেই অমিল ঘটুক না কেন, পুরুষের প্রকৃতিধর্মের সংগে মিল রেখে নারীকে তার একান্তই চাই। বাহ্য ধর্মের সংগে অমিল ঘটলে মানুষের তা'তে ক্ষতি হয় না। কিন্তু অন্তর ধর্মের সংগে অমিল নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। সেখানে তাকে বাঁচতে হ'লে প্রকৃতির সংগে নিজের জীবনকে মিলিয়ে নিতেই হবে। এই জন্যেই 'গোরা' উপন্যাসের উপসংহারে আমরা দেখি গোরার প্রসারিত ডান হাতে হাত রেখেছে সুচরিতা। গোরা ও সুচরিতা মহৎ পুরুষ এবং মহীয়সী নারীর সার্থক মিলনেই দেশের সার্থকতা আসবে, এই সত্যই হ'ল এই উপন্যাসে কবির অন্যতম উপপাদ্য বিষয়। দেশ সেবক পুরুষের নারী সংগ বর্জনের যে প্রতিজ্ঞা ও স্পর্ধা, পুরুষকে তার প্রকৃতির হাতে হার মানিয়ে কবি সেই স্পর্ধার জবাব দিয়েছেন। এমনি ক'রে কবি নারীর মাথায় গৌরবের সমুচ্চ সমুজ্জল মুকুট পরিয়ে তাকে রানীর আসনে বসিয়ে তাকে দেখেছেন। কবি ও কর্মী, ভাবুক ও স্রষ্টা এই বরপুরুষের পূজা পেয়ে চিরদিনের নারী ধন্য হয়ে রইল। পুরুষোত্তমের এই পূজা নারীর মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাকে জাগিয়ে তুলবে, তাতে সন্দেহ নাই। ভক্তের ভক্তিতে দেবতার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় এই সত্যই আমরা প্রমাণ করব দেশের নারী সমাজ। কবির এই অর্ঘ্য আমাদের হাতে ব্যর্থ না হ'ক

এই কামনা করি। কবির কথায়—

"আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
জাগে আনন্দ ভক্ত প্রাণে
সে বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।"

ভক্ত যখন পূজারতির শংখ ধ্বনিত ক'রে গেছেন তখন কি দেবতা আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে? তারও যে জাগরণের আর দেরী নেই আজ দিকে দিকে তারই সূচনা দেখা দিয়েছে।

কবির কল্পনা গ্রন্থের সুর ও ভাষা থেকে প্রথমে মনে সন্দেহ হয় এ বুঝি ভগবানের বন্দনা গান। কিন্তু একটু পরেই সে ভুল ভেঙে যায়। তখন দেখি, এ বন্দনা গানই বটে, কিন্তু ভগবানের নয়, মানস-প্রতিমা নারীর। কবির চোখে যে দেবতা আর নারী কতখানি এক হ'য়ে গেছে তা এই গান থেকে বোঝা যায়। নারী দেবতারই আনন্দিত দান। তাই কবি এই দান গ্রহণে দেবতার অভিপ্রায়ের সংগে কোন বিরোধিতা দেখতে পান নি। এই দান গ্রহণেই দেবতা প্রসন্নদৃষ্টিপাতে কবিকে পুরস্কৃত করেছেন। কবি ধর্ম ও আনন্দ এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পান নি। নারীর মাধুর্য্য-সুধা উপভোগে কবির দেব-পূজার ব্যাঘাত ঘটেনি। কবির চোখে পূজা আর প্রেম এক হ'য়ে উঠেছে। এমনি ক'রে কবি নারীকে প্রেমের অমরাবতীতে নিয়ে গেছেন এবং প্রেমকেও সংসারের ধুলো থেকে এক পবিত্রলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছেন। মানস-প্রতিমার বন্দনা-গানে কবি গেয়েছেন—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা
মম শূন্য গগন বিহারী"

এটুকু শুনে মনে হয় এ হৃদয়-দেবতা ভগবানের বন্দনা। কিন্তু এর পরে যখন দেখি—

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
মম হৃদয় রক্ত রঞ্জনে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া
অয়ি সন্ধ্যা স্বপন বিহারী
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙিয়া
মম মোহের স্বপন অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে
অয়ি মুগ্ধ নয়ন বিহারী
মম সংগীত তব অংগে অংগে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে
তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম জীবন মরণ বিহারী।"

অনেকদিন পর্য্যন্ত বহু প্রচারিত এই গান সম্বন্ধে আমার এই ধারণাই ছিল যে এ হৃদয়-দেবতা ভগবানের ধ্যান। কিন্তু আজ যখন ভালো ক'রে পড়লাম, তখন দেখি এ হৃদয় দেবতারই ধ্যান বটে, তা নইলে এ এমন মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠত না, কিন্তু সেই দেবতার নাম হ'ল নারী।

কিন্তু এই দেবতাকে কবি ঠিক ব্যক্তিরূপে দেখেন নি, তাকে দেখেছেন ভাবরূপে। অর্থাৎ ব্যক্তিরূপে দেখেও তিনি তাকে ভাবরূপে দেখেছেন। সীমার মাঝে অসীমকে দেখাই যে কবির অন্তরের অভ্যাস। তাই কবি বারে বারে বলেছেন তাঁর এই যে নারীর বন্দনা গান এতে অধিকার আছে চিরযুগের নারীর। এ কোন বিশেষ নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এ হ'ল সমস্ত বিশ্বের সমস্ত যুগের নারীর সম্পদ। তাই বিশেষ কোন নারী যে কবির কণ্ঠে মালা দিয়ে তাকে একলার ক'রে পাবে, কবির হৃদয় যে কোন এক নারী আপন হৃদয়ের বিনিময়ে কিনে নেবে, কবি ব'লেছেন সে আশা নিষ্ফল। কবি একথা হাল্কা হাসির সুরে যদিও বলেছেন, তবু এটা কবির গভীর অন্তরের গভীর কথাই।

কবি বলেছেন, যে নারী কবিকেবরমাল্য দিতে আসবে, তার সে মালা কবি নেবেন, কিন্তু তাঁর নিজের হাতের মালা তিনি যে অনেক আগেই চিরযুগের নারীর গলায় দান ক'রে ব'সে আছেন। কবির মালা আর তাঁর হৃদয় দুইই আজ উৎসৃষ্ট। তাই কেউ যদি আজ তাঁকে হৃদয় দান করতে আসে তো ভাল। কিন্তু বিনিময়ে কবির হৃদয় যে সে তার একমাত্র আপনার ক'রে পা'বে, সে আশা আর নেই। কবি যে যে নারীকে তাঁর বরমাল্য দান করেছেন তাঁরা যে কে কোথায় আছে, তার কোন নাম ঠিকানাও খুঁজে পাওয়া ভার।

তাঁদের কারো সংগে বা কবির দেখা হয়েছে, কারো বা ঘোমটার আড়ালে মুখখানি কবির আধেক দেখা, তাঁরা কেউ বা ছিলেন অতীত কালের অবন্তী, উজ্জয়িনী, বিদিশায়, এখন তাঁরা আর কোথাও নেই, আছেন শুধু কবির গানে। বিধাতা যেন চিরযুগের নারী মাধুর্যাকে কবিকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন, তাই তাঁর আর কোন এক বিশেষ জায়গায় বাঁধা পড়বার কোন সম্ভাবনাই নেই।

(উৎসৃষ্ট, ক্ষণিকা, ৭ম খঃ)

কবির এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে কবির জীবনে ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাসের খোঁজ করা বৃথা। অনেক জানা আর অনেক কল্পনা মিলিয়ে কবি তাঁর মানস-প্রতিমার প্রতিমূর্তি গড়ে তুলেছেন।

কবি বলেছেন, যে নারী কবিকে ভালোবাসবে, তাকে কিন্তু সর্বদাই সাবধানে থাকতে হবে। কবির মন যে চির-দিন একই জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকবে এমন কোন শপথ-ভংগ হবারই ষোল আনা সম্ভাবনা। কবির এই শপথ ভংগকে ক্ষমা করতেই হবে। কবির মন যে কখন কোন্ দিকে থাকে, তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই। কবির বাসা পথের ধারে। তার মনে গানের ঝোঁক। কবির ঘরে কারো আসতে মানা নেই। যত বিদেশী পথিক কবির বাসায় আনাগোনা করে। কবির প্রাণের যত দামী জিনিষ, তাঁর যত ভালোবাসা, তা যে কে কখন চুরি করে নেয়, তার কোন ঠিক নেই। এমনি ক'রে কবির ভালো-বাসা সর্বস্বান্ত হ'য়ে আছে। তাই যে নারী-কবিকে হৃদয় দান করবে তাকে বিনিময়ে কবির কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে তার সমগ্র হৃদয় পাবার আশা ছেড়ে দিয়েই তা করতে হবে। কবির হৃদয় কোনখানে চিরদিনের বন্ধন স্বীকার করতে পারবে না, এটা কবি হাসির ছলেই ঠাট্টা ক'রে নারীকে জানিয়ে রাখছেন। কিন্তু ঠাট্টা হ'লেও এর মধ্যে আছে অনেকখানি সত্য।

(অসাবধান, ক্ষণিকা, ৭ম খঃ)

কবির মন যে কে কখন-টেনে নেয়, সত্যিই তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। যাকে আর সবাই কালো ব'লে তুচ্ছ করে, সেই কালো গ্রাম্য মেয়েরও স্তবগান করেছেন কবি 'কৃষ্ণকলি' কবিতায়। সে মেয়ে যতোই কালো হ'ক, তার কালো চোখের দৃষ্টি কবির মনকে মুগ্ধ করেছে। সে যেন একটি কালো রঙের পুষ্পকলিকা। কালো হ'লেও সে একটি আধফোটা ফুলের মতই সুন্দর। তাকে দেখে কবির অন্য সব কালোকে মনে পড়ে যায়। সে কালো, কালো হ'লেও অপূর্ব সুন্দর, ঐ কালো মেয়ে তাদেরই দলের একজন। তারা হ'ল জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশান কোণে জমে-ওঠা ঝড়ের কালো মেঘ।

(ক্রমশঃ)

শতাব্দীর অর্ঘ্য

মীরা রায়

বলিষ্ঠ উদার জীবনধর্মী জাতির পক্ষে ঐতিহাসিক স্মরণ মনন একটি বড় রকমের ঐতিহ্য অবধারকের পরিচয়। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির মর্মমূলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কৃষ্টির বীজ প্রোথিত থাকে, শতাব্দীর মনীষী তর্পণে একটি প্রাণবন্ত জাতির প্রাণস্ফূর্তির পরিচয় থাকে, কারণ Those who cannot remember their past are condemned to repeat its errors. বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে শতবার্ষিকী স্মরণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাতর্পণ আমাদের জাতিগত কৃষ্টির উৎকর্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শতবর্ষের পথচারণায় যে সকল মহাজন মহাপ্রস্থানের পথিক হয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের অন্যতম। বাংলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাচ্য ও প্রতীচীর মিলনরাখী রচনায় নিবেদিতা স্মৃতিতর্পণ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে—গত ২৮শে অক্টোবর ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সেই মহেন্দ্রক্ষণ সূচিত হয়েছে।

বাংলার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই পশ্চিমের ফুলটি দেশ-মাতৃকার চরণে অঞ্জলি দিয়েছিলেন। যখন জীবনের চক্রব্যূহে মানুষ পথভ্রষ্ট, যখন সংশয়-সংগ্রামের অমানিশায় জাতীয় চেতনাবোধ মোহগ্রস্ত, তখন পরাধীনতার দুঃস্বপ্নে ঘুণধরা জাতির বক্ষপিঞ্জরে যে পশ্চিমের অমৃতবিন্দুটি

সঞ্জীবনীশক্তির কাজ করেছিল, এবং যে মহান্ পুরুষ এই সংযোগ সাধন করেছিলেন, সাম্প্রতিক তাঁর শতবার্ষিকী পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসকন্যার স্মরণোৎসব পালন না করলে যেমন একদিকে বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব অসম্পূর্ণ থাকবে; তেমনি অন্যদিকে নিবেদিতার প্রতি জাতীয় ঋণ অপরিশোধ থেকে যাবে।

বাংলা যখন শারদীয়া পূজায় জগন্মাতাকে নিজ কন্যারূপে একান্ত করে কাছে পায় সেই সময়ে জগন্মাতারই এক রূপ যেন উত্তরকালে বাংলার জন্য নিবেদিত হয়ে আয়র্লণ্ডে টাইরণ প্রদেশে মার্গারেট নোবেলরূপে আবির্ভূত হন। ধর্মযাজক পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড ও ধর্মপ্রাণা মেরী নোবেলের কন্যা মার্গারেট যে জন্ম থেকেই ধর্মপথাবলম্বিনী হয়ে উঠবেন এটি অতি প্রত্যাশিত ঘটনা। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা যজ্ঞের অন্যতম হোতা পিতার সংসর্গে বাল্যকাল থেকেই মার্গারেটের চরিত্রে স্বদেশপ্রীতি ও গভীর জাতীয়তাবোধ জন্মেছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন লণ্ডনে বেদান্ত প্রচার করতে আসেন তখন থেকেই মার্গারেট স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর মন যখন সত্যের পথ ও পথপ্রদর্শকের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের পথপ্রদর্শক গুরু হিসাবে উপস্থিত হলেন। স্বামীজীই তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ পুরুষ হিসাবে পরিগণিত হলেন।

স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টি পাশ্চাত্য দেশগুলির মহিলাদের মধ্যে মার্গারেট নোবেলকে দেশসেবার শ্রেষ্ঠ উপযুক্ত পাত্রী হিসাবে খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর মতে 'Nivedita is the fairest flower of my work in England'. দেশে ফিরে তিনি মার্গারেটকে লিখলেন, 'ভারতের কাছে তোমার একটা বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে, ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারত এখনও মহীয়সী নারীর জন্ম দিতে পারছে না তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তুমি ঠিক সেইরকম নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।' স্বামীজী বুঝেছিলেন মৃতপ্রায় বাংলা নারী-সমাজে পুনর্জাগরণের প্রয়োজন; তাই সুযোগ্যা শিষ্যাকে বাংলার নারী সমাজকে নূতন করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তিনি মার্গারেটকে ডাক দিলেন, 'তোমার মধ্যে আছে সেই শক্তি যা এই পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে। জাগো জাগো আমার কথা শুধু জাগো'। 'তুমি আছ মোর জীবনমরণ হরি' এই সুরে হিল্লোলিত হল মার্গারেটের সমস্ত জীবন, দেহমন উৎসর্গীকৃত শিষ্যা গুরুর এ আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। ভারতীয় চেতনায় তিনি নতুন করে জাগলেন, ভারতের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করলেন—আইরিশ কুমারীর নবজন্ম হল ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে। গুরু কাণে মন্ত্র দিলেন, 'ভারত-মন্ত্রই তোমার জপমন্ত্র হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমনভাবে আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন ঠিক তেমনভাবে তোমাকেও তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।' সেই মন্ত্রকে শিরোধার্য করে ভারত-কন্যা নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী তাঁর পরমতীর্থ ভারতভূমিতে পদার্পণ করলেন।

ভারতের জনগণ তাঁর আত্মা, ভারতের নদনদী তাঁর শোণিত ধারা, ভারতের তীর্থ তাঁর হৃদয়, ভারতের দেবতা তাঁর ধ্যানের বস্তু, ভারতের মুক্তিচিন্তা তাঁর দিবা-রাত্রির স্বপ্ন। ভারতের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম তাঁর উক্তিতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, 'জগতের সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সুমহান ধর্মের জন্মদাত্রীরূপে ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসি। এই ভারতবর্ষেই আমি আমার পরম শ্রদ্ধা-ভাজন গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কার্যের জন্য নিবেদিতা।'

স্বামীজী তখন বেলুড় গঙ্গাতীরে এক ভক্তের বাড়ীতে বসবাস করতেন, নিবেদিতা সেইখানেই প্রথম গুরুসঙ্গ লাভ করলেন। সেইখান থেকেই স্বামীজী গড়ে তুলতে লাগলেন তাঁর মানসকন্যাকে—তাঁর উত্তর-সাধিকাকে। নিবেদিতা শুনলেন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, জানলেন বর্তমান ভারতের পরিস্থিতি। তিনি বুঝলেন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন, একটি ভেঙে-পড়া জাতির সেবার প্রয়োজন। তাই স্বামীজী নিবেদিতাকে ত্যাগের মন্ত্রে, সেবার মন্ত্রে, তপস্বিনীর মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন; নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষা নিলেন।

ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত তাঁর একটি গ্রন্থে পাওয়া যায়, রমণী সর্বদেশের নীতি ও সদাচারের রক্ষাকর্ত্রী। ভারত সেই দেশ যেখানে স্ত্রীজাতি নিঃস্বার্থভাবে, অনলসভাবে প্রিয়জনের সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন। এই নিঃস্বার্থপরতা ভারতীয় নারীকে নারীত্বের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।' সারদা-মা নিবেদিতার কাছে ভারতের নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমার মনে হোত ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা তিনিই। খুব সরল স্বভাবের মেয়েদের মধ্যে যে গভীর জ্ঞান ও মাধুর্যের বিকাশ দেখা যায় তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি সারদাদেবীর মধ্যে।'

নারী জাতির শিক্ষার সংস্কারের নিমিত্ত নিবেদিতা প্রথমে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হলেন। দীপান্বিতার রাত্রে একদিন বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে এক ক্ষুদ্র কামরায় যে জ্ঞানের দীপশিখাটি তিনি জ্বালিয়েছিলেন পরে সেটি একটি আদর্শ নারী শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছিল। সেদিন এই বিদেশিনী মহিলা ভারতীয় রমণীর শিক্ষা ও সংস্কারকে নব জাগরণের পথে উদ্বুদ্ধ করতে যে মহান পথ প্রদর্শন করেছিলেন, পরবর্তীকালে স্ত্রী শিক্ষা প্রসার ক্ষেত্রে তার প্রচুর অবদানের স্বাক্ষর রয়েছে। সেই পর্দাপ্রথার যুগে অবরুদ্ধ মহিলা জগৎকে প্রকাশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে আনয়ন করা খুবই দুঃসাধ্যের বিষয় ছিল। একমাত্র নিবেদিতার অক্লান্ত চেষ্টায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাগণ স্কুলের ছাত্রী থেকে মধ্যবয়সী গৃহিণী পর্যন্ত সকলেই এই বিদ্যালয়টিতে যোগদান করেন। বয়স ও রুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নারী শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিদ্যালয়টিতে ছিল। এর জন্য প্রথমে নিবেদিতাকে দারুণ অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে হয়। এমন কি তাঁর নিজের উদরান্নের অর্থ বাঁচিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করতে হয়, পরে ক্রিশ্চিয়ানা নামে একজন বিদেশী মহিলাকে স্কুল পরিচালনার কাজে পেয়ে তাঁর সবদিক থেকেই খুব সুবিধা হয়। নারী দরদী স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশমত নিবেদিতার ভারতীয় নারী সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগের প্রথম প্রচেষ্টা এই স্কুলটির প্রথম উদ্বোধন করেন ভারতীয় নারীর আদর্শস্থানীয়া সারদা-মা। তাঁর স্নেহধন্যা নিবেদিতা এই মাতৃমূর্তিকে পুরোধা করে ভারতের মাতৃ-জাতির বরাবর সেবা করে গেছেন।

'জীবে প্রেম করে সেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' ভারতের জনগণের সেবায় ভারতের ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নিবেদিতা, তাই ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর আদিম আকর্ষণ এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আরও ঘনীভূত হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ ভারতকে জানতে হলে তার ধর্মজীবনকে, তার তীর্থ জনপদকে, দেব দেবতাকে, অণুপরমাণু দিয়ে জানতে হবে, তাই এই ঈশ্বরানুসন্ধানী তপস্বিনী স্বামীজীর সঙ্গে ভারত তীর্থের পথিক হলেন। সমগ্র উত্তর ভারত পর্যটন করে নৈনিতালে তিনি আর একজন ভারত প্রেমিক বিদেশিনী মহিলার সংস্পর্শে আসেন, ইনি শ্রীমতী এ্যানি বেশান্ত।

নিবেদিতার কর্মপদ্ধতি শুধু নারী শিক্ষা ব্যাপারেই নিবদ্ধ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর অগ্নিযুগের সার্বিক বিপ্লবের জোয়ার যেমন সে যুগে সমস্ত মনীষীচিত্তে আন্দোলন জাগিয়েছিল তেমনি নিবেদিতারও কর্ম ও মর্ম জগতে এনেছিল বিরাট বিপ্লব। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে নিবেদিতা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেযুগের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যলাভের সুযোগ পান। তিনি বাংলার অগ্নিযুগের সুপ্রবীর্যে যে বিপ্লব জাগিয়েছিলেন তারই আলোড়নে সাড়া দিয়েছিলেন মহামতি গোখলে, বিপিন পাল, সরোজিনী নাইডু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি। বাংলার বৈজ্ঞানিক সাধনায়ও নিবেদিতার অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছিল, তাই সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী ছিলেন। বাংলার কৃষ্টি ও শিল্প চেতনায় তিনি যে শুভানুধ্যান যুগিয়ে গেছেন তার স্বাক্ষর রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ শিল্পী ও মনীষীসঙ্গমে, নিবেদিতার গভীর সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধা ও সূক্ষ্ম শিল্পপ্রীতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে। এছাড়া বাংলার আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে গূঢ় সম্পর্ক তাঁর জীবনের মূলধন ছিল। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সাধকবর্গ ছাড়াও শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা

শিশিরকুমার ঘোষ ও স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন বহু মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

'একই অঙ্গে এত রূপ' নিবেদিতার বহুমুখী কর্মপ্রতিভায় তাঁর এককজীবন বিচিত্রময় রূপে ঝলকে উঠেছিল; জগন্মাতার বহুরূপধারিণী চিন্ময়ী প্রকাশ নিবেদিতার মধ্যে, তাই তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্রের উৎসে রয়েছে ঐশ্বরিক বিভূতির বিস্ময়কর লীলা। যখন বাংলার ইতিহাস রেনেশাঁসের সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তখন তার ধাত্রী মাতা নিবেদিতা। বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে নিবেদিতা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের আখ্যায়, নিবেদিতা ছিলেন লোকমাতা। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবের কাছেই এই সতী সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করেছিলেন।' সেই নবজাগ্রত বাংলার শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, স্ত্রীশিক্ষায়, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায়, নানাভাবে সমাজ সেবায়, নিবেদিতার জীবন বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পথপরিক্রমণ যখন নতুন শতাব্দীর প্রবেশদ্বারে এসে শেষ হল, তখন এক মহাজীবনের শেষ-সঙ্গীতে ভারাভ্রান্ত হয়ে রইল নতুন যুগের জন্মলগ্ন। রুদ্র দেবতা খুঁজে পেয়েছিল এক মহার্ঘ শিকার, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটল, শোকস্তব্ধ নিবেদিতার সাদাডায়েরীর পাতাটা শুধু একবিন্দু কালো কালিতে অশ্রু বিসর্জন করল 'Swami, dead'. শূন্য পাতাটারই মত শূন্য মন নিয়ে তিনি গুরুর শেষকৃত্যে যোগদান করলেন। ভস্মীভূত দেহের কুণ্ডলীকৃত উন্মার্গগামী ধূম্ররাশির মধ্যে তিনি শুনলেন এক বাণী, 'আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পাশে থাকব'। স্বামীজীর শেষ উপদেশ তাঁর মনে পড়ল, 'Be loyal to your mission my child!'

নিবেদিতার অলস শোকের সময় ছিলনা। স্বামীজীর আরব্ধ কর্মের উত্তর সাধিকা তিনি। স্বামীজী যে নতুন মন্ত্রে সমস্ত ভারতবাসীকে জাগাতে চেয়েছিলেন সেই মন্ত্র দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে স্বামীজীর ঈপ্সিত ভারতকে গড়ে তুলতে হবে। বৈদান্তিক হিন্দুর মনে শুধু ত্যাগ ও বৈরাগ্য জাগালেই হবেনা, মাতৃভূমির স্বাধিকারবোধ জাগ্রত করা সর্বাধিক প্রয়োজন, তাই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ভারতের সুপ্ত মর্মবাণীকে সোচ্চার করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। উল্কার মত ছুটে বেড়াতে লাগলেন ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। দেশের যুবশক্তিকে, নারীশক্তিকে অবহেলিত সমাজকে নতুন করে শোনালেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' স্বামীজীর ও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য শক্তির আশীর্বাদ যেন তাঁকে কর্মযোগের অমৃতলোকে পরিচালিত করল।

বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ নিবেদিতার চরিত্রে বিশেষ সম্পদস্বরূপ। স্বামীজীর সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পরই এই তীর্থস্বরূপ বাড়ীটির প্রতি তিনি সর্বতোভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যে কি গভীর ভাবে তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন তা তাঁর রচনার উক্তিতেই বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন, 'তাঁর প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম। নিজেকে এরূপ সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া-দিবার আশ্চর্য শক্তি আমি আর কোন মানুষের দেখি নাই। এই আত্মবিসর্জনের পশ্চাতে কত বড় একটাশক্তি প্রতিভার কি জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।' নিবেদিতার কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুর-বাড়ীর আর একটি প্রধান আকর্ষণ। এঁর শিল্প-সৃষ্টির মাঝে, বাংলার চিত্রকলার মধ্যে, অধ্যাত্মবাদের একটি মনোরম যোগসূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন।

বসুবিজ্ঞান মন্দির বাংলার আর একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠাতা জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী অবলা বসুর সঙ্গে নিবেদিতার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ ছিল। আর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ডন সোসাইটির সঙ্গেও তিনি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। নিবেদিতা কয়খানা অমূল্য গ্রন্থ পাঠকসমাজকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন, এদের মধ্যে স্বামীজীর সম্বন্ধে লেখা The Master as I saw him' বই খানি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। The Web of Indian life' নামক বইটিতে ভারতবর্ষের জীবনধারার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

ভারতের নানাতীর্থে পরিভ্রমণ করে নিবেদিতা রাজগৃহ সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেন, এটির নাম Footfalls of Indian History, পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তাঁর অদ্ভুত পারঙ্গমতা দেখা গিয়েছিল। তাঁরই

স্কুলবাড়ীটি থেকে স্বামীজীর ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সম্পাদনায় যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ' এ তিনি নিয়মিত রচনা পাঠাতেন। কিছুদিনের জন্য তিনি 'কর্মযোগিন' নামে একখানা পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

ইতিহাস কিছুই ভোলে না, জীবনের বৃহত্তর মহিমায় মহিমান্বিতা নিবেদিতাকে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সে আরও বেশী মর্যাদাদান করেছে। বিচ্ছেদ বা মৃত্যুই সব শেষ নয়, নিবেদিতার খণ্ড জীবনের অবসানে তাই সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটেনি। খণ্ডিত সমাপ্তি একটি মহাজীবনের পূর্ণচ্ছেদ নয়, এর যাত্রা কালের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে অব্যাহত থাকে। নিবেদিতার আলোকময় জীবন যখন ভবের হাটে পসরার পালা শেষ করে অমৃতপথগামী, তখন জীবন থেকে ইতিহাসের পাতায় যাবার সময়ে এই মহাপ্রয়াণের ক্ষণটিতে ভারত প্রত্যক্ষ করেছিল মৃত্যুর এক স্বতন্ত্র মহিমা, ভারতের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নিবেদিতার পঞ্চভূতের সত্তাকে একাত্মরূপে গ্রহণ করেছিল। ভারতবাসীর চিন্তায়, জ্ঞানে, কর্মে, এক নিবেদিতা বহুধা হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন—এই হল তাঁর মৃত্যু থেকে অমরত্বে উত্তরণ। এই চিরঞ্জীব প্রবহমানতার মধ্যে এক অমর প্রাণের সঞ্চার হয়ে গেছে, তার কাছে খণ্ড জীবনের ছেদ পরাজয় স্বীকার করেছে। সেই অমৃততিলক শিরোভূষণ করে নিবেদিতা জনমানসে অন্তহীন সূর্য শিখার দীপ্তি :

"বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর,
বিস্মৃতির বিস্তার, যেন বাষ্প পরিবেশে তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপ রূপান্তরে।"

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ লেডী অবলা বসুর কোলে অন্তিমশয়ানে নিবেদিতাকে প্রত্যক্ষ করে বিষাদ গম্ভীর হিমালয় হয়ত নীরব প্রশ্ন রেখেছিল, 'এ আলোকময় জীবনের অন্ত কোথায়? বেদনার বজ্র ও শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির মণি-মাণিক্যের মালা দিয়ে যে জীবন গাঁথা হয়েছিল তার দীপ্তির কী এই শেষ?' মহাকাল তাঁর অভিনন্দন গাথায় এর উত্তর দিয়েছে—

"তুমি যে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছ তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে তব অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি নারী,
দুবাহু বাড়ালে।"

অমৃতলোকবর্তিনী নিবেদিতার কাছে মৃত্যুর নশ্বরতা পরাজয় স্বীকার করেছে, আজও ভারতের হৃদয় মন্দিরে তিনি মহাজীবনের মর্যাদায় বিশিষ্ট পূজিতা। শতবর্ষের মহিমময় গর্ভকাল প্রসব করেছে নিবেদিতার স্মৃতিতর্পণের পুণ্যদিন, সেদিন, 'সহস্রদিনের মাঝে এইদিনখানি হয়েছে স্বতন্ত্র নিরন্তর।' এই স্মরণোৎসবের দিনটি পরম সান্ত্বনা রেখেছে যে ক্ষুদ্র যাওয়া আসার গণ্ডীতে সে মহাপ্রাণ বন্দী নেই, "The same sun is newly born in new lands, in a ri g of endless dawns."

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের রূপ ও মুখশ্রী-সৌন্দর্য্য যে বিশেষভাবে নির্ভর করে তাঁদের চিবুকের গঠন-লালিত্যের উপর—সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। অনিয়মিত আহার-বিশ্রাম, চলা ফেরা, শয়ন-উপবেশন এবং দৈহিক-স্বাস্থ্য বজায় রাখার উপযোগী ব্যায়াম-খেলাধূলা, স্নান-প্রসাধন, অঙ্গ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে অবহেলা আর ঔদাসীন্যের ফলে, আমাদের দেশের তরুণী-মহিলাদের অনেকেই অল্প-বয়সে চিবুকের নীচের অংশ বেয়াড়া-ধরণের মেদবহুল, স্থূল, ভারী এবং বিশ্রী 'দু 'ভাঁজ' বা 'Double Chinned' হয়ে যায়। মুখশ্রী-লালিত্যের শোভা অটুট ও দীর্ঘস্থায়ী এবং

অকাল-বার্দ্ধক্যের করালগ্রাস থেকে নিজেদের রূপ-মাধুর্য্য বাঁচিয়ে রাখতে হলে, প্রত্যেক মহিলারই কর্ত্তব্য—নিত্য-নিয়মিতভাবে একালের বিশিষ্ট-অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও রূপচর্চ্চাবিশারদেরা সহজ-সরল পদ্ধতির যে সব বিশেষ-ধরণের 'ঘরোয়া' ব্যায়াম-ভঙ্গী এবং উপযুক্ত দেহ-পরিচর্য্যার উপায় বলেছেন, ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে সেগুলি সযত্নে মেনে চলা। চিবুকের শ্রী-কমনীয়তা বজায় রাখার উপযোগী বিশেষ-ধরণের এ সব ব্যায়াম-চর্চ্চার বিধি-ভঙ্গী সম্বন্ধে, গত সংখ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা মোটামুটি কিঞ্চিৎ হদিশ দিয়েছি। ইতিপূর্ব্বের সেই আলোচনারই জের টেনে, এবারেও বলছি সুশ্রী-সুঠাম চিবুক গড়ে তোলার উপযোগী সহজ-সরল ও ঘরোয়া ধরণের আরো কয়েকটি বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের কথা।

চিবুকের ব্যায়াম-সাধনে তৃতীয় বিধি হলো—ঘরের সমতল-মেঝের উপর পায়ে-পায়ে জোড়া-লাগিয়ে দেহটিকে আগাগোড়া খাড়া রেখে সিধাভাবে দাঁড়ান। তারপর কোমরের দু'দিকে দুই হাত আলতোভাবে রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সামনের দিকে মাথাটিকে ঝুঁকিয়ে গলার নীচে বুকের উপরাংশে—যত নীচে পারেন—চিবুক রক্ষা করুন। এভাবে সামান্যক্ষণ চিবুক-রক্ষার পর, পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপরাংশ থেকে চিবুকটি তুলে নিয়ে ক্রমশঃ দেহের পিছন দিকে…অর্থাৎ, ঘাড়ের পশ্চাদ্‌ভাগের পানে—যতখানি পারেন—চিবুকটিকে হেলিয়ে রাখুন। দেহের পিছন দিকে এভাবে সামান্যক্ষণ চিবুক হেলিয়ে রাখার পর, পুনরায় ঘাড় সিধা করে খাড়াভাবে দাঁড়াবেন এবং ব্যায়াম-বিধির পূর্ব্বোক্ত প্রথম-ভঙ্গীর…অর্থাৎ, বুকের উপরাংশে চিবুক রক্ষা করবেন। তারপর পূর্ব্বোক্ত উপায়েই ব্যায়াম-বিধির দ্বিতীয়-ভঙ্গী…অর্থাৎ, দেহের পিছন দিকে—ঘাড়ের পানে মাথা হেলিয়ে রেখে সুষ্ঠুভাবে চিবুক-গঠনের ব্যায়ামটি অনুশীলন করবেন প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে, দশ-পনেরো বার। অনুশীলনকালে, গোড়ার দিকে দশ-পনেরোবারই যথেষ্ট…তারপরে পর্য্যায়ক্রমে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীর মাত্রা বাড়িয়ে ত্রিশ-চল্লিশ…এমন কি, পঞ্চাশবারও নিত্যনিয়মিতভাবে অভ্যাস করা যেতে পারে। নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের ফলে, চিবুক সুশ্রী-সুগঠিত হয়ে উঠবে এবং 'দো-ভাঁজ' (Doubl Chin) চিবুকের মেদ-বাহুল্যের সম্ভাবনাও কমবে—মুখের শোভা-লালিত্যও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

চিবুকের ব্যায়াম-সাধনের চতুর্থ বিধি হলো—ইতিপূর্ব্বে-বর্ণিত পদ্ধতির মতোই সমতল-জমির উপর দেহটিকে খাড়া রেখে সিধাভাবে দাঁড়ান। তবে, এবারে আগের ভঙ্গীর মতো পায়ে-পায়ে জোড়া লাগিয়ে দাঁড়াবেন না। দেহটি সিধাভাবে রেখে—দুই পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়ান এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যায়াম-ভঙ্গীর মতোই দুই হাত আলতোভাবে দুই কোমরের উপর রাখুন। ঘাড়টিকে প্রথমে খাড়া-সিধাভাবে রাখবেন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টিকে একবার ডানদিকে যতখানি পারেন, ফিরান এবং অল্পক্ষণ স্তব্ধ-স্থির হয়ে থেকে নিশ্বাস ত্যাগ করুন। সামান্যক্ষণ এভাবে স্তব্ধ-স্থির থাকার পর, পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত-রীতিতে ঘাড়টিকে সিধা-খাড়া রেখে দেহের ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে ফিরাবেন ও আগের মতোই অল্পক্ষণ স্তব্ধ-স্থির হয়ে থেকে নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। এমনিভাবেই এ ব্যায়াম-ভঙ্গিটিও—একবার ডানদিকে এবং তারপর বাঁ-দিকে ঘাড় ফিরিয়ে—নিত্যনিয়মিত অন্ততঃপক্ষে, দশ-পনেরোবার অভ্যাস করলে, চিবুকের গঠন-শোভা সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। এ ব্যায়াম-ভঙ্গিটিও গোড়ার দিকে দশ-পনেরোবার থেকে সুরু করে, পর্য্যায়ক্রমে মাত্রা বাড়িয়ে পরে ত্রিশ-চল্লিশবারও নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা যেতে পারে।

চিবুকের ব্যায়াম-সাধনে পঞ্চম বিধি হলো—মজবুত একটি চেয়ারের উপরে দেহটিকে খাড়া-সিধাভাবে রেখে বসুন। এমনভাবে বসবেন, তলপেটের পেশীগুলিতে যেন টান পড়ে এবং চেয়ারের পিঠে যেন মেরুদণ্ডের ভর থাকে। এভাবে আসন গ্রহণের পর, দুই হাত আলতোভাবে রাখুন কোলের উপর এবারে চিবুকটিকে উঁচু রেখে মাথাটিকে -- যতখানি পারেন—দেহের পিছন দিকে হেলিয়ে দিন। মুখটিকে ঈষৎ খোলা রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সামনের দিকে মাথাটিকে হেলিয়ে দিন—যতখানি নীচে পারেন—চিবুকটি যেন বুকের উপরাংশ স্পর্শ করে—এমনিভাবে। এভাবে

চিবুকটিকে নীচু করে মুখ বুঁজবেন এবং নিশ্বাস ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে সামান্যক্ষণ স্তব্ধ-স্থির হয়ে থাকবেন। তারপর পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপরাংশ থেকে চিবুক ও মাথা তুলে ক্রমান্বয়ে দেহের পিছন দিকে হেলান—যতখানি পারেন। এভাবে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে দেবার সময় মুখটিকে পুনরায় ঈষৎ খোলা রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণ করবেন। মাথাটিকে দেহের পিছন দিকে সম্ভবমতো হেলিয়ে দেবার পর, পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি অনুসারে নিশ্বাস ত্যাগ করবেন এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যায়াম-বিধিগুলির মতোই মুখ বুঁজে অল্পক্ষণ স্থির-স্তব্ধ হয়ে থাকবেন। এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের ফলে, শুধু চিবুকের শ্রীসৌষ্ঠবই নয়—কণ্ঠের ও গালের পেশীরও যথেষ্ট উন্নতি হবে এবং মুখ-মণ্ডলের শোভা-লালিত্যও বৃদ্ধি পাবে সবিশেষ।

আধুনিক-জগতের অভিজ্ঞ-চিকিৎসক ও রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা চিবুকের সৌন্দর্য্য-কমনীয়তা অটুট ও দীর্ঘস্থায়ী রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষ-ধরণের যে সব ঘরোয়া এবং সহজ-সরল ব্যায়াম-বিধির নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন, আপাততঃ, সেগুলিরই মোটামুটি কয়েকটি হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও রূপ-লালিত্য-শোভা বর্দ্ধনের উপযোগী আরো কয়েকটি আধুনিক ব্যায়াম-অনুশীলন পদ্ধতির প্রসঙ্গ আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

সূচীশিল্প

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় আলোচিত প্রসঙ্গের জের টেনে, এবারেও সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী 'কৌচিং' (Couching) রীতির আরো দুয়েকটি বিচিত্র-অভিনব 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative motifs) নমুনা প্রকাশ করা হলো। সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে, এ-ধরণের নমুনা রচনা—সূচীশিল্পানুরাগিণীদের পক্ষে, আদৌ কঠিনসাধ্য ব্যাপার নয়। সামান্য চেষ্টা করলেই, যে কোনো শিক্ষার্থী খুব সহজ-সরল উপায়ে এ ধরণের 'আলঙ্কারিক-নক্সার' সাহায্যে সৌখিন-সুন্দর ছাঁদে গৃহসজ্জা এবং সংসারের বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী নানা রকম সামগ্রী রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন।

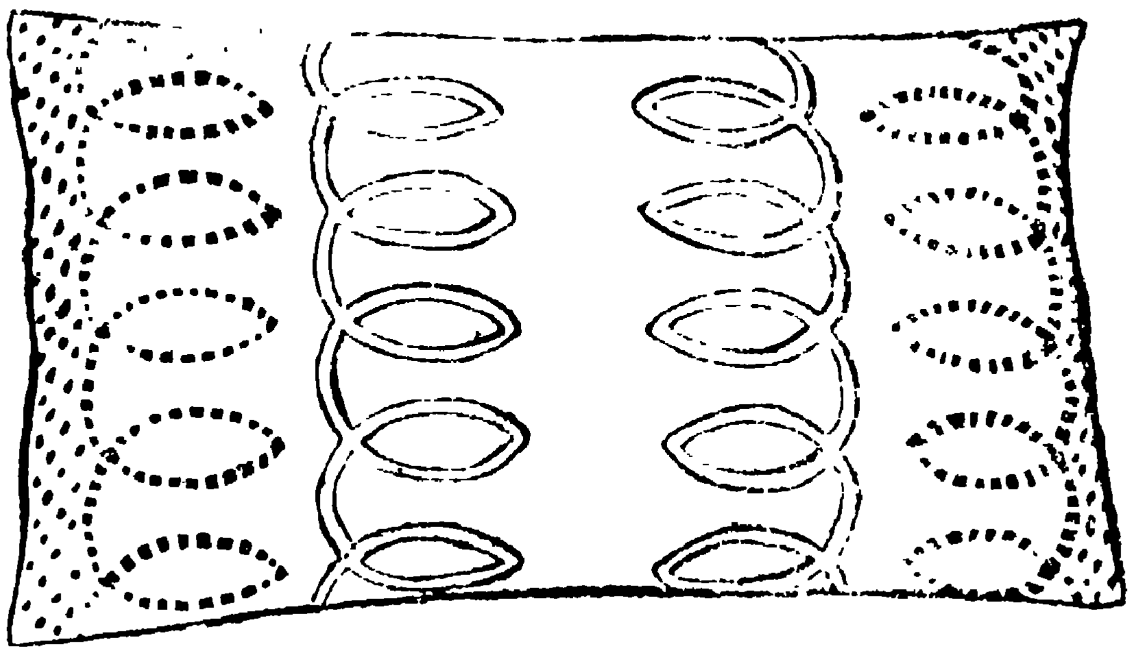

ঝ

উপরের 'ঝ'-চিহ্নিত চিত্রে 'কৌচিং'-পদ্ধতিতে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের উপযোগী যে 'আলঙ্কারিক-নক্সার' নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি অনায়াসেই সৌখিন ছাঁদের কুশন, তাকিয়া, বালিশের ওয়াড়, বিছানা-ঢাকা, পর্দ্দা, টেবিল-ক্লথ, টি-কেজি (Tea Cosy), গলাবন্ধ-মাফলার, স্কার্ফ, মহিলাদের ব্যবহার্য্য 'ষ্টোল্' (Stole) হাত ব্যাগ, বটুয়া-থলি, শিশুদের হাতের দস্তানা (Mittens)…এমন কি, ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক, রম্পার প্রভৃতি পোষাক অলঙ্করণের ব্যাপারেও সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। কি উপায়ে এ-ধরণের নক্সা-নমুনাটিকে বিভিন্ন সামগ্রী অলঙ্করণের কাজে ব্যবহার করা যাবে, সে সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা—স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ সম্ভব নয়। তবে পরপৃষ্ঠায় 'ঞ' চিহ্নিত চিত্রটি দেখলেই সূচীশিল্পানুরাগিণীরা সহজেই এ সম্বন্ধে মোটামুটি খানিকটা আভাস পাবেন।

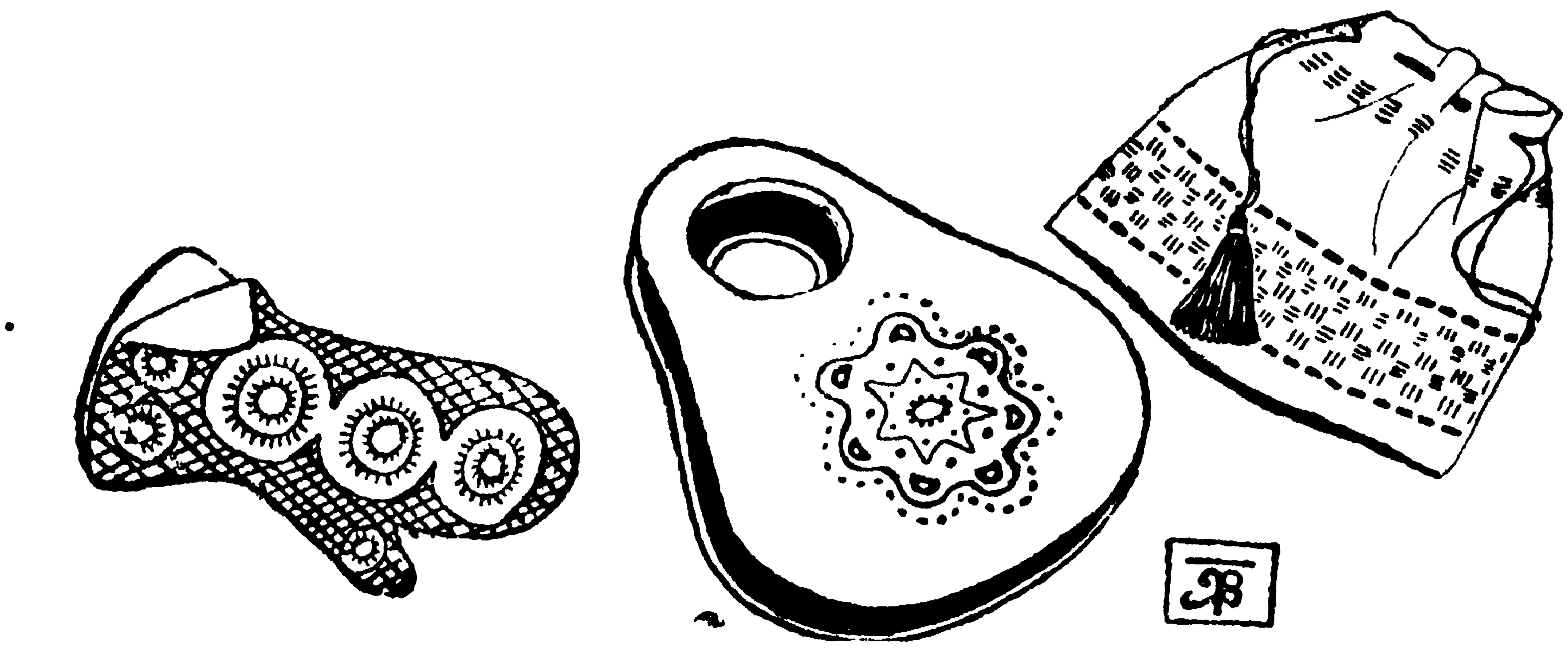

আমাদের ধারণা—উপরোল্লিখিত চিত্রের আভাস থেকে সূচীশিল্পানুরাগিণীরা সকলেই নিজেদের ব্যক্তিগত রুচি, প্রয়োজন এবং সুবিধা অনুসারে 'কৌচিং' পদ্ধতির সহজ-সরল এ সব নক্সা-নমুনাগুলিকে অনায়াসেই তাঁদের কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া এ সব নক্সারই অল্প-বিস্তর রূপান্তর এবং অদল-বদল সাধন করেও তাঁরা সহজেই ও সুষ্ঠুভাবে আরো নানান্ ধরণের সৌখিন সুন্দর বিচিত্র অভিনব ছাঁদের সূচীশিল্প সামগ্রী বানিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

আপাততঃ, 'কৌচিং' সূচীশিল্প-পদ্ধতির বিভিন্ন নক্সা-নমুনাগুলির মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখলুম। আগামী সংখ্যায় এ সব নক্সা-নমুনাকে 'কৌচিং'-পদ্ধতি অনুসারে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে কি উপায়ে সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের উপর পরিপাটি-ছাঁদে ফুটিয়ে তোলা যাবে—সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনার বাসনা রইলো।

———

সুন্দর

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আজি শান্ত উষায়, দক্ষিণবায়,
তোমায় হেরিনু সুন্দর,
তোমার আলোয় হ'ল আলোকিত
জীর্ণ হৃদয় কন্দর ;
আমি জনমে, জনমে, লক্ষ জীবনে,
তোমারেই ভালবেসেছি,
আমি শয়নে, স্বপনে, জ্ঞানে, আরাধনে,
তোমারেই বুকে চেয়েছি,
সাগরে, অনিলে, গিরিশিখরে, সলিলে
তোমারেই খুঁজে ফিরেছি,
ওগো সাধনার ধন, মাণিক রতন
তোমারে কি আমি পেয়েছি ?
কোন্ স্বরগেতে, বসতি তোমার,
কোথা আছ তুমি বল না,—
তিমির নাশিয়া, এস, এস প্রিয়,
বুকে বাঁধ তব দোলনা !

গল্প

বঞ্চিতা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১

সেকালের বাসর ঘর। দুদিকে দুটো বড় আলো জ্বলছে জোরালো। মখমলের তাকিয়া কিংখাবের বিছানা ছিল। মূল্যবান গালিচা। ফুলের প্রকাণ্ড তোড়া তাকিয়ার দুপাশে। বর-কনের গলায় জরীর পাতমোড়া গোড়ে মালা। ফুলে গহনায় দামী বিছানায় শয্যায় কনের গায়ের সজ্জায় আভরণে অলঙ্কারে ধনীবাড়ীর বিয়ের সমারোহের দৃশ্য পরিস্ফুট।

সেকালের ৭০।৮০ বছর আগের বিয়ে। বর কিশোর, বয়স আঠার উনিশ মাত্র। সুদর্শন কান্তরূপ উজ্জ্বল রং।

পাশে গাঁটছড়া বাঁধা কনে বসে। বয়স ১২।১৩। কিন্তু দেখতে যেন ১৯।২০ বছরের স্থূল দেহ মোটা সোটা বিরাট এক নারীমূর্ত্তি। কালো রং। কুলুঙ্গী কাটা মুখ। কোটরে ঢোকা চোখ। ভারি গালের চাপে নাক ছোট্ট হয়ে ডুবে আছে। শুধু ঠোঁটখানি পাতলা। দাঁতগুলি ভালো।

সে যাইহোক, তরুণ বয়স হালকা চেহারা প্রিয় দর্শন বরের পাশে সে যেন একটী প্রত্যক্ষ অন্ধকারের স্তপ মূর্ত্তি ধরে বসেছিল।

শুভদৃষ্টির সময় পিঁড়ির ওপর ওই বিভীষিকাটীকে বর এক নজরেই দেখতে পেয়েছিল। মেয়ে হলে চোখ বুঁজে থাকত। বর চোখ বোজেনি। সভয়ে অবাক স্তম্ভিত হয়ে কনের দিকে চেয়ে ছিল।

একে একে শুভদৃষ্টি, স্ত্রী আচার হয়। ছেলের পাশে মেয়েকে পিঁড়ি করে ঘোরায় লোকে আর সকৌতুকে "বর বড় না কনে বড়" বলে। বরযাত্রীরা মনে মনে এবং প্রকাশ্যেও কেউ কেউ বলে কনে তো নয় বড়দিদি ঠান্‌দিদি।

রেশমীচাদরে গাঁটছড়া বাঁধা মেয়েটিকে নিয়ে বাসরে আসবার সময়ও তারা বলাবলি করলে যেন কিশোর রাখাল বালককে একটী মহিষ (মহিষমর্দিনী!) নিয়ে চলেছে।

বাসরে এসে বসল। মেয়ের কালো থোবা থোবা ছোট্ট হাতে আর বরের সরু সূক্ষ্ম সুন্দর আঙুলে কড়ি খেলা হয় বিচিত্র কড়ি খেলার ভাঁড় উল্টে উল্টে। সবাই সকৌতুকে দেখে আর হাসে। শেষ হয় খেলা।

অনেক রাত্রে তরুণী সংঘের প্রলাপিত আলাপ শেষ হল। বিমূঢ় বর অনুকূল চন্দ্রের প্রলাপই মনে হচ্ছিল। এবারে নিঃস্তব্ধ বাসর ঘরে সুপ্ত কনের দিকে তার চোখ পড়ল। তার মনে হল যেন লাল চেলী পরা এক স্তূপাকার একটী অন্ধকার মাংসপিণ্ড তার পাশে ঘুমুচ্ছে! সে চোখ ফিরিয়ে নিলে নিদারুণ বিতৃষ্ণায়।

বাসরের পাশে জড় হওয়া ছোটবড় ছেলেমেয়েও সেখানেই প্রথামত সকলেই ঘুমোলেন। কোনো না কোনো গৃহিণী এসে জামাইয়ের সুখ সুবিধার তদারক করে গেলেন। কোনো ঠানদিদি স্থানীয়া কিঞ্চিৎ বাজে কথা ও রসিকতা করে গেলেন নিদ্রাহীন নেত্র জামাইকে দেখে।

সকালে আবার বাসিবিয়ের স্ত্রী আচার। শয্যা তোলানী কত কি! বরের পিতা, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব বরযাত্রী জড় হলেন এবারে বর কনে নিয়ে যাবেন। শেষ হল এবাড়ীর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কর্ম।

অনুকূল ভাবে তারপর? ওঃ তারপর।

তার তরুণ মন বিভ্রান্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওঃ কি করবে সে! কি করবে!

২

মা এলেন চেলী বারাণসী পরে বরণ করতে। ছেলের মুখ মেঘের মত অন্ধকার, গম্ভীর। ছেলের সামনে দুধে-আলতার পাথরে কনে বৌ কালো থামের মত দু খানি পা

রেখে দাঁড়াল। তাঁর রূপবান্ ছেলের পাশে বৌ যেন মূর্তিমতী একটী জমাট বাঁধা অন্ধকার !

ছেলের অন্ধকার মুখ দেখে জননীর তার মনের কথা বুঝতে বাকি রইল না।

সে শুধু বললে 'তাড়াতাড়ি কর। আমি স্নান করে শোব একটু।' মা ভীতহলেন। কর্তার মতিচ্ছন্ন ধরেছিল। কেমনি করে এমন সোনার চাঁদ রাজপুত্রের মত ছেলের এই বৌ আনে !

বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন। ভারি কথা! একেবারে রামের সত্য পালন। কি করবেন ঐ বৌ নিয়ে। যদি ছেলে বেঁকে বসে, ঘরে না থাকে! রেগে কোথায়ও চলে যায়! আগেই বলেছিল বিয়ে এখন করব না। বাপের বুদ্ধিতে এই বিপদ ঘরে ডেকে আনা হল। এই মহিষ-মর্দিনী বৌ দেখে তাঁরই হাড় পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। ছেলের-তো যাবেই।

বরণ, মাঙ্গলিক আচার নিয়ম শেষ হ'ল।

এবং ছেলেও একেবারে বাইরের ঘরেরদিকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পরদিন ফুল শয্যা। বৌভাতও বটেই-তবার কিছু অনুষ্ঠানও আছে।

ছেলে গম্ভীর মুখে মাকে আর বোনদের বলে গেল। 'যা করবার আজ কর আর আজই শেষ। আর কোনোদিন ঐ রক্ষেকালীর ছায়া মাড়াবনা'।

৩

ছেলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। মাকে বলে বড় পড়ার চাপ। এখন আর সময় নষ্ট করলে পাশ করতে পারবনা। বাবা অত খবর রাখেন না তার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের। তবে পড়া শোনার খবরে খুব খুসী।

মার্চে পরীক্ষা শেষ হল।

ছেলে অনুকুলচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরুলো।

মাসকয়েক পরে চিঠি এলো মার কাছে আমি একটা স্কুল কাজ পেয়েছি। ঢুকে গেলাম। এরি সঙ্গে বি, এ, পড়ে নোব। রক্ষাকালী বৌ বাপের বাড়ীতে আছে দূর থানেকের জন্য।

মা খবর দেন। কিন্তু ছেলে বাড়ী আসার কথায় মুখে ছুটী নেই।

দুতিন বছর কেটে যায়। কথনো কদাচ একদিনের জন্য বাড়ী এসেছে তার পরেই পলাতক। ক্রমে ছেলের বন্ধুদের কাছে পিতা মাতা কানা ঘুসো খবর পেলেন সত্য সত্যই ছেলে তার কোন বন্ধুর বোনকে বিয়ে করেছে।

বাপ রাগে ফেটে পড়েন। মা ভয়ে তটস্থ। ছেলের সেই বৌ এখন আসা যাওয়া করছে।

নীরব শান্ত মুখ। শ্যামবর্ণ। মোটামুটী স্নিগ্ধ মেয়েটী। রূপ না থাক গুণ আছে।

শ্বশুর শাশুড়ীকে সেবা যত্ন করে। খুব অনুগত। স্বামীর বিয়ের খবর পেয়েছে। কিন্তু তার মনের কথা কিছু বোঝা যায় না। দুঃখ হয়েছে? ক্ষোভ হয়েছে? তার বাপের বাড়ীর কেউও জানেন না। বাপের একমেয়ে বড় আদরের। কালোকুৎসিত, বলে তার জন্য কিছু চিন্তাও ছিল তাঁর মনে তাই তার জন্য কিছু সম্পত্তির ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। যদি টাকার লোভে, বিষয়ের লোভে জামাইকে বশ করা যায়!

নীরব কৃষ্ণা মেয়েটী নীরবই থাকে। ষোলোবছর বয়স হল যদিও। সহসা বিদেশে বসে অনুকুলচন্দ্র খবর পেলেন। পিতার মৃত্যু হয়েছে। এবারে বাড়ী আসতে হয় দ্বিতীয়'কে সঙ্গে নিয়েই। মা ভেঙে পড়েছেন। লৌকিক কর্তব্য শ্রাদ্ধ-শান্তি সবই তো করতে হবে।

একটী ছোটমেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে অনুকুলচন্দ্র বাড়ী এলেন সব কর্তব্য শেষ করে মাকে এবং প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে কর্মস্থলে গেলেন।

৪

তার পর চল্লিশ বছর কেটে গেছে।

বৃদ্ধ অনুকুল চন্দ্র কাজ থেকে অবসর পেয়েছেন। মার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে বিবাহিতও হয়েছে। এই স্ত্রী প্রৌঢ়া গৃহিণী। সুখী পরিবার।

নাঃ, মনে কোনো খোঁজ দুঃখ অনুভুতি কারুর জন্যই তাঁর নেই। সেই কালো মেয়েটীর জন্য সেই স্তূপাকার অন্ধকারের জন্য? নাঃ, তাকে তিনি ভুলে গেছেন।

কিন্তু সে তো তার মার সঙ্গে এসেছিল তাঁর বাড়ীতে। তার কি তবে মৃত্যু হয়েছে? কোথায় সে? এখন তো এই স্বচ্ছন্দ সংসারে সে নেই।

তার কথা তাঁর মনেও নেই তাহলে!

শরৎকালের প্রসন্ন সকাল। নিজের প্রবাসের পর বিচ্ছিন্ন বাড়ী। ছেলেমেয়েরা কৃতী ও সুখী।

ডাকের চিঠি এলো। খবর কাগজ। চিঠি। বই।

বিধবা কন্যা ডাক হাতে নিয়ে বললে এটা কার চিঠি বাবা? অচেনা নতুন হাতের লেখা? তোমারি নাম যদিও, ঠিকানা ভুল করেছে তাই ঘুরে এসেছে অনেক ছাপ নিয়ে।'

পিতা বললেন 'দেখি।'

চিঠি খুললেন। অজানা মানুষের ছোট ছোট অক্ষরে লেখা চিঠি।

শুভাশীর্বাদ বিশেষ,

আপনার স্ত্রী সরোজিনী দেবী গত ১২ই আশ্বিন বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাঁর ইচ্ছানুসারে এই পত্রে জানাইতেছি তাঁর কিছু অলঙ্কার আর কিছু অর্থ সম্পত্তি তিন আপনার পুত্র-কন্যাদের দেবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। অদ্য তাহা পাঠাইলাম।

শ্রাদ্ধাদি এখানে ব্রাহ্মণ দ্বারা করানো হইয়াছে, তাঁর ইচ্ছানুসারে। কেন না তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন ধাম। ১৫ই আশ্বিন ১৩৫০ ইতি ভবদীয়
শুভানন্দ

গোবিন্দাশ্রম

চিঠিখানার অক্ষরগুলো কি অবোধ্য? অনুকূলবাবু চিঠিখানা হাতে নিয়ে অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে আছেন কেন? মেয়ে ভাবে। কার চিঠি বাবা? দেখব কোন বিশেষ খবর নাকি?'

চিঠিখানা অনুকূলবাবুর হাত থেকে পড়ে গেল।

মেয়ে তুলে নিলে।

ছোট্ট চিঠি। মেয়ের পড়া তখনি হয়ে গেল। মেয়ে স্তব্ধ। পিতাও নীরব।

জননী এলেন কি কাজে। পিতা পুত্রীকে একখানা চিঠি নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বললেন 'কার চিঠি?' কিছু খবর আছে নাকি?

অমন করে বসে যে? দেখি।'

এবারে তিনিও নীরব হয়ে গেলেন। তারপর স্বামীর মুখের দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

শোক? দুঃখ? শোচনা? অনুশোচনা? লজ্জা? সঙ্কোচ ধর্মভয়? অপরাধবোধ?

অনুকূলবাবু নীরবে স্থাণুর মত বসে রইলেন।

মেয়ে কাজকর্ম করতে চলে যায় আবার ফিরে আসে। কেউই মা বা মেয়ে কোনো কথা বলতেও পারে না। জিজ্ঞাসাও করে না।

নিয়মিত স্নানাহার কারুর বাদ পড়ল না। অশৌচ কিনা সে সমস্যাই নেই।

তিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন। অনুকূলবাবু ভাবেন। সে গৃহ জীবনের কোনো সম্পর্কই আর রাখেনি তাহলে। কবে সন্ন্যাসিনী হ'ল? কেন হ'ল? তার তো পিত্রালয়ে অনেক স্বজন ভাই বোন।

সন্ধ্যা হল। মেয়ে এসে পিতার কাছে বসল। এই বিমাতার কথা তাদের যে একেবারে অজানা ছিল কিংবদন্তীর মত তা নয়। অন্য লোকের মুখে মুখে তাদের কানে পৌঁছেচে। কিন্তু তিনি কোথায়, জীবিত না মৃত, আর কেনই বা পিতা আবার বিবাহ করেন, আগেই কি তিনি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন? না পরে? পিতাও কি তা' জানতেন না? সে সব কাহিনী তারা জানে না।

মেয়ে বললে, বাবা, ওঁদের চিঠির কি উত্তর দিতে হবে?

পিতা সচকিত হয়ে উঠে বসলেন ইজিচেয়ারে।

বললেন 'হ্যাঁ আমি তোমাকে বলে দোব একটা চিঠি লিখে দিও।

একটু খানিক চুপ করে থেকে বললেন 'তাঁর অনেক গহনা ছিল তাঁর বাবা তাঁকে দিয়েছিলেন। আমার মা বাবাও দিয়েছেন কিছু।'

পিতার চোখ শুকনো। কিন্তু গলার স্বর বিমর্ষ। মুখ ম্লান।

মেয়ে বললে, 'তা তিনি চলে গেলেন কেন? আমরা তো তাঁকে একেবারেই দেখিনি? কবে চলে গেছেন!'

ভাবে, কোনো সামাজিক কারণ ছিল কি? না, লোকনিন্দা ছিল? জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

সে আর কিছু বলে না।

পিতা একটু চুপ করেই রইলেন তারপর বললেন 'তোমার দু বছরের সময় তিনি চলে গেছেন। তোমাদের

তাঁকে মনে নেই। তখন তোমার ঠাকুমাও বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁকে স্নেহ করতেন।'

মেয়ে সাহস পেল 'তা' চলে গেলেন কেন? ঠাকুমার কাছেও রইলেন না?

জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হয় 'তুমি তিনি থাকতেই আবার বিয়ে কেন করেছিলে? কেন না পিতা বলছেন সে দুবছরের মেয়ে ছিল।'

পিতা শুকনো আড়ষ্ট গলায় বললেন, 'আমি তাঁকে অসম্মান করেছিলাম।'

মেয়ে সঙ্কুচিত ও নীরব। তাদের বাবা, তাদের এত শ্রদ্ধেয় পিতা কি অসম্মান করেছিলেন সেই প্রথমা স্ত্রীকে? কেন করেছিলেন? সেই নারীকে? তবে তিনি কি কোনো অন্যায় করেছিলেন? আবার বিয়েই বা কেন করেন? অনেক প্রশ্ন।

না, পিতার চোখে জল আসেনি। কিন্তু মুখ লজ্জিত —বেদনায় ভরা।

স্মৃতির অতল থেকে নাঃ স্মৃতির সামনেই সেই জীবন স্মৃতি জল জল করছিল। অনুকুলবাবু বললেন, 'তিনি দেখতে ভালো ছিলেন না? তাঁর পিতাকে আমার বাবা কথা দিয়েছিলেন বলে আবার সেখানে বিয়ে দেন। আমার তখন আঠারো বছর বয়স। পড়ছি, বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল। তাঁর চেহারা দেখে তাঁর ওপর বিতৃষ্ণায় বাবার ওপর রাগে আমি পালিয়ে এসে এখানে চাকরী নিলাম। আর তোমার এই মাকে— উনি আমার এক বন্ধুর বোনকে বিয়ে করলাম। বাবা রাগে আমার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিলেন। ঐ বৌকে বাড়ী এনে ঘর করতে লাগলেন।'

মেয়ে ভাবেন বিমাতা দেখতে ভালো ছিলেন না? ভালো দেখতে নয়?

সেও তো পিতামাতার মত সুন্দর হয় নি লোকে বলে। দেখতে মোটেই ভালো নয়।… তার স্বামী এখন বেঁচে নেই বটে, কিন্তু ত্যাগ তো করেন নি। কালো কুৎসিৎ বলে ছোটও করেন নি। কিছু বলেন নি। তবে কি বিমাতা আরো খারাপ দেখতে ছিলেন? কত খারাপ!

আহা! দেখতে খারাপ বলে বাবা তাঁকে ত্যাগ করেন। আবার অসম্মানও করেন।

আবার পিতা বললেন, তারপর আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি যখন মাকে নিয়ে এখানে আসার ব্যবস্থা করলাম, মা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। মা বোধহয় ভেবেছিলেন আমি ক্রমে তাঁর সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মতই থাকবো সেকালের মত। সেকালে তো অনেক সময় লোকে দুটো বিয়ে তিনটে বিয়ে করতো। সকলের সঙ্গেই থাকতোও।'

মেয়ে নীরব।

'তিনি তোমার ঠাকুমাকে খুব যত্ন করতেন। মাও তাঁকে ভালবাসতেন। তাঁর খুব সম্ভ্রম আর তেজ ছিল। মা বললেও তিনি আমার দিকেও থাকতেন না। এদিক মাড়াতেন না। তাঁর মনে বোধহয় চেহারার জন্য খুবই দুঃখ ছিল।

আমিও তাঁকে কোনো ঘনিষ্ঠতার সুযোগই দিইনি কখনো।

তিনি তোমাকে খুব ভালবাসতেন। তখন তোমার ভাই সমরেরও জন্ম হয়েছে।

অনুকুলবাবু থামবেন।

আমি তাঁকে আমল তো দিইই নি কোনো প্রশ্রয় বা ভাল ব্যবহারও করিনি। বেশ একটু বাদ দিয়ে ছোট করেই দেখতাম। আছে, থাক, আশ্রিতের মত। মা ভালবাসেন মার সেবা যত্ন করে করুক।

এমন সময় একদিন এমন একটা ঘটনা হল যা হওয়া উচিত ছিল না।'

শ্রোত্রী মেয়ে কাঠ হয়ে গেল বিহ্বল? কি ঘটনা?

পিতা বললেন, 'আমি আপিস থেকে এসেছি। তোমার মা আমার কাছে দাঁড়িয়ে কি কথা বলছেন। আর তোমার বড়মা তোমাকে কোলে নিয়ে ঠাকুমার ঘরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।

এমন সময়ে ধোপা এলো। বললে কাপড় কোথায় গুণে দোব? তোমার মা ব্যস্ত ছিলেন কথায় জবাব দিলেন না।

তোমার বড় মা বললেন 'ঐ বিছানার ওপর রাখনা। মিলিয়ে নেবেন এখনি।'

বিছানার ওপর কাপড় রেখে সে চলে গেল।

আমি ঘরে ঢুকে বিছানায় ধোপার কাপড় ছড়ানো দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

বললাম 'কাপড় বিছানায় কেন রাখালে। মাটিতে কিছু পেতে রাখাতে পারনি? ধোপা এসে বিছানা ছোঁয় কেন?

তোমার বড় মা একটু অবাক হয়ে বললেন 'তাতে আর কি দোষ হ'ল। বিছানার তো চাদর ওয়াড়ও ধোপার বাড়ীর জিনিষ নেওয়া হয়, রাখা হয়।'

তাঁর কথায় আমি আরো বিরক্ত হয়েই বললাম 'সে আলাদা কথা। এখন শোবার বিছানায় কাপড় রাখতে ওকে কেন বলা হল?'

তোমার বড় মা বললেন 'ও তো ময়লাকাপড় আনেনি কারুর বাড়ীর। সবই তো ফরসা আমাদেরই কাপড়।'—

এবারে তোমার মা এসে দাঁড়ালেন। বললেন 'মাটীতে রাখলেই তো হ'ত। আমি মা'দুর পেতে রাখাই। আসছিলামই তো।

আমি রেগেই ছিলাম। খুব একটা খারাপ কথা বলে বললাম, 'যেমন চেহারা তেমনি বুদ্ধি। ধোপাকে এবারে বিছানায় বসতে বোলো।...

তোমার মা 'যেমন চেহারা' শুনে হেসে ফেললেন। তোমার মা-তো সুন্দর ও ভালো দেখতে, তা তিনি জানতেন। আর সতীন যে কুরূপা তাই পরিত্যক্ত তাও জানতেন।

তোমার মার হাসি দেখে, আমার ধোপাকে বিছানায় বসতে বোলে শুনে তাঁর মুখটা অপ্রস্তুত ও ছোট্ট হয়ে গেল। তাঁর চোখে জল এলো কিনা দেখিনি। শুধু দেখলাম মুখটা কিরকম যেন হয়ে গেছে। তিনি তোমাকে তাঁর কোল থেকে নাবিয়ে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি তখন ভাবছি খুব ঠিক কথা বলেছি।

তারপরে আর জীবনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

মেয়ে অবাক দৃষ্টিতে পিতার দিকে চেয়ে রইল।

পিতা বল্লেন, তিনি কারুকে কিছু বললেন না। মাকেও না। রাত্রে যেমন মার কাছে শুতেন শুলেন। সে-রাত্রে বাড়ীতে কিছু খাননি পরে শুনেছি। পরদিন সকাল বেলা আমায় খুড়তুতো ভাইকে নিয়ে চলে গেলেন দেশে। মাকে বললেন তাঁর বাবার জন্য মন কেমন করছে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। একবার দেখা করতে যাচ্ছেন।

মা কিছু জানতেন না। আমরা তখন ভাবিনি সত্যিই তাঁর মনে অত আঘাত লেগেছে।

তারপর মা বার বার তাঁকে আনতে পাঠালেও তিনি আর একেবারেই আসেননি। কখনো শুনি, তাঁর বা[...] মার সঙ্গে তীর্থে গেছেন। বিদেশে গেছেন।

মা খুব দুঃখিত হয়েছেন। মার দেওয়া সোনার বা[...] তাঁর হাতে ছিল। আর সব গহনা এখানে ফেলে রে[...] গিয়েছিলেন। শুধু বাপের বাড়ীর গহনা কটা সঙ্গে ছিল সেইগুলিই আজ পাঠিয়েছেন ওঁর সেই বালাটাও। তারপ[...] কতদিন পরে তাঁর বাবা মারা গেলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম কি ভেবে। তখন তুমি বড় হয়েছ তোমার বিয়ের জন্য বিব্রতও হয়েছি, পছন্দ অপছন্দর ব্যাপারে! তাঁর কথাও মনে পড়েছিল সেই সূত্রেই কালো ও সুন্দর! তুমি তো ফর্সা ছিলে না।

খবর পেলাম তিনি আবার কোন তীর্থে চলে গেছেন সেখানে বৃন্দাবনে ও পুরীতে খোঁজ করেছিলাম। কিছু দেখা বা চিঠি পাই নি।

পিতা চুপ করলেন।

মেয়ে বললে, 'আর কখনোই তাঁর সঙ্গে কারুর দেখা হয় নি তোমাদের?'

একটু বিব্রতভাবে—এমন কি খারাপ কথা বলেছিলে বাবা-যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রইল না কারুর? বড়মা কি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন মনে?

অনুকূলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলেন। তারপর বললেন বলেছিলাম খুবই অপমান করে একটা কথা। অভদ্রভাবে কথা। বলেছিলাম যেমন ধোপানীর মত রূপ বুদ্ধিও তেমনি। রাগে তখন বুঝতে পারিনি-খুবই অন্যায় কথা চেহারা নিয়ে কারুকে কিছু বলা। অন্ধকারেই মেয়ের মনে হল বুঝি বাবার চোখে দুফোঁটা জল এলো।

অনুকূলবাবু বিভ্রান্ত ভাবে বাইরের সন্ধ্যা শেষের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে লাগল তাঁর রূপহীনতার জন্য তো তিনি দায়ী বা দোষী ছিলেন না। কেন এমন রূঢ় কথা স্পর্দ্ধা করে সেই শান্ত ভদ্র তরুণী নারীকে বলেছিলেন! বিধাতা তাঁকে সুন্দর করেন নি সে তো তাঁর অপরাধ নয়। আজ মনে হয় এই জীবনে একদিনের জন্যও যদি বলতে পারতেন তাঁকে যে আমি অন্যায় করেছি ভুল করেছি...। তখনো বলেননি। আরএখন তো বলা-বলির দিন শেষ হয়ে গেলো চিরদিনের মত!

তাঁর কাছে বসা নিজের রূপহীনা কন্যার দিকে চোখ পড়ল। যার বিয়ে দেবার সময় কত কটু রূঢ় কথা শুনেছেন। তিক্তভাবে মনে হল একেই কি বলে কর্মফল?

'ধোপানীর মত দেখতে।'... 'ধোপানীর রূপ গুণ!'

তাকেও তো লোকে ধোপানী বাগ্দিনীর মত দেখতে বলতে পারে অনায়াসে

শাঁখারী

শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা দ্বিপ্রহর হ'লো
শাঁখারী হাঁকিছে।
শাঁখা চাই, শাঁখা চাই!
বলিয়া ভ্রমিছে॥
ধীরে ধীরে আসি এক
সুন্দরী কুমারী।
রূপ তার দেখে কেবা
আহা মরি, মরি !!
বলিল ও শাঁখারী
শাঁখা মোরে দাও।
যত্ন ক'রে হাত দুটি
শাঁখাতে সাজাও॥
বেনারসী শাড়ী পরা
আল্‌তা পরা পদ।
দেখিলে মনে হয়
সাধক সম্পদ॥
শাঁখারী দুটি শাঁখা
দিল পরাইয়া।
কুমারী পিছন ফিরি
যায় যে চলিয়া।
শাঁখারী কহিল মাগো
কই দাম কোথা?
কুমারী দেখায়ে দিল
অট্টালিকা যেথা।
হরষিত শাঁখারী
অট্টালিকায় ধায়।
শাঁখার মূল্যের তরে
কর্ত্তাকে সুধায়॥
কন্যা তব পরিয়াছে
জোড়া সাদা শাঁখা।
দেখাইয়া দিয়াছে এই
সাদা অট্টালিকা॥
কন্যা কোথা? কন্যা মোর
নাহি ত রে কেহ।
নেশা ক'রে এসেছিস্ কি?
টলিতেছে দেহ।
কোথা প'রেছে শাঁখা
চল সেথা যাই।
সে স্থানে গিয়া দেখে
কন্যা কেহ নাই।
সম্মুখেই বড় দীঘি
তাহার জলেতে
দেখা যায় দুটি শাঁখা
লাল দুটি হাতে
উঁচু করি পদ্মহস্ত
কুমারী ঘুরায়
দেখিয়া মূর্চ্ছিত পিতা
ভূমিতে লুটায়॥
দুর্গোৎসব হয় গৃহে
বৎসরে বৎসরে।
মা দুর্গা পরিয়াছে
শাঁখা যে আদরে॥
জ্ঞান এলে বলে পিতা
ভাইরে শাঁখারী।
পদধূলি দে তুই
(আমি) কৃপার ভিখারী॥
ধন্য তোর ব্যবসা আর
ধন্য তোর শাঁখা।
দিন কিনে নিলি তুই
মোর সব ফাঁকা॥
শাঁখারী বলে শুন
বাবু মহাশয়।
ব্যবসা ঘুচেছে মোর
আর নয়, নয়॥
পিতা চায়, সহস্র মুদ্রা
দিতে শাঁখারীকে।
টাকা ফেলি শাঁখারী হায়
(বলে) দেখাওয়ে মাকে॥
দীঘিকার জলে ফেলি
টাকা শাঁখার ঝুলি।
প্রত্যাখ্যান করে অর্থ
আর নয়! বলি॥
বৈদ্যুতিক শিহরণে
কাঁপিতে কাঁপিতে।
শাঁখারী উধাও হ'লো
নিমেষে চকিতে॥

বিমলকুমার সুর

চৈত্র মাস কেমন যাবে ?

আমাদের রাশিচক্র ও তার বিচার তিনটি মহত্ত্বপূর্ণ গতির উপর নির্ভর করে—যথা, বার্ষিক গতি, চান্দ্র গতি, এবং আহ্নিক গতি। বার্ষিক গতি বলতে বোঝায় সূর্য্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ। এই প্রদক্ষিণ কার্য্যে মোট সময় লাগে এক বৎসর কাল। এইভাবে প্রদক্ষিণের সময় হিসাব অনুসারে—সূর্য্য প্রতিমাসে কোন্ রাশিতে অবস্থান করেন, সে সম্বন্ধে জানা যায়। সূর্য্য আসলে প্রদক্ষিণ করেন না—সর্ব্বদাই স্থির থাকেন। কিন্তু পৃথিবীর নিরন্তর পরিভ্রমণের ফলে পৃথিবীর অধিবাসীদের মনে হয়—সূর্য্য প্রতিমাসে এক রাশি থেকে আরেক রাশিতে পরিভ্রমণ করছেন! মোট রাশির সংখ্যাও হলো বারোটি এবং প্রত্যেক রাশিরই এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কাজেই যে রাশিতে সূর্য্যকে দেখা যায়, তার প্রভাব তখন পৃথিবীর উপর পড়ে।

চান্দ্রগতি বলতে বোঝায়—পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের পরিক্রমা। এই পরিক্রমাও নিরন্তর গতিতে এবং প্রায় ২৭ দিন ৬ ঘণ্টা লাগে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ, কাজেই তার পরিভ্রমণ পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমরা সকলেই জানি, জোয়ার-ভাঁটা চন্দ্রের প্রভাবে হয়। চন্দ্রের প্রতি রাশিতে স্থিতি কাল সওয়া দুইদিন, এবং প্রতি নক্ষত্রে প্রায় একদিন।

আর তৃতীয়তঃ, আহ্নিক গতি হয় পৃথিবীর নিজের অক্ষরেখার (Axis) উপর ঘূর্ণ্যমান-অবস্থায়—ফলে, দিন রাত হয়।

এই তিন রকম গতির উপরই জ্যোতিষের মূল ভিত্তি। সূর্য্য সৌর-জগতের কর্ত্তা—তিনি প্রাণশক্তি, আলো, জীবন, আত্মা এবং সকল কিছুরই আদি বা সুরু। কাজেই প্রতি মাসে প্রতি রাশিতে সূর্য্যের পরিক্রমণ, বিশেষ এক প্রভাবের কারণ।

চন্দ্র—মন, মাতা, পুষ্টি, পরিবেশ ইত্যাদির কারক। কাজেই জ্যোতিষ বিচারে চন্দ্রেরও বিশিষ্ট স্থান আছে, ঠিক সূর্য্যের পরেই। অমাবস্যায় চন্দ্র সম্পূর্ণ ক্ষীণ, কারণ, তাঁকে দেখা যায় না, পূর্ণিমায় কিন্তু তিনি ষোল কলায় পূর্ণ এবং জাজ্বল্যমান। এই দুটি তিথিই বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত জীবনে অনেক বড়-বড় ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় প্রায় ঠিক এই দুই তিথিতে। প্রতিদিন চন্দ্রের প্রতি নক্ষত্র-ভ্রমণ, নূতন নূতন প্রভাব সৃষ্টি করে।

আর তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে লগ্ন স্থিরীকৃত হয়। কারণ, ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজের অক্ষরেখার উপর সম্পূর্ণ ঘুরবার ফলে, চক্রবৎ বারোটি রাশিকে অতিক্রম করা হয়। আহ্নিক-গতিতে একটি রাশির স্থিতিকাল প্রায় দুই ঘণ্টা। পৃথিবীর যে অংশটি কোন এক বিশেষ সময়ে সূর্য্যের দিক থেকে আলোকিত হয়—সেই অংশে যে রাশির তখন প্রভাব থাকে সেইটিই লগ্ন। অর্থাৎ, লগ্ন বলতে বোঝায়, সূর্য্যমুখী পৃথিবীর অংশটিকে—এক কথায় সূর্য্যালোকিত পৃথিবীর অংশ।

লগ্ন থেকেই ভাব গণনার সুরু। দেহ, স্বভাব, সামর্থ্য, মানসিক ও দৈহিক প্রবণতা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি বোঝা যায় লগ্ন থেকেই।

কাজেই এই তিন ধরণের গতিতেই রবি, চন্দ্র ও লগ্নের প্রাধান্য দেখা যায়। রবি আত্মা, চন্দ্র মন, লগ্ন দেহ—কাজেই মানবের, শুধু মানবের কেন সব কিছুরই ঘটনাবলী ও বিচার নির্ভর করে এই তিনটির অবস্থানের উপর।

আমাদের মাস ফল নির্ণীত হয়—রবির প্রতি মাসে প্রতি রাশিতে সঞ্চারের (shifting) উপর। কিন্তু সেটিই সব নয়। কারণ, চন্দ্র, লগ্ন ও অন্যান্য গ্রহের সমাবেশও বিচার্য্য। কাজেই মাস ফলের ভিত্তি রবির অবস্থান হিসাবে সত্য হলেও, চন্দ্র, লগ্ন ও অন্যান্য গ্রহ-গণের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখার ফলেই বিচারের অভাব থেকে যায়। কাজেই সচরাচর দেখা যায় যে মাস ফল আংশিক বা সম্পূর্ণ মেলে না। তবুও মাস ফলের প্রয়োজন আছে সাধারণ Guidanc হিসাবে। কারণ সৌর জগতে রবি সর্ব্বময় কর্ত্তা তার অবস্থান ভেদে যে ফলাফলের পার্থক্য হবে তা বিচার ও বাবস্ততা উভয় দিক হইতেই অবশ্য স্বীকার্য্য।

এখন আমরা প্রতিমাসের জাতকের চৈত্রমাসে কীরূপ ফল আশা করা যায় জানাচ্ছি। যাঁরা তাঁদের লগ্ন বা চন্দ্রের রাশি জানেন সেই দিক্ থেকেও এই ফলাফলটী মিলিয়ে দেখতে পারেন এবং কী ভাবে কতটা মেলে লেখককে জানাতে পারেন তাঁর গবেষণা কাজে সহায়তার জন্যে। পত্রের আশা করলে উত্তর-পোষ্ট কার্ড বা যথা-প্রয়োজন ডাক—টিকিট পাঠাবেন। অবশ্য পত্রাদি অধিক এসে পড়লে ব্যক্তিগত ভাবে সকলকে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবেনা।

বৈশাখ—যাঁদের বৈশাখ মাসে জন্ম তাঁদের আগামী চৈত্র মাসের ফলাফল এইরূপ। লেখাপড়া, আর কল্পনা প্রসূত কার্য্যাদি ভালই যাবে। সন্তান সন্ততির সম্বন্ধে কিছু সুব্যবস্থা সম্ভবপর হবে। হঠাৎ কিছু ধন প্রাপ্তি সম্ভব। অপর দিকে কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট, বদলী, পিতার অসুস্থতা এবং অত্যধিক ব্যয় আশঙ্কা করা যায়। ধর্ম্মভাবের উন্নতি বা মানসিক উন্নতি আশা করা যায়। স্বামী হইলে স্ত্রীর এবং স্ত্রী হইলে স্বামীর শুভফল ভোগ হইবে। ব্যবসা বা Contract সংক্রান্ত আয় হইবে। মাতুল ও পিতৃব্যদের পক্ষে বিশেষ অশুভ। জলপথে ভ্রমণ বাঞ্ছনীয় নয়। নদী বা পুকুরে স্নান করিলে সাবধানতার সহিত করা বিধেয়।

যাঁদের মেষ রাশি বা মেষ লগ্ন তাঁরাও উপরের ফলা-ফলটা দেখবেন কতটা মেলে। কারণ রবি হিসাবে বিচার করিলেও চন্দ্র ও লগ্ন হইতে বিচার করিলে অযৌক্তিক বা বাস্তবতার দিক হইতে অন্যায় আশা করা হবে না। কারণ—লগ্ন, চন্দ্র, রবি—সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ পরি-প্রেক্ষীতে আদি হিসাবে বিচার করিবার উপদেশ আছে। অবশ্য মাসফলের ক্ষেত্রে লগ্ন বা চন্দ্র অপেক্ষা রবির প্রাধান্যই অধিক। যাই হোক এই তিন দিক্ দিয়া দেখিলে আপনাদের দেখিবার পর্দ্দাটী বিস্তৃত ও তত্বপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

জ্যৈষ্ঠমাস—যাঁদের জ্যৈষ্ঠমাসে জন্ম তাঁদের চৈত্রমাসে কাজ কর্ম্ম, ধনাগম ভালই হবে। ঘর বাড়ী সংক্রান্ত লাভ বা সুব্যবস্থা সম্ভব। যান বহন সুখ, বন্ধু বান্ধব হইতে সুবিধা সাহায্যলাভ মিলিবে। জেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী, বা জামাতা বা পুত্রবধূর পক্ষে শুভ নয়। সন্তান বিষয়ক বহু ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট ভোগ হবে। তাদের স্বাস্থ্য, বিদ্যা প্রভৃতির অশুভত্ব দেখা যায়। খাওয়া দাওয়া নিয়মে ও মাপে করা প্রয়োজন, নচেৎ বিশেষ উদর পীড়া ভোগ হইতে পারে। গৃহ, পারিবারিক সাংসারিক কারণে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে লাভ আশা করা যায়। বিবাহের যোগ দেখা যায়।

যাঁদের বৃষরাশি বা বৃষ লগ্ন তাঁরা উপরের ফলটী মিলিয়ে নেবেন।

আষাঢ়—যাঁদের আষাঢ় মাসে জন্ম তাঁদের চৈত্রমাসের ফলাফল এইরূপ: ধর্ম্মবৃদ্ধি, ভাগ্যোন্নতি, বুদ্ধির প্রশংসা প্রাপ্তি। উদ্যম উৎসাহের অভাব হবেনা। কর্ম্মস্থলে অনেক ঝুঁকি বা দায়িত্ব নিতে হবে। জ্ঞাতি আত্মীয় হতে অনেক সুখ সুবিধা লাভ হবে। কিন্তু পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, মাতার গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি আশঙ্কা করা যায়। কোন বন্ধু বান্ধবের বিশেষ বিপদ এবং সেই কারণে ঝঞ্ঝাট ভোগ বিশেষ আশঙ্কা করা যায়। বাড়ীঘর ব্যাপারে কোন শুভ চেষ্টা ফলবতী হওয়া দুরূহ। পিতা-মাতার গুরুদায়িত্ব স্বাস্থ্যহীনতা আশঙ্কা করা যায়। কিন্তু নিজের কর্ম্মপ্রসারের পক্ষে এটা শুভমাস।

যাঁদের মিথুন লগ্ন বা রাশি তাঁরা দেখে নেবেন এর কতটা ফল তাদের ব্যাপারে খাটছে।

শ্রাবণ—যাদের শ্রাবণ মাসে জন্ম তাদের চৈত্রমাসটা কেমন যাবে শুনুন। পয়সার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হবে। ব্যবসা, বাণিজ্য বা Contract থেকে ভাল ধনাগম হবে। জ্ঞাতি আত্মীয় ও পারিবারিক সুখ বিশেষ দেখা যায় না।

কোন সহোদরাদির শারীরিক ও অন্যবিধ ঝঞ্ঝাট অশান্তি ভোগ হবে। তাদের নিকট হইতে সুখের আশা কম। ভাল উন্নতির যোগাযোগ হঠাৎ নষ্ট হতে পারে। সন্তান-বিষয়ক কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

যাদের কর্কট লগ্ন বা রাশি তারা মিলিয়ে দেখুন এই ফলাফল কতটা তাদের পক্ষে খাটছে।

ভাদ্র—ভাদ্র মাসে যাদের জন্ম তাদের চৈত্রমাস কেমন যেতে পারে লেখা হোল। বিবাহ, ব্যবসা, Contract, ভ্রমণ, জ্ঞাতি, আত্মীয়, সম্বন্ধীয় ব্যাপার শুভ। হঠাৎ ঝঞ্ঝাট, শারীরিক বিপদ্ ও অর্থক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। মৃতের ধনসম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে বহু অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাট। ঋণদান, ঋণগ্রহণ বাঞ্ছনীয় নহে। পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা কোন দুঃসাহসিক কার্য্যাদি করে নিজের উপর বিপদ্ এসে পড়বে। স্বামী হলে পত্নীর, পত্নী হলে স্বামীর বিশেষ অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি-সুখের অভাব। স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। কোন প্রকার জেদ, তেজ বা একগুঁয়েমি বাঞ্ছনীয় নয়। সাংসারিক সুখ নাই। মাতার স্বাস্থ্যাদি ভাল থাকবেনা। বন্ধুর জন্য নিজের কোন বিপদ হইতে পারে।

যাদের সিংহ লগ্ন বা রাশি তারা দেখবেন এই ফলগুলি তাদের পক্ষে কতটা খাটছে।

আশ্বিন মাসে—যাদের জন্ম তাদের চৈত্রমাসের ফলাফল এই রকম। নানা রকম হঠাৎ ঝঞ্ঝাট বা অনর্থ হবে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল। ঝগড়া, বাগ্‌বিতণ্ডা নিত্য সহচর। কোন Contract, ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে হবেনা। বিদেশ ভ্রমণে বিশেষ ঝঞ্ঝাট বা বিপদ। কোন Accident, বা চোরের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। নিজের রাগ তাপ বৃদ্ধি। পতি বা পত্নীর বহু অশান্তি, ঝঞ্ঝাট। এই সময়টা ধৈর্য্য ধরে চুপচাপ্ থাকাই শ্রেয়ঃ।

যাদের কন্যা লগ্ন বা রাশি তাদের কতটা এই ফল মেলে দেখবেন।

কার্ত্তিক—যাদের জন্ম কার্ত্তিক তাদের চৈত্র মাস কেমন যেতে পারে, শুনুন। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারবেন। নানা প্রকার আয়বৃদ্ধি। সন্তান বিষয়ক কিছু ঝঞ্ঝাট থাকলেও শেষে শুভফল আশা করা যায়। কিঞ্চিৎ সাংসারিক বিশৃঙ্খলা আছে। স্থান পরিবর্ত্তন করলে ভালই হবে। পতি বা পত্নী বিষয়ক ফল শুভ নয়। জ্ঞাতি আত্মীয় হতে সুবিধা সুখ বা কোন প্রকার লাভ আশা করা যায়। মা'র স্বাস্থ্য ভাল নয়। লেখাপড়ার বিঘ্নাদি অতিক্রম হবে।

অগ্রহায়ণ—এই মাসে যাদের জন্ম তাদের চৈত্র মাস এই রকম যাবে। কর্ম্মে দক্ষতা, প্রসারতা, উন্নতি। গৃহবাটী ও সাংসারিক ব্যাপারে শুভ ফল। Speculation, race ইত্যাদি ব্যাপারে মোটেই এগোবেন না। সন্তান বিষয়ক ফল মোটেই শুভ নয়। নিজের বিদ্যাভ্যাসে বিঘ্ন-বাধা। আহার সংক্রান্ত অনিয়ম অত্যাচার বাদ দেবার চেষ্টা করবেন।

বৃশ্চিক লগ্ন বা রাশির লোক এই ফল মিলিয়ে দেখবেন।

পৌষ মাস—এই মাসে যাদের জন্ম তাদের চৈত্রমাস কেমন যাবে লিখছি। জ্ঞাতি, আত্মীয়, ভার্য্যা, ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপার ভালই। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত বেশী, বন্ধুর বিপদ, মাতার স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মে বহু ঝঞ্ঝাট, পিতার বিপদের সম্ভাবনা। বিদ্যায় ব্যাঘাত বা আশানুরূপ ফলের অভাব।

যাঁদের ধনুরাশি বা লগ্ন তারাও এটা মিলিয়ে নেবেন।

মাঘমাস—এই মাসে যাদের জন্ম তাঁদের চৈত্রমাসটা এইরূপ যাবার সম্ভাবনা। অর্থাগম ভাল, ব্যবসা, বাণিজ্য contract থেকে লাভ। মৃতের সম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে শুভ যোগাযোগ। কোন সহোদর বা সহোদরার শারীরিক বা অন্যবিধ বহু অশান্তি। Short trip না করাই ভাল। নচেৎ পথিমধ্যে বিপদের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি আত্মীয় থেকে সুখের অভাব। অধিক বিক্রম দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে এনে কোন লাভ নাই।

এই ফলটা মকর লগ্ন বা রাশির লোকের কতটা খাটে দেখতে পারেন।

ফাল্গুনমাস—যাঁদের এই মাসে জন্ম তাঁদের চৈত্রমাসে ব্যবসা, বাণিজ্যে অনেক প্রকার সুবিধা হবে। এই সময় Contract, agreement ভালই। অনেক অর্থ ব্যয় বা ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদ্যায় শুভ, বুদ্ধি প্রশংসনীয়। Speculation, গ্রন্থরচনা, বিবাহ, সন্তান বিষয়ক ঘটনাগুলি সব ভালই। দাম্পত্য জীবনে কিছু খিটিমিটি দেখা দিতে পারে। মধ্য ভ্রমণের পক্ষে ভালই। প্রচুর

অর্থব্যয়। জ্ঞাতি-আত্মীয় সুখ তেমন থাকবেনা। কোন সহোদর বা সহোদরার শারীরিক ও অন্যপ্রকার বহু ঝঞ্ঝাট অশান্তি পোহাতে হবে।

যাঁদের কুম্ভ লগ্ন বা রাশি তাঁরাও এই ফলটা একবার মিলিয়ে দেখবেন।

চৈত্রমাস—এই মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের চৈত্র মাসের ফল এইরূপ। বহুরকম ঝঞ্ঝাট, অশান্তি পোহাতে হবে। স্থির হয়ে কোন কাজ করার অনুকূল পরিবেশের বিশেষ অভাব হবে। আহারের অনিয়ম, প্রচুর পরিশ্রম, দায়িত্বপূর্ণ কাজ ইত্যাদির জন্য দৈহিক ক্লেশ ভোগ করতে হবে। ব্যয় সংকোচ বা সুব্যয় হবে। কিছু জমাবার সুবিধা হবে। মাতুল পিতৃব্য এঁদের দিক্ থেকে খবর ভালই। পরিশ্রম ক্রীড়াদি বা ব্যায়াম করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। Contract বা ব্যবসায়ে নানান ঝঞ্ঝাট বা ক্ষতি। স্বামী বা স্ত্রীর দৈহিক, মানসিক উদ্বেগ, অশান্তি। জ্ঞাতি-আত্মীয়ের জন্য ব্যয়, দায়িত্ব। বিদেশ যাত্রার যোগাযোগ আছে। বিদ্যায় শুভফল কম।

যাঁদের মীন লগ্ন বা রাশি তাঁরা এই ফল মিলিয়ে দেখবেন।

কল্পনার নীড় থেকে

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

কল্পনার নীড় থেকে তোমরা আমাকে আর
বাইরে ডেকো না।
বাইরে যাব না আমি, কেন না সেখানে
অসুখী মানুষগুলো যন্ত্রণায় মরে।
তারচেয়ে বেশ আছি ; কবোষ্ণ আঁধারে
একা একা জেগে থাকি মনের বিজনে।
আমার কল্পনা—তুমি কৃতঘ্ন তো নও
মানুষের মতো! হায়রে মানুষ!
স্বার্থ-বিষে সর্বদাই জর্জরিত হ'য়ে
নিজের সামান্যলাভে অনায়াসে তুমি
অপরের বুকে দাও সুতীক্ষ্ণ শায়ক।
তোমাদের পৃথিবীতে অমৃতের কণাটুকু নেই
আছে দুঃখ, আছে জ্বালা—অনন্ত গরল।
সে গরলে ঝাঁপ দিতে ডেকোনা আমাকে।
তারচেয়ে বেশ আছি নতুন জগতে
এ জগৎ একান্ত আমার। হিংসা দ্বেষ
ঈর্ষা থেকে বহুদূরে সরে সরে থাকি
যাতে কোনো মলিনতা এখানে না আসে।
কল্পনার নীড় থেকে তোমরা আমাকে আজ
বাইরে ডেকো না।
বাইরে যাব না আমি,—কেন না এখানে
আমার ঈপ্সিত সত্তা যায়নি হারিয়ে।

মহাশাস্ত্র

[মহাভারতের মত মহাকাব্য ও মহাশাস্ত্র বিশ্বে আর দ্বিতীয় নেই। এই অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত যাঁরা মূল সংস্কৃত থেকে পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে মানবজীবনের এমন কোনও সমস্যা নেই যার সমাধান এই মহাশাস্ত্রে করা হয় নি। যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বর ঋষিগণ এই মহাকাব্য লিখে গেছেন তাঁদের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুদূর প্রসারী দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মানব জীবনের ও ইতিহাসের সকল সমস্যাবলী এবং তাঁরা তাঁদের দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে এবং তপঃপ্রভাবে এই সব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এই মহাভারতের মধ্য দিয়ে।

এই মহাকাব্যের আবার সবচেয়ে পঠনীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়টি হচ্ছে "শান্তি-পর্ব"। এই শান্তি পর্বের মত বৈচিত্র্যময় অথচ মানুষের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় কোথায় আছে জানা নেই। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ নীতি সমস্তই ইহাতে বর্তমান। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের খণ্ডনও ইহাতে রয়েছে। বৃহস্পতির নাস্তিক্যবাদ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন এতে সন্দেহ নেই। মহাভারতে নস্তিক্যবাদের নিন্দা, ক্ষপণক নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উল্লেখ, তাপের শান্তি পর্বে নাস্তিক বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব-মীমাংসাদর্শনের খণ্ডন ও সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মত সমর্থন করাতে ব্যাসদেব বৃহস্পতি, বুদ্ধ, গৌতম, কণাদ ও কপিলের পরবর্তী বা সমসাময়িক বলে অনেকে সন্দেহ করতে পারেন।

কিন্তু মহাভারত এক যুগে রচিত হয় নি। ইহা একটি বিরাট যুগের সাহিত্য। ইহাতে ব্যাস পরবর্তী দার্শনিকগণের মত খণ্ডিত হবে তা আর বিচিত্র কি? "ভারতবর্ষ'-এর পাঠক-পাঠিকাদেয় ভালো লাগবে আশা করে এই "শান্তি পর্বের" কিছু শ্লোকের মূল ও অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। মহাভারতের এই "শান্তি পর্ব"-তে শ্লোক আছে প্রায় ১৪০০০ হাজারের ওপর। এই সমস্ত শ্লোক প্রকাশ করা সম্ভব নয় বুঝে তার মধ্যে যে সমস্ত শ্লোক সাধারণ পাঠকদের উপযোগী হবে সেইরকম কিছু শ্লোক অনুবাদ-সহ প্রকাশ করা হবে। আশা করি "শান্তি পর্ব্ব-এর এই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাঠ করে অনেক পাঠক-পাঠিকাই উৎসাহিত হবেন মূল সংস্কৃত "মহাভারত" পড়তে। এতে তাঁদের জ্ঞান-পিপাসু মন নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।—সম্পাদক]

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তি পর্ব

বঙ্গানুবাদঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃতোদকান্তে সুহৃদাং সর্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ॥১
তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্বর্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃপুরাৎ॥২

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডুর পুত্রগণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ভরতবংশীয়গণের স্ত্রী সকল, সমস্ত বন্ধুবগণের উদ্দেশ্যে সলিলতর্পণ করলেন।১ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ পুরীর বাইরে গঙ্গাতীরে একমাস অবস্থান করলেন।

কৃতোদকন্তু রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অভিজগ্মুর্মহাত্মানঃ সিদ্ধাঃ ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ॥৩

মহাত্মা, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও সাধুশ্রেষ্ঠেরা তর্পণান্তে সেখানে অ.স্নানকারী যুধিষ্ঠিরের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ দেবলশ্চ মহানৃষিঃ।
দেবস্থানশ্চ কণ্বশ্চ তেষাং শিষ্যাশ্চ সত্তমাঃ ॥৪
অন্যে চ বেদবিদ্বাংসঃ কৃতপ্রজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ।
গৃহস্থাঃ স্নাতকাঃ সন্তো দদৃশুঃ কুরুসত্তমম্ ॥৫

ক্রমে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, দেবল, দেবস্থান, কণ্ব এবং তাঁদের প্রধান শিষ্যগণ, অন্যান্য বেদবিদ্, জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, গৃহস্থগণ, ব্রহ্মচারিগণ প্রভৃতি এসে কুরুসত্তম যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করলেন।৪-৫

তেঽভিগম্য মহাত্মানঃ পূজিতাশ্চ যথাবিধি।
আসনেষু মহার্হেষু বিবিশুস্তে মহর্ষয়ঃ।৬

সে সমস্ত মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়ে যথা-বিহিত সম্মান লাভের পর, মূল্যবান্ আসনে বসলেন।৬

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং তৎকালসদৃশীং তদা।
পর্য্যুপাসন্ যথান্যায়ং পরিবার্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭

তৎপর যুধিষ্ঠিরের নিকট তৎকালোচিত পূজা লাভ করে যুধিষ্ঠিরকে পরিবৃত করে যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা আশ্বাস দিতে লাগলেন।৭

পুণ্যে ভাগীরথী তীরে শোকব্যাকুলচেতসম্।
আশ্বাসয়ন্তো রাজেন্দ্রং বিপ্রাঃ শতসহস্রশঃ ॥৮

ধীরে ধীরে শত শত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ শোকব্যাকুলচিত্ত ভাগীরথীতীরে অবস্থানকারী নরপতিকে আশ্বাস দান করতে লাগলেন ৮

নারদস্ত্বব্রবীৎ কালে ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
সম্ভাষ্য মুনিভিঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদিভিঃ ॥৯

তখন নারদ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাদি মুনির সঙ্গে আলাপ করে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন :—৯

ভবতা বাহুবীর্যেণ প্রসাদান্মাধবস্য চ।
জিতেয়মবনিঃ কৃৎস্না ধর্মেণ চ যুধিষ্ঠির! ॥১০

হে যুধিষ্ঠির! তোমরা নিজেদের বাহু বলে, ও মাধবের প্রসাদে ধর্মযুদ্ধেই সমগ্র মেদিনী জয় করেছ।১০

দিষ্ট্যা মুক্তাঃ স্থ সংগ্রামাদস্মাল্লোকভয়ঙ্করাৎ।
ক্ষাত্রধর্মরতশ্চাপি কচ্চিন্মোদসি পাণ্ডব ॥১১

পাণ্ডুনন্দন তোমরা ভাগ্যবলে এই ভয়ংকর যুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়েছ, ক্ষাত্র ধর্মে নিরতও রয়েছে, এখন আনন্দ অনুভব করছ কি? ১১

কচ্চিচ্চ নিহতামিত্রঃ প্রীণাসি সুহৃদো নৃপ!॥
কচ্চিচ্ছ্রিয়মিমাং প্রাপ্য ন ত্বাং শোকঃ প্রবাধতে ॥১২

হে রাজা, শত্রুগণকে বিনাশ করে এখন মিত্রগণকে প্রসন্ন করছ তো? এরূপভাবে সম্পদ লাভের পর শোক তোমাকে পীড়ন করছে না তো?১২

যুধিষ্ঠির উবাচ

বিজিতেয়ং মহী কৃৎস্না কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াৎ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ভীমার্জ্জুনবলেন চ ॥১৩

যুধিষ্ঠির বললেন—প্রভু, আমি কৃষ্ণের বাহুশক্তি, ব্রাহ্মণদের কৃপা আর ভীম অর্জুনের বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেছি।১৩

ইদং মম মহদ্দুঃখং বর্ততে হৃদি নিত্যদা।
কৃত্বা জ্ঞাতিক্ষয়মিমং মহান্তং ঘোরদর্শনম্।১৪
সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ঘাতয়িত্বা সুতান্ প্রেয়ান্।
জয়োঽয়মজয়াকারো ভগবন্ প্রতিভাতি মে ॥১৫

ভগবন্। আমার মনে নিত্য এই গুরুতর দুঃখ জাগছে। এই ভয়াবহ জ্ঞাতিক্ষয় করে, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর প্রিয়পুত্রগণকে বলি দিয়ে এই যে জয়লাভ করেছি তা আমার কাছে পরাজয়ই মনে হচ্ছে।১৪-১৫।

কিং নু বক্ষ্যতি বার্ষ্ণেয়ী বধূর্মে মধুসূদনম্।
দ্বারকাবাসিনী কৃষ্ণমিতঃ প্রতিগতং হরিম্ ॥১৬

অহো, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলে বধূ সুভদ্রা ও অন্যান্য দ্বারকাবাসিনী নারীগণ তাঁকে কি বলবেন?১৬

দ্রৌপদী হতপুত্রেয়ং কৃপণা হতবান্ধবা।
অস্মৎপ্রিয়হিতে যুক্তা ভূয়ঃ পীড়য়তীব মাম্ ॥১৭

নিত্য আমাদের হিতে রত দ্রৌপদী পুত্র ও বন্ধুগণ হত হওয়াতে শোকাকুল ও অতি দীন দুঃখী হওয়াতে আমি অতিশয় পীড়িত হচ্ছি।১৭

ইদমন্যচ্চ ভগবন্। যত্ত্বাং বক্ষ্যামি নারদ!
মন্ত্রসংবরণে নাস্মি কুন্ত্যা দুঃখেন যোজিতঃ ॥১৮

নারদ! আপনাকে আর একটা কথা বলছি, মাতা কুন্তী কর্ণের জন্ম সংবাদ গোপন করে আমাকে গুরুতর দুঃখে নিপাতিত করেছেন।১৮

যঃ স নাগাযুতবলো লোকেঽপ্রতিরথো রণে।
সিংহখেলগতির্ধীমান্ ঘৃণী দাতা যতব্রতঃ ॥১৯
আশ্রয়ো ধার্তরাষ্ট্রাণাং মানী তীক্ষ্ণপরাক্রমঃ।

অমর্ষী নিত্যসংরম্ভী ক্ষেপ্তাস্মাকং রণে রণে ॥২০

শীঘ্রাস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ কৃতী চাদ্ভুতবিক্রমঃ।

গূঢ়োৎপন্নঃ সুতঃ কুন্ত্যা ভ্রাতাস্মাকমসৌ কিল ॥২১

যাঁর অযুত হস্তীর বল ছিল দেহে, যিনি যুদ্ধে অপ্রতিরথ, সিংহের মত মন্থর গতি, বুদ্ধিমান্, ঘৃণী (দয়ালু), দাতা, ব্রতপালনকারী, ধার্তরাষ্ট্রগণের আশ্রয়, মানী, তীব্র পরাক্রমশালী, অমর্ষী, সর্বদা তেজপরায়ণ, প্রতি যুদ্ধে আমাদের পরজয়কারী, চিত্রযোধী, কৃতী, অদ্ভুত বিক্রম, সেই কর্ণ গোপনে কুন্তীর গর্ভে জন্মেছিলেন। তিনি আমাদের ভ্রাতাই ছিলেন। ১৯—২১

তোয়কর্মণি তং কুন্তী কথয়ামাস সূর্যজম্।

পুত্রং সর্বগুণোপেতমবকীর্ণং জলে পুরা ॥২২

আমার তর্পণকালে মাতা কুন্তী বললেন, সর্বগুণ সম্পন্ন কর্ণ সূর্য থেকে আমার গর্ভে জন্মেছিল। আমি আগে উহাকে জলে নিক্ষেপ করেছিলুম।২২

মঞ্জুষায়াং সমাধায় গঙ্গাস্রোতস্যমজ্জয়ৎ।

যং সূতপুত্রং লোকোঽয়ং রাধেয়ং চাভ্যমন্যত ॥২৩

তাকে তিনি মঞ্জুষাতে রেখে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত লোকে তাকে রাধার সন্তান সূতপুত্র বলে জানত।২৩

স জ্যেষ্ঠপুত্রঃ কুন্ত্যা বৈ ভ্রাতাস্মাকঞ্চ মাতৃজঃ।

অজানতা ময়া ভ্রাতা রাজ্যলোভেন ঘাতিতঃ ॥২৪

তিনিই কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের মাতৃজাত ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ রাজ্যলোভী আমার দ্বারা সভ্রাতা নিহত হলেন।২৪

তন্মে দহতি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ।

ন হি তং বেদ পার্থোঽপি ভ্রাতরং শ্বেতবাহনঃ ॥২৫

অগ্নি যেমন তূলরাশিকে দহন করে, তেমনি কর্ণবধই আমার গাত্রকে দগ্ধ করছে। শ্বেতবাহন অর্জুনও তাঁকে ভ্রাতা বলে জানতেন না।২৫

নাহং ন ভীমো ন যমৌ চ স ত্বস্মান্ বেদ সুব্রতঃ।

গতা কিল পৃথা তস্য সকাশমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৬

অস্মাকং শমকামা বৈ ত্বঞ্চ পুত্রো মমেত্যথ।

পৃথায়া ন কৃতঃ কামস্তেন চাপি মহাত্মনা ॥২৭

আমি, ভীমসেন, বা নকুল সহদেব কেহই তাকে ভ্রাতা বলে জানতুম না। কিন্তু সেই সুব্রতধারী কর্ণ আমাদের ভ্রাতা বলে জানতেন। আমাদের মঙ্গলাভিলাষিণী মাতা কুন্তী কর্ণের নিকট গিয়েছিলেন ও বলেছিলেন: কর্ণ তুমিও আমার পুত্র। কিন্তু সেই মহাত্মা মাতার আশা পূর্ণ করলেন না।২৬-২৭

অপি পশ্চাদিদং মাতর্যব্রবীদিতি নঃ শ্রুতম্।

নহি শক্ষ্যাম্যহং ত্যক্তুং নৃপং দুর্যোধনং রণে ॥২৮

আমরা শুনেছি তারপর কর্ণ মাতার নিকট বলেছিলেন '—আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারব না।'২৮

অনার্যঞ্চ নৃশংসঞ্চ কৃতঘ্নঞ্চ মে ভবেৎ।

যুধিষ্ঠিরেণ সন্ধিং হি যদি কুর্যাং মতে তব ॥২৯

আপনার ইচ্ছানুসারে যদি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করি তবে আমার পক্ষে অনার্যতা, নৃশংসতা ও কৃতঘ্নতা করা হবে। ২৯

ভীতো রণে শ্বেতবাহাদিতি মাং মংস্যতে জনঃ।

সোঽহং নির্জিত্য সমরে বিজয়ং সহ কেশবম্ ॥ ৩০

সন্ধাস্যে ধর্মপুত্রেণ পশ্চাদিতি সোঽব্রবীৎ।

তমুবাচ কিল পৃথা পুনঃ পৃথুলবক্ষসম্ ॥ ৩১

লোকে মনে করবে আমি অর্জুনের সঙ্গে রণে ভীত। তাই কৃষ্ণের সঙ্গে তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, ধর্মপুত্রের সঙ্গে সন্ধি করব। এ কথা কর্ণ বললেন। তখন কুন্তী বিবাট-বক্ষ কর্ণকে বললেন—৩০-৩১

চতুর্ণামভয়ং দেহি কামং যুধ্যস্ব ফাল্গুনম্।

সোঽব্রবীন্মাতরং ধীমান্ বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ৩২

আমার চারি সন্তানকে তুমি অভয় দান কর, আর অর্জুনের সঙ্গে যথেচ্ছ যুদ্ধ কর মাতা বললেন একথা। তখন বুদ্ধিমান কর্ণ কৃতাঞ্জলি পুটে কাঁপতে কাঁপতে বললেন – ৩২

প্রাপ্তান্ বিষহ্যাংশ্চতুরো ন হনিষ্যামি তে সুতান্।

পঞ্চৈব হি সুতা দেবি! ভবিষ্যন্তি তব ধ্রুবাঃ। ৩৩

দেবি, অর্জুন ভিন্ন চারিজনকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হলেও বিশেষ-ভাবে হত্যা শক্ত হলেও, আমি বধ করব না। আপনার পুত্র পাঁচটিই থেকে যাবে। ৩৩

সার্জুনা বা হতে কর্ণে সকর্ণা বা হতেঽর্জুনে।

তং পুত্রগৃদ্ধিনী ভূয়ো মাতা পুত্রমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪

যদি যুদ্ধে কর্ণ হত হন, অর্জুন থাকবে, অর্জুন হত হলে কর্ণ থাকবেন। তখন পুত্রবৎসলা মাতা আবার পুত্রকে বললেন। ৩৪

ভ্রাতৃণাং স্বস্তি কুর্বীথা যেষাং স্বস্তি চিকীর্ষসি।

এবমুক্ত্বা কিল পৃথা বিসৃজ্যোপযযৌ গৃহান্ ॥ ৩৫

পুত্র, তুমি যে যে ভ্রাতার মঙ্গল করতে ইচ্ছা কর, সে সে ভ্রাতারই মঙ্গল করবে। একথা বলে কুন্তী কর্ণের নিকট থেকে ঘরে ফিরে এলেন। ৩৫

সোঽর্জুনেন হতো বীরো ভ্রাত্রা ভ্রাতা সহোদরঃ।

ন চৈব বিবৃতো মন্ত্রঃ পৃথায়াস্তস্য বা বিভো ॥ ৩৬

সেই সহোদর ভ্রাতা কর্ণ বীর ভ্রাতা অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছেন। কিন্তু পূর্বে কুন্তী দেবী তাঁর ও কর্ণের যে সম্পর্ক তা প্রকাশ করেন নি। ৩৬

অথ শূরো মহেষ্বাসঃ পার্থেনাজৌ নিপাতিতঃ।

অহং ত্বজ্ঞাসিষং পশ্চাৎ স্বসোদর্যং দ্বিজোত্তম ॥ ৩৭

পূর্বজং ভ্রাতরং কর্ণং পৃথায়া বচনাৎ প্রভো।

তেন মে দূয়তে তীব্রং হৃদয়ং ভ্রাতৃঘাতিনঃ ॥ ৩৮

হে দ্বিজোত্তম! তারপর সেই মহাবীর কর্ণ অর্জুনের দ্বারা নিপাতিত হলেন। পরে মাতা কুন্তীর কথায় জানতে পেরেছি যে কর্ণ আমাদের সহোদর অগ্রজ ছিলেন। তাই আমার ভ্রাতৃঘাতী হৃদয় আজ তীব্র অনুতাপে তপ্ত। ৩৭-৩৮।

কর্ণার্জুনসহায়োঽহং জয়েয়মপি বাসবম্।

সভায়াং ক্লিশ্যমানস্য ধার্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ ॥ ৩৯

সহসোৎপতিতঃ ক্রোধঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা প্রশাম্যতি।

যদা হ্যস্য গিরো রূক্ষাঃ শৃণোমি কটুকোদয়াঃ ॥ ৪০

সভায়াং গদতো দ্যূতে দুর্যোধনহিতৈষিণঃ।

তদা নশ্যতি মে রোষঃ পাদৌ তস্য নিরীক্ষ্য হ ॥৪১

অহো! কর্ণ আর অর্জুনের একত্র সহযোগিতায় আমি বাসবকেও জয় করতে পারতাম। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা যখন দ্যূতসভায় আমায় ক্লেশ দিয়েছিল, তখন আমার সহসা উৎপন্ন ক্রোধ কর্ণকে দেখে শান্ত হয়েছিল। দুর্যোধন-হিতৈষী কর্ণের রুক্ষ ও কটু কথায় যখন আমার রোষ উৎপন্ন হয়েছিল, তখন কর্ণের পা দুটি দেখেই আমার রাগ দূর হয়েছিল। ৩৯-৪১

কুন্ত্যা হি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্মম।

সাদৃশ্যহেতুমন্বিচ্ছন্ পৃথায়াশ্চাস্য চৈব হ ॥

কারণং নাধিগচ্ছামি কথঞ্চিদপি চিন্তয়ন্। ৪২

আমার ধারণা কুন্তীদেবীর পায়ের মত ছিল কর্ণের পা দু'টি। কিন্তু তাঁদের পায়ের সাদৃশ্যের কারণ কি তা অনুসন্ধান আর চিন্তা করেও আমি সে-সময়ে উপলব্ধি করতে পারি নি। ৪২

কথং নু তস্য সংগ্রামে পৃথিবী চক্রমগ্রসৎ।

কথং নু শপ্তো ভ্রাতা মে তত্ত্বং বক্তুমিহার্হসি ॥ ৪৩

কেন যুদ্ধের সময়ে তাঁর রথের চাকা মেদিনী গ্রাস করলেন, কেন-ই বা আমার ভ্রাতা অভিশপ্ত হয়েছিলেন তা এখন বলুন।৪৩

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্! ত্বত্তঃ সর্বং যথাযথম্।

ভবান্ হি সর্ববিদ্বিদ্বাল্লোঁকে বেদ কৃতাকৃতম্ ॥ ৪৪

হে ভগবন্। আপনি সর্বজ্ঞ, বিদ্বান, জগতে সকলের কৃত ও অকৃত কর্ম সব কিছু জানেন। আপনার কাছ থেকে সমস্ত বিষয় যথাযথ ভাবে শুনতে চাই। ৪৪।

[ক্রমশঃ]

ফাঁকির ফাঁদ

শ্রীজ্ঞান

পরীক্ষার পালা আরম্ভ হয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই এবার পরীক্ষা দিচ্ছ এবং আশা করি যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তারা সকলেই কৃতকার্য্য হবে। শুধু তাই নয় অনেকেই পরীক্ষায় বেশ ভাল ফল দেখাতে পারবে বলেই মনে করি।

ছাত্ররা বছরের পর বছর ধরে যে পড়াশুনা করে, তা তারা কিরকম ভাবে করেছে—মনোযোগের সহিত, না অমনোযোগী হয়ে; পড়াতে ফাঁকি দিয়েছে, না খেটে ও পরিশ্রম করে পড়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর। যারা মনোযোগের সহিত পরিশ্রম করে পড়া তৈরী করেছ তারা পরীক্ষাতে শুধু কৃতকার্য্যই হবে না—ভাল ফলও দেখিয়ে সকলের প্রশংসা ভাজন যে হবে এ কথা সকলেই জান। আর যারা দিনের পর দিন নানা রকম আমোদ আহ্লাদে মেতে পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়েছে, তারা যে নিজেদেরই ফাঁকি দিয়েছে, তা তোমরা তাদের পরীক্ষার ফল থেকেই বুঝতে পারবে। শুধু লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়—জীবনের সব ক্ষেত্রেই যারা ফাঁকি দিচ্ছে,ভবিষ্যতে এই ফাঁকির ফাঁদে তাদের নিজেদেরই পড়তে হবে।

যারা আজ লেখাপড়ায় ফাঁকি দিচ্ছে, তারা ভাবছে পরীক্ষায় আমরা ঠিক "পাশ" করে যাব—অসাধু উপায় অবলম্বন করেই হোক বা অন্য যে কোনও উপায়েই হোক। "পাশ" হয়ত তারা এইভাবে করবে, কিন্তু লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে অসম্পূর্ণতা (Deficiency) তাদের থেকে যাবে, তা আর তারা সারা জীবনেও পুষিয়ে নিতে পারবে না,—সে ক্ষতিপূরণ করা তাদের দ্বারা আর হয়ত সম্ভব হবে না। পরে পরিণত বয়সে হয়ত আফশোস আসবে—কেন বোকার মতন বাল্যকালে লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ফাঁকির ফাঁদে ফেলেছিলাম বলে। কিন্তু তখন যে অনেক দেরী হয়ে গেছে—ক্ষতিপূরণ করা আর সম্ভব হবে না—ফাঁকির ফাঁদে জড়িয়েই থাকতে হবে সারাটা জীবন।

তাই বলি এই পড়াশুনায় ফাঁকি দেবার বদ-অভ্যাস যাদের আছে তারা এখন থেকেই সাবধান হও—এই ফাঁকির ফাঁদে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট ক'র না।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দুই

কনেষ্টবল শ্যামল চক্রবর্ত্তীর হাতে যে চিঠিখানা দিয়েছিল। তাতে নাম ছিল বিমলের। বিমল সম্পর্কে শ্যামলের খুড়তুতো ভাই; কিন্তু তার ব্যবহারে শ্যামল এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, মনে মনে ভেবেছিলেন, আর তার মুখ না দেখতে হ'লেই ভালো হয়।

বিমলের চিঠিখানা দেখে শ্যামল যেমন বিস্মিত হ'লেন তেমনি বিরক্তও হলেন। চিঠিখানা ছিল খুবই ছোট। তাতে শুধু এইটুকু লেখাছিল যে বিমল বড় বিপদে পড়েছে এবং তখনই শ্যামলের সঙ্গে দেখা না করলে নয়।

যাতে বিমল তাঁর সঙ্গে সহজে দেখা করতে না পা'রে শ্যামল সে জন্য বিশেষ চেষ্টা ক'রে শ্রীরামপুর বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে বিমলের দ্বারা তাঁর অপকার ভিন্ন তিল মাত্র উপকারেরও সম্ভাবনা ছিল না। অথচ সেই বিমলই তাঁকে খুঁজে পেয়েছে দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ভাবলেন—আর দেরী করা ঠিক হবে না। বিমলের সঙ্গে দেখা ক'রে এখনই তাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হবে।

চিঠিখানা পকেটে রেখে দেক্রারীর সঙ্গে দু' একটা কথা বলে শ্যামল এক দৌড়ে গেটের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কৈ, বিমল কৈ ?"

একজন লোক নমস্কার ক'রে ব'লল—"তিনি গাড়ীতে ব'সে আছেন; তাঁর চিঠি খানা আমি এনেছি।"

"এখানেই বিমলকে ডাকো, এখনই খেলা আরম্ভ হবে; আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না।"

শ্যামলের মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। পরক্ষণেই দুইজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁকে দু'পাশ থেকে এমন ক'রে চেপে ধরল যে, তিনি কিছুতেই নড়তে পারলেন না। সাহায্যের জন্য চীৎকার করবার পূর্ব্বেই আর একজন লোক তাঁর মাথার উপর একটা থলি ফেলেদিয়ে চেপে ধরল। পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন যে একখানা মোটরগাড়ি তাঁকে নিয়ে চলতে আরম্ভ ক'রেছে, আর আক্রমণকারীরা তাঁকে চেপে ধরে আছে।

গাড়ী চলতে লাগলো। কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে শ্যামল তা বুঝতে পারলেন না। এই ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা কেটে গেল। শ্যামল মড়ার মত গাড়ীর ভিতর প'ড়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, বদমায়েশগুলো যখন তাঁকে বিমলের সম্মুখে হাজির করবে তখন তিনি বিমলের পিঠে এমন কসে' ঘা কতক চাবুক মারবেন যা সে জীবনে ভুলবে না।

তাঁকে এমন ক'রে পাকড়াও ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে শ্যামল তা মনে মনে চিন্তা ক'রতে লাগলেন। কিন্তু আকাশ পাতাল ভেবেও কিছু স্থির ক'রতে পারলেন না।

গাড়ীখানা হঠাৎ থেমে গেল। আক্রমণকারীরা ধাক্কা দিয়ে শ্যামলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পথের উপর দাঁড় করালো। তারপর ধাক্কা দিতে দিতে তাঁকে নিয়ে চললো এবং শেষে তাঁকে একটা দালানের উপর টেনে তুললো।

ওরা যখন শ্যামলের মুখ থেকে থলিটি খুলে নিল, তখন তিনি দেখলেন যে তাঁর সম্মুখে বিমলের সেই পত্রবাহক দূতটা দাঁড়িয়ে হাসছে। শ্যামল তার নাক লক্ষ্য ক'রে ঘুষি চালালেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে আরো দু'জন লোক এসে তাঁকে চেপে ধরলো এবং তাঁকে মেঝেতে আছাড় দিয়ে ফেললো। তারপর শক্ত একগাছা দড়ি দিয়ে তাঁর হাত ও পা এমন ক'রে বাঁধল যে শ্যামলের আর নড়বার উপায় রইল না। শ্যামল ঘরের মেঝের উপর চিৎ হ'য়ে প'ড়ে থাকতে থাকতে দেখলেন যে, বিমলের দূত রুমাল দিয়ে মুখের রক্তধারা মুছে ফেলছে। ঘুষিটা লোকটার মুখে বেশ ভাল রকমই লেগেছে দেখে শ্যামল মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন। তিনি সুস্পষ্টস্বরে বললেন—

"তোমাদের শাস্তির ওইটুকু তো শুধু আরম্ভ। আমি জানতে চাই কেন তোমরা এমন ক'রে আমায় এখানে এনেছ ?"

শ্যামলের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ওদের মধ্যে একজন গম্ভীর স্বরে আহত লোকটাকে সম্বোধন ক'রে ব'লল—"আর দেরী কেন বিশু, তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে নাও না।'

শ্যামল বুঝলেন—'বিমলের দূতের নাম বিশু। বিশু এক বিকট মুখভঙ্গী ক'রে রক্তমাখা রুমালখানায় নাক মুছতে মুছতে বলল—"তোলো, ওকে ধ'রে তোলো। হাঁ-ক'রে দেখছ কি ? ভয় নেই, কামড়াবে না। তোলো—"

দুইজনে তখন শ্যামলকে টেনে তুলে একটা টেবিলের পাশে বসালো। বিশু বন্দী শ্যামলের গায়ে একটা লাথি মেরে ব'ললো "কি গো শ্যামল! নাম ভাঁড়িয়ে চলা হচ্ছে কতদিন থেকে ? বাপ মা যে নামটা দিয়েছেন সেটা বইতে কি এতই অপমান বোধ হয় ? নাম ভাঁড়ানো

দেখে মনে হ'চ্ছে, বদমায়েসীর একটা নূতন ফন্দী নিয়ে ঘুরছো। কেমন, না?"

দৃঢ়কণ্ঠে শ্যামল বল্লেন—"ফন্দী টন্দী আবার কি? বদমায়েসীই বা দেখ্‌লে কোথায়? যার যেমন চোখ সে তেমনি দেখে। আর আমি যাই করি না কেন আমার উপর যে তোমরা এই অত্যাচারটা করছ তার কারণ আমি জান্‌তে চাই। খেলার মাঠ থেকে কেনই বা তোমরা আমায় এখানে আন্‌লে? আমার মনে হ'চ্ছে, তোমরা যুবক সঙ্ঘের" ভাড়া করা গুণ্ডা! শক্তিসঙ্ঘ যাতে একজন লোক কম নিয়ে খেলে ম্যাচে হারে সেই জন্য আমায় ধ'রে নিয়ে এসেছো।"

বিশু বিকটস্বরে হেসে উঠ্‌লো এবং বল্‌ল—'না গো বন্ধু না। ওসব কল্পনার খেলা এখন ভুলে যাও। তোমার শিল্ডম্যাচ্‌ চুলোয় যাক্‌;—আমাদের তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। তোমার সঙ্গে আমাদের একটু কাজ আছে, তাই তোমায় এনেছি।'

বিস্মিত হ'য়ে শ্যামল বল্‌লেন—"তোমাদের সঙ্গে আমার কি কাজ হ'তে পারে?"

বিশু হেসে বল্‌ল "কাজ না থাক্‌লে কি বন্ধু এত কষ্ট ক'রে তোমাকে এখানে নিয়ে আসি!"

বিশু একটি দেরাজ খুলে একতাড়া কাগজ বে'র করল এবং সেগুলি শ্যামলের সম্মুখে খুলে ধরল। শ্যামল মাথা নীচু ক'রে কাগজগুলি পড়্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমেই তাঁর শরীরের রক্ত মাথায় উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আর একখানা কাগজ শ্যামলের সম্মুখে ধ'রে বিশু বল্‌ল—"আমরা আর কিছু চাইনে—শুধু এই কাগজখানায় তোমার একটা সই।"

শ্যামল দেখ্‌লেন, কাগজখানা একটা দানপত্র। ওতে যা' লেখা ছিল, তা দেখেই শ্যামলের মুখ সাদা হয়ে উঠ্‌লো। তিনি চীৎকার ক'রে ব'ল্‌লেন—"শয়তান! এই জন্য বিমলের সঙ্গে যুক্তি ক'রে আমায় বন্দী ক'রে এনেছ? যদি আজ মরতে হয় সেও স্বীকার—তবু দানপত্রে সই করবো না। কিছুতেই না।"

গম্ভীর স্বরে বিশু বল্‌ল—'তাহলে তুমি মরবে, তবুও সই ক'রবে না? কেমন? প্রথমটা যে তুমি এরকম কথা বল্‌বে, তা আমি আগেই জানি। আজ যদি তুমি সইটা না দাও, তাহলে কাল সকালেই তোমার অনুতাপ হবে কেন তুমি আগে মরো নি; কেন এতদিন বেঁচে আছ!"

শ্যামল কিছুক্ষণের জন্য নীরব হ'য়ে রইলেন। দু'একবার মনোযোগের সঙ্গে দানপত্রখানা পড়লেন। তারপর বল্‌লেন—"আমি যদি সই-ই করি, তাতে বিমলেরই বা লাভ কি আর, তোমাদেরই বা লাভ কি? বড়জোড় হাজার বিশ পঁচিশ টাকা তোমরা পেতে পার—এই ত? সই করলেই তো তোমরা আমায় মুক্তি দেবে। আমি যদি তখনই গিয়ে পুলিশে খবর দি—পাপের ধন ত তাহলে প্রায়শ্চিত্তেই যাবে।"

বিশু একবার হি-হি ক'রে হেসে উঠ্‌লো; বলল—"আমাদের লাভলোকশান আমরাই বুঝবো। সেজন্য তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। যদি তোমার এই সাহস থাকে যে মুক্তি পেলেই পুলিশে যাবে,—বেশ, তা যেও। আগে সইটা কর, তারপর যেখানে খুশী যাও। আমি ঠিক বলছি, তোমার পথ আটকাবো না।"

বিশুর কথা শুনে শ্যামল হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর বেশ বিশ্বাস হ'ল যে, শুধু একটা সই নয়—এর মধ্যে আরও কোন একটা গভীর চক্রান্ত আছে। সেই চক্রান্তের জাল ভেদ ক'রবার জন্য তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রলেন, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পারলেন না।

বিশু আবার বল্‌ল—"কি গো বন্ধু, আমরা কি অনন্তকাল ধ'রে এখানে দাঁড়িয়েই থাক্‌বো নাকি? তোমার চেহারা তো এমন মিষ্টি নয় যে তাই দেখে দেখে আমাদের চোখ জুড়ুবে। আর দেরী কেন? সই কর—।"

তীব্রকণ্ঠে শ্যামল বল্‌লেন—"কিছুতেই না। আমি কিছুতেই সই ক'রবো না—তোমরা যা পার, তাই কর।"

বিকটস্বরে চীৎকার ক'রে বিশু বল্‌ল—"বটে! আমরা কি করি, তবে তাই দেখ। তাহলে দশমিনিটের মধ্যেই তোমার সুর বদ্‌লে যাবে।"

সঙ্গী দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু পরুষকণ্ঠে বল্‌ল—"কানু, গোরা! তোমরা হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি? নিয়ে যাও একে সেই আঁধার মণিকোঠায়।"

আদেশ মাত্রই কানু মাথার দিকে এবং গোরা পায়ের দিকে ধ'রে শ্যামলকে নিয়ে চল্‌ল এবং কয়েকটা সিঁড়ি

ব'য়ে নেমে একটা স্যাঁৎসেঁতে মেজের উপর ভুম্ ক'রে ফেলল। শ্যামলের বিষম আঘাত লাগলো বটে, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে কণ্ঠের কাতরধ্বনিটাকে চেপে রাখলেন। তাঁর পাঁজরে পদাঘাত ক'রে বিশু ব'ল্ল— "বন্ধু, তবে এইখানেই অতিথি সৎকার হোক্। এক বিন্দু জল পাবে না; একমুঠো ভাতও মিল্‌বে না। বারঘণ্টা পর পর একজন লোক এসে জেনে যাবে, তোমার সুর ফিরেছে কিনা। চলে এসো গোরা, চলে এসো কানু।"

পরক্ষণেই ঝন্‌ঝন্ শব্দ ক'রে সেই গুপ্তকক্ষের লোহার কপাট বন্ধ হ'য়ে গেল। দস্যুরা বাহির হ'তে তালাবন্ধ ক'রে মস্ মস্ ক'রে প্রস্থান ক'রল। শ্যামল বুঝ্‌লেন— তিনি বন্দী।

শ্যামল সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না যারা বিপদের মুখে পড়্‌লে জীবন্তেই মরে। উপস্থিত বিপদ তাঁর দৃঢ়পণকে আরও দৃঢ় ক'রে তুল্‌লো। তিনি মনে মনে বল্লেন— "আমার স্বাক্ষরটা যখন এদের প্রয়োজনীয়, তখন কিছুতেই ওরা আমায় মেরে ফেল্‌বে না—এটা নিশ্চিত। যাই কেন না হোক, আমি কিছুতেই সই করবো না।"

[ক্রমশঃ]

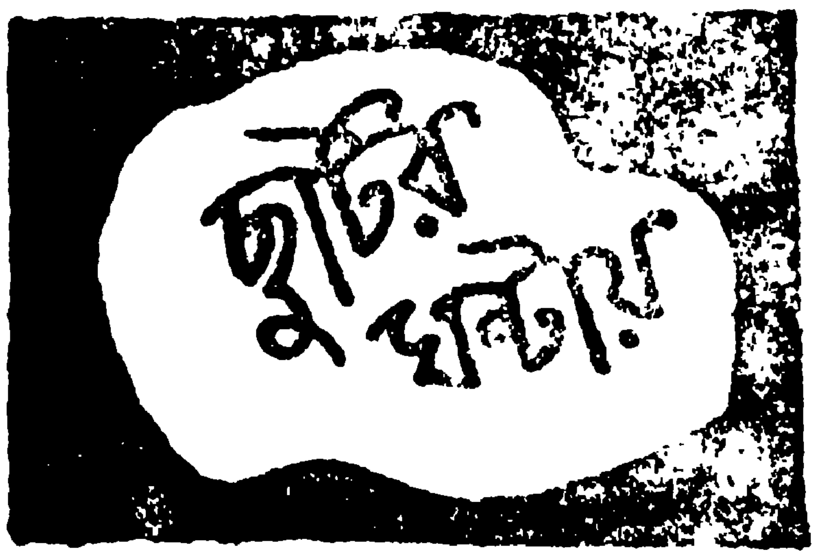

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের নতুন-ধরণের একটি আজব-মজার ভোজবাজী-খেলার কথা বলছি। এ খেলার সহজ সরল কলা কৌশলটুকু ঠিকমতো শিখে রপ্ত করে নিয়ে, নিতান্ত-ঘরোয়া অল্প-ব্যয়ের টুকিটাকি দু চারটি সাজসরঞ্জামের সাহায্যে তোমরা অনায়াসেই ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের আসরে আজব-মজার এই ভোজবাজীর কারসাজি দেখিয়ে সবাইকে শুধু আনন্দ নয়, রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো।

আপাততঃ শোনো—এ খেলার কলা-কৌশলের আসল রহস্য-কাহিনী। কিন্তু সে কাহিনী বলবার আগে, এ খেলা দেখানোর জন্য টুকিটাকি যে সব সাজসরঞ্জাম দরকার, তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এজন্য চাই—খুব মিহিভাবে গুঁড়ানো একমুঠো হাঁসের ডিম, একখানা শাদা কাগজ, একপাত্র নুনের-জল, একটি মোমবাতি এবং একবাক্স দেশলাই। ফর্দ্দমতো জিনিষ-গুলি সংগ্রহ করে, আসরে দর্শকদের সামনে এ কারসাজি দেখানোর আগেই, তাঁদের সবাইকার দৃষ্টির অগোচরে নেপথ্যে চুপিচুপি 'আয়োজন-পর্ব্বের' কয়েকটি বিশেষ জরুরী কাজ সেরে রাখতে হবে। কারণ, নিখুঁতভাবে এবং সযত্নে গোড়াতেই এ সব খুঁটিনাটি কাজ সেরে রাখতে না পারলে, আসরে দর্শকদের সামনে ভোজবাজীর কারসাজি দেখানোর সময় খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হবে···এমন কি, সুষ্ঠুভাবে কশরতীর পরিচয় দেওয়াও সম্ভব হয়ে উঠবে না শেষ পর্য্যন্ত। কাজেই সবার আগে, এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা দরকার।

'আয়োজন-পর্ব্বের' প্রথম কর্ত্তব্য হলো—হাঁসের ডিমটিকে ফাটিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি রেকাবীতে বা 'ট্রে'তে (Tray) ডিমের ভিতরকার লালাটুকু সযত্নে সঞ্চিত করে রেখে, সেই তরল পদার্থের সঙ্গে পাউডারের মতো মিহিভাবে গুঁড়ানো ফিটকিরি দানাগুলিকে মিশিয়ে আঠার মতো পাতলা—থকথকে সেই 'লেইয়ের' প্রলেপ মাখিয়ে দাও সাদা কাগজখানির দু'পিঠেই। তারপর প্রলেপ-মাখানো সেই কাগজখানিকে কিছুক্ষণ ছায়া শীতল কোনো জায়গায় রেখে খোলা বাতাসে আগাগোড়া বেশ ভালো-ভাবে শুকিয়ে নাও।

এবারে সেই শুকনো কাগজখানিকে নুনের জল ভরা পাত্রে চুবিয়ে অল্পক্ষণ ভিজিয়ে সেটিকে পুনরায় আগের পদ্ধতিতে ছায়া-শীতল জায়গায় রেখে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নাও। তাহলেই 'আয়োজন পর্ব্বের' ব্যবস্থাদি সাঙ্গ হবে।

অতঃপর, দর্শকদের আসরে ভোজবাজীর কশরৎ দেখানোর সময়, সাড়ম্বরে জলন্ত মোমবাতির আগুনের

শিখার উপরে, 'ইতিপূর্ব্বেই সকলের দৃষ্টির অগোচরে বানিয়ে-রাখা' ঐ কাগজের টুকরোটিকে যখন মেলে ধরবে, সবাই অবাক-বিস্ময়ে দেখতে পাবেন যে সেটিতে আগুন ধরলেও, জ্বলন্ত শিখার স্পর্শে সাধারণ অন্যান্য কাগজের মতো নিমেষেই দপ্ করে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না। এবারের খেলাটির এই হলো আসল মজা!

আপাততঃ, এই পর্য্যন্তই। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা বলবো।

মনোহর মৈত্র

১। মজার হেঁয়ালী :

+১৫	−৯	+৭	×৮½	−১
+৩	×১৬⅔	−৫	+২১	−১৩
+১	+১৭	?	+৯	×১০
−১১	+৫	×২৫	−৩	+১৩
×১২½	−৭	+১৯	−১৫	+১১

উপরের চতুষ্কোণ-ছকের চব্বিশটি ঘরে অঙ্কের বিভিন্ন চিহ্ন-বসানো যে সব সংখ্যা দেখছো, সেগুলিকে সমান-সারিতে পর-পর পাঁচ-ঘর হিসাবে আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি-ভাবে—যেদিক দিয়েই আঁক কষো, মোট ফল হবে ১০০। কিন্তু ছকের ঠিক মাঝখানের ঘরটিতে যে সংখ্যাটি এবং অঙ্কের যোগ-বিয়োগ অথবা গুণ-চিহ্নের সাঙ্কেতিক হরফ দেওয়া প্রয়োজন ছিল, সেটি উহ্য বা অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে বুদ্ধি খাটিয়ে হিসাব কষে তোমাদের যে কেউ সেই সংখ্যাটি ও তার সঙ্গের সাঙ্কেতিক-চিহ্নটির সঠিক হদিশ খুঁজে বার করে সরাসরি আমাদের দপ্তরে লিখে জানাতে পারবে—আগামী সংখ্যায় সকলের কাছেই আমরা সানন্দে তার নাম-ধাম-পরিচয় প্রকাশ করে দেবো। সবাই তারিফ করবে তার বাহাদুরী আর বুদ্ধিমত্তার—সেটা খুবই গৌরবের বিষয়... নয় কি? দ্যাখো না, চেষ্টা করে একবার—এ আজব হেঁয়ালির সঠিক জবাব দিতে পারো কিনা!

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। তিন অক্ষরের বিশেষ একটি কথা...পুরোটিতে অর্থ বোঝায়—যুদ্ধের উপযোগী এক ধরণের অস্ত্র এবং আজকালকার দিনের প্রায় বেশীর ভাগ তরুণ আর প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষেরাই হামেশা সেটি পালন করে থাকেন। তিন-অক্ষরের এই শব্দের প্রথমটিকে বাদ দিলে সম্মান বোঝায় এবং মাঝের অক্ষরটিকে ছেঁটে দিলে শরীরের বিশেষ একটি অঙ্গের নাম হয়। বলো তো, তিন অক্ষরের সেই শব্দটি—আসলে কি?

রচনা :—শান্তনু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের "ধাঁধা ও হেঁয়ালির" উত্তর :

১। ১২

২। কপিল

গতমাসের দুটি ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিয়েছে :

মহেন্দ্র, নগেন্দ্র, হরেন্দ্র ও বকুল সেন (আসানসোল), ছবি, রবি, টাবু ও মালতী রায়চৌধুরী (কলিকাতা), সীতাংশু, হারাণ, হিমাংশু, সুধাংশু, অলকা মুখোপাধ্যায় ও সুষমা রায় (সন্তোষপুর), মৃদুলা, সরলা, মেখলা, অনিলেন্দ্র, শমীন্দ্র, চন্দ্রনাথ, পুরুষোত্তম ও ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কলিকাতা), উমাশঙ্কর, কালীশঙ্কর, পদ্মনাথ, গুরুদাস, শান্তা, কাকলী, চন্দ্রিমা, ললিতা ও শোভনা দাসগুপ্ত (জলপাইগুড়ি), অভিলাষ, পটল, শ্যামসুন্দর, গোকুল, নকুল ও সহদেব হালদার মদনপুর), দোলনা, রোচনা ও

ফণীন্দ্র সাহা (কলিকাতা), সুমা, পুতুল, টাবলু, হাবলু, নিপু ও খোকা (হাওড়া), শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, সঞ্জয়, পুরন্দর, অরিন্দম ও অর্ঘ্যকুমার বসু (নিউ দিল্লী), পুপু, ভুটু, রাজা, বিজু, বুজু, কুলু (কলিকাতা)।

গত মাসের তিনটি প্রাধাঁর সঠিক উত্তর দিয়েছে :

নলিনী, শ্যামলী, ধ্রুবজ্যোতি, পদ্মনাভ, অদ্রিজাকুমার সেন রায় (গয়া), খোকন, লক্ষ্মী, মুরারি, কৃষ্ণা, সঞ্জয়, কল্যাণী, কাজল, ইন্দ্রাণী, গৌরী, অমিয়কুমার, সুনীল, সুমিতা, হীরেন ও মহীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর), বিজয়েন্দ্রকুমার ও বিনয়েন্দ্রকুমার সিংহ (হাজারীবাগ), রাণা, প্রশান্ত, অমিয়, কৃষ্ণলাল, সুধীশ, ভাস্কর, সুনীত, অভি, কালিদাস ও সারদাচরণ গুপ্ত (কলিকাতা), রেখা, মালা, সবিতা, প্রথম, মাধবনাথ, বটুকেশ্বর ও প্রীতিময় দাস (বোম্বাই), অলকেশ, প্রমথেশ, পুলকেশ ও সমরেশ চৌধুরী (আগড়পাড়া), লীলাময়, শতদ্রু, সত্যকাম ও নচিকেতা ঘোষ (কলিকাতা , বীণা, লীনা, সীতা, দময়ন্তী, হাসি, সূর্য্যকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী), শশধর, নটবর, মৃগাঙ্ক, শচীন্দ্র, হেমেন্দ্র, পুষ্পেন্দু, সুশোভন সরকার (বর্দ্ধমান), নির্ম্মলা, অজয়, বিজয়, সুজন বিজন ও পারমিতা দত্ত (কলিকাতা), দ্বিজেন্দ্র, রথীন্দ্র, দেবী, ঊষা, মহামায়া, চিত্রেশ্বরী ও নাগার্জ্জুন নন্দী (কৃষ্ণনগর), হেমনাথ রায় (বারাসত), পাটু, নাটু, ঘণ্টু, ঝুণ্টু ও লিণ্টু চক্রবর্ত্তী ;

আমার গান

গীতি সেনগুপ্ত

তোমার সুরের সুধাধারা ধরায় করো দান
সেই সে ধারায় জেনো আমার ভুবন করে স্নান ॥
পাখীর গানে ফুল যে ওঠে
রাতের সুরে চাঁদ যে ফোটে
আকাশ শোনে মুগ্ধ হয়ে নদীর কলতান ॥
মল বাজায়ে জল আনিতে
পুরাঙ্গনা যায় যে ঘাটে
এক সাথে সব সুর মিলায়ে
ক্ষেতে ওরা ধান যে কাটে।
সুরের মেলা জগৎ জুড়ে
সুরের খেলা হৃদয়পুরে।
তোমায় আমি ভালোবাসি" সেই ত আমার গান ॥

গল্প

জবানবন্দী

শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন

কোর্ট লোকে লোকারণ্য। সারা সহর যেন ভেঙ্গে পড়েছে।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্তা চামেলী চ্যাটার্জি। বয়স তিরিশের ওপারে। ছিমছাম গড়ন। গলায় সরু চেন হার। হাতে বালা। ডানহাতে রিষ্টওয়াচ্। মাথায় ডোনাট খোঁপা। চোখে গগল্‌স্। বেশভূষায় দেখাবার চেষ্টা বয়স কুড়ির বেশী নয়। হায় মূঢ়া! মেয়েরা যে কুড়িতেই বুড়ি! চামেলীর রঙিন শাড়ীর রঙের ছটায় কোর্টরুম ঝলকিত। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে।

—এই সাক্ষীকে আপনি চেনেন? বিনতা রায়কে দেখিয়ে চামেলীকে প্রশ্ন করেন সরকার পক্ষের উকিল বরদা চ্যাটার্জি।

—হ্যাঁ, চিনি। নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় চামেলী।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। কলিং বেল বাজে। বালীগঞ্জের বিরাট ব্যবসাদার সুদর্শন রায়ের বাড়ী। গরমের দুপুর। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। ফুলস্পীডে পাখা চালিয়ে গরম কাটাবার চেষ্টা করছে সুদর্শন রায়ের স্ত্রী বিনতা রায়। পাখার স্পীডে বুকের কাপড় সরে যাচ্ছে। চোখে আধ-ঘুম। এই দুপুর রোদে কে আসবে! বিনতা আবার পাশ ফেরে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং। আবার বেল বাজে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেশবাস ঠিক করে নিয়ে উঠে পড়ে বিনতা। চোখ রগড়ে দরজা খুলে দাঁড়ায়।

—নমস্কার। এই দুপুর রোদে আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য ক্ষমা করবেন।

দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলেন চামেলী চ্যাটার্জি। মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

—আপনি ভেতরে বসুন।

সোফা দেখিয়ে দেয় বিনতা।

—আমার নাম মিসেস্ চামেলী চ্যাটার্জি। নারী জাগরণী সমিতির সভাপতি। আমার কাজ হচ্ছে মেয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগিয়ে রাখা। তাই আপনার ঘুম ভাঙ্গাতে বাধ্য হলাম।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে গগল্‌স্ খুলে চোখ বুঁজে বলেন চামেলী চ্যাটার্জি। ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। ঘুমন্ত বিনতকে জাগিয়ে দিয়ে ঘুমোবার ভাণ করেন নারী জাগরণী সমিতির সভাপতি চামেলী চ্যাটার্জি।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হ'লাম।

আস্তে আস্তে বলে বিনতা।

চামেলী আড়চোখে দেখে নেন যে তাঁর প্রভাব বিনতার ওপর বিস্তারিত হচ্ছে। তিনি এবারে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেন।

— আপনার ভবিষ্যতের সংস্থান করতে আমি এসেছি।

সোজা প্রস্তাব করেন চামেলী চ্যাটার্জি।

—আপনার কথার আমি মানে বুঝতে পারলাম না।

লজ্জিত হয়ে বলে বিনতা।

—আপনার স্বামী বিরাট ধনী। তিনি বেঁচে থাকতে আপনার কোনদিন কোন অভাব হবে না। তবে ভগবান না করুন, তিনি যদি হঠাৎ মারা যান তখন আপনার অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি? তিনি বেঁচে থাকতেও আপনার অবস্থা খারাপ হতে পারে। ধরুন, তিনি যদি একদিন আপনাকে ডাইভোর্স করেন তখন আপনি কোথায় দাঁড়াবেন?

বিনতার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করেন চামেলী। বিনতা অমঙ্গলের কথা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠে।

—ভয় পাবেন না বিনতা দেবী। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভালো। এখন ঘুমিয়ে কাটালে ভবিষ্যতে আর ঘুমোবার সময় পাবেন না। এখন স্বামীর সোহাগে নিজের

অস্তিত্ব ভুলে আছেন। পুরুষজাতকে একেবারে বিশ্বাস করবেন না। সংসদের অধিকাংশ সদস্যই পুরুষ। তাই দেখুন না 'ডাইভোর্স' বিলটা কেমন তাড়াতাড়ি পাস হয়ে গেল। একদিন যখন আপনার রূপের জ্যোতি নিভে যাবে তখন দেখবেন আপনার স্বামী আপনাকে উচ্ছিষ্টের মত দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাই সময় থাকতে সাবধান হয়ে যান। আপনাদের সাহায্য করবার জন্য নারী জাগরণী সব সময়ই প্রস্তুত। আপনি দৈনিক বহু টাকা অযথা ব্যয় করেন। নিজের নামে দশ হাজার টাকার একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে রাখুন। এক বছরের প্রিমিয়াম পাঁচশ টাকা দিয়ে দিন। ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত।

বেশ জোরের সঙ্গে বলেন চামেলী চ্যাটার্জি। লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ফর্ম ও কলম এগিয়ে দেন বিনতার দিকে।

—কিন্তু আমার স্বামীকে না জানিয়ে আমি কি করে ইন্স্যুরেন্স কার? আর তাছাড়া পাঁচশ টাকা আমি একসঙ্গে পাই কোথা থেকে?

আমতা আমতা করে বলে বিনতা।

—আপনি দেখছি নিতান্তই অবলা। স্বামীর অবহেলার বিরুদ্ধে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন, এতে স্বামীর মতের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আর আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন যে লাখ টাকার মালিক সুদর্শন রায়ের স্ত্রী বিনতা রায়ের বাক্সে এখন পাঁচশ টাকা নেই?

চোখ বড় করে প্রশ্ন করেন চামেলী চ্যাটার্জি।

অভিভূতের মত ওপর থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে এসে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ফর্মে সই করে দেয় বিনতা রায়।

টাকাটা ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর রেখে দিয়ে জয়ের হাসি হেসে রাস্তায় নেমে পড়েন চামেলী চ্যাটার্জি।

—লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পলিসি আর আমার কাছে এলো না। বিনতার সাক্ষ্য শেষ হয়।

—এর বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলবার আছে? চামেলীকে প্রশ্ন করেন বরদা চ্যাটার্জি।

—না। নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় চামেলী।

—এই সাক্ষীকে আপনি চেনেন? শমিতা ঘোষকে দেখিয়ে চামেলীকে প্রশ্ন করেন বরদা চ্যাটার্জি।

—হ্যাঁ, চিনি। উদাসভাবে জবাব দেয় চামেলী।

খট্ খট্ খট্। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। টালীগঞ্জে উঁচু ধরণের কেরাণী রামমোহন ঘোষের বাড়ী। বর্ষার দুপুর। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির শব্দে পুরাণো দিনের নেশা জাগে শমিতার চোখে। পাঁচবছর আগে এমনি এক বৃষ্টির দিনে শান্তিনিকেতনে দেখা হয় রামমোহনের সঙ্গে। প্রথম দেখায়ই জন্মে প্রেম। তারপর হয় বিয়ে। খট্ খট্ খট্। আবার দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। নতুন করে অনুভব করা পুরাণো শিহরণ থেমে যায়। বিরক্তমুখে দরজা খুলে দেয় শমিতা।

—নমস্কার। এই বৃষ্টিতে আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য ক্ষমা করবেন।

দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলেন চামেলী চ্যাটার্জি। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে।

—আপনি বৃষ্টিতে বাইরে দাঁড়াবেন না। ভেতরে এসে বসুন। চেয়ার দেখিয়ে দেয় শমিতা।

—আমার নাম মিসেস্ চামেলী চ্যাটার্জি। নারী জাগরণী সমিতির সভানেত্রী। আমার কাজ হচ্ছে মেয়েদের ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে রাখা। তাই আপনার ঘুম ভাঙাতে আমি বাধ্য হ'লাম।

রেনকোটটা খুলে চেয়ারে বসে পড়েন চামেলী চ্যাটার্জি। বাইরে তখনও ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুমন্ত শমিতাকে জাগিয়ে দিয়ে চোখ বোঁজেন নারী জাগরণী সমিতির সভাপতি চামেলী চ্যাটার্জি।

—কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার তা তো বুঝতে পারলাম না। দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে শমিতা।

চামেলী আড়চোখে একবার শমিতাকে দেখে নেন। তারপর সোজা হয়ে বসেন।

—সেইজন্যেইতো আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে বুঝতে পারছেন না। আপনার স্বামী মোটামুটি ভালই চাকরি করেন। কিন্তু ভগবান না করুন, তিনি যদি হঠাৎ মারা যান তখন আপনার অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি? আর তিনি বেঁচে থাকতেও যে আপনার অবস্থা খারাপ না হতে পারে এমন কোন গ্যারান্টি নেই। 'ডাইভোর্স বিল' পাস হয়ে গেছে নিশ্চয়ই জানেন। ধরুন, তিনি

যদি একদিন আপনাকে ডাইভোর্স করেন তখন আপনি কোথায় দাঁড়াবেন? আড়চোখে চামেলী আর একবার শমিতাকে দেখে নেন। শমিতার মুখে চামেলীর বক্তৃতার প্রভাবের ছায়া সুস্পষ্ট। তাই বলছিলাম সময় থাকতে সাবধান হয়ে যান। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। এখন যদি ঘুমিয়ে কাটান তো ভবিষ্যতে জেগে কাটাতে হবে। এখন স্বামীর আদরের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। কিন্তু পুরুষজাতটাকে বিশ্বাস করবেন না। ভবিষ্যতে একদিন হয়তো তাঁর অনাদরের পাঁকে পা পিছলে পড়বেন। তাই সময় থাকতে সাবধান হয়ে যান। আপনাদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে দিতে নারী জাগরণী সমিতি সব সময়ই প্রস্তুত। আপনি মাসে বেশ কিছু টাকা অপচয় করেন। তাই বলছিলাম যে একশ টাকা দিয়ে National Savings Certificate কিনে রাখুন। দশবছর বাদে একশ চল্লিশ টাকা পাবেন।

দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন চামেলী চ্যাটার্জি।

—কিন্তু আমার স্বামীর বিনা অনুমতিতে আমি কি করে একশ টাকা খরচ করি?

আমতা আমতা করে বলে শমিতা।

—স্বামীকে না জানিয়েই তো আপনার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। আপনি দেখছি নিতান্তই ছেলেমানুষ!

'হো' 'হো' করে হেসে ওঠেন চামেলী চ্যাটার্জি। হাসির শব্দে শমিতার মনের সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। যন্ত্র-চালিতের মত সে চামেলীর হাতে একশ টাকা এগিয়ে দেয়।

দশটাকার দশখানা নোট গুণে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে রেনকোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন চামেলী চ্যাটার্জি।

—Nationl Savings Certificate-এর কাগজ আর আমার কাছে এলো না।

শমিতার সাক্ষ্য শেষ হয়।

—এর বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলবার আছে? চামেলীকে প্রশ্ন করেন বরদা চ্যাটার্জি।

—না। আবার উদাসভাবে জবাব দেয় চামেলী।

—এই সাক্ষীকে আপনি চেনেন? মীরা চক্রবর্তীকে দেখিয়ে চামেলীকে প্রশ্ন করেন বরদা চ্যাটার্জি।

—হ্যাঁ। বেশ সহজভাবে জবাব দেয় চামেলী।

—ভেতরে আসতে পারি কি?

শীতের দুপুর। খিদিরপুরে কারখানার শ্রমিক সুশীল চক্রবর্তীর বাড়ীর দরজায় নারীকণ্ঠ। কোলের মেয়েটা সারারাত জ্বালিয়েছে। দুপুরে বেশ শীত পড়েছে। রাত্রে ঘুম না হওয়ায় লেপ মুড়ি দিয়ে মীরা প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েটা বাদুড়ের মত বুকের ওপর লেপ্টে আছে।

—ভেতরে আসতে পারি কি? দরজায় আবার নারীকণ্ঠ।

বাধ্য হয়ে মীরা বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দেয়।

—নমস্কার। অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য ক্ষমা করবেন। হাতজোড় করে বলেন চামেলী চ্যাটার্জি। মুখে কৃতার্থতার ভাব।

—আপনি ভেতরে বসুন।

একটা টুল এগিয়ে দেয় মীরা। অবাক হয়ে ভাবে তার বাড়ীতে কি জন্য এহেন মহিলার পদার্পণ।

—আমার নাম মিসেস চামেলী চ্যাটার্জি। নারী জাগরণী সমিতির সভাপতি। আমার কাজ হচ্ছে মেয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগিয়ে রাখা। তাই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হ'লাম।

টুলের ওপর সহজভাবে বসেন চামেলী চ্যাটার্জি।

—আমি সামান্য মেয়েমানুষ। আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি?

গদগদভাবে প্রশ্ন করে মীরা।

—আপনার উপকারের জন্যই আমি এসেছি।

ঘুমন্ত মীরাকে জাগিয়ে দিয়ে ঢুলু ঢুলুভাবে বলেন নারী জাগরণী সমিতির সভাপতি চামেলী চ্যাটার্জি।

—আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

লজ্জিত হয়ে বলে মীরা।

—আপনার স্বামী কারখানায় চাকরি করেন। কষ্টেসৃষ্টে আপনাদের দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি একবারও ভেবে দেখেন নি, ভগবান না করুন, আপনার স্বামী যদি হঠাৎ মারা যান তখন আপনি কোথায় দাঁড়াবেন? আর তাছাড়া জানেন তো আজকাল কারখানায় বহু মেয়ে-শ্রমিকও কাজ করে। ধরুন,

আপনার স্বামী যদি তাদের কাউকে বিয়ে করে আপনাকে ডাইভোর্স করে দেন তখন আপনার অবস্থা কি হবে? পুরুষজাতটাকে কখনও বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে নেই। ওদের অসম্ভব কোন কাজ নেই। তাই এখন থেকে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে রাখুন। আজকাল পোষ্টাপিসে খুব অল্পটাকায় পাস বই করা যাচ্ছে। আমাকে তিরিশটা টাকা দিন। আমি কালই আপনার নামে একটা পাস বই করে দিয়ে যাবো। তারপর মাঝে মাঝে পাস বইতে টাকা জমা দেবেন। তাহলে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

ভবিষ্যতের সুখের চিত্র এঁকে দেন চামেলী চ্যাটার্জি।

—আপনি কাল আসবেন। আমার স্বামীকে জিগ্যেস করে রাখবো।

ধীরে ধীরে বলে মীরা।

—বাঙ্গালী মেয়েদের ঘুম ভাঙ্গানো খুব কঠিন। নিজেদের ভালো নিজেরা বোঝে না!

চামেলীর সুরে বিদ্রূপ।

মীরার কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। একমুহূর্তে সে তিরিশটাকা বের করে দেয়।

টাকাটা গুণে নিয়ে মুচ্‌কি হেসে চলে যান চামেলী চ্যাটার্জি।

—পোষ্টাপিসের পাস বই আর আমার কাছে কোনদিন এলো না।

মীরার সাক্ষ্য শেষ হয়।

—এর বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলবার আছে? চামেলীকে প্রশ্ন করেন বরদা চ্যাটার্জি।

—না। বেশ সহজভাবেই জবাব দেয় চামেলী।

—আপনি তাহলে স্বীকার করছেন যে এই তিনজন সাক্ষীকেই আপনি প্রতারণা করেছেন।

আঙুল নেড়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলেন বরদা চ্যাটার্জি।

—হ্যাঁ।

বেশ জোরের সঙ্গেই উত্তর দেন চামেলী চ্যাটার্জি।

সমগ্র কোর্টরুম সচকিত হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। এ যে বড় অদ্ভুত তেজ! মাননীয় বিচারকও একটু নড়েচড়ে বসেন।

—আপনি বলছেন যে আপনি এই তিনজন মহিলাকেই প্রতারণা করেছেন। আপনি বিবাহিতা। আপনার কথাবার্তায় মনে হয় আপনি শিক্ষিতা। তবে আপনার এই প্রতারণার উদ্দেশ্য কি? আপনি এঁদের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়েছেন। জানেন এর জন্য আপনার কি শাস্তি হতে পারে?

ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রশ্ন করেন বরদা চ্যাটার্জি।

—উদ্দেশ্য? শাস্তি? চোখ থেকে গগলস্‌ খুলে কোর্টের চারিদিকে এবং বরদা চ্যাটার্জির মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় চামেলী। আমার সমস্ত জীবন বিনাদোষে ছারখার হয়ে গেছে। তাই কোন মেয়ে স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘর করে এটা আমি সহ্য করতে পারি না। স্বামী স্ত্রীর মনে সন্দেহের বীজ বপন করে সুখের সংসারে ফাটল ধরানোই আমার উদ্দেশ্য। আমার মত প্রতারকের কি শাস্তি? মাননীয় বিচারক যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আমার জবানবন্দী দিতে পারি। তারপর আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি তা মাথা পেতে নেবো।

চামেলীর স্বরে বিনীত প্রার্থনা। নিষ্প্রভ চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে। চামেলীর খোলা চোখে চোখ পড়তেই সরকারী উকিল থতমত খেয়ে মাননীয় বিচারকের দিকে তাকান।

—Your Honour আসামী নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি দোষী। এক্ষেত্রে তাঁর জবানবন্দীর কোন প্রশ্ন ওঠে না।

বেশ জোরের সঙ্গে বলেন বরদা চ্যাটার্জি।

Let her proceed with her deposition.

গম্ভীর স্বরে চামেলীকে জবানবন্দী দেবার অনুমতি দেন মাননীয় বিচারক।

বরদা চ্যাটার্জি হোঁচট খান। দেহে ও মনে। হাওয়া বের হয়ে যাওয়া বেলুনের মতন মুখটা চুপসে ছোট হয়ে যায়।

১৯৫৪ সাল। ঢাকা সহর। চামেলীর গরীব বাবা তাঁর যথাসর্বস্ব খরচ করে বি, এ পাস একমাত্র মেয়ের ভালো ঘরে বিয়ে দেন।

—আমার রোজগার একটু স্থিতিশীল হলেই বাসা করে তোমাদের নিয়ে যাবো। যতদিন বাসা না করতে পারি ততদিন তুমি আমার বৃদ্ধ বাবা-মার সেবা কর। আমি থাকব কলকাতার মেসে; কিন্তু আমার মন থাকবে তোমার এখানেই।

বিয়ের পর দেশ থেকে ফিরবার আগের দিন চামেলীকে আদর করেন তাঁর স্বামী।

স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করে চামেলী বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে দিন কাটায়। হঠাৎ মানুষের পশুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে। গুণ্ডারা চামেলীদের বাড়ী আক্রমণ করে। চামেলীর শ্বশুর-শাশুড়ী মারা যান। চামেলী অজ্ঞান হয়ে যায়। পরের দিন জ্ঞান ফিরলে দেখে গুণ্ডাদের কবল থেকে মুক্ত করে চামেলীকে আশ্রয় দিয়েছে প্রতিবেশী রাবেয়া খাতুন। কয়েকদিন পরে সুস্থ হয়ে চামেলী সব ঘটনা জানিয়ে স্বামীকে চিঠি লেখে এবং অবিলম্বে তাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। রোজই ট্রেনের সময় বারান্দায় ছুটে আসে। এই বুঝি তিনি এলেন চামেলীকে নিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি এলেন না, দু'মাস পরে এলো তাঁর চিঠি। তোমাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। রাবেয়া তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে। রাবেয়া প্রফেসর। শিক্ষিতের কাজই সে করেছে। কিন্তু রাবেয়ার স্বামী মাতাল, দুশ্চরিত্র। এক্ষেত্রে তোমাকে নিয়ে ঘর করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এতে আমার সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তুমি বি, এ পাশ। নিজের পথ নিজে দেখে নিতে পারবে। আমাকে তুমি ভুলে যেও। আমি আবার বিয়ে করছি। চিঠি পড়ে চামেলী হতভম্ব হয়ে যায়। একে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! আরো বেশী হতভম্ব হয় মুসলমান মেয়ে রাবেয়া খাতুন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মেয়েরা জাতিতে এক। কলিজায় একই রক্ত। রং তার লাল। তারপ রাবেয়ার পরামর্শে এবং রাবেয়ার দেওয়া কিছু টাক সম্বল করে কলকাতায় চলে আসে চামেলী। অজান অচেনা বিশাল কলকাতা সহরে নিঃসহায় চামেলী প চলে। ভদ্রঘরের বৌ, বি, এ পাশ চামেলী চ্যাটার্জি আজ প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্তা হয়ে আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। আর সেই মামলায় সরকার পক্ষে উকিল বরদা চ্যাটার্জিই চামেলীর স্বামী। বিয়ের আগে উনি কলকাতার একটি মেয়েকে ভালোবাসতেন। কিন্ত বাপ মার মতের বিরুদ্ধে যাবার ওঁর শক্তি ছিল না তাই বাধ্য হয়ে উনি চামেলীকে বিয়ে করেন। হতভাগ চামেলীর গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছনার সুযোগ নিয়ে উনি পূর্ব-প্রণয়িনীকে বিয়ে করেন। ওঁর প্রণয়িনী ওঁকে বুঝিয়ে দেন যে চামেলী ধর্ষিতা। অতএব ভদ্রঘরের বৌ হবার অযোগ্যা। একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের সুখের সংসার ছারখার করে দেয়। দশ বছর আগেকা চামেলীকে তিনি চিনতে পারেন নি কারণ তিনি যে চামেলীকে ভুলতে চেয়েছেন। কিন্তু চামেলী তাঁকে ঠিকই চিনতে পেরেছে। মেয়েরা একবার যাকে মন দেয় আর তাকে মন থেকে মুছতে পারে না। আমার জবানবন্দীর সত্যতা প্রমাণ করবে এই ফটো।

ব্লাউজের ভেতরের বুকের খাঁজ থেকে চামেলী তার ও বরদার বিয়ের পরে তোলা একখানা যুগ্ম ফটো বের করে কোর্টকে দেখায়। তার চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ছোটে।

—Your Honour, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি··· আমি···গোঁ গোঁ করতে করতে বরদা উকিল মাথা ঘুরে পড়ে যান। কোর্টে সোরগোল ওঠে। পুলিস জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য এগিয়ে আসে। মাননীয় বিচারক সেদিনকার মত কোর্টের কাজ বন্ধ করে দেন।

ধাতুক্ষয় ও তার নিবারণ

অধ্যাপক ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডি-ফিল

লোহা ও লোহা মিশ্রিত অন্যান্য ধাতুর উপাদানে ভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরী হয় এবং এইসব যন্ত্রপাতিগুলিকে রিচার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা বহুদিন ধরে চলে সছে। ইংরাজীতে মরিচাকে "রাষ্ট" বলে। বৈজ্ঞানিকরা াহাকে মরিচাহীন করার জন্য বিবিধ পদ্ধতিতে গবেষণা রে বেশ কিছু আলোক সম্পাত করতে সক্ষম হয়েছেন। ন্তু কোন নির্দিষ্ট প্রণালীর দ্বারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে াহার ক্ষয় সম্পূর্ণ রোধ করার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ত পারেন নি। অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্র- তির অপকৃষ্টতার একটি প্রধান কারণ মরিচা। লোহা রক্ষণে রাসায়নিক প্রক্রিয়া, রং, মেটাল স্প্রে, প্লাস্টিক বরণ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। লোহা ক্ষণের নব নব পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে।

শিল্প উন্নয়নে লোহা ও লোহার সঙ্গে অন্য ধাতুর শ্রণ ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপকভাবে চলেছে। াহার কলকারখানাগুলি দ্রুত উন্নতির পথে চলছে। ানীং পৃথিবীর বহু প্রদেশে এমন কি শিল্প-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য শগুলিতেও ভারতের তৈরী লোহা ও অন্যান্য মিশ্রিত তুর যন্ত্রপাতিসমূহ প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হচ্ছে। ল্পোন্নত দেশগুলির মতই ভারতবর্ষও শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত গ্রসর হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার রা ভারতও নতুন কিছু করবার চেষ্টা করবে। বিশ্বের জ্ঞানিক মহল লোহাকে মরিচাহীন করবার চেষ্টায় শেষ তৎপর হয়ে আছেন। বৈজ্ঞানিক মনীষীরা এর ন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে অক্লান্ত পরিশ্রম রছেন। আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা সংরক্ষণ তির ব্যবস্থা করা হয় শিল্প কারখানায় তার প্রয়োগ টেই লাভজনক হয় না।

বিভিন্ন ধাতু ও তার বিবিধ ব্যবহার মানব সভ্যতার থম অধ্যায় থেকেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তাধারাকে ক্রমে ক্রমে উন্নতির শীর্ষস্থানে এনেছেন। প্রস্তর যুগের পর মানুষ প্রথম ধাতুর ব্যবহার শেখে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করল। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষপত্র থেকে সুরু করে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীতেও লোহা, ইস্পাত ও বহুবিধ ধাতুর প্রয়োজন হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকরা লোহা ও ইস্পাতের ক্ষয় নিবারণের পন্থা আবিষ্কারে সক্ষম হলে সমগ্র শিল্পজগতে বিপ্লবের সৃষ্টি হবে।

মরিচাহীন লোহার জন্য নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। ইংরাজীতে এই নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতকে ষ্টেনলেস ষ্টিল (Stainless Steel) বলে। সাধারণতঃ ইস্পাতের সহিত ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত বা স্টেনলেস ষ্টিল তৈরী করা হয়। বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্প, অম্লজান প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই মিশ্রধাতুর ক্ষয় ক্ষতির প্রতিকূল। এমন কি, জৈব রাসায়নিক উইক অম্ল (organic weak acid) ষ্টেনলেস ষ্টিলের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আধুনিক যুগে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি থেকে সুরু করে অতি সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অংশ পর্য্যন্ত ষ্টেনলেস ষ্টিল দ্বারা তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার ষ্টেনলেস ষ্টিলের রাসায়নিক সংমিশ্রণ বিভিন্ন। অল্প খরচায় ইহার উৎপাদন সময় সাপেক্ষ। নির্ভুল ও সূক্ষ্ম কাজের জন্যও ষ্টেনলেস ষ্টিলের ব্যবহার অপরিহার্য্য।

সর্ব্বপ্রকার শিল্পউন্নতিই দেশের সমৃদ্ধির একমাত্র সহায়ক। সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ভারতের বিভিন্ন কারখানাগুলিতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদনের খরচ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও ক্ষয় নিবারণ শিল্পে মূলধনী

ব্যয় হ্রাসে সাহায্য করবে। এ জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ধাতুর সম্পূর্ণ ক্ষয় নিবারণের চেষ্টায় গবেষণাগারে নানা পরীক্ষায় নিমগ্ন আছেন। কল-কারখানায় বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত গ্যাস ও বাষ্পে যন্ত্রের ক্ষয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বহুদিনের ব্যবহারে যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে এবং পুনর্নির্ম্মাণ বা পুনর্স্থাপন কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। উন্নত রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে যন্ত্রের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশে মেটাল স্প্রে করে যন্ত্রের পুনরুদ্ধার করা হয়। বিশ্বে সাধারণ ব্যবসাক্ষেত্রে ভারত অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। ভারতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন ধাতবদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে।

বায়ুর বিশেষ ধর্ম্ম হল লোহা ও তার সংমিশ্রণে প্রস্তুত কোন পদার্থকে ক্ষয় করা। লোহার উপর দস্তার প্রলেপে মরিচার ভয়াবহ হাত থেকে লোহার ক্ষয় প্রতিরোধ করা যায়। ১৯৫৪-৫৫ সালে ইংলণ্ডে প্রথম পরীক্ষামূলক-ভাবে লবণাক্ত জলের মধ্যে লোহার উপর দস্তা ও রংএর প্রলেপ দিয়ে তাদের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে দস্তার প্রলেপের জন্য লবণাক্ত জল লোহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্তু রং দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় লোহার উপরে মরিচা ধরা সুরু হয়। রাসায়নিক কারখানাগুলিতে যন্ত্রের উপর দস্তার প্রলেপ মোটেই উপযোগী নয়।

বিভিন্নপ্রকার প্রয়োগে বিভিন্ন ধাতুর প্রলেপনের প্রয়োজন হয়। এ্যাসিড কিম্বা এ্যাসিডের বাষ্প দস্তার উপর রাসায়নিক ক্রিয়া করে। এরূপক্ষেত্রে এ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড-এর (Aluminium oxide) আচ্ছাদনই এর একমাত্র প্রতিরোধক। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচুর উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া লোহা কিম্বা ইস্পাতে তৈরী যে কোন যন্ত্রপাতির ক্ষয় সাধন করে। নলের উপর দস্তার প্রলেপ অর্থাৎ গ্যালভ নাইসড্ (galvanised) পাইপ মাটির মধ্যে বহুদিন থাকিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে মাটির বীজাণু (soil bacteria) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লোহার তৈরী পাইপের উপর মরিচা পড়ে। যে কোন দেশে পৌর এলাকাগুলিকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জলের পাইপ, সয়েল পাইপ, ড্রেন পাইপ, ইলেকট্রিক কেবল (electric cable) মাটির মধ্য দিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে হিউম পাইপের ব্যবহার ও দেখা যায়। হিউম পাইপ লোহার তৈরী নয়, সিমেণ্ট প্রভৃতি দিয়ে নির্ম্মিত। এর ব্যবহার খুই অসুবিধাজনক কেননা স্থানান্তরের সময় হিউম পাইপ ভেঙ্গে যাবার সম্ভবনা থাকে। ক্ষমতা, কার্য্যকারিতা প্রভৃতি সকল দিক থেকে লোহার পাইপ হিউম পাইপের চেয়ে ভাল, কেবল মরিচাই এর একমাত্র অন্তরায়। মরিচা প্রতিরোধের জন্য ম্যাগনেসিয়ামের (magnesium) প্রলেপণও বিশেষ ফলদায়ক।

মোটামুটিভাবে বলা যায় লোহার মরিচা প্রতিরোধের পরীক্ষায় ভারত ও বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা গবেষণাগারে নিমগ্ন আছেন। অদূর ভবিষ্যতে মরিচাহীন লোহা তৈরীর সুলভ ও সহজ পন্থা আবিষ্কার হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষ্ণে মতিরস্তু

(শ্রীমতী ইন্দিরা দাশ মহাশয়ার পত্রের উত্তর)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী মনোযোগের সঙ্গে "বিশ্বভাষা-পরিক্রমা" পাঠ করার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে অযৌক্তিকতার যে-অভিযোগ তিনি এনেছেন, সবিনয়ে ও সংক্ষেপে তার উত্তর দিচ্ছি।

কৃষ্ণ যে ইচ্ছা করলেই কর্ণের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত ক'রে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতেন, তার প্রমাণ স্বয়ং যুধিষ্ঠির কুন্তীকে তিরস্কার করার সময়ে সে-কথা ঘোষণা করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদৌ অবশ্যম্ভাবী ছিল না; ঐ যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ষড়যন্ত্রের ফল; এ-কথা গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দেবার সময়ে বলায় কৃষ্ণ তার কোন উত্তর দিতে পারেন নি; যুধিষ্ঠিরও কুন্তীকে কর্ণের পরিচয় জানার পর বলেছিলেন যে, ঐ যুদ্ধ অনায়াসে এড়ানো যেত।

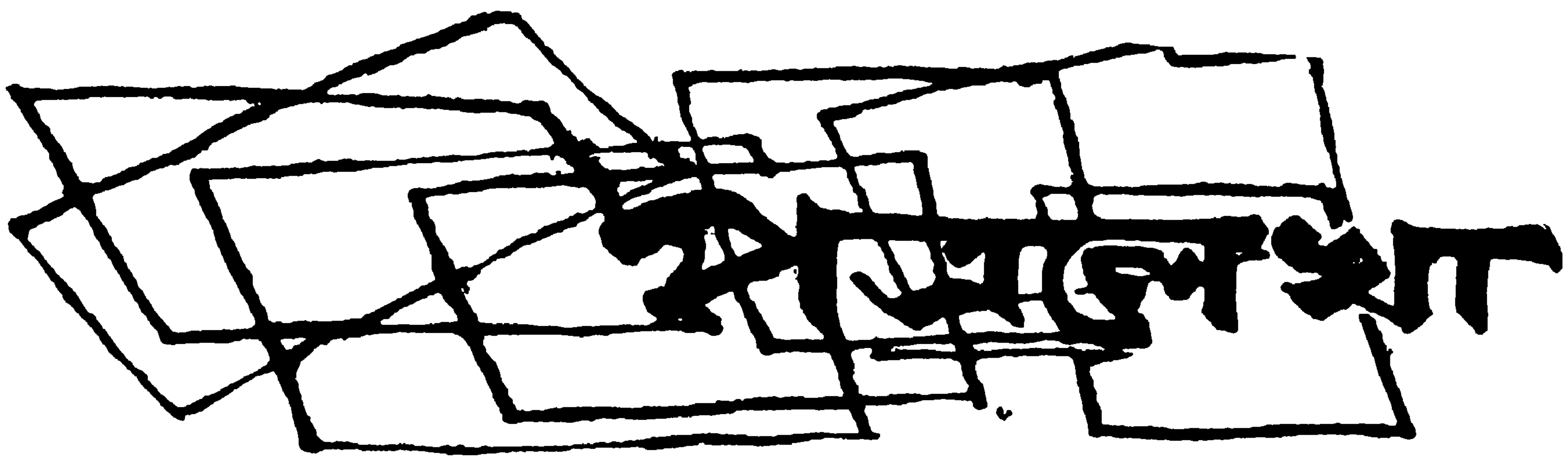

কৃষ্ণকে লেখিকা "সাধারণ মানুষের সমান" ব'লে স্বীকার ক'রে পরে আবার অতিমানব বলেছেন, এটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হয় নি; এমন স্বতোবিরোধ তাঁর রচনায় আরো আছে। "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোথাও ধর্ম, ন্যায়, সত্য ইত্যাদির অলৌকিক ক্রিয়া নাই" এ-কথা লিখেও লেখিকা আবার কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উচ্চাদর্শ প্রচারের জন্যে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু অধর্মযুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা কোন উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। গীতার প্রথমে অর্জুন যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণামে তা সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছিল। গীতা শঙ্করাচার্যের মতো মস্তিষ্কের অধিকারী সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন নি, তা স্মরণীয়।

"বিশ্বভাষা পরিক্রমা"-লেখক কৃষ্ণকে অতিমানব বা সাধারণ মানব কোনটাই না ব'লে একজন অসাধারণ কূটচক্রীরূপে বর্ণনা করতে ইচ্ছুক। একই ঘটনা থেকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিন্তু মূল ঘটনাবলী নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। লেখিকা বিশালকায় মহাভারতের সব অংশ স্বাভাবিক কারণেই একসঙ্গে স্মরণ করতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁর দু'একটি ঘটনাগত প্রমাদ সাধিত হয়েছে; সেগুলি সবিনয়ে দেখিয়ে দিলে আশা করা যায় তাঁর বিরাগভাজন হতে হবে না।

(১) কর্ণের কুন্তীপুত্র-পরিচয় দেওয়া কৃষ্ণের পক্ষে শুধু সম্ভবপর ছিল তাই নয়, কর্ণকে দলে টানতে পারলে তিনি তা করতে প্রস্তুত ছিলেন। "দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠ ভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবেন" উদ্যোগ পর্বে কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের এই উক্তি তার প্রমাণ। ধর্ম-সংস্থাপনার্থে অবতীর্ণ অতিমানবের যোগ্য উক্তি বটে!

(২) তখনকার দিনে কর্ণের "পাণ্ডুপুত্র পরিচয়" সর্বজনস্বীকৃত ছিল এবং তাতে জারজরূপে কুখ্যাত পঞ্চপাণ্ডবের সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট হবার ভয় ছিল না। তা না হলে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে শেষ পর্যন্ত সব কথা বললেন কেন এবং আগে না বলার জন্যে তিরস্কৃত হলেন কেন, সেটা ভেবে দেখা উচিত। এ-বিষয়ে স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তি:—"শাস্ত্রজ্ঞরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার কানীন ও সহোঢ় পুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যকাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ; তন্নিমিত্ত তুমি ধর্মত পাণ্ডুর পুত্র; পাণ্ডবগণও তোমাকে কৌন্তেয় ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন।" সুতরাং তখনকার দিনের আর্যসমাজে ঐ পরিচয় অপ্রকাশ্য ছিল না। কুন্তী যে

কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তার কারণ, তিনি রাজ্ঞী হবার পথ বিঘ্নমুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন—কুমারী মাতার ভালো পাত্র জোটানো কঠিন। কর্ণকে পুত্র ব'লে স্বীকৃতি তিনিও সুবিধামতো দিয়েছিলেন। অর্জুনাদির জারজখ্যাতি ছিল; কাজেই কৃষ্ণ তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট করতে পারতেন না। মাথা না থাকলে মাথাব্যথা কিসের!

দুচারজন লোকের সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষার জন্যে আঠারো অক্ষৌহিণী লোককে হত্যা মনুষ্যের কর্তব্য ব'লে মানা যায় না বোধ হয়। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা দেখুন।

(৩) মহাভারতকার সত্যবতীপুত্র হলেও যদি নিজে ব্রাহ্মণ হন, তা হলে তাঁর মাতাও তো উপরিচর বসুর কন্যারূপে ক্ষত্রিয় কন্যা উপরন্তু ক্ষত্রিয় বধূ। লেখিকা ভুলে গেছেন যে, সত্যবতী আর্য পিতার কন্যা ছিলেন। তাঁর মাতৃ পরিচয় অস্পষ্ট; কিন্তু তাঁর বর্ণসঙ্কর হবার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি অনার্য ছিলেন না।

(৪) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৃষ্ণ যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন, এমন অদ্ভুত কথা মহাভারতে নেই, ভূ-ভারতে কখনও শোনা যায় নি। কৃষ্ণ যদুবংশ রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হন।

(৫) মহাভারতকার সুযোগ পেলেই কৃষ্ণকে দেবতা ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণ যে কত বড় ব্রাহ্মণ সেবক ছিলেন, তা লেখিকা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ৪৯৫-৯৭ পৃষ্ঠা পড়লে জানতে পারবেন। কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ আনুগত্য অন্যত্রও বহুবর্ণিত।

(৬) কৃষ্ণ যুদ্ধে কোন সংযম দেখান নি। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রে স্বয়ং অস্ত্র নিয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর সুদর্শন চক্র কর্ণের অস্ত্রের তুলনায় দুর্বলতর ছিল, সে-কথা তিনি নিজ মুখে অর্জুনকে বলেছিলেন:—"এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই, যে কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে। আমি সুদর্শন চক্র উদ্যত করিয়াও উহাকে পরাজিত করিতে পারিতাম না।" লেখিকা সুদর্শন চক্রকে অনাবশ্যকভাবে বাড়িয়ে দেখেছেন। কৃষ্ণ বহুবার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাপত্র সত্ত্বেও সে-কথা পুরাণ প্রসিদ্ধ। অবশ্য কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ নিজে যুদ্ধ করেন নি। কিন্তু তার জন্যে ধ্বংস তো কিছু কম হয় নি। তিনি দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে তাদের সর্বনাশ সাধনে কুণ্ঠিত হন নি।

(৭) কৃষ্ণ সংহতি বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কারণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণামে ভারত দুর্বল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইন্দ্রপ্রস্থে বজ্রের সিংহাসন লাভ আর হস্তিনাপুরে পরীক্ষিতের রাজ্য লাভ ব্যাপারটির তাৎপর্য লেখিকা চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন। যুধিষ্ঠির নিজেও যে মহাপদ্মনন্দের মতো একরাট রাজা হতে পারেন নি, সে-কথা স্মরণীয়। লেখিকা গিরীন্দ্রশেখর বসু-র "পুরাণ-প্রবেশ" পড়লে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাবেন। এই ভুল ধারণার জন্যে নবীনচন্দ্র সেনের মতো কবিরা অনেকটা দায়ী। মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও দেখা যাবে, "বিজয়ের শেষে সে-মহাপ্রয়াণ" ইত্যাদি। অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ের পরও পুরো ছত্রিশ বছর কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির নিজের নিজের রাজ্য আলাদা আলাদা ভাবে ভোগ করেছেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ধারণাও প্রমাদপূর্ণ ও শোচনীয় অজ্ঞতার পরিচায়ক। পরে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

সুতরাং ভ্রান্তির জন্যে পত্রলেখিকার লজ্জিতা হবার কারণ নেই। ভারতবর্ষ ভেজালের দেশ; পৃথিবীর আর কোথাও খাদ্যে, ঔষধে, রাজনীতিতে এত বেশি ভেজাল দেখা যায় না। ধর্মবুদ্ধিতে ভেজাল না থাকলে এটা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণের প্রতি ভারতবাসীর যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্য তার ধর্মবুদ্ধির ত্রুটি নির্দেশ করে, এর বেশি বলা সম্ভব নয় ডক্টর অমূল্যভূষণ সেনের দুর্গতি স্মরণ ক'রে। সত্যমেব জয়তে। ইতি—

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সবিনয় নিবেদন,

অগ্রহায়ণ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত "বিশ্বভাষা পরিক্রমা"র একটি পরিচ্ছেদ পড়িলাম।

লেখক "ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার সূচনা খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর" পূর্ব্বে গিরীন্দ্র শেখরের এই মূল্যবান উক্তি উল্লেখ

করিয়াছেন—কিন্তু ইহাকে কাজে লাগাইতে পারেন নাই। আবর্জ্জনার স্তূপে মুক্তাটি হারাইয়া গিয়াছে।

ভারতের আদি ও আদিম সভ্যতার যে সব নিদর্শন মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পাতে পাওয়া গিয়াছে তাহা বিচার করিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে এই দুই স্থানীয় আদি সভ্যতা ভারতে আর্য্য সভ্যতা সূচনার পূর্ব্ববর্ত্তী—এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতের আর্য্য সভ্যতা উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক হইলে—আর্য্য সভ্যতার কোনও না কোন নিদর্শন উক্ত দুই স্থলে অবশ্য পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং আর্য্য জাতির ভারতে আবির্ভাবের যে হিসাব গিরীন্দ্রশেখর দাখিল করিয়াছেন তাহা মোটামুটি ঠিক।

লেখক বৈদিক সাহিত্যের প্রথম লিখিত রূপ এবং বেদ বিভাগের সময় খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর অনুমান করিয়াছেন। তাহাও যুক্তিসিদ্ধ। কেননা প্রায় ঐ একই সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় সুমেরীয় কিউনিফরম লিপি ও মিশরের হিরোটিকলিপিও চরম উন্নতি লাভ করে।

বৈদিক সূক্তগুলি মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল এবং বংশপরম্পরায় আবৃত্তিদ্বারা রক্ষিত হইত। ইহাতে মতভেদ হইতে পারে না। তবে ঐ সময় সুদীর্ঘ ৫০০০ বা ৬০০০ বৎসর হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ভাষা সৃষ্টি ও উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সময় ১০০০।১৫০০ বৎসর হওয়াই সম্ভব এবং এই হিসাব গিরীন্দ্রশেখরের ভারতে আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে মেলে।

মনে কিছু কিছু সংশয় থাকা সত্বেও এতক্ষণ শ্যামলবাবুর সঙ্গে পা মিলাইয়া চলিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম যে তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের লাটাইয়ের সুতা কোমরে জড়াইয়া কল্পনার জোর হাওয়ায় শূন্যে উড়িয়া চলিয়াছেন—৪০০০, ৬০০০ ৮০০০ (ফুটের হিসাবে নয়) শেষে ১০,০০০ বৎসরের অতীতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অতীতের গাঢ় অন্ধকারের ওপার হইতে গম্ভীর রবে শ্যামলবাবু বলিতে লাগিলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" —হে অমৃতের সন্তানগণ, আমি দশ সহস্র বৎসরের অতীত সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিছু কিছু অস্পষ্ট বটে, তবে শব্দতত্বের শব্দকোষটা বগলে আছে। —সুতরাং বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। তোমরা বিচলিত না হইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। দেখিতেছি দ্বাদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারত-ইউরোপীয় ভাষীরা হরদম দহরম-মহরম করিয়া চলিয়াছে। পরে দেখিতেছি গ্রীক্ জাতি ও অতলান্ত জাতি ঘোর যুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে। এদিকে মহাপ্লাবনের পর অর্থাৎ "এথন থেকে ১১ হাজার বৎসর পূর্ব্বে" দেখিলাম রাজমিস্ত্রীরা এথেন্স নগরীকে মেরামত করিতেছে। প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৩৫০) লিখিত সুসমাচারের বর্ণনার সঙ্গে সব হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। তবে বেচারা পণ্ডিত ছিলেন না বলিয়া একটু ভুল করিয়াছেন "মুকেনাই (মিনো?) বা ক্রীট দ্বীপের সভ্যতাকে ভুল করে আতলান্তিক সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছেন।"

এদিকে চারিদিকে মহাপ্লাবনের জল থই থই করিতেছে। মাত্র বলকাস ও আরাল হ্রদের মধ্যবর্ত্তী ও ক্ষুদ্র উচ্চ মালভূমি শুষ্ক। এই সুরম্য স্থান ফুলে ও ফলে সুশোভিত এবং আদিম আর্য্য মানব-মানবীগণ সুখে বিচরণ করিতেছেন। এই স্থানই ঋগ্বেদ বর্ণিত ভূস্বর্গ। সম্রাট ইন্দ্র বা সীজার এর অধিপতি এবং সকলেই ভয়ে ভয়ে দৌ বা দ্যুঃ বা দিউস্ বা Duceকে পূজা করিতেছেন। কেননা ব্ল্যাক্‌সার্টের দল ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতেছে।

জল কমিতে আরম্ভ করিল। একদল শ্বেতকায় বর্ব্বর আর্য্য ভূস্বর্গ হইতে অবোধ্য ভাষায় কিচিরমিচির করিতে করিতে পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়া এশিয়া মাইনর পার হইয়া ইউরোপে চলিয়া গেলেন। ইহারাই সম্ভবত দানব। খৃঃ পূঃ ২০০০ শতাব্দীতেও ইতিহাসে ইহারা বর্ব্বর নামে অভিহিত ও পরিচিত। আবার ইহাদেরই সগোত্র বা প্রতিবেশী রক্ত, পীত ও নীল বর্ণের আর্য্যগণ ঐ একই ভূস্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ঋগ্বেদের সূক্তগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতের সপ্তদ্বীপে কদম রাখিলেন। খৃঃ পূঃ ৯০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের আকাশ যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সামগানে অতীত মুখরিত হইয়া উঠিল।

"তাদের গায়ের রং নানা রকম ছিল বলে" তাহার

সহজেই চতুর্ব্বর্ণ সমাজ স্থাপন করিয়া ফেলিলেন—কিন্তু এই ভারতীয় আর্য্যদের যে বিশুদ্ধ শ্বেতকায় জাতিদল ইউরোপে গিয়াছিল তাহারা বিভিন্ন বর্ণের অভাব বশতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে অশক্ত হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের (খৃঃ পূঃ ১৪৩০) প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" বলিয়া যে দাবী করিয়াছেন তাহা ভুল। স্বকবর্ণ বিভাগশঃ বলিলেই ঠিক হয়। কেননা Boak, Stossen প্রভৃতি সাহেবদেরও এই মত।

আর্য্যগণ-ভারতে আসিয়া স্বাধীন হইবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—এবং ভূস্বর্গের সম্রাট ইন্দ্রের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তখন বেগতিকে পড়িয়া ভূস্বর্গের হোম গভর্নমেন্ট ভারতীয় আর্য্যদের ডোমিনিয়ান ষ্টাটাস দিয়া সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু উগ্রপন্থী আর্য্যদল ঐ সমঝোতা উপেক্ষা করিয়া পূর্ণস্বাধীনতার জন্য ঘোরতর আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। সপ্ত দ্বীপের সব যজ্ঞাগ্নিতে হোম্ হইতে আনীত লেংটি বস্ত্রগুলি ভস্মীভূত করা হইল। বহু সাধু সন্ত উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ঘরে ঘরে অনশন ব্রতের ধুম পড়িয়া গেল। সপ্তদ্বীপের রাভীর তীরে এক বস্তিতে ভারতীয় আর্য্যগণ সমবেত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিলেন। এবং খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে বেণের অধিনায়কত্বে ভূস্বর্গের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টা বিফল হইল। তোমরা ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে তোমাদের জাতীয় সরকার সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা ভুল। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের আদি হোতা বেণ (খৃঃ পূঃ ৫০০০) এবং শেষ হোতা এক বেণে (খৃঃ ১৯৪৭)।

আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। মনে হইল শ্যামলবাবু যেন লাটাইয়ের সুতাকে অবলম্বন করিয়া "ভূষণ্ডীর মাঠে" সরাক করিয়া নামিয়া আসিলেন। হাত হইতে বইটি পড়িয়া যাওয়ার শব্দে চোখ খুলিলাম। তাই ত, প্রবন্ধটি পড়িতে পড়িতে তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছে। স্বপ্ন কখনও সত্য নয়।

বিনীত—
শ্রীঅমিয়ময় বিশ্বাস
সাহারণপুর

"বেদের কৃষ্টিকাল"

(শ্রীযুক্ত অমিয়ময় বিশ্বাস মহাশয়ের পত্রের উত্তর)

অমিয়বাবু সমস্ত "বিশ্বভাষা-পরিক্রমা" না প'ড়ে তাঁর ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করায় গুরুতর ভ্রমে পতিত হয়েছেন। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার এই যে, যে-গিরীন্দ্রশেখর বাবুর উক্তি তিনি মূল্যবান্ মনে করেছেন এবং তাঁর হিসাব ঠিক ব'লে উল্লেখ করেছেন। সেই গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর "পুরাণপ্রবেশ" গ্রন্থে মূল আর্য সভ্যতা ১২০০০ বছরের মতো প্রাচীন ব'লেই উল্লেখ করেছেন। এ-ব্যাপারে স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বা হতভাগ্য শ্যামলবাবুর কোন অপরাধ নেই গিরীন্দ্রবাবুকে মান্য করা ছাড়া। বেণ ও পৃথুর নায়কত্বে বৈদিক আর্যরা মূল আর্য জাতির কর্তৃত্ব পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে যে-স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তার বিবরণও "পুরাণপ্রবেশ" (প্রকাশক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এ-ব্যাপারে অমিয়বাবু যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন, তার গতি বুমেরাং-এর মতো।

সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাইও স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেন না। সে-বিষয়ে ভারত সরকারের ঘোষণা যে ভুল, তা নিয়ে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যা লিখেছেন, তা তো পত্রলেখকের জানা উচিত ছিল। বেণ-পৃথুর প্রাচীন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে সে-বস্তাপচা অবান্তর প্রসঙ্গ আসে কি ক'রে! রসিকতার আতিশয্যে পত্রলেখক ভুলে গেছেন যে, নিতান্ত ঐতিহাসিক কালে ভারত বারবার বিদেশির দ্বারা অধীন হয়েছে; সুতরাং তার স্বাধীনতা সংগ্রামও বিভিন্ন পর্যায়ের হতে বাধ্য।

অমিয়বাবু রমেশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত ও সম্পাদিত The Ancient India ও The Vedic Age (প্রকাশক—ভারতীয় বিদ্যাভবন-বোম্বে) পড়লে অনাবশ্যক গোঁড়ামি ও ভ্রান্তধারণা থেকে মুক্ত হতে পারবেন। ইতি—

বিনীত—
শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ

সবিনয় নিবেদন,

গত কার্ত্তিক মাসের (১৩'৪) 'ভারতবর্ষে' অনৈক পত্র লেখক বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকট ব্রহ্মগায়ত্রীর ৫১৬ রকম মানে আছে। তন্মধ্যে রাম মোহন রায়ের মানেই তাঁহার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইটাই তিনি লিখে দিয়াছেন। কোনটী ভাল আর কোনটী নহে, সে প্রশ্ন ওঠে নাই। সহস্র সহস্র আারণিষ্ঠি মানবক এই মন্ত্র জপ করেন, মন্ত্রার্থ ভাবনা করেন, তাহারা সকলে একই অর্থে একই দেবতার চিন্তা করেন, না বিভিন্ন দেবতার ধ্যান করেন, এইটী হইল মানবকদিগের প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল মন্ত্রের বর্ণও একই না তাহাতে কোন পার্থক্য আছে? যদি পার্থক্য না থাকে, তবে পৃথক মানে কি করিয়া হইল? তাহার সহিত মন্ত্রবর্ণের সামঞ্জস্য রহিল, না অসমঞ্জস হইল? সুতরাং উক্ত পত্র লেখক মহাশয়, তাঁহার জানা সব কয়েকটী মানেই যদি দয়া করে লিখিয়া দেন, তবে আমরা বুঝিতে পারি কোথায় ও কি পার্থক্য, ও কিরূপ সে পার্থক্য হইল।

আর একটী বিষয়ে কিছু সন্দেহ হইতেছে—রায় মহাশয়েং মানেতে বলা হইয়াছে 'পরমাত্মা ও সূর্য্য দেবের ধ্যান করি।' রায় মহাশয় ছিলেন একেশ্বরবাদী, পরমাত্মা ও সূর্য্য দেব এই দুইটি দেবতার ধ্যান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আলোক পাত করিতে পারেন।

আর একটু কথা নিবেদন করিতেছি, সন্ধ্যার মন্ত্রের প্রথমেই আমরা আচমনের পরেই 'আপো মার্জনে'র মন্ত্র পড়ি, তাহার মানে লইয়া খুব গোল বাধে। এই আপো-দেবতা কে? আমাদের কোশার জল, না অন্য কোন দেবতা? আর তাঁহার নিকটে সে সকল প্রার্থনা করা হইতেছে, তাঁহার ঠিক ঠিক মানে কি? আপনাদের কোন লেখক বা পাঠক বা অন্য কোন অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যদি এ সন্দেহ নিরসন করেন, তবে আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞগণের উপকার হইবে। ইতি—

বিনীত—

শ্রীরাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়

টালিগঞ্জ বাঙুড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

১০ম শ্রেণীর ছাত্র

কলিকাতা-৩৩

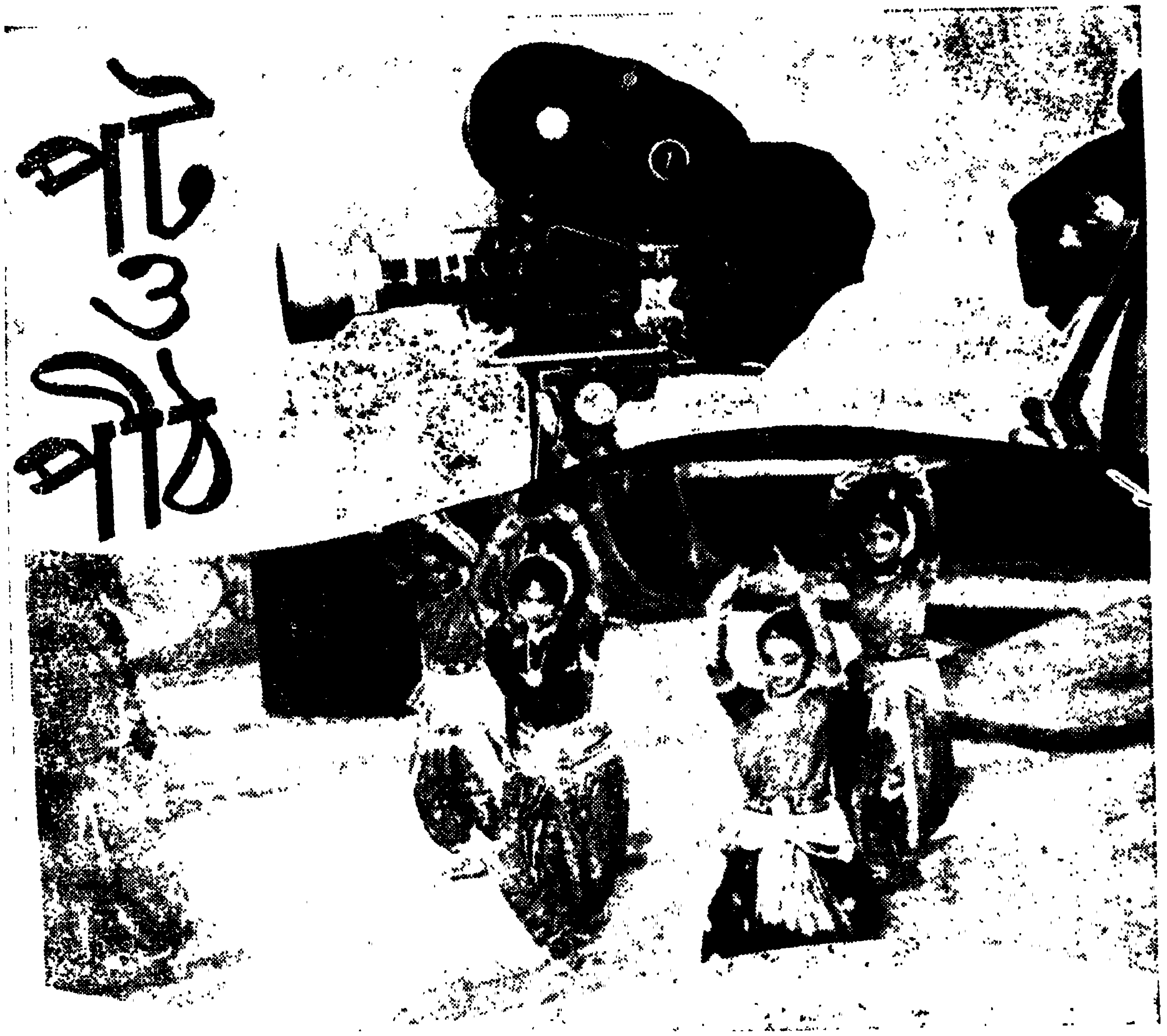

বাংলা ছবি দেখুন

শ্রী'শ'

ছবির পর ছবি—নিত্য নানা ধাঁচের, নানা ধরণের, নানা রকমের ছবির স্যুটিং হচ্ছে সারা ভারতের ষ্টুডিও-গুলিতে। মুক্তি পাচ্ছে সেই সব ছবি উৎসাহ-উদ্দীপনার মাঝে, প্রভূত আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কোনটি বক্স-অফিসের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করছে—আশাতিরিক্ত টিকিট বিক্রীর মাধ্যমে, কোনটি শুধুই সমালোচক ও চলচ্চিত্ররসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাই অর্জ্জন করছে, আবার কোনটি বিদেশী বাজারে পুরস্কার লাভ করে ভারতীয় চিত্রের গৌরববৃদ্ধি করছে। হিন্দী ছবির সম্বন্ধেই প্রথম উক্তিটি বিশেষ করে খাটে এবং শেষের উক্তি দু'টি বাংলা ছবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হিন্দী চিত্রের অজস্র সঙ্গীত অসংলগ্ন চিত্র-নাট্য, উদ্দাম হাস্য-লাস্য-নৃত্য ভারতের চিত্রামোদী দর্শকসংখ্যার এক বিরাট অংশকে, যাঁদের রুচি উচ্চস্তরের নয়, বিশেষ করে প্রভাবিত করে থাকে এবং এঁরাই বক্স-অফিসের মুনাফার অঙ্কটা বর্দ্ধিত করেন। কিন্তু বাংলা ছবির অনবদ্য গল্প রসোপযুক্ত চিত্র-নাট্য, অপূর্ব্ব অভিনয়, অপরূপ পরিচালনা প্রভৃতি হাজার গুণ থাকা সত্ত্বেও লাভের অঙ্কের দিক দিয়ে

ন্দী চিত্রের ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারে না! অথচ শ-বিদেশের চিত্র-রসিক দর্শকসমাজের ও সমালোচকের তুত প্রশংসা অর্জ্জনে সমর্থ হয়। এর কারণ হয়ত নেকেরই অজানা নয়। বাংলাভাষীর সংখ্যার ন্যায় ংলা চিত্রের দর্শক সংখ্যাও খুবই সীমিত—বাংলার বাইরে ংলা চিত্রের বাজার ও চাহিদাও তাই আশানুরূপ নয়। ন্তু অধুনা এ ছাড়াও আরও একটি কারণ ঘটছে যার ন্য মনে হয় বাংলা দেশেই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ত্র শতগুণে শ্রেষ্ঠ হয়েও নিকৃষ্ট হিন্দী চিত্রের কাছে মার য়ে যাবে। অধুনা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা য় যে কলিকাতায় ও সহরতলির কিছু কিছু চিত্র-প্রদর্শনী হ, যেখানে বরাবর বাংলা চিত্রই প্রদর্শিত হয়ে আসছে, ন্দী চিত্র প্রদর্শনের প্রতি প্রবণতা দেখাচ্ছেন, আর বাংলা ত্র হয়ত প্রেক্ষাগৃহের অভাবে দিনের পর দিন অপেক্ষা রে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাঙ্গালী দর্শকসমাজও, বিশেষ করে তরুণ-তরুণী সম্প্রদায়, আজকাল যেন হিন্দী চিত্রের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন। তাঁদের এই মনোবৃত্তির অবশ্যই প্রশংসা করা চলে না। আমরা তাঁদেরও প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যেন তাঁরা বাংলা চিত্রকেই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে চলেন এবং সকল দর্শক সম্প্রদায়কে বলব তাঁরা যেন বাংলা ছবিই সপরিবারে সানন্দে ও সাগ্রহে দর্শন করে ভারতের গৌরব এই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে সাহায্য করেন।

বাংলার বাইরে বাংলা চিত্র চলুক বা না চলুক বাংলার ভিতরে যেন আমরা বাংলা চিত্রকে তার স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি। কিন্তু স্বগৃহে যদি বাংলা চিত্র উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে তাহলে বাঙ্গালীর সে লজ্জা কোনও দিনই আর ঘুচবে না। তাই অনুরোধ জানাই বাংলার দর্শকদের তাঁরা বাংলা ছবি দেখুন এবং বেশী করে দেখুন।

* * *

দৃষ্টিপাত

দুপুর বেলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে ড়াল ছেলেটি। ভাল লাগেনা। বাড়ীতে শুধু নেই, নেই, ই! চাল নেই, ডাল নেই, তরকারী নেই, টাকা নেই! চ্ছুই নেই! একার আয়ে সংসারে কতগুলো গর্ত্ত ভরাট রতে পারে সে? আর এই বড় লোকগুলোও হয়েছে তমনি! খেয়ে মেখে ছড়িয়ে নষ্ট করবে তবু আমাদের কে একটু দেখবে না। ক্ষমতা থাকলে এই বড়লোক াতটাকে একেবারে শেষ করে দিতাম; অত্যন্ত জঘন্য য়ে গেছে এই পৃথিবীটা। কোন ভদ্রলোক এখানে বাস রতে পারে? ছ্যাঃ, ঘেন্না ধরে গেল!

ঝলমলে পোষাক পরা একটি মেয়ে আসছিল রাস্তা য়ে। ছেলেটির কাছাকাছি এসে একটু থমকে দাঁড়াল। না চেনা মনে হচ্ছে যেন! হ্যাঁ তাইতো, সেদিনের সেই দ্রলোকই। এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে কি না ভাবল য়েটি। যা মেজাজ ভদ্রলোকের; আরেকটু হলে সেদিন য়ত ঘা কয়েক দিয়েই দিতেন! আচ্ছা, ভদ্রলোক অত দমেজাজী কেন?

একটু কৌতূহলী হয়ে উঠল মেয়েটি। একটুখানি ভাবল, তারপরে আর কিছু ভাবল না। সোজা এগিয়ে গেল। দেখাই যাক না!

কলকাতা শহরের বাসট্রামগুলোও হয়েছে যেমন! ঠিক সময় মত একটা যদি আসে! নাঃ, ফিরেই যাওয়া যাক। এভাবে কাঁহাতক—

"কি ব্যাপার, আপনি এখানে?" পিছন থেকে নরম গলায় কে যেন বললে।

ঘুরে তাকাল ছেলেটি। মেয়েটিকে কোথায় যেন সে দেখেছে। ঠিক মনে করতে পারল না।

ততক্ষণে মেয়েটি আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে রইল ছেলেটির দিকে উত্তরের আশায়।

"বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তা আপনি এদিকে কোত্থেকে?" জিজ্ঞেস করল ছেলেটি।

"চাকরীর উমেদারীতে গিয়েছিলাম।"

একটু বিস্মিতভাবে ছেলেটি মেয়েটির সর্বাঙ্গে দৃষ্টি

বুলিয়ে নিল। "চাকরীর উমেদারীতে? এই পোষাকে?"

তামসী—সুমিতা সান্যাল

মেয়েটির মুখের ভাব ঠিক বোঝা গেল না। একটু অসহায়ভাবে বলল "আর বলেন কেন? যেখানে গিয়েছিলাম সেখানকার 'বস' নাকি কাপড়জামা সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে। ভয়ানক কড়া মেজাজের লোক শুনেছি।"

"তাই বুঝি? 'বস্' জাতটাই ওইরকম। কবে সে এই 'বস্'গুলোকে—"

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলল ঠিক বলেছেন। একটু চা খেলে মন্দ হতনা। চলুন না কোথাও গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক!"

হতভম্ব হয়ে ছেলেটি বলল "চা খাওয়া! কোথায়?"

মেয়েটি আরও একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বলল "কোথায় আবার, কাছাকাছি কোন একটা রেষ্টুরেণ্টে।"

চেনা অচেনা কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো রেষ্টুরেণ্টে বসে কখনও চা খেয়েছে বলে মনে পড়ল না ছেলেটির। তা মন্দ কি! এরকম একটা নরম মেয়ে পাশে থাকলে সময়টা বোধহয় মন্দ কাটবে না! সংসারের দৈনন্দিন যন্ত্রণার হাত থেকে বোধ হয় কিছুকালের জন্যে মুক্তি পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু—কিন্তু কি? সে তো আর মেয়েটিকে ডাকতে যায় নি মেয়েটি নিজেই এসেছে জীবনে রঙীন মূহুর্ত কটাই বা আসে?

"চলুন।"

মানস—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

দুজনে বাস ষ্ট্যাণ্ড ছেড়ে এগিয়ে গেল। পৃথিবীটাকে বোধহয় এখন আর ততটা জঘন্য বলে মনে হল না ছেলেটির।

* * *

ঐদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে চিনে বাদাম চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠছিল ছেলেটি। পাঁচটার সময়ে আসার কথা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল এখনও পাত্তা নেই। কিছু ভাল লাগছে না। কারই বা ভাল লাগে বিকেলবেলা পড়ন্ত আলোয় গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে খেতে একা একা দাঁড়িয়ে বাদাম চিবোতে?

হঠাৎ দেখা গেল দূর হতে একটি মেয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছে। সকালবেলার সেই মেয়েটিই। এবেলা অত্যন্ত সাধারণ জামা কাপড় পরা। নরম মেয়েদের বোধহয় এই রকম সাধারণ জামাকাপড়েই বেশী ভাল লাগে।

কাছে আসতেই ছেলেটি রাগে ফেটে পড়ল। "তোমার ব্যাপারটা কি তামসী? এর নাম পাঁচটা? কখন থেকে—"

তামসী বলল "কি করব বল? যার যেমন চাকরী।"

"চাকরী ? কি চাকরী কর তুমি ? নার্স না গভর্নেস না ষ্টেনো না টাইপিষ্ট ? কোন্‌টা তুমি ?"

বিকেলে গঙ্গার ধারে—তামসী ও মানস
(সুস্মিতা—সৌমিত্র)

অসহায়ভাবে মেয়েটি বলল "সেইট'ই তো আমি নিজেও জানিনা। কোনদিকে তাকাবার সময় আছে আমার ? বস্ যা কড়া লোক ! একটু এদিক ওদিক হলেই ··"

বেচারী মেয়েটি ! "বসের ভয়ে সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে আছে। রাত্রে ঘুমের ঘোরেও "বসের" ভয়ে আঁৎকে ওঠে কি না কে জানে ?"

* * *

পরদিন।

'এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস'। কাদের একটা সঙ্গীত সম্মেলন হচ্ছিল। চারদিকে সব নানা রঙ-বেরঙের নামী ও দামী গাড়ী ছড়ানো রয়েছে। লোকের আনাগোনা। রঙের ছড়াছড়ি। এরই মধ্যে একটি দামী গাড়ী এসে নিঃশব্দে গেটের মুখে থামল। দামী স্যুট পরা একজন প্রৌঢ় লোক নামলেন। গাড়ীতে আরও একজন ছিল তার কিন্তু নামবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাকে যেন সে খুঁজছে। প্রৌঢ় লোকটি তাকে নামতে না দেখে একটু যেন বিস্মিতই হলেন। একটু ভূরু কুঁচকে তিনি গাড়ীর ভিতরের দিকে চেয়ে ডাকলেন "কই এস।"

গাড়ী হতে নামল তামসী। ছেলেটি যদি তাকে এখন দেখতে পেত চিনতে পারত কিনা সন্দেহ ! বসনে, ভূষণে, চুল বাঁধার কায়দায়, সব দিক দিয়েই সে এখন একটি অতি আধুনিকা। এককথায় বলা যায় "হাই সোসাইটি লেডি।"

প্রবেশ পথের মুখে এসে দামী টিকিট দুখানা এগিয়ে দিলেন প্রৌঢ় লোকটি। তামসী কিন্তু সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক কি দেখছে। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে পাশে তামসীকে না দেখে আবার বিস্মিত হলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কড়া গলায় ডাকলেন তিনি তামসীকে "কি হোলো, এস।"

বসের আওয়াজ শোনামাত্র কেঁপে উঠল তাপসী। এখুনই বোধহয় চাকরীটা যাবে ! কোনরকমে একটা ঢোক গিলে বললে "গাড়ীতে রুমালটা ফেলে এসেছি। আসছি এখুনি।" বলেই আর অপেক্ষা না করে তরতর করে এগিয়ে গেল বাইরের দিকে।

চশমার পিছনে "বসে"র চোখদুটো একটু কঠিন হয়েছে বলে মনে হল। তামসীর এরকম খামখেয়ালীপনা পছন্দ করেন না তিনি। দেখাই যাক !

বেশ কিছুক্ষণ পরে।

সমস্ত হল্ নিস্তব্ধ। ষ্টেজের ওপর "ডায়াস-এ বসে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। পাশে বসে তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র কিরীট। সেও তার বাবাকে সাহায্য করছে সুরসৃষ্টিতে। বড় হয়ে সেও হয়ত একদিন তার বাবা এবং চাচা আলী আকবর খাঁ সাহেবের চাইতেও ভাল বাজাতে পারবে। হারিয়ে দেবে সবাইকে।

খাঁ সাহেবের ইন্দ্রজালে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। শুধু একজন বাদে। সুরের মূর্ছনা তামসীর মনের মধ্যে কোন আলোড়নই আনতে পারেনি। তার মনের মধ্যে চলছে ঝড়ের তাণ্ডব। মুখ ঘুরিয়ে পাশের খালি সিট দুটোর দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কি ভাবছে সে ! চোখদুটো তার হীরের মত চকমক করছে।

'একাডেমী অফ ফাইন্ আর্টস'-এ ত্রিদিব সেন ও তামসী (বিকাশ রায় ও সুমিতা সান্যাল)।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও পুত্র কিরীট ষ্টেজের ওপর বাজাচ্ছেন।

অসহ্য, এভাবে জীবন চলতে পারেনা। সব সময়ে "বসে"র খবরদারী তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নিজের কি কোন স্বাধীন সত্বা তার নেই? সব সময়ে তাকে "বসে"র ইচ্ছেমত চলতে হবে? কেন? কি জন্যে? চাকরী করছে বলে সে কি নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে?

মানসকে সে কথা দিয়েছিলো—ছিঃ, ছিঃ, এতক্ষণে মানস তাকে কি ভাবছে কে জানে? সব ঠিক ছিল হঠাৎ শেষমুহূর্ত্তে "বসে"র হুকুম এল তার সঙ্গে মিউজিক কনফারেন্সে আসতে হবে। এ হুকুমের কোন নড়চড় নেই, তা তুমি মর আর বাঁচ।

কি করা যায়! মানসের কাছে তাকে যে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু? এই বাজারে চাকরীটা যদি যায়? যায় যাক, উপায় কি? না, আর সে কিছু ভাববে না। যা হবার হোক, মানসের কাছে সে যাবেই। দেখি কার ক্ষমতা আছে তাকে আটকায়?

মনঃস্থির করে উঠে দাঁড়াল তামসী। কোনদিকে আর তাকাল না। রানীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে হল্ ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

তামসীর যাওয়ার পথের দিকে কটমট করে ভুরু কুঁচকে

তাকিয়ে রইলেন "বস্"। রাগে তাঁর শক্ত চোয়াল দুটো আরও শক্ত হয়ে উঠল। তামসীকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন কিন্তু ইদানীং তার খামখেয়ালীপনা যেন দিনদিন বেড়ে উঠেছে। বেয়াদবী জিনিষটাকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। তা সে যেই হোক! কালই এর ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিদিব সেনের কাছে ক্ষমা বলে কোন জিনিষ নেই।

মনঃস্থির করতে বেশী সময় লাগে না "বস"-এর। পরমুহূর্তেই তাঁর পাশের সিটের বিদেশী অতিথিদের দিকে ঘুরে বসলেন তিনি। "ইয়েস মিঃ স্মিথ……"

বেশ বোঝা গেল আগামীকালই তামসীর চাকরীর শেষ দিন। কেউ আটকাতে পারবে না এবারে। বেচারী!

* * *

আপনারা হয়ত ভাবছেন ব্যাপারখানা কি? এও কি সম্ভব? দুপুরবেলা তামসী মানসকে টেনে নিয়ে গেল চা খাওয়াতে, বিকেলে গঙ্গার ধারে দেখা গেল দুজনে আপনি থেকে তুমি হয়ে গেছে। তার পরদিন আবার ঐ রকম একটা কাণ্ড! প্রেমের জন্যে এই বাজারে কেউ চাকরী ছেড়ে দেয় নাকি? মেয়েটা আচ্ছা বোকা তো?

পরিচালক—হীরেন নাগ

আজ্ঞে হ্যাঁ, বায়োস্কোপের দুনিয়াতে সবই সম্ভব। এত তাড়াতাড়ি এখানে সব কিছু ঘটে যে জেট প্লেনও হার মানবে।

উপরোক্ত দৃশ্যের কাজগুলি ঠিক দুদিনের ভিতরে শেষ করলেন "চেনা-অচেনা" ছবির পরিচালক হীরেন নাগ।

পরিচালক হীরেন নাগ। আগামী দিনের একজন বলিষ্ঠ পরিচালক। বিরাট একটা সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর মধ্যে। রকেটের স্পীডে কাজ করেন। অবশ্য স্পীডে কাজ করতেই তিনি ভালবাসেন। নিজেও বসেন না টেকনিসিয়ানদেরও বসতে দেন না। অভিযোগ করলে খুব গম্ভীরভাবে তিনি বলেন "আমি একজন হার্টলেস ডিরেকটার এইটা মনে রাখতে হবে।" বুঝুন কাণ্ড! আচ্ছা আপনারাই বলুন একজন হার্টলেস লোকের হাত দিয়ে কখনও "শুন বরনারী", "বর্ণালী", "প্রভাতের রঙ", এইসব ছবির মত চিত্রনাট্য বেরুতে পারে? না তৈরী হতে পারে "কবি চন্দ্রাবতী", "থানা থেকে আসছি", "জীবন মৃত্যু"-র মত ছবি? অবশ্য হীরেনবাবুর মনে কোথায় যেন একটা অন্তর্জ্বালা এসে দানা বেঁধেছে। হয়ত তাঁর যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। "কবি চন্দ্রাবতী" তৈরী হয়েছিল বোধহয় ১৯৫২ অথবা ৫৩ সালে। এ ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেনি। কিন্তু হীরেনবাবু সেজন্যে ভেঙে পড়েননি। কারুর ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নিজের ভুল কোথায় সেইটাই তিনি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শুরু করলেন নতুন করে আবার শিক্ষনবীশী। সুদীর্ঘ কাল পরে আবার ছবি করলেন "থানা থেকে আসছি।" "কবি চন্দ্রাবতী" আমি দেখিনি কিন্তু "থানা থেকে আসছি" আমি দেখেছি। সত্যই ভাল ছবি এটি। কিন্তু এ ছবিও সেরকম ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করল না। এবারে হীরেনবাবু একটু চিন্তিত হলেন। যত ভাল ছবিই করুন না কেন তিনি ব্যবসায়ের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ না হতে পারলে তার পরমায়ু এখানেই শেষ। বর্তমান যুগটা হচ্ছে "ষ্টারের" যুগ। বহুৎ আচ্ছা, এবারে তিনি আর ভুল করবেন না। বুদ্ধিমান লেখক তার কলমের দুদিক দিয়েই লেখবার ক্ষমতা রাখে। মনের দুঃখ মনে চেপে আবার নতুন ছবিতে হাত দিলেন তিনি। তৈরী হল "জীবন

মৃত্যু"। দেখা গেল এবারে হিসেব মিলে গেছে। কলমের উল্টো দিক দিয়ে ষাঁড়ের চোখ বিঁধেছেন তিনি।

আমার নিজেরও মনে হয় সত্যিকারের ভাল ছবি করা আর বো'ধহয় সম্ভব হবে না আমাদের দেশে। ইদানীং কালে "পান্না" ও "কেদার রাজা" তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। অথচ দেখুন "স্পাই ইন রোম", "এ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস" কিরকম রমরমিয়ে চলছে। বাঙলা দেশে এসব ছবি বেশী দেখে কারা? আমরাই। আমাদের রুচি অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়ে গেছে দিনের পর দিন। হিন্দী ছবিওয়ালাদের দোষ দিয়ে কি লাভ, আমাদের মনটাই বিকৃত হয়ে গেছে, অতএব সেই বিকৃতির খোরাক যে জোগাতে পারবে ব্যবসায়িক সাফল্য সেই লাভ করবে।

ত্রিদিব সেন—বিকাশ রায়

"চেনা অচেনা" অবশ্য 'ষ্টান্ট' ছবি নয়। একটি মিষ্টি প্রেমের ছবি। প্রায় শেষ হতে চলল। আগামী মে অথবা জুন মাস নাগাদ নারানবাবুর তত্ত্বাবধানে চণ্ডীমাতার পরিবেশনায় হয়ত আপনারা দেখতে পাবেন। নরম মেয়ে তামসী হচ্ছেন সুমিতা সান্যাল, সংসারের যন্ত্রণায় অস্থির নায়ক মানস হচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কড়ামেজাজের "বস" ত্রিদিব সেন হচ্ছেন বিকাশ রায়। রয়েছেন অজয় গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, জহর রায়, বিশ্বা রাও, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন পরিচালক স্বয়ং।

প্রযোজিকা শ্রীমতী দুলালী চৌধুরী কোনদিকে ফাঁক রাখেননি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন এমন একজনকে যাঁর সুরে এবং গলাতে গান শুনতে আপনারা ভালবাসেন। বলুন তো কে? আচ্ছা আমিই বলে দিচ্ছি। তিনি হচ্ছেন শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব আছে এমন একজন লোকের ওপরে যাঁকে সাহারা মরুভূমিতে ছেড়ে দিলেও অনায়াসেই তিনি ক্লাস ফোটো-গ্রাফী করে বেরিয়ে আসবেন। তাঁর নাম বিশু চক্রবর্ত্তী। অতীতে অনেক ভাল ভাল ছবিতে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, নতুন করে আবার তাঁর কাজের পরিচয় পাবেন "চেনা অচেনা" ও শ্রীঅজয় কর পরিচালিত আগামী ছবি "পরিণীতা"তে। রোগা রুক্ষ চেহারার বিশুবাবুকে হঠাৎ দেখলে আপনার মনে হতে পারে তিনি একজন অতি বদমেজাজী লোক। কিন্তু আসলে মোটেই তিনি তা নন। ফোটোগ্রাফী জিনিসটা তাঁর পেশা বটে কিন্তু তার চাইতেও বড় হচ্ছে যে এটি হচ্ছে তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। অসম্ভব রকমের ভালবাসেন তিনি তাঁর নিজের কাজটিকে। এক্ষেত্রে কোনরকম আপস তাঁর নেই। এ জিনিষটি বোধহয় উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে। যোগ্য গুরুর যোগ্য ছাত্র। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি হীরেনবাবু ও বিশুবাবু একই গুরুর দুই ছাত্র। তাঁকেও আপনারা সবাই চেনেন। শ্রীঅজয় করের পরিচয় সর্বজনবিদিত।

দিনকয়েক আগে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওর মোরে গিয়ে দেখি শিল্প নির্দেশক শ্রীকার্ত্তিক বসু চমৎকার একটি সেট লাগিয়েছেন। কড়া মেজাজী "বসে"র ড্রয়িং রুম। সেটটি এত চমৎকার হয়েছিল যে আমারই ইচ্ছে হচ্ছিল একটা সোফায় শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে। কোন-দিকে কোন ফাঁক নেই। কি বলব মশাই এরকম একটা ড্রয়িংরুম যদি আমার থাকত!

অদূরে বিশুবাবু অত্যস্ত বিরসবদনে দাঁড়িয়ে একটা আলোর তদারকী করছিলেন। শুনলাম একটু আগেই হীরেনবাবুর সঙ্গে তাঁর একপশলা ঝগড়া হয়ে গেছে। গতিক সুবিধের নয় ভেবে সরে পড়ব কি না ভাবছি এমন সময় প্রধান সহকারী পরিচালক শ্রীস্বদেশ সরকার বললেন "চিন্তার কিছু নেই, এটা হচ্ছে এদের দুজনের দৈনন্দিন ব্যাপার। ঝগড়া করতে না পারলে এদের

পরিণীতা—

বাঁদিক থেকে :—পরিচালক—অজয় কর। নায়িকা ললিতা—মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। বিকাশ রায় ও অসিত চৌধুরী।

দুজনের কারুরই কাজের মেজাজ আসে না। বিশ্বাস না হয় এদিকে তাকিয়ে দেখুন।"

ঘুরে তাকিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। এক কাপ চা এসেছিল কার জন্যে কে জানে! হীরেনবাবু কাপটা তুলে অর্দ্ধেকটা নিজের জন্যে প্লেটে ঢেলে নিয়ে কাপটা এগিয়ে দিলেন বিশুবাবুর দিকে। বিশুবাবু কাপটা নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে পকেট হতে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করলেন। কোন কথা না বলে হীরেনবাবু একটা সিগারেট টেনে নিলেন প্যাকেট হতে। বিশুবাবুর সিগারেট থেকেই নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নিলেন। অতঃপর সিগারেট সহযোগে দুজনের কাপে ও প্লেটে চা খাওয়া নির্বিবাদেই চলতে লাগল।

গল্প করছিলেন নায়িকা সুমিতা সান্যাল সহকারী সম্পাদক শেখরবাবুর সঙ্গে। ঠাট্টা করে শেখরবাবুকে বললাম "এডিটিং ডিপার্টমেণ্টটা হচ্ছে মহা ফাঁকীবাজ ডিপার্টমেণ্ট। কাজের মধ্যে হচ্ছে তো কেবল কাঁচি দিয়ে কাটা ও সিমেণ্ট দিয়ে জোড়া।" শেখরবাবু কিছু বলবার আগেই সরোষে প্রতিবাদ করলেন সুমিতা দেবী। "কেন? এডিটিং ডিপার্টমেণ্ট ফাঁকিবাজ কেন হতে যাবে? ও'দের কাজের দায়িত্ব কারুর চাইতে কিছু কম নাকি? না জেনেশুনে ওরকম আজেবাজে কথা বলবেন না।"

এডিটিং ডিপার্টমেণ্টের ওপর সুমিতা দেবীর একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। দুর্বলতাটা অবশ্য হৃদয়-ঘটিত। প্রখ্যাত চিত্র-সম্পাদক ও প্রযোজক শ্রীসুবোধ রায় হচ্ছেন সুমিতা দেবীর স্বামী। সুবোধবাবুর কাজের পরিচয় আপনারা অনেকবারই পেয়েছেন। তপন সিংহ পরিচালিত প্রায় সব ছবিতেই তাঁর কাজের স্বাক্ষর রয়েছে। এছাড়াও "ছুটি" ছবিতে কাজের জন্যে "বি-এফ-জে"-এর ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। এক্ষেত্রে এডিটিং ডিপার্টমেণ্টকে ফাঁকিবাজ বললে সুমিতা দেবীর রুষ্ট হওয়ারই কথা। পতির ডিপার্টমেণ্টের নিন্দা কোন্ মেয়ে সহ্য করতে পারেন আপনারাই বলুন?

"চেনা অচেনা" ছবির সম্পাদক অবশ্য সুবোধবাবু নন। এ ছবির সম্পাদক হচ্ছেন শ্রীগোবর্ধন অধিকারী। ভাবছিলাম গোবর্ধনবাবুর সঙ্গে দেখা হলে—

"ব্যাপারটা কি? ক্যামেরাটা কখন ক্রেনে বসাতে বলেছিলাম এখনও হল না? রেজা গেল কোথায়?" চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল বিশুবাবুর কণ্ঠস্বরে। রেজাসাহেব হচ্ছেন বিশুবাবুর একেবারে ডান হাত। সত্যিই তো, তাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? সহকারী পরিচালক দিলীপ মিত্র বিশুবাবুকে বললেন "রেজাবাবু ল্যাবরেটরীতে গেছেন। কালকের কাজের টেষ্ট আনতে।"

আরেকজন সহকারী চিত্রশিল্পী নির্মলবাবু ক্যামেরা রিপোর্ট পরীক্ষা করছিলেন। গতিক সুবিধের নয় দেখে "আসছি" বলে তিনি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সেট থেকে একদম হাওয়া হয়ে গেলেন। ভয়ানক রকমের

চটে গেলেন এবারে বিশুবাবু। সাংঘাতিক রকমের একটা কাণ্ড ঘটবে বোধ হয় এবারে, অতএব আমারও এখানে থাকা আর উচিত নয় ভেবে বে'রিয়ে এলাম।

গোলঘরে গিয়ে বসলাম। অনেকদিন পরে নির্মলকুমারের সঙ্গে দেখা। "আজকে কোন স্যুটিং আছে নাকি?" জিজ্ঞেস করলাম। "একটা মেক-আপ টেষ্ট আছে।" বললেন নির্মলকুমার।

"মেক-আপ টেষ্ট! কোন্ ছবির জন্যে?"

"কমললতা।" গহরের রোলটা করছি। অনেকদিন পরে একটা মনের মত চরিত্র পেয়েছি।" বেশ খুশীমনেই ছিলেন নির্মলকুমার। অবশ্য খুসী হবারই কথা। মনের মত চরিত্র অভিনয় করতে পেলে কোন শিল্পী না খুশী হয়?

"অন্য চরিত্রগুলিতে কে কে আছেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কমললতা হচ্ছেন সুচিত্রা সেন, শ্রীকান্ত হচ্ছেন উত্তমকুমার আর গহরের রোলটা যে এই অধম করছে তা আগেই বলেছি। অন্য চরিত্রগুলিতে কারা আসছেন এখনও বলতে পারব না।"

"পরিচালক কে?"

"পরিচালনা করছেন হরিসাধন দাসগুপ্ত। প্রযোজনা করছেন শ্রীঅসিত চৌধুরী।"

"কবে হতে কাজ শুরু হবে?"

"মার্চের চার তারিখ হতে। অবশ্য প্রথমদিকে উত্তম ও আমার কাজ পড়েছে। মিসেস সেনের কাজ শুরু হতে একটু দেরী হবে বোধ হয়।" সিগারেট ধরালেন নির্মলকুমার।

আরও একজন অতিথি এলেন গোলঘরে। পরিচালক তরুণ মজুমদার। নমস্কার বিনিময় করে জিজ্ঞেস করলাম "কেমন আছেন?"

তরুণবাবু স্বভাবসিদ্ধ উদাস কণ্ঠে জবাব দিলেন "ভালই।"

"ছবি কতদুর এগোল?"

"হুঁ, তা অনেকদুর এগিয়েছে বলা যায়।"

আবার কবে স্যুটিং করছেন।

"দাঁড়ান, দম ফেলতে দিন! এই তো কয়েকদিন হল বিশ্বজিৎ একটানা স্যুটিং করে গেল। তাড়াতাড়ি করে শেষ করতে হোল।" স্বল্পবাক তরুণবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন অদূরে হেমন্তবাবুকে আসতে দেখে। বোধহয় তাঁদের আগামী ছবি, "রাহগীর" ব্যাপারে কোন আলোচনার জন্যেই। "রাহগীর" হচ্ছে "পলাতকের" হিন্দী সংস্করণ। বিশ্বজিৎ ছাড়া আরও যাঁরা রয়েছেন তারা হচ্ছেন বম্বের শশীকলা, সবিতা চ্যাটার্জি, পদ্মা, কানহাইয়ালাল ও বাংলার সন্ধ্যা রায়। সুর দিচ্ছেন হেমন্তবাবু। এ ছবির যুগ্ম-প্রযোজক হচ্ছেন হেমন্তবাবু ও তরুণ মজুমদার।

হপ্তাখানেক পরে সকালের দিকে অফিসে বসে কাজ করছি এমন সময় টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। এমন অসময়ে ফোন করে কে? বেশ একটু বিরক্তই হলাম। হাতে এক গাদা কাজ জমে রয়েছে। সম্পাদক মশাই এদিকে তাড়া দিয়ে দিয়ে স্নান, খাওয়া শিকেয় তুলে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর কোন দোষ নেই। কুঁড়ে বলে আমার বেশ একটু সুনাম আছে বাজারে।

ফোনটা তুলে ধরতেই হল। অপর প্রান্ত হতে ভেসে এল সহকারী পরিচালক স্বদেশ সরকারের কণ্ঠস্বর। "চলে আসুন এখুনি।" "কোথায়?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। "নিউ থিয়েটার্স, দেরী করবেন না।" "কিন্তু"—আপত্তি করবারও সময় দিলেন না স্বদেশবাবু নিজের কথাটি বলেই ফোনটি রেখে দিয়েছেন।

কিন্তু, এই বেলা সাড়ে নটার সময়ে বাসে ট্রামে ওঠে কার বাবার সাধ্য! যাই হোক কোন রকমে "ট্রাপিজ" করতে করতে গিয়ে পৌছালামনিউ থিয়েটার্সে। স্বদেশবাবু গোলঘরে বসে গম্ভীরভাবে ফাইল ওল্টাচ্ছিলেন। "কি ব্যাপার, হঠাৎ এত জরুরী তলব?"

স্বদেশবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন যাই।" ব্যাপারখানা কি? স্বদেশবাবুর কি শেষে মাথার গোলমাল দেখা দিল নাকি? "কোথায় যাব?"

"নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না; শুনুন, ঠিক দু বছর এগার মাস পরে আবার নতুন ছবিতে হাত দিয়েছেন করবাবু। আজ থেকেই স্যুটিং আরম্ভ! এবারে আপনিই বলুন এটা খুশী হবার মত খবর কি না? আমরা তো ভাবতে শুরু করেছিলাম করবাবু বোধহয়

ছবি করা ছেড়েই দিলেন।" হাল্কা মেজাজে বললেন স্বদেশবাবু।

খুসী হবার মত খবর নিশ্চয়ই সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। শ্রীঅজয় করের হাত দিয়ে আজঅব্দি যতগুলি ছবি বেরিয়েছে সবগুলিই পরিচ্ছন্ন মেজাজী ছবি। রুচির ছাপা পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে। শ্রীমতী সুচিত্রা সেনও একদিন অজয়বাবুর "সাত পাকে বাঁধা" ছবিতেই অভিনয় করে বিশ্ববন্দিতা হয়েছিলেন এ কথাও আমাদের মনে আছে। অবশ্য শ্রীমতী সুচিত্রা সেনও একজন উঁচুদরের অভিনেত্রী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই কিন্তু পরিচালকই হলেন ছবির আসল প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। অজয়বাবুর মত একজন পরিচালক কেন যে এতদিন নীরব ছিলেন এটাও একটা রহস্য। হয়ত অনেক কিছুই কারণ থাকতে পারে।

স্বদেশবাবুর সঙ্গে গেলাম পরিণীতার সেটে। বিরাট ক্রেনের ওপর একদম উঁচুতে ক্যামেরাতে চোখ লাগিয়ে প্রথম শটটি কম্পোজ করছিলেন শ্রীঅজয় কর। তাঁর বাঁ দিকে বসে রেজাসাহেব সাহায্য করছিলেন তাঁকে। নিচে সেটে ক্যামেরাম্যান বিশুবাবু আলো করতে ব্যস্ত ছিলেন।

সব ঠিক করে নিয়ে ওপর হতে অজয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন "বিশু, আর ইউ রেডি?" "ইয়েস আই এ্যাম রেডি," নিচে হতে বললেন বিশুবাবু। বলেই পাশে দাঁড়ান ঢোলা প্যাণ্ট পরা সহকারী নির্মলবাবুকে চুপিচুপি বললেন" "চট করে জানলার বাইরে একটা পাঁচশ বসাও।" নির্মলবাবু ছুটে চলে গেলেন।

"বিকাশবাবু আপনি রেডি?"

"দাড়ান মশাই, বিশুর হোক আগে।" স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকভরা কণ্ঠে বললেন শ্রীবিকাশ রায়। বিশুবাবু চট করে বললেন "আমি তো রেডি!" বলেই আবার নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন "কি হোল?"

ওপর হতে অজয়বাবু সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। বিশুবাবুর কাণ্ড দেখে একটু হাসলেন তিনি। ক্যামেরা-ডিপার্টমেণ্টের এ ধরণের লুকোচুরি খেলাতে তিনি অভ্যস্ত। ক্যামেরাম্যানদের সব সময়ে তিনি যে একটু বেশী সুযোগ দেন এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে সবাই করে থাকেন।

ইতিমধ্যে সহপ্রযোজক শ্রীবিমল দে "ছায়াবাণীর" প্রধান কর্ণধার ও বহু সার্থক চিত্রের প্রযোজক শ্রীঅসিত চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেটে। সঙ্গে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। আজ্ঞে হাঁ, সেই ছোট্ট বালিকা বধূটি। এ ছবিতে অবশ্য ললিতা। কিন্তু শেখর কোথায়? স্বদেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর এল সৌমিত্রবাবু মেক আপ রুমে ব্যস্ত আছেন।

গুরুচরণের বাইরের ঘরে তক্তপোসের ওপর বসে গল্প করছিলেন বিকাশবাবু ও অসিতবাবু। ক্রেনের ওপর হতে অজয়বাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল "লাইটস্।" এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সেটটি আলোকিত হয়ে উঠল।

উঠে দাঁড়ালেন বিকাশবাবু ও অসিতবাবু। অসিত-বাবুর হাতে ক্ল্যাপষ্টিক এগিয়ে দিলেন বিকাশবাবু। অজয়বাবু ওপর হতে বললেন, "বিশু, এ শটটা আমি নিচ্ছি!"

"নিয়ে নিন।" পাশের একটা আলোতে টিশু কাগজ মুড়তে মুড়তে বললেন বিশুবাবু।

"ষ্টার্ট সাউণ্ড," চেঁচিয়ে বললেন প্রধান সহকারী পরিচালক শ্রীনরেশ রায়। সমস্ত সেট একেবারে নিস্তব্ধ। ক্ল্যাপষ্টিক দিয়ে একপাশে সরে গেলেন অসিতবাবু। "এ্যাকশন," ওপর হতে বললেন অজয়বাবু। ঘরের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি অস্থিরভাবে পায়চারী করতে শুরু করলেন বিকাশবাবু। এক সময়ে তক্তাপোসের কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। চোখে ঈষৎ আতঙ্কের আভাষ। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

ইতিমধ্যে ওপর হতে ক্রেন শুদ্ধ ক্যামেরাটা ধীরে ধীরে নেমে এসে গুরুচরণের মুখের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। ধরে রাখছিল গুরুচরণের মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলবার পর অজয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন "কাট্।"

আলোগুলো একে একে নিভে যেতে শুরু করল। শটটি নিখুঁত ভাবে গ্রহণ করে ক্রেন হতে নেমে এলেন শ্রীঅজয় কর। নামবা মাত্র তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন অসিতবাবু। দুই পুরোনো বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

একটা কোকাকোলা শেষ করে একটু পরেই চলে গেলেন অসিতবাবু। অভয়বাবুর অনুরোধেও আর বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। তাঁর নিজস্ব ছবি "কমললতা" নিয়ে বর্তমানে ভয়ানক ব্যস্ত রয়েছেন। "কমললতা" হচ্ছে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর চতুর্থ পর্বের একটি বিশেষ অংশ।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী মৌসুমী সহকারী পরিচালক নরেশ-বাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে আজ তিনি কিছুই খাবেন না। নরেশবাবু কারণ জিজ্ঞেস করাতে উত্তর হোল "বাঃ, আজ শিবরাত্রি না! উপোষ করতে হবে যে?"

"তাই তো! খেয়াল ছিল না।" একটুখানি মাথা চুলকোলেন নরেশবাবু। "আজ ভাল করে উপোষ করলে তবেই না শিবের মত বর হবে?"

"শিবের মত বর আমার চাই না, নন্দী ভৃঙ্গি হলেই চলবে।" বেমালুম ঠোঁট উল্টে উত্তর দিলেন শ্রীমতী মৌসুমী।

বুঝুন ব্যাপারখানা! একালের মেয়েরা শিব রাত্রির উপোষ করে শিবের মত বর পাবার জন্যে নয়—নন্দী ভৃঙ্গির জন্যে!

—শ্রীকান্ত

"পট ও পীঠ" বিভাগের পাঠক-পাঠিকাদের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কিছু জানবার থাকে তাহলে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে লিখে পাঠালে তার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া হবে।

পত্রের উপর "পট ও পীঠ" বিভাগ লিখে পাঠাবেন—

—সম্পাদক

খবর বলছি:　　✱　　✱

রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষায়তন "গীতবীথি" সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, শ্রীমতী ঋতু গুহ ও শ্রীবিশ্বজিৎ রায় তাঁদের সুকণ্ঠে গীত রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরের অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেন। সঙ্গত করেন শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই শিক্ষায়তন-এর সভাপতি হচ্ছেন শান্তি নিকেতনের অর্থসচিব শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শ্রীপূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। শিক্ষায়তন-সচিবের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীঅমর লাহিড়ী ও কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদকের ভার নিয়েছেন সুযোগ্য কর্মী শ্রীশঙ্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতি মাসেই এই শিক্ষায়তন রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন বলে জানিয়েছেন।

✱　　✱　　✱　　✱

হাওড়ার নৃত্যশিক্ষা শিক্ষায়তন "নৃত্যম্" ২৩,২৪,২৫ ও ২৬শে মার্চ তাঁদের "যুগ উৎসব অনুষ্ঠান" সাড়ম্বরে পালন করছেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে চার দিনব্যাপী নৃত্য, নৃত্য-নাট্য, সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতির এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

✱　　✱　　✱　　✱

বিশ্ব-বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা "ওয়ার্ণার ব্রাদার্স—সেভেন আর্টস্"-এর একজিকিউটিভ্ ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ নর্মান, বি, কাট্জ কলিকাতায় আসছেন। তিনি এ অঞ্চলের চিত্র-প্রদর্শন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান এবং তাঁদের সংস্থার বিশিষ্ট চিত্র "দি ফ্যামিলি ওয়ে" সহ যে সব চিত্র এই অঞ্চলে দেখান হবে সে সম্পর্কেও একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করবার ইচ্ছা তাঁর আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বহু আলোচিত চিত্র "দি ফ্যামিলি ওয়ে" আগামী ২১শে মার্চ কলিকাতায় মুক্তি লাভ করছে।

✱　　✱　　✱　　✱

বিশ্ববিশ্রুত চলচ্চিত্রাভিনেতা চার্লি চ্যাপ্লিনের পুত্র চার্লস চ্যাপ্লিন্ (জুনিয়র)-কে হলিউডে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর এই রহস্যজনক মৃত্যুর এখনও কোনও সমাধান হয় নি।

বিশ্ববন্দিত ইতালীয় চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সোফিয়া লোরেনকে রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে অনেকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী সোফিয়া সে সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে শিল্পীজনোচিত মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন।

* * * *

দক্ষিণ ভারতে হিন্দী ভাষা বিরোধ আন্দোলনের রোষ হিন্দী চলচ্চিত্রের উপরও পড়েছে। তাই মাদ্রাজ রাজ্যে হিন্দী চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

এদিকে মহারাষ্ট্রেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং সেখানেও মাদ্রাজে তৈরী হিন্দী এবং তামিল প্রভৃতি চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভাষার দ্বন্দ্বের প্রধান শিকার হয়ে পড়েছে এখন চলচ্চিত্র। দুই পক্ষের এই যুদ্ধে চলচ্চিত্র শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে।

* * * *

এদিকে বাংলা দেশে চলেছে সিনেমা কর্মচারী ধর্মঘট। যার ফলে বাংলা দেশের, কয়েকটি ছাড়া, সমস্ত সিনেমা গৃহ বন্ধ রয়েছে। সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে,—মালিকদের এবং কর্মচারীদের ক্ষতিও সামান্য নয়। আর বাংলা দেশের হাজার হাজার ফিল্ম-ক্যান্ যেন বেকার হয়ে পড়েছে! আশা করি দুই পক্ষই উদ্যোগী হয়ে এই বিরোধ মিটিয়ে নিয়ে কলিকাতা-সহ বাংলার সান্ধ্য জীবনকে আবার আলোঝলমল করে তুলবেন।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাল্গুন–১৩৭৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

নির্ব্বাণ

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

নত্থি রাগ সমো অগিগ, নত্থি দোস সমো কলি,
নত্থি খন্ধাদিসা দুকখা, নত্থি সন্তি পরমং সুখং।
জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খরা পরমা দুখা,
এতং ঞত্বা যথা ভূতং নিব্বানং পরমং সুখং।
আরোগ্য পরম লাভা, সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং
বিশ্‌সাস পরমাঞাতী, নিরবানং পরমং সুখং। ধম্মপদ।
"রাগ সমান অগ্নিনাই, হিংসার ন্যায় পাপ নাই,
শরীরের ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই,
হিংসা পরম ব্যাধি, সংস্কার পরম দুঃখ, নির্ব্বাণ পরম
সুখ, যিনি এই জানেন তিনি সত্যকে জানেন, আরোগ্য-
পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরমাত্মীয় নির্ব্বাণই
পরমসুখ।' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"নির্ব্বাণ পরা শান্তি "যত্রকামঃ পরাগতা" সমস্ত কামনা তিরোহিত হয়, সমস্ত বাসনা উন্মুলিত হয়, ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামঃ"। নির্ব্বাণার্থে বাণ বা তৃষ্ণশূন্যতা বোঝায়, সর্ব্ব শূন্যতা নহে। বুদ্ধদেবের মতে নির্ব্বাণের অর্থ তৃষ্ণার, অজ্ঞানের নির্ব্বাণ, আত্মার নির্ব্বাণ নহে, তন্‌হা নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ, a level of peace and bliss, গীতার "অত্যন্ত সুখ", আনন্দের দিক থেকে ঐ আনন্দ "ব্রহ্ম সংস্পর্শ" যোগ যুক্তের বা মুক্তের সুখকে "অক্ষয়সুখ" বলে, উপনিষদ তাহাকেই "ভূমা" বা "অতিগ্নীম আনন্দস্য", acme of bliss বলে, উহাই অমৃতত্ব সিদ্ধি, ভূমানন্দের অবস্থা, Bliss is Nirvana"; বুদ্ধদেব বলেন "মুক্তপুরুষ পীতিসুখং অধিগচ্ছতি, অঞঞং

চাতাতো সন্তুতরং"—নির্ব্বাণ কেবল সুখ নহে, উহা সুখোত্তর দশা, উহাই উপনিষদের আনন্দং নন্দনাতীতম্"। নির্ব্বাণং পরমং সুখং, পস্সে চ বিপুলং সুখং, মুক্তি পরাশান্তি, এই "পঞ্চমাত্ত বিনিমুক্তি", ইহা অভিবো ব্রহ্ম-নির্ব্বাণম, ইহাই "প্রাজ্ঞ", ব্রহ্ম-সাযুজ্য, পরমহংস, মোক্ষ, বন্ধন মুক্তি (Release, Liberation, Emancipation), কিসের বন্ধন (Bondage)—অবিদ্যার বন্ধন, কামনার বন্ধন, বাসনার, তৃষ্ণার, মোহের বন্ধন; উপনিষদ একেই গ্রন্থি, গ্রহ, বন্ধ, পাশ বলিয়াছেন, এরা জীবের বন্ধভাব "পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ"। "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"—মোহের অধীন হইলে ঈশ্বরভাবের অভাব হয় এরা fetters, knots, bands, bonds that bind the Soul to the object of sense; ঐ অবিদ্যার শাতন হলে, কামনা বাসনার বারণ হলে, মোক্ষের উন্মূলন হলে মুক্তি, Deliverence, পরমপুরুষার্থ। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে "the highest holy freedom" বলিয়াছেন, সাংখ্য তাকে বলিয়াছেন "অন্তরায় ধ্বস্তি"। বুদ্ধদেব—"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপি তে"—"হে সুভূতি! যাহা শূন্য তাহাই আবার অক্ষয়, তাহাই আবার অপ্রমেয়।

অপ্রমেয়, অসঙ্খেয়, অক্ষয়, শূন্য, অনিমিত্ত, অপ্রনিহত, অনভিসংস্কার, অজ, অজাতি, অভাব, বিরাগ, নিরোধ নির্ব্বাণ—ইহারা সকলেই সেই একই বস্তুকে সূচিত করিতেছে। মিলিন্দা নির্ব্বাণকে "একন্তসুখ", "বিমুক্তি সুখ" বলিয়াছেন। অন্যত্র একেই বলা হইয়াছে "অসঙ্খত ধাতু", ইহাই সাংখ্যের জ্ঞানামুক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান, এই জ্ঞানই মুক্তি। বুদ্ধের আত্যান্তিক শূন্যতা; "নির্ব্বাণধাতু", লোকোত্তরবাদীদের "মহাবস্তু", নাগার্জ্জুনের "ভূততাথতা" একই বস্তু।

নির্ব্বাণকে স্বরূপে স্থিতি বলে, "মুক্তিহিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" ব্যুত্থানদশায় জীব বৃত্তিস্বারূপ্য (identification) করিয়া নিজের প্রকৃত রূপ বিস্মৃত হইয়া পাপীতাপী সুখীদুঃখী মনে করে, "বৃত্তিস্বারূপ্যম্ ইতি" (যোগসূত্র); যোগসিদ্ধ হলে সমাধিতে বৃত্তি নিরোধ হলে সে স্বরূপে অবস্থান করে "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্" (যোগসূত্র); বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে "অচ্যুতস্থান" বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য একেই পরমাগতি ও পরম সম্পদ বলেন—"এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ" (ছান্দোগ্য) ঐ স্বরূপ সমাপত্তিকেই জীবের চরম লক্ষ্য (highest goal) বলেন—"এষ সম্প্রষাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরমং জ্যোতিঃ উপসম্পন্ন স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" ঐ সপ্রসন্ন জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্বরূপে স্থিত হন, ইহাই "অস্তংগত", অমৃতত্ব সিদ্ধি—মুক্তং বা অস্তংগতঃ, মুক্তি ব্রাহ্মীস্থিতি, যাকে মুক্তি বা মোক্ষ বলা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মের সহিত একীভবন—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি", "ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি", "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মভবতি" ইহারই নামান্তর অমৃতত্ব সিদ্ধি, বিদ্বান্ ব্রহ্ম অমৃতঃ অমৃতম্. যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি।"

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

"বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে বলা হ'ত "ধর্ম্ম অনিতিক সাধকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে ইহার পরমতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়—অনুভূতির মাধ্যমে ইহা ধরা পড়ে। তর্ক, যুক্তি বা বুদ্ধি-দ্বারা এ ধর্ম্ম লাভ করা যায় না, করায়ত্ব হয় একান্ত ধ্যান ও লোকোত্তর সমাধির মধ্য দিয়া। ধর্ম্ম সাধনায় বিশ্বাস অতি প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখতে হবে প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর। কারণ পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষের সাধনা, তার উপলব্ধি ঘটে তার নিজেরই ভিতরে।" "প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির উপর জোর দিলেও বুদ্ধদেব শাশ্বত নিত্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এক অজাত, অভূত, অসংখ্যাত পরম সত্তার কথা বার বার বলেছেন, তার মূল সূত্র অনিত্যবাদ। নির্ব্বাণ সর্ব্বব্যাপী এক পরম সত্তার উপলব্ধি, এর বিনাশ নাই, ইহা নিত্য, চৈতন্যময়। আমিত্বের বিনাশের ফলে এই পরম জ্ঞানের অবস্থা লাভ হয়। "নিব্বন্তি ধীরা যথাপাদ পদীপ"—প্রদীপ যেমন নেভে তেমনি ধীরগণ নির্ব্বাপিত হন কিন্তু এই নির্ব্বাণ কিন্তু সত্তার বিনাশ নয়, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তা এই দুটি পার্থক্য করিয়াছেন, নির্ব্বাণের অর্থ তাই ব্যবহারিক সত্তার নির্ব্বাণ বা উপাধির নির্ব্বাণ, ইহাই নিরুপাধি অবস্থা, নিত্যাবস্থা। বুদ্ধদেব সারিপুত্রকে বলেন—"লোকে বলে নির্ব্বাণ, এর প্রকৃত অর্থ—রাগ, দ্বেষ

ও মায়া মোহের অন্তর্দ্ধান।" এই নির্ব্বাণ অস্তিধর্ম্মী, পরাশান্তি ও ভূমানন্দের অবস্থা "পীতিসুখং অধিগচ্ছন্তি।"

"বুদ্ধদেব আত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে "ধর্ম্মকায়" বলে একটি জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহ এবং ধর্ম্ম সমূহের যেখান থেকে উৎপত্তি হচ্ছে তাই ধর্ম্মকায়। বৌদ্ধ দার্শনিক সুজুকি বলেন—"The Dharmakaya may be compared in one sense to the god of Christianity and in another sense the Brahman or Paramatma of the Vedantta. The Universe is a manifestation of the Dharmakaya himself."

রবীন্দ্রনাথ—"যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করলেন তখনই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কর্ম্ম বিশুদ্ধ কর্ম্ম কারণ তাহাতে ভয়, লোভ, মোহ, হিংসা নাই, তাহা স্বার্থ বন্ধনের অতীত; তাহা দয়ার কর্ম্ম, প্রেমের কর্ম্ম। শীল-সাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্ব্বত্র মৈত্রীকে, দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্মাকে বিশ্বব্যাপী করাকেই ব্রহ্মবিহার বলে। অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে।" রবীন্দ্রনাথ শূন্যতা বোধকে (Nihilist) বৌদ্ধ দর্শনের চরম কথা বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি কখনো শূন্য পদার্থ হতে পারে না। "বুদ্ধদেব কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন, এই প্রেমের বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপ পায়। বুদ্ধদেব শূন্যতা মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গল সাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়ে ছিলেন—এই প্রেম যা যেখানে আছে, কিছুই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোন বাধাই মানে না। বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল মাত্র ত্যাগের ধর্ম্ম নহে। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা, এতো শূন্যতার পন্থা নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম তাই ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভের ধর্ম্ম। মুক্তির পথে আত্মশক্তিই প্রধান। "এইজন্য আমাদের দেশে কর্ম্মই ধর্ম্ম। আমরা বলি মানুষের কর্ম্ম-মাত্রেই চরম লক্ষ্য কর্ম্ম হতে মুক্তি এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম। "বৌদ্ধ ধর্মে মুক্তির পথ অতি দুর্গম। এই পথে দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগের, কঠোরতার সীমা নাই। কর্ম্মের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করে, সমস্ত কর্ম্মকে নিবৃত্তি অভিমুখীন করে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"   শ্রীমন্তকুমার জানা।

"বুদ্ধের ধর্ম্ম বীর্য্যের ধর্ম্ম পৌরুষের ধর্ম্ম এতে কৃপা করুণার স্থান নেই। বুদ্ধ বড় আশাবাদী, দুঃখবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নন। বঙ্কিম চন্দ্র বলেন—বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম্মকে জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন কিন্তু সহজ করেন নি। সত্য বুদ্ধ জগৎকে বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন, পুনঃ পুনঃ বলেছেন থাকে সুখ মনে করি তা দুঃখের দ্বারা অনুরঞ্জিত। যিনি বলেন দুঃখের নিবৃত্তির উপায় আছে তিনি তো নৈরাশ্যবাদী নন। বেদান্তের মুক্তি ও বৌদ্ধ নির্ব্বাণ এক।" "বৌদ্ধেরা বলেন নির্ব্বাণের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। নির্ব্বাণ নিয়ে বৌদ্ধদের নানা মত; কেউ বলেন নির্ব্বাণ এমন এক শাশ্বত শান্তি বা আনন্দের অবস্থা যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহ জীবনে এই অনির্ব্বচনীয় দিব্যানন্দ লাভ সম্ভব, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত লোক কর্ম্ম করতে পারেন স্বয়ং বুদ্ধ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদান্তেও জীবন্মুক্ত স্বীকৃত, লোক কল্যাণকামী নির্ব্বাণ যদি শাশ্বত অবস্থাও ইহ জীবনে লভ্য হয়, বৈদান্তিকের মুক্তি তাই পার্থক্য নেই কোন।" বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ও বেদান্তের ব্রহ্ম যে এক তা শ্রীঅরবিন্দও স্বীকার করেছেন।

"গম্ভীর, আনন্দ, প্রতীত্য, সমুৎপাদ, গম্ভীর ইহার দীপ্তি। আনন্দ এই ধর্ম্ম না জানিয়া এবং না বুঝিয়া মনুষ্যগণ বিজড়িত তন্তুর মতন, জটীভূত সূত্র-পিণ্ডের মতন, মুঞ্জ তৃণ গ্রন্থির মতন হইয়াছে এবং অপায় দুর্গতি, অধঃপতন ও সংসার (পুনর্জন্ম) অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। "পটিচ্চ সমুপ্পাদো" প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, এই নীতিই তাঁহার সদ্ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। নীতির দিক দিয়া যা "পটিচ্চ সমুপ্পাদো" প্রচারের দিক দিয়া তাহাই "চত্তারো অরিয সচ্চানি" চারি আর্য্য সত্য দুঃখ নিরোধবাদ, এই নিরোধের অপর নাম নির্ব্বাণ নিরোধো নাম নির্ব্বাণং।

বুদ্ধ বলেন জগতের আদি চিন্তাতীত, যিনি ইহা চিন্তা করিবেন, তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত হইতে হইবে এবং অনুশোচনা করিতে হইবে। অবিদ্যা জগতের আদি কারণ নয়, অবিদ্যা চিরবিদ্যমান, অনাদি জগতের অন্যান্য শক্তির ন্যায় ইহাও শক্তি। এই অবিদ্যার নিবোধে সংস্কার (জন্ম) নিরুদ্ধ হয়। কোন বিষয় না জানা অবিদ্যা, এই না-জানা, অজ্ঞানতা কি? কোন বিষয় না জানা অবিদ্যা? পঞ্চোপাদান স্কন্ধ যে দুঃখ ইহা না বুঝা অবিদ্যা, এই দুঃখের কারণ যে "তৃষ্ণা" ইহা না বুঝা অবিদ্যা এবং আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী জীবন চালনা যে তৃষ্ণা নিরোধ করিবার একমাত্র উপায় ইহা না বুঝা অবিদ্যা। অবিদ্যা চতুরার্য্য সত্যের রস লক্ষণ কিছুই জানিতে দেয় না, বুঝিতে দেয় না, ভেদ করিতে দেয় না, উহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে। এ ছাড়া অতীত ও ভাবী জীবনের "স্কন্ধ" "আয়তন," "ধাতু" ও প্রত্যয়োপন্ন ধর্ম্মের রস লক্ষণাদিও জানিতে দেয় না। এইরূপ না জানিতে দেওয়া অবিদ্যার কার্য্য। সুতরাং অবিদ্যা চিত্তেরই সেই অজ্ঞানতা যেই অজ্ঞানতা চিত্তকে তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিতে অক্ষম করিয়া রাখে।"

ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া।

"নির্ব্বাণের অবস্থা লাভের পর আনন্দোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি এত প্রবল হয় যে সে আনন্দবন্যা সংযত করার পূর্ব্বে প্রায় এক সপ্তাহ মত্ত হস্তীর মত বিচরণ করেছেন। বিবেকানন্দ তাঁকে আদর্শ কর্ম্মযোগী বলেছেন। গীতার মহত্তম আধ্যাত্মিক আদর্শ রূপায়িত করতে আবির্ভূত। ঈশ্বরে তার বিশ্বাস ছিল না, তা নয়, তাঁর নীরবতার কারণ এই সকল বিষয় যুক্তিতর্ক দ্বারা সমাধান করা যায় না। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষ অন্তর্দ্বন্দ্বে জনগণের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করত; এগুলি ধর্ম্ম জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করত না। বুদ্ধের মতে ধর্ম্ম অনুভূতির বিষয়, শুধু তত্ত্ব ও মতের স্বীকৃতি নয়, ধর্ম্ম আমাদের সত্তার রূপান্তর। ধর্ম্মবুদ্ধি বৃত্তি বর্জ্জিত করা নয়, ব্যক্তিত্ব পরমাত্মা সমপর্য্যায়ে উন্নীত করা। ধর্ম্ম পুরুষার্থের প্রত্যক্ষ অনুভূতি।"

"সব্বম্ দুঃখম্ ছন্দমূলকম ছন্দ নিদানম ছন্দো হি মূলম্ দুঃখস্ত"—সব দুঃখের মূল ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে জাত। ইচ্ছাই দুঃখের কারণ। অবিদ্যাকে নাশ করতে চাই বিদ্যা, সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে—"তাহাই প্রকৃত বিদ্যা, যাহা আত্মাকে বিচার, বিমূঢ়তা, অন্যায়, অধর্ম্ম ও পাপ হতে মুক্ত করে।" লোভ, দ্বেষ, ও মোহ অন্তর্হিত হয়েছে, এসেছে পরমা তৃপ্তি, অপূর্ব্ব শান্তি, ক্ষেমঙ্কর পরমা শান্তি—এতম্ যো পরমম জ্ঞানম্ এতম সুখ অনুত্তম অশোকম বিরজম্ ক্ষেমম্—এসেছে পরম জ্ঞান, অনুত্তর সুখ, শোক নেই, ধূলি নেই, মলিনতা নেই, এসেছে ক্ষেমঙ্কর পরমা শান্তি।" বুদ্ধদেব মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছেন—'আত্ম দীপো ভব। তিনি যে কেবল সাধু সন্ন্যাসীর মতো পরলোকের কথাই ভাবতেন তা নয় কেমন করে এই জগতের প্রতিটি মানুষ সব দিক দিয়ে সুখী হতে পারবে, তাই ছিল তার চাওয়া। শ্রীঅরবিন্দ—"নির্ব্বাণ লাভের পর আর কোন কাজ করা যায় না, এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়, নির্ব্বাণ লাভ হলে ভগবৎ নির্দ্দেশে আরও বেশী করে ভাল করে কাজ করা যায়।" অনির্ব্বাণ তাই প্রবুদ্ধ জীবচেতনায় আত্ম সংবিতের তত্ত্বরূপে ফুটে ওঠে তুর্য্যাতীতের অবিজ্ঞেয় ভূমিতেই পরা সংবিতের অসমোর্দ্ধ্ব অনুভব মিটে যায় ইতি ও নেতির দ্বন্দ্ব। সম্যোক সম্বোধিতে এ সৌষম্য সম্ভব বলেই বুদ্ধদেব লোকোত্তর নির্ব্বাণ পদে আরূঢ় থেকেও কর্ম্মের প্রচণ্ড আন্দোলন তুলেছিলেন জগতে, অন্তশ্চেতনায় নৈর্ব্যক্তিক হয়েও সার্থক ব্রতের উদ্‌যাপনে মুক্তি চেতনার চরম চমৎকার দেখিয়ে গেছেন পৃথিবীতে।" দিব্য জীবন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর যোগেও নির্ব্বাণের অভিজ্ঞতা অবশ্য করণীয়, নির্ব্বাণ লাভ না হ'লে অজ্ঞানতার হাত হতে মুক্তি লাভ করা যায় না—

("In our Yoga Nirvana is the begining of the higher Truth, as it is the passage from Ignoraed to the higher Truth. The Ignorance has to be extinguished in order that the Truth may manifest.—Sri Aurobindo

"বুদ্ধ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছেন; "পবিত্র হও, সৎ হও, অপরকে ভালবাস, ভগবান লাভের এই চিরন্তন পথ, অন্য পথ আর কিছু নাই। আমরণ চিত্ত অশান্ত করবে না। পূর্ব্বজন্মের প্রারব্ধ কর্ম্মের অনিবার্য্য

ফল এ জন্মে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। জীবনের কর্ম্মফলকে এড়িয়ে যাবার শক্তি কোন জাতকের নেই, তাকে স্বীকার না করলেও তা ঘটবে। কামনা থেকেই দুঃখ বা বাসনাই দুঃখের কারণ। দুঃখ থেকে ত্রাণ পেতে হলে কামনা বাসনাকে জয় করে নিতে হবে। নিষ্কাম চিত্তে আত্মোন্নতি করতে হবে নির্বাণ লাভের জন্য, তবেই সংসারের দুঃখ জরা মৃত্যু থেকে মুক্তি মিলবে, আসবে পরমা শান্তি।" "প্রারব্ধ কর্ম্ম জীবনের পথ পূর্ব্ব থেকেই নির্দ্ধারিত করে রাখে।..."জীব জগৎ ও সর্ব বস্তুর মূলে এক সত্তা বিদ্যমান। এক মৃত্তিকা থেকে যেমন প্রয়োজনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ পূর্বক নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তেমনি এক সত্তা বিভিন্ন সংস্কারাত্মক মনের দরুণ ভিন্ন ভিন্ন নামে নাম ও রূপাদি প্রাপ্ত হয়। নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি ভেদ জ্ঞান তিরোহিত সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন। সর্ব্বগ্রাসী অহঙ্কার বর্জ্জন করিলে তুমি মনের যে নির্ম্মল প্রশান্ত অবস্থা লাভ করিবে ঐ অবস্থা তোমাকে সম্পূর্ণ শান্তি, মঙ্গল ও জ্ঞান দিবে। তোমরা বিবেকী-মনুষ্য প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে তোমার "আমিত্ব" কল্পনা ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে, এই কল্পনা দূর কর, তুমি বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পাইবে।" "তোমার স্বরূপকে জানো। বাসনা ও কামনার মোহে আত্মা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সদিচ্ছা ও সৎসঙ্কল্পের দ্বারা প্রবৃত্তিকে জয় করলে আত্মানুভূতি আসে। হৃদয় প্রসারিত করো, যুক্ত কর অনন্ত প্রবাহের সঙ্গে। মানুষ আপনা আপনি পাপ করে, আপনাকে আপনিই ক্লেশ দেয়, আপন দেখাতেই পাপ থেকে বিরত হয়, আপনার দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়। শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আত্মকৃত। একে অপরকে কখনও উদ্ধার করতে পারে না।" "দুঃখের ঐকান্তিক নিরোধ যে সর্বদাই বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কিরূপে দুঃখের নিরোধ সম্ভব? কেহ মনে করিতে পারেন এ জীবন যখন দুঃখময়, দেহের বিনাশেই দুঃখের নিবৃত্তি। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন দেহের নাশে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, কারণ পুনর্জ্জন্ম হতে পারে। তৃষ্ণার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্জ্জন্ম অবশ্যই হইবে। দেহের বিনাশে নয়, তৃষ্ণার ক্ষয়েই নির্বাণ লাভ হয়। জগতে যদি কোন নিত্য বস্তু না থাকে তবে পুনর্জ্জন্ম হয় কিরূপে? কাহার পুনর্জ্জন্ম হয়?

"বিনয় পিটক অবলম্বনে পণ্ডিতেরা এই মুক্তি বা নির্ব্বাণকে তিনভাবে (ত্রিবিধো মোক্ষঃ—সাংখ্য সূত্র) ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১) নির্ব্বাণ হ'ল শূন্য বিনাশ, মহা বিনাশ, অহং বোধের বিলোপ সাধন করিয়া গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জন (২) নির্ব্বাণ এক পরম রহস্য স্বয়ং বুদ্ধ ইহার স্বরূপ খোলাখুলি বলেন নি (৩) নির্ব্বাণ মানব জীবনের গৌরবময় ও কল্যাণকর পরিণাম।" শ্রীশরৎচন্দ্র রায়। "বিশুদ্ধি মার্গের মতে" পঞ্চস্কন্ধের ধ্বংসকে নির্ব্বাণ বলে। নির্ব্বাণ অর্থে কাম, মদ, তৃষ্ণা, আসক্তি ও সকল ইন্দ্রিয় সুখের ধ্বংসকে বুঝায়। ধ্যান, প্রজ্ঞা, শীল ও আরব্ধ বীর্য্যের দ্বারা তাহা লাভ করা যায়। নির্ব্বাণগামী পুরুষ মুক্তির পথে ধাবিত হয়।" অর্থশালিনীর মতে—"সমস্ত তৃষ্ণা এবং পাপের উপশমকে নির্ব্বাণ বলে। সুমঙ্গল বিলাসিনীর মতে—"নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ সমস্ত কাজকর্ম্ম হতে আপনাকে মুক্ত করা এবং পরমা শান্তি লাভ করা। মিলিন্দার মতও তাই। নির্ব্বাণ দুইপ্রকার (১) স-উপাধি বিশেষ নির্ব্বাণ (২) অনুপাধি বিশেষ নির্ব্বাণ। অর্হত্ব লাভের পর প্রথমটি পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর পর। প্রথমটি শান্তির পরম অবস্থাকে বুঝায় দ্বিতীয়টি পার্থিব জীবনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। বুদ্ধ ঘোষের মতে অর্হত্ব বলিতে শান্তির পরম অবস্থাকে বুঝায় এবং যখন তিনি নির্ব্বাণ অর্থে শূন্যতাকে বুঝেন দ্বিতীয়টির অবস্থা। সমস্ত সংযোজন দূর করিয়া মনের যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা পরিনির্ব্বাণ। নির্ব্বাণের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য ও সুখ।" ডাঃ বিমলাচরণ লাহা। বিমুক্তি তিন প্রকার—তদঙ্গ, বিক্কম্ভণ ও সমুচ্ছেদ—"রূপাবচর সমাধির ধ্যান প্রাপ্তিকে "তদঙ্গ বিমুক্তি", অরূপাকর সমাধির ধ্যান প্রাপ্তিকে বিক্কম্ভণ বিমুক্তি আর বিদর্শন কর্ম্ম ভাবনার দ্বারা দৃষ্টি বিশুদ্ধি করে সম্পূর্ণ বিমুক্ত সমুচ্ছেদ বিমুক্তি।" এদের সঙ্গে সাংখ্যের মুক্তির (ত্রিবিধো মোক্ষঃ) কোন পার্থক্য নেই। প্রথমটি জীবন্মুক্তের অবস্থা, দ্বিতীয়টি বিদেহ মুক্তের অবস্থা, তৃতীয়টি চিরলয়ের অবস্থা।

"কোন দর্শনেই পরমাত্মায় লীন হওয়াকে মুক্ত বলিয়া বর্ণনা করেন নি। পতঞ্জলি—"পুরুষার্থশূন্যানাং জ্ঞানানাম্ প্রতিপ্রসবঃ" কৈবল্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতিঃ —যে সময় জীবের আর কোন প্রয়োজন সিদ্ধি থাকে

না অর্থাৎ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছা নষ্ট হয় তখনই তাহাকে মুক্তি বলা যায়। সাংখ্য শাস্ত্রে কপিলদেবও জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন অর্থাৎ যখন জীবের সর্ব্ব প্রকার তাপের আত্যন্তিক নাশ হয় তখনই তিনি মোক্ষানন্দ বা মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ত্রিতাপের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলে। যদি ঈশ্বরে লীন হওয়া সম্ভব হইত তবে কে মুক্তানন্দ উপভোগ করিবে? ন্যায়শাস্ত্রেও দুঃখের নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলেন; ব্যাস, জৈমিনি, পরাশর ইত্যাদি ঋষিরা মুক্তাবস্থায় জীব কিরূপে অবস্থান করেন তাহা স্পষ্টই বলেছেন। ছান্দোগ্য বলেন জীবমুক্তাবস্থায় পরমাত্মায় লীন না হইয়া পৃথকভাবে অবস্থানপূর্ব্বক মোক্ষানন্দ উপভোগ করেন; যাজ্ঞবল্ক্য বলেন পরমেশ্বর আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাতে অবস্থিতি করেন অথচ তাহা হইতে সদা পৃথক্ বা ভিন্ন"।

"বুদ্ধদেব বার বার বলেছেন—"গম্ভীরাং প্রজ্ঞাপারমিতাং" তাঁহাকে সহজে লাভ করাযায় না। বহু কষ্টে প্রজ্ঞা পারমিতাকে লাভ করা যায়। বুদ্ধত্ব, স্বয়ম্ভুত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা অতি দুরূহ, তাহা চিন্তার অতীত, তুলনার অতীত, তাহা অপ্রমেয়, গম্ভীরাসদুর্বোধা।" শ্রীঅরবিন্দও একই কথা বলেছেন ("No body ever said that the spiritual change was an easy thing; if it were so it would be multitude and not only a few that would be practising it."—Sri Aurobindo)।

যোগ যদি এতই সহজ হ'তো তাহলে কোটিকে গোটিক নয় লাখে লাখে মুক্ত মহাপুরুষ নিমেষে বেরিয়ে আসতো।

অষ্টাঙ্গ যোগের পথ তা বৌদ্ধ বা হিন্দু বা অন্য যে কোন ধর্ম্মেই হোক, অতি সুকঠিন পথ, ক্ষুরস্য ধারার পথ, সে পথ অতিক্রম করতে শুধু এক জন্ম নয়, বহু জন্ম লাগে সে পথে সিদ্ধি লাভ করতে কারণ যোগের পথ অতীব মন্থর, তাতে ধাপে ধাপে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়, হঠাৎ সিদ্ধিলাভ করা যোগের পথে সম্ভবপর হয় বলে জানিনে। আমি যোগের পথে যাই নি, আমি গিয়েছিলাম গীতার কর্ম্ম যোগের পথ, মন্ত্র জপ ও ত্রাটক, এই তিনটি এক সঙ্গে অভ্যাস করেছিলাম এবং তখন ছিলাম প্রায় মৌনী, কারও সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলতাম না, যদিও আমি ছিলাম বহু লোকের মাঝে, সেখানে এটা করা একেবারেই অসম্ভব, আমি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে ছিলাম। নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞান আমার লক্ষ্য বা সাধনা ছিল না; আমার লক্ষ্য ছিল পরব্রহ্ম, তাঁর তত্ত্ব আমি জানিনে বটে কিন্তু সমাধিতে তাঁর স্পর্শ বা আশীষ আমার মাথায় আমি পেয়েছি (২৬,১২,১৯৬০, বেলা ২॥০ থেকে ৩॥০ টার মধ্যে)। তিনিই দিয়ে ছিলেন অযাচিত ভাবে হঠাৎ এই ব্রহ্মজ্ঞান। একথা সত্য মহাকালীই সর্ব্বপ্রথম খুলে দেন আমার পথ, করান আমাকে ঘর ছাড়া সন্ন্যাসী। শ্রীঅরবিন্দ—"যে শাশ্বতকে বেছে নেবে, তাকে শাশ্বত আগেই বেছে নিয়েছেন। সে পেয়েছে সেই দিব্য সংস্পর্শ যা নইলে জাগৃতি আসে না, যা নইলে আত্মদানের দুয়ার খোলে না। কিন্তু একবার এই সংস্পর্শ পেলে সিদ্ধি ধ্রুব, হয় তা আসে এক জন্মেই দ্রুত যুদ্ধ জয়ের মত নয় ত আসে এই সংসারের মাঝে ধাপে ধাপে বহু জন্ম ধরে ধীর ভাবে অনুধাবনের ফলে। কচিৎ এমন হয় যে কোন সাধকের আর অন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, কেননা তার যোগ সাধনার বাকী অংশটাকে অবিরাম সেই দিব্য সংস্পর্শের ও সেই দিব্য প্রেরণার ফলে আত্মা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তবে এরকম সাধকের সংখ্যা খুবই কম তাঁরা সত্য সত্যই মহান মহাপুরুষ যাঁদের পক্ষে এ স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞানই যথেষ্ট, যাঁদের দরকার হয় না কোন লিখিত গ্রন্থ বা জীবন্ত শিক্ষাদাতার আশ্রয় গ্রহণ।" মহাকালীই আমার প্রথম গুরু, আমার তৃতীয় গুরু হলেন বুদ্ধদেব, তাঁর সঙ্গে আমি একীভূত হই (৬-৬-১৯৬২ সালে বেলা প্রায় ২ টায়), তাঁর কৃপায় আমি পরম শান্তির অবস্থা লাভ করি, দ্বিতীয় গুরু নির্ব্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম এবং চতুর্থ গুরু পর ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম, এঁদের প্রত্যেককেই আমি ছুঁয়েছি, তাঁদের কৃপা বা আশ্বাস পেয়েছি, আমার ভবিষ্যৎ কাজের ইঙ্গিতও হয় তো এদের কাছ থেকে পেয়েছি। মুক্তি পেলেও আমি যা চাই তা আজও পাইনি, আমার লক্ষ্যে আজও আমি পৌঁছাই নি। এ ছাড়া আর আমার কোন গুরু নেই। যোগের পথে আমি যাইনি সেই জন্য এপথ সম্বন্ধে জোর করে বলা সম্ভব নয়, তবে এইটুকু বলতে পারি আমি

একজনকেও ওপথে সিদ্ধিলাভ করতে দেখিনি বা এমন কাউকেও জানিনে যে মন্ত্র জপ করে বা গুরু কৃপায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। সাধনা সাধককেই করতে হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তা এদেহে থেকেই করতে হবে অন্যত্র নয় ("Sadhana has to be done in the body, it can not be done by the soul without the body." Sri Arobindo), মৃত্যুর পর সাধনা করা যায় না বা সিদ্ধি লাভ করা যায় না । ভগবান লাভের বহু পথ আছে। সুদীর্ঘ পথও আছে, দীর্ঘ পথও আছে, মধ্যম পথও আছে আবার এক জন্মে শীঘ্র সিদ্ধি লাভের পথও আছে। আগেই বলেছি মহাকালী আমার পথ খুলে দিয়েছিলেন, সম্ভবত সেই কারণেই আমাকে সাধন কালে দুর্ভোগ বা বাধা বিঘ্ন কিছুই পোয়াতে হয় নি বলে প্রায় দশ মাসের অবিরাম চেষ্টায় আমি নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান, তিনটিই এক সঙ্গে লাভ করি তার জন্য আমাকে আর কিছুই করতে হয় নি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ত্রাটক অভ্যাসই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহজ ও আশুফলদায়ী পন্থা, এতে গুরু, মন্ত্র, কৃপার কোন স্থানই নেই, ঠিক মত করতে পারলেই হ'ল, ত্রাটক সিদ্ধের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে দুই এক মাস সময় যথেষ্ট। ত্রাটক মানুষকে কালজয়ী করায়, দিব্যদৃষ্টি দেয় ত্রাটক অভ্যাসের সময় আমি গান্ধীজীর মৃত্যুর খবর কিছু আগে পাই। আমরা জানিনে জন্মজন্মান্তর ধরে আমাদের শরীর চেতনা নাভিমূলে আবদ্ধ হয়েছে, ত্রাটক অভ্যাসের ফলে ঐ বদ্ধ চেতনা মুক্ত হয়ে ভ্রূমধ্যে চলে আসে, একবার সেখানে যেতে পারলে সেখান থেকে ঐ চেতনাকে সহস্র দল ভেদ করে শরীরের বাইরে নেয়া অতি সহজ হয়ে আসে, তাতেই হয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, আমার মনে হয় এটাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহজ ও আশুফল দায়ী পন্থা এবং এই জন্যই সহজিয়া, তান্ত্রিকরা এই পথ নিয়েছেন। আমি নিজে এই পথে বসেই প্রায় দশ মাসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি। এটা পরীক্ষিত সত্য এতে মিথ্যার কোন স্থান নেই।

অনির্ব্বান—"যে সত্য সার্ব্বজনীন তারও গ্রাহক মুষ্টিমেয়ই হয়। যা বিজ্ঞানগম্য, তার গ্রাহক কোটিকে গোটিক।" 'ভারতবর্ষে' আমার লেখাগুলো পড়ে কয়েকজন আমাকে পত্র দিয়েছিলেন, আমি আগেই তাদের বলেছিলাম তারা পারবে না, তারা শেষ পর্য্যন্ত লেগে থাকতে পারেন নি। ভগবানকে এখন আর সত্য করে লোকে পেতে চায় না। ব্রহ্মজ্ঞানটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলেও (১০।৯।১৯৬০) কি করে সহজে শীঘ্র ব্রহ্মজ্ঞান বা নির্ব্বাণ লাভ করা যায় তার অব্যর্থ ও নির্ভুল পথ বলে দিতে পারি, দেখিয়ে দিতে পারি কিন্তু সে পথ তো খুব সহজ নয়। বুদ্ধদেব বলেন —"দুর্ল্লভ এমন কোনও বস্তুই জগতে নাই যাহা উদ্যমশীল বীরগণের যত্নে সিদ্ধ হয় না।" যারা উদ্যমশীল, একাগ্রচিত্ত ও ভক্তিযুক্ত, যাদের সংকল্প স্থির অটল ভগবানকে তাঁরা পাবেই ("He who choses the Infinite has been chosen by Infite." Sri Aurobindo) তারাই বলতে পারে শেষে—

মুক্তি (Liberation.—Sri Aurobaindo)।

"মনের ঘূর্ণি নৃত্য আমার দূর করিয়াছি তারে,
আত্মার নীরবতায় দাঁড়ায় মুক্ত আমি যে আজি,
জীব জগতের অতীত, মৃত্যু কালহীন পরপারে,
মোর স্বানন্দ কেন্দ্রটি ঐ শোভায় উঠেছে বাজি!
আমি নিষ্কৃত মাক, আমার ক্ষুদ্র অহম্ গিয়াছে মরি;
আমি অসত্য, অক্ষর, মোর সঙ্গী নাইত কেহ;
আমার রচিত বিশ্ব হইতে আমিত গিয়াছি সরি,
হইয়া উঠেছি নামহীন আমি, হয়েছি অপ্রমেয়।
উহার অসীম আলোকে আমার নির্ব্বাণ হ'ল মন,
শান্তি পুলক ভরা নীরবতা অন্তরখানি মম
শব্দে পরশে দৃশ্যে টলেনা মোর ইন্দ্রিয়গণ,
শুভ্র অসীম মণ্ডলে দেহ একটি বিন্দুসম।
আমি যে পরম অচলানন্দ সেই এক সত্তার,
আমি সৃষ্টির কবি তবু কোন বিশেষের আমি পার।" *

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বসু।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ

(৯)

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহি অধীয়তে একে (৯)

শঙ্কর বলে জ্যোতি ও অগ্নি পৃথ্বি এ তিনজন
ক্রমে ক্রমে তাহা ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট জানিও হন
ছান্দোগ্যতে কয়
লাল সাদা কালো হয়
অর্থাৎ জেনো আগুনের লাল রূপ সে তেজের হয়
সাদারূপ জেন জলের ও কালো রূপ সে পৃথিবীময়
আগুন কে মোরা চোখ দিয়ে দেখি স্থুল রূপে রয় তাহা
সূক্ষ্ম রূপে লাল সাদা কালো তিনে মিশে হয় জেন যাহা
কেহ কেহ বলে এই
জ্যোতির জ্যোতি সে সেই
হৃদয়ের মাঝে উপাস্য রূপে দেখো রাজে সেই জন
সকল জ্যোতির আধার সেজন জ্যোতিতে মূর্ত্ত হন।

কল্পনাপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদ বিরোধঃ

(১০)

শঙ্কর কন কল্পনাপদেশ মধু আদি বলা হয়
অবিরোধ তাই নাহিক ইহাতে জেন মনে নিশ্চয়
অজা শব্দটি কল্পনা জেন
বহু প্রসবের কারণেরে যেন
বদ্ধ জীবেতে করে উপভোগ মুক্ত জীবেতে নয়
ছান্দোগ্যতে সূর্য্যকে যথা মধুরূপ ভাবি কয়।
বেদের মাঝেতে বাক্যকে জেন ধেনুরূপে বলিয়াছে
স্বর্গলোককে অগ্নির রূপে কোথাওবা প্রকাশিছে
তেমনি অজা সে কয়
কল্পনা নিশ্চয়

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানা ভাবাদতিরেকাচ্চ।

(১১)

যাঁহারা মধ্যে পাঁচজন আর আকাশ বর্ত্তমান
আত্মা ব্রহ্ম অমৃত জানিও তাহাতে অবস্থান
ইহারে জানিলে সবজানা যায়
অমৃত লাভের সহজ উপায়।

(১২)

প্রানাদয়ো বাক্য শেষাৎ

পঞ্চজন শব্দ প্রাণ পঞ্চকে বোঝায়
বাক্য শেষে এই পাঁচে জেন বলা যায়
পরানের প্রাণ সেই চক্ষুর চোখ
কর্ণের কর্ণও অন্নের হোক
আর মন এই পাঁচ জনেরে বোঝায়
কেহবা পাঁচটি বর্ণ জাতি বোঝা যায়।

(১৩)

জ্যোতিষা একেষাম্ অসতি অন্নে

কাণ্ব মাধ্যন্দিন নামে দুটি শাখা আছে
শুক্ল বেদে জেনো এর কথা আছে
তং দেবা জ্যোতিষং জ্যোতিঃ
দেবাদিদেবের মোহন মূরতি
প্রকাশি বলিতে ভাষা হেরে যায় লেখনী স্তব্ধ নত
অসতি অন্নে শ্রুতি বাক্যেতে তাঁহারি মহিমা শত ॥

কারণত্বেন আকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ (১৪)

বিভিন্ন উপনিষদ জানিও কত মত কথা কয়
তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টি আকাশ হইতে হয়
ছান্দোগ্য বলে কভু নয়
ব্রহ্ম হইতে তেজের উদয়
প্রশ্নোপনিষদে বলে প্রাণ হতে শ্রদ্ধা জনম লয়
প্রাণ হতে জেন সবার সৃষ্টি এমনি কতকি কয়। [ক্রমশঃ

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

একটু পরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হলেন। তারপর অসিতের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন: "বাবা, এসব কথা মুনি ঋষিরা গোপন রাখেন তার একটা কারণ—সত্যকে বিশ্বাস না করার প্রত্যবায় আছে।"

অসিত প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তাকালো।

মা: একটু খুলে বলি তোমাকে আজ, কারণ লগ্ন এসে গেছে। বলছিলাম কি জানো বাবা? সত্যকে অবিশ্বাস করলে তাতে ক'রে সত্যের মানহানি হয় না, অবিশ্বাসীদের ঠাট্টা তামাসায় সত্যদর্শীরও কোনো ক্ষতিই হয় না। ক্ষতি হয় কেবল অবিশ্বাসীদেরই। সত্যদর্শীরা যে বলতে চান না তাঁদের ভগবদ্দর্শনের কথা তার একটা কারণ এইই। কিন্তু তোমাকে আজ বলতে পারি কারণ তুমি আসলে অবিশ্বাসী নও এ আমি দেখতে পেয়েছি। আর কখন জানো। যখন তুমি গাইছিলে শেষের অন্তরাটি যে তুমি "সাধবে মাকে সকল সুরে।" সেই সময়ে ঐ যে দেয়ালে মা ভবানীর ছবি ঝুলছে না? তাঁর হৃদয় থেকে একটি স্নিগ্ধ নীল আলো এসে তোমার কপালে ঠেকল। তারপর কি আর না মেনে পারি যে, তুমি অধিকারী হয়েছ—ডাকার ব্যাকুলতার গুণে। তাই শোনো। সব কথা বলার সময় হবে না, পারবও না আমি গুছিয়ে সব বলতে। তবে সংক্ষেপে যা বলব তাতেই হয়ত কাজ হবে।

তোমাদের তর্ক উঠেছিল বাহ্যপূজা নিয়ে। পূজা কার? না, ঠাকুরের বিগ্রহের। এ-বিগ্রহ কেমন ক'রে এল? না, ঠাকুর নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনো না কোনো সময়ে। কেন দিয়েছিলেন? না, নরলীলা তিনি ভালোবাসেন ব'লে। নৈলে কি গীতায় বেজে উঠত যে, যুগে যুগে তিনি জন্ম নেন? গীতায় অবশ্য তিনি বেশি বলেন নি। শুধু এইটুকু ব'লেই থেমে গিয়েছিলেন যে, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন আর নতুন ক'রে পত্তন করতেই তিনি বার বার অবতীর্ণ হন। একথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে মানুষের যে মূর্তিতে তিনি আমাদের কাছে আসতে চান কাঠামোকে পুজো করব না কেন? সাধনার অর্থ - তাঁর নিয়মকে মেনে নিয়ে নিজের স্বেচ্ছাচারী অভিমানকে জয় করা তো? তাঁর নরলীলাকে মেনে নিলে এ-অভিমান জয় করা কিছুটা সহজ হ'য়ে আসে। কারণ সব চেয়ে বড় সাধনা হ'ল প্রেমের সাধনা আর মানুষ সবচেয়ে সহজে ভালোবাসতে পারে মানুষকে। তাই অর্জুন বলেছিলেন ঠাকুরকে তাঁর মানব মূর্তিতেই দর্শন দিতে—বিশ্বরূপ দেখিয়ে বিহ্বল না করতে। তাই গৃহ বিগ্রহ পূজো করার প্রবৃত্তি পদ্ধতি প্রাণহীন লোকাচার নয়—ভালোবেসে বিগ্রহের মধ্যে তাঁকে ডাকলে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এ কথার কথা নয় বাবা, বহু সাধক প্রত্যক্ষ দেখেছেন—প্রেমের ভাবে বিগ্রহের মধ্যে ঠাকুর নামেন—যেমন মীরার বিগ্রহে নামতেন। নামেন কেন? না, ভক্তের সঙ্গে তিনি মানুষ মানুষ খেলা খেলতে ভালবাসেন ব'লে। (থেমে) তবে মূর্তিপূজাও সকলের জন্যে নয় বাবা। গীতায় একটি লাখ কথার এক কথা বলেছেন ঠাকুর নম্র হ'য়ে মেনে নিলে আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল ঢের ক'মে যেত। কথাটা হ'ল—প্রত্যেকের প্রথমে খুঁজে পেতে হবে তার স্বধর্ম—তারপরে চলতে হবে সেই পথে। প্রচারকেরা "সবাইকে এক গোয়ালে মাথা মুড়োতে হবে" হেঁকেই এত মুস্কিল হয়েছে। কারণ ঠাকুর আমার নানা সুরেই তাঁর বাঁশি বাজান—যে যে-সুরে সাড়া দেয় সে সেই সুরেই নিজের প্রাণের তার মিলিয়ে নেয়। এতে আপত্তি কেন?

ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈচিত্র্যে এ-ও কি মানতে নারাজ তুমি? (নমস্কার ক'রে) তিনি কী কাণ্ড ক'রে চলেছেন যুগ যুগ ধরে—একবার ভাবো তো! শুধু কোটি কোটি বিশাল সূর্য-চন্দ্র-তারা নীহারিকাই তো নয়—অণুর মধ্যে নেমেও কী কীর্তি করছেন বলো তো—যে-অণুদের জাল পাকিয়ে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড গ'ড়ে উঠেছে! একটু ভাবতে না ভাবতে তাক লেগে যায় শুধু মহতো মহীয়ানের কথা ভেবেই নয়, অণোর অনীয়ানও কি কম আশ্চর্য? প্রণবের কাছে শুনেছি—সিকি ইঞ্চি জায়গায়ও না কি লক্ষ লক্ষ জীবাণু জন্মাচ্ছে, হৈ চৈ করছে, মরছে, আবার জন্মাচ্ছে কোটি কোটি বৎসর ধ'রে। অথচ প্রতি জীবাণুরই একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। তাহ'লে ঠাকুরের কত মূর্তি দাঁড়ালো গোণাগুন্তিতে ভাবো তো—কারণ প্রতি জীবাণু তো তাঁরি এক একটি রূপ। তাঁর বিশ্বরূপে তিনি যখন অর্জুনকে তাঁর এই মহারূপের একটু খানি দেখিয়েছিলেন, অতবড় বীর হ'য়েও সে ভয়ে কম্পমান হয় নি কি? তবু আমারা তাঁর দুচারটে লীলাখেলা দেখে লীলাকে মেনে লীলাময়কেই বাতিল ক'রে দিয়ে বাহাদুর বলতে চাই। এরই নাম পণ্ডিতমূর্খ। নয় কি?

অসিত: কিন্তু এত রূপের ঘটা কেন মা?

মা (হেসে): তাঁর ভালো লাগছে ব'লে। মর্জি। লীলা। কত নাম দেওয়া যায়। কিন্তু নাম লেবেলের কি সত্যি দরকার আছে বাবা? তারচেয়েঢের ভালো নয় কি—তিনি যে-রূপেই আসেন সে রূপেই তাঁকে অভ্যর্থনা করা "এসো" ব'লে? এরই তো নাম অর্চনা। এতে দোষের কী থাকতে পারে? যাকে ভালোবেসেছি বা বাসতে চাই তাকে ভেবে আদর করা পুজো করাইকি প্রেমের ধর্ম নয় বাবা? একঘেয়ে জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা এই সাদা কথাটি বুঝতে চান না ব'লেই মূর্তিকে গাল দেন— বলেন মূর্তি-পূজা করলে তাঁকে ছোট করা হয়।

শোনো বাবা। আমি ছেলেবেলায় এক সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্ম সখীর পাল্লায় প'রে তাদের মতন বিজ্ঞ সুরে বলা সুরু করেছিলাম—মাটির বিগ্রহ নিষ্প্রাণ সুতরাং ভগবান হ'তেই পারে না। এই সময়ে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর প্রেমবিহ্বল উদ্দিপ্ত নৃত্য দেখে অভিভূত হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রতিমা পূজার কথা। তিনি হেসে বলেছিলেন যে, তিনিও একসময়ে ব্রাহ্মদের প্রভাবে প'রে ভাবতেন প্রতিমা বিগ্রহ মূর্তি সব কুসংস্কার। একদিন হ'ল কি শান্তিপুরে তাঁদের গৃহবিগ্রহ শ্যামসুন্দর তাঁকে বললেন: "ওরে একবার আয় না, দেখ আমি কেমন সেজেছি।" তাতে তিনি বললেন: "ধেৎ! "তোমাকে আমি বিশ্বাসই করি না।" তাতে ঠাকুর বলেন: "নাই বা বিশ্বাস করলি। দেখতে ক্ষতি কি?" দেখতে গিয়ে তাঁর চোখের জল আর থামে না।

বাবা! ভক্তি যারা চায় তারা সবচেয়ে সহজে ভক্তির সাধনা করতে পারে কোনো না কোনো মূর্তির মধ্যে দিয়েই। এ-মূর্তিকে বাইরে রেখে তার 'পরে দেবত্বের আরোপ করলে প্রেমের ভাবে সে-মূর্তি জীবন্ত হ'য়ে ওঠে এ একটি অকাট্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা—শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই ঘটেছে এ-অঘটন বুদ্ধিমন্তদের গা জোয়ারি অস্বীকার একে কী ক'রে কাটবে বলো? সত্যকে কি গায়ের জোরে "তুমি নেই" বললেই সে হার মেনে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় বাবা? প্রেমল আমাকে কঠোপনিষদ প'ড়ে শোনাচ্ছিল সেদিন। যাতে একজায়গায় আছে—যা এখানে তাই সেখানে, যা সেখানে তাই এখানে। মূর্তিকে তিনি সেখানে মঞ্জুর করেছেন ব'লেই এখানে আমরা মানপত্র পেয়ে মূর্তির চালচিত্র গড়তে পেরেছি। গীতা কি শুধুই ফাঁকা আওয়াজ করেছে—যখন ঠাকুর অর্জুনকে বললেন—তাঁকে যে যে ভাবেই ডাকুক না কেন, তাকে তিনি ঠিক সেইভাবেই, সেই রূপেই, দর্শন দেন, তার অর্ঘ—পাতা ফুল ফল সবই গ্রহণ করেন? আর গ্রহণ করা মানেই তো বাহ্য পূজার পাঠ দেওয়া। গীতার শেষ অধ্যায়েও তিনি এই কথাই বলেন নি কি যে, আমাকে মন দিয়ে গ্রহণ করতে হবে জ্ঞানীর মতন, প্রাণ দিয়ে বরণ করতে হবে ভক্তের মতন, দেহ দিয়ে বরণ করতে হবে যাজ্ঞিক বা পূজারীর মতন? প্রেমল প্রায়ই বলে—the proof of the pudding lies in the eating: বিগ্রহকে ধূপদীপ জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে ফুলচন্দনে সাজিয়ে পুজো করলে যদি ঠাকুর তার মধ্যে জেগে উঠে দর্শন দেন তবে তারপরে আর কী বলবার থাকতে পারে বলো তো?

ললিতা (উৎফুল্ল হ'য়ে): ও মা! তুমিও তো সামান্যি মেয়ে নও!! লুকিয়ে লুকিয়ে বাগ্মীর কাজে লেকচার দেওয়ার দীক্ষা নিলে কবে?

প্রেমল: কী বাজে বকছ? চুপ করো।

ললিতা: চুপ করব কেন? (অসিতকে) দেখ দাদা; তুমি তো কত পেল্লায় সাধু সাধ্বী, গুরু-গুর্বীর সঙ্গে মিশেছ। কত অঘটনই না দেখেছ স্বচক্ষে। কিন্তু এমন জুড়ি আর দেখেছ কি যে, হিন্দু মা হ'ল সাহেব ছেলের গুরু—মৌনব্রতের, আর সাহেব ছেলে হ'ল হিন্দু মার গুরু—কথা ব'লে ফাটিয়ে দেওয়ার ব্রতে? সত্যি মা, তুমি যে বোলচালে আজ বাক্যবিশারদ বাগ্মীকেও হারিয়ে দিলে এজন্যে তোমাকে প্রণাম প্রণাম প্রণাম! (গিয়ে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে) ওর বড় অহঙ্কার হয়েছিল ওর মতন কথা বলতে কেউ পারে না—gift of the gabএ ওর জুড়ি নেই।

(প্রণবকে): তোমাকে বলি নি সেদিন—অতি দর্পে হতা লঙ্কা? (হাততালি দিয়ে) কী বাগ্মী? বলি নি সেদিন—আমাকে ঘড়ি ঘড়ি ধম্‌কে দমিয়ে দিলে সাজা পাবেই পাবে? তাই মা সরলা অবলা হ'য়েও দাদাকে বুঝিয়ে দিলেন দুকথায় যা তুমি দুশো কথায়ও বোঝাতে পারো নি।

মা (ধম্‌কে): তুই থামবি? আমি কথায় দুলালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারি কখনো? না জানি বেদ, না বেদান্ত, না তন্ত্রমন্ত্র, পুরাণ উপনিষদ দর্শন ব্রহ্মসূত্র। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত—আমার দৌড় ঐ গীতা ভাগবত অবধি। তাই তো দুলাল আমাকে বেদ বেদান্ত পড়াচ্ছে—গুরু মুখ্যু হ'লে মান থাকবে কেন!

প্রেমল (উঠে প্রণাম ক'রে): শেম্ মা! শেম্! ঠাট্টা ক'রেও এমন বাণ হানতে আছে। আমি তোমাকে পড়াচ্ছি? ছি ছি! কাল থেকে সব পড়ানো বন্ধ।

মা (সস্নেহে): সত্যি, তোর কাছে আমি কি কম শিখেছি রে! তোর নিষ্ঠা, ভক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, সবার ওপর এমন নির্মল চরিত্র—বালব্রহ্মচারী—

প্রেমল: মা, আমি চ'লে যাব কিন্তু সুরথদার কাছে। থাকবে তুমি তোমার আশ্রম নিয়ে একলাটি।

মা: না রে না। ঠাট্টাও বুঝিস না।

প্রেমল: না মা, গুরুকে নিয়ে ঠাট্টা—আমি শুধু যে বুঝি না তাই না, বুঝতে চাইও না। মনু কি বলেন নি "নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ"—শিষ্যের আসন সর্বদাই গুরুর আসনের নিচে পাততে হবে।

প্রণব (বাধা দিয়ে): ভাই, এখন এ-তর্ক ধামাচাপা দাও—গুরু বড় না শিষ্য বড়। মন্দিরে ঠাকুর অপেক্ষা করছেন, আরতির সময় হ'ল।

মা: ঠিক ঠিক। যা—আজ পঞ্চপ্রদীপে আরতি করিস।

ললিতা: কেন মা? জন্মাষ্টমী তো কাল।

মা: হোক। ঠাকুর চাইলেন আজ পঞ্চপ্রদীপের আরতি।

অসিত (চম্‌কে): কখন চাইলেন মা?

মা (একটু চুপ ক'রে থেকে): তোমার গান শেষ হবার একটু পরেই। আর বললেন কোত্থেকে জান বাবা? বিগ্রহ থেকেই। তাই তো আমি বলি বাবা, যে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'লে তার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর যে নরলীলা করেন সে-লীলা কোনো নিরাকার লীলার চেয়েই কম যায় না। (প্রেমলকে) তুই বল না ওকে শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে কী দেখেছিলি? না—বল্ তুই। আমি বলছি—বলার দরকার আছে। ও বুঝবে এখন।

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে): অগত্যা। শোনো।

গত বৎসর আমি গিয়েছিলাম দক্ষিণে কয়েকটি মন্দিরে ধ্যান করতে—মা-ই বলেছিলেন যেতে। হ্যাঁ, আর গিয়েছিলাম তিরুভন্নামালাইয়ে রমণ আশ্রমে।

অসিত: রমণ মহর্ষিকে তুমি দেখেছ? আহা, আমার তাঁকে যে কী ভালো লেগেছিল!

ললিতা: তুমিও দেখেছ? ঐ দেখ মা, (কাঁদুনী সুরে) কেবল আমিই দেখতে পেলাম না।

মা: পাবি রে পাবি—সময় হ'লেই। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে দুলাল, বলো শ্রীরঙ্গমের কথা।

প্রেমল (অসিতকে): সে কী বলব ভাই? ভাষায় তার বর্ণনা হয় না, হ'তে পারে না। তবু বলি যতটা পারি—মা যখন বলতে বলছেন।

মন্দিরে শ্রীনাথকে প্রণাম করতে গিয়ে মন্দিরে ঢুকেই

কেমন যেন ভাব লেগে গেল। ঠিক এরকম অনুভূতি আমার আগে কখনো হয় নি কোনো মন্দিরে বা তীর্থে। তারপর বিহ্বল হ'য়ে বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গ হতেই ঘোর মতন এল। দেখলাম···সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য··· (গাঢ়কণ্ঠে) সে···সে এক বিশাল সমুদ্র···কিন্তু জলের তো নয়···শুধু আলো আর আলোর ঢেউ। অথচ তরল আলো, ঠিক জল নয়। ভাগবতে আছে না নারায়ণ জলে শয়ান ছিলেন যোগনিদ্রায়। সেই জলই হয়ত··· কে জানে? জল থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। তাই "আপো নারায়ণঃ" বলেছেন মুনিবর। যাক্

তারপর···তারপর···কালের প্রবাহ যেন থেমে গেল। সে কী নিশ্চুপ—কী বলব ভাই? আমার মধ্যেও সব স্থির···শুধু শান্তি আর শান্তি। বাইরের সমুদ্র আর ভিতরের সমুদ্র একাকার হ'য়ে গেছে শান্তিরসে। এমন সময়ে হঠাৎ সে আলো নীল রঙে রঙিয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে প্রতি নীল ঢেউয়ের চূড়ায় এক একটি শ্বেত পদ্ম ফুটে উঠল···যেদিকে চাই সেদিকেই শ্বেত পদ্ম! আর প্রতিটি পদ্মে অভ্যুদয় হ'ল কৃষ্ণরাধার যুগল মূর্তি—রাধা হাসছেন হাসি, কৃষ্ণ বাজাচ্ছেন বাঁশি। অসিত! অসিত! কী বলব সে কেমন হাসি, কেমন বাঁশি!···আকাশে বাতাসে কাঁপছে কেবল ঠাকুরের বাঁশির ঝঙ্কার—তার সঙ্গে জলছে ঠাকুরাণীর হাসির আলো। আর···আর···বাঁশির প্রতি রেশে আনন্দ, হাসির প্রতি রোলে স্বপ্নের মিড়—কিসের স্বপ্ন কে বলবে!···সে··· সে···

কথার রেশ ওর আপনা আপনিই মিলিয়ে যায়···

* * *

সকলে উঠে একে একে প্রণাম করল মা-কে তারপর মন্দিরে গিয়ে বসল ওরা চারজন। মা ব'সে রইলেন তাঁর খাটে একা···ভাবস্থ···

অসিত মন্দিরে বসল প্রেমল ও ললিতার মাঝখানে। প্রণব বসল ওদের পিছনে।

প্রথমে ললিতা ও প্রেমল গাইল:

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন-কিশোরী কিশোরী-পূজন কিশোরী
চরণ সার।
মন মাঝে রাধা বনে রাজে রাধা রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা রাধাময় হ'ল আমি।
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা রাধিকা আরতি
পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধানাথ নাম পেয়েছি অনেক আগে।
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার,
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার।
কহিতে কহিতে রসিক নাগর তিতল নয়ন জলে
চণ্ডিদাস কহে নবীনা কিশোরী বন্ধুরে করিল কোলে।

যেন শুনতে শুনতে অসিতের বুকে একটু একটু ক'রে ভক্তি জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে মন্দিরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব। কিন্তু দেখতে পায় না তবু কী এক অ'নর্দেয় শান্তিতে ওর মন ছেয়ে যায়। মনে হয় প্রথম যে, মন্দিরের সার্থকতা আছে। প্রেমলের একটি কথা মনে প'ড়ে যায়—বলত ও প্রায়ই বৃন্দাবনে—যে, যে-মন্দিরের বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে-মন্দিরে ঠাকুরের করুণা উচ্ছল হ'য়ে ওঠেই ওঠে—যারাই শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে আসে তারাই কিছু না কিছু পাথেয় পায় সে করুণা থেকে। প্রেমল উপমা দিয়েছিল বৈদ্যুতিক ডাইনামোর—করুণার এই উৎসযন্ত্র থেকে যেন আনন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে—কেবল যারা অবিশ্বাসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে (insulated) থাকে তারা পায় না এ-বিদ্যুতের স্পর্শ। "এই জন্যেই"—বলেছিল প্রেমল—"বুদ্ধির হাজার দীপ্তি থাকলেও সরল বিশ্বাসের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করতে পারে না ধর্মের পূজাঙ্গনে।" অসিত বলেছিল: "কিন্তু যা যা বিশ্বাস করা অনুচিত তাতে তো ক্ষতিও হয়?" উত্তরে প্রেমল বলেছিল: "ভাই, যা বিশ্বাস করা অনুচিত তাকে বিশ্বাস করলে যত ক্ষতি হয় তার দশগুণ ক্ষতি হয় যা বিশ্বাস করা উচিত তাকে অবিশ্বাস করলে।" উক্তিটি উদ্ধৃত করার মতন। ললিতা মিথ্যা বলে নি: প্রেমল শুধু ভক্তিসাধনায়ই নয় ভাষার সাধনায়ও সিদ্ধ হয়েছে। নইলে ওর কথায় অবিশ্বাসীদের হৃদয়ও দুলে উঠত না। "অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেও, ভাই বিশ্বাসী হয়ে দাঁড়ায় ওর কাছে আসতে না আসতে—এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি—" বলেছিল প্রণব। এম্নি কত কথাই ওর মনে আসে ভিড় ক'রে! অসিত কেমন যেন শিউরে

ওঠে ভাবতে যে, সে এমন পরম ভাগবতের স্নেহ পেয়েছে! প্রেমলের ভক্তিকোমল দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে, ওর মনে আবেশ জেগে ওঠে। মনে মনে ও ভাবে প্রণাম করে।

তারপর ললিতা বলল: "এবার তোমার গানের পালা দাদা! মন দিয়ে গেও কিন্তু—পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েছি যখন।"

অসিত: কী গাইব?

প্রেমল: একটি মীরাভজন—নৃত্যসঙ্গীত। কাল জন্মাষ্টমী তার সূচনা হোক আনন্দে।

ললিতা: না না, হিন্দি আমি ভালো বুঝি না—তুমি মীরার সেই নাচের গানটির বাংলা অনুবাদ গাও না।

প্রণব (হেসে): চমৎকার নির্দেশ বটে। কোন্‌টি?

ললিতা: দাদা জানে। সেই "নেচে গেয়ে আজ"—যেটি বৃন্দাবনে আমাকে শিখিয়েছিলে।

অসিত: আচ্ছা (ব'লে ধরে):

নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসার।
চাই না সে বিনা আর কারে—জানি প্রিয়তম শুধু তার॥
কলঙ্ক হ'ল সিঁথির সিঁদুর, মাথার মণি শোভার।
মোহশৃঙ্খলা হ'ল কিঙ্কিনি—পায়ে পায়ে ঝঙ্কার!

তার ভরে সয় সকলি—হারায়ে সকলি জিনিব তারে।
নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসারে॥
এ-ভবার্ণবে জীবন তরণী, প্রণয় কর্ণধার।
বঁধুয়ার বিরহিণী চাইবে না কারো পানে ফিরে আর।
তুফানেরো সাথে খেলিব, উধাও ঢেউ সাথে গাহিবারে!
নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসারে॥
বিঁধিলে কাঁটা সে-রক্তে আঁকিব চিহ্ন পথে আমার,
দেখি' যারে পরে প্রতি বিরহিণী দিশা পাবে পথে তার।
ভালোবেসে তারে আনিব টানিয়া, আড়াল মানিব না রে!
নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসারে॥

চোখ বুঁজে গাইতে গাইতে আবেশ জেগে ওঠে অসিতের বুকে। হঠাৎ মনে হয় যেন ঘরের ডান কোণে অতি মধুর নূপুরের ধ্বনি বাজছে গানের সঙ্গতে! চোখ চেয়ে দেখে…কই কোথাও কিছু নেই! ফের গান ধরে—

মোহ শৃঙ্খলও হয় কিঙ্কিণি—পায়ে পায়ে ঝঙ্কার…ঐ আবার সেই নূপুর বেজে ওঠে! আবার তাকাতেই বাঁ পাশে ললিতার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। দেখে ললিতাও তাকাচ্ছে সেই কোণে, প্রেমলও। কী ব্যাপার? ওর মনে কৌতূহল গাঢ় হ'য়ে ওঠে।

গান শেষ হ'তে অসিত বলে প্রেমলকে: "ভাই, একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে আজ।"

প্রেমল (হেসে): ঐ কোণে?

অসিত (আশ্চর্য): তুমিও শুনেছ?

ললিতা: বাপী বলবে ভেবেছ? না-ই বলুক। শুধু কি ও-ই শুনতে পারে না কি? (সগর্বে) আমিও শুনেছি। আর আমি বলবই বলব। হ্যাঁ দাদা, শুনেছি, শুনেছি শুনেছি ঐ কোণে ঠাকুরের নূপুর বেজে উঠল। আর সেই সঙ্গে নীল আলো—ঐ একই কোণে।

অসিত (প্রেমলকে): তুমিও শুনেছ?

প্রেমল: না। তবে দেখেছি।

অসিত: কী?

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে): ললিতা যা বলল ‥ নীল আলো।

ললিতা: তুমি দেখ নি দাদা?

অসিত: না, আমি শুধু শুনলাম—যেন নূপুর বাজছে। মনে হ'ল—ভুল শুনছি হয়ত…

প্রেমল: অসিত, অসিত, অসিত! এখনো সংশয়! আদালতেও যে corroborative evidence-কে জজ জুরি উকীল সাক্ষী সবাই মানে। কেবল তুমিই… (ললিতাকে) যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে?

(ক্রমশঃ

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষোড়শ মন্ত্র (১।১।১৬)।

মন্ত্র—তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাহয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥

অর্থ—(পূর্ব মন্ত্রে শেষ পংক্তিতে কথিত) মহাত্মা যম নচিকেতার শিষ্যযোগ্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই বিষয়ে অদ্য আমি তোমাকে আর এক বর দিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে পরিচিত হইবে। আর এই বিচিত্র শব্দ বিশিষ্ট রত্নমালা গ্রহণ কর।"

ব্যাখ্যা—যম নচিকেতাকে অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্তির যজ্ঞ শিক্ষা দিয়া এমনই তৃপ্তি লাভ করিলেন যে এই যজ্ঞকে নাচিকেত-অগ্নি নামে অভিহিত করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন এবং তাহার গলায় বর মাল্য প্রদান করিয়া উপযুক্ত শিষ্যকে যোগ্যতম সাদর সম্ভাষণে অভিষিক্ত করিলেন। সে মালা উৎকৃষ্ট মালা, তাহার, তুলনা হয় না। সে মালা শব্দময়ী ও রত্নময়ী। তাহা শিক্ষাপ্রদ ও গলায় ধারণ করিলে সে শিক্ষা অক্ষয় সম্পদ হয়।

"রত্নময়ী" বলিতে মনে হয় ইহাতে কয়েক প্রকার রত্ন খচিত ছিল। রত্নের গুণ অনেক। বিশেষ বিশেষ রত্ন বিশেষ বিশেষ ব্যাধির রক্ষাকবচ রূপে ধারণ করিলে, উপকার দেখা গিয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাদের প্রভাব কিরূপ ? এক কথায় উপনিষদে তাহা কয়েকস্থলে "ধাতুপ্রসাদ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (শ্বেতা উপ, ৩।২০ ও কঠ উপ, ১।২।২০ দ্রষ্টব্য)। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই তিনটি ধাতুকে অবিমিশ্রি ধাতু বলা হয় এবং এই তিনটি ধাতুর প্রসাদ শিষ্যত্বের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তাম্রপাত্রে যাহা রক্ষিত হয়, তাহাতে বহুকাল পর্যন্ত পোকা ধরে না। যেমন তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল রাখিলে তাহা অন্ততঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত নির্মল ও শুদ্ধ থাকে। সেইরূপ যে শিষ্যের অন্তরে তাম্রপাত্রের গুণ আছে, তাহার স্মৃতি ও ধারণা শক্তি অটুট থাকে। রৌপ্য আধার, চাঁদের মত, আচার্য্যের শিক্ষার কিরণ স্বীয় অন্তরে ধারণ পূর্বক তাহা বিকীরণ করিতে সমর্থ হয়, যাহা তাম্রপাত্র সক্ষম নহে। সোনার খনির মত উজ্জ্বল যাহার অন্তর, তাঁহার আর আচার্য্যের প্রয়োজন হয় না, সে সাধক সূর্য্যের মত জগৎময় আলোক বিস্তার করিয়া নিজেই আচার্য হইয়া যা'ন। প্রকৃত সাধকের পক্ষে এই তিন গুণ বিশিষ্ট রত্ন খচিত মালা ধারণ করিলে, যখন যে ভাবে কাজ পাওয়া যায়, সেই ভাবে জীবন যাপন করা যায়, ও পূর্ণ শিষ্যত্ব অর্জন করা হয়। যম নচিকেতাকে সেই পূর্ণ শিষ্যত্বের পদে অভিনন্দিত করিলেন।

আবার মালাটি যে "শব্দময়ী" তাহাও বলা হইল। বুকের মধ্যে যখন যে প্রশ্ন উঠিবে, এই মালার পরশে, তাহার উত্তর অন্তরে তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হইবে। "শব্দব্রহ্ম" কথাটি আমাদের শাস্ত্রের পুরাতন বাণী। যখনই বুকের মধ্যে "ধ্বনি" শোনা যায়, বুঝিতে হয় সে শব্দ ব্রহ্মের আগমনের বার্তা, অতএব ব্রহ্মেরই অংশ, যেমন আকাশই কেবলমাত্র শব্দ বহন করিতে সক্ষম। আকাশই শব্দের আধার, কাজেই ভিতরে ধ্বনি শুনিলেই ব্রহ্মের উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে হয়। নচিকেতাকে যম যে মালা দিলেন, তাহা সত্যই অপরূপ, একেবারে পূর্ণ শিষ্যত্ব এবং পরব্রহ্মরূপ পরম গুরুর জীবন্ত সান্নিধ্য তাঁহার সর্বদা নির্ভরস্থল হইল। এইখানেই কঠোপনিষদ শেষ হইতে পারিত এবং শেষ হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু পরব্রহ্ম যখন সাক্ষাৎ গুরু হইলেন, তখন তাঁহার কাছেই পূর্ণ নির্ভর বিধেয়। তিনি যে পথে লইয়া যা'ন। নচিকেতার বুকে আরও কত প্রশ্ন আছে, তাহারও উত্তর শুনিতে পাইব।

সপ্তদশ মন্ত্র (১।১।১৭)

মন্ত্র—ত্রিনাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং

ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

অর্থ—(পঞ্চদশ মন্ত্রে যেমন জীবন যজ্ঞের বর্ণনা ইঙ্গিতের মত বলা হইয়াছে তাহা সাধক অন্তরে সুস্পষ্ট হইলেও যে মারাত্মক পরিণামে লইয়া যাইতে পারে, তাহা সেখানে ব্যাখ্যার শেষ ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই-জীবন-যজ্ঞ কেমন করিয়া সাধক ক্রমশঃ পালন করিয়া সার্থকতা মণ্ডিত হইতে পারেন তাহা বলা হইতেছে :— যিনি মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই তিন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদের অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যেকের সহিত একযোগে (সব সমেত তিনবার) অগ্নি চয়ন করেন এবং যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিন কর্ম্মের সাধন করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং পূজনীয় ব্রহ্মজজ্ঞ দেবকে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং সমুদায় বস্তু জানেন সেই অগ্নিদেবকে জানিয়া এবং দর্শন করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—পঞ্চদশ মন্ত্রে কথিত "ইষ্টক" নির্ম্মাণ ও এমন কি "ইষ্ট" পর্য্যন্ত জীবনের প্রারম্ভে বুঝা কঠিন হয়। তখন পরে পরে প্রত্যেক মানুষের জীবনে তিনটি পথ প্রদর্শকের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা এ বিষয়ে তাহাকে আপনার জানিয়া সচেষ্ট রাখেন। তাঁহারা হলেন, মাতা, পিতা ও আচার্য্য। (স্ত্রীলোকের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে স্বামীকে আচার্য্য বলিয়া গণ্য করা হয়, যেমন পুরুষ সাধকের জীবনে স্ত্রীকে পথনির্দ্দেশক রূপে পাওয়া যায়। মহাকবি তুলসীদাস, পরমহংস রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মানব আদর্শকে সেইজন্য সহধর্ম্মিণীর পূজা ও সেবা করিতে দেখা যায়)। শৈশবে মাতার নিকট তপস্যা বা তপোযজ্ঞ তাঁহার অনুকরণে শিশুর স্বভাবে সজাগ হয়। পরে পিতার অনুসরণ করিয়া বাল্য হইতেই তাঁহার আদর্শ মত জীবন অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক স্বাধ্যায়ের পথ জানিয়া জ্ঞান যজ্ঞের অধিকারী হইবার স্বপ্ন দেখা দেয়। শেষে আচার্য্যের আনুকূল্যে আত্মদানের উন্মুখ পথ আবিষ্কার করিয়া দ্বিজ শিষ্য যাগ যজ্ঞে অপ্রমত্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে (গীতার ভাষায়, ১৮।৫ ও ৪।২৮ দ্রষ্টব্য) তপস্যা, যজ্ঞ ও দান মানবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জীবনই অমৃতের সোপান। তখন বুদ্ধিতত্ত্বে মানুষ অধিষ্ঠিত হইয়া, বুদ্ধিকে অগ্নিস্বরূপ জানিয়া (ইহাই গীতায় উক্ত মনীষীর ধর্ম্ম), অগ্নিকে সহায়ক পান। অগ্নির আর একটি নাম "জাতবেদা"। তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করেন, সব কিছু আত্মসাৎ করিয়া জানিতে থাকেন। তাই মানুষ "অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা" লইতে চায়। ক্রমে মন্ত্রসিদ্ধ হইলে শিষ্য যে "সর্ব্বজ্ঞ পূজনীয় ও জ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন" জাতবেদাকে অবগত হন ও তাঁহাকে আত্মস্বরূপে (ধ্যানের পথে) উপলব্ধি করিয়া সবিশেষ রূপে শান্তি পান, তাহার ভরসা যমরাজ এখানে দিতেছেন।

এই অবস্থায় শিষ্য সমাবর্ত্তন (convocation) উৎসবে, গুরুগৃহ হইতে নিজ আলয়ে ফিরিবার উদ্যোগ পর্ব্বে, আচার্য্যের নিকট আশীর্ব্বাদ পান, "মাতৃদেবঃ ভব, পিতৃদেবঃ ভব, আচার্য্যদেবঃ ভব, অতিথিদেবঃ ভবঃ" (তৈত্তি উপ, ১।১১।২) অর্থাৎ মাতা দেবত যাহার, পিতা-দেবতাযোহ আচার্য্য দেবতা যাহার, অতিথি দেবতা যাহার, সেইরূপহও। তখন পরিপূর্ণ জীবনের সমগ্র মানচিত্র শিষ্যের মানস নয়নে উদ্ভাসিত হয় ও তাহা ভুলিবার নয়। শেষ কথাটি অতিথিদেবঃ ভব" কেন নচিকেতাকে জানান হইল না? এখানে নচিকেতা এখনও স্বয়ং অতিথি (নূতন শিষ্য) ও তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে যমরাজ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই উপনিষদে বারবার উক্ত হইল যে ইহার শিক্ষা ও দীক্ষা কেবলমাত্র গুরু শিষ্যের পরম্পরায় লাভ হয় না। আচার্য্য স্থানীয় যাঁহারা, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ থাকিলে, মানুষ নিজ অন্তরেই ইহা আপনা হইতে, জাতবেদার অনুকম্পায়, লাভ করেন (উপরে ১৪ মন্ত্র ও পরে ১।২।৯ দ্রষ্টব্য)। তাই এই বিদ্যা প্রদানের সময় নচিকেতাকে গুরু হইলে পর নিষ্প্রাণ হইতে বলার আবশ্যক হইল না। তবে সাধারণতঃ সনাতন ধর্ম্মের সকল শিক্ষাই গুরু ও শিষ্যের পরম্পরায় ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। সেইজন্য সে-কালের আচার্য্যগণ শিষ্যকে (অতিথি) যেমন দেবতা-জ্ঞানে সেবা করিবেন, শিষ্য সেইরূপ নিজ জীবনে গুরু হইলে পর, সেই মত আদর্শ পালন পূর্ব্বক "অতিথিদেবঃ এই মন্ত্রের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, তাহার দাবী

পূর্ব্ব হইতেই করা হইত।

মন্ত্র— অষ্টাদশ মন্ত্র (১।১।১৮)।

ত্রিনাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

অর্থ—তিনবার অগ্নিচয়নকারী যে জ্ঞানী ব্যক্তি এ তিন বিষয়—যে প্রকার ও যত সংখ্যক ইষ্টক অগ্নিচয়নে আবশ্যক (১৫ মন্ত্র দেখুন) এবং যে প্রকারে অগ্নিচয়ন করিতে হয় (১৭ মন্ত্র দেখুন)—জানিয়া অগ্নিচয়ন করেন, তিনি শরীরপাতের পূর্ব্বেই মৃত্যুবন্ধন সমূহ অর্থাৎ "অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বেষ" প্রভৃতি ছেদন পূর্ব্বক শোকাতীত হইয়া স্বর্গলোকে প্রমোদ করেন।

ব্যাখ্যা—এখানে বলা হইতেছে যে নাচিকেত নামক জীবনযজ্ঞে তিনবার আত্মনিবেদন করিতে হইবে। একবার মাতার সাহায্যে, আর একবার পিতার আনুকূল্যে এবং তৃতীয়বার আচার্য্যের সংযোগে। মনে রাখিতে হয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইলে দুইটি কাষ্ঠের সংঘাতে তাহা সম্পন্ন হয়। সেইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনে নিজসত্তায় আর একটি সত্তা শ্রদ্ধার সহিত সংযুক্ত হইতে থাকিলে ঘর্ষণ হইবে, নিজ বাস্তবজীবন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির আদর্শ জীবনের সংস্পর্শ হইতে যে চেতনা নিজসত্তায় জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা ধৃতি দ্বারা ধরিয়া থাকিলে স্থায়ী হয়। এক পথ প্রদর্শকের প্রভাব যদি ফুরাইয়া আসে, আর একজনের শক্তি আসিয়া সহকারী হয় ও এইরূপে মাতা পিতা ও আচার্য্যের জীবন-ব্যাপী করুণা নিজ জীবনে অক্ষুন্ন থাকিলে শিষ্যের জীবনে বারবার অগ্নিচয়ন হেতু পূর্ণযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে থাকে ও সেই হোমানলে আত্মদান করিতে হয়। যতই জ্বলিবে, ততই সামর্থ্য পাইবে, শিষ্যের অধর্ম্ম ঘুচিবে, আধ্যাত্মজ্ঞান বাড়িবে ও সকল প্রকার আসক্তি দূর হইবে। তখন আর সে কিসের আকর্ষণে পুনরাবর্তন করিবে? যজ্ঞ যতই আনুষ্ঠানিকভাবে বাহ্যজীবনে নিষ্পন্ন হইতে থাকিবে, ততই অন্তরে ভাবগত জীবনে স্বপ্রকাশ হইবে ও ক্রমে জীবনের অষ্টপাশ খসিতে থাকিবে। পাশমোচন হইতে থাকিলে, যম আর কিসের সাহায্যে মানুষকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে? মানুষ ত নিজের ফাঁস নিজেই সারাজীবন প্রস্তুত করে। তাহা যখন আর হইবে না, জীবিত অবস্থায় মানুষ যখন নিজ হাতে গড়া নিগড় হইতে অব্যাহতি পায়, তখন মরণ তাহাকে কোন পাশ দিয়া বাঁধিবে? সেত জীবনমুক্ত হইল, "অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য অমৃতাঃ ভবন্তি" (কেন উপ, ১।২) অর্থাৎ সেত এই জীবনেই নিবৃত্ত হইয়া, বিদেহমুক্ত হইবার প্রতীক্ষায়, অমৃত হইয়া যায়। তখন ত অনন্ত স্বর্গলোকের বিরাম চিরন্তন এইখান হইতেই পাওয়ার সূচনা হয়। ইহা ইহলোকের আমোদের মত নহে, তবে নিজের মধ্যে প্রমোদ বলা চলে। ইহাকে বৈষ্ণব প্রার্থিত বৈকুণ্ঠের লীলা আখ্যা দেওয়া যায়। যে লীলার পূর্ব্বাভাষ ভাগবতে কথিত অজামিলের উপাখ্যানে বর্ণিত পাই।

এই প্রকার সাধকদের শরীরপাত হইলে সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ হয় ও সূক্ষ্মদেহ আর সঙ্গী থাকে না বলিয়া অনন্ত স্বর্গবাসের সুবিধা হয়। স্বর্গে শাশ্বত ও সনাতন অবস্থায় "শান্তি নিরাময় ও কান্তি সুনন্দন" লাভ করিয়া সাধক অমৃত হইয়া যান। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, কে অমৃত হইয়া যান? সাধকের স্থূল শরীর গেল, সূক্ষ্মদেহ ও লয় হইয়া গেল, তবে আর রহিল কি? যিনি কারণস্বরূপ, যাঁহাকে আত্মা নামে অভিহিত করা হয়, তিনি থাকেন কিনা, এইবার তাহাই জিজ্ঞাস্য। আমাদের মনে যখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে, তখন নচিকেতার অন্তরেও ইহা উঠিবে এবং যমরাজ কি সে প্রশ্নের সমাধানের সুযোগ দিবেন না? যমরাজ কিরূপ আশা দেন, তাহা পরের মন্ত্রে জানিতে পারি।

উনবিংশতি মন্ত্র (১।১।১৯)।

মন্ত্র— এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতং অগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস—
স্তৃতীয়ং বরং নাচিকেতো বৃণীষ্ব॥

অর্থ—(যম বলিতেছেন:—) "হে নচিকেতা, তুমি তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সেই অগ্নিবিষয়ক বরই তোমায় প্রদান করিলাম। লোকে তোমারই নামে এই অগ্নিকে অভিহিত করিবে। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।"

ব্যাখ্যা—আমরা যমের নিকট এই সুযোগেই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এবার নচিকেতা কি চান, তাহা শুনিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

গল্প

জীবনের দুই তীরে

শিবপ্রসাদ সরকার

মেন ষ্টেশনে একটা বেঞ্চে বসে মনোজ বিশ্রাম করছিল, পাশেই রেখেছিল সে তার বইয়ের পোঁটলাটা। বই বিক্রী করাটাই তার পেশা। সারাদিন ট্রেনে ঘোরে। নানা রকমের বই,—লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী, মনসামঙ্গল, মেয়েদের ব্রতকথা, নিত্যকর্মপদ্ধতি এই রকম আরও কত কি। বছর দশেক হল এই কাজ করছে সে। স্বাধীন কাজ বটে কিন্তু খুবই কষ্ট করতে হয়, আগে আগে মনোজ খুব দৌড়ঝাপ করতে পারত, তখন বয়স আরও একটু কম ছিল ত; এখন একটু ছুটোছুটি করলেই বুকের মধ্যে কেমন হাঁপ ধরে। একটু বিশ্রাম না করে পারে না।

একটু আগেই পাটানকোট এক্সপ্রেস ট্রেনটা যখন দাঁড়িয়েছিল তখন সে গাড়ীর মধ্যে উঠে চীৎকার করে বলছিল:

“মাননীয়গণ, এই লাইনে আমি নতুন নয়, আজ দশ-বছর ধরে আমি বই বিক্রী করছি, বইগুলো সব ঘরেই কাজে লাগে, একবার বাজার যাচাই করে দেখবেন, দামে কত সস্তা, হাতে করে দেখতে পারেন দরকার হলে ডাক দিয়ে চেয়ে নেবেন” ইত্যাদি। এ সব কথাগুলো ওর মুখস্থ, একই ভাবে একই সুরে প্রত্যেক ট্রেনেই বলে বেড়ায়। অনেক হাঁকাহাঁকির পর আজ সকাল থেকে মাত্র দুখানা বই সে বিক্রী করেছে। কত আর লাভ হবে, মাত্র আনা ছয়েক বড় জোর, তাতে কিই বা হয়, নাঃ, বাজার বড্ডই খারাপ হয়ে গেছে। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা এ সবেরই যোগাড় করতে লোকের প্রাণান্ত হচ্ছে, বই-টই কেনার সখ মরে গেছে। নেহাৎ পেটের খোরাক ছাড়া লোকে একটুও অন্য খরচ করতে চায় না। যাই হোক সে সারাদিন এই রকম খেটে যা সামান্য রোজগার করে তাতে কোনরকমে তার সংসারটা চলে যায়। তাতেই সে খুশী। আর তার আছেই বা কে। নিজে বিয়ে যা করেনি, এক বিধবা দিদি আর ছোট একটা ভাই। ভাইয়ের পড়ার খরচটাই যা একটু বেশী।

একটু আগেও প্ল্যাটফরমটা লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। এখন আর সেটা বোঝবার উপায় নেই। প্রায় জনশূন্য বললেই হয়। কেবল মাত্র দূরে কয়েকজন ষ্টেশন-স্টাফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছে। আর এধারে একজন ভেণ্ডার তার ফলের গাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে একমনে। মনোজ বেঞ্চে বসেই দেখল ওর পরিচিত অনেক লোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অফিস যাচ্ছে; ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আবার ট্রাম বাস ধরতে হবে অনেককে। এখন সাড়ে দশটা। সত্যিই আজ ওই লোকগুলোর অফিসের বেশ দেরী হয়ে গেছে। অফিসের দেরী, কৈফিয়ৎ আর রেডমার্কের ভীতির সঙ্গে সে নিজেও একদিন পরিচিত ছিল। অবশ্য এখন ওর অফিসের অনেক জানাশুনো লোকও ওর সঙ্গে কথা বলেনা, দু' একজন ভাল লোক ছাড়া, হয়ত ফেরীওলার সঙ্গে কথা বললে সম্ভ্রম নষ্ট হয় তাই। তা না হলে এইত একটু আগে তাদেরই অফিসের পিওন যজ্ঞেশ্বর ওর সামনে দিয়ে গেল। আগে নমস্কার করত দু'বেলা, এখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। এমন ভাব দেখাল যেন সে চেনেই না ওকে। আশ্চর্য্য, কতদিন কত টাকাপয়সা দিয়ে এই যজ্ঞেশ্বরকে সে সাহায্য করেছে, কত সময় কত উপকার করেছে তার, আজ সব যেন সে ভুলে গেছে!

বহুদিনের বহু পুরাতন সুখ দুঃখভরা কাহিনীকে বুকে নিয়ে আছে ওদের সেই পাহাড়ের মত বিরাট অফিস বাড়ীটা, এখান থেকে মাইল খানেক দূরে হবে। সেখানে মনোজ চাকরী করত, কেরানীর কাজ। দু' একদিন নয়

একটানা পনের বছর কাজ করবার পর চাকরী তার শেষ হয়ে যায়। বেশী দিনের কথা নয়, এই ত বছর দশেক হল। কথাটা মনে পড়লে আজও কেমন যেন দুঃখ হয় তার। নকল সভ্যতায় গড়া এই বিরাট শহরের মুখোস-পরা মানুষগুলোর ভেতর-মুখ কদর্যরূপে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে; নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার মতই মানুষের একটু সহানুভূতিও চরম মূল্য দিয়ে কিনতে হয় এখানে—এমনই আশ্চর্য এই সভ্যযুগের ধর্ম। ভাবতেও ঘৃণা হয় মনোজের। ওদের অফিসে কি একটা কাজে সেদিনও গিয়েছিল মনোজ। একতলার সেই বড় বড় ঘরগুলোয় কেরানী, টাইপিষ্ট, পিওন সব আগের মতই কর্মব্যস্ত থাকতে দেখল। মনোজ আশ্চর্য হয়ে ভাবে এ এক বিচিত্র জগৎ। কত বিভিন্ন জায়গা থেকে কত বিভিন্ন চরিত্রের লোক এখানে আসে, একসঙ্গে কাজ করে, কত হাসি গল্প ঠাট্টাতামাসায় দিনের পর দিন কাটায়; কত সুখদুঃখের হিসাব নিকাশ আর মীমাংসা হয় এখান থেকেই। অথচ আশ্চর্য এই বিরাট সমষ্টির মধ্য থেকে কেউ যখন চলে যায়—যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর মধ্যে মৃত সৈনিকটির মতোই কেউ আর তার খোঁজ করেনা, ফেলেনা দু ফোঁটা চোখের জল তার কথা স্মরণ করে। এ জগৎ তার আপন পথ ধরে নীরবে চলে যায়।

দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির সামনে বড় সাহেবের ঘর। সেই ঘরের সামনে নেমপ্লেটের তলায় উর্দিপরা চাপরাশী মহান্তি ভারিকিচালে এখনও বসে থাকে সব সময়। চাপরাশী মহলে মহান্তির কদর ভয়ানক; এক কথায় চাপরাশীদের মধ্যে তাকে কুলীন বলা চলে। মানে খোদ বড় সাহেবের চাপরাশী কিনা তাই। ওকে কেরানীরাও সমীহ করে চলে। সুদে টাকা খাটায় কিনা তাই মাসের শেষে অনেক কোটপ্যাণ্টধারীদের চুপি চুপ ওর কাছে গিয়ে হাত পাততে হয় নইলে তাদের সংসার চলে না। ওরই সৌজন্যে সাহেবকে দিয়ে দরকারী কাগজপত্রের সই সাবুদ নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই করিয়ে নিতে পারা যায়। তা ছাড়া কাগজপত্র নিয়ে বড় সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো, কৈফিয়ৎ এসবও কখনও কখনও এড়ানো যায় বৈ কি! মহান্তি তাই নিজেকে মুরুব্বি আর বিজ্ঞ ভাবে।

আরও দু'চারটে ঘর পেরিয়ে এসে এষ্টাব্লিশমেণ্ট সেকশন। মনোজের বিশেষ বন্ধু সুধীরবাবু একটা ফাইল হাতে করে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে দেখতে পায় মনোজ। অদ্ভুত এই মানুষটি! নিজের হাতে কাজ না থাকলেও ফাইল হাতে ব্যস্ত ভাবে ছুটোছুটি করা তার একটা নেশার মত। হাতে কোন কেস ডিল করবার মতো না থাকলেও তাকে বিভিন্ন অফিসার-দের ঘরে এমন কি চীফ ক্লার্ক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছেও কিছুক্ষণ ধরে খামোকা গল্প করতে প্রায়ই দেখা যায়। সুধীরবাবুর কাছে পানের একটা কৌটো থাকে সব সময়। ঠিক কৌটো বললে ভুল হবে। সেরটাক ঘি কিংবা গুড় ধরে এমন একটা বিরাট পাত্র। অফিসে আসবার সময় দোকান থেকে কিনে আনে ডজন তিনেক সাজা পান। তার মধ্যে কোনটা সাদা, কোনটা মিষ্টি সুপারী দেওয়া আবার কোনটা জর্দা বা গুণ্ডি মেশানো। কে কোনটা খায় সুধীরবাবুর মুখস্থ ছিল। একদিন সে মনোজের কাছে খোলাখুলি বলে ফেলেছিল: "সাহেব আর বড়বাবুদের মন যোগাবার জন্যে এগুলো দরকার হয় ভাই। বোঝনা, বিস্তে ত ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত কবে কোথা থেকে কি ভুলভ্রান্তি হয়ে বিপদে পড়ি···তাই বুঝলে কিনা আগে থেকে এক রকম পূজো দিয়ে রাখা।"

অফিসার আর বড়বাবু মহলে সেই কেনা পানগুলো সারাদিন বিলিয়ে বেড়াত সুধীরবাবু, আজও বিলোয়, আর সকলকে বেমালুম বলে থাকে অফিসে বেরুবার সময় ওর বউ নাকি সেজে দিয়ে থাকে, অথচ মনোজ জানত সুধীর-বাবুর বউ অনেকদিন হল কতকগুলি কাচ্চাবাচ্চা রেখে ওর সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে।

আর একদিন এক মস্ত বড় ছিপ হাতে নিয়ে সুধীরবাবু অফিস ঢুকছে দেখে মনোজ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কৌতুক করে জিজ্ঞেস করেছিল: "ব্যাপার কি হে, এমন যুদ্ধের সাজে তোমায় ত কোনদিন দেখি নি।" সে হাসতে হাসতে বলেছিল: "চক্রবর্তিসাহেব, যিনি আমাদের নতুন এ্যাকাউণ্টস অফিসার হয়ে এখানে বদলী হয়ে এসেছেন, তাঁর শুনেছি মাছ ধরার খুব নেশা। একদিন আমাদের গাঁয়ে ওকে নিয়ে যাব ভেবেছি; তাই আজ ছিপটা কিনে ফেললুম।"

মনোজ অবাক, বলেছিল : "এ সখ ত তোমার দেখিনি কোনদিন বাপু ! আর তা ছাড়া তোমার পুকুরই বা কই ?" সুধীরবাবু জবাব দিল : "পুকুরের বাবস্থা একটা বলে কয়ে করে নেওয়া যাবে'খন। আর সখের কথা বলছো ? সখ কি আর এমনি হয়েছে রে ভাই, সবই কৌপীন কো ওয়াস্তে। গরীব কেরানীদের নিজস্ব—মানে ব্যক্তিগত কোন সখ থাকা উচিত নয়। ওপরওলাদের সখই আমাদের সখ, তাদের আনন্দেই আমাদের আনন্দ। ওরা যে দেবতার মত,—সন্তুষ্ট থাকলে সমস্ত সংসারটা আনন্দময় হয়ে থাকে।"

একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে চীফ ক্লার্কের ঘরটা নজরে পড়ল। অবশ্য ওর সময় যিনি কাজ করতেন তাঁর নাম ছিল ব্রজেনবাবু, এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল মনোজের। বেঁটে কালো হোঁতকা চেহারা। চল্লিশ বছর একটানা চাকরী করবার পর চীফ ক্লার্ক হয়েছিলেন, কিন্তু কি দাপট ছিল তাঁর। কারও একটু আসবার দেরী হল, কে একটু নিজের দরকারে বাইরে গেল, কে একদিন কামাই করল—এই সবের ব্যাপারে ষ্টেপ নেওয়ায় তিনি ছিলেন খুব হুঁসিয়ার,—মানে, যাকে বলে লয়াল টু দি একৃষ্ট্রিম ! অমনি অফিসারের কাছে রিপোর্ট। মানুষের একটু উপকার করতে হলে তাঁর বুকে যেন কাঁটা বিঁধত। পয়সাসংক্রান্ত ব্যাপার হলে ত কথাই নেই, ভাবতেন তাঁর নিজের পকেট থেকেই বোধ হয় দিচ্ছেন। নিজের ছিল বিদ্যের অভাব অথচ মাঝে মাঝে দেখাতেন যেন কতই কাজ বোঝেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল অপরের কাছে কাজ বুঝে নিয়ে তাকেই চোখ পিটপিট করে এমন ধমকাতেন যেন তিনি নিজেই তাকে কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন অথচ সে বুঝছে না ! মনোজের এক বন্ধু সাহিত্যচর্চা করতেন সেটা তিনি কেমন করে জেনেছিলেন আর তাকে একদিন বিদ্রূপ করে বলেছিলেন : "কি হে, ওসব লিখে-টিকে আর কত পাবে, ভাল করে কাজ শেখো ভবিষ্যতে উন্নতি হবে।" পরে ভাগ্যক্রমে কলকাতার এক বিশিষ্ট পত্রিকায় সেই বন্ধুটির একটি উপন্যাস ছাপা হল এবং তিনি হাজারখানেক টাকা সমেত বহু জায়গায় সম্মানিত হলেন। সেই খবরটা বেশ ফলাও করে রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে ওরা ব্রজেনবাবুকে জানিয়ে ছিল। কারণ ব্রজেনবাবুকে না জানালে তিনি এসব খবরের ধার ধারতেন। তিনি শুনে দেঁতো হাসি হেসেছিলেন আর বলেছিলেন : "তা বলে কাজ কর্মগুলোও একটু ভাল করে শিখো বুঝলে।" ওদের এক অফিসারের মেয়েকে বিনা পয়সায় পড়াবার পরামর্শও দিয়েছিলেন সেই সঙ্গে। মনোজ ভাবে এদের মত প্রভুরূপী ভৃত্যগুলো এই সব পোকাধরা ধুলোজমা ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে খাব চাত কচলাতে কচলাতে সমস্ত জীবনটা কেমন করে কাটায় ! এরা জানে না, ভাবতেও শেখেনি যে এই লোভ, নীচতা আর জঘন্য প্রবৃত্তির বাইরে একটা অপূর্ব লীলাময় পৃথিবী আছে আর তারই মধ্যে চিরকালের বুভুক্ষু মানুষের হাসি কান্নার কত করুণ ইতিহাস প্রতিটি মুহূর্তে রচিত হচ্ছে, এরা তার কোন হিসাবই রাখে না, রাখবার প্রয়োজনও মনে করে না। পৃথিবীর কোথায় কোন মানুষের অনাহারে মৃত্যু হল সে খবরটা এদের কাছে অতি তুচ্ছ ; নিজের বাঁচবার চিন্তাতেই এরা সারা জীবন বিভোর !

সেদিন সমস্ত অফিসটা ঘুরে মনোজ যখন নিজের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল তখন তার সেই দিনটার কথা মনে পড়ল যে দিনটা একটা উচ্ছল স্বপ্নময় জীবনকে তমস চ্ছন্ন কালস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে সদর্পে এগিয়ে চলে এসেছে এই উনিশ শো পঁয়ষট্টি সালের শেষপ্রান্তে।

জয়া চাকরী করত মনোজেরই সেকশনে আর ঠিক তারই সামনে বসত সে। ক্ষীণ হয়ে আসা প্রদীপশিখার মত কম্পমান শীর্ণাঙ্গী এক যুবতী। দারিদ্র্যের কালিতে নিস্প্রভ চোখদুটি—তবুও যেন চোখ ফেরানো যায় না এমনি ছিল তার রূপের স্নিগ্ধতা। তার চোখদুটি অনেক লালসাদীপ্ত চোখকে আকর্ষণ করত।

এক সঙ্গে বসে কাজ করার জন্যই বোধ হয় মনোজ জয়ার অনেক খবরই জেনেছিল এবং এটাও বিশেষ করে জেনেছিল যে জয়াদের মতো সঙ্গতিহীন পরিবার কলকাতায় শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী আছে কিনা সন্দেহ। সংসারে বাবা, মা, চারটি ভাই আর তার অবসর প্রাপ্ত বাপের প্রচুর দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অল্পবয়সী জয়া জীবন-তরঙ্গে ক্রমাগত দোল খাচ্ছে দেখে কারও দয়া হোক না হোক মনোজের স্বভাবতই অনুকম্পা জেগেছিল জয়ার ওপর। আর সেই অনুকম্পার বীজ

অঙ্কুরিত হয়ে কবে যে ভালবাসায় পরিণত হয়েছিল তা মনোজ নিজেই জানতে পারেনি। অবশেষে মনোজ ঠিক করেছিল যে কর্মসঙ্গিনী জয়াকেই সে জীবনসঙ্গিনী করবে।

ক'দিন থেকে জয়ার মা জ্বরে ভুগছিল। হঠাৎ বাড়াবাড়ি হওয়ায় জয়ার মাথার ঠিক ছিল না। মাসেরও প্রায় সেদিন মাঝামাঝি, হাতে টাকা পয়সা নেই কিছুই, সংসারই চলছে না। তার ওপর ডাক্তার ওষুধ আর পথ্যের যা প্রেসক্রিপশান করেছেন তাতে অন্তত কুড়ি বাইশ টাকা দরকারত হবেই। কি করবে সে! অফিসে আসতেই হয়, জরুরী সব কাজ রয়েছে হাতে।

টিফিনের সময় মনোজ বোধহয় চা খেতে একটু বাইরে গিয়েছিল। সেই সময় জয়া কি একটা ফাইল খুঁজতে গিয়ে আলমারীটা খুলে ফেলে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে ইম্প্রেষ্ট ক্যাশের বাক্সটা খোলা। মুহূর্তে সে বাক্স থেকে গোটা তিনেক দশ টাকার নোট তুলে নিজের জামার মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। তারপর বিকেলের দিকে চারটে নাগাদ ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে যায়।

পরদিন সকালে এসে প্রথমেই সে মনোজকে বলে: "মনোজদা, আমি কাল একটা খুব অন্যায় কাজ করেছি। আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন? অবশ্য খুব বিপদে পড়েই করেছি।"

"কি বলতো, এমন কি অন্যায়?"

জয়ার চোখদুটো ছলছলিয়ে ওঠে, বলে: "কদিন থেকেই মায়ের খুব বাড়াবাড়ি জ্বর,—হাতে একটাও টাকা ছিল না, তাই ইম্প্রেষ্ট থেকে তিরিশটা টাকা আমি চুরি করেছি।"

মনোজ জয়ার মার অসুখের কথা শুনে এতবড় গর্হিত কাজের কথাটা হাল্কা করে নেয়—সান্ত্বনার সুরে বলে: "আচ্ছা আচ্ছা ভয় নেই, আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে ওটা মেক গুড করে দেব'খন। কিন্তু মনোজের ঠিকে ভুল হল। সে বিকেলে ক্যাশটা ঠিক করে রাখবে ভেবেছিল কিন্তু সেই দিন তার আগেই এ্যাকাউণ্টাণ্ট এসে ক্যাশটা চেক করতে চাইল। হয়তো ক্যাশ থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা কেউ শুনতে পেয়ে লাগিয়েছিল।

এ্যাকাউণ্টাণ্ট হরেনবাবু লোকটা বরাবরই বদমায়েস প্রকৃতির আর মনোজকে সে দু চক্ষে দেখতে পারত না। হরেনবাবু ক্যাশ চেক করবার পর বড় সাহেবকে রিপোর্ট দিলেন, ইম্প্রেষ্ট থেকে টাকা তুলে মনোজবাবু পকেটে ফেলেছেন, অবশ্য রিপোর্ট'টা পেশ করবার আগে মনোজকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন: "দেখ মনোজ, তুমি যদি শ তিনেক টাকা যোগাড় করে দিতে পার আমি বরং রিপোর্ট টা ছিঁড়ে ফেলতে পারি, তাহলে তোমার চাকরীটা থেকে যায়,—যা খারাপ বাজার।"

কথাগুলো শুনে মনোজের হাড়পিত্তি জ্বলে উঠেছিল, হরেনবাবুর কথাতে রাজী হওয়া দূরে থাক মনোজ তাকে দুচার কথা শুনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

জয়ার নিজের অপরাধে মনোজের চাকরী যাবে একথাটা সে যতই ভাবছিল ততই সে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে সে একটা মতলব ঠিক করল। অফিসের ছুটির পর সবাই যখন চলে গেল তখন সে সন্তর্পণে গিয়ে হরেনবাবুর ঘরে ঢুকল। উদ্দেশ্য হরেনবাবুকে সত্যি কথাটা বলে বুঝিয়ে মনোজের চাকরীটা যাতে থাকে সেই চেষ্টা করা।

জয়াকে আসতে দেখে হরেনবাবু অবাক হন,—জিজ্ঞাসা করেন: "ব্যাপার কি জয়া, কোন আর্জেণ্ট কেস না কি?"

জয়া একটু ইতস্ততঃ করে বলে: "না স্যার, একটা ব্যক্তিগত কথা বলতে এসেছিলাম, আপনার এখন সময় হবে?" হরেনবাবু বিস্মিত হয়ে বলেন: "আচ্ছা বোস ওই চেয়ারটায়।" জয়া খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বলে: মনোজদার কথাটা বলছিলাম—রিপোর্টটা কি ছেড়ে দিয়েছেন?"

হরেনবাবু কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে ওঠেন। তাঁর মনের মধ্যে মনোজের কড়া কথাগুলো তখনও পাঁকের মত গুলোচ্ছে—বলেন: "না এখনও ছাড়িনি, তবে ছাড়তে আমাকে হবেই। ভেবেছিলুম গরীব লোক চাকরী গেলে খাবে কী। তাই বুঝিয়েছিলাম অনেক, তা দেখলাম হবে না! আমাকে ওদিন কি যাচ্ছে তাই না বলে গেল —তোমরা শোননি? ফোঁপরা ঢেঁকীর শব্দ বেশী কি না।"

জয়া বলে: "শুনেছি সব, কিন্তু আপনি তো শাস্তি দিতে যাচ্ছেন একজন নিরপরাধকে। টাকাটা সে নেয়নি নিয়েছিলাম আমি, আর আমি সেই কথাটাই বলতে

এসেছি।" হরেনবাবু অবাক হয়ে বলে: "তুমি নিয়েছিলে? কিন্তু ইম্প্রেষ্টের ইনচার্জ তো মনোজ, সে কেয়ারলেস বলেই তাঁর ক্যাশের টাকা চুরী যায়। না না আমি পারব না, এত বড় ইম্পার্টিনেন্স আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না।"

জয়া অধৈর্য হয়ে ওঠে, বলে: তবু আমি তার হয়ে ক্ষমা চাইছি স্যার, আপনি এবারের মত কনসিডার করুন।"

হরেনবাবু শ্লেষের সঙ্গে এবার অনেকটা স্বগতভাবেই বলে: "এত বড় দোষ করে একটা মেয়েছেলে পাঠিয়েছে, নিজে আসতে পারেনি পায়ে ধরতে। মেয়েছেলের রূপ দেখে ভুলে যাব এমন ইডিয়েট ভেবেছে আমাকে? চাকরীতে যাদের অত মায়া, তাদের অত তেজ কিসের!"

কথাগুলো তীরের মত গিয়ে জয়ার অন্তরে ধাক্কা দেয়। সে আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে এ্যাকাউন্টান্টের চাপরাশী গোবিন্দ দরজার সামনেই বসে বসে মুখ টিপে হাসছে।

অবশেষে সত্যিই মনোজের চাকরী গেল। শেষ যেদিন মনোজ অফিস থেকে চলে যাচ্ছে সেদিন জয়া শুধু বলেছিল: "এমন করে তাদের জীবনের সব স্বপ্নকে মিছি মিছি নষ্ট করল সে। চাকরীটা বজায় রাখার উপায় হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।" মনোজ শুধু জবাব দিয়ে ছিল: "আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে চাকরী রাখার পরামর্শ তার পক্ষে আরও বেদনাদায়ক; তার কাছে বাঁচবার দাবী ইজ্জতের দাবীর কাছে অতি তুচ্ছ।" জয়া হয়ত তাকে ভুল বুঝেছিল কিন্তু বোধ হয় এটুকু সে বোঝেনি যে প্রবঞ্চনা আর ছলনা নিয়ে জীবন-তরীটাকে বোঝাই করবার প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে ছোট করবার কোন যুক্তি নেই এ পৃথিবীতে। যে বিচিত্র রঙমহলের মাঝখানে সে গোলাম হয়ে এসেছিল সে রঙের খেলা শেষ না হতেই তাকে চলে যেতে হল।

তারপর কতবার সে এসেছে ওই অফিসে, কিন্তু জয়াকে আর সে দেখতে পায়নি কোনদিনও। প্রেমকে হারিয়ে সেও কি হারিয়ে গেল একেবারে জীবনের বিচিত্রতার আড়ালে!

অঙ্গার

অশোক ভট্টাচার্য

অঞ্জলির অন্ধকার তর্পণেতে তৃপ্তি কার—
বহ্নিমুখী শলভ সব রৌদ্রজ্বালায় পুড়ছে।
সমুদ্র দূর অনবসর, অভ্যাগ্নি প্রাগ্রসর,
জতুগৃহের শীর্ষচূড়ার দহন কেতন উড়ছে।
পর্যঙ্কে বিষম নাড়া— শাকপার্থিব অপর্ণারা
অধোংশুকে অন্তরঙ্গ উত্তরীয় জুড়ছে।

অনর্গল প্রবেশদ্বার, প্রস্থানের সাধ্যকার—
কানামাছি তোমরা সবাই বাঁশবনেতে ঘুরছে।
ছায়া হলে চলবে না, সূর্য যে আর জ্বলবে না;
থাক বা না থাক ইচ্ছে তবু আসা তো চাই সংজ্ঞার।
ভোগের জোগান ভস্মছাই; দায়ভাগ তো তবুও পাই
ক্ষয়ের তাপে তৃপ্তি জ্বালে যেমন করে অঙ্গার।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : বাঙলা ও বাঙালী

শিবাজী গুপ্ত

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাংলাকে ভালবাসতেন, ভালবেসেছিলেন বাঙালীকে। অথচ সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, তাঁর এই ভালবাসা অন্ধজনের ভালবাসা ছিলনা। তিনি সোহাগ করেছেন এবং বলাবাহুল্য শাসনও করেছেন। তাঁর সুগভীর প্রীতিই তাঁকে ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণের অধিকার দিয়েছিল।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে (পাটনা-২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭) মূলসভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ : "অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী শিক্ষকতা কার্যের ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পাইয়াছি, সে সময় আমি বাঙালীর জীবন-সমস্যার অলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছি। অস্বীকার করিব না—এ আলোচনার ফলে নিরাশা ও দুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে—তাই পত্র হইতে পত্রান্তরে নানা প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় আমি বাঙলার আসন্ন সঙ্কট সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। জীবন-সন্ধ্যায় আজ আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অস্তিত্বের বিনিময়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির গৌরবে আত্মহারা! হায় বাঙালী! তোমার 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' সম্বন্ধে ত্রিশবৎসর পূর্বে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াও কি তোমার জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারিলাম না?" উদ্ধৃত উক্তিই তাঁর প্রচণ্ড আন্তরিকতা প্রমাণ করবে। মহামতি গোখলের "What Bengal thinks to-day the whole of india thinks to-morrow" উক্তি স্মরণ করে "আজ দিনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে" বলে খেদোক্তি করেছিলেন। চাকরি আর ওকালতীর দিকেই বাঙালীর নজর। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গ্র্যাজুয়েট তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। বাঙালীর শ্রমবিমুখতা, অপটুতাও আলস্যের নিন্দা করেছেন তিনি উক্ত অভিভাষণে। তিনি বাংলাভাষার উন্নতি বিধানে সকলকে বদ্ধপরিকর হবার আহ্বানও জানিয়েছিলেন।

একটা জিনিষ তাঁকে ভয়ানক পীড়া দিত তাহল বাঙালীর শ্রমবিমুখতা। বাঙালীর আত্মপ্রবঞ্চনা তাঁর ভাললাগেনি। তাঁর আক্ষেপ "হায় বাঙালীযুবক" তথাকথিত বিদ্যার্জনের দোহাই দিয়া তুমি অর্থনীতি ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ এবং কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছ।" প্রসঙ্গক্রমে তিনি সত্তর পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারীর ব্যবসার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন middle man হিসেবে অন্য জাতের মানুষ অন্যূন শতকরা দশ টাকা পরিমাণ মুনফায় স্বচ্ছন্দে সাত আট লাখটাকা রোজগার করে। বাঙালীযুবক সকল ক্ষেত্র হতে পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হচ্ছে। বাঙালী সত্যিই 'নিজবাস ভূমে পরবাসী' হল। পৃথিবীর মহামানবদের দৃষ্টান্ত, যাঁরা অজস্র দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের সামনে সদাজাগ্রত ছিল এবং সেই দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। ভেঙে পড়া জিনিসটা তাঁর একেবারেই পছন্দসই ব্যাপার ছিল না। বাংলাদেশে বাঙালীর এই হটে যাওয়া তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি। তবু তিনি বাঙালীকে মেরুদণ্ড সিধে রাখতে আর মনোবল জাগিয়ে রাখতে বলেছিলেন। সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙালীর অপমানবোধ-ভীতিকে তিনি নিন্দা করেছিলেন। "বাঙালী আজ বাবু বলিয়া পরিচিত।" বাঙালী বিনা অন্নে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৩৩৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন "এইভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর পরে বাংলাদেশে জনকয়েক উকীল মোক্তার ও জনকয়েক অফিসের বাবু ছাড়া আর অন্ততঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা।"

রামমোহন হলে "বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয়" সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, "বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় বিষয়ে কিছু বলিব। গত ২০ বৎসর এই বিষয়টি আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। আর কিছু নয়, তাঁর নিজের মুখ হতে উচ্চারিত এই সংবাদটি

আমাদের কাছে মুখ প্রয়োজনের ব্যাপার। দরদ দিয়ে যে দীর্ঘকাল তিনি বাঙালীর কথা ভাবছিলেন, এ কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। বাঙালী চতুর এহেন জনশ্রুতি স্মরণ করে ওই সভায় তিনি বললেন "যত চতুর তত ফতুর।" বাঙালী চতুর্দিকে সুধু মার খাচ্ছে। অনিবার্য ধ্বংসের সিঁড়ি একটি একটি করে স্পর্শ করছে। বাঙালী ব্যবসা করছেনা, চাকরী করাই তার জীবনের একমাত্র সাধনা, লক্ষ্য, আশা আর তারই দেশে তারই বুকের ওপর বসে অন্য অনেকে লুটেপুটে খাচ্ছে এটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছিল। "ডিগ্রীর মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। জ্ঞান অর্জন হইতেছে না, ডিগ্রী অর্জিত হইতেছে।...ফাঁকি দিয়া পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেশ্য।" এই কথা বলার পর তিনি যে বাক্য উচ্চারণ করলেন তাহল "এজন্যই ভারতবর্ষময় আমি বলিয়া থাকি Degree is only a cloak to hide one's ignorance অর্থাৎ ডিগ্রী অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র।" অনেক বড় ব্যবসায়ীর নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করলেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছিলনা কিন্তু লোকে তাঁদের অশিক্ষিত কখনই বলবেনা। "বাঙলায় আসিয়া সকলেই সোনা পায়। সুধু বাঙালীর হাতে উঠে ধূলি-মুটি। তাহারা উপবাস করিয়া মরে।" আবার বললেন, "কেবল চাকরির আশায় তাহারই পথ পানে চাহিয়া হা-ভাতের মত বাঙালীর দিন যাইতেছে। তাহার কার্যে স্পৃহা নাই, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, অন্নাভাবে তনু তাহার ক্ষীণ।" উপাধিধারী বাঙালী টাইপিষ্ট বা কেরানী হবার জন্য অনভিজ্ঞ লোকের দরজায় দরজায় ঘুরছে।

"মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা" সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কথা তুললেন: "গত ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া আমি দেশের সর্বত্র চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছি যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বাঙালীজাতি অর্থনীতিক হিসাবে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। "ওকালতি, ডাক্তারি, সরকারি চাকুরি ছাড়া আমরা আর কিছু চিন্তা করতে পারি না।" এবং এটা তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেননি। তিনি লিখছেন, "প্রত্যেক আদালতেই দেখিতে পাই—মক্কেলের অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা অধিক।" এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি "আত্মঘাতিনী" বলেছেন এবং এই শিক্ষাপদ্ধতির আশু পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছেন। এ শিক্ষা দেশে বেকার বাড়াচ্ছে মাত্র।

"বাঙালী তুমি কি ধ্বংসসাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ" এই জিজ্ঞাসা, এই যন্ত্রণা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উৎসারিত। আমরা দুপাতা ইংরাজি পড়ে পণ্ডিত হয়েছি এবং অপরকে তাচ্ছিল্য করছি। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা বাঙালী বণিকদের করতলগত নয়। এখান থেকে অর্থাৎ বাংলা দেশ থেকে কি পরিমাণ টাকা বাইরে যাচ্ছে তার হিসেবও দিয়েছেন আদমসুমারি থেকে। ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকার আদানপ্রদান হয়। প্রফুল্ল-চন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস বাঙালী সেখানে মসীজীবী হিসাবে বিরাজ করছে, ব্যবসায়ী হিসাবে নয়।

"বাংলার জমিদারবর্গ" শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনায় তিনি জমিদারের কথা বলেছেন, তাদের হতশ্রী তাঁকে কাতর করে তুলেছে। শুধু কর্মবিমুখতা নয়, অপকর্মেও বাঙালীকে তিনি অগ্রণী বলেছেন, অনেক দুঃখে বলেছেন। 'চা-পান ও দেশের সর্বনাশ' আলোচনায় তিনি বললেন যে চা-পান বাঙালীকে মরণের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই সর্বনেশে অভ্যাস আয়ত্ত করাকে তিনি আত্মহত্যার সামিল মনে করেছেন। আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন জীবনে চা একটি প্রধান অঙ্গ কিংবা চা ছাড়া আমরা বোধহয় এখন কিছু ভাবতেই পারিনা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের প্রত্যহের সমস্যাগুলিকে অস্বীকার করেননি। বাঙালীর প্রতি তাঁর অসীম মমতা আর প্রীতি। চা পান প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "এক পেয়ালা চা-তে এক গ্রেণেরও অধিক ক্যাফিন পাওয়া যায়। নিত্য চা-পায়ীরা প্রত্যহ গড়ে ৫ হইতে ৮ গ্রেণ ক্যাফিন বিষপান করিয়া থাকে। ইহাও সামান্য নয়।" ক্যাফিনবিষ ক্ষতিকর। তিনি বলছেন, "ক্রমাগত ক্যাফিন বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখনও কখনও উহাতে শিরোঘূর্ণন ও অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি।" মনে হবে চায়ের কথাও বলেই তিনি যেন বারবার বলছেন, না, না, না।

এমন অনেক দৃশ্য আছে যেগুলি আমরা প্রত্যহের দেখার ফলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এবং অতি সহজেই

এড়িয়ে যেতে পারি। তিনি তা করেননি। ছোটখাট ত্রুটিগুলোও তাঁর নজর এড়ায়নি। এখন সিনেমায় স্কুলকলেজের ছাত্রদের লাইন দিতে দেখলে আমরা আপত্তির কোন কারণ দেখিনা। "কলেজের ছাত্রদের অপব্যয়" প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্য "সিনেমায় যাহারা যায় তাহাদের সিনেমায় যাইবার আগ্রহ মদের নেশার মত উগ্র। জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া বালকদের সিনেমাতে যাইবার খরচা সংগ্রহের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু আশ্চর্য এ ব্যাপারটাকে কতই না অবহেলার চোখে আমরা দেখছি। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সত্বেও বহু কলেজের ছাত্রের প্রায়ই সিনেমায় যাওয়া চাই।" আর আজকের দিনে খাঁটি খাদ্য যখন একান্ত দুর্লভ বস্তু ও কিংবদন্তীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন এদিকটা আমাদের আরো একবার ভেবে দেখা দরকার নয় কি? অথচ প্রফুল্লচন্দ্র ত্রিশ বছরেরও আগে এদিকে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের চোখ ফোটে নি কারণ বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। "বাঙালী ছেলেদের মাথায় ডাঙশ মারিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার বাতিক"-এর কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

সহজে বাঙালী কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না। অথচ তিনি হাতের কাজ শেখার কথা বলেছেন এবং বারবার বাঙালীকে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করে দিয়েছেন। ডিগ্রীলাভ আমাদের কাছে স্বর্গলাভ বা মোক্ষলাভের সামিল। হালকাসুরে তিনি বললেন, "মেয়েরা ছাতে চুল শুকাইবার কালে পড়শীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে—'ছেলে আমার ফেল হইয়াছে।' যেন ইহার ন্যায় গুরুতর পাপ সংসারে দ্বিতীয় নাই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া অভিভাবকের তাড়নায় কত ছাত্র আত্মহত্যা করে। পরীক্ষা পাশের এ মোহ বাঙালীকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশবছর আগে আচার্য এই সব কথা বলেছিলেন, কিন্তু আজকের দিনেও তাঁর এই উক্তিগুলির সত্যতা অনস্বীকার্য। বিদ্যালাভ নয়, পরীক্ষা পাশই ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞান-স্পৃহাও ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। ডিগ্রী বা উপাধি তাঁর মতে অজ্ঞতার আবরণ মাত্র, যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। ডিগ্রীধারীরা এত কম জানেন যে বলতে লজ্জা হয়। তাঁদের কাছে anything which is outside the prescribed books is anathema." তিনি একথা বারংবার বলেছেন, যে ডিগ্রী আর নকরিতে বাঙালী জাতির সর্বনাশ হচ্ছে। তিনি একটা practical কথা বললেন, এটি ভেবে দেখবার মত; "যার প্রতিভা আছে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাও, যাকে ঠেঙিয়ে পাঠাতে হয়, তাকে পাঠাবার দরকার নেই।" তাঁর বলবার ভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গির কথাই আমাদের স্মরণ করায়। বিবেকানন্দের মতোই তিনি জোরের সঙ্গে কথা বলেছেন, 'জাগো' এই রকম বাক্য কিংবা শব্দ অজস্রবার তিনি উচ্চারণ করেছেন বাঙালীর প্রতি—হৃদয়ের গভীরদেশ থেকে। পেছনে যে পড়ে আছে তাকে সামনে আনার কথা বলেছেন প্রফুল্লচন্দ্র নইলে রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য হয়ে দেখা দেবে "যারে তুমি পশ্চাতে ফেলিছ সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" প্রফুল্লচন্দ্র তাই বললেন, "যে পিছনে আছে তাহাকে তুলিতে হইবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টানিয়া লইবেন।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র রচনায় শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কালান্তর বইয়ের লোকহিত প্রবন্ধে (১৩২১ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সর্বপ্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই।" সেই রাস্তাটা কি? তারও উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ঐ প্রবন্ধেই "লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা।" তিনি সবচেয়ে কম করে বলেছেন, "কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও বললেন, "চাই শিক্ষা। উন্নতির জন্য কি দরকার? আমি বলিব, প্রথম শিক্ষা, দ্বিতীয় শিক্ষা ও তৃতীয় শিক্ষা। শিক্ষা ভিন্ন পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে কোনো প্রভেদ নাই।" তিনি সকলকে ডাক দিয়ে বললেন, "শিক্ষার বিস্তার করুন। উন্নতি ধ্রুব নিশ্চয়।" প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালীকে আহ্বান করলেন। তিনি শিক্ষায় বিশ্বাস করতেন, ডিগ্রীতে নয়। ডিগ্রীর মোহ থেকে মুক্ত হবার কথা তিনি বারংবার বলে গেছেন। হতাশা নিয়ে তিনি বলেছেন, "বাঙালী চাকুরীর আশায় বিদ্যা শিক্ষা করে

—জ্ঞান অর্জনের জন্য নহে। ইহারই ফলে তাহার বিদ্যার্জন ও অর্থ উপার্জন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।" এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার কথা বাঙালীর কথা ভেবে গিয়েছেন। আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধুর মত বাঙালীর দৈন্যের দিনে পাশে দাঁড়িয়েছেন, বন্ধুর মত পরামর্শ দিয়েছেন, অন্ধকারপথে প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়েছেন। সমস্ত হৃদয় মথিত করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, "হায় বাঙালী, তোমার মহিমা কীর্তনে আমি আজ বলিহারী যাই। তুমি দিন দিন দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছ, তবুও ইহাতে তোমার চৈতন্যোদয় হইতেছে না।...কেবল অবাঙালীরা তোমার সোনার বাঙলা হইতে প্রতিমাসে দশ কোটি টাকা করিয়া লুটিয়া লইয়া যায়; আর তুমি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় তকমা লইয়া বেকার সমস্যা বাড়াইতেছ এবং অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতেছ।" এ কথা আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। এতদিন পরে টাকার অঙ্কটার একটু হের-ফের হয়েছে। কিন্তু কথাগুলো আজও অক্ষরে অক্ষরে সত্য রয়ে গেছে। অধ্যবসায়হীনতাকে তিনি বাঙালীর পদে পদে পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করতেন।

কলেজ স্কোয়ারের পাশদিয়ে হেঁটে গেলে একবার না একবার সকলকেই থমকে দাঁড়াতে হয়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মর্মর মূর্তি। সামনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বাড়িটা। এই কলেজ ষ্ট্রীটের তপ্তকঠিন ফুটপাতের ওপর অজস্র তরুণছাত্রেরদীর্ঘশ্বাস মুদ্রিতহয়েরয়ে,ছেঁড়াপুরনো বইয়ের দোকানে রেখেছে তাদের গোপন কান্নার স্বাক্ষর! প্রফুল্ল-চন্দ্রের সামনে হতাশার অজস্র চিত্র ছিল। তবু হতাশা নয়, তিনিশেষপর্যন্ত আশাবাদী। তাই তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ছাত্র-দের সামনেআবেগের সঙ্গে যে বাণী তিনি তুলেধরেছেন তা আশার, "আমার শেষ সময় উপস্থিত—হে আমার সাধের ছাত্রগণ; তোমাদের দিকে আগ্রহাকুল নয়নে আমি তাকিয়ে আছি। যদি দেখি তোমরা মানুষ হচ্ছ তবে ভাববো আমার জীবনব্রত সফল হ'ল The future destiny of my country is in the hands of my young children—তোমরা মানুষ হও, নিজেরা আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও—দেশ আবার নিশ্চয়ই উঠবে।"

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছয়

নিজের দোষে ট্রেণ ফেল করা জরুরী কাজে যানেওয়ালা সঙ্গীহীন যাত্রী যেমন শূন্য উদাস মন নিয়ে ওয়েটিং রুমের ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে চোঁ চোঁ করে সিগারেট টানে, ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় কাৎ হয়ে সমীর ঠিক সেই ভাবেই জোরে জোরে সিগারেট টানছিল, কিন্তু গোল্ডফ্লেকের কোন আস্বাদই তার রসানেন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পারছিল না। এ যেন কোথা দিয়ে কি একটা হয়ে গেল! কি রকমের একটা অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে সমস্ত পৃথিবী ভেঙ্গে চুরে কোথা দিয়ে যেন প্রবল বন্যা এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। গত একঘন্টা মাত্র সময়ের মধ্যে গৌরীর মাসতুতো বোনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ থেকে সুরু করে মাসিমার পাঠানো আমের আচার—মেঝেয় এখনো ভাঙ্গা কাঁচের প্লেট, চামচ আর আচারের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অংশগুলি—আচ্ছা নীরোদবাবুদের বাড়ীর কেউ এ বাড়ীর কোন কথাবার্তা কিছু শুনতে পেয়েছে না কি? কত সব এলোমেলো চিন্তা, গায়ের মধ্যে কি এক অদ্ভূত কম্পন তিনমাসের মধ্যে কোথা থেকে এসে জুটলে গৌরী আর আজ আবার সমীর স্পর্শ করেছে ঐ এক বিধবা রেণুকে—ওঃ, রেণুর হাত খানা কি শক্ত, কেমন গোলাকার, কুচ্‌কুচে কালো রঙ্‌, যেন পাথরে খোদাই করা হাত, সমীরের হাতের মধ্যে ওর মনিবন্ধের স্পর্শ যেন এখনও লেগে আছে। নিজের হাতখানা সমীর একবার দেখে নিলে। একটা চোখ ওর ছোট হয়ে আছে বটে, কিন্তু অন্য চোখটা কেমন জলভরা, ভাসা ভাসা! পুলিসের কবল থেকে গা আড়াল দিয়ে সমীর যখন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বনে বনে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, তখন অসংখ্য জংলী হরিণ সে দেখেছে, তাদের চোখের মধ্যে যে ভীরু চাউনি ও দেখেছিল আজ রেণুর চোখের মধ্যে সমীর যেন সেই রকম ত্রস্ত চকিত হরিণের দৃষ্টিই দেখ্‌তে পেয়েছে। আচ্ছা, রেণু ওর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে কেন? ও যখন তার হাত ধরে টেনে তুল্লে, তখন ত সে তেমন কোন আপত্তিও করে নি। অসহায়া, বিধবা, পর ঘরে আশ্রিতা ঐ রেণু, কিন্তু কি তার তেজ! অন্যায় ব'লে যাকে সে মনে করে, তার ওপোর কি প্রচণ্ড তার অভিযোগ! আবার সামান্য একটু মিষ্টি কথায়, সামান্য একটু নিরাপত্তার পরিচয় মাত্রেই কি অপূর্ব্ব তার অকুণ্ঠ নির্ভরশীলতা! নিরক্ষরা পল্লীরমণী বিরাট ভারতীয় রাজধানীর একটি মাত্র কোটরে আবদ্ধা, পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ঐ রেণু, যার বর্ত্তমানে শুধু অহোরাত্র 'ব্যাপী কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবন ধারণের উপযোগী একমুষ্টি অন্ন এবং যার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত মৌখিক মমতাময় পরিবারে মধ্যে দাসীবৃত্তি করেই তার জীবন শেষ হবে, অথবা বার্দ্ধক্যের জীর্ণ রুগ্‌ণ দেহ নিয়ে রাজপথে আবর্জ্জনার পার্শ্বে পথচারীদের দয়ার দান গ্রহণ করে ভিক্ষুনীর জীবনেই হবে তার পরিণতি, কে জানে? কে বলবে, এই দ্বিবিধ বিকল্পের মধ্যে কোন্‌টি তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশে তার জন্য অপেক্ষা করছে? এ সম্বন্ধে কেউ চিন্তাও করেনা। সমীরই কি করেছে কোনোদিন? যে রেণু এতদিন মুখ বুজে মাত্র যন্ত্রের মতই ঘরের দৈনন্দিন, বর্ণ গন্ধ হীন নিয়মিত কাজগুলি প্রত্যহ একই ভাবে সমাধা করেছে, স্নানের প্রাত্যহিক ব্যবস্থামত তেল সাবান এগিয়ে দিয়েছে, স্নানান্তে ভাতের থালা এনে

সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে, পিপাসায় পানীয়ের গ্লাস এনে সামনে ধরেছে, রাত্রে রুটীর গোছা বহন করে এগিয়ে এসেছে; আহারান্তে নিয়মিতভাবে বাঁধা ধরা ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছে আর কিছু লাগ্‌বে কি না, যার নিজের স্নান আহার নিদ্রা সমস্তই সকলের দৃষ্টির অগোচরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সমাপ্ত হয়েছে, সমাপ্ত হয়েছে কি না সে সংবাদ পর্য্যন্ত অন্য সকলের কাছে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে মনে হয়েছে, আজ সেই নিতান্ত তুচ্ছ চির অবজ্ঞাত, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও যাকে মানুষের পদবীতে বসানোর প্রয়োজন কেউ বোধ করে নি, সেই রেণুর ওপোরই আজকের দিনে নির্ভর করছে সদাশিব-পরিবারের সমগ্র ভবিষ্যৎ। সমীর মনে মনে রেণু সম্বন্ধে যুগপৎ করুণা ও শ্রদ্ধায় ভরপুর হয়ে গেল। মেয়েটা এত অসহায়, অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য কি কঠিন তার পণ। আবার সেই কঠিন পণও সমীরের সামান্য অনুনয়ে কত সহজে ভঙ্গ হোল। এই আমার দেশ, এই আমার দেশের অগণিত মূক নারী। সমাজ ও ধর্মের প্রবল সংস্কার এদের বজ্রাদপি কঠোর করে রেখেছে, আবার সামান্য একটু ভালোবাসা, কিঞ্চিন্মাত্র অনুনয় এদের কুসুম অপেক্ষাও মৃদু ভাবকে কত সহজে জাগিয়ে তোলে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল সমীর দেশ-মাতৃকার সেবা করেছে, কিন্তু আজ মনে হয়, সে শুধু রাজসিক দম্ভ আর তামসিক মোহের অন্ধ আবর্তেই বৃথা আস্ফালন করে এসেছে। ঐ গৌরীর মতো শিক্ষিতা ও সুন্দরীদের স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মসুখের তীব্র হানাহানিকেই সে পরম সত্য বলে উপলব্ধি করে তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাদেরই দুঃখ সুখ দিয়ে, তাদেরই ভবিষ্যতের সঙ্গে সমগ্র দেশকে একত্র করে যে ভারতবর্ষ, সেই আসমুদ্র হিমাচল মানচিত্রেরই সে পূজা করে এসেছে কিন্তু দেশের সহিষ্ণু মাটী সকল সন্ধানী দৃষ্টির অন্তরালে সম্পূর্ণ সংগোপনে আপনার প্রতীক মূর্তিকে যে-গভীর বিষাদ ও ব্যথায় ভারাক্রান্ত করে, অশ্রু রসে সঞ্জীবিত করে গঠন করে, পঞ্চ সহস্রাব্দীকে পরিব্যাপ্ত করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তা, জ্ঞান ও অনুশীলনের সারাংশ সঞ্চয়ন করে যে অব্যক্ত ও বর্ণনাতীত ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্য বঙ্গপল্লীর অজ্ঞাত প্রান্তে সংস্কারের সুদূর পাষাণ বেদিকায়, ধর্মের বজ্র-কঠিন ধারণ শক্তির মধ্যে বন্যপুষ্পের ন্যায় সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে পরিস্ফুট করে সেই মূর্তি ও দেশহিতৈষণার উন্মাদ মুহূর্তে বারেকমাত্রও সমীরের দৃষ্টিগোচর হয় নি। আজ এ কি এক অপূর্ব মূর্তি সে দেখলে; দেখার সময় একে ত আদৌ অপূর্ব বলে মনে হয় নি, কিন্তু একা আপন মনে বসে বসে নানারূপ ছন্নছাড়া চিন্তার মধ্য দিয়ে অনুভূতির বর্ণহীন পর্দার ওপোর যে রেণুরূপ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, তা সত্যই অনবদ্য, তা সত্যই স্মরণীয়, তা প্রকৃতই বরণীয়।

টাইমপিস ঘড়িটার দিকে নজর দিতেই সমীর দেখলে প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে। আজ চারটে নাগাদ একবার অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন, তারপর অফিসারের বাংলোয় গিয়ে—সমীর হিসেব করে দেখলে, আজকের কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরতে প্রায় সাড়ে আটটা হবে।

স্নানের পর যে তোয়ালেটা বাইরের তারে শুকোচ্ছিল, সমীর সেটাকে টেনে নিয়ে সেই অল্প ভিজে তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুখ হাত গলা মুছে অফিসের পোষাক এঁটে দেখলে পকেটে মণিব্যাগ নেই। মনে পড়ে গেল যে, বৌদি ওটা তার হাত থেকে নিয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য যে-বৌদি রোজ দুপুরে সর্বক্ষণই এ ঘরে থাকে, আজ প্রায় এক ঘণ্টার ওপোর হোল, সেই বৌদি একবারও এদিকে আসে নি। তা নাই আসুক, কিন্তু ব্যাগটা যে তার চাই, তাই সাহসে ভর করে সমীর ডাক দিলে, বৌদি।

কোন সাড়া নেই। পরদা ঠেলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে আরও দু'বার ডাকতে বৌদি নিঃশব্দে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো, কোন কথাই কইলে না।

সমীরও কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুখে বল্লে, আমার ব্যাগ?

টেবিলের টানায় আছে, শুষ্ক উত্তর দিয়ে বৌদি দাঁড়িয়ে রইলো।

সমীর ঘরে এসে টেবিলের টানা থেকে ব্যাগ নিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখে বৌদি পূর্বের জায়গায় স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভেবে সমীর বল্লে, আজ রাত্রে ফিরবো সাড়ে আটটার সময়। এই বলে উত্তরের জন্য অল্প প্রতীক্ষা করলে, ভাবলে অন্যদিনের মত হয়ত এক বাটী চা সে পাবে কিন্তু

বৌদির পক্ষ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সাইকেলের ষ্টাণ্ড থেকে গাড়ীটা নামিয়ে নিয়ে যেমনই বাইরের বারান্দা দিয়ে বেরুতে যাবে, হঠাৎ রেণু পাশে এসে বল্লে, আংটি কাপড় দিয়ে আর কেলেঙ্কারী বাড়াবেন না। আমি আপনার কথামতই কাজ করবো।

রেণুর মুখের দিকে চেয়ে সমীর বল্লে, আচ্ছা, এবং এর পর সাইকেলটা রোয়াক থেকে নামিয়ে সেটার ওপোর চড়ে সে কাঁকরের রাস্তার ওপোর দিয়ে চলে গেল। সাইকেলের চাকায় লেগে কাঁকরগুলোয় কড়মড় শব্দ হতে লাগলো, আর মনে হোল, তার পিঠের ওপোর কার যেন আকুল এক আলগা চাউনি উড়ন্ত সাড়ীর আঁচলের প্রান্তটুকুর ন্যায় বার বার পরশ বুলিয়ে হাওয়ার মধ্যেই মিলিয়ে গেল। সেই পরশ অফিসে পৌঁছবার পরেও সে ভুলতে পারছিল না।

সেইদিনই অনেক চেষ্টা করে সে এক তিন সপ্তাহব্যাপী টুর প্রোগ্রামের মধ্যে নিজের নামটা ঢুকিয়ে দিলে। সেইদিনই সন্ধ্যার পর যাত্রা। এক চাপরাশীকে স্লিপ লিখে বাসায় পাঠালে, বাক্স ও বিছানাটা আনবার জন্য।

যথাসময়ে বাক্স বিছানা সমস্তই এসে পৌঁছালো। রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে নিয়ে অফিসারের সঙ্গে অফিসের ষ্টেশন-ওয়াগণে ওরা যখন দিল্লী ষ্টেশনে এসে পৌঁছাল তখনও সমীরের মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে ছিল, কেবলই উৎসুক হয়ে ভাবছিল, কতক্ষণে ট্রেনটা দিল্লীর ষ্টেশনটা ছেড়ে বাইরের মাটী দিয়ে গড়াতে গড়াতে দূরে, বহু দূরে চলে যাবে।

সাত

কুড়ি বাইশ দিন পরে একদিন সকালে হঠাৎ এক ট্যাক্সি এসে সদাশিবের বাংলোয় প্রবেশ করলে। গাড়ী থেকে নামতেই সমীরের সঙ্গে প্রথম দেখা হোল সদাশিবের। সদা তখন দাঁতন নিয়ে বারাণ্ডায় বসে দাঁতন করছিল।

সমীরকে নামতে দেখে সদা এগিয়ে এলো, বল্লে, কি খবর, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এতদিনের জন্য উধাও। এতদিনের মধ্যে একখানা চিঠি পর্যন্ত পেলুম না—

মালপত্র নামাতে নামাতে সমীর বল্লে, চাকরী ত ভাই, আর ত কিছু নয়, হুকুম হলেই যেতে হবে।

বাক্স বিছানা ঘরে তুলে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে সমীর বল্লে, তারপর কি খবর, সব ভালো ত?

ম্লান মুখে সদা বল্লে, ভালো আর কই, তোমার বউদি আবার বিছানা নিয়েছেন।

ব্যস্ত হয়ে সমীর বল্লে, কেন কেন, কি হয়েছে, কি?

সেই পুরাতন রোগ, অম্লশূল, সদাশিব উত্তর দিলে। উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘোরে। এই দশ দিনে ডাক্তারের ফি, ওষুদ আর ইনজেকশনে প্রায় পঞ্চাশ টাকা গলে গেল, কিন্তু রোগের কোন উপশমই তো দেখছি না।

সমীর তাড়াতাড়ি বল্লে, চল দেখে আসি। কোথায়, ঘরে শুয়ে আছে বুঝি?

সদা বল্লে, দেখো 'খন আগে জামা-টামা খোল।

না না, সে পরে হবে, আগে বউদিকে দেখে আসি। বলতে বলতে সমীর বাইরের ঘরের ভেতরের দিকের পরদা সরিয়ে বউদির ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে ডাক দিলে, বউদি কেমন আছো, বলেই পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। সদা এলো সমীরের পেছনে।

গায়ের ওপোর কাপড়টা টানতে টানতে গৌরী ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লে, এসো ঠাকুরপো, এখনও বেঁচে আছি। আর কিছুদিন পরে এলে একেবারে আমার শ্রাদ্ধ খেতে পেতে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে তার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে সমীর বল্লে, তাইত একটু তাড়াতাড়িই এলুম বউদি, শ্রাদ্ধের যোগাড়-যন্ত্র করতে হবে কিনা, সদা কি একা সব গুছিয়ে পেরে উঠবে। বলতে বলতে ঘরের প্রায় অন্ধকার ভাবটা চোখে অভ্যস্ত হতেই ভালো করে গৌরীর মুখখানা দেখতে পেয়ে সে বিস্মিত হয়ে গেল, বল্লে, একি, এই কদিনেই এমন বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে!

সদা বল্লে, হ্যাঁ ভাই, কি করি বল দেখি। এদিকে অফিসে ছুটী পেলুম না এক দিনের জন্যও, অথচ বাড়ীতে এই রোগী! কি যে করি তার ঠিক নেই, আবার মাসের শেষ—

গৌরী বল্লে, যাও ভাই ঠাকুরপো, তুমি জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে একটু সুস্থ হও, একে রেলের জার্নি—

সমীর বল্লে, সে থাক; একবার যখন এসে পড়েছি তখন তোমায় বৌদি তিন দিনের মধ্যে চাঙ্গা করে তুলবো।

সদা বল্লে, দেখ ভাই, আমার চেষ্টায় ত কিছু হোল না। এবার তোমার শুশ্রূষায়—

হ্যাঁ নিশ্চয়, বলতে বলতে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এসে জামা প্যাণ্ট খুলে লুঙ্গি পরে তার মাসকাবারী একশ টাকার নোট নিয়ে সদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে, তোর এমাসের টাকাটা—

সদা হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে নিতে বল্লে, এ মাসে ত ছিলেই না ভাই, বলে নোটটা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো।

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে বসার পর রেণু এলো চা নিয়ে। তার মুখে ছিল একরাশ সঙ্কোচ। সে জানে, ছোট দাদাবাবু সকালে পাউরুটী, মাখন, ডিম, কেক, কলা একরাশ সুখাদ্য দিয়ে প্রাতরাশ করে, কিন্তু এবাড়ীতে কে সব ব্যবস্থা গত কুড়ি দিন ধরে কিছুই নেই। আজ সকালে সে কি দিয়ে চা দেবে সে কথা বড়দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে সদাশিব টাকে হাত বুলিয়ে বলেছিল শুধু চা-ই দাও। সারা রাত্রি রেলে আসার পর কি আর লোকের খিদে থাকে! দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বেচারী রেণু ধমক খেয়েছে। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, খান কয়েক লুচি ভেজে দেব? দিদিমণি মুখ বিকৃত করে বলেছিল, মরণ আর কি, দরদ দেখ! ছোটদাদাবাবু চলে যাওয়ার পর দিন থেকেই দিদিমণি যেন কেমন হয়ে গেছে! যেন ছোটদাদাবাবু তারই জন্যে চলে গেছে, এই রকম তার ধারণা।

দুবাটী চা এনে রেণু অনেক কুণ্ঠা নিয়ে একবাটী দিলে বড়দাদাবাবুকে অন্য বাটী ছোটদাদাবাবুকে। ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে সমীর বল্লে, রেণু, আমার সুটকেশটা খুলে দেখত ওর ভেতর বড় একটা কৌটো আছে। সেটা বার কর। এই কথা বলেই সে সদাশিবের সঙ্গে তার ভ্রমণের গল্প চালাতে লাগলো।

রেণু বাক্স থেকে কৌটো বার করে দেখে, তার মধ্যে অনেকগুলো ভালো মেঠাই খাবার রয়েছে। সমীর বল্লে, আমাকে আর সদাকে ভাগ করে দে, আর তুইও খানিকটা নিয়ে যা। বউদি ত আর খাবে না। রেণু অন্য প্লেট আনার উপক্রম করতেই সমীর বল্লে, ঐ ত সামান্য জিনিষ, এই চায়ের প্লেটেই দিয়ে যা।

দুই বন্ধুতে খাওয়া দাওয়া চলছে, এমন সময় টলতে টলতে গৌরী এলো দরজার কাছে। রেণু তখন সমীরের বাক্সটা বন্ধ করছে, আর পাশে আছে সমীরের কৌটোটা। কৌটোয় কিছু মিঠাই সমীরই জোর করে রাখিয়ে দিয়েছিল রেণুর জন্য।

গৌরীর ভেতরটা জ্বলে গেল। তেড়ে ওঠে রেণুকে বল্লে রেণু, এইখানে বসে তুই এইভাবে সময় নষ্ট করছিস, রান্না বাড়া করতে হবে না। যা, চটপট কাজ করে নিগে যা—

সদাশিব ব্যস্ত হয়ে বল্লে, তুমি—তুমি আবার এ ঘরে আসতে গেলে কেন, শেষে আবার মাথা ঘুরে—

টলতে টলতে এসে নেয়ারে খাটের ওপোর বসে পড়লো গৌরী। সমীরও অভিযোগ করে বল্লে, বাস্তবিক বউদি, এ ঘরে আসা তোমার খুবই অন্যায় হয়েছে—

ও, অসুবিধে হোল বুঝি, আচ্ছা চলে যাচ্ছি, রাগতস্বরে গৌরী উত্তর দিলে।

না—না—এসেছ যখন, তখন বোসো, বউদি—বউদি—। গৌরী টলতে টলতে আবার পরদা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সদা বললে, কি বলবো ভাই, এবার অসুখটা হয়ে অবধি কি যে খিট খিটে হয়েছে, তা আর কি বলবো? রাতদিন খালি ঝগড়া আর রাগারাগি। ঐ রেণুটাকে এত ভাল বাসতো, আর এখন যেন রেণু হয়েছে দু'চক্ষের বিষ। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই ভালো। ও ছিল, তাই দু'বেলা খেতে পাচ্চি।

পরদা সরিয়ে কর্কশ কণ্ঠে গৌরী বললে, দয়া করে বাজারে-টাজারে যাবে; না দুই বন্ধুতে বসে বসে রেণুর গুণগান করবে? ছি ছি, লজ্জাও করে না। বলি ঘেন্না পিত্তি কি কিছুই নেই? কাণ্ডজ্ঞান কি একেবারেই গেছে!

ব্যস্ত হয়ে সদাশিব খাবার ফেলে উঠে পরদা সরিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরে বসেই সমীর শুনতে পেলে সদা গৌরীকে বৃথা সান্ত্বনা দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, আর অল্প ধমকের ভঙ্গীতে বলছে—ছিঃ, সমীরের সামনে কি করছো? কি মনে করবে ও?

করুক মনে আমি আর এই সব বেয়ারাপনা সহ্য করতে পারি না। ছোটদাদাবাবু এলো, আর উনি গিয়ে তাঁর

বাক্স খুলে বসলেন, মরণ আর কি ? বামুনের ঘরের বিধবা না। মরুক মরুক মরুক ও।

এর পর সমীর বুঝতে পারলে যে সদাশিব গৌরীকে তার ঘরে নিয়ে চলে গেল।

চা পান শেষ করে সমীর আপন মনেই খবরের কাগজ নিয়ে বসলো। আগে এ বাড়ীতে খবরের কাগজ আসতো না। সমীরই কাগজ নিতে সুরু করেছে। সদাশিব ঘরে ঢুকে একবার মাত্র কাগজের বড় অক্ষরগুলো দেখে নিয়ে বাজারের দিকে বেরিয়ে গেল, আর সমীর কাগজ রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস হয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো।

আজ সমীরের কোন ডিউটি নেই। সকালে অফিসারের বাড়ীতে যেতে হবে না কাজেই সকাল সকাল স্নানাদি শেষ করে দুই বন্ধুতে একসঙ্গে আহারাদি সেরে নিলে। খাওয়ার সময় গৌরী আর বাইরে আসে নি। একচক্ষু রেণুই চিরদিনের অভ্যাসমত নতমুখে ভাতের থালা এনে দিয়েছে, মুখ ধোয়ার জল রেখেছে মগে ভর্তি করে, রেকাবীতে করে সুপারী লবঙ্গ দিয়ে গেছে, কারুর সঙ্গে কোন কথাই তার হয় নি। সেই সঙ্গে রোগীর পথ্যও সে দিয়ে গেছে রোগীর ঘরে, কিন্তু বাড়ীতে কেউ কারুর সঙ্গে যেন কোন কথাই কইতে চায় না, এমনধারা গম্ভীর গম্ভীর ভাব!

অফিসের সনাতন কোট পরে সদাশিব গৌরীকে ওষুধ খাইয়ে সমীরকে ওষুধ খাওয়ানর কথা বলে দুর্গা শ্রীহরি নাম স্মরণ করে একহাতে খাবারের কৌটো অন্য হাতে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সমীর আপন মনেই বাইরের বারাণ্ডায় পাতা ডেক্ চেয়ারে বসে বসে বড় রাস্তার অফিসগামী বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, পাঞ্জাবী বিভিন্ন প্রদেশের গতিচ্ছন্দ এবং সাইকেল, মোটর সাইকেল, মোটরকার, টাঙ্গা ইত্যাদি বিভিন্ন যানের গতিবেগ উদ্দেশ্য-হীন ভাবেই লক্ষ্য করতে লাগলো। দেড়দিন ধরে রেলভ্রমণ করে সে এসেছে, কিন্তু দিবানিদ্রার কোন আকর্ষণই সে বোধ করলে না, এমন কি গৌরীর ঘরে পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য তেমন আকর্ষণও সে অনুভব করলে না।

টাইমপিস ঘড়িতে বারোটা বাজলো। রেণু এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অতি ধীরে ডাক দিলে, ছোরদাবাবু।

মুখ ঘুরিয়ে সমীর তার দিকে চেয়ে দেখ্লে, বল্লে, কি রে।

সে বল্লে, দিদিমণিকে ওষুধ দিতে হবে, বারোটা বাজলো যে।

যাচ্ছি। বলে সমীর ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়ালো। রেণুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে কেমন আছিস্?

রেণু ঘাড় হেট্ করে দরজা ছেড়ে ভেতরে চলে গেল। সমীর তার বাইরের ঘরের মধ্যে ঢুকে আধভেজা গামছা দিয়ে মুখ ঘাড় বেশ করে মুছে দুটো সুপারী লবঙ্গ মুখে দিয়ে রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ করে ভেতরের বারাণ্ডায় পৌছে বউদির ঘরের সামনে এসে পরদার পেছন থেকে ডাক্লে বৌদি, বৌদি জেগে আছ।

ভেতর থেকে কোন সাড়া নেই। একটু ইতস্ততঃ করে আর একবার ডাক্লে, সেবারেও কোন সাড়া না পেয়ে সমীর রান্নাঘরের দিকে মুখ করে ডাক্লে। রেণু!

রেণুরও কোন সাড়া নেই, অথচ এই দুমিনিট আগেই সে এদিকে এসেছে; হয় রান্না ঘরে, না হয় ত বৌদির ঘরেই সে আছে।

সমীর জোর করে নিজের অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে কণ্ঠস্বরের কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলার জন্য যতই চেষ্টা করতে লাগলো, ততই যেন সে নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে পড়তে লাগ্লো। এরকম জড়তা তার কেন আস্ছে, তা সে বুঝতেও পারলে না।

কিন্তু এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও ত ভালো দেখায় না। একটু জোর করেই ডাক্লে, রেণু।

এবার সাড়া দিলে বউদি। রুক্ষ কণ্ঠেই ভেতর থেকে বল্লে, ঘরে এসো। সমীর গৌরীর ঘরের পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুক্লো। বল্লে, কেমন আছ বৌদি, তোমার ওষুধ খাওয়ার সময় হোল না?

কোন উত্তর নেই। ছোট টেবিলের ওপোর থেকে মিক্শ্চারের শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কুঁজো থেকে ওষুদের গ্লাসে জল ঢেলে গ্লাসটা ধুয়ে তাতে একদাগ ওষুদ ঢেলে সমীর এগিয়ে এলো বউদির বিছানার কাছে; গৌরী কিন্তু তখনও উদাসীনভাবে অন্যদিকে চেয়ে শুয়ে

আছে, তার ভাব দেখলে মনে হয়, ঘরে কোন লোক এসেছে, এটা যেন সে তখনও টেরই পায় নি।

সমীর বল্লে, নাও, ওষুদটা খেয়ে নাও।

কোন উত্তর নেই। সমীর আর একবার অনুরোধ জানালে। গৌরী উদাস ভাবেই উত্তর দিলে, বল্লে, ওটা রেণুকে দাও গে. তোমার দিতেও ভালো লাগ্‌বে, তার খেতেও ভালো লাগ্‌বে।

সাহসে ভর করে সমীর বউদির বিছানার একটা কোণে বসে বল্লে, নাও ভাই, ওষুধটা খেয়ে নাও, আর মিছামিছি রাগ কোরো না।

ওষুদটা নর্দামায় ঢেলে দাও গে। আমি ওষুদও চাই না, বাঁচতেও চাই না, বলেই গৌরী অপর দিকে মুখ করে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

সমীর ভয়ে ভয়ে গৌরীর কাঁধে হাত দিলে, বল্লে, রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি, মিছামিছি এরকম ছোটোলোকী করছো কেন।

গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লো, যেন তার কোন অসুখই আর নেই। সমীরের মুখের দিকে কঠোরভাবে দৃষ্টিপাত করে বল্লে, কেন, বেলা সাড়ে নটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত এ দরদ কোথায় ছিল? বারাণ্ডায় বসে বসে এত তন্ময় হয়ে কার চিন্তা হচ্ছিল শুনি?

সমীর বল্লে, সে কথা পরে বল্‌ছি, আগে ওষুদটা খেয়ে নাও-ত, শেষে আবার কেউ দেখে ফেল্‌বে—

দেখুক। আগে আমার কথার উত্তর দাও। আগে বল, রেণু কি অধিকারে তোমার বাক্সে হাত দেয়? এ অধিকার তাকে কে দিয়েছে?

এতটা বাড়াবাড়িতে সমীরের বিরক্তি এসে গেছে। একবার মনে হল বলে, যে অধিকারে তুমি এতটা মান অভিমান করছো, কিন্তু মুখে সে কিছুই বল্লে না। খুব ভদ্রভাবে বল্লে, অসুস্থ শরীরে বেশী রাগারাগি কোরো না বউদি, অসুখটা কি আরও বাড়াবে?

ওঃ, কি দরদ! আমার অসুখ বাড়লে তোমার কি? আমার জন্য একটুও ভাবো কি তুমি? সেই যে সেদিন পালালে, তারপর বাক্স বিছানা নিতে নিজে কি এক মিনিটের জন্যও আস্‌তে পারতে না? একবার বলে যেতে পারতে না যে, কোথায় যাচ্ছো, কবে ফিরবে! একটু থেমে বল্লে, আচ্ছা, তাও যদি না পারো, তাহলে কি একখানা চিঠি লিখে তোমার বন্ধুকেও জানাতে পারতে না যে, কোথায় গেছ এবং কবে ফিরবে? আমার এই অসুখের জন্য একমাত্র তুমই দায়ী, আর কেউ নয়। যদি মরি তাহলে কেউ না জান্‌লেও তুমি স্থির জেনে রেখো, তুমিই আমায় খুন করেছ। হাঁপাতে হাঁপাতে গৌরী বল্লে, ভুল করেছি, ভয়ানক ভুল, যেন শত্রুতেও এরকম ভুল না করে।

সমীর চুপ করে কিংকর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে বসেছিল। ওষুদের গ্লাস সমেত তার হাতটা অল্প অল্প কাঁপছিল। গৌরীর সেদিকে নজর পড়তেই তার হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিয়ে সবশুদ্ধ ছুঁড়ে মেঝের ওপোর ফেলে দিলে। ঝন্‌ঝন্ করে গেলাস গেল ভেঙ্গে, ওষুদটা মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল, খানিকটা ছিট্‌কে দেওয়ালের গায়ে গিয়েও লাগলো। রাগে ফুলতে ফুলতে হাঁপাতে হাঁপাতে গৌরী আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

এবার সমীর রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। রাগতস্বরে বল্লে, বেশ বৌদি বেশ, বেশ অভিনয় হলো। আমার ওপোর যদি কোন কারণে রাগই হয়ে থাকে, যা বলবার থাকে বলো, গেলাস ভেঙ্গে, ওষুধ ফেলে এসব কাণ্ড হচ্ছে কেন? বেলা বারোটায় ওষুদ দেওয়ার কথা, দাদাও আমাকে বলে গেছে—

থামো থামো, গৌরী ধমক দিয়ে উঠলো। বারোটার সময় ওষুদ দেওয়ার জন্য কোনো খেয়াল ছিল কি তোমার যে, বড়মুখ করে বল্‌তে এসেছ, বন্ধু বলে গেছে। ওষুদ দেওয়ার জন্য কে তোমায় ডেকেছে শুনি।

রেণু—

রেণু? রেণু তোমায় ডেকেছে? রেণু চায় যে আমি মরি, তার পথ পরিষ্কার হোক্। জিগ্যেস করে দেখ তোমার রেণুকে,—সেই বলুক কে তোমায় ডাকৃতে পাঠিয়েছে।

গতিক বাড়াবাড়ি দেখে সমীর হঠাৎ সুর বদলে অনুনয়ের সুরে বলে বউদি, কেন মিছেমিছি ঝগড়া করছো ভাই? শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী হয়ে পড়বে? আমি তোমারই জন্য জোর করে বাইরে যাওয়ার দরকার তৈরী করে চলে গিয়েছিলুম, যাতে করে—

যাতে করে আমাকে ভুলতে পারো, তাই না? গাছে তুলে মই কাড়তে তোমরা পুরুষমানুষরা বড় ওস্তাদ। কেন, কেন তবে এ বাড়ীতে এসেছিলে? এত বড় দিল্লীতে কি থাকবার জায়গা মেলে না। আমি ত বেশ ছিলুম, আমার স্বামী কৃপণ হোক্, বোকা হোক্, যাই হোক্, তাকে নিয়েই ত আমার আঠারো বছর বেশ কেটেছে, কেন তুমি আমার সংসারে হানা দিয়ে ঘুমন্ত মৌচাকে ঢিল দিলে। গৌরী বিছানার ওপোর ফের উঠে বস্‌লো, বল্লে আমি এর বিচার চাই, অন্য কারুর কাছে নয়, তোমাকেই এর বিচার করতে হবে।

সমীর বল্লে, দোহাই বৌদি, চেঁচামেচি কোরো না, রেণু শুন্‌লে কি ভাববে বল দেখি?

যাই ভাবুক, ওর ভাবার জন্য আমি গ্রাহ্য করি না। ওটাকে আমি একদিনেই বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবো, কিন্তু আগে তোমার কাছে কথা পেতে চাই, তুমি আমায় এভাবে অপমান করো কি মনে করে?

আমি তোমায় অপমান করেছি, কি করে, কবে? সবিস্ময়ে সমীর প্রশ্ন করলে।

নয় ত কি? সকালে একবার মাত্র আমার ঘরে এসে মামুলী দুটো কথা বলে সেই যে বিদেয় হলে, সেই তখন থেকে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত কি রাজকার্য্য করছো বলত শুনি? রেণু পর্য্যন্ত হাসে, বলে ছোটদাবাবু বাইরে একলাটি চুপ করে বসে আছে। এসবের মানে কি, আমি আগে তাই জানতে চাই। বল্‌তে বল্‌তেই গৌরীর চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরে পড়লো জল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়লো।

এই ধরণের মান অভিমান সমীর তার পয়তাল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় কখনও দেখে নি, দেখার সময়ও ঠিক পায় নি। সখের থিয়েটারে অভিনয় সে করেছে, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করতে সে ওস্তাদ, দেশের কাজে স্বার্থ বলি দিচ্ছি ভেবে অসীম দুঃখবরণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে তার বড় ভালো লাগে, কিন্তু বুভুক্ষু মধ্যবয়সী নারীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা যে বিপুল দাবানলের সৃষ্টি করতে পারে, সেই সর্বনাশীর সংবাদ বেচারা সমীর কখনও পায় নি। সমীর ভেবেছিল, তার তিন সপ্তাহের অদর্শনের পরে সে আবার পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুভাবে এ বাড়ীতে এসে গৌরীর কাছে দাঁড়াতে পারবে, কিন্তু বেচারায় ঠিকে ভুল হয়ে গেল। বুভুক্ষুর ক্ষুধা যে এই অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠবে, প্রতিপক্ষ রেণুর সান্নিধ্যে গৌরী যে গত তিন সপ্তাহের প্রতি পলে পলে এত উদ্দাম, এমন হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, তা সে কল্পনাও করে নি। তিন সপ্তাহের অদর্শনে সমীর প্রায় সুস্থ হয়েই এসেছিল, কারণ এই তিন সপ্তাহের মধ্যে তার ভ্রাম্যমাণ পরিস্থিতি ও কাজের ভিড়ের মধ্যে ছিল নানাবিধ বৈচিত্র্য, কিন্তু গৌরীর এই তিন সপ্তাহে কি ছিল? বৈচিত্র্যহীন একমুখী চিন্তা, কুৎসিত দর্শনা-আশ্রিতার প্রতি নিদারুণ ঈর্ষা, পূর্ব্বের অভ্যস্ত, অতি পরিচিত, প্রায় পর্য্যুষিত স্বামীর সঙ্গে নব পরিচিত সমীরের তুলনা করে নব নব ক্ষোভের সঞ্চার এবং এই সকলের সমন্বয়ে গৌরীর প্রতিটি মধ্যাহ্ন তাকে কঠোর ধিক্কার দিত, দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত্ত তার কাছে হাহাকারের নিঃশব্দ তুফান তুলে বেচারা গৌরীকে একেবারে বারদরিয়ায় এনে ফেলেছে। শরীরের যন্ত্রগুলো তার কোনদিনই বিশেষ মজবুত ছিল না, দু'চার দিন ক্ষুধামান্দ্যের পরেই তার পুরাতন অম্লশূল তাকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে, এমন সময় সমীর এসে তার কুশল জিজ্ঞাসা করলে নেহাৎই এক মামুলী পরিচিতের মতো; সে যেন সহস্র যোজন দূর থেকে তাকে দেখ্‌ছে, সে যেন একেবারেই স্বামীর বন্ধু হয়ে গেছে। গৌরীর স্পষ্ট মনে হল, অদ্যকার প্রভাত যেন দুর্ব্বাশার অভিশাপের মতো গৌরী বল্লভের মন থেকে গৌরীকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে সেখানে স্থাপনা করেছে হয়ত ঐ একচক্ষু রেণুকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। বাইরের ঘরের টাইম-পিস ঘড়িটায় সাড়ে বারোটা বাজ্‌লো। গৌরীর স্থির শায়িত মূর্ত্তির দিকে হতাশভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে সমীর কিছুক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা করলে, শেষে খপ্ করে তার পায়ে হাত দিয়ে বল্লে, বৌদি, আমায় ক্ষমা করো, যদি ভুল করে—

গৌরী তার পা'খানা সরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো। সমীর তার হাত ধরে অল্প টান্‌তেই সে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়লো সমীরের কোলের ওপোর।

এক হাত দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আর সমীর তার ডান হাতখানা গৌরীর মাথায় বুলোতে লাগলো। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো রেণু, কাঁচের গেলাসে করে আধ গেলাস হরলিকস তৈরী করে নিয়ে এসেছে।

সমীর ব্যস্ত হয়ে পড়লো, কিন্তু গৌরীর ভ্রূক্ষেপ নেই। রেণু মাথা হেঁট করে গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে তার ওপোরে কোন ঢাকা পর্যন্ত না দিয়ে কোন কথাটি না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সে বোধ হয় পালিয়ে বাঁচল।

রেণু চলে যাওয়ার পর সমীর বলে, ছিঃ, এটা কি হোল?

সহাস্যমুখে গৌরী সমীরের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, ঠিকই হয়েছে। সে বুঝুক যে বাক্স খোলার অধিকার দিলেই সব অধিকার পাওয়া যায় না। কানী মাগী কোথাকার?

একটু চুপ করে থেকে সমীর বললে, কিন্তু সে যদি সদাকে সব কথা বলে দেয়।

বলুক, তোমার বন্ধু ওকে বিশ্বাসই করবে না।

কি রকম?

সে ব্যবস্থা হয়েছে, সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না।

সমীর বললে, সে কি?

গৌরী বললে, সে যাক, এখন দাও দেখি হরলিক্সটা। ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি যে।

সমীর টেবিল থেকে হরলিক্সের গেলাসটা তুলে নিয়ে গৌরীর হাতে দেওয়ার উপক্রম করতেই গৌরী বললে, রোগী কখনও নিজে হাতে গেলাস ধরে খেতে পারে?

ইঙ্গিতটা সমীর বুঝলে, নিজে হাতে গেলাস ধরে গৌরীকে দুধটা অল্পো অল্পে সমস্তটা খাওয়ালে। পানান্তে খাটের ওপোর রাখা তোয়ালে দিয়ে গৌরীর মুখটা মুছিয়ে দিলে। গৌরীও পরম নির্ভরে বালিশে মাথা দিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে বললে, এইবার সেরে উঠবো, দু'একদিনের মধ্যেই। তারপর সমীরের হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে বললে, মাথাটা বড় ধরেছে গো, একটু টিপে দেবে।

অসহায় সমীর গৌরীর মাথা টিপতে লাগলো, কিন্তু তার মুখখানা দেখলেই মনে হোত সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। যে কোন সাধারণ নারীর দৃষ্টিতেই এই চিন্তা অতি সহজেই ধরা পড়তো, কিন্তু তিন সপ্তাহ উপবাসের পর বহু দুঃখে, অমৃতের আকণ্ঠ-পান আদায় করার আনন্দে গৌরী এতই মশগুল ছিল যে, তার অনুভূতিতে সমীরের কোন রকম ভাববৈকল্যই ধরা পড়লো না। গৌরী এখন সত্যই আনন্দিত, সে জয়লাভ করেছে।

[ক্রমশঃ]

অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বৌদ্ধবাদ

আনন্দ ভিক্ষু

"নম তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধসস্"

বৌদ্ধবাদ বুঝতে হলে প্রথমেই এইসত্য বুঝতে হবে যে বুদ্ধদেবের নিজস্ব বোধীর সঙ্গে প্রাচীন ঋষিদের মোক্ষধর্ম্ম উপলব্ধির কোনই মৌলিক পার্থক্য নেই। আমরা যেসব মতগুলিকে বৌদ্ধবাদ বলে অর্থাৎ নাস্তিকতাবাদ বলে মনে করি,—সেগুলি বুদ্ধের দ্বারা সংকল্পিত নয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা বুদ্ধচিন্তাকে "অনুসরণ" করার একান্ত অক্ষমতা থেকে এবং "অনুকরণ" করার দুরপনেয় দুর্ব্বলতা দিয়ে সংকল্পিত। যেমন শঙ্করাচার্য্য ও আধুনিক "সন্ন্যাস" অর্থাৎ গীতার "সন্ন্যাস যোগ"—ও গীতার আবরণে গড়ে উঠা আধুনিক ভারতীয় "গুরুবাদীয়" ও "আশ্রমবাদীয়" "অদ্ভুত সন্ন্যাসবাদ"। যেমন চৈতন্য দেব ও আধুনিক "অদ্ভুত বৈষ্ণববাদ"। এমনিই বুদ্ধ ও উত্তরকালীয় বৌদ্ধ অনুকরণকারী (ভাববাদের অবশ্যম্ভাবি পরিণতি)দের মধ্যে এক বিভ্রান্তিকর বৈষম্য "অদ্ভুত সন্ন্যাস ও বৈষ্ণববাদের" মতই গড়ে উঠেছে; যার প্রকট বিকাশ প্রত্যেকটি বাদেরই মর্ম্মে, গুণ ক্ষোভের অবসরে, অসংখ্য শাখা প্রশাখায়, এমনকি পরস্পর বিরোধী চিন্তা-দুষ্টতায় দূষিতও হয়ে পড়েছে। বুদ্ধবোধীও বহু দুর্ব্বলবাদীর শাখায় ও নিজস্ব উপলব্ধিহীন দুর্ব্বলতায়, অসংখ্য অধঃ-পাতের দ্বারা রুগ্‌ণ হয়ে গেছে। ভগবান শঙ্করের ও শ্রীচৈতন্যদেবের আবরণের তলায় যেমন প্রচ্ছন্ন অসুরবাদীয় সন্ন্যাসবাদ ও বৈষ্ণববাদ গজিয়ে উঠে, সমগ্র মূল হিন্দু চিন্তাগুলিকে "সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিতের ধূর্ত্তশক্তি বলে এক মহা তামসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির "আহরণ মাধ্যম" রূপে ব্যবহার করার মতন ক'রে, সম্পূর্ণরূপে এক "আশ্রমী গুরুবাদীয় ধোঁকাবাজী"তে পরিণত করে ফেলেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মও ঠিক সেই একই ক্লীবত্বে পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই বৌদ্ধবাদকে বুঝতে হলে "বুদ্ধদেবকেই বুঝতে হবে প্রথমে। আমরা বুদ্ধদেবকেই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোতে চিনতে চেষ্টা কোরবো।

বুদ্ধদেব বেদের নিন্দা করেছেন বলে সাধারণতঃ আমরা চিন্তা করি যে তিনি "নাস্তিক"। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, কর্ম্মকাণ্ডবাদী ও জ্ঞানকাণ্ডবাদীদের বিবাদ চিরন্তন। গীতাতেও দেখা যায় বেদব্যাসবলছেন—"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ "অর্থাৎ যাঁরা বেদেরপুষ্পিত বাক্যে স্বর্গত্ বিপ্রতিপন্ন হয় তাদের অবিপশ্চিৎ অর্ধাৎ মোহান্ধ পর্য্যন্ত বলা হয়েছে। গীতা আরো বলেন "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ॥ অর্থাৎ সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হলে কুয়ো বা পুকুরের যে প্রয়োজন থাকে, যিনি 'বিজানন' Realiser 'বিদুর' illuminated,তাঁরও সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড বেদে সেইটুকু মাত্রই প্রয়োজন থাকে। জীবঘাতী যজ্ঞবিধায়ক নিন্দাই যদি বুদ্ধদেবের "নাস্তিকতার" দোষ হয়, তবে উপনিষদ-গুলো যজ্ঞকে দুঃখময় সংসার সাগর পার হওয়ার ব্যাপারে 'ভঙ্গুর ভেলা' মাত্র বলে উপহাস করেছেন। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" (মুণ্ডক) এবং যে মূঢ় সেও ঐ ভেলায় চেপে তেমনি দুর্দ্দশা ভোগ করে, যে দুর্দ্দশা এক অন্ধ, অন্য অন্ধের সাহায্যে পথ চলতে চায়। "জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" এমনি অনেক বেদনিন্দা উপনিষদগুলিতে পাওয়া যায় কিন্তু এতে কি "নাস্তিকতা" প্রমাণ হয়? আচ্ছা, আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোতে "নাস্তিকবাদ"টি সত্যই কি জাতের মনন, আগে সেই বিজ্ঞানটুকু বোঝার চেষ্টা করা যাক্। আমাদের আদর্শ "নাস্তিকবাদী" চার্ব্বাককেই আগে বোঝার চেষ্টা করি। চার্ব্বাক-মননের মধ্যে প্রবেশ করলে প্রথমেই দেখা যাবে তিনি একজন পাকাপোক্ত "উচ্ছেদবাদী" (Nihilist) এবং "উচ্ছেদবাদ" কে প্রবর্ত্তিত করতে তার অবশ্যম্ভাবি প্রয়োজনীয় শক্তি "জড়বাদ" (Malterialism) কে আশ্রয় করতে হয়েছে, এবং এই "জড়বাদের" শক্তিতে আশ্রিত সমস্ত বিকাশ-ই যেমন "সংশয়বাদ", ক্রমে "হেতুবাদ" (Rationalism) তারপর "দৃষ্টবাদ" (positivism)

ইত্যাদিতে পরিণতি লাভ করে শেষ বাদ "প্রেয়বাদে" (Hedonism) পূর্ণ বিকশিত হয়, চার্ব্বাকের বেলাতেও "উচ্ছেদ বাদ" তার উপযুক্ত শক্তি ও গতি ভঙ্গিমা অনুসরণ করে, যথার্থ লক্ষ্যস্থল "প্রেয়বাদে (Hedonism) পৌঁছে গেছে। চার্ব্বাকের "উচ্ছেদবাদে"র যথার্থ পরিণতি দেহবাদ অনাত্মবাদ ও ইহ-সর্ব্বস্ববাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রূপে অভিব্যক্ত। এই অভিব্যক্তিগুলি এমনি, যথা পাপপুণ্য নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, স্বর্গ নরক নেই, পরলোক নেই, পুনর্জ্জন্ম নেই, ঋষিত্ব নেই, ঈশ্বরত্ব নেই, মোক্ষ, নির্ব্বাণ, কৈবল্য, মুক্তি এসব কিছু নেই।

চার্ব্বাক দেহের অতিরিক্ত কিছুই (আত্মা) মানতেন না তিনি বলেন "দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।"

তবে চৈতন্য (conscionsness) কি ? তিনি বলেন "চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে" ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ (ব্যোম্ বাদ দিয়েছেন) এই চারটি ভূত (element) মিলে দেহ রচনা করেছেন ঐ ভূত ৪টির মিলন দ্বারা সঞ্জাত বিকারই "কিন্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্য মুপজায়তে"—চৈতন্য বা আত্মা, "স এবাত্মা, ন চাপরঃ" এইই আত্মা-অন্য আর কিছু নয়। কাজেই শরীর ধ্বংস হলে, আত্মারও বিনাশ তাঁর মতে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। তবে survival of Man ? ওঁর মতে, ও সব বাজে কথা—অতএব "দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ" দেহনাশই মোক্ষ—।

ইহসর্ব্বস্ব চার্ব্বাকের মতে "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ" স্বর্গ নরক বলে কিছু নেইপরলোক, পুনর্জ্জন্ম (কর্ম্মশৃঙ্খলা) বলে কিছু নেই, কাজেই "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?" ভস্মীভূত দেহের আবার পুনরাগমন কেমন করে হবে ? স্বর্গ তো নেইই, তবে নরক ? উত্তরে তিনি বলেন "কণ্টকাদিজন্যং দুঃখমেব নরকম্"। আর ধর্ম্মাধর্ম্ম ? উত্তরে তিনি বলেন "ও সব তো পাগলদের প্রলাপ মাত্র। তার মতে যা কিছু অনুকূল-বেদনীয় pleasant, তাইই উপাদেয়, আর যা কিছু প্রতি-কূলবেদনীয় unpleasant তাইই হেয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম যখন নেই, তখন 'এগুলো থেকে জাত "অদৃষ্টও" থাকতে পারেনা "ততঃ তৎসাধ্যম্ অদৃষ্টাদিকমাপি নাস্তি"।

আচ্ছা অদৃষ্ট (অব্যক্ত, unmanfiested universe) যদি নেই, তবে এই বিশ্ব ও তার বৈচিত্র্য কোথা থেকে এলো ? একি আকস্মিক accidental ? চার্ব্বাকের উত্তর সোজা, তিনি বললেন "স্বভাবাৎ তদ্‌ব্যবস্থিতিঃ"—স্বভাবই 'প্রকৃতি' এই সব ব্যবস্থাপনা করছে। স্বভাব—প্রকৃতি কি ? তিনি উত্তরে বলেন "অগ্নি রুষ্মো জলং শীতং শীতস্পর্শ স্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিত তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ আগুনের উত্তাপ, জলের শীতলতা, বায়ুর শীত স্পর্শতার মতই জগৎ বৈচিত্র্যও স্বভাব সিদ্ধ। "তস্মাৎ দুঃখভয়াৎ নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুম্ উচিতম্— * * * যদি কশ্চিৎ ভীরুঃ দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ, তর্হি স পশুবৎ মূর্খো ভবেৎ" কাজেই দুঃখের ভয়ে সুখকে ত্যাগ করা কখনই উচিত নয়। যদি কোন ভীরু দৃষ্টসুখ (আপাতসুখ) ত্যাগ করে, সে পশুর মত মূর্খ। কাজেই এই সত্য স্থির যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন সমস্ত কিছুই উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, তখন "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ যতদিন বাঁচ, সুখে বাঁচ, ঋণকরে হলেও (পরিশোধের ব্যবস্থা নেই) ঘৃত খেয়ে যাও। "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ নাস্তিমৃত্যোরগোচরঃ" যতদিন বাঁচ, সুখেই বাঁচ কারণ মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। সেইজন্য সুখই (ঐহিক) জীবের লক্ষ্য, এবং চরম সুখ হচ্ছে "অঙ্গনালিঙ্গম্" (sex) এই সুখই চার্ব্বাকের "পুরুষার্থ" "অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্যং সুখম্ এব পুরুষার্থঃ" তার মতে "বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রগুলো বাজে কথা বলে আমাদের জীবন-গুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়, কিন্তু ঐ গুলোর প্রমাণ্য কি ? তার মতে "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশা-চরাঃ" বেদ তিনটির কর্ত্তারা ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর (চোর), এ'বেদ মানতে হবে কেন ? "প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেঃ অনঙ্গী কারেণ প্রমাণাভাবাৎ অর্থাৎ বেদকে লোকে "আগম"বলে—বেদ নাকি আগম-প্রমাণসিদ্ধ"। চার্ব্বাক বলেন "প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত কোন প্রমাণই নেই,—অনুমানই অসিদ্ধ, আগমতো দূরের কথা !"

অতএব বহু বিড়ম্বনা থেকে পার হতে হলে এই "রমণীয়" (যাতে রমন, মৈথুন করা যায়) চার্ব্বাক মতের আশ্রয় নাও "বহূনাং প্রাণিনাম্ অনুগ্রহার্থং চার্ব্বাকমতম্ আশ্রয়নীয়মিতি রমণীয়ম্" (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)।

চার্ব্বাক মতের একটি নাম 'লোকায়তবাদ"

(wide-spread) এই নামটি সার্থক। নাস্তিকতা জীবের ক্ষুধার (feelnig of want) vital force প্রাণশক্তি তৃষ্ণার (satire, অতৃপ্তি) কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা। নাস্তিকতা জীব জীবন বোধে নিগূঢ় ভাবে নিরূঢ়।

কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত "নাস্তিকবাদ" এর প্রবর্ত্তক চার্ব্বাক নন, তারও অনেক আগে এক অজ্ঞাত বৃহস্পতির বহু শ্লোকের মর্ম্মে এই মতের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। সর্ব্বদর্শন চার্ব্বাক মতকে বৃহস্পতি মতানুযায়ী বলে ইঙ্গিত দেন, এবং বৃহস্পতির নামের সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকটি বচনও উদ্ধৃত করেছেন। একেবারে নির্ভেজাল দ্বিধাহীন নাস্তিক্যবাদ বুঝতে হলে, আর একজন নাস্তিকের মতবাদ বুঝে, তার পর আমরা "বুদ্ধবাদ"টিকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানানুযায়ী বুঝতে চেষ্টা কোরবো। এই দ্বিতীয় নাস্তিককেশরী হচ্ছেন রামায়ণের জাবালি।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে এসেছেন ভরতের সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন, এই সময় জাবালি এসে রামচন্দ্রের কুটিরে উপস্থিত। সমস্ত ইতিহাস শুনে তিনি রামচন্দ্রকে বললেন "ন তে কশ্চিৎ দশরথঃ ত্বং চ তস্য ন কশ্চন" পিতৃসত্য? ওতো এক ধোঁকাবাজী, দশরথ তোমার কে? পিতা-পুত্র এই সম্বন্ধ? "উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ঃ - তুমি উন্মাদ। "প্রত্যক্ষং যৎ তদ্ আতিষ্ঠ পরোক্ষংপৃষ্ঠতঃ কুরু" দেখ, প্রত্যক্ষই সার—পরোক্ষ বলে কিছুই নেই। "ন নাস্তি পরম্ ইত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে' হে মহামতি, পরলোক বলে কিছুই নেই, ইহলোকই সর্ব্বস্ব। "দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।

যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপঃ তপ্যস্ব সন্ত্যজ"

অর্থাৎ দান, দীক্ষা, তপস্যা, ত্যাগ—মূর্খদের প্রতারণা করার জন্য এইসকল বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাবন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নেই, যারা ধর্ম্মের জন্য, পুরুষার্থের জন্য, কষ্ট স্বীকার করে—তারা কৃপার পাত্র—"তান্ তান্ শোচামি, নেতরান্"। কেন?

'তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য, বিনাশং প্রেত্য লেভিরে'

দেহের অতিরিক্ত যখন আত্মা নেই—তখন শরীরের সঙ্গে আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী নয় কি? কাজেই যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে অন্নের অপব্যয় উপদ্রব ছাড়া আর কি?

"অষ্টকা পিতৃদৈবত্যম্ ইত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ

অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিম্ অশিষ্যতি?

রামায়ণে দেখা যায়, ঐসব যুক্তি দেখিয়ে জাবালি শ্রীরামচন্দ্রকে ধর্ম্মব্রত থেকে চ্যুত করতে চেয়েছিলেন। জাবালির বক্তৃতা শুনে শ্রীরামচন্দ্র বললেন একি!" ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্ব্বস্য চোচ্যতে" ধর্ম্মই সবকিছুর মূল—সত্যেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সেই সত্য ত্যাগ কোরবো? একি ভয়াবহ সুনাস্তিক, ধর্ম্মদ্রোহী মতবাদ! কাজেই দেখা যাচ্ছে, সেই সুপ্রাচীন রামায়ণের যুগেও ভারতবর্ষে নাস্তিকমতের প্রচার ছিল।

নাস্তিক মতবাদ কি, তাই বোঝবার জন্য দুজন বিখ্যাত নাস্তিকের মতবাদাংশ বল্লাম। এবার বুদ্ধযুগের নাস্তিক-বাদ কিছুটা বিবৃত করলেই, "নাস্তিকবাদ" কি ও কেমন, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে গেলে, বুদ্ধদেবের মতবাদ নাস্তিকবাদ কিনা, স্পষ্ট বোঝা যাবে।

বুদ্ধদেবের সময়েও নাস্তিক মতবাদের অভাব ছিলনা। "মজ্‌ঝিম-নিকায়"-তে এই নাস্তিকবাদ এমনিভাবেই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে, যথা "নত্থি দিন্নং, নত্থিমিট্ঠং, নত্থি হুতং, নত্থি সুকত দুক্কতানং, কম্মানাং ফলং বিপাকো, নত্থি অয়ং লোকো, নত্থি পরোলোকো, নত্থি মাতা নত্থি পিতা, নত্থি সত্তা ওপপাতিকা, নত্থি লোকে সমনব্রাহ্মণা সম্মগ্‌গতা সম্মা পটিপন্না যে ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সয়ং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তি।"

অর্থাৎ ভিক্ষা, ত্যাগ বা নিবেদন বলে কিছু নেই। ভালো বা মন্দ কর্ম্ম ও সেইসব কর্ম্মের সুখ বা দুঃখ বলে কোন ফলই নেই। পরকাল নেই কাজেই ইহকালও নেই। পিতামাতা বলে কোন কিছুই নেই। তাদের ছাড়া জীবের অস্তিত্ব নেই বা থাকবেনা এও সত্য নয়। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ বলে কোন অস্তিত্বই নেই। যারা বোধ বা জ্ঞানের শিখরে পৌঁছতে পেরেছেন, যাদের গতি নির্ভুল, ইহজগৎ ও পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে বলতে পারেন এমন কেউ নেই। আবার বলা হচ্ছে 'চাতুম্মহা-ভূতিকো অয়ংপুরিসো,' অর্থাৎ ৪টি মহাভূতের সমাহারে যে দেহ গঠিত, তাইই জীব।

'যদাকালং করোতি পঠবী পঠবীকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আপো আপোকায়ং, অনুপেতি অনুপগচ্ছতি,

তেজো

তেজোকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, বায়ো বায়ো কায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আকাশং ইন্দ্রিয়াণি সংকমন্তি।' অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। মৃত্যু হলে ক্ষিতি ক্ষিতিতে, অপ্ জলে, তেজঃ অগ্নিতে, মরুৎ বায়ুতে এবং ইন্দ্রিয়গুলো (The senses) আকাশে মিলিয়ে যায়। আবার বলা হচ্ছে "আনন্দি পঞ্চমা পুরিসা মতং আদায় গচ্ছন্তি, যাব আলাছনা পদানি পঞ্ঞায়ন্তি, কাপোত কানি অট্ঠীনি ভবন্তি। ভস্মন্ত হুতিয়ো দত্তুপঞ্ঞত্তং যদ্ ইদং দানং। তেসং তুচ্ছং মুসা বিলাপো যে কেটি অস্তিকবাদং বদন্তি। বালেচ পণ্ডিতেচ কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জন্তি বিনস্সন্তি, ন হোন্তি পরং মরণাতি' অর্থাৎ চারজন বাহক, মৃতদেহ পঞ্চমটিকে বয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়, এবং মন্ত্রপাঠ করে সেই মৃতের উদ্দেশে দানাদি সমস্তই মৃতের অস্থির সঙ্গে ভস্মে পরিণত হয়। এই দানাদি কর্ম্ম এক মূর্খ মতবাদ। এই দানাদি কর্ম্ম শুভফলদায়ক বলে বিশ্বাস করা এক ভয়ঙ্কর অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা, এক অলস কল্পনামাত্র। অজ্ঞবিজ্ঞ সবাই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই নাশ ও অস্তিত্বহীন হয়। কাজেই ইহলোক পরলোক, এরকম ভেদ করা এক মূর্খবাদ। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ, কর্ম্মফল এসবই একেবারেই মিথ্যাবাদ। দান, শীল, ত্যাগ, কৃত্য, এসবই পণ্ডশ্রম, নিরর্থক ও মিথ্যা—এসবই এইমতে 'doctrine of fo ls'—এই হোলো বৌদ্ধযুগের নাস্তিক্যবাদ। বুদ্ধদেব নিজে এই সমস্ত নাস্তিকতাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছেন এবং খণ্ডন করেছেন। এসব নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন

"সচে ইমস্স ভোতো সত্থুনো
সচ্চং বচনং অকতেন মে এত্থ কতং, অবুসিতেন মে অত্থং বুসিতং,
'উভোপি মযং এত্থ সমসমা সামঞ্ঞং পত্তা……অতিরেকং যো পন ইমস্স ভোতো সত্থুনা নগ্গিয়ং মুণ্ডিয়ং উক্কুটিক প্রধানং
কেন মসস্সুলোচনম্', যোহং পুত্তসংবাধনয়নং অজ্ঝাবসন্তো,
কাসিক চন্দনং পচ্চনুভন্তো, মালা গন্ধবিলেপনং ধারন্তো, জাতরূপজতং সাদিয়ন্তো ইমিনা ভোতা সত্থারা সমসমগতিকো ভবিস্সামি অভিসম্পরায়ং। সো অত্রন্ধচরিয়াবাসো অয়ংতি ইতি বিদিত্বা
ব্রহ্মচরিয়া নিব্বিজ্জ পক্কমতি। অর্থাৎ যদি এই সমস্ত নাস্তিক মতবাদ সুস্থিত ও সত্যোপেত হোতো তবে মানবের তাবৎ নৈতিক বিকাশই নিরর্থক হয়ে যেত—Every mcral effort upon this earth would be purposeless. এইসব যাঁরা বস্ত্রহীন হয়ে, মুণ্ডিতমস্তক ইত্যাদি হয়ে, বহু প্রকারের কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা ভিক্ষুব্রত ধারণ করে চলেছেন, আর যাঁরা সন্তানাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, কষয়ে বস্ত্রে ও মালাচন্দনাদি সুরভি দ্বারা সুশোভিত হয়ে, স্বর্ণরৌপ্য ও বিবিধ মণিমাণিক্যে গড়া আভরণে আবরিত হয়ে থাকেন, এঁদের দুই গোষ্ঠির মানুষের ভাগ্যই তবে একরকম হোতো। কিন্তু তা কখনো সম্ভব নয়, অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগের ফল কখনো একই হতে পারেনা। তাই বুদ্ধদেবের মতে নাস্তিক মতবাদ হেয় ও অগ্রাহ্য and recognisiag that this is an antithesis to the higher life, and not the path to the truth, he turns away in diagust.

মানুষের মধ্যে একটা সুস্থির, প্রকৃতিস্থ, natural instinct আছে, এরই নাম Moral। জড়বাদীর সাবধানে গড়ে তোলা, মহা শক্তিশালী জড়বাদীয় তর্কের ভেলাটি এ অধ্যাত্মসত্যের অচলে আঘাত পেয়ে বার বার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। উচিত অনুচিত সম্পর্কে মানব মননের এই যে প্রকিতিস্থ, natural সংস্কার, (ভোগের স্মৃতি) যাকে স্বারসিক বিবেক বলে,—বুদ্ধ চেতনার সেইই হোলো ভিত্তিফলক, এইই বৌদ্ধবাদের Corner Stone। যারা নাস্তিক, যাঁরা ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য মানেন না, অথচ নীতিবাদী, বুদ্ধদেবের মূল শিক্ষার মধ্যে নিশ্চয় তাঁরা ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। আগামীবারে আমরা বুদ্ধদর্শনের চিন্তাগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে চেষ্টা করে চল্‌বো।

(ক্রমশঃ)

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব্ব

বঙ্গানুবাদঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বৈশম্পায়ন উবাচ

স এবমুক্তস্তু মুনির্নারদো বদতাং বরঃ।

কথয়ামাস তৎসর্বং যথা শপ্তঃ স সূতজঃ ॥১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্। যুধিষ্ঠির এরকম জিজ্ঞাসা করলে পরে বক্তৃমণ্ডলীমধ্যে—শ্রেষ্ঠ নারদ সূতপুত্র কর্ণ কিভাবে শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন তা বিবৃত করলেন।

নারদ উবাচ

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।

ন কর্ণাৰ্জুনয়োঃ কিঞ্চিদবিষহ্যং ভবেদ্রণে ॥২

নারদ বললেন – মহাবাহু-ভরত নন্দন, তুমি যেরকম বলছ ব্যাপার সে রকমই। বাস্তব পক্ষে কর্ণ আর অর্জুনের কাছে যুদ্ধে কিছুই অসাধ্য থাকতে পারত না।

গুহ্যমেতৎ তু দেবানাং কথয়িষ্যামি তেঽনঘ।

তন্নিবোধ মহাবাহো যথা বৃত্তমিদং পুরা ॥৩

অনঘ! ইহা দেবতাদের গুপ্ত কথা,—যা এখন আমি বলছি। মহাবাহো! পূর্বকালে ঘটিত এই বৃত্তান্ত যথাযথ ভাবে তুমি শ্রবণ কর।

ক্ষত্রং স্বর্গং কথং গচ্ছেচ্ছস্ত্রপূতমিতি প্রভো।

সংঘর্ষজননস্তস্মাৎ কন্যাগর্ভে বিনির্মিতঃ ॥৪

প্রভো! একসময়ে দেবতাদের মধ্যে বিচার হল—কি উপায়ে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের শস্ত্রাঘাতে পবিত্র করে স্বর্গে পাঠান যায়। এই চিন্তা করে তাঁরা সূর্য দ্বারা কন্যার গর্ভে এক তেজস্বী বালক উৎপন্ন করলেন—যিনি সংঘর্ষের জনক হলেন।

স বালস্তেজসা যুক্তঃ সূতপুত্রত্বমাগতঃ।

চকারাঙ্গিরসাং শ্রেষ্ঠাদ্ ধনুর্বেদং গুরোস্তদা ॥৫

সেই তেজস্বী বালকই সূতপুত্ররূপে খ্যাত হলেন। তিনি আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য থেকে ধনুর্বেদের শিক্ষা প্রাপ্ত হলেন।

স বলং ভীমসেনস্য ফাল্গুনস্য চ লাঘবম্।

বুদ্ধিং চ তব রাজেন্দ্র যময়োর্বিনয়ং তদা ॥৬

সখ্যং চ বাসুদেবেন বাল্যে গাণ্ডীবধন্বনঃ।

প্রজানামনুরাগং চ চিন্তয়ানো ব্যদহ্যত ॥৭

রাজেন্দ্র! তিনি ভীমসেনের বল, অর্জুনের লঘুতা, যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি, নকুল সহদেবের বিনয়, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সঙ্গে বাল্যেই শ্রীকৃষ্ণের মিত্রতা, তারপর পাণ্ডবদের প্রতি প্রজাদের অনুরাগ দেখে চিন্তামগ্ন হয়ে জ্বলে যাচ্ছিলেন।

স সখ্যমকরোৎ বাল্যে রাজ্ঞা দুর্যোধনেন চ।

যুষ্মাভির্নিত্যসংদ্বিষ্টো দৈবাচ্চাপি স্বভাবতঃ ॥৮

এ কারণে তিনি বাল্যাবস্থাতেই রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন করলেন। দৈবের প্রেরণায় এবং স্বভাবের বশে তোমাদের প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করতে লাগলেন।

বীর্যাধিকমথালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ম্।

দ্রোণং রহস্যুপাগম্য কর্ণো বচনমব্রবীৎ ॥৯

একদিন, অর্জুনকে ধনুর্বেদে অধিক শক্তিশালী দেখতে পেয়ে, একান্তে দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে বললেন।

ব্রহ্মাস্ত্রং বেত্তুমিচ্ছামি সরহস্যনিবর্তনম্।

অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ ॥১০

সমঃ শিষ্যেষু বঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ধ্রুবম্।

ত্বৎপ্রসাদান্ন মাং ব্রূয়ুরকৃতাস্ত্রং বিচক্ষণাঃ ॥১১

গুরুদেব! আমি ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ ও তাকে পুনরানয়ন শিক্ষা করতে চাই। আমার ইচ্ছা হচ্ছে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করি। নিশ্চয়ই সকল শিষ্য ও পুত্রের উপর আপনার সমান স্নেহ। আপনার কৃপায় যেন বিদ্বানেরা বলতে না পারেন এ (কর্ণ) সব-অস্ত্রে পারদর্শী নয়।

দ্রোণস্তথোক্তঃ কর্ণেন সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি।

দৌরাত্ম্যং চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ ॥১২

কর্ণ এরূপ বলার পরে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত যুক্ত দ্রোণাচার্য কর্ণের দৌরাত্ম্য বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন।

ব্রহ্মাস্ত্রং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ যথাবচ্চারিতব্রতঃ।

ক্ষত্রিয়ো বা তপস্বী যো নান্যো বিদ্যাৎ কথঞ্চন ॥১৩

বৎস। ব্রহ্মাস্ত্রকে জানতে পারে ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত

পালনকারী ব্রাহ্মণ, অথবা তপস্বী ক্ষত্রিয়। অন্য কেহ কোন রূপেই ইহা শিক্ষা করতে পারে না।

ইত্যুক্তোঽঙ্গিরসাং শ্রেষ্ঠমামন্ত্র্য প্রতিপূজ্য চ।

জগাম সহসা রামং মহেন্দ্রপর্বতং প্রতি ॥১৪

একথা বলা হলে পরে অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের আদেশ নিয়ে ও তাঁর যথোচিত পূজা করে কর্ণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের নিকটে চলে গেলেন।

স তু রামমুপাগম্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।

ব্রাহ্মণো ভার্গবেঽস্মীতি গৌরবেণাভ্যগচ্ছত ॥১৫

তিনি পরশুরামের নিকট গিয়ে শিরনত করে প্রণাম করলেন, এবং আমি ভৃগু বংশীয় ব্রাহ্মণ একথা বলে গুরুভাবে তাঁর শরণ নিলেন।

রামস্তং প্রতিজগ্রাহ পৃষ্ট্বা গোত্রাদি সর্বশঃ।

উষ্যতাং স্বাগতং চেতি প্রীতিমাংশ্চাভবদ্ ভূশম্ ॥১৬

পরশুরাম গোত্র আদি সকল কথা জিজ্ঞাসাকরে তাঁকে শিষ্য ভাবে গ্রহণ করলেন এবং বললেন—'বৎস, তুমি এখানে থাক, তোমাকে স্বাগত জানাই।' এভাবে বলে তাঁর উপর মুনি খুব প্রসন্ন হলেন।

তত্র কর্ণস্য বসতো মহেন্দ্রে স্বর্গসংনিভে।

গন্ধর্বৈ রাক্ষসৈর্যক্ষৈর্দেবৈশ্চাসীৎ সমাগমঃ ॥১৭

স্বর্গলোকের মত সুন্দর মহেন্দ্র পর্বতে থাকাকালে কর্ণের সঙ্গে গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও দেবতাদের সঙ্গ মিলনের সুযোগ ঘটতে লাগল।

স তত্রেষ্বস্ত্রমকরোদ্ ভৃগুশ্রেষ্ঠাদ্ যথাবিধি।

প্রিয়শ্চাভবত্যর্থং দেবদানবরক্ষসাম্ ॥১৮

সেই পর্বতে ভৃগু শ্রেষ্ঠ পরশুরামের নিকট থেকে বিধি পূর্বক ধনুর্বেদ শিক্ষা করে কর্ণ তা' অভ্যাস করতে লাগলেন। তিনি দেবতা, দানব ও রাক্ষসগণের অতি প্রিয় হয়ে উঠলেন।

স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বিচরন্নাশ্রমান্তিকে।

একঃ খড়্গধনুষ্পাণিঃ পরিচক্রাম সূর্যজঃ ॥১৯

একদিন সূর্যপুত্র কর্ণ হাতে খড়্গ ও ধনুর্বাণ নিয়ে সমুদ্রের তীরে আশ্রমের নিকটে ভ্রমণ করছিলেন।

সোঽগ্নিহোত্রপ্রসক্তস্য কস্যচিৎ ব্রহ্মবাদিনঃ।

জঘানাজ্ঞানতঃ পার্থ হোমধেনুং যদৃচ্ছয়া ॥২০

পার্থ! সে সময়ে এক অগ্নিহোত্রী বেদপাঠী ব্রাহ্মণের হোমধেনু সে দিকে বেরিয়ে এল। তিনি অজ্ঞানবশতঃ সেই ধেনুকে অকস্মাৎ হত্যা করলেন।

তদজ্ঞানকৃতং মত্বা ব্রাহ্মণায় ন্যবেদয়ৎ।

কর্ণঃ প্রসাদয়ংশ্চৈনমিদমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥২১

অজ্ঞানতাবশত এ অপরাধ ঘটে গেছে। এ বুঝতে পেরে, কর্ণ ব্রাহ্মণকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন করার জন্যে বললেন—

অবুদ্ধিপূর্বং ভগবন্ ধেনুরেষা হতা তব।

মম তত্র প্রসাদং চ কুরুষ্বেতি পুনঃ পুনঃ ॥২২

ভগবন্! অজ্ঞানতাবশতঃ আপনার গাভী আমি হত্যা করেছি। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে কৃপা করুন। কর্ণ বার বার এ অনুনয় করলেন।

তং স বিপ্রোঽব্রবীৎ ক্রুদ্ধো বাচা নির্ভর্ৎসয়ন্নিব।

দুরাচার বধার্হস্ত্বং ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে ॥ ২৩

যেন বিস্পর্ধসে নিত্যং যদর্থং ঘটসেঽনিশম্।

যুধ্যতস্তেন তে পাপ ভূমিশ্চক্রং গ্রসিষ্যতি ॥ ২৪

ব্রাহ্মণ তাঁর কথা শুনেই কুপিত হয়ে উঠলেন আর কঠোর বাক্যদ্বারা তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন—দুরাচারী তুই বধের যোগ্য। তুই এই পাপের ফল পাবি। তুই যাকে সর্বদা ঈর্ষ্যা করছিস, তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়ে তোর রথের চাকা মেদিনী গ্রাস করবে।

ততশ্চক্রে মহীগ্রস্তে মূর্ধানং তে বিচেতসঃ।

পাতয়িষ্যতি বিক্রম্য শত্রুর্গচ্ছ নরাধম ॥২৫

হে নরাধম! যখন তোর রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে। আর তুই অন্যমনস্ক থাকবি। তখন তোর শত্রু পরাক্রম সহকারে তোর মস্তক ছেদন করবে। এখন তুই চলে যা।

যথেয়ং গৌর্হতা মূঢ় প্রমত্তেন ত্বয়া মম।

প্রমত্তস্য তথারাতিঃ শিরস্তে পাতয়িষ্যতি ॥ ২৬

ওরে মূঢ়! যে ভাবে অসাবধান হয়ে তুই আমার গাভী হত্যা করেছিস, সে রকম অসাবধান অবস্থায়ই তোর শত্রু তোর শিরশ্ছেদন করবে।

শপ্তঃ প্রসাদয়ামাস কর্ণস্তং দ্বিজসত্তমম্।

গোভির্ধনৈশ্চ রত্নৈশ্চ স চৈনং পুনরব্রবীৎ ॥২৭

এই ভাবে শাপ প্রাপ্ত হয়ে কর্ণ সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকে অনেক গাভী এবং ধন-রত্ন দান করে তাঁকে প্রসন্ন করায় চেষ্টা করলেন। তখন তিনি এ প্রকার উত্তর দিলেন—

নহি মেঽব্যাহৃতং কুর্যাৎ সর্বলোকেঽপি কেবলম্।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা যদ্ বা কার্যং তে তৎ সমাচর ॥২৮

সারা জগৎ এসে দাঁড়ালেও আমার এ বাক্যের অন্যথা হবে না। তুই এখান থেকে যা, বা এখানে দাঁড়িয়ে থাক, অথবা তোর যাহা ইচ্ছে তাহা কর।

ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণেনাথ কর্ণো দৈন্যাদধোমুখঃ।
রামমভ্যাগমদ্ ভীতস্তদেব মনসা স্মরন্ ॥ ২৯

ব্রাহ্মণ একথা বলার পর কর্ণের বড় ভয় হল। তিনি দীনতাবশতঃ শির নত করলেন। মনে মনে সেই (অভিশাপের) কথা চিন্তা করতে করতে পরশুরামের নিকট ফিরে এলেন।

(ইতি শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসন-পর্বণি কর্ণশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।)

———

সর্বভুক মহাকাল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সর্বভুক মহাকাল চিরঔদরিক
নিকটে যে নাই তা'র কাহারও নিস্তার ;
উদর সবার ভরে, ভরে না তো তা'র ;
চর্বণ—চোষণ তা'র চলে নির্নিমিখ।
অহোরাত্র অবিরাম,ভুলি' দিগ্বিদিক্
গ্রোগ্রাসে সে গিলিবেই ; হিংস্র নির্বিচার
সূচনা-সমাপ্তিহারা দুর্বার ক্ষুধার
নিত্য-জঠরাগ্নি তা'র জ্ব'লবেই ঠিক।
নিষ্কৃতি যেথায় নাই, নির্ভীকতা ভালো।
দেহ-ভোজ-গৃহ তাই স্বেচ্ছাবৃত্তি সুখে
সাজাও ; মশাল সেথা মহানন্দে জ্বালো ;
তুলে দাও সব সত্তা মহাকাল মুখে।
দণ্ডেকও সে ভাবে যদি এ ভোজ্য রসালো,—
অমৃত-আস্বাদে তা'র মৃত্যু যাবে চুকে।

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দু'এক দিন পরে, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ করে, সুহাস এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে স্থির করে ফেলল। আবার অন্য কোন জায়গায় গিয়ে নতুন করে সে গড়ে তুলবে তার জীবন।

মনে পড়ল রুণুর কথা। সে ভদ্রলোক অর্থাৎ তার বান্ধবীর মামা চাকরীতে বহাল থাকলে এখনও রুণু সুহাসের একটা চাকরী করে দিতে পারতো। সুহাস বিশ্বাস করল রুণু তা অবশ্যই পারতো। কিন্তু সে এখানে থাকার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারতো না।

রুণুর প্রতি একটু মমতাও জাগল সুহাসের মনে। তার মনে হল, রুণু যেন এ-সংসার ছাড়া জীব। এখানে যেন সে যত্ন করে দাদাকে আটকে রাখতে চায়, স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে। সুহাস চলে যাবে শুনে রুণুর মধ্যে যে ভাবান্তরের আকুলতা সে লক্ষ্য করেছে তা মন থেকে মুছে ফেলবার নয়। সুহাসের ব্যাপারটা যেন অলক্ষ্যেই তার মনে বেজে উঠেছিল তাই বোধ হয় সে নারীত্বের পক্ষপুট দিয়ে আড়ালে রাখতে চেয়েছিল সুহাসের চলে যাবো বলার দীর্ঘশ্বাসের ব্যথাটাকে।

সুহাসের মনে হল রুণুর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে মনীষার। মনীষা কোন নিকট আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হবার নয়। তবু অবিচারের পাশে যখনই সুহাসের মনে ব্যথা বেজে উঠত, কোথা থেকে ঠিক সময়ে মনীষা ছুটে আসতো তার পাশে, সান্ত্বনার প্রলেপে দূর করবার চেষ্টা করতো তার ব্যথা।

সেও একদিন এমনই তারাভরা অন্ধকার রাতে এসে বলেছিল, কেন বাইরে চলে যাবে সুহাস। এখানেই থেকে, নিজের অধিকার বজায় রেখে অন্য কোন কাজ করার চেষ্টা করো।

সে রাতের পর জ্যেঠাইমা দু'জনের মধ্যে তুলে দিলেন একটা ব্যবধানের শক্ত প্রাচীর। একজনকে এখান থেকে চিরদিনের মত বিদায় না নিলে গ্রামের সামাজিক দৃষ্টিতে অহেতুক আর একজন দগ্ধ হবে। তাই সুহাস চলে যাবার সঙ্কল্প করে বেরিয়ে পড়েছিল। মনীষাও জানতে পারেনি অন্তর্নিহিত কারণ।

তার মধ্যেও মনীষা গোপনে দেখা করে জানিয়েছিল, জ্যেঠাইমার গোপন অভিসন্ধির কথা সেদিনের বয়সের পরিমাপের অনভিজ্ঞ মন দিয়ে সুহাস কিছুই বুঝতে পারে নি। তাই আজ মনীষা তার কাছে হয়ে উঠল পরম শ্রদ্ধেয়া। নিজের জীবনে অহেতুক কলঙ্কের বোঝা টেনে নিয়েও অবিচারের পাশে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার শক্তি ও সৎ সাহস তার চরিত্রকে মহান করে তুলল সুহাসের মনে।

আকাশের ক্ষীণ তারাগুলো কেঁপে কেঁপে, দুলে দুলে উঠল সুহাসের দৃষ্টিপথে।

তার সামনে ভেসে উঠল বিশ বছর আগের সেই চলে-যাওয়ার দৃশ্যটা। হাতের একটা পুঁটলীতে কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিষ বেঁধে নিয়ে পেছনের সমস্ত টান ও মায়ার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে সে বেরিয়ে পড়েছিল অজানার উদ্দেশ্যে। খানিক দূরে এসে সে দেখতে পেল পথের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে মনীষা। তার চোখ দু'টো জলে ভর্তি।

চলতে চলতে মনীষারই পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল সুহাসকে।

মনীষা বলেছিল, সত্যি সত্যি তুমি চলে যাবে এ আমি ভাবতে পারিনি। কিন্তু এ ভাবে চলে গেলে একটা মিথ্যেকে শুধু প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে। তাই এখনও বলছি, যেয়ো না।

সুহাস বলেছিল, দুঃখ কোরোনা মনীষা। এত বড় বাড়ীতে, এত পরিজন ও স্বজন থাকতে কেউ তো আমাকে এসে বলল না—যাস্‌নি নদান। একমাত্র তুমিই আমার পথের সঙ্গী ভোলা মনটাকে কাঁদালে। আর কাঁদালে চির-জীবনের চে । এই পথের মোড়কে আর তোমার মাথার ওপরের ঐ করবী গাছটাকে। চির জীবন এরা তোমার কান্নার স্বরকে জাগিয়ে রাখবে আমার অস্তিত্বকে কান্নায় ডোবাবার জন্যে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে সুহাস আবার বলেছিল, যেতে আমাকে হবেই, বাধা দিওনা মনীষা। তোমার চোখের জল মুছে ফেলে আমার যাত্রা পথকে পরিষ্কার করে দাও।

আর একটিও কথা বলেনি মনীষা। সত্যসত্যই সে চোখের জল মুছে ফেলে নীরব নয়নে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটায়।

সুহাস পিছন ফিরে তাকিয়েছিল কয়েক বার। মনে হয়েছিল মনীষা যেন কাঁদছে আর বলছে, যেয়ো না।

তারপর কোন ফাঁকে লৌহদানব তাকে তুলে নিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল সমস্ত সম্পর্কের, সমস্ত চিন্তার আর সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে।

তা সত্বেও ফেলে আসা পথ আর মনীষার অশ্রুভারে ছলছল করে ওঠা চোখের তারা দু'টো স্মৃতিভারে জর্জরিত করেছে সুহাসকে বারে বারে।

চিন্তার অবসরে আকাশের তারাগুলো যেন আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হবার বাসনা নিয়ে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে এক এক করে। ভোরের ঠাণ্ডা রাশি রাশি বাতাস এসে যেন চিন্তায় উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শীতল করে শিথিল করে আনল।

ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিদের মুড়ি বাতাসা কাড়াকাড়ির ঝগড়া আর চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল সুহাসের। বিছানা ছেড়ে সে দেখল সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সারার দিকে মন দিয়েছে সকলেই।

কেউ রান্না ঘরের দাওয়ায় গোবর মাটি নিকোচ্ছে। কেউ কুলো থেকে ধান বেছে ফেলছে। কেউ ঝাঁটা হাতে উঠোন পরিষ্কার করছে। সদর দরজায় বিজন একটা পাড়ানির সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তার কোমরে গামছা বাঁধা। বোধ হয় পুকুরে নাইতে যাবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েছে।

সুহাস চোখ মুখ ধোবার জন্যে, রাত্রে খাবার জলের জন্যে পাশে রাখা ঘটিটা তুলে নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে এগোতেই দেখল, রুণু স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে বাড়ীর মধ্যে আসছে।

সামনে সুহাসকে দেখতে পেয়ে রুণু বলল, কালকের কথা মনে আছে তো দাদা?

মুখ ধুয়ে এসে একটু পরেই বেরুবো বলে, সুহাস চলে গেল পুকুর ঘাটের দিকে।

পুকুর ঘাটে এসেই সুহাস দেখতে পেল জ্যেঠাইমা পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে স্নান ঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়ির ওপর বসে হরিনামের মালা নিয়ে জপ করছেন আর আশপাশের মেয়ে বউদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দু' একটা কথা বলছেন।

সুহাসকে দেখতে পেয়ে জ্যেঠাইমার জপ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মালাটা মুঠোর মধ্যে ধরে তিনি স্নানরতা মেয়ে-বউদের কাউকে কলা বউ, কাউকে মোচা বউ ইত্যাদি ধরনের নাম করে ডাকাডাকি করে সুহাসের দিকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, এ আমার মেজ ঠাকুর পোর ছেলে সেই নদান রে?

সুহাস দেখল, মেয়ে-বউদের মধ্যে অনেকেই আড়চোখে তারদিকে তাকিয়ে দেখল।

জ্যেঠাইমা বলে যেতে লাগলেন, সহরের বড় নাম করা উকিলের মুহুরী ছিল এতদিন। অনেক টাকা পয়সা করে ফিরে এসেছে আমার কাছে। কোথায় আর যাবে? কাল রাতে তাই ও আমাকে বলছিল, জ্যেঠাইমা, আমি তো মানুষ চিনি, আর এখেনকার সকলে আমার বাবাকে কত কষ্ট দিয়েছে তাও জানি। তাই খালি তোমার জন্যেই আমার প্রাণটা কাঁদে।

বলে, একটু ঢোক গিলে নিয়ে জ্যেঠাইমা ধরা গলায় বললেন, আহা বাছা আমার রে, মা-বাপ মরা ছেলে। কাল থেকে ওর কথা শুনে প্রাণটা আমার হু হু করে করে উঠছে। যতই হোক মা-মরা ছেলে আমার কোলে পিঠে চড়ে তো মানুষ!

কথাগুলো শেষ করে, জ্যেঠাইমা আবার মালাটাকে বাগিয়ে ধরে জপে বসলেন।

সুহাস সব শুনল। কোন কথা বলল না। পুকুরের জলে মুখ চোখ, হাত পা ধুয়ে আপন মনে উঠে চলে এল বাড়ীর ভেতরে।

রোয়াকের ওপর উঠতে গিয়ে সামনে পড়ল বিজন। সে বোধহয় সুহাসের ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

সুহাসকে একটু পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে চুপি চুপি বলল, ছোড়দা, যদি গোটা দশেক টাকা দিতে পারো, বড়ই উপকার হয়। আমাদের এই সারা মুলুকে এক ফোঁটাও তেল নেই। বাড়ীরও অবস্থা তাই। আমি আজ যাচ্ছি বগড়ী হাটের পাশেই একটা জমি খোঁড়াবার কাজে। হাতে একটাও পয়সা নেই। তোমার কাছ থেকে দশটা টাকা পেলে হাট থেকে কিছু তেল এনে সংসারে দিতে পারি। নইলে বাচ্চা-কাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়াই বন্ধ যাবে যা দেখছি।

এরপর কোন কথা চলেনা। কিন্তু সুহাসের যা সম্বল, তার থেকে দশটাকা দেওয়া যায়না। দিলে তার হাতে আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই সে বলল, বিজন, দশটা টাকা তো আমার হাতে নেই এখন, তুমি বরং পাঁচটা টাকায় কাজ চালিয়ে নাও।

বলে, সুহাস বিজনকে ডেকে জ্যেঠাইমার ঘরে এনে জামার পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বিজনের হাতে দিল।

বিজন হাতে টাকা নিয়ে বলল, এতে তো কিছু হবেনা দাদা। আমি বরং কারুর কাছ থেকে বাকী টাকাটা ধার করে নিয়ে কাজটা উদ্ধার করি। সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এলেই বাকী টাকাগুলো শোধ করে দিও।

কথা শেষ করে কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই বিজন হন্ হন্ করে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে গেল।

জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সুহাসের মনটা শুকিয়ে ছোট হয়ে গেল। এত বড় একটা সাংসারিক প্রয়োজনে তার সামান্য সাহায্য কিছুই নয়। কিন্তু বিজন সন্ধ্যেবেলায় এসে আর পাঁচটা টাকা চাইলে সে দেবে কেমন করে?

সহরের তেলের হাহাকার পল্লীজীবনকেও যে এমন করুণভাবে স্পর্শ করেছে ভেবে দমে গেল সুহাসের মনটা। সংসারের চাল, ডাল, তেলের প্রয়োজনের চাহিদার কাছে টাকা কত ছোট হয়ে যায় সে অভিজ্ঞতা আছে সুহাসের জীবনে।

ভবনাথবাবুর সংসারে থাকতে এমন কতদিন গেছে, এক কিলো চালের জন্যে উনুনে জল ফুটছে। এখুনিই চাল চাই। মূল্য সেখানে নিছক। জিনিষটা পেলেই হল। তেল নেই বাজারে। যদি কোথাও খুঁজে খুঁজে একটু মিলল, বেশী দামে নিতে হবে। আর সে তেলে সরষের নাম গন্ধ নেই, আছে শুধু রঙ। তাই সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ততার অন্ত ছিলনা।

তার ওপর ভবনাথবাবুর আর্থিক সচ্ছলতা ছিলনা একেবারেই। সামান্য খুচরো কোন জিনিষ কিনতে লজ্জায় ভবনাথবাবু যেতেন না কোন দোকানে। পাড়ায় সকলেই তাঁকে জানে উকিলবাবু বলে। তিনি যাবেন দৈনিক আধ কিলো চাল কিংবা একশো গ্রাম তেল কিনতে দোকানে, সে কেমন কথা? তাই চাপ পড়তো ছোট মেয়ে কৃষ্ণার ওপরে। আর তার সাধ্যের বাইরের কোন ব্যাপার হলে ডাক পড়তো সুহাসের।

সেই জীবনের ধারাটা এসে পৌছল পল্লীর সুস্থ জীবন-যাত্রার প্রাণ কেন্দ্রে। সুহাসের মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠল এই ভেবে যে বিজন টাকা চাইলে সে কি করবে? শেষ পর্যন্ত সুহাস স্থির করল বাকী টাকা ক'টা সে বিজনকে দিয়ে দেবে।

জামা কাপড় পাল্টে সুহাস এঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকল পাশে কাকীমার ঘরে। কাকীমা, ঝুণু, রুণু, বুলু সকলেই সেখানে উপস্থিত। বোধহয় কোন বিষয় নিয়ে এরা একত্রে সলা পরামর্শে ব্যস্ত ছিল। সুহাসকে দেখে সকলেই থেমে গেল।

কাকীমা বললেন, হ্যাঁরে নদান, তুই নাকি চলে যাবি ঠিক করেছিস? আর তাছাড়া উপায়ই বা কি? শূন্য হাতে এসে এখেনে শেষজীবনে আরাম ভোগ করবে, সে রাস্তা বন্ধ। তাছাড় সহর ঘেঁষা লোক এখেনে বাস করবে কি করে? এ বাড়ীতে যে আসবে দু'দিনেই সে পালাই পালাই করবে।

সুহাস বুঝল, রুণুর কাছ থেকে কাকীমা তার চলে যাওয়ার কথা শুনেছেন। তাই বোধহয় একটু সহানুভূতির সুর জেগে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। সমবেদনার আভাষ

পেয়ে সুহাস বলল, ঠিক সহর ঘেঁষা লোক বলে নয়, আমার মনে হয় কোন মানুষের পক্ষে বাস করার উপযুক্ত জায়গা এটা নয়।

কাকীমার মধ্যে একটু চাঞ্চল্য জেগে উঠল। তিনি বুলুকে দরজার সামনে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলেন। বোধহয় জ্যেঠাইমার রোষ নজর থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে।

তারপর কাকীমার দিকে তাকিয়ে সুহাস বলল, আমি আবার চলে যাবো এটা ঠিকই।

—কিন্তু নন্দান, আমার যে কোন একটা উপায় করে দিয়ে যাস্ বাবা। একটা মেয়েরও বিয়ে দিতে পারলুম না। ওদের দিকে আর আমি তাকাতে পারিনা। তোর নিজের বোনের মত মনে করে……

কথা শেষ করতে না দিয়ে সুহাস বলল, দেখুন কাকীমা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, বাইরে গিয়ে আমি যদি কোন কাজ জুটিয়ে নিতে পারি, তাহলে আপনাদের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবো।

—আমার কথা ছেড়ে দে বাবা। আমি এই ভিটে ছেড়ে কোথাও নড়তে পারবো না। তুই মেয়ে তিনটের যে কোন একটা ব্যবস্থা করে দিস্। তোর হাতে ওদের ছেড়েছিলুম। ভয় হয়, কবে যে কি হয়, বয়েস হয়েছে, আমি চোখ বুঁজলে এদের হয়ত পথে পথে ঘুরতে হবে।

এমন সময় বৌদি অর্থাৎ জ্যেঠাইমার বড় ছেলের বউ ঘরের ভেতর একবার উঁকি মেরে চলে গেল।

সুহাস সেদিকে তাকিয়েও ভ্রূক্ষেপ করল না। কাকীমার কথাগুলোকে তিনটে অবিবাহিত মেয়ের মায়ের স্বাভাবিক কথা ও দাবী বলে মেনে নিল।

কাকীমা বললেন, তোদের সহরে তো শুনেছি অনেক মেয়ে অনেক রকম কাজ করে নিজেদের সংসার চালায়। রুণুটা চালাক চতুর মেয়ে। ওকে নিয়ে গিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি কোন কাজে লাগিয়ে দিতে পারিস্ তাহলে আমার হাড় অনেকটা জুড়োয়।

এতগুলো মেয়ে থাকতে কার দুরভিসন্ধির হাত থেকে রুণুকে আর নিজেকে কাকীমা বাঁচাতে চান বুঝতে বাকী রইল না সুহাসের। সে কথা দিল বাইরে গিয়ে তার স্থিতি হলেই প্রথম সে রুণুর জন্যে ব্যবস্থা করবে।

বুলু, চট্ করে সরে এসে আস্তে আস্তে বলল, জ্যেঠাইমা মালা জপ্‌তে জপ্‌তে উঠোনে পা দিল।

সুহাস কাকীমাকে বলল, রুণুকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।

কাকীমার সম্মতি পেয়ে রুণুকে নিয়ে সুহাস বেরিয়ে গেল পথে।

প্রথমেই দু'জনে এসে দাঁড়াল পিটুলী পাড়ার হরিমোহন পাঠশালা যেখানে ছিল, সেই জায়গাটায়।

পাঠশালা। পাঠশালার মাঠ আর তার পরিবেশের চিহ্নমাত্র নেই সে জায়গায়। আটচালা ভেঙ্গে সেখানে উঠেছে মস্ত বড় 'এল্' সেপের বাড়ী। তার মধ্যের উঠোনটা নানা রঙের ও নানা জাতের ফুলের গাছে ভর্তি।

সামনের যে মাঠটায় কুঁজো নটবর গরু বেঁধে দিয়ে শ্যাওড়া-জঙ্গলের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো, সে মাঠটা হারিয়ে গেছে বিরাট বিরাট দালান বাড়ীর নীচে।

রুণু বলল, ওগুলো কুলিদের থাকবার ব্যারাক।

কুঁজো নটবর আর তার মেয়ে যুথীর কোন খবর দিতে পারল না রুণু।

আটচালার পিছন দিকের লাল পথটা যেখানে তার শাখা পথকে ঠেলে দিয়েছিল শিবতলা মাঠের মধ্যে সে পথটাও অদৃশ্য হয়েছে চুণ-বালি আর কংক্রিটের দৌরাত্ম্যে। অতীত দুঃখের স্মৃতি জড়িত সেই করবী চারাটা কোন পাষণ্ডের হাত দিয়ে নির্মূল হয়েছে ভাবতে গিয়ে ব্যথায় মুষড়ে পড়ল সুহাস।

এ জায়গাটাকে আর চেনা যায় না। সুহাসও হয়ত চিনতে পারতো না যদি রুণু এসে তাকে দেখিয়ে না দিতো।

অতীত যেন হারিয়ে গেল সুহাসের সামনে থেকে। এক নতুন যৌবনের কাছে যেন পরাজয় স্বীকার করেছে, বার্দ্ধক্যে নুয়ে পড়া অতীত।

এই সেই গ্রাম। সুহাস জন্মের প্রথম ক্ষণে যে মাটির বুকে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করেছিল নতুন আলোক। আজ সেই সম্পূর্ণ গ্রামটা যেন কয়েক লক্ষ ইট আর কংক্রিটের ভারী ভারী চাবড়ার দাপটে দেবে গেছে অনেক নীচে। পুরাতন স্নিগ্ধ প্রদীপের পাশে এ যেন সভ্যতার জোর করে ঢুকে-

পড়া কয়েকটা সার্চ লাইট। যে স্নিগ্ধতা আনতে পারে না, পারে না প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার শিক্ষা দিতে, পারে শুধু ঝল্‌সে দেওয়া রূপে নেতিয়ে পড়া লজ্জাবতীকে বিভ্রান্ত করতে।

সেখানে দাঁড়াতে সুহাসের আর মন চাইল না। কেদার মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করার ভারী ইচ্ছে হল তার। যদিও জলা বিল পাড়ার দূরত্ব এখান থেকে অনেকটা তাহলেও দাদার সঙ্গে প্রাণ খুলে ঘুরে বেড়াবার আনন্দে রুণু আগ্রহে রাজী হয়ে গেল।

পথে পড়বে চড়কডাঙ্গার হাট। সেই হাটে হরুর হাঁড়ির দোকান। পাঠশালাজীবনে প্রতিদিন যার দর্শন মিলতো আজ জীবনের মধ্যপ্রহরে তাকে শেষ বারের মত দেখে নেবার আশায় পথ চলতে লাগল সুহাস।

রাস্তা ঘাট বদলে গেছে অনেক। রাঙ্গা মাসীদের বাগানের মধ্যে দিয়ে চওড়া একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে উত্তর দিকে। ষষ্টিতলার পেছনের জঙ্গলটা সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে গড়ে উঠেছে বিরাট একটা কারখানা।

আরো খানিকটা এগিয়ে নেবুতলার হোগলা বনের জলা জায়গায় পাম্প বসিয়ে জল ছেঁকে বের করা হচ্ছে। রুণু জানালো, ওখেনে একটা বড় কলেজ হবে।

এর পরই পড়বে চড়কডাঙ্গার হাট। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে যাওয়ার পর হাট নজরে না পড়ায় সুহাস রুণুকে প্রশ্ন করল।

জবাবে রুণু বলল, সে হাট উঠে গেছে অনেকদিন আগে। এখন সেখেনে গেঞ্জী তৈরীর কল বসেছে। আজকাল যে যায়গাটায় হাট বসে সেটার নাম লটারী বাজার। যে ভদ্রলোক বাজারটা করেছেন তিনি লটারীর টাকা পেয়ে ওটা করেছেন বলে, লোকে ওর নাম দিয়েছে লটারী বাজার।

অনেক পরিচিত অপরিচিত জায়গাকে পেছনে ফেলে সুহাস এসে হাজির হল জলা বিলের ধারে ডোম পাড়ার কাছে একটা খোলার বাড়ীর সামনে।

রুণু বলল, বাড়ীটা ঠিক চিনতে পারছি না। তুমি কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও।

সামনে দিয়ে কতকগুলো শূয়োর মেদভারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ছুটে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। নোংরার স্তূপ ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে পাড়াটার এদিক ওদিকে। পচা জমাট বাধা জল আটকে আছে স্থানে স্থানে। তার গন্ধ নতুন কোন আগন্তুকের অসহ্য। দূরে একটা পচা ডোবার জল সবুজ বর্ণধারণ করে এখানকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে দিচ্ছে।

একটা ছোট ছেলেকে দৌড়ে আসতে দেখে সুহাস তাকে প্রশ্ন করল, এ লেড়কা হিঁয়া কেদারবাবু নামকা কই আদমী রহতা হাঁয় ?

—ওঃ মাষ্টারবাবুকে খুঁজছেন কি ?

সুহাস মনে মনে লজ্জিত হল ছেলেটির পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় কথা শুনে। তাই জবাব দিয়ে নিজের লজ্জাটা ঢাকবার চেষ্টায় বলল, হ্যাঁ কেদারবাবুই মাষ্টার মশাই, তাঁকেই আমরা খুঁজছি।

ছেলেটি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে সেই শূয়োর ঢুকে পড়া গলিটার মধ্যে ঢুকে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এইটা মাষ্টারবাবুর ঘর।

বলেই, ছেলেটি দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সুহাস বাইরের থেকে 'মাষ্টার মশাই আছেন' বলে বার দুই ডাক ছাড়ল।

একটা ছোট ছেলে এসে ওদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। ভেতরটা অত্যন্ত অপরিষ্কার। ছাইয়ের গাদা আর জঞ্জালে সমস্ত উঠোনটা ভর্তি। ছাইয়ের গাদা থেকে কয়েকটা লাউ গাছ উঠে গেছে খোলার চালের ওপর। এক কোণে একটা কুয়ো। কুয়োর চার দিক ঘিরে পচা জলের ভ্যাপ্‌সানি গন্ধ। তার পাশেই একটা ঘরে এরা ঢুকল।

সামনে একটা খাটিয়ার ওপর এক বৃদ্ধ বসে আছেন, হাতে হুঁকো নিয়ে। খালি গা। পরনে একটা ছেঁড়া কাপড়ের লুঙ্গি। চোখে একটা মোটা কাঁচের ফ্রেম-ভাঙ্গা চশমা। মাটির মেঝেতে একটা চট পাতা। তার ওপর চার-পাঁচটা ছোট ছেলে মেয়ে বই শ্লেট নিয়ে বসে আগন্তুক-দের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

সামনের ভদ্রলোকটিও মোটা কাঁচের চোখ জোড়া তুলে ধরলেন এদের দিকে। তারপর একটু সরে বসে খাটিয়ায় বাকী জায়গাটুকুতে এদের বসতে দিলেন।

উভয়েই উভয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই সুহাস প্রশ্ন করল, আপনার নাম কি কেদারবাবু? হরি

মোহন পাঠশালায় কোন সময়ে শিক্ষকতা করেছিলেন কি ?

ভদ্রলোক, একটু চুপ করে থেকে বললেন, কেন বলুন তো ?

—আমি সেখানকার ছাত্র ছিলাম।

সুহাসের নাম, কোন্ শ্রেণীতে পড়তো, বাবার নাম, কোন্ পাড়ার ছেলে, কোন্ সালের ছাত্র সব জেনে নিয়েও ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না সুহাসকে। তাই ভদ্রলোক বললেন, হতে পারে, কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলুম না বাবা ?

ইনিই কেদারবাবু বুঝতে পেরে সুহাস পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। দাদার দেখা দেখি কৃষ্ণও কেদারবাবুকে প্রণাম করল।

সুহাস বলল, এটি আমার ছোট বোন। দীর্ঘদিন এখানে না থাকায়, ফিরে এসে দেখি, এখানকার পথ-ঘাট, লোকজন সবই পাল্টে গেছে। তাই বোনকে সব জিজ্ঞেস করে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে।

এ কথা শুনে কেদারবাবু একটু হাসলেন, বললেন, তা বাবাজীর এতদিন থাকা হতো কোথায় ?

—কোলকাতায়।

কোলকাতার নাম শুনে কেদারবাবু একটু গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা আমার সঙ্গে কি দরকার বাপু ?

—ছোটবেলার থেকেই আমার স্মৃতিতে কয়েকটি মানুষ আদর্শস্থান অধিকার করে আছে। আপনি তাদের মধ্যে একজন। দীর্ঘদিন পরে আপনার চেহারা দেখে চিনতে পারিনি বটে, কিন্তু আজও আপনার সেই বাঙলা পড়াবার কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজছে। তাই প্রথমেই এসে বোনের কাছ থেকে আপনার খবর নিয়েছিলুম। তারপর শুনলুম সেই পাঠশালার কবরের ওপর গড়ে উঠেছে নতুন ইমারৎ। পুরোনকে বাদ দিয়ে নতুনের করতালিতে মুখরিত হচ্ছে তার পরিবেশ।

—এতে তোমার দুঃখ হওয়ার তো কোন কারণ দেখছি না। তোমরা তো আমাদের পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে চলে গেছো, যেমন তেমন নয়, কোলকাতার মত সহরে।

সুহাস কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কেদারবাবু বললেন, এর কোন যুক্তিগত দেখাবার দরকার নেই সুহাস। অতি সোজা ও পরিষ্কার কথা। তোমরা অশ্রদ্ধায় সরে গেলে বলেই তো, ওরা আমাদের সরিয়ে দিতে পারল। কিন্তু সরাবে কোথায় ? যেদিন পাঠশালাকে ওরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল, সেদিন আমাকেও বয়েসের দোহাই দিয়ে ওরা সরিয়ে দিল। সেদিন কই তোমাদের তো পাশে দেখলুম না ! তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ তো এগিয়ে এল না ! তাই বলি, তোমরা আমার কাছে বাঙলা পড়োনি, পড়েছে সুখলা ডোমের ছেলেরা। অথচ তখন ওদের পাঠশালায় নেওয়া হত না।

কেদার মাষ্টারকে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে শুনে সুখলা এসে কেঁদে-কেটে নিয়ে এল তার বাড়ীতে। বলল, মাষ্টারবাবু,আমাদের ছেলেগুলোকে মানুষকরে দাও।

তারপরেই আমি চলে এলাম এখানে। সেই নিয়ে আমার নামে বাবুদের আবার কত কথা ! মুরোদ নেই ছিটে ফোঁটা জাত খাবার যম। আমি কারুর তোয়াক্কা না করেই লেগে গেলুম কাজে। আজও পড়িয়ে চলেছি ওদের। সুখলা ডোম বেঁচে নেই বটে কিন্তু তার এক ছেলে আমারই হাতে সংস্কৃতে কাব্যতীর্থ।

একটু চুপ করে থেকে একবার ঢোক গিলে কেদারবাবু আবার সুরু করলেন, কিন্তু আমাকে সরিয়ে রাখবে কোথায় ? আমাকে যত পিছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে সরিয়ে, সরিয়ে, আমি তত সরতে সরতে জিততে জিততে যাব। দেখছো না সব একাকার হয়ে গেছে। আমি তোমাকে এই বলে রাখলুম সুহাস, মিলিয়ে দেখে নিও, যদি আমি আর দশটা বছর বাঁচি, যে ইস্কুল থেকে আমাকে তাড়ানো হয়েছে, সেই ইস্কুলে আমার এই ডোম ছাত্রদের মধ্যে একজনকে না একজনকে আমি হেডপণ্ডিত করবোই। তবে আমার নাম কেদার-মাষ্টার।

বলে, ঘন ঘন দম নিয়ে হাঁফাতে লাগলেন মাষ্টার মশাই। বয়স হলেও একটা কিছু গড়ার আশা ও স্বপ্নের তারুণ্যে তিনি এতগুলো কথা বলে ফেললেন নেহাৎই আবেগের বশবর্তী হয়ে।

সুহাস ভাবতে লাগল মাষ্টার মশাই কথাগুলো নেহাৎ খায়াপ বলেন নি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবহেলা ও অনাদরে গড়ে উঠেছে কেদার মাষ্টারের এই ভাঁটি-ভাঙ্গা চশমার খাটিয়ায় বসা বৃদ্ধ মূর্তিটি। এই বয়সেও আরো দশ বছর বাঁচার আশা নিয়ে পেছুতে পেছুতে পেছিয়ে থাকার দলকে সামনের দিকে এগি:য় দিয়ে জিতে চলে যেতে চান এ জগৎ ছেড়ে। সুহাসের মনে হল, আমা-দের সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে মাষ্টারমশাইয়ের এটা একটা চ্যালেঞ্জ। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল সুহাসের। মাষ্টার মশাইয়ের ছাত্র যেন হেডপণ্ডিত হয় এই আশা নিয়ে সুহাস আবার তাঁর পদধূলি নিয়ে রুণুর সঙ্গে বেরিয়ে এল পথে।

মাষ্টারমশাই কোন কথা বললেন না। পুরু কাঁচের চশমার চোখ দু'টো তুলে তাকিয়ে রইলেন দূর আকাশের গায়।

[ক্রমশঃ

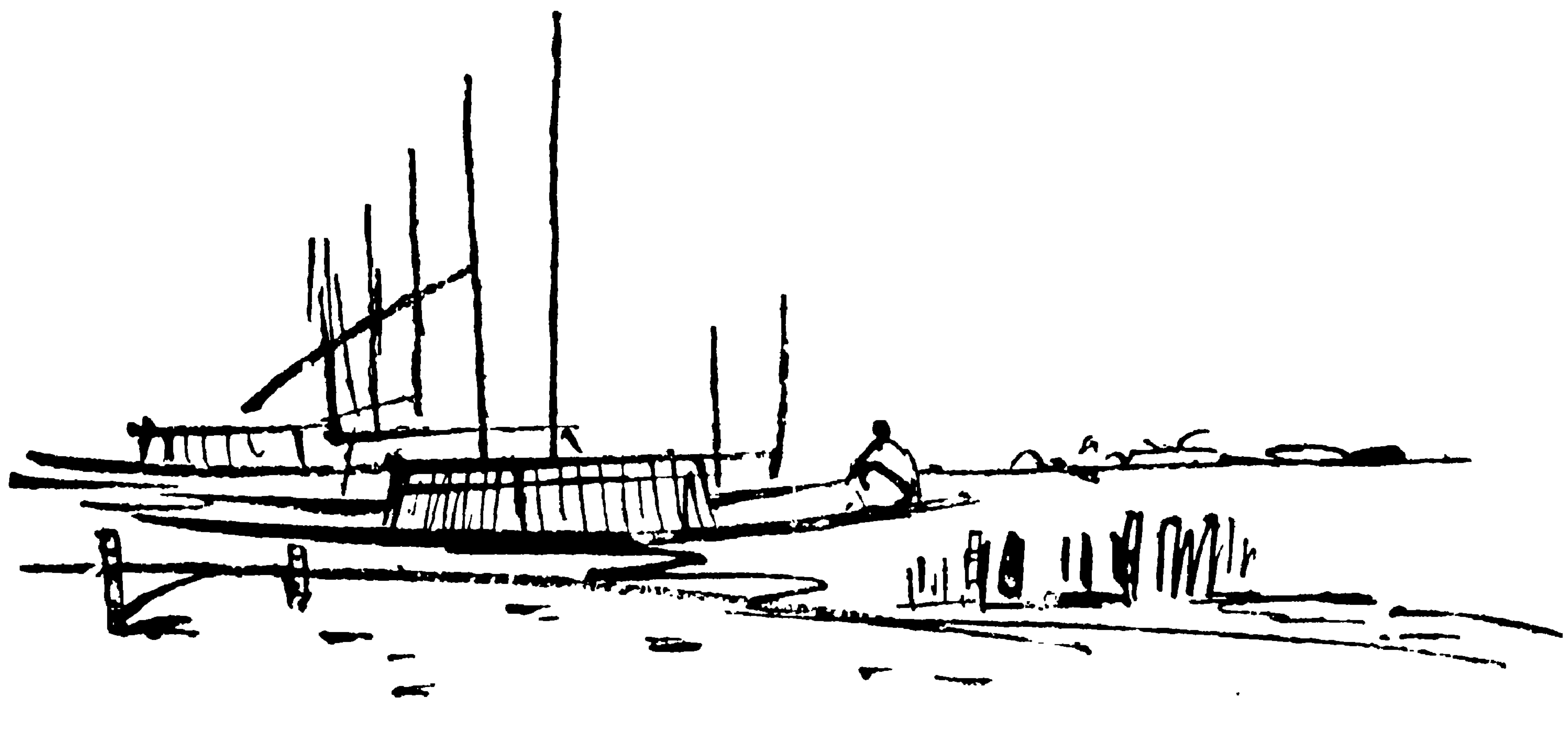

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মায়ার দেশ (হিন্দু আমেরিকা) —মায়ামী ও সাঁ হোয়াণ

মেরিডা :

সন্ধ্যায় লিমোশীন বলে রাখায় জাং হোটেল থেকে বিমানবন্দরে এসে 'প্যানাম' (PANAM) কাউণ্টারে আমার কালো ব্যাগটা জমা দিলাম। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বিমান ছাড়লো। বিমানের কাপ্তেনের সংগে বিমান বন্দরের বিশ্রামকক্ষে আগে থেকেই আলাপ ডায়েরীতে লিখে চলেছি। বিমান চলার শেষের দিকে সামান্য ঝাঁকুনীর জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছিল। ঘণ্টা দেড়েক বাদে মেক্সিকো উপসাগর অতিক্রম করে মেক্সিকো রাজ্যের যুকাটন প্রদেশে রাজধানী মেরিডায় পৌঁছে গেলাম। এখানে আমার হোটেল ঠিক করা না থাকায় মনে যে সামান্য ভাবনা হয় নি একথা শপথ ক'রে ব'লতে পারব না। রাতের বেলা—জানিনা কোথায় যাবো! লিমোশীনের চালক 'কলোন হোটেলে' থাকার জন্য

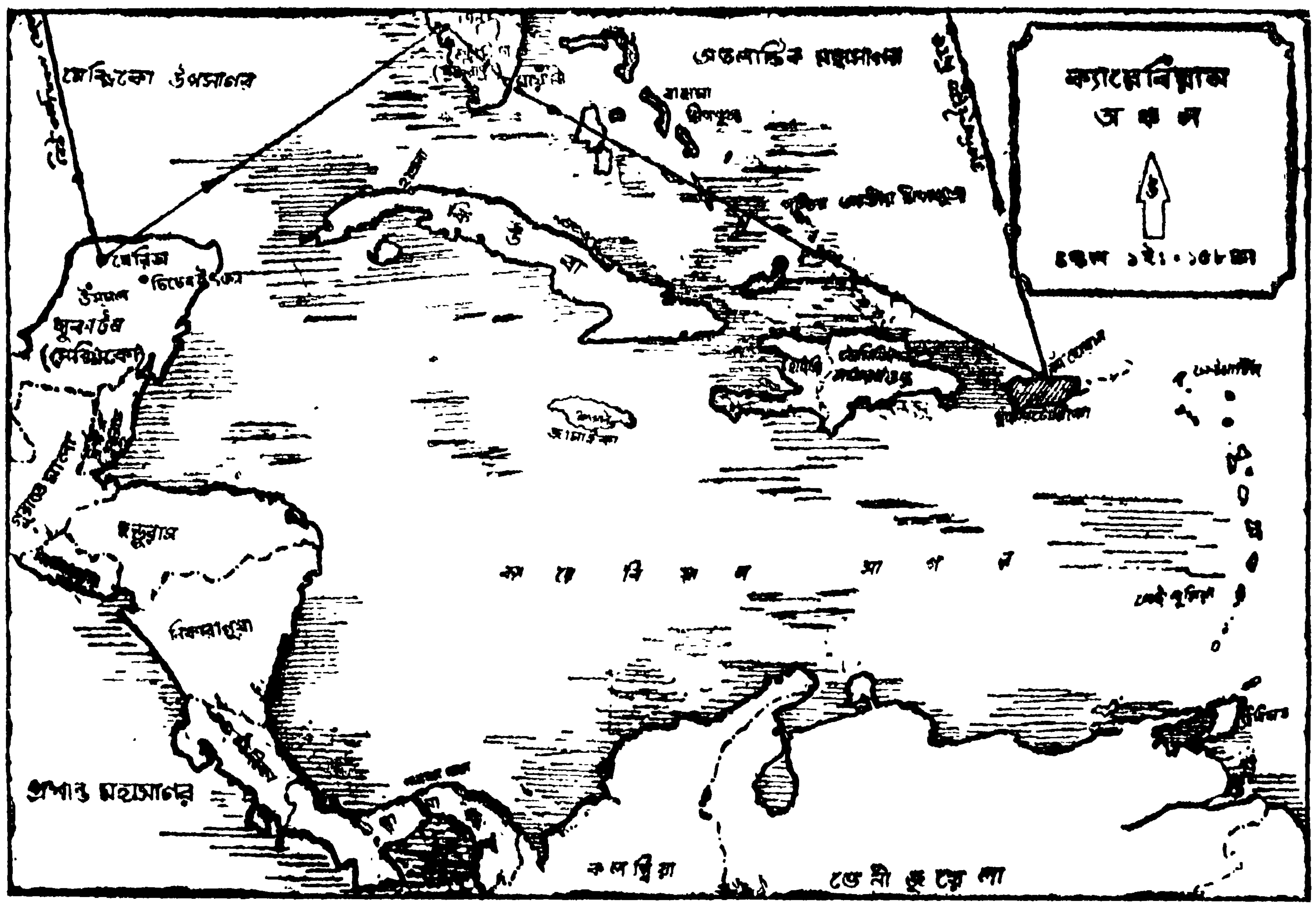

হ'য়েছিল। তিনি আবার বিমানে আসন গ্রহণের পর দেখা ক'রে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন। আমি তখন অনুরোধ কোরল এবং অন্য যাত্রীদের নিয়ে যাবার সময় আমায় 'কলোন হোটেলে' নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন

রাত এগারোটা বেজে গেছে। আমার হাতে মাত্র পূর্ণ দুদিন কিন্তু আসলে তে রাত্তির অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারের রাত্তির। রবিবার সকালে আবার নতুন জায়গায় পাড়ি দিতে হবে।

রাতের শোবার বিছানা ভাড়া আশী পেশো দিলাম। এ ব্যবস্থা ইউরোপীয়ান ধরনে। তার মানে সকালের প্রাতরাশও এই দামের মধ্যে ধরাবে। ভোরবেলা উঠে এক ছ্যাকড়া গাড়ী ভাড়া ক'রে নতুন হোটেলের সন্ধান করতে গেলাম। সকালে অনুসন্ধান ক'রে যে নতুন হোটেল বার করলাম সেখানে লাগবে দৈনিক মাত্র ৩৫ পেশো। সেখানে সংলগ্ন স্নানঘর ও পায়খানা আছে। সারাদিন তো দেখাশোনায় কাটবে বাইরে। রাতে যখন বাড়ী ফিরবো তখন এত ক্লান্ত হবো যে যেখানেই শুই না কেন ঘুমে অচেতন হ'তেই হবে। তখন কত দামের বিছানা ও নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ হবে না হোটেলের হিসেব ক'রে মূল্য দিতে হোটেলওয়ালা বলে যে প্রাতরাশের পৃথক মূল্য দিতে হবে। 'পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' নিরুপায় হ'য়ে অর্থদণ্ড দিলাম। কিন্তু আমার মন আজ ব্যগ্র হিন্দু আমেরিকা দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। দেওয়ান চমনলাল তাঁর Hindu America পুস্তকে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, কিম্বদন্তী ও লোকাচার দৈহিক গঠন ও বর্ণের সাম্য মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও সেখানের অধিবাসীদের মধ্যে দেখেছেন।

হিন্দু আমেরিকার উশমল ও চিচেণ ইৎজা :

যাই হ'ক সামান্য বিশ পেশো প্রাতরাশের জন্য দিয়ে কোন গতিকে সেখান থেকে বেরিয়ে নতুন হোটেলে মালপত্র রেখে সেই ছ্যাকড়া (ঘোড়ার) গাড়ীতেই 'উশমলের বাসের আড্ডার দিকে চললাম। যখন বাসের আড্ডায় পৌছলাম তখন বাস ছাড়ো ছাড়ো। আমার কুড়ি মার্কিণ ডলারের ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙ্গিয়ে আড়াই পেশো পেলাম। এক একটা রূপোর পেশো আগেকার রাণী মার্কা টাকার চেয়ে বড়ো ও বেশী ভারী। 'উশমল' মেরিডা থেকে ৫৮ মাইল দূরে; প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাস চলার পর সেখানে এলাম। উশমলে পৌছবার রেলগাড়ী নেই। বিকল্পে ট্যাক্সী করে যাওয়া যেতে পারে। 'উশমলে'র কাছাকাছি এলেই বাসে বসে দূর থেকে উশমলের রাজ্যপালের প্রাসাদ, যাজিকাভবন, বড় পুরোহিতের নিবাস ও মন্দির, ও আরও সুউচ্চ ধ্বংসাশেষ পথিকের

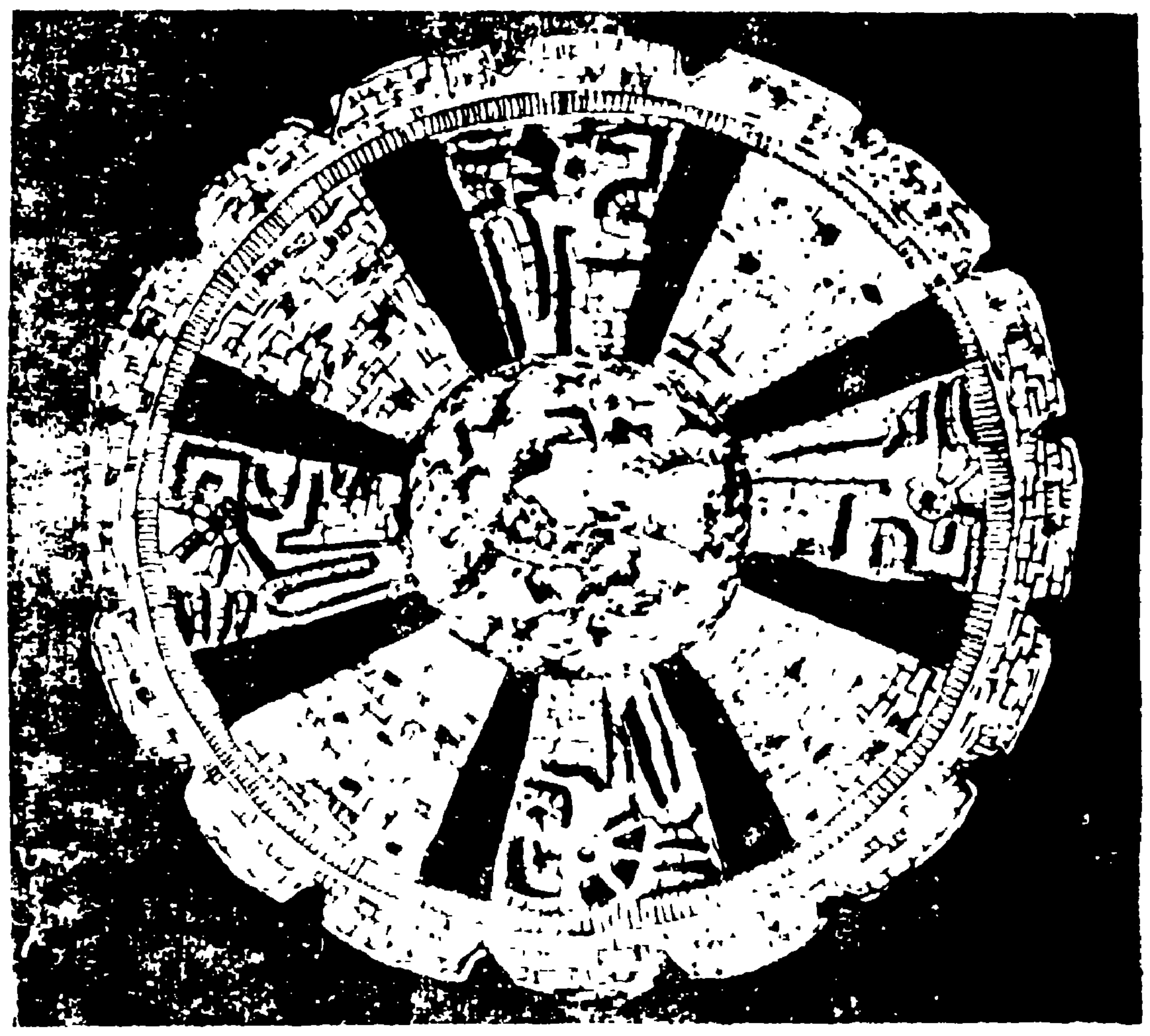

"মায়া" সভ্যতার কালচক্র

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন চিত্র এখানে রয়েছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে কেউ কেউ বলেন, "ভগবানের মুখ থেকে গাছপালা, মাছ, সরীসৃপ, জীবজন্তু, সাপ ও মানুষ ও মানুষকে পাকিয়ে সাপ উঠে গেছে। এর থেকে অনেকের ধারণা এখানে সাপের পুজো হ'ত। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য নির্মল বোসকে অভিষিক্ত ক'রে পাঠাতে হয় প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে। বর্তমানে স্পেনের আধিপত্যে অধিকাংশ লোকই রোমান ক্যাথলিক। চার্চে ঢোকার সময় মেয়েরা মাথায় রুমাল চাপা দিয়ে ঢোকে। ফুল-ফলের ফেরিওয়ালারা চার্চের সামনে ডালা মেলে বসেছে। আর বসেছে সাহেব ভিখিরি।

পরের দিন চিচেন ইৎজার ধ্বংসাবশেষ দেখে এলাম। 'চিচেন ইৎজার' বাসের আড্ডা অন্য জায়গায়। 'চিচেন ইৎজা' মেরিডা থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে। চিচেন ইৎজার বাস সাতটার সময় ছাড়লো ও দু'জায়গায় আধ ঘণ্টা ক'রে থেমে বেলা এগারটা নাগাদ আমরা চিচেন ইৎজার পৌছলাম। 'চিচেন ইৎজা' শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ হ'ল 'চি' অর্থে মুখ, 'চেন' অর্থে-কুয়ো ইৎজা অর্থ একটি 'মায়া' গোষ্ঠী। অথবা 'মায়া' শব্দের জন্য অর্থও 'উৎসর্গের বেদী'। এখানের বিখ্যাত দ্রষ্টব্য হ'ল

'বীর মন্দির,' 'গোল গম্বুজ,' 'কুকুল কানের বিরাট মন্দির' 'Ball Court' প্রভৃতির বিরাট ভগ্ন অট্টালিকা।

মেরিডার রাস্তা :

'চিচেন ইৎজা' থেকে ফিরে এসে হোটেলের সংলগ্ন নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটতে গেলাম। তার মুখ্য কারণ হ'ল ছুটির দিন প্রথমতঃ সময় আছে এবং এখানে চুল ছাঁটার মূল্যও আমেরিকার এক তৃতীয়াংশ। আমেরিকায় চুল ছাঁটার দাম দু' থেকে তিন ডলার; এখানে মাত্র আট পেশো বা ২/৩ ডলার! চুল ছাঁটার সব আধুনিকতম বহু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, দাঁতের ডাক্তারের দোকানের চেয়ারের মত চেয়ার, প্রভৃতি সবই আছে। নাপিতের দোকানের গায়ে দর্জির দোকান ও তার গায়ে খাবারের দোকান। মেরিডার রাস্তাগুলোর নাম সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং উত্তর দক্ষিণের রাস্তাগুলো জোড় সংখ্যায় যেমন ৪০,৪২,৪৪,৪৬,৪৮, তেমনি পূর্ব পশ্চিমের রাস্তা বিজোড় সংখ্যায় যেমন ৩৯,৪১,৪৩,৪৫,৪৭ প্রভৃতি। এখানে লোকেরা বীর পূজার ভাব প্রকাশ করে নেই, তাই লোকের নাম দিয়ে রাস্তার নামকরণ হয়নি। অনেক রাস্তার ছেদ অংশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা নিয়ে পার্ক। প্রাচীন দ্বারকায়ও এমনি খানিকটা খোলা জায়গা অনেক রাস্তার মোড়ে রাখা হয়েছে। পার্ক রেলিং দিয়ে ঘেরা, ও ফুল ও পাতা বাহারের গাছ ও পাম জাতীয় বহু গাছ—পিচাডিয়া, এবিকা পাম প্রভৃতি দাঁড়িয়েরয়েছে। পার্কের মাঝে মাঝে বসার বেঞ্চি। কলকাতার কার্জন পার্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কলকাতার রাস্তার মত ছোট ছোট ছেলেরা 'বুট পালিশ' করার জন্য শুধু ব্যস্ত নয়, বিরক্তও করে। জুতো তারা পালিশ ক'রে দেবেই। পা নিয়ে টানাটানি।

আমার ক্যামেরার ষ্ট্রাপটা ছিঁড়ে যাওয়ার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরার মহা অসুবিধা হচ্ছিল, তাই সেটাকে মেরামত করার বিশেষ প্রয়োজন। বহু অনুসন্ধান ক'রে ঐটাকে মেরামত করিয়ে নেবার জন্য একটা মুচির দোকানে গেলাম। ওরা দেখে শুনে পারবে না বলে দিল। আমার কিন্তু ওটা ঠিক না করলে ক্যামেরাটা বইবার অসুবিধে ও প'ড়ে ভেঙেচুরে যাবারও সম্ভাবনা। তাদের দোকান থেকে যন্ত্র চেয়ে নিয়ে একটা জুতোর 'আইলেট' কিনে লাগিয়ে নিলাম। তাদের যে যন্ত্র ব্যবহার করেছি তার জন্য মূল্য দিতে চাইলে ওরা কিছুতেই দাম নিল না। বিনিময়ে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম।

মেরিডার বাজার :

পরেরদিন ভোরবেলা। মেরিডা সহরটা একটু ঘুরে দেখার বাসনা নিয়ে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লাম। বেলা এগারটা নাগাদ আমার বিমান বন্দরে যেতে হবে। দেখার উদ্দেশ্য এখানকার বস্তি অঞ্চল ও বাজার হাট। সকালে বেরুতেই দেখি ক্যাম্বিসের থলে ও প্লাষ্টিকের ব্যাগে ক'রে বাজার নিয়ে পুরুষ ও মেয়েরা যাচ্ছে আসছে। তাদের ফিরতি পথ ধ'রে আমি বাজারের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। প্রায় মিনিট দশেক হাঁটার পর দেখলাম বাজারের বাইরে চাষীরা রাস্তার ধারে ডালা মেলে বসেছে যেমন কলকাতায় শ্যামবাজারে বাজারের সামনে, কি হাওড়ার কালীবাবুর বাজারের সামনে বসে। এখানে পাইকিরি জিনিষ পত্রের বড় বড় গুদোম রয়েছে। বড় গুদোমের বিপরীত দিকে আমি যে বাজারটায় গেলাম সেটা দোতলা ও তার চেহারা বেশ নতুন ও বাইরের হরিদ্রাভ রংও বেশ উজ্জ্বল! মাছ মাংসের বাজারটা দোতলায়। দোতলার ওঠার কয়েকটা সিঁড়ি রয়েছে। তা'ছাড়া রিণফোর্সড কংক্রীটের একটা ঢালু পথ বড় রাস্তা থেকে একতলার ছাদ পর্যন্ত চ'লে গেছে। রাস্তা থেকে দোতলায় ভারী মাল তোলার জন্য ইলেকট্রিক মোটর-টানা ইস্পাতের মোটা তার লাগানো উইঞ্চ (winch)-ও রয়েছে। সে পথ দিয়ে মানুষ চেষ্টা করলে বেগে উঠতেও পারে।

নীচে কাঁচা বাজার ও শাকসবজি ফলমূল নানা বাজরা ভ'রে চাষী ও ফ'ড়েতে নিয়ে বসেছে। সবজির মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট কদমা কুমড়ো, লাল ও সাদা পেঁয়াজ, লাল ও সাদা মুলো, ছোট বড় আলু, বেগুন, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শাঁসভর্তি টমেটো, গাজর, বীট, শশা, কলা, লেটুস, কাঁচা ও পাকা আম, আনারস, বড় বড় লঙ্কা, বীণ, রাঙা আলু প্রভৃতি।

দোতলায় গরুর মাংস, শুয়োরের মাংস, ভেড়ার মাংস, (পাঁঠার মাংস নয়) সমুদ্রের মাছ—চেতল, ভেটকি, চাঁদা

প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে। দোতলায় আঁশটে গন্ধ হ'লেও সে-গন্ধ নীচের অন্যান্য লোক জনদের বিব্রত করে না। হাঁস ও মুরগীর ডিম, মুর্গী, টার্কি, হাঁস, প্রভৃতি বিক্রির জন্যও এনেছে।

এখান থেকে নীচে নেমে দেখি এক জায়গায় কলে ছোট ছোট রুটী তৈরী হচ্ছে। সেগুলো ছ' ইঞ্চি ব্যাসের বেশী নয়। মাখা ময়দা রোলারের ভেতর দিয়ে পাতলা হ'য়ে বেলে আসছে ও তার উপর একসংগে গোল গোল দুটি ছাপ পড়াতে দু'টি গোল অংশ গ্রহণ করে পাশের উদ্বৃত্ত ময়দাটুকুন তুলে নিচ্ছে। যে যন্ত্র চালাচ্ছে সেই রুটি তৈরী করছে। রুটি এগিয়ে চলেছে শম্বুক গতিতে চলন্ত ছোট লোহার চেন বেল্টে। একটা উষ্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে যেখানে গ্যাসের আগুন জ্বলছে। সেই জলন্ত গ্যাসের প্রকোষ্ঠ থেকে বেরুতে রুটি সেঁকা হ'য়ে যাচ্ছে। সময় ও আঁচ এমন ভাবে বাঁধা আছে যে রুটি ঠিক সেঁকা হয়, পোড়েও না বা কাঁচা থাকেনা ঐ রুটি নেবার জন্যে লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। কেউ ওর ভেতরে কিছু পুর অর্থাৎ মাংসের কিমা বা আলুর তরকারী দিয়ে বা স্যালাড দিয়ে জড়িয়ে বাঁশীর মতো করে নিচ্ছে। তারপর খেতে সুরু ক'রে দিচ্ছে। কেউ বা শুধু সেঁকা রুটি নিয়ে যাচ্ছে। বেশীর ভাগ খদ্দেরই ঐ চাষা-ভূষো ও মজুর কুলি সম্প্রদায়ের। ফিরে আসার সময়ে এক জায়গায় কলের আওয়াজ শুনে বাইরে থামলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি সেখানে সিসল গাছের পাতার আঁশ দিয়ে দ'ড় পাকানো চলেছে। শহরের বাইরে বাংলা দেশের মত মটকামারা খরের চালওয়ালা প্রচুর বাড়ী। ইটের বদলে পাথর দিয়ে অনেক বাড়ীর চারদিকে সীমানায় পাঁচিল তুলেছে। দেখতে অনেকটা ইংরেজীতে যাকে বলে রাব্‌ল্ ম্যাসনরী'র (Rubble masonery) মত।

মেরিডার অবস্থিতি : মেরিডা হ'ল মেকসিকোর অন্তর্গত যুকাটন প্রদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী। যুকাটনের ভৌগোলিক চেহারা হ'ল উটের মুখেরমত। উটের চোখের মণির জায়গায় মেরিডার স্থান। যুকাটনরাজ্যের উত্তরাঞ্চলে সমুদ্র উপকূল থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে এর অবস্থিতি। এখানে একলক্ষ সত্তর হাজার লোক বাস করে। নিকটবর্তী নগর 'প্রগ্রেসো' বন্দর থেকে নৌ বাণিজ্য ও সমুদ্র পথে যাতায়াত চলে। এটী সিসল দড়ির প্রধান প্রস্তুত কেন্দ্র। এখান থেকেই যাওয়া যায় মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে-উশমল, কাবা চিচেনইৎজাস। চিচেনইৎজার বিখ্যাত নৈসর্গিক কূপ এখানের পানীয় জলের উৎস ছিল। চিচেনইৎজার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হ'য়েছিল এই নিশ্চিত জল-সরবরাহে নৈসর্গিক ব্যবস্থা থাকায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উত্তর যুকাটনে নিত্য বহমানা কোন নদী না থাকায় জলের উৎস সন্ধানে মাটির তলায় যেতে হয়। হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতায় ধর্ম কেন্দ্রিক নগরী বিখ্যাত নদীর কূলে কূলে গড়ে উঠেছিল যেমন অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা প্রভৃতি ও কখন কখনও কৌপ্য বারির উৎসকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন হিন্দু বৈদিক সভ্যতায় বিকল্প ভিত্তি ছিল কূপের বারি। যার সন্ধান পাই সন্ধ্যাবিধির আপোমার্জ্জনায়।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃসন্তু নূপ্যাঃ

শন্ন সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ।

মেরিডার জলকল : মেক্সিকো রাজ্যের নবতম জলকল হ'ল মেরিডায়, যেখানে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ছিল অনিশ্চিত, ইতিহাসের পুনরাবর্তনে প্রাচীন কূপ থেকেই জল সংগ্রহ করে বর্তমানে পৌর জল সরবরাহের ব্যবস্থা হ'য়েছে। পরিস্রুত বারি প্রেরণ করা হচ্ছে নল দিয়ে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। ভূতাত্ত্বিক গঠনে যুকাটনের ভূমি চুনা পাথর দিয়ে তৈরী, তার উপর সামান্য কিছু মৃত্তিকার আস্তরণ পড়েছে। যার গভীরতা একফুট থেকে কয়েক ইঞ্চিমাত্র। চুণা-পাথরের গঠনে প্রচুর সামুদ্রিক গুগলি-গেঁড়ির খোলা পাওয়া গেছে। যার ফলে সমুদ্রের ও বৃষ্টিজলের সংযোগে কিছুক্ষণ ধুয়ে যাওয়ায় বহু গহ্বর, ফাটল ও বিদার পাওয়া গেছে। ঐ সব বৃহৎ গহ্বরগুলি অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে বৃহৎ ভূগর্ভস্থ জলধারে পরিণত হয়েছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিসংখ্যানে জানা গেছে এখানে গড় বৃষ্টিপাতের মাত্রা মাত্র ৩৭'৭ ইঞ্চি বা ৯৩৯,৩ মিলিমিটারি। সারা বছর ধরে সামান্য সামান্য বৃষ্টিপাত হয় মুখ্যতঃ মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। উপরের মাটী এত তৃষিত থাকে যে বৃষ্টি পড়ামাত্রই সবটাই মাটীতেই শুঁষে নেয়—'তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম।' মাটীর ওপর দিয়ে বড় একটা

জল ব'য়ে যেতে পারে না। সহরের রাস্তা, পাকা বাড়ীর ছাদ ও টিনের চাল জল শুঁষে নিতে পারে না। সেখানে দৈবে যদি কিছুটা জল পাকা নালা দিয়ে ব'য়ে মাটীতে পৌছয় তখন সে জল বেশীদূর ব'য়ে যেতে পারে না। ঐ সকল ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে, যেমন অনেক জায়গায় পেট্রোলের আধার পাওয়া যায়, জল পাম্প করে এবং কেন্দ্রীয় শোধনাগারে নিয়ে এসে পরিশোধন ও নির্বীজন ও কিছু দ্রবক্ষার দূর ক'রে ঘরে ঘরে নল যোগে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতে মোট তিনলক্ষ জনসংখ্যার জন্য এই জলসরবারহ পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এর ফলে দিনে মাথা পিছু ৪০০ লিটার বা ১০৬ গেলন জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তিন লক্ষ লোকের জন্য সেকেণ্ডে ১৫০০ লিটার জল নিষ্কাসনের প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় ২০টী ইদারার প্রত্যেকটী থেকে সেকেণ্ডে ৭৫ লিটার ক'রে জল তোলা হয়। মোট ২০টী ইদারা গড়ে তোলা হবে যেখানে দু'টি থাকবে বিকল্পও চালুকূপের মেরামতির সময়ব্যবহারের জন্য। অনেক ইদারা থেকে বহু ক্ষেত্রে সেকেণ্ডে ২০০ লিটার জলও নিকাশনের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতি ইদারার পারস্পরিক দূরত্ব ৬০০ মিটার ও সাধারণ গভীরতা মাত্র ৩৫ ফুট। এর জল পরিবাহ ক্ষেত্র ১০ থেকে ১৫ বর্গ কিলোমিটার। চারিদিকের ইদারা থেকে জল কংক্রীটের নালা দিয়ে সংগৃহীত হয় মুখ্য জলকলে। সেখানে উপযুক্ত জল শোধন পর্বের শেষে সহরের নানা জায়গায় পাঠানো হয়।

মেরিডার উপকণ্ঠে সিসল খেত :

পথে যেতে দেখা যায় সহরের উপকণ্ঠে সীমিত সিসল খেতের চারদিকে ট্রলী লাইন পাতা। পাতা কেটে জমা করা হয় ঐ ট্রলীতে ও ঠেলে নিয়ে আসা হয় এক জায়গায়। বড় সিসল খেতের মাঝে বা পাশে যেখানে মালিক বা কর্মচারী বাসা বেঁধে থাকেন সেখানে কূয়ো খুঁড়ে তার মাথায় উইণ্ড মিলের পাখা ঘোরে। সমুদ্র থেকে জোরে যখন হু হু ক'রে বাতাস বয়, তখনই উইণ্ড মিলের পাখা ঘোরে। ঐ পাখার অক্ষ দণ্ডের সঙ্গে পাম্প ফিট করা। সেই জলে ডোবা পাম্প দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে খেত-খামারে দেয় ও নিজেদের গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্যও রাখে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ অঞ্চলের উচ্চতা মাত্র ৩০ ফীট। আবহাওয়া কলকাতার মত। দুপুরে গরমের দিনে বেজায় ঘাম হয়। বাড়ীর নম্বর জানা থাকলে বাড়ী খুঁজে বের করা অতি সহজ কেননা প্রতি মোড়ে ডাইনে বাঁয়ে ও সামনে পেছনে রাস্তার নম্বর দেওয়ালের গায়ে আঁটা। মেরিডা সহরের মধ্যে অধিকাংশ রাস্তাই কংক্রীটে মোড়া। তবে রাস্তাগুলো খুব চওড়া নয়।

মেরিডা থেকে বিদায় :

রাত বারোটার সময় একজন লোক এসে আমার ঘরের দরজায় ঠক্‌ঠক্ করে টোকা দিল। দরজা খুলে জিগ্যেস করলাম "ব্যাপার কি ?"

সে বললো "আমি PAA থেকে আসছি। মায়ামীর বিমান নির্দিষ্ট সময়ের বদলে আরও দেড় ঘণ্টা দেরী করে ছাড়বে। অতএব আপনাকে সম সমকালে এসে নিয়ে যাব।"

আমি বললাম "ভাল কথা। তাই হবে।"

বিমান বন্দর বেশী দূর নয়। যাই হোক পরের দিন সকালে হাতে আরও কিছু সময় এল। কিন্তু আমি চেয়েছি দুপুরে মায়ামী পৌছতে।

মেরিডা থেকে বিমান ছাড়ার সময় সকাল সাড়ে দশটার বদলে অনিবার্য কারণে ছাড়লো বেলা সাড়ে বারোটায়। সেই অনুযায়ী 'লিমোশীন' এসে বিমান বন্দরে নিয়ে গেল। দেড়ঘণ্টা চলার পর বিমান থামলো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর 'তাম্পায়' (TAMPA)। এখানে পনেরো মিনিট বিমান থামবে। 'তাম্পা' সহর সমুদ্রের ধারে 'তাম্পা উপসাগরে'র উপর গড়ে উঠেছে। এটি ফ্লোরিডা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি মায়ামীর আরও উত্তরে ফ্লোরিডার পশ্চিম গা ঘেঁষে অবস্থিত। গোল গোল বড় ডবার মত পেট্রোলের ট্যাংক দিয়ে ভরা সমুদ্রের উপকূল। সমুদ্রের ধাও বাঁধানো। এখানে কয়েকটা এক্সপ্রেসওয়েও গড়ে উঠেছে।

'তাম্পা' ছেড়ে বিমান চললো 'মায়ামীর' দিকে। আমার ট'না টিকিট ছিল মেরিডা থেকে 'পুয়োরটোরিকো' কিন্তু সংবাদ পেলাম যে সোমবার ছুটি। অতএব পুয়োরটোরিকোতে বিশ্রাম না ক'য়ে একটা নতুন শহর ও বহু পর্যটকের আকর্ষণ 'মায়ামী' একদিনের জন্য পরিদর্শন করে যাই। PAA কাউণ্টারে একটা টিকিটের বদলে

মেয়েটী দুটো টিকিট করে দিলেন—একটাতে মেরিডা থেকে 'মায়ামী' অপরটিতে 'মায়ামী' থেকে 'স্যা হোয়াণ'। PAA বিমান বন্দরে বলেছিলাম একটা হোটেল ঠিক করতে। ওরা বলে দিয়েছিল 'লিমিংটন হোটেলে' যাবার জন্যে। বিমান বন্দর থেকে টেলিফোন করে জানলাম আমাদের থাকার হোটেলে রিজার্ভেশন হয়েছে কিনা? সংবাদ পেলাম, ব্যবস্থা হয়েছে। বিমানে মিশর দেশের একটি ছাত্রও চলেছে। মায়ামী থেকে প্রায় মাইল পঁচিশ দূরে' 'সল্ট-পয়েন্ট' (SALT Point) নামক স্থানে পড়াশোনা করতে যাবে। লিমোশীনে ক'রে আমরা দুজনেই লিমিংটন হোটেলে এলাম।

মায়ামী :

মায়ামী ও মায়ামীর সিন্ধুসৈকত ফ্লোরিডা রাজ্যের বিসকেন (BISCAYNE) উপসাগরের উপর অবস্থিত। এখানে সাগর সৈকতের দৈর্ঘ্য প্রায় আট মাইল। সমুদ্রের কূলে সারি সারি বহুতল হোটেল গ'ড়ে উঠেছে। তাঁর সংখ্যা শ'চারেক। এখানকার লোকেরা অধিকাংশ স্পেনিশ

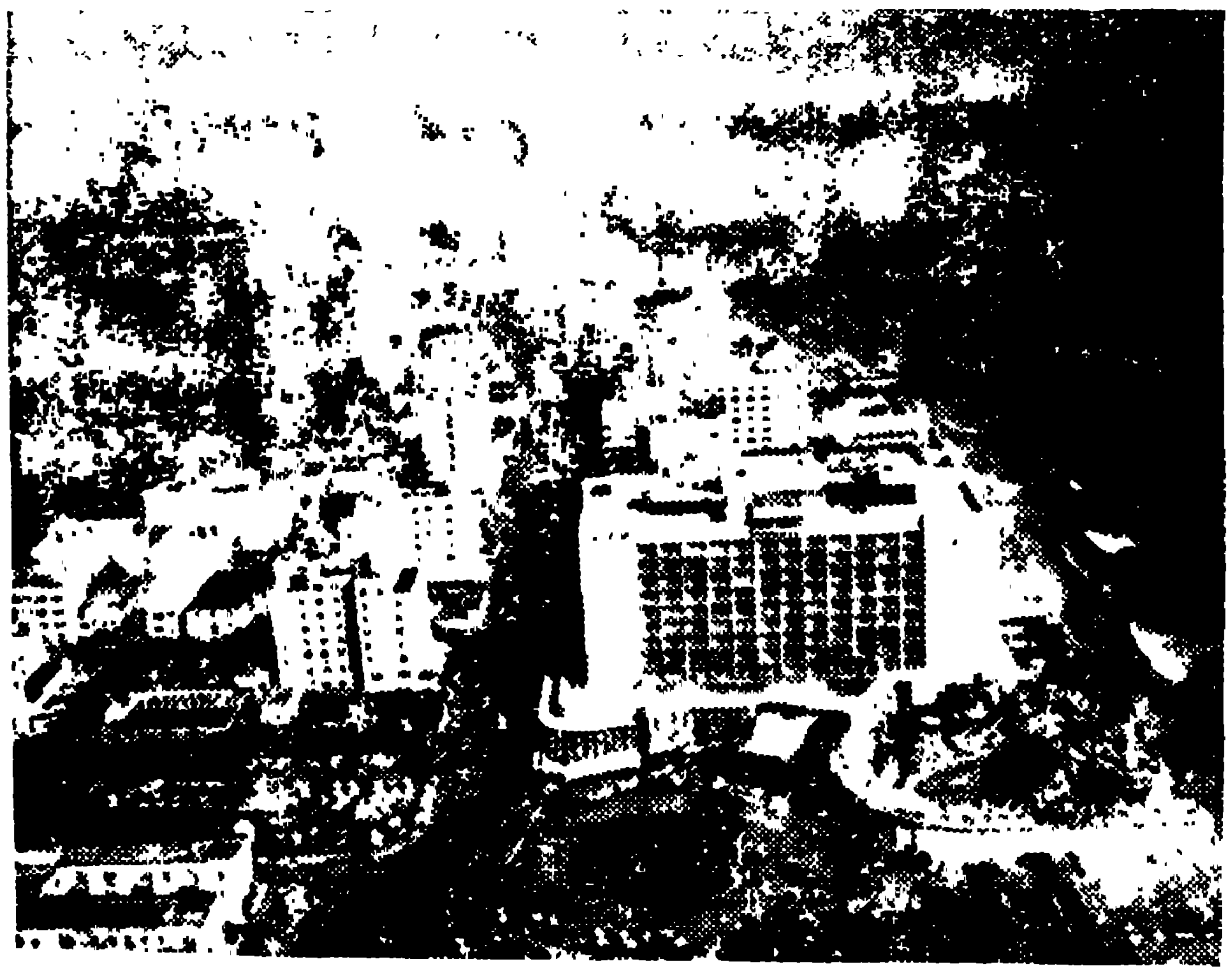

মায়ামী (ফ্লোরিডা) সাগরবেলায় হোটেল শ্রেণী

ভাষা বলতে প'রে যাতে দক্ষিণ আমেরিকার পর্যটকের নিজেদের ভাষায় কথা কইতে অসুবিধে না হয়। এখানে 'মহানগরী মায়ামীর' অধিবাসীর সংখ্যা হল প্রায় দশ লক্ষ। এখানে হোটেল ভাড়া বিশেষ ক'রে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত খুব বেশী। কেননা শীতকালে উত্তর যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় যখন তুষারপাত হচ্ছে তখন এখানে সমুদ্রের দক্ষিণ সমীরে পরিবেশ অতি মনোরম হয়ে ওঠে। ডিসেম্বর-এপ্রিল মাসের দৈনিক হোটেল ভাড়া ৪০ মার্কিন ডলার থেকে অন্য সময়ে, ১০ ডলারেও নামতে পারে। এখানে ছোট ছোট 'কটেজ' এবং 'এপার্টমেন্ট বাড়ী'ও পাওয়া যায়। বর্তমানে মোটেলও এখানে বহু হয়েছে। এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের মধ্যে Lowe Art গ্যালারীতে বহু চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাবেশ করা হয়েছে।

মায়ামীর নিকটে সমুদ্রমীনাগার (Seaquarium), কাকাতুয়ার জঙ্গল, প্রভৃতি বহু আকর্ষণীয় বস্তু আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে জুলাই মাসের মাঝামাঝি বিশ্বসুন্দরীর মেলা (Miss Universe Pageant) সুরু হয়। 'লিংকন মলে'র দু'পাশে বিরাট বিরাট দোকান নরনারীর উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাগরসৈকতের উপরে হোটেলগুলির খাদ্যমূল্য শহরের চেয়ে বেশ কয়েক-গুণ বেশী।

'মায়ামী সৈকত' যখন তার চল্লিশ জন্মদিন পালন করছিল দেড় কোটি ডলার ব্যয়ে চোদ্দতলা 'ফনটেন ব্লু হোটেলের (Fontain Bleau) দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। ফনটেন ব্লু হোটেলের বৃত্তাভাস আকৃতির বিরাট অট্টালিকার স্থপতি হ'লেন মরিস ল্যাপেডাস্ (Morris Lapidus)। এই শান্ত প্রকৃতির স্থপতিকে প্রশ্ন করতে তিনি বলেন "ফনটেন ব্লু' তৈরী করার মধ্যে একটা উল্লাস ও উন্মাদনা আছে সত্যি কিন্তু আমার অবকাশ বিনোদনের জন্য আমি একটা ছোট বাড়ীই পছন্দ করব।

মায়ামী (ফ্লোরিডা) সিন্ধু-সৈকতে স্নান

আমি জানি এই বিরাট বাড়ীর ভেতরের প্রসাধনে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু দেখা গেল এখন লোকেরা যে এমনটিই চায়। এর ৫৬৫টি ঘরযুক্ত হোটেল খোলারদিন থেকেই এটা সর্বদা ভর্তি। সহরেরমধ্যে ১২ ডলারের ঘরের বদলে এখানে ১০ ডলার দিলে থাকা যায়। আমাদের দিল্লীর 'অশোকা হোটেলে'র মত।

'ফনটেন ব্লু' হোটেলের বাইরে বসার ঘরে এত বিরাট জাঁক-জমক মনে হয় যেন এটা বিরাট ফরাসী সাম্রাজ্যের সব কিছু যেন এখানে জড়ো করা হয়েছে। আর তাতে নবতম প্রসাধন সংযোজন করা হয়েছে, যা চতুর্দশ লুই-এর সময় ছিল না। এখানের আসবাব পত্রগুলো প্রাচীন ফরাসী যুগের অনুকরণে। মনে হবে যেন এক মোহময় ভার্সাই রাজপ্রাসাদের নবতম পরিবেশের মধ্যে আসীন আবুহোসেন।

'মায়ামী'র উত্তরে একটি মহানগরীর পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে জো ইয়ং (Joe Young) লক্ষ লক্ষ ডলার লগ্নী করেছে এখানের রাস্তাঘাট তৈরী করতে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হুভারের সময় যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে তখন এর প্রগতি স্থগিত থাকে। কিন্তু জো ইয়ং প্রথমেই তার 'গোলপার্কে সীমফনী অর্কেষ্ট্রা (Symphony Orchestra) বসিয়ে দেয় ও আগন্তুকদের বাসে

ফ্লোরিডার হোটেলের হট্টমেলা

ক'রে নিয়ে এসে তাঁবুতে রেখে মনোমত বাড়ী করার জমি দিয়ে দেয়। এমনি করেই চললো বিরাট উন্নয়ন পর্ব। তিন দশক আগে যেটাকে অবাস্তব পরিকল্পনা ব'লে মনে হ'য়েছিল তা আজ নানা শোভায় মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে। 'মায়ামী'র গৃহ নির্মাণপর্ব পৃথিবীর সকল সহরকে ছাড়িয়ে গেছে।

একজন এর কারণ অনুসন্ধান ক'রে বের করেছেন। এর প্রধান কারণ দুটি। একটি হল শীতকরের উদ্ভাবন ও হিমিত কমলালেবুর রস। গ্রীষ্মের দিনে যখন এখানে বেজায় গরম তখন শীততাপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় গৃহে ও অফিসে থাকায় কোন পার্থক্য নেই নিউইয়র্ক কি মায়ামীর মধ্যে। বাইরে যাতায়াতের ক্লান্তি দূর করার জন্য রয়েছে হিমিত কমলালেবুর রস।

এখানে তিন বছর যদি নতুন হোটেল পুরোদমে চলে তখন বুঝতে হ'বে এটার বিশেষ গুণাপণা আছে। প্রথম বছরে লোক আসে দ্বিতীয় বছরেও তার জের চলে তৃতীয় বছরে ঐটী কিঞ্চিৎ ম্লান হয় কেননা এই সময়ে আরও উন্নততর হোটেল নির্মিত হ'য়ে বিজ্ঞাপনের মারফৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে নবাগতদের।

আজ মেমোরিয়ল-তে, আজ এখানে ছুটী। আমরা দুজনে একটা দু'শয্যার ঘর ভাড়া করলাম। তাকে বললাম 'কেন আর বেপোড় জায়গায় রাতের বেলা যাবে? কাল তো ছুটি। কাল বৈকালে এক সময় গেলেই চ'লবে, আমার বিশ্বাস'।

সে রাজী হ'য়ে র'য়ে গেল। নীচে গিয়ে সে একটু ঘুরে এল। আমিও খানিক বাদে সামনের বাসের টার্মিনাসে গিয়ে রাতের আহারাদি সেরে নিলাম ও Salt Pointএ যাবার বাসের খবরাখবর করা হ'ল। রাস্তার ওপারে 'গ্রে হাউণ্ডে'র বাস-টার্মিনাস থেকে সুদূর উত্তরাঞ্চলে-শিকাগো, নিউইয়র্ক, এমনকি টোরণ্টো পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। কিন্তু Salt Pointএর স্থানীয় বাস এখানে থেকে ছাড়ে না। এখান থেকে দু'ব্লক সামনে গিয়ে ব্রুক বাঁয়ের মোড়েই সেই বাসের আস্তানা।

সেখানে দুজনে হেঁটে চলেছি। রবিবার বৈকালে গির্জের সামনে দেখি দুই বুড়োবুড়িতে মারামারি। গির্জার বাইরের উঁচু চাতালে বুড়ীর গলা চেপে ধরেছে

বুড়ো কনুইয়ের কব্জা দিয়ে। অনবরত কিল চড় ছুঁড়ছে। আমি বল্লাম, দর্শকদের উদ্দেশ করে—

'তোমাদের কেউ গিয়ে ওঁদের মারামারি ছাড়িয়ে দাও।'

একজন বল্লেন—'ও ওদের স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া'

আমি বললাম—'স্বামস্ত্রীর হলেই বা। রাস্তায় মারামারি কেন?'

তখন আর একজন বললেন—'Holy Churchএর সামনে এরকম করা উচিত নয়।'

চ্যাংড়া ছেলের দল গজালি ছেড়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো। এর মধ্যে একজন পুলিশে ফোন করতে চ'লে গেল। রাস্তার ধারে টেলিফোন 'বুথ' থেকে খবর দিল পুলিশকে।

এই সব কলহ ছেড়ে চললাম বাসের আড্ডায়। যাবার সময় মনে মনে ভাবতে ভাবতে চলেছি যে এদের দাম্পত্য কলহ বড় রাস্তার ওপরে মারামারিতে দাঁড়িয়েছে। বয়স কারুর পঁয়ষট্টির কম নয়। জানিনা এদের ছেলেমেয়ে আছে কিনা? থাকলেই বা কি? তারা তো সব আলাদা থাকে। চামড়া-জড়ো কপালে বলি-পড়া বুড়িকে নিয়ে আর যাই হ'ক নিশ্চয়ই কেউ অবৈধ প্রণয় করবে না।

বাসের আড্ডায় গিয়ে খবর পাওয়া গেল যে 'Salt Point'এর বাস ছাড়বে বেলা তিনটে নাগাদ।

সারা সন্ধ্যা ও প্রথম রাত্রি কি করা যায়? নগর পরিদর্শনের বাসের সন্ধান করলাম। এত বেলায় রাতের নগর পরিক্রমা মানে আলোর মেলা, নাইট ক্লাবে যুবতীর মেলা, আর 'বারে' বা শৌণ্ডিকালয়ে বোতলের মেলা। এই রাতের পরিদর্শনের অভিলাষ ছেড়ে দিয়ে আমরা একটী সহরের বাসে চড়লাম। বাসটী আমাদের নিয়ে বহুক্ষণ চলতে লাগল। যখন থামলো নগরের নক্সা দেখে জানলাম সহরের প্রান্তে এসে গেছি। সেখান থেকে কিছুক্ষণ পরে সেই বাসেই হোটেলে ফিরলাম। রাত তখন ন'টা। সমুদ্রের তীরে গেলাম। সমুদ্রবক্ষে সেতুর উপর সম দূরত্বের উজ্জল আলো প্রচেতের গলায় মণিহারের মত দেখাচ্ছে। কাছেই সাধারণ লাইব্রেরি; আজ তা বন্ধ। ঠিক করলাম ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ি। কাল ভোরে বেরুলেই চল্বে। সমুদ্রতীরও আমাদের হোটেলের খুবই কাছে।

মিশরীয় বন্ধু মামুদ নীচে গেল চিঠি লিখতে ও কিছু খেয়ে আসতে। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। নতুন জায়গায় ঘুম ভাল হয় না। যখন ঘুম ভাঙলো, ঘড়িতে দেখি রাত আড়াইটে। ঘরও বেজায় ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। Air Conditionerটা বন্ধ ক'রে দিলাম। নীচে চেয়ে দেখি একটা আধটা লোক চলছে। মাঝে মাঝে গাড়ী ও ট্যাক্সি অতিবেগে চলছে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি 'গ্রেহাউণ্ড বাস টার্মিনাসে' এসে থামছে। সেখানের রেস্তোরায় অত রাতেও লোক খেয়ে চলেছে। রাস্তার মোড়ে Fire Hydrant জোড়া মাথা উঁচু ক'রে ব'সে আছে। একটা মুখে লাল রং অপরটী হলদে। সারা রাস্তা ফুল্ল আলোয় আলোকিত। মাঝে মাঝে দুএকটী তরুণ যুবক নিবিড় বাহুবন্ধনে যুবতী বান্ধবীকে বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে।

আবার শুয়ে পড়লাম। ঘরের ঠাণ্ডা ভাব রয়েছে কিন্তু শীতের ভাব নেই। ঘুম যখন ভাঙলো তখন ভোর পাঁচটা। প্রাতঃকৃত্য সেরে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের কূলে। উপসাগরের ধারে সারি সারি নানা রংয়ের নানা আকৃতি ও মাপের অজস্র পেট্রোল বোট। ছোট ছোট জেটি জলের ভেতর এগিয়ে গেছে। এখান থেকে নৌবিহারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। এখানে মুক্ত-প্রাঙ্গণ থিয়েটারের আসন ও কংক্রীটের ঘোমটার মত মঞ্চটী অতি আকর্ষণীয়।

সারা সোমবার ঘুরে ঘুরে দেখা। তবে আজকে সব কিছুই বন্ধ। পরের দিন অতি ভোরে যাতে লিমোশীন তুলে নিতে আসে তার জন্য হোটেলের কাউণ্টারে ব'লে দিলাম।

সাঁ হোয়াণের পথে:

সময় হ'য়ে গেল লিমোশীন এল না। মহা মুশকিলে পড়লাম। একটা ট্যাক্সী ভাড়া ক'রে মায়ামীর বিমান বন্দরের দিকে চললাম। বিমান ছাড়তে সামান্য সময় বাকী। যদিও 'পুয়োরটি রিকো' ভিন্ন রাজ্য তবুও মার্কিন মুলুকের সীমায় এখানেও চলে। নতুন কিছু করার প্রয়োজন নেই। কালো ব্যাগটা ওজন করতে দিয়ে আমার পোর্টফোলিও ব্যাগটা নিয়ে বিমানে উঠলাম। এবার সুরু হবে পুয়োরটি রিকো যাবার পালা। এর

রাজধানী ও প্রধান নগরী হ'ল স্যাং হোয়াণ (San Juan) ইংরাজীতে উচ্চারণ করলে দাঁড়ায় 'স্যানজুয়ান'। মার্কিন আওতায় এটী বর্তমানে একটী বিশেষ উন্নতিশীল দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। শিল্পের উন্নতির জন্য উন্নয়নশীল দেশ দেখাতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই দেশটী দেখে যাবার সুপারিশ করেন। আবার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিদ্যা-সম্বন্ধে দর্শনীয় স্থান হিসেবে এখানে আমার একটা কর্মসূচীও জুড়ে দেয়। যেখানে অন্যান্য সংলগ্ন দ্বীপগুলি বিশেষ ক'রে কিউবায় যখন গণ আন্দোলন সুরু, এরা তখন এখানে সুখে সীধুপানে নিমগ্ন। বাইরের রাজনৈতিক ঝড় ঝাপটা মার্কিন ডলারের কৃপায় এখানের শান্ত শীতল সমীরণকে দূষিত করে না। তবে এখানেরই এক পুয়োরটোরিকান 'প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান'কে হত্যা করতে গিয়ে প্রাণ দান করে।

ভারতবর্ষে যেমন গোয়ানিস্ রাঁধুনীর বড় বড় হোটেলে খ্যাতি, তেমনি মার্কিন মুলুকে পুয়োরোটোরিকান রাঁধুনী-দেরও। এদের শুনেছি উচ্চাঙ্গের রসনার বাসনা-উদ্রেকী রন্ধন কার্য্যের জন্য খ্যাতিমান্।

স্যাঁ হোয়ানে (San Juan) :—

মায়ামী ছেড়ে স্যাঁ হোয়াণে যখন এলাম, যাঁর নিতে আসার কথা ছিল তিনি আসেন নি। এর কারণ আমার পূর্ব নির্দ্ধারিত দিনের একদিন পরে আমি ওখানে যাই। পরে জানতে পারি যে মেরিডা থেকে আমার পাঠানো টেলিগ্রামও তিনি পাননি। যেহেতু তিরিশে জুন এখানে ও সারা মার্কিন মুলুকে ছুটী তাই অকারণ স্যাঁ হোয়ামে ব'সে না থেকে 'মায়ামী' দেখে যাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। যাই হ'ক হার্ভের বন্ধু ও ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের প্রতিনিধি 'অস্কার ফ্রাঙ্কো'র টেলিফোন গাইডে যে ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর পেলাম, তাতে সংযোগ ক'রে তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। কি করা যায়! বিমান বন্দর থেকে যাঁরা লিমোশিনের বন্দোবস্ত করেন তাঁদের আমায় সহরে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবস্থা করতে বললাম। তাঁরা বললেন, 'সব লিমোশীন সহরে চলে গেছে। বেলা বারোটার পর যখন ফিরবে, তখন একটা বন্দোবস্ত হবে।'

আজ ছুটীর দিন। এখানে অপেক্ষা করাও যা হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করাও তাই। উপরন্তু এখানে এক আন্তর্জাতিক জলন্ত জনজীবন দেখতে পাব। দেখলাম, বিমান বন্দরের একটি দেওয়ালের গায়ে নানা ছবি দেওয়া বহু হোটেলের বিজ্ঞাপন রয়েছে। আর ছবির সামনে একটা টেলিফোনের রিসিভারও রয়েছে। টেলিফোন তোলামাত্রই সেই হোটেলের দূরভাষিণীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সংযোগ হবে, অন্য কোথাও নয়। টেলিফোনের মূল্যও কিছু দিতে হবে না। কিন্তু লিমোশীনের তত্ত্বাবধায়িকা সুন্দরী আমায় বুদ্ধি দিলেন যে আপনি বিমান কোম্পানীর ক্যাউণ্টারে গিয়ে মাইকে প্রচার করতে বলুন, অস্কার ফ্র্যাঙ্কো, তুমি যেখানেই থাক, Panam এর কাউণ্টারের সামনে চ'লে এস ; তোমার জন্য ভারতবর্ষ থেকে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন।' কাউণ্টারের মেয়েটি আমার নামটা ভাল ক'রে উচ্চারণ করতে না পারায় 'ভদ্রলোক' ব'লে চালিয়ে দিলেন।

বারকয়েক সম্প্রচার করার পরও যখন কেউ এল না তখন আমি 'কেপিটোল' হোটেলে টেলিফোন তুলে 'ঘর খালি আছে কিনা সন্ধান নিলাম ; উত্তর এল—'ঘর খালি আছে, চ'লে আসুন।'

লিমোশীনে চ'ড়ে বেশ একটা নাগান বের হলাম। আমার সঙ্গের অন্য কয়েকজনকে তাদের নির্দিষ্ট হোটেলে নামিয়ে আমায় 'কেপিটোল' হোটেলে শেষে পৌঁছে দিয়ে গেল। এটী নতুন ও পুরাতন সহরের মধ্যিখানে অবস্থিত।

দৈনিক সাত ডলার ভাড়াতে একখানি ছোট ঘর পেলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর নিলাম না ; তাতে আরও বেশী ভাড়া লাগতো। ঘরটি সমুদ্রের ধারে রাস্তার ওপর। সব সময়ই গাড়ী যাওয়ার শব্দও সমুদ্রের হাওয়া বওয়ার সন্ সন্ আওয়াজ। হোটেল কর্তৃপক্ষকে টেবিল-ফ্যান দিতে বলায় তাঁরা জবাব দিলেন যে তাঁরা টেবিল ফ্যান রাখেন না।'

পরের দিন সকালে পুরোণো স্যাঁ হোয়াণের 'ফটী লেজার ষ্ট্রিটে'র State Department of International Exchange এর দপ্তরে গেলেন। পুরাতন স্যাঁ হোয়ান দ্বীপটি প্রায় দু'মাইল লম্বা কিন্তু চওড়ায় কোথাও আধ মাইলের বেশী নয়। এই প্রাচীন দ্বীপেই পুয়োরটারিকোর

রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল, ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ কলম্বাসের দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রায় পুয়েরটোরিকোয় অবতরণ করায় আটাশ (২৮) বছর বাদে। 'পুয়োরটেরিকোর অর্থ অর্থ হ'ল Rich Port অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী বন্দর। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর কলম্বাস এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। এটা জাতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। জুয়ান পঁশ দে লিও (Juan Ponce De Leon) ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বর্তমানে সাঁ হোয়াণে 'পঁশ দেলিও' নামে একটি রাস্তাও আছে এবং নগরীর উপকণ্ঠে 'পঁশ' ব'লে একটি নতুন সহর স্থাপন করা হয়েছে। কলম্বাসের পদার্পণের পূর্বে 'আরাওয়াক ইণ্ডিয়ানরা' এখানে বসবাস করতো। এইখানে স্পেনিস্ উপনিবেশ প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করে 'ক্যারিব ইণ্ডিয়ান', ওলন্দাজ ও বৃটিশেরা। সাঁ হোয়াণ পৌর প্রতিষ্ঠান এখন বিশেষ প্রসারিত হ'য়ে নিজ কুক্ষি মধ্যে 'রিয়োপিয়েনডারস অঞ্চলকে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে লোকসংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় অধিকারের যেন তোরণ হিসেবে এটা অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বে এটি প্রাকার বেষ্টিত নগরী ছিল। সপ্তদশ শতকে সমুদ্র থেকে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নগরীর চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাকার নির্মাণ কার্য স্থরু হয়। দেড়শো বছরে এই কাজের সমাপ্তি হয়।

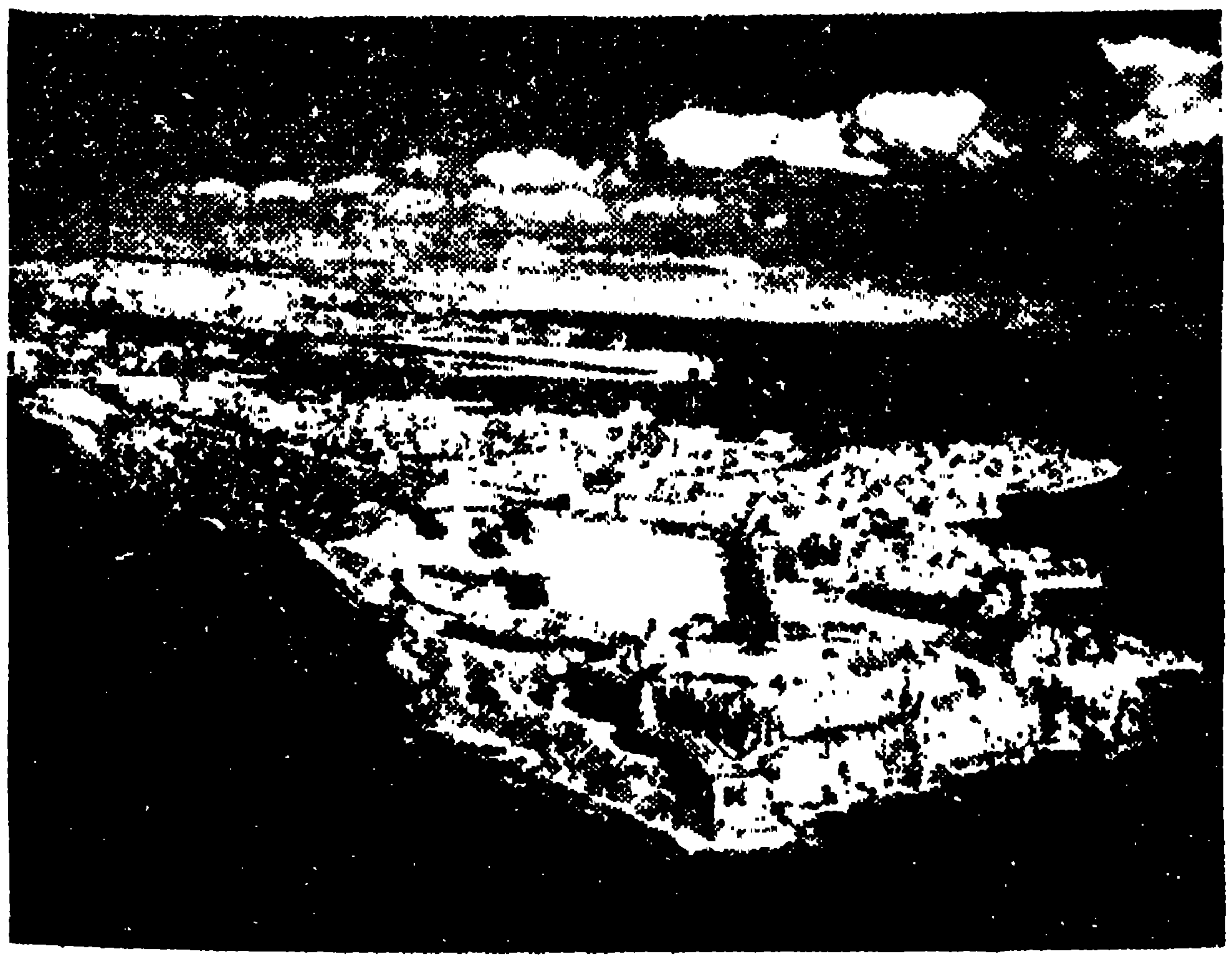

প্রাচীর বেষ্টিত সাঁ হোয়াণ

পরে ফিরে এল ভাঙার পালা। বিমান ও নৌবহরের ক্ষমতাশালী কামান-তোপের প্রচলনের পর এই পরিখা প্রাচীরের মূল্য প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়। ১৮৯০ সালে নগর প্রাচীরের কিয়দংশ ভেঙে ফেলা হয়। বাকী অংশ আজও প্রাচীর পরিবৃত বটে, কিন্তু তার আরক্ষমূল্য কিছুই নেই। অতি আড়ম্বর ও দুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে স্যানটিয়াগো তোরণ ধ্বংস করা হয়। বিদায়ের বাজনা বিপর্যয়ের সুরে বেজেছিল।

দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে রাজ্যপালের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ আধ বর্গমাইলেরও বেশী অঞ্চল ঘিরে। মূল নগর প্রাচীরের মধ্যে ঐটা অবস্থিত। যদিও নগর প্রাচীর বহু ভাঙা হয়েছে সত্য কিন্তু দুর্গ প্রাচীরের কিছু অংশ অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে আজও বিরাজমান। অতলান্তিক সমুদ্রের কূল ঘিরে দ্বীপটিকে আবেষ্টন ক'রে 'পরিধি সড়ক' চ'লে গেছে। পুরাতন সাঁ হোয়াণের প্রায় সব রাস্তাই একমুখো। এর ফলে যদি কোন হোটেল বা গন্তব্য স্থল বাসের রাস্তার ওপর হয় তাহ'লে যাবার পথে সুবিধে থাকলে ফেরার পথে কিছু হাঁটতেই হবে। নতুন লোক হ'লে একটু বেশীই হাঁটতে হবে। আর গলি খুঁজির মধ্য দিয়ে ছেদ রাস্তা থাকার সংবাদ নবাগতের জানা না থাকাই সম্ভব।

এখানে সরকারী ভাষা স্পেনিশ। স্পেনিশ ভাষায় সবাই কথাবার্তা কয়। সরকারী সংযোগ দপ্তরের লোকেরা ইংরিজিতো জানেনই উপরন্তু কেউ কেউ ফ্রেঞ্চও জানেন। হোটেলে দুরকম ভাষায় লেখা, মেনু বিশেষ ক'রে মার্কিন পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাখা হয়। কয়েকটা চলতি স্পেনিশ শিখে নিয়েছিলাম হোটেল-রেস্তোরায় কাজ চালিয়ে নেবার জন্য। সারা মঙ্গলবার আমার সরকারী মহলে ফর্ম ভর্ত্তি করা, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনায় কেটে গেল। দুপুর বেলা পর্যন্ত অফিসের কাজ হ'ল। বৈকালে অবসর। সরকারী অফিস থেকে 'ফ্রেঙ্কো'র সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হ'ল। বহির্দপ্তরের ভদ্রলোক বললেন যে তাঁরা আমার Miramac হোটেলে থাকার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। আমি বল্লাম 'আমি কিছুই জানিনা। যাঁর আমায় নিয়ে

আসার কথা ছিল দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি বিমান বন্দরে আসেন নি।'

তিনি জানতে চাইলেন, তিনি কি টেলিফোন ক'রে জানবেন এখনও ঘর খালি আছে কি না?

'আমি বললাম—'এখন তো পর্যটকদের ঋতু নয়, খালি ঘর খুব সম্ভব পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি তো এক জায়গায় রয়েছি। একদিনের জন্য হোটেল বদল করার কোন প্রয়োজনই দেখি না।'

টেলিফোনে ফ্রাঙ্কো জানালো যে সে হার্ভের লেখা চিঠি আমায় দিতে চায়। আমি বললাম—'আমি আগন্তুক। পথঘাট চিনি না। তুমি না হয় আমার হোটেলে চ'লে এস। এখানেই কথাবার্তা হবে।

সে বলল—বেলা একটা নাগাদ যাচ্ছি।

—বেশ, ভাল কথা। তবে আজই আমি ঐ হোটেল ছেড়ে দেবো।

কোথায় যাবে?

—পুরোণো সাঁ হোয়াণের ওয়াই এম সি এ-তে। সরকারী দপ্তরের খুব কাছে। আমারও কাজের সুবিধে হবে। হোটেল ছেড়ে দেবার সময় হ'ল বৈকাল দু'টো। ঘরে বেলা দু'টো পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও সে যখন এল না, তখন একদিনের ভাড়া মিটিয়ে নীচের লাউঞ্জে একটা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছি, মূর্তিমান তখন হাজির।

সে এসে বলল, তার তিনখানা গাড়ী। সব ভেঙে খারাপ হ'য়ে গেছে। তাই আসতে এত দেরী। তাও সে এসেছে একটা মোটর বাইকে। সে Fumigationএর মুখ্য ব্যবসা করে। তার 'প্রতিষ্ঠানে' আরও তিনজন লোক কাজ করে। আমি ভেবেছিলাম ও এলে ওরই গাড়ীতে হোটেল ছেড়ে y-তে যাব। অতএব পূর্ব ব্যবস্থাই ঠিক রইল। সে হার্ভের চিঠি আমায় দিল। হার্ভে বলেছে আমায় ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে সহর দেখাতে ও লৌকিক আপ্যায়ন করতে। কখন কবে সুবিধে হবে জানতে চাওয়ায় আমি বললাম, "আজ সন্ধ্যায়ই আমরা রাতের সাঁ হোয়াণ দেখে আসি। সময় তো আমার অল্প।

—তাই হ'বে। আমি আসবো সন্ধ্যে সাতটায় সাঁ হোয়াণের YMCA-তে—

—সেই ভাল।

সে এসেছিল সন্ধ্যা বেলায় একটা ছোট 'ভক্স ওয়াগান' গাড়ীতে চ'ড়ে। এ গাড়ীটা তার মেয়ের। ওর নিজের কাজের গাড়ীগুলো রাস্তায় খারাপ হ'য়ে প'ড়ে আছে। সে প্রথমে নিয়ে চলল প্রাচীন সাঁ হোয়াণের রাস্তা দিয়ে। এখানের রাস্তার সংখ্যা খুবই কম। এবং অধিকাংশই একমুখো। 'প্লাজা দি কলোনে'র উপর বিরাট পলতোলা থামের চূড়োয় কলম্বসের বাঁ হাতে ক্রশ উর্ধ্বে তুলে দাঁড়ানো মূর্তি। প্রাচীন 'সাঁ হোয়াণ'টি একটা যেন বড় ঢিবির উপর। এখানে কয়েকটি সিঁড়ি দেওয়া ছেদ রাস্তাও রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটা ঐতিহাসিক স্থানও রয়েছে—যেমন উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ফোর্ট এল মোররা (Fort El Morro) উত্তর পূর্ব প্রান্তে ফোর্ট ম্যান ক্রীষ্টোবাল, বড় পোষ্টাফিস, শুল্ক ভবন, পৌরভবন, সাঁ হোয়ান কেথিড্রাল, সাঁ জোস্ চার্চ প্রভৃতি

পুরাতন সাঁ হোয়াণের সঙ্গে মূল ভূখণ্ড তিনটি সেতু দিয়ে সংযুক্ত। বৃহত্তর সাঁ হোয়াণের আওতার মধ্যে পড়ছে 'কোনডেডো' (Condado) 'সাঁক্রুস্' (San Truce) 'রিয়ো পিয়াদ্রাস্' (Rio Piedrds) 'হাতো রে' (Hato Re) প্রভৃতি। সহরতলীতে অবস্থিত 'কাটানো' (Catano) সহর পুরোণো সাঁ হোয়াণের সঙ্গে ফেরী দিয়ে সংযুক্ত। প্রায় দেড় মাইল সাঁ হোয়াণ উপসাগর পার হ'য়ে যেতে হয় 'কাটানোয়'। পুরাতন সাঁ হোয়াণে দক্ষিণে 'আইলা গ্র্যাণ্ডো' বিমান ক্ষেত্র (Islagrande)। বিমান ক্ষেত্রের সংলগ্ন অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত। 'কাটানো' সহরের সংলগ্ন দক্ষিণ অঞ্চলও যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত। 'ফোর্ট বুকানন' আবাসিক অঞ্চল। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বাহিনীর জন্য আরও সংরক্ষিত অঞ্চল রয়েছে।

অবস্থিতি :—

উত্তর আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের 'ফ্লোরিডা' রাজ্য থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের 'কোলোম্বিয়া', 'ভেনেজুয়েলা' রাজ্যের মধ্যে অতলান্তিক মহাসাগরের অংশ 'ক্যারিবিয়ান সমুদ্র'। এই সমুদ্রে অসংখ্য দ্বীপ বিদ্যমান।

যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের সংলগ্ন মূল এশিয়া ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন 'বোর্নিও', 'সুমাত্রা', 'যবদ্বীপ', 'সেলিবিস' প্রভৃতি মুখ্য দ্বীপপুঞ্জ বিরাজমান। তেমনি অতলান্তিক

পুয়োরটোরিকোর জলসরবরাহের সুড়ঙ্গ

মহাসাগরেও 'বারমুদা', 'বাহামা দ্বীপপুঞ্জ', 'কিউবা', 'জ্যামেকা', 'হাইতি', 'ডোমিনিয়ান রিপাবলিক', 'পুয়োর-টোরিকো', 'সেণ্ট টমাস', 'সেণ্ট ক্রয়েক্স', 'সেণ্ট মার্টিন', 'সেণ্ট লুসিয়া' এমনকি ভেনেজুয়েলার সংলগ্ন ট্রিনিডাড দ্বীপ প্রভৃতি। 'পুয়োরটোরিকো' আয়তনে মধ্যম শ্রেণীর দ্বীপ। কিউবার মত ৪৪,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত নয়, এবং সেণ্ট লুসিয়ার মত ২৩৩ বর্গমাইল, কি 'সেণ্ট মার্টিনের মত মাত্র বিশ বর্গমাইল বিস্তৃত নয়। 'পুয়োর-টোরিকো'র আন্তর্জাতিক 'আইল ভার্দে' বিমানক্ষেত্রে প্যান আমেরিকান বিমান একটানা নিউইয়র্ক থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টায়, 'মায়ামী' থেকে সওয়া দুঘণ্টায় পৌঁছায়। তা'ছাড়া এটার আবেষ্টন 'ফিলাডেলফিয়া', ও 'বাল্টিমোর' 'ওয়াশিংটন' বিমান ক্ষেত্রের এমনকি ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থানের সঙ্গে বিমান সংযোগ রয়েছে। এটা একটা বিখ্যাত বন্দরও। তাই নানা দেশের বহু অর্ণবযান যাত্রী ও বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে পুয়োরটোরিকোর বন্দরে যাতায়াত করে।

'পুয়োরটোরিকো' দ্বীপটী ফ্লোরিডার দক্ষিণপূর্ব দিকে ১৮°—২৮' উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। মায়ামী থেকে ১০৪০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ও নিউইয়র্ক থেকে ১৬৬২ মাইল দক্ষিণপূর্ব এই দ্বীপটীর অবস্থান। সাংবৎসরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হ'ল ৮৩° F ও নিম্ন তাপমাত্রা হ'ল ৭৩·৫ F। এ অঞ্চলে যেন চিরবসন্ত বিরাজমান। এখানে সুস্থির কোন বর্ষাকালের সময় নির্দ্দেশ নেই। মাঝে মাঝে সব ঋতুতেই কিছু না কিছু বৃষ্টিপাত হয়। এতে ফসল ফলানোর মহা সুবিধে। ফলে দ্বীপটী চির শ্যামলিমায় ঢাকা। তবে যে মাসে কিছু বেশী বৃষ্টি পড়ে, অন্য মাসের তুলনায়।

এই দ্বীপের বিস্তৃতি প্রায় ৩৫০০ বর্গমাইল। দ্বীপটী লম্বায় একশো মাইল ও গড় চওড়ায় ৩৫ মাইল। এখানে রাস্তায় দূরত্ব নির্দেশক ফলক কিলোমিটারে দেওয়া। এখানের লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ। এখানে লাইসেন্স নেওয়া ২৫০০ ডাক্তার আছে। ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর হার হাজার করা ৭·২ ছিল এখানে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে হাজারে ৯·৪ জন।

শাসন পদ্ধতি :—

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের স্পেনিশ-আমেরিকান্ যুদ্ধে পুয়োর-টোরিকো দ্বীপটী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে আসে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গত দ্বিতীয় মহাসমরের পর বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ মাননীয় লুই মুনোজ মেরিণ (Luis Munoz Marin) প্রথম নববিধানে রাজ্যপাল নিযুক্ত হ'ন। তাঁরই চেষ্টায় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এটী যুক্তরাষ্ট্রের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয় ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এই সামান্য ভূভাগে বৃহৎ রাষ্ট্রের মত সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করতে পারবে না ব'লে নিজেরাই কয়েকটী বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে যুক্ত আছে। বিশেষ ক'রে এখানের বৈদেশিক কূটনীতি, পোষ্টাফিসের কাজ, মুদ্রা ও বৃহত্তর প্রতিরক্ষা বিষয়ে এরা যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ওয়াশিংটনে পুয়োরটোরিকো রাজ্যের প্রতিনিধি অবস্থান করেন সত্য ও তিনি কংগ্রেসে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারেন কিন্তু তাঁর ভোট দেবার ক্ষমতা নেই। অল্পে বলা যেতে পারে যে এখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে কিন্তু মার্কিন আওতায় অর্থনৈতিক পরাধীনতা যথেষ্ট। তবে ওরা এটা স্বীকার

করে, ভারতবাসী যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরাধীনতায় থেকেও তা' স্বীকার করে না।

এখানের পরিকল্পনার মূলতত্ত্বটী হ'ল মহা মহা প্রশমজ্ঞদের বুদ্ধিবিদ্যার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল নয়; পক্ষান্তরে বহু সাধারণ বুদ্ধির লোকদের মতামতের ভিত্তিতে বিশেষ এক মন্তব্যে উপস্থিত হওয়া। "Planning is device for allowing many people of moderate skills to contribute to wise decision making, rather than leaving it wholly to the great skill of a small group of leaders."

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চারটী মুখ্য পন্থা হ'ল যথাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক মান নির্ণয়, ভবিষ্যৎ কর্মসূচীকে বিশেষ পঞ্জীভুক্ত করা, সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অতি প্রয়োজনীয় অংশটুকু বেছে নেওয়া ও বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।

তাই দেখি Practical Planner সম্বন্ধে Niccolo Machiavelli তার Discourses নামক পুস্তকে বলতে:

"......I see no other course than to take things moderately, not to undertake to advocate any enterprise with too much zeal; but to give one's advice calmly and modestly.

বর্তমান বিভবের মান নির্ণয়ে নানা বিষয় তারা বিশ্লেষণ করে পঞ্জীভূত ক'রে এগিয়েচলেছেন: যেমন ১। প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ ও তালিকা, ২। মানব সম্পদের তালিকা (সংখ্যা ও গুণ নির্ণয়), ৩। ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষমতা নিরূপণ, ৪। জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা, ৫। পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন সম্পদের সুব্যবহারের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি।

তা'ছাড়া এগুলি ভবিষ্যতে (আগামী পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর) কি রূপধারণ করবে তার একটা খসড়া প্রণয়ন। সময়ের বিবর্তনে সুপরিকল্পিত পথের পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'তে পারে। সেই সময়ের পরিবেশে উপযুক্ত মতে সংশোধন ক'রে নিতে হবে।

পুয়োরটোরিকোর উন্নয়ন পরিকল্পনা:—

পুয়োরটোরিকোর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতের বহু প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। এখানের মুখ্য নগরী সাঁ হোয়াণ, পস্, আয়বনিতো, মায়াগুয়েজ প্রভৃতির প্রাথমিক মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত হয়েছে। এর মধ্যে আছে নগর পুনর্বিন্যাস, নগর প্রবিধান, বিভিন্ন ব্যবহারের মণ্ডল নির্দেশ, বিভিন্ন মণ্ডল নির্দেশক মানচিত্র প্রস্তুত, ভূমি উপবিভাগ, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রভৃতি। উন্নয়ন পরিকল্পনার নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নক্ষেত্রে কাজ ক'রে চলেছে। সরকারী কাজের জন্য উন্নয়ন দপ্তর ছাড়াও আধা-সরকারী উন্নয়ন হ'ল:—Economic Development Administration, PuertoRico Industrial Development Company. The Ports Authority, Government Development Bank, The Agricultural Development Agencies. অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা হ'ল Housing Agencies, The Water Resources Authority, Sewer and Aqueduct Authority প্রভৃতি।

এই Water Resources Authority মুখ্যতঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে লিপ্ত। কেবল গ্রামীন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যতিরেকে আর সকল ক্ষেত্রেই এই সংস্থা স্বয়ং নির্ভরশীল। Sewage and Aqueduct Authorityর সঙ্গেই আমার ক'দিনের কাজ। এই সংস্থার মুখ্য দায়িত্ব হ'ল সমস্ত দ্বীপের সারা সহরে জল সরবরাহ করা। বর্তমানে দক্ষিণ অঞ্চলে জলের বিশেষ ঘাটতি। যার ফলে এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কয়েক ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলের জল পাহাড় ভেদ ক'রে সুড়ঙ্গ পথে দক্ষিণ অঞ্চলে নিয়ে আসা হচ্ছে। এ জলের বহুলাংশ কৃষির উন্নতির জন্য সে র উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যে-হেতু অধিকাংশ মুখ্য সহর সমুদ্রের উপকূলে সেইজন্য নগরীর বিশদ ময়লা পরিশোধনের পর্বের তেমন কোন ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যবস্থা নেই। সমুদ্রের জলে কিছু দূরে ফেলে দিলেই হ'ল। তবে বর্তমানে দ্বীপের ভেতরের একটী সহরে নবতম পরিকল্পনায় এক নতুন ময়লাকল তৈরি হচ্ছে দেখলাম।

পরিদর্শন পর্ব:—

সকালে দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে এক নির্মীয়মান জলকল ও একটী ময়লাকল দেখতে যাব ব'লে বেরুবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় একটী উচ্ছল প্রাণবন্ত তরুণ এসে হাজির। সে বলতে এসেছে যে যদিও আজ

পয়লা জুন তবুও সে এখনও মাইনে পায়নি কিন্তু আজই তাকে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য যেতে হবে। তার মাইনে তার মাকে দিয়ে সে যেতে চায়। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার তার সম্বন্ধে আমায় লক্ষ্য ক'রে বললেন।

—রোজই খবর আসছে দুটো-তিনটে ক'রে পুয়োর-টোরিকান ভিয়েৎনামের যুদ্ধে মারা যাচ্ছে।

—আমি ছেলেটীর করুণ চোখের দিকে চেয়ে বন্ধু ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম—এইতো নিয়তি। বিশ্বাস ও ইচ্ছা না থাকলেও দেশের পরোক্ষ স্বার্থে অন্যায়ের পক্ষে আত্মাহুতি দিতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ডের তরুণরা কেন চলেছে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে ভিয়েৎনামীদের হত্যা করতে। প্রত্যক্ষ ও আপাতোপরোক্ষ স্বার্থও তো তাদের নেই। তোমাদের হয়তো কিছুটা আছে। এই সরকারকে মার্কিন সরকার অর্থ সাহায্য করে। তার জন্য জীবনবলি দিয়ে কৃতজ্ঞতা!

প্রথমে এলাম এদের 'জলকল' দেখতে ও ফেরার পথে একটা ছোট 'ময়লা কল' দেখে এলাম। বৃষ্টিতে মাটী দলদলে হ'য়ে গেছে। কাঠের পাটা ফেলে চলার বন্দোবস্ত করেছে। পথ বড় পেছল। এই পরিদর্শনের গৌণ উদ্দেশ্য হ'ল সরেজমিনে এদের গ্রামীন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'রে আসা। দুপুরে আমরা একটা গ্রামের পান্থশালায় আহারাদি সেরে নিলাম। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এরা ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে। একটী পরিবার তাদের গুটিছয়েক ছেলেমেয়ে নিয়ে এই পান্থশালায় আহারে এসেছে। কাচের জানলা দিয়ে সবুজ খেত ও অরণ্যে ঢাকা, ঢেউ খেলানো প্রান্তর, নির্মল নীলাকাশের নীচে স্নিগ্ধতা ও প্রাচুর্যের এক সন্ধান দেয়।

এরা এই শ্যামল দ্বীপটির উন্নয়নের জন্য এটিকে শিল্প-কেন্দ্রিক ক'রে তোলার চেষ্টায় আছে। নতুন সরকারের চেষ্টায় ও প্রলোভনে পোর্টোরিকোতে ২৩০০ কারখানা স্থাপিত হ'য়েছে। এরা মূলধন বিনিয়োগের শতকরা ২৫ ভাগ মুনাফা করেছে। এঁরা বলেন এর মুখ্য দুটি কারণ।

প্রথমতঃ এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কোন কর দিতে হয় না ও পোর্টোরিকো সরকারকে প্রথম ১০ থেকে ১৭ বছর পর্য্যন্ত শুল্ক দিতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ হ'ল পোর্টোরিকো শ্রমিক ও কর্মীদের কুশলতা। আসলে প্রথমটাই মূল কারণ। দ্বিতীয়টা কিছু আত্মপ্রসাদ ও কিছু নিজেদের প্রচার। এরা শুধু কর মুক্তির সুযোগ শুধু মার্কিন শিল্প প্রতিষ্ঠানকেই দেবে।

১৯৬৫ সালে ১৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে পাকাপাকি স্থাপিত হইয়াছে। এর মধ্যে ২৫টী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দুটো ক'রে কারখানা আছে। ছ'টি শিল্পের চার ও ততোধিক কারখানা আছে। যেহেতু মার্কিন ফেড'রাল (Federal) সরকার এদের ফেডারাল ট্যাক্স্ নেই এবং ভোটাধিকারও নেই। No taxation without representation পোর্টোরিকো সরকার ইচ্ছেমত ট্যাক্স ধরতে ও মকুব করতে পারেন। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে মোয়াওয়েজ নগরীর নিকট স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 'Operatin bootstrap' প্রয়োজক দেয়া হয়। যতখুসী বিদেশী কাঁচা মাল বা শিল্পের যন্ত্রপাতির অংশ আমদানী করতে পারে কোন ট্যাক্সই দিতে হবে না। আবার তৈরী মাল রপ্তানী করলেও কোন শুল্ক দিতে হবেনা কেবল যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া।

ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্য পুয়োরটোরিকো থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মাল চালান দেওয়া সুবিধে। দুই উপমহাদেশ থেকে এটি প্রায় সমান দূরে। সস্তায় মাল তৈরী হ'লে বিদেশেও প্রতিযোগিতার সুবিধে এবং লাভও বেশী। ১৯৬৩-৬৪ সালে পুয়োরটোরিকো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮৬'৪৭ কোটি ডলার মূল্যের মাল রপ্তানী করেছে। কিনেছেও ৮০০ কোটি ডলার মূল্যের মাল। এরা সবচেয়ে বেশী ব্যবসা করে যুক্তরাষ্ট্রের সংগে। পুয়োরটোরিকো দ্বীপে কাজ করতে সক্ষম শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ।

রবিবার ৫ই জুন সকালে সাঁ হোয়ান টাইম্সে (San Juan Tmies) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপর 'The most powerful woman of the world' ব'লে একটি রঙিন চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। কেমন করে তিনি ধীরে ধীরে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারই এক ছোট্ট কাহিনী প্রকাশিত হয়। তথ্য অতি সামান্যই। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শ্রীমতী ইন্দিরা বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়ায় মেয়েরা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছে, ভদ্র লোকেরাও বিশেষ চুপ।

এখানে কিন্তু খাবারের দোকানের চেয়ে মদের দোকান‌ই বেশী। হোটেলে খেতে গিয়ে দেখলাম নানা রকমের 'বিয়ার' রয়েছে। দাম প্রতি বোতল ৩০ থেকে ৬০ সেণ্টের মধ্যে। রবিবারে এরা একটু বেশী মদ খায়। Y M C A এর কাউণ্টারের ভদ্রলোক এত বেশী মদ খেয়েছে আমায় যে চাবি জমার টাকাটা ফেরৎ দিলেনা। সাধারণ রাস্তাকে এরা বলে Calle, বড় হলে বলে Avimda।

প্রাচীন সাঁ হোয়ানে ছোট ছোট চিত্রশালা আছে। রঙিন পাথরে মোড়া রাস্তা দিয়ে সেখানে যেতে হয় Museum of Colonial ure architect এর ফটোগ্রাফ, পুরানো নক্সা, কাঠের কাজের লোহার কাজের নমুনা রাখা আছে। মেট্রোপলিটান সাঁ হোয়ানে বিরাট বড়ো বড়ো হোটেল গড়ে উঠেছে সমুদ্রের ধারে ধারে। সাঁ হোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় পুয়োর্টোরিকো ক্যাপিটল (Capital) না অফিস এ দপ্তর রয়েছে। এখান থেকে নানা জায়গায় পরিদর্শনে নিয়ে যবার ব্যবস্থা আছে। এখানের বিখ্যাত হোটেল হল 'এ্যামেরিকানা', ক্যারিবি হিলাইন' নোনডাডো বীচ, 'দা প্রিন্সি', ডন সাঁ হোয়ান', ফ্ল্যামবয়েন (Flamboyan), লা কঞ্চা, প্রভৃতি যেখানে একক দৈনিক ঘরভাড়া কুড়ি ডলারের উর্দ্ধে এমনকি ৪২ ডলার পর্য্যন্ত অর্থাৎ দিনে প্রায় তিনশো টাকা।

সকলের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলার মহা অসুবিধে কেননা এরা ইংরাজী ভালো জানে না। দোসরা জুন সুয়ার ও একুই ডাষ্ট অথরিটির বাজেট পেশ করার দিন। আমায় তারা সেখানে উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যথাসময়ে হাজির হ'লাম। লুগোলুগো (Lugo Lugo) ব'লে জলসংযোগ অফিসার আমার দেখা শোনার ভার নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সভাস্থলে উপস্থিত হ'লাম। সচিব মহোদয় আমায় সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

Executive Director জনসাধারণের সামনে বিশ-মিলিয়ান অর্থাৎ দুকোটী ডলারের বাজেট রাখলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর। যে কোন লোক এই সভায় যোগ দিতে, বিতর্ক তুলতে ও সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারেন। এক ভদ্রলোক দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে পোলিশ ভাষায় বলতে সুরু করলেন, 'তাঁর অঞ্চল দিয়ে ময়লা জলের নল আজও যায়নি। সে বিষয়টি কি এবারের কাজের ফিরিস্তির মধ্যে ধরা হয়েছে? যদি না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে যেন তাড়াতাড়ি ধরা হয়।'

উত্তরে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টার বললেন—'চেষ্টা করা হবে যত সত্বর নেওয়া যায়, যাঁরা ঐ অঞ্চল উন্নয়ন ক'রে জমি বেচেছেন এটি তাঁদেরই করণীয়। তাঁরা প্রস্তাব নিয়ে এলেই আমরা তাড়াতাড়ি অনুমোদন ক'রে দেবার ব্যবস্থা করব।

সভাশেষে Ex. Directorকে বললাম আপনার বিশ মিলিয়ান ডলারের বাজেট পাশ করতে আপনি নিলেন মাত্র বিশ মিনিট। অর্থাৎ মিনিটে এক মিলিয়ান ডলার। এ কাজ যে খুব সত্বর হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগামী ৩৬৫ দিনে কাজটি মাটীর তলায় ও উপরে গ'ড়ে তুলতে হবে। সেখানে কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম ও কুশলতার প্রয়োজন।

তিনি বললেন—ঠিক বলেছেন। অতি কঠোর পরিশ্রম এক বছরের জন্য জমা রইল।

সভাশেষে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে এলাম।

[ক্রমশঃ

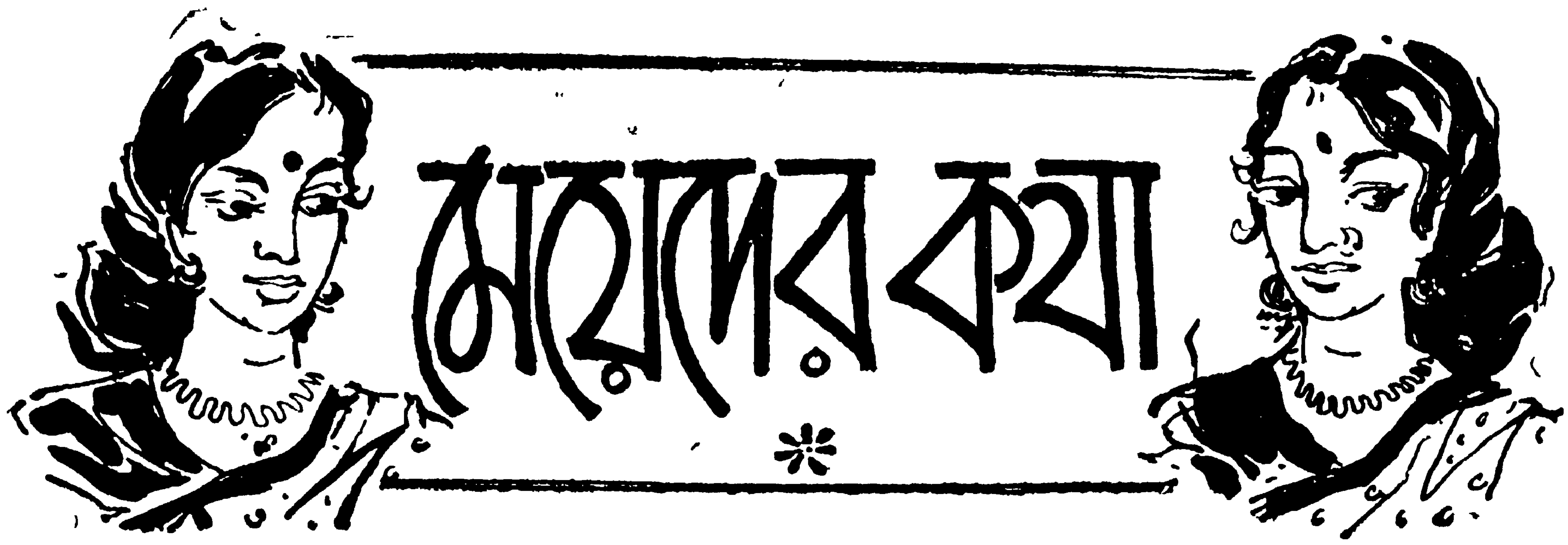

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আষাঢ় মাসে তমাল গাছের তলে ঘনিয়ে আসা কালো ছায়া, শ্রাবণের ঘনান্ধকার রাত্রে মনে যে হঠাৎ জেগে ওঠা খুশী, এই মেয়েও তেমনি কালো, তেমনি স্নিগ্ধ, একে দেখেও মন তেমনি খুসী হয়ে ওঠে।

নারীর ভালবাসাকে কবি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মেনেছেন। সে নারী তাকে ভালোবেসেছে, সে তাঁর জীবন তরণী খানিকে সোনা করে দিয়ে গেছে। যেমন পুরাণ কাহিনীতে শোনা যায় যে দেবতার পায়ের ছোঁয়া লেগে নৌকা সোনা হয়ে যায়, তেমনি। এই পরম লাভে কবি আর সমস্ত লোকসান সহ্য করতে রাজি। এই ভালবাসার স্মৃতিসম্বল বুকে নিয়ে কবির মরণকেও ভয় নেই। জীবন ও মরণ এই ভালোবাসার সুরে কবির কাছে সমান সুন্দর হয়ে উঠেছে।

"যে দিন খেয়া ধরেছিলাম
ছায়া বটের ধারে
ভোরের সুর ডেকে ছিলো
কে যাবি আয় পারে।
ভেবেছিলাম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোনা।
এত বারের পারাপারে
এত লোকের ভীড়ে
সোনা করা দুটি চরণ
দেয়নি পরশ ফিরে।
যদি চরণ পড়ে থাকে
কোনো একটি বারে
যাবে সোনার জন্ম নিয়ে
সোনার মৃত্যুপারে।

(যৌবন বিদায়—ক্ষণিকা)

কবির কাছে কোনো অসাধারণ তত্ত্বের অনুসন্ধানের চেয়ে নারীর সাহচর্য্য তার সান্নিধ্য বেশী প্রিয় বলে মনে হয়েছে। যারা তত্ত্বানুসন্ধান নিয়ে জীবনটাকে নীরস করে তোলে তাদের একজনের মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন চতুরঙ্গ উপন্যাসে। শ্রীবিলাস বলছে—"গুরুকে লইয়া, গুরু ভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছাইত। কখনও কখনও শুনিতে পাইতাম উচ্চস্বরের ডাক 'বামী'। আমরা ভাবের যে আসমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম, তার কাছে এগুলি অতি

তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত কনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝরঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মত জীবনের ছোটখাটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যেই বুঝিতাম রসের লোক তো ওইখানেই। যেখানে সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দেবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে ও তীব্রে, স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি—সেইখানেই রসের স্বর্গ।

ঘর সংসারের প্রতিদিনের কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া এরই মধ্যে নারীর সত্য প্রকাশ। এরই মধ্যে মিলে আছে ভাব এবং কাজ। এই কাজে প্রকাশ পেয়েছে নারীর অন্তরের প্রেম। তাই কবি অসাধারণ তত্ত্বালোচনার চেয়ে নারীর গৃহস্থালীর মধ্যে তার প্রেমে জীবনের সার্থকতা দেখতে পেয়েছেন। কবির কাছে নারীর গৃহস্থালীর কাজকর্ম যত সত্য কোন ধর্মতত্ত্বের আলোচনা তত সত্য নয়। কবি বলেন যা তুচ্ছ আসলে তা তুচ্ছ নয়। ওই তুচ্ছের মধ্যেই বেজে উঠেছে চির সত্যের চিরন্তনী সুর। ওকে এড়িয়ে চলতে গেলে জীবনের চিরসত্যকে এড়িয়ে চলে যাওয়া হবে।

নারীর গৃহস্থালী শুধু তো কাজ নয় ওর মধ্যে রয়েছে একটা ভাব, সে হ'ল তার ভালোবাসা। তাই ওখানে কাজের সীমার মাঝে ধরা দিয়েছে ভালোবাসার অসীম। তাই ওখানে মাখামাখি হয়েছে স্থূলে এবং সূক্ষ্মে।

চতুরঙ্গ উপন্যাসে কবি দেখিয়েছেন যে এমন অসাধারণ সাধক সংসারে থাকতে পারে নারীর প্রেমে যার কোন প্রয়োজন নেই। সে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতেও পারে, কিন্তু প্রেমের সাধনাই অন্ততঃ কবির কাছে বেশী সার্থকতাময়। নিষ্কাম সাধককে কবি দূর থেকে প্রণাম করে ফিরে এসে সঙ্গ নিয়েছেন প্রেমিক যুগলের। তাই আমরা দেখি শচীশের সাধনা ও তার সিদ্ধির বর্ণনা সমাপ্ত করে কবি ফিরে এসেছেন শ্রীবিলাস ও দামিনীর প্রসঙ্গে। এই দিয়েই তিনি উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন। তাই কবির কাছে জীবনের শেষ কথা ধর্ম সাধনা নয়, প্রেম সাধনা। চতুরঙ্গ উপন্যাসে কবির শেষ কথা—দামিনী ও শ্রীবিলাসের পরিপূর্ণতা। সাধক শচীশ যে পরম পূর্ণকে লাভ করেছে দামিনী ও শ্রীবিলাসের জীবনের পূর্ণতা কবির চোখে তারই সমান। কবি দেখেছেন—নরনারীর মিলন জগৎ সংসারকে সুন্দর করে তোলে, জীবনের কঠিন কষ্টকে রমণীয় করে তোলে। আর এই প্রেমের উৎকর্ষ হল বিচ্ছেদে। বিরহ না হ'লে প্রেম তার শেষ পূর্ণতা লাভ করে না। তাই পূর্ণিমার সন্ধ্যায় যে উদ্বেল পরিপূর্ণতা সমুদ্রের জোয়ারে জেগে ওঠে, দামিনীর মৃত্যুতে প্রেমিক যুগলের মধ্যে সেই বেদনার পরিপূর্ণতা দিয়েই কবি এই উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন, পূর্ণিমার সন্ধ্যায় উদ্বেল সমুদ্রের তীরে। অসাধারণ মানুষ শচীশ পূর্ণতা লাভ করেছে তার ভাগবত সাধনায়, আর সাধারণ মানুষ শ্রী বিলাস এবং সাধারণ নারী দামিনী জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছে পরস্পরের প্রেমে।

নরনারীর প্রেম সংসারে যে কী কল্যাণ নিয়ে আসে তাও কবি বলেছেন এই উপন্যাসে। দুটি মানুষ যখন পরস্পরকে নিয়ে খুশী, তখন তারা চার পাশের সংসারে আত্মীয় স্বজনের, পাড়াপ্রতিবেশীদের মঙ্গল করবার জন্যে এগিয়ে আসে। তাই শ্রীবিলাস বলছে যে দামিনীকে বিয়ে করবার পরে তার ভাইদের সংসারে ছেলেদের পড়াশোনা, মেয়েদের বিয়ে এবং তাদের অন্যান্য অভাব দূর করবার জন্য তাকে কত কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

কবি মেয়েদের পূজারী, কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী, তাই সংসারে যা কিছু সুন্দর তাতে কবির মন আকৃষ্ট হয়েছে। নারীর রূপ চিরযুগের কবিকে মুগ্ধ করেছে। কবি কালিদাসের কাব্যও এই মুগ্ধতারই পরিচয় পাই। কবি কালিদাসের কাব্যে নারীর মাধুরী যেমন ফুটে উঠেছে এমন আর অন্য কোনো সংস্কৃত কবির মধ্যে নয়। তাই তার মনে মনে লোভ হয় যদি তিনি কালিদাসের যুগে জন্ম নিতেন! কবি কালিদাস যে মেয়েদের সুন্দর সুন্দর নাম দিয়েছেন সেই নামের ঝংকার কবিকে মুগ্ধ করেছে।

"কোন নামটি মন্দালিকা
কোন নামটি চিত্রলেখা

মঞ্জুরিকা, মঞ্জরিনী,
ঝংকারিত কত।"

চতুরিকা, নিপুণিকা, পত্রলেখা, মালবিকার ছবি কবি-চিত্তকে আকুল করে তুলেছে। মুগ্ধা প্রণয়িণীর ছল করে সহকারের ডালে আঁচল বেধে যাওয়া, হঠাৎ এক-দিন চিত্রশালায় এক অপরূপ রূপসীর ছবি দেখে প্রেমিকের মুগ্ধ ভাব, কবি কালিদাসের এই মনোরম ছবিগুলো কবি রবীন্দ্রনাথের মন হরণ করেছে। নারীর এই মাধুরী চিরন্তন। কবি কালিদাস যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মলাভ না করেও আজও সেই মাধুরী প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। তাই কবি লিখেছেন—

"মরব না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে—
তারা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।"

কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছুরই বদল হয়েছে বটে, কিন্তু নারীর মাধুরীর বদল হয়নি।

"সেই কটাক্ষ—
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।"

কিন্তু কবি বলেছেন নারীর এই রূপ শুধুই বিধাতার একলার সৃষ্টি নয়। পুরুষ তার মধ্যে সঞ্চার করেছে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য। পুরুষ নারীকে দিয়েছে লজ্জা, দিয়েছে সজ্জা, দিয়েছে আভরণ। তাকে দুর্লভ করে তোলবার জন্যই আবরণের অন্তরালে গোপন করে রেখেছে। তার পা রাঙ্গাবার জন্য কীট নিজের প্রাণ দিয়েছে, তার জন্যে মণিমুক্তো আহরণ করবার জন্যে পুরুষ সাগরের অতলে ডুব দিয়েছে। সোনা যোগাবার জন্যে খনির দুর্গমে নেমেছে, এমনি করে নানা আয়োজনে নানা কল্পনার রংয়ে রঙিয়ে পুরুষ নারীকে এমন মোহিনী করে তুলেছে। তাই নারী পুরুষের মানসী, তার মানস সৃষ্টি। আপনার মন দিয়ে সে নারীর সৌন্দর্য্য রচনা করেছে। আপনার প্রদীপ্ত কামনার রঙীন আলোতে নারীকে সে রাঙিয়ে নিয়ে দেখেছে। কবিরা উপমার জাল বুনে বুনে নারীর আপন সৌন্দর্য্যের উপরে এক অতিরিক্ত আলোকপাত করেছে। তাই কবি নারীকে বলেছেন—

"অর্দ্ধেক মানবী তুমি
অর্দ্ধেক কল্পনা"।

নারীর স্তবগান কবির কাব্যের উপজীব্য। কবি বলছেন—যে দিন তিনি বেঁচে থাকবেন না সেদিনও নূতন যুগের কবি নারীর স্তবগান রচনা করে মধুঋতুকে মুখর করে তুলবে।

"সে দিন নূতন কবি
দক্ষিণ পবনে—
মধু ঋতু মুখরিবে
তোমাদের স্তবনে।"

কবির প্রবাসের দিনগুলো যে মাধুর্য্য সুধায় ভরে দিয়েছে সেও ওই নারী। কবির সঙ্গে নারীর চিরদিনের প্রণয় বন্ধন। কবি তাঁর ভক্ত শিষ্যা বিদেশিনী বিজয়াকে (ভিক্টোরিয়া) উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,—

"প্রেমের অতিথি কবি
চিরদিন তোমারি অতিথি।"

বিদেশের আদর ও আতিথ্য কবির প্রাণে পৌঁছেছে নারীরই হাত দিয়ে। এই পৃথিবীরও আতিথ্য কবি পেয়েছেন নারীরই আন্তরিক অভ্যর্থনায়। এমন কি কবির অপরিণত কাব্যও প্রথম ক্ষমা পেয়েছে নারীরই কাছে। হাল্কা হাসির সুরে লেখা এক কবিতায় কবি লিখেছেন যে, পুরুষ পাঠক যেখানে তার কাব্য পড়ে নিন্দা করে সেখানে ক্ষমাশীলা নারী পাঠিকা বলে—"আহা মন্দ কী হয়েছে?" নারী বিচার বিশ্লেষণ করবার আগেই ক্ষমা করে ভালোবাসে। মানুষকেও সে এমনি করেই ভালো-বাসে, বিনা বিচারে, বিনা বিশ্লেষণে। এইখানেই নারীর স্বরূপ। তাই কবি বলেছেন—নারীর বাহিরের রূপে তার মূল্য নয়। তার মূল্য তার অন্তরের ক্ষমায়, প্রেমে, আত্মত্যাগে। সুন্দরী নারীকে ডেকে কবি বলছেন—ওগো সুন্দরী, দর্পণ নিয়ে কী দেখছ? দেখছ কি তোমার প্রিয়তমের কাছে যে অর্ঘ্য নিয়ে যাবে, তোমার ওই মুখে তার কোনো ত্রুটি রয়ে গেল কি না? জানো না কি রূপের পসরা নিয়ে উর্বশী দেবরাজের সভা হ'তে—

নৃত্য শেষে বাইরে চলে যায়। আর আত্ম-নিবেদন নিয়ে শচী থাকে চিরদিন ইন্দ্রের পাশে। পুরুষের প্রেমে স্থায়ী আসন নারী দেহের রূপ নিয়ে পেতে পারে না। আত্মনিবেদন, আত্মোৎসর্গ দিয়েই নারী চিরদিনের জন্যে পুরুষের হৃদয় জয় করতে পারে। কুমারসম্ভব কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি এই কথাই বলেছেন। বসন্ত-পুষ্পাভরণে সজ্জিতা উমা—সঞ্চারিণী, পল্লবিনী লতার মত যে মহাদেবের তপঃক্ষেত্রে গিয়ে আবির্ভূতা হলেন, সেদিন মধুঋতু ছিল তার সহায়। দেবতাদের চক্রান্ত ছিল তাতে। কিন্তু সব আয়োজন ব্যর্থ হ'ল। উমাকে ফিরতে হল হার মেনে, শূন্য হৃদয়ে, তার ললিত বপুর সমস্ত অপমানিত সৌন্দর্য্যের দুর্বহ ভার মাথায় নিয়ে। কবি বলেছেন যুগে যুগে নারী—কতবার এমনি করে শূন্য হৃদয়ে তার ভবনের পথে ফিরে এসেছে। যখনই নারী তার রূপ নিয়ে পুরুষের মনোহরণ করতে গিয়েছে তখনি তার এই অপমান ঘটেছে। এই অপমানের কাহিনী চিরদিনের।

কবি লিখেছেন নববধূ যে দিন নৌকো ভাসায় তার অজানা ঘরের উদ্দেশ্যে, সে দিন সে জানে না, ভাগ্য তার জন্য কী রেখেছে। কিন্তু সুখ দুঃখ যাই আসুক না কেন বধূ যেন বলতে পারে—

"আলো দিয়ে জেলেছিনু আলো
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।"

নিজের প্রাণের আলো দিয়ে তার গৃহের মঙ্গল প্রদীপটি জ্বেলে দেওয়া, তার সব দিয়ে ভালো বাসা—এই হ'ল নারীর জীবনের চরম অর্থ। সুখ দুঃখ সব কিছুর মধ্যে তার এই মঙ্গল ব্রতটিকে বাঁচিয়ে রাখাই তার পরম সার্থকতা।

কবি নারীর এই কল্যাণীরূপ দেখেছেন তাঁর নিজের জীবনে। তাদের উদ্দেশ্য কবি লিখেছেন—

"কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
যারা এৎকালিনী নয়, যারা চির কালিনী।
... ...
আমাদের কত ত্রুটি অশনে ও শয়নে
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
... ...
প্রেম দীপ জ্বেলে ছিল পুণ্যের আলোতে।"

এই তো চিরন্তনী নারীর প্রকৃতি। পুরুষের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করাই তার চিরদিনের স্বভাব, এতেই তার মহত্ব।

[ক্রমশঃ]

হাসি

রমা দেবী, কাব্যতীর্থ

কবি বোলেছেন—

"মধুর হাসি যার দিক্ সে উপহার
মাধুরী আছে যার হাসিতে।"

হাসি মাত্রই মধুর এবং মধুর হাসিই ছড়ায় মাধুরী। জীবনের আকাশে লুকিয়ে থাকে কত দুরন্ত কাল-বৈশাখী ঝড়। যতদিন মনের পৃথিবী তরুণ থাকে ততদিন কৌতূহল চঞ্চল মানব মন এক অকারণ পুলকে ভেসে চলে। কিন্তু আজকের এই দুঃখ দুর্দশার দিনে নানা দুশ্চিন্তার মাঝে সেই অকারণ পুলক কোথায় যেন উধাও হোয়ে গেছে। আজকের মানুষ প্রতিটি মুহূর্ত গুণে গুণে হিসেব করে চলেছে কারণ কখন কোথা হতে আসবে বিপর্যয়।

আজকের এই জৌলুষহীন রুক্ষ পরিস্থিতিতে উৎপীড়িত হোয়ে মুখে নামে অন্ধকার আর তার সাথে গৃহ-পরিবেশেও আসে রুক্ষতা। কিন্তু একটু হাসুন, মিষ্টি হাসি দিয়ে আপনার মুখশ্রীতে আনুন চোখ জুড়ান কমনীয় আভা, দেখবেন মুখের স্নিগ্ধ কান্তিকে আরও মসৃণ আরও কোমল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় যত রকম প্রসাধন করা হয় তার থেকে এতে অনেক বেশী উপকার পাবেন। আমরা প্রত্যেকে যে মুখভাব ও যে রং নিয়ে জন্মেছি শত চেষ্টায়ও তার পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না কিন্তু সম্ভব হবে তাকে কমনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলা মিষ্টি হাসির ছোঁওয়া দিয়ে।

জানি অনেক সংসারই আজ নানা ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত ও তার জন্য আসে বিরক্তি এবং সেই ভাব ফুটে ওঠে মুখে তবুও তার মাঝে আমরা যে ধৈর্য নিয়ে দৈহিক সৌন্দর্য চর্চা করি সেই ধৈর্যের কিছুটা নিয়ে যদি একটু

মানসিক সৌন্দর্যেরও চর্চা করি তবে ফল আরো ভাল হবে। অবশ্য একথাটা ঠিক যে যে প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে তা পরিবর্তন সম্ভব নয় কিন্তু যদি রাগ দুঃখ ও হিংসার ভাব অনবরত মুখের ওপর প্রকাশিত হতে থাকে তার ফল ভাল হয় না।

জানি আজকের দিনে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি মানুষের হাসি যখন শুকিয়ে আসছে তখন যদি আমি হাসতে বলি সেটা অবান্তর হোয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তবুও কি পারা যায় না মুখের ওপর হাল্কা হাসির ছোঁওয়া দিয়ে মুখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে?

কর্ম ক্লান্ত পুরুষ যখন কর্মের অবসরে ফিরে আসে তার গৃহনীড়ে একটু শান্তির আশায়, তখন সারাদিনের ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত মেয়েরা যদি অসন্তুষ্ট মুখে বয়ে আনে রাশি রাশি অভিযোগ তাতে পারস্পরিক সাহচর্য শোভন ও সহজ হয়ে ওঠে না—শুধু ভরে যায় তিক্ততায়, আনে বিতৃষ্ণা। মুখের লাবণ্য বৃদ্ধির যত রকম ব্যবস্থা আছে তার প্রথম এবং প্রধান হোলো মিষ্টি হাসি। কবি বোলেছেন:—

"স্থির হাসি খানি
উষালোক সম অসীমা
অয়ি প্রশান্ত হাসিনী।"

মেয়েরা সমাজের কেন্দ্র। তাঁরা যদি সামাজিক শিক্ষা না পান, তাঁরা যদি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধে শুধু উগ্রই হয়ে ওঠেন, তাহলে সংসারে অশান্তিই শুধু বাসা বাঁধবে না, সংসারের ছোট ছোট শিশুগুলিও সুস্থ মন নিয়ে গড়ে উঠবে না। আমাদের শাস্ত্রে মেয়েদের শক্তিরূপিণী বলা হয়েছে। মেয়েরা শক্তির উৎস—মেয়েরা প্রেরণা যোগায় পুরুষকে। ছেলেদের কর্মশক্তি স্থূল প্রকৃতির তাদের কর্মশক্তি অহরহ নানা ভাবে আত্ম প্রকাশ করছে। কর্মব্যস্ত পুরুষের পাশে তাই নারীকে কল্যাণময়ী, হাস্যময়ীরূপে দেখলে তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়।

আমাদের জীবনের দৈনন্দিন কর্মগুলি অনাবিল সৌন্দর্যে সুশোভন করার জন্য, স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধগুলি মধুরতর করবার জন্য চাই সুন্দর পরিবেশ, তবেই তো দেখা যাবে—

সুখ হাসি আরও হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ সুধা মাখা বাস গৃহ তল
আরও আপনার হবে।

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের রূপ-লাবণ্য-শোভা ও দেহের গঠন সুঠাম, সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী রাখতে হলে নিত্যনিয়মিত কিছুক্ষণ ব্যায়াম-চর্চ্চা যে একান্ত দরকার, সে বিষয়ে আজকাল অনেকেই বিশেষ সচেতন। বাড়ী-ঘর মজবুত ও খাড়া রাখতে হলে যেমন তার ভিৎ এবং দেয়ালকে পাকা করা দরকার, দেহের গড়ন ও সৌন্দর্য অটুট-অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তেমনি চাই—মেরুদণ্ডের জোর। নাহলে বেয়াড়াভাবে চলা-ফেরা, বসা দাঁড়ানোর দোষে আমাদের মেরুদণ্ড অনেক সময় অকালে জীর্ণ-অপটু এবং কুঁজো হয়ে যায়—উপযুক্ত যত্ন-ব্যায়ামের অভাবে সরল-সুন্দর ও স্বচ্ছন্দভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তার ফলে, মেরুদণ্ড হয় পল্‌কা ও বে-মজবুত। এ জন্য সামান্য অসুখ-বিসুখে বা অল্প-বিস্তর পরিশ্রম করলেই ক্লান্তিতে আমাদের পিঠ টন্‌টন্ করে, শুয়ে-বসে পিঠের সে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘুচাতে হয়।

একালের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা বলেন—মেরুদণ্ড যদি মজবুত থাকে, তাহলে প্লুরিশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি নানান্ রোগের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকখানি, তেমনি মেরুদণ্ডের অস্বাচ্ছন্দ্য বা বৈকল্য ঘটলে শুধু উপরোক্ত ব্যাধিগুলিই নয়, যক্ষ্মা, বাত এবং পক্ষাঘাত হবারও আশঙ্কা সবিশেষ। তাছাড়া মেরুদণ্ডের অস্বাস্থ্যের ফলে, পরিপাক-শক্তির গোলযোগ ঘটে. ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগের

করলে পড়বার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট। তাই মেরুদণ্ডকে সরল, সুঠাম, স্বচ্ছন্দ এবং মজবুত রাখার উদ্দেশ্যে, আধুনিক চিকিৎসক এবং রূপচর্চ্চা বিশারদেরা সচরাচর বিশেষ-ধরণের যে সব সহজসাধ্য 'ঘরোয়া' ব্যায়াম-বিধির উপদেশ দিয়ে থাকেন, এবারে তারই মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো।

প্রথম ব্যায়ামবিধি অনুশীলনের জন্য—ঘরের সমতল মেঝের উপর দেহ এবং মেরুদণ্ড সটান-সিধা রেখে খাড়া ভাবে দাঁড়ান। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে দুই পায়ের গোড়ালি তুলে শুধু পায়ের আঙুলগুলির উপর দেহের ভার রেখে উবু-ভঙ্গীতে বসুন। এভাবে বসার সময়, বুক যথাসম্ভব চিতিয়ে রাখবেন এবং দুই হাত দেহের পিছন দিকে, যত দূর সম্ভব, প্রসারিত করে দিন। তারপর বেশ দ্রুত-তালে দুই হাত দেহের পিছন দিক থেকে সামনে টেনে এনে চট করে সিধা-খাড়াভাবে উঠে দাঁড়ান। এভাবে দাঁড়ানোর পর, নিশ্বাস ত্যাগ করে ক্ষণকাল স্থির হয়ে থেকেই পুনরায় উপরোল্লিখিত ভঙ্গীতে বসে পড়বেন। এইভাবে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ মিনিটকাল বেশ দ্রুত-তালে 'ওঠ্-বোস্' করতে হবে। নিত্যনিয়মিত-ভাবে এ ব্যায়াম-বিধি অভ্যাসের ফলে, সারা অঙ্গ কমনীয়-ছাঁদে গড়ে উঠবে এবং বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট ও জঘন-দেশের গঠন হবে সুঠাম ও লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত।

সুষ্ঠু মেরুদণ্ড-গঠনের উপযোগী দ্বিতীয় ব্যায়াম-বিধি অনুশীলনের জন্য—দেহ এবং মেরুদণ্ড সটান ও সিধা রেখে ঘরের সমতল মেঝের উপর উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই পা ও পায়ের আঙুলগুলি জোড়া রেখে এবং বুক থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেহাংশ উঁচু করে ধনুকের মতো উবুড় হয়ে শুয়ে বঙ্কিম-ভঙ্গীতে দুই হাত পিঠের উপর এনেএক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুটিকে কষে ধরুন। এভাবে পিঠের উপর দুই হাত সংলগ্ন রেখে উপরে-নীচে দ্রুত-তালে দোলান···সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে মাথা এবং পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত ধনুকের মতো বাঁকানো-ছাঁদের দেহাংশও সেই তালে-তালে দোলাতে থাকুন—জলের ঢেউয়ে নৌকা যেমন দোলে, অবিকল তেমনিভাবে সারা দেহ দোলাতে হবে। এ ব্যায়ামবিধিও নিত্যনিয়মিত অন্ততঃপক্ষে পাঁচ মিনিটকাল অভ্যাস করা প্রয়োজন। এ ব্যায়াম ভঙ্গী অভ্যাসের ফলে, মেরুদণ্ড এবং দেহ—দুই-ই হয়ে উঠবে সুস্থ, সবল ও স্বচ্ছন্দ।

মেরুদণ্ডের ব্যায়ামের তৃতীয় বিধি অনুশীলনের জন্য—দেহটিকে সটান-সিধা রেখে ঘরের সমতল মেঝের উপর খাড়াভাবে দাঁড়ান। এভাবে দাঁড়ানোর পর, ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের তালে-তালে মেঝের উপর থেকে ডান-পা উঁচুতে তুলে হাঁটুর কাছে মুড়ে পায়ের পাতা ও আঙুলগুলি যতখানি সম্ভব বাঁকিয়ে বাঁ-পায়ের উপর দেহের ভার রেখে কিছুক্ষণ স্থির-স্তব্ধ হয়ে থাকুন। তারপর দেহ, পিঠ ও মেরুদণ্ড সিধা-খাড়া রেখে দুই হাত শরীরের পিছন দিকে হেলিয়ে এবং বক্ষঃস্থল সুমুখ-দিকে চিতিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বেশ গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন—অন্ততঃপক্ষে, প্রায় দুই মিনিটকাল।

এইভাবে ব্যায়াম-অনুশীলনের পর, ডান-পা ঘরের মেঝেতে নামিয়ে ও ডান-পায়ের উপর দেহের ভার রেখে বাঁ-পা উঁচুতে তুলে হাঁটু মুড়ে উপরোল্লিখিত-বিধিতে পুনরায় এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি দুই মিনিটকাল অভ্যাস করতে হবে। নিত্যনিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অভ্যাসের ফলে, দেহ ও মেরুদণ্ডের গঠন সুঠাম, সুন্দর ও সুস্থ-সবল হয়ে উঠবে।

স্থানাভাবের কারণে, এবারে মেরুদণ্ডের ব্যায়াম-উপযোগী আরো কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গীর হদিশ দেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় 'কৌচিং' (Couching) পদ্ধতিতে সুতোর ফোঁড় তুলে সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পে

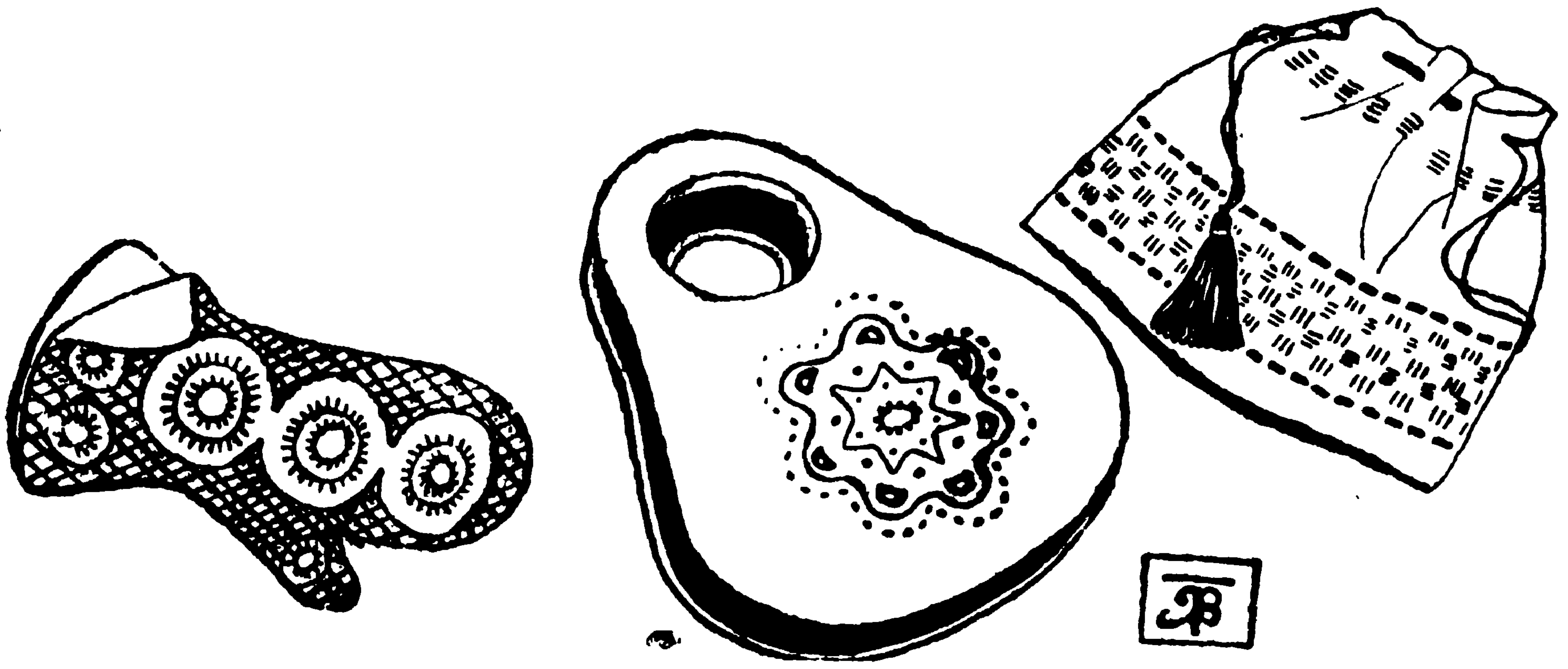

ক

উপযোগী 'দস্তানা' (Mitten), 'হাত-ব্যাগ' (Vanity-Bag) ও 'বটুয়া-থলি' রচনার যে তিনটি নক্সা-নমুনা (Design-Pattern) প্রকাশিত হয়েছিল, এবারে বলছি, কি উপায়ে সেগুলিকে সূতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের উপরে পরিপাটি-ছাঁদে রূপদান করা যাবে—তারই কথা।

উপরের নক্স-নমুনা অনুসারে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে 'দস্তানা' রচনার জন্য—'বাটন্‌হোল্‌-ষ্টিচ' (Buttonhole Stitch) এবং 'ডার্নিং' (Darning) সেলাইয়ের ফোঁড় তুলবেন। 'ডার্নিং' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কায়দা সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলারা সকলেই অল্প বিস্তর জানেন, তাই সে সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলেই ধারণা হয়। 'কৌচিং'-পদ্ধতিতে 'বাটন্‌হোল ষ্টিচ্‌' রচনার প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে পুনরানুবৃত্তি করার আবশ্যকতা নেই।

উপরের নক্সা-নমুনা অনুসারে মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী সুদৃশ্য-সৌখিন 'হাত-ব্যাগ' রচনার জন্যও পূর্ব্বোল্লিখিত-পদ্ধতিতে 'বাটন্‌হোল্‌-ষ্টিচ্‌' এবং 'ডার্নিং' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে কাজ করতে হবে।

উপরের নক্সা-নমুনার ছাঁদে 'বটুয়া-থলিটিকে' এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে পরিপাটি-নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে, সহজ-সরল 'ডার্নিং'-পদ্ধতিতে আগাগোড়া ছোট-ছোট ও সমান-মাপের সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে এমব্রয়ডারী করবেন। তবে নজর রাখবেন—এভাবে ছোট-ছোট এবং সমান-মাপে সুতোর ফোঁড় তুলে এমব্রয়ডারী-কাজের সময়, নক্সাটির কোনো অংশ যেন এতটুকু বাঁকাচোরা বা অসমান ছাঁদে রচিত না হয়। কারণ, সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার সময় এদিে সজাগ-দৃষ্টি না রাখলে, 'বটুয়া-থলিটির' আলঙ্কারিক-শো ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

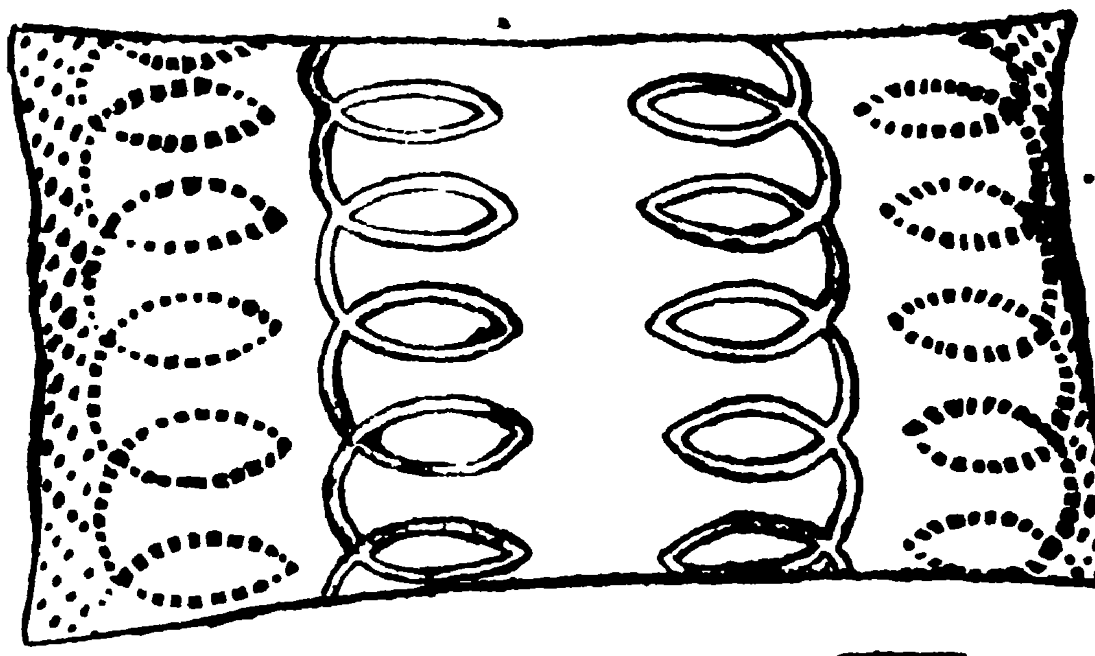

খ

উপরের নক্সাতে সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী-সূচীশি কাজ-করা যে 'কুশন' (Cushion) বা 'বালিশে (Pillow) নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি অলঙ্কর জন্য—ঈষৎ-মোটা ধরণের রেশমী বা পশমী সুতোর হা ব্যবহার করাই ভালো। তবে প্রয়োজনবোধে, দো বা ঈষৎ-মোটা ধরণের 'তুলোর-সুতা' (Cotton-Strand ব্যবহার করা যেতে পারে। 'কুশন' বা 'বালিশে উপরকার সহজ-সরল 'আলঙ্কারিক-নক্সাটি' রচনা কর হবে—ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত এবং গত পৌষ ১৩৭৪ সংখ্যা প্রকাশিত 'ছ' ও 'জ' চিহ্নিত চিত্রের নমুনা অনুসা 'কৌচিং'-পদ্ধতিতে সুদৃশ্য-পরিপাটি সেলাইয়ের ফোঁ তুলে

সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের উপযোগী বিভিন্ন ধরণের নক্সা-রচনা এবং বিবিধ পদ্ধতিতে বিচিত্র-আলঙ্কারিক সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কলা-কৌশল সম্বন্ধে মোটামুটি যে সব হদিশ দেওয়া হলো, সেগুলি হয়তো সূচীশিল্পানুরাগিণীদের কারো-কারো কাজে লাগতে পারে—এমনি ধারণাতেই প্রসঙ্গালোচনা সুরু করা হয়েছিল। বারান্তরে, সুযোগ-সুবিধামতো সূচীশিল্প সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

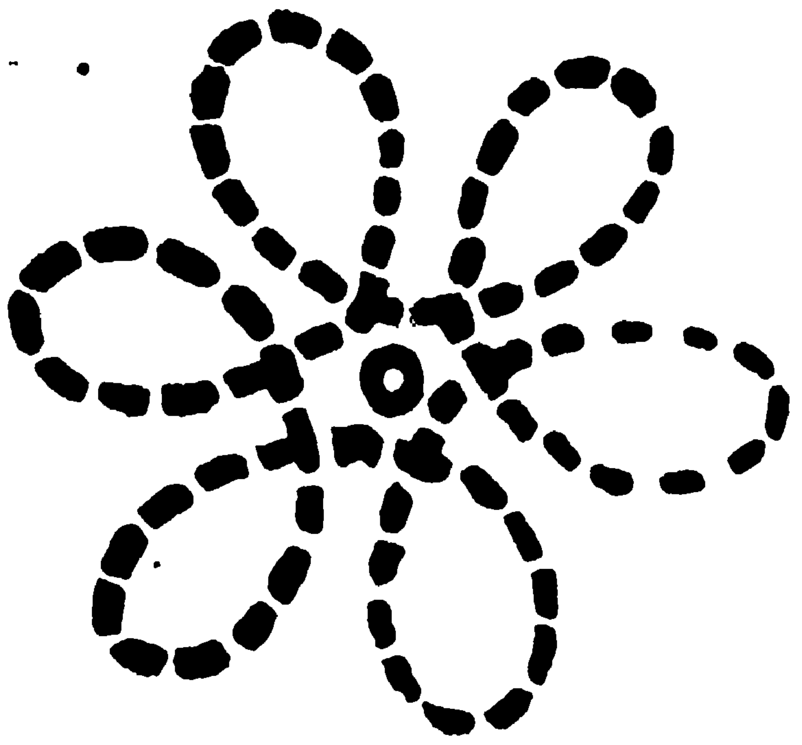

ছ

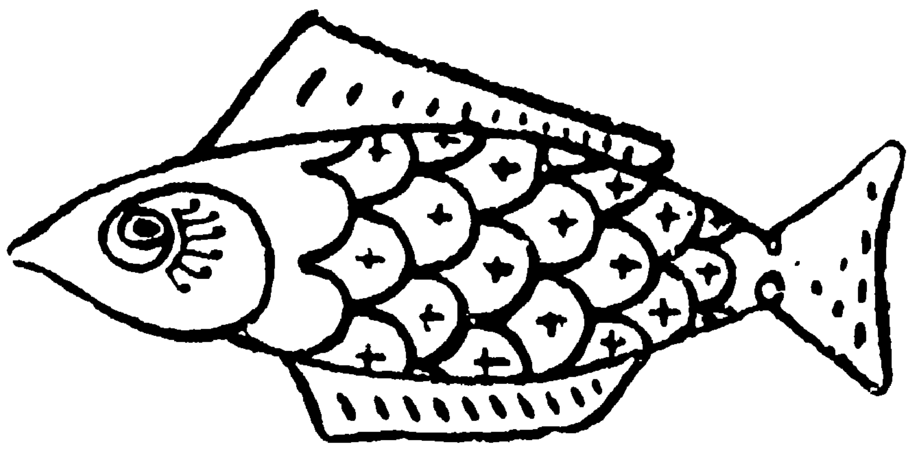

জ

মার্টিন লুথার কিং

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

কতবার রুধিরে সিক্ত
হবে ধরিত্রীর ধুলি রাশি ?
মৈত্রী-সাম্য-শান্তি-দূতে
বর্বরেরা কত যাবে নাশি ?
কণ্টক মুকট শির
যীশুরে কবরে কেবা রাখে ?
তাঁরি মত নব রূপে রাজা,
তুমিও ফিরিবে লাখে লাখে।

গল্প

বন্ধুবরেষু

অলক সান্যাল

আজ, চিঠি দিচ্ছি। বহুদিন অপেক্ষায় থেকে থেকে ক্ষুণ্ণ হয়েছ, জানি। প্রচ্ছন্ন আভাসে ইঙ্গিতে যতটা ব্যস্ত মানুষ বলে আমাকে ঠাট্টা করেছ, ততটা কিন্তু মোটেই নই। চিঠি না দেওয়াটা, সুতরাং, আমার অপরাধ—স্বীকার করছি।

তবে একটা কথা। এই দিন পনেরো হল যে বেসরকারী ডাক্তারীটা জুড়েছি—আমার চিঠি না দেওয়ার অপরাধ বা অক্ষমতার সঙ্গে সেটিকে যদি একটি কৈফিয়তের সামিল মনে করে নাও, অনুগৃহীত হব। আজকের চিঠির মধ্যে সেই কারণটাই তুলে ধরব। বানিয়ে বলছি না। যদি তাই বলতাম বা বলতে পারতাম তাহলে, সত্যিটুকু গোপন করে মিষ্টি একটি প্রেমের গল্প লিখে পাঠাতাম তাকে, যা পড়ে তুমি আনন্দ পেতে। কিন্তু নিছক আনন্দ দিয়ে আমার কি লাভ—বা তোমার, যদি তা মিথ্যেই হয়।

তার আগে একটা সুসংবাদ দিই। আজ সকালেই তোমার চিঠির সঙ্গে আর একটা চিঠি পেয়েছি। খুলে দেখি বদলির অর্ডার। এক দূর দেশে। তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে জানিনা। এখনকার কয়েক মাসের রিলিফের জীবন থেকে রিলিফ পেয়ে এবার এক নতুন পরিবেশে যাবার জন্য যাত্রা শুরু করছি।

এ কটা মাস কেমন ভাবে কাটিয়েছি? ভাল মত আলাপ হয়নি কারো সঙ্গে—এক সীতানাথ মুখার্জী ছাড়া। ভদ্রলোক এখানকার স্কুলের হেড মাষ্টার মশাই ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। বড্ড অভাবী। কয়েকটা টিউশানি করে কোনক্রমে সংসার চালান। গ্রাম বলেই সম্ভব। দারুণ এই পাগল মানুষ। পড়াশোনার মধ্যেই ডুবে থাকেন সব সময়। সে সব দর্শন শাস্ত্র। এছাড়া অন্যকিছু বোঝেন না বা বুঝতে চান না—জানি না। তবে এই দিন পনেরো থেকে ওঁদের বাড়ীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে কিছুটা বেঁচেছিলাম, পরিচয়টা অবশ্যই ডাক্তারীর মাধ্যমে।

আমি যদি ডাক্তার না হয়ে তোমার মত অন্য কিছু হতাম, তাহলে সীতানাথবাবুর অন্দরে অনুপ্রবেশ আমার ভাগ্যে ঘটত না। বোধ করি সেটা ভালই হত।

আজ বদলির অর্ডার পেয়ে কেন জানি একটু দুঃখ হচ্ছে। এই জায়গাটা ছেড়ে যাবার জন্য নয়। একটু ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যথা। যা কেবল বন্ধুর কাছেই ব্যক্ত করা যায়। সেন্টিমেন্টাল মনে করো না। মেডিকেল কলেজে অনেক হৃদয় হাতরে দেখেছি। চাপ চাপ রক্ত আর দলা দলা মাংস ছাড়া সেখানে অন্যকিছু খুঁজে পাইনি। এটাও কি আমার অক্ষমতা? যদি বল, তাই। তবে তাই।

কিন্তু জ্যান্ত হৃদয় নিয়ে কারবার এর আগে করিনি। কেন না সীতানাথ মুখুজ্জ্যের মেয়ে অঞ্জনার দেখা আমি এই দিন পনেরো আগেও পাইনি বলে।

এইটুকুই জানতাম—অঞ্জনা নামে কেও একজন থাকে এ বাড়ীতে। তার বেশী নয়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় তখনই ঘনিষ্ঠ হয়, যখন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসে। কিন্তু সীতানাথবাবু তার ব্যতিক্রম। নিজের গণ্ডীর মধ্যে তিনি এক অন্য মানুষ। সেখানে তিনি দার্শনিক। সকালবেলার ক'টা টিউশানী ছাড়া বাকী সময়টুকু তাঁর বেদ আর উপনিষদ, সক্রেটিশ, রাসেল, রাধাকৃষ্ণণকে নিয়ে কাটে।

অথচ এই ক'টা মাস ধরে আমি এই গ্রামের মধ্যে যেটুকু মিশেছি—এই মানুষটির সঙ্গে, আন্তরিকতাও পেয়েছি।

কিন্তু আন্তরিকতা এবং অন্তরঙ্গতা বোধকরি এক নয়। সীতানাথবাবুর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ঘটেনি। এটা কোন্ পক্ষের দুর্বলতা বলা কঠিন। জানি—সীতানাথবাবুর সঙ্গে আমার যে বয়সের ফারাক্ সেটা ঠিক বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই অন্তরঙ্গতার একমাত্র প্রকাশ নয়।

সীতানাথবাবুর ও আমার মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীরটা ছিল এক জায়গায়। সেটা তাঁর প্রবল পাণ্ডিত্য। যার

কাছে আমি শিশু। যদিও এই ক'মাসে ঘন ঘন তাঁর আলোচনার একনিষ্ঠ শ্রোতা সেজে বসেছি আমি। কিছু বুঝি আর না বুঝি। তাঁরও অবসর হয়নি আমার মগজের মাত্রাটা বুঝে নিতে। এমন একজন নিষ্ঠাবান শিষ্ট শ্রোতা পেয়েই তিনি আনন্দিত!

অনেক সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি মনে মনে। বাইরে প্রকাশ করবার ইচ্ছে জাগলেও সাহসে কুলোয়নি। সীতানাথের জ্ঞান গম্ভীর প্রাজ্ঞ.মূর্তির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে থেকেছি।

সীতানাথ সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন—আপনার খুব ধৈর্য আছে! লজ্জা পেয়ে বলেছি—কি যে বলেন।

সীতানাথ বলেছেন—বাস্তবিক। আপনার ধৈর্য আছে! আর মনও। লজ্জাটা আরও বেড়ে ওঠে।

আত্মগ্লানিতে মন ভরে আসে। সীতানাথ জানেন না। কে মনকে প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা টেনে আনে এই ঘরে। দর্শনের বইতে ঠাসা ভ্যাপসা গুমোটের এক ঘেয়েমীতে ভরা সেই ঘরে কোথাও একটা সূক্ষ্ম ব্যথার আনন্দ লুকিয়ে থাকে আমার। রোজ রোজ একটা মন-কেমনের মালা গাঁথি এখানে, ছোট ছোট একই ট্র্যাজেডীর ফুল দিয়ে। মালাটা একদিন শেষ হবে এই আশায় বোবা শ্রোতার অভিনয় করে চলি এখানে নিত্যদিন। কিংবা কাটা সৈনিকের!

আমি অঞ্জনার কথা ভাবি! এ ঘরে তার একটা ছবি আছে। সেই ছবিটাই আমাকে ভাবনার প্রশ্রয় দিয়েছে।

তাকে চোখে দেখিনি তখনও। তাই মন সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। মনে হয় দরজার আড়ালে কিংবা দরজার ফাঁক দিয়ে এক জোড়া চোখ দৃষ্টি মেলে দিচ্ছে এই ঘরের দিকে। এ ঘরে হারিকেন জ্বালা আবছা অন্ধকার। সীতানাথ আর আমি। আর সেই দৃষ্টি।

প্রথম দিন ছবিটা দেখেই ভাল লেগেছিল। বলতে দ্বিধা নেই, একটা ধারণাও সেই সঙ্গে মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল।

আমি যদি জানতাম আমার সেই ধারণাটাই সত্যি তাহলে এই ভালো লাগাটাও সেদিন নিছক ভালো লাগার মধ্যেই সীমিত থেকে যেত।

প্রথম দিন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখছি। সীতানাথ বললেন ওটা আমার মেয়ের ছবি। অঞ্জনার।

সীতানাথের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা আমি গম্ভীর হয়ে গেছি।

একটা অহেতুক ধারণা মনকে পেয়ে বসল। এত বড় ছবি এখানে যখন এমন ভাবে টাঙানো রয়েছে তখন এটা কোন মরা মানুষের ছবি। (কি হাস্যকর ধারণা!)।

স্বভাবতঃই সমবেদনার সুরে বললাম, একেবারে জীবন্ত ছবি। খুব ডিসটিন্‌কট।

সীতানাথ বিষণ্ণ হাসলেন।

বাস্তবিক। অঞ্জনাকেও আমি সেই কথাই বলি। মানুষটার চেয়ে ছবিটাই জীবন্ত। শুনে ও হাসে।

আমার লক্ষ্মীছাড়া ধারণাটা মনের মধ্যে নিখাদ লজ্জায় পর্যবসিত হল সেই মুহূর্তে।

সীতানাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই দর্শনের দুরূহ ব্যাখ্যা শুনতে হচ্ছিল আমাকে। কিন্তু আমার কাছে তখন যা সবচেয়ে সত্য—সেই একটি দর্শনের আশায় দিন কাটাচ্ছি। মাত্র একবার আলেয়ার মত এসে চলে গেছে অঞ্জনা আমাদের আলোচনার মধ্যে। তারপর থেকে সীতানাথ আর কিছুই বলেননি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি নেমেছিল। ঝোড়ো হাওয়াটা। মাঘের শেষ। শীত শীত ধরেছিল সর্বাঙ্গে।

সেদিন আর যেতে ইচ্ছে করল না। ভাল একটা বই ছিল কাছে। পড়ব ভাবলাম। আর ওই দার্শনিক কচ্‌কচানি কত ভাল লাগে বল।

কিন্তু যা ভাবি তা হয় না।

সীতানাথবাবু লোক পাঠিয়েছেন। অঞ্জনার ভীষণ জ্বর এসেছে বিকেল থেকে। আমাকে যেতে হবে।

সেই প্রথম অঞ্জনাকে দেখলাম আমি। জ্বরের ঘোরে পড়ে আছে। দ্রুত নিঃশ্বাস। অস্ফুটভাবে কাতরাচ্ছে। সারা মুখখানা টস্ টস্ করছে। আয়ত চোখদুটো তুলে কয়েকবার তাকাল।

কপালে হাত দিয়ে দেখি গা পুড়ে যাচ্ছে।

হাতটা দেখতে চাই। নিজেই তুলে নিয়ে দেখা যেত। কিন্তু লেপ দিয়ে হাতটা ঢাকা।

অঞ্জনা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরায়। লেপের নিচে হাতটা যেমন তেমনি রেখে দেয়।

সীতানাথ বলেন,—নাড়ী দেখবেন ?

লেপ সড়িয়ে দিয়ে মেয়ের হাতটা তুলে দিলেন। নাড়ী দেখে থার্মোমিটার বের করি। জ্বর দেখা প্রয়োজন। যন্ত্রটা ঝেড়ে দিয়ে অঞ্জনার দিকে এগিয়ে দিই।

—আমাকে দিন। সীতানাথ আমার হাত থেকে থার্মোমিটার নিলেন।

অঞ্জনা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার মাথা নাড়িয়ে অস্ফুট আপত্তি জানায়।

—কি ?

আমাকে আড়াল করে সীতানাথ মেয়ের মাথার পাশে গিয়ে বসেন।

—মাকে ডেকে দেব ? আচ্ছা তাই দিচ্ছি।

সীতানাথ উঠতে যাচ্ছিলেন। বুঝলাম না। অঞ্জনাকে দিলেই তো হয়। থার্মোমিটার দেখার জন্য আবার একজনের কি প্রয়োজন জানি না।

—কেন ওকেই দিন না। বাধা দিয়ে বলি। দু'মিনিটের তো ব্যাপার। কি হবে।

সীতানাথ উঠতে উঠতে বললেন, ও নিজে পারবে না। প্যারালিসিস্। ওর মাকেই সব করতে হয়।

দম্‌কা ঝড়ে জানলার পুরণো ছিটকিনিটা খুলে গেল। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। দেওয়ালের গায়ে ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলি বিপর্যস্ত হল। কেরোসিনের ডিমলাইটটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে যাবার যোগাড়।

সীতানাথ উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করেন।

বাইরে আবার এক পশলা বৃষ্টি নেমেছে। একটু আগে বাজ পড়েছে কোথাও। ভীষণ শব্দ করে।

—আমি নিচে গিয়ে ওর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে ডাকলে কিছু শুনতে পাবে না।

সীতানাথ দরজার বাইরে দৃষ্টি ছুঁড়ে ঝড়ের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করলেন।

—একটু অপেক্ষা করুন।

দরজা দিয়ে সীতানাথ বেরিয়ে যান। পুরোণো সিঁড়ি বেয়ে তাঁর খড়মের শব্দ শোনা যায়।

অঞ্জনার মাথার কাছের জানলাটা নড়ছে বাতাসে। বিকৃত শব্দ উঠ্‌ছে। ক্যালেণ্ডারখানা অল্প অল্প কাঁপছে এখনও। ছবিতে একটা উচ্ছ্বাসী মেয়ে হাসছে। যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

ঘরের মধ্যে নীলচে ভিজে খানিকটা আলো।

হাত দু'খানা জড়ো করে বুকের কাছে আনি। কোটের ভিতরে ঠাণ্ডা ঢুকছে হু হু করে। শীতকে তাড়ানো যাচ্ছে না।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ কানে এল অঞ্জনার। জিজ্ঞেস করি,—কি হল ? শীত করছে ? মাথা নাড়িয়ে কি জানাল বুঝতে পারিনা।

আবার শুধাই—মাথা ধরেছে ?

এবার সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে, হুঁ।

—মাথা টিপে দেবে কেউ ?

—কে ?

—আপনার মা।

অঞ্জনা চোখ তুলে তাকায়।

—আপনার বাবা ডাকতে গেছেন নীচে। এখুনি আসছেন।

একটা শব্দ হল। ডিমলাইটের কাছ থেকে একটা টিকটিকি খসে পড়ল মেঝেতে। আলোটার চারপাশে ঘিরে পাখাওয়ালা উইপোকার ভীড়। কয়েকটা টিকটিকি জুটেছে।

উইপোকাগুলো দরজার বাইরে থেকে, জানলার ফাঁক দিয়ে উড়ে উড়ে আসছে।

আবার উশখুশ করে অঞ্জনা। উইপোকা আর টিকটিকির জটলা থেকে চোখ ফিরিয়ে আনি। অঞ্জনার সারা মুখে বিরক্তি। মাথাটা অল্প অল্প নাড়াতে চাইছে।

– কি হল ? জিজ্ঞেস করি।

—পোকা !

—কোথায় ?

—কানের কাছে।

অঞ্জনা বালিশে মাথা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

একটু বাদেই সিঁড়িতে আলো দেখা যায়। হারিকেন হাতে নিয়ে অঞ্জনার মা আসেন। সীতানাথ ফেরেন না। মেয়ের মাথার কাছে থার্মোমিটার রেখে গেছেন। জ্বরটা দেখতে বলি।

জ্বর দেখে যা ওষুধ দেবার দিয়েছিলাম। কিন্তু

ডাক্তারীর চাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল সেদিন পরিচয়টা।

তোমাকে যখন চিঠি না দেবার কৈফিয়ৎ দিতে বসেছি। তখন খুলেই বলি। সেদিন রাতে ঝিপঝিপে বৃষ্টির কান্না শুনতে শুনতে সারারাত্রি বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে কাটিয়ে দিয়েছি। ঘুম আসেনি। এরপর থেকে আর দার্শনিক তত্বের শ্রোতা নই। পুরোপুরি ডাক্তারী শুরু করেছি।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় যেতে অঞ্জনার মা নালিশ জানান। আমার পাঠিয়ে দেওয়া ওষুধ সকাল থেকে মাত্র একদাগ খেয়েছে অঞ্জনা। বাকীটা যেমন তেমনি থেকে গেছে। মুখে তোলেনি।

কারণ কি তাকেই জিজ্ঞেস করি।

কালকের বেঘোর ভাবটা আজ কম। কিন্তু জ্বর বাড়ছে বুঝতে পারি। গতকাল সন্ধ্যের দিকেই জ্বরটা এসেছিল। আজও সেই সময় মত বাড়ছে। তাছাড়া কাল দুর্যোগের জন্য অনেক দেরীতে এসেছিলাম। তখন জ্বর পুরোপুরি এসে গেছে। আজ এসেছি সন্ধ্যে করে।

অঞ্জনা আমার কথার উত্তর দেয়না। অন্যধারে চোখ ফিরিয়ে রাখে।

সামনের টেবিলে ওষুধের শিশি রাখা আছে। তুলে নিই। পাশের ছোট কাপটাও।

মাসীমা খুশী হয়ে দেখছিলেন। বলে রাখি, অঞ্জনার মাকে আমি মাসীমা বলি।

—ওষুধের ওপর ওর বরাবর বিতৃষ্ণা ছেলেবেলা থেকেই, মাসীমা বলেন। ওষুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে আমার বেপরোয়া ভাবটা তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

রুগীর জিদ ডাক্তারের অনায়াস সাধ্য, প্রমাণ হল। গম্ভীরভাবে বলি—এই করলে কি করে জ্বর ছাড়বে। সারাদিন গিয়ে এই সন্ধ্যেবেলা তো একদাগ পেটে পড়ল।

মাসীমা বলেন, ওকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছি বাবা। এত বড় মেয়ে কিছু যদি বোঝে। জ্বর হয়েছে, ওষুধ খাব না। না খেলে যে রোগও যাবেনা। একেই তো এই চিররুগ্ণ।

মাসীমাকে নির্দেশ দিই—জোর করে মুখে দেবেন। কোন কথা শুনবেন না।

—জোর খাটলে তো। মেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রাখে।

মাসীমার কথায় ওর ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে যায়। মুখখানা জানলার দিকে ফিরিয়ে নেয় মুহূর্তে।

একটি নিঃশব্দ যোগাযোগের মত একটুখানি হাসি আমিও ঠোঁটে রেখে মাসীমার দিকে ছুঁড়ে দিই।

মুখে বলি—না না, ও সব ছেলেমানুষী একদম শুনবেন না।

এই ওষুধ খাওয়া নিয়ে ঝামেলা প্রায়ই চলত। কাজে আটকা পড়ে দু'দিন যাইনি। পরদিন গিয়ে শুনি সেই পুরণো নালিশ।

অঞ্জনার এই ছেলেমানুষী বা জিদ আমার বিরক্তির কারণ হল দুটি কারণে। প্রথমতঃ ডাক্তারখানা আমার নিজস্ব নয়, সরকারী। কাজেই রোজ রোজ ওষুধ নষ্ট করা অন্যায়।

দ্বিতীয়তঃ আমার পাঠানো ওষুধ গ্রহণ না করে অঞ্জনা কি লাভ দেখেছে জানিনা। আমি না থাকলে তাকে শেষ পর্য্যন্ত ঐ লোকটার ওষুধই তো খেতে হত, যে ওকে ওর সাত বছর বয়সে পঙ্গু করেছে কঠিন রোগের চিকিৎসা করে।

মাসীমার মুখে শুনেছি ওর ছেলেবেলার অসুখের কথা। রোগে ভুগে ভুগে শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি হারাল। হাত পা নাড়ানোর ক্ষমতা পর্যন্ত।

আমার উচিত তাকেই ডেকে দেওয়া। তবু নিজেই গেছি। জিজ্ঞেস করেছি—কি, ওষুধ খাবেই না পণ করেছ?

অঞ্জনা হেসে জানিয়েছে—ভীষণ তেতো ওষুধ যে!

ওষুধ তো তেতোই হবে আমি বলেছি। উপায় কি!

—মিষ্টি হয়না বুঝি? অঞ্জনা পাল্টা প্রশ্ন করেছে।

কোন কথা কানে তুলিনি। শিশিটা তুলে নিয়ে ওষুধ ঢেলেছি।

খেতে গিয়ে শেষ আপত্তি জানিয়েছে অঞ্জনা।—ছিঃ নিমপাতা। কাপটা ওর গলায় উপুর করে দিয়ে বলেছি—মধু মনে করলেই মধু। মনে করো না।

অঞ্জনা হাসে না। কথার উত্তরও দেয় না।

একটু চুপ থেকে আবার বলি—হঠাৎ গম্ভীর কেন। শরীর খারাপ লাগছে ?

—না—

—তবে।

—এমনি।—

—এমনি কেউ গম্ভীর থাকে ?

উত্তর না দিয়ে চোখ বন্ধ করে।

জিজ্ঞেস করি—ঘুম আসছে ?

মাথা নাড়া দেয়।

বিছানার চাদরে তর্জনী দিয়ে কয়েকবার আঁচর কাটার সাধনা করে।

ওর এই স্তব্ধতা ক্রমশ: অস্বস্তিকর ঠেকতে শুরু করে আমার কাছে। পরিবেশকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করি।

—মাসীমাকে ডাকব ?

এবার চোখ তুলে তাকায়—কেন ?

—যদি কোন অসুবিধে হয়।

—কিছু না।

—কিন্তু ডাক্তারের কাছে সব কিছু খুলে না বললে কি করে হবে।

অঞ্জনা হেসে ওঠে।

—হাসছ যে ?

—এমনি। হাসি পেল, তাই।

উঠে আসছিলাম। বাধা দেয়। এখুনি চলে যাবেন না। একটু বসুন। মা এলে তবে যাবেন। মা এখুনি আসবে।

—আমার একটু কাজ আছে যে।

—ভারী কাজ।

ওর আব্দারের সুরটা আমার কাছে ধরা পড়ে। উঠেও উঠতে পারি না। যে মিথ্যে কথাটা বলেছিলাম। অঞ্জনা সেটা আবার যাচাই করবে ভাবিনি।

—কি কাজ বললেন না তো ?

হেসে বলি—আমারও যে কাজ থাকতে পারে।

—ও ডাক্তারী। আপনি বুঝি সব সময় ডাক্তারী করেন ? বলি—না। তা ঠিক নয়।

—তবে। আমার সঙ্গে একটু গল্প করতে দোষ কি। কথা বলার কেউ থাকলে আপনাকে আটকে রাখতাম না। নেই যে কেউ। সময় কাটে না।

—মা আছেন তো।

—ও বাবা! মার সেই একঘেয়ে কথা। কেবল দুঃখ আর দুঃখ।

বিশ্রী লাগে। অন্যসব কথা শুনতে ইচ্ছে করে আমার। দেশ বিদেশের কথা। যা কোনদিন শুনিনি। দেখিনি। জানেন, এই ঘরটার বাইরে কি আছে ভাল করে তাই জানিনা। কোন্ ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। মনে নেই। ভুলে গেছি।

চোখ বন্ধ করে অঞ্জনা। অনেক দিনের পুরোণো স্মৃতিতে বোধ হয় ফিরে যায়। যখন ও চলতে ফিরতে পারত, কিংবা দৌড়ে দৌড়ে খেলা করে বেড়াত।

—আপনি রাগ করেছেন ?

—কেন ?

—এই যে আপনাকে আটকে রেখেছি ?

—রাগ করব কেন ?

—সত্যি বলছেন ?

হেসে বলি—বিশ্বাস হচ্ছেনা ?

—না !

অঞ্জনা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। হাসে। কি করে জানব ?

একটু থেমে বলে—আমাদের বাড়ীর সামনে একটা বড় মাঠ আছে। তাই না ?

—হ্যাঁ। এই জানলা দিয়ে দেখা যায়।

একটু একটু মনে পড়ে। আমার একটা বন্ধু ছিল। বিমলি। আমার থেকে এক বছরের বড়। আমরা এক সঙ্গে খেলা করতাম। তারপর আমার অসুখ করল।

একটু চুপ করে থেকে বলে, আচ্ছা, বড় হয়ে গেলে মানুষ যেন কেমন হয়ে যায়। তাই না। বিমলির বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আমাকে ভুলেই গেছে। আমি কিন্তু ভুলতে পারি না। একটু ম্লান হাসি ক্রমশ: ওর ঠোঁটে মিলিয়ে যায়।

বিমলিকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। কতদিন দেখিনি—কতবছর! এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠি। কবে যে ভাল হব। হাঁটতে পারব, ছুটতে পারব। উঃ বিশ্রী লাগে।

অঞ্জনা মাথাটা এবারে পুরোপুরি কাত করে। আমার মুখোমুখি। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। হাসে।

—আপনার খুব খারাপ লাগছে।

—মোটেই না। আমার খুব ভাল লাগছে।

—এই গল্প আবার কারো ভাল লাগে! আমি কিছু দেখেছি না জানি। আপনারা কত ঘুরেছেন। বলুন না একটা গল্প!

—কি গল্প।

—এই, আপনার কথা। আপনার দেশের কথা। আত্মীয় স্বজন চেনা মানুষদের কথা।

আমি গল্প করি। এক মনে শোনে ও। দু চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। বিভোর রূপ।

এক এক সময় আনন্দে অস্ফুট শব্দ করে ওঠে। দু চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে—ইস, আমাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। সত্যি, দেখতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই সারামুখ কালো হয়ে আসে। বিষণ্ণ। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে—তাকিয়ে তাকিয়ে—একমনে ভাবে। আমার গল্প মাঝপথে থেমে যায়।

এই ক'টা দিন কত গল্প করেছি। অতি সাধারণ সব কথা। কিন্তু ওর কাছে সব নতুন। সব অজানা।

অঞ্জনা আকুল হয়ে শুনেছে। অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেছে। আমি যেন কোন এক স্বপ্ন রাজ্যের মানুষ।

এক একটি করে দিন কেটেছে। এক একটি করে বহু অবাক মুহূর্ত কাটিয়ে আমরা আবিষ্কৃত হয়েছি অন্ধকার থেকে। অনেক অনেক গল্প ফুরিয়ে যে গল্প শেষ পর্যন্ত বাকি থেকে গেছে—এ ঘরের নীল নীল কাঁপা কাঁপা আলো অন্ধকারে শুধু মাথা কুটে মরেছে।

কথা যত বাড়াতে চাই, তত বাড়ে। সব কথা কালি কলমে আসেও না। অনুমানে অনুভব করে নিও। আজকের কথাটুকু বলে এখন শেষ করি।

আজ সকালেও ওর দু'চোখে নীলাঞ্জনের দ্যুতি দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে চোখের কোণে ক্লান্তিও।

মাসীমা বলছিলেন—রাত্রে মেয়েটার ঘুম হয় না। একটা ঘুমের ওষুধ দিও তো।

মাসীমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওপরে উঠে এসেছি।

অঞ্জনা যেন আমার প্রতীক্ষায় ছিল।

যেতেই বলে—আজ কোন দিকে সূর্য উঠেছে?

—কেন?

—এই অসময়ে যে মনে পড়ল।

—একটা কথা বলতে এসেছি।

—কি কথা—হঠাৎ

একটু নীরব থাকি। অঞ্জনা বলে—ভাবতে হচ্ছে নাকি কথাটা।

সত্যি ভাবছিলাম। বলব কি বলব না।

তার আগেই ও বলে—আমারও একটা কথা ছিল।

—'কি কথা।'

—আজ নয়। আর একদিন। আগে শুনি—তারপর তো।

কথাটা আর বলা হল না। ইতস্তত করে উঠে পড়ি। অঞ্জনার অনুনয় শুনিনি বলে রাগ করেছে।

নীচে নেমে এসেছি। সীতানাথের ঘরে। সীতানাথ পাঠে মগ্ন। আজ কি কারণে ছুটি বোধহয় ছাত্রদের। তাই নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত।

আমি তাঁর পড়াশোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আমার চলে যাওয়ার খবরটা পৌঁছে দিই।

সীতানাথ দর্শনের বই থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসছিলাম। পেছন থেকে ডাক দিলেন।

—আজই যাচ্ছ? সীতানাথ প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, রাত্রে।

—সন্ধ্যে বেলা একবার এসো তাহলে। যেমন আসো।

—গোছগাছ করতে হবে। দেখি যদি পারি।

—অঞ্জনা আর ওর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে? দেখা হয়েছে জানাই।

—অঞ্জনা এখন ভালই, কি বল?

—হ্যাঁ। এখন বেশ সুস্থ।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সীতানাথ। তারপর এক-

সময় বলেন, একটা কথা—রোজ বলব বলব ভাবি। বলা হয় না। এর পর তো দেখাও হবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ সীতানাথ। কি বলতে চান জানি না। তাঁর মত মানুষের এমন কোন কথা থাকতে পারে জানি না। যা বলব বলব করেও বলা যায় না।

সীতানাথ বলেন—তোমার ঠিকানাটা দিও। বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা। তবু যেমন করে পারি—

—কিসের কথা বলছেন ?

সীতানাথ একটু কাশেন। ভাঙা গলায় বলেন—এত-দিন চিকিৎসা করলে মেয়েটার। তুমি ডাক্তার। ওষুধ-পত্র দিয়ে—রোজ এসে—

ছোট জানলাটা দিয়ে আমি বাইরের আকাশের দিকে তাকালাম। মাঘ শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। আকাশে আগুন। মাঠটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। গরু ছাগলের ছোট ছোট জটলা। এখানে সেখানে ফাল্গুনী মেজাজ। বাউণ্ডুলে বাতাস।

বললাম—একথা বলছেন কেন ? টাকাটাই কি সব।

শেষ কথা কটি বোধ করি একটু জোরে শোনাল।

সীতানাথ কিছুক্ষণ নীরব। কিছু বোধহয় চিন্তা করেন।

একটু পরেই বলেন—তুমি বলছ একথা।

যেন অনেক ভরসা পেলেন সীতানাথ মনে মনে। অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন। অনেকটা স্বস্তি বুকে নিয়ে চশমাটা তুলে নিলেন। টেবিলের ওপর উপুর করা খোলা বইখানাও। উদ্ভাসিত সীতানাথ। চলে এলাম।

তারপর থেকে যতবার মনে এসেছে অঞ্জনার কথা ততবার সীতানাথের। দুজনের মধ্যে কোথায় যেন মিল খুঁজে পেয়েছি।

সন্ধ্যেবেলা যাবার কথা ছিল। যেতে পারিনি। অঞ্জনা বোধ হয় এখনো অপেক্ষা করছে।

হাতে সময় ছিল। তাই ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসেই চিঠিটা লিখে ফেললাম। ট্রেণের সময় হয়ে গেছে। নতুন জায়গায় গিয়ে ঠিকানা দেব। চিঠি দিও। তবে একটি অনুরোধ। অঞ্জনার সম্বন্ধে নীরব থেকো। ওর সম্পর্কে আর কিছু বলার নেই। যেটুকু বলার, বলেছি। তার বেশী বা কম নয়। তাই এই খাপ ছাড়া গল্পটার জন্য দোষ দিও না। ছন্দ মিলিয়ে সব কিছুরই তো শেষ হয়না।

শুভেচ্ছা জেনো। ইতি।

—

বিমলকুমার সুর

আমরা আগের মাসে রবি, চন্দ্র ও লগ্নের প্রাধান্যের কথা আলোচনা করেছি। এখন রাশিচক্রের বিষয় কিছু বলবো। সূর্য্য স্থির, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান। কিন্তু পৃথিবী থেকে মনে হয় পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ঘুরিতেছেন। কাজেই একটি কাল্পনিক রেখার উপর দিয়া রবি, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণ ঘুরিতেছিল বলিয়া মনে হয়। এই কাল্পনিক রেখাটি ডিম্বাকৃতি, এবং ইহা অক্ষরেখাকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ২৩°২৭′ (ডিগ্রী ও মিনিট) কোণ করিয়া হেলিয়া থাকার দরুণ অক্ষরেখার উপর দুইটি কাল্পনিক ছেদ পাওয়া যায়। সূর্য্যের গতিপথে ঐ দুইটি বিন্দুতে সূর্য্য আসিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়। এই দুইটি বিন্দু পড়ে ২২শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

Zodiac কথাটির মানে পশুগণের সমষ্টি। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ এমনভাবে সজ্জিত হইয়া বা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন যাহাতে মনে হয় আকাশের পটে এক একটি করিয়া দ্বাদশটি ছবি আঁকা। গ্রীষ্মকালে ২২শে মার্চ নাগাদ যে বিন্দুতে সূর্য্য আসিলে দিন রাত সমান হয়, সেই বিন্দু হইতে মেষ রাশির সুরু। অর্থাৎ নক্ষত্রখচিত আকাশের ঐ অংশটি মেষের মত দেখায়। পরের রাশিটি বৃষের আকার ধারণ করেছে। এইরূপে ১২টি রাশির যথাক্রমে নাম হচ্ছে—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

বৈশাখ মাসে রবির সঞ্চারে দেখা যাচ্ছে রাহু, বুধ, শুক্র ও শনি গ্রহ মীন রাশিতে আছেন এবং ঐ রাশির উল্টোদিকে অর্থাৎ কন্যা রাশিতে কেতু, চন্দ্র ও প্রজাপতির অবস্থান। ফলে এই মাসটি সারা পৃথিবীর পক্ষেই এক জটিল মাস। নানান্ চেষ্টা ও নানান্ উৎপত্তি হবে অথচ সমস্যা মিটবে না। এর প্রধান কারণ পরিষ্কার চিন্তাধারার অভাব থাকবে। Reasonএর সহিত Passion যুক্ত হলে যেমন Reason বলে কিছু থাকে না, তেমনি সর্ব্বত্রই নিঃস্বার্থ চিন্তার অভাব হবে। অর্থাৎ নিজের কোলে ঝোল টানার দরুণ সমস্যা ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

সূক্ষ্ম বিচারের কারক বুধ। তিনিই নীচস্থ এবং আসুরিক গ্রহ রাহুযুক্ত থাকায় আসুরিক বুদ্ধিরই বৃদ্ধি করবে। এই দলে শনি যুক্ত থাকায় স্বার্থজড়িত Calculation চলতে থাকবে। অপরদিকে মনস্কারক চন্দ্র বুধের প্রতি বৈর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুদ্ধি ও মনের দ্বন্দ্ব এনে হাজির করবে। চন্দ্র, কেতুযুক্ত থাকায় মন নিজেই উদ্বিগ্নযুক্ত, কাজেই সুবিচারের অনুকূল মন কোথায়? এই সব কারণে প্রত্যেকের দাবীর মধ্যে স্বার্থগত জেদ, তেজ ও তাপ অধিক থাকবে অথচ স্বচ্ছ নিঃস্বার্থবুদ্ধি যা পরস্পরের সমস্যার সমাধানের সহায়ক তার অনেকটা অভাব থেকে যাবে।

রবি ও মঙ্গলগ্রহ বেশ বলবান্ থাকায় শৌর্য্য ও বীর্য্যের কদর হবে। সৎ সাহসে ভর করে যে কাজই করা যাবে, তার কিছু না কিছু শুভ ফল পাওয়া যাবেই। মঙ্গল ভূমিকারক কাজেই জমিজমা সংক্রান্ত সীমা পরিসীমার নির্দ্ধারণ বা অন্য সুব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। রবি গ্রহ

বিশেষ বলবান্ থাকায় সরকার সম্বন্ধীয় সব প্রচেষ্টাগুলি ভালর দিকে এগিয়ে যাবে।

চন্দ্র ও শুক্র দুইটি গ্রহই পাপপীড়িত। কাজেই সাধারণ ভাবে স্ত্রীলোকগণ সুখী থাকবেন না।

এখন মাসগত অর্থাৎ প্রতি মাসের জাতকের বৈশাখ মাসের ফলাফল বিচার করা যাক্।

বৈশাখ—এই মাসে যাঁদের জন্ম, তাঁদের ব্যয়বাহুল্য প্রচুর হবে। কর্মস্থলে নানা ঝঞ্ঝাট, বদলী, গমনাগমন ইত্যাদি ঘটবে। পিতা জীবিত থাকলে তাঁর শরীর ভাল যাবেনা এবং তাঁর অনুরূপ অনেক দুর্ভোগ হতে পারে। জাতকের আয় হতে না হতেই ব্যয় তোলা থাকবে। আত্মীয়স্বজন ও গৃহাদি কারণে বিশেষ সুখ নাই। সন্তান, বিদ্যা, গ্রন্থরচনা Speculation এই দিকগুলো ভাল। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। শত্রুপীড়া কম হবেনা। স্ত্রীর বা স্বামীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল থাকবেনা। ব্যবসায়ী হলে ব্যবসাবাণিজ্যে কিছু নাকাল হতে হবে। ধর্ম ও ভাগ্য বিষয়ে উন্নতির আশা করা যায়। প্রথম ১০ দিন অনেক বিষয়ে ভাল। শেষের ২০ দিন সাংসারিক বিশৃঙ্খলা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে উদ্বেগ ইত্যাদি নিয়ে মন খানিকটা চঞ্চল থাকবে।

জ্যৈষ্ঠ মাস—ভাল আয় হবে। লেখাপড়া সন্তানাদি ব্যাপারে শুভাশুভ। অবশ্য উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের অংশই বেশী। সন্তানাদির স্বাস্থ্য ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বিপদসঙ্কুল ব্যাপারে সন্তানাদির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর বা স্বামীর কারণে এবং সাংসারিক কারণে ব্যয় হবে। গৃহাদির ব্যাপারে যদি কিছু পাকা বন্দোবস্ত করতে চান্ ত এগিয়ে যান্। এইটি প্রথম ১০ দিন অধিক শুভ। বাকী ২০ দিন সন্তানাদির ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট বেশী এবং বিদ্যায়ও কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত পেতে হবে।

আষাঢ় মাস—কর্ম বিষয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট ও দায়িত্ব থাকবে। কিন্তু কর্মের প্রসার হবে এবং কর্মযোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন। আয় বেশ ভালই থাকবে। আত্মীয়স্বজন থেকে লাভবান্ হবার যোগ রয়েছে। গৃহ ও সাংসারিক ব্যাপারে বহু ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি না ভোগ করে উপায় নাই। বন্ধু-বান্ধব যান-বাহন সব ব্যাপারেই মধ্যে মধ্যে বেশ উদ্বেগ সৃষ্টি হবে। মাতা-পিতার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। তঁাদের নিয়ে উদ্বেগ যথেষ্ট। প্রথম ১০ দিন অনেক বিষয়েই ভাল। বাকী ২০ দিন উপর্যুক্ত অসুবিধাগুলি ভোগ হবার সম্ভাবনাই বেশী।

শ্রাবণ—শ্রাবণ মাসে জাতকের কর্ম ও বিদ্যায় শুভ ফল। কিছু নাম যশও হতে পারে। প্রথম ১০ দিন এই দিক থেকে ভাল। অর্থের দিকে একটা নিশ্চয়তা থাকবে। কিন্তু জ্ঞাতি-আত্মীয়ের ব্যাপারে এবং ছোটখাটো ভ্রমণ ব্যাপারে শুভ নয়; বিশেষ করে শেষের ২০ দিন। স্ত্রীর স্বামীর কিছু সামাজিক প্রাধান্য বা কর্মসূচী বৃদ্ধি হতে পারে। ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে ব্যবসায়ের প্রসারের কথা চিন্তা করা উচিত।

ভাদ্র—এই মাসের জাতকের পক্ষে ধর্ম, বিদ্যা, বন্ধু, মাতা, গৃহবাটী ব্যাপারে শুভ ফল। বিশেষ করে প্রথম ১০ দিন। সাধারণভাবে পরিস্থিতি ভাল থাকবে। কিন্তু অত্যন্ত অর্থব্যয়, এবং উদ্বেগ অশান্তি শোক তাপও পাবার সম্ভাবনা আছে শেষের ২০ দিন। জ্ঞাতি-আত্মীয়ের ব্যাপারে উদ্বেগ অশান্তি বেশ খানিকটা ভোগ হতে পারে।

আশ্বিন—এই মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের বেশী বে-কায়দায় থাকতে হবে। অনুকূল পরিস্থিতি পাওয়া তাদের পক্ষে এই মাসে সম্ভব নয়। ব্যবসা বাণিজ্য যাঁরা করেন তাঁদের অনেক যোগাযোগ আসবে বটে, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেয়ে যাবে। লাভের মধ্যে খাটুনিটুকু লাভ হবে। স্ত্রীর বা স্বামীর মেজাজ কেমন থাকবে বলা শক্ত। তিনি নানান্ Moodএ থাকবেন এবং নানান্ কর্মসূচীতে ব্যাপৃত থাকতে পারেন। সন্তান বিষয়ক বা বিদ্যা বিষয়ক শুভফল তুলতে কাটখড় পোড়াতে হবে কিছু বেশী। প্রথম ১০ দিন শরীর সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

কার্ত্তিক—আয় ভালই হবে। ব্যবসা বাণিজ্য স্বামী বা স্ত্রীর ব্যাপারে শুভফল। অল্পবিস্তর ভ্রমণাদি করলে কার্য্য সিদ্ধি হবে। সাংসারিক ব্যাপারে সুখ শান্তি বিশেষ দেখা যায় না। বরং অশান্তিই বেশী। বন্ধুবান্ধব যানবাহন গৃহাদি ব্যাপারে সুখ নাই। কার্য্যসিদ্ধি হওয়া বিশেষ শক্ত। নিজেই শত্রু বৃদ্ধির কারণ হতে পারেন। কাজেই

কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারে কতকটা সংযম রাখতে পারলে ভাল হয়।

অগ্রহায়ণ—তেজ বিক্রম বৃদ্ধি পাবে। কর্ম্মে উন্নতি বা প্রসারতা দেখা যায়। নানান্ ভাবে আয়ও হবে। কিন্তু বড় ভাই বা বড় বোনের বা জামাতার বা পুত্রবধূর পক্ষে সময়টা ভাল নয়। সন্তানাদি নিয়ে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। বিত্তালাভে আগ্রহ থাকলেও নানান্ কারণে বিঘ্ন এসে পড়ে আশানুরূপ ফল না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

পৌষ মাস—বিত্তা ও ধর্ম্ম ব্যাপারে শুভ ফল আশা করা যায়,বুদ্ধির উৎকর্ষদেখাযায়। সন্তানাদির ব্যাপারে শুভফল। এইসব বিশেষ করে প্রথম ১০ দিনে আশা করা যায়। গৃহাদি ব্যাপারে পরিবর্ত্তন যোগ আছে। নূতন বন্ধুবান্ধবও লাভ হবে। কর্ম্ম সম্বন্ধে উদ্বেগ দায়িত্ব যথেষ্ট থাকবে। এবং মধ্যে মধ্যে হঠাৎ গুরুতর ঝঞ্ঝাট এসে পড়তে পারে। কিন্তু ধৈর্য্য ধরে এগিয়ে গেলে সব কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা কিছুটা ঘটবে। মাতাপিতার স্বাস্থ্য তাদৃশ উত্তম থাকবে না।

মাঘ—সময়টা মন্দ নয়। অবশ্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের একটা দুশ্চিন্তা চলতে পারে। গৃহবাটীর ব্যাপারে বা মৃতের সম্পত্তির ব্যাপারে একটা সুরাহা হওয়ার আশা করা যায়। আত্মীয়স্বজন নিয়ে সময়টা বেশী কাটতে পারে। কিছু চেষ্টার পর ব্যবসায়ে লাভ বা সুবিধা আশা করা যায়।

ফাল্গুন—কর্ম্ম ও ব্যবসা ব্যাপারে উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা। ব্যবসায়ের অনেক যোগাযোগ উপস্থিত হবে। জাতক নানান্ কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকবেন। অর্থ রোজগারের চেষ্টা যথেষ্ট থাকলেও মধ্যে মধ্যে মোটা খরচ হয়ে কতকটা আর্থিক শিথিলতা এনে দেবে। ধর্ম্ম ব্যাপারে মনের ঝোঁক ভালই থাকবে এবং সাধনা করলে উন্নতি হবে। কিন্তু পুরাপুরি মন দেবার অনুকূল আবহাওয়া থাকবে না। শেষের ২০ দিন শরীর সম্বন্ধে যত্ন রাখা প্রয়োজন। শত্রুগণ চালাকি করতে গিয়ে নিজেরাই বিপদে পড়বে বেশী।

চৈত্র—নানান্ ভাবে ভাবিত থাকবেন। নিজেরাই স্থির করে উঠতে পারবেন না নিজেদের ইচ্ছা বা পছন্দ কি। তাঁরা দো-টানায় পড়ে গিয়ে কতকটা সময় অযথা নষ্ট করে ফেলবেন। যত clear ও prompt dicision নিতে পারবেন, ততই তাঁদের পক্ষে ভাল হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে তাহারা প্রসারের চেষ্টা করলে ভাল হয়, আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের চিন্তার কারণ নাই। কারণ এ বিষয়ে তাঁরা কতকটা স্থৈর্য্য বা নিশ্চয়তা আশা করতে পারেন।

——

সাময়িকী

খাদ্য কথা

প্রায় দুইমাস যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চলিতেছে। তাহার ফলে প্রায় সর্বত্র চাষী ও মজুৎদারদের নিকট হইতে কঠোরতার সহিত ধান ও চাল সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। রেশনিং এলাকায় যে চাল দেওয়া হয় তাহা পর্যাপ্ত নয়। কাজেই সেখানকার লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। একদল মানুষ গ্রামাঞ্চল হইতে চাল কিনিয়া আনিয়া তাহা রেশনিং এলাকায় বিক্রয় করে। ঐ কাজ বেআইনি হইলেও বহুদিন ধরিয়া এই চালের ব্যবসা চলিতেছে।

চাল সরবরাহ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা কঠোর হওয়ার ফলে ঐরূপ চাল কালো বাজারে আর বেশী পাওয়া যাইতেছে না। এবার পর্যাপ্ত পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপন্ন হইয়াছে। লোক আশা করিয়াছিল রেশনে চালের পরিমাণ বাড়িয়া মাথাপিছু সপ্তাহে ৭৫০ এর স্থলে ১ কিলো করা হইবে। তাহা করা হইলে জনসাধারণের চালের অভাব কমিয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু উহা এখনও হয় নাই। অথচ প্রতিদিন সংবাদ পত্রে দেখা যায় যে, সরকারী কর্মচারীরা প্রচুর পরিমাণে ধান, চাল সংগ্রহ করিতেছেন। সংগৃহীত চাল দিয়া কি নূতন ভাবে মজুত চাল রক্ষা করা হইবে?

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর সকল দিক দিয়া ভাল কাজ করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে লোক আরও বেশী কিছু আশা করে। চাল অনুসন্ধানের সময় বহুস্থানে দেখা যাইতেছে মজুতদারেরা মাটীর নীচে সিমেণ্টের ঘর করিয়া তাহার মধ্যে ধান, চাল লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঐরূপ ব্যাপারে অপরাধীদের কেন কঠোর শাস্তি দেওয়া হইতেছে না তাহা বুঝা যায় না। আর সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া রাজ্যপাল যদি দেশের জনগণকে উপযুক্তভাবে খাদ্য বিতরণে মনোযোগী হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির শাসনকে সার্থক বলা যাইবে।

গমও এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য বিদেশ হইতে গম না আনিয়া শুধু দেশী গমে দেশের চাহিদা মেটানো যাইবে কিনা তাহা বলা কঠিন। দেশে চিনির অভাব এখনও কমে নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গে খেজুরে গুড়, আঁখ প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস চাল, গম ও চিনি বণ্টন ব্যবস্থা হইতে ত্রুটি দূর করা হইলে দেশে কোন জিনিষেরই অভাব থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে আলুর কথা বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি জেলায় বহু সংখ্যক হিম ঘর নির্মিত হইয়াছে, সেই সকল হিম ঘরে আলু রাখিয়া সারা বৎসর ঠিক ভাবে তাহা বাজারে বাহির করিলে আলুর অভাব তো হইবেই না, দামও কমিয়া যাওয়া উচিত। হিম ঘরে আজকাল শুধু আলু রাখা হয় না, রাঙা আলু, পাকা কলা, কুমড়া প্রভৃতি বহু খাদ্য দ্রব্য রাখিবার ব্যবস্থা হয়। অনেক স্থানে পাকা আমও হিমঘরে তিন চার মাস রাখা চলে। একদিকে যেমন বৎসরে এক জমিতে তিনবার চাষ করিয়া অধিক খাদ্য উৎপাদনের বিপুল চেষ্টা চলিতেছে অন্যদিকে তেমনি খাদ্য বণ্টনের ও খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে মানুষ খাদ্যাভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

নূতন নূতন পথ নির্মিত হওয়ায় এখন গ্রামাঞ্চল হইতে সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য তরীতরকারি মাছ পর্যন্ত শহরাঞ্চলে আনা সহজ সাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার মত শহরের লোক দুইশত মাইল দূর হইতে আনীত শাকসব্জী তরীতরকারী প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে, ফলন বাড়িলেই আমদানি বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য মূল্য আপনা হইতে কমিয়া যাইবে। আমরা এই সকল বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

আগামী সাধারণ নির্বাচন

স্থির হইয়াছে আগামী নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন হইবে। কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য ২৮টি

দল ইতিমধ্যে নির্বাচনের আসরে নামিয়াছে। গত ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসদল এককগরিষ্ঠ হইতে না পারায় ১৪টি বিরোধীদল এক জোট হইয়া শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করে। কিন্তু নয় মাস পরে সে মন্ত্রী সভা ভাঙিয়া যায় ও যুক্তফ্রন্টের ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়, ডঃ ঘোষের মন্ত্রী সভা তিন মাসও টিকিল না কংগ্রেসের সমর্থন সত্ত্বেও। গত ২০শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হইল। এখন দেশবাসী আগামী নির্বাচনে কি করিবে তাহাই বিবেচনা করিতেছে।

কংগ্রেস ২০ বৎসর ধরিয়া দেশ শাসন করিলেও দেশের বেকার সমস্যা ও খাদ্যাভাব দূর করিতে পারে নাই। কিছু কিছু কাজ করিলেও দেশবাসী কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিল। তাহা ছাড়া কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আত্মকলহ ও দলাদলিই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের অন্যতম কারণ, কংগ্রেস যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া সংগঠনকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে তবেই আগামী নির্বাচনে তাহার একক গরিষ্ঠতা লাভের সম্ভাবনা হইবে। সেজন্য আজ প্রত্যেক সেবককে ধীর ভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের লোক আশা করিয়াছিল যে, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হইয়া সে বিষয়ে কঠোর হস্তে কর্তব্য পালন করিবেন। কিন্তু ডঃ চন্দ্রের কার্য দেখিয়া লোক এখনও কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া পায় নাই। শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন শক্তিশালী নেতা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের কার্যক্ষমতা পরীক্ষার পর দেশবাসী নূতন নেতার দ্বারা কংগ্রেসের অধিকতর শক্তি সঞ্চয় দেখিবার আশা করিয়াছিল।

নির্বাচনের এখনও ৮ মাস দেরী। বিরোধীদলেরা যতই তোড়জোড় করুন না কেন, জনসাধারণ এখনও কংগ্রেসের দিকে তাকাইয়া আছে। কংগ্রেস যদি অচিরে তাহার সংগঠনকে দৃঢ়তর না করে তবে আগামী নির্বাচনের ফল দেশের পক্ষে ভয়াবহ হইবে। গত এক বৎসরে দেখা গিয়াছে যে, যুক্ত ফ্রন্ট করিয়া মন্ত্রী সভা দখল করা যায় কিন্তু দেশবাসীর কোন উপকার করা যায় না।

যুক্ত ফ্রন্টের শাসনকালে যে শ্রমিক চাঞ্চল্য হইয়াছিল, আজও তাহার সুরাহা হয় নাই। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এখনও বেকার হইয়া বসিয়া আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি দুই মাস রাষ্ট্রপতির শাসন আমাদের দারুণ খাদ্যাভাব দূর করিতে পারে নাই। ভোট দেওয়ার কথা চিন্তা করিবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক অধিবাসীকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি

গত ২০শে ফেব্রুয়ারি হইতে পশ্চিমবঙ্গ শাসন ভার মন্ত্রী সভার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শাসন আরম্ভ করিয়াছেন। রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে লইয়া দেখাশুনা করিতেছেন। অবশ্য সেক্রেটারী হইতে কেরানী পর্যন্ত আসল কর্মকর্তা সকলেই আগেকার মত বহাল আছেন। যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রী সভা বা ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের মন্ত্রী সভা এক বৎসর কাজ করিয়া দেশবাসীর কোন উপকার করিতে পারে নাই। দেশে অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। খাদ্যমূল্য যেমন দিন দিন বাড়িয়াছে, খাদ্যের অভাবও তেমনি দিন দিন বাড়িয়াছে। এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকশত কারখানার ধর্মঘট হওয়ার ফলে দেশের অসংখ্য লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও বার বার শিক্ষক ও ছাত্র ধর্মঘটের ফলে শিক্ষা প্রায় বন্ধ হইতে চলিয়াছিল। ট্রাম ও বাস ধর্মঘট এবং রেলগাড়ীতে হাঙ্গামা ও দুর্ঘটনার ফলে লোক বাড়ীর বাহিরে যাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু প্রায় দুই মাস কাল রাষ্ট্রপতি শাসন চলার পরও দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। সংবাদপত্রে দেখা যায় বহু চোরাকারবারী ধরা পড়িতেছে কিন্তু চিনি, ডাল, তরীতরকারী প্রভৃতির দাম কমে নাই। আলু পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বটে এবং সংবাদপত্রের হিসাবে দেখা যায় আলুর দাম বাজারে ৫০ পয়সা কিলোর বেশী হওয়া উচিত নয় কিন্তু কিনিবার সময় ৮০ পয়সা কিলোর কম দামে আলু পাওয়া যায় না। রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে অধিক কঠোর হইবার জন্য প্রতিদিন নির্দেশ জারী করিলেও দেশের চোরাকারবারীরা অবাধে তাহাদের ব্যবসা চালাই-

তেছে। সংবাদপত্রে দেখা যায় রাজ্যপাল অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য নানারূপ নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। কৃষিক্ষেত্রে শতশত নলকূপ বসানো হইতেছে। প্রতি জমিতে যাহাতে বারো মাস খাদ্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ জমিতে বৎসরে একটি মাত্র ফসল না হইয়া বৎসরে তিনবার ফসল হয় সেজন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। দেশে লোক সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে খাদ্য উৎপাদন সেই পরিমাণে বাড়াইতে না পারিলে খাদ্যাভাব কিছুতেই কমিবে না। রাজ্যপাল তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া প্রত্যহ পরামর্শ-সভা ডাকিয়া এ সকল বিষয়ে কাজে অগ্রসর হইতেছেন। তথাপি যদি পশ্চিমবঙ্গে কাজ না হয় তবে তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বলা যাইবে না। আটমাস পরে পশ্চিমবঙ্গে আবার সাধারণ নির্বাচন হইবে কিন্তু এই কয়মাসে দেশে উন্নতির জন্য যে সকল কাজ আরম্ভ হইবে তাহা শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি রাষ্ট্রপতির শাসন শেষ হয় তবে দেশবাসী উপকৃত হইবে না। সেজন্য দেশের বহু লোক নির্বাচন আরও পিছাইয়া দিবার পক্ষপাতী। আমাদের বিশ্বাস, রাজ্যপাল বিষয়টী বিবেচনা করিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

নিগ্রো নেতা লুথার কিং নিহত—

আমেরিকায় নিগ্রো জাতির অধিকার রক্ষার আজীবন সংগ্রামী রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং গত ৪ঠা এপ্রিল আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৯। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী যেমন দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করিয়াছিলেন, রেভারেণ্ড কিং তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে সেইরূপ অসাধারণ কাজ করিয়া গিয়াছেন। বয়স দিয়া কাজের বিচার করা যায় না। ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের প্রধানতম প্রচারক আচার্য্য শঙ্কর মাত্র ৩২বৎসর বয়সে এবং নব যুগের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

আজও আমেরিকায় শ্বেতজাতি কৃষ্ণবর্ণ মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া চলিয়াছে। ডঃ কিং সেই অত্যাচার দমনে ব্রতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মত তাঁহাকেও জীবনে বহু নির্য্যাতন, বহু কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং গান্ধীজির মত তিনিও আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। দেশবাসী আজ সমস্বরে বলিবে যে, লুথার কিং-এর দেহ চলিয়া গেল কিন্তু তিনি ইতিহাসে চিরজীবী হইলেন। তিনি যে আদর্শ প্রচারের জন্য সকল দুঃখকষ্ট আনন্দের সহিত সহ্য করিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন, কিং-এর মৃত্যু সেই আন্দোলনকে শত গুণে শক্তিশালী করিবে এবং সারা পৃথিবীর লোক আদর্শবাদী লুথার-কিং-এর কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির—

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে কন্যাকুমারিকায় সমুদ্র তীরে এক সুবৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া কয়েকদিন সাধনা করিয়াছিলেন। তদবধি সেই শিলা বিবেকানন্দ শিলা নামে পরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি সারা ভারতের একদল ভক্ত সেই শিলার উপর বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির নির্মাণের উদ্যোগী হইয়াছেন। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ঐ স্মৃতি মন্দির নির্মাণে কয়েক কোটি টাকা খরচ হইবে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রদেশের রাজ্যপাল অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন প্রচার করিয়াছেন। বড় বড় শহরে তো সেইজন্য সভা হইতেছে এমন কি ক্ষুদ্র আগড়পাড়া গ্রামেও ঐ উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি জনসভা হয়।

বর্ত্তমান ভারত গঠনে বিবেকানন্দের দানের কথা নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। ভারতবাসীর মধ্যে যাহা কিছু ভাল গুণ হইয়াছে বলিতে গেলে সবটাই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার ফল। সেজন্য স্বামীজির কথা ভারতবাসীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনের চেষ্টায় সমগ্র পৃথিবীতে বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্ম ও আদর্শ সকলকে জানাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নূতন মন্দিরও সেই উদ্দেশ্যে নির্মিত হইবে। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁহার সাধ্যানুসারে এই কার্য্যে সাহায্য দান করিবেন।

শ্রীকালিদাস রায়

বাংলার অন্যতম প্রবীণ কবি শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর ৭৯ বৎসর বয়সে 'পূর্ণাহুতি' কবিতাপুস্তকের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করায় বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। কবি কালিদাসের পৈত্রিক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ কড়ুই গ্রামে। বাল্যে

বহরমপুরে শিক্ষাজীবন কাটাইয়া B, A, পাশ করার পর তিনি রঙপুর জেলার কুড়িগ্রামে শিক্ষকতা করিতে গিয়াছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম কাজেই কোন বড় চাকুরী পান নাই। সেই সময় হইতেই তাঁহার লিখিত কবিতা বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার কবি প্রতিভা সর্বত্র স্বীকৃত হয়। তাঁহার সে যুগের লেখা 'নন্দ পুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতার আবৃত্তি আজও বাঙ্গালার মুখে মুখে শোনা যায়।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি কলিকাতায় শিক্ষকতা লাভ করেন, এবং শিক্ষকতার পর অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে টালিগঞ্জে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া তাহার উপর 'সন্ধ্যার কুলায়' নামে গৃহ নির্মাণ করেন ও তদবধি তথায় বাস করিতেছেন।

কবিতা ছাড়াও তিনি বহু সংখ্যক সমালোচনা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। মাত্র দুই মাস পূর্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। দেহ জরাজীর্ণ, এবং দুইটি চক্ষুই প্রায় দৃষ্টিশক্তি হীন। এ অবস্থায় বর্তমান পুরস্কারলাভ সকল দিক দিয়া তাঁহাকে উপকৃত করিয়াছে।

৬০ বৎসরেরও অধিককাল যে কবি তাঁহার অসাধারণ কাব্য প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, জীবন সায়াহ্নে তাঁহাকে রবীন্দ্র পুরস্কার দান করিয়া পুরস্কারেরই মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আমরা মনে করি মেঘদূতের কবি কালিদাসের মত এ যুগের কবি শ্রীকালিদাস রায়ও সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন ও যারা জীবন বাঙ্গালা পাঠকের কাছে তিনি যে মর্যাদা লাভ করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী হইবে। আমরা কবিকে তাঁহার এই অসামান্য সম্মান লাভে অভিনন্দিত করি এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্ম হইতে তাহাতে কবির কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় কবিকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করি।

সাহিত্যিকদের পুরস্কার লাভ

আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, মৌচাক, উল্টোরথ প্রভৃতি পত্রিকার পক্ষ হইতে একদল সাহিত্যিককে পুরস্কার দান করিয়া অভিনন্দিত করা হয়। এ বৎসর প্রফুল্লকুমার সরকার পুরস্কার পাইয়াছেন বৈজ্ঞানিক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার পুরস্কার পাইয়াছেন সাহিত্যিক শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার পাইয়াছেন স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার, মতিলাল পুরস্কার পাইয়াছেন লেখকা শ্রীমহাশ্বেতা দেবী, এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রদত্ত মৌচাক (বর্তমানে সুধীর চন্দ্র) পুরস্কার পাইয়াছেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং উল্টোরথ পুরস্কার পাইয়াছেন কবি শ্রীসুনীল সরকার। অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ভারতবর্ষের লেখক হিসাবে সুপরিচিত। আমরা সকলকে অন্তরের অভিনন্দন জানাই।

শশীভূষণ রায়চৌধুরী

২৪ পরগনা জেলার সোদপুর ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল পূর্বে তেঘরা মুড়াগাছা গ্রামে ১০০ শত বৎসর পূর্বে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে শশিভূষণ রায় চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়া এক মাইল দূরে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে যাইতে হইত এবং পদব্রজে দুই বেলা ছয় মাইল হাঁটিয়া সোদপুর হাই স্কুলে পড়িতে হইয়াছিল। দরিদ্র শশীভূষণ কলেজে পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সফলকাম হন নাই। তিনি শিক্ষকের কাজ লইয়া কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের নিকট শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বয়সেই দেশের মুক্তি আন্দোলন তাঁহাকে আকৃষ্ট করে এবং কয়েক বৎসর কারাবাসের পর তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন।

ইতিমধ্যে তিনি বাংলা দেশের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন করেন। নিজের জমির উপর বাঁশ ও তালপাতার দ্বারা একটি ছোট ঘর নির্মাণ করিয়া গ্রামের কৃষকদিগকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠশালা আরম্ভ করেন।

দরিদ্র শশী ভূষণ মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার গ্রামে বারাসাত রোডের ধারে প্রায় ২০ বিঘা জমি ট্রাষ্ট সম্পত্তি করিয়া গ্রামবাসীদের কল্যাণের জন্য দান করিয়া যান। সে সময়ে দেশের নেতৃস্থানীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য, শিক্ষাব্রতী সত্যানন্দ রায় প্রভৃতি ট্রাষ্ট বোর্ডের সদস্য ছিলেন। প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্বে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বোর্ডের সম্পাদকের কাজ পান।

স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহযোগিতায় ঐ গ্রামে প্রায় ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সহকর্মী ডাঃ অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সেখানে একটি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

শশীভূষণের জন্ম শতবার্ষিকী আসিতেছে। তাঁহার প্রদত্ত জমিতে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলেও এখনও বহু জমি খালি পড়িয়া আছে। আমরা তরুণ দেশ প্রেমিকদিগকে শশীভূষণের স্মৃতি, তাঁহারই প্রদত্ত জমিতে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান জানাই।

তাঁহার স্বর্গলাভের পরও প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এইরূপ একজন নীরব কর্মীর কথা দেশের জনগণকে আরও উপযুক্ত ভাবে জানানো প্রয়োজন।

অবসর ভবন—

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একান্নবর্ত্তী পরিবার ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ভাই ভাই ত একত্রে থাকেনা এমনকি ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষার অনুকরণের ফলে পিতা ও পুত্র একত্র থাকা কমিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধদের পেনসনের নানাপ্রকার নূতন ব্যবস্থা হইতেছে কিন্তু বিদেশের মত বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের থাকিবার জন্য অবসর ভবন এখনও গড়িয়া ওঠে নাই। ২৪ পরগনা আরিয়াদহ নিবাসী পদ্মশ্রী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজে একজন ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ হইয়াও তাঁহার চারিপাশে বৃদ্ধ বৃদ্ধার থাকার এই দুরবস্থা দেখিয়া অবসর ভবন খুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের শান্তি-পূর্ণভাবে থাকার চেষ্টাই করিতেছেন। বরাহনগরে গঙ্গার ধারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় দশবিঘা জমি খালি পড়িয়া আছে। এক সময় ঐ জমি কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত বড় খাল কাটার জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া-ছিলেন। সেই জমিতে অবসর ভবন নির্ম্মাণ করা শম্ভু-নাথের একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আইনের জটিলতায় সেই জমি এখনও পাওয়া যায় নাই। ইতিমধ্যে বিহারের মুঙ্গের জেলায় ইষ্টার্ণ রেলওয়ের শিমুলতলা ষ্টেশনের নিকট এক সাধু শম্ভুনাথকে ১২ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। স্থানটী চারিদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, ভিতরে একটী মন্দিরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্ত্তি আছে, একটী নাটমন্দির আছে একটী বাঁধানো পুকুর আছে এবং তথায় বর্ত্তমানে যে বাড়ী আছে—তাহাতে ২০জন লোক অনায়াসে বাস করিতে পারিবে। বাড়ীটীতে সম্প্রতি ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে এবং স্যানিটারী পায়খানা নির্ম্মিত হইয়াছে। বাড়ীটি মুঙ্গের ভাগলপুর জেলার সংযোগস্থলে অবস্থিত সেজন্য উভয় জেলার শাসকগণই অবসর ভবনে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। শিমুলতলা রেলষ্টেশন হইতে তাহা মাত্র দেড় মাইল দূরে। সেখানে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের বিনাভাড়ায় থাকিতে দেওয়া হইবে বটে কিন্তু বিনামূল্যে খাদ্যসরবরাহের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সরকার সেজন্য অর্থসাহায্য না করিলে পেন্‌সনভোগী ছাড়া অপর কাহাকেও তাহাতে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেদিনীপুর জেলার দীঘাতে সমুদ্রের ধারে যে নূতন নগর নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেখানেও শম্ভুনাথ বিনামূল্যে একবিঘা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ জমিতে একটী অবসর ভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। এ সকল বিষয়ে দেশের ধনীগণের সাহায্য পাওয়া গেলে কাজ তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবে। কেহ উপযুক্ত স্থানে ভাল বাড়ী সমেত জমি দান করিলে সেখানেও অবসর ভবন খোলা যাইতে পারে।

——

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সোভিয়েট ইউনিঅনের সঙ্গে অবশিষ্ট ইউরোপের সীমানির্ণয়সমস্যা সহজে মিটিয়ে ফেলা যায়, যদি রুশ জাতি তার পশ্চিমদিকের প্রতিবেশী জাতিগুলির সম্বন্ধে ভাষার ভিত্তিতে সীমা-নির্ধারণের মতো একটু উদারতা দেখাতে প্রস্তুত হয়। খাস সোভিয়েট ইউনিঅনের সমস্ত এলাকা ভাষার ভিত্তিতে অত্যন্ত সুগঠিত এবং সুবিন্যস্ত রাষ্ট্র বা উপরাষ্ট্র সমূহে সংহত। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, হুঙ্গারি এবং রুমানিয়া—এই ছয়টি রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্মিলনের সীমানা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ন্যায় সঙ্গত উপায়ে নির্ধারিত হয় নি। এর ফলে মধ্য ইউরোপেও দুই জার্মানি, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশকে জড়িয়ে একটি জটিল সীমান্ত সমস্যা হয়ে রয়েছে। অথচ সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের তথা গণতান্ত্রিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে নীতি স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে, তা সোভিয়েট ইউনিঅনের পশ্চিমের সীমান্তস্থিত প্রতিবেশী জাতিগুলির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করলে সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও অবশিষ্ট ইউরোপের মধ্যে অবস্থিত সীমারেখা নিয়ে মনোমালিন্যের সমস্যা অনায়াসে দূর করা যেতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিঅন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্যের কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফিন্‌ভাষী বিস্তীর্ণ এলাকা রুশিয়ার সহিত যুক্ত করা হয়। সেই এলাকা বা কারেলিয়া অঞ্চলটি কারেলো-ফিন্‌ প্রজাতন্ত্র নামে সোভিয়েট ইউনিঅনের ষোড়শ অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্তালিনের আমলে কিছুকাল বর্তমান ছিল। পরে সেটিকে রুশ প্রজাতন্ত্রের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্ররূপে অবনমিত করা হয়েছে। এর নামও বদলে করা হয়েছে: কারেলীয় প্রজাতন্ত্র যাতে ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বত্ব অপহরণের চিহ্ন বর্তমান না থাকে।

সোভিয়েট ইউনিঅনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ফিন্‌ ও লাপ্‌ভাষী এলাকা ফিনল্যাণ্ডের প্রাপ্য বলে দাবি করা হয়। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রগতি সাধিত হলে লাপ্‌ল্যাণ্ডও ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চাইতে পারে। তবে লাপ্‌ ও মর্দ্‌ভিন ভাষা দুটির পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন এখনই সম্ভব পর না হতে পারে। সুতরাং লাপ্‌ ও ফিন্‌ভাষী এলাকা নিয়ে গঠিত ফিনল্যাণ্ড রাষ্ট্রের সঙ্গে মর্দ্‌ভিনভাষী সমন্বিত সোভিয়েট রাষ্ট্রসমূহের সীমারেখা সুষ্ঠুভাবে নির্নীত হলেই রুশ-ফিন বিরোধ সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। আপাতত মর্দ্‌ভিন-ভাষী এলাকা সোভিয়েট ইউনিঅনের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্য হিসেবে থাকবে। সমস্ত ফিন ও লাপ অঞ্চল ফিনল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। পরে উপযুক্ত সময়ে লাপল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। মর্দভিন রাষ্ট্রও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। এই ব্যবস্থাই ফিন-উগ্রীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের পূর্ণ মুক্তি লাভের সর্বোত্তম উপায়। এর দ্বারা রুশ-ফিন বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসাও সম্ভব পর।

অনুরূপভাবে, কিশিনেভ্‌-কে রাজধানী ক'রে গঠিত মোলদাভিয়া প্রজাতন্ত্র এখনও সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্মিলনের পঞ্চদশ সদস্য বটে, কিন্তু এই রুমানীয়ভাষী এলাকাটি রুমানিয়ার কাছ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নিয়ে নেওয়া হয়েছে ব'লে এই অঞ্চল রুমানিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়ার যুক্তি আছে। ফিনভাষী কারেলিয়া এবং রুমানীয়ভাষী মোলদাভিয়া নিজেদের রাষ্ট্রে সংযুক্ত হওয়াই বেশি যুক্তি সঙ্গত। মোলদাভিয়া আর ভালাখিয়া বা ওয়ালাচিয়া প্রদেশদুটি নিয়ে রুশিয়ার সঙ্গে রুমানিয়ার দীর্ঘকালের বিরোধ চলে আসছে সেই জারের আমল থেকে। এই বিরোধ মূলত ভাষাভিত্তিক। ইতালিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত

লাতি ন রুমানীয়ভাষী অঞ্চল স্লাভ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবার কোন যুক্তি নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে স্তালিন-শাসিত রুশিয়ার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়া নাৎসি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করেছিল, সেই অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। মাত্র এই কারণটি ছাড়া কারেলিয়া ও মোলদাভিয়া দখল ক'রে রাখার অন্য কোন হেতু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রুমানিয়া কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র হলেও মোলদাভিয়া তাকে প্রত্যর্পণ করা হয় নি।

বস্তুত সমগ্র সোভিয়েট ইউনিঅন আসলে অনেকগুলি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের সমষ্টি। এই ইউনিঅন যে বহুজাতিকবহু ভাষাভাষীরাষ্ট্র, সে-সত্য কখনও কোন মহল থেকে অস্বীকৃত হয় নি। বহুজাতির স্বাভাবিক আত্মবিকাশের উপায় যে বহুভাষা সমূহ, সেগুলিকে জোর ক'রে চেপে রাখার বা নিঃশেষে লুপ্ত ক'রে দেবার অপচেষ্টা না ক'রে রুশজাতি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য মস্কোর কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম রুশভাষাতেই চলে, তবে সোভিয়েট ইউনিঅনের অন্য সব ভাষাগুলির আঞ্চলিক মর্যাদা আছে।

তবু সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সোভিয়েট ইউনিঅন বিশ্লিষ্ট হবার আগে পর্যন্ত রুশভাষার প্রাধান্য অ-রুশভাষী প্রজাতন্ত্রগুলির ওপর অব্যাহত থাকলেও রুশ ছাড়া অন্য ভাষাগুলি যাতে জার আমলের মতো লুপ্তির পথে এগিয়ে না যায়, তার চেষ্টা রুশরা করছে। তা হলেও সোভিয়েট ইউনিঅনে রুশ ছাড়া অন্য সব ভাষা প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের ভাষা।

ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন-ঔৎসুক্য না থাকায় ভারতে অনেকে লক্ষ্য করেন না যে, সোভিয়েট ইউনিঅনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ এক সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিঅনের সব ক'টি ভাষায় বা প্রধান ১৫টি ভাষাতেও চলে না। সেখানে প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য বা প্রজাতন্ত্রে স্থানীয় কাজকর্ম সবই প্রজাতন্ত্রটি যে-ভাষার ভিত্তিতে গঠিত, সেই ভাষায় চলে বটে, কিন্তু খাস কেন্দ্রীয় দপ্তরে মাত্র রুশ ভাষায় সব কাজ চলে। শ্বেতকায় রুশজাতি নিজেদের ভাষাভাষী একটি বৃহৎ এলাকা ছাড়াও আরো অনেক ক্ষুদ্র ভাষাভাষী এলাকা নিয়েই সোভিয়েট ইউনিঅনের অভ্যন্তরের বৃহত্তম রাজ্য রুশ প্রজাতন্ত্র বা R. S. F. S. R. গঠন করেছে। তা ছাড়া আরো ১৪টি প্রজাতন্ত্র বা ছোট-বড় ১৪টি ভাষা ব্যবহারকারী অঞ্চলও সার্বভৌম কর্তৃত্বের দিক থেকে এই প্রজাতন্ত্রের অধীনে রয়েছে।

যাঁরা বলেন সোভিয়েট ইউনিঅনে বহুসংখ্যক ধর্ম, ভাষা ও জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে বিনয় কুমার বলেছেন, "এইরূপ ঐক্যস্থাপন সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে বিশেষত্ব নয়। সোভিয়েটহীন আমেরিকায়ও ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। জার-শাসিত রুশিয়ারও ঐক্য ছিল। তা ছাড়া ব্রিটিশ-শাসিত ভারতেও ঐক্য আছে। পল্টনের জোর থাকলে যেখানে-সেখানে জুতিয়ে ঐক্য কায়েম করা সম্ভব।" বলা অবাস্তব নয় যে, বর্তমানে ভারতের ঐক্যও এই জাতের।

তবে অন্যান্য সাম্রাজ্যে যেমন সাধারণত পরাধীন জাতিদের মাতৃভাষা লোপ ক'রে দেবার চেষ্টা করা হয়, রুশদের প্রজাতন্ত্রী ভাষাভিত্তিক সাম্রাজ্যে তেমন চেষ্টা অন্তত বাইরে থেকে দেখা যায় না। লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে স্থানীয় ভাষাভাষীরা ছাড়াও বহু সহস্র বা লক্ষ সংখ্যক রুশ ঔপনিবেশিক স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। তাই বোধ হয় ওঁদের মুখে উপনিবেশবিস্তারের নিন্দা হিটলার তাঁর "Mein Kampf"-এ বিদ্রূপ করেছেন। জার-সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল না। বর্তমান সোভিয়েট রুশ সাম্রাজ্য অনেক উন্নত হলেও সোভিয়েট ইউনিঅনে রুশভাষা সাম্রাজ্যবাদ প্রচলিত রয়েছে ঠিক যেমন চীনে উত্তর চৈনিক ভাষাসাম্রাজ্যবাদ প্রচলিত। ভারতেও ওদের অনুকরণে আর এক ভাষসাম্রাজ্যবাদ ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ১৫টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে তিনটি স্লাভিক শাখার ভাষাভাষী প্রজাতন্ত্র ছাড়া বাকি ১২টি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করতে পারে। পূর্ণ স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হতে হলে ১৫টি প্রজাতন্ত্রকে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে হবে। তার অর্থ ১৪টি প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। উক্রাইনে ও বিয়েলো-রুশিয়া প্রজাতন্ত্র দুটি জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘে কতকটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলেও, ঐ দুটি রাষ্ট্রও পূর্ণ স্বাধীনতায়

প্রতিষ্ঠিত নয়। লিথুয়ানিয়া, লাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া, মোল্‌দাভিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি ১৯৩৯ সালেও স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে বিদ্যমান ছিল। চতুর্থটি রুমানিয়ার একাংশরূপে তখন পরিগণিত হত। ককেশীয় প্রজাতন্ত্র তিনটির মধ্যে আর্মেনিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তুর্কি আক্রমণের ভয়ে রুশ জাতির আশ্রয় নেয়। জর্জিয়া বা গেওরগিআ আজ অত্যন্ত অশান্ত; স্তালিন ও বেরিয়ার মৃত্যুর পর সেখানে প্রায়ই কমিউনিষ্ট সরকারের অদল-বদল ঘটিয়ে মস্কোর কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। রুশ-প্রভাবাধীন আজের-বাইজান ও পারসিক আজের-বাইজান সম্মিলিত হয়ে যাতে এক অখণ্ড আজের-বাইজান রাষ্ট্র গ'ড়ে ওঠে, তার জন্যে ১৯৪৫ সালে জাফর পিশাভরির নেতৃত্বে রুশরা এক আন্দোলন গ'ড়ে তোলে এবং সাময়িক ভাবে রুশ সামরিক কর্তৃত্বে দুই আজের-বাইজান মিলিত হয়। কিন্তু ইঙ্গমার্কিন সহায়তাপুষ্ট ইরানি সেনাবাহিনী পারসিক আজের-বাইজান জয় করে। তুর্কিস্তানি প্রজাতন্ত্রগুলি অর্থাৎ কাজাকস্থান, কিরগিজিয়া, উজবেকিস্থান, তুর্কোমানিয়া বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিঅনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। ইরানীয়-আর্য ভাষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাব্যবহারকারী তাজিকিস্থানের সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য।

সম্যক্‌ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, ৮৫৭০৬০০ বর্গ মাইল বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ এলাকায় অবস্থিত সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র সমষ্টিকে ভাষা ভিত্তিতে একটির বেশি সংখ্যক রাষ্ট্রে বিকেন্দ্রীকৃত করা যায়। ভারত-ইউরোপীয়, উরাল-আলতীয়, ফিন্‌-উগ্রীয়—নানা ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা এখানে প্রচলিত ব'লে ভাষাগত কোন ঐক্য আছে বলা চলে না। ভবিষ্যতে যদি বিকেন্দ্রীকরণ হয় তাহলে বৃহৎ রুশ প্রজাতন্ত্রের লেনিনগ্রাদ থেকে ব্লাদিভস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট প্রজাতন্ত্র-এলাকার তেমন কোন অঙ্গহানি না ঘটিয়েও আরো অন্তত এই ক'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতে পারে—কারেলিয়া ফিনল্যাণ্ডের আর মোল্‌দাভিয়া রুমানিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং পূর্ব জার্মান, পোল্যাণ্ড, হুঙ্গারি ও চেকোস্লোভাকিয়া তাদের প্রাপ্য ফিরে পাবে, এটা ধ'রে নিয়ে এই হিসেব দেওয়া হ'ল :—

(১) উক্রাইনে (২) বিয়েলোরুশিয়া (৩) লিথুয়ানিয়া (৪) লাটভিয়া (৫) এস্তোনিয়া (৬) মর্দোভিয়া (৭) তাতার (৮) বাশ্‌কির (৯) চুভাশ (১০) আর্মেনিয়া (১১) জর্জিয়া (১২) আজের-বাইজান (১৩) কাজাকস্থান (১৪) কিরগিজিয়া (১৫) তুর্কোমানিয়া (১৬) উজবেকিস্থান (১৭) তাজিকিস্থান।

বৃহৎ রুশিয়া বা রুশিয়া সমেত এই আঠারোটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সোভিয়েট ইউনিঅনকে পরিণতি দেওয়া ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতেই সম্ভবপর হবে।

এদের মধ্যে মর্দোভিয়া, তাতার, বাশ্‌কির ও চুভাশ এলাকা ইতিমধ্যেই স্বায়ত্তশাসিত। প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছে বৃহৎ রুশ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থেকে। মঙ্গোলীয় এলাকাও সীমারেখা সংশোধনের পর অবশ্যই মঙ্গোলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে, এটা ধ'রে নেওয়া যাক। রুশ পণ্ডিতদের মতে সোভিয়েট ইউনিঅনের মধ্যে ১২০টি বা তারও বেশি ছোট-বড় জাতি বাস করে এবং অন্তত ১০টি ভাষা কথিত হয়। জাতি হচ্ছে ভাষাভিত্তিক সত্তা, হার্ডারের এই মত রুশ মনীষীরাও গ্রহণ করেছেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে তাদের সমস্ত এলাকা ফিরিয়ে দেবার পরও সোভিয়েট ইউনিঅনকে মোট আঠারোটি এমন রাষ্ট্রে বিভক্ত করা চলে যাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতমটিতেও অন্তত এক মিলিঅন লোকের বাস।

রুশ পণ্ডিতদের মতে যেমন রুশ-শাসিত সোভিয়েট এলাকায় ১২০টি ভাষার প্রচল, গ্রিআর্সন সাহেবের মতে তেমনি ভারতীয় উপ-মহাদেশ ১৭ টি ভাষার প্রচলন। এই রকম পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কঠোর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য :

"In India the pedants enumerate I know not how many hundred languages. This is a stupid misstatement; there are about a dozen great tongues; the rest are either dialects or aboriginal survivals of tribal speech that are bound to disappear." (The Ideal of Human Unity—pp. 257.

"ভারতে পণ্ডিতেরা কেমন ক'রে জানি না বহু শত

ভাষা গণনা করেন। এ হল নির্বোধ ভ্রান্ত বিবৃতি; প্রায় বারোটি বড় ভাষা আছে; অবশিষ্ট হয় উপভাষা নয় উপজাতীয় ভাষার আদিম উদ্বর্তন যা লুপ্ত হতে বাধ্য।"

সুনীতিবাবুও বলেছেন যে, ১৭৯টি ভাষার মধ্যে ১১৬টি ভাষা ভোট-চীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যা ভারতে খুব অল্প সংখ্যক লোকে ব্যবহার করে। রুশ-শাসিত সোভিয়েট এলাকাতেও বাস্তবিক একই ব্যাপার; সেখানেও বড় বড় ভাষার সংখ্যা আঠারোটির বেশি নয়। পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এই সংখ্যা আরো দুচারটি বাড়তে পারে।

ভারতের কংগ্রেস সরকার নানা ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিঅনের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন কিন্তু ভাষাসংক্রান্ত সমস্যায় তাঁরা অন্তত প্রাদেশিক সীমানির্ধারণের ক্ষেত্রে সোভিয়েট পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেশ অনেক প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারত। ভারতের হিন্দুস্থানি শাসকেরা ব্রিটিশ জাতির প্রশাসন-প্রতিভার উত্তরাধিকার অর্জন করতে পারেন নি। রুশ জাতির প্রশাসনিক বিবেচনাও তাঁদের নেই। কেবল গায়ের জোরে ভারতের ঐক্যরক্ষাই তাঁদের কাম্য। তারজন্যে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য রক্ষার অধ্যাত্মনীতি অমান্য করতেও তাঁদের আপত্তি নেই। এর ফলে ভারতের তথাকথিত রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক ঐক্য ও সংহতি সমূলে বিনষ্ট হবে।

ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে রুশ নীতি যে সর্বোত্তম তা নয়, ব্রিটিশ প্রজ্ঞা যে শ্রেষ্ঠ দিশারী, তাও নয়। সোভিয়েট এলাকায় রুশ জাতির লোকেরা ছাড়া আর সকলের মর্যাদা অনেকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত। চীনে উত্তর চৈনিকরা ছাড়া অপর সকল চীনা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ভারতে হিন্দিভাষীরা ভিন্ন অন্য সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হতে চলেছে। এমন অবস্থায় হার্ডারের সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত গ্রহণীয় এই জন্যে যে, সকল ভাষাভাষীর সম-অধিকারের ভিত্তিতে কোন বহুভাষিক রাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব যদি রাষ্ট্রবহির্ভূত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা না হয়। রাষ্ট্রবহির্ভূত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে শুধু যে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় তা নয়, রাষ্ট্রের জনমণ্ডলী মাতৃভাষায় রাষ্ট্রকার্য চালাবার সুযোগ পায় না এবং জনসাধারণের অপরিচিত রাষ্ট্রভাষায় দক্ষতা অর্জনের অজুহাতে রাষ্ট্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কায়েমি স্বার্থভোগী শ্রেণী গ'ড়ে ওঠে। তাতে যে-সব দেশের জনসাধারণ মাতৃভাষায় সরাসরি রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিচালনার সুযোগ পায়, তাদের তুলনায় পরভাষা-গ্রহণকারী রাষ্ট্রের জনসাধারণকে জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে হয়। আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ও বাস্তব কর্মমুখর জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পূর্ণ উপলব্ধি—দুদিক থেকেই প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন তার নিজের মাতৃভাষায় সমস্ত যৌথ ও ব্যক্তিগত কাজকর্ম চালাবার পূর্ণ অধিকার অর্জন। যদি সে-অধিকার সে ত্যাগ করে, তবে স্বেচ্ছায় তা করবে বৃহত্তর গোষ্ঠী গঠনের জন্যে, কারো চাপে প'ড়ে নয়। মানবজাতির ঐক্যের এই মহা আদর্শ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "The Ideal of Human Unity" নামক বিশিষ্ট গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু হার্ডার, পেস্কা, মার্কস্, লেনিন, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীর নীতির দ্বারা ভারতের বর্তমান হিন্দিভাষী সরকার চালিত নন। মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা—এই নীতিই ভাষাব্যাপারে সর্বোত্তম নীতি। এই সর্বোত্তম নীতি কার্যকরী করতে হলে ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা ছাড়া উপায় নেই। যে জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা নয়, সে-জনগোষ্ঠীকে স্বাধীন বলা উন্মাদের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের উল্লিখিত মহতী নীতি সব চেয়ে ভালো ভাবে কার্যকরী হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে। আপাতত আলোচনার সুবিধার জন্যে সোভিয়েট ইউনিঅন বাদে অবশিষ্ট ইউরোপকে পশ্চিম ইউরোপ ব'লে ধরা হচ্ছে। অবশিষ্ট ইউরোপ ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র স্থাপনের কাজে সুগঠিত হলে তার চাপে ইতিমধ্যেই ভাষার ভিত্তিতে প্রশাসনিক বিভাগের ব্যাপারে সুগঠিত সোভিয়েট ইউনিঅনও হয়ত ভাষার ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে অগ্রসর হবে। হয়ত একদিন স্বাধীন ইউরোপীয় রাষ্ট্র-মণ্ডলীতে বৃহৎ রুশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেন ও বিয়েলোরুশিয়াও এক পংক্তিতে সমাসীন হবে।

সোভিয়েট ইউনিঅন ভাষার ভিত্তিতে মোট ৫৩টি এলাকায় বিভক্ত বটে। ১৫টি প্রজাতন্ত্র, ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত

প্রজাতন্ত্র, ১০টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ১০টি জাতীয় এলাকা নিয়ে এই ভাষাসাম্রাজ্য গঠিত। এর মধ্যমণিরূপে ধরা যায় রুশ জাতি তথা রুশ ভাষাকেকিন্তু ভাষা'র ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি কেবল অবশিষ্ট ইউরোপে বা সোভিয়েট ইউনিঅনের পশ্চিমে দেখা যায়।

সোভিয়েট ইউনিঅনের গঠনপদ্ধতি ইউগোস্লাভিয়া ও চীনে অনুসৃত হয়েছে। হয় তো ভারতেও হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা অদূর ভবিষ্যতে তা প্রবর্তন করবেন।

অবশিষ্ট ইউরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ যে ভবিষ্যতে আয়ারল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, ওএল্‌স্‌ এবং ইংল্যাণ্ড, এই চারটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে, ধর্মের ভিত্তিতে আয়ারল্যাণ্ড-বিভাগ বজায় থাকলে পাঁচটি রাষ্ট্রে, সে-অনুমান সঙ্গত। নানা ভাবে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড আর ওএল্‌সের পৃথক্‌ সত্তা ইংল্যাণ্ড মেনে নিয়েছে, বিশেষত খেলার মাঠে এবং স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্যে। আর আয়ার তো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বটেই।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও সোভিয়েট ইউনিঅনের পর অবশিষ্ট ইউরোপে নর্স (Norse) বা নর্‌সে ভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত নরওয়েজীয়, সোয়েডিশ্‌, ডেন ও আইসল্যাণ্ডিক ভাষা চারটির ভিত্তিতে গঠিত চারটি রাষ্ট্র নরওয়ে, সুইডেন্‌, ডেনমার্ক ও আইস্‌ল্যাণ্ড ইউরোপে ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তরূপে অভিহিত হতে পারে। এরা একত্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ারাষ্ট্র গঠন ক'রে থাকতে পারত। কিন্তু তা থাকা সম্ভবপর হয় নি। এরা একদা ডেনমার্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্লীন ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে এরা একে একে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করল। ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার চেয়ে বেশি নয়। সুতরাং হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও সংযোগরক্ষাকারী ভাষারূপে চূড়ান্তভাবে ও একমাত্র হিসেবে গৃহীত হলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি মাত্র তত দিন থাকবে যতদিন হিন্দিভাষীরা গায়ের জোরে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

ফিন্‌ল্যাণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রাষ্ট্রগুলির দ্বারা এত প্রভাবিত যে, স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাব্যবহারকারী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক থেকে ফিনল্যাণ্ডকে অন্যতম স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রাষ্ট্র বলা যায়। বৃহৎ রুশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে কারেলিয়া নিয়ে সীমান্ত সংশোধনের পর অখণ্ড ফিন্‌ভাষী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবপর হতে পারে।

উত্তর ইউরোপের পশ্চিমতম প্রান্তে অবস্থিত আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের আয়তন ৩৯৭০৯ বর্গমাইল কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ১৭৭২৯২ জন। তা হলেও এরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ডেন্‌মার্কের সঙ্গে শেষ সম্পর্কটুকু ছিন্ন ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আইস্‌ল্যাণ্ডের ভাষা ডেন্‌মার্ক ও নরওয়ের ভাষা দুটির যত সন্নিহিত, বাংলা হিন্দির ততটা নয়, এ-কথা মনে রাখা ভালো।

ডচ-ভাষী এলাকা এখন ধর্মের ভিত্তিতে আয়ারল্যাণ্ডের মতো হল্যাণ্ড ও বেলজিঅমের মধ্যে বিভক্ত। লুক্সেমবুর্গের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও এই ডচভাষী এলাকার অন্তর্ভুক্ত। লুক্‌সেম্‌বুর্গ ইউরোপের ছটি খেলনা রাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তম। এটিকে বেলজিয়মের একটি ক্ষুদ্র জেলা বলা যেতে পারে আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে। মাত্র একটা রাজনৈতিক চুক্তির মর্যাদা রক্ষার্থে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অব্যাহত আছে। এমন আছে আরো পাঁচটি খেলনা রাষ্ট্রের। বেলজিঅম, নেদারল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ড এবং লুক্‌সেমবুর্গ—এই তিনটি রাষ্ট্র ডাচ-ভাষী এবং এদের মধ্যে একীকরণের সম্ভাবনার প্রাবল্যের নানা লক্ষণ দেখা গেছে আর সর্বোপরি এদের মধ্যে শুল্কবিভাগীয় ঐক্য সম্পাদিত হয়েছে ব'লে এদের একযোগে বেনেলুক্‌স্‌ বলা হয় নামের আদ্যক্ষরগুলি যোগ ক'রে। বেনেলুক্‌স্‌ রাষ্ট্র তিনটির ব্যাপার আমাদের পরে নানা কারণে বারবার স্মরণ করতে হবে।

ইউরোপের ছ'টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আয়তন, লোকসংখ্যা ও প্রচলিত ভাষা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবনীয় :—

রাষ্ট্র	আয়তন	লোকসংখ্যা	ভাষা
লুক্সেম্বুর্গ	৯৯৯ বর্গমাইল	৩১৪৮৮৯	ডাচ
আন্দর্‌রা	১৯১ "	৬৪৩৯	স্পেনীয়
লিখটেন্‌ষ্টাইন	৬৫ "	১৬৬২৮	জার্মান
সান মারিনো	৩৮ "	১৫০০০	ইতালীয়
মোনাকো	৩৭০ একর	২২২৯৭	"
বাতিকান	১০৯ "	১০১০	"

এদের মধ্যে লুক্সেমবুর্গের বেলজিঅমের সঙ্গে, আন্-

দমুরার স্পেনের সঙ্গে, লিখটেনস্টাইনের জার্মানভাষী সুইট্‌সারল্যাণ্ডের সঙ্গে, সান মারিনো ও বাত্তিকান বা ভ্যাটিকানের ইতালির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং পরে এদের সংশ্লিষ্ট বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। মোনাকোর ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বটে, কিন্তু ফ্রান্সের অন্তর্গত ইতালীয়ভাষী এলাকা ইতালির সঙ্গে যুক্ত হলে অর্থাৎ ভাষার ভিত্তিতে ফ্রান্স ও ইতালির সীমারেখা সংশোধিত হলে মোনাকো ইতালির অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই ছ'টি রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা রক্ষা করতে দিয়ে ইউরোপীয়রা যেমন রাজনৈতিক খেলনার সাধ মিটিয়ে নেয়, তেমনি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায়ও যে তারা যত্নবান, সেটা জগৎকে বোঝাতে চায়। ছটি রাষ্ট্রের মোট আয়তন ১৩০০ বর্গ মাইলের কম আর লোকসংখ্যা মাত্র পৌনে চার লাখ! তবু জনগণের খেয়াল চরিতার্থ করা হয়েছে। [ক্রমশঃ]

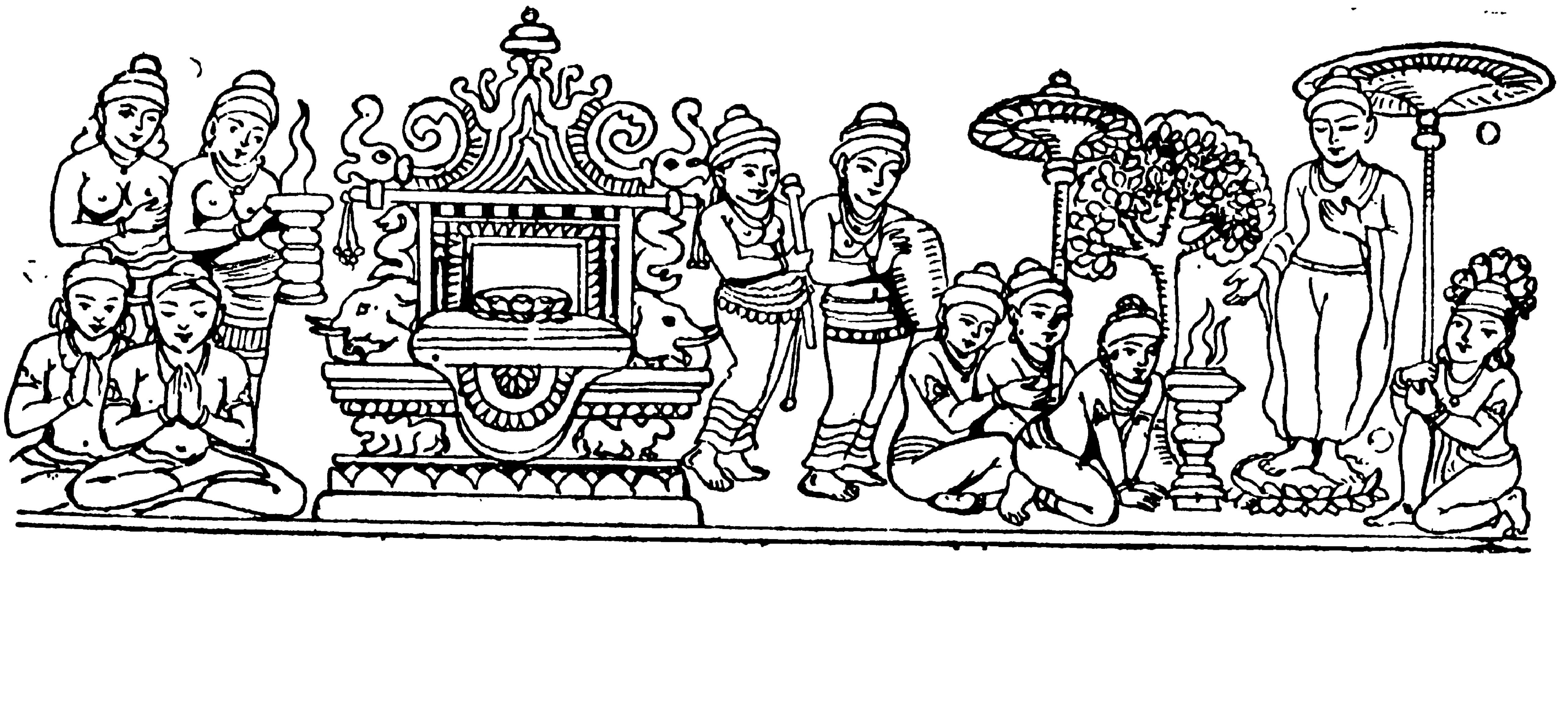

বাড়াবাড়ি ভাল নয়

শ্রীজ্ঞান

গত সংখ্যার লেখার ("ফাঁকির ফাঁদে") মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী সমাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম লেখা-পড়ায় ফাঁকি না দিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা গ্রহণের সময়কার ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় পরীক্ষার হলে নকল করার ঘটনা এবার বেশীই হয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে তা সকলেই স্বীকার করবেন।

এই নকল করার প্রধান কারণ হল পরীক্ষার জন্য ঠিক মত প্রস্তুত না হওয়া। অর্থাৎ সারা বছর ঠিক মত পড়াশুনা না করা। হয়ত প্রত্যেক ছাত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে এই লেখাপড়ায় গাফিলতি ঘটে থাকে। কারুর অসুস্থতার জন্য, কারুর সংসারের নানাবিধ কাজের জন্য, আবার কারুর হয়ত উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাবে পরীক্ষার উপযোগী পড়াশুনা করা ঘটে ওঠে না। কিন্তু এসব কারণ ঘটে অল্প কয়েকজন ছাত্রের ক্ষেত্রেই। আর বেশীর ভাগ ছাত্র লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয় অন্য নানা কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে। সে কারণগুলি হচ্ছে,—সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধূলা, জলসা, নানারূপ আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডা! এই সব বিষয়ে অতিরিক্ত আসক্তিই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় অমনোযোগী করে তোলে এবং তারা পড়াশুনায় ফাঁকি দিতে থাকে। তারপর পরীক্ষা সমাগত হলে কুচক্রে পড়ে দল বেঁধে নানা ভাবে চেষ্টা করে পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার জন্য। তাতেও বিশেষ কিছু লাভ হয় না। তখন পরীক্ষার হলে নকল করে কোনও রকমে 'পাস্' করবার চেষ্টা চলে। ধরা পড়লে পরীক্ষা হলের গার্ডদের প্রতি অত্যাচার ও ভীতি প্রদর্শনও চলতে থাকে। এইভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছে—শিক্ষাব্যবস্থা উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্তে ওলট পালট হচ্ছে! পাঠে মনোযোগী, পরীক্ষায় ভাল ফল প্রত্যাশী সাধারণ ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা এই আবর্তনের মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। তাদের ভবিষ্যতও, তাদের নিজেদের দোষে না হলেও, অপরের দোষে আজ নষ্ট হতে চলেছে।

এ অবস্থায় করণীয় কি? যা করণীয় তা করতে হবে সুস্থবুদ্ধি সকল ছাত্র ছাত্রীদেরই। অবশ্য অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও সহযোগিতা থাকা চাই। যে সব ছাত্র-ছাত্রী এই সব কুচক্রে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে না চায়, তাদের উচিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এগিয়ে এসে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে এই অরাজকতা, এই উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা। এ-বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকসমাজও তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে যেন পিছিয়ে না থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের ও শিক্ষার যে বিরাট দায়িত্ব তাঁদের ওপর রয়েছে তা যেন তাঁরা বিস্মৃত না হন এবং সে দায়িত্ব পালনে তাঁরাও যেন দৃঢ়পদে এগিয়ে আসেন। আর ছাত্র সমাজের কাছে আবেদন জানাই, সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়ত চলবে না; কিন্তু তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়, লেখা পড়ায় যেন ব্যাঘাত

সৃষ্টি না করে। সব সময়ে এই ইংরাজী কথাটি মনে রেখ —'Too much in everything is bad.' সব বিষয়েই অতিরিক্ত করাটা মন্দ। যাই তোমরা কর না কেন তা যেন বাড়াবাড়ির পর্য্যায়ে না গিয়ে পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রেখ। অতিরিক্ত সব বিষয়েই খারাপ—তা ভালর বদলে মন্দই ঘটিয়ে থাকে।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

সেইদিন সন্ধ্যার সময় মেসের বারান্দায় বসে বাংলার দুইজন বিখ্যাত খেলোয়াড় এই অদ্ভুত মানুষ চুরির বিষয় আলোচনা করছিলেন। দেবেশ বল্‌ল—"নৃপেনদা! এ রকম অদ্ভুত ঘটনা তো কোনদিন ক'লকাতার মাঠে দেখা যায় নি,—শোনাও যায় নি কোন দিন। এ ব্যাপারটার সব দিকই দেখ্‌ছি কুয়াশায় ঢাকা।"

নৃপেন বল্লেন—"হয়ত শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে এ ঘটনায় নূতনত্বও কিছু নেই, বিস্মিত হবারও কিছু নেই। তা যাই হোক, আমার মনে হয় এবিষয়ে একটু ভাল রকম খোঁজ নেওয়া উচিত। পুলিশ অবশ্য খোঁজ ক'রবে। কিন্তু তাদের গদাই লস্করী চালে কতদিনে এর নিষ্পত্তি হবে কে জানে?

দেবেশ বল্‌ল—"আচ্ছা নৃপেনদা, আমরা নিজেরাই এ ব্যাপারটার একটু অনুসন্ধান করি না কেন? এমনিই তো আমরা এখন বেকার—না হয় কিছু ব্যাগারই খাটা যাবে।"

নৃপেন বল্লেন—"তা বেশ তো; চল না। আগে শক্তিসঙ্ঘ ক্লাবে গিয়ে শ্যামলের বিষয় খোঁজ খবর নেওয়া যাক্।"

দু'জনে যখন শক্তিসঙ্ঘ ক্লাবে গিয়ে পৌঁছিল। তখন সেখানে একটা বিষম হৈ-চৈ চল্‌ছে। নানা জনে নানা কথা বল্‌ছে। কেউ বল্‌ছে—এর মধ্যে নিশ্চয়ই যুবকসঙ্ঘের কারসাজি আছে। কেউ বল্‌ছে—"সেটা কখনও সম্ভব নয়—খেলোয়াড় যারা তারা কখনও এত নীচ হতে পারে না। নিশ্চয়ই শ্যামলের কোন পরম শত্রু এই কাজ করেছে। কেউ বলছে—"এর সঙ্গে যে একটা গভীর চক্রান্ত জড়িত আছে তা বেশ সহজেই বুঝতে পারা যায়।"

দস্যুরা শ্যামলকে যে মোটর গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেছে তার রং বা নম্বর কেউ-ই সে সময় লক্ষ্য করে নি। অথচ নানা জনে নানা রকম মন্তব্য করছে। কেউ বা প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার লোকের সম্মুখ থেকে এই অদ্ভুত মানুষ চুরির উল্লেখ করে পুলিশের অক্ষমতার উপর সকল দোষ চাপিয়ে তীব্র মন্তব্য করছে।

নৃপেন এ সকল কথার কোন আলোচনাতেই যোগ দিলেন না। দেবেশকে সঙ্গে নিয়ে সোজা শক্তিসঙ্ঘের সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বল্লেন —"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

ক্লাবের সেক্রেটারী যতীন ব্যানার্জী তাঁদের সযত্নে বসিয়ে বল্লেন—"বলুন, কি জানতে চান আপনারা।"

নৃপেন বল্লেন—"আজকের খেলার মাঠে শ্যামলের ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। তাই বে-সরকারী ভাবে অনুসন্ধান ক'রে আমরা তাঁকে খুঁজে বের করতে চাই। সেই জন্য শ্যামলের বিষয়ে আপনার যা জানা আছে, সব কথা দয়া করে আমাদের বলুন।"

যতীন ব্যানার্জী বল্লেন—"শ্যামলের বিষয়ে—আমিও বিশেষ কিছু জানি না। তবে তিনি কাজ করেন বঙ্গলক্ষ্মী মিল-তাঁত ঘরের অ্যাপ্রেন্টিস্। মাইনে পেতেন সামান্যই। তবে সে জন্য তাঁর কোন দুঃখ নেই।—তা ছাড়া টাকার দিকে তাঁর ঝোঁক মোটেই নেই। মিলের ম্যানেজারের কাছে শুনেছি। তিনি লেখাপড়া বেশ জানেন এবং তাঁর আচার ব্যবহার দেখলে মনে হয় তিনি খুব বড় আর ভদ্রঘরের ছেলে।"

নৃপেন বল্লেন—"আপনার সঙ্গে শ্যামলবাবুর কত দিনের পরিচয়?"

সেক্রেটারী উত্তর করলেন—"এই তো সে দিনের। আমাদের একজন ভালো সেণ্টার হাফ চাই শুনে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ম্যানেজার আমায় শ্যামলের কথা বলেন। তাঁরই অনুরোধে আমি শ্যামলবাবুকে খেলতে নামাই। তবে ঠকিনি যে—এ কথা বলাই বাহুল্য। মাঠে মাঠে ঘুরে বুড়ো হয়ে গেলাম, কিন্তু এমন খেলা কখনও দেখিনি।"

আরও দু'চারটি কথার পরে নৃপেন বুঝলো যে ক্লাবের সেক্রেটারী শ্যামলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আর জানেন না। ওরা বিদায় নিল। [illegible]

এগিয়ে দিয়ে যতীনবাবু বল্লেন—"আপনারা বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ। তাই আশা করছি আপনারা এ কাজটা সহজে ছাড়বেন না। যে সাহায্য চান আমরা তাই করতে প্রস্তুত আছি। আমার ক্লাবের উপর এমন একটা জুলুম হবে তা আমি কিছুতেই সইব না।"

ক্লাব হতে ফিরে এসে নৃপেন ও দেবেশ ঘটনাবলীর বিষয়ে নানা আলোচনা করতে লাগলো। রাত্রি গভীর হয়ে এলো; কিন্তু তারা কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলো না।

পরদিন প্রভাতে চা পান করতে করতে উভয়ে কি ভাবে অনুসন্ধান করা উচিত তারই পরামর্শ করছিল। এমন সময়—ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

টেলিফোন ধরে দেবেশ যা শুনলো, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তার মুখের ভাব দেখে নৃপেন বললেন—"ব্যাপার কি? কে ডাকছে?"

"যতীনবাবু। তিনি বলছেন, আজ সকালে শ্যামল চক্রবর্তী ফিরে এসেছেন। কোথায় ছিলেন, কি হয়েছিল, তিনি কিছুই বলছেন না।" বিস্মিত হয়ে নৃপেন বল্লেন—"কিছু বলছেন না—বল কি? বলবার যে কিছু নেই তা'ও নয়। দেখি দেখি ফোনটা—!"

টেলিফোন নিয়ে নৃপেনবাবু আবার যতীন ব্যানার্জীকে ডাকছেন। বল্লেন—"আপনি যা বলেছেন সব শুনেছি কিন্তু শ্যামলবাবু এমন করে মুখ বুঁজে আছেন কেন?"

"কি জানি। আমি বারবার অনুরোধ করেছি; কিন্তু শ্যামলবাবু একেবারেই নীরব। বল্লেন ও-ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করলে তাঁর পারিবারিক অনেক কথাই প্রকাশ করতে হয়। ব্যাপারটা যাতে চাপা পড়ে তাই তিনি চান। দেখেছেন তো সহরের সব খবরের কাগজগুলোতে কি বিষম হৈ চৈ পড়ে গেছে। এমন চুপ করে থাকলে যে দেশের ও দশের কাছে সকলকেই বোকা সাজতে হবে নৃপেনবাবু। কি যে করবো—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না; শ্যামলবাবু একজন খুবই ভালো খেলোয়াড় বটে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লোকে নানা রকম কানঘুষা করবে, আর আমরা তাঁকে ক্লাবের মেম্বার করে রাখবো এটা ত হতে পারে না।"

নৃপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখলে কি মনে হয় শ্যামলের হঠাৎ কোন অসুখ-টসুখ হয়েছে? মাথার কোনো গণ্ডগোল?"

"কৈ না, তেমন কিছু ত দেখছিনে। তবে তাঁকে বড় রোগা দেখাচ্ছে; চোখের কোণে কালিও পড়েছে। আর আগেকার মত স্ফূর্তিটা যেন তাঁর নেই। ঘরের একপাশে চুপ করে বসে আছেন। সে'দিন খেলার আগে পর্যন্ত দেখেছি—তাঁর মুখে কত কথা, কত হাসি। কিন্তু এখন আর সে সব কিছুই নেই।"

নৃপেনবাবু বল্লেন—"আমার সঙ্গে কি শ্যামলের একবার দেখা হতে পারে?"

যতীন ব্যানার্জী বল্লেন—"তা দেখা হতে পারে বৈ কি? আজ বিকালে আমাদের মাঠে একটা খেলা আছে। আপনি যদি আসেন ত' হলে মাঠেই তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে। তবে তাকে দেখে যে কিছু বের করতে পারবেন এমন তো ভরসা হয় না। এই ত খানিক আগেই পুলিশের একজন ইন্সপেক্টার এসে শ্যামলকে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু শ্যামলের সেই একই উত্তর—"আমি কিছুই বলতে চাইনে।"

নৃপেনবাবু বললেন—"আচ্ছা দেখা যাক। বিকেলে খেলার মাঠে আবার দেখা হবে। নমস্কার।"

টেলিফোন রেখে দিয়ে গম্ভীর মুখে নৃপেন বললেন—"এ রহস্যটাকে ভেদ করতেই হবে। সেজন্য এর পেছনে একমাসও যদি খাটতে হয় সেও স্বীকার।"

"নিশ্চয়ই!"

"দেখ আমার মনে হয় শ্যামলবাবু বিশেষ কোন একটা দায়ে ঠেকেছেন। কোন কারণে সেটা প্রকাশও করতে পারছেন না; অথচ ব্যবস্থা করাও হয়ত সম্ভব হচ্ছে না।

দেবেশ একখানা পুরাতন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলল—"তা তিনি যদি মোটেই সাহায্য না করেন, আমরা এর খেই ধরবো কি করে? দস্যুরা তো আর কোন নিশানা রেখে যায় নি।"

মৃদু হেসে নৃপেনবাবু বললেন—"তা হোক তবুও দেখতে হবে। যেখানে বেশী অন্ধকার, সেখানে আলোক নিয়ে যেতেই আমার আনন্দ।

সেদিন অপরাহ্ণে নৃপেন ও দেবেশ যখন শক্তিসঙ্ঘের

খেলার মাঠে গিয়ে উপস্থিত হল তখন সেদিনকার শ্যামলের খেলা দেখবার জন্য আবার লোকের ভীড় হয়েছে। নৃপেনকে দেখামাত্রই শক্তিসঙ্ঘের সেক্রেটারী যত্ন করে নিজের কাছে বসালেন। খেলা আরম্ভ হল। শ্যামল পূর্বদিনের মত বার বার বলটা ধরতে লাগলেন, বারবার বিপক্ষদলকে কাটিয়ে বল নিয়ে ছুটলেন। কিন্তু নৃপেন ও দেবেশ দেখল যে মধ্যে মধ্যে শ্যামল যেন থত-মত খেয়ে যাচ্ছেন—তাঁর আক্রমণের সে প্রচণ্ড বেগ যেন নাই—তাঁর সন্ধানে সে আগ্রহভাবের অভাব হয়েছে! যতীনবাবু নিজের হাত কচলাতে কচলাতে দুঃখের সঙ্গে বললেন—"শ্যামলের সে খেলা আর নাই দেখছি—এখন মনে হচ্ছে দু'দিনেই শ্যামল যেন ঘুণে ধরা লাঠি হয়েছে।"

দেবেশ সে কথার উত্তরে বলল—"হাঁ, সেদিনের সে তেজ আর আজ নাই বটে। আজ দেখছি হলদলে ভাব। তা এতো হতেই পারে। এত বড় ঝড় যার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, আর দেশশুদ্ধ লোক যার কথা নিয়ে আলোচনা করছে, তার সকল কাজেই একটু আড়ষ্টতা তো আসতেই পারে। তবে ও কিছু নয়; দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আরও কিছুক্ষণ গেল। তখন দেবেশকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল যে শ্যামলের সে খেলা আর নাই—সে সাহস আর নাই! বিপক্ষদলকে আক্রমণ করে বলটা কেড়ে না নিয়ে তিনি মধ্যে মধ্যেই তা ছেড়ে দিচ্ছেন এবং বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের বাধা দিতেও মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ করছেন।

নৃপেনবাবু নিবিষ্টচিত্তে খেলা দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি চুপি চুপি দেবেশকে বললেন—"দেবেশ, আমার মনে হচ্ছে আজ যিনি খেলছেন, তাঁকে কোথায় যেন আমি আগে দেখেছি। কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছি তা' মনে করতে পারছি না। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ইনি আসল শ্যামল চক্রবর্তী নন—ইনি জাল শ্যামল।

দেবেশ বিস্ময়ে একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। নৃপেনবাবু তার কোট ধরে না টানলে সে হয়ত এমন একটা কিছু বলে ফেলত যাতে নৃপেনের সন্দেহটা তখনই প্রকাশ হয়ে যেত। নৃপেনের ইঙ্গিত বুঝে দেবেশ লজ্জিত হয়ে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরেই দেবেশ বলল—"কিন্তু এত লোক তো খেলা দেখছে। কৈ এরা তো কিছু সন্দেহ করেনি।"

নৃপেন বললেন—"তা করবে কেন? ওরা যে মনে মনে জেনেই রয়েছে যে শ্যামলের খেলা দেখছে। দেখ না, একই রকম চোখ মুখ—একই রকম চুল। খেলছেও নিতান্ত মন্দ নয়। সেদিন যদি আসল শ্যামলের খেলা আমরা না দেখতাম তা হলে আজকের খেলা দেখে তো আমরাও খুসী হয়ে বাড়ি যেতাম। আজকের খেলায় এমন দোষই বা কি আছে? মধ্যে মধ্যে একটু ভয় পাচ্ছে—এই না? আর ঐ বাঁ পা খানা! সেদিন শ্যামল দুই পায়ে সমানে খেলেছে—আর আজ বাঁ পা মোটেই চলছে না। যা হোক একদম মুখ বুঁজে থাকো—এ বিষয়ে কথাটি বলো না। জালই হোক, আর খাঁটিই হোক, আমি খেলা শেষ হলেই শ্যামলের সঙ্গে দেখা করবো।

চার

খেলা শেষ হবার একটু পরে নৃপেন ও দেবেশ 'শক্তি-সঙ্ঘের' আফিস ঘরে এসে বসল। তাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে যতীন ব্যানার্জী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন—"শ্যামলবাবু, এই দু'জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। ওঁদের যে কি কথা আছে তা আমি জানিনে। তবে শুনেছি, ওঁরা যা জিজ্ঞাসা করবেন সে আপনারই মঙ্গলের জন্য।"

যতীন ব্যানার্জী সেখানে আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন। নৃপেন দেখলেন—শ্যামলের দুই চোখে একটু ভয়ের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। নৃপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যামল বলল—

"কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলার অবসর আবার নাই। আপনারা কি পুলিশের লোক? এই দু'দিনে আমি অনেক পুলিশ কর্মচারী দেখলেম। সত্যি কথা বলতে কি—জ্বালাতন হয়ে উঠেছি। আজ সকালেই একজন ইন্সপেক্টার এসেছিলেন। তাঁকে যা বলেছি তার বেশী বলবার আমার আর কিছু নেই।"

নৃপেন বললেন—"আমরা পুলিশের লোক নই। এক কালে আমরাও আপনার মত খেলোয়াড়ই ছিলাম।

যা হোক, আপনি কি দাঁড়িয়েই থাকবেন? একটু বসুন না। আপনাদের ক্লাবের চেয়ারগুলোতে বসে বেশ আরাম দেখছি। আপনিও একটু বসুন না—দু'দণ্ড কথা বার্ত্তা কই।"

নৃপেন আহ্বানের অপেক্ষা না করে একখানি চেয়ারে ব'সে পড়লেন এবং আর একখানি দেখিয়ে শ্যামলকে বললেন—"এই যে। এই খানায় বসুন।"

শ্যামল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল—"বুঝেছি, আপনারা কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার। আঃ! এই রিপোর্টার-গুলোই কি আমাকে কম জ্বালাচ্ছে। দিন নাই, রাত নাই—জোঁকের মত লেগেই আছে। আপনাদের কাছেও আমার নূতন কিছু বলার নেই।"

শ্যামল ফিরলেন। মনে হল, তিনি তখনই যেন সেই ঘর থেকে বের হয়ে যাবেন সেই মুহূর্তে দেবেশ উঠে ঘরের দুয়ারটা বন্ধ করল এবং দুয়ারে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। বলল—"আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? জানবেন আমরা আপনার বন্ধু। তা ছাড়া, আপনি শত চেষ্টা করলেও দরজাটা খুলতে পারবেন না। বসুন না চেয়ারে। সেদিনের ব্যাপারটা কি তা আমাদের বলতেই হবে।"

চীৎকার করে শ্যামল বলে উঠলো—"সে আমার ঘরোয়া কথা। সে কথা আপনাদের বলবো কেন? দয়া করে দুয়োরটা খুলে দিন, আমি যাই।"

অকস্মাৎ নৃপেনের চক্ষু দু'টী উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি স্থির ও গম্ভীর স্বরে বললেন—"রাজকুমার, দয়া করে বসুন।"

"রাজকুমার! কে রাজকুমার!" দেবেশ অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে ব'লে উঠ্‌লো। কিন্তু তার চাইতে শতগুণ অধিক বিস্মিত হলেন সেই ফুটবল খেলোয়াড় শ্যামল চক্রবর্ত্তী। তিনি জড়িত স্বরে বল্‌লেন—"রাজকুমার! রাজ—কুমার! আপনি কাকে কি বল্‌ছেন? আপনার মৎলবটা কি?"

একটু হেসে নৃপেন বললেন—"এমন কিছু নয়। আপনি যে শ্যামপুকুরের রাজকুমার তা চিন্‌তে পেরেছি। সে আজ অনেকদিনের কথা; একখানা মাসিক পত্রিকায় আমি আপনার একখানা ছবি দেখেছিলাম। যখন খেলার মাঠে আপনাকে দেখি তখন থেকেই ভাবছি আগে কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি। তখন মনে করতে পারিনি এখন ধরতে পেরেছি। কেমন ঠিক চিনেছি কিনা?"

শ্যামল আর দাঁড়াতে পারছিলেন না। একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের জন্য দু'হাতে মুখ ঢেকে রইলেন। তারপর নৃপেনের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—"আপনি ঠিকই চিনেছেন। আপনারা বল্‌ছেন আমার বন্ধু। তাই অনুরোধ দয়া ক'রে আমার নামটা প্রকাশ করবেন না। সত্য সত্যই আমি শ্যামপুকুরের রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী।"

নৃপেন তীব্রস্বরে বলে উঠলেন—"আপনি যদি রাজ-কুমার বিমল চক্রবর্ত্তী, তবে শ্যামল চক্রবর্ত্তী কোথায়?"

কম্পিতস্বরে রাজকুমারী বল্‌লেন—"এই যে আমি—আমিই সেই।" রাজকুমার হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসে-ছিলেন। এখন জোর করে উঠে বললেন এবং নৃপেনের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু হাসি হেসে বল্‌লেন—"আমিই শ্যামল চক্রবর্ত্তী। রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তীই—শ্যামল চক্রবর্ত্তী:—শেষেরটা ছদ্মনাম বৈ তো নয়। উপাধির বিড়ম্বনায় বাধ্য হয়েই আমাকে নাম বদলাতে হ'য়েছে। যার ধন সম্পত্তি বিশেষ নাই—উপাধি তার বিষম ব্যাধি। তাই আমি সে সব ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি শ্যামলচক্রবর্ত্তী হয়েছি। ভেবেছি নিজের ক্ষুধার অন্ন নিজেই উপার্জ্জন ক'রে খাবো। সেই জন্যই বঙ্গলক্ষ্মী মিলে ঢুকেছিলাম তাঁতের কাজ শিখ্‌বো বলে।'

"ছিলাম মানে? আপনি কি মিল ছেড়ে দিয়েছেন?

রাজকুমার একটু থতমত খেলেন। তিনি নৃপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বিড়াল যেমন ইন্দুরের সকল ভঙ্গী লক্ষ্য করে দেবেশও এতক্ষণ তেমনি ক'রে রাজকুমারকে লক্ষ্য করছিল। তার মনে হ'ল নৃপেন যাতে তাঁকে কোন রকম সন্দেহ না করে সে জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

রাজকুমার আবার বললেন—"দেখুন, আপনাদের কাছে সব কথা বল্‌তে যে আমি বাধ্য তা নয়। কিন্তু আপনারা এক কালে আমারই মতন খেলোয়াড় ছিলেন শুনে কেমন যেন আমার মনটা টান্‌ছে। বলতেই হবে

আপনাদের। কিন্তু আপনাদের নামটি পর্য্যন্ত আমার জানা নেই—।

"আমি নৃপেন ভৌমিক, আর ইনি আমার বন্ধু দেবেশ চৌধুরী।

"সেকালের বিখ্যাত খেলোয়াড় আপনারা। কাজেই আর একজন খেলোয়াড়ের দুঃখ আপনারা বুঝবেন আশাকরি। তবে শুনুন আমার কাহিনী। সে এতটুকু ছোট্ট একটা কথা।"

নৃপেন বললেন—"বড় ছোটতে কিছু আসে যায় না। আপনি হলেন উপাধিধারী জমিদার—অথচ সব ছেড়ে দিয়ে মিলে মজুরী করতে এসেছেন—সে গল্পটার মধ্যে শোনবার মত অনেক কথাই আছে। সেই সঙ্গে আমি এটাও জান্‌তে চাই যে সেদিন খেলার মাঝখান থেকে কটা লোক আপনাকে অমন করে ধরে নিয়ে গেল যেন?

একটু বিব্রত হয়ে হাতের আঙুলগুলি নাড়্‌তে নাড়্‌তে রাজকুমার বল্‌লেন—"আমার খুড়তুতো ভাই এ সব গোলমাল বাধিয়েছে। তার নাম হলো প্রশান্ত—প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী। সে মনে করেছে যে শুধু একটা ল্যাড়া নামে আর তার পোষাচ্ছে না। আমার বদলে সে যদি রাজকুমার হতে পারে তাহলে তার একটু সুবিধা হয়। কিছুদিন থেকে প্রশান্ত আমাকে বড়ই বিরক্ত করে তুলেছে। আমি তার সকল আবদার দুহাতে ঠেলে রেখেছিলাম। সেদিন খেলার মাঠে সে একখানা চিঠি লিখে পাঠালো যে সে বড় বিপদে পড়েছে—তখনই আমার সঙ্গে দেখা না করলেই নয়। তারপর যা ঘটেছে সে তো আপনার সবই জানেন। প্রশান্তর তিনবন্ধু সেদিন আমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে একেবারে আমার বাড়ীতে হাজির। এমন ভয়ানক লোক তারা যে সেখানে নিয়ে গিয়ে একখানা দানপত্র দিয়ে বলে যে সই কর। আমি দেখলেম তাতে সই করলেই আমার যথা সর্ব্বস্ব প্রশান্তকে দিতে হয়। আমি কিছুতেই রাজি হলেম না। আমার ছোট ভাই অমল লণ্ডনে পড়্‌তে গিয়েছে। দান করতে হলে তাকেই করব। যখন তারা আমাকে দিয়ে কিছুতেই সই করাতে পারলো না তখন আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে গেল। বল্লে যতক্ষণ না সই করবো, ততক্ষণ তারা এক ফোঁটা জলও দেবে না, একমুঠো ভাতও দেবে না। যাহোক, শেষ পর্য্যন্ত কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। পুলিসকে এ সব খবর দিলে ভালো হত বটে কিন্তু নিজের ঘর সংসারের গুপ্তকথা ঢাক পিটে সবাইকে জানানো কি উচিত? তাই মুখ বুঁজে আছি। ভরসা করি, আপনারাও আমার কথাটা গোপন রাখবেন।

নৃপেন বললেন—"নিশ্চয়—তাতে কি আর ভুল আছে। তবে জানতে পারি কি হঠাৎ মিলের কাজটা ছাড়্‌তে যাচ্ছেন কেন?

নৃপেনের প্রশ্ন ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখে রাজকুমার একেবারে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন। রেগে বল্লেন—"কি জানেন নৃপেনবাবু। আমি ভেবে দেখলাম যে প্রশান্ত যে সম্পত্তিটা কেড়ে নিতে চাচ্ছে সেটা হয়ত একেবারে নগণ্য নয় দেখে শুনে নিলে বেশ দু' পয়সা হ'তে পারে। তাই স্থির করেছি এখন থেকে আমি নিজেই দেখ্‌বো। কাজেই মিলের কাজ ছেড়ে আমাকে আবার জমিদার হয়েই সেখানে যেতে হচ্ছে। কিন্তু একটু খেলাধূলাও তো চাই। তাই এখানে শ্যামল চক্রবর্ত্তী হয়েই খেল্‌তে এসেছি।

কথায় কথায় নৃপেন রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আশাকরি আপনার খুড়তুতো ভাই দেখ্‌তে আপনার মত নয়।"

শঙ্কিত হয়ে জড়িত কণ্ঠে রাজকুমার বল্‌লেন—"কি বলছেন? আমি—হাঁ হাঁ ওই প্রশান্ত না! সে কেন দেখ্‌তে আমার মত হতে যাবে? তার সঙ্গে আমার চেহারার এতটুকুও মিল নাই। তবে আমরা একই বংশে জন্মেছি। এই জন্য যা একটু সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাবেন।"

রাজকুমার যে নৃপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি বল্‌তে পারলেন না. দেবেশ তা লক্ষ্য করল।

নৃপেন বললেন—"আপনার কাহিনীটি দেখছি বড়ই চিত্তাকর্ষক। হাঁ—তা—ভাল—আপনার খুড়তুতো ভাই এবং তাঁর বন্ধু তিনটির কি হলো, কিছু তো বল্লেন না। যখন তারা দেখ্‌লো যে সব ফেঁসে গেছে তখন নিশ্চয়ই তারা ভোঁ দৌড়! আশাকরি ওরা আপনাকে আর বিরক্ত করবে না। কেমন?

রাজকুমার বিদায় হলেন। তিনি একেবারে চলে গেলে

দেবেশ বলল—"উঃ! লোকটা কি মিথ্যাবাদী। ওর একটা কথাও সত্যি নয়।"

নৃপেন বললেন—"না দেবেশ। তোমার সঙ্গে আমার মত মিলছে না। আমার মনে হচ্ছে, আমরা যা শুনলাম তার শতকরা নিরানব্বইটাই সত্য। হয়ত খাঁটি সত্য না হতে পারে—কিন্তু বেশ মনোহর গল্প যে একটা এ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সত্য।"

[ক্রমশঃ]

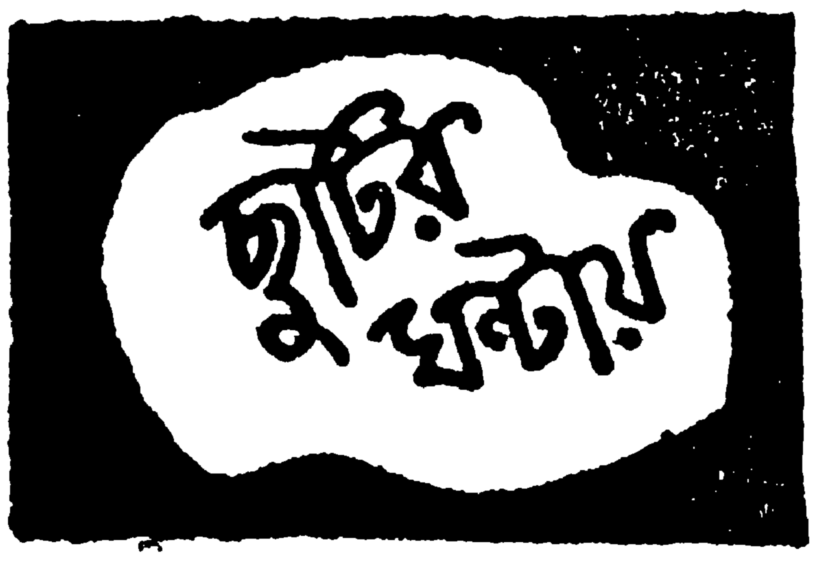

চিত্রগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এবারে তোমাদের নতুন-ধরণের একটি আজব-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা বলছি। এটি আসলে হলো—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিচিত্র কারসাজী। তবে এ কারসাজীর সহজ-সরল কলা-কৌশলটুকু শিখে এবং রপ্ত করে নিয়ে, ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে যদি পাকা-ম্যাজিসিয়ানের মতো কায়দামাফিক ভঙ্গীতে দেখাতে পারো তো, আজব এই ভোজবাজীর কশরতের পরিচয় পেয়ে, তাঁরা শুধু যে প্রচুর মজা পাবেন তাই নয়, উপরন্তু, তোমার কেরামতিরও তারিফ করবেন উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে।

আপাততঃ শোনো—এ খেলার কলা-কৌশলের আসল রহস্য-কাহিনী। তবে, সে-কাহিনী বলবার আগে, এ কশরতী দেখানোর জন্য টুকিটাকি যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—টাট্‌কা একটি জবাফুল, একটি পাতিলেবু এবং একটি ধারালো ছুরি।

ফর্দ্দমতো জিনিষগুলি সংগ্রহ করে, আসরে দর্শকদের সামনে এ কারসাজী দেখানোর আগেই তাঁদের সবাইকার দৃষ্টির অগোচরে নেপথ্যে চুপিচুপি 'আয়োজন-পর্ব্বের' কয়েকটি জরুরী কাজ সেরে রাখতে হবে—নাহলে খেলার মজা মোটেই জমবে না। 'আয়োজন-পর্ব্বের' এই কাজটুকু অবশ্য এমন কিছু হাঙ্গামার ব্যাপার নয়। বরং সামান্য এই কাজটুকু গোড়াতেই যদি নিখুঁতভাবে সেরে রাখতে পারো, তাহলে আসরে খেলা-দেখানোর সময় সুবিধা হবে যথেষ্ট এবং আজব মজার কারসাজীটি দেখিয়ে দর্শকদেরও অনায়াসেই রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যাবে। সচরাচর আসরে ভোজবাজীর কশরত দেখানোর আগে ম্যাজিসিয়ানরা যেমন দর্শকদের দৃষ্টির অগোচরে যেমন কারচুপির কায়দা সেরে রাখেন, এ কাজটুকুও হলো অনেকটা ঠিক তেমনি ধরণের। অর্থাৎ, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এ খেলার কসরত দেখানোর আগে, নেপথ্যেই টাট্‌কা জবাফুলের পাপড়ির রসটুকু নিঙড়ে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ছুরির ফলার দু'পিঠেই ফুলের রসটুকু মাখিয়ে নাও। তবে হুঁশিয়ার—ধারালো ছুরির ফলার গায়ে ফুলের রস মাখানোর সময় খেয়াল রেখো—অসাবধানতার ফলে, ধারালো ছুরির ফলার আঁচড়ে তোমাদের হাত না কেটে যায়।

এমনিভাবে ছুরির ফলার দু'পিঠে জবাফুলের রসটুকু লাগিয়ে নেবার পর, খোলা বাতাসে খানিকক্ষণ মেলে রেখে ছুরিখানি আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নাও। তাহলেই 'আয়োজন-পর্ব্বের' কাজ শেষ।

এবারে আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময়—একহাতে ঐ ছুরিখানি এবং আরেক হাতে অটুট পাতিলেবুটিকে ধরে পাকা-ম্যাজিসিয়ানের মতো মুরব্বী-চালে তাঁদের জানিয়ে দাও যে সচরাচর ছুরি দিয়ে লেবুটিকে কাটলে যেমন সাদা-রঙের স্বচ্ছ-তরল রস বেরোয়, তোমার হাতের ঐ যাদু-ছুরিখানি দিয়ে কাটলে কিন্তু তেমনি ধরণের রসের বদলে বেরুবে—টক্‌টকে লাল রঙের তাজা রক্ত!

দর্শকদের অনেকেই হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস করবেন না—পরিহাসচ্ছলে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠবে

তাঁদের মুখে—এমন আজব কাণ্ড কখনো সম্ভব হয় নাকি ?

তখন তাঁদের চোখের সুমুখেই তোমার হাতের সেই ছুরিখানি দিয়ে দু'টুকরো করে কেটে ফেলো পাতি-লেবুটিকে। তাহলেই দর্শকের দল স্বচক্ষে দেখতে পাবেন যে সদ্য-কাটা পাতিলেবুর টুকরো থেকে বেরুচ্ছে তাজা রক্তের মতো টক্‌টকে লাল রঙের তরল পদার্থ!—আজব-মজার এ দৃশ্য দেখে তাঁদের আর বিস্ময়ের সীমা থাকবে না !

এই হলো—এবারের খেলাটির আসল মজা। এমন মজার কাণ্ড কেন ঘটে জানো !

এই আজব কাণ্ড ঘটে আসলে বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। অর্থাৎ জবাফুলের রসটুকুকে রাসায়-নিকদের ভাষায় ইংরাজীতে বলে— 'লিটমাস্' (Litmus) এবং পাতিলেবুর টক-রসকে বলা হয়—'অ্যাসিড্' (Acid)। এ দু'টি বিভিন্ন সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ার ফলেই, পাতিলেবুর স্বচ্ছ-তরল সাদা-রঙের রসটুকু বিজ্ঞানের রহস্যময়-বিধানে অচিরেই রূপান্তরিত হয়ে ওঠে তাজা রক্তের মতো রাঙা টক্‌টকে লাল-বর্ণে

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আজব মজার আরেকটি নতুন খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। লোক-চেনার হেঁয়ালি :

প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে দিল্লী-মেলের ফার্স্টক্লাশ কামরায় চড়ে চলেছেন ছয়জন যাত্রী দুখানি বেঞ্চে—প্রত্যেকটিতে তিন-তিনজন করে বসেছেন সামনাসামনি। যাত্রীরা সকলেই বিখ্যাত লেখক। তাঁদের নাম—বরদা, বাণীনাথ, গোবিন্দ, গদাধর, পরেশ আর উমেশ। এঁদের মধ্যে একজন প্রবন্ধ লেখক, একজন ঔপন্যাসিক, একজন সম্পাদক, একজন কবি, একজন নাট্যকার এবং একজন ঐতিহাসিক। প্রত্যেকের হাতে একখানি করে বই…প্রত্যেকেই বই পড়ছেন—বাইরের কোনো লেখকের লেখা বই নয়—এঁদের নিজেদের লেখা বই। তবে কেউই নিজের লেখা বই পড়ছেন না—পড়ছেন সহযাত্রীর লেখা বই।

বরদাবাবু পড়ছেন প্রবন্ধ-পুস্তক…এ প্রবন্ধ-পুস্তকের লেখক বসেছেন বরদাবাবুর ঠিক সামনে। বাণীবাবু বসেছেন প্রবন্ধ-লেখক এবং সম্পাদকের মাঝখানে…পরেশ-বাবু বসেছেন নাট্যকারের পাশে…প্রবন্ধ লেখক বসেছেন ঔপন্যাসিক-যাত্রীর ঠিক সামনে। গদাধরবাবু পড়ছেন নাটক। বাণীনাথ হলেন ঐতিহাসিকের ভগ্নীপতি এবং বরদাবাবু ইতিহাস-গ্রন্থ মোটেই ভালোবাসেন না। গদাধর-বাবু বসেছেন ঐতিহাসিকের সামনে—মুখোমুখি। পরেশ-বাবু পড়ছেন সম্পাদকের লেখা একটি সম্পাদকীয়-মন্তব্য এবং উমেশবাবু কস্মিনকালেও কবিতা পড়েন না। এই তো পরিচয়…এ থেকে বলতে পারো—এঁদের মধ্যে কে কবি, কে নাট্যকার, কে ঐতিহাসিক ? কে-বা সম্পাদক… উপন্যাসিক আর প্রবন্ধ লেখক ?

(বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা)

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

চার-অক্ষরের শব্দ—বিশেষ-ধরণের একটি রাসায়নিক-সামগ্রীর নাম। প্রথমার্দ্ধে বোঝায় হিন্দু-দেবতার নাম এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ হলো—আমাদের দেশের বর্ষাকালীন এক-ধরণের উপাদেয় ফল। চার-অক্ষরের এই সামগ্রীটি সহজেই মেলে বেনের দোকানে এবং দামও এমন কিছু চড়া নয়। বলতে পারো—সে দ্রব্যটি কি ?

[রচনা : সুলতা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর :

১।—১৭

২। কামান

গতমাসের দুটি ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিয়েছে :

নিবেদিতা, গার্গী, অরুন্ধতী, পরমেশ, প্রমথেশ ও নিখিলেশ মজুমদার (বোম্বাই), কাটু, লাটু, ছোটু, খুকু, মিনু ও পানু (বিলাশপুর), মোহিত, কপিল, ললিত,

মোহনলাল, পুষ্প, গৌরী, চন্দ্রা ও কান্তা সেনগুপ্ত (কলিকাতা), অলকা, সুষমা, সুধাংশু, হিমা শু, হারাণচন্দ্র ও শীতাংশু মুখোপাধ্যায় (সন্তোষপুর), মৃণাল, পরেশ, দিব্যকান্তি, মদনমোহন ও রতিকান্ত চৌধুরী (পাটনা), চন্দ্রশেখর, জ্যোতির্ময়, ইন্দ্রজিৎ, পুরন্দর ও অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা), সুতপা, সুরেন্দ্র, তপেন্দ্র, ভুপেন্দ্র ও প্রীতিলতা হাজরা (নিউ দিল্লী), দোলন, রোচনা ও ফণীন্দ্র সাহা (কলি তা)।

গ ত মাসের একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে :

মুরারিমোহন, বাসুদেব, দেবেন্দ্রনাথ ও রত্নাবলী গুহ (কলিকাতা), দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), কল্যাণ, শচীন, সুধীশ, ইন্দ্র দত্ত, বিশ্বতোষ, রজত, মিহিরলাল, দে বস্ত্র ও পার্থপ্রতিম (কলিকাতা), সুনয়না, সুলোচনা, দীপঙ্কর ও গোপীনাথ নন্দী (কোইম্বাটোর) অলক, তিলক, হিমু, পিণ্টু, রবি, প্রশান্ত, রাণা, বাদল, কৃষ্ণলাল ও মৃণাল (কলিকাতা), গণেশ, অরুণ, নৃপেন, শুকদেব ও মণীন্দ্রকুমার (নাগপুর), আশীষ, ভূপাল, নেপাল খগেন্দ্র, নীরেন্দ্র ও বিভূতি (কলিকাতা), অনুপম, অভিরাম, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সেন (হাজারীবাদ), সঞ্জীব সন্দীপ, টাবলু, সুমী, পূরবী ও সুনীরা মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)।

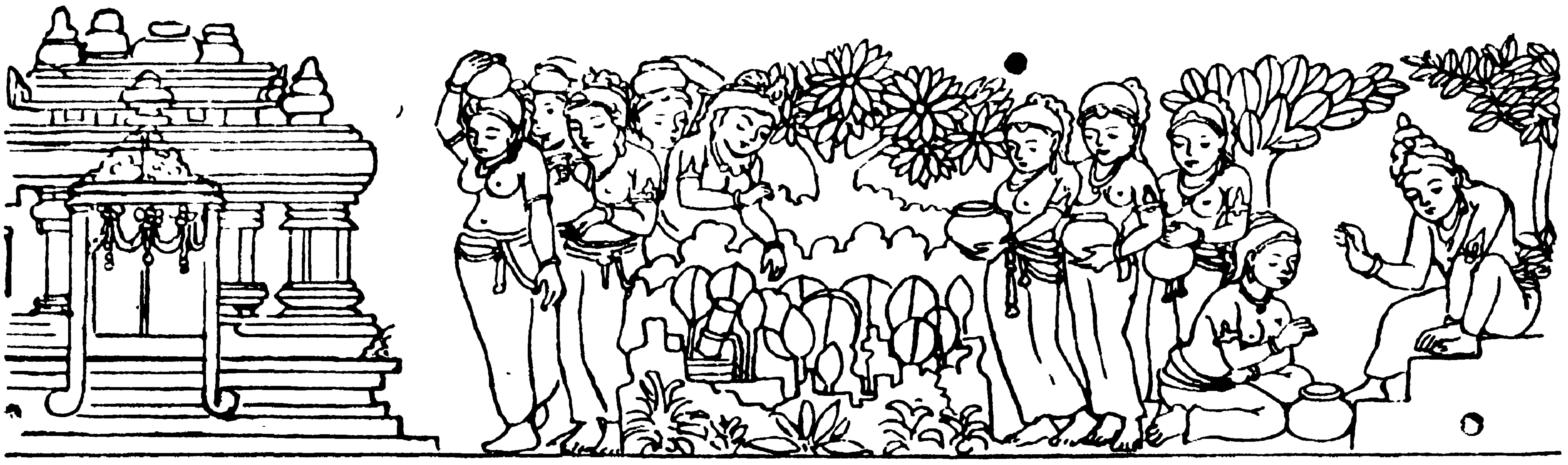

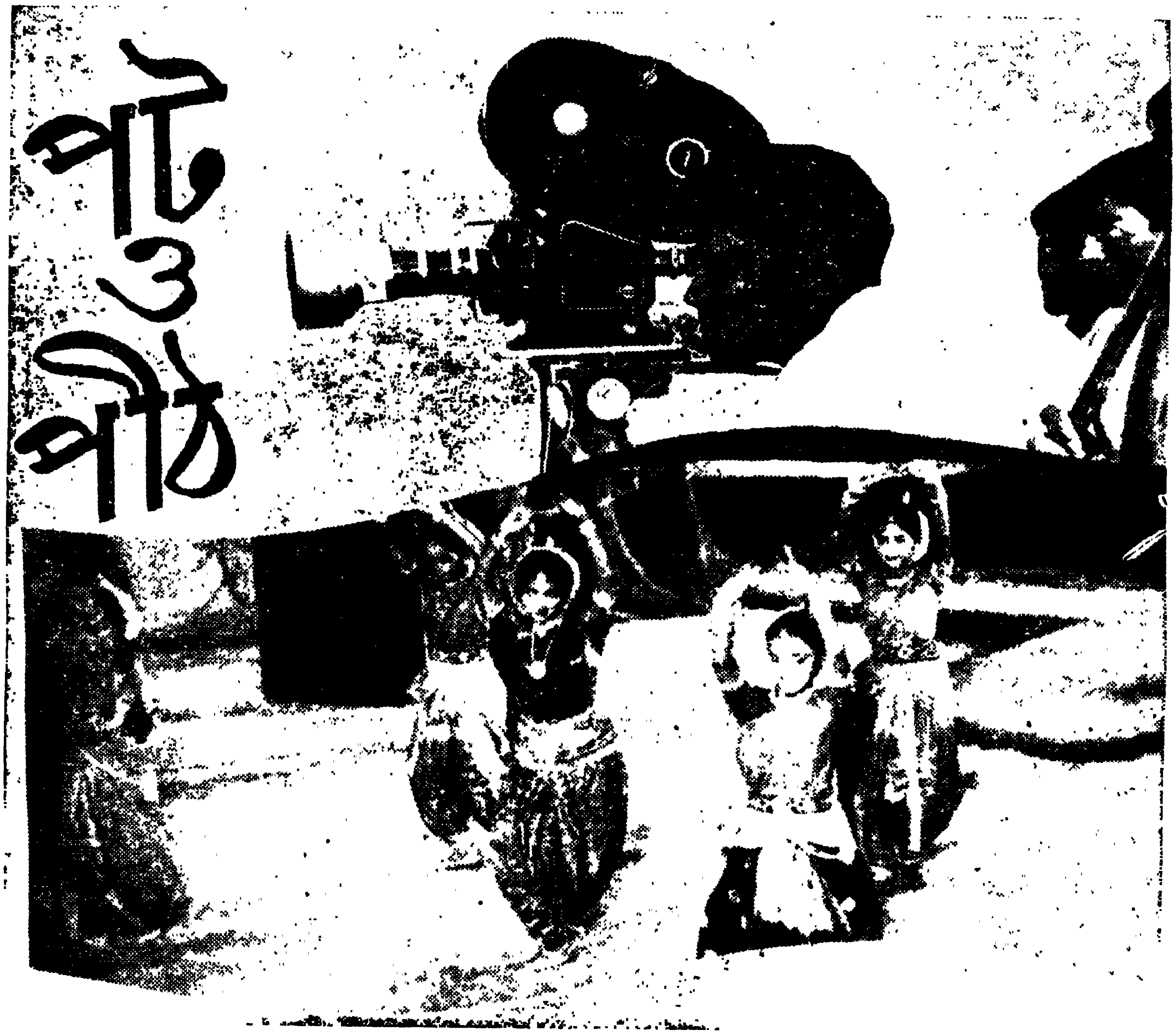

সংরক্ষণ সমিতি

শ্রী'শ'

গত ১২শে এপ্রিল ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওর প্রাঙ্গণে সন্ধ্যে সাতটার সময় এক বিরাট সভা হয়। সভার আহ্বায়ক ছিলেন "চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি।" সভা যথাসময়ে শুরু হয় এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅজয় কর। সেদিনে সভার মূল বক্তব্য ছিল—

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচানর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল সম্প্রদায়ের প্রতি :

"পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি"র আহ্বান

চিত্রগৃহের উপর আরোপিত "শো ট্যাক্স" নয়—"শো সেস্" প্রবর্ত্তন এবং সেই "শো সেস্"এর সমুদয় অর্থ চিত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ব্যয় করতে বাধ্য করুন।

এবং

সরকার প্রতি বছর চিত্রগৃহের বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে কোটি কোটি টাকা কর হিসাবে গ্রহণ করেন। আমাদের দাবী ঐ অর্থের একটা বৃহৎ অংশ চিত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ব্যয় করা হোক। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সকলের জীবন যাত্রার মান এবং শিল্প সৃষ্টির মান উন্নত করতে সরকারের এ একটি অপরিহার্য্য দায়িত্ব।

আইন করে সেন্সর সার্টিফিকেটের তারিখ অনুযায়ী অগ্রাধিকার দিয়ে ছবি দেখানর ব্যবস্থা করা হোক। এই একটি আইন শিল্প সঙ্কটের বেশীর ভাগ দূর করতে সক্ষম।

সেদিন উপস্থিত চলচ্চিত্রের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রতিটি কলাকুশলী, পরিবেশক, শিল্পী, সকলেই এই প্রস্তাবগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। যারা বক্তৃতা দেন তাদের মধ্যে অসিত চৌধুরী, উত্তমকুমার, নারায়ণ সাধুর্খা, কালী ব্যানার্জি, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিত লাহিড়ি, বিমল দে, সুনীল মজুমদার, ঋত্বিককুমার ঘটক, মঞ্জু দে, সরোজ দে, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এ ধরণের সমাবেশ আর কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। একদিকে চিত্রগৃহের মালিকদের জুলুম, লোভ ও অপরদিকে হিন্দি চিত্রের সাঁড়াশী অভিযান কিভাবে বাংলা চিত্রশিল্পকে দিনের পর দিন বাংলা দেশেই কোণঠাসা করছে তার কিছুটা আভাষ আগের সংখ্যাতেই দিয়েছিলাম। বাঙালী হিসেবে আজ আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে আজ সবাই বিরোধ ভুলে একসঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছেন বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাবার জন্যে। সংরক্ষণ সমিতি প্রস্তাবিত "শো সেস" প্রবর্ত্তন ও সেন্সর সার্টিফিকেটের তারিখ অনুযায়ী অগ্রাধিকার দিয়ে ছবি রিলিজের ব্যবস্থা করার প্রতি আমাদেরও পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

সমিতির কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। যে আবেগ নিয়ে আজ তাঁরা এগিয়ে এসেছেন সে আবেগ যেন কোনরকমে ঝিমিয়ে না পড়ে এটা যেন তাঁরা লক্ষ্য রাখেন। বাঙালী জাত অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এই কথাটা অবাঙালীদের মধ্যে চালু আছে। কথাটা মিথ্যে নয়, আবেগ না থাকলে মানুষ কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আর "ক্রিয়েটিভ আর্ট"এর ক্ষেত্রে আবেগ জিনিষটা তো অপরিহার্য্য। কিন্তু আবেগের আগুন যেমন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে তেমনি চট করে নিভেও যায়। সমিতিকে প্রস্তুত থাকতে হবে সর্ব্বরকম বাধাবিঘ্নের জন্য ও এগিয়ে আসতে, হবে জনসাধারণকে তাদের বক্তব্য ভাল করে বোঝাতে। শুধুমাত্র দৈনিক কাগজে অথবা পত্রিকা মারফৎ এটা সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি। জনসাধারণের অত্যন্ত কাছাকাছি তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। জনসমর্থন আদায় করতে হবে।

নির্বাক চিত্রের যুগ হতে আজ অব্দি বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্প দেশবাসীকে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নায় বোনা অনেক চিত্র উপহার দিয়েছে। ছিনিয়ে এনেছে বিশ্বের দরবার হতে সম্মানের রাজমুকুট। বাঙালী হিসেবে আপনার, আমার, সকলের উচিত বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের দাবীকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করা। আজ যদি আমরা হিন্দি চিত্রের মোহে পড়ে বাংলা চিত্রকে বাংলা দেশ হতে বিদায় দি তাহলে এমন একটা দিন আসবে যেদিন ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। এটা সত্যি যে আজ পৃথিবীর সব দেশেই সামাজিক ছকটা বদলে যাচ্ছে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কোন দেশই তার নিজস্ব কোন জিনিষই বর্জন করেনি। তার রূপ বদলেছে এই মাত্র। দেশের লোক আজ প্রশ্ন তুলতে পারে বাংলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্প আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে কেন? "চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি"র প্রচারিত আর একটি ইস্তাহার নীচে প্রকাশ করা হল—

চিত্রশিল্পের প্রতি দরদী দেশবাসীর অবগতির জন্য কয়েকটি কথা

পশ্চিমবঙ্গের ৩২০টি স্থায়ী চিত্রগৃহের মধ্যে শুধু বাংলা ছবি দেখান হয় মাত্র ১৪টিতে। কিছু অন্য ছবি এবং বেশীর ভাগ বাংলা ছবি দেখান হয় মাত্র ২২টিতে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহে বাংলা ছবি দেখানর সময়—মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ।

* * *

বাংলা ছবির বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রায় একতৃতীয়াংশ সরকার গ্রহণ করেন—অথচ এই শিল্পের উন্নতির জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না।

* * *

চিত্রগৃহের মালিকরা গ্রহণ করেন বাকী অর্থের শতকরা ৭০ ভাগ।

পরিবেশক ও প্রযোজকদের জন্য থাকে বাকী অর্থের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ। অথচ চিত্র নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয় অর্থাৎ ষ্টুডিও ভাড়া, ফিল্ম, লেবরেটারীর খরচ, শিল্পী ও কলাকুশলীর পারিশ্রমিক, যাবতীয় বিজ্ঞাপন এমনকি চিত্রগৃহ সজ্জার ব্যয় পর্য্যন্ত একা প্রযোজককে বহন করতে হয়।

ফলে প্রায় শতকরা ৯৫ জন প্রযোজক ঋণগ্রস্ত হয়ে প্রথম চিত্র নির্ম্মাণের পরই এই চিত্রশিল্প থেকে বিদায় নেন এবং বেকার কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বিচার আপনারাই করুন

দুর্গটি আয়তনে সামান্য নয়। দুর্গের আকারে নির্মিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রাচীর পরিখাবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। ভোগবিলাসের জন্যই বোধকরি অতীত-কালের কোনও বিলাসী রাজা ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দুর্গটি এমনভাবে তৈরী যে মাত্র কয়েকজন বিশ্বাসী লোক লইয়া দুর্গদ্বার ভিতর হইতে রোধ করিয়া দিলে শত্রু দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও ইহা দখল করিতে পারিবে না। নদীর গর্ভ হইতে পাথরের দুর্ভেদ্য প্রাকার উঠিয়াছে; মাঝে মাঝে স্থূল বুরুজ। প্রাকারগাত্রে স্থানে স্থানে পর্য্য-বেক্ষণের জন্য গোলাকৃতি ছিদ্র। বাহির হইতে দেখিলে দুর্গটিকে একটি নিরেট পাথরের স্তূপ বলিয়া মনে হয়।

জলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গড়ের চারিপাশে পরিখা খননের প্রয়োজন হয় নাই। নদীর ফেনায়িত জলরাশি তাহাকে বেষ্টন করিয়া সগর্জনে বহিয়া গিয়াছে। একটি সঙ্কীর্ণ সেতু খরস্রোতা প্রণালীর উপর দিয়া তীরের সহিত গড়ের সংযোগ সাধন করিয়াছে। ইহাই দুর্গপ্রবেশের একমাত্র পথ।

গড়ের অভ্যন্তরে একটি প্রশস্ত হলঘর। বিরাট একটি গোল টেবিল। চারিপাশে অনেকগুলি খালি চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে। অপরাহ্ণ কাল। পশ্চিমগামী সূর্যের লাল আভা আসিয়া ঘরটিকে ম্লান আলোয় আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। একজন যুবক চেয়ারে বসিয়া একাগ্রচিত্তে একটি ফাইল্ দেখিতেছেন। মুখে চিন্তার ছায়া। খানিক পরে ফাইল্ রাখিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন। চোখ বন্ধ করিয়া নিবিষ্টমনে কিছুকাল চিন্তা করিয়া ডাকিলেন "সুনীল।"

একজন যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে ধুতী ও সার্ট। সারা মুখে প্রবীণতার ছাপ। উজ্জ্বল চক্ষু দুটি মেলিয়া প্রশ্ন করিল "বলুন ?

সবাই এসে গেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

এখানে পাঠিয়ে দাও।

সুনীল চলিয়া গেলে যুবকটি পুনরায় ফাইল্ টানিয়া লইলেন।

পরিচালক—শ্রীঅজিত লাহিড়ী

কিছুক্ষণ পরে।

ফাইলটি নামিয়ে পরিচালক অজিত লাহিড়ি পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট সম্পাদক গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন "শট্ ডিভিশন কি রকম হয়েছে?

গোবিন্দবাবু চোখ বন্ধ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ব্যস্ত ছিলেন। সেই অবস্থাতেই উত্তর দিলেন ভালই, তবে আজকের সব কিছুই নির্ভর করছে ক্যামেরাম্যানের ওপর।

'ক্যামেরাম্যান বিজয় দে চুপচাপ এতক্ষণ বসে শট ডিভিশন শুনছিলেন। গোবিন্দবাবুর কথা শুনে একটু হাসলেন। দেখাই যাক কি করতে পারা যায়। গোল টেবিলের অপর প্রান্তে বসা সহকারী ক্যামেরাম্যান শান্তিবাবুকে ডাকলেন। শান্তিবাবু কাছে এলেন।

শুনুন, আপনি গড়ের বাঁ দিকে বুরুজের ওপর ক্যামেরাতে থাকবেন। বিশ্বজিত, কমলদা ও গোটা ক্রাউডের গড় আক্রমণ করা ও গড়ের সিংহদরজা ভেঙে ফেলা এইটে আপনি কভার করবেন, ঠিক আছে?

"ইয়েস স্যার।"

"শঙ্কর!"

এবারে শঙ্করবাবু এলেন। শোন, তুমি গড়ের ভেতরে থাকবে। গড়ের ভিতরকার সৈন্যরা সিংদরজার আক্রমণ প্রতিরোধ করছে, সিংদরজা ভেঙে পড়ল, গড়ের সৈন্যদের পরাজিত করে বিশ্বজিত ও কমলদা তাদের অনুচরদের নিয়ে গড়ের ভেতরদিকে এগিয়ে গেলেন এই অব্দি তুমি কভার করবে। ঠিক আছে?

"ইয়েস স্যার।"

বিজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। পরিচালক অজিত লাহিড়ি এতক্ষণ সব শুনছিলেন এবারে বিজয়বাবুকে প্রশ্ন করলেন "তুমি কোথায় থাকবে?"

"ঠিক ব্রিজের ধারেই আমি থাকব। নৌকো নিয়ে ওরা সব এগিয়ে আসছে, তীরে নামল, সিংদরজা আক্রমণ, ভেঙে পড়ল দরজা, ওরা গড়ের সৈন্যদের পরাজিত করে ভেতরে ঢুকল এই অব্দি আমি কভার করব। সব কটা ক্যামেরাই একসঙ্গে চলবে।"

"ঠিক আছে" বললেন অজিত লাহিড়ি। চলে গেলেন বিজয়বাবু। ইলেকট্রিশিয়ানদের নিয়ে বেলা থাকতে থাকতেই আলোগুলো সব ঠিক জায়গায় বসাতে হবে।

ডানদিকের বুরুজের ওপর কামানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন অজিত লাহিড়ি। দূরের কৌতূহলী জনতার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইলেন। এরই মধ্যে হাজার দুয়েক লোক জড় হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে জনকয়েক লোক বসে গেছে মুড়ি, চানাচুর, চা, ইত্যাদি বেচতে। মনে মনে হাসলেন অজিতবাবু। কে বললে বাঙালীর ব্যবসাবুদ্ধি নেই!

রাত এগারোটা।

অন্ধকারের মধ্যে অস্থিরচিত্তে বুরুজের ওপর কামানের ধারে পায়চারী করছিলেন অজিত লাহিড়ি। অনেকক্ষণ হল সুনীলরাম গেছে, এখনও ফিরে আসছে না কেন? উৎকণ্ঠার সঙ্গে বারবার শুধু ঘড়ি দেখছিলেন। "রাহগীর"-এর সুটিং শেষ করেই বিশ্বজিত চলে আসবে সেই রকম কথা ছিল; তবে কি ওদের কাজ এখনও শেষ হয়নি! কিন্তু এই তিন হাজার লোককে কতক্ষণে আটকে রাখবেন তিনি? কমলদা এসে মেক্ আপ্ সেরে রেডী হয়ে আছেন খবর এসে গেছে। সুনীলকে দু নম্বর ক্যাম্পে পাঠিয়েছেন বিশ্বজিতের খবর আনতে। বিশ্বজিত এলে মেক আপ করে ওকে ওখান হতেই নৌকাতে কমলদার

সঙ্গে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু কি যে হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—

"অজিতদা"—

"কে ?"

"আমি রবীন"

"কি ব্যাপার ?" শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন অজিত লাহিড়ি।

"সুনীলদা খবর পাঠিয়েছে বিশ্বজিত রেডি।"

আচমকা আনন্দের খবর এলে মনের অবস্থা কি রকম হয় ? মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে বললেন "বিজয়কে ডাক।"

বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তগুলি একের পর এক পা ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। অদ্ভুত রকমের একটা প্রশান্তি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে গড়ের সামনের সেতুর দিকে তাকিয়ে রইলেন অজিতবাবু। জীবন যুদ্ধে জয় পরাজয় দুটোই আছে। দেখাই যাক—

"আমাকে ডেকেছ ?"

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ক্যামেরাম্যান বিজয় দে'র কণ্ঠস্বরে। চোখ বন্ধ করে একেবারে কপালের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে অজিতবাবু বললেন "তুমি রেডি ?"

"হ্যাঁ"

"Absolutly ready ?"

"Yes"

"লাইট দিতে বল, খবর এসেছে বিশ্বজিত প্ল্যান মাফিক এগিয়ে আসছে।"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রবীনের দিকে ইশারা করলেন বিজয়বাবু। পকেট হতে হুইশলটা বের করে জোরে ফুঁ দিল বাবু।

ঝিলের ওপারে জেনারেটার চালু হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। মাইকটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে বিজয়বাবু গর্জন করে উঠলেন "লাইটস্।"

এক মুহূর্ত। সমস্ত দুর্গ সেতু ও ঝিলের কালো জল আলোকিত হয়ে উঠল। উত্তেজনায় ভরা চোখ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন অজিত লাহিড়ি ও বিজয় দে। পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন দুই কমরেড। পর মুহূর্তেই দৃঢ় পদক্ষেপে দুজনে এগিয়ে গেলেন সেতুর দিকে।

* * *

চোখের দৃষ্টি জমাট অন্ধকারের মধ্যে কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না। জল হইতে সম্মুখে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে কেবল নক্ষত্রালোক খচিত মসীকৃষ্ণ জলরাশি। দেবীকান্ত ও ভুজঙ্গ হালদার যতই দুর্গের নিকটবর্তী হইতে লাগিল জলের কল্লোলধ্বনি ততই বাড়িয়া চলিল। নৌকার সংঘাতে একটানা স্রোত ফুলিয়া ফাঁপিয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেবীকান্তর মনে হইল আজিকার এই অভিযান তাহার জীবনের একটা বৃহত্তর সত্যের প্রতীক ; জীবন স্রোতের দুর্নিবার টানে সে-তো অনেকদিন হইতেই ভাসিয়া চলিয়াছে। পাষাণ প্রাকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া এতদিন চূর্ণ হইয়া যায় নাই কেন ইহাই আশ্চর্য। কে জানে হয়ত আজিকার জন্যই নিয়তি অপেক্ষা করিয়াছিল—তাহার ভাসিয়া চলাকে পরিসমাপ্তির উপকূলে পৌঁছাইয়া দিতে। কিন্তু কোথায় সে উপকূল ? গড়ের এপারে না ওপারে ?

দেবীকান্ত ভাবিতেছিল—আজ রাত্রিটা শুধু আমার ! কাল কোথায় থাকিব, বাঁচিয়া থাকিব কি না কে জানে ? যদি মরিতেই হয় মৃত্যুপথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইব না ? উত্তরার মুখের দুইটি কথা শেষবার শুনিতে পাইব না! ইহাতে কাহার কি ক্ষতি ? উত্তরা তাহাকে ভালবাসিয়াছে। তাহার জীবনের ও মরণের সাথী হইতে সেও প্রস্তুত।

আজ মনে পড়ে যৌবনের রাজটীকার প্রারম্ভে প্রথম যেদিন তাহার উত্তরার সহিত দেখা হইয়াছিল। উত্তরার কোমল ঠোঁট দুইটি সেদিন বারবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন কথা বাহির হয় নাই। শুধু তাহার সমুদ্রগভীর চোখ দুটির দৃষ্টিতে যে গভীর অনির্বচনীয় ভাবাবেগ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল তাহাই দেবীকান্তকে পুরস্কৃত করিয়াছিল। গড়ের ভিতরে উত্তরা কি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ? কে জানে ? কিন্তু উত্তরার সহিত দেখা করিবার পূর্বে বাসুদেবের সহিত তাহাকে শেষ বোঝাপড়া করিতে হইবে। এক খাপে দুই তলোয়ারের স্থান হয় না। বাসুদেব অথবা দেবীকান্ত দুইজনের একজনকে পৃথিবী—

*

উত্তর—গড়নাসিমপুর

*

কাঁধে কাহার একটা কঠোর স্পর্শে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাকাইয়া দেখিল গুরুদেব তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। বাসুদেবের চিন্তায় অজানাতেই দেবীকান্তর হাত তলোয়ারের হাতলের উপর দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়াছিল। ভুজঙ্গ হালদার তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজিকার এই বৃহৎ অভিযান তাহাদের শেষের শুরু। উত্তেজনার মুহূর্তে ঠিকমত রাশ না ধরিলে জীবনের চরম মুহূর্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

ভুজঙ্গ হালদার বলিলেন "হুঁসিয়ার, সামনেই দুর্গ।"

দেবীকান্ত বলিল "আপনি সাবধান।"

ভুজঙ্গ হালদার মাথা নাড়িলেন। ততক্ষণে তাহাদের নৌকা গড়ের সেতুর নিকটবর্তী হইয়াছিল। তলোয়ার তুলিয়া ভুজঙ্গ হালদার হাঁকিলেন "মশাল জ্বাল।"

সংস্রাধিক মশাল জ্বলিয়া উঠিয়া অন্ধকারকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। মশালের আলোয় দুর্গের পাথরের প্রাকার যেন চমকাইয়া উঠিল। কাহার এত স্পর্ধা হইয়াছে তাহার ঘুম ভাঙাইবার ?

তলোয়ার হাতে দেবীকান্ত হাসিল। তাহার উপর বাসুদেবের বড় রাগ। এই তলোয়ার দিয়ে পৃথিবীর সবাইকে হত্যা করা যায় না ? তুমি, আমি, শত্রু, মিত্র কেহ বাঁচিয়া থাকিবে না।

জল স্রোতের মুখে খড়-কুটোর মত ঝাঁপাইয়া পড়িল দেবীকান্ত।

* * *

পিছনের বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে ইজিচেয়ারে চুপচাপ শুয়েছিলেন বিশ্বজিত। পাশেই বসেছিলেন কমল মিত্র। শুয়ে শুয়ে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল কি যে ভাবছিলেন বিশ্বজিত কে জানে? শেষ অব্দি উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন কমলদাকে।

"কমলদা।"

"উঁ, কি হোল উঠছিস কেন?"

"শট্‌গুলো কি রকম হোল বলত?"

"খুবই ভাল হয়েছে। আমি তো ভাবতেই পারি নি এই বিরাট ক্রাউড্‌ নিয়ে এরা এত চমৎকার ভাবে কাজ করতে পারবে। তাছাড়া জানিস তো আজকাল আউট ডোরে দর্শকদের অত্যাচারে স্যুটিং করতে প্রত্যেকেই ভয় পায়। তাই একরকম বাধ্য হয়েই ষ্টুডিওর ভেতরেই সব কাজ সারতে হয় আমাদের।"

"তা ঠিক, আমিও ভাবতে পারিনি এখানকার এই বিরাট দর্শককুল এত নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেবে আমাদের। সত্যি কথ, বলতে কি গোড়ার দিকে আমার বেশ ভয়ই করছিল। আচ্ছা, কত লোক হবে বলত?"

"তা প্রায় হাজার পাঁচেক তো হবেই।" ঝিলের ওপারে অপেক্ষমাণ জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন কমলদা।

অজিত লাহিড়ি এসে দাঁড়ালেন।

"আমার আর কতটা কাজ বাকি আছে?" জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বজিত।

"আর গোটা তিনেক শট্‌ হলেই আজকের মত আপনাদের কাজ শেষ। আমি জানি আপনি খুব ক্লান্ত চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি—"

"না," উঠে দাঁড়ালেন বিশ্বজিত। "আমার জন্যে আপনাকে মোটেই চিন্তা করতে হবে না। যতক্ষণ না কাজ মনের মত হয় আমাকে ছাড়বেন না। তিনটে কেন, তিরিশটা শট্‌ যদি আপনার দরকার থাকে আপনি নিন। আমি সারারাত কাজ করব।"

"কিন্তু আপনিও তো সারাদিন স্যুটিং করে ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন, তার ওপর কাল সকালেই আবার—"

"সে চিন্তা পরে করা যাবে। আপাততঃ চলুন এখনকার শট্‌গুলো শেষ করে ফেলা যাক।"

দেবীকান্ত—গড়নাসিমপুর

"চলুন, আমরা রেডি।" বললেন অজিত লাহিড়ি।

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আগুন, আর আগুন। প্রতি-শোধের নির্মম আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্য। বাসুদেবের গর্বের শেষ পরিণতি দেখবার জন্যে দুর্গের একটিও প্রাণী বেঁচে নেই। উত্তরাকে নৌকাতে তুলে নিয়ে দূরে অন্ধকারের মাঝে কোথায় হারিয়ে গেছে দেবীকান্ত!

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল দুর্গের একাংশ। লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন অজিত লাহিড়ি। চমৎকার!

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বোধকরি এমনি করেই পৃথিবীতে সব অহঙ্কারেরই একদিন অবসান ঘটে। কেন জানি ফিরে ফিরে কবিগুরুর গানের সেই লাইন গুল বারবার মনে পড়ছিল—

"অনেক দিনের সঞ্চয় তোর আগুলি আছিস বসে,
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন ঝরুক পড়ুক খসে।
আয়রে এবার সব হারাবার জয়মালা পরো শিরে
ওরে সাবধানী"—

"কি ভাবছেন?"

চমকে ঘুরে তাকালাম। শ্যাডো প্রডাকসন্সের প্রধান কর্মসচিব শ্রীসুনীলরাম কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন জানতেই পারিনি। সঙ্গে শ্রীমান রবীন সেনগুপ্ত ওরফে বাবু। শ্যাডো প্রডাকসন্সের এই দুজনই হচ্ছে আসল প্রাণ। অদ্ভুত এদের দুজনের কর্মকুশলতা। যে বিরাট জনতা নিয়ে আজ এরা এখানে সুষ্ঠভাবে কাজ করলেন তা এ লাইনের অনেক প্রযোজক ও পরিচালকদের বহুদিন ধরে হিংসার উদ্রেক করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

"ভাবছিলাম, কি করে সম্ভব করলেন?"

একটু লজ্জিত হলেন সুনীলরাম। "কি করে যে সম্ভব হল তা আমি নিজেও জানিনা, শুধু গত কয়েকদিন যাবৎ মাথার মধ্যে এইটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল, যে করে হোক করতেই হবে, একসময়ে দেখলাম হয়েও গেল।"

একাগ্রতা থাকলে বোধহয় কোনকিছুই অসম্ভব হয়না মানুষের কাছে। দীর্ঘদিন আগে সুনীলরাম যখন চিন্তা করেছিলেন ছবি করতে হবে সেদিন অনেকেই উপেক্ষার হাসি হেসেছিলেন। বড় বড় রথী মহারথী যেখানে ছবি করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যায় সেখানে গোটাকয়েক প্রডাক্‌সন্ বয় চিন্তা করছে কি না ছবি করবে?

কিন্তু সুনীলরামের জেদের কাছে সব বাধাই সেদিন হার মেনেছিল। মাত্র গোটাকয়েক বিশ্বস্ত কর্মী নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন সুনীলরাম। তৈরী হল শ্যাডো প্রডাকসন্স। তৈরী হল "জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার।" শুধু ছবিই তৈরী হলনা সৃষ্টি হল একটা রেকর্ড বক্স অফিসে।

সেদিন সুনীলরামের পাশে এগিয়ে এসেছিলেন অজিত লাহিড়ি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি, রুমা দেবী, বিকাশ রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সৌমেন্দু রায় ও আরও অনেকেই যাঁদের নাম আমার জানা নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ এঁদের মধ্যে নেই, ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেকেই থাকবেন না, কিন্তু থাকবে একটি জিনিষ বেঁচে, যা কোনদিন মরবে না তা হল মানুষের একাগ্র সাধনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

বারীন্দ্রনাথ দাসের কাহিনী অবলম্বনে "গড় নাসিমপুর" হচ্ছে শ্যাডো প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি। এ ছবির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সঙ্গীত পরিচালনা করছেন বাংলার মধুকণ্ঠ-গায়ক শ্রীশ্যামল মিত্র। শ্যামলবাবু আরও অনেক ছবিতে সুর দিয়েছেন কিন্তু এ ছবিতে সুরকার হিসেবে তিনি যা কাজ করেছেন তা এক কথায় বলা যায় অপূর্ব। ছবি রিলিজ হলে বুঝতেই পারবেন আপনারা।

ছবির শিল্প নির্দেশকরা কি যে না করতে পারেন তাই ভাবছিলাম আর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম শ্রীসুবোধ দাসের কাণ্ড। অসাধারণ পরিশ্রম করে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ফলতার রেষ্ট বাঙলোকে রূপান্তরিত করলেন তিনি নাসিমপুরের গড়ে। হয়ত কোনদিন দেখব দিল্লীর লাল কেল্লাটা উঠে এসেছে কলকাতার গড়ের মাঠে।

কাজের শেষে ব্রিজের উপরেই কলাকুশলীরা সবাই বসে গিয়েছিলেন রাতের খাওয়া সারতে। রাত তখন প্রায় চারটে। এতবড় ধকলের পর কাউকেই ক্লান্ত বলে মনে

হচ্ছিল না। যেন সবাই পিকনিক করতে এসেছে। ঠাট্টা পরিহাসে সবাই মশগুল। খাওয়ার উপকরণও অতি সামান্যই। গরম ভাত ও একটা কুমড়োর তরকারী। কোথাও নেই। খোঁজ করলে দেখা যাবে হয়ত অনেকেরই বাড়িতে কালকের রেশন তোলবার মত টাকাও নেই। এ লাইনের উন্নতির জন্যে কারুর মাথা ব্যথাও নেই। অথচ

গড়নাসিমপুর—(বাঁ দিক থেকে) ক্যামেরাম্যান বিজয় দে, প্রধান কর্মসচীব মুনীশ্বরাম, পরিচালক অজিত লাহিড়ী ও শ্রীমান বাবু

তাই দিয়েই সবাই হাসিমুখে খেয়ে চলেছে। কোন অভিযোগ নেই। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলাম পরিবেশনের পাত্র।

"বিজয়বাবু আর খানিকটা ভাত দেব ?"

"না না" পাতের উপর হাত নাড়লেন ক্যামেরাম্যান শ্রীবিজয় দে। যদি থাকে তাহলে খানিকটা তরকারী দিন। শান্তভাবে বললেন তিনি।

বাংলাদেশের ছবির টেক্‌নিসিয়ানরা আমাদের গর্ব। অতবড় বিরাট যুদ্ধের দৃশ্য, বিরাট "জোনের" কাজ শেষ করলেন বিজয়বাবু মাত্র ছটি দু'কিলো লাইট নিয়ে। অর্থাৎ মাত্র বার হাজার কিলোওয়াট লাইট নিয়ে। বোম্বাই অথবা হলিউডের টেক্‌নিসিয়নারা কাজ করা দূরে থাকুক কানে শুনলেই ভিরমি খেয়ে পড়ে যেতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, বাঙলা দেশের ছবির টেক্‌নিসিয়ানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেক্‌নিসিয়ান্। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যন্ত্রপাতি নিয়ে এরা আজকের জেট যুগের ছবির সঙ্গে সমানে টেক্কা দিয়ে লড়ে চলেছেন। যা আছে তাই দিয়েই তাঁরা হাসি মুখেই কাজ করেন। কাজকে ভালবাসেন, কাজের মধ্যেই তাঁরা মশগুল হয়েই থাকেন। অথচ বাঙলা দেশের টেক্‌নিসিয়ানদের মত গরীব টেক্‌নিসিয়ান্ পৃথিবীর কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয় এখানে। আমাদের সদাশয় সরকারের কাজ হচ্ছে দয়া করে শুধু নানারকম ভাবে ট্যাক্স আদায় করা। তার বেশী আর কোনরকমের দায়িত্ব কি তাঁদের নেই ?

পরিচালক অজিত লাহিড়ি খাওয়া শেষ করে ব্রিজের একধারে চুপ করে বসেছিলেন অত্যন্ত চিন্তিত মুখে। কাছে গিয়ে বসলাম। সিগারেট এগিয়ে দিলেন অজিতবাবু।

"কি হোল ? এত কি চিন্তা করছেন ? আজকের কাজ তো খুব ভাল ভাবেই শেষ করলেন !" সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"আজকের কথা ভাবছি না। এখানে আসবার আগে পাঁচদিনের একটা বিরাট সেট্ ক্যান্সেল করতে হয়েছে। কতটাকা নষ্ট হল, আবার নতুন করে করতে হবে।"

"কি হয়েছিল ?"

"আর বলেন কেন ? দেবীকান্ত ও বাসুদেবের তরবারী নিয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের একটা সিন ছিল, প্রথম দিনেই বাসুদেব সেট থেকে তলোয়ার হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে পা ভেঙে বসে রইল। একেবারে গোড়ালীতে ফ্র্যাকচার হয়েছে। দু-তিন মাসের ধাক্কা। কোন্‌দিকে সামলাই বলুন দেখি !"

"বাসুদেবের ভূমিকায় কাকে নিয়েছেন ?"

"বম্বের দেব মুখার্জীকে, জয় মুখার্জীর ছোট ভাই। দেবীকান্ত করছেন বিশ্বজিত, উত্তরা করছেন মাধবী মুখার্জী, ভুজঙ্গ হালদার করছেন কমলদা। বিকাশদা, রমা দেবী, অসিতবরণ, শেখর চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, সুব্রতা আরও অনেকেই রয়েছেন।

"মিরজুমলা কে করছেন ?"

"বলুন দেখি কে ?" দু চোখে কৌতুক ভরে জিজ্ঞেস করলেন অজিতবাবু।

খানিকক্ষণ মাথা চুলকোবার ভাণ করলাম। পরে হার স্বীকার করে বললাম "দেখুন ও রকম একটা কঠিন চরিত্রে রূপ দেওয়া খুবই শক্ত। আমি তো কাউকেই ভাবতে পারছি না। অবশ্য ছবিদা বেঁচে থাকলে…"

ছবিদার কথা উঠতেই অজিতবাবুর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধরাগলায় বললেন তিনি "ঠিক বলেছেন, আমারও ঐ একই মুস্কিল হয়েছিল, ঐ পরিমাণে যে ঋণী তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।" একটু সামলে নিয়ে বললেন অবশ্য "আমি একটা Risk নিয়েছিলাম নিজের দায়িত্বে। যাঁকে দিয়ে ঐ চরিত্রে কাজ করিয়েছি বাঙলা দেশের লোকেরা তাঁকে রোমান্টিক নায়ক চরিত্রেই দেখতে অভ্যস্ত। আমি নিজেও ভাবতে পারিনি যে ওইরকম একটা শক্ত চরিত্রে অনায়াসেই কি করে অভিনয় করলেন—

"কে ?" অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"উত্তমকুমার, মিরজুমলার চরিত্রে একেবারে নতুন ধরনের অভিনয় করেছেন উত্তমবাবু। ছবি রিলিজ হলে দেখতে পাবেন একটুও বাড়িয়ে বলছিনা আমি। সত্যিই ওর তুলনা নেই।"

উত্তমকুমার সম্বন্ধে আমার নিজেরও খানিকটা দুর্বলতা আছে। লোকে শুধুমাত্র রোমান্টিক নায়ক চরিত্রে তাঁকে দেখতে চায় অন্য কোন ধরণের চরিত্রে তাঁকে নিতে চায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে কোন টাইপ চরিত্রে উত্তম-

মীরজুমলা—গড়নাসিমপুর

চরিত্রে ছবিদা ছাড়া আর কাউকে ভাবতেই পারছিলাম না। অবশ্য তার একটা অন্য কারণও আছে। আমরা, মানে স্যাডো প্রডাকসন্সের কর্মীরা ছবিদার কাছে কি

কুমার সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করবার ক্ষমতা রাখেন। অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" দেখেছিলাম। তাতে রাইচরণের ভূমিকায় উত্তমকুমারের

অভিনয় আমার এখনও মনে আছে। ইদানীং কালের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের "নায়ক" ছবিতেও তাঁর অভিনয় মনে রাখবার মত।

একটুখানি চুপ করে থেকে অজিতবাবু আবার বললেন "একদিনের একটা ঘটনা বলি, সেদিন উত্তমবাবু ও রুমা দেবীকে নিয়ে কাজ ছিল। সকালে ঠিক সময়ে এসে মেক্‌আপ্‌ রুমে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। আমি সেটে বিজয়কে শট ডিভিশন করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ সুনীল এসে খবর দিলে উত্তমবাবু ডাকছেন। গিয়ে দেখি মেক্‌আপ্‌ সেরে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রয়েছেন। কেমন যেন বেশ একটু ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছিল তাঁকে। কাছে যেতেই তাঁর সেদিন কি কি কাজ আছে জানতে চাইলেন। বুঝিয়ে দিলাম।

খানিক পরে সেটে এলেন। শুরু হল কাজ। ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াবামাত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব বদলে গেল। হারিয়ে গেলেন উত্তমকুমার, তার জায়গায় আমাদের সামনে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মিরজুমলা।

সারাদিন অক্লান্তভাবে কাজ করলেন। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ জিজ্ঞেস করলেন আর কতটা কাজ বাকী আছে? একটু ভয়ে ভয়েই বললাম আর গোটা দুয়েক শট্‌ হলেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এদিকে নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে। উত্তমবাবু আজকে আর যদি কাজ না করতে চান তাহলে আবার কালকেও সুটিং করতে হবে। সবদিকেই মুস্কিল।

"আর কতক্ষণ লাগবে?" জানতে চাইলেন।

"ঘণ্টাখানেক হলেই হয়ে যাবে" বললাম একটু মাথা চুলকে।

একটুক্ষণ চিন্তা করে আরও ঘণ্টাখানেক কাজ করতে রাজী হলেন। যথাসময়েই আমরা কাজ শেষ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আসল ঘটনাটা জানতে পারলাম কাজ শেষ হবার একটু পরেই। উত্তমবাবু ষ্টুডিও থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ফোন এল। ওঁর ছেলে গৌতম ফোন করছিল। গৌতমের কাছেই জানতে পারলাম উত্তমবাবুর স্ত্রী গৌরী দেবীর সেদিনখুব বাড়াবাড়ি অবস্থা গেছে। গৌরী দেবী একটু অসুস্থ ছিলেন আমরা জানতাম, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে এটা জানতাম না। উত্তমবাবুও কাউকে কিছু জানতেও দেন নি, বুঝতেও দেন নি। শুধু তাই নয় ঐরকম একটা মানসিক অবস্থা নিয়ে সারাদিন একটা দুরূহ চরিত্রে কি করে যে অক্লান্তভাবে অভিনয় করে গেলেন তাই অবাক হয়ে ভাবছিলাম। আপনিই বলুন, নিজের ওপর কতখানি বিশ্বাস থাকলে তবে মানুষ এইভাবে কাজ করবার ক্ষমতা রাখে?"

"তা ঠিক" অজিতবাবুর সঙ্গে আমিও একমত হলাম।

কথায় কথায় এদিকে আকাশের পূর্বদিক ফরসা হয়ে আসছিল। শ্রীমান বাবু এসে উপস্থিত হল। কিছু কিছু টেক্‌নিসিয়ানদের নিয়ে একটা গাড়ি কলকাতায় যাচ্ছে আমি যদি যাই ওতে যেতে পারি।

আমার সঙ্গে অজিতবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন, আমাকেও যেতে হবে।"

"কিন্তু আপনার এখন বেশ খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সারারাত যা ঝামেলা গেছে।" গাড়িতে বসে বললাম।

"উপায় নেই, ঠিক সাতটার সময় আর এক জায়গায় লোকেশান্‌ দেখতে যেতে হবে। আমার জন্যে ওরা সব এসে বসে থাকবে।"

"আজকের সুটিং শেষ হতে না হতে আবার নতুন লোকেশান্‌ দেখতে যাচ্ছেন! আপনি কি দু'মাসের মধ্যেই ছবি শেষ করে ফেলবেন ঠিক করেছেন?" একটু বিস্মিত ভাবেই বললাম।

একটু লাজুক হাসলেন অজিতবাবু। "না, এ ছবির জন্যে নয়।"

একটুখানি অবাক হয়েই বললাম "তবে কোন্‌ ছবি?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন অজিতবাবু "পদ্ম গোলাপ্‌। লোকেশান থেকে ফিরেই মাধবী মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর ও উত্তমবাবুর ডেট্‌ কি ভাবে Adjust করব সেটাও একটা চিন্তার ব্যাপার।"

"আর কে কে আছেন?"

"এখনও পুরো কাষ্টিং করে উঠতে পারিনি। তবে ইচ্ছে আছে অশোক কুমারকেও নেবার। কিন্তু শেষ অব্দি সেটা সম্ভব হবে কি না বুঝতে পারছি না। দেখাই যাক।"

কিছুক্ষণ নীরবেই কাটল। ইতিমধ্যে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া গাড়ির ভেতর ঢুকে অস্থির করে তুলছিল আমাদের। কখন যে চোখদুটো আপনা থেকেই জড়িয়ে এসেছে বুঝতেই পারিনি। ঘুম ভাঙল অজিতবাবুর ডাকে। এসপ্লানেডে পৌঁছে গেছি।

গাড়ি হতে নেমে অজিতবাবুর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম "চলি, আজকের রাতের কথা অনেকদিন মনে থাকবে।"

"আমারও," হাতটা টেনে নিয়ে বললেন অজিতবাবু।

২৩শে মার্চ। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে সেদিন ফিল্মলাইনের অনেক গণমান্য লোকের পায়ের ধুলো পড়েছিল। সকালের দিকে ক্ল্যাপ ষ্টিক দিলেন অরুন্ধতী দেবী, ক্যামেরার স্যুইচ অন করলেন তপন সিংহ, চিত্রগ্রহণ করলেন অজয় কর। দুপুরের দিকে এসে অভিনন্দন জানালেন হীরেন নাগ, বিশু চক্রবর্ত্তী, বিমল দে, দেবেশ ঘোষ, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, বংশী চন্দ্রগুপ্ত এবং সবশেষে এলেন উত্তমকুমার। নবজাত শিশুটি যে জন্মাবামাত্র কি করে এতগুলো লোককে তার আঁতুর ঘরে টেনে নিয়ে এল তাই ভাবছিলাম। ওই যাঃ, আসল খবরটাই তো এখনও বলা হয়নি। কার জন্ম দিনে এতগুলো লোক এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন সেটাই এখনও বলা হল না। এ যেন কনেকেই বাদ দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে!

২৩শে মার্চ ভূমিষ্ঠ হলেন নবজাত পরিচালক শ্রীস্বদেশ সরকার। শ্রীঅজয় কর ও সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় ছাত্র তিনি। এ লাইনে যাত্রা শুরু করেছিলেন একদা প্রণব রায় পরিচালিত "রাঙামাটি" ছবিতে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষানবিশী করার পর এই প্রথম একা মুখোমুখী দাঁড়ালেন জীবন-সংগ্রামে। কামনা করি তিনি যেন সসম্মানে জয়ী হতে পারেন।

স্বদেশবাবু তাঁর প্রথম ছবি বেছে নিয়েছেন কবিগুরুর "শাস্তি" গল্প থেকে। গ্রামের পটভূমিকায় এক চাষীর সংসারের হাসি কান্নার আলোয় বোনা এ কাহিনী। বড় ভাই দুখিরামের ভূমিকায় কালী ব্যানার্জী, ছোট ভাই ছিদাম দিলীপ রায়। দুখিরামের স্ত্রী রাধা গীতা দে ও ছিদামের বউ চন্দরা সাবিত্রী চ্যাটার্জি। প্রধানতঃ এই চারজনকে নিয়েই গল্প।

একদিন সকালবেলা এক ফাঁকে অফিস হতে সরে পড়লাম। স্বদেশবাবুর সেটে যেতে হল। না গেলে মাথাটা আস্ত থাকবার সম্ভাবনা খুবই কম। চমৎকার সেট্ তৈরী করেছেন এ ছবির প্রধান কর্ণধার ও শিল্প নির্দেশক শ্রীসুনীতি মিত্র। দুখিরাম ও ছিদামের বাড়ি। চাষীর বাড়ী যেমন হয়। মাটির ঘর, দাওয়া, ধানের মরাই, গোয়ালঘর, গরু, লাঙল, লাউমাচা, কোন কিছুই বাদ যায়নি। চমৎকার একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সুরকার পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক কোণে দাঁড়িয়ে গানের সিচুয়েসান্ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন স্বদেশবাবু। কাছে যেতেই একটু হাসলেন। প্রথম দিনে না যাওয়ার দরুণ খানিকটা অভিযোগও শুনতে হল। জিজ্ঞেস করলাম "ডিরেক্টার হয়ে কী রকম লাগছে?"

"এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না", মৃদুহেসে উত্তর দিলেন স্বদেশবাবু।

"গৃহিণী কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম।

অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে স্বদেশবাবু বললেন "ওইত"।

গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে বললাম "গিন্নীকে বলবেন— এতদিন তো তুমি আমাকে পাত্তাই দিতে না; এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি একটা যে সে লোক নই।"

সিগারেট ধরিয়ে স্বদেশবাবু বললেন "আরে সেইজন্যেই তো যেচে নেমতন্ন করে নিয়ে এসেছি। ক'দিন ধরে কাছে ঘেঁষতেই দিচ্ছে না। বলে "ছেলেরা বড় হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না! আক্কেল জ্ঞান কি চুলোর দোরে গেছে নাকি? কি মুস্কিল বলুনতো! নিজের বউয়ের সঙ্গে একটু প্রেম করব তাতেও কারফিউ অর্ডার।"

ইতিমধ্যে সহকারী চিত্রশিল্পী কালীবাবু এসে স্বদেশবাবুকে বললেন একটা মনিটার করবার জন্যে। স্বদেশবাবু ওপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি মনীষবাবু একটা মনিটার নেব?"

সেটের এককোণে বিরাট একটা কাঠের ফ্রেমের ওপর গোটাকয়েক টুল চাপিয়ে তার ওপর ক্যামেরা খাটিয়ে বসেছিলেন ক্যামেরাম্যান মনীষ দাসগুপ্ত। স্বদেশবাবুর

শাস্তি—বাঁদিক থেকে : ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে পরিচালক স্বদেশ সরকার একটি রোমান্টিক দৃশ্য চিত্রায়িত করছেন। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন শিল্পী প্রসাদ মুখার্জ্জি আর ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (চন্দরা) ও দিলীপ রায় (ছিদাম)।

প্রশ্নের উত্তরে বললেন "আমিতো রেডী হয়ে বসেই যাছি।" বলেই এক সঙ্গে গোটা চারেক পান ও খানিকটা জর্দ্দা ঠেসে নিলেন মুখের ভিতরে।

মনীষবাবুর নির্দেশে এক এক করে লাইটগুলো জ্বলে উঠতে লাগল। শিল্পীরাও যে যার জায়গায় গিয়ে প্রস্তুত হলেন। স্বদেশবাবু গম্ভীরভাবে বললেন "সাইলেন্স এভ্রি বডি।"

শুরু হল মনিটার।

জমিদারের নায়েব এসেছিলো খাজনা নিতে। দুখিরাম ছিদামকে বললে নায়েবকে খাজনার টাকাটা দিয়ে দিতে। ছিদাম বললে তার কাছে টাকা নেই। শুনে দুখিরাম জিজ্ঞেস করলে খাজনা দেবার জন্যে যে টাকাটা সে ছিদামকে দিয়েছিল সে টাকাটা তাহলে কি হোল? ম্লানবদনে ছিদাম উত্তর দিলে টাকাটা সে ছোট বউয়ের চুড়ী তৈরী করবার জন্যে খরচা করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে বড় বউ রাধা দাওয়া থেকে নেমে এসে ফোড়ন দিয়ে বললে গোটা সংসারটাই ছোট বউয়ের জন্যে উচ্ছন্নে যাবে। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল দুখিরাম। দাওয়া থেকে কাটারিটা তুলে নিয়ে "তবেরে শালা" বলে ছিদামকে তাড়া করল। গতিক সুবিধের নয় দেখে ছিদাম পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। ইতিমধ্যে ছোটবউ চন্দরা ছুটে এসে দুখিরামের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। থমকে দাঁড়াল দুখিরাম।

এই অব্ধি।

"সব ঠিক আছে।" সাবিত্রী দেবী আপনার টাইমিংটা ঠিক হয়নি, আর একটু আগে আপনি আসবেন, আর কালীদা আপনার সবই ঠিক ছিল শুধু মেজাজটা আর একটু রুক করতে হবে। সবে আপনি মাঠ হতে ফিরেছেন।" শিল্পীদের শেষ মুহূর্ত্তের নির্দেশ দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে ক্যামেরার পাশে দাঁড়ালেন স্বদেশবাবু।

যথারীতি দৃশ্যটির গ্রহণ পর্ব শেষ হল। এরপরে আধঘণ্টার জন্যে লাঞ্চের বিরতি। একে একে সবাই বেরিয়ে ক্যান্টিনে জমা হলেন। বিশেষ একটু কাজ ছিল, সরে পড়বার তালে ছিলাম কিন্তু স্বদেশবাবু ছাড়লেন না। অগত্যা ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা নিয়ে সঙ্গে বসতেই হল। পাশের টেবিলে বসে ছিলেন ক্যামেরাম্যান্ মনীষবাবু ও ষ্টিল্ ক্যামেরাম্যান্ তরুণ গুপ্ত। তরুনবাবু "শাস্তি"র ষ্টিল্ ছবিগুলো দেখাচ্ছিলেন মনীশবাবুকে। গম্ভীরভাবে ছবিগুলো দেখছিলেন মনীষবাবু হঠাৎ জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন "এই রায়, শোন্ শোন্।

জানলার বাইরে হতে উঁকি দিলেন ক্যামেরাম্যান্ সৌমেন্দু রায়। "কি হোল?" জানতে চাইলেন ব্যাপারখানা। সামনে উপবিষ্ট তরুণবাবুকে দেখিয়ে মনীষবাবু বললেন "এই বস্তিটাকে নিয়ে কি করাযায় বলত?

জ্বালিয়ে দিলে একেবারে। সেটেতে সব সময়েই জ্বালাচ্ছে, খেতে এসেছি এখানেও নিষ্কৃতি নেই, এখানেও প্রজেকসান দেখাতে শুরু করলে।"

সৌমেন্দুবাবু ছবিগুলো টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করলেন। তরুণবাবু মনীষবাবুকে বললেন "বাঃ, বস্তিদের বস্তিরা না দেখলে কে দেখবে? আর এটাতো পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে যে"—মনীষবাবু বললেন "চোপ ওসব প্রেমের কথা রাত্রে নিজের বউকে শুনিও, আমাকে নয়, আমাকে বলে কোন লাভ নেই কেননা সবাই জানে সে আমি হচ্ছি বস্তি কুলের কলঙ্ক।" তরুণবাবু আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন মনীষবাবু দইয়ের ভাঁড়টা এগিয়ে দিয়ে বললেন "দইটা খেয়ে এখন মাথা ঠাণ্ডা কর, পরে তোর কথা শুনব।"

হাসির ঢেউ উঠল। তরুণবাবুও হেসে ফেললেন। আর দেরী করা চলে না। স্বদেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি আসতেই পথরোধ করে দাঁড়াল একটি চক্রযান। বিরক্ত হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি এমন সময় পিছনের দরজা খুলে নেমে এলেন সুবেশিনী কালো চশমাধারিণী এক ভদ্রমহিলা। সরাসরি একেবারে সাংনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে বললেন "কি মশায়, আজকাল দেখছি ডাকলেও পাশ কাটিয়ে সরে পড়েন, বলি ইদানীং কি মোটা টাকার জ্যাকপট্ পেয়েছেন নাকি?"

আমতা আমতা করে বললাম "না তা নয়, মানে ঠিক শুনতে পাইনি তোমার ডাক।"

"তা পাবেন কেন? এত অন্যমনস্ক হয়ে পথ চললে কারুর ডাকই শোনা যায় না। তা কার প্রেমে পড়া হয়েছে জানতে পারি কি?"

"প্রেমে এখনও পড়িনি, তবে এবারে পড়ব ভাবছি, না হলে আর বন্ধুমহলে প্রেষ্টিজ থাকছে না।"

"তাহলে তাড়াতাড়ি পড়ে যান। এরপরে আর কেউ পাত্তা দেবে না।"

"দেবে না কি এখনই দিচ্ছে না। মেয়েগুলো সব No vacancy বোর্ড লটকে বসে আছে। কি করা যায় বলত?"

"কি আর করা যাবে! আপাততঃ আমি না হয় কোনরকমে কাজ চালিয়ে দেব।"

হাত জোড় করে বললাম "ক্ষমা কর দেবী, নিরীহ ছাপোষা বঙ্গসন্তান আমি, বোম্বাই বাংলা দৌড়োদৌড়ি করতে গেলে হার্ট strike করবে। তা কলকাতায় এলে কবে? নতুন কোন ছবিতে কাজ করছ নাকি?

"করছি। গাড়িতে উঠুন যেতে যেতে কথা বলা যাবে।"

"কিন্তু আমার যে দরকারী কাজ ছিল—"

কড়া গলায় একটা ধমক দিয়ে সবিতা চ্যাটার্জি বললে "আঃ উঠুন বলছি আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় লোক জমছে দেখতে পাচ্ছেন না।"

ভীষণ ঘা লাগল প্রেষ্টিজে। একটা মেয়ে আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধমকাচ্ছে আর আমি বিনা—

রেগেমেগে উঠেই পড়লাম ওর গাড়িতে। দেখি কোথায় নিয়ে যেতে চায় ও। ওর দৌড় কতদূর একবার দেখতে চাই আমি!

বেশীদূর যে নয় সেটা অনতিবিলম্বেই বোঝা গেল। গাড়ি এসে ঢুকল টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওর কম্পাউণ্ডেতে। রেগেমেগে গাড়ী হতে নেমে চলে গেলাম সটান ওখানকার প্রজেকসন থিয়েটারে শ্রীজহর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। দরজা খুলে ঢুকতে যাব ধাক্কা লাগল বিরাট একজন লম্বা চওড়া লোকের সঙ্গে। উনিও বেরিয়ে আসছিলেন। পড়তে পড়তে দরজা ধরে কোনরকমে সামলে নিয়ে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে জুলজুল করে।

গম্ভীর ভাবে উনি জিজ্ঞেস করলেন আমার লেগেছে কি না! আমি মাথা নাড়াতে আশ্বস্ত হয়ে ফটাস করে একটা বিড়ি ধরালেন শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক। দরজার ভিতরের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন "তাহলে ওই কথাই রইল জহর।" বলেই গম্ভীর ভাবে আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে, শূন্যে আঙুল নাচিয়ে হাওয়ায় অঙ্ক কষতে কষতে চলে গেলেন।

ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম প্রজেকসান থিয়েটারে। সামনেই গোটা দুয়েক চেয়ার এক করে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছিলেন জহরবাবু। কাছে যেতে চোখ না খুলেই বললেন "জ্বালাতে এসেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"সরে পড়, এখন আমি স্বপ্ন দেখবার চেষ্টা করছি।"

"কার স্বপ্ন ?"

"সুচিত্রা সেনের।"

"সুচিত্রা সেনের স্বপ্ন কেন ?"

"কারণ ঋত্বিক ঘটকের নতুন ছবি "রঙের গোলাম"-এ সুচিত্রা সেনের সঙ্গে কাজ করতে হবে আমায়।"

"আর কাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে ?"

"অনিল চ্যাটার্জী, মণি শ্রীমানী, সীতা দেবী এদের সঙ্গেও কাজ করতে হবে। গল্প লিখেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল, সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন বাহাদুর খাঁ। সব খবর তো পেয়েছ এবারে বিদেয় হও। আর হ্যাঁ, যাবার সময় বেণুকে বলে যেও আমি এখানে আছি।"

"কোথায় উনি ?"

"দেখ বোধহয় বাগানে আছে।"

এদিকে তাকাতে দৃষ্টিটা এসে পড়ল আমার ওপর। ভাবলাম বোধহয় চিনতে পারবেন না অতএব এই তালে পাশ কাটিয়ে সরে পড়া যাক ; কিন্তু কার্যতঃ তা হল না। চোখে চোখে পড়াতে উনি একটু হাসলেন। শুনেছি উনি হাসলে মেয়েরা নাকি সব কাটা কলাগাছের মতই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং তাদের রক্তের চাপ অসম্ভব রকমের বেড়ে যায় ওনার হাসি দেখলে। খোদায় মালুম কি হয় কিন্তু আমাকে তখন ওনার দিকে এগিয়ে যেতেই হল।

চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে উত্তমকুমার জিজ্ঞেস করলেন "কেমন আছ ?"

"ভালই" মণ্টগোমেরী ক্লিফটের মতন উদাস ভাবে বলবার চেষ্টা করলাম।

"কতদিন পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে। তা প্রায়

গল্প করছিলেন (বাঁদিক থেকে)—সুপ্রিয়া দেবী, পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য্য, অনৈক শিশুশিল্পী, দীপ্তি রায় ও উত্তমকুমার।

"বেরিয়ে এলাম ! বাগানের দিকে যেতেই নজরে পড়ল বেশ কয়েকজন বসে জমিয়ে গল্প করছেন। বেণু ওরফে সুপ্রিয়া দেবী পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী দীপ্তি রায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভাবলাম জহরবাবুর খবরটা ওনাকে দিয়ে সরে পড়ব এমন সময় নজরে পড়ল ডানদিকে ধুতি পাঞ্জাবী জহরকোট পরা এক ভদ্রলোকের দিকে। বসে চা খাচ্ছিলেন উনি। মুখ ঘুরিয়ে হঠাৎ

বছর পাঁচেক হয়ে গেল, তাই না ?"

একটু হিসেব করে নিয়ে বললাম "না, ঠিক সাত বছর পরে দেখা হল।"

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? চা খাবে ?"

চা খাবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু উত্তম কুমারের ফ্যানরা যদি জানতে পারেন যে তাঁর চায়ের অফার আমি রিফিউজ করেছি তাহলে দেহ হতে আমার

মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী রকমের। অতএব সুবোধ বালকের মত বসলাম এবং চাও খেলাম। অতীত দিনের কথায় কথায় অনেকখানি সময় যে কখন পার হয়ে গেছে বুঝতেই পারি নি। আরও অনেকখানি সময় হয়ত কেটে যেত এমন সময় একজন এ্যাসিষ্টেণ্ট প্রডাকসন ম্যানেজার এসে বললেন "সেটে সবিতা চ্যাটার্জী আপনাকে ডাকছেন।" অগত্যা উত্তমকুমারের কাছ হতে বিদায় নিয়ে উঠতেই হল।

দেখা হল পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীর সঙ্গে। শুনেছি বর্ত্তমানে উনি সব চাইতে ব্যস্ত পরিচালক। অজিতবাবুর "মুখুজ্যে পরিবারে" ছবি দেখেছিলাম। খুব ভাল ছবি হয়েছিল। ভবিষ্যতে আরও ভাল ছবি ওনার হাত দিয়ে তৈরী হবে এ আশা আমি রাখি। সেদিনে উনি সুটিং করছিলেন রঞ্জিৎ কাংকেরিয়া প্রযোজিত "দাদু" ছবির। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অনুভা, সত্য ব্যানার্জী, বিকাশ রায় ও সবিতা চ্যাটার্জী। শুনলাম সবিতা এ ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিচ্ছে। বিরাট একটি দালানের সেট পড়েছিল। একপাশে মোড়াতে বসে ছিলেন অনুভা ও সত্য ব্যানার্জী, দালানের একধারে একটি থামের কাছে বৃদ্ধ দাদুর রূপসজ্জায় দাঁড়িয়েছিলেন বিকাশ রায়। টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দালানের মাঝখানে উদ্দাম নৃত্য করছিলেন সবিতা চ্যাটার্জী।

বসে কিছুক্ষণ নিখরচায় নাচ দেখা গেল। যেভাবে নাচ চলছিলো তাতে আমি ভেবেছিলাম যে খানিক পরে সবিতা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে, কিন্তু কোথায় কি? শট শেষ করে দিব্যি ঠাণ্ডা কোকাকোলা হাতে নিয়ে একটা মোড়া এনে আমার পাশে বসল।

এক চুমুকে বোতলের অর্দ্ধেকটা শেষ করে বলল "নাচটা কি রকম হয়েছে?"

সিগারেট ধরিয়ে বললাম "সাংঘাতিক, ছবি রিলিজ হলে বাংলাদেশের ছেলেরা পটাপট তোমার প্রেমে পড়বে এ গ্যারাণ্টি এখনই দিয়ে দিচ্ছি।

চোখ পাকিয়ে বলল ও "কের ইয়ারকি, যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দিন।"

"বললাম তো সাংঘাতিক হয়েছে। কিন্তু ও নাচের নামটা কি?"

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত "দাদু" ছবির সেট-এ—(বাঁদিক থেকে) অনুভা ও সত্য ব্যানার্জ্জি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছেন সবিতা চ্যাটার্জির উদ্দাম নৃত্য।

"নামটা কি ছাই আমিই জানি! কিছু একটা হবে বোধহয়! বলেই কোকাকোলার বোতলটা আবার নিজের লিপষ্টিক রঞ্জিত ঠোঁট দুটোর কাছে টেনে নিল।

শ্রীকান্ত

প্রশ্নোত্তর

মিতালী ব্যানার্জি কলিকাতা।

আপনারা আবার পঠ ও পীট চিত্রকে নবরূপে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন দেখে আনন্দ লাভ করলাম। এই সঙ্গে আরও আনন্দ হল জেনে যে আপনারা পাঠক-পাঠিকাদের পত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানাতে ইচ্ছুক। এইরমক একটা বিভাগ খোলার জন্যে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার অনেক প্রশ্ন আপনাদের কাছে করবার আছে। কিন্তু সবগুলি একসঙ্গে করা ঠিক হবে না মনে করে মাত্র একটি প্রশ্নই করছি। আমার জিজ্ঞাস্য হল—অনেকদিন আগে খবরে জেনেছিলাম যে বাঙ্গালী মহিলা শ্রীমতী সোনালী দাসগুপ্তা বিখ্যাত ইতালীয়ান্ চিত্র-পরিচালক রোজালিনীকে বিবাহ করেছেন। তারপর তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। শ্রীমতী সোনালীর কোনও খবর জানেন কি? আমার জানতে ইচ্ছা হয়।

* পট ও পীঠ বিভাগের নবরূপ আপনাকে আনন্দ দিতে পেরেছে জেনে আমরাও আনন্দিত হলাম। একজনও পাঠক অথবা পাঠিকা যদি আনন্দ পেয়ে থাকেন তাহলেও বুঝব আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। সংযত ও শালীন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সব সময়েই চেষ্টা করব। সবগুলো প্রশ্ন যে এক সঙ্গে করেন নি তার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীমতী সোনালীর বর্তমান খবর আমরাও জানিনা। বিবাহের পর তিনি ইতালীতেই তাঁর স্বামীর ঘর করছেন এইটুকুই আমরা জানি। গত কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর কোন খবর আর পাওয়া যায় নি।

*　　*　　*

অশোক ঠাকুর কলিকাতা।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এমন একজন অভিনেতা আছেন যিনি এ পর্যন্ত বাংলা ছবিতে যে কয়টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন তার কোনোটিতেই ব্যর্থ হন নাই। অথচ সেই দক্ষ, শিক্ষিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্যকে এখন আর কোন ছবিতে দেখিতে পাই না কেন?

* রাধামোহনবাবুর সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন বিষয়ে আমরাও একমত। আরও আনন্দ হল এই ক জেনে যে বাংলা ছবির এখনও কিছু রুচিবান শিক্ষি দর্শক তাঁর অভিনয় দেখতে আগ্রহী। তবে কেন তাঁ বর্তমানে কোন ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় না তার উত্ত বুদ্ধিমান পরিচালক ও প্রযোজকরাই দিতে পারবেন অবশ্য বর্তমানে "আলেয়ার আলো" ছবির বিজ্ঞাপন রাধামোহনবাবুর নাম দেখা গেছে। ছবিটি মুক্তি পেলে তাঁকে আবার দেখতে পাবেন।

*　　*　　*

অনুপরঞ্জন বসু শ্রীরামপুর।

আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র। ছোট থেকেই আমার অভিনয়ের দিকে ঝোঁ ছিল। সেটা এখনও বর্তমান। এ ছাড়া চলচ্চি সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছাও আমার আছে, শুধু জানার ইচ্ছা নয় এর সংস্পর্শে আসার ইচ্ছাও আছে। আমি জানি মূলে চাই অভিনয় দক্ষতা। এসব গুণের অধিকারী এক আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে পারে। এই গুণেরপরিচয় প কতকগুলো নাটকেরমধ্যেদিয়েদর্শকদের প্রশংসারমাধ্যমে এ ছাড়া চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্যে কি কি গুণ থা আবশ্যক তাহা জানাবেন। যে সব চলচ্চিত্র এখন প্রযোজক ও পরিচালকদের পরিকল্পনাধীন তা এবং সকল ব্যক্তিদের বাড়ীর ঠিকানা দয়া করে জানাবেন।

* আমাদের দেশে ভাল বিজ্ঞানীর ভয়ানক অভাব দেশের আজ প্রয়োজন সত্যিকারের ভাল বিজ্ঞানীর চলচ্চিত্রে অভিনয় করার ঝোঁক ছেড়ে বিজ্ঞানের সাধনা মন দিন। কে জানে হয়ত আপনার মধ্যেই একা আইনষ্টাইন অথবা মেঘনাদ সাহা লুকিয়ে আছেন কি ন প্রযোজক ও পরিচালকদের পরিকল্পনা আমরা আগে হ কি করে জানতে পারব বলুন, কারণ আমাদের স পরামর্শ করে তাঁরা তো আর পরিকল্পনা করেন ন চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্য তা আমরা বলতে অক্ষম।

*　　*　　*

—

সাহিত্য সংবাদ

াদ প্রসঙ্গ : দয়ালচন্দ্র ঘোষ বিরচিত ও প্রমথ নাথ রী সম্পাদিত।

আলোচ্য পুস্তকটি ভক্তসন্তান দয়ালচন্দ্র ঘোষ একশ' আগে বহু পরিশ্রম করে প্রকাশ করেছিলেন। মা ভক্ত সন্তানকে দিয়ে যখন কোন কাজ করান তা ক পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা করেই ন। দুরূহ কাজ শক্ত হাতে সফল হয়। নইলে লুপ্ত-প্রসাদ-সঙ্গীতগুলোকে আজ আমরা অনায়াসে র কাছে পেতাম কি করে? দয়ালবাবুর সার্থক শ্রমের কথা পুস্তকটির মধ্যেই লেখা আছে। আজকাল প্রসাদের যে সব রচনাবলী দেখতে পাওয়া যায় তার র ভাগই অপ্রামাণিক কিন্তু আলোচ্য পুস্তকটির র পংক্তিগুলোর ধরণ স্বতন্ত্র। যে ভাবে বহু পূর্বে গুলো সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে মনে হয় প্রসাদ কবির ভাবধারার ওপরই ওগুলো সন্নিবেশিত। তাছাড়া টির মধ্যে রামপ্রসাদের যে জীবনী দেওয়া আছে প্রামাণিক বলেই আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকটির সব ত আকর্ষণীয় বিষয় হল রামপ্রসাদ ও তদীয় সহধর্মীণীর ই চিত্র। চিত্রটির শিল্পী নাকি রামপ্রসাদকে ছিলেন এবং শিল্পী যথার্থ রামপ্রসাদের প্রতিরূপ র তুলেছিলেন বলে প্রকাশ। পুস্তকটি অনুসন্ধিৎসু ও কদের বিশেষ কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস রাখি। া' বছর পরে দয়াল ঘোষের বইটি বহু পরিশ্রম করে, হকারে ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পুনরায় প্রকাশ র জন্যে প্রথমনাথ চৌধুরী অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার য। সাংবাদিকতার কাজের চাপের আড়ালে বাবুর এই সৎ প্রচেষ্টা ও বিক্রয় লব্ধ অর্থ রামপ্রসাদ র পীঠের কালী মাতার সেবায় উৎসর্গের ঘোষণা ল যাবে না বলেই বিশ্বাস রাখি।

জয়শ্রী চক্রবর্তী

e Eternal Quest—(ইংরাজী ভাষায় রচিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থ):

রচয়িতা—সুধীর গুপ্ত

কাশক: শ্রীকালিকানাথ চৌধুরী, ৮বি, মহেশচৌধুরী লেন, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৩ টাকা]

কবি, অধ্যাপক শ্রীসুধীর গুপ্ত এ পর্যন্ত অজস্রগীতি-কবিতা রচনার দ্বারা সেবা করেছেন বংগভারতীর। তাঁর এই অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে তাঁর মৌলিক ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ The Eternal Quest প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রয়েছে ৬১টি গীতি-কবিতা। এর মধ্যে ৪৫টি কবিতা এদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যসম্ভারে বর্ণিত হয়েছে মানবের চিরন্তন অনুসন্ধানের বিষয়। এই কারণেই জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা মানব-জীবন চর্যার নানা বিষয় কবিতাসমূহে লীলায়িত হয়ে উঠেছে অভিনব ভাষায়। আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই ইংরাজী-ভাষাতেও কবির আশ্চর্যজনক অধিকার লক্ষ্য করে। একসময়ের বাঙলাদেশে কাশীপ্রসাদ, শ্রীমধুসূদন, তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ কবিগণ—প্রদর্শন করেছিলেন অসামান্য কৃতিত্ব। তখন ছিল ইংরাজ রাজত্ব, ইংরাজী ভাষারও ছিল প্রভূত চর্চা। বর্তমানে ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব নেই বটে, কিন্তু ইংরাজীভাষার রয়েছে একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। এজন্যে, বাঙালী কবি যদি ইংরাজীতে কাব্য চর্চা করেন তা দোষাবহ তো নয়ই, অধিকন্তু তাঁর বিচিত্র প্রতিভার পরিচায়ক। আলোচ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে সেই স্বচ্ছন্দ কবিত্ব শক্তির, অনায়াস ভাষা ও সাবলীল ছন্দ প্রয়োগের পারিপাট্য দেখে কাব্যামোদী পাঠকমাত্রই আনন্দবোধ করবেন আশা করি, কবিকেও করবেন অভিনন্দিত। সারল্য, স্নিগ্ধতা, অনন্তজীবন জিজ্ঞাসা, মানবপ্রীতি ও ভগবদ্ প্রেরণা প্রভৃতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে কবিতার ছত্রে ছত্রে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিগূঢ় জীবন-বোধকে আবিষ্কার কোরে, নিখিল মানব একই জিজ্ঞাসা ও একই অনুসন্ধানের পথে চলেছে তাই কবি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সংগে অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আমরা ঐকান্তিকভাবে কামনা করি গ্রন্থখানার বহুল প্রচার।

কুমারেশ ভট্টাচার্য

[প্রাপ্তিস্থান—মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০, বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা—শ্রীগৌরী গুপ্ত। মূল্য ৩ টাকা]

বাণী-বন্দনা :

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সর্বত্র নৃত্য, গীত, বাদ্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এই উপলক্ষ্যে 'বাণী-বিশ্বরূপা' নামে একখানি গীতিনাট্য প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—মহাভারতী ১১৪।৩ বিধান সরণী কলিকাতা-৪।

বই খানিতে সরস্বতী পূজার ইতিহাস ও তাহার সঙ্গে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে দেবীর বহু বন্দনা দেওয়া হইয়াছে, অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিতি ও অধ্যাপিকা ডঃ উমা রায় বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

বইখানি ইতি পূর্ব্বেই নানা স্থানে অভিনীত হইয়াছে। সন্তোষবাবু পণ্ডিতব্যক্তি। তাঁহার এই পুস্তক দেশের জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইবে আশা করা যায়।

সরস্বতী পূজার এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজন ছিল।

মন্ত্র যোগে পুরুষোত্তম লাভ গীতা
জনক অশ্বপতি সাধক : **শ্রীমদ্ ভৈরবানন্দ পরমহংসজী**

গ্রন্থলেখক শ্রীমদ্ ভৈরবানন্দ তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংসজী ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ। নির্বিকল্প সমাধি-লাভের পর আরও ছয় মাসে পারমহংস্য ও তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে তিনি দৈবাদিষ্ট হলেন—তুমি এইবার নিজের নামে পুস্তক আকারে বেদের অপৌরুষেয় অংশ, জ্ঞানকাণ্ড ও সাধন-কাণ্ড, সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড, স্থূল ব্রহ্মাণ্ড ও মানব-শরীর ব্রহ্মাণ্ড যে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত, তাহা প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত রহস্য যুক্ত প্রমাণ সহ যোগের অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, শিবসংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা, দত্তাত্রেয় সংহিতা ও পূর্ণানন্দ গিরির ষট্ চক্র অবলম্বনে, এবং মোক্ষলাভ করিতে হইলে যে সাতটি সাধন অপরিহার্য ভাবে দরকারী ও অধুনা-লুপ্ত শিব-বিদ্যা সাধনটি—এই সব সাধনগুলি তুমি যে ভাবে সাং করিয়াছ, সেই ভাবে মন্ত্র যোগ-পথের সাধনোপযো করিয়া প্রকাশ কর।" এরই ফলস্বরূপ ভ্রান্ত, পথভ্র পথানুসন্ধায়ী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী ও ভক্ত ভারতবাসীর সাম প্রকাশ পেল লুপ্তপ্রায় যোগবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, একল সাধনের অভ্রান্ত বিধান। উপযুক্ত গুরু বা পথপ্রদর্শকে অভাবে যাঁরা পথ খুঁজে বেড়'চ্ছেন তাঁদের জন্যে পরমহংস নূতন আশার আলোক বিস্তার করেছেন—যে সাধ জগৎগুরু শিব 'শিব' হয়েছেন। যে-সাধনে তিনি নি করেছেন, ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করে প্রকাশ করেছেন।

ধর্ম অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি কি সম্ভব তার গুহ্য তত্ত্ব এ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। স সম্প্রদায়ের সাধক গৃহীর পক্ষে যে সকল মন্ত্র,—বী মন্ত্র, ধ্যান মন্ত্র ও প্রণাম মন্ত্র নিত্য প্রয়োজনীয় সে সমস্ত এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। গ্রহগণের শান্তি প্রক্রিয়া দ্বা কিসে আধি-ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায় তার রহস্য এ গ্রন্থে ভেদ করা হয়েছে। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ থে মহা সমাধি লাভ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল সাধন-প্রণা ইহাতে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমূ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরমহংসজীর একজন কৃপাপ্রাপ্ত সাধ তাঁর রচিত পরিচ্ছেদেও পরমহংসজীর সাধন-জীবনের বি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ধর্মপিপাসু মাত্রেই যে এই গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হবে ও পাঠে পরম উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। আ এ-গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি।

স্বর্ণকমল ভট্টাচা

[প্রকাশক শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৮।৪৮ ফার্ণ রোড কলিকাতা ১৯, প্রধান পরিবেশক—মহেশ লাইব্রেরী কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী
প্রণীত

কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গ্রন্থের টীকা, টিপ্পনী,
সমালোচনা ও বিশ্লেষণ।

[বি]ষয়সূচী—কৃষ্ণকান্তের উইলের নামকরণ—সম-[স]াময়িক সমাজ—প্রধান ও অপ্রধান পুরুষ ও [ন]ারী চরিত্র—কৃষ্ণকান্তের উইলে মনস্তত্ত্ব—[অ]ভিমান—বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন—কৃষ্ণকান্তের উইলে ব্যঙ্গচিত্র ও উহার ভাষা।

ইহা ব্যতীত আরও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৮৮।

দাম—দুই টাকা

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস

ছিন্নবাধা

সর্ব বাধা-বন্ধহীন একটি সৃষ্টিশীল আত্মসন্ধানী সাধারণ মানুষের পথ-চলার কাহিনী।

পঙ্কে তার উদ্ভব—পঙ্কিল পরিবেশেই তার পুষ্টি। কিন্তু তার অন্তরের সৃষ্টির প্রেরণা তাকে সকল প্রলোভন—সকল প্ররোচনা এবং সকল জটিলতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে স্থান দিয়ে তার শাশ্বত মানবাত্মার অভিব্যক্তিকে সহজ করে দিয়েছে।

একটি বলিষ্ঠ মানুষের সংঘাতময় বাস্তব জীবন-কথা।

সুন্দর প্রচ্ছদ-শোভিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দাম—৭·৫০

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

অপরাধ-বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত
পঞ্চম সংস্করণ। দাম—৮৲

[অপ]রাধ, অপরাধ-রোগী, অপরাধ-প্রবণতা, স্বভাব-অপরাধী, অপরাধ-বিভাগ, অপরাধ-চিকিৎসা, অপরাধ-সাহিত্য, খেউড় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

[অপ]রাধ-পদ্ধতি, বোগাস ম্যারেজ ট্রিকস্, ধর্মের পোশাকে [প্র]বঞ্চনা, ঠগী ভিখারী, মিথ্যা বিজ্ঞাপন, পকেটমার, গৃহ-চোর, রেলওয়ে ও ডাকঘরের অপরাধ, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ড। দাম—৫৲

[যৌ]নজ অপরাধ, যৌন-বোধ, প্রেম-বোধ, মিশ্র-প্রেম, প্রেম-[র]োগ, পরা বিদ্যা, ব্যভিচার, শ্লীলতাহানি, নারী-হরণ, ভ্রূণ-[হত]্যা, যৌনজ প্রবঞ্চনা, নারী-নির্যাতন, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ড। দাম—৪৲

[অ]নৈতিক অপরাধ, মিথ্যাচরণ, পেশাগত অপরাধ, চুকলামি, [চ]াটুকারিতা, উকীলকৃত অপরাধ, তেজারতি সংক্রান্ত অপরাধ ইত্যাদি।

পঞ্চম খণ্ড। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। দাম—৬

অশ্লীলতা, আত্মহত্যা, অকারণ মনোবিকার, দাঙ্গাহাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, গুণ্ডামী, দ্যূতক্রীড়া, জালিয়াতি, হত্যা বা খুন, রাজনৈতিক হত্যা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ খণ্ড। দাম—৫৲

অপরাধ-নির্ণয়, অকুস্থল গমন ও পরিদর্শন, অপতদন্ত, গ্রেপ্তার, ওয়াচ ও ট্যাপিঙ, থানা-তল্লাসী, বিবৃতি-গ্রহণ, প্রমাণ সংগ্রহ, পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ন, পদ্ধতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

সপ্তম খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

রোমহর্ষক ডাকাতি, বেনামা পত্র লিখন, অপহরণ, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধের বিজ্ঞান-সম্মত তদন্ত পদ্ধতি।

অষ্টম খণ্ড। দাম—৪৲

সাধারণ, স্বাভাবিক ও অসাধারণ উপায়ে অপরাধ নিবারণের বিভিন্নপ্রকার অভিনব উপায় সম্বন্ধে আলোচনাই এই খণ্ডের বিষয়বস্তু। তাছাড়া নিয়োগপ্রথা, জনবিক্ষোভ, পাহারা ও টহলের কার্য, আরক্ষবাহিনী এবং স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির ইতি-হাস সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে গবেষণা করা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

চৈত্র—১৩৭৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

জন্মান্তরবাদের প্রাচীনতা

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ, এম্‌, এ, পি, আর, এস্‌

ভারতে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসমূহে সর্ব্বত্র জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যেভাবে জন্ম-মৃত্যুর পৌনঃপুনিকতার কথা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মেও ঠিক তেমনি জন্মমৃত্যুর পৌনঃপুনিকতার স্বীকৃতিই দেখা যায়। প্রাচীনতম বেদগ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতে যতগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোথাও সাক্ষাদ্‌ভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাবে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

সাধারণতঃ ঋগ্বেদকেই প্রাচীনতম বেদ বলিয়া স্বীকার করা হয় বটে; কিন্তু এই অভিমতটি ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ বেদগুলির মধ্যে অথর্ব্ববেদই যে প্রাচীনতম, অথর্ব্ববেদের ভাষা, বিভিন্ন বেদে অথর্ব্ববেদ-প্রবক্তা অথর্ব্বা ও আঙ্গিরস মুনিদের উল্লেখ, ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে অথর্ব্বা ঋষির বর্ণনা, ঋগ্বেদের মন্ত্রে অথর্ব্বা ও আঙ্গিরসদিগকে প্রথম যজ্ঞাগ্নির প্রবর্ত্তনকারীরূপে উল্লেখ, অথর্ব্বা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং অন্যান্য নানা হেতু হইতে তাহা নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে করিয়াছি। এই প্রাচীনতম অথর্ব্ববেদের বিভিন্ন মন্ত্র হইতে জানা যায়, সেই যুগেও জন্মান্তর সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ভারতীয় ঋষিগণের মধ্যে বিরাজিত ছিল। অথর্ব্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (অনুবাদ ৪, মন্ত্র ৭৮—৮০) নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি দেখা যায়—

"স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবীষদ্ভ্যঃ।
স্বধা পিতৃভ্যোঽন্তরিক্ষসদ্ভ্যঃ।
স্বধা পিতৃভ্যো দিবিষদ্ভ্যঃ।"

মৃত্যুর পর কেহ কেহ এই পৃথিবীতেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; কেহ অন্তরিক্ষলোকে গ্রহতারাদিরূপে, কেহ বা স্বর্গলোকে দেবতাদিরূপে জন্মিয়া থাকে—এইরূপ বিশ্বাসই উল্লিখিত মন্ত্র তিনটিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত এই অষ্টাদশ কাণ্ডেরই অন্য দুইটি মন্ত্রে আরও স্পষ্টভাষায় উল্লিখিত বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা যায়।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে—মহর্ষি বামদেব পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন জন্মে মনু, সূর্য্য, কক্ষীবান ঋষি, কুৎস ঋষি এবং উশনারূপে দেহধারণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্র যথা—

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জ্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা বা॥"
—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।২৬।১

উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় মহামতি সায়ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জাতিস্মর ঋষি বামদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মসমূহের কথা উল্লিখিত প্রকারে বলিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের ১০।১৫।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"যে সকল পিতৃলোক পূর্ব্বে অথবা পরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীতে আছেন, অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান্ লোকদের মধ্যে আছেন, তাঁহাদের সকলকে অদ্য এই নমস্কার করিলাম।" উক্ত মন্ত্রটি যথা—

"ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য
যে পূর্ব্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা
যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু॥"

এই মন্ত্রে স্পষ্টই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে মৃত্যুর পর মানুষ কর্ম্মানুযায়ী গতিলাভ করে। কেহ পুণ্যবলে দেবত্বপ্রাপ্ত হয়, কেহ মনুষ্যলোকেই পুনরায় জন্মে, এবং কেহ বা রাক্ষস, পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ঋগ্বেদের ১০।১৬।৩ মন্ত্রটি মৃত ব্যক্তির দাহকার্য্যের সময় উচ্চারণ করা হইত। ইহাতে মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে তাঁহার চক্ষুঃ যেন সূর্য্যলোকে গমন করে এবং তাঁহার আত্মা যেন আপাততঃ বায়ুমণ্ডল আশ্রয় করিয়া থাকে। অতঃপর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের পর যেন তিনি সূক্ষ্মদেহে নিজ কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গাদিলোকে গমন করেন, অথবা পুনরায় পৃথিবীতে জন্মেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অথবা তাঁহার জীবদ্দশায় কৃত কর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট হইলে জলচর প্রাণীরূপে অথবা উদ্ভিদ্‌রূপেও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এই মন্ত্রটিতেও জন্মান্তরবাদের পরিষ্কার স্বীকৃতিই দেখা যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য সম্পূর্ণ মন্ত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা
দ্যাঞ্চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধর্ম্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিত—
মোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ॥" (১০।১৬।৩)

যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—যাঁহারা শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বেদোক্ত বিধানে যজ্ঞাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর উন্নততর সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ ক্রমে ক্রমে অমরত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, আর যাঁহারা শাস্ত্রার্থ জানেন না এবং বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াও করেন না, তাঁহারা মৃত্যুর পর পুনরায় সাধারণ লোকের গৃহেই জন্ম লাভ করত ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন।

"তে য এবমেতদ্ বিদুঃ। যে বৈতৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে, মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি, ত এতস্যৈবান্নং পুনঃ পুনর্ভবন্তি।
(১০।৪।৩।১০)।

উক্ত শতপথ ব্রাহ্মণেই অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে—মানুষ তিনবার জন্মিয়া থাকে। একবার জন্মে মাতা-পিতা হইতে, দ্বিতীয়বার জন্মে উপনয়নকালে, এবং তৃতীয়বার জন্মে মৃত্যুর পর। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায়—

"ত্রির্হ বৈ পুরুষো জায়তে। এতন্মেব মাতুশ্চাধি পিতুশ্চাগ্রে জায়তেঽথ যং যজ্ঞ উপনয়তি স যদ্ যজতে তদ্ দ্বিতীয়ং জায়তেঽথ তত্র ম্রিয়তে যত্রৈনমগ্নাবভ্যাদধতি স যত্ততঃ সম্ভবতি তৎ তৃতীয়ং জায়তে। তস্মাৎ ত্রিঃ পুরুষো জায়ত ইত্যাহুঃ।" (১১।২।১।১)

যজুর্ব্বেদ ক্রিয়াবহুল। ইহার শ্রাদ্ধকাণ্ডে যে সকল মন্ত্র ও বিধি নিবদ্ধ আছে, তাহাদের মধ্যেও জন্মান্তরবাদের বহু ইঙ্গিত ও উল্লেখ দেখা যায়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের

একটি মন্ত্র হইতে জানা যায়—উহা পাঠ করিয়া যদি গৃহিণী শ্রাদ্ধান্তে মধ্যবর্তী পিণ্ডটি ভক্ষণ করেন, তবে পিতৃপুরুষদের মধ্য হইতে কোন একজন উক্ত গৃহিণীর গর্ভে পুত্রসন্তানরূপে প্রবেশ করেন এবং ফলে যথাকালে উক্ত গৃহিণী পুত্রবতী হন। মন্ত্রটি যথা—

"আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্
যথেহ পুরুষোঽসৎ।

—বাজসনেয়ী সংহিতা ; অধ্যায় ২, কণ্ডিকা ৩৩

শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হইয়াছে—তৃণজলৌকা (চিনে জোঁক) যেমন দেহাগ্রভাগ দ্বারা নূতন একগাছি তৃণ আশ্রয় করতঃ পশ্চাতের তৃণটি পরিত্যাগ করে, মনুষ্যাদির দেহস্থিত জীবাত্মাও তেমনি নূতন দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক পুরাতন জীর্ণ দেহটি পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষায়—

"তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেব মেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্য মাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।"

(৪।৪।৩)

মৃত্যুর পর দেহান্তর ধারণ যে সাধারণতঃ অবশ্যম্ভাবী, তাহারই ইঙ্গিত এখানে করা হইয়াছে।

সামবেদের উপনিষদ্ভাগ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ নামে বিখ্যাত। এই উপনিষদে বলা হইয়াছে—যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহারা পরবর্ত্তী জন্মে উত্তম জাতিতে, উত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী কখনও ব্রাহ্মণযোনিতে, কখনও ক্ষত্রিয়যোনিতে, কখনও বা বৈশ্যযোনিতে জন্মিয়া থাকেন। আর যাহারা কুকর্ম্ম করে, তাহাদিগকে পরবর্ত্তী জন্মে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শেষোক্ত লোকেরা কখনও কুকুররূপে, কখনও শূকররূপে, কখনও বা চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে।

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।" (৫।১০।৭)

এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই বলা হইয়াছে—যে সকল লোক জনহিতার্থে দেবালয়, হাসপাতাল, জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, মৃত্যুর পর তাঁহারা চন্দ্রলোকে উপনীত হন এবং নির্দ্দিষ্টকাল তথায় বাস করিবার পর পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রলোক হইতে কিভাবে তাঁহারা পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হন, তাহার মনোজ্ঞ বর্ণনা ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে (১০ম খণ্ডে) রহিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যে পথে চন্দ্রলোকে গিয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় সেই পথেই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমে তাঁহারা আকাশে অবতীর্ণ হন। তথা হইতে পৃথিবী পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেন এবং আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ধূমের আকার ধারণ করেন। ধূমাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারা শাদা মেঘের আকার ধারণ করতঃ ক্রমে কৃষ্ণমেঘে রূপান্তরিত হইয়া বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পতিত হন। অতঃপর ব্রীহি, যব, তিল, ডাল, সব্জী প্রভৃতিরূপে পৃথিবীদেহে জন্মগ্রহণ করেন। মানুষেরা ঐগুলি ভক্ষণ করে এবং ফলে উল্লিখিত প্রেতাত্মারা মনুষ্যদেহে শুক্রের আকার প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহারা শুক্ররূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাকালে মনুষ্যশিশুরূপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায়—

"তস্মিন্ যাবৎ-সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে। যথেদমাকাশমাকাশাদ্ বায়ুম্। বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি। মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে। অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ ভূয় এব ভবতি"—ছান্দোগ্য ৫।১০।৫—৬

হিন্দুদের কাছে বেদই সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ। বেদের পরেই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। যদিও বিভিন্ন যুগে ২০ জন স্মৃতিকার দুই ডজনেরও অধিক স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি সর্ব্ব প্রাচীন বেদানুষঙ্গী মনুসংহিতার প্রামাণ্যই অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থের চেয়ে অধিক। মনুসংহিতায় এবং অন্যান্য স্মৃতিসংহিতাগুলিতে নানাভাবে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। মনু বলেন—বেদাধ্যয়ন,

শৌচ, তপস্যা, এবং অহিংসা—এইগুলির সাধনা যিনি করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে সমর্থ হন। মনুর ভাষায়—

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্॥"

৪।১৪৮

পূর্ব্বজন্মে কিরূপ পাপ করিলে পরজন্মে মানুষ কিভাবে বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতারা দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, জন্মান্তর কাল্পনিক ব্যাপার নহে; ইহা বাস্তব সত্য।

স্মৃতিশাস্ত্রের পরেই ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদরূপেই স্বীকার করা হইয়া থাকে। ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ বাল্মীকিরচিত রামায়ণ এবং ব্যাসরচিত মহাভারতকে বুঝায়।

"ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাল্মিকিকাব্যমেব চ।"

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ; শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড—১৩৩।২৩

রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থেই দৃঢ়ভাবে জন্মান্তরের স্বীকৃতি এবং তাহার অজস্র উদাহরণ রহিয়াছে। পুরাণগুলিতে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি ও উদাহরণ আরও অধিক। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

দর্শনশাস্ত্র সমূহেও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের ৩।১৮ সূত্রে বলিয়াছেন—"সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্"। অর্থাৎ সংস্কারের সাক্ষাৎকার ঘটিলেই মানুষ তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। উক্ত সূত্রের ব্যাসভাষ্যে সংস্কারের পরিচয় এবং প্রকারভেদ সম্বন্ধেও বহু কথা বলা হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য উহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। সংস্কার দুই প্রকার—(১) স্মৃতিক্লেশহেতু বাসনারূপ এবং (২) বিপাকহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ। এইগুলি পূর্ব্বজন্মসমূহে নিষ্পাদিত হয়। যে ব্যক্তি যোগাভ্যাস সহকারে উল্লিখিত সংস্কারগুলির উপর চিত্তবৃত্তিকে স্থাপন করেন, তিনি ক্রমে পূর্ব্বজন্মের স্থান কাল ও নিমিত্ত প্রভৃতি স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় ঘটনাবলী স্মরণ করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে—মহামুনি জৈগীষব্য এইরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অসংখ্য জন্মের যাবতীয় ঘটনা স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অন্য একটি সূত্রে (২।৩৯) পতঞ্জলি বলিয়াছেন—যোগী যদি কখনও অন্যের নিকট হইতে কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ না করেন, এবং অপরের দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছাটিকে পর্য্যন্ত তাঁহার মন হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তবে ইহার ফলেও তাঁহার মনে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে (অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ)।

মহর্ষি পতঞ্জলির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শুধু জন্মান্তরসম্বন্ধীয় সত্যসংবাদ পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; মানুষ যাহাতে তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে তাহার বিভিন্ন উপায়ও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের সাধুমহাত্মগণ কর্তৃক যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতেও জন্মান্তর সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। জন্মান্তরবাদের প্রাচীনতা প্রদর্শনের জন্য ঐগুলির আবশ্যক না থাকায় তাহা আর আলোচনা করিব না।

বর্ত্তমান যুগের খ্রীষ্টানেরা যদিও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে চান না, তথাপি তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে ইহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। বাইবেলের 'ম্যাথু' গ্রন্থ হইতে জানা যায়—যীশুখ্রীষ্ট একদা সমুদ্রোপকূলে সমবেত তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেহ কেহ বলে—আপনি ও ধর্ম্মযাজক জন অভিন্ন; অন্যেরা বলে আপনি পূর্ব্বজন্মে এলিয়াস ছিলেন। কিছু লোকে বলে—আপনি পূর্ব্বজন্মে জেরেমিয়াস্ বা অন্য কোন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন।"

[When Jesus came into the coast of Caesarea Phillippe he asked his disciples, saying "Whom do men say that I the son of man am?"

And they said:—Some say that thou art Jahn the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets.—Matthew 16/13—14.]

এতদ্ব্যতীত বাইবেলের অন্যান্য স্থানেও জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি আছে।

বর্ত্তমান যুগের মুসলমানেরা যদিও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস

করেন না, তথাপি তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ কোরাণের অন্ততঃ একটী স্থানে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি দেখা যায়। উক্ত স্থানে বলা হইয়াছে—"আল্লা প্রাণীদিগকে সৃষ্টি করিয়া পুনঃ পুনঃ জীবলোকে প্রেরণ করেন।"

[God generates beings and sends them back over and over again till they return to Him.

Al Quran xxx. xl.]

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী বিগত শতাব্দীতে ৺কাশীধামে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর জ্ঞানে পূজিত হইতেন। কথিত আছে—এই মহাপুরুষ ২৮০ বৎসর জীবনধারণ করেন এবং ১৫০ বৎসরকাল একমাত্র ৺কাশীধামেই বাস করেন। ইনি বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই মহাত্মার জীবনী পাঠে জানা যায়—ইনি যে কেবল নিজের বিভিন্ন পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এমন নহে, ইহার বহু শিষ্যকেও তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ নির্ভুলভাবে বলিয়া দিতেন।

স্বামী ৺অভেদানন্দ তাঁহার 'পুনর্জ্জন্মবাদ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৬৩) লিখিয়াছেন—"একটি ৬ বৎসরের বালিকাকে আমি দেখিয়াছি। সে অতি সুন্দররূপে ও আশ্চর্য্যভাবে পিয়ানো যন্ত্র বাজাইত এবং যে কোন গৎ একবার মাত্র শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা হুবহু বাজাইতে পারিত। আমার মনে হয়, সে পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই পিয়ানো ভাল করিয়া বাজাইতে পারিত।"

প্রায় প্রতি বৎসরই সংবাদপত্রে এমন ২।১ টি সংবাদ প্রকাশিত হয় যাহা হইতে ভারতে বা অন্য কোন দেশে একটি বালক বা বালিকার পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এইরূপ শত শত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগের প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালেই মানুষের মধ্যে জন্মান্তরের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় বিশ্বাস বিদ্যমান আছে এবং এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবার মত প্রমাণও মানুষ যুগে যুগে পাইয়া আসিতেছে।

শিবমস্তু।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দশ

শেষে আরতি হ'ল যথাবিধি। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে স্তব করল।

কৃষ্ণগেহে স্থিতা রাধা রাধগেহে স্থিতো হরিঃ
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥
কৃষ্ণচিত্তাস্থিতা রাধা রাধাচিত্তস্থিতো হরিঃ।
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥
নীলাম্বরধরা রাধা পীতাম্বরধরো হরিঃ।
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বরঃ।
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥

আরতির শেষে সকলে ফিরে এসে একে একে মাকে প্রণাম ক'রে বসল মাটিতে। মা অসিতের দিকে চেয়ে হেসে বললেন: "বলি নি বাবা, যে, তুমি এখন বুঝবে?"

প্রেমল। কিন্তু ও বুঝছে কই মা? নিজের কানে শুনে তবু যে মাথা নাড়ে—শুনেছি, না কানের ভুল ··

মা। আহা, সংশয় এম্‌নি ক'রেই কাটে। এক একটা ঢেউ আসে আর সংসারের বাঁধনে ঘা দিয়ে জখম ক'রে যায়। দেখ 'নি—নদীতে কী হয় যখন বর্ষায় জল বাড়ে? তীরে এসে লাগে ঢেউ বার বার—মনে হয় তীর সমানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আসলে ভিতরে ভিতরে জখম হ'তে থাকে, শেষটা একদিন প্রকাণ্ড এক চাঙাড়া মাটি ভেঙে ধ্ব'সে পড়ে—অম্‌নি যেখানে ছিল জমি, হ'য়ে যায় নদীর সঙ্গে একাকার।

অসিত। কিন্তু···ঠাকুর কি সত্যিই এ-যুগেও আসেন সাধকদের গানের সঙ্গে নূপুরে তাল দিতে? কিছু মনে করবেন না মা, এসব গল্প কথা শুনেছি অনেক, পড়েছিও যথেষ্ট, কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় কি না—

মা। কেন যাবে না বাবা? নরলীলা মানে কী তাহ'লে? শুধু একটা কথা? বলছিলাম না—তিনি নানারূপে আসেন নানা লীলা পোষ্টাই করতে? শোনো, আম রই একটা চোখে দেখা ব্যাপার। আমি সে সময়ে বিশ্বাস করতাম না যে, গণেশ ঠাকুরও জীবন্ত হ'য়ে দেখা দেন। একদিন রাতে হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার, সুড় সুড়িতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কি—ওমা শিশু গণেশ —কী যে সুন্দর! আহা, আলোঘন তনু বাবা, সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে, অমন উদ্ভট মূর্তি এত সুন্দর হয়···মনে হয় যেন সুষমার নির্যাসে গড়া···এ হেন গণেশ ঠাকুর খেলা করছেন আমার ঘাড়ে তাঁর শুঁড় বুলিয়ে সুড়, সুড়ি দিয়ে! এরই পরে আমি গণেশ ঠাকুরের ঐ মূর্তিটি আনিয়ে ঐ কুলুঙ্গিতে রেখেছি। রোজ তাঁর পায়ে ফুল চন্দন দিয়ে প্রণাম করি বাবা। তিনি এসেছিলেন আমার এক সংকটের দুর্লগ্নে—সংকট কাটাতে। সংকট মানে —সাধনার বিঘ্ন। তাঁর এক নাম বিঘ্নহন্তা, আর এক নাম সিদ্ধিদাতা, জানো তো! ঠাকুর এই রূপেও যখন আসেন ভক্তের ঘাড়ে সুড় সুড়ি দিতে, তখন কৃষ্ণ হ'য়ে নাচতে আসবেন না কেন? (থেমে) বাবা, এ সবই জীবন্ত সত্য —বহু সাধক দেখে এসেছেন আবহমানকাল। কিন্তু তাঁরা তো নাম সই রেখে যান নি সে-ইতিহাসে—আর লিখে রেখে গেলেও কি ছাই তোমরা বিশ্বাস করতে—যখন স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করতে এত বেগ পাচ্ছ?

অসিত। কিন্তু মানুষের যে চোখের ভুল হয় এও তো সত্যি মা। কল্পনাও তো করেন অনেকে? মানে, Subjective—

মা। মানি। কিন্তু প্রেমল ঠিকই বলে অনেক বাজে ওষুধে অসুখ সারে না ব'লে তো বলা যায় না ভালো ওষুধ নেই যাতে বহু রুগীর সংকট অসুখও সেরেছে বার বার? তাছাড়া বাইরের প্রমাণও মেলে—যাকে তোমাদের বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যার নাম দেন Objective proof. শোনো একটা দৃষ্টান্ত দেই—আমারই, স্বচক্ষে দেখা—চোখের ভুল বলারও পথ নেই। ঐ যে দেখছ কুলুঙ্গিতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন মাটির বালগোপাল না? ওঁকে আমি এম্‌নিই ওখানে রেখেছিলাম কিন্তু রোজ ফুল দিতাম না। মানে, রীতিম'ত পুজো করতাম না। একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওঁর কান্নায়। জেগে উঠে শুনি—ঠাকুর বলছেন: "তুমি দিব্যি লেপ মুড়ি দিয়ে আরাম ক'রে ঘুমচ্ছ। কিন্তু আমি ঘুমই কি ক'রে বলো তো? আমার সারা গায়ে পিঁপড়ে উঠছে যে!" আমি ধত্‌মড়্‌ ক'রে, উঠে কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে দেখি—ওমা! সত্যিই তো! হয়েছিল কি পাশে একটা মধুর বোতলের ছিপি আঁটা হয় নি ভালো ক'রে। ফলে পিল পিল ক'রে পিপড়ের সার উঠছে—ঠাকুরের সর্বাঙ্গে তারা ওঠা নামা করছে! আমি তখন কেঁদে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরকে বললাম: "আর কখনো এমন হবে না ঠাকুর, এ বারটি আমাকে মাপ করো।" ব'লে ঠাকুরকে ভালো ক'রে মুছে আমার বিছানায় শুইয়ে দিই। তখন ঠাকুর ঘুমন। এরকম আরো কত নরলীলার কাণ্ড দেখেছেন কত শত ভাগ্যবান্‌ ভক্ত। আমি—বৃন্দাবনের দুটি বৈষ্ণব সাধকের কথা জানি—কিন্তু সে যাক। তোমাকে আজ শুধু এইটুকু বলতে চাই বাবা—যে, তুমি আসলে সাধকই বটে —তোমার গুরু এলেই তোমাকে ডেকে নেবেন। তখন কোথায় থাকবেন তোমার খাঁ চোবে মিশ্র আলি হোমরাও চোমরাও ওস্তাদেরা কে জানে? কেবল এইটুকু জানি আমি যে, তখনও তুমি গাইবে বটে, কিন্তু ওস্তাদি গান নয় —শুধু ভজন, আর সমাজদারদের শোনাতে নয় - ঠাকুরকে শোনাতে—আর—সে শুভদিনে বহু সাধক সাধিকা সে-গানের প্রসাদ পাবেন তোমার কণ্ঠ থেকে—একথা মিলিয়ে নিও পরে যখন আমি আর এ-জগতে থাকব না—কিন্তু হয়ত ওপার থেকে শুনব কান খাড়া ক'রে—কে বলতে পারে?

ললিতা (ঝংকার দিয়ে): তোমার কী যে কথার ছিরি হয়েছে মা!—চ'লে যাব চ'লে যাব—আমার ডাক এসেছে এই সব কুডাক। এর মধ্যেই যাবে কি মা? তুমি হ'লে আশ্রমের মাথা—মাথা না থাকলে সে যে কবন্ধ হয়ে হাঁপাবে—মনে হয় না কি একবারও?

মা (হেসে): কিচ্ছু হবে না রে। দুলাল হ'য়ে দাঁড়াবে তিনটি মাথা একটার জায়গায়।

প্রেমল: আরো গাল দাও না কেন মা দশানন ব'লে?

মা: ছি ছি, তোকে কি গাল দিতে পারি বাবা! তুই না এলে কি আমি এ আশ্রম করতে সাহস পেতাম?

(অসিতকে) আমার এ ছেলেমেয়েরা সব বড় মায়াবী, বাবা! কিন্তু বৈরিাগ হ'য়ে মায়ামমত.—এ কোন্‌ দিশি কথা শুনি? আমি কে বল্‌ দেখি? কিছুই না। একটা সময়ে দেশলায়ের কাঠির মতন একটুখানি আগুনের ফুলকি জ্বেলেছিলাম। কিন্তু আগুন গনগনে হ'য়ে ওঠার পরে আর দেশলাইয়ের কাঠিকে কে পোঁছে? তুমি দেখো অসিত, ও যে কেমন আধার—সবাই বুঝবে—আমি চ'লে গেলে তবে—মিলিয়ে নিও।

প্রেমল: ফের যদি অমন করো মা—

মা (অসিতকে হেসে): কী আবদার দেখ তো ছেলের! মা কি কারুর চিরকাল থাকে না কি—না বেশিদিন পঙ্গু হয়ে বাঁচা ভালো? আমার কাজ শেষ হয়েছে—আমি জানি। কিন্তু যাক সে কথা—যা বলছিলাম। (অসিতকে) তুমি নিজেকে যা ভাবছ বাবা, তুমি তা নও নও নও—এও পরে মিলিয়ে নিও আমি চ'লে গেলে। আর একটা কথা তোমাকে আমি আজ বলতে চাই—যদিও তুমি হয়ত এখন ঠিক বুঝতে পারবে না—ভাববে—আমি ফের হেঁয়ালির সুর ধরেছি। কথাটা এই যে, তোমাকে ঠাকুরই পাঠিয়েছেন এখানে। (থেমে) সংসারে সব কিছুই ঘটে বাবা, তাঁর হাতের ঠেলায়—যদিও অন্ধ আমরা শুধু তাঁর ঠেলাটারই খবর পাই—হাতের ছোঁওয়াটা ফ'স্কে যায়। তবু তুমি একদিন দেখতে পাবেই পাবে যে, তোমার মধ্যে সত্যিকার বৈরাগ্যের ব্যাকুলতা জেগেছিল ব'লেই আমাদের 'পরে তিনি ভার দিয়েছিলেন তোমাকে রওনা ক'রে দিতে—

খেইটি ধরিয়ে দিতে—কোন্ পথে ঠাকুরকে পেয়ে তাঁর প্রেমের আলোয় নিজেকে চেনা যায়। হয়েছিল কি জানো বাবা? তুমি মগজী বুদ্ধির হাঁকডাকে বড় বেশি হকচকিয়ে গিয়েছিলে হাল আমলের বুদ্ধিমন্তদের মতন, তাই তোমাকে শোনানোর দরকার ছিল একটুখানি বাঁশির সুর—যাতে ক'রে তুমি টের পাও—সে-সুরের পাশাপাশি বুদ্ধির গলাবাজি কী রকম বেসুরো বাজে। বাবা, ঠাকুর যদি এসে দাঁড়ান আজ তোমার ঠিক সামনে—তাহ'লে তোমার বুদ্ধির পর্দায় বড় জোর তাঁর একটা আবছা ছায়া মতন পড়তে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। তাঁকে দেখা, চেনা, জানা, চাখা—এ পারে কেবল আমাদের অন্তরাত্মা। দুলাল আমাকে উপনিষদ পড়াচ্ছিল তাতেও ঐ কথাই আছে যে, আমাদের হৃদয়ই শ্রদ্ধার ভিৎ, সত্যের বনেদ, বুদ্ধি যুক্তি বিচার নয়। তুমি ওদেশ থেকে তালিম নিয়ে এসেছ মগজের—কিন্তু মগজের কর্ম নয় তাঁকে চিনতে কি অভ্যর্থনা করতে পারা। তিনি এসে বসতে চান যে কেবল অন্তরের অন্দর মহলে—মগজ—হ'ল সদরের দারোয়ান, অন্দরে ঢুঁ মারবে কেমন ক'রে? দেখ না কেন, এই যে আজ তুমি ঠাকুরের নূপুর শুনলে। কেন শুনলে এমন হঠাৎ—আথাল পাথাল ভেবেও কি কোনো কূলকিনারা পাচ্ছ? না—পেতে পারো না। কারণ মগজী বুদ্ধি দিয়ে কেউ কস্মিন্‌কালেও এ-রহস্যের তল পায় নি, না পেতে পারে না। তোমাকে আরো একটা দৃষ্টান্ত দিই শোনো—এ-ও আমার স্বচক্ষে দেখা। পওহারি বাবার নাম শুনে থাকবে হয়ত?

অসিত: স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে গুরু করতে চেয়েছিলেন?

মা: হ্যাঁ। তিনি গাজিপুরে একটি গুহায় থাকতেন। মাঝে মাঝে উঠে এসে সাধুদের ভাণ্ডারা দিতেন। আমার তখন বয়স হবে চোদ্দ পনেরো। শুনলাম একদিন সকালে উঠেই যে, আজ পওহারি বাবা ভাণ্ডারা দেবেন। মানে, সাধুদের খাবার ও কাপড়। আমি ঝোঁকালো মেয়ে, তার উপর রোখালো।

ঠিক করলাম—পওহারি বাবা কোত্থেকে এই ভাণ্ডারা দেন তার তল পেতেই হবে। কাউকে না ব'লে গুড়ুৎ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সাধুদের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। পাঁচ সাতশো সাধু ভিখিরি। এক এক ক'রে পৌঁছাচ্ছে পওহারি বাবার গুহায় আর আমি দেখছি দূর থেকে তাঁর দুটি হাত—একটি হাতে ভাঁড় ঝুলছে যার মধ্যে খাবার, অন্য হাতে একটি ঝুড়ি। পাঁচ সাতশো ভাঁড়, তার উপর পাঁচ সাতশো কাপড় তো সোজা জায়গা নেয় না! আমি শুনেছিলাম—তিনি থাকেন এক ছোট্ট গুহায়। এ কী ব্যাপার! মনে মনে মৎলব আঁটলাম। একটু একটু ক'রে এগিয়ে যেই পৌঁছেছি গুহার সামনে দেখলাম পওহারি বাবার দুটি হাত গুহা থেকে বেরিয়ে ভাঁড় ও কাপড় দোলাচ্ছে—আমাকে ডাকতে। আমি চক্ষের নিমেষে গুহায় ঢুকে পড়লাম। বাইরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু শুনছে কে?

অসিত: তারপর মা?

মা: তারপর আর কি?—চক্ষু স্থির! ছোট্ট গুহা—কোথাও কোনো মুখ নেই—শুধু এই একটি মাত্র মুখ ছাড়া। কিন্তু স্বচক্ষে দেখলাম বাবা—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—যে গুহায় কোথাও কিছুই নেই, না ভাঁড় না কাপড়!

অসিত: বলেন কি?

মা: তোমাকে বলছি। কিন্তু তুমি যদি একথা ক নো কাউকে বলো কি কাগজে লেখো লোকে কি তোমাকে বিশ্বাস করবে ভেবেছ? বলবে হয় তুমি মিথ্যুক নয় আমি। বলবেই বলবে—কেন না মগজী বুদ্ধি দিয়ে কেউ এ-অঘটনের তল পেতেই পারে না। সাধুদের এমন আরো কত বিভূতি, কত কীর্তিই দেখেছি আমি। কিন্তু এসবই গৌণ অঘটন, বাবা। সবচেয়ে বড় অঘটন হ'ল—সাধুদের আশীর্বাদে মানুষের স্বভাব বদলে যাওয়া। ঠাকুরের কৃপা তাদের মধ্যে দিয়ে এসে ঘটায় এ-অঘটন: কৃপণ হয় দাতা, লম্পট—ব্রহ্মচারী অবিশ্বাসী—ভক্তিমান্, অবোধ জ্ঞানী। এইই হ'ল সবচেয়ে বড় অঘটন। শুধু সাধনা ক'রে এ-অসম্ভব সম্ভব হয় না বাবা—যদিও আপ্রাণ সাধনাও চাইই চাই। কিন্তু সে-সাধনাও করিয়ে নেন তিনিই—সাধু বা গুরুর মধ্যে থেকে হুকুম দিয়ে, বল দিয়ে, ডাক দিয়ে। এরই নাম কৃপা। এ-কৃপাকে বুদ্ধদেব নাকচ করেছিলেন কি না

জানি না। প্রেমল তাঁর খবর রাখে—অগুন্তি কেতাব পড়েছে তাঁর সম্বন্ধে—পালিতে সংস্কৃতে ইংরিজিতে ফ্রেঞ্চে। ও জানে। কিন্তু যদি দুশো বুদ্ধও এসে এজাহার দেন যে, ঠাকুরের কৃপা ব'লে কিছুই নেই, তাহ'লে আমি হেসে কুটি কুটি হব বাবা! কারণ এ অকাট্য সত্য যে, হাজার হাজার সাধু ঠাকুরের কৃপার পরশমণির ছোঁওয়ায় সোনা হয়ে গেছেন। কিন্তু এসব তর্কাতর্কি করে মানুষ কখন? না যখন সে দেখে নি জানে নি চেনে নি ভালোবাসে নি। যখন একবার এই ভালোবাসা জাগে বাবা, দিনদুনিয়ার চেহারাই বদ্‌লে যায়। তখন কে কী বলেছে বা বলছে তা নিয়ে আর মাথা বকাতে ইচ্ছেও হয় না, দরকারও থাকে না। তখন শুধু শান্তি আর আনন্দ আর···আর বিহ্বল হ'য়ে বলা: ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর···আমি···আ···

তাঁর কথা শেষ হ'ল ভাবসমাধিতে। ওরা সবাই তাঁকে প্রণাম করে একে একে।···

এগারো

বাইরে এসে অসিত বলল প্রেমলকে: "একটু কথা আছে ভাই, তোমার সময় হবে কি?"

প্রেমল হেসে বলল: "আমি এখানে কী এমন রাজকার্যে ব্যস্ত আছি শুনি?" ব'লে ললিতাকে: "ঠাকুরের প্রসাদ এনো একটু পরে—ঘণ্টাখানেক। আমারও ওর সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

এই সময়ে প্রণবের ডাক পড়ল এক পাহাড়ী কৃষাণ হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে ঘা খেয়েছে। সে ললিতাকে নিয়ে গেল তার ডিস্পেন্সারিতে। অসিত প্রেমলকে নিয়ে গিয়ে বসালো তার শোবার ঘরে। বিছানার উপরে পাশাপাশি ব'সে অসিত একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল: "আমার ভাই মনটা একটু খারাপ হ'য়ে গেছে মা-র কথা শুনে।"

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে গলা সাফ ক'রে নিয়ে): জানি। কিন্তু উপায় কী বলো? আমাদের জীবনমরণ তো আমাদের হাতে নয় ভাই।

অসিত: মা-র ঠিক কী অসুখ?

প্রেমল: অসুখ তো অগুন্তি। কিন্তু তা নিয়ে কথা নয়। মা ইচ্ছে করলে আরো কয়েক বছর থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি কেবলই বলেন—তাঁর কাজ শেষ হয়েছে—ডাক পড়েছে। তাছাড়া (গাঢ়কণ্ঠে) মা বলেন: তাঁর সাহায্য যতদিন দরকার ছিল ততদিন ঠাকুর তাঁর হাজার অসুখেও তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এখন—মা বলেন—আমাদের কাছে ঠাকুর চান যে আমরা শুধু তাঁর ছাড়া আর কারুর 'পরেই নির্ভর না করি। তাছাড়া—প্রণব একটা কথা বলে—কিন্তু থাক সেকথা।

অসিত। না, থাকবে না, বলতেই হবে তোমাকে। মা একটা কথা ব'লে আমাকে আরো চমকে দিয়েছেন। যে, আমাকে ঠাকুরই তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন খেই ধরিয়ে দিতে।

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে)। হ্যাঁ ভাই, সত্যি কথা। আর তাই তো মা আমাদের বলেছিলেন তোমাকে এখানে ডাকতে—এখানে তোমার—চোখের ঠুলি খ'সে পড়বে ব'লে। তাই না তুমি ঠাকুরের নূপুর শুনতে পেলে। তাঁর আলোও চর্মচক্ষেই দেখতে পেতে—যদি না সংশয়কে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে।—না, শোনো। আমি তোমাকে ধম্‌কাতে চেয়ে একথা বলি নি। ব্যাসদেব বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা—তোমাকে এর আগেও বলেছি—যে, পর্যায়যোগাৎ লভতে মনুষ্যঃ—ঈশ্বর লগ্ন না এলে রাত পোহায় না। তুমি নানা সাধু সন্তর কাছে ধর্ণা দিয়ে একটু আধটু আলোর আভাষ পেয়েও সংশয়ের রাত তোমার পোহায় নি, কারণ তাঁদের শ্রদ্ধা করলেও তুমি ভালোবাসো নি—মনে যেমন ভালোবেসেছ আমাদের। তাই, সংসারে প্রেম বিনা যে শুধু নন্দলালার দেখা মেলে না তাই নয়, কোনো লালারই দেখা পাওয়া যায় না। তুমি আমাদের দেখবামাত্র ভালোবেসে ফেলেছিলে ঠাকুর উস্কে দিয়েছিলেন ব'লেই। আমরাও তোমাকে ভালোবেসেছি ঠিক ঐ একই কারণে। কিন্তু মা আরো একটু বলেছেন—যা এখন তোমাকে বলতে মানা করেছেন আমাদের পই পই ক'রে। মা বলেন—ঠাকুর অনেক কিছু আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন—যতদিন না আলোর তৃষ্ণায় আমাদের প্রাণ ডাক ছেড়ে কেঁদে না ওঠে।

অসিত। কিন্তু—না, আমি জানতে চাইছি না কী সে গোপন কথা—কেবল এইটুকু জানতে চাই যে, তাহ'লে

ঠাকুর কি সবই আগে থাকতে ছক কেটে রেখেছেন বলবে? কারণ তা যদি বলো—অর্থাৎ যদি সব কিছুই তাঁর অসংখ্য বিধান বা নিয়তি-নির্দিষ্ট হয়, তাহ'লে সাধনার জন্যে সাধকদের উঠে প'ড়ে লাগতে বলার কি কোনো মানে হয়? জীবনটা হ'য়ে দাঁড়ায় নাকি এক অদৃশ্য শক্তির খাম খেয়ালী পুতুল খেলা?

প্রেমল। ঐ দেখ, ফের তুমি সেই একই ভুল করছ—যা মগজী বুদ্ধির নাগালের বাইরে তাকে সেই বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে চাইছ। শোনো, কথাটা যখন উঠলই তখন বলি—মা-র কাছে এসে আমি যা শিখেছি। (একটু থেমে)

আমি এক সময়ে ভাবতাম যে আমি শক্তিমান বুদ্ধিমান শুভব্রত জিজ্ঞাসু—কাজেই মন দিয়ে সাধনা করলে আমার সিদ্ধি ঠেকায় কে? তোমার ঐ গানের ভাষায় বলি: "এবার জ্বালব আলো চাওয়ার দর্পে চিনতে তোমার ঠিক ঠিকানা।" কিন্তু শেষে বুঝলাম—তোমারই আর একটি গানে আছে এ-আভাস—জলে কি আলোর আলো—তুমি যদি না জ্বালো? পার কি বাসতে ভালো—তুমি না বাসলে ভালো?" তোমাকে আমি চিনেছি ভাই তোমার গানের মধ্যে দিয়েই যদিও (হেসে) মজা এই যে, তুমি নিজে চিনতে পারো নি। এও তাঁর এক লীলা—আর লীলা বলেই তাকেই মন যার তল পায় না।

যেমন ধরো, তোমাদেরই এক ঘরোয়া উপমা আছে যে, সাপের মাথায় মণি আছে কিন্তু সে নিজে শুধু তার বিষের খবর রাখে। আমারও সে সময়ে ঠিক সেই অবস্থা ছিল। ধ্যান লাগালাম—কী বিপুল ধ্যান! উপবাস, আসন, মৌনব্রত, মাধুকরী, স্বপাকে খাওয়া—কী নয়? মা দু'একবার একটু আভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হ'লেন। বেশি বললেন না। কিন্তু হায়রে, সবই যেন ভেস্তে গেল: ক্রমশঃ এমন অবস্থা হ'ল যে, আমি যত সাধনা করি ততই সাধনার অহঙ্কার আমাকে পেয়ে বসে। সবই আমি করব—আমার সাধনা, আমার সংকল্প, আমার বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা, রায়, আমার মাটিতে পা ফেলা, জলে সাঁতার কাটা, আকাশে ওড়া—সবই আমার মর্জি initiative। কাজেই তিনি—ঠাকুর—আস্তে আস্তে কাছে না পেয়ে স'রে গেলেন। শেষটায় যখন মনে হ'ল আর সইতে পারছি না, ভেঙে পড়ব—যাকে বলে touch and go—তখন হঠাৎ দেখলাম স্বর্গে উঠতে গিয়ে নিজে হাতে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে এসে পড়েছি কোন্ রসাতলে! তখন কেঁদে-কেঁটে শরণ নিলাম মার চরণে। অমনি সব কান্না হ'য়ে উঠল আনন্দ ঠিক যেন বাজিকরের হাতে অগণ্য গ্রন্থি খুলে যায় রাশিটা ধরে নাড়তেই! তখন আর হাঁক দিলাম না—সাঁতার কেটে পাথার পেরুব—বললাম মাকে চোখের জলে: "আমার সাধনার ভার তুমিই নাও মা।" মা এই ডাকটুকুরই অপেক্ষা করছিলেন: "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা হি মাতঃ"। মিলল দিশা, কিন্তু এমন পথে যার কোনো হদিশই দিতে পারেনি আমার স্বাবলম্বী শক্তি, বহুপাঠী বিদ্যা বা মগজী বুদ্ধি। কিন্তু এও এক হেঁয়ালি বটেই তো। সাধনাও চাই অথচ কৃপার কাছেও ধর্ণাও দিতে হবে! নিজের পায়ে দাঁড়াতেও হবে অথচ অসহায় হয়ে! রাধাকৃষ্ণের মিলনে শ্রীরাধার কণ্ঠে একটি সূক্ষ্ম হার ছিল—একদা সেও হয়ে উঠল বাধা! গোপীদের শেষ পাশ—কুলবালার লজ্জা—তাকেও ঠাকুর অম্লানবদনে কাটলেন বস্ত্রহরণ পর্বে! সংসারের কর্তব্য পালন না করা মহাপাপ—অথচ তাকে মেনে চললেও মিলবে না তাঁকে যাঁর বিধানে কর্তব্যকে লংঘন করা পাপ হ'য়ে দাঁড়ালো! তোমার প্রশ্নও তাই এই হেঁয়ালির থাকেই পড়ে: দৈব না পুরুষকার? হাল ধরা, না হাল ছেড়ে দেওয়া? আমি কর্মকর্তা, না স্বভাব আমাকে চোখ-বাঁধা বলদের মতন চালাচ্ছে নাকে দড়ি দিয়ে? জানো নিশ্চয়ই আমাদের ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে: "You can catch a swallow if you can put salt on its tail." পাগলামির প্রলাপ বৈ কি, কারণ পাখীকে না ধরলে তার লেজে নুন দেব কেমন ক'রে? অথচ লেজে নুন না দিলে তাকে ধরাও যাবে না! কিন্তু আসলে এ প্রলাপ নয় নয় নয়—এইখানেই ঘটে অঘটন, আর ঘটান যিনি তাঁরই নাম দৈবী কৃপা। তাঁর শরণ নিলে পাখী হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে তার লেজে তুমি নুন দিয়ে ব'সে আছ। এর অন্য নাম প্যারাডক্স। আত্মিক জগতে সবচেয়ে গভীর তত্ত্বকথার আভাষ দিয়েছেন ঋষিরা এই প্যারাডক্সের ভাষায়: তিনি বলেন অথচ বলেন না; কাছে অথচ দূরে, অণোরণীয়ান্

মহতো মহীয়ান্; সর্বধর্মের স্রষ্টা অথচ সর্বধর্ম পরিত্যাগ বিনা তাঁর শরণ নেওয়া যায় না। মগজী বুদ্ধি এর নাম দেয় "হেঁয়ালি"। দেবে না? যার গোটা দৃষ্টিটাই উপরভাসা সে অতলের খবর পাবে কেমন ক'রে? তাই সে দেখতে পায় না এই গভীর সত্যটি যে, যে-সাধক গুরুচরণে সত্যি শরণ নিয়েছে সে শরণাগতি বলতে বোঝে না তামসিক নিরুদ্যম, বোঝে—আমি এই করলেও কর্মকর্তা নই এইমাত্র। তাই অর্জুন যখন কৃষ্ণকে বললেন "আমি তোমার শরণাগত শিষ্য আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার কী কর্তব্য", তখন ঠাকুর তাকে "মামেকং শরণং ব্রজ" বলার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন—"আমাকে স্মরণ ক'রে যুদ্ধ করো আমার প্রতিনিধি হ'য়ে—হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ ক'রে।" কিন্তু এ উল্টোপাল্টামির চাবিকাঠি মগজী বুদ্ধি পাবে কেমন ক'রে? তাই শুধু তোমাকে আমাকে নয়, ভাই, প্রতি সাধককেই আত্মনিবেদনের এই পরম দীক্ষাটি পেতে হবে: সাধনার আশ্রয় নিয়ে কর্মব্রতী হ'তে হবে শরণাগতির মন্ত্রসিদ্ধিকে আয়ত্ত করতে। এ যে পাবে তারই হাতে চাঁদ এসে ধরা দেয় ভাই। যে চাঁদকে টার্গেট ক'রে লাফিয়ে ওঠে সে শুধু মুখ থুবড়ে পড়ে।"

ললিতা ডাক দিল: "এবার খেতে এসো বাপী। লেকচার জুড়িয়ে যাবে না; কিন্তু খাবার যাবে।"

[ক্রমশ:]

কুকুরের মৃত্যু

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

কাছে যাই আর যাই বহু দূর,
চির সহচর ছিলো সে কুকুর;
ঘেউ-ঘেউ তা'র—সঙ্গীত-সুর
　　　　প্রিয় ছিলো মোর কাছে।
বিদায় নিয়েছে গিয়েছে কোথায়!
কোন্ অজানার মহামোহনায়!
ব্যথিতের ব্যথা বুঝিবারে হায়
　　　　হেথায় কে আর আছে!

২

পশু ছিলো—তবু পশু বুঝি নয়;
অতল প্রীতিতে ভরা সে হৃদয়,—
যত বিরসতা করিত বিলয়,—
　　　　ছড়াতো পুলক-দ্যুতি।
শয়নের পাশে—গৃহে—অঙ্গনে
নিদ্রা—তন্দ্রা—যত জাগরণে
জীবন মিশায়ে জীবনের সনে
　　　　ঢালিত সে অনুভূতি।

৩

মানুষেরই মতো—বেশী তা'রও চেয়ে;
কতো যেন খুশী মোরে কাছে পেয়ে!
হিয়া বেয়ে বেয়ে ফেলেছিলো ছেয়ে
　　　　যেন বা বন্ধ-লতা।
বিশ্বাসে তা'র—নিরত-সেবায়,
চোখের নিবিড় [redacted]
ভরি' দিতো প্রাণ কানায় কানায়
　　　　মূক সে মুখর কথা।

৪

মরণ-উদধি প্লাবনে কখন্
এই বসুধার এত আয়োজন
তুচ্ছ করিয়া, হরিয়া জীবন
　　　　অসীমে কে কোথা লয়!
পোষা কুকুরের শব-স্মৃতি চায়
কাঁদায়—ভাবায়—কোথা নিয়ে যায়—
অজানা হইতে কোন্ অজানায়?
　　　　রহস্য মনে হয়।

৫

জীবনে জীবনে ভেদ নাহি ওরে,
সবই একাকার মৃত্যু-সাগরে;
কানে—মনে—প্রাণে কে যে বলে মোরে,—
　　　　প্রীতি দীপ জেলে দিলে
শ্বাপদে—মানবে—তরু—এ ধরায়
অনুভূত লোকে এক হ'য়ে যায়;
মৃত্যু গহন পার হ'লে হায়
　　　　গরমিলে যায় মিলে।
প্রতিটি মরণ সেই মহাপথে
　　　　নিয়ে যায় তিলে তিলে।

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডাচ বা ওলন্দাজভাষী হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ড, ডাচের প্রকারভেদ ফ্লেমিশ ব্যবহারকারী বেলজিঅম এবং একই ভাষাভাষী লুক্সেম্বুর্গ—রাষ্ট্র তিনটিকে একত্র ক'রে তিনটি রাষ্ট্রের নামের প্রথমাংশ যোগ ক'রে বেনেলুক্স নাম দিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা সক্রিয় আছে। বেলজিঅম থেকে ফরাসিভাষী ভাল্লোন্‌রা স্বতন্ত্র হয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারে কিম্বা ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। বেলজিঅমের মধ্যে ভাল্লোন্ আর ফ্লেমিংদের মতান্তর এমন যে পর্যায়ে এসেছে তাতে তারা দেশবিভাগে সম্মত হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। যদি ভাল্লোন্ বা ফরাসির এক উপভাষাভাষী বেলজীয়রা স্বতন্ত্র হয়ে যায়, সে-ক্ষেত্রে অচিরে বেনেলুক্স রাষ্ট্র গঠিত হবে। বেলজিঅম, নেদারল্যাণ্ড ও লুক্সেম্বুর্গের মধ্যে ইতিপূর্বে শুল্কবিভাগীয় ঐক্য বা Zollverein বা Customs Union সাধিত হয়েছে। অন্য নানা ব্যাপারেও এদের এক রাষ্ট্র ব'লে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই রাষ্ট্র তিনটির মিলিত হওয়ার পথে প্রধান বাধা ক্যাথলিক-প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মবিরোধ। প্রোটেষ্টাণ্ট নেদারল্যাণ্ডের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক বেলজিঅম ও লুক্সেম্বুর্গ সহজে মিলিত হতে সম্মত নয়। বেলজিঅমের ফ্লামান্দ বা ফ্লেমিশভাষী জনসাধারণের সঙ্গে লুক্সেমবুর্গের অধিবাসীদের মৈত্রী খুব নিবিড়। লুক্সেমবুর্গে ফ্লেমিশের প্রকারভেদ জার্মানভাষার জ্ঞাতি যে উপভাষা প্রচলিত তার নাম লেৎসেবুর্গেশ। ডাচ, ফ্লেমিশ ও লেৎসেবুর্গেশ—তিনটি ভাষাই পশ্চিম জার্মানিক উপশাখার নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং ইংরেজি ও জার্মানের জ্ঞাতিস্থানীয়। সুতরাং ভাষার ভিত্তিতে বেনেলুক্সকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে গঠনের কোন বাধা নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদের চার শো বছরের ধর্মবিরোধ রাজ্য তিনটিকে সম্পূর্ণ একত্র হতে এখনও দেয় নি। ঠিক এই কারণে প্রোটেষ্টাণ্ট উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ক্যাথলিক এইরে বা আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের সঙ্গে মিলিত হতে চায় না। তবে জর্মানিতে ক্যাথলিক-প্রোটেষ্টাণ্ট বিরোধ যেমন লুপ্তপ্রায়, তার প্রভাবে বেনেলুক্স অঞ্চলেও সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় প্রভেদ গুরুত্বহীন হতে চলেছে। একত্র হলে প্রায় চব্বিশ হাজার বর্গ মাইল এলাকায় দু কোটি লোকের রাষ্ট্র হবে এই ওলন্দাজ বা ডাচভাষী বেনেলুক্স বা বেনেলাক্স।

ভাল্লোন্-ফরাসিদের খাতিরে বেলজিঅমের অন্যতর রাষ্ট্রভাষা ফরাসি। বেলজিঅম এখন একটি দ্বিভাষিক রাষ্ট্র। এর জন্যে ফ্লেমিশ বা ফ্লেমিং বা ফ্লামান্দ্ জাতির লোকদের ক্রোধের অন্ত নেই। একাধিকভাষী রাষ্ট্রে দুটি স্বতন্ত্রভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে-তীব্র মতভেদ ও মনোমালিন্য দেখা যায় দুটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলেও, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ইউরোপে তার নিদর্শন বিশ্লেষণ করলে যে কোন চিন্তাশীল লোক এ-বিষয়ে একমত হবেন যে, মৈত্রী ও শুভেচ্ছার ভিত্তিতে ভারতে একভাষী একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠন সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা। ভারতে যদি একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রে রাজ্য চালানো হয়, তবে তা সম্প্রীতির সঙ্গে জনসাধারণের শুভেচ্ছার দ্বারা সাধিত হবে না, হবে বেয়োনেট ও পল্টনের জোরে। সুতরাং ঐতিহাসিক ধারায় ও প্রাকৃতিক নিয়মে হিন্দিভাষী অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রিক স্থায়িত্ব বেশি দিনের হবার কথা নয়।

বেলজিঅমের অন্তর্গত ভাল্লোন্-গরিষ্ঠ ফরাসিভাষী এলাকা আর সুইস-ফরাসি এলাকা বাদে সমস্ত ফরাসিভাষী এলাকা নিয়ে ফ্রান্স রাষ্ট্র গঠিত। কিছু স্পেনীয়, ইতালীয় ও জার্মান এলাকা ফ্রান্সের দক্ষিণে ও পূর্ব প্রান্তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা যথাক্রমে স্পেন, ইতালি ও জার্মানিকে ফিরিয়ে দিলে ফ্রান্সের গায়ে লাগবে না সুইস-ফরাসি

ও ভালোন্ অঞ্চল ফিরে পেলে।

স্পেন ও পোর্তুগাল ভাষার ভিত্তিতে ঠিক বাংলা ও আসামের মতো স্বতন্ত্র। লিখিত আকারে স্পেনীয় ও পোর্তুগিস্ ভাষাদুটির পার্থক্য তেমন কিছু নয়; কিন্তু উচ্চারণে প্রভেদ অসামান্য। যাঁরা বলেন, ভাষার ভিত্তিতে ইউরোপে রাষ্ট্র নেই, তাঁরা যে কত ভ্রান্ত, তা স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যাণ্ড, হুঙ্গারি ইত্যাদি রাষ্ট্র দেখলে বোঝা যায়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসংস্থার শ্রেষ্ঠ সমাধান হচ্ছে ভাষার ভিত্তিতে সমগ্র ইউরোপের পুনর্বিন্যাস; অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ভাষাভিত্তিক এলাকাকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত করা প্রয়োজন, কেবল পার্থক্য এই থাকবে যে, ভাষার ভিত্তিতে গঠিত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ সোভিয়েট ইউনিঅনের মতো কোন রাষ্ট্রসংঘের অধীনে বা আওতায় থাকবে না, তারা হবে প্রত্যেকে পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। পরে তারা স্বেচ্ছায় এক অখণ্ড বিশ্ব সরকারের আওতায় আসতে পারে; কিন্তু একটি স্বাধীন ভিত্তিক রাষ্ট্র আর অখণ্ড বিশ্ব সরকারের মাঝখানে কোন মধ্যবর্তী রাষ্ট্রজোট বা ইউনিঅন না থাকাই বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলজনক। একমাত্র বিশ্ব সরকারে ব্যতীত অন্য কোন শক্তিজোটে যোগ না দেওয়াই স্বাধীন ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের বরণীয় পথ। যখন বিশ্ব রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা সবাই একত্র হতে পারি, তখন মাঝখানে আবার সোভিয়েট ইউনিঅন, ইউগোস্লাভিয়া, ভারতীয় ইউনিঅন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রযূথ গঠনের আবশ্যকতা কি? বিশ্ব রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বিশ্বকেন্দ্রে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ দপ্তর তিনটি অর্পণ ক'রে একভাষী ডেনমার্ক, জাপান, সোমালিয়া, নেপাল ইত্যাদি জাতীয় রাষ্ট্র পরম শান্তিতে থাকতে পারে। তাতে অনেক ভাষা-সাম্রাজ্যবাদীদের বাড়া ভাতে ছাই পড়তে পারে বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে মানবসাধারণের পরমকল্যাণ ব্যতীত কোন ক্ষতির ভয় নেই।

পুরাতন ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলি যাই বলুক, মানবজাতির কল্যাণের জন্যে সোভিয়েট ইউনিঅনের মতো কোন সংঘ বা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তা খোলা মনে চিন্তা করলে যে কোন লোক বুঝতে পারবেন। বড় বড় রাষ্ট্রজোট গঠিত হওয়ার অর্থ, বি[...] মহাশক্তিধর যুদ্ধোন্মুখ বা যুধ্যমান বড় বড় শিবিরের সৃষ্টি যা পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা জগৎকে ধ্বংসের পথে নি[...] যাবে। তার চেয়ে অনেকগুলি একভাষী ক্ষুদ্রকায় স্বত[...] রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় যাদের এক বিশ্ব সরকারের অধী[...] একত্র করা যাবে।

সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার মত[...] প্রচণ্ড সামরিক ও প্রাকৃতিক শক্তি এখন কোন রাষ্ট্রে নেই, না মার্কিন না সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের। কি[...] সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থাকে অনায়াসে বিশ্ব সরকা[...] পরিণত করা যায়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসীমাসমস্যার কেন্দ্রস্থল তথা ইউরোপের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে জার্মানি। অতঃপর জার্মানি সম্ব[...] বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন।

ভাষার ভিত্তিতে সমস্ত জার্মান-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলা[...] নিয়ে অখণ্ড জার্মানি গঠনের স্বপ্ন জার্মানরা দীর্ঘক[...] থেকে দেখে আসছে। অন্য জাতির ওপর অত্যাচ[...] করার দুষ্টবুদ্ধি না থাকলে এ-স্বপ্ন দেখায় কোন দ[...] নেই। হার্ডার থেকে হিটলার পর্যন্ত সমস্ত জার্মান নে[...] এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার সাধনা করেছে[...] জার্মানির বাইরের জগৎ থেকে এ-কাজে সবচেয়ে বে[...] সাহায্য করেছিলেন স্বয়ং নাপোলেঅন বোনাপার্তে [...] মাতৃভাষা ছিল কর্সিকান বা ইতালীয়। এই স্ব[...] বস্তুরূপ রচনায় দোষের কিছু নেই, অসঙ্গত কিছু নে[...] একে মাত্র নাৎসি পরিকল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা ইতিহাসে শোচনীয় অজ্ঞ[...] পরিচায়ক।

সোভিয়েট ইউনিঅনের অন্তর্ভুক্ত তুর্কমেনদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে তা হলে জার্মানদের ত[...] থাকার কোন কারণ নেই।

পশ্চিম জার্মানির বর্তমান সরকার চান যে, [...] সালের ৩১শে ডিসেম্বর জার্মান রাষ্ট্রের যে-সীমানা তা পুনরুদ্ধার করা হোক। এ-দাবি কার্যত স্বীকৃত [...] সুদূরতম ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। প্রথম মহা[...] আগে ইউরোপে জার্মান রাষ্ট্রের যে-ক্ষেত্রফল ছিল

কে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ২৭ হাজার বর্গ মাইল কেটে ওয়া হয়। নাৎসি আমলে হিটলার সেটা পুনরুদ্ধার রেন এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানির মিলন ঘটিয়ে সমস্ত র্মানভূমি একত্র করার কাজে যতটা এগিয়ে যান, আজ র্যন্ত আর কোন জার্মান নেতা ততটা এগোতে পারেন । কিন্তু হিটলারও সমস্ত জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ড ক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি, সেটা য় তো অনেকে খেয়াল করেন না। ১৯৪২ লে যখন হিটলারের ক্ষমতা চরমে উঠেছিল, জাপানের হযোগিতায় অক্ষশক্তির অবস্থা যখন সবচেয়ে ভালো, খনও সমস্ত জার্মান ভূখণ্ড একত্রীভূত হতে পারে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানি থেকে অষ্ট্রিয়াকে আলাদা ক'রে দেওয়া হয়। তারপর জার্মানিকে পশ্চিম ও পূর্ব—দুটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। পশ্চিম জার্মানির কাছ থেকে তার প্রতিবেশীরা যার যা খুশি কেড়ে নেয়। সে-সবের মধ্যে পশ্চিম জার্মানি এখন কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করেছে। পূর্ব জার্মানির কাছ থেকে মেমেল ও ডান জগ্ কেড়ে নেওয়া হয়। চেকোস্লোভাকিয়াকে দক্ষিণ জার্মানদের বাসভূমি বা সুডে টনলান্ট ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া ১৯৩৭ সালের জার্মানির শতকরা ২৪°৩ ভূভাগ পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিআ রাষ্ট্রদুটিকে সমর্পণ করা হয়। অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পরের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জার্মানির অবস্থা আরো শোচনীয় ক'রে দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালের ১লা জানুআরি থেকে পরবর্তী কালে যে-সব জার্মানগরিষ্ঠ এলাকা জার্মানি গণভোটের দ্বারা বা যুদ্ধ চলা কালে উদ্ধার করতে পেরেছিল সে সব কেড়ে নেওয়ার পরও ১৯৩৭ সনের যুদ্ধপূর্ব জার্মানির যে ২৪·৩% ভূভাগ রুশ কর্তৃপক্ষের হাতে গেছে তা বিনা যুদ্ধে ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা এখন নেই। কিন্তু যদি ঐ শতকরা ২৪°৩ ভাগ এলাকা ফিরে এসে পূর্ব জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হত, পশ্চিম ও পূর্ব দুই জার্মানি মিলিত হত, এমন-কি অষ্ট্রিয়াও যদি মিলিত জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হত, তা হলেও সমস্ত জার্মানভাষী এলাকা একত্র হত না। চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স ও ইতালির কাছে তখনও বহু জার্মান এলাকা প'ড়ে থাকত। বস্তুত সমস্ত জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ পরস্পর সন্নিহিত এলাকার আবার একত্র হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তা হওয়া উচিত। না হলে এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভিন্ন তা সম্ভবপর নয়।

জার্মান সমস্যা সমাধানের অক্ষমতাই ইউরোপে দুটি মহাযুদ্ধের কারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানি থেকে অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জার্মানিকে দুই খণ্ড ক'রে সেই দুই খণ্ড থেকে আরও প্রায় ৫৩ হাজার বর্গ মাইল এলাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ১৯৩৮-৪৫ সালে হিটলার অষ্ট্রিয়া বাদে আরো যে-সব জার্মান এলাকা অধিকার করেন, সে-সবই কেড়ে নেওয়া হয়। এর কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া জার্মানদের মনে হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

বর্তমানে সমস্ত জার্মানভাষী এলাকা একত্র করতে হলে মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে বৈপ্লবিক সীমান্তসংস্কার প্রয়োজন হবে, তা সে শান্তিপূর্ণ উপায়ে হোক বা প্রচণ্ড যুদ্ধ ও বিপ্লবের মারফতে হোক।

জার্মান সমস্যা সমাধানে চারটি বৃহৎ শক্তি আমেরিকা, রুশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দীর্ঘ তেইশ বছরে (১৯৪৫-৬৮) এ-সমস্যার সমাধান তো হয়ই নি, সমাধানের কোন ইচ্ছা যে বৃহৎ চতুঃশক্তির আছে, তাও তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় না।

এর কারণ কি হতে পারে তা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একে তো জার্মানির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিশোধগ্রহণস্পৃহা চারটি বড় শক্তির মনেই কাজ করছে, তার ওপর অখণ্ড জার্মানি গঠিত হলে তার শক্তি এত বেশি হবার সম্ভাবনা যে, তার সঙ্গে আকারে অনেক বড় হয়েও আমেরিকা বা রুশিয়ার বিশেষত রুশিয়ার পেরে ওঠার সামর্থ্য না থাকতেও পারে, এই আশঙ্কা বড় শক্তিগুলির মনে বিদ্যমান। রুশদের মধ্যে স্তালিন-মালেনকফ-কোসিগিন প্রভৃতির তুলনায় অনেকটা উদারপন্থী যে ক্রুশ্চভ, তিনিও বলেছিলেন যে, যুদ্ধের দ্বারা সীমারেখার যে-পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আবার যুদ্ধ ভিন্ন তার পরিবর্তন অসম্ভব। রুশরা আর সব জাতি ও ভাষাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিতে চাইলেও জার্মানদের তা দিতে চায় না এই জন্যে যে, অখণ্ড জার্মানির সঙ্গে একক

যুদ্ধে পেরে-ওঠা খুবই শক্ত ব্যাপার। বাইরে থেকে আস্ফালনবাক্য শুনে যাই মনে হোক, রুশ বা মার্কিন কোন পক্ষই আর একটা বড় যুদ্ধে জার্মানির সম্মুখীন হতে উৎসাহী নয়।

জার্মানিকে অখণ্ডতা দিতে হলে প্রথমে দুই জার্মানিকে একত্র করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটাই একীকরণের পথে প্রথম এবং প্রধান ধাপ। অবশ্য অন্য ঘোরা পথও আছে। কিন্তু সোজা পথ এটাই যে, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি, একত্র হবে এবং বন্ ও পান্‌কাউএর বদলে মিলিত বার্লিনে জার্মানির রাজধানী স্থানান্তরিত হবে। দুই জার্মানির একীকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে এই তিন শক্তি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদে প্রস্তুত নয়। জার্মানি বর্তমান অবস্থায় মিলিত হলে যে শতকরা ২৪'৩ পরিমাণ ভূভাগ পুনরুদ্ধারের জন্যে হিটলার-বর্ণিত Drang nach osten বা পূর্বদিকে সম্প্রসারণের নীতি অনিবার্যভাবে পুনর্গ্রহণ করবে তা বুঝতে বেশি গবেষণার দরকার নেই। তাতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের লাভ হলেও রুশরা স্বভাবতই অসম্মত। রুশদের ইচ্ছা, দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জার্মানি ভিন্ন পথে চলুক। তারা যদি পারে তবে নিজেরা একত্র হোক। অন্যথায় তারা চির-পৃথক্ থাকলেই বা ক্ষতি কি?

সীমারেখা সংশোধন নিয়ে দুই জার্মানি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে কোন আবদার না তুলবার চুক্তি করলে আর কিছুদিন পরে দুই জার্মানি বর্তমান আয়তন নিয়ে একত্র হবার সুযোগ পেতে পারে। তার পরের ধাপগুলি অতিক্রম করা দুরূহ।

পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি মিলিত হবার পর অষ্ট্রিয়াকেও মিলিত জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তার পর ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবুর্গের সঙ্গে জার্মানির সীমারেখা সংশোধনের কাজটা দুরূহ নয়। ঐ চারটি রাষ্ট্র জার্মানির সঙ্গে স্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপনের পক্ষপাতী। তারা কোন জার্মানগরিষ্ঠ এলাকা গ্রাস ক'রে রাখতে চায় না। তাদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানির সীমারেখা সংশোধনের কাজ ইতিমধ্যে অনেকটা সম্পন্ন হয়েছে। বাকিটুকু অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের পর সমগ্র জার্মান জাতির অনুমোদনে সহজে সমাপ্ত হবে। প্রকৃত সমস্যা সুরু হচ্ছে এর পর। দুই জার্মানির মিলন এবং মিলিত জার্মানির সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার পুনর্মিলন নিয়ে কোন যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা নেই। কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার দ্বারা আগামী কয়েক বছরে এ-দুটি অধ্যায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু তারপর পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইন আর সুইস-জার্মান এলাকাকে। হিটলারও এ-কাজ করতে পারেন নি। তার কারণ তাঁর সামরিক শক্তির অভাব নয়। কূটনৈতিক কারণে সে-কাজ করা হয় নি।

সুইস রাষ্ট্র আসলে চারটি জনপদের সমষ্টি: জার্মান ফরাসি, ইতালীয় আর রেতো-রোমান। এদের মধ্যে জার্মান এলাকাটি বৃহত্তম এবং সুইস রাষ্ট্রে সুইস-জার্মানদের প্রাধান্য সব ক্ষেত্রে বর্তমান। এমন অবস্থায় সুইট্‌সারল্যাণ্ড থেকে সুইস-জার্মান এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ, স্বেচ্ছায় খানিকটা অ-জার্মান অঞ্চলের ওপর থেকে জার্মান প্রাধান্য অপসারিত করা। এ-কাজ কোন বুদ্ধিমান্ জার্মানের পক্ষে অসম্ভব। হিটলার এ-কাজ করতে আগ্রহ বোধ করেন নি। অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোন জার্মান নেতাও এ-কাজ সম্পন্ন করতে উৎসাহী হবেন না। তবে যদি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের উৎসাহে কখনও সুইস-ফরাসী এবং সুইস-ইতালীয় এলাকা পার্শ্ববর্তী ফ্রান্স ও ইতালির সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তা হলে সুইস-জার্মান এলাকা একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্ররূপে না থেকে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলন চাইতে পারে, কিন্তু উইলিয়ম টেল-এর গল্প যাঁরা জানেন, তাঁরা মানেন সে সম্ভাবনা কত কম। যদি কখনও সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ড বিশ্লিষ্ট হয়ে ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সুইসরা আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা ও ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করার সুযোগে যে-সমৃদ্ধি লাভ করেছে তা ছেড়ে কখনও নিজেদের রাষ্ট্র বিলোপ করবে, এমন কথা ভাবা যায় না। মুসোলিনির আমলে একমাত্র সুইস-ইতালীয় এলাকা ইতালির অন্তর্ভুক্ত করার কথা উঠেছিল। কিন্তু সুইস-ফরাসি বা সুইস-জার্মান অঞ্চলে তেমন কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি।

লিখ্‌টেন্‌স্টাইন সুইস রাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্কবিভাগীয় ঐক্য স্থাপন করেছে। পরে এই ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্রটি সুইস-জার্মান এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার বেশি সম্ভব.

এর পরে আসে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত জার্মানভাষী এলাকা বিখ্যাত আলসাস ও লোরেন ফিরে-পাওয়ার কথা। ইতিহাসের ছাত্র জানেন, গত শতাব্দীকালের মধ্যে এই প্রদেশদুটি ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কতবার হাত-বদল হয়েছে। আলসাস-লোরেন ফিরে পেতে চাইলে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত বাধবার সম্ভাবনা। ফরাসিরা যে বিনা যুদ্ধে আলসাস ও লোরেন ফিরিয়ে দেবে তা মনে হয় না।

ফ্রান্সের পর ইতালির সঙ্গেও জার্মানির সীমানা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী একটি বিরোধ আছে যা হিটলার-মুসোলিনি মৈত্রী স্থাপনের পর ধামাচাপা অবস্থায় ছিল। এ-বিরোধের মীমাংসাও খুব সহজসাধ্য হবে ব'লে মনে করা চলে না। দক্ষিণ তিরোল জার্মানভাষী-অধ্যুষিত এলাকা। মুসোলিনির সঙ্গে মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় হিটলার ইতালির উত্তরাংশে অবস্থিত এই জার্মানগরিষ্ঠ অঞ্চলটির প্রত্যর্পণ দাবি করেন নি। অবশ্য মিলিত জার্মানি শক্তিশালী হয়ে উঠলে তার প্রীতিলাভের আশায় ও তাকে না রাগাবার প্রয়োজনে ডেন্‌মার্ক, লুক্‌সেম্‌বুর্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছাড়া ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রও অনেক সুযোগ-সুবিধা দিতে চাইবে। কাজেই ফ্রান্স ও ইতালির সঙ্গেও বিশ্বযুদ্ধ না বাধিয়েই জার্মানি সীমান্ত সংশোধন করতে পারবে।

কিন্তু পূর্ব দিকে রুশিয়ার জন্য ও জার্মানবিদ্বেষ প্রবল হওয়ার জন্যে জার্মানি সহজে হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে-সব এলাকা জার্মানির অন্তর্ভুক্ত ছিল, খালি সেগুলি ফিরে পেলেই পূর্ব দিকে জার্মানি তার সমস্ত প্রাপ্য ফিরে পাবে না। প্রথমে জার্মানিকে পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে তার ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের এলাকার অপহৃত অংশ উদ্ধার করতে হবে। পিছনে সোভিয়েট ইউনিঅনের সমর্থন থাকলে পোল্যাণ্ড ১৯৩৯ সালের মতোই জার্মানিকে তার ন্যায্য প্রাপ্য সহজে মিটিয়ে দিতে সম্মত হবে না। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এ-ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে গেলেও জার্মানিকে দান্ত্‌সিক্‌ বা ডানজিগ বা গ্দান্‌স্ক ও তার সন্নিহিত জার্মানগরিষ্ঠ সমস্ত এলাকা ফিরে পেতে হবে যাতে কুখ্যাত পোলিশ করিডরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ঠিক এই জায়গাটা জার্মানি ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিরে চেয়েছিল ব'লেই তো ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং এখন কি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও ফিরে পাওয়া যাবে? অবশ্য অন্তরালবর্তী বৃহৎ শক্তির প্ররোচনা না থাকলে পোল্যাণ্ড জার্মানিকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবে।

পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের সীমারেখা বরাবর সমস্ত এলাকা, ডানজিগ ও ও পোলিশ করিডর ফেরৎ পাবার পর জার্মান বিখ্যাত প্রুসিয়া অঞ্চলের খানিকটা মাত্র পুনরুদ্ধার করতে পারল। অবশিষ্ট প্রুসীয় এলাকা, যাকে জার্মানির প্রাণবীজ বলা যায়, তখনও সোভিয়েট ইউনিঅনের দখলে থাকছে। সুতরাং জার্মানিকে ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের সীমারেখা অনুসারে সোভিয়েট ইউনিঅনের সঙ্গে সীমান্ত সংশোধন করতে হবে। যদি ঐ প্রুসীয় এলাকা পুনরুদ্ধার করা যায় তা হলে তারপর জার্মানিকে লিথুআনিআর কাছ থেকে মেমেল বন্দর পর্যন্ত সমস্ত জার্মানগরিষ্ঠ এলাকা আদায় করতে হবে। এর পরে বা অব্যবহিত পূর্বে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে সীমারেখা সংশোধন ক'রে দক্ষিণ জর্মনভূমিকে জার্মানির সঙ্গে পুনঃ সংযুক্ত করতে হবে। পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সীমারেখা সংশোধনের ব্যাপারেই বিশ্বব্যাপী তুমুল উত্তেজনা ও যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রুশিয়া ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হুঙ্গারি ও চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জকে সীমারেখা নির্ধারণের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ক'রে রেখেছে। সুতরাং অসন্তুষ্টতর জার্মানির সঙ্গে যোগ দিয়ে তারা উপযুক্ত মুহূর্তে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করার চেষ্টা করতে পারে জার্মানিকে দেয় এলাকা ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েট ইউনিঅনের কাছ থেকে হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারে জার্মানি ও তার মিত্রদের সাহায্য পেতে পারে।

সুতরাং ফিখ্‌টে-হার্ডার-বিসমার্ক-হিট্‌লারের বড় সাধের অখণ্ড জার্মানি গঠনের স্বপ্নসিদ্ধির সঙ্গে বর্তমান ইউরোপের অন্তত ১৪টি রাষ্ট্র জড়িত। জার্মান সমস্যা এত জটিল যে, কূটনৈতিক উপায়ে ধাপে ধাপে এর সমাধানের প্রয়াসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞদেরও মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবে। ঐ ১৪টি রাষ্ট্রের নাম এখানে দেওয়া হল:—

(১) পশ্চিম জার্মানি (২) পূর্ব জার্মানি (৩) অষ্ট্রিয়া (৪) সুইট্‌সারল্যাণ্ড (৫) লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইন (৬) চেকো-স্লোভাকিয়া (৭) ফ্রান্স (৮) ইতালি (৯) পোল্যাণ্ড (১০) সোভিয়েট ইউনিঅন (১১) ডেনমার্ক (১২) নেদার-ল্যাণ্ড (১৩) বেলজিঅম (১৪) লুক্‌সেম্‌বুর্গ।

এ-ছাড়া ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি-অসম্মতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে ব'লে পরোক্ষভাবে তারাও জার্মান প্রশ্নের সঙ্গে বিজড়িত থাকবে।

অখণ্ড জার্মানি গঠন করতে হলে পোল্যাণ্ড, চেকো-স্লোভাকিয়া ও ইতালি জার্মানিকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবার পর সোভিয়েট ইউনিঅন, ইউগোস্লাভিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে চাইবে। পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েট ইউনিঅনের কাছে এবং ইতালি ইউগোস্লাভিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছে যথাক্রমে পোল, স্লোভাক ও ইতালীয়ভাষী এলাকাগুলি ফেরৎ দিতে বলবে। সুতরাং জার্মান প্রশ্নে ইউগোস্লাভিয়াও জড়িয়ে পড়বে। কান টানলে মাথা আসার মতো জার্মান সমস্যার সঙ্গে একে একে সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

পশ্চিম জার্মানি, পূর্ব জার্মানি, অষ্ট্রিয়া ও লিখ্‌টেন-ষ্টাইন রাষ্ট্র চারটি সম্পূর্ণভাবে জার্মানভাষী। এদের নিয়ে অখণ্ড জার্মানি গঠিত হলে বাকি দশটি রাষ্ট্রের কাছে সীমা সংশোধনের দ্বারা সমস্ত জার্মান এলাকা আদায় করা যাবে।

বর্তমান পশ্চিম জার্মানির সরকার এতটা দাবি করেন না। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জার্মানি পুনর্গঠিত হোক, তাঁরা মাত্র এটুকু চান। তার মানে দুই জার্মানিকে একত্র ক'রে আরো ৪৩০০০ বর্গ মাইল এলাকা ঐ মিলিত রাষ্ট্রে যোগ করা। এ-কাজ হয়ে যাবার পর সম্ভবত অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে আনশ্লুস বা একী-করণের পথে কোন গুরুতর প্রতিবন্ধক আরোপ করা হবে না। কিন্তু ঐ ৪৩ হাজার বর্গ মাইল এলাকা পাওয়া খুব কঠিন। তার পরের আরো কতকগুলি বাধা দুর্লঙ্ঘ্য। অথচ সেগুলি অতিক্রম না করলে জার্মান সমস্যার ন্যায়সঙ্গত স্থায়ী নিশ্চিত শান্তিপূর্ণ সমাধান অসম্ভব।

যাতে জার্মানি একীকরণের পর ভূতপূর্ব জার্মানগরিষ্ঠ এলাকাগুলি দাবি করতে না পারে তার জন্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রেরা যে উপায় অবলম্বন করেছে, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো জার্মানবিরোধী শান্তিপ্রিয় মনীষীও fact and fiction গ্রন্থে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। জার্মানগরিষ্ঠ এলাকায় গণভোট নিলে দেখা যাবে যে, সবাই জার্মানির সঙ্গে যোগদানের পক্ষপাতী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও ডানজিগে এটা বারবার দেখা গেছে। অধিকৃত এলাকায় জার্মানগরিষ্ঠ সমস্ত অঞ্চল থেকে ঐ গণভোটে পরাজিত হয়ে জার্মান এলাকা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবার ভয়ে পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও লিথুআনিআর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জার্মান এলাকা থেকে লক্ষ লক্ষ জার্মান অধিবাসীকে বিতাড়িত ক'রে উদ্বাস্তু করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের মধ্যেই যে-জার্মানগরিষ্ঠ এলাকায় ১৯৩৯ সালে এক কোটি জার্মানের বাস ছিল, সেখান থেকে ৮৭ লক্ষ জার্মানকে তাড়িয়ে দিয়ে ৫৪ লক্ষ পোল, শ্বেত রুশ, বৃহৎ রুশ প্রভৃতি জাতির লোকদের এনে বসানো হয়। এর নাম জাতি-হত্যা। হুঙ্গারিতেও এই ভাবে একটা স্বাধীন জাতিকে পিষে মেরে ফেলবার চেষ্টা চলছে। ইমরে নজের হত্যা নিশ্চয় শিক্ষিত ভারতীয়রা এখনও ভুলে যান নি। তিব্বতেও চীনারা বাইরে থেকে লোক আমদানি ক'রে তিব্বতিদের সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কমিউনিষ্ট শক্তিগোষ্ঠী-অধিকৃত যে-সব জার্মান অঞ্চল জার্মান-গরিষ্ঠ ছিল, এখন ১৯৬৮ সালে সে সব এলাকায় জার্মানরা সংখ্যালঘুতে পরিণত।

তা হলেও পশ্চিম জার্মানির সরকার ঐ সব এলাকা

পূর্ব দলিলের জোরে দাবি ক'রে যাবেন। কিন্তু সে-দাবি শেষ পর্যন্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার গল্পের নায়ক বনবিহারী বাবুর করুণ কাগুজে প্রচেষ্টায় পর্যবসিত না হয়! জার্মানি বিভাগের সঙ্গে কোরিয়া ও ভিএত্‌নাম বিভাগের মিল আছে। তিনটি ক্ষেত্রেই একটি অখণ্ড জাতিকে ইচ্ছা ক'রে দুই শিবিরে বিভক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। জাতিটি স্বয়ং বিভক্ত হতে বা থাকতে একান্ত অনিচ্ছুক। জার্মানি বিভাগের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড, সাইপ্রাস, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের তুলনা চলে না এই জন্যে যে, এই চারটি জাতি বা রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে বিভক্ত হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ড, পাঞ্জাব ও বাংলা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কারণে বিভক্ত। সাইপ্রাসে দুটি স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী স্বতন্ত্র জাতির বাস; তারা ধর্মীয় ও জাতিগত উভয় কারণে পৃথক থাকতে বাধ্য। সাইপ্রাস কার্যত বিভক্ত হলেও কাগজে-কলমে এখনও দুটি পৃথক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

বাঙালির পক্ষে জার্মানির একীকরণের সমস্যা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে স্বীকৃত জার্মানরাও এখন পর্যন্ত চোদ্দ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তা হলে বাঙালিরা যে সাত সাত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে তাতে দুঃখের কারণ থাকলেও অগৌরবের কিছু নেই।

জার্মানভাষী এলাকার একীকরণ সর্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার। যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, তবে জার্মানির একীকরণকে উপলক্ষ ক'রে বাধবে, অন্য কোথাও অন্য কোন কারণে নয়। জার্মান জাতির একটা সুবিধা এই যে, তারা এক মন প্রাণ নিয়ে এক হতে চায় এবং হলে তাদের শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাব সম্বন্ধে ঠিক সে-কথা বলা যায় না। বাঙালিরা স্বেচ্ছায় পৃথক হয়েছে এবং তারা পৃথক থাকতে চায়। আর পাঞ্জাবিরা এমন ভাবে বিভক্ত হয়ে লোক-বিনিময় ক'রে নিয়েছে যে, আর কখনও আগের মতো এক অখণ্ড পাঞ্জাব গঠনের সম্ভাবনা নেই।

(ক্রমশঃ)

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব্ব

বঙ্গানুবাদঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন জ্ঞাতিকুল বিনাশে শোকে মুহ্যমান হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন অর্জুন ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী সকলে একে একে তাঁকে রাজধর্মের মহাত্ম্য বুঝাতে চেষ্টা করলেন। এরপর অর্জুন আবার তাঁর নিকট রাজদণ্ডের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করতে লাগলেন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ।

অনুমান্য মহাবাহুং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥১

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রৌপদীর কথা শুনে যুধিষ্ঠির যখন নিজ সংকল্প ত্যাগ করলেন না বলে মনে হলো, তখন অর্জুন আবার সম্মানের সঙ্গে বললেন।

অর্জুন উবাচ

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।

দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ ॥২

অর্জুন বললেন—দণ্ড সমস্ত প্রজা শাসন করে, দণ্ডই তাঁদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করে। সকলে নিদ্রিত হলেও দণ্ড জেগে থাকে। তাই জ্ঞানীরা দণ্ডকে রাজধর্ম মনে করে থাকেন।

দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্মং তথৈবার্থং জনাধিপ।

কামং সংরক্ষতে দণ্ড স্ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে ॥৩

জনাধিপ! দণ্ডই ধর্মকে রক্ষা করে, অর্থকে রক্ষা করে, কামকে রক্ষা করে। অতএব দণ্ডকে ত্রিবর্গ রক্ষক বলা হয়।

দণ্ডেন রক্ষ্যতে ধান্যং ধনং দণ্ডেন রক্ষ্যতে।

এবং বিদ্বানুপাধৎস্ব ভাবং পশ্যস্ব লৌকিকম্ ॥৪

দণ্ড দ্বারা ধান্য রক্ষা করা হয়, ধন রক্ষা করা হয়। এই সব লৌকিক ব্যবহার লক্ষ্য করে আপনি এই দণ্ড গ্রহণ করুন।

রাজদণ্ডভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।

যমদণ্ডভয়াদেকে পরলোকভয়াদপি ॥৫

পরস্পরভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।

এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে সর্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৬

অনেক মানুষ যেমন যমদণ্ডের ভয়ে পাপ থেকে বিরত থাকে, তেমনি অনেক মানুষই রাজদণ্ডের ভয়ে পাপ করে না। ৫

কতকগুলি লোক পরস্পরের ভয়ে পাপ করে না। সংসারে এরূপ অবস্থা চলছে। তাই সমস্ত ন্যায়াচরণই এক দণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ৬

দণ্ডস্যৈব ভয়াদেকে ন খাদন্তি পরস্পরম্।

অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৭

অনেক লোক দণ্ডের ভয়েই পরস্পরকে হিংসা করে না। দণ্ড যদি না রক্ষা করে তবে সমস্ত লোকই গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

যস্মাদদান্তান্ দময়ত্যশিষ্টান্ দণ্ডয়ত্যপি।

দমনাদ্ দণ্ডনাচ্চৈব তস্মাদ দণ্ডং বিদুর্বুধাঃ ॥৮

দণ্ড দুর্দান্ত লোকেদের দমন করে, অশিষ্ট লোকদের শাস্তি দেয়। এই দমন ও দণ্ডন কার্যের জন্যেই পণ্ডিতেরা ইহাকে দণ্ড বলেন।

বাচা দণ্ডো ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং ভুজার্পণম্।

দানদণ্ডাঃ স্মৃতাঃ বৈশ্যা নির্দণ্ডঃ শূদ্র উচ্যতে ॥৯

ব্রাহ্মণদের শুধু বাক্য দ্বারা, ক্ষত্রিয়কে শুধু ভোজনমাত্র বেতন দিয়ে, বৈশ্যকে শুধু জরিমানা দ্বারা দণ্ড দেওয়া হয়। শূদ্রকে দণ্ড রহিত বলা হয়—তার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড ব্যবস্থা করা হয় না।

অসংমোহায় মর্ত্যানামর্থসংরক্ষণায় চ।

মর্যাদা স্থাপিতা লোকে দণ্ডসংজ্ঞা বিশাম্পতে ॥১০

প্রজানাথ! লোকেদের প্রমাদ থেকে রক্ষা করার জন্যে, তাদের ধন রত্ন রক্ষা করার জন্যে, জগতে যে মর্যাদা স্থাপিত হয়েছে, তার নামই দণ্ড।

যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি সূনৃতঃ।

প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তে নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥১১

কৃষ্ণদেহ ও রক্তনয়ন দণ্ড দুর্জনদের দমনের জন্যে যে দেশে চরে বেড়ায়, সে দেশের নেতা পারদর্শী হলে প্রজারা আর মোহগ্রস্ত হয় না।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।

দণ্ডস্যৈব ভয়াদেতে মনুষ্যা বর্ত্মনি স্থিতাঃ ॥১২

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এরা সকলেই দণ্ডের ভয়েই নিজ নিজ পথে স্থির থাকে।

নাভীতো যজতে রাজন্ নাভীতো দাতুমিচ্ছতি।

নাভীতো পুরুষঃ কশ্চিৎ সময়ে স্থাতুমিচ্ছতি ॥১৩

রাজন্! বিনা ভয়ে কেউ যজ্ঞ করে না, কেউ দান করে না। বিনা ভয়ে কেউ মর্যদা বা প্রতিজ্ঞা রাখে না।

নাচ্ছিত্বা পরমর্মাণি নাকৃত্বা কর্মদুষ্করম্।

নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥১৪

মৎস্যশিকারীর মত অন্যের মর্মস্থান উচ্ছেদ ও দুষ্কর কর্ম না করে ও বহুসংখ্যক প্রাণী হত্যা না করে কেউ বড় সম্পত্তি অর্জন করতে পারে না।

নাঘ্নতঃ কীর্তিরস্তীহ ন বিত্তং ন পুনঃ প্রজাঃ।

ইন্দ্রো বৃত্রবধেনৈব মহেন্দ্রঃ সমপদ্যত ॥১৫

যে অপরকে হত্যা করে না, তার না কীর্তি হয়, না বিত্ত হয়, না প্রজা হয়। ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করেই মহেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন।

য এব দেবা হন্তারস্তাংল্লোকোঽর্চয়তে ভৃশম্।

হন্তা রুদ্রস্তথা স্কন্দঃ শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ ॥১৬

হন্তা কালস্তথা বায়ুর্মৃত্যুর্বৈশ্রবণো রবিঃ।

বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাশ্চ ভারত ॥১৭

এতান্ দেবান্ নমস্যন্তি প্রতাপপ্রণতাঃ জনাঃ।

ন ব্রহ্মাণং ন ধাতারং ন পুষাণং কথঞ্চন ॥১৮

যে দেবতা অন্যকে হত্যা করেন সংসার তাঁরই অধিক পূজা করে। রুদ্র, স্কন্দ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, বায়ু, কুবের, সূর্য, বসু, মরুদ্‌গণ, সাধ্য তথা বিশ্বদেব—এ সকল দেবতা অপরকে হত্যা করেন। তাঁদের সামনে নতমস্তক হয়ে সকলে নমস্কার করে। কিন্তু ব্রহ্মা, ধাতা ও পুষাকে কেউ কখনও প্রণাম করে না।

মধ্যস্থান্ সর্বভূতেষু দান্তান্ শামপরায়ণাম্।

যজন্তে মানবাঃ কেচিৎ প্রশান্তা সর্বকর্মসু ॥১৯

কারণ তাঁরা সকল প্রাণীর প্রতি সমভাব রাখাতে মধ্যস্থ, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিপরায়ণ। কেবল যে সব মানুষ শান্তস্বভাব তাঁরাই সকল কাজে ধাতা আদিয় পূজা করে থাকেন।

ন হি পশ্যামি জীবন্তং লোকে কশ্চিদহিংসয়া।

সত্ত্বৈঃ সত্ত্বা হি জীবন্তি দুর্বলৈর্বলবত্তরাঃ ॥২০

সংসারে এমন কোন পুরুষকে দেখি নি যিনি অহিংসা দ্বারা জীবিকা অর্জন করছেন। প্রাণী দ্বারাই প্রাণী বেঁচে থাকে। প্রবল দুর্বল জীবদ্বারাই জীবন ধারণ করে।

নকুলো মূষিকানত্তি বিড়ালো নকুলং তথা।

বিড়ালমত্তি শ্বা রাজন্ শ্বনং ব্যালমৃগস্তথা ॥২১

রাজন! নকুল ইঁদুর খায়, বিড়াল নকুল খায়। কুকুর বিড়াল খায়, কুকুরকে বাঘে খায়।

তানত্তি পুরুষঃ সর্বান্ পশ্য কালো যথাগতঃ।

প্রাণস্যান্নমিদং সর্বং জঙ্গমং স্থাবরং চ যৎ ॥২২

কিন্তু মানুষ সবই খায়—কালে যা হয়ে এসেছে দেখুন। স্থাবর জঙ্গম সবই প্রাণীর খাদ্য।

বিধানং দৈববিহিতং তত্র বিদ্বান্ ন মুহ্যতি।

যথা সৃষ্টোঽসি রাজেন্দ্র তথা ভবিতুমর্হসি ॥২৩

এ হচ্ছে দৈব বিধান। ইহাতে বিদ্বান্ পুরুষ মোহগ্রস্ত হয় না। রাজেন্দ্র! বিধাতা আপনাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন (যে জাতি ও কুলে আপনার জন্ম দিয়েছেন) তেমনই থাকা উচিত।

বিনীতক্রোধহর্ষা হি মন্দা বনমুপাশ্রিতাঃ।

বিনা বধং ন কুর্বন্তি তাপসাঃ প্রাণযাপনে ॥২৪

যে মন্দবুদ্ধি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্রোধ ও হর্ষ নেই সে-ই বনে গিয়ে তপস্বী হয়, কিন্তু হিংসা ব্যতিরেকে জীবনধারণ করতে পারে না।

উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাং চ ফলেষু চ।

ন চ কশ্চিন্ন তান্ হন্তি কিমন্যৎ প্রাণযাপনম্ ॥২৫

জলে রয়েছে অনেক প্রাণ, পৃথিবীতে ফলে রয়েছে অনেক প্রাণ, এমন মানুষ কেউ নেই যে এ-সকল প্রাণ নাশ না করে। এ-সমস্তই জীবননির্বাহ ছাড়া আর কি?

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।

পক্ষ্মণোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধপর্যয়ঃ ॥২৬

কত সূক্ষ্মযোনি জীব রয়েছে, যাদের শুধু অনুমানে জানা যায়।—মানুষের পলকমাত্রে যাদের নিপাত হয়ে যায়।

গ্রামান্ নিষ্ক্রম্য মুনয়ো বিগতক্রোধমৎসরাঃ।
বনে কুটুম্বধর্মাণো দৃশ্যন্তে পরিমোহিতাঃ ॥২৭

কত মুনি ক্রোধ ঈর্ষ্যা ত্যাগ করে, গ্রাম ত্যাগ করে বনে যান, তাঁরা সেখানে আবার মোহবশতঃ গৃহস্থ-ধর্মেই অনুরক্ত দৃষ্ট হন।

ভূমিং ভিত্ত্বৌষধীশ্ছিত্ত্বা বৃক্ষাদীনণ্ডজান্ পশূন্।
মনুষ্যাস্তন্বতে যজ্ঞাংস্তে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥২৮

মানুষ ধরিত্রীকে খনন করে, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, পশু ও পক্ষীদের উচ্ছেদ করে যজ্ঞানুষ্ঠান করে ও স্বর্গে চলে যায়।

দণ্ডনীত্যাং প্রণীতায়াং সর্বে সিদ্ধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ।
কৌন্তেয় সর্বভূতানাং তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥২৯

কুন্তীনন্দন! দণ্ডনীতি ঠিক ঠিক প্রয়োগ করলে, সমস্ত প্রাণীর সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, এতে আমার সংশয় নেই।

দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষ্যন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥৩০

যদি সংসারে দণ্ড না থাকে তবে সকল প্রজা নষ্ট হয়ে যায়। জলে যেমন বড় মাছ ছোট মাছদের খেয়ে ফেলে, তেমনি প্রবল জীব দুর্বল জীবকে নিজের আহারে পরিণত করে।

সত্যং চেদং ব্রহ্মণা পূর্বমুক্তং
দণ্ডঃ প্রজা রক্ষতি সাধুনীতঃ।
পশ্যাগ্নয়শ্চ প্রতিশাম্য ভীতাঃ,
সন্তর্জিতা দণ্ডভয়াজ্জ্বলন্তি ।৩১

ব্রহ্মা প্রথমেই এই সত্য প্রকাশ করেছেন—ভালভাবে দণ্ড প্রয়োগ করলে প্রজাদের রক্ষা হয়। দেখুন, আগুন যখন নিভে আসে তখন ফুঁদিলে দণ্ডের ভয়ে জ্বলে উঠে।

অন্ধতম ইবেদং স্যান্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী ॥৩২

যদি সংসারে ভালমন্দের পার্থক্যকারী দণ্ড না থাকে জগৎ অন্ধকারে ডুবে যায়, আর কারও কিছু বোধ থাকে না।

যেঽপি সম্ভিন্নমর্যাদা নাস্তিকা বেদনিন্দকাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনাশুনিপীড়িতাঃ ॥৩৩

ধর্মের মর্যাদা নষ্টকারী বেদনিন্দক নাস্তিকসকল দণ্ডের দ্বারা পীড়িত হলে ঠিক পথে চলে আসে ও মর্যাদা পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।

সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্জনঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াদ্ ভীতো ভোগায়ৈব প্রবর্ততে ॥ ৩৪

সকল জগৎ দণ্ড দ্বারাই ঠিক পথে পরিচালিত হয়। কারণ স্বভাবতই সর্বথা শুদ্ধ মনুষ্য বিরল। দণ্ডের ভয়েই মনুষ্য মর্যাদা পালনে প্রবৃত্ত হয়।

চাতুর্বর্ণ্যপ্রমোদায় সুনীতিনয়নায় চ।
দণ্ডো বিধাত্রা বিহিতো ধর্মার্থৌ ভুবি রক্ষিতুম্ ॥৩৫

বিধাতা এই উদ্দেশ্যে দণ্ডবিধান করেছেন যাতে যাতে চারবর্ণের লোক আনন্দে বাঁচতে পারে, সকলের মধ্যে সুনীতি বিদ্যমান থাকে ও জগতে ধর্ম ও অর্থ রক্ষা হয়।

যদি দণ্ডান্ন বিভ্যেয়ুর্বয়াংসি শ্বাপদানি চ।
অদ্যুঃ পশূন্ মনুষ্যাংশ্চ যজ্ঞার্থানি হবীংষি চ ॥৩৬

যদি পক্ষী ও হিংসক জীব দণ্ডের ভয় না পায়, তবে তারা মনুষ্য ও যজ্ঞের জন্য রক্ষিত ঘৃত খেয়ে যায়।

ন ব্রহ্মচার্যধীয়ীত কল্যাণী গৌর্ন দুহ্যতে।
ন কন্যোদ্বহনং গচ্ছেদ্ যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৩৭

যদি দণ্ড মর্যাদা না রক্ষা করে তবে ব্রহ্মচারী বেদপাঠে রত হয় না। কল্যাণী-গাভী দুধ দেয় না, কন্যা বিবাহে রাজী হয় না।

বিষ্বগ্লোপঃ প্রবর্তেত ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
মমত্বং ন প্রজানীয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৩৮

দণ্ড যদি মর্যাদা পালন না করায় তবে চারিদিক থেকে ধর্মকর্ম লোপ পায়, সকল মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। আর লোকেরা এও জানতে পারে না, কোন্ জিনিষ তাদের—কোন্ জিনিষ তাদের নয়।

ন সংবৎসরসত্রাণি তিষ্ঠেয়ুরকুতোভয়াঃ।
বিধিবদ্ দক্ষিণাবন্তি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৩৯

যদি দণ্ড ধর্ম পালন না করায় তবে বিধিপূর্বক দক্ষিণাযুক্ত সাংবৎসরিক যজ্ঞও নির্ভয়ে সম্পন্ন হয় না।

চরেয়ুর্নাশ্রমে ধর্মং যথোক্তং বিধিমাশ্রিতাঃ।
ন বিদ্যাং প্রাপ্নুয়াৎ কশ্চিদ্ যদি দণ্ডো ন
পালয়েৎ ॥৪০

যদি দণ্ড মর্যাদা পালন না করায় তবে লোক আশ্রমে থেকে বিধিপূর্বক শাস্ত্রোক্ত ধর্ম পালন করে না, বিদ্যাও প্রাপ্ত হয় না।

ন চোষ্ট্রা ন বলীবর্দা নাশ্বাশ্বতরগর্দভাঃ।

যুক্তা বহেয়ুর্যানানি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৪১

দণ্ড যদি কর্তব্য পালন না করায় তবে উট, বলদ, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা রথে বাঁধা হলেও রথ টেনে নিয়ে যায় না।

ন প্রেষ্যা বচনং কুর্যুর্ন বালা জাতু কর্হিচিৎ।

ন তিষ্ঠেদ্ যুবতী ধর্মে যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৪২

যদি দণ্ড ধর্ম ও কর্তব্য পালন না করায় তবে সেবক স্বামীর কথা শোনে না, বালকও কখনও মা-বাপের আদেশ পালন করে না, যুবতী স্ত্রীলোকও নিজের সতীত্বধর্মে স্থির থাকে না।

দণ্ডে স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্বা ভয়ং দণ্ডে বিদুর্বুধাঃ।

দণ্ডে স্বর্গো মনুষ্যাণাং লোকোঽয়ং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪৩

দণ্ডেই সকল প্রজা ঠিক থাকে। দণ্ডদ্বারাই ভয় সৃষ্ট হয়, ইহাই পণ্ডিতেরা মনে করেন। মনুষ্যের ইহলোক পরলোক দণ্ডের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ন তত্র কূটং পাপং বা বঞ্চনা বাপি দৃশ্যতে।

যত্র দণ্ডঃ সুবিহিতশ্চরত্যরিবিনাশনঃ ॥৪৪

যেখানে শত্রুবিনাশকারী দণ্ড সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেখানে ছলনা, পাপ আর বঞ্চনাও দৃষ্ট হয় না।

হবিঃ শ্বা প্রলিহেদ্ দৃষ্ট্বা দণ্ডশ্চেন্নোদ্যতো ভবেৎ।

হরেৎ কাকঃ পুরোডাশং যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৪৫

যদি দণ্ড রক্ষার জন্যে সর্বদা উদ্যত না থাকে তবে কুকুর ঘৃত দেখলেই লেহন করে,—কাক যজ্ঞের পুরোডাশ তুলে নিয়ে যায়।

যদীদং ধর্মতো রাজ্যং বিহিতং যদ্যধর্মতঃ।

কার্যস্তত্র ন শোকো বৈ ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যজস্ব চ ॥৪৬

এ রাজ্য ধর্মে বা অধর্মে লাভ হয়েছে তার জন্য শোক করা উচিত নয়। এখন আপন সুখ ভোগ করুন, আর যজ্ঞানুষ্ঠান করুন।

সুখেন ধর্মং শ্রীমন্তশ্চরন্তি শুচিবাসসঃ।

সংবসন্তঃ ফলৈর্দানৈর্ভুঞ্জানাশ্চান্নমুত্তমম্ ॥৪৭

শুদ্ধবস্ত্র ধারণকারী পুরুষ সুখে ধর্মের আচরণ করেন, আর উত্তম অন্নভোজন করে ফল ও দান বর্ষণ করেন।

অর্থে সর্বে সমারম্ভাঃ সমায়ত্তা ন সংশয়ঃ

স চ দণ্ডে সমায়ত্তঃ পশ্য দণ্ডস্য গৌরবম্ ॥৪৮

এতে সন্দেহ নেই যে সমস্ত কার্য অর্থের অধীন, অর্থ দণ্ডের অধীন। দেখুন দণ্ডের কী মহিমা?

লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।

অহিংসা সাধুহিংসেতি শ্রেয়ান্ ধর্মপরিগ্রহঃ ॥৪৯

লোকযাত্রা নির্বাহের জন্যই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। সর্বভাবে হিংসা করা যাবে না, বা শুধু দুষ্টেরই হিংসা করা যাবে এ প্রশ্ন উপস্থিত হলে, যদ্দ্বারা ধর্ম রক্ষা পাবে সেই কার্যই শ্রেষ্ঠ বলে মানতে হবে।

নাত্যন্তং গুণবৎ কিঞ্চিন্ন চাপ্যত্যন্তনির্গুণম্।

উভয়ং সর্বকার্যেষু দৃশ্যতে সাধ্বসাধু বা ॥৫০

এমন কোন বস্তু নেই যাতে শুধু গুণই রয়েছে। এমন বস্তুও নেই যাতে কোন গুণ নেই। সকল কার্যেই দোষ ও গুণ উভয়ই দৃষ্ট হয়।

পশূনাং বৃষণং ছিত্বা ততো ভিন্দন্তি মস্তকম্।

বহন্তি বহবো ভারান্ বধ্নন্তি দময়ন্তি চ ॥৫১

পশুদের অণ্ডকোষ ছেদন করে ও শিঙ্ ভেঙ্গে দিয়ে তাদের দিয়ে ভার বহান হয়। তাদের ঘরে বেঁধে রাখা হয় ও দমন করা হয় অর্থাৎ কাজ করতে অভ্যাস করানো হয়।

এবং পর্যাকুলে লোকে বিতথৈর্জর্জরীকৃতে।

তৈস্তৈর্ন্যায়ৈর্মহারাজ পুরাণং ধর্মমাচর ॥৫২

মহারাজ! এইভাবে সারা জগৎ মিথ্যা ব্যবহারে ব্যাকুল ও দণ্ডে জর্জরিত রয়েছে। আপনিও সেই সেই ন্যায় অনুসরণ করে প্রাচীন ধর্মের আচরণ করুন।

যজ দেহি প্রজাং রক্ষ ধর্মং সমনুপালয়।

অমিত্রান্ জহি কৌন্তেয় মিত্রাণি পরিপালয় ॥৫৩

যজ্ঞকরুন, দান করুন, প্রজাদের রক্ষা করুন, ও নিরন্তর ধর্মপালন করুন। কুন্তীনন্দন, আপনি শত্রুদের বিনাশ ও মিত্রদের রক্ষা করুন।

মা চ তে নিঘ্নতঃ শত্রূন্ মন্যুর্ভবতু পার্থিব।

ন তত্র কিল্বিষং কিঞ্চিৎ কর্তুর্ভবতি ভারত ॥৫৪

রাজন্! শত্রুদের বধ করার সময়ে আপনার মনে যেন দীনতা না আসে। হে ভারত! শত্রুকে বধ করলে কর্তাতে কোন পাপ স্পর্শ করে না।

আততায়ী হি যো হন্যাদাততায়িনমাগতম্।

ন তেন ভ্রূণহা স স্যান্মন্যুস্তং মন্যুমাচ্ছর্তি ॥৫৫

যে আততায়ী হাতে অস্ত্র নিয়ে এসেছে তাকে যে নিজে আততায়ী হয়ে হত্যা করে তাতে ভ্রূণহত্যার পাপ বর্তায় না। মারণোদ্যত মানুষের ক্রোধই তার বধনিমিত্ত ক্রোধের সৃষ্টি করে।

অবধ্যঃ সর্বভূতানামন্তরাত্মা ন সংশয়ঃ।

অবধ্যে চাত্মনি কথং বধ্যো ভবতি কস্যচিৎ ॥৫৬

সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা অবধ্য, এতে সন্দেহ নেই। আত্মার যখন বধ হয় না। তখন তা কি করে অন্যের বধ্য হবে?

যথা হি পুরুষঃ শালাং পুনঃ সম্প্রবিশেন্নবাম্।

এবং জীবশরীরাণি তানি তানি প্রপদ্যতে ॥৫৭

দেহান্ পুরাণানুৎসৃজ্য নবান্ সম্প্রতিপদ্যতে।

এবং মৃত্যুমুখং প্রাহুর্যে না যে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৫৮

মানুষ যেমন পুনঃ পুনঃ নূতন গৃহে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনি জীব ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করে। পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহ ধারণ করে, ইহাকে তত্ত্বদর্শিগণ মৃতমুখ বলে থাকেন।

[ক্রমশঃ

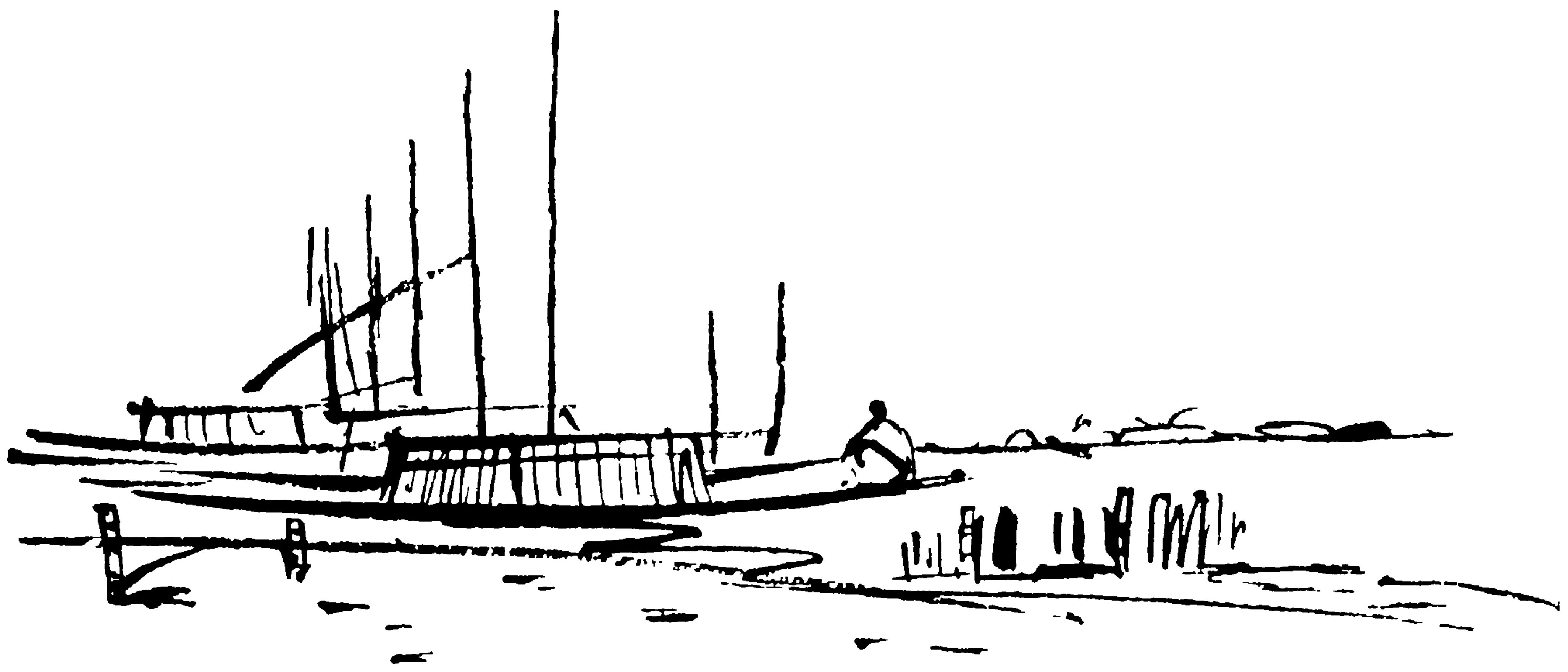

গল্প

একটি স্বপ্ন

সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মাটির তেজ আছে, তাই তো জন্মেছে অমন সব হীরের টুকরো ছেলে। এ মাটিতেই তারা হেসেছে, খেলেছে, মাটির গান, মানুষের গান গেয়েছে; মান বাড়িয়েছে মায়ের; রাঙা মাটির ছাঁচে গড়ন-পেটন, এদের মন তাই রাঙা; মাথার ওপর দিগন্তজোড়া সুনীল আকাশের চাঁদোয়া টাঙানো; উদাসী হাওয়ায় ভাসে বাউলের একতারায় সুরের গুঞ্জন, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে অসীম শূন্যতার আসন বিছানো।

এখানের মানুষ শুধু স্বপ্ন দেখে না, তাকে বাস্তবের রূপ দেয়। বাইরের মানুষ তার রূপে মুগ্ধ হবার ভাণ করে, উপহাস করে আড়ালে গিয়ে। তেলুটিয়া উদয়ন কল্যাণ কেন্দ্র থেকে ফেরার সময় এই কথাটিই বার বার মনে হচ্ছিল সীতাংশুর।

গরুরগাড়ী চেপে তিলুটিয়ার দিকে চলেছিল ওরা অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক কজন মিলে। এক এক গাড়ীতে গাড়োয়ানকে নিয়ে চারজন; সার বেঁধে চলেছে গাড়ীগুলো কাঁচা পথ দিয়ে, রাঙা ধুলো উড়িয়ে। বেলা গড়িয়ে আসছে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ কমে ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। উঁচুনীচু রাস্তায় ওলট পালট খাচ্ছিল ওরা; ছইয়ে মাথা ঠুকছে, কুণ্ডলীপাকিয়ে বসা শরীরে অস্বস্তি; তবু ওদের আনন্দের সীমা নেই। কবি বিশু রায় আনন্দের আতিশয্যে বিকৃতস্বরে এবং উচ্চারণে গেয়ে উঠলেন—'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ……'

সংস্থার নতুন সভ্য হয়েছে সীতাংশু। তিলুটিয়া উদয়ন কল্যাণ কেন্দ্রে সংস্থার ষাণ্মাষিক অধিবেশনে ও যোগ দিতে চলেছে। এতগুলি জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যে ও রীতিমত সঙ্কোচবোধ করছিল। বোলপুর ষ্টেশনে ওরা সদলবলে নেমে গেটের বাইরে আসতেই শুনতে পেল সমবেত শঙ্খধ্বনি। সীতাংশু দেখল কয়েকটি মেয়ে সার বেঁধে শাঁখ বাজাচ্ছে। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রসাদ হাতজোড় ক'রে এগিয়ে এলেন সহাস্য মুখে; তাঁর নির্দেশে একটি বালিকা সকলের কপালে এঁকে দিচ্ছিল চন্দনের তিলক। সঙ্কোচে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল সীতাংশু। এ সব জ্ঞানী, গুণিজনদের প্রাপ্য, এতে তার অধিকার না থাকারই কথা। কিন্তু ওঁদের অভ্যর্থনায় ত্রুটি হবার যো নেই। অবশেষে সীতাংশুর কপাল বালিকাটির শিকারেরলক্ষ্য হল। তার তুলতুলে নরম হাতের চন্দন তিলকে লাঞ্ছিত হল। গা-টা কেমন শির-শির করে উঠছিল সীতাংশুর; দুই ভুরুর মাঝখানটা দপদপিয়ে উঠেছিল। ছি, ছি, রবীন্দ্রনাথের পদধূলিপূত এই জায়গায় সাহিত্যিক সেজে তিলক নেওয়া? কি ধৃষ্টতা!

তারপর শ্রীপ্রসাদ ওদের সকলকে নিয়ে গরুর গাড়ীতে তুলেছেন। তেজী বলদগুলো এক টোকাতেই ছুটতে আরম্ভ করল কাঁচা পথে রাঙা ধুলো উড়িয়ে।

বহুদিন বাদে এতগুলি জ্ঞানি-গুণী মুক্তি পেয়েছেন শহরের বদ্ধ খাঁচা থেকে। সীতাংশু ওঁদের উচ্ছল হতে দেখল; কবি বিশু রায় থামতেই ওদিক থেকে অধ্যাপক অনাথ চট্টোপাধ্যায় ধরলেন—'তোমার মুক্তি আলোয় আলোয়……

এই পল্লীপ্রকৃতি কিছু অচেনা নয় সীতাংশুর; বীরভুম আর বর্ধমান যেন দুটি বোন; দুজনেই গৌরাঙ্গিনী; বড় বোনের চেহারা হয়তো কিছুটা রুক্ষ কিন্তু ছোট বোন কোমলা ননীর মতো। আবীরের মত রাঙা তার মাটি, ফসলের তুলনা নাই। বসুমাতা হাট বসিয়েছেন দাক্ষিণ্যের; তাঁর ভাণ্ডার উন্মুক্ত সব সময় সর্বজনের তরে।

সেই কোমলা মায়ের বুকে জন্মেছে সীতাংশু। শৈশব কেটেছে সেখানের মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে। এই রাঙা ধূলিওড়া কাঁচিপথ, ওই উন্মুক্ত তৃণহীন প্রান্তর, পদ্ম-ফুলে ভরা দীঘি, তালগাছের সারি—সব তার চেনা। এখান থেকে কতদূরে হবে রাণীপাড়া গ্রাম? শৈশবে পিসীমার বাড়ীতে এসেছিল সীতাংশু। মনে পড়ে, কাছেই মহেশপুর গ্রামের আঠারো হাত কালী। উঃ—পাঁঠাবলির কি ধুম! মহেশপুরের কাছেই না লাভপুর? বাংলাদেশের হৃদয়ের শিল্পী তারাশঙ্কর না সেখানেরই মানুষ?

পশ্চিমের আকাশের রক্তিম গোলকটি অন্ধকার অতলে ডুব দিচ্ছিল আকাশে; সীতাংশু সেদিকে চেয়ে-ছিল। সঙ্গী দুজন ওর অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে কথাবার্তা বলে যাচ্ছিল।

—"আমি ষ্ট্যাটিস্টিক্সে কাজ করি, বর্ধমান—বীরভূম আর বাঁকুড়া হচ্ছে আমার কাজের এলাকা। কাজের খাতিরে আমাকে প্রায়ই এ-জেলা সে-জেলা ঘুরতে হয়, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হয় নানা বিষয়ে। বছর কয়েক আগে একবার তিলুটিয়ায় আমাকে যেতে হয়ে-ছিল, গিয়ে যা দেখলাম ভাই, কল্পনাও করা যায় না।'

—'কি ব্যাপার অর্ধেন্দুদা, বলুন শুনি।'

—'তিলুটিয়া আসতেই শুনলাম, এক দাঙ্গায় কয়েকটা খুন খারাবী হয়ে গেছে আগের দিন। আশে পাশের গ্রামগুলোয় বহু মুসলমানের বাস। এক মসজিদের সংস্কার নিয়ে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ দানা পাকায়। তা থেকেই সেই পরিণতি, সে যাক, এতে অবাক হবার কিছু নেই। অমন তো আখছার হচ্ছে। আমি যেতেই তিলুটিয়ার কয়েকটি যুবক কেঁদে ফেলল। জিগ্যেস করলুম, কাঁদছ কেন? তারা বললে—আমাদের গুরু-দেবকে আর কজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেল হাজতে রেখেছে। জিজ্ঞাসা করি—কে তোমাদের গুরুদেব? শুনতে পেলাম, সাধক-কবি আবদুল হক। অবাক হয়ে ওদের মুখের পানে তাকালাম—তোমরা কি জাত? ওরা বলল—হিন্দু! শুনে চমক লাগল। হিন্দুর ছেলেরা মুসলমানকে গুরুদেব বলে, তাঁকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেলে ঝর ঝর ক'রে কাঁদে, দেখতে হবে এর মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে। এই ভেবে তিলুটিয়ায় গেলাম। দেখলাম হক সাহেব প্রতিষ্ঠিত উদয়ন কল্যাণ কেন্দ্র। যা দেখলাম, তার তুলনা নেই।'

—'হক সাহেব এখন কোথায়?'

—'সাত বছর কারাবাসের পর এই তো মাসখানেক আগে মুক্তি পেয়েছেন। এই উপলক্ষ্যেই তো এবারের অধিবেশন এখানে করা।'

গরুর গাড়ীগুলো ডাইনে বেঁকে, পর পর কয়েকটা পুকুরের পাড় দিয়ে গিয়ে গ্রামের ভেতর ঢুকল। কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে আর একটা বাঁক নিয়ে থামল গিয়ে অশথতলায়। সামনে শস্যরিক্ত প্রান্তর দিগন্ত প্রসারিত। অশথ গাছের নীচে বৃত্তাকার মাটির বেদী। নীচে তালাইয়ের ওপর সতরঞ্চি পাতা; অশথ গাছের সামনেই আশ্রম; মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়বে, ক্ষুদ্রাকৃতি গাছপালার অজস্র জটলা; দুদিকে কোণা উঁচু, চুনকাম করা ইটের সার করা সুরকি বিছানো পথ। কিছু এগিয়ে একটি গোলাকার সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বর। অনেক উঁচুতে খড়ের আচ্ছাদন; পাশেই একটি টিউবওয়েল; বাঁধানো ড্রেন বেরিয়ে গেছে আশ্রমের সীমানার বাইরে। ডানদিকে দোতলা একটি মাটির খোড়ো ঘর। বাঁয়ে একফালি উঠোন; তারই শেষ প্রান্তে পাকশালা।

গোলাকৃতি চত্বরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট সাধক কবি আবদুল হক। অপূর্ব দেহ কান্তি তাঁর; এক মাথা কাঁচাপাকা চুল, মুখে ঋষিদের মত দাড়ি। চোখে বোল গোল্ড ফ্রেমের চশমা; সবাই গিয়ে তাঁকে ঘিরে বসল। সীতাংশু পেছনে পড়েছিল। ওখানে পৌঁছে ভাবল, সবাই বুঝি প্রণাম সেরে বসেছে। সে পায়ের ধুলো নিল। সাধক তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাইকে শুনিয়ে সুমিষ্ট স্বরে বললেন—'এ আশ্রম আপনাদের; আপনারা সব বুঝে সুজে নিন; আমার চোখ বুঁজে আসছে। আর সময় নেই।'

সত্যি সত্যি, চোখ দুটো বুজে আসছিল তাঁর, কোলের ওপর জড়ো করা হাত দুটো কাঁপছিল। মুখ থেকে 'চিক্ চিক্' শব্দ বের হচ্ছিল। এটা সম্ভবতঃ তাঁর

মুদ্রা দোষ; মাঝে মাঝে তাঁকে দু'কাঁধে ঝাঁকানি দিতে দেখল সীতাংশু।

সীতাংশু পরে জানতে পারল, উনিই সাধক কবি আব্দুল হক। প্রথমটা, একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। মুসলমানের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল বামুনের ছেলে হয়ে! কাজটা কি ঠিক হল? ভেতর থেকে কে যেন বলল—উনি তো মহান ব্যক্তি। ওঁরা জাতের উর্ধে; সকলের নমস্য।

গলা শুকিয়ে কাঠ সকলের; খিদেও পেয়েছে; কয়েকজন কাঁচের গ্লাসে করে সরবত দিতে লাগলেন, খেয়ে প্রাণটা জুড়োল। এরপর দোতলার ঘরে গিয়ে যে যার ব্যাগ রেখে কাপড়-গামছা-তোয়ালে সাবান নিয়ে গেল পুকুরে চান করতে। একজন পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ছোট পুকুর হলে কী হয়, ভারী সুন্দর জল; চান করে বড় আরাম হল।

তাড়াতাড়ি ফিরে এল ওরা; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; অশথ গাছের তলায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে। হ্যাজাক আলো জ্বলছে দুটো; মাতাল হাওয়া বইছে; ওপরের চাঁদোয়া উড়িয়ে নেওয়ার যোগাড়। বেদীতে পদ্মফুল ছড়ানো, সভাপতির জন্যে গাঁথা রয়েছে পদ্মের মালা। গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে; ওরা তাড়াতাড়ি বেশভূষা করে সভায় এসে বসল। সুরু হল অধিবেশন। শ্রীপ্রসাদ অভ্যর্থনা জানালেন:

'পরমাত্মীয়েরা, আপনাদের পেয়ে আজ আমরা ধন্য। কি আছে দেবার? শুধু প্রেম, প্রেমই আছে, প্রেমই সত্য, শিব, সুন্দর।' তিনি ঘোষণা করলেন উদয়ন কল্যাণ কেন্দ্রের আদর্শ: 'ধনবৈষম্য দূরীকরণ সাধ্যমত শ্রমদানে, পরিমিত জীবনধারণের সম্পদ গ্রহণে, কর্মের শ্রীক্ষেত্রে সুন্দরতম জীবন প্রতিষ্ঠায়, একক বিশ্ব পরিবার পরিকল্পনার কল্যাণব্রতে ব্রতী হওয়াই আমাদের আদর্শ।' অবশেষে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'দ্বন্দ্বভরা বিশ্বআত্মার মহামিলনে বিশ্ব পরিবার রূপায়নের পুণ্য প্রয়াস সার্থক হোক।'

সীতাংশু দেখল, সভায় প্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বস্তুত, সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে অবাস্তব ঠেকছিল। মনে মনে হাসল সে; সংস্থার সম্পাদক অর্ধেন্দুবাবুর ঘোষণা শুনে; এই আশ্রমকেই তারা 'ভুবন-ভারতীর' রূপ দেবেন। সীতাংশু ভাবল, কয়েক মাইল দূরেই 'বিশ্বভারতী'; তার দ্বারা যা হোল না, তারই অনুকরণে এই কল্পিত প্রতিষ্ঠান তাই পারে কোনদিন? এই সব পাগলদের সঙ্গে না এলেই ভাল হত। এর মধ্যে কিছুই আর তার মনকে সাড়া দিচ্ছিল না। বেশ বুঝল, এই সব জ্ঞানী গুণীদের ভাবগতিক লোক দেখানো মাত্র, কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা। এখান থেকে দু'কদম যেতে না যেতেই নির্ঘাৎ আবরণটা খসে পড়বে। তারপর যে-কে সেই।

রাত্রি এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শেষ হল। কত বক্তৃতা, কত কবিতা, কত গান হল, মৌলবী করলেন কোরাণ পাঠ, কবি বিশু রায় করলেন বাইবেল থেকে আবৃত্তি, স্থানীয় বহু প্রতিভা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তব্য রাখল। সব এক ঘেয়ে মনে হল সীতাংশুর। ক্ষিদেয় তার পেট জ্বলছিল, কিছুই ভাল লাগছিল না; একপ্রান্তে বসে ভাবছিল, কখন শেষ হয়। অবশ্য সে শ্রোতাদের ভাল করেই দেখছিল; গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে মাটির মানুষেরা; সকল জাতের মানুষ মিলে মিশে একাকার। সবার মুখেই মনের ক্ষুধা মেটানোর পরিতৃপ্তি; নাঃ—সীতাংশু কোনদিন মানুষ হতে পারল না! মানুষজন দেখছে, ওদিকে উপচে পড়ছে রস, সেদিকে অরুচি।

রাত বারোটায় আহার জুটল; চ্যাটাই পেতে শালপাতায় ভাত, ডিংলার তরকারী, ডাল, মাছের ঝোল; মাপা পেটে প্রায় সবাই এক সপ্তাহের রেশন সাবাড় করল। তারপর যে যার সুবিধে মত শুয়ে পড়ল।

অশথতলায় এত হাওয়া যে খালি গায়ে শীত শীত করছিল। নিজের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুল সীতাংশু; ঘুম আসত কিন্তু বিধি বাম না প্রসন্ন কে জানে! আশ্রমের এক চ্যালা তাকে পেয়ে বসল; তার আশ্রমিক নাম অমরেন্দ্র, আসল নাম সিরাজুদ্দীন। সুন্দর চেহারা, বুদ্ধির ছাপ মুখে চোখে; কথাবার্তা ভারী মিষ্টি, হাসিটি তার চেয়েও মিষ্টি। মাথায় এক রাশ চুল কাঁধ ছুঁয়েছে, মুখে পাতলা দাড়ি।

অমরেন্দ্র বললেন,—'সবাই আলোচনায় অংশ নিলেন,

আপনি দাদা বড্ড ফাঁকি দিলেন।

সীতাংশু মনে মনে হাসল। বলল—'নতুন কি আর বলার ছিল ভাই। তাছাড়া বরাবরই আমি শ্রোতার দলে। আমি মানুষজন দেখছিলাম।'

অমরের উচ্চকণ্ঠের হাসি শোনা গেল। হাসি থামিয়ে বললেন—'বেশ লোক আপনি বটে, তা যখন শুনলাম শ্রোতার দলে আপনি, তখন শোনেন আমার কথা—

—'বেশতো বলুন, শুনছি—'

—'জানেন দাদা, গুরুদেবের সঙ্গে আমারও জেল হয়েছিল। তিন বছর বাদে ছাড়া পেলাম। এসে দেখি বোনটি বেশ ডাগর হয়েচে; বিয়ে দোব, উদিকে হাতে কাণাকড়ি নাই। কিন্তু কী ভালবাসে আমাকে এখানের ভায়েরা, সবাই এসে আমাকে সাহস দিল। কদিনের মধ্যে তিন হাজার টাকা তুলে দিল। এই ভালবাসার প্রতিদান আমি কী দিতে পেরেছি? উঃ-দাদা, এসব কথা বলে বোঝানো যায় না।'

সীতাংশুর ঘুম চুলোয় গেল। ছেলেটি ধাতুতে ইস্পাত মনে হচ্ছে। কৌতুহলী হয়ে জিগ্যেস করল—'লেখাপড়া কদ্দুর করেছেন—?'

—'বেশী এগুতে পারিনি দাদা; ছোটবেলায় রাজনীতি করতাম, হেডমাষ্টারমশায় স্কুল থেকে তাড়ালেন। মনের জোরে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করলাম; একটা চাকরী ভায়েরা করে দিলেন, পাঠশালার মাষ্টারী। বেশ লাগছিল। ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা আমার কাছে ছিল দেবতার মতো। তাদিকে গীতা, বাইবেল, কোরাণ পড়াতাম, সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শোনাতাম, তুলে ধরতাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের, বিবেকানন্দের আদর্শ। কিন্তু কপালে সইল না দাদা! এখানের মুসলমানরা ক্ষেপে গেল। তারা আমাকে স্কুল থেকে তাড়াল, মার-ধোর করল, ধর্মত্যাগী ব'লে কোতোল করার ভয় দেখাল। আমি যদি ওদের মতে চলতাম, তাহলে ওরা আমাকে মাথায় তুলে নাচত দাদা, কিন্তু আমি কিছুতেই গুরুর আদর্শ ছাড়িনি; জান কবুল, প্রেমের পথ থেকে নড়ব না কোনোদিন।'

সীতাংশু ওর কথায় আন্তরিকতার সুর শুনতে পাচ্ছিল। একটানা কথা ব'লে ও থামতেই সীতাংশু জিগ্যেস করল—'এই আশ্রমের ব্যাপারটা আমার কিছুই বোধগম্য হয়নি, একটু বুঝিয়ে বলুন তো—?'

অমরেন্দ্র যেন প্রশ্নটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বেশ জোর দিয়ে বললেন—'আপনাদের শোনা ত দরকার, এ প্রতিষ্ঠান তো আপনাদেরই। উদয়ন কল্যাণকেন্দ্রকে একটা বিশ্বপরিবার পরিকল্পনার বীজ বলে ধরুন না কেন। আশ্রমে গুটিবারো হিন্দু মুসলমান পরিবার আছেন মিলে মিশে; সকলের আয় জড়ো হয় আশ্রমে; আশ্রম থেকেই সকলের ব্যয় নির্বাহ হয়। রান্না হয় একই পাকশালে। সকলের বাড়ী বাড়ী খাবার যায় আশ্রম থেকে। ঐ যে বলদ, গরু, ধানের মড়াই দেখছেন, সমস্ত আশ্রমের সম্পত্তি।'

একটু দম নিয়ে অমরেন্দ্র আবার বললেন—'যা দিনকাল পড়েচে, একক শক্তিতে পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব নয়। আশ্রমের যৌথ-দায়িত্বে সমস্ত নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে। বলুন তো দাদা, এই আশ্রমের আদর্শ সকলের গ্রহণ করা উচিত কিনা—?

সীতাংশু আমতা আমতা করে বলল—'প্রশ্নটা বেশ জটিল ভাই; আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন বিয়ে করে বাপ-মায়ের সঙ্গেই বাস করতে পারছি না, তখন—'

অমরেন্দ্র বাধা দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন—'ও সব তো পরের অনুকরণ; আমরা এই ধরণের মনোবৃত্তি পালটিয়ে নতুন যুগ, নতুন মানুষ গড়তে চাই; আপনাদের সৃষ্টির ভেতর সেই নতুন যুগের ভিত গড়ে তুলুন। ধর্মের উর্ধ্বে, বর্ণের উর্ধ্বে উঠে মানুষ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এক হোক।'

কথায় কথায় রাত্রি শেষ হয়ে এল। ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল; শোনা যাচ্ছিল পাখীর কলকাকলি। ওরা সবাই উঠে পড়ল। প্রাতঃকৃত্য, স্নান, জলযোগ সেরে পুনরায় গিয়ে বসল অধিবেশনে। গত সন্ধ্যায় ছিল অনুভবধর্মী সাহিত্যালোচনা; আজকের আলোচ্য বিষয় ছিল মননধর্মী সাহিত্য; চলল বেলা বারোটা অবধি।

স্বভাবতঃই, সীতাংশুর ভালো লাগছিল স্থানীয়

শিল্পীদের বাউল গান। একেবারে এখানের মাটির মানুষের গান, কণ্ঠে বা সুরে কোন কৃত্রিমতা ছিল না।

.অধিবেশন শেষে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে, গরুর গাড়ী চেপে, কাঁচি পথ দিয়ে রাঙা ধুলো উড়িয়ে ওরা ফিরে এল।

সীতাংশু যা আশংকা করেছিল, দেখল তাই সত্যি।

আশ্রমের আদর্শ তিলুটিয়ার সীমানা ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হয়েছেন যত জ্ঞানিগুণিজন। কেননা, গাড়ীর মধ্যেই, পরস্পরের মাথা ঠোকাঠুকি করতে করতে ওরা আশ্রমেরপ্রতিষ্ঠাতা ঋষি কবি হক্ সাহেবের কথাবার্তা আর মুদ্রাদোষগুলি নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মশগুল হল।

চৈতী হাওয়ার দুপুরে

স্বামী সত্যানন্দ

চৈতী হাওয়ার দুপুরে মাধবী ফুলেরা যেন
উদাস পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়

কৃষ্ণচূড়ার শুকনো শাখায় হাওয়া লাগে
যেন ঘুম না ভাঙ্গা একটা স্বপ্ন।

খোলা হাওয়ায় গঙ্গার বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে-
ছায়া ছায়া দূর দিগন্তে চাপা একটা কথা।
একটা ষ্টিমার ধুঁকছে বার্দ্ধক্যের জীর্ণতা নিয়ে।
দূরের মিলগুলো মাঝে মাঝে যেন
ডুকরে কেঁদে ওঠে—
অনেক মানুষের পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যথার সে কান্না।
ধূসর আকাশেও যেন একটা কান্নার ছোপ—
হাওয়ায় হাওয়ায় উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।
দুপুরের ছবিটা যেন
ওয়ার্টসের আঁকা চোখ বাঁধা আশা
একমনে বাজিয়ে চলেছে
করুণ একটা সুর।

———

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

"নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখনই সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক্ আধুনিক। এই আধুনিকটি সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে।" কবিগুরুর উপযুক্ত উক্তি সাহিত্যে আধুনিক বা সাম্প্রতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে।

রবীন্দ্র প্রভাবিত কবিগান ছাড়া আর একদল কবির সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় যাঁদের লেখায় বাংলা কাব্যের বাঁক নেওয়া স্পষ্টতর হয়। তাঁদের মধ্যেও সম্প্রতি তাঁদের লেখনীতে বাংলা কবিতায় অত্যাধুনিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁদেরই আলোচনা এই প্রবন্ধে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার আলোচনা করতে গেলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করেছেন। এদিক দিয়ে জীবনানন্দ দাস ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় পাওয়া যায় সুদূরতা ও ব্যাপকতার ইঙ্গিত। মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ও মূল্যবোধই সাম্প্রতিক কবিতার ভিত্তি। মানবিকতার ক্রন্দন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রতি স্তরে বিদ্যমান। মানুষের সামাজিক জীবনে যে কঠোরতা আর দারিদ্র্য আজ দেখা দিয়েছে তার মধ্য থেকে আধুনিক কবি কখনও রোমান্টিক হতে পারে না; কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে রোমান্টিকতা।

তাই, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পদার্থের সন্ধানের চেষ্টা করা ভুল। কারণ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংশয়, ক্লান্তি প্রভৃতি যেমন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় পাওয়া যায় তেমনি প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়, জাগরণ এবং আনন্দ। আবার কখনো যেমন দেখা যায় সামাজিক জীবনের সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা তেমনি প্রেম আর প্রকৃতির বর্ণনায়ও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা উজ্জ্বল। যেমন—

"প্রেমের তিলকে দিলকে রাঙায়ে নবারুণ রাগ
তরুণ ভালে,
গেয়ে ওঠে পাখী যেন থাকি থাকি কচি কিশলয়
তরুর ডালে।
ফেলে আসে কত জীবন-রাগিণী গেয়ে গেল যেবা
নূতন সুরে;
মরণে বরণ করিতে চাহিল বঁধুরূপে যেবা জীবনপুরে।"

প্রণাম—নরেন্দ্র দে

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় যেমন লক্ষিত হয় অনুভূতি ও আবেগ তেমনি উপলব্ধি করা যায় ঐক্যের মধ্যে বিপরীতের স্থান এবং বিরোধের মধ্যে সংহতির সম্ভাবনা। কেবল রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কতগুলো মতবাদ নিয়ে কেউ কবি হয়ে উঠতে পারেন না। কবির জীবনের সঙ্গে যদি তেমন কোন মতবাদের সামঞ্জস্য থাকে তবেই কবিতায় একটা বলিষ্ঠ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। ধর্মে, দর্শনে বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রিক মতবাদে আস্থাবান হলেই যে কবিতা রচনা সম্ভব তা নয়, হৃদয় দিয়ে সমস্ত মানুষকে চিনতে পারলে সার্থক কবিতা সৃষ্টি সম্ভব। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"নই কাপুরুষ, আমরা মায়ের দুঃসাহসী সুসন্তান,
মান গৌরব কীর্তি দেশের আলোর বাণী দীপ্যমান।"

বন্দেমাতরম্—দিলীপ কুমার র

কোন সময়কে অবাস্তব ও বাস্তব ভাবার ও বানি নেবার কর্তা কবির মন। হয়তো কখনো বিষাদে নৈরাশ্যে হারিয়ে যায় কবির মন; আবার কখনো হ ও আশায় তা ফিরে আসে। এই চাঞ্চল্যকর অবস্থ কবির মন বিচরণ করতে বাধ্য। কারণ, অবস্থা বিপরী হয়েই তরঙ্গায়িত করে মন। তাই একই কবির লেখ কখনো দেখা যায় নৈরাশ্যের ছায়া আবার কখনো ফু ওঠে আশার বাণী।

"হায়রে স্বপ্ন! একী অভিশাপ? স্বাধীন দেশে—

হাহাকার করে দুর্গত প্রাণ ভিখারী বেশে !
অন্নহরণ পাপ ব্যভিচার
ঘরে ঘরে আনে দুঃখ অপার—
কোটি সংসার শূন্যে তাকায় নির্নিমেষে—
নিরাশা তিমিরে স্বাধীনতা ওঠে অট্টহেসে।"

যুগসন্ধি—বিমলচন্দ্র ঘোষ

আবার,

"জীবন পোড়া ছাই উড়ছে কয়লাখনির কবরে,
এবার আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বুঝি হবোরে।

চিত্রিতা

ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজনীতি এমনকি বিজ্ঞান সচেতনও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিশেষত্ব এবং সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই কবিরা তা কাব্যে ব্যবহার করেছেন। ইতিহাস ব্যবহার বিশেষ সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে যেমন জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তেমনি বিজ্ঞান সচেতনায় অমিয় চক্রবর্ত্তী সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল। রাজনৈতিক চেতনা যেমন বিষ্ণু দের প্রখর তেমনি তার নগ্ন প্রকাশ দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়। সমাজচেতনাতেও জীবনানন্দ যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি অত্যাধুনিক সমাজনৈতিক কবি পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের ধ্বংসকে রূপায়িত করলেন।

"কর্মপ্রার্থী কর্ম খুঁজছি।
করুণ মিনতি, একটি কর্ম
যে কোন রকম—পিওন মুহুরী মুটে বা মজুরি—
ছেলেকে হাঁটান, গতর খাটান, পয়সা কামান—
যেমন তেমন জীবন কাটান।
বিধবা মা বোনের অশ্রু মোছান।
লজ্জা ঘোচান একটি কর্ম।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ কবিদের কবিতাই যে শুধু নগরাভিমুখী তা নয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার অধিকাংশ কবিরই দৃষ্টিভঙ্গি নগরকেন্দ্রিক।

"হে প্রেমের দেবতা ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি
আর শহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।"

নাগরিক—সমর সেন

আবার,—

"ট্রাম বাসের ঠাসাঠাসি
আর ট্রাক মোটর লরির
ধোঁয়া ছাড়া ধুলোওড়ানো কাৎরানিতে
নোংরা নষ্ট দিনটা

দিনটা—প্রেমেন্দ্র মিত্র

অত্যাধুনিক কবিদের মধ্যেও বিজ্ঞান চেতনার অভাব লক্ষিত হয় না। তাঁদের বৈজ্ঞানিত দৃষ্টিভঙ্গী কবিতায় তীব্রভাবে প্রয়োগ না হলেও তাঁদের রচিত কবিতায় সুন্দর বিজ্ঞান প্রয়োগ দেখা যায় :

"কারখানার গর্ভে জন্মে এরোপ্লেন শুভ্র ফেননিভ—
সদ্যোজাত গোবৎস মনন
ফ্যাক্‌টরী সুতিকাগারে জন্ম নেয় ইলেক্‌ট্রিক ব্রেন
যেন জাতিস্মর শিশু শাস্ত্র পারঙ্গম আশ্চর্য।"

রহস্যময়ী—জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী

সুশীল রায় তাঁর কবিতায় লিখলেন—

"উপবাসী ফুসফুসে ঢুকে পড়ে—
অক্‌সিজেন ভরা একরাশ হাওয়া—
অগ্নিদগ্ধ চাঁদ উঠে আসে
মেঘের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চিমনীর ধোঁয়া।"

চিত্রযামিনী—সুশীল রায়

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় আধ্যাত্মিকবাদ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা কবি নিবারণ করেন তাঁদের কবিতায়।

"উড়বে যেথাই—মা, তোর নিশান বাসবে ভালো
দুই নয়ন
"জয় মা ভারত"—গাইব যখন, উঠবে কেঁপে
তিন ভুবন।"

—বন্দেমাতরম্—দিলীপকুমার রায়,
চিত্রিতা।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিগণ বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির ইঙ্গিত দিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাই মন্ত্র ও যন্ত্র তাঁদের কাছে একাকার হয়েছে—

"ওঁ—
চুণ সুরকির ভাঙ্গা চোঙ"।

——

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

আধঘণ্টার মধ্যেই গৌরী ঘুমিয়ে পড়লো। এরকম শান্তির ঘুম সে তিনসপ্তাহের মধ্যে একবারও ঘুমোয় নি। আধি এবং ব্যাধি এই দুটোই যেন গৌরীর দেহ মন ছেড়ে চলে গেল কিন্তু একরাশ আধি এসে সমীরের মাথায় ওপোর বোঝা হয়ে চেপে বসলো! গৌরীকে অঘোরে ঘুমুতে দেখে সমীর ধীরে ধীরে নিজের কোল থেকে তার হাতটা নামিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এলো, ওষুদের গেলাসের ভাঙা টুকরোগু'লা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে হাতের চেটো দিয়ে দেওয়ালের দাগগুলো বেশ করে মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের জঞ্জালের ক্যানেস্তারার ভাঙা কাচের টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে বেশ করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেল্লে। তারপর কিছু পয়সা নিয়ে সাইকেলটা বার করে ঘরের দরজা ভেজিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লো। পরনে লুঙ্গিটা যেমন ছিল তেমনই রইলো এবং পনর বিশ মিনিট পরে ঠিক সেইরকম একটা ওষুধ খাওয়ার গেলাস কিনে নিয়ে ফিরে এসে তেমনই নিঃশব্দে সাইকেল তুলে বউদির ঘরে ঢুকে টেবিলের যথাস্থানে নতুন কেনা গেলাসটিকে ধুয়ে উপুড় করে রেখে দিলে। সদা যেন ঘুণাক্ষরেও গেলাস-পর্ব্বের কিছুমাত্র বুঝতে না পারে। গৌরী তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছিল।

সব কাজ শেষ করে বাইরের ঘরে নেওয়ারের খাটে এসে যখন সে চিৎ হয়ে শয়ন করলো তখন সেই নির্ব্বিকার টাইমপিসে দেড়টা বেজে গেছে এবং দিল্লীর এই অঞ্চলের মাধ্যাহ্নিক নীরবতা ধ্যানাসনে স্তব্ধ বিভোর হয়ে বসেছিল।

কিছুক্ষণ পরেই ঘরের ভেতরের দরজার পরদাটা ধীরে ধীরে নড়ে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল রেণু। সমীর ওর ফোলা-ফোলা মুখের দিকে চেয়ে রইলো, স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, অনেকখানি অশ্রু-পাতের পর সে এইমাত্র চোখে মুখে জল দিয়ে এ ঘরে এসেছে একটা কিছু বোঝাপড়ার জন্য। সমীর সবটা বুঝে নিয়ে কোন কথা না বলে নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো নতুন একটা বর্ষ.পর জন্য। কিন্তু রেণু সেরকম কোন পর্ব্বেরই সৃষ্টি করলো না। গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে বল্লে, আমি আজই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আপনাকে বলতে এলুম।

তেমনি শুয়ে শুয়েই সমীর প্রশ্ন করলো, কোথায় যাবে?

রেণু বল্লে, জানি না।

এখানে অন্য কোন লোকের সঙ্গে চেনা আছে? নির্ব্বিকার প্রশ্ন।

না, উত্তরের অনুরূপ নির্ব্বিকার ভাব।

তবে? এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় দাঁড়াবে?

রাস্তায়।

তাহলে এমন করে বেরুবে কেন, তার চেয়ে টাকা কড়ি গুছিয়ে নিয়ে দেশে চলে যাও।

দেশে কেউ নেই।

তবে এইখানেই থাকো। তোমায় ত কেউ কিছু বলছে না।

কোন উত্তর না দিয়ে রেণু যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে ঘরের পরদা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

এর পর বহুক্ষণ যাবৎ সমীর স্থির হয়ে শুয়ে রইলো। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা উচিত তার কোনো মীমাংসাই সে করতে পারলে না। শেষে টাইমপিস ঘড়িতে একেবারে যখন চারটে বাজলো তখন ওর জ্ঞান হোল যে, তিনটের সময় বৌদিকে আর এক দাগ ওষুধ দেওয়ার কথা ছিল।

সমীর তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলো। পরদা সরিয়ে কোনরকম নাড়া না দিয়েই সে যখন গৌরীর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো, তখন দেখলে গৌরী খাটের ওপোর আরশী নিয়ে বসে চুল বাঁধছে। সমীরকে দেখেই গৌরী বেশ সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, ঘুম ভাঙ্গলো।

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বল্লে, হ্যাঁ। তারপর ওষুধ খাওয়ার কথা হতেই গৌরী শ্লেষ করে বল্লে, হ্যাঁ গো মশাই, খুব ত ওষুধ খাওনর দরদ! বলি এতদিন কে ওষুধ খাওয়াত যে, তুমি না খাওয়ালে আমার সময়ে ওষুধ খাওয়া হবে না?

সমীর ওর খাটের এক পাশে বসে বল্লে, কে খাওয়াত গৌরী?

নিজেই খেতুম, আজই না হয় তোমায় বন্ধু সোহাগ করে তোমায় ওষুধ খাওয়াতে বলে গেছেন, তা তুমি ত খুব খাওয়ালে!

কেন, বারোটার সময় ওষুধ দিতে আসিনি?

হ্যাঁ এসেছ, কিন্তু সে যেন স্বাতীনক্ষত্র থেকে হাওয়ায় ভর করে নেমে-আসা। মাটীর ওপোর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ত এতক্ষণে আসা হোল বাবুর। তবে হ্যাঁ, তোমার গেলাসের ভেজালটা আসলের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে, সে জন্য তোমায় অশেষ ধন্যবাদ।

সমীর বল্লে, ওষুধ খাওয়ার আধঘণ্টা পরে হরলিক্স খাওয়া হয়েছে ত?

কি করে হবে, কে দেবে?

কেন রেণু?

কই? সে কোথায়? সারা বাড়ীতে নেই পোড়া মুখকে ত দেখ্‌তে পেলুম না। সবিস্ময়ে সমীর প্রশ্ন করলে সে কি, কোথায় গেল সে? খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে গৌরী বল্লে, পাখী উড়ে গেছে সাগরের পার—কে জানে, কাশী মশী কোথায় গেছে। সমীরকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে গৌরী বল্লে আহা, তোমায় একটু বাতাস দেব, বুকে হাত বুলিয়ে দেব, একটু জল খাবে?

এই কুৎসিত পরিহাসে সমীরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। মুখে কিছু না বলে সে বল্লে, রেণু কি মাঝে মাঝে এরকম বেড়াতে যায় না কি?

মোটেই নয়। কোন্ চুলোয় যাবে সে? এখানে কি তার বাবা খুড়ো কেউ আছে না কি?

তবে?

তবে খুঁজ্‌তে বেরোও তাকে; আর না হয় ত ফটো দিয়ে কাগজে ছাপিয়ে দাও, বলো আমার একচক্ষু হরিণ কোথায় গেছ, ফিরে এসো। একটু থেমে বল্লে ওহো, তার ফটো ত একখানাও নেই, তা হলে কি হবে? গৌরীর মুখে যেন কত চিন্তার ভাব!

সমীর আর থাক্‌তে পারলে না, বল্লে, কি যে কর বৌদি? একটা আশ্রিতা মেয়ের সঙ্গে সমানে সমানে যেন—

যেন কি? সতীনের মতো ব্যবহার করি? সেটা কি আমার দোষ, না তোমার? যদি রেণুকেই তোমার পছন্দ, তাহলে আমার সর্ব্বনাশ করলে কেন?

সমীর বেশ জোরের সঙ্গে বল্লে, আমি যে রেণুকে পছন্দ করি সেকথা তোমায় কে বল্লে? যেদিন দিল্লী থেকে চলে যাই, সেদিনের যা কিছু ঘটনা সে সমস্তই ত তোমার জন্যে। তুমিই ত রেণুকে যত্ন করতে বলেছিলে। তারপর আজ এখানে এসে অবধি রেণুর সঙ্গে একটা কথাও ত বলি নি।

সমীরের কথা শেষ হওয়ার পর গৌরী বেশ একটু মৌন থেকে ধীরে ধীরে অথচ পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বল্লে, দেখ ঠাকুরপো, মেয়েরা বোকা হতে পারে, কিন্তু এই জাতটাকে ভালোবাসার ব্যাপারে বোকা বানাতে চেষ্টা কোরো না। পুরুষেরা ভালোবাসা নিয়ে খেলা করে মেয়েরা করে সাধনা। রেণুকে কোন কথা তুমি বলেছ কি না, তা তুমিই জানো, কিন্তু বলো আর নাই বলো, তোমার ভেতরের দরদ রেণুর জন্য না থাক্‌লে সে কখনই

এই তিন সপ্তাহ ধরে তোমার জন্য তপস্যা করতো না। এই তিন সপ্তাহে সে যদি মনে প্রাণে তোমার হয়ে না যেত, তাহলে ঐরকম করে সকালেই তোমার বাক্স খুলে বসতে পারতো না। আমি তার যে ভাবগতিক দেখেছি, তা'তে বুঝেছি, সে তোমাকে নিয়ে মরেছে, এবং যতদিন বেঁচে থাকবে, তোমার জন্যই মরবে।

তা সে জন্য আমি আর কি করবো আমার অপরাধটা কোথায় ?

তোমার অপরাধ এই যে তুমি সেই ঝি মাগিটাকে, সেই কানিটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। পুরুষে ভালোবাসতে সুরু না করলে মেয়েরা কখনও বাসে না। পুরুষে জোর দিয়ে টানে মেয়েরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। তারপর পুরুষ এক খেলা থেকে অন্য খেলায় মেতে ওঠে, আর মেয়েরা আজীবন ধরে ব্যর্থ সাধনায় তিলে তিলে মরে।

তা বৌদি তোমার যদি এতই টন্‌টনে জ্ঞান তাহলে নিজে এরকম ছোটলোকের মত ঝগড়া কর কেন? আমার জন্য ভেবে ভেবে রোগ করেই বা বসলে কেন ?

কারণ আমিও নারীর। একটু থেমে বল্লে, এই এক কথায় তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল।

চুল বাঁধা শেষ করে গৌরী উঠে পড়লো। বল্লে, বোসো ঠাকুরপো, অনেকদিন বিকালে গা ধোওয়া হয় নি। একটু হাতে মুখে সাবান দিয়ে আমার হরলিক্স আর তোমার চা তৈরী করে দিই।

ব্যস্ত হয়ে সমীর বল্লে, সে কি কথা! শয্যাশায়ী রোগী তুমি—

বলতে বলতেই গৌরী খাট থেকে নেমে পড়লো। বল্লে, বাধা দিও না। আজ নিজে হাতে কাজ করতে ভয়ানক ইচ্ছে করছে। বরঞ্চ তুমি আমায় সাহায্য করতে পারো। হ্যাঁ, তুমি ততক্ষণ ষ্টোভটা ধরাও, আমি দুমিনিটের মধ্যেই আসছি।

গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সমীর স্থির হয়ে খাটের ওপোর বসেই রইলো।

নয়

সাড়ে পাঁচটা নাগাধ সদাশিব রোজ বাড়ী ফেরে। পাঁচটার সময় সমীর বেশ একটু চেষ্টা করেছিল বাইরে যাওয়ার জন্য, গৌরী ওকে কিছুতেই ছাড়ে নি। বল্লে, বন্ধু এলে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, তোমার শুশ্রূষার জোর কত। একদিনে আমার শরীরের কতটা উন্নতি তুমি করে দিয়েছ সেটা তাকে মেপে নিতে বোলো।

সমীর বল্লে, সেটা কি ভালো হবে বউদি ? তুমিই বল। রেণু নেই, শুধুমাত্র দুজনে আমরা সারা দিন ধরে বাড়ীতে রয়েছি সে যদি কিছু মনে করে ?

প্রশ্নটায় গৌরীকে যেন একটু ভাবিয়ে দিলে। দুমিনিট থেমে সে বল্লে, সে ভার আমার ওপোর, সেজন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শুধু তোমার বন্ধুকে বলবে যে চারটের পর থেকে রেণুকে আর পাও য়া যাচ্ছে না এবং ঐ সময় থেকেই আমি নীরোদবাবুদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছি। বুঝলে ত? এর পর তোমরা অন্য গল্প কোরো।

সমীর অবাক্ হয়ে গৌরীর কথাগুলো ভাবতে লাগলো। তার মনে পড়লো প্রতিভা দিদিকে, সমীরদের পার্টির সার্ব্বজনীন দিদিমণিটিকে পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য যত কিছু মায়াজাল বিস্তার করা হোত, তার অধিকাংশই ছিল প্রতিভা সেনগুপ্তের রচনা। এমন কি সমীররা যেদিন ধরা পড়ে, সেদিনও হয়ত ওরা ধরা পড়তো না, যদি প্রতিভা তার দুদিন আগে পার্টিরই অন্য কাজে ওদের দল ছেড়ে অন্যত্র চলে না যেত। এই প্রতিভাকে পুলিশ কোন দিনও ধরতে পারে নি।

প্রসাধন, হরলিক্স পান এবং চা খাওয়ানো শেষ করে গৌরী একখানা চিরুনী নিয়ে কোনো রকম দ্বিধা না করে খুব যত্ন করে সমীরের মাথা আঁচড়ে দিলে তারপর চিরুনীটা নিজের আঁচলে পরিষ্কার করে যথাস্থানে রেখে সমীরের কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে এসো ভাই এবার বাইরের ঘরে গিয়ে বসা যাক্।

মাথা আঁচড়ানো পর্ব্ব সমীরের ভালো লাগলেও সে যেন উদাসীন আনমনা হয়েই ছিল। গৌরীর দুষ্টামীভরা আনন্দিত মুখখানার দিকে চেয়ে সে বল্লে, চল।

এর পর ওরা দুজনেই বাইরের ঘরে অর্থাৎ সমীরের ঘরে এসে বসলো। ঘড়িতে তখন পাঁচটা কুড়ি।

পাঁচটা পঁচিশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে সমীরের

ডেক চেয়ারের কাছে এসে হঠাৎ তার মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে তার কপোলে, কপালে এবং মাথার ওপোর এঁকে দিলে ওষ্ঠের ছাপ, একটার পর একটা আগ্রহপূর্ণ, আন্তরিকতাপূর্ণ, পুনঃপ্রাপ্তির প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ! এক-চ্ছত্রাধিপতির নিশ্চিত স্বাক্ষরপূর্ণ জলন্ত সেই ছাপ। তার-পর দ্বিধামাত্র না করে বাইরের দরজা দিয়ে গৌরী বেরিয়ে গেল, বারাণ্ডা পার হয়ে গাছের বেড়ার ফাঁক দিয়ে নীরোদবাবুদের বাড়ীর দিকে। অতর্কিতে সমীর তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ এবং কপাল মুছতে লাগলো, তার মুখে যেন জলন্ত সিগারেটের আগুনটা ঠেকে গেছে, বুকের মধ্যে কি একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা, একটা খুনী-খুনী ভাব। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে একটা সিগারেট ধরালে।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিতে দিতেই তার স্পষ্ট মনে পড়লো রেণুকে। আহা, সে এখন কোথায়? এই বিরাট্ দিল্লীর কোন্ রাস্তায়, কোন্ অজ্ঞাত পরিবেশের মধ্যে বেচারী রেণু সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় রয়েছে। সেই কথাটা মনে পড়তেই সমীরের সমস্ত মন রেণুর জন্য একযোগে হাহাকার করে উঠলো। গৌরীর কথা-গুলো আর একবার করে সমস্তই ওর মনে হতে লাগ্লো। তীক্ষ্ণবুদ্ধি গৌরী হয়ত ঠিকই বলেছে। রেণু হয়ত সমীরকেই একমাত্র নির্ভর বলে মনে করেছিল, অথচ এই মনে করার ফল কি? যে নির্ভরতার স্থান তার ছিল, সেটুকুও চিরকালের জন্য মুছে গেল। এখন রেণুর জন্য বাকী আছে শুধু মৃত্যু। আর যদি—

মনে হতেই সমীর শিউরে উঠলো। দিল্লীতে খারাপ লোকের অভাব নেই। রেণুর সৌন্দর্য্য নেই বটে, কিন্তু বয়স আছে। কেউ যদি রেণুকে নিয়ে গিয়ে ছ'মাস ভোগ করে শেষে রুগ্ণ অপটু অবস্থায় ছেঁড়া জুতোর মত রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে—? রেণুর শেষ কথাগুলো সমস্তই সমীরের মনে পড়তে লাগ্লো। পৃথিবীতে আপনার বল্তে কেউ তার কোথাও নেই। দেশেও সে যাবে না, সে যাবে রাস্তায়। কিন্তু রাস্তার খবর ত সে জানে না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সদাশিবের আশ্রয়ে এসে দিন তার কেটেছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়নি একটুও। এই অনভিজ্ঞা নারী—

সমীর আর স্থির থাকতে পারলো না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। টাইমপিস ঘড়িতে টং করে সাড়ে পাঁচটা বাজলো। বারাণ্ডায় বেরিয়ে সিগারেটের শেষ অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একবার মনে করলে গৌরীকে ডাক দিয়ে বাড়ীতে এনে নিজে একবার বেরোয়, অথচ ডাকতে গিয়ে কেমন একটা বাধা এলো। ঐ অতি-ব্যগ্র নারী যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণই মঙ্গল। অথচ বাড়ী খালি রেখে সে যাবেই বা কেমন করে। ইতস্তত করে ঘড়ির দিকে দেখে সমীর লুঙ্গি ছেড়ে বুশকোট আর প্যাণ্ট পরে, পায়ে কাবুলী চটির ষ্ট্রাপ এঁটে সাইকেলটা বার করে তৈরী হয়ে রইলো, সদাশিব অফিস থেকে ফিরতেই সে বেরোবে। কিন্তু কোথায় যাবে, তার ঠিক নেই।

পাঁচটা চল্লিশ হয়ে গেল, তখনও সদাশিবের দেখা নেই। সমীর ছট্ফট্ করতে লাগ্লো।

গৌরীও সেই যে পাশের বাড়ীতে গিয়ে বসে আছে তারও কোন পাত্তা নেই। একটু ভেবেচিন্তে সমীর আবার ঘরে ঢুকলো, সিগারেটের গোটা টিনটা নিঃশেষ করে সে সবগুলোই পুরে নিলে কেসের মধ্যে, বাক্স থেকে সবগুলো টাকা সে নিজের মণিব্যাগে ভরে নিলে, সাইকেলের পাম্পটা কি জানি কেন টেবিল থেকে তুলে এনে গাড়ীতে লাগিয়ে নিলে, আলোটা নেড়েচেড়ে দেখে নিলে তেল ভর্ত্তি আছে কিনা। ইত্যবসরে দেখা গেল সদাশিব বাড়ীর হাতায় এসে প্রবেশ করছে।

মুখ তুলে সমীরকে সাইকেল নিয়ে এই অবস্থায় দেখে সদা বল্লে, কি, বেরুচ্চো নাকি?

সমীর বললে, হ্যাঁ, তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। রেণু বাড়ীতে নেই, কোথায় যেন গেছে, আর বৌদি গেছে পাশের বাড়ী বেড়াতে—

এ্যাঁ? পাশের বাড়ী বেড়াতে! সে কি? সদাশিবের কণ্ঠে যেন আর্ত্তনাদ!

সমীর বল্লে, হ্যাঁ, ভালোই আছে, বললে বেড়াতে যাচ্ছি।

সদাশিব পাশের বাড়ীর দিকে চেয়ে বল্লে, কখন গেছে, কতক্ষণ হোল।

এর উত্তর দিতে সমীর কেমন অস্বস্তি বোধ করলে। সে বল্লে দেখ্না, ডেকে পাঠা না, আমি একটু বেরুচ্ছি,

দরকার আছে। এই বলে আর অপেক্ষা না করে সমীর তার সাইকেলে চড়ে রওনা দিলে। সদাশিব ইতস্ততঃ করে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে সমীর তার নিজের অজ্ঞাতসারেই রওনা দিলে বিড়লা মন্দিরের দিকে। মন্দিরের সামনে এসে তাড়াতাড়ি নেমেই গেটের পাশে সাইকেল ষ্ট্যাণ্ডে চাবি দিয়ে গাড়ীটাকে আট্‌কে দরোয়ানের ঘরে জুতো রেখে জুতোর টোকেন নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকলো। দ্রুতপদে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সমস্তটা ঘুরে নিয়ে সেখান থেকে নেমে এসে বাগানে গেল। বাগান, গুহা, পাশের বাড়ীর ছবিঘর শেষে ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘুরে নিয়ে নিতান্ত চিন্তিত হয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে হঠাৎ দ্রুতগতিতে জুতো পরে সাইকেল নিয়ে গেল কালীবাড়ীর দিকে। কালীমন্দিরের চারিদিকে ঘুরে সেখান থেকে পরাজিতের মনোভাব নিয়ে যখন পুনরায় রাস্তায় এলো, তখন প্রায় সাড়ে ছয়টা। আপন মনেই সাইকেল চালিয়ে সে গেল ষ্টেশনে। ষ্টেশনের ষ্ট্যাণ্ডে গাড়ীখানা চাবি দিয়ে রেখে সমীর প্ল্যাটফরমের বাইরে মেয়েদের ওয়েটিং রুমের ধারে ধারে ঘুরে শেষে ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকে হতাশভাবে এদিক ওদিক দেখে বেরিয়ে এসে গাড়ীর চাবি খুলে গাড়ীখানা ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে খানিকটা চল্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন সমীরের নাম ধরে ডাক্‌লে, সমীরবাবু!

ডাক্‌টা তার কানে ঠিক পৌঁচেছে কি না ঠিক নেই, তারই পাশে এসে খুব আস্তে সাইকেল চালিয়ে টপ্‌ করে নেমে পড়লো অর্জ্জুনপ্রসাদ শর্ম্মা, এখানকার কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মী। চোস্ত উর্দ্দুতে বল্লে, সমীরবাবু, কোথায় যাচ্ছেন।

সমীর অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে, ঠিক নেই, এদিক ওদিক ঘুরছি।

অর্জ্জুনপ্রসাদ তার অনির্দ্দিষ্টভাব দেখে বল্লে, চলুন গান্ধীঘাটে। একবার ঘুরে আসি।

সমীর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—হঠাৎ গান্ধীঘাটে কেন? রাত্তিরে কি আছে সেখানে?

অর্জ্জুন বল্লে, আজ কিছু নেই, তবে কাল সকালে ক'জন আমেরিকান ভি আই পি সেখানে যাবেন, সেজন্য আজ বিকেল থেকে ওখানে কিছু কাজ হচ্ছে। সেইটেই তদারক করতে যাবো। আপনিও চলুন-না, বেড়িয়ে আস্‌বেন।

সমীরকে ইতস্ততঃ করতে দেখে অর্জ্জুনপ্রসাদ তার পিঠে হাত দিয়ে বল্লে, চলিয়ে জী চলিয়ে, এবং তারপর একরকম জোর করেই তাকে সাইকেলে চড়িয়ে দুজনে মিলে রওনা দিলে গান্ধী ঘাটের দিকে।

গান্ধীঘাটে যখন তারা পৌছাল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সমস্ত বাগান ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, এবং কয়েকজন লোক তখনও কিছু কিছু কাজ করছে। অর্জ্জুনপ্রসাদ সাইকেল থেকে নেমে এদিক ওদিক দেখে সর্দ্দারের সঙ্গে কথা কইতে সুরু করে দিলে, আর সমীর ওদের থেকে একটু দূরে সাইকেলখানি হাতে নিয়ে আপন মনে এদিক ওদিক দেখতে লাগ্‌লো। হঠাৎ খানিকটা দূরে সন্ধ্যার আবছায়ায় নজরে পড়লো, কে যেন বসে আছে!

কে?

সমীর তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে চল্‌লো। জায়গাটা নিচু বলে সমীর চট্‌ করে হাতের সাইকেলখানা মেঝেয় কাৎ করে রেখে পায়ে-হেঁটে এগিয়ে চল্‌লো। তার মতো করিৎকর্ম্মা লোকের মনেও পড়লো না, যে তেলের আলোটা থেকে সব তেলই মাটীতে পড়ে যেতে পারে।

লাফিয়ে লাফিয়ে উঁচুনিচু জায়গাগুলো কোনমতে পার হয়ে তাড়াতাড়ি সেই মূর্ত্তির কাছে এসে দেখে, পেছন ফিরে চুপ করে বসে আছে রেণু!

রেণু—

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। তার চোখমুখ ফুলে উঠেছে, জুতো পায়ে প্রচুর ধুলো। উঠেই রেণু একেবারে অঝোরে কেঁদে ফেল্লে।

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সমীর চাপা গলায় রেণুকে বল্লে, চুপ কর, কেঁদো না, লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে।

রেণু মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতেই লাগ্‌লো।

সমীর বল্লে, এসো! রেণু চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলো।

একটু ভেবে নিয়ে সমীর বল্লে, তুমি ঐধার দিয়েই আস্তে আস্তে ওপোরে ওঠো, আমি সাইকেলটা নিয়ে আসি ওঠো—ও—

রেণু নিঃশব্দে সমীরের প্রদর্শিত পথ দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

সমীর ছুটে এসে সাইকেলখানা তুল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে, অনেকখানি মাটী ভেলে ভিজে গেছে। অন্যসময় হলে নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে সে ধিক্কার দিত, কিন্তু আজ যেন কোনো ক্ষতিই তার ক্ষতি বলে মনে হো'ল না। এক দৌড়ে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল পথ দিয়ে সে রেণুর দিকে এগিয়ে চল্‌লো। অর্জ্জুনপ্রসাদের কাছে বিদায় জানিয়ে আসা যে দরকার সেটা তার মনেও রইলো না।

রাস্তার ওপোর এসে সমীর প্রথম কথা কইলে। ডাক্‌লে, রেণু!

কোন উত্তর নেই। সে স্থিরভাবে হাঁটছে।

সমীর বল্লে, তুমি এই এতদূরে গান্ধীঘাটে এসেছ কেন?

রেণু যেন পুতুলের মতই হাঁট্‌তে লাগ্‌লো।

বলো, যা জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দাও, সমীর বেশ জোর করে প্রশ্ন করলে।

ভেবেছিলাম, এটাই এখানকার শ্মশানঘাট,—উত্তরটা যেন বহুদূর থেকে হাওয়ায় ভেসে এল।

কি করে এলে?

পথের লোককে জিজ্ঞাসা করে।

কেন এলে?

কোন উত্তর নেই।

এতটা হেঁটে কষ্ট হয় নি? প্রসঙ্গ বদ্‌লে সমীর প্রশ্ন করলে।

না।

হেঁটে ফিরতে পারবেত, কষ্ট হবে না?

এতক্ষণ পরে রেণু মুখ তুলে চেয়ে দেখলে, বল্‌লে, কোথায় ফিরবো?

বাসায়।

না।

তবে? তবে কোথায় যাবে?

জানি না।

দেখ রেণু, ওরকম পাগ্‌লামী কোরো না। আমার কথা শোন, বাসায় ফিরে চল।

না, রেণুর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

দুজনেই রাস্তার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এদিকে অন্ধকারটা বেশ গাঢ়। হতাশ হয়ে সমীর বল্‌লে, তবে আমি তোমায় নিয়ে কোথায় যাবো?

কোথাও না।

কোথায় থাক্‌বে তুমি?

শ্মশানে।

তারপর?

কাল আর আমাকে দেখতে পাবেন না। একটু থেমে বল্‌লে, আজই আমায় দেখতে পেতেন না, তবে ঐ লোকগুলো এখানে ছিল বলে তাই চুপ করে বসেছিলুম।

মরবে?

হ্যাঁ।

তাতে লাভ?

আমার লাভ নেই, কিন্তু আপনাদের আছে। হঠাৎ ধরা গলায় বল্‌লে. কেন আমায় লোভ দেখালেন?

অনুনয় করে সমীর বল্‌লে,দোষ হয়েছে রেণু, ফিরে চল।

কোথায় নিয়ে যাবেন?

যেখানে হোক্‌।

দিদিমনি রাগ করবে না?

করুক।

কি আমার পরিচয় হবে?

যা হয় একটা কিছু, কিন্তু এ ভাবে নিজের জীবনটা নষ্ট কোরো না।

না, সে হয় না, যার কেউ নেই, তার যম আছে।

আমারও কেউ নেই।

কেন? আপনার বউদি আছে। পিসিমা আছেন; আপনার টাকা আছে, কিন্তু আমারত কিছুই নেই, কেউই নেই।

একহাতে সাইকেলটা ধরে অন্য হাতে খপ্‌ করে রেণুর কালো হাতখানা ধরে সমীর বল্‌লে, কেন? তোমার আমি আছি।

রেণু চুপ করে রইলো।

তবে চল আমার সঙ্গে সমীর অনুনয় করলে।

পায়ে রাখ্‌বেন?

রাখবো। দূর থেকে তীব্র একটা হেড্‌লাইটের

আলো এসে পড়লো, সমীর তাড়াতাড়ি রেণুর হাতটা ছেড়ে দিলে।

গাড়ীখানা ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। দিল্লী কংগ্রেসের একখানা হাফ্ বাস্, সাম্‌নে তিনরঙা ধ্বজা উড়ছে।

আপনি আমায় আশ্রয় দেবেন? রেণু আর একবার প্রশ্ন করলে।

দেব, সমীর পুনরায় উত্তর দিলে।

আলো দেখ্‌লেই হাত ছেড়ে পালাবেন না ত?

সমীর চম্‌কে উঠ্‌লো, নিরক্ষর রেণুও এ রকম কথা জানে। গৌরী ঠিকই বলেছে, প্রেম মেয়েদের সাধনাই বটে শিক্ষা-দীক্ষার গুরু।

বলুন, বলুন, বলুন ছোট দা-বাবু।

সমীর নীরব।

রেণু বল্‌লে, কোথায় রাখবেন আমায়?

সমীর চুপ করে রইল।

একটু ভেবে চিন্তে রেণু বল্‌লে, আমায় কেন আপনার পিসিমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দিন না। সেইখানেই থাকবো, আর আপনার পিসিমাকে দেখা শুনা করবো।

এতক্ষণ পরে নিদারুণ অন্ধকারে সমীর একটা স্পষ্ট আলো দেখ্‌তে পেলে। সাগ্রহে বল্‌লে তাই যাবে? বেশ, সেইখানেই তোমায় পাঠিয়ে দেব।

ম্লান হয়ে রেণু বল্‌লে তবে চলুন, কাশীতেই যাবো।

দুজনে ধীরে ধীরে পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলো। দুজনেই নীরব।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর সমীর ডাকলে, রেণু।

কি?

আজ রাত্তিরে কোথায় থাকবে?

যেখানে রাখ্‌বেন।

বাসায়, সদাশিবের বাড়ীতে?

না, ওখানে আর যাবো না, তার চেয়ে বরং রেল ষ্টেশনে থাকি না কেন?

সে হয় না, সমীর উত্তর দিলে।

রেণু থেমে গেল। বল্‌লে, তাহলে আমি এই খানেই থাকি। দু' একদিন পরে আপনার সময় হলে এখান থেকে আমায় নিয়ে কাশী যাবেন।

অল্প হেসে সমীর বল্‌লে, তাও কি আবার হয় নাকি? এখানে থাক্‌বে কোথায়, খাবে কি?

কিছুই খাবো না, উপোষ করে গাছতলায় বসে থাকবো।

পাগল নাকি? একটু ভেবে বল্‌লে, তবে চল, আজই তোমায় কাশীতে নিয়ে যাই।

আপনার অফিস?

সে যা হয় হবে'খন। দু'জনে আবার হাঁটতে সুরু করলে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর পেছন থেকে পুনরায় মোটরের হেড লাইট পড়লো। ওরা দুজনে পথের পাশে সরে দাঁড়িয়ে দেখলে সেই আগের হাফ-বাসখানা তিনরঙা ধ্বজা উড়িয়ে ওদেরই দিকে আসছে।

সমীরের মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাত তুলে গাড়ীটাকে থামিয়ে দেখলে ড্রাইভারের পাশে অর্জ্জুনপ্রসাদ বসে আছেন। অর্জ্জুন-প্রসাদ দরজা খুলে নেমে এসেই রেণুকে দেখে একটু বিস্মিত হতেই সমীর ইংরাজীতে বল্‌লে, অর্জ্জুন প্রসাদ, ইনি আমাদের দেশের মেয়ে, মাথার গোলমাল আছে, অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরছেন আজ হঠাৎ গান্ধীঘাটে এঁকে পেয়ে গেলুম। এখন আমাদের ষ্টেশন অবধি পৌঁছে দিন।

নিশ্চয় নিশ্চয়,—অর্জ্জুনপ্রসাদ সোরগোল করে বাসের ভেতর কুলীদের সরিয়ে রেণুর জন্য জায়গা করে দিলে। কুলীরাই সমীরের সাইকেলখানা উঠিয়ে নিয়ে অর্জ্জুন প্রসাদের সাইকেলের সঙ্গে একসঙ্গে রেখে দিলে, তার পর সমীরকে নিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে অর্জ্জুন আর সমীর দুজনে ঠাসাঠাসি করে বসে গাড়ীতে আবার ষ্টার্ট দিলে। কথায় কথায় অর্জ্জুন বল্‌লে, আমি আমার সর্দ্দারকে বল্‌ছিলুম, তোমাদের বরাৎ ভালো তোমরা আজ গাড়ী পেয়েছ, না হলে আমার বিশ্বাস ছিল, গাড়ী আজ আসবে না কুলীদের হেঁটেই যেতে হবে, তাই আমি সাইকেল নিয়ে বিকেলে এসেছিলুম, এখন দেখছি এ গাড়ী কুলীদের বরাতে আসে নি, এসেছে আপনার ঐ নিরুদ্দেশ বহিনটির নসিবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ষ্টেশনে এসে পেঁছাল

সমীর বাস থেকে নেমে অর্জ্জুনকে বললে, শর্ম্মাজী, আপনি আমার সাইকেলটা আমার এত নম্বর কোয়ার্টাসে´ পৌঁছে দিয়ে দয়া করে আমার অমুক অফিসে একটা চিঠি দিয়ে দেবেন কি ?

অর্জ্জুন বল্লে, হঁ্যা কেন দেব না ? কিন্তু আপনি কোন ট্রেনে দেশে যাবেন ?

সমীর বললে, দেশে যাবো না, যাবো কাশীতে এর পিসিমার কাছে ।

অর্জ্জুন বললে হবে আপনি বাসা থেকে ঘুরে আস্তে পারেন স্বচ্ছন্দে ট্রেন ত ছাড়বে রাত্রি দশটা নাগাধ ।

সমীর ইতস্ততঃ করে বললে না তাতে অসুবিধে আছে। আর দেখুন আমার বাসায় সাইকেলটা দেওয়ার সময় যেন এই মেয়েটির কোন কথা বলবেন না, বুঝলেন। কারণ নানারকম লোক সব আছে ত ? কে কি মনে করবে দরকার কি ?

অর্জ্জুন সমীরের মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে বললে আচ্ছা। একটু থেমে বললে···অফিসে কি চিঠি দেব।

সমীর একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, থাক, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আমি আমার অফিসারকে ষ্টেশন থেকেই টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু কাইগুলি বাইকটা—আচ্ছা, এক কাজ করুন না, গাড়ীখানা আপনার কাছেই রাখুন, আমি ফিরে এসে আপনার বাড়ী থেকেই ওটা নিয়ে নেব।

অর্জ্জুন বললে আচ্ছা সে যা হয় হবে। এর পর দু'জনে 'নমস্তে' বিনিময় করে অর্জ্জুন পুনরায় বাসে উঠল। সমীর রেণুকে নিয়ে দিল্লী ষ্টেশনে ঢুকে পড়ল।

ট্রেনের তখনও প্রায় দু'ঘণ্টা দেরী। সমীর রেণুকে বললে—রেণু কি খাবে বল দেখি। গান্ধীঘাটের রাস্তায় দ্বিতীয়বার বাস-গাড়ীর আলো দেখ্তে পাওয়ার পর থেকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত রেণুর সঙ্গে কোন কথাই তার হয় নি, সে বেচারা আপন মনেই ছিল। ষ্টেশনের অত্যন্ত ভিড় ও কোলাহলের মধ্যে সমীর রেণুকে এই প্রশ্ন করলে।

রেণু খুব সহজভাবে উত্তর দিলে, যা দেবেন।

রহস্য করার স্পৃহা যেন সমীরের হঠাৎ বেড়ে গেল। বললে, যা দেব ? যদি বলি চপ, কাটলেট, ডিম, মাছ তাহলে—

আপত্তি নেই, রেণু নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিলে।

সবিস্ময়ে সমীর বললে, সে কি ? তুমি ত এমনটা ছিলে না।

রেণু তেমনি নিলিপ্তভাবে উত্তর দিলে—আপনি আমায় বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। আপনি এখন আমাকে যা খুসি করতে পারেন, আমার কোনো কিছু মতামতই আর নেই।

আশ্চর্য্য! তোমার সমস্ত নিষ্ঠা আমার জন্য ছেড়ে দিচ্ছ ?

রেণু চুপ করে পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো।

এর পর ওরা দু'জনে এসে ঢুক্লো ষ্টেশনের নিরামিষ ভোজনালয়ে। এর বেশী বাড়াবাড়ি করতে সমীর সাহস পেলে না। রেষ্টুরেণ্টের সাবান নিয়ে হাত ধুয়ে রেণুর হাত ধুইয়ে ওকে টেবিলে বসাতে গিয়ে ওরা দুজনেই অনুভব করলে যে, রেণুর কাপড় চোপড় এবং খালি পায়ের সঙ্গে সমীরের প্যাণ্ট এবং বুশ কোট এতই বেমানান হয়ে পড়েছে যে, অনেকেই এই বিসদৃশ জিনিষটা লক্ষ্য করতে সুরু করেছে। হয়ত বা পুলিসেও নজর দিতে পারে।

দুজনে তাড়াতাড়ি পুরী-মিঠাই খেয়ে নিয়ে বড় কাপের ভালো চা পান করে দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এসে সমীর বল্লে, রেণু, তুমি একটু বোসো, আমি টিকিট করে নিয়ে আসি। তা'হলে কাশীর টিকিটটাই করি, কি বল ?

রেণু নীরবে সমীরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কি যেন সে বল্তে চায়! কি বল্বে কিছু ?

বড় ইচ্ছে ছিল—বলেই রেণু মাথাটা হেঁট করলে।

কি, কি ইচ্ছা ছিল রেণু, বল-বল, চট্ করে বলে ফেল।

খুব কাছেই শুনেছি মথুরা বৃন্দাবন অনেক গল্পও শুনেছি, কিন্তু একবারও দেখা হয় নি।

বৃন্দাবন ? বৃন্দাবন ? আচ্ছা, তোমার এ সাধটাও মিটিয়ে দিচ্ছি। তুমি বোসো, আমি টিকিটটা করে আনি।

একটা বেঞ্চের ওপোর রেণুকে বসিয়ে সমীর চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে সে ফিরে এলো, তার হাতে একটা কাগজের বড় প্যাকেট। এসেই বল্লে, চল গাড়ী এসে গেছে।

কিন্তু সোজা পথে প্ল্যাটফরমে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো না। ষ্টেশনের ইয়ার্ডের ভেতর দিয়ে ওরা এসে উঠলো

সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। কামরাটি ছিল গভীর অন্ধকার!

গাড়ীর রড ধরে উঠে দরজা খুলে কামরার মধ্যে ঢুকে হেঁট হয়ে রেণুর হাত ধরে সমীর রেণুকে টেনে তুললে। গাড়ীতে ঢুকে রেণু বল্‌লে, উঃ কি অন্ধকার!

সমীর একটা দেশলাই জ্বেলে বল্‌লে, হ্যাঁ, এটা প্যাসেঞ্জার গাড়ী, রাত্রি এগারটায় ছাড়বে, ভোর বেলা মথুরায় যাবে, সেখান থেকে গাড়ী বদল করে বা মোটরে বৃন্দাবন গেলে পর সাড়ে ছ'টা নাগাদ বৃন্দাবনে পৌছাব। এখন ভালো করে শুতে পারো। সারারাত এই গাড়ীতেই কাটাতে হবে।

রেণু দরজার পাশের বেঞ্চিতে আড়ষ্ট হয়ে বসলো।

সমীর দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ার আগেই একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটটায় একবার করে জোরে টান দেয় আর ঘরে অল্প একটু আলো হয়। কয়েকটা টান দিয়ে সে যেন একটু সহজ হয়ে নিলে, তারপর রেণুর দিকে কাগজের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললে, রেণু, এতে তোমার কাপড় জামা কিনে এনেছি আমারও একটা তোয়ালে একটা লুঙ্গি আছে। তুমি এই অন্ধকারে তোমার ঐ জামা-কাপড় বদলে নাও, নইলে বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে।

রেণু প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললে, আপনি আমার জন্য এত খরচ করছেন কেন?

সে উত্তর পরে দেব, এখন যা বল্লুম কর দেখি।

রেণু অন্ধকারেই কাপড় জামা বদলে নতুন ধোয়া কাপড় পরে নিলে। নিজের ময়লা কাপড় জামা আলাদা পুঁটলী করে সরিয়ে রেখে বসতেই সমীর রেণুর গায়ের কাছে এগিয়ে এলো। অন্ধকারেই রেণু তা বুঝতে পারলে; তার মধ্যে জেগে উঠলো নিদারুণ এক ভীতি এবং সেই সঙ্গে অপূর্ব শিহরণও বটে।

সমীর এলো রেণুর একেবারে গায়ের কাছে। এসে তার গায়ের কাছে মুখটা নিয়ে খুব আস্তে অতি সন্তর্পণে তার কানে কানে বললে, আমায় দাদা বলে ডাকবে, খুব সহজ হয়ে থাকবে আর 'তুমি' বলবে, নইলে লোকে সন্দেহ করতে পারে। হয়ত এর মধ্যেই চর লেগেছে, এখানে ভয়নক মেয়ে চুরি হচ্ছে কি না!

রেণু যে রকম আশা বা আশংকা করছিল, তার কিছুই নয়, অন্য ব্যাপার। সে একটু ভীত হয়ে তেমনি ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, আচ্ছা। একটু থেমে বললে, কেন, দাদাকে কি আপনি বলা যায় না?

[ক্রমশঃ]

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিংশতি মন্ত্র (১।১।২০)

মন্ত্র—যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥

অর্থ—(নচিকেতা বলিলেন) "মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে—কেহ বলেন "আছে", আর কেহ বলেন "নাই"—আমি আপনার কাছে এই বিষয়ে উপদেশ জানিতে চাই। আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর।"

ব্যাখ্যা—নচিকেতার এই উক্তি খুবই স্বল্প কিন্তু এত গভীর যে এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া ইহার পর সমস্ত উপনিষদখানি ব্যাপিয়া চলিবে। "মৃত মনুষ্য" বলিতে নচিকেতা কি বলিতে চান? কেবলমাত্র যে মানুষ ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। বরং নচিকেতা বলিতে চান, সেই মানুষ যাঁহার শরীর পাত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম দেহ উভয়েই একসঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সূক্ষ্ম দেহ মানুষকে পরলোকে টানিয়া লইয়া যায় ও তাহাই আবার ধরাধামে পুনর্জন্মের অবস্থায় ফিরাইয়া আনে। এক্ষণে যে মৃত মানুষের মরণের সঙ্গে ইহলোক শেষ হইল, পরলোক ও সমাপ্ত হইল, তাহার কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? সে কোন অবস্থায় থাকে তাহাই নচিকেতা জানিতে চা'ন।

নচিকেতা বলিতেছেন, আমি শুনিতে পাই, কেহ কেহ বলেন, সেইরূপ মৃত ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারা কি করিয়া সে কথা বলেন, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। এখানে নচিকেতা বৈদিক ঋষিদের উল্লেখ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, উক্ত মৃত মনুষ্যের ইহলোক ও পরলোক আর পৃথকরূপে তাঁহার কাছে থাকে না, তাহারা উভয়ে আত্মলোকে পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ আত্মাতে মিলাইয়া যায় এবং সে মৃত মনুষ্য আত্মা হইয়া যান বা কেবলমাত্র আত্মায় থাকেন। আত্মা বলিতে যাঁহা আকাশের ন্যায় সীমাহীন বিস্তার সর্ব্বদা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। সেই আকাশ হইতে সবকিছুর সৃষ্টি বা জন্ম হয় এবং অন্তে সবকিছু সেই আকাশে মিলাইয়া যায়। (গীতায় বল হইয়াছে, প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্ (৯।১৮)। কিছুই নষ্ট হয় না, কিছুই হারায় না। সবহারার দেশে সবহারার সব কিছু জমা থাকে। আবার সময় আসিলে, নূতন কল্পে আত্মার "ঈক্ষণে" যাহা সৃষ্টি হইবার হইতে পারে। আত্মাকে "বিভু" বলিয়া ঋষিগণ জানেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, তাঁহারা কি করিয়া এসব তত্ত্ব জানিতে পারেন? তাঁহাদেরও ত পূর্ব্ব মন্ত্র অনুসারে শরীর ও মন বুদ্ধিতে স্থান পাইয়া জীবন যজ্ঞে পুড়িয়া কর্ম্ম সমর্পণ হইয়াছে (১৫ মন্ত্র)। এক্ষণে বলা যাইতে পারে, যে বুদ্ধি (Intellect) পর্য্যন্ত এইরূপে ছাই হইলে তাহা হইতে যে নূতন আলোক বা দৃষ্টিভঙ্গী লাভ হয় তাহাকে বলা হয় "বুদ্ধি যোগ" (Intuition)। এই প্রকার সাধকদের সাহায্যের জন্য যে আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়, তাহা জানিতে হয়। ভৌতিক, দৈবিক ও যজ্ঞ ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহাদের নিজের বলিতে যাহা, সমস্তই যখন উপহার দিতে পারিলেন, তখন নামিয়া আসে তাঁহাদের জীবনে আত্মার করুণা "বুদ্ধি-যোগ" রূপে (গীতা, ১০।১০)। এইবার প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ। তাহার পর তত্ত্বজ্ঞানের সূচনা। বুদ্ধি চরম গতি প্রাপ্ত হইলে পর তবে বুদ্ধি যোগ পাওয়া যায়। তখন সেই যোগের সাহায্যে উপলব্ধ হয় যে আত্মা আছেন ও সেই আত্মায় সকলই সর্ব্বকালে ছিল, আছে ও থাকিবে। নচিকেতা বালক হইলে কি হয়, তিনি এ সকল কথা যেমন শুনিয়াছেন তাহা স্মৃতি মন্দিরে

সঞ্চিত রাখিয়াছেন। কিন্তু সত্যকে স্মৃতিরূপে রাখিয়া কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, তাহাকে জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে তবে শান্তি হয়। নচিকেতা সেই শান্তির ভিক্ষা করেন, যমের কাছে।

তাই নচিকেতা স্পষ্ট করিয়া যমরাজকে ইহাও বলিলেন যে অপরদিকে অনেকে ঘোষণা করেন যে মৃত মনুষ্য যাহার ইহলোক ও পরলোক অবসান হইয়াছে, যাহার স্থূল শরীর ও সূক্ষ্মদেহ "নির্ব্বাণ" প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। আর যদি অনির্ব্বাণ বা আত্মা বলিয়া কেহ থাকে, সেরূপ রাজ্যহীন রাজার সংবাদ লইয়া লাভ কি? মৃত মনুষ্যের জীবন ত সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া গেল, যদি জগৎ মণ্ডলে তাহার অস্তিত্বের ভাঙাচোরা কিছুটা সাক্ষ্য পড়িয়া থাকে, তাহাও সেই জগৎ মণ্ডল সাথে লইয়া সেইভাবে মহাশূন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই মহাশূন্যে সব শেষ, সে কথাও তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন। নচিকেতা জানিতে চান, ইহাই কি তবে বুদ্ধি (Intellect) দ্বারা লভ্য চরম সত্য, যাহার মধ্যে পরম শান্তি খুঁজিতে হইবে?

যতক্ষণ বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ অহংকার থাকিবেই। আমিত্ব নিঃশেষ হইলে তবে ঈশ্বরকে দেখা যায়। দুইটি আলো একত্র প্রকাশমান হইলে উভয়ের প্রভাব ঠিকমত ধরা যায় না। একটি আলোক (বুদ্ধি) যাহাকে নির্বাপিত করা যায়, তাহা করিলে পর (বাহিরে স্বার্থ এবং অন্তরে অহংকার ত্যাগ হইলে) তবেই অপরটি (ঈশ্বরের আলোক, যাহাকে ভজনা পূর্ব্বে সম্ভব হইয়াছে) সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া আত্মা রূপে দেখা দে'ন। আর যতক্ষণ বুদ্ধিরূপ ব্যক্তিগত ক্ষীণ আলো থাকিতে চায় ততক্ষণ বুদ্ধি নিজেকে প্রচার করিয়া ক্রমশঃ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় ও আত্মার আগমনী সংবাদ যখন আসে, তখন সাধক নীরব হইয়া গিয়াছেন।

নচিকেতা নীরব হইবার পাত্র নহেন। পুষ্প যেমন আলোর জন্য না জানিয়াও সারা রাত জাগিয়া অপেক্ষা করে, তাঁহার হৃদয় সেইরূপ ধৈর্য্য ধরিয়া যমরাজের মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, যদি গুরুর কৃপা হয়।

একবিংশতি মন্ত্র (১।১।২১)

মন্ত্র—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥

অর্থ—(যম বলিলেন) এই তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে (সৃষ্টি-কালে) দেবতাগণ কর্তৃক সংশয় করা হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম এত সূক্ষ্ম যে উত্তমরূপে উপলব্ধি করা সহজ নহে। তুমি নচিকেতা, অন্য বর প্রার্থনা কর। আমাকে আর উপরোধ করিও না। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া, এই বর গ্রহণের অভিলাষ ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা—আবার মন্ত্রের বাক্যগুলি ধরিয়া অর্থ খুঁজিতে হয়। প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষ কথা "পুরা" অর্থাৎ পূর্ব্বে। সৃষ্টির আদিপর্বে যখন দেবতাদের আবির্ভাব হইল, তখন তাঁহারা দেখিলেন তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই আত্মা অনেক কিছু স্বীয় "ঈক্ষণ" দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন (ঐত উপ, ১।১।৪ দ্রষ্টব্য)। কাজেই দেবতারা, তাঁহাদের পূর্ব্বেই আত্মা কোথা হইতে আসিলেন, কি করিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে এইটুকু বুঝিলেন যে একজন মালিক আছেন ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকাই ভাল। কোন কোন দেবতাও যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে কথাও জগতের কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে শোনা যায়। মোট কথা, আত্মাকে ঠিকমত বুঝিবার সাধ্য দেবতাদের ছিল না (গীতা, ১০।২ দ্রষ্টব্য)। সেইজন্য তাঁহাদের সন্দেহ রহিয়া গেল।

আত্মা আছেন এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপ সম্বন্ধে দেবতারা যেমনই বুঝুন, তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম কি, তাহা তাঁহারা কোনমতে ধরিতে পারিলেন না। তাই দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে পাই, "নহি সুবিজ্ঞেয়ম্ অণুরেষ ধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ আত্মা এতই সূক্ষ্ম, অণুর ন্যায়, যে তাঁহার ধর্ম্ম মোটেই সুবিজ্ঞেয় নহে। আত্মাকে এখানে সর্বপ্রথম "অণু" (Atom) বলিয়া নামাঙ্কিত করা হইল, তাহা ভুলিবার নহে। কিন্তু Atomic power, অণুর ধর্ম্ম, অণু কি করিতে পারে, অথবা অণুকে দিয়া কিছু করান যায় কি না ও কেমন করিয়া করান যায় তাহা দেবতাদের দ্বারা বিজ্ঞাত হইল না। দেবতারা দাস মাত্র, দাস কি কখনও প্রভুকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া তাঁহার সহিত একত্ব অনুভব

করিতে পারেন? ইহা কোন শাস্ত্রেই বলে না। এই উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা পরমেশ্বরের ভয়ে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন (২।৩।৩)। অথচ, গীতা হইতে জানিতে পারি যে জ্ঞান ও যোগে অবস্থিত অমৃতের পুত্রগণ যে সকল গুণের দ্বারা বিভূষিত হ'ন, তাহাদের মধ্যে "অভয়" অন্যতম (১৬।১)। সেইজন্য প্রভুকে জানিতে পারেন, প্রভুর সন্তানরা, যাঁহাদের তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে লালন পালন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, তাঁহারা হলেন ঋষি। ঋষিদের এইভাবে প্রাপ্ত জ্ঞানই "বেদ"। বেদ সনাতন। তাহারই সাহায্যে, দেবতাগণ তাঁহাদের সময়ে আত্মার কথা জানিতে পারেন। বেদ হইতে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া দেবতারাও যে জ্ঞানবান হ'ন, সে সাক্ষ্য-যমরাজ স্বয়ং পরের বল্লীতে বেদের উল্লেখ করিয়া যখন আত্মতত্ত্বের স্তরগুলি বুঝাইবেন (১।২।১৫), তখন স্পষ্ট হইবে। যমরাজ এক্ষণে হয়ত ভাবিতেছেন, নচিকেতার এখন সে সব বুঝিতে অনেক বিলম্ব। এই প্রসঙ্গে আমাদের নচিকেতার পক্ষ হইতে ইহুদী ধর্মশাস্ত্রের একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে, "A little child shall lead the way." তাই আমরা নচিকেতার অনুসরণ করিতে চাই। শিশুর স্বভাবই এইরূপ যে, যাহা তাহাকে দেওয়া হয় না বা দিতে বিলম্ব করা হয়, তাহা না পাইলে তাহার যেন প্রাণ বাঁচে না। নচিকেতা যেন আমাদের তাঁহারই মত উৎকণ্ঠিত করিতে পারেন, তবেই আমরা তাঁহার সাথে চলিতে পারিব। এই বরের পরিবর্তে অন্য কিছু লইয়া কি হইবে?

নচিকেতা যাহা বলিবার বলুন।

[ক্রমশঃ]

পুরুষকার

শ্রীবিমলজ্যোতি দাস

তোমার অক্ষয় তূণে যত আছে চোখা চোখা শর,
একে একে সব হানো অনাবৃত এ বক্ষের' পর।
নিঃশব্দে সহিব আমি, হে নিয়তি, সমস্ত প্রহার,—
রণে ভঙ্গ দিব না তবুও। তব কাছে বারংবার
পর্যুদস্ত হইয়াও তুচ্ছ করি লজ্জা অপমান
নূতন সংগ্রামে পুনঃ জানাইব তোমারে আহ্বান।
যুদ্ধের লাগিয়া আমি জন্ম লই মানব-সত্ত্বায়;
সামর্থ্য সীমিত, কিন্তু অন্তহীন এ অধ্যবসায়।
জয়-পরাজয় ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে;
অমর, অদম্য আমি, এই মোর গৌরব সংসারে॥

ছায়াপৃথিবী

দাদাঠাকুর—শরৎ পণ্ডিত—

বাংলা দেশে যে মানুষটি গত ৬০ বৎসরেরও বেশী দিন সকলের কাছে দাদাঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর আসল নাম শরৎ পণ্ডিত। তিনি মুর্শীদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের অধিবাসী। গত ২৬শে জানুয়ারি শুক্রবার সকালেই তাঁর জন্মদিনেই ৮৭ বৎসর পূর্ণ করিয়া দুই পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ছেলেবেলায় পিতৃ মাতৃহীন অবস্থায় কাকার নিকট প্রতিপালিত হন এবং কয়েকদিন কলেজে পড়িয়া পড়া শুনা ছাড়িয়া দেন। দরিদ্র হইলেও ছেলেবেলা হইতেই তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও তেজস্বী, তাই কোন চাকুরী না করিয়া প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নাম দিয়া একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। তাহার পূর্বে তিনি ছাপাখানার কাজ মোটামুটি শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতে ছড়া এবং কবিতা লিখিতে অভ্যস্ত থাকায় সবদাই তাঁর মুখে কবিতা ও ছড়া শুনা যাইত।

কলিকাতা হইতে ৪৫ টাকা মূল্যে কাঠের একটি ছাপাখানা কিনিয়া জঙ্গীপুরে তাহা স্থাপন করেন। টাইপ রাখিবার জন্য কাঠের বাক্স ক্রয় না করিয়া মাটির ছোট ছোট ভাঁড় রাখিয়া তাহাতে টাইপ রাখিতেন। তাঁহার কাগজের তিনি নিজেই লেখক, কম্পোজিটার, প্রেসম্যান এবং হকার ছিলেন। কাজেই তাঁকে লাভ লোকসানের হিসাব রাখিতে হইত না। সব কাজ নিজে হাতে করিয়া যা উপার্জন হইত তাহা দিয়া সংসার চালাইতেন। ২০ বৎসর আগে পর্যন্ত তিনি ঐ ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর ছড়া ও কবিতা খুব মধুর হইত। তাহাতে গালাগালি থাকিলেও কেহ রাগ করিত না।

আমরা তাঁহাকে ৪৭ বৎসর পূর্বে কলিকাতা নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীটে ৺নির্মল চন্দ্রের বাড়িতে প্রথম দেখি। জীবনে কখন জামা-জুতা পরেন নাই। শীতকালে দিল্লীতেও সাদা চাদরের উপর কম্বল জড়াইয়া সভা সমিতিতে যোগদান করিতেন। তখন ৺চন্দ্র মহাশয় দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। দাদাঠাকুর তাঁহার খুব প্রিয় ছিলেন এবং সঙ্গে করিয়া দিল্লী লইয়া গিয়া সারা ভারতের নেতাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেন। দাদাঠাকুর বাংলাতে যেমন কবিতা ও ছড়া তৈয়ারি করিতেন, ইংরাজীতেও তেমনি কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার হাস্যকৌতুক শুনিয়া সারা ভারতের নেতারা আনন্দ অনুভব করিতেন। দাদাঠাকুর জীবনে কোনদিন ধনী হইতে পারেন নাই। আমরা তাঁহাকে কলিকাতার রাস্তায় সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি।

কলিকাতাতেও তিনি বিদূষক নামে একখানি ছড়ার কাগজ প্রকাশ করিয়া নিজে তাহা বিক্রয় করিতেন। একটি অসাধারণ শক্তিমান ও গুণিলোক হইয়াও তিনি টাকা রোজগারের জন্য কখন ব্যাকুল হন নাই। সামান্য কিছু আয় হইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং জীবনের বেশী সময় জঙ্গীপুরের বাড়িতে কাটাইয়া দিয়াছেন। এত দীর্ঘ দিন সুস্থ জীবন খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বাংলা দেশের সবচেয়ে আনন্দের কথা দাদাঠাকুরের জীবিত অবস্থায় সিনেমাতে তাঁহার জীবনের ছবি তৈয়ারি হইয়াছিল এবং সেইজন্য দাদাঠাকুর কোটি কোটি লোকের নিকট পরিচিত হন।

লোক তাঁহাকে জীবন্ত না দেখিলেও ছবিতে তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। সারাজীবন তিনি দেশপ্রেম ও জাতীয়তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং নিজের জীবনে সে আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি জীবনে কিছু চাহেন নাই। তথাপি দেশ যে তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দান করিয়াছে এটাই আমাদের কাছে বড় কথা। তাঁহার আদর্শ দেশের মানুষ শ্রদ্ধার সহিত পূজা করুক ইহাই আমরা কামনা করি।

সকলের সঙ্গে আমরাও তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই।

কৃষিকথা

পশ্চিম বাংলার সৌভাগ্য বশতঃ ১৯৬৭ সালে ধানের উৎপাদন ভালই হইয়াছিল। পূর্ব বৎসর হইতেই সরকারী কর্মচারীরা অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহু নূতন স্থানে খাল কাটিয়া বা গভীর নলকূপ বসাইয়া চাষের জমিতে বার মাস জল সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় ১৯৬৭ সালে পশ্চিম বাংলার অনেক জমিতে এক বৎসরে তিনবার ফসল উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ভাল বীজ সরবরাহ, সার বণ্টন প্রভৃতিরও উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সকল সত্বেও ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে সহসা গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্তিত হইল। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রী সভা পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া নূতন পদ্ধতি চালাইতে লাগিল। তাহাতে চাষীদিগকে বহুপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, ভাগ্য ভাল থাকায় উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় অধিকাংশস্থানে ফসল ভালই ফলিয়াছে। একদিকে যেমন কৃষকদিগকে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে অন্যদিকে সরকারী কর্মচারীরা প্রচুর চাল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার ফলে গত তিন মাস রাষ্ট্রপতির শাসন সময়ে বাংলা দেশের চালের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে।

রেশন অঞ্চলে উপযুক্ত মূল্যে কয়েকমাস ভাল চাউলই পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিরাট এলাকায় যেখানে রেশন অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না সেখানে আংশিক রেশন অবস্থা চালু হইয়াছে এবং যেখানে রেশন অবস্থা নাই সেখানে লোকে একটাকা হইতে দেড়টাকা মূল্যে প্রচুর চাউল কিনিতে সক্ষম হইতেছে। চাউলের দরের উপর অন্যান্য খাদ্যের দাম নির্ভর করে। তাহার ফলে ডাল, তেল, গুড়, তরিতরকারী প্রভৃতির দামও বেশী বাড়িতে পারে নাই।

রাষ্ট্রপতি শাসনের তিনমাসে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারী কর্মচারীরা তৎপর হইয়াছেন। তাহার পিছনে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের উৎসাহ ও চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। গত ১লামের সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ১১শত গেজেটেড্ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করিয়া ২৭৭ জন অফিসারকে দোষী স্থির করা হইয়াছে। এখন রাজ্যপালের সম্মুখে এক ভীষণ সমস্যা উপস্থিত। বহু সংখ্যক রাজকর্মচারী যদি দুর্নীতি পরায়ণ হয় তাহা হইলে কাহাদের লইয়া রাজ্যপাল রাজ্য শাসন করিবেন? তিনি বারবার দিল্লী যাইয়া ও তথায় আবেদন নিবেদন করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ লইয়া তিনি কি ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবেন! যাহাতে আরও অনেক জমিতে বৎসরে তিনবার খাদ্য শস্য উৎপন্ন করা যায় সেজন্য কয়েক-শত গভীর নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে; বহু জায়গায় ছোট ছোট খাল কাটিয়া গভীর জলাশয় হইতে জল চারি-দিকে বিতরণের আয়োজন হইতেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে যাহাতে অধিক ফসল উৎপন্ন করা যায় সেজন্য অসংখ্য পরিকল্পনা তৈয়ারি হইয়াছে। দেশের জন-সাধারণ অধিকাংশই আজ দুর্নীতি পরায়ণ। অভাবে যে স্বভাব নষ্ট হয়, তাহা চারিদিকে চাহিলেই আজ বুঝিতে পারা যায়। সকলের চেয়ে বড় কথা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি। পুলিশ বিভাগে দুর্নীতি সর্বাপেক্ষা অধিক। কিভাবে দেশকে বাঁচান যাইবে তাহা প্রত্যেকেরই চিন্তার বিষয়।

আগামী সাধারণ নির্বাচন—

তিন মাস পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ও বিধান পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে যাহারা এম, এল, এ, হইয়াছিলেন তাহারা মাত্র ৯ বৎসর কাজ করিবার বা বেতন পাইবার সুবিধা ভোগ করিয়াছেন। গত তিন মাস এম, এল, এ, ও এম, এল, সি, সকলেই বেকার। পূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, আগামী নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন হইবে। কিন্তু নভেম্বর ফসল তোলার সময়। কাজেই সে সময়ে কৃষকদের পক্ষে দু'একদিনও নষ্ট করার সময় থাকিবে না। সেজন্য নির্বাচন আরও পিছাইয়া দেওয়ার কথা চলিতেছে। নির্বাচন যখনই হউক না কেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিকদল-গুলি গত দুই মাস ধরিয়া নির্বাচনের জন্য আয়োজন শুরু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে একক দল হিসাবে কংগ্রেস এখনও সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে

কংগ্রেস বিধান সভায় ২৮০টি আসনের মধ্যে ১৩০টি পাইয়াছিল। বাকী ১৮টি দল একত্র হইয়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করিয়া কয়েক মাস শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা চালায়।

তারপর সংখ্যায় কম হইয়া ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে তিন মাস মন্ত্রী সভা চলে। কংগ্রেস ২০ বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বড় দল হইলেও কাজে যোগ্যতা দেখাইতে পারে নাই। কাজেই আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস যে সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইবে একথা বলা চলে না। কংগ্রেসবিরোধী দলগুলি সকলে মিলিত হইতে পারে নাই। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা নেতা আছে। তাহার সকলেইমুখ্যমন্ত্রী বা অন্ততঃমন্ত্রী হইতে চায়। কোন কোন দলের সদস্য সংখ্যা এত কম যে তাহাদের পক্ষে বিধান সভায় নিজেদের বাঁচাইয়া রাখই কঠিন। গত তিনমাসের খবরে জানা যায় কংগ্রেস বিরোধীদল-গুলির মধ্যে কে বা কাহারা নেতা হইবে তাহা লইয়া প্রত্যহ বৈঠক বসিলেও সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই।

কমিউনিষ্টরা এখন তিনটি বড় দলে বিভক্ত।:(১) দক্ষিণ কমিউনিষ্ট, (২) বাম কমিউনিষ্ট এবং (৩) নক্সালবাড়ী। পি এস, পি দল ঠিক করিয়াছে তাহারা যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে কাজ করিবেনা। কংগ্রেসের মধ্যে শক্তিশালী নেতা নেই। বাহিরে দলাদলি না থাকিলেও ভিতরের দলাদলি কংগ্রেসীদের মধ্যে একতা আনিতে দেয় না। যাহারা কংগ্রেস পক্ষের সমর্থন পাইয়া প্রার্থী হইবে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের এলাকাতেই একদল কংগ্রেসী তাহাদের বিরোধিতা করিবে। সেজন্য ২৮০টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেওয়া হইলেও নির্বাচনের ফল প্রকাশের সময় দেখা যাইবে নিজেদের মধ্যে দলাদলির জন্য শতকরা ৫০ জনের অধিক প্রার্থী জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত প্রভৃতি স্বরাজ্যে এই অবস্থা চলিতেছে। কোথাও স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে আগামী সাধারণ নির্বাচনের পরও দেশে যে শান্তি ফিরিয়া আসিবে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই দেশের সাধারণ লোক মনে করিতেছে, যে কয়মাস পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন চলিবে সেই কয়মাসই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলের কথা।

বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রপতির শাসন গণতান্ত্রিক না হইলেও কার্য্যকরিতার দিক দিয়া সকলের কাম্য হইয়াছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত। সমাধানের উপায় কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না। চারিদিকে যেরূপ দুর্নীতিও অনাচার বাড়িতেছে তাহাতে কঠোর শাসন বা সৈন্য দ্বারা শাসন হয়ত ভবিষ্যতে অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে, সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং কেন্দ্রেও ঐ একই অবস্থা।

মানুষ নানা দুঃখ, দুর্দশার মধ্যে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই মনে মনে কঠোরতর শাসন বা সৈন্য দিয়া শাসন কামনা করিতেছে। তাহা ছাড়া অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা—

ইহার মধ্যে আনন্দের কথা-যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া লইয়া কঠোর হস্তে দেশশাসনে অগ্রসর হইয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি দিল্লী হইতে টাকা ধার বা ভিক্ষা করিয়া লইয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন অন্য দিকে তেমনি বহু দুর্নীতি পরায়ণ সরকারী কর্মচারীকে নোটিশ দিয়া চাকরী হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বহু ভাল কাজ যাহা গত পাঁচ বৎসরে আরম্ভ করিয়া কিছুটা হওয়ার পর বন্ধ ছিল সেগুলি শ্রীধর্মবীর নিজে পরিদর্শন করিয়া ও কাগজপত্র দেখিয়া যাহাতে অল্পসময়ের মধ্যে শেষ করা হয় সেজন্য আদেশ দিয়াছেন। ফলে দেশের বহু রাস্তা নির্মাণ, খাল কাটা, শিক্ষালয়ের গৃহ নির্মাণ, পুল নির্মাণ প্রভৃতি কাজে জোরের সহিত লোক লাগান হইয়াছে ও দ্রুত কাজ হইতেছে জানিয়া দেশবাসী আনন্দিত হইবেন।

শিক্ষা সংস্কৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা—

স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় ১ কোটি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট বহু কোটি টাকা ব্যয় করিলেও অধিকাংশ টাকাই অপব্যয় হইয়াছে এবং সাধারণ উদ্বাস্তুরা

বিশেষ লাভবান হয় নাই। উদ্বাস্তুদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সর্বত্র স্কুল, পাঠশালা, কলেজ প্রভৃতি সংখ্যায়, অনেক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে কিন্তু শিক্ষা আগেকার মত পদ্ধতিতে চলিতে থাকায় ছেলেমেয়েরা প্রকৃত নাগরিক হইতে পারিতেছে না।

এই অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া ২৪ পরগণা জেলার আগড়পাড়া গ্রামে রেলষ্টেশনের পশ্চিমদিকে একদল নিষ্ঠাবান্ শিক্ষাব্রতী শ্রীসমর মিত্রর নেতৃত্বে দশ বৎসর পূর্ব্বে 'বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির' নামে একটি নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারা দশবৎসর কোনরূপ সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিলে আসল কাজ শিক্ষাদান অপেক্ষা খাতাপত্র ও হিসাব রাখায় জন্য অধিক মনযোগী হইতে হয় এবং দুঃখের কথা সরকারী শিক্ষা পরিদর্শকগণ শিক্ষাদানে অর্থ সাহায্যের সহিত প্রকৃত উৎসাহ না দিয়া বরং বাধা দান করেন। বিদ্যামন্দিরের তরুণ কর্মীরা এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া অর্থাভাব ভোগ করিলেও সরকারী অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে এই ভাবে বীরভূম জেলার বোলপুরের মাঠে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সরকারী অর্থ না লওয়ায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য বিশ্বভারতী বিদ্যালয় আইন করিয়া কবিগুরুর বিদ্যালয়কে উপযুক্ত সম্মান দান করেন।

আমাদের বিশ্বাস 'বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির'ও যদি সকল অসুবিধা সহ্য করিয়া নিজ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে তবে তাহাও এককালে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অবশ্যই লাভ করিবে। বিদ্যালয়টির শিক্ষাদান ব্যবস্থা নূতন প্রকৃতির এবং আমরা দেশের শিক্ষানুরাগী, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে তাহা পরিদর্শন করিতে আবেদন জানাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন—

ভিক্ষু স্বামী বেদানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন জলপাইগুড়ি সহরে একটি নূতন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। বাণীতীর্থ শিশু বিদ্যালয়, নিবেদিতা পাঠাগার, দেশবন্ধুনগর ও অরবিন্দনগর দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র প্রভৃতি এই মিশনের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। দরিদ্র ছাত্রদের স্থান দান ও শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ইহার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় এম, পি, বিশিষ্ট চা শিল্পপতি শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ইহার প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। গত ১৭ই ফাল্গুন শুক্রবার (ইংরাজি ১লা মার্চ, ১৯৬৮) শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথিতে মিশনের নিজস্ব জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিয়া ভিত্তি স্থাপন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের পূজা, বাস্তুপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং বেদমন্ত্র ও স্তোত্রাদিপাঠ করেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীনাথ শাস্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পথ চলতে চলতে রুণু বলল, তুমি যাই বল দাদা, তোমার ঐ কেদার মাষ্টার একটা বদ্ধ পাগল। এখন বুঝছি, ঐ জন্যেই ওকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সুহাস এতক্ষণ মাষ্টার মশাইয়ের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে পথ চলছিল। রুণুর কথায় হঠাৎ তার মনের গ্রন্থিগুলো যেন খুলে গেল।

রুণুর কথায় আহত হয়ে সুহাস বলল, ছিঃ রুণু অমন কথা বলতে নেই। অনেক সময় অনেক জিনিষ ঠিক পরিষ্কার হয়ে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে না বলে, অনেক সময় আমরা বুঝতে না পেরে বিরূপ সমালোচনা করে বসি।

তারপর একটু থেমে সে আবার বলল, এই যে তুই ভদ্রলোককে বদ্ধ পাগল বললি, কিন্তু চিন্তা করে দেখ, আমাদের গ্রামে ঐ যে বড় স্কুলটা হয়েছে, ওখানে পড়বে কারা? যাদের পড়ার সামর্থ্য আছে। আর যাদের সামর্থ্য নেই, তাদের দেখবে কে? তাদের দেখবে ঐ কেদার মাষ্টারের মত বদ্ধ পাগলরা। ওরা পাগল না হলে ঐ পেছিয়ে-থাকা মানুষগুলো এগিয়ে যাবে কি করে?

রুণু এ প্রসঙ্গে আর আলোচনা চালাতে চাইল না। কিন্তু এসব কথা শুনে সুহাসের ওপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কেমন যেন ভরসা পাবার মত মনে হল তার দাদাকে। তাই সে বলল, দাদা, তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতায় যাবে তো?

—সঙ্গে করে এখুনিই নিয়ে যাওয়া যাবে না রুণু। আগে আমি গিয়ে চাকরী জোগাড় করবো, তারপর তোর থাকার মত জায়গার ব্যবস্থা করে তবে তো নিয়ে যাব। তুই মেয়েছেলে, হুট্ করে নিয়ে গিয়ে ফুটপাতে তো রাখতে পারবো না।

এতক্ষণে রুণুর মনে হল সে মেয়েছেলে এবং ঠিক মত থাকার জায়গার ব্যবস্থা না করে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না। নইলে আনন্দের আতিশয্যে সে ভাবছিল, দাদাকে ধরলেই কোলকাতায় চলে যাওয়া যাবে। তবু উৎসাহ দমন না করেই সে বলল, তাহলে কিন্তু গিয়েই আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

আমি গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব।

—কথা দ ও কতদিন পরে?

—ঠিক কতদিন পরে, তাতো বলতে পারবো না রুণু তবে দেখিস খুব তাড়াতাড়ি তোকে কোলকাতা দেখাবো ঘাবড়াসনি, ওখানে নিয়ে গিয়ে এক দারোয়ান-টারোয়ানের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেবো।

—ধেৎ, বিয়েই করবো না ছাই।

—তবে কি করবি?

—পড়বো আর চাকরী করবো। তারপর কি ভেবে সে বলল, আচ্ছা দাদা, তুমি বিয়ে করোনি কেন কোলকাতায় একটা বৌদি থাকলে বেশ ভাল হতো।

—কেন, এখানে এতগুলো বৌদিতে তোর মন ভরল না

—দূর, এগুলো আবার বৌদি নাকি! খালি খাটাবে আর আড়ালে জ্যেঠাইমাকে ভ্যাঙ্গাবে।

—ভয় নেই, সেখানে তোকে কেউ খাটাবে না এমন জায়গায় তোকে রাখবো, সেখানে শুধু খেলবি আর গল্প করবি।

—তা হলেই মা যেতে দিয়েছে? দেখো দাদা, সত্যিই যদি তাই হয়, মাকে যেন জানিও না। তুমি মাকে কিছু করে টাকা পাঠিয়ে দেবে আর বলবে, রুণু বেশ মন দিয়ে চাকরী করছে।

কথাগুলো শুনতে ভারী ভাল লাগল সুহাসের। যেন একটা সরল অবোধ শিশুর সঙ্গে কথা বলছে সে। রুণু দাদার সঙ্গে কোলকাতায় যেতে পারলেই খুশি। কিন্তু দাদার দিকটা চিন্তা করলে বোঝা যায়, রুণু কবে যে কোলকাতার দর্শন পাবে তা হিসেবের বাইরে। তবু বয়েস ধর্মের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা সে বিচারের ধার দিয়েও যায় না। রুণু এতটা আনন্দে ডগমগ করে পা ফেলতে পারতো না যদি একবার দাদার সমস্যার দিকে তাকাতে পারতো।

সুহাস ভাবল, সমস্যার পাশে বিরাট অবোধ আনন্দ যদি না থাকতো তাহলে বোধহয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো প্রতিনিয়ত। হয়ত এই নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের দিনে নির্মল আনন্দটুকুই জগতের বৈচিত্র্য। অন্ততঃ রুণু কোলকাতায় যাবার আনন্দে দীর্ঘদিন আশা-পথের দিকে তাকিয়ে অনেক দুঃখ হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারবে।

দু'জনেই আবার পা দিল বাড়ীর সীমানায়।

রুণু বলল, কোলকাতায় চাকরী করতে যাবার কথাটা যেন ওরা কেউ জানতে না পারে।

সুহাস বুঝল, রুণুর 'ওরা' শব্দের অর্থ জ্যেঠাইমার সংসারের সকল প্রাণী।

বাড়ির উঠোনে উঠতেই থমকে দাঁড়াতে হল সুহাসকে। নুয়ে পড়া, ক্ষীণ দৃষ্টির জ্যেঠাইমা হঠাৎ যে, শাপে কি বরে বোঝা গেল না, যৌবনে ফিরে এসেছেন। একবার তিনি দৌড়ে ঘরে ঢুকছেন আবার তিনি দৌড়ে বাইরের রোয়াকের ওপর এসে দাঁড়াচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন।

সুহাস একটু দাঁড়িয়েই বুঝতে পারল, জ্যেঠাইমা ঝগড়া করছেন কাকীমার সঙ্গে এবং সে ঝগড়ার কারণ হল কাকীমা সোমত্ত মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে সুহাসের মনকে ভিজিয়ে দলে টেনে নেবার জন্যে।

রাগে, দুঃখে, অপমানে সুহাসের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল। লজ্জায় এক মুহূর্তও সেখানে সে দাঁড়াতে চাইল না। পাশেই রুণু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুহাসের মুখ আপনা থেকেই নীচের দিকে নেমে গেল।

এদের দেখতে পেয়ে জ্যেঠাইমা দ্বিগুণ উৎসাহ ও চতুর্গুণ উচ্চ কণ্ঠে রুণুর চরিত্র নিয়ে টানাটানি সুরু করে দিল।

সুহাস দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সোজা এসে দাঁড়াল জ্যেঠাইমার সামনাসামনি।

সুহাসকে কাছে পেয়েই জ্যেঠাইমা বলে উঠলেন, এই যে নদান, কাল তুই বলছিলি না, 'ছোট'কে হাড়ে হাড়ে চিনি, বাবাকে না খেতে দিয়ে দিয়ে মেরেছে?

সুহাস সোজা কথায় উত্তর দিল—না, আমি এ সব কথা বলিনি—এ সমস্তই আপনার বানানো। আমি এ সংসারে দু'দিনের জন্যে এসেছিলাম। আমি চাই, আমাকে নিয়ে কোন কথা যেন আর না ওঠে। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

বলে, সুহাস দ্রুতপদে ঘরের ভেতর ঢুকে জামা কাপড় গোছাতে লাগল।

জ্যেঠাইমা চীৎকারের সঙ্গে এবার হাউ মাউ করে কান্না জুড়ে দিয়ে বললেন, যে ছেলে কাল মাঝ রাতেও আমাকে বলল, জ্যেঠাইমা, তুমি আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ, সেই ছেলেকে এই দু'ঘণ্টার ভেতরেই ধিঙ্গীটা বশ করে নিল!

বলে, রুণু আর ছোটর নামে অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ সুরু করে দিলেন।

সুহাস একটা ছোট পুঁটলি হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে একবার কাকীমার ঘরের দিকে তাকালো।

এতক্ষণ কাকীমা বা তাঁর মেয়েদের মুখ দেখতে পাওয়া যায়নি। এবার কাকীমার মুখটা সুহাসের সামনে ফুটে উঠল। সুহাসের মনে হল কাকীমা নীরবনয়নে শুধু প্রতিকার প্রার্থনার দাবি নিয়ে যেন সুহাসের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাকীমার সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে হল সুহাসের। কিন্তু পরক্ষণেই কাকীমার ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা চিন্তা করে, নীরবেই সে প্রতিকারের চেষ্টা করবে জানিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে আপন মনে পথ চলতে চলতে

ষ্টেশনের রাস্তা ধরল সুহাস। এখন সে কোথায় যাবে, কি ভাবে সুরু করবে তার জীবন সেই হিসেবে ব্যস্ত থাকতে থাকতে এক সময়ে এসে পড়ল নতুন স্কুল বাড়িটার সামনে। সেদিকে সে একবার অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে আবার সুরু করল পথ চলা। আগেকার পাঠশালার পেছন দিকে, যেখানে বেদনার স্মৃতি জড়ানো করবী গাছটা অস্তিত্ব নিয়ে একদিন দুলে উঠেছিল, সেখানে শেষবারের মত একবার তাকাতে গিয়ে দেখল, রুণু দাঁড়িয়ে আছে।

রুণুকে খুব পরিশ্রান্ত বলে বোধ হল সুহাসের। সে অনুমান করল, নিশ্চয়ই রুণু এতটা পথ দৌড়ে অতিক্রম করেছে। তাই সহানুভূতির সুরে সে বলল, কেন এতটা পথ মিছি মিছি কষ্ট করে এলি ?

রুণু বলল, এত বেলায় না খেয়ে চলে যাবে সে হতে পারে না। তুমি ফিরে চল, খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে তারপর যেয়ো।

—এসে যখন থাকতে পারলুম না, তখন আর ফিরে যাবো না রুণু। দুঃখ করিসনি। হয়ত ফিরে গিয়ে দেখবি তোদেরও খাওয়া হবে না এ বেলায়। আমি এখন ষ্টেশনে গিয়ে হয়ত কিছু খেয়ে নেব। কিন্তু ভাবছি তোদের কথা।

বলে, একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুহাস আবার বলল, যে রকমের আঘাতই আসুক না কেন, ভেঙ্গে পড়বি না এক কথায়। সব সময় কেদার মাষ্টারের কথা ভাববি। কত অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েও ভদ্রলোক বলতে পেরেছেন, তাঁকে যতই সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হোক না কেন, তিনি পিছু সরতে সরতে জিততে জিততে যাবেন। এই রকম মনের জোরের অধিকারী হবি। আর সব সময় ভালোর জন্যে এগিয়ে যাবার আশা রাখবি মনে মনে। কোলকাতায় যাচ্ছি, আমার প্রথম চেষ্টা হবে তোকে নিয়ে যাবার। তারপর কাকীমা ও অন্য বোনদের ব্যবস্থা করা। আমি গিয়ে চিঠিতে ঠিকানা লিখে পাঠাবো, উত্তর দিস্। আর কাকীমাকে আমার প্রণাম জানাস্।

রুণু বলল, তা জানাবো। কিন্তু দাদা, তুমি একেবারে যাবার ঠিক না করে চিঠি দিয়োনা। কারণ মাঝপথে যদি ওদের হাতে চিঠি পড়ে তাহলে অতিষ্ঠ করে তুলবে আমাদের।

রুণুর উক্তির সত্যতা বুঝল সুহাস। তারপর মনে মনে ভাবল, এরা কত অসহায়। আত্মীয়-স্বজনের সুখদুঃখের খবরাখবর নিতেও এরা কুণ্ঠিত জ্যেঠাইমার জ্বালায়।

রুণুর পিঠে একটা হাত রেখে তাকে আদরের সুরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিল সুহাস। তারপর বেদনার কষাঘাতের বোঝা মনে নিয়ে এলোমেলো পদক্ষেপে এসে পৌছল ষ্টেশনে।

ট্রেন থেকে নেমে কোলকাতা সহরের দগ্ধ বুকে পা রাখল সুহাস।

পথে কোন উদ্বেগ ছিল না সুহাসের মনে। তখন ছিল হতাশা আর বেদনার হাহাকার। শান্ত মনের ঘূর্ণিহাওয়া ঝড় তুলেছিল তার সমস্ত অনুভূতিতে।

গন্তব্য সহরে পা দিয়ে একটু থমকে দাঁড়াতে হল সুহাসকে। মনের উদ্বেগ নিয়ে চলমান জগতের দিকে তাকিয়ে সামনের সমস্যার মুখোমুখি হতেই রাজ্যের চিন্তা এসে গ্রাস করল তাকে। এখন কোথায় সে আস্তানা গাড়বে, সেটাই হল প্রধান সমস্যা। একবার ভাবল, ভবনাথ বাবুর বাড়ী যাবে। তারপর ভাবল, মাত্র কয়েকদিন আগের কথা, সেখান থেকে বিদায়ের পর্ব শেষ করে সে বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া ভবনাথবাবুর দারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের জন্যেই যখন তাকে চলে আসতে হয়েছিল তখন আর সেখানে যাওয়া চলে না।

হঠাৎ সুহাসের চিন্তারাজ্যে ভেসে উঠল এক ভদ্রলোকের ছবি। তিনি কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছিলেন ভবনাথবাবুর মক্কেল। মানুষ হিসেবে তিনি অতি সদাশয়। পেশায় তিনি জ্যোতিষী। তাঁর জ্যোতিষ যাদু-বিদ্যায় যা সম্ভব হয়নি, ভবনাথবাবুর ওকালতির যান্ত্রিক বিদ্যায় তা সম্ভব হয়েছিল। একমাত্র ভবনাথ বাবুর চেষ্টায় ভদ্রলোক হয়েছেন বিরাট এক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

চিন্তা আর কর্ম-পদক্ষেপের যোগ সাজসে সুহাস এসে দাঁড়ালো সোমনাথবাবুর জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়ের সামনে। ফুটপাত ছেড়ে রাস্তা পার হলেই সাক্ষাৎ মিলবে ভদ্রলোকের। ট্রাম গাড়ীগুলো যেন গতিশক্তি রহিত

হয়ে মন্থর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশই। রাস্তার মোড়ের পুলিস, ট্রাফিক ছাড়তেই আস্তে আস্তে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা হয়ে গেল পথ।

রাস্তা পার হয়ে সুহাস এল জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়ের মধ্যে। সোমনাথবাবু তখনও কার্যালয়ে আসেননি। তাঁর সহকারী সহযোগিতার দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন একটা চেয়ারে।

জ্যোতিষী মহাশয়ের আসার প্রহর গুণতে লাগল সুহাস।

সামনেই বড় রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রাম, বাস, রিক্সা, ট্যাক্সি, লোকজন যাতায়াত করছে অনবরত। সেদিকে তাকিয়ে সুহাস ভাবল, সহরের প্রকৃতিতে গতি আছে। আর সেই গতির বেগে সে গতিশক্তি হরণ করছে আশপাশের স্বাভাবিক পরিবেশের গ্রামগুলোর। সহর আকর্ষণ করছে সমস্ত দেশকে। বাইরের চাক্‌চিক্যের জিপ্‌সি-নৃত্য শুধু ছন্দের তালে দোলাচ্ছে সমস্ত দেহ মনকে। অসারের প্রবাহে সার সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিতালির করমর্দনের উদ্দেশ্যে।

এইতো সহরের আকর্ষণ। সহরকে চিনেছে সুহাস তার গ্রামের 'এল' সেপের বাড়ীগুলোর মধ্যে। কাকাই ক্ষেতের মধ্যে খড়ের মানুষের মত তার অস্বাভাবিক অবস্থিতি। সেই সহরে এসেছে সে, যে সহর একদিন তা'কে আশাহত জীবনের লজ্জা ঢাকতে পাঠিয়ে দিয়েছিল গ্রামে। সুহাসের গ্রামে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সহরও বোধহয় তার সঙ্গে গিয়েছিল। নইলে সহরেই বা আবার ফিরে আসতে হল কেন তাকে?

তার মনে পড়ল সেই কিশোর বেলার কথা। যেদিন এক অনভিজ্ঞ গ্রাম্য কিশোরকে কোলকাতার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। ট্রেনের কামরায় বসে পাশের ভদ্রলোককে সহরের কথা প্রশ্ন করতে করতে নিজের উদ্দেশ্যের কথাও বলে ফেলেছিল সে। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনের কথাও বেরিয়ে পড়ল চোখের জলের সঙ্গে।

ভদ্রলোক আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুহাসের সরলতায়। তাই তাকে সঙ্গে করে তিনি উঠেছিলেন নিজের বাসায়। আর সুহাসের কাজও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন নিজের আইন ব্যবসায়।

সেদিনের সহর জীবনের অনভিজ্ঞতা তাকে সহায়ের সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছিল ট্রেনের কামরায়। আর আজ দীর্ঘ বিশ বছরের অভিজ্ঞ সহরবাসীকে সহর আকর্ষণ করল অসারের মধ্যে সার বস্তুর সন্ধানে নিযুক্ত করে পথে ঘাটে আশার প্রদীপ জেলে ঘুরে বেড়াতে।

সোমনাথবাবু এলেন। চেয়ারে বসলেন। তারপর সুহাসের আগমনের হেতু জানতে চাইলেন।

যে কথাগুলো বলার জন্যে সুহাস এতক্ষণে প্রস্তুত হয়েছিল মনে মনে, উপযুক্ত সময়ে সে বক্তব্যগুলো যেন হারিয়ে গেল তার মন থেকে।

তবু যতটা সম্ভব চেষ্টা করে সোমনাথবাবুকে সে আগমনের উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিল।

সব শুনে সোমনাথবাবু বললেন, এঃ, তোমার উকিল তাহলে পাততাড়ি গোটালে!

তারপর সুহাসের উদ্দেশ্যে বললেন, ঐ যে তুমি বললে না, অবস্থার বিপাকে পড়ে উকিলের এই দুর্দশা। ও সব কিছু নয়। ও অবস্থার বিপাক-টিপাক নয়, ও-গুলো ধর্মের পাক্। কত লোককে ঠকিয়েছে, কত লোককে পথে বসিয়েছে, তবেই না এই হাল। লোকে বলে ভগবান্ নেই। আছে কি নেই যদি প্রমাণ চাও, সোজা গিয়ে দেখে এসো ভবনাথ উকিলকে। এমন হাতে হাতে চাক্ষুষ প্রমান আর মিলবে না। একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

এর কোন জবাব হয় না। উকিল সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা হয়ত এই। যুগ-যুগান্তর ধরে উকিল সম্বন্ধে যে ধারণা সাধারণে মনে পোষণ করে আসছে, যুক্তি তর্ক দিয়ে তাকে খণ্ডন করার চেষ্টা মানে মূর্খতা। বিশেষ করে সোমনাথবাবুর সঙ্গে তো কোন কথাই চলে না এ সম্বন্ধে, এখন বোঝা গেল। কারণ এদের ধারণাও নেই, অনুভূতিও নেই। এরা কথা বলে শুধু বলতে হয় বলে। বিশেষ করে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ হিসেবে এরা নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরের জগৎকে দেখতে জানে না।

এই সোমনাথবাবুরই কথা মনে পড়ল তার। যতদিন মামলা চলেছে, ততদিন উকিলবাবুর মাথায় ছাতা ধরে আদালতে এসেছেন ইনি। মামলার তারিখে উকিল-বাবুর মাথা ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে ডাব খাওয়াবার তাগিদ

দিয়েছেন বহুবার। বোধহয় উকিলবাবু খেতে চাইতেন না বলে।

ভবনাথবাবুর এক বন্ধুর মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে বনিবনা হয় না বলে, সোমনাথবাবুর সঙ্গে ভবনাথবাবু সেই বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হয়ে মেয়েটির ভাগ্যের যদি কোন পরিবর্তন করা যায়।

জ্যোতিষী মহাশয় মহাশক্তি সম্পন্ন এক কবচ তৈরীর নাম করে ভবনাথবাবুর বন্ধুর কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে কবচ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু মেয়েটি আজও তার বাপের বাড়িতেই দিন কাটাচ্ছে। আর বন্ধুর মেয়ের উপকারের নাম করে ভবনাথবাবুকে ফী না দিয়েই কাজ করিয়ে করিয়ে আজ সোমনাথবাবু লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক।

তাই সুহাস ক্ষুব্ধ মনে ভাবল, সোমনাথবাবুর ভাষায় ধর্মের প্রতিষ্ঠা তাঁরই ঘরে। আর ধর্মের কল বাতাসে ভর করে গিয়ে নড়ে ওঠে ভবনাথবাবুর ঘরে!

সুহাস চিন্তা করল, এখানে আসা তার ভুলই হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে যে এতটা বেইমান হতে পারে তা জানা ছিল না সুহাসের।

সুহাসকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে, সোমনাথবাবু বললেন, কি করবো বলুন, আজকালকার যা বাজার, তেল জোটে তো নুন জোটে না, নুন জোটে তো তেল জোটে না। তার ওপর অপ্রয়োজনে একজনের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া তো কোলকাতা সহরে আশা করা যায় না। তাছাড়া নিজের কথা তো বাদই দিলুম। অন্ত:কাউকে ধরে কয়ে যে একটা কাজে লাগিয়ে দেবো সে উপায়ও নেই; আপনি ছিলেন পাকা উকিলের পাকা মুহুরী। আপনাকে কোথাও কাজে লাগিয়ে নিজের গলায় ফাঁস লাগাতে আমি রাজী নই।

সোমনাথবাবুর কাছে থেকে সময় নষ্ট না করে আবার পথকে সঙ্গী করে নিল সুহাস।

অনেকটা সময় কেটে গেল পথে ঘুরে ঘুরে। আসন্ন রাত্রিবাসের সমস্যা সামনে জেগে থাকলেও উদ্দেশ্য হীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে বড় ভাল লাগল সুহাসের। উদ্দেশ্যের সঙ্গে আছে সঙ্ঘাত। আছে ওঠা পড়া। এ যেন কেবল মাত্র প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করা। ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, নেই কোন ভাবনা। খালি দুনিয়ার হাটের উপভোগ্য বিষয়গুলোর দিকে তাকিয়ে খুশি মনে আনন্দ কুড়িয়ে নেওয়া।

সন্ধ্যার তারাগুলো একে একে ভীড় করে সংখ্যা বাড়াচ্ছে আকাশের গায়। শুধু এক ফালি আকাশ। আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলো দৃষ্টিপথকে সংকীর্ণ করে দিয়ে আপন অস্তিত্বের জয় ঘোষণায় ব্যস্ত। ভাল করে আকাশটাও দেখতে দিল না এরা। এই সহর ক্ষুদ্রতায় বেঁধে দিল তার সীমানা। এক ফালি আকাশ।

সেই ক্ষুদ্র উদারতার নীচে দাঁড়িয়ে সুহাসের মনে পড়ল ভবনাথবাবুর কথা। তিনি বলতেন, সুহাস, ছোট আদালতে ওকালতি করার মত পাপ আর নেই। এখানে আদালত ছোট, উকিল ছোট, মক্কেল ছোট, পয়সা ছোট, মনোবৃত্তি আরো ছোট।

সুহাসের মনে হল, ছোট আদালতের সবই ছোট কিন্তু আইন ছোট নয়, সব চেয়ে বড়।

এখানে মানুষ প্রতিকার চায়। আইন চায়। উকিল চায়। চায় সেবা কাজ। প্রতিদানে দেয় শুধু প্রবঞ্চনা।

আসামী নির্মল এল ভবনাথবাবুর কাছে। বলল, উকিলবাবু বাঁচান। বড় মামলা। সরকারী অর্থের তছরূপ।

ডাল সেদ্ধ ভাত খেয়ে উকিলবাবু লেগে গেলেন বাঁচাতে। রাতের পর রাত চিন্তা করে, 'প্রবেবল ষ্টোরি'র ওপর তৈরি করলেন 'ডিফেন্স'। দিনের পর দিন জেরায় জেরায় শেষ করলেন সরকার পক্ষের সাক্ষী। মামলার নথি পরীক্ষা করলেন। তারপর বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে ডুবে পড়লেন। রাতের পর রাত পার হয়ে গেল। কালি, কলম, মন বাঁধা পড়ে গেল কাজের নেশায়।

একদিন জেগে উঠলেন উকিলবাবু। আরগুমেন্টের দিন। খানিকটা পায়ে হাঁটা পথে, বাসের ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তির মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ সেরে, প্যান্ট-কোটে কাদার দাগ নিয়ে উকিলবাবু এলেন আদালতে।

হাকিমের সামনে ঘণ্টা দুই দাঁড়িয়ে আইনের পাণ্ডিত্য আর বুদ্ধির লড়াইয়ের নায়ক সেজে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

হয়ত তারপরই তিনি লাইব্রেরীতে বসে বসে ভাবলেন, ঘরে চাল নেই, কিংবা স্কুলে ছেলেদের মাইনে না দিলে

নাম কেটে দেবে বলেছে, বাড়িওয়ালা ভাড়ার জন্তে তাগাদা দিয়েছে ইত্যাদি।

নির্মল এসে বলল, আজ আর টাকা দিতে পারবোনা উকিলবাবু—সামনের তারিখে এক সঙ্গে মিটিয়ে দেবো।

মুহুরী ভেবেছে, ধরে ক'রে তারিখে তারিখে চার টাকা ফী করিয়েছে, তাও আবার পরের তারিখে ?

উকিলবাবুকে হাসি মুখে বলতে হয়েছে, আচ্ছা আচ্ছা সে হবে।

পরের তারিখ, মানে রায়ের তারিখ।

বেকসুর খালাস হয়ে গেল নির্মল। আবার সে চাকরী পাবে। পাওনা বাকী মাইনের সবই পাবে। আবার তার সংসার আনন্দের কলকাকলিতে ভরে উঠবে। চিন্তা করে উকিলবাবুর প্রাণেও আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

নির্মল শুধু বেকসুর খালাস হয়ে যাবার পর সুড় সুড় করে হাঁটা দিল বাড়ির পথে, উকিলবাবুর সঙ্গে দেখাও করল না। উকিলবাবুর পাওনা শুধু আনন্দটুকু!

আর কানুকে বাঁচাতে গিয়ে, পথ থেকে ঘরে তুলতে গিয়ে, কামধেনু হল মনোরমা দেবীর কানের দুল। আর গৃহলক্ষ্মীর কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

এক ফালি আকাশের নীচে এক ফালি অনুদার মন। সোমনাথবাবুর ভাষায়, উকিলের মুহুরী বলে গলায় ফাঁস লাগবার ভয়ে যাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়না পরিচিতের সঙ্গে। সেই মনটা সারা জীবন নীচে পড়ে-যাওয়া মানুষকে প্রাণপণে তুলে ধরার সাধনায় নিযুক্ত থাকা মনের পাশে বাস করে আজ রিক্ত, সর্বহারা।

সেই সর্বহারা রিক্ত মানুষটা এক ফালি আকাশের নীচে ভাবুক মন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কখন এসে থমকে দাঁড়ালো এক বস্তী বাড়ীর সামনে। এখানে ইতিপূর্বেও সে কয়েকবার এসেছে। তার মধ্যে একবার ভবনাথবাবুর সঙ্গে।

শ্রীপৎ নামে এক দাগী চোরের আস্তানা এখানে। সে ছিল ভবনাথবাবুর ঘর পোষা মক্কেল। মাঝ বয়সে চৌর্যবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সংসারে ভদ্রজীবন যাপন করার সাধ জাগে তার মনে। সেই সংসারজীবনের প্রবেশ-পথে তার সজ্ঘাত বাধে স্ত্রীর সঙ্গে। তখনও শ্রীপৎ আইনের বেড়াজাল টপ্‌কে বাইরে যেতে পারেনি। উকিলবাবুর কাছে তখনও তার যাতায়াত লেগেছিল।

স্ত্রীর কাছে এ সব গোপন করে রেখেছিল সে। ভেবেছিল, এ যাত্রা পার করে আর সে আদালতে আসার কাজ করবে না। কিন্তু স্ত্রী কি ভাবে সব জেনে ফেলে। চৌর্যবৃত্তির পথ ছেড়ে সৎ জীবন যাপন করার প্রেরণায় সে সংসার পথে প্রবেশ করেছিল ভবনাথবাবুরই দীর্ঘদিন চেষ্টার ফলে। তাই স্ত্রীর সঙ্গে সজ্ঘাত উপস্থিত হতে সে ভবনাথবাবুর শরণাপন্ন হয়।

ভবনাথবাবু নিজে মাথা পেতে শ্রীপতের সব দায়িত্ব নিয়ে 'মা' বলে দাঁড়িয়েছিলেন তার স্ত্রীর সামনে। বোধহয় ভরসা পেয়েছিল শ্রীপতের স্ত্রী তাপসী। অবশ্য ভয় পাবার মত চরিত্র নয় তাপসীর। এক উদ্বাস্তু শিবির থেকে মা-বাবা, ভাই-বোন, সকলকেই ছেড়ে সে পালিয়ে এসেছিল শ্রীপতের সঙ্গে। কি দেখে আর কিসের আশায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন সে দেখেছিল বলা কঠিন। ওটা একান্তই তাপসীর নারী জীবনের মর্মকথা। তবে শ্রীপতের কোন কিছুতেই ভয় পায় না সে। শ্রীপৎ মদ খাক্, তার ওপর অত্যাচার করুক, তাতেও কিছু যায় আসে না—ভয় শুধু, শ্রীপৎ যেন তার কাছ ছাড়া না হয়, শ্রীপৎ যেন হারিয়ে না যায়।

উকিলবাবুর পা ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল শ্রীপৎ তাপসীর সামনেই।

তাপসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। উকিলবাবু বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর থেকে মুহুরীকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রমাণ অভাবে সে মামলা থেকে রেহাই পায় শ্রীপৎ। কিন্তু নিজের জীবনযাত্রার প্রমাণ দাখিল করে উকিলবাবুর হাত থেকে রেহাই পেতে তার সময় লেগেছিল অনেকটা।

শ্রীপতের উক্তির সততা প্রমাণের জন্যে মাঝে মাঝে তিনি সুহাসকে বলতেন, তাপসী মায়ের সঙ্গে দেখা করে একটু খবরাখবর নিয়ো তো ?

সেই সূত্রে সুহাস কয়েকবার এসেছিল এখানে।

এখানে দাঁড়িয়ে সহরের প্রকৃতি-পরিবেশের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিল সুহাস।

সামনেই এক হিন্দুস্থানীর ছোট চায়ের দোকান। হাতে গড়া রুটির গন্ধটা যেন এই দিকেই ভেসে আসছে।

পরিপাক যন্ত্রের জান্তব রূপটা হঠাৎ যেন উলঙ্গ দৃষ্টি মেলে ধরল। হয়ত ইতিমধ্যে অনেকটা ঘুরে বেড়াবার আনন্দে দেহতত্ত্বের একটা দিককে অস্বীকার করেছিল বলে।

আস্তে আস্তে সুহাস এগিয়ে গিয়ে বসল, দোকানের সামনে পেতে-রাখা নড় বড়ে বেঞ্চিটার ওপর।

নরম মনে উপভোগ্য হয়ে উঠল গরম রুটি। জড়তা নাশ করল বড় ভাঁড়ের ফুটন্ত চায়ের লিকার।

শ্রীপতের ঘরের সামনে এসে ডাক দিল সুহাস। মাথার ওপর কাপড় টেনে বেরিয়ে এল তাপসী।

তাপসীকে দেখে সুহাস প্রশ্ন করল, শ্রীপৎ কোথায়?

তাপসী, আনন্দের উজ্জল চোখ দু'টো তুলে আরো এগিয়ে এসে বলল, আগে ভেতরে চলুন তারপর গল্প করা যাবে।

বলে, সুহাসকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে এসে বসতে দিল চেয়ারে।

ঘরে ঢুকে একটু অবাক বিস্ময়ে সুহাস তাকিয়ে দেখল চারদিকে। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে ঘরের মধ্যে।

মাথার ওপরে ছোট টিউবের একটা নিয়নআলো। ভাঙ্গা চৌকীটা সরে গিয়ে সেখানে বসেছে একটা ডবল বেডের খাট। একটা টেবিল ক্লথ ঢাকা ছোট্ট তেপায়া টেবিলের ওপর একটা রেডিও সেট। একপাশে একটা আলমারী।

চেয়ারে বসে সুহাস জানতে চাইল, শ্রীপৎ কোথায়?

—সে তো গাড়ীতে।

—গাড়ীতে মানে?

—কেন, আপনি শোনেননি, সে তো এখন ভাগে ট্যাক্সি চালায়। উকিলবাবুর সঙ্গে কাল তার দেখা হয়েছিল। তিনি তো সব শুনেছেন। শুনে, কত আনন্দ করেছেন।

সুহাস বুঝল, ভবনাথবাবু চিরকালটাই অপরের উন্নতিতে আনন্দ পেয়েছেন, তাই নিজের দুঃখের ইতিহাসটা এদের বোধহয় জানাতে পারেননি। সেজন্যে এরাও জানেনা উকিলবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা।

তাপসী জবাবে যে ধরণের উক্তি করল, তাতে বোঝা গেল, তার মনে এখনও ধারণা রয়েছে যে উকিলবাবুকে জানানো মানে মুহুরীর কাছেও তা অজ্ঞাত না থাকা।

কিন্তু এতক্ষণের ভ্রাম্যমাণ জীবনের মধ্যে ভাবের যে রেশটুকু জেগে উঠেছিল তা মুছে যাবার নয় বলেই, সুহাস কতকটা অন্যমনস্কভাবেই তাপসীকে জানালো তার উকিলবাবুর শেষ পরিণতির কথা।

সুহাস লক্ষ্য করল, তাপসীর চোখ দু'টো জলে ভরে এসেছে। তাই সে অন্য প্রসঙ্গে যাবার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, ঘরে ঢুকে খুব আনন্দ পেলুম কিন্তু। আপনাদের এই গোছানো সংসারে একটা শ্রী ফিরে এসেছে। আগে যারা দেখেছে, এখন এসে তারা চিনতেই পারবেনা।

সুহাস ভাবল, মেয়েদের সামনে সংসার গোছানোর প্রশংসা করলে তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তাই ভাবান্তর লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে তাপসীর দিকে তাকিয়ে সে দেখল, তার মনের বন্যায় চোখের জল উপচে পড়ছে দু'গাল বেয়ে।

তাপসীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই, তাপসী আঁচলটা মুখে চেপে ধরে সবেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সহানুভূতির আর্দ্রতায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল সুহাসের মন। তাপসী বেরিয়ে যেতে সুহাস কিছুক্ষণ বৈরাগী মনটাকে আপন গতিপথে ছেড়ে দিল। চোখের জল নিয়ে চোখের সামনে এক এক করে ভেসে উঠল, মনীষা, মনোরমা দেবী, রুণু।

তবু ওদের চোখের জলের সঙ্গে তাপসীর চোখের জলের একটা স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠল সুহাসের মনে। ওরা প্রত্যেকেই সুহাসের জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যথার বাস্তব রূপকে প্রত্যক্ষ করে প্রতিকারহীন ব্যর্থতায় সহানুভূতির স্পর্শ দিতে গিয়ে অকাতরে ফেলেছে চোখের জল।

আর তাপসী? এক দাগী চোরের স্ত্রী। নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন সকলকে কাঁদিয়ে সে চলে এসেছে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, সে যে অপরের জন্যে এমন করে চোখের জল ফেলতে পারে এও সুহাসের জীবনে আর এক অভিজ্ঞতা।

সুহাস ভাবল, পৃথিবী জায়গাটা কেবলমাত্র তার দেখা বা জানা জগৎ নয়। তার দেখা বা জানার বাইরে অনেক জিনিষ পড়ে আছে যেখান থেকে নতুন নতুন

উৎস প্রেরণা দিচ্ছে সৃষ্টির শক্তিকে। নইলে আজও পৃথিবী তার অফুরন্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাবার দাবীতে উৎসুক করতে পারতোনা মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকে।

তাপসী চোখ মুছে ঘরে এল।

থমথমে পরিবেশে শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে সুহাস তাকাল তার মুখের দিকে।

তাপসী বলল, ভাল লোকগুলোকে কষ্টে পড়তে শুনলে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে।

—সুহাস বলল, কাঁদলেন শুধু আপনি, আর জগতের সকলে শুধু হাসল, বিদ্রূপ করল।

—তাতে কিছু যায় আসেনা মুহুরীবাবু। সকলে সব জিনিষের ভেতরটা দেখতে জানে না তাই বাইরের থেকে তারা যা ভাবে সেটা তো সত্যি নয়। আর সত্যি জিনিষের মৃত্যু নেই। তাই তো উকিলবাবুর সত্যের দৃঢ়তার ওপর, চোখের সামনে চোর হয়ে দাঁড়ালো শান্ত ট্যাক্সি ড্রাইভার।

সুহাস সামান্য লজ্জিত হয়ে উঠল। নিজের জীবনের অধঃপতিত কাহিনী এমন অকপটে বলতে পারার মধ্যে সত্যকে উচ্চারিত করার বাহাদুরী আছে বটে কিন্তু শ্রোতার মনের শালীনতায় কোথায় যেন ঘা পড়ে।

সুহাস বলে উঠল, না না, একথা আপনি বলবেন না। শ্রীপতের মনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই তাকে প্রেরণা দিয়েছে সরল স্বাভাবিক পথে এসে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই সে এগিয়ে এসেছে আজ ধাপে ধাপে।

—মুহুরীবাবু, আপনিও সোজা পথ থেকে সরে গেলেন লজ্জায় বোধ হয়। কিন্তু আমার চোখে জল এসেছিল কেন জানেন? আপনি মাঝে মাঝে এসে বলতেন, "উকিলবাবু বললেন তাপসী মায়ের কাছ থেকে জেনে এসো শ্রীপৎ ঠিকমত সংসার করছে কিনা", সেই কথা মনে পড়ায়।

তাপসীর কণ্ঠস্বর আর্দ্রতায় জড়িয়ে উঠল। একটু সামলে নিয়ে আবার সে বলতে সুরু করল, নিজের সংসার যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে তখন তিনি আমাদের সংসার ঠিক আছে কিনা খবর নিতে পাঠাতেন। আজ তাঁর জীবনের দুঃখের দিকটা দেখবার মত যোগ্যতা ভগবান আমাকে দিলেন না কেন?

তাপসীর কথা শুনে সুহাসের ভেঙ্গে-পড়া মনে যেন নতুন উদ্দীপনার স্রোত বয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবল, পৃথিবী থেকে মানবিক বৃত্তি আজও লোপ পায় নি। নতুন করে চলা আর নতুন করে ভাবার একটা পথ যেন খুলে গেল সুহাসের সামনে।

তার মনে হল, আজও মানুষের ব্যথায় মানুষ কাঁদে। সুতরাং নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। নতুন করে জীবনের পথ তৈরী করার দৃঢ়তা নিয়ে সুরু হবে তার যাত্রা। আবার সে ফিরে পাবে তার কর্মোদ্যম, আবার তার মনের সজীবতায় ভবিষ্যৎ দৃষ্টির আশাতরী খেয়া পারাপার করবে জীবনের মাঝ দরিয়ায়।

সুহাসের মনের উদাসীনতার পাশে গড়ে ওঠা একটা কক্ষ থেকে ছাড়া পেল জ্যোতিষী সোমনাথবাবু, ছাড়া পেল ঠিকাদার গোবিন্দবাবু।

রুনু শত আবেদনের মিনতিভরা আঁখিপল্লব মেলে ধরল সুহাসের সামনে। কাকীমার নীরব প্রার্থনার স্থির মূর্তিটা যেন জেগে উঠল বারকয়েক।

কেদার মাষ্টারের ডাঁটি-ভাঙ্গা চশমার প্রতিজ্ঞা-কঠিন আশা-দৃষ্টি সুহাসকে জোগাল অর্দ্ধশতাব্দীর মনোবল। সামনের দণ্ডায়মান মূর্তিটি যেন অশ্রু ধারায় নবোদকে স্নাত ধরণীর মত নতুন করে নতুন আশার বার্তায় ভরিয়ে দিল সুহাসের মন।

তাপসী বলে উঠল, উকিলবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবনেও দুর্যোগের ঝড় উঠেছে নিশ্চয়ই। এবার কি করবেন ঠিক করেছেন?

সুহাস বলল, মানুষ যেখানে এসে তার জীবনের প্রতিষ্ঠার ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের হিসেব করে, আমি সেখান থেকে আবার নতুন করে সুরু করব আমার চলার পথ।

—কিন্তু খুব সাবধান। জমিদারের জমিদারী চলে গেলে তার নায়েবের অবস্থা কি হয়, আমার বাবা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

সুহাস কোন কথা না বলে, তাপসীর মুখের দিকে একবার তাকাল।

তাপসী বলে যেতে লাগল, দেশ ভাগ হয়ে গেল। স্বনামধন্য জমিদার আগের থেকেই পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে

কোন রকমে চলে এসেছিলেন কোলকাতার বাড়ীতে। ভরসা ছিল সময় মত নায়েব তাঁর অস্থাবর সম্পত্তিগুলো কায়দা করে পাঠাবে কোলকাতায়। সে চেষ্টার প্রথম মুখেই বাবা ধরা পড়ে গেলেন পুলিসের হাতে। কিছুদিন বন্দী-জীবন যাপন করার পর তিনি ছাড়া পেলেন। জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি লুট হল, বাজেয়াপ্ত হল।

বাবা আমাদের নিয়ে চলে এলেন সীমান্তের এ পারে। তারপর পথের ধারে দুর্লভ মনুষ্য জীবন যাপন করে কিছু দিন পরে গিয়ে হাজির হলুম এক আশ্রয় শিবিরে।

বলে, একটু থামল তাপসী।

সুহাস বলল, তারপর?

—তারপর শিবিরে গিয়ে দেখলুম এক নতুন পরিবেশ। মেয়েদের সামনে নিত্য নতুন প্রলোভনের সামগ্রী তুলে ধরে দালালরা চালাচ্ছে তাদের এক চেটে ব্যবসা। প্রথম বুঝতে পারিনি এ সব।

শিবিরে যাবার কয়েক দিন পরেই ওখানে দেখা মিলল আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোকের। তিনি আমার বাবার বন্ধু। তাঁকে হীরেন কাকা বলে ডাকতুম আমরা। আমাকে দেখেই তিনি বাবাকে আশ্বাস দিলেন, ভয় নেই —তোমার মেয়েই তোমার সংসার ভরিয়ে দেবে। বাবাও আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে যে সব জায়গায় যাতায়াত সুরু করে দিলেন এবং পয়সা রোজগারের যে পন্থার কথা উল্লেখ করলেন, তা কোন ভদ্র মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে শোনাও সম্ভব নয়। আমি হীরেন কাকাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে থাকলুম। কিন্তু তিনি বাবার হাতে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে এমন বশ করে ফেললেন যে বাবা আমার আবছা ওজর আপত্তিতে কানই দিতেন না। লজ্জায় মা'র কাছেও খোলাখুলি ভাবে কিছু বলতে পারতুম না।

তবে সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে, এমনই মানসিক অশান্তির সময়ে হঠাৎ শ্রীপতের সাক্ষাৎ পেলুম। শ্রীপৎও বোধহয় কোন দুরভিসন্ধি নিয়েই ওখানে যাতায়াত করতো। কিন্তু প্রথম যেদিন ওকে দেখলুম, মনে হল ওর দৃষ্টির মধ্যে স্নেহের প্রচ্ছন্ন আশ্রয় পাবার একটু আকুলতা রয়েছে যেন। মনে হল, একমাত্র ঐ পারে আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করতে।

জাতিতে শ্রীপৎ অবাঙ্গালী হলেও ওর ওপর কেমন করে নির্ভর করে ফেললাম। তারপর একদিন সকলের অজান্তে পালিয়ে এলাম বাড়ী ছেড়ে। এরপরও শ্রীপতের সঙ্গে যেটুকু অমিল দেখা দেবার সম্ভাবনা জেগেছিল, উকিলবাবুর চেষ্টায় সেটা পুরোপুরি ভাবে সরে গেল আমার জীবন পথ থেকে। আজ আমি নিজের সুখে নিজেই গর্ব অনুভব করি।

বলে, তাপসী একটু থামল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তাই বলছিলাম মুহুরীবাবু, অভাব বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিষ। অভাব যে মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সে পরিচয় আমার জানা আছে।

তাপসীর কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে এল সুহাসের। কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত সে তাপসীকে জানতো সরকারী শিবির থেকে পালিয়ে আসা নষ্ট চরিত্রের একটা মেয়ে আর তার শেষ পরিচয় সহরের এক দাগী চোরের বউ। এখন সে ভাবল, তাপসী পালিয়ে এসে পাপ মুক্ত করেছে সমাজের। তাই এই মনুষ্য সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে আজ সে জোর গলায় বলতে পারছে, তার মত সুখী খুব কমই আছে।

তাপসী যে অভাবের পরিচয় পেয়েছে বলে জানালো সুহাসও সে অভাবের পরিচয় পেয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে তাপসীর ক্ষেত্রে অভাব বিকৃত চেতনা দিয়ে লুট করালো সুস্থ মনের মাতৃত্ববোধকে, পঙ্গু করালো নীতি বোধের প্রাথমিক জ্ঞানকে আর সুহাসের ক্ষেত্রে অভাব হরণ করালো মনুষ্যত্বকে, বিক্রী করতে শেখাল শিক্ষা, রুচি, সংস্কারকে।

তার মনে পড়ল, প্রথম দিকের আদালত জীবনের কথা। তখন তার আখ্যা ছিল 'বাবু'। উকিলবাবু ছিলেন 'সাহেব'। সমাজের কাছ থেকে তখন পাওয়া যেতো শ্রদ্ধা আর শ্রদ্ধা জাগাবার মত পয়সা।

তারপর অভাব এসে যেই আদালতের ফটকের ধারে আর বটতলার রাঁধান বেদীর আশপাশে ঘোরাফেরা সুরু করল, অমনি সুহাসের 'বাবু' হল 'দালাল'। আর উকিলবাবুর বিদ্যে-বুদ্ধি সব দর যাচাইয়ের চাপে পড়ে উবে গেল।

সেই সময় ভবনাথবাবু একদিন বলেছিলেন, সুহাস, এভাবে আর হবে না। এবার ফৌজদারী আর দেওয়ানী মামলা একই সঙ্গে সুরু করে দিই ?

ফৌজদারী আর দেওয়ানী আদালতের অবস্থিতি পাশাপাশি। পুরোণ বিদ্যা নতুন করে ঝালাই করে নিয়ে ভবনাথবাবু দেওয়ানী মামলাও হাতে নিতে লাগলেন। ফলও ভাল হতে লাগল। কিন্তু বাজারের উর্ধ্বগতির সঙ্গে তাল রক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারলেন না।

বাজার যত চড়ে, উকিলের মূল্য প্রতিযোগিতা করে ততই কমে।

শেষ পর্যন্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, সবই অভাবের বাণিজ্যিক হাটে বিকিয়ে গেল।

একজন উকিল পারল না একজন মুহুরীর অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে। ফলে মুহুরীর নাম হল দালাল।

আর যে মুহুরী দালালী করতে পারল না বা যে উকিল সস্তা দরে নিজেদের বিকোতে পারল না, তারা মামলার টানে শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে আদালতে এসে আস্তে আস্তে চেম্বার তুলে দিল, বই পত্তর বিক্রী করে দিল, শেষ পর্যন্ত অন্য কোন ফিকিরের দিকে নজর দিতে গিয়ে আদালতে আসাও বন্ধ করে দিল।

তাই শেষ দিকে ভবনাথবাবু সুহাসকে ডেকে বলেছিলেন, এভাবে কি উকিলের চলে, আমার চেম্বার তুলে দাও। শেষ সিদ্ধান্তে এসে সত্যি সত্যিই তিনি চেম্বার তুলে দিলেন। বইগুলোও হয়ত এতদিনে বিক্রী হয়ে গেছে।

তাপসী বলল, আপনি কি উকিলবাবুর বাসায় যাচ্ছেন ?

—না।

—তবে কোথায় যাবেন এখন ?

—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি। তবে এবার বেরিয়ে যে কোন একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

বলে, সুহাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অনেকক্ষণ কষ্ট দিলুম, এবার চলি।

সামনে এগিয়ে এসে তাপসী বাধা দিল সুহাসকে। বলল, না, শ্রীপৎ না আসা পর্যন্ত আপনার যাওয়া হবে না। সে এখুনিই গাড়ী নিয়ে এসে পড়বে। কোথাও যদি আপনার যেতে ইচ্ছে হয়, সে গাড়ী করে পৌছে দেবে। এই ফাঁকে আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি গে।

বলে, কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

[ক্রমশঃ]

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদ

১৫ শ্লোক

সমাকর্ষাৎ

উপনিষদেতে জগৎ কারণ অসৎ বলিয়া কহে
পরে বলিয়াছে সত্যই তাহা অসৎ কখন নহে
সত্যই জেন স্থির অবিচল
অসত যাহা করে টলমল
ভিত্তিহীন যে জগৎ কারণ একথা কখন নয়
ব্রহ্ম ইচ্ছা এক হতে সেই বহুর উদয় হয়।

জগদ্বাচিত্বাৎ (১৬)

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আছে—

"যো বৈ বালাকে এতেষু পুরুষাণাং কর্ত্তা
যস্য বা এতৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্যঃ

অজাতশত্রু রাজা সে বালাকি ব্রাহ্মণে তবে কয়
এই সকলের কর্ত্তা যেজন জানিতে তাহাকে হয়
সেই ব্রহ্মের উপদেশ বলি
এতৎ শব্দে জগতেরে বলি
এই প্রভু জেন বিশ্ব কর্ত্তা ব্রহ্ম যাঁহাকে কয়
রাজাধিরাজ সে বিশ্বের প্রভু অতুল মহিমাময়।

জীব মুখ্য প্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ তৎ ব্যাখ্যাতম্ (১৭)

শঙ্কর ভাষ্য ১।১ ৩১ সূত্রে বলা হইয়াছে—

জীব মুখ্য প্রাণ লিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ ন উপাসা ত্রৈবিধ্যাৎ
আশ্রিত্বাৎ ইহ তৎ যোগাৎ"

জীব লক্ষণ প্রাণ লক্ষণ তবুও জানিও নয়
সকল ছাপায়ে সকল ব্যাপিয়ে ব্রহ্মই জেন হয়

১৭

জীব উপাসনা প্রাণ উপাসনা
সবার অতীত তাঁর আরাধনা
যুক্তিদেখিয়া হইবে বুঝিতে ব্রহ্ম সর্ব্ব ময়
তাঁহারি রূপেতে আঁধার বিশ্ব আলোয় আলোক হয়।

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন ব্যাখ্যানাভ্যাম্ অপি চ
এবম্ একে (১৮)

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ"

জৈমিনি কন অন্যার্থ হেথা জীবের কথাই নয়
অন্য বস্তু পরমাত্মার প্রকাশ অর্থে হয়
এক যে পুরুষ নিদ্রিত ছিল
ডাকিয়া তাহারে সাড়া না মিলিল
যষ্টির দ্বারা প্রহার করিতে তখন জাগিয়া রয়
প্রশ্ন হেথা কোথায় আছিল আসিল কোন সময়
উত্তর এর স্বপ্ন না দেখে নিদ্রিত যেই জন
সেই সময়েতে প্রাণের সাথেতে মিলিত তখন হন
আত্মা হইতে পরানেতে যায়
প্রাণ হতে তাহা দেবেতে মিলায়
পরমাত্মাকে বুঝাবার তরে জীবের কথা যে হয়
একাত্মা সেই যাহার সাথেতে সকলের যোগ রয়।

বাক্যান্বয়াৎ (১৯)

আপনার লাগি প্রিয় হয় সব উপনিষদেতে কয়
ভালোবাসে মোরে এই কথা ভাবি তবে সেই প্রিয় হয়
এইখানে জেন সেই কথা নয়
আত্মাকে শুধু জানো নিশ্চয়
আত্মাকে তুমি কর দরশন শ্রবণ বিচার করো।
পরমাত্মার প্রীতি যাতে হয় বারেক তাহাও স্মরো।
মৈত্রেয়ী কন যাজ্ঞবল্ক্যে কি হবে তাহারে পেয়ে
অমৃত যাহাতে নাহি যায় পাওয়া লহিব তাহা না চেয়ে
আত্মাই সেই অমৃত আধার
বাক্যান্বয়াৎ এ বোঝ সেই সার
পরমাত্মার জ্ঞান ছাড়া জেন অন্য কিছুই নাই
যাহাকে পাইলে সব যায় পাওয়া কয় জন তারে চাই।

[ক্রমশঃ]

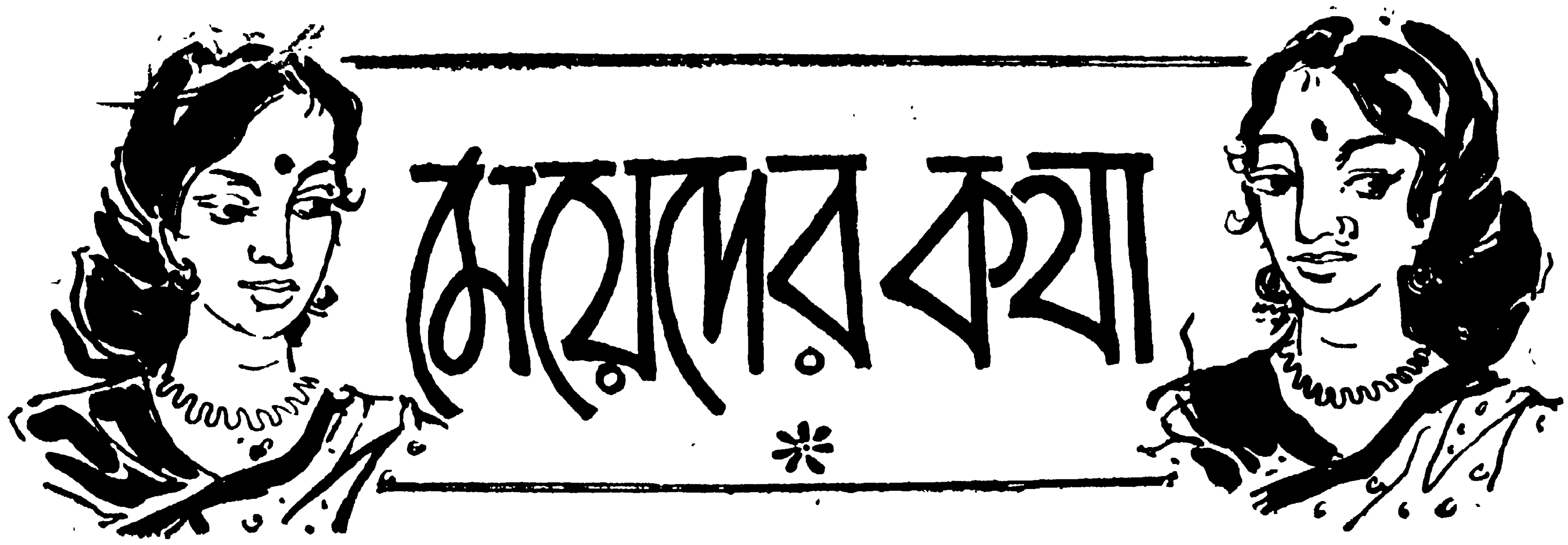

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের দুই জাত।

মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন, মেয়েদের দুই জাত আছে। মা আর প্রিয়া, লক্ষ্মী আর উর্বশী। একজন পুরুষের চিত্তকে তার বক্ষ মাঝে আত্মহারা করে তোলে, তার রক্তধারাকে নাচিয়ে তোলে আর একজন তাকে ফিরিয়ে আনে শান্তি ও কল্যাণের মাঝে। "দুই বোন" উপন্যাস কবির এই বিষয়বস্তু নিয়েই লেখা। সংসারের মেয়েরা যেন ভিন্ন প্রকৃতির দুটি বোন। এই উপন্যাসের ভূমিকায় কবি লিখেছেন যে যদিও প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই কম বেশী এই দুই প্রকৃতিই মিশে আছে, তবু কারো মধ্যে কোনটা বেশী, আর কোনটা কম। শর্মিলা হ'ল মায়ের জাত, সে তার স্বামীকে নিয়ে সদা ব্যাকুল, তার খাওয়াটি যাতে ঠিক মত হয় তার ব্যবস্থা করা, তার জুতো জোড়াটি পর্য্যন্ত তার পায়ের কাছে এগিয়ে দেওয়া, কোনখানে কোন কিছুতে তার এতটুকু কষ্ট না হয়, এই দেখাই শর্মিলার দিনরাতের ব্রত। কিন্তু যেখানে পুরুষের কর্মক্ষেত্র, শর্মিলা সেখান থেকে সসম্ভ্রম ভয়ের সঙ্গে দূরে থাকে। সে জানে পুরুষের কাজ কঠিন, সেখানে তার স্ত্রীবুদ্ধি কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু এর বিপরীত প্রকৃতি উর্মিলার। তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সে শশাংকর কাজকে ভয় করে না। তার কাজ শিখে নিয়ে তাকে সাহায্য করবার মত আত্মবিশ্বাস আছে। তার কাজ শিখবার ক্ষমতা দেখে ভগ্নিপতি শশাংক খুশী হয়ে তাকে নিজের কাজের সঙ্গিনী করে নেয়। শশাংক যে শর্মিলার মত সেবা পরায়ণা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও উর্মিলাকে ভালোবাসল তার কারণ এই যে সে পেয়েছিল মা'কে আর সেবিকাকে, তাই প্রিয়া আর সঙ্গিনীর জন্যে তার মনের মধ্যে গোপন অভাববোধ ছিল।

সে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র থেকে সসম্ভ্রমে দূরে থেকে তার খাওয়া পরা শোয়া বসার সুব্যবস্থা নিয়ে দিনরাত ব্যাকুল হ'য়ে থাকে সে হ'ল তার পক্ষে মা—আর যে মেয়ে তার বুদ্ধি দিয়ে তার সাহচর্য্য দিয়ে পুরুষের কঠিন কর্মক্ষেত্রে তার পাশে এসে দাঁড়ায়, সে হ'ল তার প্রিয়া। যে পুরুষ দুর্বল প্রকৃতি, সে চিরশিশুর মত মাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। নারীর মধ্যে চিরদিনই সে মাকে খোঁজে, কিন্তু যার প্রকৃতিতে আছে পৌরুষ তার মনে মনে প্রিয়ার জন্য আকুলতা। শর্মিলার স্বামী শশাংক তাই শুধুই শর্মিলার কাছে মাতৃস্নেহ পেয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায় না। উর্মিলার মধ্যে পুরুষের পার্শ্বচারিণী বুদ্ধিমতী নারীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। শুধুই নারীর হৃদয় পেয়ে সে খুশী নয়। নারীর বুদ্ধির সাহচর্যও সে কামনা করে, তার পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মাঝে

শশাংকের মধ্যে আছে পৌরুষ, তাই সে চিরশিশু হয়েই থাকতে চায় না। তাই মাকে ছেড়ে প্রিয়ার জন্য তার আকুলতা। কিন্তু কবি বলেছেন—আমাদের দেশে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল। তারা চির-শিশু। তাই তারা মায়ের আঁচলের ছায়ায় থাকতে ভালোবাসে। এই জন্যই আমাদের আশ্রয়দাত্রী দেবীরা আমাদের মা। মা মা করে চীৎকার করতেই আমাদের দেশের দুর্বল পৌরুষ ভালোবাসে। কিন্তু তবু কবি বেশী সম্মান দিয়েছেন কাকে, মাকে না প্রিয়াকে? বোধহয় মাকেই। আমরা দেখি শর্মিলা তার ক্ষমা, তার ধৈর্য্য, তার আত্মবিসর্জন নিয়ে তার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত রইল, ঊর্মিলাকেই চলে যেতে হল দূরে কারণ সে বুঝল তার প্রতি শশাংকর যে প্রেম সে একটা আকস্মিক ভূমিকম্প। তার ফাটলের ওপরে ঘর বেঁধে বাস করা চলে না।

কল্যাণী নারী স্বামীর মঙ্গলের জন্যে নানা ছল, নানা চতুরতা ও ক্ষুদ্রতার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করে না। যে আত্মীয়দের কাছে স্বামীর বিপদের দিনে সাহায্য পাওয়া যাবে শর্মিলা ছল করে তাদের সঙ্গে পুরানো আত্মীয়তা ঝালাই করে নূতন করে তুলতে চায়। নারীর এই নীচতাকেও কবি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। কারণ এই নীচতা সে স্বীকার করেছে স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্যে। মাতৃত্বশালিনী নারী তার প্রশান্ত বুদ্ধি দিয়ে অনেক বেশী বুঝতে পারে। শশাংক যখন ঊর্মিলাকে নিয়ে মত্ত হয়ে উঠে নিজের কাজকর্ম নষ্ট করতে লাগল তখন শর্মিলা মনে মনে ভয় পায় যে যেদিন তার এই মত্ততা কেটে যাবে, সে দিন সে ঊর্মিলাকে কোনমতে ক্ষমা করবে না, তার কাজ নষ্ট করবার জন্যে তার শক্তিকে এমনি করে অপচয়ের পথে নষ্ট করবার জন্যে। সেদিন ঊর্মিলার কি দুঃখের দিন আসবে এই চিন্তায় শর্মিলা শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। তাই দেখি যে কবির মনের শেষ শ্রদ্ধা ছিল স্নেহময়ী হৃদয়শালিনী, মাতৃরূপিণী কল্যাণীরই জন্যে। "কল্যাণী" কবিতায় কবি নারীর এই মাতৃরূপের ছবি এঁকে তাকেই তার সব শেষের সর্বশ্রেষ্ঠ গান নিবেদন করেছেন। এই কবিতায় কবি জননী ও গৃহিণী নারীকে বিদুষী ও রূপসী নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। কল্যাণী নারী নিত্য তার গৃহ কাজে মগ্ন. স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে তার অঙ্গনের আমের শাখায় কোকিল ডাকে, গৃহে তার শিশুর কণ্ঠধ্বনি। কল্যাণী নারী তার গৃহের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মদান করেছে। তার জীব নর সমস্ত মহৎ অর্থ সার্থক হয়েছে একখানি গৃহের মধ্যে। (কল্যাণী)

"নদীর মত এসেছিলে, গিরি শিখর হতে
নদীর মত সাগর পানে চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে রেখা।"

নদী যেমন তার পুণ্য প্রবাহ নিয়ে কত শত দেশ-বাসীর পিপাসা মিটিয়ে চলে নারীও তেমনই তার জীবন দিয়ে সমস্ত সংসারের মঙ্গল করে। কিন্তু তার হৃদয়খানি একটি গৃহেই বিশেষ করে ধরা দিয়েছে। সেই গৃহখানির মধ্যেই তার সমস্ত পুণ্য চেষ্টা। সেই গৃহখানি তার মঙ্গল-ডোরে সমস্ত সংসারকে পুণ্যের সম্পর্কে বেঁধেছে।

"তোমার শান্তি পান্থ জনে
ডাকে গৃহের পানে
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।"

গৃহহারা উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের জন্যে নারী আশ্রয়নীড় রচনা করে রাখে, যে জীবন ব্যর্থ হয়েছে তার ব্যর্থতা ঘুচিয়ে তাকে আবার জীবনের ছিন্নডোর জোড়া দিয়ে নিতে সাহায্য করে কল্যাণী নারী। নারীর এই কল্যাণী রূপ কবি সংসারের মধ্যে দেখেছেন। কবি বলেছেন—তাঁর যত দিনের যত হৃদয়াবেগ তার ফলে কতই না গানের মুকুল ফুটেছে ও ঝরে পড়েছে, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ গান, ওই কল্যাণী নারীরই জন্যে।

"আমার কাব্য কুঞ্জ বনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।"

এই কল্যাণী নারীর মহিমার কাছে বিদুষী ও রূপসী নারীর প্রভাব ম্লান হয়ে যায়। এই কল্যাণী যদি রূপসী নাও হয়, বিদুষী নাও হয় তবু তাতে তার গৌরবের কিছু-মাত্র হানি হয় না।

"রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরণ মালা।"

কবি যে মেয়েদের দুই জাতে, ভাগ করেছেন তার সুন্দর বর্ণনা পাই 'পঞ্চভূতের ডায়রীতে' দীপ্তি আর স্রোতস্বিনীর মধ্যে। যেমন 'দুই বোনের' ঊর্মিলা, তেমনি এখানে দীপ্তি। স্রোতস্বিনী আর শর্মিলা হল একজাতের। একজনের মধ্যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, আর একজনের মধ্যে হৃদয়ের স্নিগ্ধতা। শর্মিলা বা স্রোতস্বিনীর বুদ্ধি নেই তা নয়, কিন্তু সে বুদ্ধি হৃদয়ের স্নিগ্ধতার অন্তরালে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার প্রখর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয় না।

স্রোতস্বিনীর কোন কথার প্রতিবাদ করবার ভঙ্গিটি বর্ণনা করে কবি লিখেছেন—"এ তর্কের কোনও রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন 'না না'—·········কেবল বারবার 'না না, নহে, নহে। তাহার সহিত আর কোন যুক্তি নাই। কেবল একটি তরল সঙ্গীতের ধ্বনি, একটি অনুনয় স্বর, একটি তরঙ্গ-নিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন না না, নহে, নহে।"—স্রোতস্বিনীর প্রতিবাদের ভাষা বুদ্ধির যুক্তি নয়, সে শুধু করুণ কাতর মিনতি। কিন্তু এ মিনতি যুক্তির চেয়ে কম শক্তিশালিনী নয়। এর কাছে হার মানতে হয়। সে কথা কবির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এখানে যে হার মানা, তা মাধুর্য্যের কাছে হার মানা। তাতে যে হার মানে তার মনে কোন ক্ষোভ থাকে না আর তর্কের মুখে দীপ্তির বর্ণনায় কবি লিখেছেন—একেবারে নিষ্কোষিত অসিলতার মত ঝিকমিক করিয়া ওঠেন এবং শাণিত সুন্দর সুরে বলেন·········।

কবি দেখিয়েছেন স্রোতস্বিনী শান্ত, ধীর, স্নিগ্ধ প্রকৃতির মেয়ে। সে কখনো উত্তেজিত হয় না। যা বলে তা শান্ত হয়ে বলে। সে কখনো আপনাকে নিয়ে অহঙ্কার করে না। পরের প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং মমতা। অথচ তার যে বুদ্ধি কম তা নয়। বরং অনেক সময়ে সে অনেক কথা আগে হতেই বুঝে নেয়।

দীপ্তির প্রকৃতি এর বিপরীত। তার মধ্যে আছে তেজ এবং অহঙ্কার। সে আপন শ্রেষ্ঠতা আপনি অনুভব করে এবং সে কথা বিরোধী প্রতিপক্ষকে—দীপ্ত তেজে জানিয়ে দেয়। এই তেজ, এই দীপ্তি, নারীর মধ্যে এও পরম সুন্দর। কবির বর্ণনা থেকে আমরা বুঝি যে এই দীপ্তিকেও তাঁর ভালো লাগে। কিন্তু তবু স্নিগ্ধ প্রকৃতির শান্ত বুদ্ধিশালিনী স্রোতস্বিনীর প্রতি যে কবির শ্রদ্ধা বেশী এ কথা কবির বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কবি মেয়েদের এই দুই জাতকে তুলনা করেছেন দুই ঋতুর সঙ্গে। "ম হলেন বর্ষা ঋতু জল দান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ—ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে। দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব, আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু, গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়া মন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ—.পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে ঝংকারের অপেক্ষায়। সে ঝংকারে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

'দুই নারী' কবিতায় কবি বলেছেন সৃষ্টির আদিম যুগ থেকেই জগতে দুই নারী যেন উঠে এসেছে সমুদ্র মন্থন থেকে। একজন হল উর্বশী আর একজন হ'ল লক্ষ্মী। এক জনের হাতে উচ্ছলিত মদিরার পান পাত্র, আরেক-জনের হাতে সুধা ভাণ্ড। একজন পুরুষ-চিত্তকে মত্ততার মাঝে দিশাহারা, পথহারা করে তোলে আর একজন তাকে ফিরিয়ে আনে স্নিগ্ধ শান্তি ও সান্ত্বনার মাঝে।

উর্বশীর প্রতি কবির লোভ আছে, কিন্তু তার শেষ প্রণাম ওই লক্ষ্মীরই পায়ে, এ কথা তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায়।

নারীর প্রকৃতিতে কবি দেখেছেন ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেম ও প্রীতির গভীরতা। নিজের অন্তরের এই প্রীতি নিয়ে নারী কত অযোগ্য কাপুরুষেরও সেবা করছে। সেবার বিনিময়ে কত কাপুরুষ নারীকে অপমান আঘাত ও লাঞ্ছনা দিয়ে থাকে, নারী কিন্তু চোখের জল মুছে তাকে ক্ষমা করে।

... ...

চক্ষু মুছে ক্ষমা করে তারে।"

যেখানে দুর্বলতা সেখানে বিকৃতি, যেখানে রোগ

নারীর স্নেহ সেখানে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। প্রাণলক্ষ্মী যাকে পরিত্যাগ করে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে নারী তাকে কুড়িয়ে আনে। শুশ্রূষা দিয়ে তাকে আবার সুস্থ করে বাঁচিয়ে তোলে। যে মহিমা যে মাধুরী নিয়ে নারী চক্রবর্ত্তী সম্রাটকেও ধন্য করতে পারত তাই নিয়ে সে কত অধম কাপুরুষের সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করেও তার সেবা করে।

[ক্রমশঃ]

রূপচর্চ্চা

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং রূপচর্চ্চাবিশারদেরা মেরুদণ্ডের গঠন সুঠাম, সুন্দর, সুস্থ-সবল ও সাবলীল রাখার জন্য নিত্যনিয়মিতভাবে বিশেষ ধরণের যে সব সহজ-সরল ব্যায়াম অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছেন, গত সংখ্যায় সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছি। কিন্তু স্থানাভাবের কারণে, সেবারে মেরুদণ্ডের ব্যায়াম-উপযোগী আরো যে কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গীর হদিশ দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, এবারে তারই পরিচয় দিই।

আধুনিক রূপচর্চ্চাবিশারদ এবং শরীর তত্ত্ববিদ্‌-চিকিৎসকেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যায়াম-চর্চ্চা সম্বন্ধে অবহেলা-ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতার ফলেই, সচরাচর আমাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া ক্রমে ক্রমে কঠিন (Stiff) আর সাবলীলতাহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে অকাল-বার্দ্ধক্যের উপসর্গ দেখা দেয় এবং শরীরও জীর্ণ অপটু হয়ে ওঠে। পুরুষ ও নারীর দেহে পিঠের সুছাঁদের উপর শুধু বুকের গঠনই নয়, শরীরের স্বাস্থ্যও নির্ভর করে অনেকখানি। পিঠ যদি সুছাঁদে গড়ে ওঠে, তাহলে যেমনই বেশভূষা হোক রমণীয়তার আর অন্ত থাকে না। কাজেই পিঠকে স্বাস্থ্য-শ্রীতে গড়তে হলে কয়েকটি ব্যায়াম-বিধি পালন করা কর্ত্তব্য। নিয়মিত ব্যায়াম-অনুশীলনে মেরুদণ্ড যদি বেশ সহজ-স্বচ্ছন্দ থাকে, তাহলে দেহের প্রতি অঙ্গ সাবলীলভাবে নড়া-চড়া করে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে আমাদের সরল-স্বাভাবিকভাবে নড়তে চড়তে যথেষ্ট ক্লান্তি-কষ্ট বোধ হয়—মানুষ ক্রমেই অলস হয়ে পড়ে এবং অকাল-বার্দ্ধক্যের কবলে শরীর দ্রুত জীর্ণ-অপটু ব্যাধিগ্রস্ত ও পঙ্গু হয়ে ওঠে। তাই আধুনিক-বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এ সব উপসর্গ থেকে রেহাই পেতে এবং শরীরকে সুঠাম-সরল ও সুস্থ রাখতে হলে, নিয়মিতভাবে নিত্য কয়েকটি বিশেষ ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গক্রমে, আপাততঃ তাঁদেরই প্রস্তাবিত, মেরুদণ্ডকে সুস্থ-সবল ও সুঠাম রাখার উপযোগী আরো কয়েকটি সহজ-সরল বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গীর মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হলো।

গোড়াতেই যে ব্যায়াম-ভঙ্গীর হদিশ দিচ্ছি, সেটি অনুশীলনের রীতি হলো—দেহ এবং মেরুদণ্ড সটান-সিধা রেখে সমতল মেঝের উপর বসে দুই পা সুমুখ দিকে প্রসারিত করে দিন। তারপর দেহের সুমুখে প্রসারিত দুই পায়ের পাতা ও বুড়ো-আঙুল দুটিকে সমানভাবে মিলিয়ে একত্রিত করে, ধীরে-ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত উর্দ্ধে তুলুন মাথার উপর দিয়ে। এবারে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত ক্রমশঃ মাথার উপরদিক থেকে নীচের দিকে নামিয়ে দেহের সুমুখ দিকে প্রসারিত করে দিন এবং দুই হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করুন। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ আট-দশবার অভ্যাস করা দরকার। তাহলে মেরুদণ্ডের গঠন সুঠাম-সুন্দর এবং শরীর সুস্থ-সবল ও সাবলীল হবে অচিরেই এবং দৈহিক সৌন্দর্য্যও বজায় থাকবে দীর্ঘকাল।

মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য-শোভা অটুট রাখার উপযোগী আরেকটি ব্যায়াম-রীতি হলো—মেরুদণ্ড (Spinal column) যতখানি flexible বা সাবলীল···অর্থাৎ সহজ

স্বাচ্ছন্দ্যে ইচ্ছামতো হেলানো-বাঁকানো ও দোলানো যায়, ততই মঙ্গল। মেরুদণ্ডের এই সহজ সাবলীলতা বা flexibility মেলে—পিঠ বা মেরুদণ্ড বাঁকানোর ব্যায়াম-ভঙ্গিমায়। এই ব্যায়াম-ভঙ্গিমার জন্য, শরীর সিধা-সটান রেখে সমতল মেঝের উপর দাঁড়ান—কোমরের দুই পাশে দুই হাত ন্যস্ত করে। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে যথাসম্ভব শরীরকে বাঁকিয়ে দেবেন। এইভাবে যতখানি সম্ভব দেহকে হেলিয়ে পিঠের দিকে বাঁকিয়ে দিতে হবে—পেশীগুলিতে যেন বেশ টান পড়ে, সেটুকু পুরোপুরি উপলব্ধি করা চাই। এমনি ভঙ্গীতে দেহ এবং মেরুদণ্ডকে পুরোপুরি বাঁকিয়ে রাখার পর, ক্ষণেক স্থির স্তব্ধভাবে থেকেই পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটিকে উর্দ্ধে তুলে নিয়ে পূর্ব্বের মতো সিধা-সটান হয়ে দাঁড়াবেন। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটিও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে, দশ-বারোবার সযত্নে অভ্যাস করা দরকার।

পিঠে অবাঞ্ছিত মেদ-সঞ্চয় কমানো পেশীগুলি সবল রাখা এবং রক্ত-চলাচল সুস্থভাবে সম্পাদনার জন্য আরো একটি বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-সাধনের প্রয়োজন আছে। সে ব্যায়ামের রীতি হলো—দেহটিকে সটান-সিধা রেখে সমতল মেঝের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন এবং মাথার দু'পাশ দিয়ে দুই হাত যথাসম্ভব দীর্ঘপ্রসারিত করে দিন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই পা উর্দ্ধে তুলে দেহটিকে বাঁকিয়ে, পা দুটিকে যথা সম্ভব মেঝের উপর প্রসারিত দুই হাতের কাছে আনুন এবং এমনি ভঙ্গিমায় ক্ষণকাল স্থির-স্তব্ধ হয়ে থেকে, পুনরায় দুই পা উর্দ্ধে তুলে দেহটিকে ক্রমান্বয়ে সিধা করে ব্যায়াম-বিধির প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ, সমতল-মেঝের উপরে সটান-চিৎ হয়ে শয়নাবস্থায় ফিরে আসুন। এই ব্যায়াম-ভঙ্গিমাও নিত্য নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার সযত্নে অভ্যাস করা চাই।

এ সব ব্যায়াম-রীতি ছাড়াও, আরো কয়েকটি বিষয়ে একান্ত লক্ষ্য রাখা দরকার।

পরিচ্ছন্নতা সকল স্বাস্থ্যের মূল। দৈনিক ব্যায়াম-চর্চ্চার পরে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই পিঠটিকে নিত্য নিয়মিতভাবে সাফ্ করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্লেদহীন রাখা চাই। প্রত্যহ ব্যায়ামের পর এবং স্নানের সময় নরম গামছা বা তোয়ালে দিয়ে পিঠ রগড়ানো…দুই হাত দেহের পিছনে প্রসারিত করে পৃষ্ঠ-মর্দ্দন—একান্ত কর্ত্তব্য। এভাবে পৃষ্ঠ-মর্দ্দনের ফলে, পিঠ পরিচ্ছন্ন থাকে, পেশীগুলিতে শক্তি-সঞ্চারিত হয় এবং রক্ত-চলাচল অব্যাহত থাকে। পিঠের দিকের পেশীতে অযথা মেদ-সঞ্চয় হয় না, পেশী সুস্থ-সবল ও সুদৃঢ় থাকে, গায়ের চর্ম্ম মসৃণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিয়মিতভাবে এ সব ব্যায়াম-বিধি ও পৃষ্ঠ-মর্দ্দনের রীতি অনুশীলনের ফলে, দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য যে ক্রমেই সুন্দর, অটুট ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

[ক্রমশঃ

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংসারের দৈনন্দিন-কর্ম্মের অবসরে যে সব মহিলা সচরাচর নিজেদের হাতে সেলাইয়ের কাজ করতে ভালবাসেন, 'স্মকিং' (Smocking) বা 'হনিকোম্ব' (Honeycomb) সূচীশিল্প-রীতি সম্বন্ধে তাঁদের অনেকেরই অল্প-বিস্তর জ্ঞান আছে। আপাততঃ তাই সে সম্বন্ধেই মোটামুটিভাবে দু'চার কথা বলবো।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সূচীশিল্প-পদ্ধতি বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। প্রায় ৮০।৯০ বছর আগে ইউরোপের কৃষক-

সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের তাগিদে অপরূপ কারুকলাময় মনোরম এই সূচীশিল্প-পদ্ধতির সৃষ্টি। তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে এত দ্রুততালে এর ক্রমোন্নতি সাধন হয়েছে যে 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের রীতি আজকাল সুসভ্য-সৌখিন সমাজে অন্যতম 'ফ্যাসন' (fashion) হিসাবে বিশিষ্ট সমাদর লাভ করেছে। ইদানীং কালে মহিলাদের সৌখিন অঙ্গাবরণী ব্লাউশ,—বিশেষতঃ, ছোট ছেলেমেয়েদের জামা-ফ্রক প্রভৃতি পোষাক-আশাকে 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সূচীশিল্পের সুন্দর-অভিনব কাজ করা মানে, সেগুলির সজ্জা-শ্রী, মনোহারিত্ব এবং শোভা-সম্পদ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলাই বোঝায়। তাছাড়া সব চেয়ে সুবিধার কথা হলো, 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের রীতি এতই সহজ যে যাঁরা সামান্য সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ জানেন, অল্প-আয়াসে তাঁরাও নিখুঁত-পরিপাটিভাবে এ-কাজ করতে পারবেন।

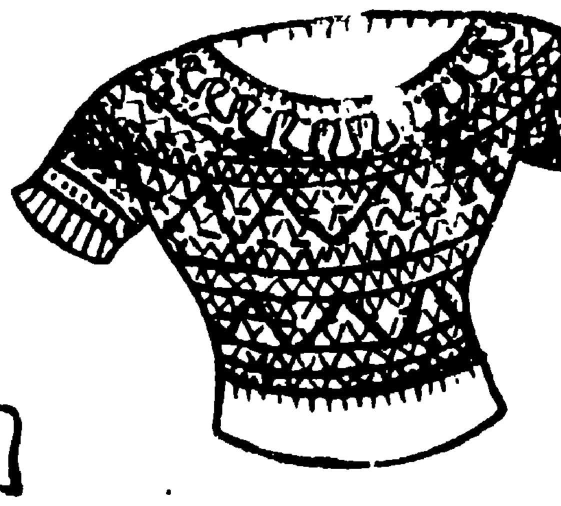

১ স্মকিং বা হনিকোম্ব সেলাইয়ের কাজ করা ব্লাউশ

'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের কাজের জন্য সব চেয়ে উপযোগী হলো—যে কোনো রকমের মিহি-পাতলা ধরণের সূতী, রেশমী বা পশমী কাপড়। মোটা কাপড়েও অবশ্য এ-রীতিতে সেলাইয়ের কাজের বাহার মন্দ খোলে না। কারণ, মোটা কাপড়ে স্বাভাবিকভাবেই সচরাচর যেমন ধরণের 'কোঁচ' (Gatheringবা folds) পড়ে, 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের উদ্দেশ্যই হলো—সেগুলিকে সুসমঞ্জসভাবে পাটে-পাটে গেঁথে ধরে রাখা। কাজেই 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাই করতে গেলে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা দরকার—কাপড়ে যে-কোঁচ পড়ে, সেগুলি যেন সমান-ছাঁদের হয়। অর্থাৎ, একটি কোঁচে বড় বা বেশী কাপড় এবং অপরটিতে ছোট বা কম, এমনভাবে কাপড়টিকে কোঁচকালে, সেলাইয়ের সমধারা-বাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ফলে, সে-সেলাই বিশ্রী-বেয়াড়া, এলোমেলো-অসমান ও তালগোল-পাকানো নিতান্তই খাপছাড়া-ছাঁদের দেখাবে। তবে এ অসুবিধা থেকে রেহাই পাবারও সহজ উপায় আছে—যদি সেজন্য একটু কষ্ট স্বীকার করি। সে কাজটুকু হলো—এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি কিম্বা আধ ইঞ্চি যতখানি পুরু কোঁচ (Gathering বা fold) দিতে হবে, ঠিক তত-ইঞ্চি অন্তর-অন্তর আড়াআড়িভাবে সেলাইয়ের কাপড়ের টুকরোটির উপর সেই মাপ-অনুসারে চওড়া-চওড়া ছাঁদে লাইন টেনে নেবেন। তারপর ঠিক ঐ একই-মাপে-ইঞ্চি বাদ দিয়ে আরো কয়েকটি লাইন টানুন লম্বালম্বিভাবে। তাহলেই দেখবেন—পেন্সিলের রেখায় রচিত সারি-সারি কতক-গুলো বরফি-কাটা ঘর পাওয়া যাবে। এবারে কাপড়ের যে-অংশে ঐ বরফি-কাটা ঘরের দুটি লাইন পরস্পর কাটাকুটি করেছে, সেই সব অংশে পেন্সিলের সাহায্যে 'ফুটকী-চিহ্ন' দিন। কাপড়ের টুকরোর উপরে এভাবে 'ফুটকী-চিহ্ন' দিয়ে আঁকার বদলে, যদি কাপড়ের যথাযথ মাপ-অনুযায়ী আলাদা একখণ্ড মজবুত শাদা-কাগজের উপর উপরোক্ত-পদ্ধতিতে সমান-ছাঁদের 'কোঁচ' (Gatherings বা folds) ও বরফি-কাটা ঘর এবং ফুটকী-চিহ্ন রচনা করে নেওয়া যায়, তাহলে 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সূচীশিল্পকর্ম্মেরও যথেষ্ট সুবিধা হবে এবং সেলাইয়ের কাপড়ের পারিপাট্যও সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা যাবে। কি উপায়ে এ কাজটুকু সম্পন্ন করা যাবে। শিক্ষার্থিনীদের সুবিধার্থে নীচের ২নং ছবিতে তার মোটা-মুটি আভাস দেওয়া হলো।

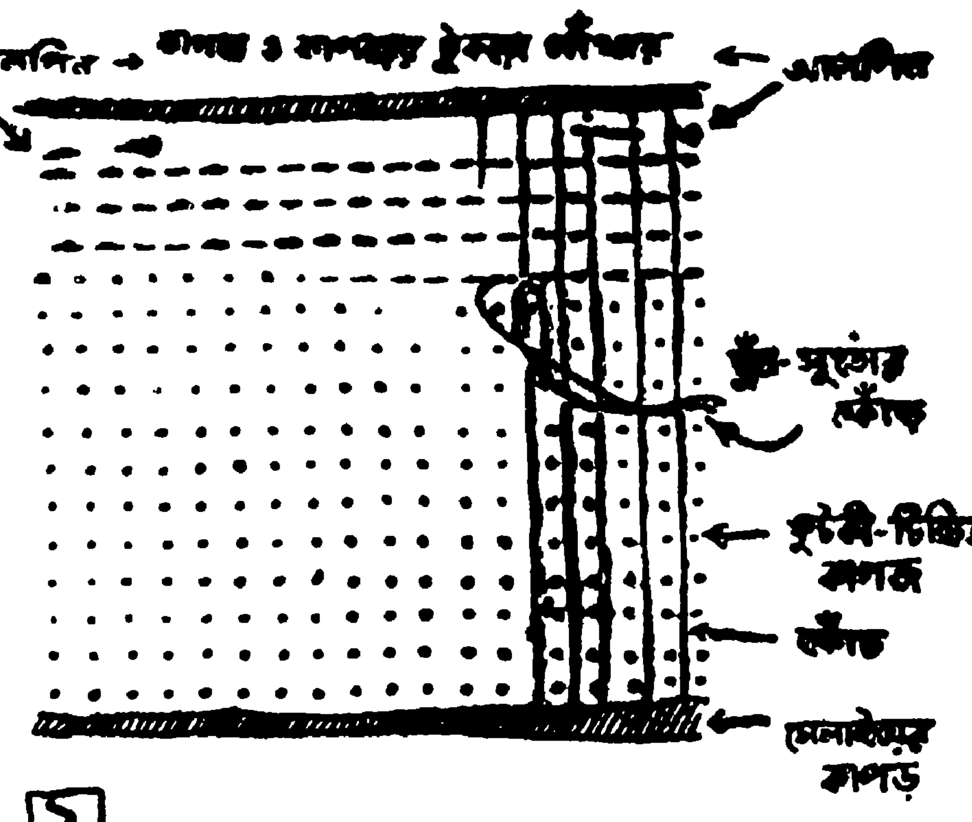

২

অতঃপর ফুটকী-চিহ্নিত ঐ কাগজখানিকে আলপিন বা

টাঁকা-সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে সেলাইয়ের কাপড়ের টুকরোটির উপরে মাপ-অনুসারে যথাযথভাবে এঁটে নিন এবং ছুঁচ আর সুতোর সাহায্যে ২নং ছবির হদিশ মতো উপায়ে ফুটকী-চিহ্নিত প্রত্যেকটি অংশে সযত্নে পরিপাটি ছাঁদে 'দাঁড়া-সেলাইয়ের' ফোঁড় তুলুন। এভাবে 'দাঁড়া-সেলাইয়ের' ফোঁড় তোলার সময় সর্ব্বদা মনে রাখবেন যে প্রত্যেকটি লাইন আরম্ভ করতে হবে ছুঁচে নতুন সুতো পরিয়ে। কারণ, প্রত্যেক লাইন রচনার শেষে ছুঁচ থেকে সুতোটিকে খুলে নিতে হবে। তাহলে পরে, ঐ সুতোর অংশ ধরে 'টেনেই সুষ্ঠু-পরিপাটি ছাঁদে সেলাইয়ের' কাপড়টিকে কুঁচকে নেওয়া সম্ভব হবে। এমনিভাবে একে-একে সব কয়টি লাইনের সুতোর অংশগুলিকে টেনে সেলাইয়ের কাপড়টিকে কি উপায়ে কুঁচকে নিতে হবে, পাশের ৩ নং ছবিটি দেখলেই তার মোটামুটি হদিশ পাবেন। এবারে কাপড়ের কোঁচকানো-অংশগুলি স্থায়ী করবার জন্য উপরোক্ত ছবির নমুনা-অনুসারে—প্রথমে সুতোগুলিকে টেনে নিন। এ কাজের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন—কাপড়ের প্রত্যেকটি কোঁচ যেন সমান-ছাঁদের হয়। তারপর 'বকেয়া-সেলাই' পদ্ধতির ভঙ্গীতে ৩ নং ছবিতে দেখানো তীর-চিহ্নিত অংশের নমুনা-নির্দ্দেশ

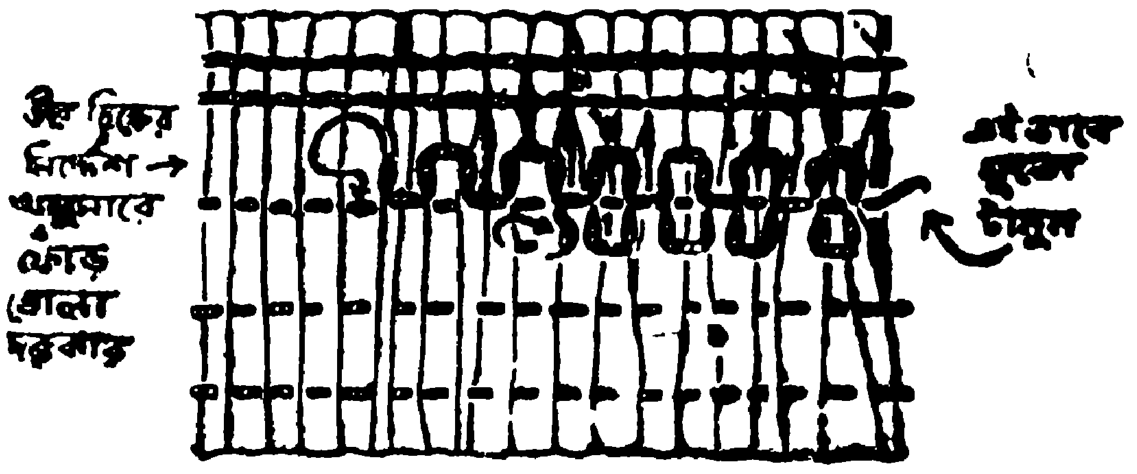

৩

অনুযায়ী ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে পরিপাটি-নিখুঁত ভাবে সূচীকার্য্য করে চলুন।

'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সূচী শিল্পের রীতি প্রসঙ্গে এবারে মোটামুটি আভাস দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি দরকারী কথা জানাবো।

[ক্রমশঃ

——

প্রতিবিম্ব

জগদীশচন্দ্র দাস

রাতের কলুষ কীট শুরু দেখি দুপুর শহরে
নিজেরে রেখেছে ব্যস্ত কর্ম্মময় ক্ষুধার্ত্ত প্রহরে।
তারপর সন্ধ্যা শেষে ক্লান্ত মনে শ্লেষের নিশ্বাসে
রাত জাগে দুঃখ-ভারে, কাঁদে আর হাসে।
এক নয়, অনেক সংঘাত
জটিল করেছে স্বযু বসায় সে সুকৌশল দাঁত;
এ শহরে তবু মোহ, নীড় বাঁধা আর ভেঙ্গে ফেলা
দাবীর মিছিলে থেকে শেষ হয় জীবনের খেলা।
তবু ঘৃণা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর কলরব,
অতল আঁধারে থাকি একান্ত নীরব—
আশা তবু ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে এই নগর-নরক
পাপ হাসে, ঘৃণা হাসে, কাঁদে শুধু মৃত্যু দীর্ঘ শোক

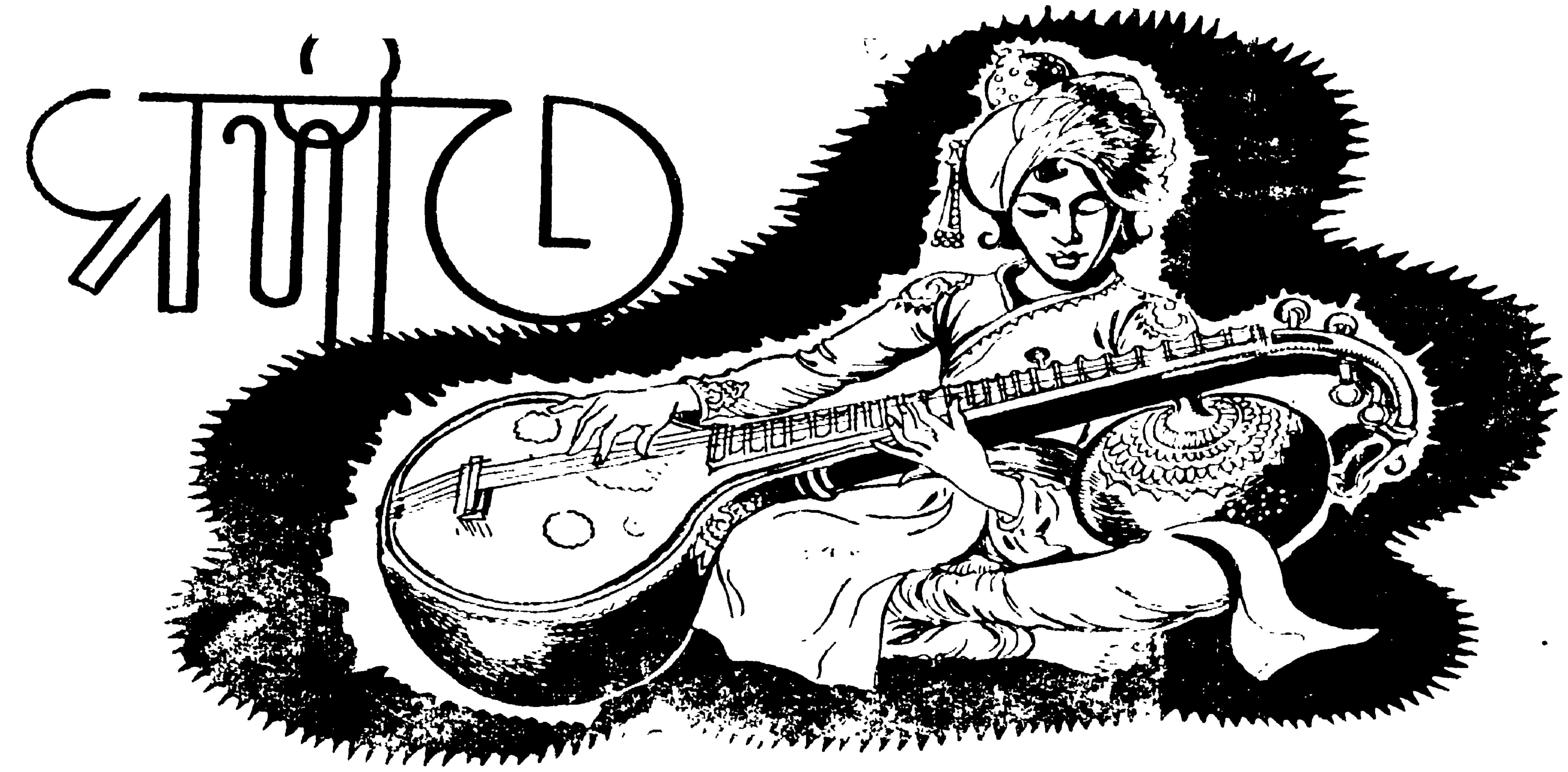

সুষমা করুণা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(লঘুগুরু ছন্দ)

গগনে দীপ্তিফুল চয়নে কে অতুল বালা
গাঁথে এ-অমল রাতে মরি কমলমালা ?
শোকে শান্তি পরকাশি' (মা ;
ভোগে ভ্রান্তি দুখ নাশি (মা)
মলয়ে মঞ্জরিল হৃদয়ে সঞ্চারিল সুষমায়,
প্রাণে ঝরিল সুর তানে কে মধুর করুণায় ?
মর্মে ঝংকৃল অবন্ধে (মা)
নর্মে ছন্দিল বসন্তে (মা)
ব্যোমে বৃন্দ রবিরাগে মন্ত্র জপি' প্রেমে (মা)
বরদা কে জননি, এলে জয়ধ্বনি' নেমে ।

(এ গানটি গত বৎসর ডিসেম্বরে পুনায় বেঁধে ছিলাম ভূমিকম্পের পরে তারাভরা আকাশের তলে। ছন্দটি নতুন—নব মাত্রিক : ১ ২ ৩ ৪।৫ ৬,৭ ৮ ৯ এই বিভাগ—বিস্তৃত তেওরার ভঙ্গিতে। বোল : ধা ধিন্ ধিন্ না। ধিন্ না। ধিন্ ধিন্ না। কার্ফা ও ঝাঁপতালের সমাস। নানা তাল দিয়ে আমি গানটি গেয়ে থাকি। একটু অভ্যাস করলেই গানটির বৈচিত্র্য ও সুষমার মর্ম উপলব্ধি করা চলবে।

স্বরলিপি

প

II সা ঋা মা । | পা দা র্সা না র্সা I ঋ্া র্সা ণা র্সা | পা ণা ণা দা পা

গ গ নে - দী প্ তি ফু ল চ য় নে - কে - অ তু ল

ম

র্সা ণা দা পা | পা মা জ্ঞা ঋা সা I

বা - - - লা - - - - -

সরা জ্ঞা জ্ঞা । | রজ্ঞা মা মা মা মা I গমা পা পা । | মপা দা দা দা দা I

গাঁ - থে - এ - অ ম ল রা - তে - ম রি ক ম ল

জ্ঞা মা দা ণা | দণা র্সা জ্ঞ্া ঋ্া র্সা I

মা - - - লা - - - - -

ণ ণ

জ্ঞা । মা । | দা । দা ণা ণা I দ ণা র্সা র্সা । | ঋ্া র্সা দা ণা র্সা I

শো - কে - শা ন্ তি প র কা - শি মা - - - - -

ম র্ মে - ঝ ঙ্ কৃ ল অ ব ন্ ধে - মা - - - -

জ্ঞ্ জ্ঞ্ র্

জ্ঞ্া । জ্ঞ্া । | জ্ঞ্া । জ্ঞ্া জ্ঞ্া জ্ঞ্া | ঋ্া ঋ্া র্সা । | র্মা জ্ঞ্া জ্ঞ্া ঋ্া র্সা I

ভো - গে - ভ্রা ন্ তি দু খ না - শি মা - - - - -

ন র্ মে - ছ ন্ দি ল ব স ন্ তে - মা - - - -

র্ স্ ণ

র্মা র্মা র্মা । | জ্ঞ্া । জ্ঞ্া জ্ঞ্া জ্ঞ্া I ঋ্া ঋ্া ঋ্া । | র্সা । র্সা র্সা র্সা I

ম ল য়ে - ম ন্ জ রি ল হৃ দ য়ে - স ন্ চ রি ল

ব্যো - মে - বৃ ন্ দ র বি রা - গে - ম ন্ ত্র জ পি

ণ

র্সা ণা দা পা | মা পা র্সা না র্সা I

সু ষ মা য় মা - - - -

প্রে - মে - মা - - - -

প ম জ্ঞ

ণা । ণা । | দা দা দা দা দা I পা । পা । | মা । মা মা মা I

প্রা - ণে - ঝ রি ল সু র তা - লে - কে - ম ধু র

ব র - দা কে - জ ন নি এ - লে - জ য় - ধ্ব নি

জ্ঞ

মা জ্ঞা ঋা সা | না সা মা গা মা II

ক রু ণা য় মা - - - -

নে - মে - মা - - - -

বিশ্ব বেষ্টন

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে

রবিবার বৈকাল চারটার সময় সাঁ হোয়াণ বিমান বন্দর থেকে উড়ে মেরী ল্যাণ্ড রাজ্যের প্রধান নগরী বাল্টিমোরের 'ফ্রেণ্ডশিপ' আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামলাম। তখন সূর্য অস্তপাটে বসেছেন। বিমান বন্দরের মুক্ত ক্ষেত্রে দীর্ঘ এল্‌ম্ গাছের ছায়া আরও দীর্ঘতর হ'য়ে পড়েছে। এখান থেকে ওয়াশিংটন তিরিশ মাইলেরও বেশী দূর। যদিও মার্কিণ মুলুকে বিমান কোম্পানীর স্বতন্ত্র বাস রাখার পদ্ধতি নেই সত্য তবু এ ক্ষেত্রে সামান্য মূল্য দিয়ে ভারতের অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। এমনি এক রাজধানীর নগর কেন্দ্রের সঙ্গে বিমান বন্দরের যোগাযোগ রক্ষাকারী বাসে আড়াই ডলারের টিকিট কেটে চ'ড়ে বসলাম। সামান্য কয়েকজন যাত্রী নিয়ে বাস প্রশস্ত পীচে মোড়া তরঙ্গায়িত, যান বিরল বাল্টিমোর ওয়াশিংটনে পার্কওয়ে (২৫ নং জাতীয় শরণি) ধ'রে চলতে লাগল। আমাদের বাঁয়ে প'ড়ে রইল পেটুক্সেন্ট বন্যপশুর আশ্রয়-স্থল। (Petuxent wild life Reefuge) আমরা চলে গেলাম জাতীয় কৃষি গবেষণাগারের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে হায়েতস্-ভীলাকে ডাইনে রেখে এগুতে লাগলাম ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে। আসা-যাওয়ার পৃথক্ পথের মাঝে শ্যামল তরুরাজির ব্যবধান। পথের ধারে পুষ্পিত বিটপীশ্রেণীর শোভা, পথ চলার ক্লান্তিকে বিদূরিত করে। আমরা প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে ওয়াশিংটনের সহরতলীর মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ বাসের আস্তানার দিকে এগিয়ে চললাম।

এলেন লী হোটেল :

এখান থেকে ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে পূর্ব নির্দিষ্ট 'এলেন লী' হোটেলের দরজায় এসে হাজির। বকশিস সমেত এক ডলার ভাড়া চুকিয়ে ব্যাগ নিয়ে হোটেলের কাউণ্টারে দাঁড়ানো প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার সম্মুখে রাত্রি বাসের ঘরের জন্য অনুরোধ নিয়ে দাঁড়ালাম। যে-ঘর আমার ভাগ্যে জুটলো তার আবার সংলগ্ন পায়খানা নেই। তা' নাই বা থাকলো! তারা বলে যে আমার আগামী কাল আসার সংবাদ 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' থেকে পেয়েছে। তাই আগামী কাল থেকে ভাল ঘর দেবে ব'লে ঠিক করে রেখেছে। এখন রাত প্রায় এগারটা ; অতএব পায়খানা ও স্নান ঘর সংলগ্ন, কি অসংলগ্ন তা' নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, মাথা বালিশে দিয়ে শুয়ে পড়াই শুভ বুদ্ধির কাজ ব'লে মনে হ'ল। ক্ষতি কি ? এ রকম ঘরের ভাড়াও তো কম। সংলগ্ন স্নান ও পায়খানা থাকলে কোন্ না এক ডলার বেশী পড়তো। যে হেতু আমি সকালে উঠি, সে দিক দিয়ে স্নান ঘরে যাওয়া আমার কাছে কোন অসুবিধেরই নয়। ভদ্র মহিলা যাঁরা স্নান ঘরে গিয়ে অধিকক্ষণ সময় নেন, তাঁরা সাধারণতঃ ভোরে ওঠেন না, বরঞ্চ বিলম্বেই উঠেন। ঘরে জিনিষ পত্র আনিয়ে, চাবি দিয়ে লাউঞ্জে এসে বসলাম। আমার পাশের সোফায় বসা ভদ্রলোকের সঙ্গে সামান্য, আলাপ হ'তে তাঁকে W.H.O.-র নতুন বাড়ীর সন্ধান চাইতে তিনি আমায় ব্যাখ্যা ক'রে না বুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এলেন।

রাস্তার মোড়ে গিয়ে বাঁ দিকে নবনির্মিত বাড়ী দেখিয়ে তিনি বললেন-'এই আপনার W.H.O.-র নতুন বাড়ী।' দেখলাম, মাত্র মিনিট তিনেকের হাঁটা পথ। রাত দুপুর প্রায় হতে চলল, অতএব বিছানায় শুয়ে পড়াই শ্রেয় বলেই স্থির করলাম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দপ্তর

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে প্রাতরাশের জন্য ও পরে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' অফিসের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অফিস ছাড়িয়ে 'ম্যাক ব'রে' জলযোগ সেরে বেলা সাড়ে আটটায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O.) অফিসে এলাম। আমি যাঁদের চাই তাঁদের কেওই তখনো কাজে আসেন নি দেখলাম, কিন্তু সাহেব দারোয়ান এসে গেছে। ক্রমশঃ লোকের যাতায়াত সুরু হয়েছে। লিফটে ক'রে কর্মীরা নিজ নিজ ঘরে উঠে যাচ্ছেন। এখন আর নামার পালা নাই, তখমা লাগানো দারোয়ান হামেহাল হাজির। সবাইকে সুপ্রভাত জানাচ্ছে। তিনিই আমায় শ্রীমতী সারদা লুইয়ের অফিসের নির্দিষ্ট তলা বলেছিলেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রথমেই দেখা করলাম শ্রীমতী লুইয়ের সঙ্গে। তিনি আমায় পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে চেক দেওয়ার জন্য নীচের তলায় গাণনিকের অফিসে সংগে করে নিয়ে এলেন, কিছুদিনের হাত খরচ প্রথমে কলকাতায় ও পরে ম্যানিলায় দিয়েছিল, বাকী পথের পাথেয় ওয়াশিংটন থেকে শেষ চুকিয়ে দেবেন তারই এ হিসেব পত্র। নানা দেশ অনুযায়ী নানা রকমের হার চালু। সেই সব জড়িয়ে হিসেব হবে। এখানে রয়েছেন হিসেবের অধিকর্তা হয়ে মেয়ে গণনিক, অত্যন্ত কাজের লোক কিনা তাই পাঁচ তারিখে আমি এখানে আসবো জেনে ওঁরা সাঁ হোয়ানে পয়লা তারিখে রেজেষ্টী করে চিঠি ও চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন, কোথায়? না সাঁ হোয়ানের জন সংযোগ অফিসারের কেয়ারে, তার ফলে আর যথা সময়ে চেক পেলাম না।

আমি বললাম 'দয়া ক'রে সে চেক বাতিল ক'রে নতুন চেক লিখে দিতে আর ও চেক বাতিল হবার খবর ব্যাংকে পাঠিয়ে দিতে। আমার পাঁচ তারিখ আসার কথা জেনে কেন পুয়োরটোরিকের P.R.O র কাছে চেক পাঠাতে গেলেন? P-R-O-র সংগে দেখা করার বাধ্যবাধকতা আমার তো নেই, দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে, সেখানে কেন পাঠাতে গেলেন?' ভদ্র মহিলা বললেন—ভাবলাম ডলার ফুরিয়ে যাবার আগে যদি চেক পৌছয়, তাতে আপনার সুবিধেই হবে; নইলে বিদেশে অর্থাভাবে মুস্কিল হতে পারে।'

এই ভেবে চিন্তে আপনার কাছে আগেই চেক পাঠিয়ে দিলাম।

—সত্যিই আপনার দূরদর্শিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ. তবে এখন যে বিপদে পড়েছি তার থেকে উদ্ধার করবে কে? একটি মাত্র পন্থা রয়েছে সেটা হ'ল পূর্ব চেক খারিজ করে আমায় একটা নতুন চেক কেটে দেওয়া, ভাল করতে গিয়ে এমন দুরবস্থায় যে পড়তে হবে আপনাকে কেমন করে জানাবো?

—আপনি কত দিন আছেন?

আছি তো শনিবার সকাল পর্যন্ত।

—তার মধ্যে নিশ্চয়ই চেক ফেরৎ এসে যাবে।

—এতো আপনার অনুমান অথবা ব্যক্তিগত বিশ্বাস। চেক ফিরে আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। আমার বিবেচনায় ও আমার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যও আপনি ঐ চেকের ভরসায় না থেকে আমায় নতুন চেক দিয়ে দিন, আর আগের কাটা চেকটা বাতিল ক'রে ব্যাঙ্কেও খবর দিন।

—না দেখবেন আপনি পেয়ে যাবেন যথা সময়ে।

—এই আশায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম কিন্তু অর্থের আমার আশু প্রয়োজন।

যাই হোক এই অপ্রীতিকর আলোচনা ক'রে ওপরে উঠে এলাম. দেখা করতে হবে এখানকার একজন কর্তাব্যক্তি, মার্ক হলিসের সংগে। তিনি এগারটা নাগাদ আমার সংগে দেখা করবেন খবর পাঠিয়েছেন। বিদেশে থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর সংগে আলোচনা সেরে আমার সংগে কথাবার্তা কইবেন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক-দের সংগে দেখা করবার জন্য মার্কহলিসকে লেখা হয়েছিল। মার্ক হলিস U. S. P. H. S. (United States Public Heatth Services)-এর প্রধান স্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি বিশ বছর আগে যখন আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তখন তাঁর সংগে পরিচয় হয় নিউ ইয়র্কে, একবার যখন তিনি কলকাতায় আসেন তখনও দেখা ও প্রীতিবিনিময় হয়েছিল।

নীচে ফিরে আসতে শ্রীমতী লুই বললেন "মার্ক হলিসের সচিব তোমায় তাঁর সংগে দেখা করতে বলেছেন।

জানো মিঃ চ্যাটার্জি, আমি এখন ফেলোশিপের কাজ দেখছি না। শ্রীমতী টনী এসব এখন দেখছেন। তোমায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।" আমরা দুজনে শ্রীমতী টনীর ঘরে গিয়ে দেখি, টনী কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত। কাজ ছেড়ে উঠে করমর্দন করলেন। শ্রীমতী টনী মাদাম লুইসের তুলনায় বয়সে অল্প, টসটসে ঠোঁট, যৌবন যেন উথলে পড়ছে, বর্তমানে তিনি প্যারিসের অফিস থেকে বদলী হয়ে ওয়াশিংটনে এসেছেন। সেখানে ব'সে আমার আশু করণীয় কিছু কাজ সেরে নিলাম। একটা জেনারেল ম্যানেজার Ontario Water Resources Commission-এর কাছে লেখা চিঠি পাঠাতে, আমার Official Data Sheet ছ'কপি টাইপ করে দিতে ও আমার পাশপোর্টে কয়েকটা দেশের ভিসা করিয়ে দিতে দিলাম।

হার্ভের সেই 'বুরোক্রেশীর যাঁতাকলে মানুষ সাধারণ সৌজন্য টুকুনও হারায়' সেই উক্তিটি আমার স্মরণে এল। মনে হ'ল যেন আমি উন্নাসিক কোন সরকারী ভারতীয় অফিসে এসেছি সেখানে যেমন সাধারণতঃ হৃদয়হীন ব্যবহার পাওয়া যায় এখানেও যেন তার পুনরাবৃত্তি!

পরের দিন হায়েৎসভিল থেকে শ্রীমতী টনীকে টেলিফোন করলাম।

জিগ্যেস করলাম—কাজের কতদূর কি হ'ল? ভিসার খবর কি?

—লোক গেছে নানা দূতাবাসে ভিসা করাতে।

—Data sheet কপি করা ও চিঠিটা ফেলিয়ে দিয়েছেন তো?

—অফিসিয়াল পত্রছাড়া এখান থেকে ডাক টিকিট দেওয়া হয় না। সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস ও 'ফেলো'দের

FEDERAL TRIANGLE & EXECUTIVE DEPARTMENTS WITH WHITE HOUSE

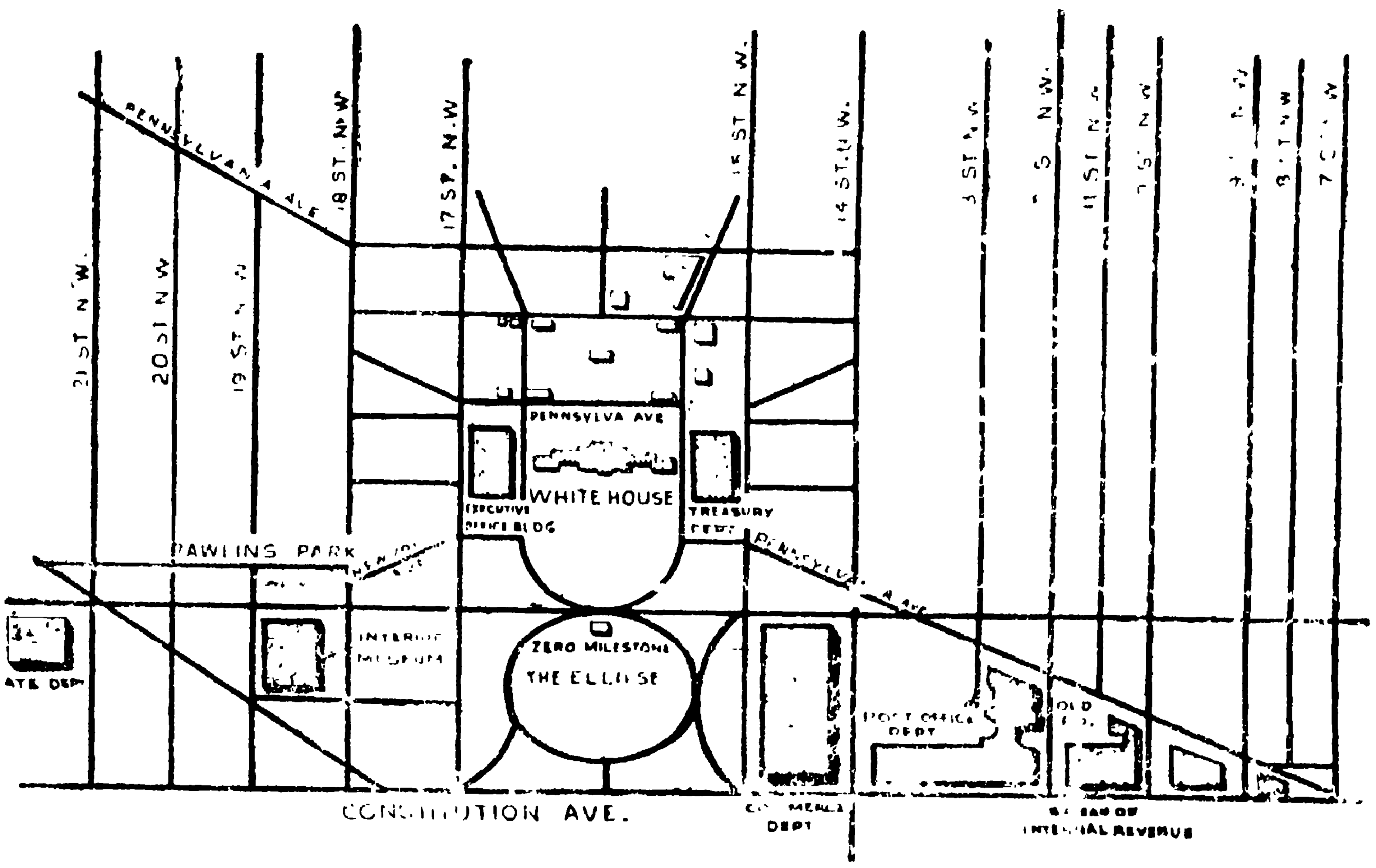

মঙ্গলবার বৈকালে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাজ সেরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দপ্তরে এসে দেখি সকল কর্মীই চলে গেছেন। শুধু একটী ভদ্রমহিলা ছিলেন। আমার পাশপোর্টের সন্ধান করতে বলায় তিনি সামান্য খুঁজে খবর করতে পারলেন না। 'টনী'র ঘরে ঢুকে দেখি চিঠিটা ফেলা হয় নি, Data sheet টাইপ হয়নি। যেমনকার যা সেই জায়গায়ই রয়েছে। আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলাম।

দেওয়া হয় না।

—মাদাম, একথা কোথায় লেখা আছে? U. N. Charter-এ, না WHOএর কনষ্টিটিউশনে? অথবা কোন রুল বা রেগুলেশনে?

—ঠিক বলতে পারবো না। এই রকম এখানের নিয়ম।

—এটা কি কোন 'অফিস অর্ডারে' এই রকম কাজ চলছে?

—আমি নতুন, আমি জানিনা।

—তোমায় যিনি বলেছেন একথা, তাঁর কাছ থেকে তুমি জেনে রেখো। আমি গিয়ে দেখবো সেই অর্ডার।

—এমনি, কন্ভেনশন্।

—শ্রীমতী টনী শুনুন, এটা আমেরিকা, এখানে কন্ভেন্শনে বিলেতের মত কোন কাজ হয় না। নিয়ম হ'লে নিশ্চয়ই লেখা থাকবে। নয় বুঝবো তোমরা এর প্রকৃত অর্থ করতে পারো নি।

—এরা বলছিল এখানের এই রকম কায়দা।

—শ্রীমতী টনী, তুমি এখানে নতুন। ওদের বুদ্ধিতে তুমি চললে, তুমি ডুববে। মহিলা চুপ ক'রে থাকেন, উত্তর করেন না।

—আচ্ছা শুনুন শ্রীমতী টনী, চেকের কি হ'ল বলতে পারেন?

—আমরা অপেক্ষা করছি।

—শুক্রবার তুমি পেয়ে যাবে।

—আমি কি তোমাদের এখানে ভিখিরির মত ধর্ণা দিতে এসেছি যে পুরোনো ব্যুরোক্রেশীর চালে কথা কইছ। আমি তোমাদের ঠিক-করা হোটেলওয়ালাকে বলে দিচ্ছি তোমাদের নামে বিল বানাতে। আর এ সব ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে চিঠি এখানের বড় কর্তা ও দিল্লী ও জেনেভায় লিখে দিচ্ছি।

—আমাদের নামে বিল পাঠালে চলবে না।

—কেন? তোমরা কি মনে কর যে, যে-টাকা তোমরা দাও তার থেকে জমা তো দূরের কথা স্থানীয় ভদ্রলোকেরা লাঞ্চ ডিনারের নেমতন্ন করে' বলেই কোন গতিকে চলে। নইলে দু এক বেলা উপোষ দিতে হ'ত।

—তুমি এরপর কোথায় যাবে?

—প্রথমতঃ সিকাগো। সে কথা জেনে কি হবে? আমি পরিষ্কার ক'রে বলে দিচ্ছি কাল আমি তোমাদের অফিসে যাব। শুক্রবার যাব না। কালই আমার চেক চাই। চেক পেলে তো শুধু হবে না সেই চেক আমায় ব্যাংকে গিয়ে ভাঙাতে হবে, তবেই চেকের মূল্য।

—তা' হ'লে তুমি বৈকালে এস অন্ততঃ বৃহস্পতিবার।

—ধন্যবাদ। আমি বৃহস্পতিবার বৈকালেই অফিসে যাচ্ছি।

দক্ষিণী মেয়ের কাহিনী:

মার্ক হলিসের সঙ্গে দেখা করার মাঝে, আমি এক ভারতবাসী যে এসে গেছি সে খবর ভারতীয় কর্মীদের কাছে পৌছে গেছে। কেরেলার এক ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে টনীর ঘরে এসে দেখা করে গেলেন। ক্ষীণদেহা ভদ্রমহিলা যেন বিরহ ও বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি। তার কথা গভীর মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে শোনবার জন্য নিজের ঘরে নিয়ে গেল ও আপন জীবনের বেদনাময় গোপন তথ্য আমার কাছে উন্মোচন করে চলল। মুখে শুধু সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে শান্ত হইনি, অন্তরেও এর বেদনায় আমি সমব্যথী। ভদ্রমহিলা ব'লে চললেন—আমার জীবন যে কত দুঃখ ও বেদনার না শুনলে বুঝতে পারবেন না। আমার বাবা ছিলেন প্রাচীন খ্রীষ্টান ও সরকারী অফিসে বড় কাজ করতেন। আমার নিহত স্বামীও বাবার কাছে কাজ করতো। অতি সুন্দর স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, লেখাপড়ায় যেমন তীক্ষ্ণধী, খেলাধূলায়ও তেমনি সুদক্ষ। বাবা একটা খবরের কাগজের সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন ও ছেলেটীও বাবার কাছে সংবাদপত্রের কাজকর্ম শেখবার জন্য আসতেন। বাবাকে নানাভাবে ছেলের মত সাহায্য করতেন। আমার সঙ্গে সংবাদপত্রের অফিসে আলাপ হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হ'তে থাকে। তাকে আমি ভালবাসি, সেও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতে থাকে। সে ছিল হিন্দু কিন্তু আমায় পেতে সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। আমেরিকায় জার্ণালিজিমের একটা কাজ জুটিয়ে আমার বাবার কাছ থেকে জাহাজ-ভাড়া নিয়ে সোজা ওয়াশিংটনে চ'লে আসে। ব'লে যে, দেখো একবছর মধ্যেই তোমায় আমেরিকায় নিয়ে আসব। আমি এ দিকে এম. এ-টা পাস করে নিলাম। সে আমায় বছর না ঘুরতেই বিমান ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে ওয়াশিংটনে আনিয়ে নেয়। এখানে শিক্ষিতা মেয়েদের কাজের অভাব নেই। আমারও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় কাজ জুটে গেল। দুজনে মনের সুখে আছি। সে একটা নতুন গাড়ী কিনলো 'হায়ার-পার্চেজ'। ভগবানের বোধ হয় এত সুখ সহ্য হ'ল না। এক বছর পূর্ণ হয়নি একদিন নতুন মোটরে এক দুর্ঘটনায় সে মারা গেল। তাকে এখানের সব ভারতবাসী চিনতো। সে

ছিল সবাইয়ের প্রিয়। তার শবানুগমনে সারা ওয়াশিংটনের ভারতীয় সম্প্রদায় যোগ দিয়েছিল।

তখন আমি হ'য়ে গেলাম একলা। রাতের নিঃসঙ্গ বিছানায় কে আমায় সান্ত্বনা দেবে! চোখের জলে আমার মাথার বালিস সিক্ত হ'ত। দিন দিন আমি বিশেষ আনমনা ও উদাস হয়ে যেতে লাগলাম। এক আমেরিকান মিসনারী, ভারতবর্ষে যাঁদের একদল কাজ করেন, তাঁরা আমার শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমায় তাঁদের গির্জ্জার সংলগ্ন বাসভবনে হাওয়া বদলের জন্য আমেরিকার প্রশান্ত সাগরীয় প্রান্তে স্যানফ্রানসিস্কো যাবার আমন্ত্রণ জানান। আমি সেখানে মাসচারেক ছুটী নিয়ে যাই। যখন দেহে ও মনে কিছুটা সুস্থ হ'য়ে ফিরলাম, তখন এই অফিসের ছ্যাবলা মেয়েরা কি বল্‌লো জানেন?

—না। প্রথমতঃ তারা কেন বলবে? তারা বলবারই বা কে?

—তারা বললে date করে বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে ফিরলে নাকি?

—ওরা নিজেদের মনের মত সবাইকে ভাবে। এরা মনে করে বিবাহ শুধু পারস্পরিক দৈহিক সম্বন্ধ। একজন যখন গেছে অপর জনকে নিয়ে আনন্দ কর। আমাদের ভারতীয় আদর্শের বিবাহ যে জন্ম জন্মান্তরের। ধর্ম বদলালেও প্রাচীন সংস্কার মুক্ত হওয়া যায় না।

—"ঠিক বলেছেন। ওরা ভালবাসাকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যেতে চায়। ভালবাসাকে এরা জৈব প্রয়োজন ব'লে গ্রহণ করেছে। কুকুর বেড়াল মরলে অন্য একটা নিয়ে এসে শূন্যস্থান পূর্ণ করা যায় তেমনি স্বামীর বেলায়ও যেন সেরকম হ'তে পারে!"

ভদ্রমহিলার এ কাহিনী শুনে আমার মনটা বড় খারাপ বোধ হল। এদের হৃদয় বলে কি কোন জিনিষ নেই? বস্তুতান্ত্রিক বলে কি সবই ডলারের আদান প্রদানে পরিমিত হবে?

বললাম—সত্যই আমি তোমার মনোবল ও আত্মনির্ভরতায় বিমুগ্ধ হয়েছি। তোমার বাকী জীবন কেমন করে কাটবে! তোমার দেশে কারা আছেন নিজের ব'লে?

—বাবা কিছুদিন হ'ল মারা গেছেন। ছেলেবেলায় আমি মাতৃহারা।

—শ্বশুর বংশে কি কেউ নেই?

—শাশুড়ী আছেন। তিনি খুব শক্ত ভদ্রমহিলা। দেশ সেবায় জীবন পণ করেছেন।

—দেশে ফেরার কোন দিন ইচ্ছা আছে কি?

—নিশ্চয়ই।

—সেখানে গিয়ে কি করবে?

—আমার ইচ্ছে আমার শাশুড়ীর একটা সেবা নিকেতন আছে। সেখানেই আমার যতকিছু সঞ্চয় ও যতকিছু শ্রম দিয়ে জীবন অতিবাহিত করব।

—তোমার কি কোন পোষ্য নেবার বাসনা নেই?

—আপাততঃ নয়। তবে ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না। নিলেও নিতে পারি।

—খ্রীষ্টান 'নানে'দের মত শেষ জীবন সেবাধর্মে উৎসর্গিত হবে, দেখছি।

ভদ্রমহিলা প্রসঙ্গ বদলিয়ে বললেন 'এখানে অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

—এখনও হয়নি।

—এখানে একজন পাকিস্থানী বৌ এই দপ্তরেই কাজ করেন।

—খুব ভাল।

—তবে সে পাকিস্থানী নয়, কেনেডিয়ান্।

—তাতে আর কি আসে যায়। সেও তো বর পেয়েছে, পাকীস্থানী হ'লেই বা। এখানে বর পাওয়াও এক মহা সমস্যার ব্যাপার।

আমি ওখান থেকে মার্ক হলিদের ডাকে উঠে পড়লাম।

পাকিস্তানী কেনেডিয়ান্ বধূ:

বৈকালে যখন এদিকে ফিরলাম তখন এক তরুণী ভদ্রমহিলা আমায় শুভ অপরাহ্ণ জানিয়ে কিছু যেন বলতে চায় বুঝলাম। আমি তো সব কথারই উৎসুক শ্রোতা। সে বলল মিসেস্ কুট্টি আমার নামে তোমার কাছে কি সব বলছিল?

—কি জন্যে?

—ও নাকি বলছিল আমি পাকিস্থানী বিয়ে করেছি?

বলে থাকতে পারে। তাতে তোমার কি হ'ল?

তোমার বিয়ে কার সঙ্গে হবে বা কাকে তুমি করবে সে তোমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার বাপ মা তো তোমাদের বিয়ের দায়িত্ব নেন না, যেমন আমাদের দেশে নেন, তোমার পাকিস্থানী বালকসখাকে ভাল লেগেছে তুমি তাকে বিয়ে করেছ। এতো আনন্দের কথা। তার বলায় কি যায় আসে? কতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

—এই কয়েক মাস।

—তবে প্রেম বেশি পুরোনো নয়। তোমাদের বিবাহিত জীবন যাতে মধুময়, প্রেমময় ও শান্তিময় হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় সে কামনা তোমাদের দুজনের জন্যেই রেখে যাচ্ছি। তুমি আমার বন্ধুর দেশের মেয়ে, যেখানে আমি বৎসরাধিক কাল স্নাতকোত্তর লেখা পড়া করেছি। আর পাকিস্থানী ছোকড়া। সেও তো সেদিন ভারতেরই অংশ ছিল অর্থাৎ আগেকার ভারতবাসী। তোমরা দুজনেই আমার বন্ধু। দেখছি আমার মেয়ে পুরুষ বিশেষ ক'রে মেয়ে-বন্ধুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের অফিসে :—

এগারটায় আমি মার্ক হলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের পূর্ব পরিচিতির অতীত কাহিনীর কিছু রোমন্থন চলল। তিনি বললেন আজ দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চে যেতে হবে। সেই লাঞ্চে বিশ্বব্যাঙ্কের আরমষ্ট্রং, শিপম্যান ও অন্য বন্ধুরাও যোগ দেবেন। তার আগে তাদের সঙ্গে কিছু আলাপ পরিচয় করতে হবে। এখন আমাদের ওঠাই ভাল। গাড়ীতে যেতে যেতে কথা হবে।

—আমরা উঠে পড়লাম, নীচে নামবার জন্য। আজ তাঁর গাড়ী শ্রীমতী হলিস নিয়ে গেছেন। তাই নীচে নেমে একটা ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সি চালক এক নিগ্রো মহিলা। তার গলার স্বর কর্কশতায় পুরুষকেও হার মানায়। কোথাও যেন নেইকো কোমলতা না অঙ্গে, না ভ্রূভঙ্গে, না শ্রীতে, না প্রসাধনে।

বিশ্বব্যাঙ্কের আরমষ্ট্রং (Armstrong) ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল, তাঁরা জানতে চাইলেন কলিকাতা মহানগরী পরিকল্পনা (C. M. P. O.) সংস্থার কাজকর্ম কেমন চলছে? মাষ্টার প্ল্যান কি পর্য্যায়ে এখন আছে।

তখন আমি সংক্ষেপে বললাম ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের অফিসে Master Plan for water supply, sewerage and drainage সম্বন্ধে রিপোর্ট এখন সমাপ্তির পথে। জেনেভায় তারা অনুমোদন করার জন্য পাঠিয়েছে। WHO থেকে অনুমোদন পেলে মাসখানেকের মধ্যে ছাপা হবে। আর বৃহত্তর মহানগরী কলকাতার মাষ্টার প্ল্যান ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আওতায় নানা নাম পরিবর্ত্তন হয়ে সমাপ্তির দিকে শম্বুক গতিতে চলেছে। মাষ্টার প্ল্যান বলে কাজ শুরু হয়, তারপর 'ফার্ষ্ট সাইকেল প্ল্যান' (First cycal plan) লেখা শেষ হয়, সামান্য শুধু নক্সা করার বাকী থাকে। সেটা সম্পূর্ণ বাতিল করে প্রথম প্রণেতার বিদায়ের পর অপরজনকে দিয়ে 'বেসিক ডেভেলাপমেণ্ট প্ল্যান (Basic Development Plan) নামে লেখা চলেছে, শুধু ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কর্মীকুলের স্থিতিপর্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে, তাদের খুসী খেয়ালে কাজ হয়, তারপর কর্মীদের কেউ যদি ত্বরান্বিত করতে চায় তো সমূহ বিপদ, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের হাতে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করার আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হল যখন এই বিরাট পরিকল্পনা রূপায়ণে কিছু অর্থ বাইরে থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে বিশেষ করে বিদেশী যন্ত্রপাতি কেনার জন্য, তখন বিষয়টী তোমরা যেন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখো তারই অগ্রদূত হিসেবে যখন এ দেশে এলাম তখন এই সুযোগে তোমাদের সঙ্গে প্রিয় পরিচয় কিছু উজ্জীবিত করে যেতে চাই। এই হল এ মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কলকাতায় দেখা আমার চেনামুখ দেখার সৌভাগ্য ও সুযোগ ক'রে দেবার জন্য আমি মার্ক হলিসকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাই। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে আজ আমরা টাকার মূল্য ডলারের তুলনায় অবনমিত হওয়ায় বিশেষ অসুবিধেয় পড়েছি, যে জিনিষ পাঁচ লক্ষ টাকায় কিনতাম তার দাম আজ দিতে হবে সাড়ে সাত লক্ষ টাকায়। শিপম্যান বললেন—'মিঃ চ্যাটার্জি, আপনাদের কিছু Asset গড়ে না উঠলে আমাদের পক্ষে ঋণদানের ব্যাপারে কিছু করা ভারী শক্ত। তখন আমি বললাম—এ কথা আমিও জানি সম্পত্তি বন্ধক রেখে ধার নিতে হবে।'

তোমাদের একথা বলতে আসিনি যে ভুয়ো একটা প্রতিষ্ঠানকে তোমরা ধার দাও। কাজ করে চলেছি। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মাঝপথে ঠেকে গেলে বন্ধুদের সহায়তা নেওয়ারই রীতি, তখন হয়তো তোমাদের কাছে আসতে পারি। চাইবার যখন অধিকার হবে, তখনই চাইব, তার আগে নয়। যোগ্যতা বিবেচনা ক'রে তখন ঋণের কথা ভেবো এবং তাও বিশ্বব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে। তোমাদের আমরা দয়া দেখাতে বলব না। সাধারণতঃ নানা প্রশ্ন, যা' হয়তো তোমাদের মনে পরিষ্কার হচ্ছে না, তা আমরা টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসে সেই সব সমস্যার সহজ সমাধান করে নিতে পারি। যখন ওয়াশিংটনে এলাম তখন ডক্টর হলিস্‌কে তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ করব বলে! আমার সামনে দেখছি কলকাতার পরিচিত আমার পুরোনো বন্ধুবর রয়েছেন! কবে কলকাতায় যাচ্ছেন মিঃ চার্লসমন?

—দরকার হ'লেই, বা ডাক পড়লেই যাব।

—এমনি কোন কলকাতা হয়ে ম্যানিলা, কি ব্যাংককে যাবার কর্মসূচী নেই। এক আধদিন নেমে যাবেন কলকাতায়, কি বলেন?

—নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

আমরা উঠে পড়লাম লাঞ্চে যাবার জন্য। ঐ বাড়ীরই কাছাকাছি একটি যায়গায় গেলাম। খেতে খেতেও আমাদের আলাপ আলোচনা, পরিচিতদের সংবাদ আদান প্রদান চল্‌লো। 'ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স' অফিসে কাজকর্মের কথা বললাম। সেখানে প্রধান তিন পর্বের কথা আলোচিত হ'ল। তা জলসরবরাহ, ময়লা পরিবহন এবং পরিশুদ্ধি ও বর্ষার জল নিষ্কাশন (Water Supply, sewerage & sewage Treatmen and Storm Drainage)।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরে :—

বেলা আড়াইটে নাগাদ মার্ক হালিস তাঁর আগেকার অফিস U,S,P,H, S,এ 'বোজেক' সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে বললেন, বোজেক সাহেব আমারও কদিনের পরিদর্শন পর্ব পরিচালনার ভার নিয়েছেন। শ্রীমতী সারদা লুইস্ আমাকে একটা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন, সেটা বের করলাম না। এখান থেকে ট্যাক্সি ক'রে আমরা চলে এলাম U. S. P. H. S.-এর অফিসে। তিনি এই অফিস থেকেই সদ্য অবসর নিয়েছেন, উনি একসময় আমেরিকান ওয়াটার ওয়ার্কস এসোসিয়েশনেরও (A.W.WA.) সভাপতি ছিলেন। সারা পৃথিবীতে তিনি তাঁর বিশেষ ক্ষেত্রে সুপরিচিত, কর্মসূত্রে তিনি জেনেভা, কানাডা, ফিলিপাইনস্, ভারতবর্ষ ও সারা আমেরিকার নানা স্থানে ঘুরেছেন। বহুদিন আগে হার্ভে লাউউইগ তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। এ কাজ ছেড়ে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অভিজ্ঞ লোক দরকার হওয়ায় তাকে আবার সরকারী চাকরী নিতে বলায় সে অস্বীকার করে। কিন্তু যুদ্ধে' আইনে যে কোন মুহূর্তে যাকে ইচ্ছে যুদ্ধে পাঠানো যেতে পারে। এরকম ভাবে বোঝাতে বা ভয় দেখাতে তিনি U,S,P,H,S,এ যোগ দেনও যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজের ব্যবসায় ফিরে যান। এখন তাঁরা বেশ কয়েক জায়গায় শাখা-অফিস খুলেছেন। কলকাতায় একটা খোলার আয়োজন চলেছে। ডাঃ হলিস আমায় 'বোজেকের' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেখান থেকে নিজের পুরোনো অফিসে উঁকি মেরে মেয়েদের শুভেচ্ছা জানালেন। আমি ফিরে গিয়ে বোজেক সাহেবের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম। তিনি আমার পরিদর্শনের একটা ব্যবস্থা ও কর্মসূচী তৈরি করে যথা যোগ্য স্থানে সংবাদ দিয়ে দিলেন—আমি কবে, কখন, কোথায় যাব। ব্যবস্থা হ'ল, মঙ্গল ও বুধবার যাব ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে হায়েৎস্‌ভিলস্ ও ডিষ্ট্রিক্ট কলম্বিয়ার চেয়ে আরও বিস্তৃত অঞ্চলে 'ওয়াশিংটন সুবারবান্ সেনিটেশন কমিশনের (W. S. S. C.) অফিসে ও সেখানে আলাপ আলোচনা ও পরিদর্শন চলবে বৃহস্পতিবার বৈকালে কোন কর্মসূচী নেই কেন না দুপুরে মার্ক হলিসের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ, সকালে 'ওয়াটার পলুউশন কনট্রোল' অফিসে আলাপ আলোচনা। শুক্রবার ওয়াশিংটন সহরের মহানাগরিক দপ্তরে দেখা সাক্ষাৎ ও বৈকালে Solid Waste ব্যাপারে কি রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা হচ্ছে তার সঙ্গে ওয়াকিবহাল হওয়া। মানুষের ও শিল্পের পরিত্যক্ত পদার্থকে দুটি

প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটি হল কঠিন পরিত্যক্ত পদার্থ, দ্বিতীয়টা হল তরল ও বায়বীয় পদার্থ। Water Pollution Control বর্তমানে কেন্দ্রীয় Education, Health & Welfare দপ্তরের আওতা থেকে Department of Interior-এর আওতায় এসেছে, Solid Waste ও Air Pollution এখন স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ U. S. P. H. S. (United States Public Health-Services) এর কর্তৃত্বাধীন।

বিদেশে বাঙালীর সন্ধানে সোমবার বিকেলে কি যে খেয়াল হ'ল। আমার ঘরে-রাখা টেলিফোন ডিরেক্টরীটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। শুনেছিলাম প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র পূর্ণেন্দু ওয়াশিংটনে আছেন। পেয়ে গেলাম একটা Dr. P. K. Benerjee। মনে হল, হয়তো সেই পূর্ণেন্দুই হবে কেননা অটোয়াতে এঁরা স্বামী স্ত্রী কী সব পড়তেন। টেলিফোন করলাম। বেয়ারা টেলিফোনে বলল 'তিনি বাড়ী নেই ; কোথায় ডিনারে গেছেন, ফিরতে রাত হবে।' তাকে বলেছিলাম যে কাল সকালে তিনি আমায় যেন টেলিফোন করেন। হোটেলের টেলিফোন নম্বরও দিয়ে দিলাম। তারপর চ্যাটার্জি, মিত্তির, রায়, সরকার, সেন প্রভৃতি পদবীতে বহু লোক রয়েছে দেখলাম, প্রথমে R.Sen কে টেলিফোন করলাম। তাঁর স্ত্রী টেলিফোন ধরেছিলেন ও কর্তা বাড়ী আছেন, বললেন। শ্রীসেন টেলিফোন ধরলেন, আমি আমার পরিচয় দিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'এখানে কতজন বাঙালী আছেন ? বিশেষ করে কোন বিশিষ্ট পাড়ায় আপনারা থাকেন কিনা, ইত্যাদি।'

তিনি বললেন 'আমরা দুজন বাঙালী পরিবার রাষ্ট্র দূতের দপ্তরে কাজ করি। তাই তাঁদের দেওয়া একখানা সরকারী ভাড়া বাড়ীর দোতলায় আমরা ও তিন তলায় থাকেন শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার। আগামী কাল বৈকালে বা সন্ধ্যায় কোন engagement রেখেছেন কি ?'

এখনো কিছু রাখিনি বা হয় নি। তবে পূর্ণেন্দু বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে বৈকালের দিকে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচটা, ছটায়।

তিনি বললেন—তা'হলে কিছু যদি মনে না করেন তো ওঁর সাথে রাষ্ট্রদূতাবাসে সাক্ষাৎ ক'রে চ'লে আসুন আমাদের বাসায়। দূতাবাস থেকে কয়েক মিনিটের মাত্র হাঁটা পথ। আপনি এলে আমরা ভারী খুশী হব। এখানেই রাতের খাওয়া সেরে যেতে হবে।

মনে মনে কুণ্ঠাও আছে লোভও আছে। তৃতীয় রিপুর প্রকোপ এই বিদেশে সম্বরণ না ক'রে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে রাজী হলাম। আর রাজী হলাম আমার ব্যক্তিগত চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক লোভের দরুণ। সেটা হল নিজের চোখে বিশেষ ক'রে দেখা কেমন ক'রে আমাদের আপন জনেরা বিদেশ-বিভূঁয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে আছেন। তাঁদের স্ত্রীরা কেমন করে দিন কাটান ? ছেলেমেয়েদের কিভাবে লেখা পড়া হয় ? এমনি নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে জুড়ে দাঁড়াল। তাই বললাম—'তাই হবে আপনাদের ঠিকানা তো রয়েছে ডিরেক্টরীতে। কিন্তু যাবার নির্দেশ একটু বলে দিন।'

—ভারতীয় দূতাবাসের প্রায় সামনেই Fairfax হোটেল। হোটেলের পাশেই আমাদের বাসা। দোতলায় সামনে দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। নীচে একটা ডাক্তার খানা, তাঁরই এই বাড়ী।

—অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি যাবার চেষ্টা করব।

হায়েৎস্‌ভিলে :

মঙ্গলবার সকালে উঠে বাস ও ট্যাক্সিতে চ'ড়ে ওয়াশিংটনের ডিষ্ট্রিক কলম্বিয়ার সীমানার উত্তর-পূর্ব দিকে হায়েৎস্‌ভিলের দিকে চললাম। ২৩ নং স্ট্রীট থেকে 'রোডস্ আই ল্যাণ্ড এভিনু' ধ'রে 'ব্রেন্টউড' শহরতলী পেরিয়ে এনাকোষ্টিয়া নদীর উত্তর-পূর্ব উপনদী পার হয়ে হায়েৎস্‌ভিলে এলাম। মোড়ের মাথায় একজনকে জিগ্যেস ক'রে বের করলাম 'ওয়াশিংটন সুবারবান্ স্যানিটারী কমিশনের' অফিস কোথায় ? ফাঁকার উপর তিনতলা লাল রংয়ের বাড়ীটা যেন প্রাকৃতিক পরিবেশে বসানো বিশাল শাল্মলি তরু। কর্তৃপক্ষের মানসিক দুশ্চিন্তার দিনে আমি সেখানে গেলাম। অর্থাৎ ময়লা কল, ময়লা নল ও আবর্জনা পরিষ্কারের কর্মীরা ক'দিন হল হরতাল করেছে। এরা অধিকাংশই নিগ্রো, চাকরী থেকে বরখাস্ত করার হুমকিও তাদের সংকল্প থেকে টলাতে পারে নি। প্রায় দিন তিনেক পার হ'য়ে গেল, কেবল জনগণের কাছ থেকে টেলিফোন আসছে

'হরতাল কি কর্মীরা তুলে নিলে ?'

কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, সিনেমায় স্লাইড দিয়ে, হ্যাণ্ডবিল বিলিয়ে বলতে চাইছেন যে অধিবাসীদের কিছু যে অসুবিধে হবে তার জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে। এই ডামাডোলের দিনে Public Information Officer 'আর্থার পি-বিংহ্যাম' এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি কতকগুলো কাগজ দিলেন। তিনি মেথর-মুদ্দফরাসদের হরতালের জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁর সহকর্মী 'উইলিয়ম আর্থার'কে আমার দু দিনের পরিদর্শন ব্যাপারে ভার নিতে বললেন। তার বাবা এই সংস্থার একজন পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য। এই সংস্থার নানা শাখার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দেখা করলাম। চীফ সার্ভেয়ারের সঙ্গে design বিষয়ে নানা চালু পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টা ওঁরা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে আলোচনা হ'ল। বেলা দেড়টা নাগাদ এ আলোচনা-পর্ব চলল। তারপর আর্থার এসে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিয়ে গেল। কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিল না। বৈকালে নিয়ে গেল বেশ কয়েক মাইল দূরে নির্মীয়মাণ ময়লা পরিশোধন যন্ত্রশালায়। বহু জায়গা নিয়ে এই পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। এর স্থাপত্যে স্থানীয় স্থাপত্যের সঙ্গে সাম্য রাখতে লাল টালি দিয়ে ছাওয়া ঘর বানাতে হয়েছে। অনেক হেঁটে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পরিদর্শন পর্ব চলল। বেলা সাড়ে চারটে বেজে গেল। তখন আমরা হায়েৎসভিলের দিকে ফিরলাম। দেখা করলাম বিংহ্যাম সাহেবের সঙ্গে। ওঁদের General Specification, বার্ষিক রিপোর্ট, পুরাতন ও বর্তমান বাজেটের কপি প্রভৃতি দিলেন। আমি নিয়ে গেলাম রাতে পড়বার জন্য ও বলে গেলাম যে এগুলি আমি বইব না। কলকাতায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে আপনাদের অনুরোধ করবো। দুটী মহিলা P. A. রয়েছেন, একজন বয়স্কা অপরজন তরুণী। কয়েক মিনিটের মধ্যে আলাপ হ'য়ে গেল। এরা সহজে আপনার ও আপন করতে পারে। তরুণীর হাতে কাজ নেই দেখে মনে কোন দ্বিধা না রেখে অনুরোধ করলাম, আমার কয়েকটা চিঠি ছেপে দিতে।

অতি খুসীর সঙ্গে রাজী হ'য়ে চিঠি ছেপে দিয়ে জিগ্যেস করল 'খামের ওপর ঠিকানাটা টাইপ ক'রে দেব কি ?'

—তোমার দূরদর্শিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। খামে ঠিকানাটা টাইপ ক'রে দিলে ভারী খুসী হ'ব।

—তুমি যদি চিঠিটা সই করে দাও তো আমি ফেলবার বন্দোবস্ত করব বলে নিজেই গর্বথলি থেকে টিকিট বের ক'রে এঁটে দিতে ব্যগ্র দেখে বললাম 'ওয়াশিংটনে গিয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি যাবে। তুমি ঠিকানা লেখা খামটা দাও, তা' হ'লেই যথেষ্ট। এর জন্য তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ। মনে মনে ভাবলাম, সরকারী আওতায় এক মহিলা কর্মীর কী বিপরীত রকম ব্যবহার। অপরদিকে হায়েৎসভিলের জীবনে কয়েক মিনিটের জন্য জানা মহিলার সাহায্য করার জন্য কত না উদ্দীপনা ও কতনা সহানুভূতি। এই মনোভাব প্রকাশের অর্থমূল্য সামান্য বটে কিন্তু প্রীতির মূল্য অসামান্য। মনে মনে ভাবলাম সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের মনোভাবের কী অদ্ভুত পার্থক্য। সেবার মনোভাব সরকারী মহল থেকে নির্বাসিত। তবে সবার বেলা বলা অসমীচীন হবে। আমাদের দেশে এর উৎকট বিকাশ এবং উন্নাসিকতা এত প্রকট যে তাদের মানবিকতার উপর আবেদন জানিয়ে কশাঘাত করলে মাত্র ক্ষণকাল শমিত থাকে। আবার যে কে সেই। আমার নিজের অফিসেই দেখছি মানুষ চায় একটু হৃদয়ের মানবিক স্পর্শ। কিছুই সাহায্য করা সম্ভব নয় সত্য তবু মনোযোগ দিয়ে শুনতে কি বাধা ?

'স্বভাব যায় না ম'লে।
কয়লার রং যায় না ধুলে।'

কিন্তু হিন্দী প্রবাদে বলেছে কয়লার রং বদল হয়—

'কয়লা কো ময়লা টুটে, যব আগ্ করে পরবেশ'

আগুন প্রবেশ করলেই কয়লার কালো রং রাঙা হ'য়ে ওঠে। সারাবিশ্বের সরকারী কর্মচারীদের কালো মনে আগুন ধরানো দরকার, যাতে মনের কালিমা ধুয়ে মুছে ছাই হ'য়ে যায়। মনে পাকা হ'য়ে যেন বসে তাদের জনসেবায় উৎসর্গিত জীবন।

ভারতীয় দূতাবাসে ঃ

বৈকালে পৌনে পাঁচটা নাগাদ হায়েৎসভিল থেকে বেরিয়ে ভারতের রাষ্ট্র দূতাবাসের দিকে চললাম। একে বলা হয় 'চ্যান্সারী'। 'মাসাচুসেট এভিন্যু'তে এসে দেখি অফিসের ছুটী হ'তে সবাই চ'লে গেছে। ডঃ পূর্ণেন্দু

ব্যানার্জ্জী আছেন। রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে তঁর কাজ তিনি এখন করছেন। তাই তিনি বাঁধা ধরা সময়ে ঘরে ফিরতে পারেন নি। তাঁর কাছে আমার কার্ডটা পাঠিয়ে দিলাম। তখনই তিনি বার্তাবহ মারফৎ একটু অপেক্ষা করতে বললেন।

কিছুক্ষণ পরেই ডেকে পাঠিয়ে নিজেই নেমে আসছিলেন :

"চিনতে পারছেন? অটোয়ায় আপনার বাড়ীতে বিরাট নেমতন্ন খেয়ে এসেছিলাম। আপনার ছেলে কেনেডিয়ান ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে মোটর চাপা প'ড়ে, বেশ ভাল হয়ে উঠে ছিল তখন। আমাদের চেক পাঠাবার দায়িত্ব First Secretary হিসেবে আপনারই ছিল।"

—খুব পারছি। আপনি তো আমাদের Lord Elgin হোটেলে নেমতন্ন করেছিলেন। কোলকাতার নতুন খবর কি বলুন?

—চিঠিতে যা খবর পাচ্ছি, তাতে কি আর নতুন পাব। আমি তো মাস দুই দেশ ছাড়া। আপনারা খবরের কাগজের মারফৎ খবর পাচ্ছেন ও রাখতেও হচ্ছে। আপনার খোকা কেমন আছে?

—সে এখন আর খোকা নেই। Gentleman-at-Large, অক্সফোর্ডে পড়ছে।

—শ্রীমতী এখানে, না দেশে?

—স্ত্রী এখন জাপানে 'আর্টের' বাকী কোর্স নিচ্ছেন। শেষ হলেই চ'লে আসবেন। চীনে যখন ছিলাম তখন তিনি জাপানী আর্টের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা হন ও টোকিওতে ভর্তি হন। মনে হয় কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে আসবেন আশা করা যাচ্ছে।

—তা হ'লে 'you are the monarch of all you survey' now?

—'মনার্ক' যে কত তা দিল্লী থেকে কেবল-গ্রাম ও টেলিফোনের ঠেলায় ব্যতিব্যস্ত। খাদ্য পাঠান, খাদ্য পাঠান।' চাল কিছু জোগাড় করতে পারেন না? গমের বদলে ভুট্টা কেন? তিরিশটা জাহাজের বদলে বিশট জাহাজ কেন? তিরিশটা যে পাঠাবার কথা ছিল।

বললাম-'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।' তাদের সুযোগ সুবিধে হ'লে পাঠাবে। বেশী জুলুম ওখানে চলবে না ভিক্ষের চাল কাঁড়া, না-আকাঁড়া!'

—যা বলেছেন। তাগাদার ঠেলায় অস্থির। রাষ্ট্রদূত গেছেন পশ্চিম কূলে কেলিফোর্নিয়ার দিকে। আমার মাথায় নিজের ও তাঁর ভাবনা এক সঙ্গে এসে পড়েছে।

—বাবা কি করছেন?

—বাবা এখন লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। ওঁর একখানা আইনের বই ছিল সেটী সংশোধন ও বর্তমানের সময়োপযোগী ক'রে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেছেন। এখন ইতিহাসের ওপর একখানা বই লিখতে ব্যস্ত।

—উনি দেখছি বর্তমানে কাজ নিয়েই সদ সর্বদা ব্যস্ত রেখেছেন নিজেকে।

—আপনি ক'দিন থাকবেন রাজধানীতে?

—এ সপ্তাহের শনিবার সকাল পর্যন্ত।

—আপনার হোটেলের টেলিফোনের নম্বর কার্ডে লিখে দিন। সম্ভব হয়তো টেলিফোন করব, দেখি কি করতে পারি।

—নিশ্চয় করবেন। তবে হয় সকাল সাড়ে সাতটার আগে, নয় রাত সাড়ে সাতটার পর। আজ এখন উঠি। নমস্কার।

নমস্কার বিনিময়ের পর আমার সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবতে লাগলাম এই সহরে কেন পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই লোক এসে দূতাবাস খুলেছে, কিই বা এ সহরের ইতিকথা, কিসের জন্য এটী বড়, কি বিষয়ে এখানের বৈশিষ্ট্য ও আরো কত কী। দেখা যাক্, কোথায় এই মহানগরীর কাহিনী সুরু! কেমন এখনকার অধিবাসী, কত না এর দর্শনীয়বস্তু!

আগামী সংখ্যায় এই মহানগরীর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব।

[ক্রমশঃ

শাশ্বত আঁখি

রমাদেবী, কাব্যতীর্থ

পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে তুমি ব্যাপ্ত মহাকাল
প্রকৃতির মায়াজালে রচিছ আড়াল
আবাত সংঘাত ভরা ঘন ঘোর মেঘ
ভাষাহীন রাগিণীর আকুল আবেগ
বিদীর্ণ হইয়া ফেরে বনমর্ম্মরে
দেখি সেথা শান্ত আঁখি অরণ্যশিহরে।

তোমার সঘন অন্ধকারে
মহাকাশ ভরা
তারার আলোকে যেন হেরিলাম
শিহরিছে ধরা
তাপদগ্ধ ঝন্ঝার বায়ে
যবে দীর্ঘশ্বাস ওঠে বনময়ে
ঝর ঝর নামে ধারা জল
স্নেহ ঝরা তব আঁখি বেয়ে।

দেখিলাম তোমার আবির্ভাবের
নির্ভীক আভাস
গোধূলির কালিমার আভায় মেশা
তোমার অতল কালো গভীর নয়নে
সহসা উছলি ওঠে নব নব আশা

কখনও বা ও আঁখিতে হেরি
সাগরের নীল বুকে আকাশের ছায়া
দীপহীন গৃহে কভু অধো নিমীলিত
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দিগন্ত আঁখিতে কভু হেরি
থর থর কাঁপিতেছে অগণ্য বিস্ময়
কখনও বা তায়

অন্যায়ের প্রতিকার তরে
জ্বলিয়া উঠিছ দীপ্তি বিদ্যুতের মত
ওই তব আঁখি নীলিমায়
স্তব্ধ হয়ে বসে বসে দেখি
তোমার রহস্যে ঢাকা আঁখির ঝিলিক্
কি কথা বোঝাতে চাও
কি সুর বাজায়ে যাও
বুঝিনাতো ঠিক।

যবে অন্তর বেদনাখানি
মেলি সন্ধ্যাকাশে
কুসুম সৌরভ মাখা
আকুল আবেশে
চির স্নিগ্ধ ওই আঁখি ঘন মেঘ দলে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনে শ্রাবণ জলে।

প্রলয় কাঁদনে যদি ভেসে যায় ধরা
জানি নতুন প্রাণের বার্ত্তা
উঠিবে ফুটিয়া তায়
মুকুতার শুচিতায় ভরা
দিগন্তভরিয়া তব কোমল করুণা
জানি ফুটিয়া উঠিবে ওই
তব আঁখি পাতে
তোমার গুঞ্জন মেশা স্তব্ধতার সুরে
ঝরিয়া পড়িবে স্নিগ্ধ সুনীল সান্ত্বনা
মমতার সাথে
জলিবে আঁখিতে তবু দীপ্ত প্রতিকার
কিছু নয় আর।

গল্প

পলাতক

অরুণ দে

ভয়ে ভয়ে গরুরগাড়ী থেকে নিজের গ্রামের কাছে নামল পঞ্চানন। সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাল। সামনে সংকীর্ণ নির্জন পথ এঁকেবেঁকে গ্রামের ভেতরে চলে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল পঞ্চানন। জেল থেকে পালিয়ে সে সোজা গ্রামে চলে এসেছে। এতক্ষণে হয়ত পুলিশ তার সন্ধান করছে। শহর থেকে বহুদূরে এই অজ পাড়াগাঁয়ে তাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে না। তবু একটা অজানা আশঙ্কা তার মনে উঁকি দিচ্ছিল।

নিজের বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল পঞ্চানন। একটা চাপা কান্নার স্বর ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনল পঞ্চানন। তারপর হাঁক দিল—ঘরে কেউ আছ নাকি গো?

কিন্তু কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল না।

কান্নার স্বর যতই চাপা হোক, গলার স্বর পঞ্চাননের চেনা-চেনা মনে হল। কান পেতে কিছুক্ষণ শোনার পর তার আর সন্দেহ রইল না যে তার বৌ লক্ষ্মীই কাঁদছে।

পঞ্চাননের পুরাণ দিনের কথা মনে পড়ল। প্রায় দশ বছর আগে সে বৌকে ছেড়ে শহরে পালিয়ে গিয়েছিল। শহরে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মিশে সে যখন নানা অপরাধে লিপ্ত থাকত তখনও মাঝে মাঝে কচি বৌটার ডাগর চোখ দুটো তার মনে পড়ে যেত। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য।

আবার চীৎকার করল পঞ্চানন—"লক্ষ্মী ঘরে আছ নাকি, ও লক্ষ্মী।"

কান্নার শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। পরণের ছেঁড়া কাপড়টা সামলে নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এল লক্ষ্মী। পঞ্চাননের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"চিনতে পারছ?"—বলল পঞ্চানন।

জেলে থাকতে পঞ্চাননের একমুখ দাড়ি গজিয়েছিল। পালিয়ে আসার পথে সে সব কেটে আসেনি সে। দশ বছর আগে যা ছিল তার থেকে অনেক রুগ্ণ হয়ে গেছে সে। মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। চেহারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই তবু লক্ষ্মীর তাকে চিনতে কষ্ট হল না, কিন্তু সে নিজের চোখ দুটোকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"কাঁদছিলে কেন?"—আবার বলল পঞ্চানন।

লক্ষ্মী কিছুতেই বলতে পারল না যে অভাবে, ক্ষুধার জ্বালায় সে এতক্ষণে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে কাঁদছিল। কান্নার বদলে হঠাৎ একরাশ আনন্দ যেন তার বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠল। সে গালে হাত দিয়ে বলল, "ওম্মা—তুমি! এতকাল কোথায় ছিলে গো?"

"সে অনেক কথা—পরে বলব।" বলে ঘরের ভেতর ঢুকল পঞ্চানন।

* * *

গ্রামে ফিরে এসে পঞ্চাননের কয়েকদিন বেশ কষ্টে কাটল। অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে অনেকদিন তার পরিচয় ছিল না। না খেতে পাওয়ার জ্বালা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রামে কয়েকদিন থেকেই সে বুঝতে পারল রোজগারের কোনপথ এখানে তার জন্য খোলা নেই। কি করে দিন কাটবে সে বিষয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হল।

একদিন রাতে সে বিছানায় শুয়ে ভাবছিল আবার শহরে ফিরে যাবে কিনা। গ্রামে থেকে মোটা টাকা রোজগারের সত্যিই কি কোন পথ নেই?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পঞ্চাননের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

কুমোরপাড়া থেকে একটা কালীমূর্তি চুরি করে নিয়ে সে গভীর রাত্রে সকলের অজ্ঞাতসারে নদীর ধারে বটগাছতলায় মাটিতে গর্ত করে সেই কালীমূর্তি পুঁতে দিল। তারপর জায়গাটা আবার মাটী দিয়ে আগের মত চাপা দিয়ে দিল।

পরদিন ভোরবেলা সুরু হল তার অভিনয়।

"মা—মা", বলে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বিছানা থেকে উঠল।

লক্ষ্মী ঘুমোচ্ছিল। স্বামীর চীৎকার কানে যেতে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, "কি হল! অমন করছ কেন?"

"আমি স্বপ্ন দেখেছি—মা আমাকে ডাকছে" বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর তীরে বটগাছতলার দিকে পাগলের মত ছুটতে লাগল পঞ্চানন। লক্ষ্মী কিছু বুঝতে না পেরে—"কি হল? ওগো কি হয়েছে?"—বলতে বলতে স্বামীকে অনুসরণ করল।

বটগাছতলায় এসে বুক চাপড়াতে লাগল পঞ্চানন। "মা, কোথায় লুকিয়ে আছিস মা", বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। লক্ষ্মী বটগাছতলায় পৌঁছে হাঁফাচ্ছিল।

পঞ্চাননের চীৎকার শুনে দেখতে দেখতে অনেক লোক জড় হয়ে গেল। লক্ষ্মীকে একজন জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে? তোমার স্বামী অমন পাগলের মত করছে কেন?"

"আমি কিছুই জানি না। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখি ঐরকম করছে।

ছুটে এসেছে এখানে—আবার কাঁদছে। কি হল কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"—বলল লক্ষ্মী।

কয়েকজন লোক পঞ্চাননের দিকে এগিয়ে গেল। একজন বৃদ্ধ বললেন, "এই পাঁচু—অমন দাপাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?"

"দাপাব না? আমার যে বুক জ্বলে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে মা কালী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কি বলেছে জান?"

"মা কালী স্বপ্নে দেখা দিয়েছে? বলিস কি!! তুই তো বড় ভাগ্যবান্। তা মা কালী কি বলল?"

"মা কালী বলল, ওরে পঞ্চানন ওঠ। আর ঘুমো না। এতকাল নিরুদ্দেশ হয়ে বনে জঙ্গলে তপস্ করেছিস আমি তোর ডাক শুনতে পেয়েছি। আ নদীর ধারে বটগাছতলায় অনেক যুগ ধরে পড়ে আছি প্রকৃত ভক্তের অভাবে দেখা দিই নি। তুই এসেছি আমাকে জাগিয়ে তোল। আমার প্রচার কর।"

"অ্যাঁ—সেকি কথা! মা তোকে এত কথা বলেছে মা এই বটগাছতলায় আছে!!"

"হ্যাঁ, এখানেই আছে। তোমরা আমাকে একট কোদাল এনে দাও। আমি মাটি খুঁড়ে দেখি মা কোথা লুকিয়ে আছে।"

উপস্থিত বিস্মিত জনমণ্ডলীর মধ্যে একজন সত্যি এক কোদাল এনে দিল।

মাটি খুঁড়তে লাগল পঞ্চানন। খবরটা ছড়িয়ে পড়তে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। অসংখ্য মানুষ এসে জ হল বটগাছতলায়। এল কৌতূহলী যুবতীরা, বিস্মি প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার দল। পুরুষ মানুষের ভিড়ও কিছু ক হল না। সকলের মুখে ভয় ও ভক্তির ভাব, চো বিস্ময়।

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ "পেয়েছি—পেয়েছি বলে আনন্দে চীৎকার করে উঠল পঞ্চানন। সকলে চোখের সামনে মাটির তল থেকে কালীমূর্তি বেরি এল। সেই মূর্তি বুকে নিয়ে "মা মাগো" বলে দুল লাগল পঞ্চানন। দু চোখ দিয়ে তার জলের ধারা নামল- যেন সে অমৃত সাগরে ভাসছে।

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল লক্ষ্মী।

হঠাৎ পঞ্চাননের কি যেন হল। সে মাটিতে ব পড়ল। কালীমূর্তি সামনে রাখল। পা গুটিয়ে পদ্মা করল। তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে বুঁজে এল। দে হল নিথর, নিস্পন্দ। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেন হঠা স্তব্ধ হয়ে গেল। পাথরের মূর্তির মত বসে রইল পঞ্চানন

"সমাধি হয়েছে—ওরে সমাধি হয়েছে।"—কে বলল। কথাটা কানে যেতে মনে মনে হাসল পঞ্চানন নিজের অভিনয়-কুশলতায় নিজেই পুলকিত হল।

* * *

দিনকয়েকের মধ্যে পঞ্চানন আর পঞ্চানন রইল না। সে হল 'ক্ষ্যাপাবাবা'। একমাত্র লক্ষ্মী ছাড়া অন্য সব গ্রামবাসীরা পঞ্চাননকে পরম ভক্ত বলে স্বীকার করে নিল। দূর দুরান্ত থেকে লোকে তাকে দেখবার জন্য বটগাছতলায় আসতে লাগল।

সে আজকাল বটগাছতলায় থাকে। গলায় পরে থাকে রক্তজবার মালা, কপালে তিলক। মুখে কাঁচাপাকা একগাল দাড়ি। সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা "মা—আমার মা" বলে বালকের মত নৃত্য করে। অলৌকিক তার লীলা, রহস্যময় তার গতিবিধি।

সারাদিন বটগাছতলায় কাটিয়ে রাত্রে যখন মানুষের ভিড় থাকে না তখন পঞ্চানন বাড়ী ফিরে যায়।

আজও সে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে এল। স্বামীর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল লক্ষ্মী। সে স্বপ্ন দেখছিল! স্বপ্নের ঘোরে শুনতে পেল—ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ—বিকট শব্দ করে কি যেন বাজছে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে বসল লক্ষ্মী। দেখল, তার স্বামী পঞ্চানন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মৃদু হাসি। চোখ ঢুলু ঢুলু। হাতে একটা বড় থলি।

থলিটায় কয়েকবার ঝাকুনি দিল পঞ্চানন। শব্দ হল—ঝন-ঝন-ঝনাৎ।

"থলির মধ্যে কি?"—বলল লক্ষ্মী।

"নাও", বলে থলিটা এগিয়ে দিল পঞ্চানন।

"কি আছে?"

"দেখবে?" বলে পঞ্চানন থলিটা মাটিতে উপুর করে দিল।

অসংখ্য পয়সা-সিকি-আধুলি মেঝেতে স্তূপাকার হয়ে উঠল। কিছু গড়িয়ে গেল এদিকে ওদিকে।

"পাপের পয়সা দিয়ে আমাকে ভুলাতে পারবে না। ও আমি চাইনা।"—বলল লক্ষ্মী।

"ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই। এসব পাপের পয়সা নয়। মা আমাকে দিয়েছে।"

"মা দিয়েছে!"

"হ্যাঁ। সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হলে কিছু হয় না। সেই মা-ই ভক্তের হাত দিয়ে আমাকে এসব পাঠিয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"তোমার মনে এত সন্দেহ কেন লক্ষ্মী! মা কি তোমাকে কৃপা করবে না?"

"আমার যে কেমন সন্দেহ হয়। মা কালীকে নিয়ে তো ছেলেখেলা চলে না। কেমন যেন ভয় হয় আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওগো যদি মিথ্যে হয় তবে এসব তুমি ছেড়ে দাও। ডালভাত দুমুঠো যা জোটে তাই খেয়ে থাকব। এত পয়সার দরকার নেই। বড় ভয় করে।"

"এসব তুমি কি বলছ! মায়ের কাছে সন্তানের আবার ভয় কি? ভক্তি চাই। বিশ্বাস চাই।" বলে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে ঊর্দ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পঞ্চানন।

অবাক হয়ে স্বামীকে দেখতে লাগল লক্ষ্মী। একবার তার মনে হল হয়ত তার ভক্তি নেই বলেই সে স্বামীকে সন্দেহ করছে। লোকটা অনেককাল নিরুদ্দেশ ছিল। হয়ত সত্যি সে আর আগের মানুষ নেই। হয়ত সে পরম ভক্ত। লক্ষ্মী মনে মনে তার ভক্তিহীনতার জন্য মা কালীর কাছে ক্ষমা চাইল।

কিছুক্ষণ পর কপাল থেকে যুক্তহাত দু'টা নামিয়ে পঞ্চানন বলল, "আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। রাত অনেক হোল।"

"বিছানা পেতে দেব? কিছু খাবে না?"—বলল লক্ষ্মী।

"না। ভক্তদের দেওয়া খাবার অনেক খেয়েছি। প্রসাদ বিতরণ করেছি। এখন পরিশ্রান্ত।"

খাটের উপর তাড়াতাড়ি স্বামীর জন্য শয্যা রচনা করে দিল লক্ষ্মী। নিজে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

পঞ্চাননের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। স্ত্রীর সম্পর্কে একটা দুর্ভাবনা তার বুকের মধ্যে জেগে উঠল। শেষ পর্যন্ত সব কিছু ফাঁস না হয়ে যায়!

স্ত্রীর মনে কি করে ভক্তি জাগান যায় সেকথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল পঞ্চানন। কখন যে লক্ষ্মী বিছানা থেকে উঠে তার মাথার কাছে খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে লক্ষ্য করেনি। খুট করে শব্দ হতে ফিরে তাকাল পঞ্চানন।

লক্ষ্মী বলল, "হ্যা গো, তুমি এখনও ঘুমোও নি?"

ভুরু কুঁচকে তাকাল পঞ্চানন। বলল, "ঘুম আসে না। দুশ্চিন্তায় মন ভরে আছে।"

"কেন, কি হয়েছে গো?"

"পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে। মায়ের আদেশে আমাকেই পাপীদের উদ্ধার করতে হবে। ভাবছি কি করে সবাইকে উদ্ধার করা যায়। ভাবনায় আমার ঘুম আসছে না। তুমি শুয়ে পড়। যাও। চিন্তায় বাধা দিও না।"

"জেগে থাকলে ভাবনা। ঘুমোলে আবার মা কালীকে স্বপ্নে দেখ। তোমার যে কি হবে—কি যে আমার কপালে আছে মা-ই জানে।"

"ইচ্ছাময়ীর যা ইচ্ছা তাই হবে। যাও, শুয়ে পড়।"

... ...

যে বটতলায় ছিল শুধু মাটি সেখানে কয়েকমাসের মধ্যে দেখা গেল শান বাধানো চত্বর। ভক্তদের অর্থে গড়ে উঠল মন্দির। বটেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত হলেন মন্দিরের অভ্যন্তরে। আর সেই মন্দিরের প্রধান পূজারী ও সাধক পঞ্চানন গ্রামবাসীদের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করে সকলকে কৃতার্থ করতে লাগল।

দিন ভালই কাটছিল। লক্ষ্মীর মনে স্বামীর সাধুত্বের অবিশ্বাস সম্পূর্ণ দূর না হলেও, সকলকে ভক্তি করতে দেখে সে নিজেও স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী হবার চেষ্টা করল।

সেদিন বুধবার। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। লক্ষ্মী ঘরে বসে ওষুধ তৈরী করছিল। আজকাল পঞ্চানন ভক্তদের রোগ শোক দূর করার জন্য মাঝে মাঝে ঔষধ বিতরণ করে। লক্ষ্মীকে এনে দেয় অর্জুন গাছের ছাল, বাবলা গাছের ডাল, নানারকম গাছের শিকড়, মূল ইত্যাদি। লক্ষ্মী সেগুলো স্বামীর নির্দেশ মত শিলে বেটে রস তৈরী করে কিংবা লাল সুতোর মধ্যে তাবিজের মত বেঁধে দেয়।

সেদিনও লক্ষ্মী কি একটা গাছের ছালের রস তৈরী করছিল। এমন সময় দুজন অপরিচিত লোক ঘরের দরজায় উঁকি দিল।

"কে?"—বলে শিলনোড়া রেখে এগিয়ে গেল লক্ষ্মী। লোকগুলো লক্ষ্মীকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল। তারপর ঘরের ভেতর জিনিষপত্রের উপর দৃষ্টি ফেলল।

"আপনারা কি চান?"—বলল লক্ষ্মী।

"তোমার স্বামীর নাম কি?"—একজন প্রশ্ন করল।

"আ মরণ—মেয়েমানুষের স্বামীর নাম মুখে আনা আছে নাকি? কোথা থেকে আসছেন?"

"অনেক দূর থেকে। পঞ্চানন মুখার্জি কি তোমার স্বামী?"

"হ্যাঁ।"

"সে কোথায়? বাড়ীতে আছে?"

"না।"

"মিথ্যে কথা। আমরা বাড়ী সার্চ করব।"

"কি করবেন?"

"বাড়ীতে সে আছে কিনা খুঁজে দেখব।"

"আমি একা মেয়েমানুষ ঘরে আছি। হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকলেই হল! এটা কি মগের মুলুক নাকি? পাড়া গাঁ বলে কি দারোগা পুলিশ এ রাজ্যে কিছুই মনে করেন? যা ইচ্ছে করলেই হল?"

"আমরা পুলিশের লোক। জেল পালানো আসামী পঞ্চাননকে ধরতে এসেছি। বেশি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করলে তোমাকেই থানায় নিয়ে যাব।"

লোকদুজন ঘরের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মী।

কিছুক্ষণ পর লোকদুজন ঘরে থেকে বেরিয়ে এল।

একজন ধমকের সুরে বলল, "পঞ্চানন কোথায় গেছে?"

"আমি জানি না", বলল লক্ষ্মী।

"মিথ্যে বললে জীব টেনে ছিঁড়ে ফেলব। সত্যি বল পঞ্চানন কোথায় গেছে।"

"সেই ভোরবেলা চলে গেছে ..."

"কোথায় গেছে?"

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল লক্ষ্মী। তারপর বলল, "সে তো অনেক দূরে গেছে। সেই যে সাত ক্রোশ দূরে সোনাডাঙ্গা গাঁ সেইখানে গেছে। আজ সেখানে সভা বসবে কিনা। আজ সে-গাঁয়েই থাকবে।"

"হুঁ"—একজন শব্দ করল।

লোকদুজন আরও কিছুক্ষণ বাড়ীর চারপাশে ঘোরাঘুরি করে চলে গেল।

রাস্তার প্রান্তে তারা অদৃশ্য হয়ে যেতেই উল্টো

টতলার দিকে ছুটল লক্ষ্মী। অন্ধকার গ্রাম্য পথে য়েকটা কুকুর চীৎকার করে উঠল।

বটতলার কাছে এসে একটু দাঁড়াল লক্ষ্মী। সে াফাচ্ছিল। চারদিক অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ পোকা াকছে। বটগাছের উপর একটা বাদুড় ডানা মেলে ুলছে। কয়েকটা জোনাকি উড়ছে। দূরে শ্মশান থেকে রুণ কান্নার স্বর ভেসে আসছে।

কয়েক পা এগিয়ে মন্দিরের ভেতর উঁকি দিতেই চমকে উঠল লক্ষ্মী। মন্দিরের ভেতরে মিট মিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তারই আলোয় দেখতে পেল যে পঞ্চানন ালসার মত কি একটা পাত্র থেকে তরল পদার্থ চুমুক দিয়ে পান করছে। তার পা দুটো টলছে। ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে এক যুবতী। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যথাকাতর। পোষাক অবিন্যস্ত।

হঠাৎ যেন লক্ষ্মীর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সে ছুটে গিয়ে পঞ্চাননের হাত চেপে ধরল।

"কে-এ-এ-এ?"—বলল পঞ্চানন।

"এসব কি গিলছ?"

"কারণ পান করছি। সোমরস—একে বলে সোমরস। কালীসাধনা বড় কঠোর সাধনা। পঞ্চমকারের উপাসনা করতে হয়।"

"ঐ মেয়েটা কে?"

"অভাগী। ছেলে মরে যাচ্ছে তাই ওষুধ চাইতে এসেছে। অমাবস্যার ঘোররাত্রি ছাড়া তো ওষুধ দেওয়া যায় না তাই বসিয়ে রেখেছি।"

হঠাৎ সেই যুবতী হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, "আমার ছেলেকে বাঁচাও বাবাজী। দয়া কর বাবাজী দয়া কর।"

"হতভাগী বোকা, এখান থেকে বেরিয়ে যা। এখনই যা।"—বলল লক্ষ্মী। যুবতী কিন্তু একপাও নড়ল না।

"যাবি না?" বলে তার দিকে এগিয়ে গেল লক্ষ্মী।

"আহা। ও বড় অভাগী। ওকে কিছু বোল না। যা আজ তুই চলেই যা। পরের অমাবস্যা আসুক।"—বলল পঞ্চানন।

"এখনও বসে আছিস। তোকে বের করে তবে ছাড়ব" বলে লক্ষ্মী তেড়ে গেল।

যুবতী সভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মন্দিরের বাইরে চলে গেল। সে অদৃশ্য হতেই পঞ্চানন বজ্রমুঠিতে লক্ষ্মীর চুলের গুচ্ছ ধরে চীৎকার করে বলল, "এখানে কেন এসেছিস? তোকে তো অনেকদিন বলেছি মন্দিরে আসবি না। কেন এসেছিস?"

"পুলিশ তোমার খোঁজে বাড়ীতে এসেছিল"—কাতর স্বরে বলল লক্ষ্মী। কথাটা যেন মন্ত্রের মত কাজ করল। হাতের মুঠি আলগা করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে পঞ্চানন বলল, "কোথায়? পুলিশ কোথায়?"

পালাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল পঞ্চানন।

"দাঁড়াও। তাহলে তুমি সত্যি সাধু নও। তুমি চোর ডাকাত। আমাকে এতদিন শুধু ঠকিয়েছ। পালিও না। পুলিশ চলে গেছে।"

"চলে গেছে!"

"হ্যাঁ, আমি তাদের বলেছি আমার স্বামী সোনাডাঙ্গার মেলায় গেছে।"

"সাবাস", বলে লক্ষ্মীকে বুকে জড়িয়ে ধরল পঞ্চানন।

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে দুপা সরে দাঁড়াল লক্ষ্মী। বলল, "আমাকে ছুঁয়ো না। ঘেন্নায় আমার গা রি রি করছে।"

'ঘেন্না! আমাকে?', বলে হো হো করে হেসে উঠল পঞ্চানন।

ঘর থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দরজার কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল লক্ষ্মী।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় মন্দিরের প্রদীপটা কেঁপে কেঁপে নিভে গেল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল পঞ্চানন। কি যেন ভাবল।

তারপর ধীরে ধীরে বাইরে এসে লক্ষ্মীর পাশে বসল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লক্ষ্মী।

"লক্ষ্মী—এই লক্ষ্মী" ডাকল পঞ্চানন।

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু তীক্ষ্ণ চাপা কান্নার শব্দ অন্ধকার বিদীর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল।

মন্দিরের ভেতরে একবার তাকাল পঞ্চানন। বটেশ্বরী কালীর হাতের খড়্গ অন্ধকারেও চিকমিক করছে।

নীরবে কি যেন ভাবতে লাগল পঞ্চানন। সময়ের কাঁটা এগিয়ে চলল।

হঠাৎ পঞ্চানন দেখল বহুদূর থেকে কয়েকটা আলোর রেখা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরে ভারী বুটের শব্দও শোনা গেল

লক্ষ্মীকে জোড়ে ঠেলা দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পঞ্চানন। বলল, "নিশ্চয়ই পুলিশের লোক আসছে। তোর চালাকী ধরে ফেলেছে। আমি পালাচ্ছি।"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। সামনে তাকাল। সত্যি কয়েকটা আলোর রেখা ছুটে আসছে। বোধহয় টর্চের আলো। কি একটা বলার জন্য লক্ষ্মী পাশে তাকিয়ে দেখল পঞ্চানন নেই।

অল্পক্ষণ পরেই পুলিশের লোক এসে ঘিরে ধরল লক্ষ্মীকে।

"কোথায়—শয়তানটা কোথায়?", চীৎকার করে বলল দারোগা সাহেব। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মী।

"ঝপাং" করে গঙ্গার জলে আওয়াজ হল।

"ঐ যে—ঐ পালাচ্ছে"—গঙ্গার দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন পুলিশ কর্মচারী চীৎকার করে উঠল।

সকলে ছুটে গেল সেদিকে। পুলিশের লোক পঞ্চাননকে ধরবার জন্য জলে ঝাঁপ দিল।

ডুব সাঁতার কেটে অন্ধকারে তীব্র বেগে এগোতে লাগল পঞ্চানন। কিছুক্ষণ পর ওপারে তীরের কাছে পৌছল। সরীসৃপের মত গঙ্গার ধার ঘেষে মুখ বাড়িয়ে দেখল পুলিশের লোক অন্ধকারে তার গতিপথ ঠাহর করতে না পেরে অন্যদিকে তাকে খুঁজছে। লাফিয়ে তীরে উঠেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল পঞ্চানন।

ব্যর্থ পুলিশ কর্মচারীরা ভোরের দিকে তীরে ফিরে এসে দেখল বটেশ্বরী কালীর মূর্তির সামনে উন্মাদিনীর মত বার বার মাথা ঠুকছে লক্ষ্মী।

দাদাঠাকুর

শ্রীজ্ঞান

দাদাঠাকুর শরৎপণ্ডিতের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ। যদিও তিনি জীবন যাপন করতেন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতন. কিন্তু তিনি ছিলেন নানা দিক থেকে অসাধারণ!

অত্যন্ত সরল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, হাসিখুসী এই মানুষটির কার্য্যকলাপ যেন কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছিল তাঁর জীবিতকালেই। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অত্যন্ত আসাধারণ ব্যক্তির জীবনী তাঁর জীবিতকালেই চলচিত্রে রূপায়িত হবার নজির প্রায় নেই। কিন্তু শরৎ পণ্ডিতের জীবনী তাঁর জীবিতকালেই "দাদাঠাকুর" নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে বাংলা দেশের অগণিত দর্শককে দেবতুল্য দাদাঠাকুরের সঙ্গে, তাঁর মহিমময় জীবনের সঙ্গে যেন পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। দাদাঠাকুরের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প সকলের অভিনন্দন ও ধন্যবাদের যোগ্য।

দাদাঠাকুর আজ নেই! পরিণত বয়সে তিনি সম্প্রতি মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণতার, পরোপ-কারিতার বহু ঘটনা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন বা শুনেছেন। পরে এই সব কথা কিম্বদন্তী বা গল্পের আকার নেবে এবং তার মধ্যেই বেঁচে থাকবেন দাদাঠাকুর, শুধু বেঁচেই থাকবেন না—তাঁর এই সব মহান কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রাণিত করবেন দেশের জনসাধারণকে, পথনির্দ্দেশ করবেন তরুণ সমাজকে, আশার আলোক জ্বালাবেন দুঃখীর প্রাণে, সাহস যোগাবেন দুস্থের মনে।

তোমরা কি দাদাঠাকুরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে না? তাঁর কথা, তাঁর কাজ, কি তোমাদের তরুণ প্রাণকে অনুপ্রাণিত করবে না?—নিশ্চয়ই করবে বলে বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি বাংলা দেশের দাদাঠাকুর আবার ফিরে আসবেন তোমাদের মধ্যে দিয়েই।

মণির খনি

শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—পাঁচ—

কলকাতা থেকে রাজকুমারের বাড়ি শ্যামপুকুর কুড়ি পঁচিশ মাইলের বেশী হবে না। কিন্তু যা'তে কারও সন্দেহ না হয় সেজন্য অনেক দূর ঘু'রে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৃপেন ও দেবেশ সেখানে গিয়ে পৌছিল।

ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে একটা টিলা দেখা যাচ্ছিল। তারই উপরে একখানা বাড়ি দেখিয়ে নৃপেন বললেন—"ওইখানাই বোধহয় জমিদার বাড়ি।"

অস্তগামী সূর্য্যের আলোকরশ্মি তখন বাড়িটার উপর পড়ে ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। প্রাসাদের চারদিকে বহুদূর বিস্তৃত ফুলবাগান দেখে দেবেশের মনে হ'ল যে এমন বাড়ি, এমন বাগান সহজে কেউ ছাড়্তে চায় না।

এমন একটা সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের কলে চাকুরী নিয়ে তুলো আর ধূলি মাখতে কার সাধ হয়?

দুই বন্ধুতে কথা বলতে বলতে প্রাসাদের সদর দরজার কাছে অসতেই দেখল প্রাসাদে লোক আছে। নৃপেন বললেন—"এ পথে ঢুকে কাজ নেই। আমরা যে এসেছি এ খবরটা ওরা না পেলেই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।"

উভয়ে তখন বাগানটি ঘিরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগল। কাঠের তক্তার বেড়া দিয়ে চতুর্দিক ঘেরা ছিল। সে বেড়া অনেক উঁচু। নৃপেন বললেন—"চল, আরও এগিয়ে যাই। একটা না একটা পথ পাবই।"

প্রায় পনের মিনিট হাঁটবার পর দেখা গেল এক জায়গায় বেড়াটা ভেঙ্গে গিয়েছে। সেই ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে বাগানে ঢুকে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরতেই নৃপেন বুঝতে পারলো যে সেই কাঠের বেড়ার ভিতর অন্ততঃ পাঁচশ' বিঘা জমি আছে। কেউ যদি যত্ন ক'রে চাষ আবাদ করে তা' হলে সেই জমিতে সোনা ফলতে পারে। দেবেশকে ডেকে নৃপেন বললেন—"খাসা বাগান তো! আমার ইচ্ছা হয় জীবনের শেষ কটা দিন এমনি একটা নির্জ্জন স্থানে কাটাই। দেখতো আমাদের সামনে ওটা কি দেখা যাচ্ছে? ওই গাছগুলোর আড়ালে?"

"ও একটা বাড়ি। বেশী গরম হলে বোধহয় এখানে এসে থাকে।"

নৃপেন বললেন—তা হতে পারে। একশ বছর আগে এদেশে জমিদারদের এই একটা ঝোঁক ছিল। সকলেরই বাগানবাড়ি থাকতো। বাগানের ভিতর বাড়িগুলো গড়তো যেন ঠিক এক একটা মন্দির।

কাছে আসতেই দেখা গেল বাড়িটা অষ্টকোণ বিশিষ্ট। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবার একটি মাত্র দরজা; তা-ও সুদৃঢ় শালকাঠে তৈরী। বারান্দার উপরে উঠেই নৃপেন দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন;—সঙ্গে সঙ্গে একটা পচা গন্ধ তার নাকে এলো।

নৃপেন বললেন—"দেবেশ, কি একটা পচা পচা গন্ধ আসছেনা!"

"আসছে বৈ কি। হয়ত বিড়ালটিড়াল কিছু একটা মরে' আছে। পোড়ো বাগানের যা দশা হয়! কে আর এদিকে লক্ষ্য করে!"

নৃপেন বললেন—"এ গন্ধ বিড়াল-মরার গন্ধ বলে মনে হচ্ছে না। এ কেমন গন্ধ তা' ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। এর আগে কোথাও এমন গন্ধ তো পাই নি। এই দেখ ঘরের ভিতরটা। এতক্ষণে বোঝা গেল এটা বাগানবাড়ি নয়—এ একটা বাউলী।"

"বাউলী কি?"

"একটা প্রকাণ্ড ইন্দারাকে ঘিরে ঘর তৈরী করেছে। দেখছ না মেজের ঠিক মাঝখানে পাথরখানা। কে যেন একটু আলগা ক'রে রেখেছে দেখছি! এই পাথরখানাই হলো ইন্দারার মুখের ঢাকনা। উঃ! কী ভীষণ ভারি! এই যে ছোট পাথরখানা দেখছ যা দিয়ে ঢাকনাটা একটু আলগা করা আছে, সেখানা ঐ উপর থেকে খসে পড়েছে।"

দেবেশ বলল—হাঁ, ইন্দারাই ত বটে। জলের কল হবার আগে ঘরে ঘরেই ত ইন্দারার আবশ্যক হতো। এটায় আর বোধহয় জল-টল নেই—শুক্না। এসো না ঢাকনাখানা তুলে দেখা যাক্।

নৃপেন নিবিষ্ট চিত্তে ঘরখানা দেখছিলেন। কিন্তু সূর্য্য অস্তগত জন্য ঘরের ভিতর বেশী আলো ছিল না। নৃপেন দরজাটি বন্ধ করবামাত্র ঘরটি অন্ধকারে ঢেকে গেল। তিনি তখন পকেট থেকে টর্চ্চ বের ক'রে আলো জ্বাললেন—তীব্র আলোকে চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নৃপেন বললেন—"দেখছি সম্প্রতি অনেকগুলি লোক এই ঘরে ঢুকেছিল। আবার বেরিয়ে গেছে। তাদের পায়ের দাগে মেজেটি ঢাকা। এই যে—জুতো থেকে মাটিও খসে পড়েছে দেখছি। পথের কাঁকড়ও গোটা কতক দেখছি। আর কাদা দেখছি এক ডেলা।"

ওদিকে দেবেশ তখন শরীরের সকলবল দিয়ে ইন্দারার ঢাকনাখানা সরানোর চেষ্টা করছিল। পাথর নড়ল না। তখন নৃপেন এসে তার সঙ্গে যোগ দিলেন। উভয়ের সমবেত চেষ্টায় পাথরখানা একদিকে অল্প একটু উঠল বটে কিন্তু মুখের উপর থেকে একেবারে সরল না। যতটুকু ফাঁক হ'ল সেই পথেই কূপের ভিতর থেকে এমন বিকট গন্ধ আসতে লাগলো যে সহ্য করে কার সাধ্য!

নৃপেন বললেন—"দেবেশ, সাবধান। হয়ত কোন বিষ

টিষ থাকতে পারে। বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ কিনা কে জানে! আর তুলে কাজ নেই। এইটুকু ফাঁকই থাক। আমি পাথরখানা ধরছি। তুমি কাঠ কিছু এনে পাথরখানার তলায় দিয়ে দাও।"

দেবেশ একখানা কাঠ কুড়িয়ে এনে ইন্দারার মুখের ঢাকনাখানার তলায় দিয়ে দিল,—পাথর আল্‌গা হ'য়ে রইল। টর্চ্চের আলোতে নৃপেন দেখলেন যে ইন্দারার গা দিয়ে কাঠের একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

দেবেশ বলল—"আর দেরী কেন? চল ভিতরে নেমে পড়া যাক্। যতটুকু ফাঁক হ'য়েছে ওতেই আমরা ঢুকতে পারবো।'

দেবেশকে টেনে ধরে নৃপেন বললেন—"আরে কর কি? কর কি? মুখ ঢাকা পুরাণো ইন্দারায় কি অমন নামতে আছে?"

"কি করতে চাও তবে?"

"এই দেখনা কি করি।" এই বলেই নৃপেন পকেট থেকে একখানা কাগজ বের ক'রে তাতে আগুন ধরালেন এবং ইন্দারার মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। কাগজখানা পুড়তে পুড়তে তের চৌদ্দ হাত নীচে নেমে গেল এবং তলায় পড়ে জ্বলতে লাগলো।

নৃপেন বললেন—"যারই কেন গন্ধ না হোক—বিষাক্ত গ্যাসের নিশ্চয়ই নয়। যদি তা হতো তা হলে আগুনটা জ্বলতো না। চল এইবার নামা যাক্। হয়ত দেখতে পাব দু'একটা গলিত মৃতদেহ পড়ে' আছে। তা' হোক্। যখন এসেছি তখন ভালো ভাবেই পরীক্ষা ক'রতে হবে।"

নৃপেন ও দেবেশ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। নৃপেন আগে, দেবেশ তার পিছনে। দু'জনেরই উত্তেজনার সীমা ছিল না। নীচে নেমেই নৃপেন দেখল ইন্দারার গায়ে একটা থাক কাটা আছে। সেই থাকের গা জলে ভিজে গেছে এবং থাকের উপর আঠা আঠা কাদা পড়ে আছে।

নৃপেন চারদিক পরীক্ষা ক'রে বললেন—"আমার মনে হয় এই ইন্দারাটা বহুদিনের পুরাতন। সেকালে লোকে প্রাণের ভয়ে এমনি ইন্দারার ভিতর লুকিয়ে থাকতো। শত্রু চলে গেলে বেরিয়ে আসতো। এই যে পাথরের থাকটা দেখছ, যার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ইন্দারার জল এটাকে ছাপিয়ে বড় বেশীদূর উঠে ব'লে মনে হয় না। এখান থেকে ইন্দারার গা কেটে সুড়ঙ্গ চলে গেছে, দেখেছ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে দেবেশ বলল—"দেখেছি বৈ কি!"

"চল এবার ওটার ভিতরে যাই। পথটা খুবই সরু বটে, কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে ঢুকতে পারা যাবে।"

নৃপেন ও দেবেশ সুড়ঙ্গ দিয়ে অগ্রসর হলো। প্রায় দশ হাত চলার পর তারা দেখল সেখানে আর একটা কূপ আছে। এক সময়ে সেই কূপের গা পাথরে বাঁধানো ছিল। কিন্তু পাথরগুলি খুলে পড়েছে এবং রাশি রাশি চট্‌চটে কাদা কূপের গা বেয়ে খসে পড়ছে। সেখানকার বাতাস এতই ভারী যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সহসা নৃপেনের হাতের টর্চ্চটি নিভে গেল। কোথায় কূপটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে; তা না হ'য়ে তীব্র আলোক রাশি বিচ্ছুরিত হ'য়ে চারদিক উদ্ভাসিত ক'রে দিল। জলের কণাগুলি পর্য্যন্ত জ্বলতে লাগলো। মনে হ'ল যেন কূপের ভিতরে আগুন লেগেছে!

দেবেশ বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। বলল—"কূপের গায়ে কি এ?—আগুনের মত জ্বলছে।

নৃপেন টর্চ্চ জ্বাললেন। কূপের আগুন নিভে গেল। আবার টর্চ্চ নিভালেন। কূপটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। নৃপেন তখন কূপের গা থেকে খানিকটা মাটী তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলেন—স্পর্শে গন্ধে ও স্বাদে তার স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করলেন। আবার টর্চ্চ নিভাতে কূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। কূপের আলোকে নৃপেন ও দেবেশ পরস্পরের মুখ দেখতে লাগলো। সে আলোক এতই উজ্জ্বল যে আবশ্যক হলে কোন কিছু পড়াও চলতে পারত।

উত্তেজিত হয়ে নৃপেন বললেন—"দেবেশ, আমরা রেডিয়ামের খনির ভিতর নেমেছি। এই কাদার সঙ্গে রেডিয়াম আছে। সারা পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে তা দিলেও যে এত রেডিয়াম মিলে না।"

দেবেশ উন্মত্তের মত চিৎকার ক'রে উঠলো—রেডিয়াম! বল কি নৃপেনদা—এখানে রেডিয়াম্!"

নৃপেন বললেন—"রেডিয়াম যে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে আসল খাঁটি নিভাজ রেডিয়াম নানা জিনিষের সঙ্গে মিশানো থাকে। তোমার সামনে

যে কাদা দেখছ এ হলো নানা জিনিষের সঙ্গে মিশানো রেডিয়াম। তা হোক্ না—এর দামই যে কোটি টাকারও বেশী। আর সেই টাকার মালিক— ।"

নৃপেনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দেবেশ বলল—"রাজকুমার শ্যামল চক্রবর্ত্তী। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন প্রশান্ত এই সম্পত্তিটা কেড়ে নেবার চেষ্টায় আছে—আর গুণ্ডারাই বা কেন তার সঙ্গ নিয়েছে।"

"এই রেডিয়ামের খনিটা আবিষ্কার ক'রে এখন বুঝতে পারছি সমস্যাটা কত জটিল। এই এঁটেলো কাদার সঙ্গে মিশে এত টাকা এখানে আছে যে লোকের লোভও আপনিই আসে। এ ধন লাভ করতে মানুষ পাগল হয়। খুন বল, জালজালিয়াতি বল—মানুষ চুরি করা বল—এর জন্য সব করতে পারে এমন লোকের অভাব কি— ?"

নৃপেনের মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল। কূপের মধ্যে কার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি গুম্ গুম্ করতে লাগল। নৃপেন ও দেবেশ স্তব্ধ হয়ে শুনল কে যেন বলছে—

"কে কথা বলে? কানু নাকি? আমি তো অনেকবার তোমাকে বলেছি একা একা ওখানে যাতায়াতটা আমি পছন্দ করি না। এসো, চ'লে এসো বলছি।"

দেবেশ তাড়াতাড়ি উপরে উঠছে দেখে নৃপেন তার হাত চেপে ধরলেন এবং কানে কানে বললেন—"কথাটি কয়োনা—কাঠ হ'য়ে দাড়িয়ে থাকো।"

আবার শোনা গেল—"কৈ? এখনো এলেনা কানু? কতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? যদি আপন ইচ্ছায় উঠে না আসো তবে বুঝতেই পারছ— ? আমি কিন্তু এখনই নেমে আসবো বল্‌ছি।"

নৃপেন বললেন—"দেবেশ, এখানে আর দেরী করলে বিপদ হবে। চল বরং উপরেই উঠি।"

নৃপেন কালবিলম্ব না ক'রে অগ্রসর হ'লেন। দেবেশ তার পিছনে পিছনে চলল। সুরঙ্গ থেকে বাহির হয়ে তারা যখন ইন্দারার সেই পাথরের থাকের উপর এসে দাঁড়ালো, তখন শুনতে পেল; আর একজন কে ব'ল্‌ছে, "বিশু, তুমি ভুল করছ। কানু ওখানে নেই। মিছেই আমরা এখানে সময় নষ্ট করছি। আজ রাত্রে যে অনেক কাজ করতে হবে।"

প্রথমে যে কথা ক'য়েছিল—সে তীব্রস্বরে বলে উঠল—"কি যে বল তার ঠিক নেই! আমি কানুর কথা পর্যন্ত শুনেছি, আর তুমি বলছ ওখানে সে নেই! আর তিন সেকেণ্ড দেরী ক'রব। এর মধ্যে যদি কানু উঠে না আসে তা হ'লে ঠিক বল্‌ছি এখনই নেমে যাব আর কানুর গলার নলিটা দু'হাতে টেনে ছিঁড়বো। ওতে আমাদের সকলেরই সমান অংশ। আর কানু কিনা লুকিয়ে লুকিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে—কামড়ে খানিকটা করে চুরি করে নিয়ে যা'বে! কিছুতেই তা হবে না। কানু! কানু! কৈ? এখনো এলে না!"

মুখের কথা শেষ না হতেই বিশুর হাতের টর্চ্চ কূপের ভিতর আলোকিত করে তুলল। পরমুহূর্ত্তেই সে চীৎকার ক'রে উঠলো—রঘু! রঘু! এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা দেখছি। ইন্দারায় চোর ঢুকেছে। এস দেখি একবার নীচে—মজাটা দেখাই।

নৃপেন দেখলেন মহা বিপদ! তিনি গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—"নেমো না বলছি। যদি এতটুকু কুমৎলব দেখি, তবে এখনই গুলি চালাবো। সরে' দাঁড়াও বলছি ইন্দারার মুখ থেকে। আমরা আপনা হতেই উঠে আসছি।"

বিশু চীৎকার ক'রে উঠলো—"কি গুলি চালা'বে? তবে দেখাচ্ছি মজা। রঘু পাথরটা ধরত—ইন্দারার মুখটা বন্ধ কর। শয়তানদের এখানেই কবর দাও।"

পরমুহূর্ত্তে মুখের পাথরখানা সশব্দে প'ড়ে ইন্দারাটি বন্ধ ক'রে দিল। নৃপেন শুনল'—হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে বিশু বল্‌ছে—"এইবারে যাদু ফাঁদে পড়েছ। চল রঘু। পাম্প চালিয়ে জল ছেড়ে দাও। বেশী নয়—দুদিনের মধ্যেই রেডিয়াম ওদের হাড়মাস হজম ক'রে ফেলবে—চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখবে না।"

কিছুক্ষণের জন্য চারদিক নীরব হয়ে গেল। অকস্মাৎ পাম্পের খস্ খস্ শব্দে দেবেশের চমক ভাঙ্গল। পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল কূপের ভিতর অল্পে অল্পে জল পড়তে আরম্ভ ক'রেছে।

আতঙ্কে বিকৃত কণ্ঠে দেবেশ বলল—"নৃপেনদা এখন উপায়?"

"উপায় ভগবান্!" [ক্রমশঃ

ছুটির ঘণ্টায়

চিত্রগুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় বিজ্ঞানের বিচিত্র-বিধানে রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, রঙ বদলানোর যে আজব-মজার কারসাজির পরিচয় দিয়েছি, এবারেও তেমনি ধরনের আরো কয়েকটি খেলার কথা বলছি। এ কারসাজির কলা-কৌশল আয়ত্ত করা খুব একটা কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়। সামান্য চেষ্টা করলেই টুকিটাকি কয়েকটি রাসায়নিক সামগ্রীর সাহায্যে তোমরা অনায়াসেই বিজ্ঞানের এমনি সব নানান্ মজার খেলা দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের শুধু প্রচুর আনন্দদানই নয়, রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

আপাততঃ শোনো—এই বিজ্ঞানের বিচিত্র উপায়ে এমনি আরো কয়েকটি আজব-মজার 'রঙ বদলানোর' কায়দা-কশরতের কাহিনী।

'লিট্মাসের' (Litmus) সঙ্গে 'এ্যাসিড' (Acid) বা 'অম্ল-জাতীয় সামগ্রী মেশালেই যে বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, রঙ-বদলায়, সে কথা তোমাদের ইতিপূর্ব্বেই জানিয়ে রেখেছি···এবং এ দুটি বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে 'অ্যালকালি' (Alkaline) বা ক্ষার জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে পুনরায় 'রঙ-বদলানো' সম্ভব—সে কথাও তোমাদের অজানা নয়। কাজেই উপরোক্ত নিয়মানুসারে আরো যে সব আজব মজার কারসাজি দেখানো যায়—এবারে তোমাদের তারই কয়েকটি সহজ সরল কলা-কৌশলের মোটামুটি পরিচয় দিই।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রঙ বদলানোর প্রথম কারসাজিটি দেখানোর জন্য—'লিটমাসের' বদলে 'টারমেরিক' (Turmaric) বা 'হলুদগোলা-জল' ব্যবহার করা যেতে পারে। এ কারসাজি দেখানোর সময় এক গামলা হলুদ গোলা জলে ধবধবে পরিষ্কার একখণ্ড কাপড় ভিজিয়ে নাও। তারপর হলুদ-রঙে ছোপানো সেই কাপড়টিকে গামলা থেকে তুলে সযত্নে জল ঝরিয়ে নিয়ে ঘরের সমতল মেঝে বা কাঁচের একটি পাতের (Glass Sheet) উপরে বিছিয়ে কিছুক্ষণ সাবান ঘষলেই দেখবে—কাপড়ের হলুদ-রঙ ক্রমশঃ সুন্দর লাল-রঙে পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠেছে। এবারে লাল-রঙ রূপান্তরিত সেই কাপড়ের টুকরোটি কিছুক্ষণ রসাল পাতিলেবু দিয়ে ঘষলেই দেখবে—বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, কাপড়ের লাল-রঙ ক্রমেই বদলে গিয়ে পুনরায় আগের মতোই হলুদ-রঙের হয়ে উঠেছে। এমনি-ভাবে অনায়াসেই কেবলমাত্র একবারই নয়, আসরের দর্শকদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য প্রয়োজন হলে দু' তিনবারও ইচ্ছামতো রঙ বদল করা যেতে পারে।

রঙ-বদলের দ্বিতীয় কারসাজিটি দেখানোর জন্য দরকার—'Schiff's Reagent' নামের রাসায়নিক পদার্থ। এ সামগ্রীটি মিলবে—শহরের যে কোন ভালো এবং বড় ডাক্তারখানা কিম্বা রাসায়নিকের দোকানে। 'Schiff's Reagent' রাসায়নিক-পদার্থটি আসলে দেখতে হলো—জলের মতোই স্বচ্ছ নির্ম্মল। Turmaric' বা 'হলুদগোলা জলের' মতো Schiff's Reagent' Solution এ শাদা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো চোপালে, কিছুক্ষণ বাদেই সেটি দিব্যি টুকটুকে-সুন্দর লালচে-রঙে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে এবং কাপড়ের টুকরোটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিজা থাকবে, ততক্ষণ সেটির লাল-রঙ বজায় থাকবে বরাবর। কিন্তু Schiff's Reagent Solution এ ভেজানো কাপড়ের টুকরো বাতাসের স্পর্শে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ যতই শুকনো হতে সুরু করবে, লাল-রঙের আভাও তেমনিভাবে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পুনরায় আগেকার ধবধবে শাদা রঙে রূপান্তরিত হবে। এমনটি ঘটবার কারণ—'Schiff' Reagent" রাসায়নিক পদার্থটির প্রক্রিয়া হলো সাধারণ Magenta Solution এর Sulphur dioxide Gas দিয়ে রঙ রূপান্তরিত করা। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত সলিউশানে' ভেজানো কাগড়ের টুকরোটিতে ঐ গ্যাসটুকু বজায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আসল রঙটিও রয়ে যায় অদৃশ্য কাপড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্যাসটুকু ক্রমশঃই ধীরে ধী

শুকিয়ে এবং মিলিয়ে যায়।

তার ফলেই, লাল-রঙ ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, শুকনো-কাপড়ের আসলকার শাদা-ধবধবে রঙটি ফিরে আসে পুনরায়।

এবারে এই পর্যন্তই। আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রক্রিয়ার ফলে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব-মজার রঙ-বদলানোর রাসায়নিক-কৌশলের হদিশ দেবার বাসনা রইলো। ক্রমশঃ

ধাঁধা ও হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। আজব হেঁয়ালি:

যে কোনো বড় বড় সামগ্রী…ভারী ভারী লোহার সিন্দুক, আসবাবপত্র, পাথরের মূর্ত্তি, ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট, বন-জঙ্গল-মাঠ, বাগ-বাগিচা, ফুল লতা-পাতা, নদী-পর্ব্বত, লোকজন, জন্তু-জানোয়ার, অর্থাৎ, দুনিয়ার সব কিছুরই চেহারা আমি অনায়াসেই আমায় ঝকঝকে-মসৃণ বুকে তুলে নিই। ধনী-দরিদ্র সবার ঘরেই আমি আছি—ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ সবাই আমায় চায়—সবাই আমাকে ভালবাসে—যত্ন করে হাতের কাছে রাখে। বলো তো—আমি কে?

সুলতা মুখোপাধ্যায়

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

গ্রামের পুকুরে কয়েকটি পদ্মফুল ফুটেছিল। সদ্য-ফোটা ফুলের সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে এক ঝাঁক ভ্রমর এসে সেই পদ্মফুলগুলির আশেপাশে উড়তে সুরু করে দিলো। এভাবে উড়বার সময় ভ্রমরেরা দেখলো যে যদি তারা প্রত্যেকে একটি করে পদ্মফুলের উপরে বসে, তাহলে একটি ভ্রমর বাড়তি হয় এবং যদি দুটী করে ভ্রমর প্রত্যেকটি পদ্মফুলের উপর বসে, তাহলে আবার একটি পদ্মফুল বাড়তি থেকে যায়। এই হিসাব বুঝে নিয়ে বলো তো তোমরা—মোট কয়টি ভ্রমর এসেছিল এবং গ্রামের পুকুরে মোট কতগুলি পদ্মফুল ফুটেছিল!

রচনা: অমল সাহু, বিভা দাশগুপ্ত ও সেজদি (ঝাড়গ্রাম)

৩।

ত্রি-বর্ণে রচিত নাম—থাকে ঘরে ঘরে,
প্রথম ত্যজিলে তারে খেতে সাধ হয়।
তৃতীয় ত্যজিলে অতি বিষধর জীব—
দংশনে দারুণ জ্বালা…প্রাণ-সংশয়!
মধ্যম ত্যজিলে কিন্তু কিছুই না রয়
বলো তো, সেটির নাম—ঘুচাও বিস্ময়!

রচনা: প্রাণগোপাল বানাই (লক্ষ্মীপুর, খেরী)

গত মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর:

গোবিন্দ—প্রবন্ধ লেখক, বাণীনাথ—কবি; গদাধর—সম্পাদক; এঁরা তিনজনে বসেছেন এক বেঞ্চে পাশাপাশি এবং এঁদের সামনের বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছেন—পরেশ—ঐতিহাসিক; উমেশ—ঔপন্যাসিক এবং বরদা—নাট্যকার।

২। হরিতাল

গতমাসের দুটি ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিয়েছে:

মোহন, শোভন, শর্ম্মিলা, গায়ত্রী ও নন্দিতা সিংহ (বারাণসী), পল্টু, লাট্টু, গোপাল, কাদম্বরী, চন্দ্রিমা, ছট্টু ও গাবলু (শ্রীরামপুর), পূরবী, সোমা, সন্দীপ, সমীর, সঞ্জীব ও সুনীরা মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), অশোক, অনাবিল, ধীরেন, বিমান, মিহির, সুধীশ, কল্যাণ, শচীন ও ইন্দ্র, (কলিকাতা), অমিতাভ, কবি ও অধীশকুমার হালদার (লক্ষ্ণৌ), কবিতা, নমিতা, সবিতা, সুদেব, ভূদেব ও প্রভবদেব চট্টোপাধ্যায় (জামসেদপুর), সত্যেন্দ্র, লক্ষ্মী, মুরারি, কৃষ্ণা, সঞ্জয়, সুলেখা, অমিয়, কুমুদিনী, জ্ঞানাঙ্কুর, আরতি ও অরিন্দম সেন (কলিকাতা), নৃপেন্দ্র, হরেন্দ্র, দীপেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র ও মধুমিতা রায় (ডালটনগঞ্জ), রজত, কুহেলী, মীরা, শ্যামশ্রী ও বনানী বটব্যাল (নিউ দিল্লী), প্রবীর, রণজিৎ, যুধাজিৎ, অভিজিৎ ও কাননিকা ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা), ছায়া, রাকানাথ, উষানাথ, নিশানাথ, দেবনাথ ও নির্ম্মলা সাহা (চন্দননগর), মন-

তোষ, শিবতোষ, দেবতোষ, মালতী, নীহারিকা ও কুন্তলা দেব (বোম্বাই), ভূপেন্দ্র, ইন্দিরা, চন্দনা, কৃপানাথ ও মহীদেব ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা), অনিরুদ্ধ, সমরেন্দ্র, পূর্ণেন্দু, পার্থ, শঙ্করনাথ ও শ্যামলী চক্রবর্ত্তী (বিলাসপুর), কাশীনাথ, শরৎচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমেন্দ্র, ফণীন্দ্র ও কাঞ্চনমালা ঘোষ (রাঁচী)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), ছোটন, বাবুন, লক্ষ্মী, পাপু, ভুটিন, রাজা, মণ্টী, নন্দা ও লুকু (কলিকাতা), হরিদাস, অজয়, বিজন, রাখাল, রাজীব, দিব্যকান্তি ও মাধব (কাঁচড়াপাড়া), অমিয়, অলক, বাপি, শিবাজী, লতিকা, পুপু, গোপা ও শান্তা রায় (কৃষ্ণনগর), গোবিন্দ, শ্যামাদাস, মহেন্দ্রলাল, জীমূতেন্দ্র ও নবেন্দু বসু (কলিকাতা), চঞ্চল, মিনতি, নিকুঞ্জ, বাসুদেব, প্রশান্ত, সুশান্ত ও শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান), দোলন, ফনীন্দ্র ও রোচনা সাহা (কলিকাতা), কৃষ্ণলাল, ভাস্কর, রবীন্দ্র, পুলিন, তিনকড়ি, হেমন্ত ও রথীন্দ্র (পাটনা), জোনাকী বাগচী (পূর্ব্ব পুটিয়ারী)।

দর কষাকষি

শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সংসারে, ধরি গলে গলে
কত খেটেছ, খেটেছি, আনন্দেতে গ'লে
কিবা পেনু বল, কীবা নাহি পেলে
বিদায়ের দিনে, শুষ্ক মনেতে ॥

ষোল আনা ফাঁকি, অঞ্চলে বাঁধা
গ্রন্থি খুলে দখি, সব ফাঁকা সাদা
এত জোরে বাঁধা, গ্রন্থিটী সদা
উপহাস করে, হাসিতে হাসিতে ॥

তুমি খাটিয়াছ, আমিও খেটেছি
গাড়ী টানা ঘোড়ায়, হার মানায়েছি
প্রতিদান তার, কী বল পেয়েছি ?
চাবুকের প্রহার, সম্মুখে পশ্চাতে ॥

ইন্দ্রিয়গণ, শিথিল হ'লো আজ,
অভোগ্য জিনিসের, ভোগে হ'লো সাঁঝ
ভোগ্য বস্তু, নাহি এর মাঝ
পড়েছি ফাঁকি দেখি দুজনেতে ॥

চক্ষে বহে এখন সমুদ্রের ঢেউ
সে ঢেউ সহিতে, রাজি নহে কেউ
সারমেয় সব, করে ঘেউ ঘেউ
নজর রাখিয়াছে, ঘুন্সির চাবিতে ॥

কথা নাহি মোদের, মুখে কোন আজ
হেঁট মুণ্ডে প্রাণে, হইতেছে লাজ
চোরের মত সংসারে করিয়াছি কাজ
সংসার কি চোরে, পারে গো ছাড়াতে ॥

অনুমানে বুঝি, প্রাণের মাঝার
বাজীকর এক, আছে যে মজার
যাদুদণ্ডের পরশে তাহার
মায়ার বাঁধন খসে যে চকিতে ॥

(এসো) সঞ্চালি মোদের বিফল অঞ্চল
ডাকিয়া ঈশ্বরে বলি "হে চঞ্চল
(তুমি) এ বঞ্চনার শেষে, না হ'লে সচ্ছল
কী আর বাঁধিব মুক্ত গ্রন্থিতে ॥

হে সংসার, তুমি, আঘাতি জীবনে
বাধ্য করিয়াছ, খুঁজিতে সে ধনে
পূজিনু তোমায় দীক্ষাগুরু জ্ঞানে
ঈশ্বরের নির্দ্দেশ দিলে যে শেষেতে ॥

নরক নয় রে তুমি রে আশ্রম
এ আশ্রমে দীক্ষায় হইনু সক্ষম
ঈশ্বর অন্বেষণে, আসিল সংযম
নমি তব বিশ্রী সুন্দর পদেতে ॥

পুরস্কার

শ্রী'শ'—

বিশ্ব-চলচ্চিত্র শিল্পের মহাতীর্থ "হলিউড"-এ বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান প্রথা প্রচলিত আছে। এই পুরস্কার "য়্যাকাডেমি য়্যাওয়ার্ড" নামে বিখ্যাত। চলচ্চিত্র শিল্পের নানা বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই পুরস্কার পাওয়া বিশেষ সম্মানের বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমাদের এই বাংলাদেশেও একটি সংস্থা তিরিশ বৎসরের ওপর বাংলা ও ভারতীয় অন্য ভাষাভাষী এবং বিদেশী চলচ্চিত্রের নানা বিভাগে পুরস্কার বা "য়্যাওয়ার্ড" দিয়ে আসছেন। এই সংস্থাটি হচ্ছে "বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এসোসিয়েসন্।" এঁদের এই বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ আজ শুধু সারা ভারতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে নি, বিদেশেও এই পুরস্কারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা দেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকগণ গত তিরিশ বৎসর ধরে, যে বাংলার চলচ্চিত্র ভারত তথা বিশ্বের চলচ্চিত্র সম্মেলন থেকে বারবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করে এনেছে,

সেই বাংলার ঐতিহ্যের উপযুক্ত এই পুরস্কার বিতরণ করে সারা ভারতের চলচ্চিত্রামোদীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ লাভ করছেন। তাই এই বি-এফ-জে-এ (B.F.J.A.) য়্যাওয়ার্ড পাওয়া যে বিশেষ সম্মানের বস্তু তা আজ সারা দেশের লোকই স্বীকার করে নিয়েছেন।

এবার বি-এফ-জে-এ গত ৬ই মে সন্ধ্যায় "রবীন্দ্র সদন" ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তঁাদের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন করলেন।

১৯৬৭ সালের চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে যে সব চিত্র, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং শিল্পীবৃন্দ এই পুরস্কার পেলেন তাঁদের নাম ও চিত্রের নাম নিয়ে দেওয়া হল :—

প্রথম দশটি ভারতীয় চিত্র—

(১) ছুটি, (২) বালিকা বধূ, (৩) অনুপমা, (৪) কেদার রাজা, (৫) সেক্সপীয়ারওয়ালা, (৬) উস্‌কি কাহানী, (৭) আগন্তী খাত, (৮) হাটে বাজারে, (৯) উপকার ও (১০) মিলান,

তিনটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র—

(১) ডক্টর জিভাগো, (২) হু ইস্ য়্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উল্ফ ও (৩) জোরবা দি গ্রীক্।

শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—

বাংলা চিত্র : অরুন্ধতী দেবী ("ছুটি")
হিন্দী চিত্র : হৃষিকেশ মুখার্জি ("অনুপমা")
বিদেশী চিত্র : ডেভিড লীন্ ("ডক্টর জিভাগো")

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—

বাংলা চিত্র : উত্তম কুমার ("গৃহদাহ")
হিন্দী চিত্র : সুনীল দত্ত ("মিলন")
বিদেশীচিত্র : এন্টনী কুইন ("জোরবা দি গ্রীক্")

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—

বাংলা চিত্র : মৌসুমি চ্যাটার্জি ("বালিকা বধূ")
হিন্দী চিত্র : নূতন ("মিলন") ও নাইনা সাহু "হারে কাঁচ কি চুড়িয়া"
বিদেশী চিত্র : জুলি ক্রীষ্ট ("ডক্টর জিভাগো")

শ্রেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতা—

বাংলা চিত্র : বিকাশ রায় ("প্রস্তর স্বাক্ষর")
হিন্দী চিত্র : বলরাজ সাহনী ("আসরা")

শ্রেষ্ঠ সহযোগী অভিনেত্রী—

বাংলা চিত্র : সুব্রতা চ্যাটার্জি ("চিড়িয়াখানা")
হিন্দী চিত্র : দীনা গন্ধী ("উস্‌কি কাহানী")

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক—

বাংলা চিত্র : হেমন্ত মুখার্জি ("বালিকা বধূ")
হিন্দী চিত্র : লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল ("মিলন")

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য—

বাংলা চিত্র : অরুন্ধতী দেবী ("ছুটি")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : বিমল দত্ত ও ডি, এন, মুখার্জি ("অনুপমা")

শ্রেষ্ঠ সংলাপ—

বাংলা চিত্র : বিমল কর ("ছুটি")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : মনোজ কুমার ("উপকার")

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচনা—

বাংলা চিত্র : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ("এন্টনী ফিরিঙ্গী")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : আনন্দ বক্সী ("মিলন")

শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক্ গায়ক—

বাংলা চিত্র : (পুরুষ) মান্না দে ("এন্টনী ফিরিঙ্গী")
(মহিলা) প্রতিমা ব্যানার্জি ("ছুটি")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : (পুরুষ) মুকেশ ("মিলন")
(মহিলা) লতা মঙ্গেশকর ("মিলন")

শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান্ (শাদা ও কালো)—

বাংলা চিত্র : সৌমেন্দু রায় ("বালিকা বধূ")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : সুব্রত মিত্র ("সেক্সপীয়ারওয়ালা")

শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান্ (রঙ্গীন)—

হিন্দীও অন্য চিত্র : রাধু কর্মকার "আমন"

শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা—

বাংলা চিত্র : সুবোধ রায় ("ছুটি")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : দাস ধাইমেড ("অনুপমা")

শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দ্দেশনা—

বাংলা চিত্র : বংশীচন্দ্র গুপ্ত ("চিড়িয়াখানা")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : পি, এল, যাদব ("আসরা")

শ্রেষ্ঠ অডিওগ্রাফী—

বাংলা চিত্র : নৃপেন পাল ও অনিল তালুকদার ("বালিকা বধূ")
হিন্দী ও অন্য চিত্র : রামস্বামী ও শ্রীনিবাসন্ ("মিলন")

বিশেষ পুরস্কার—

বাংলা চিত্র : নন্দিনী মালয়া ("ছুটি") এবং বাপ্পি ("আথরা খাত")

খবর বলছি :

অভিনেতা অরুণ মুখার্জ্জি সাংঘাতিক "জিপ্" দুর্ঘটনায় আহত হলেন। অভিনেত্রী সুব্রতা চ্যাটার্জ্জির হোটেলের ঘরে চোর ঢুকে চুরি করল। প্রযোজক কালীপদ দত্তগুপ্ত বিশেষরূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার ওপর দার্জ্জিলিং-এর অনিশ্চিত আবহাওয়া। এই সমস্ত ঘটে গেল— সিনেমার গল্পে কিন্তু নয়, সত্য সত্যই !

দার্জ্জিলিং-এ "স্বর্ণ শিখার প্রাঙ্গণে" চিত্রের সুটিং করতে গিয়ে পরিচালক পীযূষ বসুকে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু পরিচালক অদম্য অধিনায়কের মত সব বাধা বিঘ্ন জয় করে দার্জ্জিলিং-এর সুটিং পর্ব্ব শেষ করলেন। "সারদা চিত্র মন্দির"-এর এই নির্ম্মীয়মাণ চিত্রটিতে অভিনয় করছেন—মাধবী মুখার্জ্জি, সুব্রতা চ্যাটার্জ্জি, শিখা ভট্টাচার্য্য, বেবি রিতু, দিলীপ রায়, তরুণ কুমার, অরুণ মুখার্জ্জি ও নেপালী মেয়ে কৃষ্ণা প্রধান প্রভৃতি।

সমরেশ বসুর 'কালকূট' উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। চিত্রটির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এর সঙ্গীতাংশ। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করছেন—লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখার্জ্জি ও মান্না দে।

চিত্রটি আর, ডি, বি, এণ্ড কোং-এর মাধ্যমে মুক্তিলাভ করবে।

*　　*　　*

চিত্র-প্রযোজক শ্রী আর, ডি, বনশাল তাঁর প্রথম হিন্দী চিত্রের "ঝুক্ গয়া আস্মান্"-এর মুক্তি উপলক্ষে বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমবেত চিত্র-সাংবাদিকদের ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন যে, তিনি হিন্দী চিত্র নির্ম্মাণে ব্রতী হলেও বাংলা চিত্র নির্ম্মাণের প্রতিই তাঁর অনুরাগ বেশী এবং সেজন্যেই তিনি এতগুলি সাফল্যময় বাংলা চিত্র, যা দেশ বিদেশের খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে, তা নির্ম্মাণ করতে পেরেছেন। তিনি আরও জানালেন যে তিনি কলিকাতারই লোক এবং তিনি বাংলা চিত্র-নির্ম্মাণ বন্ধ করবেন না এবং তাঁর আগামী বাংলা চিত্রগুলি বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ উপযুক্তই হবে।

*　　*　　*

১৯৬৭ সালে ভারতে ৩১১টি চলচ্চিত্র ১২টি ভাষায় নির্ম্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ শতাংশ চিত্র হিন্দী ভাষী হলেও, দক্ষিণ ভারতীয় তেলেগু, তামিল, মালয়লাম ও কানাড়ী ভাষায় নির্ম্মিত চিত্রগুলির সংখ্যা ৫৮ শতাংশ হয়েছে। ভাষার ভিত্তিতে হিন্দী ভাষী চিত্রের সংখ্যাই বেশী। হিন্দী চিত্র নির্ম্মিত হয়েছে ৮৪টি, তেলেগু ৬২, তামিল ৪১, মালয়ালাম ৩৮, কানাড়ী ২৪, বাংলা ২৪, এবং মারাঠী ১১টি। পাঞ্জাবী, গুজরাটি, আসামী, ওড়িয়া এবং সিন্ধী ভাষার চিত্রগুলি সবকটি মিলে মাত্র ১১টি হয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ইনডেক্স' থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

*　　*　　*

গত ২৬শে বৈশাখ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যটি পরিবেশন করলেন। এই নৃত্যনাট্যের নৃত্য ও সঙ্গীত বেশ উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং এর সবটুকু কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ।

*　　*　　*

ওয়াই, এম, সি, এ, (চৌরঙ্গী)-র সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য্যের "অতএব" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে চৌরঙ্গীস্থিত ওয়াই, এম, সি, এ মঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন। এই সংস্থার সভ্যরা খেলাধুলা ছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ে, বিশেষ করে অভিনয়েও যে কতখানি পারদর্শী তার পরিচয় তাঁদের এই নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়।

অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—গোপাল বসু, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতানাথ চৌধুরী, রবীন মুখার্জ্জী ও নগেন মুখোপাধ্যায়।

*　　*　　*

"চিরকুমার সভা" নাটকে অংশগ্রহণকারী "গীতবীথি"র ছাত্রছাত্রীগণ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন "গীতবীথি" রবীন্দ্রনাথের চিরনূতন "চিরকুমার সভা" নাটক সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সরোবর মঞ্চে অভিনয় করলেন। এই সঙ্গীত শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সঙ্গীতবহুল নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে শুধু তাঁদের সঙ্গীত কুশলতার পরিচয়ই দেন নি, অভিনয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষরও রেখেছেন। নাট্য-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীশৈলেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনয়ে যাঁরা নৈপুণ্যের পরিচয় দেন তাঁরা হলেন :— অসীম চট্টোপাধ্যায় (চন্দ্রবাবু), শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (রসিক), কল্যাণ সাহা (অক্ষয়), মিহির চট্টোপাধ্যায় (মৃত্যুঞ্জয়), প্রশান্ত বসু (দারুকেশ্বর), প্রণব বসু (শ্রীশ) স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিপিন) এবং বন্দনা ঘোষ (পুরবালা) রিণা মুখোপাধ্যায় (শৈলবালা) মিতা চট্টোপাধ্যায় (নৃপবালা) স্বপ্না চট্টোপাধ্যায় (নীরবালা) ও অমিতা বসু (নির্মলা) শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅমর লাহিড়ীর কৃতিত্বপূর্ণ সঙ্গীত পরিচালনার গুণে নাটকের সঙ্গীতাংশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়ের (নীরবালার) সঙ্গীতগুলি এবং অমিতা বসুর (নির্মলার) নেপথ্য সঙ্গীত "ওগো তোরা কে যাবি পারে..." বিশেষ প্রশংসার দাবী করতে পারে।

* * *

* * * * * * *

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যে আকাশ পাতাল ভাবছিলেন মণিদি কে জানে? মাঝে মাঝে দীপঙ্করের মনে হয় মণিদির মনের নাগাল সে বোধহয় আজও পায়নি, কোনদিন পাবেও না। এত কাছে থেকেও কত যোজন দূরে,—যতই নিবিড়ভাবে সে মনিদিকে জেনেছে ততই মনে হয়েছে মণিদি তার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কি যে ভাবছিলেন মনিদি নিজেও জানেন না। গাড়ীর জানলার বাইরে অপাসৃয়মাণ গাছ, মানুষ, গাড়ী সব কিছুই ঝাপসা হয়ে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছিল তাঁর চোখের নাগাল হতে। এমনি কতজনই তো হারিয়ে গেছে তাঁর জীবন হতে। তাদের কারু কারুকে মনে পড়ে কারু কারুকে বা আজ আর মনে পড়ে না। কতজনই তো এল গেল! তাঁকে নিয়ে যারা একদিন ঘর বাঁধতে চেয়েছিল তাদের কাউকেই তিনি কোনদিন চাননি, যাকে নিয়ে একদিন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, তার মনের নাগাল কোনদিন পাওয়া যায়নি।

অন্যমনস্ক ভাবে একবার দীপঙ্করের দিকে তাকালেন। মন Emotional, তেমনি ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ বলেই বোধহয় Emotional, বছর দশেক আগে হলে বোধহয় ভাবাই যেত না যে দীপের সঙ্গে একদিন এভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে। কি যায় আসে! জীবনটাই বোধহয় এরকম।

"আমি তোমাকে সব দেব প্রকাশ।"

"Oh stop it মণি, তুমি আমাকে সব দেবে but I don't need it, বিলেতে গেছি সেখানেও প্রতিটি Mail-এ তোমার Instruction আসছে অমুক কোরনা, তমুক কোর না, এর সঙ্গে মিশবে না ওর সঙ্গে, মিশবে না, do yon think that I am a child ;"

"প্রকাশ?

"By the way, আসল খবরটাই তোমাকে জানান হয়নি, আমি বিয়ে করেছি বিলেতে, বাঙালীই অবশ্য।"

গলার ওপর দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন মণিদি। দেবাশীষের কাছে তিনি একদিন ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত গয়নাগুলো বিক্রি করিয়ে দেবার জন্যে। প্রকাশের টাকার বড় দরকার।

মণিদি ও প্রকাশ—ছায়াপথ

Windscreen-এর দিকে তাকিয়ে দীপ কি ভাবছে অত? হয়ত আগামী দিনের কথাই। পৃথিবীর সব বেইমান গুলোর মুখোশ খুলে দিতে চায় ও। বেচারা। পৃথিবীতে যে কত রকমের-বেইমান আছে কে তার হিসেব রাখে!

'দীপ'

"উঁ,"

"তোমার বয়স কত দীপ!"

"জানি না, হাজার বছর হতে পারে বোধহয়।"

"মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয়।

অবাক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে কালো মেকানিক। মানুষের মনটা কেন যে আকাশের মত উদার হয় না? মেঘেরা কত কি ছবি এঁকে যায় আকাশের গায়ে, কিন্তু আকাশের বুকে কোনদিন কোন দাগই পড়ে না। পৃথিবীর বুকে মানুষ হয়ে জন্মানটা যে কতবড় সৌভাগ্য এটা কোনদিন তারা বুঝতে পারবে না যারা মানুষকে বিচার করে শুধুমাত্র তার জন্মসূত্র দিয়ে। যেমন লাহাদের বাড়ীর বড়কর্তা। ওর মেজ ছেলেটাকে

রাগের মাথায় একটা চাপড় কষিয়ে দিয়েছিলো কালো এই তার অপরাধ। ছেলে যে এদিকে দিব্যি মস্তানী করে বেড়াচ্ছে, ওর সামনে দিয়ে পাড়ার মেয়েরা পর্যন্ত পথ চলতে পারেনা,এসব দেখেও ছাখেননা বড়কর্ত্তা। ওঁর ছেলে যা ইচ্ছে করে বেড়াক তাকে শাসন করতে যায় কালো কোন্ অধিকারে? কালোর জন্মের যে কোন ঠিক নেই এই কথাটাই পাড়াশুদ্ধ লোকের সামনে বেশ জোর গলায় ভাল করে সমঝিয়ে দিয়ে গেছেন বড়কর্ত্তা।

অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে থাকে কালো। কবে যে সে জন্মেছিলো সে নিজেই জানে না, যেমন জানে না কে তার জন্মদাতা। অ'চ্ছা, জারজ সন্তানের গায়ের রক্ত আর বনেদি বংশের গায়ের রক্ত, দুরকম রক্তের রঙ কি আলাদা? না একই রকমের লাল? কাল বিশু ও দীপঙ্করকে একবার জিজ্ঞেস করবে সে। ওরা হয়ত ঠিক বলতে পারবে। কলেজের ছাত্র ওরা। হয়ত জানলেও জানতে পারে!

ঘোষালস কেবিনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় কালো। রোজকার মতই ধারে চা খেতে খেতে লাটুবাবু ঘোষালের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে চলেছেন। "আজকালকার ছেলেছোকরারা বলে লাটুবাবু নাকি গল্প বানাচ্ছেন! হুঁ, যত সব—এই তল্লাটের কে না জানে একদিন শহরের পাঁচ পাঁচটা সেরা মেয়েমানুষ নিয়ে বাগানবাড়িতে—লোকে তাকে বলত কাপ্তেনের কাপ্তেন! তখন কি কোনদিন কেউ ভেবেছিলো যে এই পচা চায়ের দোকানে কোনদিন তার পায়ের ধুলো পড়বে, না ঘোষালই কোনদিন সাহস করতো তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে?" রাগের মাথায় চায়ের কাপটা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যান লাটুবাবু। কালোর গায়ে একটা ধাক্কা লাগে। একটু সরে দাঁড়ায় কালো। ভ্রূক্ষেপও করেন না লাটুবাবু। হনহনিয়ে বেরিয়ে যান। ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে কালো।

"পাখি উড়ে গেছে খুড়ো, সাবি নেই।"

চমক ভেঙে যায় কালোর। রোজকার মতই বস্তির ছোকরাগুলো খুড়োকে খেপাচ্ছে। খুড়োর দিকে নজর পড়তেই আপনমনেই হেসে ফেলে কালো। কেমন মায়া হয় খুড়োকে দেখলে। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে রাখতেই প্রাণটা গেল খুড়োর। ইদানীং আবার চুলে রঙ মাখা ধরেছে। তা সাবি মেয়েটা এদিক দিয়ে ভালো। যদিও খুড়ো সব সময়েই সন্দেহ করছে কালোর সঙ্গে ওর বোধ হয় কোন রকম একটা লটঘট আছে। কালো যখন বাড়িতে থাকে না, অসুস্থ মাকে ওই সাবিই যা একটু দেখাশোনা করে। সেটুকুও সহ্য করতে পারে না খুড়ো। মায়ের কথা মনে হতেই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে কালো। দ্রুত পা চালায় বাড়ির দিকে।

কালো মেকানিক—ছায়াপথ

"ওরা একলাখের বেশী আর উঠছে না।"

"দিয়ে দাও।"

"কিন্তু সব মিলিয়ে তিন লাখেরও ওপর হবে।"

"জানি, ওই এক লাখই আজ আমার কাছে দশলাখ।"

চুপ করে থাকে এ বাড়ির সরকার হরিচরণ। এককথায় যে কেদারনাথ রাজী হয়ে যাবেন এটা সে ভাবতেও পারেনি। রামনগর পেপার মিলের মালিক জানকীপ্রসাদ অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে যাতে জমিটা পাওয়া যায়। লাখখানেকের ভেতরেকরে দিতে

পারলে পান খাবার জন্যে হরিচরণকে হাজার দশেকের মত দেবে সে, এই রকম একটা কথাবার্তা হয়েই আছে। লাখখানেক না হোক অন্ততঃ লাখদেড়েকের ভেতরে সে। রাজী করাতে পারবে কেদারকে ভেবেছিল হরিচরণ। কিন্তু! এখুনী একবার জানকীপ্রসাদকে ফোন করতে হবে হাজার দশেকে হবে না, আরও কিছু বাড়াতে হবে।

"কাগজপত্র সব ঠিক করে ফেল।"

"আজ্ঞে", ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল হরিচরণ।

টেবিলের ওপর রাখা সাদা পাথরের ঘোড়াটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কেদার। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে তেজী ঘোড়াটা। বিরাট একটা অজগর সর্বাঙ্গে পাকিয়ে ধরে রয়েছে। মুক্তি নেই মৃত্যুর হাত থেকে। সংসারে কারুরই নেই। আলবোলাটা মুখের কাছে টেনে নিলেন কেদার। জাল বুনতে বুনতে একবার থমকে দাঁড়াল মাকড়সাটা। কেমন একটা গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। ধোঁয়ার মেঘ জমেই চলেছে সিলিঙের আনাচে কানাচে।

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

সম্মিলিত একটা ক্রুদ্ধ গর্জনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল কেদারের ফাঁকা চিন্তাস্রোতের মাঝে। উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কেদার।

রাস্তা দিয়ে কিসের একটা মিছিল যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীপঙ্করের কথা মনে পড়ল কেদারের। ইদানীং ছোঁড়াটা কেমন যেন হয়ে উঠেছে। শুনেছেন কলেজেও নাকি কি সব ইজম-টিজম নিয়ে খুব মাতামাতি করছে। তা করুক, বয়সকালে ওরকম অনেকেই একটু আধটু করে থাকে। বেশী বাড়াবাড়ি না করলেই হল। মণিদির সঙ্গে সম্পর্কের ঘটনাটাও তাঁর অজানা নয়। মনে মনে একটু হাসলেন কেদারনাথ। তাঁরই নাতি তো! তাঁদের বংশে যৌবনে রক্তের জোয়ার কোনদিকে বয় তা তাঁর জানা আছে। যুগ বদলেছে ঠিকই কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি কতটুকু বদলেছে? তাদের সময়ে তাঁরা যেটুকু করতেন সন্তর্পণে, সমাজের বাইরে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা সেটুকু করে সমাজের মধ্যেই প্রগতির মুখোশ পরে।

দীপঙ্করের যেমন প্রয়োজন ইজমের, প্রয়োজন মণিদির, তেমনি কেদারনাথেরও প্রয়োজন ওস্তাদ দরবেশ খাঁ সায়েবের, প্রয়োজন আকাশবালার। আকাশবালার সঙ্গে একদিন দেখা না হলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। যৌবনের প্রয়োজন তাঁর অনেকদিন আগেই ফুরিয়েছে, যেমন ফুরিয়ে গেছে একদিন এ বাড়ির আভিজাত্য। তাঁর পরে এ বাড়ির কোন কিছুই আর থাকবে না তাও তাঁর অজানা নয়। তিন লাখের সম্পত্তি এক লাখেই চলে যাচ্ছে, যাক, হিসেব করে খরচা করতে যারা পারে তারা করে, তিনি পারেন না। এ বংশের কেউ কোনদিন হিসেব করে চলেনি তিনিও চলতে পারবেন না। খরচা করতেই তিনি জন্মেছেন খরচা করতেই তিনি ভালবাসেন। জীবনের আর কটা দিনই বা বাকী আছে। শুধু একমাত্র চিন্তা হয় উমার জন্যে। তাদের বংশের রস কেমন যেন খাপ খায়না মেয়েটাকে। ওর শান্ত গভীর চোখদুটোয় মাঝে কিসের মত রহস্য যে লুকিয়ে আছে সে একমাত্র ওই জানে।

বিশ্ব বুঝে উঠতে পারেনা কেমন করে এনক্ষী এমন

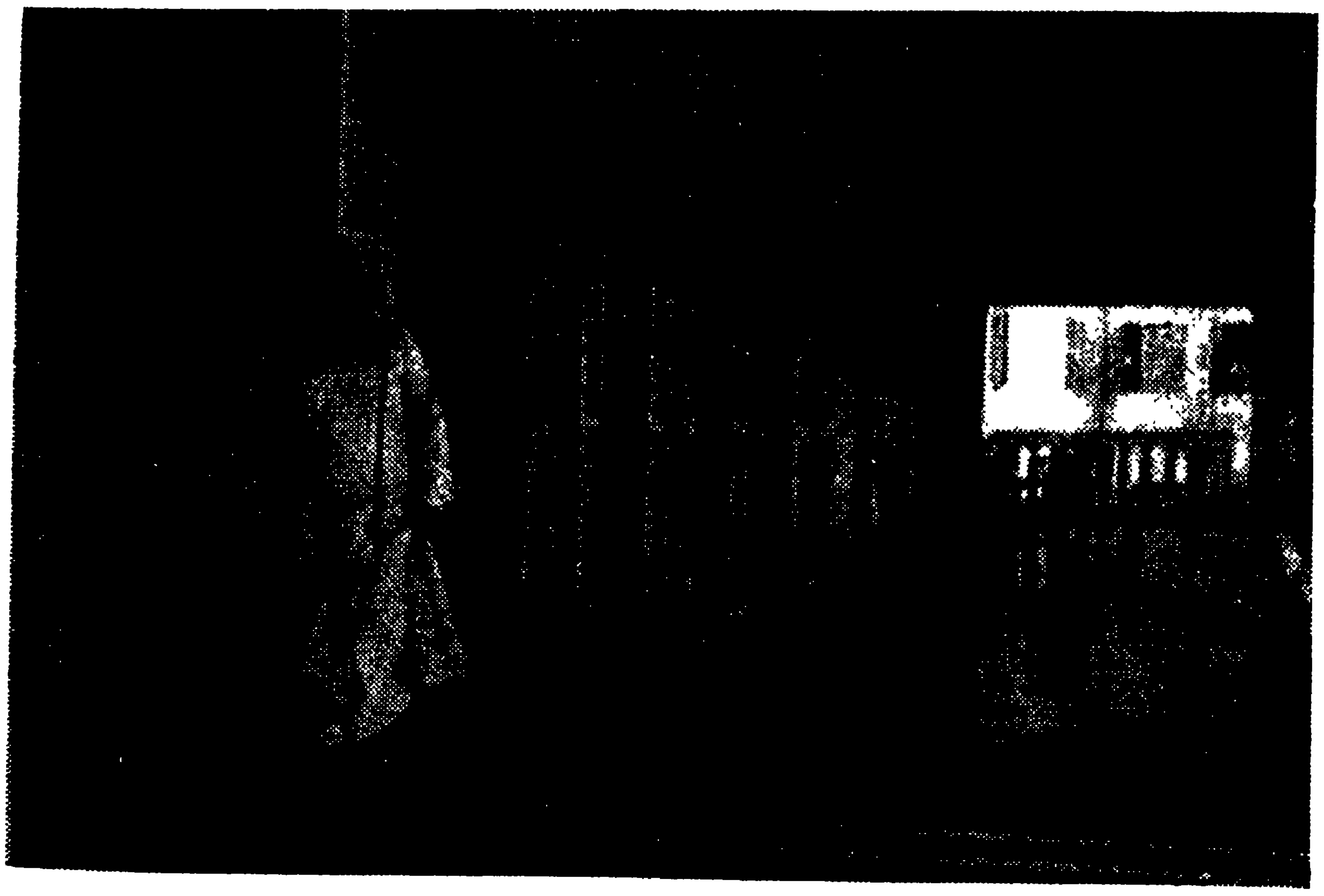

কেদারনাথ—'ছায়াপথ'

কাজ করতে পারল। জীবনের কি কোন মূল্যই এনাক্ষীর কাছে নেই ? প্রশ্ন করাতে এনা নিরুত্তর থাকে, দুচোখ বেয়ে শুধু জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। কি উত্তর বিশ্বকে দেবে এনা ? উত্তরটা যে তার নিজেরই জানা নেই। জীবনের কাছে সে যে কি চেয়েছে, কি পেলে সে সুখী হবে তা যদি সে জানতে পারত ? মাঝে মাঝে মনে হয় বাস্তবে সুখ জিনিষটার বোধহয় কোন অস্তিত্বই নেই, ওটা শুধুই কবির কল্পনা। জিত মিটার তার কাছে কি চেয়েছিল সে কোনদিন বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারেনা তার স্বামী ইন্দর সিং তার কাছে কি চায়! আজকাল নিজেকে বড় বেশী রকমের একা মনে হয়, সে যেন একটা বিরাট শূন্যতার মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মাঝে।

"জানলাটা খুলে দেবে বিশ্ব, একটু আকাশ দেখব।"

বিশ্ব উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দেয়। ঘর ভরে যায় আলোয় আলোয়। জীবনে আজ এই প্রথম অনুভব করে এনা সে বিশ্বকে ভালবাসে। কিন্তু? না, তা হয় না। বিশ্বকে সে তার নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াতে পারবে না। বিশ্ব সত্যের সন্ধানী, আলোর পূজারী, সামনের দিকে সে এগিয়ে যাক, এনা হারিয়ে যাবে বিশ্বর জীবন হতে সীমাহীন শূন্যতার মাঝে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ই বোধহয় নেই !

আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের আনাগোনা দেখতে দেখতে বিশ্ব ভাবে কত বিচিত্র পরিবেশে সে মানুষকে দেখল। কত বিচিত্র চরিত্র ভীড় করে আসে। মনে পড়ে রত্না বৌদি ও তার স্বামী মজুমদার সাহেবের কথা। সংসার আছে কিন্তু সব কিছুই সাজানো। কাগজের ফুলের মত, প্রাণ নেই। ঘর থেকে বাইরের টান বেশী। রত্না তার পুরুষ বন্ধু ও বান্ধবীর দল নিয়ে নাচে, গানে, পিক্‌নিকে ডুবে থাকে। মজুমদার সাহেব তাঁর ব্যবসা, অফিস, পার্টি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। বিশ্ব ভেবে পায়না কেন এমন হয় ? কেন এমন বিশৃঙ্খলার জীবন ? উৎসব ওদের বাইরেই, অন্তরের আলো নিভে গেছে অনেকদিন আগে, তাই মনের ভেতরটা ডুবে গেছে চির অন্ধকারে।

আর এক জীবনের মিছিল বিশ্বর মনে পড়ে যায়। মেস, পাইস্ হোটেল, মেসের পিছনের বস্তি। অদ্ভুত চরিত্রের ভীড়। লাটুবাবু, কালোদা, সাধুবাবু, সরলা ঝি, গোকুল, সাবিত্রী, খুড়ো, এরা যেন তার কাছে এক একটি বিস্ময়। মেসের বাসিন্দা গোকুল নিজের অভাবের কথা বলে বিশ্বর কাছে টাকা ধার করে। গভীর রাতে মাতাল হয়ে সে ফেরে। সবায়ের চোখ এড়িয়ে পাইস্ হোটেলের ঝি সরলার সঙ্গে সাধুবাবুর প্রণয় অভিসার। অন্ধকার রাতে নির্জন পথে সরলা ঝি বিশ্বকে তার ঘরে আমন্ত্রণ জানায়।

বিরাট শহরের বিরাট শূন্যতা বড় প্রকট হয়ে ধরা পড়ে বিশ্বর চোখে। হৃদয়বৃত্তির বালাই বলতে কোন কিছু নেই। ভালবাসার মূল্য কেউ দেয়না এখানে। সবটাই অভিনয়। আন্তরিকতা, বলতে কোন কিছু নেই এখানে তাই কাছে থেকেও প্রত্যেকেই অপরজন হতে শত যোজন দূরে। মাঝখানের দূরত্বটা খুব বেশী বলেই প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, বড় বেশী একা বোধ করে। সবাই শান্তির খোঁজে পাগলের মত ছুটে মরছে, অথচ শান্তি যে কি সেইটাই কেউ জানেনা!

……তবুও তো সবার উপরে মানুষ সত্য, ভাবে বিশ্ব।

ইদানীং ষ্টুডিওর হাওয়া খুব থমথমে। দীর্ঘদিন ধরে সিনেমা হাউসগুলোতে একটানা ধর্মঘট চলছে। স্বল্প দু'একটি ছবি ছাড়া প্রায় সব ছবির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। টাকার আমদানী বন্ধ, ফলে ছবির কাজকর্মও সব বন্ধ। সবকটা ষ্টুডিওতে নেমে এসেছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

ল্যাবরেটরীর ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম এ অবস্থা আর কতদিন চলবে! কোন আশার আলো কোনদিকে দেখা যাচ্ছে না, এতবড় একটা ইণ্ডাষ্ট্রীর—

চমকে উঠলাম। সম্পাদক গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় কখন এসে পাশে বসেছেন জানতেই পারিনি।

দেশলাই চাইছিলেন গোবিন্দবাবু।

দেশলাইটা এগিয়ে দিয়ে বললাম—"ষ্টুডিও ও লেবরেটরী মহলে বিশেষ তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছিনা, আপনি এ অসময়ে এখানে একা কি করছেন?" গোবিন্দ-বাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন "একা নই, ওপরের ঘরে বসে কাজ করছিলাম।"

"কোন্ ছবির?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ছায়াপথ", মেজদার ছবি" উত্তর এল।

"কে কে আছেন ছবিতে?"

"প্রশ্নটা আপনার কিন্তু একটু বোকার মত হয়ে গেল।"

"কেন?"

"কে কে নেই জিজ্ঞেস করলে হয়ত একটা উত্তর দিতে পারতাম, কে কে আছেন এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং মেজদাও দিতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে আমার।"

কৌতূহলটা বেড়ে গেল। "লোক কেমন?" প্রশ্ন করলাম।

"কার কথা বলছেন?"

"মেজদার।"

"পরিচয় নেই আপনার সঙ্গে?" প্রশ্ন করলেন গোবিন্দবাবু।

মাথা নাড়লাম। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন গোবিন্দবাবু। "আসুন আমার সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবছিলাম মেজদার কথাই। অনেকদিন ধরেই পরিচয় করবার ইচ্ছে ছিল, সুযোগ হয়ে ওঠেনি। কি রকম লোক কে জানে? কেউ বলেন সুবিধার নয়, কেউ কেউ বলেন একেবারে যিশুখৃষ্ট। শুনেছি মেজদা নিজেকে শিশু ভোলানাথ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এ হেন লোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার সময়ে বেশ একটু Nervous হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুটো কারণে পরিচয় করবার লোভটা সামলাতেও পারছিলাম না। এক মেজদার অনেকগুলি স্থিরচিত্র দেখবার সৌভাগ্য একদা আমার হয়েছিল। সেদিন প্রথম জানতে পেরেছিলাম স্থিরচিত্র দিয়ে কথা বলান যায়। দুই, মেজদার প্রথম চলচ্চিত্র "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। অবাক হয়েছিলাম সেদিন। একটি লিরিকে ছবি কি রকম হতে পারে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম স্থিরচিত্র এবং চলচ্চিত্র দুটোতেই সমানভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন মেজদা। যদিও "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেনি। কিন্তু তাতে কি যায় আসেনা। "জেমস্ বণ্ড" মার্কা ছবি প্রচুর পরিমাণে ব্যাবসায়িক সাফল্য লাভ করে কিন্তু তাতে কোন রুচিশীল মানুষের মনের বিরোধ কোনদিন মেটেনা।

পৃথিবীতে সামান্য কয়েকজন চিত্রকর আছেন যাঁদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ছবি আঁকা, ব্যবসায়িক সাফল্য ছবি লাভ করবে কি না তা নিয়ে তাঁরা কোনদিন মাথা ঘামান না। মেজদা হচ্ছেন সেই দলের।

গোবিন্দবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। চেহারা দেখে একটু অবাক হলাম। এই নাকি শ্রীভূপেন্দ্রকুমার সা

ওরফে মেজদা! বেঁটে খাট একটুখানি মানুষ, পালোয়ানি ছাঁটে চুল কাটা, পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি ও সার্ট। কণ্ঠস্বর মেয়েদের মতই পাতলা। চশমার নীচে একজোড়া বিরাট গোঁফ। ওইরকম গোঁফ ফিল্মলাইনের কারুর আছে বলে আমার জানা নেই। শুনলাম মেজদার চাইতেও মেজদার গোঁফের খ্যাতি অনেক বেশী।

"আগের ছবিতে সব নতুন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করেছিলেন, এবারে করলেন না কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আগের ছবিতে খুব বেশী চরিত্রের ভীড় ছিল না। এবারের ছবির পটভূমিকা হচ্ছে শহর কলকাতা। প্রচুর চরিত্র। নতুন শিল্পী খুঁজেছিলাম কিন্তু মনের মত

স্যুটিং-এর সময় এন, বিশ্বনাথনকে চরিত্রটি ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন মেজদা।

পাইনি। তাছাড়া, একটু হেসে বললেন, আপনারাও তো ছবিতে বক্স অফিস আর্টিষ্টই খোঁজেন!"

নিঃশব্দে হজম করে বললাম "এবারের ছবিতে কে কে আছেন?"

"চলুন দেখবেন" বললেন মেজদা।

"কোথায়? প্রশ্ন করলাম।

"প্রজেকসান্ থিয়েটারে।"

একটু ইতঃস্তত করছিলাম। হাজার হলেও আমি একজন সামান্য চিত্র সাংবাদিক। ছবি শেষ হবার আগে প্রজেকসান্ দেখাটা উচিত নয়।

প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেলেন মেজদা প্রজেকসান্ থিয়েটারে। ছবি দেখার পর প্রশ্ন করলাম "সঙ্গীত পরিচালনা কে করছেন?"

"রবিশঙ্কর", বললেন মেজদা।

প্রজেকসান্ থিয়েটারে বসে গান শুনতে শুনতে

"ছবি কতদূর হোল?" প্রশ্ন করলাম।

"তা প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেছে" বল্লেন মেজদা।

"আর কতদিন লাগবে শেষ হতে?"

তীব্র একটা যন্ত্রণার ছায়া ভেসে উঠল মেজদার চোখে। "ঠিক বলতে পারছি না" একটু সামলে নিয়ে বললেন।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সহকারী পরিচালক শিবশঙ্করবাবু। একটু ম্লান হেসে বললেন "কি অবস্থার মধ্যে যে ছবি করতে হচ্ছে—"

থামিয়ে দিয়ে মেজদা বললেন "ওটা কিছু নয়, আলো ও অন্ধকার নিয়েই জীবন। ছবি আমাকে করতেই হবে; আমি মানেই ছবি, ছবি মানেই আমি। জীবনে শত্রু যেমন প্রচুর পেয়েছি বন্ধুও তেমন প্রচুর পেয়েছি। ধরুন এই ছায়াপথের কথাই। শিল্পীরা ও টেক্নিসিয়ানরা সহযোগিতা না করলে সম্ভবই হোত না।"

আমিও ভাবছিলাম এরকম মাদকতাভরা সুর দেওয়া কার পক্ষে সম্ভব হতে পারে? গান বলতে অবশ্য তিনটি। একটি ধ্রুপদ, গেয়েছেন জয়কৃষ্ণ সান্যাল মশাই, অপরটি কোরাস, লীড করেছেন মানবেন্দ্র মুখার্জি। শুধু তাই নয় সঙ্গে বাজিয়েছেন ভি, জি, যোগ ও তুষারকণা পাল। আরও একটা মজার ব্যাপার, কোরাস গানটি লিখে দিয়েছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর নিজেই, অপর আর একটি গান গেয়েছেন নীতা সেন লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছায়াপথের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই। কোন Studioতে Shooting করছেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন ষ্টুডিওর চৌহদ্দির মধ্যে শহর কলকাতার নগ্নরূপটি ধরা যাবে বলে মনে হয় না, তাই ষ্টুডিওর বাইরে যখন যেখানে প্রয়োজন হয় Shooting করেন। আমারও তাই মনে হয়েছিল কারণ প্রজেকশান্ দেখতে দেখতে এটুকু বুঝেছিলাম যে ছায়াপথের কাহিনী বাঁধাধরা ছকে ফেলা গল্প নয়। এটাকে চরিত্র-চিত্রণ বলা যেতে পারে—Cross Section of Society, এই সব চরিত্রগুলি আমাদের আশে পাশে সব সময়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কর্মজ্ঞানের ছায়াপথ ধরে এগিয়ে এলে সাধারণ অসাধারণ সমাজের মধ্যেই কিছু না কিছু বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যাবে। আজকের ভগ্নাংশ মানুষের প্রাত্যহিকতার মাঝে বিচিত্র চরিত্র সব বাসা বেঁধে আছে। বৃহত্তর সমাজ তার কতটুকু খোঁজ রাখে! কিন্তু সবটাই সত্য, চরম বাস্তব, ভয়ংকর। ভগ্নাংশ মানুষ খুঁটিয়ে এর বিচার করে না, মূল্যও দেয় না। অথচ মূল্যায়নের সময় আজ এসে গেছে।

শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন মঞ্জু দে (মণিদি), বিকাশ রায় (প্রকাশ), মাধবী মুখার্জি (উমা), এন, বিশ্বনাথন (মিঃ মজুমদার), কণিকা মজুমদার (রত্না), সুস্মিতা সান্যাল (এনাক্ষী), শেখর চট্টোপাধ্যায় (কালো মেকানিক), নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (লাটুবাবু), দিলীপ রায় (জিত মিটার), সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (সাবিত্রী), প্রমথনাথ রায় (কেদারনাথ), শিবশংকর (দীপঙ্কর), অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্ব), আরতি দাস (সরলা), শৈলেনবাবু (লাহাবাবু), রায়বাবু (খুড়ো), অলকা গাঙ্গুলী (শকুন্তলা) এবং অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার ও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে হয়ত দেখা যেতে পারে বসন্ত চৌধুরীকে।

"যতটা দেখলেন কেমন লাগল?" জিজ্ঞেস করলেন শিবশঙ্করবাবু।

আমি উত্তর দেবার আগেই গোবিন্দবাবু বললেন "কেমন লাগল মানে? এ ছবি হিট হবে, হিট হতে বাধ্য।"

গোঁফের আড়ালে ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে মেজদা প্রশ্ন করলেন 'কি করে বুঝলেন?"

সিগারেট ধরিয়ে গোবিন্দবাবু বললেন "কারণ হিট্ ছবি ছাড়া আমি কাজই করি না।"

দরাজ গলায় প্রাণখোলা অট্টহাসি হেসে উঠলেন শিশু ভোলানাথের ছদ্মবেশে সান্যাল মশাই। —শ্রীকান্ত

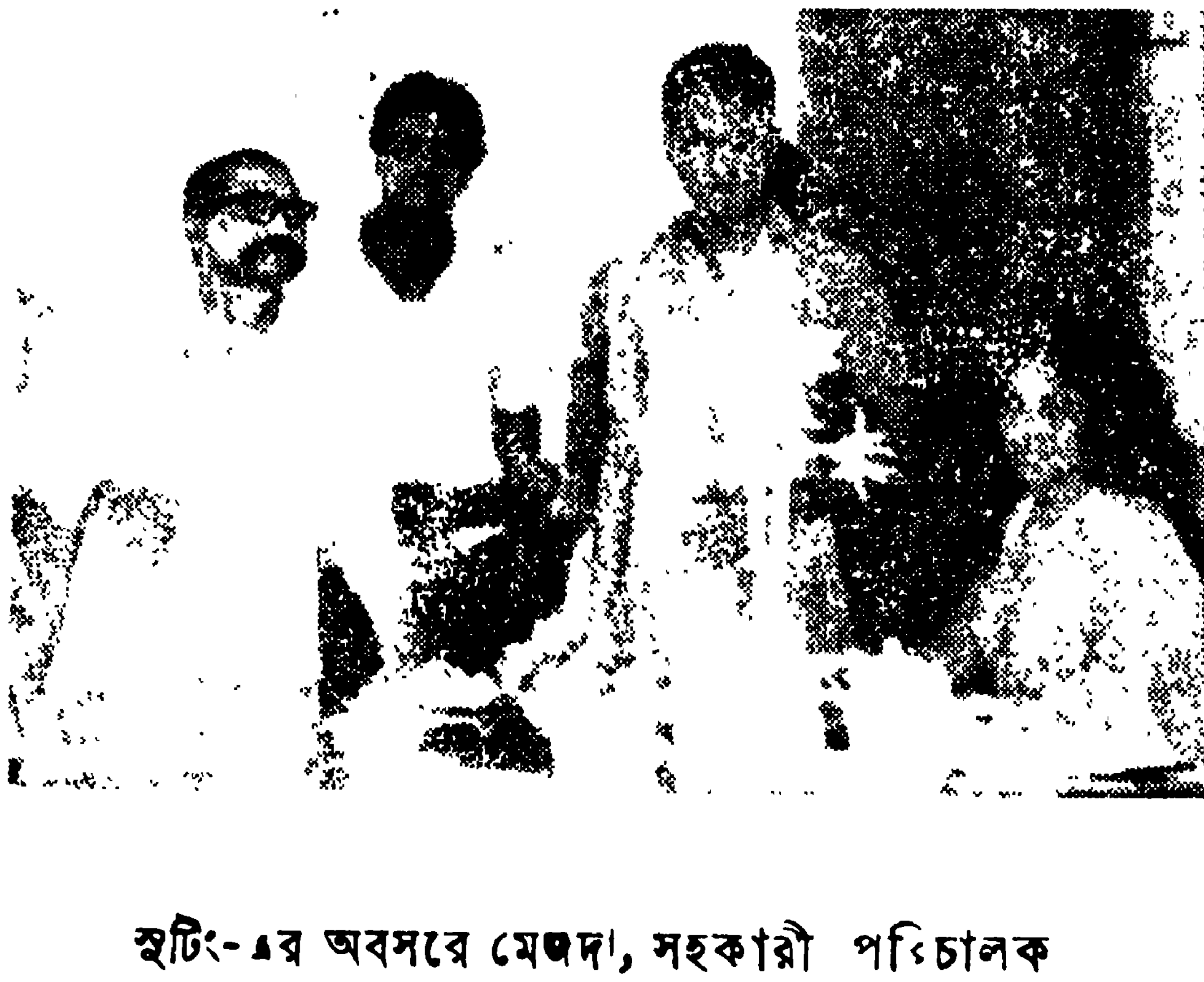

শুটিং-এর অবসরে মেজদা, সহকারী পরিচালক শিবশঙ্কর, শব্দযন্ত্রী সুজিত সরকার ও কণিকা মজুমদার

সংগীত গ্রহনের সময় জনৈকবংশী শিল্পীকে তালিম দিচ্ছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

বিমলকুমার সুর

নিয়ে প্রতি মাসের জাতকের বা জাতিকার জ্যৈষ্ঠমাসটা মোটামুটি কেমন যাবে তা বলা হল।

বৈশাখ—এই মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের জ্যৈষ্ঠমাসের ফলাফল—অনেক সুবিধা ও সুযোগ পাবার কথা। অবশ্য কাজের দিক্ দিয়ে খাটুনি কম হবেনা। অনেক কিছুই প্রয়োজন মত অধিক পরিশ্রম ও তৎপরতার সহিত করতে হবে। রোজগার খারাপ হবেনা। এক এক সময় অবশ্য কাঠখড় পোড়াতে হবে কিছুবেশী এবং প্রয়োজন হলে শত্রুর মুখে ছাই দিয়েও টাকা আনতেহবে। কাজেই অর্থ রোজগারে উদ্বেগ অপরিহার্য, যদিও আয় ভালই হবে। কিন্তু আয় করলে কি হবে? রাঘব বোয়াল শনি আর রাহু আয় খেয়ে আরো ঘরের না বের করে দেয় এই ভয়।

নারী হলে পুরুষ হলে স্ত্রী এবং পুরুষ কথা শুনবে অর্থাৎ বশ্য থাকবে এবং ভাল করে বোঝালে তাঁকে দিয়ে অনেক কার্য্য উদ্ধার করে নেওয়া যেতে পারে।

মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল যাবে না। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা এবং উদ্বেগ কিছুটা দেখছি। খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখা দরকার। নচেৎ পেটের গোলমাল, পেট-ফাঁপা ইত্যাদি হঠাৎ হতে পারে। কর্ম্মে বদলীর আশঙ্কা রয়েছে। নচেৎ কর্মে ঝঞ্ঝাট ভোগ চলবে অনেক।

জ্যৈষ্ঠমাস—জ্যৈষ্ঠ মাসে যাঁদের জন্ম তাদের জ্যৈষ্ঠমাস মন্দ কী? কাজ কর্ম ভালই চলবে নিজের সাহস ও তৎপরতার অভাব হবেনা। গৃহ, বাটী, সংসার সম্বন্ধে যে কোন অসুবিধা হোক্ না কেন, কিছু গোছ-গাছ করে ফেলতে পারবেন। আপনার সদ্ব্যয় হবে। কাজেই ভাল করে জমাতে না পারলেও দুঃখ করার কিছু নাই। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এদের জন্য খরচ না করে উপায় নাই। খরচ যাইই করুন আয় ত ভাল দেখি। হঠাৎ হঠাৎ মোটা টাকা এসে পড়তে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য ভালই চলবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে বেশী। গৃহ, বাটী মাতা, বন্ধু, পৈতৃক বিষয়-আশয়ের জন্য উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা প্রভৃতি বোধ করবেন মাঝে মাঝে, এই সব বিষয়ে কোন crisis এসে পড়তে পারে। এই মাসে সন্তানাদি সংক্রান্ত উদ্বেগ অশান্তি চলতে থাকবে। এদের খুব কাবদায় আনতে পারবেন না। পেটের দিকটা নজর রাখবেন। প্রেমের ব্যাপারে সাবধানে অগ্রসর হবেন। নচেৎ কোন ধাক্কা এসে পড়তে পারে।

আষাঢ় মাস—আপনার যদি এই মাসে জন্ম হয় ত জ্যৈ মাস কেমন যাবে শুনুন।

আপনি ভাল আয় করতে পারবেন। কিন্তু দেখছি আয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আপনি ব্যয় করে বসে আছেন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, মাতা এবং নিজের জন্যই ব্যয় হয় দূরে যাবার জন্য মন ছট্‌ফট করবে। নচেৎ দূরে বদ হয়ে ব্যতিব্যস্ত বোধ করবেন। যাই হোক আপনা স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকবে এটা সুনিশ্চিত। ক ও গৃহ ব্যাপারে অনেক ঝঞ্ঝাট ও উদ্বেগ ভোগ করছে অনেক মাস থেকে এবং এখনও কিছুকাল চলবে কর্ম্ম ব্যাপারে গুটিয়ে না নিয়ে প্রসারের কথা ভাবু দেখবেন অধিকতর যোগাযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হ

পড়ছে। মাতা-পিতার স্বাস্থ্যের দিকটা ভাল দেখছিনা। সেই কারণে উদ্বেগ এখনও চলবে। বুদ্ধি ভালই দেখছি। বিদ্যালাভে বাধা অনেক। মুখস্থ করবার চেষ্টা করবেন না। বুঝে পড়বেন, ফল পাবেন বেশী। আপনার মাথায় দায়িত্ব অনেক। কাজেই শক্ত হবেন এবং ধীর স্থির হয়ে অগ্রসর হউন।

শ্রাবণ—আপনার ত শ্রাবণ মাসে জন্ম। কাজেই আপনার জ্যৈষ্ঠ মাসে কেমন যাবে মিলিয়ে নিন্। কর্ম্মে সুখ সুবিধা দেখছি। মান যশঃ পাবেন। টাকাকড়ি ত ভাল আয় হবে। উদ্যম থাকবে এবং তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন। সন্তান সম্বন্ধে চিন্তান্বিত থাকবেন দেখছি। যদি বিবাহ না করে থাকেন ত প্রণয়ের যোগাযোগ দেখছি। আর আপনি যদি ধর্ম্মমার্গের লোক হন ত এ বিষয়ে মনটা গভীরতার দিকে নিয়ে যাবে। যদি কবি বা সাহিত্যিক হন ত প্রাণ খুলে লিখুন। কল্পনার অভাব হবে না। বৈজ্ঞানিক হলে উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। যদি ব্যবসাদার হন ত কর্ম্মের প্রসারের চেষ্টা করুন। চাকরী করলে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালাতে পারবেন। উকীল হলে আপনার মুখের সামনে দাঁড়ায় কে?

আত্মীয়স্বজনের দিক্ থেকে তেমন সুখ নাই। কোন কাগজপত্র স্বাক্ষর করলে ভাল করে পড়ে করবেন। বাস্থতে কোনরূপ বাধা, অসুবিধা বা আঘাত-প্রাপ্তি হতে পারে। সন্তান থাকলে তাদের জন্য মাঝে মাঝে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।

ভাদ্র—আপনার যদি ভাদ্র মাসে জন্ম হয় জৈষ্ঠ মাসের ফলাফল এইরকম ভোগ হবে। কর্ম্মে যথেষ্ট যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারবেন। কর্ম্মেই মনটা ব্যাপৃত থাকবে বেশী। Executive job যাঁরা করেন তাঁদের পক্ষে খুব ভাল। স্থির ও সদ্‌বুদ্ধি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ভাগ্যোন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ আসবে। টাকা পয়সা ভালই রোজগার করবেন এবং আপনার পরিবেশ শান্ত ও সংযত থাকার কথা। কিন্তু তবু দেখছি আপনার অর্থচিন্তা, অন্ন-চিন্তা নয়, চমৎকার। এক এক সময় বোমা বিস্ফোরণের মত আপনার অর্থ বিস্ফোরণ হবে। সেই জন্যই টাকার চিন্তা চালু থাকবে। আপনি যদি বিবাহিত হন আপনার স্ত্রীর বা স্বামীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল দেখিনা। তাঁর খরচের অন্ত নাই। তাঁর মেজাজ যা দেখা যায়, তাতে পরস্পর মানসিক শান্তির অনুকূল নয়। আপনি ব্যবসায়ী হলে, আপনার অনেক দিগদারী যাচ্ছে বলে মনে হ। প্রণয় ব্যাপারে পারতপক্ষে এগোবেন না। জমিজমা বাড়ীঘর সম্বন্ধে যদি কিছু করার বাসনা থাকে, একটু আগ্রহ করে এগিয়ে যান্।

আশ্বিন আপনি যদি আশ্বিনের লোক হন, আপনার জ্যৈষ্ঠ মাসটা কেমন শুনুন। বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেলে ছাড়বেন না। মৃতের সম্পত্তি আপনার পাবার কথা থাকলে ভাল যোগাযোগ উপস্থিত হবে। ধর্ম্মভাবের ইচ্ছা প্রবল হলেও, তেমন অনুশীলন করতে পারবেন না। সেইজন্য দরকার, এই বিষয়ে বেদ ও অনুরাগ বেশী। আপনার ত দুশ্চিন্তা চলছে অনেক দিন থেকে। সব কাজেই দেখছেন বাধা। আত্মীয়স্বজন নিয়ে মনটা অনেক সময় উদ্বিগ্ন থাকবে। নিজের বিক্রম বা বাহুবল দেখাবার কোন প্রয়োজন নাই। ধীর স্থির থাকুন তাতে বেশী লাভ হবে। আপনার বিবাহ বা প্রণয় ব্যাপারে বিঘ্ন-বাধা অনেক। মাতা, গৃহ, সংসার, বন্ধুবান্ধবের জন্য ব্যয় অনেক। এঁদের জন্য মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে পড়তে হবে। যাই করেন, হঠাৎ মাথা গরম করে অনর্থসৃষ্টি করবেন না।

কার্ত্তিক—আপনার যদি কার্ত্তিক মাসে জন্ম হয়ে থাকে তাহলে জৈষ্ঠ মাসের ফলাফল এইরূপ। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে সুবিধা আছে। পরের সঙ্গে মেলামেশা করে আনন্দ পাবেন এবং লাভবান্ হবেন। স্ত্রী বা স্বামী অধিক অনুরাগী—হবার কারণ রয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল না থাকারই কথা। তাঁর কতকটা উদ্বেগ, অশান্তি এবং দায়িত্ব থাকবে। অর্থ বিষয়ক ফল মোটামুটি। অ ও কুটুম্ব চিন্তা অধিক থাকবে। আপনার চোখ বা গলা সম্বন্ধে যত্নের অবহেলা করবেন না। সাংসারিক ব্যাপারে গুছিয়ে নিতে কিছু সময় লাগবে। তবে গৃহের অদল-বদল প্রসার ইত্যাদি যা করণীয় মনে করছেন, চেষ্টা করে থাকুন বুদ্ধিকে স্থির রাখবেন। ঝগড়া-ঝাঁটি বাড়িয়ে ফেলবেন না রাগ বা তেজের বশীভূত হয়ে। আপনার ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক, চেষ্টা অনেক করেও সামলে উঠতে পারবেন না খরচ কমাতে। মাতুল ও পিতৃবাড়ে

ব্যাপারে অশান্তি ঝঞ্ঝাট এখনও চলবে।

অগ্রহায়ণ—আপনার এই মাসে জন্ম হলে জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলাফল শুনুন। লোকের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেড়ে যাবে। ব্যবসা প্রসারের চেষ্টা করলে ভালই হবে। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝগড়া-ঝাঁটির বা বাগ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হতে পারে। সেটা করে লাভ নাই, কারণ তাতে বৃথা শত্রুবৃদ্ধি হবে। মাতুলদের ভাল যাবে এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে আপনার লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকার কথা। তবে অধিক ভোজন করে বা অনিয়ম করে পেটে গোলমাল বাধাবেন না। লেখাপড়ার কিছু সুযোগ থাকলেও মনটা বসানো শক্ত হবে। সন্তানাদির বিষয় সতর্কতা রেখে যান। উপযুক্ত যত্ন নিলে তাঁদের একজনকে লেখাপড়ায় বা কর্মজীবনে ভাল করে দাঁড় করাতে পারবেন।

পৌষ—আপনার পৌষ মাসে জন্ম হলে জ্যৈষ্ঠ মাসের ফল শুনুন। আপনার আয় ভাল হবে। শুভ বুদ্ধি থাকবে এবং তার সাহায্যে অনেক শক্ত বা দুষ্কর কাজও উদ্ধার করতে পারবেন। আপনার সঙ্গে দুষ্টুমি করলে কারুর সুবিধা হবে না অবশ্য কর্ম ব্যাপারে উদ্বেগ ঝঞ্ঝাট চলবে। মাতা পিতার দিকটা ভাল নয়। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা এড়াতে পারবেন না। সন্তানাদির ব্যাপারে অনেকটা Control আনতে পারবেন তাদের দিকে খেয়াল রাখুন, বেশী ভাল হবে। আপনার ধর্মভাব থাকবে? কিন্তু গৃহ ও কর্মের চাপে সেটাকে অনুশীলন করতে কতটা পারবেন তা নির্ভর করে আপনার নিজের চেষ্টার উপর।

মাঘ—আপনার যদি মাঘ মাসে জন্ম হয় তাহলে জ্যৈষ্ঠ মাসের ফল শুনুন। জ্ঞাতি-আত্মীয় ভাই বোনেদের অশান্তি চলবে। তাঁদের কথা আপনি ভাববেনও অনেক। পারিবারিক ব্যাপারে আপনার অভাব না থাকার কথা। উপযুক্ত সাহায্য সুবিধা এসে পড়বে।

কিসে ব্যবসা বা Contrack থেকে লাভ হয় এই চিন্তাই আপনার বেশী। দেহ পীড়া দেখছি। সন্তানদের ব্যাপারে কিছুটা সুব্যবস্থা হবে।

ফাল্গুন—আপনার যদি ফাল্গুন মাসে জন্ম হয় তাহলে ফল এইরূপ। ব্যবসা বা Profession এর দিকে ভালই। অর্থ রোজগার ভালই করবেন, কিন্তু যা খরচ তাতে মনে হবে যে টাকা পাচ্ছেন তাতে কিসসু হচ্ছে না। আপনার কর্মচিন্তা প্রবল। তাতেই ডুবে যান ভালই হবে। আপনার ভাই-বোনেদের কিছু সুবিধা হবার কথা। ধর্মচিন্তা বাড়িয়ে যান আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারবেন। গৃহ বাটী সংক্রান্ত কিছু সংস্কার বা উন্নতি ইত্যাদি করবার ইচ্ছা থাকলে সেদিকে চেষ্টা করুন। পিতার স্বাস্থ্য ভাল না থাকার কথা।

চৈত্র—চৈত্র মাসে আপনার জন্ম হলে জ্যৈষ্ঠ মাস এই রকম কাটবে। পয়সা কড়ির দিকটা ভাল অর্থাৎ অভাব হবে না, প্রয়োজন মত ঠিক সময়ে জুটে যাবে। উদ্যম বাড়িয়ে যান, ভাগ্যোন্নতি হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তার পক্ষেও ভাল। কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিকের বদলের ফলে, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কিছু কিছু বাধা পাবেন। স্ত্রী বা স্বামীর সম্বন্ধে উদ্বেগ বেড়েছে, কমেনি। তাঁর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। তাঁর পরিস্থিতি এমন চাপের মধ্যে আছে যে সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। এ থেকে মুক্তির পথ শুধু ধৈর্য্য এবং জগতের ধারা কি তা বুঝবার চেষ্টা করা।

ব্যবসা-বানিজ্যে গোলযোগ আজকের নয়! চলছে অনেকদিন থেকে। বরং কয়েক মাস হোল নূতন ফ্যাসাদ জুটেছে। স্থির থাকুন, এবং প্রয়োজন মত শক্ত হউন। আপনি যদি সত্যই মনে করেন ধৈর্য্য ধরবো। অনেক বিপদ আপদ সঙ্গে সঙ্গেই মিটে যাবে। স্বামী বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। তাঁর দুশ্চিন্তা ও স্নায়ু উত্তেজনা তাকে তটস্থ করে রেখেছে। আপনিও তার অংশ কিছুটা গ্রহণ করছেন, দেখছি। আপনার কাছে কর্তব্য আগে। আপনার রবি রাশিতে দুই-ই চণ্ডালের বাস। কাজেই ব্যবস্থার মার্জিত রাখা শক্ত হবে। এবং যতটা নিষ্ঠা পালন করবেন তার কিছু অংশ ম্লেচ্ছের সংসর্গে এসে ভাব ও ধারার দুইয়েরই অভাব ঘটবে। দরকার হলে লড়ে নিজের অধিকার খাটিয়ে নেবেন।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈশাখ—১৩৭৫

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

মুক্তির স্বরূপ ও আনন্দরূপ

জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী

দুষ্টু খোকনকে মা বেঁধে রেখে, গৃহকর্মে মন দেন। স্বকর্মে,একান্ত নিরুদ্বেগে নিয়োজিত হ'ন। না হলে, খোকন বন্ধন মুক্ত থাকলে, সংসারকে তছনছ করে দেবে, সব কাজে, সুশৃঙ্খলায় অনর্থ ঘটাবে। ফলে, নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি! তাই তাকে সাময়িককালের জন্য স্থিতাবস্থায় বা বন্ধনাবস্থায় রাখা হয়।

তেমনি বিশ্বকর্মাও, বোধ করি তাঁর সকল কর্মের সুবিধা বিধানের জন্য ভুবন সংসারের অস্থির চঞ্চল মানব কুলকেও, সময় সময় বন্ধনের দুঃসহতা প্রদান করে থাকেন। 'সংসার' নামক ক্ষুদ্র আর এক বিচিত্র জায়গায় নানারূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সুকঠিন আবদ্ধজালে—মানব-কুলের মুক্ত প্রাণ মনকে—সময়কালীন বিশেষে—বন্দীদশায় রেখে, তার কোন একটি গোপন উদ্দেশ্যকে সফ করে তোলেন। বন্ধনকালীন সময়ে খোকন যেমন—ছাড়া পাবার আশায় আকুল রবে কাঁদতে থাকে তেমনি আমাদেরও আবদ্ধদশার—দুঃসহ সেই কালক্ষয়ে—আকুল আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে।

আর যখনই মুক্তি প্রাপ্তি সুরু হয়—তখন মু আনন্দকে যেন চরম উপভোগ করা যায়—অফুর আবেগে। মুক্তির সেই অপূর্ব আনন্দ সমগ্র জীবনভা মথিত হ'য়ে ওঠে অমৃত সুধায়। সেই মহাস্বাদপূর্ণ সু পান করে যেন জীবনানন্দকে উপলব্ধি করা হয়। আপনাকে সর্বব্যাপী সর্বভাগে সুবিস্তৃত করে তোলা যায়—সুবিশা আনন্দ আঙিনায়।

আর এইরূপে, আনন্দময় পরমেশ্বর—ক্ষুদ্র সত্তা বিশিষ্ট আত্মার আধার থেকে—পরমাত্মারূপে বিরাজিত হয়ে ওঠেন—পরলোকে সমুজ্জ্বল শোভায়। দীপ্তিমান অত্যাশ্চর্য আলোকোজ্জ্বল—দীপশিখার ন্যায় ভাস্বর মানব রূপে। মুক্তির আনন্দরূপই হোল, পরমানুভূতি। পরমানন্দের পরম প্রকাশ। এইরূপে ধরা যাক্—মুক্তির স্বরূপ কি? তারপর তো মুক্তির আস্বাদন!

প্রাথমিকভাবে, বন্ধনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিলে, মুক্তির মাহাত্ম্যকে মর্যাদাদান করা যায়। বৈচিত্র্য আনন্দের নিমিত্ত সৃষ্টিকর্তার যদি এই ধরণের নিয়মতান্ত্রিকতা সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে নিয়ন্তার নির্দেশে, সময় বিশেষে নিরুদ্ধদশায় মুক্তির আনন্দ বিধানের জন্যই নিয়ন্ত্রিত। এই সময় সন্ধিক্ষণে, মুক্তির সজ্ঞানকে উপলব্ধি করা যায়। অন্ধকারে কিছু সময় অবস্থান লাভ করে আলোর প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হ'লে তার মহত্তীরূপ—যে ভাবে প্রকাশিত হয় তেমনি বন্ধনের দুঃসহতা থেকে সহসা মুক্তিলাভও আনন্দময়ের আস্বাদন করার আনন্দদায়ক প্রকৃষ্ট উপায়। মুক্তির স্বরূপ ব্রহ্মানন্দের আনন্দরূপ। মুক্ত দেহ মন না হ'লে, আপ্লুত আবেগ না হ'লে, মুক্ত উপলব্ধি না হ'লে পরমানুভূতি লাভ হয় না।

অসীম বিশ্ব চরাচরে মুক্ত প্রাণ মন বিচরণ না করলে মুক্তিদাতাকে স্মরণ করা যায় না। সর্ব অবস্থায় মুক্তির একটি তাৎপর্যমূলক উদ্দেশ্যজনিত কারণ আছে গভীরে। সর্বব্যাপিতার সুস্পষ্ট অর্থ জড়িয়ে আছে। মানবদেহের আবদ্ধে ক্ষুদ্রাত্মা যখন বন্দীদশা প্রাপ্ত তখন পরমাত্মার সম্যকরূপ দর্শন লাভ হয় না। ক্ষুদ্র আত্মার মুক্তি হলেই, পরমাত্মায় পরমানুভূতি জাগে। আর আত্মার মুক্তি তো বিলয় নয়, জীবনানন্দ লাভ। ক্ষুদ্র চেতনা থেকে, পরম চেতনায়, উত্তীর্ণ হওয়ার স্তরেই—প্রকৃত মুক্তি লাভ, এবং এই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হয়—সহজিয়া বিকাশ সাধনে। স্ব-ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ সর্বকঠিন দশায় আত্মোৎসর্গ। তা ছাড়া বন্ধন সীমায়—মুক্তিকে আশ্রয় দান করা। সংসারের মায়া রজ্জু, সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করলেও আমি মুক্তি পেতে পারি, যদি মুক্তি দিতে পারি নিরুদ্ধ আত্মাকে। দেহের খাঁচা থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া, যেখানে খুশী, যেমন তেমন। প্রাণকে তো বন্দী করে কেউ রাখেনি। মনই বা কোথায় আটক? প্রাণময়ের এবং মনোময়ের চেতনা থাকলে, তার মুক্তি সাধনও সহজসাধ্য। আর বন্ধন তো বাহ্যিক উপলক্ষ্য মাত্র—বন্দী রূপের।

উপলব্ধি যে আত্মার কামনা। সে কামনা তো বাঁধা পড়ে নেই। কোনখানেই অবরুদ্ধ নয়। আবেষ্টন আছে বলেই,—আবেশ জাগে প্রাণের। আসক্তির আকুলতা বৃদ্ধি পায়। আসলে, 'ভাব' এর উদয়মুহূর্ত থেকে, উন্মেষিত হয়ে—অন্তর্লীন হয়ে যাবে—অনন্তময়ের অন্তর লোকে। আবেগকে রুদ্ধ করা যায়না। তার খাঁটি মূর্ছনা থাকলেই, মুক্ত হয়ে যাবে, সবদ্বার অবারিত উন্মুক্ত হবে—সহস্র বন্ধুর পথে। চারধার বয়ে যাবে—মুক্ত প্রাণের বন্যা, ত্রি-ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে, নিজেকে সর্বতোভাবে হারিয়ে।

এই আত্মহারা আনন্দরূপই—পরমানন্দরূপের বিকাশ। মুক্তির আনন্দরূপই যে ব্রহ্মরূপ। ব্রহ্মসত্তা! চৈতন্যময়। যেখানে মুক্তির কামনা নেই—সেখানে আনন্দময় ব্রহ্ম বিরাজ করেন না। মুক্তির প্রকাশই—আনন্দময়ের প্রকাশ। সর্বক্ষণ মুক্তির বাসনা থাকলে, আনন্দের আস্বাদনকে উপভোগ করা যাবে। সংসারে আমরা বহির্গতরূপে, বন্ধনাবস্থায় আবদ্ধ, প্রাণমনতো বন্দী নয়। দেহের কয়েদখানায় বন্দী থাকলেও—তারা ছাড়া, তারা মুক্ত। তাদের স্পন্দন, তাদের চেতনা কোনখানেই নিরুদ্ধ নয়। নির্বাণ লাভের সহস্র পথ উন্মুক্ত অবারিত। মুক্তির প্রেরণাই সার কথা। তেমনি খাঁটি দরদী প্রেরণা থাকলে, মুক্ত হয়ে যাবে সবকিছু। যেমন জীবনের মুক্তি, মৃত্যুর মুক্তি, প্রাণ মনের মুক্তি, সুখ দুঃখের মুক্তি! যিনি বন্ধন দাতা, তিনিই তো মুক্তি দাতা। যিনি বন্ধনের দুঃসহতা দান করেন, তিনিই মুক্তির আনন্দ বিতরণ করেন। যিনি বৈচিত্র্য সাধনের নিমিত্ত—বন্ধন ও মুক্তির উপলব্ধি দিয়েছেন—তিনিই আবার জীবনের শ্রেষ্ঠকাম্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই ভাবে আমরা সর্বদা মুক্তির ইচ্ছায় সচেষ্ট হ'তে পারি। সকল অবস্থায় মুক্তানন্দ পেতে পারি। এই রূপে সর্বকালীন নির্বাণ লাভ ঘটলে, প্রকৃত পক্ষে

ঈশ্বরাবিষ্ট হই। যে কোন বাহ্যিক বদ্ধতার কাছে দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণ করলেই—মুক্তির উপায় লাভ ঘটে। যে কোন কঠিন দশারই সম্মুখবর্তী হওয়া যাক না কেন, প্রকৃত শুদ্ধ আত্মদান হ'লেই নির্বাণ লাভ! যিনি এইরূপে সর্ব অবস্থায় মুক্তিকে সন্ধান করেন, এবং উপলব্ধি করেন মুক্তানন্দের, তিনিই পরম জ্ঞানী। তিনিই ব্রহ্মানন্দের মুক্তমান রূপদর্শী! রসের সন্ধানী, জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্যতঃ বহিরাবরণের আশ্রিত হ'লেও, অন্তঃস্থ শক্তিমত্তার প্রতি প্রবল বিশ্বাসী। গভীর আত্ম প্রত্যয়ী। অনন্তময়ের অপার বিস্তৃত আনন্দে—আত্মহারা।

তিনি সর্বব্যাপী, চরাচরে—মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায়—অবাধ—অনায়াস বিচরণ করে থাকেন। সেইরূপে, ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ দর্শন, মুক্তির আনন্দরূপ দর্শন, সর্বশেষ সিদ্ধান্তে—চিদানন্দের চিন্ময় রূপ দর্শন লাভ।

প্রাণের ভাবাবেগও মুক্তির প্রাথমিক স্তর। 'ইমোশান' প্রবল না হ'লে, গতিপথ—অবারিত উন্মুক্ত হ'বেনা। যেখানে ভাবাবেগের চরম বিকাশ ফলে তার একটি বিশেষ দৈব শক্তির উৎপত্তি, যা সমস্ত বিঘ্নতাকে অতি অনায়াসে অতিক্রম করা যায়—আত্মহারা আনন্দরূপে। আকুল প্রয়াসে। বিপুল ভাবাবেগের বিস্তৃত স্রোতে। আমরা সাংসারিক নিয়মে—নানারূপে আবদ্ধভুক্ত। অসার সংসারেও পরম জ্ঞানীরা অবস্থান করেন। সকল আবদ্ধ অবস্থা থেকে—বিমুক্ত রূপে বিরাজ করে থাকেন। মায়া, প্রেম, আসক্তি এ'গুলোও বন্ধনের পর্য্যায়ভুক্ত। বিশেষতঃ এই জাতীয় রিপুগুলির দ্বারাই আমাদের দেহ মনের নিরুদ্ধভাব প্রকাশমান। যিনি নিরাময়, নির্বাণ পুরুষ, তিনিই নির্মল মহাত্মায় বিরাজ করেন। তিনিই তাঁর নিয়ন্ত্রিত স্তরগুলোকে সময় অনুযায়ী মুক্তালোকে পরমাশ্রয় প্রদান করে থাকেন।

পরমাত্মার অনন্ত শক্তির, বিচিত্র বহু ভাব ও রূপের মেলায়, এই বৃহৎ জগৎ ও জীবনের অবস্থিতি! অন্ধকার যেমন রূপ, কৃষ্ণবর্ণজাত, তেমনি আলোকও রূপ—সমুজ্জ্বল বর্ণাভার। এই দুই রূপের সমন্বয়ে, একক রূপ সৃষ্টি অদ্বৈতানন্দ রূপে। মহান্ একক ভাব প্রকাশে। মহা বৈচিত্র্যে!

বৈচিত্র্যময়, প্রেমময়, লীলাময়ের বৈভবে বিশ্ব-সংসারের মেলা নানা দৃশ্যে এবং অনন্ত সৌন্দর্যে সজ্জিত। স্বাধীন এবং পরাধীন দুই মনোবৃত্তির কারণ বৈচিত্র্যে বিচিত্রতর লীলানুভূতি।

মুক্তির বিভিন্ন স্তর ও মার্গ থাকলেও প্রধান ভাবে দুই পর্যায়ে বিভক্ত। দুই স্তরে শ্রেণীবদ্ধ। একটি বাহ্য মুক্তি! অন্যটা অন্তর মুক্তি। বাহ্য মুক্তি—অজ্ঞান দশার আঁধার রূপ। অন্তর মুক্তি—অনন্ত প্রাপ্তির আলোক। এবং অন্তরমুক্তিই চৈতন্যোদয়েরপরিপূর্ণ উন্মেষকাল। পরমাশ্রয়ের অন্তরভুক্ত। জ্ঞানেরও মুক্তি দশা—দুই ভাগে পরিলক্ষিত হয়। সাধনা স্তরে, মুক্তিরূপ দর্শন মাত্র। সাধনান্তে, পূর্ণ নির্বাণ লাভ। অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি।

তারপরই মহামুক্তি। মহানন্দের রূপলীলায় মগ্ন কাল। মহানির্বাণ লাভ। মহত্ব বিকাশেই—মুক্তিরূপ দর্শন। মহা ভাবে আনন্দরস সম্ভোগ। মহান্ প্রকাশেই—সর্বজয়ী মুক্তি লাভ।

——

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারো

অসিতের মন কী যে অশান্ত হ'য়ে ওঠে! এ কী হ'ল? এমন শান্তিময় আশ্রমে এসে কেন তার মনে এত অস্বস্তি জ'মে উঠল? মা-র আশীর্বাদে সব চিন্তাই যেন থিতিয়ে গিয়েছিল। এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যে তার মন প্রাণ যেন টইটুম্বুর হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে সেই থিতিয়ে-যাওয়া চিন্তাবুদ্বুদেরা ফের বিজবিজ করে উঠে ওর মনকে উতলা ক'রে তুলল। একটা কিছু যে ঘটছে যা ঘটবার মত এটুকু বুঝতে ওর বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু অসহায় হ'য়ে শরণাগতি চাওয়ার ছবি চমৎকার হ'লেও কী উপায়ে ও অসহায় হবে? সাধনাও চাই অথচ অসহায়ও হ'তে হবে? জানাও চাই অথচ সংশয়ের চাজাবো প্রশ্নকে আমল দিলে চলবে না? এক পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের কথা মনে পড়ল: "জগতের সব চেয়ে প্রাচীন লড়াই হচ্ছে বুদ্ধি বনাম বিশ্বাসের। কখনো এ জেতে কখনো ও।" কিন্তু দুই-ই মরিয়া না মরে রাম ধড়ঞ্চর। বিজ্ঞানের ভিত্তি হ'ল সংশয়, বলেন কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক। একথা যদি সত্যিই হয়, তবে সংশয়কে "কিছু নয়" ব'লে নস্যাৎ করা চলে না। অথচ ধর্মের পথে সংশয় হ'ল নিবেদিতার ভাষায়—a lion in the path.

মানুষের জীবনে এ-দুই পথের পথিকের ছন্দ একেবারে উল্টো কেন? মহা প্রতিভাধর যাঁরা তাঁরা বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে জগতের চেহারাই বদলে দিয়েছেন একথা অস্বীকার করার নাম পাগলামি। কিন্তু তাঁরা যখন বলেন—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া কোনো পথে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান মিলতেই পারে না তখন সেও কি সমান পাগলামি নয়? মা-র মতন শান্তিময়ী কি এর আগে দেখেছে, না শরণাগতির পথে সংশয়কে জয় ক'রে এমন আশ্চর্য তেজস্বিনী হওয়া সম্ভব একথা কোনদিন কল্পনা করেছে? কথায় যাঁর এতটুকু আত্মাভিমানের আমেজ নেই অথচ প্রতি কথার জোর কত: মনে পড়ে ইহুদীদের খৃষ্টকে দেখে বলাবলি করা: He speaks with authority! মা-ও যাই বলেন মনকে আবিষ্ট করে। না করলে প্রেমলের মতন বলিষ্ঠ প্রতিভাধরও কি ওঁর পায়ের কাছে ব'সে থাকে পোষা বেড়ালছানার মতন? শুধু প্রেমলই তো নয়—প্রণবও তীক্ষ্ণধী, স্বভাবে অন্ধ বিশ্বাসীও নয়। সেও তো মার কাছে হার মানল! আর ললিতা? সেও কি মারই আদেশে প্রেমলের কাছে তার বিদ্রোহী মাথা নোয়ায় নি? এমন একটি আশ্চর্য পরিবার গ'ড়ে উঠেছে কেমন ক'রে এ-হেন অকল্পনীয় পরিবেশে? এ কি পাওহারি বাবার ভাণ্ডারার চেয়েও অভাবনীয় অঘটন নয়! একদিকে ওর মনে সম্ভ্রম জাগে এ-কয়টি স্নেহময় সত্যাশ্রয়ী তত্ত্বজিজ্ঞাসুর 'পরে। অন্যদিকে আসে—ভয়: সেও কি এদেরই মতন সর্বহারা হ'য়ে বিশ্বাস মন্ত্র জপ করতে বাধ্য হবে ভগবানকে পেতে? তাঁকে পাওয়া মানে কি সব ছাড়া—সব ধারণা, প্রতীতি, বুদ্ধির 'পরে আস্থা—সব? হঠাৎ মনে পরে টমাসের বিখ্যাত Hound of Heaven কবিতাটি: প্রেমল মাঝে মাঝে কাশীতে ওর কাছে আবৃত্তি করত। বলেছিল একদিন খুব জোর দিয়েই যে, ইংরাজ কবিদের মধ্যে আর কেউই এত চমৎকার খাঁটি আধ্যাত্মিক কবিতা লেখেন নি। পড়তে পড়তে প্রেমলের গৌর মুখ লাল হ'য়ে উঠত:

I fled Him, down the nights and down
the days;
I fled Him, down the arches of the
years;
I fled Him, down the labyrinthine ways
Of my own mind; and in the mist
of tears
I hid from Him, and under running
laughter……
From those chong feet that followed,
followed after.

সত্যিই তো ভগবান্ মানুষের পিছু নিলে সে ভয় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে ছুটে পালায়—নিজের মনের আঁকাবাঁকা অলিগলি দিয়ে—বৎসরের পর বৎসর, কান্নার কুয়াশার আড়ালে নিজেকে গোপন করতে চেয়ে। কেন? না:

hest, having him, I must have naught beside—পাছে তাঁকে পেতে হ'লে আর সব কিছুকেই ছাড়তে হয়।

"হা অদৃষ্ট"—বলেছিল প্রেমল ব্যঙ্গ হেসে—"ভাবো দেখি—কামনা বাসনার মায়ায় মানুষ কোথায় পৌঁছেছে—কী হসনীয় আশঙ্কায়! যে ভগবানের দানের প্রসাদ পেয়ে আমরা বেঁচে আছি, যাঁর নিশ্বাসে আমরা রাতদিন নিশ্বাস নিচ্ছি, যাঁর কৃপায় আকাশে আলো চন্দ্র সূর্য উঠছে; মা সন্তানকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করছে; পরের জন্যে স্বার্থপর মানুষও আত্মত্যাগ করছে; যাঁর আলোয় তীর্থযাত্রী পথ চলছে তাঁর বাঁশির ডাকে নির্দিশায় দিশা পেয়ে; যিনি বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে ঝিকমিক ঝিকমিক করছেন বলেই এ ব্রহ্মাণ্ড অশ্রান্ত সৌন্দর্য্যের নির্ঝর ঝরিয়ে চলেছে আবহমানকাল—তাঁকে পেলে পাছে সব হারায়—এ-ভয়, এ-সংশয়ের কী নাম দেওয়া যায় বলো তো?"

কত সত্যি কথা! ভাবতে ভাবতে ওর বিষাদ কেটে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে গভীর শান্তিতে শেষ রাতে। এক স্বপ্ন দেখে কী আশ্চর্য!

চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে—হঠাৎ এক পরীর প্রাসাদ! এ-ঘর খোলে রত্নমণি। উপর তলায় উঠে দেখে আরো বিচিত্র মণি! আর একতলা ওঠে—অগুন্তি মুক্তামণির প্রদর্শনী! হঠাৎ স্বর শোনে: "এ সবই তোর।" হৃদয় আনন্দে বিস্ময়ে গৌরবে নেচে ওঠে। কিন্তু কে বলল: "এ সবই তোর!" না চাইতে দিল এত সম্পদ! কে সে দেবতা? আর একতলা উঠতে যাবে অমনি ভয় হয়—যদি দেবতা বলেন এসব ছেড়ে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে? ভয় পেয়ে নেমে আসে—পাছে অধ্রুবের জন্যে ধ্রুব ধন হারায়। অমনি শোনে সে স্বর আবার! যেন দেবতা হেসে বলছেন: "তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যম্ অনন্ত আদ্যে!* লজ্জায় ও মুখ ঢাকে…সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়। দিগন্তে শুকতারা যেন বলছে হেসে: "এত দেখে তবু ভয়?"

তেরো

পরদিন অবিস্মরণীয় জন্মাষ্টমী। বিকেল বেলা মার ঘরে ওরা গিয়ে বসেছে। ললিতা এক এক পেয়ালা ক'রে কফি ঢেলে দিল ওদের তিনজনকে। মাকে শুধু কমলালেবুর রস।

চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রেমল মাকে বলল অসিতের স্বপ্নের কথা।

মা (খুশী): খুব ভালো লক্ষণ বাবা! বলি নি?

অসিত (হেসে): ঠাকুর ধমকালেন ব'লে?

প্রেমল: অবিশ্যি। ভাগবতে কি কালিয়ের নাগ-রানীরা ঠাকুরকে বলে নি: "ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ"।

ললিতা: মানে? ঐ দেখ, আমি সংস্কৃত জানি না ব'লে আমাকে এত হেনস্থা—

অসিত: বাপ্‌রে! তোমাকে হেনস্থা করবে কার ঘাড়ে এমন দুটো মাথা আছে দিদি? ওর মানে হচ্ছে—ঠাকুরের ক্রোধও তাঁর কৃপাই বটে।

প্রণব (অসিতকে): আমার এই কালিয়দমন গল্পটি কী চমৎকারই যে লাগে; অসিত! তোমাদের পুরাণের কত গল্পই যে—কী বলব—জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে এমন রসিয়ে উঠেছে: এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়।

* অনন্তবৈভব ভগবান্ তুষ্ট হ'লে কি মানুষের অলভ্য ব'লে কিছু থাকতে পারে?

প্রেমল: কিন্তু কেন ঘটেছে এ রাজযোটক বলো তো?

প্রণব: কেন? তাঁদের কল্পনার প্রসার ছিল ব'লে আর কি?

প্রেমল: না, আরো আছে। তাঁদের মনে বিশ্বাস এত সহজে ঠাঁই পেত ব'লে। তাই তো ভারতকে স্বামীজি পুণ্যভূমি উপাধি দিয়েছিলেন তাঁর কলম্বোর ভাষণে। কী অসিত, ফের মন খারাপ? না সংশয়?

অসিত (হেসে): দুইই! সত্যিই আমার কেমন যেন ধাঁধা লাগে ভাই। কারণ শুধু স্বামীজিই তো নন, শ্রীরামকৃষ্ণও হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম নাম দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—আর সব ধর্ম আসবে যাবে কিন্তু হিন্দুধর্ম থাকবে; তারপরে মহাত্মা সন্তদাস বাবাজিও বলেছিলেন—ভারত হ'ল ধর্মভূমি; সবশেষে মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দও বললেন—ভারত অদূর ভবিষ্যতে জগতের অধিনায়ক হবে তার আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাবলে। অথচ স্বামীজি উঠতে বসতে দুঃখ করতেন যে, আমাদের দেশের লোক তামসিক। তাই লোকাচারই আমাদের দেবতা—যার ফলে ধর্ম আমাদের গিয়ে ঠেকেছে ভাতের হাঁড়িতে। এ-দুই মত কি পরস্পর বিরোধী নয়?

প্রণব (প্রেমলকে): নাও, ঠেলা সামলাও এবার।

প্রেমল (মৃদু বিদ্রূপে): এ ঠেলা তুমি একাই সামলাতে পারবে। আমি আজ জিরুই।

মা: না, দুলাল! তুমিই এর জবাব দাও।

প্রেমল: প্রণবকে বারণ করছ কেন মা?

মা: কারণ অসিত যে-প্রশ্নটি করেছে সেটি শুনতে সহজ হ'লেও তার উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়। তাছাড়া অসিত তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছে। তাই তুমিই বলো। আমি আজ চুপ ক'রে শুধু শুনতে চাই। ঢের বকেছি কাল।

প্রেমল: কিন্তু জন্মাষ্টমীর দিন এত তর্কাতর্কি—

মা: এ তর্কাতর্কি নয়। তুমি কি ভুলে গেলে অসিতকে কাল ঠাকুর কী স্বপ্ন দিয়েছেন?

অসিত: স্বপ্ন দিয়েছেন? ঠাকুর?

মা: নৈলে কি যাকে সাহেবরা বলে Chance? বাবা, বিশেষ ক'রে সাধনার পথে, প্রথম দিকে ঠাকুর কথা বলে নানা স্বপ্নের ভাষায়ই। তুমি যে মণিমহল দেখলে তারই নাম ভারতবর্ষ—যেখানে সব মণিরত্নই ঢের। কিন্তু তবু এ সব রত্নই "তোমার" হ'লেও তুমি প'ড়ে পেয়েছ কাজেই তোমার হ'য়েও তোমার হয় নি। হ'য়ে দাঁড়ালো মায়া—সোনার হরিণ। একে পেরিয়ে মাহেশ-এর কাছে পৌঁছলে তবেই পাবে এর দখলনামা। কিন্তু এমনিই মায়ার কাণ্ড বাবা, যে মণি পেতে না পেতে মানুষ মণিকারকে ভুলে গিয়ে হ'তে চায় দখলদার। তিনি বারবারই ডাকেন আমাদের দিশা দিতে—কেমন ক'রে তাঁকে পেলে তবেই এ ধনরত্ন ভোগ করা যায়—কিন্তু আমরা সে ছন্দটি শিখতে চাই না ব'লেই পদে পদে পাকে পড়ি!—কিন্তু তবু ভয় পাই পাছে "hest having Him I must have naught beside—"কিন্তু যে-ই তাঁকে একবার চিনবে সে-ই দেখতে পাবে—এ পুণ্য-ভূমিতে তিনি বার বার অবতীর্ণ হয়েছেন কেন—কিন্তু ঐ দেখ, ঢের ব'কে বলেছি।

অসিত: না, বলুন মা। বড় ভালো লাগছে।

মা: না বাবা, এখন (প্রেমলকে হেসে) you have the floor—তোমারি প্রিয় কঠ উপনিষদের ভাষায়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" দুলাল! ওঠো—সুপ্ত সিংহ, জাগো!

প্রেমল (মা-র চোখের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে অসিতের দিকে ফিরে): মা আবদার ধরলে আর রক্ষে নেই অসিত, তাই তাঁর সামনেও বলতে হবে "জানি" এই ভঙ্গি ক'রে—যেমন শরশয্যায় ভীষ্ম করেছিলেন কৃষ্ণের সামনে। কেবল তফাৎ এই যে, ভীষ্ম জানতেন—কৃষ্ণই তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছেন, যেখানে আমি বক্তৃতা সুরু করতে না করতে ভুলে যাই যে, আমি বক্তা নাই। মরুক গে। বলি শোনো, আমার এ সম্পর্কে যা মনে হয়।

য়ুরোপ—আমেরিকার কাপালিক চণ্ডবৃত্তি দেখে যখন আমি মানুষে প্রায় বিশ্বাস হারাতে বসি সেই সময়ে আমার হাতে আসে বুদ্ধের বাণী: যে, অক্রোধ দিয়েই ক্রোধ জয় করতে হবে, আর সবাইকে ভালোবাসতে হবে, যেমন মা ভালোবাসেন তাঁর একমাত্র সন্তানকে। মনে হয় আমার যে, এছাড়া আর পথ নেই—যে বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ভোগবাদ আমাদের পেয়ে বসেছে তার সমাপ্তি

সর্বনাশে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ত্যাগের আদর্শ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল: বুদ্ধ রাজার ছেলে, যার সবই ছিল, সে কিসের ডাকে ভোগ ছেড়ে যোগকে বরণ করল প্রাণকে পর্যন্ত বাজি রেখে? এত বড় দুর্ধর্ষ ত্যাগ—"Pandace"—আর কোন দেশের ভোগীর মধ্যে ঝলকে উঠেছে বলো তো? ভাবো তো, কী অদ্ভুত বৈরাগ্য এ, —যার মূলে ছিল না কোনোই আধি ব্যাধি কি নিরাশা! মানুষকে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই না তাঁর মন মানুষের দুঃখে ব্যথিয়ে উঠেছিল! তাই তো যোগাসনে বসার সময়ে তিনি শপথ করেছিলেন:

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি।' (ললিতাকে): অর্থাৎ আমার ত্বক্ অস্থি মেদ সমস্তই যদি শুকিয়ে মাটিতে মিশেও যায় তবু জ্ঞানের জ্ঞান না পেয়ে আমি এ যোগাসন থেকে উঠছি না।

পেলেন তিনি দুঃখ নিবৃত্তির চাবি—বাসনাজয়—সব তৃষ্ণাকে অস্বীকার করলে তবে মিলবে পরমা শান্তি। এর পরে উপনিষদ গীতাতেও পেলাম এই কথাই আরো গভীর ছন্দে—ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং মতগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং, ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্...ইত্যাদি। ধাপে ধাপে বুদ্ধের দিশা মেনেই নির্বাণ শান্তি থেকে উঠে এলাম ব্রহ্মাত্মবাদে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানলেই ব্রহ্ম হওয়া যায় আর না জানতে পারলে সর্বনাশ, "মহতী বিনষ্টিঃ।" কিন্তু তার পরে শুনলাম মা-র প্রসাদে ঠাকুরের প্রেমের বাঁশি —দেখলাম তাঁর রাঙা চরণ—যাঁর ছোঁওয়ায় এ ভারত পুণ্যভূমি হ'য়ে উঠেছে—যার অপরূপ রূপ অনুপম প্রেমের আলোয় পথ দেখিয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় আনন্দের নিত্যবৃন্দাবনে। এ-বাণী এমন সুরে আর কোন্ দেশে বেজে উঠেছে বলতে পারো আমাকে? বলি না—অন্য দেশের মানুষও ঠাকুরকে চায় নি। কিন্তু এমন ব্যাপক ভাবে, অগুন্তি ছন্দে, অগাধ রসের সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে শেষে বিশ্বরূপদর্শনের মহানাট্যমঞ্চে আর কোথাও মানুষ তাঁকে রসানাং রসতমঃ, সত্যস্য সত্যং, অমৃতস্য অমৃতং ব'লে বরণ করেছে কি?—ধর্মের মধ্যে দিয়েই সব ধর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে শরণাগতির মন্ত্রে পৌঁছেছে কি? প্রতি ধর্মেই তাঁর সত্যের একটি দুটি তিনটি ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু কেবল কৃষ্ণই এসেছেন নিটোল নরলীলার পূর্ণ বাণীবাহ হয়ে—যে-বাণীর প্রতিধ্বনি জেগে উঠেছে অগণ্য পুরাণে তন্ত্রে মন্ত্রে পূজায় সাধনায় কাব্যে গানে কীর্তনে। বলব না এ হেন দেশকে পুণ্যভূমি—ধুলোও পবিত্র রজঃ, পর্বতও দেবতাত্মা, নদীও পতিতপাবনী! এ কবিত্বের অপলকা উচ্ছ্বাস নয় অসিত, যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"। তাঁর কি তুলনা আছে ভাই—যিনি নররূপী নারায়ণ সর্বভূতের অন্তরবাসী—সর্বঋষির অন্তর্নেত্র? সব যজ্ঞের পরম পুরোহিত? রমণ মহর্ষি আমাকে বলেছিলেন গীতায় এই শ্লোকটি তাঁর মনে নিত্য বাজে গভীর ঝঙ্কারে:—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।*

রমণ মহর্ষির মতন জন্মসিদ্ধ কি আর কোনো দেশে জন্মাতে পারত—বিশেষ করে এযুগে! যাঁকে দেখাও পুণ্য।

অসিত: রমণ মহর্ষিকে কেমন লেগেছিল তোমার?

প্রেমল: আমি তাঁকে দেখে শুধু যে মুগ্ধ হয়েছি তাই নয়, ধন্য হয়েছি তাঁর আশীর্বাদে। যে দেশে তাঁর মতন লোকোত্তর মহাজন জন্ম নিয়েছেন সে দেশকে ধন্য বলব না? বলব না সে-দেশের মাটিও চিন্ময়?

মা: অসিতকে বলো না দুলাল, মহর্ষি তোমাকে কী ভাবে তাঁর নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপটি দেখিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, ঠিক সময়েই প্রসঙ্গটা এসে গেছে। প্রথমে একজনেরই চোখের ঠুলি খোলে, তার পরে তার দৃষ্টির ছোঁয়াচে আরো পাঁচজনের চোখে জ্বলে ওঠে দৃষ্টিপ্রদীপ, হয় দিব্যদর্শন।

ললিতা: হ্যাঁ, বলো না বাপী! আমার কী যে ভালো লাগে তাঁর কথা শুনতে!

প্রেমল (একটু চুপ করে থেকে): শোনো তবে বলি অসিত। কিন্তু বলে বোঝাতে পারব কি সে অপূর্ব দর্শন?

(হেসে) মহর্ষিকে আমি ভক্তি করেছি প্রথম থেকেই তাঁর একটি ছবি দেখবামাত্র। তারপর পড়ি তাঁর নিজের লেখা ও পাল ব্রান্টনের বিবৃতি। বুঝতে দেরি হয়নি

* নিখিল জীবের অন্তরবাসী আমি
আদি মধ্য ও অন্ত—জীবন স্বামী।

আমার যে, তিনি জীবন্মুক্ত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—যাঁর সম্বন্ধে বলা যায় ভাগবতের ভাষায়—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে!

(ললিতাকে) অর্থাৎ জীবন্মুক্ত সিদ্ধদের মধ্যেও এমন পরম ভাগবত মেলে কালে ভদ্রে।

মা: আগে বলো তাঁর সম্বন্ধে তুমি কী ধ্যানে দেখেছিলে।

প্রেমল: তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না মা! তোমার কাছেই শুনেছি এসব ধ্যানদর্শনের কথা গুরুর কাছে ছাড়া বলতে নেই—

মা: কিন্তু গুরু হুকুম দিলে বলা যায় এ'ন কথাও শোনো নি কি গুরুর কাছে? না, আমি বলতে বলছি কারণ আছে ব'লেই। অসিত সত্যিই সংশয়ী নয় তো—ও জানতে চায় কেবল বাজে কথাও তো নয়টে, তাই বলতে বলছি তোমাকেই—যার কথা মেনে নিতে ওর বাধবে না।

প্রণব (টুক করে): কিন্তু ধরুন যদি বাধে?

ললিতা: ঈস্! মা যাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তার মন কি কুটিল হতে পারে?

অসিত: (মাকে) আমি সহজে মেনে নিতে পারি না একথা সত্যি মা, কিন্তু যাকে সত্যসাধক ব'লে চিনেছি তাকে শ্রদ্ধা করতে আমার বাধেনা। তবে (ললিতাকে) মন আমার কুটিল না হ'লেও বেশ একটু জটিল দিদি। তাই তুমি তোমার সার্টিফিকেট ফিরিয়ে নিতে পারো।

ললিতা (কাঁদো কাঁদো সুরে)—তুমি ভা-রি দুষ্টু দাদা! আমি দুরন্ত মেয়ে হ'তে পারি কিন্তু তোমাকে সার্টিফিকেট দিতে যাব এত বড় মুখ্যু না কি আমি?

মা (হেসে): তা ওর অপরাধ কী বল্? ও স্বচক্ষেই দেখে নি কি—তুই তোর গুরুর সঙ্গেও কী ঝুটোপুটি ঝগড়া করিস উঠতে বসতে? দেখেশুনে আমিই ভয় পাই তা ও তো ছেলে মানুষ!

প্রণব: কিন্তু এবার তোমার কথাটা শেষ করো সন্ধ্যা পুজোর সময় এল ব'লে।

মা: হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি বলো দুলাল রমণ মহর্ষির সম্বন্ধে ধ্যানে কী দেখেছিলে।

প্রেমল (অসিতকে): সে সময়ে আমি খুব ধ্যান করতাম—আরো রমণ মহর্ষির কথা প'রে। ভাবতাম আমি কে আমি কে আমি কে? রমণ মহর্ষির নির্দেশ মেনে দেখতে চাইছিলাম কোথাও পৌঁছতে পারি কি না। হঠাৎ একদিন ওঁর ছবির সামনে ধ্যান করছি (দেয়ালে দেখিয়ে) এই হেলান দেওয়া ছবি বৃদ্ধ বয়সের—এমন সময়ে হঠাৎ দেখি ছবিটি গ'লে মিলিয়ে গেল আর অমনি সামনে এক পাহাড়! সেই পাহাড় বেয়ে এক পনেরো ষোলো বছরের ছেলে চলেছে। মাকে বলতে মা বললেন: রমণ মহর্ষি ঐ বয়সেই গৃহত্যাগ ক'রে অরুণাচল পাহাড়ে উঠে অরুণাচল শিবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

অসিত: তিনিই যে রমণ মহর্ষি-কেমন ক'রে জানলে?

প্রেমল: রমণাশ্রমে আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁকে লিখেছিলাম। তিনি মহর্ষির বালক বয়সের একটি ছবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার ধ্যান দর্শনের পরে। অবিকল সেই মূর্তিই আমার ধ্যানে ফুটে উঠেছিল।

ললিতা। (শাসিয়ে): কী দাদা, এবার?—স্কেপটিক!

মা: ফে-র! বলি নি তোকে—ছেলে আমার মোটেই স্কেপটিক নয়? যার শ্রদ্ধা করার এমন সহজ শক্তি সে কখনো স্কেপটিক হ'তে পারে রে মেয়ে?

ললিতা: মা, তুমি ভারি একচোখো। তোমার ছেলের সাত খুন মাফ—কিন্তু মেয়ের পান থেকে চুনটি খসেছে কি সুরু হয়েছে তোমার তর্জন গর্জন।

মা (হেসে): আর মেয়ে আমার কী লজ্জাবতী লতা রে! সাত চড় মারলেও কথা কন না। (প্রেমলকে) কিন্তু বাজে কথা থাক্। দুলাল, বলো তারপর কী হ'ল।

প্রেমল: ছবি পাবার পরেই আমি যাই রমণাশ্রমে। মহর্ষির ঘরে গিয়ে প্রথম দিনই তাঁকে প্রণাম ক'রে বসলাম তো তাঁর পায়ের কাছে। তিনি তাঁর লম্বা বেদীটিতে হেলান দিয়ে জানলার দিকে সমানে একদৃষ্টে চেয়ে—যেমন তাঁর বৃদ্ধ বয়সের ছবিতে আছে। দেখেই গভীর ভক্তিতে মন ছেয়ে গেল। আহা, চোখ নয় তো যেন নির্মল শুকতারা!—কী দীপ্তি, অথচ পরম করুণা, গভীর শান্তি! যাক।

তাঁর পায়ের কাছে ব'সে ভাবলাম এই নিটোল শান্তি নামল ব'লে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক উল্টো কাণ্ড: কোথাও কিছু নেই একটি স্বর আমার মনের দোরে যেন টোকা মেরে প্রশ্ন ক'রে চলল: "কে তুমি? কে তুমি? কে তুমি?"

আমি প্রথমে হলাম আশ্চর্য, তার পরে—বিব্রত, শেষে—বিরক্ত। চেষ্টা করলাম কান না দিতে। কিন্তু স্বর থামতে চায় না যে—আর বাইরের কান নয় যে কানে তুলো দেব।…অগত্যা ভেবেচিন্তে একটা উত্তর খাড়া করতেই হ'ল—অবশ্য মনে মনেই বললাম: "আমি কৃষ্ণ দাস।" অম্‌নি—কী আশ্চর্য—প্রশ্নটা বদ্‌লে গেল: "কিন্তু কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ কে?" আমি তখন নানা উত্তর খাড়া করলাম: অন্তর্যামী, ভক্তবৎসল নিয়ন্তা, আদিগুরু…কিন্তু প্রশ্ন থামে না বুঝলাম—পরীক্ষায় পাশ হই নি। শেষে অশান্ত চিত্তে ঘরে ফিরে এসে ব'সে ধ্যান লাগালাম ক'ষে। কিন্তু ধ্যান করব কী? প্রশ্ন চলে সমানেই: "কে কৃষ্ণ? কে কৃষ্ণ? কে কৃষ্ণ?"

শেষে হতাশ হয়ে রাধারাণীকে আর্জি জানালাম। তিনি এসে জানতে চাইলেন—আমি কী উত্তর দিয়েছি। তখন বুঝলাম—ব্যাপারটা সঙিন, প্রশ্নটা আদৌ কল্পনা নয়—করেছিলেন মহর্ষি স্বয়ং। আমি রাধারাণীকে বললাম একে একে যা যা আমার মনে হয়েছিল। রাধারাণী মৃদু হেসে বললেন: "হল না।"

"হল না? তবে? মান বাঁচাও, বলো।"

তখন রাধারাণী বললেন আমার কানে কানে—অতি মৃদু স্বরে…অথচ কী ঝংকার! আহা!

অসিত (রুদ্ধশ্বাসে): তার পর?

প্রেমল: তারপর আর কী? নিশ্চিন্ত। সঙ্গে সঙ্গে—সে কী করে বোঝাব ভাই কী হল? তাই শুধু বলি—হঠাৎ সব ধ্বনি থেমে গেল…সঙ্গে সঙ্গে শান্তি এল ফিরে।

পরদিন সকালে ফের মহর্ষির ঘরে বসেছি যথাবিধি, তাঁর পায়ের কাছে। ধ্যান সুরু করতে না করতে মনে গভীর নিটোল শান্তি বিছিয়ে গেল। সে যে কী অপূর্ব শান্তি ভাষায় তার কী আভাষ দেব ভাই? তাই থাক ও-অপচেষ্টা, বলি তারপর কী হ'ল।

হঠাৎ আমার মাথায় কী খেয়াল চাপল—চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হ'য়েই মহর্ষিকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম: "কে আপনি, কে আপনি, কে আপনি!"

অম্‌নি হঠাৎ চোখ খুলে দেখি—দু সেকেণ্ড আগে যে-বেদীতে মহর্ষি হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন সে-বেদী খালি!

অসিত: খালি? মানে—?

প্রেমল: মানে মহর্ষি উবে গেছেন—melted in to thin air যাকে বলে। চোখ বুঁজেই তক্ষনি ফের চোখ খুললাম। দেখি—মহর্ষি সেই একই ভাবে আসীন তাঁর বেদীতে—শান্তিসিন্ধু সদাশিব! হঠাৎ তিনি ফিরে তাকালেন—ঠোঁটের উপান্তে ঈষৎ হাসির ফিনকি—কী প্রসন্ন হাসি! তার পরেই ফের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। আমার বুঝতে বাকি রইল না। তাঁরও না। আমার প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন যে ভাবে কেবল তিনিই দিতে পারতেন—আর কারুর সাধ্য ছিল না।

মা (অসিতকে): বুঝতে পারলে কি বাবা? না, ধাঁধা লাগছে?

অসিত (ঈষৎ অনিশ্চিত স্বরে): বোধহয় আঁচ পেয়েছি মা, বলতে পারি না। তিনি জানিয়ে দিলেন তো যে, রক্তমাংসের দেহটা তাঁর—মানে রমণ মহর্ষির—তাঁর আসল স্বরূপ নামরূপের অতীত? তাই না?

মা (খুশী): ধরেছ বাবা! (ললিতাকে) দেখলি রে মেয়ে, আমার ছেলে কেমন সুবুদ্ধি? তুই তো ধরতে পারিস নি!

ললিতা: পারি নি বৈ কি! শুধু বলি নি। বাপী দশটা প্রশ্ন করলে তবে একটার জবাব দেয়—আমি সস্তা হব কী দুঃখে? তাই সাফ জবাব দিয়েছিলায়—"বলব কেন?"

মা (হেসে): খুব বাহাদুর! এমন না হ'লে চেলী!

প্রণব: কিন্তু আসল প্রশ্নটা ধামাচাপা প'ড়ে মারা গেল মা: যে, ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলা সাজে কি না?

মা: না না। বলছে ও। বলো দুলাল।

প্রেমল (অসিতকে): আমি যখন প্রথম লক্ষ্ণৌয়ে আসি, তখন আমারও মনে বিষম সংশয় ঘনিয়ে এসেছিল

—ভারতবর্ষ কি সত্যিই পুণ্যভূমি? তা সংশয়ের অপরাধ কী বলো? ভাবো—কাদের সঙ্গে আমায় মিশতে হ'ত দিনের পর দিন!—অধ্যাপক আর ছাত্র, উকীল আর ডাক্তার, রইস আর দেশধ্বজ,—যাদের মধ্যে সাড়ে পনেরো আনার মুখেই খই ফুটত বিলিতি বোলচালের cliche-র। তাছাড়া ভড়ঙেরও সে জেল্লা কত দেখানেপনা!—আমি কত কেতাব পড়েছি। ছাত্রেরা কপ্‌চাত নানা পাথীপড়া বুলি আর অধ্যাপকেরা আওড়াতেন নানা ধুমধড়াক্কা বিলিতি মতামত—এর ওর তার—যেসব বুলি আমাদের দেশে সেকেলে ব'লে বাসি হ'য়ে গেছে বা শুধু হাসিরই খোরাক জোগায়। অথচ মজা এই যে, ভারতীয় হ'য়েও তাঁরা কেউ ভুলেও ভারতের বেদবেদান্ত গীতা ভাগবতের নাম মুখে আনতেন না, শুধু শুনতাম—আমাদের সব আপ্ত বাক্যই হয় কুসংস্কার নয় আষাঢ়ে গল্প। শুনতাম উঠতে বসতে যে, হিউম্যানিটি (with a Capital H) আর সায়েন্সই হলেন এযুগের শিবশক্তি, জীবনের উদ্দেশ্য শুধু সুখে গড়ানো—to raise the standard of living, কালচার্ড হওয়া, সাহেবদের বাহবা পেয়ে নাম করা। সকলের মুখেই ঐ এক রা: pillars of society—যাঁরা আসতেন মা-র সালঁ-তে—সবাই এ বিষয়ে একমত যে, ধর্ম হ'ল মিডীভাল আর সায়েন্স হ'ল মানুষের একমাত্র মুক্তিদাতা। তাদের সঙ্গে মেশা ছিল এক যন্ত্রণা।

আমি নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতাম যদি শুধু মা-র বাইরের রূপই আমার চোখে পড়ত। কিন্তু তাঁকে ভালোবাসার জন্যেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর আসল স্বরূপ যা তিনি লুকিয়ে রাখতেন। কেমন ক'রে তাঁর এ-সত্য স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ হ'ল সে-ইতিহাস বলব না—তার দরকারও নেই। কেবল এইটুকু বলি—তাঁর মধ্যেই দেখতে পেলাম আমার গুরুকে। তারপর ঘটল আর এক অঘটন: তাঁর আশীর্বাদ পেতে না পেতে আমার এমন কয়েকটি আশ্চর্য অনুভূতি হ'ল যার ফলে আমার আর সন্দেহ রইল না যে আমি যা খুঁজতে ভারতবর্ষে এসেছিলাম তার চাবিকাঠি আছে মা-র কাছেই। তাঁকে বললাম সেকথা, চাইলাম দীক্ষা। মা বললেন: "আমি দীক্ষা দিতে পারি কেবল এই সর্তে যে, এর পরে যদি তোমার আর একটিও আত্মিক উপলব্ধি—spiritual experience—না হয় তাহ'লেও তুমি সাধনা ছেড়ে দেবে না।" অর্থাৎ কিনা, দীক্ষার ফলে যে-নবজন্ম হবে তার নির্দেশেই চলবে সমানে মরুর পরে মরু পার হ'য়ে, যুক্তি, বুদ্ধি, সংশয়, সুবিধা এসবের মায়া কাটিয়ে। আমি রাজী হ'লাম, কারণ বিলিতি সভ্যতায় আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম এই নবজন্মের ফলেই।

মা-র দীক্ষা পেতে না পেতে আমার চোখের ঠুলি খ'সে পড়ল—তাঁর মন্ত্রবলেই বলব। সঙ্গে সঙ্গে আমার এই নবলব্ধ দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল ভারতের সত্য রূপ যা চর্মচক্ষে দেখা যায় না। আমার বুকে ভক্তির যেন বান ডেকে গেল, মনে হ'ল—ধন্য আমি যে, এ-পুণ্যভূমিতে এসে ঠাঁই পেয়েছি এমন দেবীগুরুর চরণে। মার আদেশে সংস্কৃত ও বাংলা শিখলাম—পড়লাম উপনিষদ, ভাগবত, গীতা, তন্ত্র, চৈতন্যচরিতামৃত। এখানে ওখানে মিশবার সুযোগ পেলাম কয়েকজন সাধুর সঙ্গে—বিশেষ ক'রে গুপ্ত-যোগী মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে। মার কাছে শুনেছিলাম তিনিই ছিলেন তাঁর প্রথম গুরু। মহেন্দ্রবাবুও আমাকে সাধনার পথে কম আলো দেন নি। পড়ালেন বেদ, সাংখ্য, গীতা—বিশেষ ক'রে তন্ত্র।...তারপর অনেক কিছুই উপলব্ধি হ'ল—গুরুর কৃপায়ই বলব—যার ফলে দেখতে পেলাম যে, ভারতের আত্মা—ধর্মই বটে, মহাভারতের অন্তিমবাণী মন বরণ ক'রে নিল:

নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যঃ হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ

(ললিতাকে) অর্থাৎ কেবল ধর্ম চিরন্তন, সুখদুঃখ আলোছায়া—আসে যায়, আত্মা অটল, কিন্তু তার বাহ্য বনেদ—basis—টলমলে।

অসিত: তারপর? থামলে কেন?

প্রেমল (উদ্দীপ্ত সুরে): তারপর আর কি? মন আমার গান গেয়ে উঠল বিল্বমঙ্গলের দোয়ার দিয়ে:

ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ

ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ?—(ললিতাকে)

অর্থাৎ, ঠাকুর! তুমি প্রসন্ন হ'লে আর সবাই মুখ ফেরালেই বা কি? আর তুমিই যদি প্রসন্ন না হও তবে আর সবাই আমাকে রাজা করতে চাইলেই বা কি

যেই গাওয়া, অমনি শুনলাম গুরুর কণ্ঠ ইষ্টের স্বর আর সঙ্গে সঙ্গে যেন এক দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম—আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের পাশ কাটিয়ে—যে ধর্মই এ-দেশকে ধারণ করে আছে আর সাধুরাই সে-ধর্মের ধারক, প্রতিভূ। উপলব্ধি করলাম ভাগবতে নারায়ণের সাধু-স্তুতি: "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্"—অর্থাৎ সাধুরাই আমার হৃদয় আর আমিই সাধুদের হৃদয়।

তারপর ঘটল আর এক কাণ্ড! দেখলাম স্বচক্ষে কুম্ভমেলা। আর দেখে অভিভূত হ'য়ে—সে যে কী হ'ল অসিত, কী বলব?—আর কোন্ দেশে ধর্ম আজো এমন জীবন্ত কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে? যে দেশে মাত্র গঙ্গাস্নানে পাপী তাপী নির্মল হয়, যে দেশে সাধুকে দেখামাত্র প্রণাম করতে ছুটে আসে ভক্ত অভক্ত সমান আগ্রহে, যেদেশে ঠাকুর আগে অফুরন্ত রাগমালায় তাঁর বাঁশি বাজান নিত্য বৃন্দাবনের লীলার অঙ্গীকারে; যে মা বলতে আজো অণুস্তি বুকে জেগে ওঠে জগন্মাতার জগদ্ধাত্রী মূর্তি—সেদেশে দুচার লাখ অন্ধ বুদ্ধিমন্ত বিজ্ঞানের ক্ষীণ তীরন্দাজি দিয়ে কী করে ভগবানের হিমালয় প্রতিষ্ঠার নড়চড় করবে শুনি? সত্যি বলছি তোমায় ভাই, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ভারত বেঁচে আছে আজো ধর্মের ঐতিহ্যকে লালন করছে ব'লেই। [থেমে] কিন্তু কুম্ভমেলার কথাই বা আলাদা ক'রে বলছি কেন? তোমাদের হাজারো ব্রতপার্বণ আজ কার নাম আঁকা? দেবতার। দৈনন্দিন জীবনে কাকে স্মরণ করে এদেশের লোক সকাল সন্ধ্যা? ভগবান্‌কে। এমন কি বাহ্য সমাজেরও আইনকানুন প্রণয়ন করেন কাঁরা? রাজনৈতিকের নয়—সাধু মহাত্মারা।

এমন কি, তোমাদের বর্ণাশ্রমধর্মেরও নিয়ন্তা ঐহিক রাজরাজড়া পুলিশ কোতোয়াল নন—স্মৃতি ও সংহিতাই বটে। সেকুলার? না ভারতের আত্মা কোনদিন বিশ্বাস করে নি আজও করে না যে, ভগবানকে বরখাস্ত ক'রে সমাজের কোনো স্থায়ী সংস্কার হ'তে পারে। তোমাকেন একটা দৃষ্টান্ত দেই।

একবার আমি কাঠগুদাম থেকে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি ট্রেনে। তৃতীয় শ্রেণীতে ঢুকবামাত্র যাত্রীরা সবাই উজিয়ে উঠল। গাড়ীতে দারুণ ভিড়, কিন্তু দরিদ্র যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন মাটিতে ব'সে আমার জন্যে বিছানা ক'রে দিল। সাধুজির না কষ্ট হয়। কেউ পাখা করে, কেউ সরবৎ এনে ধরে। কেউ ফল। কেউ চা। দেখে সত্যি আমার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে উঠল। কার জন্যে এদের এত প্রীতি শ্রদ্ধা দরদ? এক অচিন গেরুয়াধারী সাধু। আমাদের দেশে অসিত, কে পায় বিপুল সম্বর্ধনা? হয় রাজারাণী না হয় নটনটী না হয় সিনেমা তারকা, না হয় এক আধটা আইনষ্টাইন বা বার্ণার্ড শ—যাদের প্রতিষ্ঠার মূলে—খবরের কাগজের জয়ধ্বনি। কিন্তু ভারতের রাজারাণীও মাথা নোয়াত, সাধুদের পায়ে—কৌপীনবস্ত্র গান্ধিজি পান সার্বজনীন সম্মান।

ললিতা [হাততালি দিয়ে] তুমি চমৎকার কথা বলতে শিখেছ, বাপী—একথা মানতেই হবে তোমার অতি বড় শত্রুকেও।

প্রণব: কথা তো ও চমৎকার বলেই। কিন্তু [প্রেমলকে] একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না কি? রাজারাজড়ারা এদেশেও যে-কোনো ছাইমাখা সাধুর পায়ে মাথা নোয়ান না—গান্ধীজির মতন চৌখস প্রতিভাধরকে উল্কার মতন সর্বসাধারণের চোখ ধাঁধিয়ে রাজনীতির আকাশে ঝল্‌কে উঠতে হয় তাদের অভিভূত করতে। আর কেন তারা অভিভূত হয় তাও তুমি বেশ ভালো ক'রেই জানো। অভিভূত হয়, কারণ গান্ধিজি সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার-phenomenon! তা-ছাড়া তাঁকে নিয়েও খবরের কাগজওয়ালারা কিছু কম ধুমধাম করে নি।

ললিতা: ঠিক বলছ প্রণবদা। আমি এদিক দিয়ে ভেবে দেখি নি। বাপী এখানে একটু বেশি ব'লে ফেলেছে। গান্ধিজি সত্যিই এক অদ্ভুত মনিষ্য। আমি বিলেতে শুনতাম এক ভারি চমৎকার রচনা আমেরিকান টুরিষ্টদের সম্বন্ধে—যাঁরা এদেশে আসেন তিনটি জিনিষ দেখতে: তাজমহল, মহাত্মা গান্ধি ও রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

সবাই হেসে ওঠে, প্রেমলও যোগ দেয় সে-হাসিতে। একটু পরে হাসির রেশ মিলিয়ে যাবার পরে প্রেমল প্রণবকে বলল: 'তোমার একথা সত্যি। কিন্তু তুমি

আমার মূল বক্তব্যটি ঠিক ধরতে পারোনি—কিসের উপর আমি জোর দিতে চেয়েছিলাম। আমার বলবার উদ্দেশ্য—গান্ধিজির অভ্যুদয় এদেশে এখনই সবাইকে এমন অভিভূত করতে পারত না যদি না তাঁর কৌপীন-বস্ত্র মূর্তি সন্ন্যাসীর ত্যাগের প্রতীক রূপে মান পেত। যতই বলো না কেন, য়ুরোপে আমেরিকায় এখনো সব-চেয়ে ধুমধাম করা হয় ধনী শিল্পী জননেতা বা বৈজ্ঞানিক নিয়েই।

ভারতে মান পায়—সাধুসন্ত ত্যাগী মহাত্মা।

প্রণব : কিন্তু প্রেমল, ধর্মভাবকে মাপা যায় না তো বাইরের এই সব ধুমধাম দিয়ে। তলিয়ে দেখলে কি দেখা যায় না—য়ুরোপ আমেরিকাও গড়পড়তায় এখনো ধর্ম-বিমুখ নয়?

প্রেমল : আমি একথা মানি প্রণব, যে গড়পড়তারা সবদেশেই মোটামুটি একই খাতে চলে, কেন না তাদের মূল চাহিদা ঝোঁক রোখ দাবিদাওয়ার সুর তাল ছন্দ সর্বত্রই এক। কিন্তু তবু বলব—ভারতের মাটির মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাকে অস্বীকার করা কঠিন। (অসিতকে) তুমি কালই আমাকে বলছিলে না লোয়েস ডিকিনসনের একটি ভ্রমণকাহিনীর কথা? বলো তো প্রণব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি কী সিদ্ধান্তে এসেছেন?

ললিতা : রোসো রোসো। ব্যাপারটা বুঝতে হবে তো, কেন আচমকা লোয়েস ডিকিনসনের ডাক পড়ল? কে ইনি!

প্রণব : নামজাদা লেখক, বার্টরাণ্ড রাসেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু, লীগ অফ নেশানের মহড়া প্রথম এঁরই মগজে গজিয়েছিল। ভেবেছিলেন ইনি—হয়ত আজও ভাবেন কে জানে?—যে দলিল সই ক'রে ও করিয়ে জগতের সব আপৎশান্তি হ'ল ব'লে!

অসিত : কিন্তু হঠাৎ তাঁর কথা তুললে কেন?

প্রেমল : বলছি। তুমি বলো তো আগে।

অসিত (প্রণবকে): সাহেব এক ব্রিলিয়াণ্ট কাহিনী লিখেছেন সারা জগৎ ঘুরে। তাতে শেষে লিখেছেন যে, কিপলিং যে বলেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরকে কোনদিনই বুঝতে পারবে না—একথায় তাঁর পুরো সায় আছে যদি প্রাচ্য-কে বদলে ভারত বসানো হয়। কারণ বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে তাঁর মনে হয়েছে যে, য়ুরোপ কেবল একটি দেশকে কোনোদিনই বুঝতে পারে নি ও পারবে না—ভারতবর্ষের মতিগতি ও ভাবধারা।

প্রণব : ডিকিন্সনের রায়-এ কি সায় দাও?

প্রেমল : দিই, কেবল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমার মনে হয়—যাঁরা য়ুরোপের কালচারকে ভারতের অধ্যাত্মবাদের চেয়ে বড় মনে করেন তাঁদের কাছে ভারতবর্ষের মতিগতি ভাষার ডিকিনসনের মতনই অবোধ্য মনে না হয়েই পারে না। যেমন ধরো, রোমাঁ রোলাঁ। কিছু মনে কোরো না অসিত, যদি রোলাঁ সম্বন্ধে তোমার উচ্চ ধারণায় আমি নাম সই করতে না পারি। কী করব বলো? ভারতবর্ষকে ভালোবাসার পর থেকে আমার দৃষ্টিই বদলে গেছে যে! আমার এখন মনে হয় যে, রোলাঁ জাঁকালো ইণ্টারন্যাশনাল জগৎগুরু হ'য়ে সবাইকে পথ দেখাতে গিয়ে নিজে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি ভেবেছেন—বিবেকানন্দী জীব-সেবা খ্রীষ্টান স্পিরিট অফ সার্ভিস—হ'ল ভারতের আত্মার মূল বাণী। "হবেই হবে"—হাঁকলেন রোলাঁ—"যেহেতু হিউম্যানিটি এক, বিশ্বদেব is equal to বিশ্ব-সেবক।" আমার আপত্তি এইখানেই—একেবারে গোড়াতে। আমি বলি—ভারতের বাণীকে ভালো বলে সার্টিফিকেট দিতে না চাও দিও না—যদি ভারতের ধর্মবাদকে অনৈহিক বা সেকেলে ব'লে নাকচ করতে চাও তবে সে অধিকারও তোমার মঞ্জুর। কিন্তু যে বাণী ভারতের আত্মার বাণী নয় সেই উন্নাসিক পরোপকার-বান—doing good to others—ভারতেরও মর্মবাণী এমন কথা ঘোষণা করতে পারো না, বলতে পারো না তারস্বরে উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবাদী রেডিয়োতে; এসো ভাই সব! আমরা সবাই এক পথের পথিক। ভগবান্ থাকেন থাকুন তাঁর আকাশবৈকুণ্ঠে, আমাদের—কিনা হিউম্যানিটির—একমাত্র লক্ষ্য হ'ল—সার্ভিস টু হিউ-ম্যানিটি।" ভারত আবহমান সব আগে বসিয়েছে ভগবানকে, তারপর সংসার বা সংসারীকে। ভারতের মন্ত্র হ'ল শিবজ্ঞানে জীবসেবা—আহাবাদী দয়ালুতা কি noblesse oblige humanitarianism নয় নয় নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নমো নমঃ ক'রে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বিবেকানন্দকে নিয়েই ধুমধাম করেছেন—তাঁকে ভারতের আত্মার চরম প্রতিভূ বলে বরণ করে। এর নাম যদি দৃষ্টিবিভ্রম না হয়—

প্রণব: রোসো রোসো, স্বামী বিবেকানন্দ জীব-সেবার বাণী প্রচার করেছেন ব'লে কি বলবে—তিনি ভারতের আর্যবাণীর—ধ্যান তপস্যার—মর্মজ্ঞ ছিলেন না?

প্রেমল: না, তা বলি না। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মহাপুরুষ—সেন্ট পলের মতেই মহাশক্তিধর, সংস্কারক, প্রচারক। কিন্তু যেমন কেবল সেন্ট পলের প্রতিভার গজকাঠি দিয়ে খৃষ্টের মহিমার তল পাওয়া যায় না, তেম্‌নি কেবল বিবেকানন্দের কীর্তির ভাষ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মজ্ঞ হওয়া যায় না। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে যে বুঝতে পারে নি—বা চায় নি—তার হিন্দুধর্মের মর্মবাণীটিই অজ্ঞাত থেকে গেছে জানবে। না, এ আমার গাজোয়ারি কথা নয় প্রণব, যে, এ-যুগে ভারতের আত্মার তুঙ্গতম আলোকস্তম্ভ—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ নন। আমাকে ভুল বুঝো না কিন্তু। স্বামীজিকে আমি সুরংদার মতনই শুধু শ্রদ্ধা নয়, ভক্তি করি মনে-প্রাণে এযুগে তাঁর মতন মহাবীর সংস্কারকের খুবই প্রয়োজন ছিল হিন্দুসমাজের হাজারো তামসিকতার আগাছা সাফ করতে। আমি ঠিক কী বলতে চাচ্ছি হয়ত তোমাকে দুকথায় বোঝাতে পারব না, কিন্তু অসিত বুঝবেই বুঝবে। কারণ সে শ্রীরামকৃষ্ণকে আশৈশব ভালোবেসে এসেছে ব'লেই আমার এই রায়-এ সায় না দিয়ে পারবে না যে, মাকালীর এই চিরশিশুটির মা-মা-ঝঙ্কারেই বেজে উঠেছে ভারতের অন্তরাত্মার একটি গভীরতম সুরঝঙ্কার—যে-সুর তার একান্ত নিজস্ব, অর্থাৎ যে-সুর আর কোনো ধর্মই দোয়ার দিতে পারে নি—অন্ততঃ আজ পর্যন্ত। তাই আমি বলবই বলব যে, স্বামীজির বীর্য-ত্যাগ-জ্ঞানের হাজার গুণগান করলেও রোলাঁর কর্ম নয় শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমার মূল্যায়ন করা। কিম্বা ধরো, শ্রীচৈতন্যদেব—তিনি যেখানেই গিয়েছেন তাঁর হরিনামের মৃতসঞ্জীবনী রসে ঘুমন্ত ও মরন্তদের বাঁচিয়ে জাগিয়ে মাতিয়ে তুলেছেন—লক্ষ লক্ষ প্রাণের মরা গাঙে ভক্তির বান ডাকিয়ে, আত্মঘাতী কামনাবাসনার কাঁটাবনে আগুন লাগিয়ে, কাঙালদের মধ্যেও শ্রীক্ষেত্রের পাত পেড়ে। মনে করো কি, আজ যদি তিনি আবার হঠাৎ ভারতে অভ্যুদিত হন নামের হরির লুট ঝরাতে, তাহ'লে রোলাঁ-বর্গীয় মিশনারিরা কি তাঁর জয়ধ্বনি করবেন? না অসিত, তাঁরা বৈজ্ঞানিক অজ্ঞদের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁর প্রেমোন্মাদকে হিস্টিরিয়া নাম দিয়ে তাঁকে পাগলাগারদে পুরবেন ডাক্তারের সার্টিফিকেটে। কিন্তু ভারতবর্ষে কন্যাকুমারী থেকে মানস সরোবর পর্যন্ত কোটি কোটি হিন্দু তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে চোখের জলের প্রণামে।

ঘরের মধ্যে সবাই নিশ্চুপ। একটা থমথমে ভাব জেগে ওঠে। মা আঁচলে চোখ মোছেন, ললিতা মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করে। অসিতের বুকের তার বেজে উঠে। প্রণব একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে প্রেমলের আবেগ-উচ্ছল রাঙা মুখের পানে। প্রেমল একটু থেমে গাঢ়কণ্ঠে ব'লে চলে:

"আমি বলছি তোমাকে অসিত, তোমরা যদি য়ুরোপের মন্ত্রশিষ্য হ'য়ে ধর্মে তোমাদের সহজ শ্রদ্ধা হারিয়ে বিশ্বাসের কোঠায় দেউলে হয়ে পড়ো, তাহ'লে 'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ'—ভগবানকে ধর্মকে হারিয়ে সব হারাবে—কারণ ভারতের প্রাণপুরুষ আর কোথাও নেই, আছেন তার ধর্ম ধ্যান ভক্তির মর্মকোষে। তোমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে আজ ক্রমশঃ ফেঁপে উঠছে বুদ্ধিরোখালো, দম্ভজাঁকালো, ব্যঙ্গ ঝাঁঝালো অশ্রদ্ধা—যার চেয়ে সর্বনেশে বিষ আর নেই। গীতার কথা ভুলো না যে, "সংশয়াত্মা প্রণশ্যতি"—নাস্তিক অশ্রদ্ধাকে বরণ করার অন্য নাম—মরণবাড় বাড়া। মনে রেখো যে, বারবার বিদেশীদের হানা দেওয়া সত্বেও ভারতের আত্মাকে রক্ষা করেছেন ঠাকুর এই শ্রদ্ধার বর্মে, পথ দেখিয়েছেন পরা প্রজ্ঞার আলোয়, বাঁচিয়ে তুলেছেন ভক্তির সুরধুনীতে। তাই তোমরা দেশ হারালেও ধর্মকে আঁকড়ে ধ'রেছিলে ব'লে ধর্ম বারবারই তোমাদের রক্ষা করেছে। যুধিষ্ঠির একটি লাখ কথার এক কথা বলেছিলেন যক্ষকে যে, "ধর্ম এব হতো হন্তি, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ—" ধর্মকে মারলে ধর্ম তোমাদের মারবে, রাখলে—রাখবে।

অসিত : তোমার একথায় আমার মনেরও পুরো সায় আছে ভাই, বিশ্বাস কোরো। কেবল, কিছু মনে কোরো না—তুমি কি রোলাঁর 'পরে একটু অবিচার করছ না? রোলাঁ—

প্রেমল (হাত তুলে) : না অসিত, রোলাঁ, রাসেল, ডিকিন্সন—এঁদের ওকালতি কোরো না fair-minded হ'তে চেয়ে। অধর্ম সিঁধ কাটে এই সব ওকালতির ছিদ্র পেয়েই। রোলাঁ, রাসেল, ডিকিন্সন, ওয়েল্‌স্ এঁরা কেউ মন্দ লোক নন। মনে মনে এঁরা সত্যিই চান মানুষের মঙ্গল। কেবল জানেন না এক—সেরা মঙ্গল কী, দুই—কী ক'রে মানুষকে আত্মঘাতের অমঙ্গল থেকে বাঁচানো যায়। এঁদের হয়েছে কি বলব? মগজী বুদ্ধির তাঁবেদারি করতে করতে এঁরা প্রত্যেকেই আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি অনুভব খুইয়ে বসেছেন। তাই তো জগৎকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে চান সভাসমিতি, দলিলদস্তাবেজ, আন্তর্জাতিক সলাকলায়। আত্মিক দৃষ্টি উপলব্ধি থাকলে এঁরা কখনই এমন অশ্রদ্ধেয় কথা বলতেন না যে, ভারতের ধর্মনিষ্ঠা কুসংস্কার, ভক্তিবাদ শোচনীয়, গুরুবাদ সেকেলিয়ানা। এ-পুণ্যভূমিতে তাঁরা রাতারাতি নাস্তিক্যের আবাদ ক'রে সৌভ্রাত্রের সোনা ফলাতে চান—যে-দেশের প্রাতঃস্মরণীয় সাধুসন্তেরা স্তবগান করেছেন—শিবপীঠ বারাণসীর, দেবতাত্মা হিমালয়ের, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার—জড় মৃৎশিলার মধ্যেও তাঁরা ভগবানের দেখা পেয়ে ধন্য হয়েছেন, জীবজন্তুর মধ্যেও দিব্যলোকের প্রতীক খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে জ্ঞানী ভক্তেরা যুগযুগান্ত ধ'রে দীক্ষা পেয়ে এসেছেন জগৎপ্রণামের।

ললিতা (ফের চোখ মুছে) : কেবল একটা কথা বাপী—জগৎপ্রণাম ব্যাপারটা কী? কথাটা আগেও তোমার মুখে শুনেছি—কিন্তু মানেটা বলেছিলে কি না মনে পড়ছে না।

প্রেমল (ললিতাকে) : তোমার মনে নেই? বাঃ! এই সেদিনই যে মার সাম্‌নে পরে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম? শ্লোকটি বিখ্যাত। শোনো তবে, আবার বলি :

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

এর ভাবার্থ : আমাদের প্রতি ইন্দ্রিয় প্রতি বৃত্তিকেই ঈশ্বরমুখী করবে হবে : বাণী হোক শুধু তোমার গুণগানে রত, কান শুনবে কেবল তোমার কথা, হাত করুক তোমার পূজা, মন থাকুক তোমার চরণলগ্ন, চোখ করবে শুধু সাধুদর্শন আর মাথা প্রণামে ন'ত হোক এই জগতের উদ্দেশে যেখানে তোমার নিবাস। (অসিতকে) জগৎ-কথাটি কী সুন্দর, বলো তো? এ-অপরূপ ভাবধারা আর কোন্ দেশে ফুটে উঠেছে এমন শ্রদ্ধার বাগানে ভক্তির ফুলটি হ'য়ে!

ম (দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে) : শোনো অসিত আজ বলব তোমাকে—লগ্ন এসে গেছে—বলি নি একটু আগে?

তুমি আমাকে দুতিনবার জিজ্ঞাসা করেছ—আমি এ কুকুরটিকে কেন আমার বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়াই রোজ। এতদিন আমি বলি নি কারণ (পুলকে শিউরে)

আঃ!···আমি কুকুরকে সইতে পারতাম না।

মনে করতাম অপবিত্র। একদিন আমার ঠাকুরের ভোগ বেঁধে বিগ্রহের সামনে তাঁকে নিবেদন ক'রে প্রার্থনা করছি তাঁকে ভোগ গ্রহণ করতে—এমন সময়ে এই কুকুরটি—রাস্তার কুকুর—পিছন থেকে এসে সে-ভোগে মুখ দিয়েছে। চম্‌কে উঠে আমি পাশের লাঠি তুলে ওকে মারলাম। ও কেঁদে উঠল। অমনি আমি দেখলাম ···আমার···আমার ঠাকুর···বালগোপাল তার মধ্যে শুয়ে! ···আর···আর···তিনিও কাঁদছেন।

(গাঢ় কণ্ঠে) সেই থেকে এ-কুকুর হয়েছে আমার নিত্যসাথী। (উদ্দেশে প্রণাম)

প্রণব (চোখ মুছে) : আরতির সময় হয়েছে মা!

[ক্রমশঃ]

——

জন্ম-তিথির তীর্থে

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

বরষ শেষে হরষ ভরে ফিরে
এই সনাতন ধরার 'পরে ধীরে
কখন আবার জন্ম-লগন্ আসে!
আবার আলো উচ্ছ্বসিয়া হাসে;—
ঘাসে ঘাসে ঝলমলিয়ে ঝরে,
ঝরে নদীর উর্মিমালার 'পরে
প্রীতির ভরে,—তুলনা তা'র নাই।
পথিক আমি, পথ-চলা তাই চাই।

২

এই পথে যে ঋতুর লীলা চলে;
এই পথের ওই কুঞ্জ-ছায়ার তলে
যে সব পাখী উষার আলোয় জাগে,
যে সব ফুলে উতল বাতাস লাগে,
জন্ম-তিথি তা'দেরও সব আছে;
সে বার্তাটি যাই বা ভুলে পাছে,
জন্ম-লগন বুঝি বা তাই শেষে
সেই বারতা স্মরণ করায় এসে!

৩

জন্ম-লগন্—কাহার ধরায় নাই?
সবাই যে তা'র জানান্ দিয়ে যাই
অসীম পথের অজানা কোন্ টানে।
পথ যে মোদের সবার প্রাণে প্রাণে
পরম প্রীতির সূত্র রেখে রেখে
কোথায় নিয়ে চলছে জীবন থেকে
অন্য জীবন-নদীর বুঝি ধারে;
সব একাকার সেথায় একেবারে!

৪

সেথায় বুঝি জন্ম-লগন্ নাই?
তাই কি কেবল অসীম পথে ধাই?
সবার জন্ম-তিথির অবসানে
সবার পরশ পাবো সবাই প্রাণে;
বুঝ্‌বো তখন,—একই প্রাণের ঢেউ
সবার মাঝে, পর তো নহে কেউ,
জন্ম-তিথির সাগর হবো পার।
পথেরে তাই জানাই নমস্কার।

৫

জন্ম-তিথির আলোর তুফান আনো
হে পথ আমার—সন্ধানী, সব জানো।
বলো আমায়,—"চলার নেশায় ধাও;
সমুখ পানে কেবল ছুটে যাও;
তারপরে এই চলার যেথায় শেষ
পাবে যখন সেই সনাতন দেশ
জন্ম-দিনের সেদিন অবসান;
তাহার টানে চল্‌তে থাকো প্রাণ;
সবার জন্ম-তিথির পরশ পেয়ে
চল্‌তে থাকো পথের প্রেমে ধেয়ে।"

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব

বঙ্গানুবাদঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে একে একে সকলেই উপদেশ দেবার পর শ্রীকৃষ্ণও যথোচিত সান্ত্বনা দিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট গেলেন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রণিপত্য হৃষিকেশমভিবাদ্য পিতামহম্।

অনুমান্য গুরূন্ সর্বান্ পর্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকে প্রণাম করে যুধিষ্ঠির সমস্ত গুরুজনের অনুমতি নিয়ে বললেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ

রাজ্ঞাং বৈ পরমো ধর্ম ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।

মহান্তমেতং ভারং চ মন্যে তদ্‌ব্রূহি পার্থিব ॥২

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! ধর্মজ্ঞ আর বিদ্বানদের মত হচ্ছে এই যে রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কাছে ইহা বড় ভারী মনে হচ্ছে। অতএব হে ভূপাল আপনি আমাকে রাজধর্মের উপদেশ দিন।

রাজধর্মান্ বিশেষেণ কথয়স্ব পিতামহ।

সর্বস্য জীবলোকস্য রাজধর্মঃ পরায়ণম্ ॥৩

পিতামহ! রাজধর্ম সম্পূর্ণ জীবজগতের পরম আশ্রয়। অতএব আপনি রাজধর্মই বিশেষরূপে বর্ণন করুন।

ত্রিবর্গো হি সমাসক্তো রাজধর্মেষু কৌরব।

মোক্ষধর্মশ্চ বিস্পষ্টঃ সকলোঽত্র সমাহিতং ॥৪

কুরুনন্দন! রাজধর্মে ধর্ম অর্থ কাম এই তিনেরই সমাবেশ রয়েছে। আর এত স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ মোক্ষধর্মও রাজধর্মে নিহিত।

যথা হি রশ্ময়োঽশ্বস্য দ্বিরদস্যাঙ্কুশো যথা।

নরেন্দ্রধর্মলোকস্য তথা প্রগ্রহণং স্মৃতম্ ॥৫

অশ্বের যেমন রশ্মি, হস্তীর যেমন অঙ্কুশ, লোকগণের (মর্যাদারক্ষার্থে) কাছে রাজধর্ম তেমনি প্রয়োজনীয়।

তত্র চেৎ সম্প্রমুহ্যেত ধর্মে রাজর্ষিসেবিতে।

লোকস্য সংস্থা ন ভবেৎ সর্বং চ ব্যাকুলী ভবেৎ ॥৬

প্রাচীন রাজর্ষিদের দ্বারা এই রাজধর্মে যদি রাজা মোহবশত প্রমাদ করে বসে তবে সংসারের ব্যবস্থাই বিকৃত হয়ে পড়ে। সকল লোক দুঃখে পতিত হয়।

উদয়ন্ হি যথা সূর্যো নাশয়ত্যশুভং তমঃ।

রাজধর্মাস্তথালোক্যাং নিক্ষিপন্ত্যশুভাং গতিম্ ॥ ৭

সূর্যদেব উদিত হলেই যেমন অন্ধকার নাশ হয়ে যায় তেমনি রাজধর্ম মানুষের অশুভ আচরণ বা তাকে পুণ্যলোক থেকে দূরে রাখে তাকে নিবারণ করে।

তদগ্রে রাজধর্মান্ হি মদর্থে ত্বং পিতামহ।

প্রব্রূহি ভরতশ্রেষ্ঠ ত্বং হি ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ৮

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ, আপনি সকলের আগে আমার হিতের জন্যে রাজধর্ম ব্যাখ্যা করুন। কারণ আপনি ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আগমশ্চ পরস্ত্বত্তঃ সর্বেষাং নঃ পরন্তপ।

ভবন্তং হি পরং বুদ্ধৌ বাসুদেবোঽভিমন্যতে ॥ ৯

পরন্তপ পিতামহ! আমাদের সকলের জ্ঞান আপনার নিকট থেকেই হওয়া সম্ভব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আপনাকেই বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

ভীষ্ম উবাচ—

নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।

ব্রাহ্মণেভ্যোঃ নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥১০

ভীষ্ম বললেন—মহান্ ধর্মকে নমস্কার। বিশ্ববিধাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। এখন আমি ব্রাহ্মণদের নমস্কার করে সনাতন ধর্মের বর্ণনা আরম্ভ করব।

শৃণু কার্ৎস্ন্যেন মত্তস্ত্বং রাজধর্মান্ যুধিষ্ঠির।

নিরুধ্যমানান্ নিয়তো যচ্চান্যদপি বাঞ্ছসি ॥ ১১

যুধিষ্ঠির! এখন তুমি নিয়মপূর্বক একাগ্র হয়ে আমার কাছ থেকে রাজধর্ম শ্রবণ কর। আরও যদি অন্য কিছু শুনতে চাও তাও শোন।

আদাবেব কুরুশ্রেষ্ঠ রাজ্ঞা রঞ্জনকাম্যয়া।

দেবতানাং দ্বিজানাং চ বর্তিতব্যং যথাবিধি ॥ ১২

কুরুশ্রেষ্ঠ! রাজাকে সকলের আগে প্রজারঞ্জনের ইচ্ছাতে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।

দেবতানর্চয়িত্বা হি ব্রাহ্মণাংশ্চ কুরূদ্বহ

আনৃণ্যং যাতি ধর্মস্য লোকেন চ সমর্চ্যতে ॥ ১৪

হে কুরুকুলভূষণ! দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করে রাজা ধর্মঋণ থেকে মুক্ত হন। আর সারা জগৎ তাঁর সম্মান করে।

উত্থানেন সদা পুত্র প্রযতেথা যুধিষ্ঠির।

ন হ্যুত্থানমৃতে দৈবং রাজ্ঞামর্থং প্রসাধয়েৎ ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির! তুমি সর্বদা পুরুষার্থের জন্য প্রযত্নশীল থাকবে। পুরুষার্থ বিনা কেবল প্রারব্ধ দ্বারা রাজাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

সাধারণং দ্বয়ং হ্যেতদ্দৈবমুত্থানমেব চ।

পৌরুষং হি পরং মন্যে দৈবং নিশ্চিত্য মুহ্যতে ॥ ১৫

দৈব এবং পৌরুষ এ-দুই-ই কার্যসিদ্ধির পথে সমান, কিন্তু দুয়ের মধ্যে পৌরুষকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ মানুষ দৈবকে নিশ্চিত জেনে মোহগ্রস্ত হয়।

বিপন্নে চ সমারম্ভে সন্তাপং মাস্ম বৈ কৃথাঃ।

ঘটস্বৈব সদাত্মানং রাজ্ঞামেষ পরো নয়ঃ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির, যদি কোন কারণে পৌরুষ (আরব্ধ কার্য) নষ্ট হয়, তবে তার জন্যে সন্তাপ করো না। কার্যসাধনের জন্য সর্বদা পুরুষকারের আশ্রয় নেবে। এই রাজাদের শ্রেষ্ঠ নিয়ম।

নহি সত্যাদৃতে কিঞ্চিদ্রাজ্ঞাং বৈ সিদ্ধিকারণম্।

সত্যে হি রাজা নিরতঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥ ১৭

নৃপতির কাছে সত্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই সিদ্ধির কারণ হয় না। সত্যে নিরত থাকলে ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই আনন্দ লাভ করেন।

ঋষীণামপি রাজেন্দ্র! সত্যমেব পরং ধনম।

তথা রাজ্ঞাং পরং সত্যান্নান্যদ্বিশ্বাসকারণম্ ॥১৮

হে রাজেন্দ্র! মুনির কাছে সত্যই পরম ধন। রাজাদেরও সত্য ভিন্ন অন্য কিছু আচার মানুষের বিশ্বাসজনক হয় না।

গুণবান্ শীলবান্ দান্তো মৃদুর্ধর্ম্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সুদর্শঃ স্থূললক্ষ্যশ্চ ন ভ্রশ্যেত সদা শ্রিয়ঃ ॥১৯

গুণবান্, শীলবান্, শান্ত, কোমলপ্রকৃতি, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, সুন্দরাকৃতি, প্রচুর দানশীল রাজা কখনও রাজলক্ষ্মী থেকে বঞ্চিত হয় না।

আর্জবং সর্বকার্যেষু শ্রয়েথাঃ কুরুনন্দন।

পুনর্নয়বিচারেণ ত্রয়ীসংবরেণ ন চ ॥২০

হে কুরুনন্দন। সকল কাজেই সারল্য অবলম্বন করবে। কিন্তু নীতি বিচার অনুসারে ত্রয়ী সংবরণে (অর্থাৎ নিজের রন্ধ্র, নিজের মন্ত্রণা, ও নিজের কৌশল গোপন রাখা সম্বন্ধে) সরলতা দেখানো ঠিক নয়।

মৃদুর্হি রাজা সততং লঙ্ঘ্যো ভবতি সর্বশঃ।

তীক্ষ্ণাচ্চোদ্বিজতে লোকস্তস্মাদুভয়মাশ্রয়ঃ ॥২১

যে রাজা সর্বদা কোমল ব্যবহার করেন লোকে তাঁর আদেশ পালন করে না, আবার রাজা কঠোর ব্যবহার করলে, লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তাই রাজা আবশ্যকতানুসারে কঠোরতা ও কোমলতা দুই-ই অবলম্বন করবেন।

অদণ্ড্যাশ্চৈব তে পুত্র বিপ্রাশ্চ দদতাং বর।

ভূতমেতৎ পরং লোকে ব্রাহ্মণো নাম পাণ্ডব ॥২২

হে দাতৃশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব। তুমি ব্রাহ্মণদের কখনও দণ্ড দেবে না। কারণ সংসারে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী।

মনুনা চৈব রাজেন্দ্র গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা।

ধর্মেষু স্বেষু কৌরব্য হৃদি তৌ কর্তুমর্হসি ॥২৩

হে রাজেন্দ্র কুরুনন্দন। মহাত্মা মনু ধর্মশাস্ত্রে দুইটি শ্লোক গান করেছেন—তুমি এই দুইটি হৃদয়ে ধারণ করবে।

অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।

তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥২৪

জল থেকে অগ্নি, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়, আর পাথর থেকে লোহা সৃষ্ট হয়েছে। তাদের তেজ সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু নিজের উৎপত্তি-কারণের সঙ্গে যদি সংঘর্ষ হয় তবে শান্ত হয়ে যায়।

অয়ো হন্তি যদাশ্মানমগ্নিনা বারি হন্যতে।

ব্রহ্ম চ ক্ষত্রিয়ো দ্বেষ্টি তদা সীদন্তি তে ত্রয়ঃ ॥২৫

যদি লোহা পাথরের উপর, অগ্নি জলের উপর, এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপর আঘাত বা দ্বেষ করে, তবে এই তিনই দুর্বল হয়ে পড়ে।

এবং কৃত্বা মহারাজ নমস্যা এব তে দ্বিজাঃ।

ভৌমং ব্রহ্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধারয়ন্তি সমর্চিতাঃ ॥২৬

মহারাজ। ইহা বুঝে তুমি সর্বদা ব্রাহ্মণকে নমস্কার করবে। কারণ ব্রাহ্মণ পূজিত হলে পৃথিবী তদন্তস্থিত ব্রহ্ম বেদকে ধারণ করে।

এবং চৈব নরব্যাঘ্র লোকত্রয়বিঘাতকাঃ।

নিগ্রাহ্যা এব সততং বাহুভ্যাং যে স্যুরীদৃশাঃ ॥২৭

হে পুরুষসিংহ! যদিও এমনি বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি ত্রিলোক বিনাশে উদ্যত হয়, তাঁকে বাহুবলে পরাস্ত করে নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে হবে।

শ্লোকৌ চোশনসা গীতৌ পুরা তাত মহর্ষিণা।

তৌ নিবোধ মহারাজ ত্বমেকাগ্রমনা নৃপ ॥

তাত! নরেশ্বর! এই বিষয়ে পূর্বকালে শুক্রাচার্য গীত দুই শ্লোক প্রসিদ্ধ। মহারাজ! তুমি একাগ্রচিত্ত হয়ে এই দুই শ্লোক শোন।

উদ্যম্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।

নিগৃহ্ণীয়াৎ স্বধর্মেণ ধর্মাপেক্ষী নরাধিপঃ ॥২৯

বেদান্ত পারংগত ব্রাহ্মণই হোক না কেন, যদি সে শস্ত্র উঠিয়ে যুদ্ধে এসে উপস্থিত হয়, ধর্মাকাঙ্ক্ষী রাজার উচিত তাকে বন্দী করে রাখা।

বিনশ্যমানং ধর্মং হি যোঽভিরক্ষেৎ স ধর্মবিৎ।

ন তেন ধর্মহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥২৫

যে রাজা তার (ব্রাহ্মণের) দ্বারা বিনশ্যমান ধর্মকে রক্ষা করেন তিনি ধর্মজ্ঞ। অতএব তাকে (ব্রাহ্মণকে) হত্যা করলে তাঁকে ধর্মহা বলা যাবে না। বাস্তব পক্ষে ক্রোধই ক্রোধকে সংঘাত করে।

এবং চৈব নরশ্রেষ্ঠ রক্ষ্যা এব দ্বিজাতয়ঃ।

সাপরাধানপি হি তান্ বিষয়ান্তে সমুৎসৃজেৎ ॥৩১

হে নরশ্রেষ্ঠ! এরূপভাবে দ্বিজাতিকে রক্ষা করবে। অপরাধযুক্ত হলেও (তাদের প্রাণদণ্ড না দিয়ে] নিজের রাজ্য থেকে বের করে দেবে।

অভিশস্তমপি হ্যেষাং কৃপায়ীত বিশাম্পতে।

ব্রহ্মঘ্নে গুরুতল্পে চ ভ্রূণহত্যে তথৈব চ ॥৩২

রাজদ্বিষ্টে চ বিপ্রস্য বিষয়ান্তে বিসর্জনম্।

বিধীয়তে ন শারীরং দণ্ডমেষাং কদাচন ॥৩৩

প্রজানাথ। যদি কোন ব্রাহ্মণ কলঙ্কিত হয়, তার উপর কৃপা করাই উচিত। ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীগমন, ভ্রূণহত্যা, ও রাজদ্রোহের অপরাধ হলেও ব্রাহ্মণকে দেশ থেকে বের করে দেওয়াই বিধান। তাকে শারীরিক দণ্ড কখনও দেওয়া ঠিক নয়।

প্রিয়াশ্চ নরাস্তে স্যুর্ভক্তিমন্তঃ দ্বিজেষু যে।

ন কোষঃ পরমন্যোঽস্তি রাজ্ঞঃ পুরুষসঞ্চয়াৎ ॥৩৪

ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্ত নরগণ সকলের প্রিয় হয়। রাজাদের কাছে ব্রাহ্মণদের ভক্ত সংগ্রহ করার চেয়ে বড় রাজকোষ আর নেই।

দুর্গেষু চ মহারাজ ষট্‌সু যে শাস্ত্রনিশ্চিতাঃ।

সর্বদুর্গেষু মন্যন্তে নরদুর্গং সুদুস্তরম্ ॥৩৫

মহারাজ! মরু, জল, পৃথ্বী, বন, পর্বত আর মনুষ্য এই ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে মানবদুর্গই প্রধান। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জ্ঞাতা বিদ্বান্ এই সকল দুর্গের মধ্যে মানবদুর্গকেই দুর্লঙ্ঘ্য বলে মনে করেন।

তস্মান্নিত্যং দয়া কার্যা চাতুর্বর্ণ্যে বিপশ্চিতাঃ।

ধর্মাত্মা সত্যবাক্ চৈব রাজা রঞ্জয়তি প্রজাঃ ॥৩৬

অতএব বিদ্বান্ রাজার কর্তব্য চতুর্বর্ণের উপর সর্বদা দয়া রাখা। ধর্মাত্মা আর সত্যবাদী রাজাই প্রজাকে প্রসন্ন রাখতে পারে।

ন চ ক্ষান্তেন তে নিত্যং ভাব্যং পুত্র সমন্ততঃ।

অধর্মো হি মৃদু রাজা ক্ষমাবানিব কুঞ্জরঃ ॥ ৭

পুত্র। তুমি সর্বদা ও সকলের প্রতি ক্ষমাশীল হবে না। কারণ ক্ষমাশীল হস্তীর মত স্বভাবশীল রাজা অপরকে ভীত করতে পারে না বলে অধর্মের প্রসারে সহায়ক হন।

বার্হস্পত্যে চ শাস্ত্রে ৪ শ্লোকো নিগদিতঃ পুরা।

অস্মিন্নর্থে মহারাজ তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৩৮

মহারাজ! একথার সমর্থনে বার্হস্পত্য শাস্ত্রের শ্লোক বলছি, শ্রবণ কর।

ক্ষমমাণং নৃপং নিত্যং নীচঃ পরিভবেজ্জনঃ।

হস্তিযন্তা গজস্যৈব শির এবারুরুক্ষতি ॥৩৯

নীচ মনুষ্য ক্ষমাশীল নৃপতিকে সর্বদা গালি দেয়, যেমন মাহুত সর্বদা হাতীর শিরেই বসে থাকতে চায়।

তস্মান্নৈব মৃদুর্নিত্যং তীক্ষ্ণো নৈব ভবেন্নৃপঃ।

বসন্তার্ক ইব শ্রীমান্ ন শীতো ন চ ঘর্মদঃ ॥৪০

বসন্তকালের সূর্য যেমন খুব শীতলও নয়, ঘর্মকারকও নয়, তেমনি নৃপতির অধিক কোমল হওয়াও উচিত নয়, অধিক কঠোর হওয়াও উচিত নয়।

প্রত্যক্ষেণানুমানেন তথোপম্যাগমৈরপি।

পরীক্ষ্যাস্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব নিত্যশঃ ॥৪১

মহারাজ! প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম এই চার প্রমাণ দ্বারা সর্বদা আপন-পরের পরিচয় নিতে থাকবে।

ব্যসনানি চ সর্বাণি ত্যজেথা ভূরিদক্ষিণ।

ন চৈব ন প্রযুঞ্জীত সঙ্গং তু পরিবর্জয়েৎ ॥৪২

হে প্রচুর দানশীল রাজা। তুমি সকল প্রকারের ব্যসন পরিত্যাগ করবে। কিন্তু সাহস আদিরও সর্বথা প্রয়োগ করবে না এমন কথা নেই। অতএব সব প্রকারের ব্যসনের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে হবে।

লোকস্য ব্যসনী নিত্যং পরিভূত ভবত্যুত।

উদ্বেজয়তি লোকং চ যে হতিদ্বেষী মহীপতিঃ।

ব্যসনে আসক্ত রাজা সকল লোকের অনাদরের পাত্র হন। আর যে রাজা সকলের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষযুক্ত হন, তিনি সকলের উদ্বেগকারক হয়ে থাকেন।

ভবিষ্যতি সদা রাজ্ঞা গর্ভিণী সহধর্মিণা।

কারণং চ মহারাজ শৃণু যেনেদমিষ্যতে ॥৪৪

মহারাজ! রাজা প্রজাদের সঙ্গে গর্ভিণীর স্ত্রীর মত ব্যবহার করবে। তার কারণ কি তা বলছি, শ্রবণ কর।

যথা হি গর্ভিণী হিত্বা স্বং প্রিয়ং মনসোহনুগম্।

গর্ভস্য হিতমাধত্তে তথা রাজ্ঞাপ্যসংশয়ম্ ॥৪৫

বর্তিতব্যং কুরুশ্রেষ্ঠ সদা ধর্মানুবর্তিনা।

স্বং প্রিয়ং তু পরিত্যজ্য যদ্ যল্লোকহিতং ভবেৎ ॥৪৬

গর্ভিণী স্ত্রীলোক যেমন নিজের প্রিয় ভোজন আদি পরিত্যাগ ক'রে কেবল গর্ভস্থ সন্তানের হিত কামনা করে, তেমনি ধর্মাত্মা রাজারও উচিত ঠিক ঐ-রকম আচরণ করা। কুরুশ্রেষ্ঠ, রাজার নিজের প্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করে যাতে সকল লোকের হিত হয় সেরূপ কার্য করা উচিত।

ন সংত্যাজ্যং চ তে ধৈর্যং কদাচিদপি পাণ্ডব।

ধীরস্য স্পষ্টদণ্ডস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৪৭

পাণ্ডুনন্দন! তুমি কখনও ধৈর্য ত্যাগ করবে না। যে রাজা অপরাধীকে দণ্ড দিতে সংকোচ করেন ও সর্বদা ধৈর্য ধারণ করেন, তার কখনও ভয় আসে না।

পরিহাসশ্চ ভৃত্যৈস্তে নাত্যর্থং বদতাং বর।

কর্তব্যো রাজশার্দূল দোষমত্র হি মে শৃণু ॥৪৮

হে রাজশ্রেষ্ঠ রাজশার্দূল! তুমি চাকরবাকরদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করবে না। এতে যে দোষ হয় তা শোন।

অবমন্যন্তি ভর্তারং সংহর্ষমুপজীবিনঃ।

স্বে স্থানে ন চ তিষ্ঠন্তি লঙ্ঘয়ন্তি চ তদ্বচঃ ॥৪৯

রাজা থেকে জীবিকা অর্জনকারী যে সব ভৃত্যের সঙ্গে রাজা পরিহাস করেন, তারা প্রভুকে অবমাননা করে, নিজ স্থানে থাকে না, প্রভুর আদেশও লঙ্ঘন করে থাকে।

প্রেষ্যমাণাবিকল্পন্তে গুহ্যং চাপ্যনুযুঞ্জতে।

অযাচ্যং চৈব যাচন্তে ভোজ্যান্যাহারয়ন্তি চ ॥৫০

তাদের যখন কোন কাজে পাঠান হয় তাতে সন্দেহসৃষ্টি করে। রাজার গোপনীয় খবরও জানতে চায়। যা চাওয়ার যোগ্য নয়, তাও চেয়ে বসে। রাজার জন্যে রক্ষিত ভোজ্যদ্রব্যও খেয়ে ফেলে।

ক্রুধ্যন্তি পরিদীপ্যন্তি ভূমিপায়াধিতিষ্ঠতে।

উৎকোচৈর্বঞ্চনাভিশ্চ কার্যান্যনুবিঘ্নন্তি চ ॥৫১

তারা রাজ্যের অধিপতিকে ডাঁট দেখায়, ক্রোধের সঙ্গে কথা বলে, উৎকোচ গ্রহণ করে ও বঞ্চনা দ্বারা রাজার স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

জর্জরং চাস্য বিষয়ং কুর্বন্তি প্রতিরূপকৈঃ।

স্ত্রীরক্ষিভিশ্চ সজ্জন্তে তুল্যবেষা ভবন্তি চ ॥৫২

জাল আজ্ঞাপত্র প্রচার করে রাজার রাজ্য জর্জরীভূত করে ফেলে। স্ত্রীরক্ষীদের বেশ ধারণ করে তাদের সঙ্গে মিশে যায়।

বাতং নিষ্ঠীবনংচৈব কুর্বতে চাস্য সন্নিধৌ।

নির্লজ্জা রাজশার্দূল ব্যাহরন্তি চ তদ্বচঃ ॥৫৩

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেরূপ ভৃত্যেরা নির্লজ্জ হয়ে রাজার সামনে বায়ুত্যাগ করে, থুথু ফেলে, রাজার মুখের কথা টেনে এনে নিজেরা বলে।

হয়ং বা দন্তিনং বাপি রথং বা নৃপসত্তম ॥
অধরোহন্ত্যবজ্ঞায় সহর্ষাঃ পার্থিবে মৃদৌ ॥৫৪

হে নৃপসত্তম! রাজা কোমল হলে ভৃত্যেরা তাঁর হাতী, ঘোড়া, রথ সব সানন্দে আরোহণ করে।

ইদং তে দুষ্করং রাজন্নিদং তে দুষ্টচেষ্টিতম্।
ইত্যেব সুহৃদো বাচং বদন্তে পরিষদ্ গতাঃ ॥৫৫

রাজার কৃত্রিমবন্ধুরা বলতে থাকে—রাজা আপনাকে দিয়ে একাজ হবে না। আপনার এচেষ্টা দোষযুক্ত।

ক্রুদ্ধে চাস্মিন্ হসন্ত্যের, নচ হৃষ্যন্তি পূজিতাঃ।
সংঘর্ষশীলাশ্চ তদ্ ভবন্ত্যন্যোন্য কারণাৎ ॥৫৬

মৃদু রাজা ক্রুদ্ধ হলে ভৃত্যেরা হাস্য করে। রাজা সম্মান করলেও ভৃত্যেরা আনন্দিত হয় না। সভাকালে পরস্পরের স্বার্থ আদায়ের জন্যে ঝগড়ায় মত্ত হয়।

বিস্রংসয়ন্তি মন্ত্রঞ্চ বিবৃন্বন্তি চ দুষ্কৃতম্।
লীলয়া চৈব কুর্বন্তী সাবজ্ঞা স্বস্য শাসনম্ ॥৫৭
অলঙ্কারে চ ভোজ্যে চ তথা স্নানানুলেপনে।
হেলনানি নরব্যাঘ্র! স্বস্থাস্তস্যাপশৃন্বতঃ ॥৫৮

নরশ্রেষ্ঠ! রাজভৃত্যেরা গোপন মন্ত্রণা প্রকাশ করে, রাজার দুষ্কৃত কার্য প্রচার করে, রাজার আদেশ অবহেলার সঙ্গে পালন করে। রাজার অলঙ্কার খাদ্য, পানীয় ও অনুলেপন সম্বন্ধে কোন যত্ন নেয় না, রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অবহেলার কথা বলে।

নিন্দন্তে স্বানধিকারান্ সন্ত্যজন্তে চ ভারত।
ন বৃত্ত্যা পরিতুষ্যন্তি রাজদেয়ং হরন্তি চ ॥৫৯

ভরত নন্দন, তারা আপন আপন পদের নিন্দে করে, স্বেচ্ছায় সে সব পদ পরিত্যাগ করে চলে যায়, রাজদত্ত বেতনে তুষ্ট হয় না। রাজদেয় বেতন নিজেরাই হরণ করে।

ক্রীড়িতুং তেন চেচ্ছন্তি সসূত্রেণেব পক্ষিণা।
অস্মৎ প্রণেয়ো রাজেতি লোকাংশ্চৈব বদন্ত্যত ॥৬০

রাজা যেন সূত্রবদ্ধ পাখী, তেমনি ভাবে তারা খেলা করে আর লোককে বলে—আমরাই তো রাজাকে চালাই।

এতে চৈবাপরে চৈব দোষঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যত।
নৃপতৌ মার্দবেহপ্যেতে বহুলে চ যুধিষ্ঠির ॥৬১

হে রাজা যুধিষ্ঠির! রাজা কোমল হলে বা ভৃত্যগণের সহিত হাস্য পরিহাস করলে এ-সবএবংআরো কত সব দোষ এসে যায়।

[ক্রমশঃ

নির্ব্বাক

জগদীশচন্দ্র দাস

শেষ মুহূর্ত শুধু চাপ চাপ অন্ধকারে ঢাকা—
অম্বর সুনীল, স্নিগ্ধ নক্ষত্রের টিপে ছবি আঁকা।
একা তবু ভেসে যাই, সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাসে
কান পাতি পদধ্বনি তরে, যদি কেহ ভুলে হেথা
আসে।
ডুবে যাই, ভেসে উঠি, কত রস, কত স্বপ্ন-আলোতে
আঁধারে—
হাসি, কান্না ভালবাসা—হিংসা, দ্বেষ ক্ষমার মাধুর্য্য
সব সুর বাজে এক তারে
নয়নের জলে স্রোত—নয়নের আলোতে আগুন
শিল্পী মন ছবি আঁকে হাত তার সৌন্দর্য্যে নিপুণ,
এক রঙে বহু ছবি,—উচ্চ, নীচ, নম্র, স্থির, নতুবা
চঞ্চল—
নতুবা কলুষঘৃণ্য—ঐ রঙে মেঘ ঢালে জল ;
ঐ রঙে আলো হাসে, দ্বার খুলে দিয়েছে সে ডাক —
ঐ রঙে বিস্মৃতি, বিস্ময়—কোলাহল অথবা নির্ব্বাক।

——

মল্লিকা

জগদীশচন্দ্র দাস

প্রতিদিন যেমন আসে আজও রাত সাতটার পর ৭।২ অনাদি বোস লেনের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল শুভেন। বেসামাল হাত-দিয়ে দরজার কড়াটা বার দুয়েক নাড়া দিল। তারপর খেয়ালের ঝোঁকে মাথা নীচু করে আপন মনে হাসছিল। হয়ত এ বাড়ীতে ঢোকবার আগে মল্লিকার ছেলেমানুষী আবদারের কথা এই অসময়ে খেয়াল করতে পেরে তার কথা ভেবেই নিজের খেয়ালী হাসিকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রাখবার চেষ্টা করেনি সে। ভেবেছে, মল্লিকার এই তুচ্ছ আবদার অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে। তাতেও যদি সে না ভোলে, নিজে অসহযোগ করলে একদিন নিরাশ হয়ে আর এই ধরণের আবদার তার কাছে করতে আসবে না।

হিসেবে ভুল করেছিল শুভেন। তাই আজকের বোঝা-পড়া তাকে সচেতন করে তুলতে বাধ্য হোল।

আশার মধ্যে আনন্দ। সেই উত্তেজনা নিয়েই শুভেনের কড়া নাড়ার শব্দ কানে ঢুকতেই আজ দরজা খুলে দেবার জন্যে ছুটে এসেছিল মল্লিকা। কিন্তু দরজা খুলে দেবার পর তার সুন্দর মুখে রক্ত জমেছে। আজও মাতাল অবস্থায় শুভেনকে তার কাছে একা আসতে দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি মল্লিকা। উত্তপ্ত লাভার মতন সে কটূক্তি ও অপমানের ঝাঁঝ ছিটিয়ে দিয়েছে শুভেনের দিকে—আবার তুমি যত সব ছাইভস্ম গিলে এখানে এসেছ? কালই তোমাকে বলেছিলুম না যে আর আমার কাছে ফূর্তি করতে আসবে না? আমি তোমার কে? যার কাছে তোমার ছেলেকে আনতে ভয় পাও, সেই পিশাচীর কাছে আসতে তোমার লজ্জা করে না? কালকের কথা এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভুলে গেলে?

মল্লিকার কালকের কথা ভোলেনি শুভেন। এখন মাতাল হলেও কালকের সব কথা তার মনে পড়ছে। মল্লিকাকে স্পর্শ করে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মল্লিকার সর্ত সে মেনে নেবে। মাতাল সেজে এ বাড়ীতে আর পদার্পণ করবে না। আর যে ভাবেই হোক, প্রদীপকে সে তার কাছে একদিনের জন্যেও নিয়ে আসবে। কিন্তু আজও প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি শুভেন রায়। সেই প্রতিদিনের মতই অফিস ছুটির পর ক্লান্ত শরীরকে "বারে" টেনে এনে মদ গিলেছে, তারপর ছুটে এসেছে মল্লিকার কাছে। তবু নিজের আচরণকে সংযত করতে পারেনি শুভেন।

আজকের মতন এতটা তিরস্কার তাকে কোনদিন করেনি মল্লিকা। সাপিনীর মতন তার সারা শরীর যেন ক্রোধে জ্বলছে। তাহ'লে সে কি ভেবেছে যে, তার এই ভালবাসা মেকি, মূল্যহীন? শুধু নিজের ভোগ লালসার জন্যে তার কাছে নিয়মিত সে আসছে! কেন এতদিন বাদে তার আচার, আচরণ ভাল লাগবে না মল্লিকার? আজ এ বাড়ীতে এখন কেউ নেই। সদরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাড়ীর ভিতরে পৌছবার পর আজ কাউকে দেখতে পেল না শুভেন। কোথায় গেলেন আজকে বাসন্তী কাকিমা, অর্থাৎ মল্লিকার মা। ওদের ঠাকুর্দার আমলের লোক সেই যশোদাকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। ঠিক শোকাতুরা, সন্ন্যাসিনীর মতন সাজে এক পাশে বসে আছে মল্লিকা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওর চোখের কোণে জল।

এবার মল্লিকার দুঃখকে বুঝতে অসুবিধা হোল না শুভেনের। নিজের সঙ্গে তুলনা করতেই সহজেই অনুভব করতে পারল শুভেন যে মল্লিকাকে সে কিছুই দিতে

পারেনি। তার কাছ থেকে মল্লিকার যা পাওয়া উচিত ছিল তার এক কণাও সে পায়নি। অথচ, সে নিজে লোভীর মতন তার যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। মল্লিকা জানে বা মল্লিকা বোঝে, যে তাকে শুভেন রায় ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসায় ফাঁক আছে। এই ভালবাসাকে সমাজ মর্য্যাদা দেয় না, বরঞ্চ কলঙ্ক রটাবার জন্যে প্রস্তুত থাকে। আজ যৌবনের শেষ সীমান্তে পৌঁছে নিজের মনে বিশ্লেষণ করে শুভেন রায় দেখতে পায় যে তার যোগ্য স্ত্রী হবার অধিকার মল্লিকার ছিল। তাই সমাজ-লাঞ্ছিতা নারী হিসেবে তার আজ ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। পনের বছর পূর্ব্বের একটি ঘটনার কথাও ভুলে যায়নি মল্লিকা। এখনকার মতন সেদিন তুমি সাহস দেখাতে পারনি। সেদিন তোমার অন্তর পুরোপুরি মল্লিকাকে ভালবাসলেও জোর করে নিজের দাবী আদায় করে নিতে পারনি। ভীরু, কাপুরুষের মতন তাকে শুধু আশ্বাস দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে তার নাগালের বাইরে। নিজের মনকে ঠকাবার ভয়ে বলেছিলে, যারা গুরুজন, যাদের আশীর্ব্বাদ ছাড়া ভবিষ্যতের দায়, বিপদে উদ্ধার পাওয়া যাবে না, তাদের কথার অবাধ্য হওয়ার অর্থ জীবনের দারুণ ক্ষতিকে ডেকে আনা। পিতামাতার আদর্শবান সন্তান তুমি। মল্লিকাকে ভালবাসবার পূর্ব্বে চিন্তা করনি যে তাদের জীবনধারা সঙ্গে তোমাদের বাড়ীর প্রাচীন জীবন-ধারার সঙ্গে মিলবে না। তার ওপর জাতের বাধা। মল্লিকাদের সঙ্গে তোমাদের বৈবাহিক-সূত্র স্থাপন জাতিগত বৈষম্যের দরুন আকাশপাতাল ফারাক থাকার ফলে যে সম্ভব নয় সেটিও তুমি বুঝতে পেরেছিলে শুভেন। শেষ পর্য্যায়ে যখন তোমার কানে এল মল্লিকার মায়ের নামে প্রচারিত কুৎসার কথা, সেদিন পিতামাতার আদর্শবান ছেলে হিসেবে নিজেকে জাহির করতে সাময়িক ভাবে মল্লিককে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলে। সেদিন তোমার ছল-চাতুরী মল্লিকা বুঝতে পারেনি। শুধু তোমাকে হারাবার ভয়ে চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজিয়েছিল। আর তুমি সেদিন হাসতে হাসতে বরণ করে ঘরে এনেছিলে সুলতাকে।

তবু তোমার ওপর অনুরাগ ছিল মল্লিকার। জীবনের প্রথম প্রেমকে সে ভুলতে পারেনি, জোর করে ভুলতে চায়নি। পরবর্ত্তী জীবনে অনেকের অনুরাগ প্রত্যাখান করেছে শুধু তোমার প্রতি আসক্তি বজায় রাখতে। বিবাহের পরও তাই তোমাকে আসতে দিয়েছে নিজের কাছে। অন্যের স্বামী জেনেও তোমাকে সে কোনদিন ছলনা করেনি, বরঞ্চ নিজেকে তোমার প্রেয়সীর মতন সেবা-যত্ন দিয়ে ভালবেসেছে।

এর ফল হয়েছে শোচনীয়। যারা তোমাকে জানে না, চেনে না, তারা এ বাড়ীতে তোমাকে প্রতিদিন আসতে দেখে মল্লিকার গায়ে কালি ছুঁড়ে দিয়েছে—সে খবর তোমার জানা নেই শুভেন। কোনদিন অন্তর দিয়ে অনুভব করনি মল্লিকার দুঃখকে। সে অনেক ত্যাগ করেছে, তাই নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে মোহজাল বিছিয়ে তোমাকে এখানে সব সময়ের জন্যে আটকে রাখতে চায় না। সুখ ও আনন্দের স্বপ্ন দেখা তার শেষ হয়েছে। তুমি জান আর নাই জান, সমাজ জানুক অথবা নাই জানুক সে তোমাকে এখনও স্বামী ছাড়া আর কিছু ভাবে না। তাই তোমাকে স্বামীর মতন ভালবাসে বলেই সন্তান-সোহাগী জননীর মতন তোমার ছেলে প্রদীপকে ভালবাসতে চায় মল্লিকা। তার প্রতিদিনের অনুরোধ তুমি মন দিয়ে শুনেছ শুভেন। তার কাছে প্রদীপকে আনবার প্রতিশ্রুতিও তুমি দিয়েছ। ছেলেকে আদর-যত্ন ও ভালবাসার জন্যে যে মায়ের মন এখন চঞ্চল তার কাছে তোমার ছেলেকে আনতে আপত্তি থাকবে কেন?

কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা শুভেনের পক্ষে অসম্ভব। আগের মতন আর ছোটটি নেই প্রদীপ। এখন সবকিছু বুঝতে শিখেছে সে। ন'-দশ বছরের ছেলেকে এখানে এনে মল্লিকার সত্যিকারের পরিচয় জানালে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে। মল্লিকাকে তাই বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছে শুভেন। কিন্তু শুভেনের কথা মল্লিকা বুঝতে চায়নি। করুণ সুরে অনুরোধ করেছে—আমার সম্বন্ধে প্রদীপের কাছে সত্য, মিথ্যা যে কোন পরিচয় তুমি দিতে পার, তাতে আমার দুঃখু নেই, শুধু তাকে যেন একবার দেখতে পাই। তোমার ছেলে হিসেবে তাকে যেন একটু আদর করতে পারি।

অবুঝকে বোঝা'ন সম্ভব নয় বলেই তাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শুভেন। আশ্বাস দেখিয়ে, বলেছে - আমি তোমার অনুরোধ রাখতে চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। কোন রকম চেষ্টা করেনি শুভেন। মাসের পর মাস কেটে গেছে। মল্লিকা তখন বুঝতে পেরেছে শুভেন তার মনকে শান্ত করতে মিথ্যে বলেছে। শেষ পর্য্যন্ত অন্য পথ ধরেছিল মল্লিকা। প্রদীপকে এখানে না আনলে তাকে ভয় দেখাতে হবে—বলতে হবে প্রদীপকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসতে না পারলে তুমিও আর এ বাড়ীতে আসবে না। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আজকাল এই ধরণের কথা প্রতিদিন শুভেনকে বলছে মল্লিকা। কিন্তু মল্লিকার এই ভ কে গ্রাহ্য করেনি শুভেন। প্রতিদিন সে আসছে, প্রতিদিনের একই ইতিহাস।

কিন্তু আজকের সুরটা ভিন্ন ধরনের। আজকের সুরের মধ্যে অভিমান ও দুঃখের তাপ ছাড়াও ক্ষোভের উত্তাপ সুস্পষ্ট। শুভেনের মনে হোল তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করত বলেই এতদিন নিজের রূঢ় ভাব প্রকাশ করেনি মল্লিকা। শুভেনের ব্যবহারকে সহজ মনে সহ্য করেছে। দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছে শুভেনের মনকে বিশ্বাস করে। কিন্তু যে লোক প্রতিদিন এসে মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে নিজের মনকে শান্ত করে চলে যায় তার মনের কথা কি বেশী দিন গোপন থাকে? আজ সে পুরোপুরি চিনতে পেরেছে শুভেন রায়কে। লোকটা সারা জীবন ভালবাসার অভিনয় দেখিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছে।

একভাবে ঘণ্টা খানেক সময় বসে ছিল শুভেন। মাঝে মাঝে চো ঘুরিয়ে দেখছিল মল্লিকাকে। না, তার মুখ আজ কঠিন ইস্পাতের মতন দেখাচ্ছে। তার প্রতি ছিটে ফোঁটা করুণা নেই মল্লিকার। আজকে তার ব্যবহার শুধু অভিমান বা দুঃখেও কান্না কাঁদেনি, সেই সঙ্গে তার প্রতি ঘৃণা দেখিয়ে, অপমান করে দারুণ আঘাত হেনেছে শুভেনকে। অর্থাৎ আর তাকে কোন দিন ভালবাসবেনা মল্লিকা। তাকে সে ঘৃণা দেখিয়ে চলে যেতে বলেছে, পুনর্বার আসতে বারণ করেছে। এ বাড়ীতে মল্লিকার কাছে নিজের প্রয়োজনে যেন ছুটে আসে না শুভেন রায়। বেশ, তাই হবে মল্লিকা।

বাড়ী ফেরবার জন্যে বিমর্ষ ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল শুভেন। তারপর ধীর গতিতে এগিয়ে গেল মল্লিকার কাছে। মল্লিকা তার দিকে মুখ ফেরাতেই শুভেন বলতে লাগল, তোমার কথা মতন আমি চলে যাচ্ছি মলি। আমাকে যখন আর সহ্য করতে পারছ না, আমাকে যখন অমানুষ ভাবছ তখন আজকের আসাই আমার শেষ আসা। ভবিষ্যতে তার কোন দিন তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।

দেখতে পেল মল্লিকা সদরের দিকে ধীরে গতিতে এগিয়ে গেল শুভেন। হয়ত আশা করেছিল পিছন থেকে তার গতি রোধ করতে ছুটে যাবে মল্লিকা। কিন্তু কেন শুভেনকে সে সুযোগ দেবে মল্লিকা? হৃদয় তার দুঃখের তাপে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক, শুভেনের অভাবে তার মন আরও ভেঙ্গে পড়ুক, তবু নিজের দুর্বলতা জানাতে তাকে সে ফেরাতে পারবে না।

তার পর দিন থেকে শুভেন রায় নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেছে। প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে তবু এ বাড়ীমুখো আর হয়নি। মল্লিকার অস্বস্তি দিনের পর দিন বেড়েছে। ভাবতে পারেনি যে তার কথায় আঘাত পেয়ে চি-দিনের মতন শুভেন রায় তার কাছে আসবে না। তাহলেই তার প্রিয়তমের ছেলেকে কি একদিনের জন্যেও কাছে পাবে না সে? কেন সে এতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করল?

মনে হয়, মল্লিকার অন্তর-বেদনা বুঝতে পেরেছিলেন অন্তর্যামী। তাই শুভেনের ছলে প্রদীপের দেখা পেয়েছে মল্লিকা। অন্তর তার ভরে গেছে মাতৃত্বের অনুভূতিতে। বুকের মধ্যে যে স্থান সন্তান কামনার সৌরভে শূন্য হয়েছিল আজ অনাবিল আনন্দের মধ্যে প্রদীপকে কাছে পেয়ে সেখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে একটি সুন্দর গোলাপ। শুভেন জানে না, প্রদীপের মা সুলতাও জানে না যে দিন কয়েক হোল তার এখানে যাতায়াত করছে তাদের ছেলে প্রদীপ। তাকে 'মা' ডাকতে শিখিয়েছে মল্লিকা। শুধু 'মা', এই 'মা' ডাকের মধ্যে তার বুকের জ্বালা কমে যায়। তাই 'মাসীমা' 'কাকীমা' নয়, শুধু 'মা'। প্রদীপ মল্লিকাকে 'নতুন-মা' বলে ডাকে।

সত্যি, অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে প্রদীপের সঙ্গে মল্লিকার, ছেলের সঙ্গে মায়ের।

বন্ধু নরেনের সঙ্গে একদিন বল খেলে মল্লিকাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে বাড়ী ফিরছিল প্রদীপ। ফুটবল খেলতে মাঠে গেলে ঐ রাস্তা দিয়েই বাড়ী ফিরত প্রতিদিন। ঐ সরু রাস্তাটা দিয়ে আসতে পারলে বেশী ঘুরতে হয় না, তাড়াতাড়ি ফেরা যায় বাড়ীতে। নরেন না দেখলেও অনেকদিন ঠিক তাদের বাড়ী ফিরে যাবার সময় মল্লিকাকে সদরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে প্রদীপ। ছোট্ট প্রদীপ বুঝতে পারেনি মল্লিকার উৎসুক দৃষ্টিকে। অথচ কেমন ভাষা ভাষা মমতায় ভরা তার দৃষ্টি। চোখে চোখ পড়লে কেমন মিষ্টি করে হেসেছে তার দিকে। ঠিক তার মায়ের মতন হাসি, যখন তিনি প্রদীপকে বুকের কাছে টেনে এনে আদর করেন, প্রদীপ তখন তার মায়ের মিষ্টি হাসি মনভরে লক্ষ্য করেছে।

এদিকে অপরিচিত প্রদীপকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছে মল্লিকা। ঠিক তার মতন মুখ। শ্যামবর্ণ হোক, তবু মুখের আদলটি খুব মিষ্টি। টানা টানা চোখ দুটো ভাষা ভাষা, কোন অমিল নেই শুভেন রায়ের মুখের সঙ্গে। তাহলে ঐ কি শুভেনের ছেলে প্রদীপ? বর্ত্তমান ঠিকানা তাকে কিছুতেই বলেনি শুভেন। শুধু শুনেছিল ওরা তার কাছাকাছি থাকে। কিন্তু কোন্‌খানে, কোন্ পাড়ায়? শুধু তাকে বলেছে—এখানকার ঠিকানা জেনে কি করবে? এখন যেখানে আছি সেখানে মানুষ থাকে না। শুধু উপায় নেই বলেই কোন রকমে ঘাড় গুঁজে দিন কাটাচ্ছি। তাই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। তাছাড়া সুলতাকে তুমি না চিনলেও সে কিন্তু তোমাকে দেখলেই চিনতে পারবে। তাতে তোমার আমার দুজনেরই ক্ষতি মল্লিকা।

ঠিক বলেছ আমাদের দুজনের ক্ষতি। তাই দরকার নেই তোমার ঠিকানা। বলা তো যায় না মেয়েমানুষের মন, কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে যদি তোমার বাড়ী গিয়ে সুলতাকে নিজের পরিচয় দিয়ে আসি!

অনেকটা শুভেনের অসন্তোষের ভয়ে তার ঠিকানা জানার ব্যাপারে জেদ করেনি মল্লিকা। এখন অতীতের কথা মনে পড়লে কষ্ট বাড়ে। তাই অতীতকে ভুলে যাক তার মন। শুধু সাহস বজায় রেখে একদিন ঐ ছেলেটাকে কাছে ডেকে আনতে পারলে সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। যাই হোক, ভগবান তার সহায় আছেন বলে একটি সহজ সুযোগ হাতের কাছে পেল মল্লিকা। তখন ঘুড়ি ওড়াবার মরশুম। আকাশে তখন অনেকগুলো সুন্দর ঘুড়ি উড়ছে। সেই সময় মল্লিকাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে বাড়ী ফিরছিল প্রদীপ। আজ সে একা এসেছে একাই ফিরে যাচ্ছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল মাথার ওপর দিয়ে একটা সুন্দর ঘুড়ি কেটে যাচ্ছে। হাত বাড়াল সে, না তার হাতের নাগালের অনেক উঁচুতে সুতো ঝুলছে। ঘুড়িটা ধরবার জন্যে পিছন থেকে একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এল। না, তাদের কেউ ধরতে পারল না ঘুড়িটাকে। কেমন তাদের মাথার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে শেষে পড়ে গেল সামনের একতলা বাড়ীটার ভিতরের দিকে। যারা হৈ হৈ করে এসেছিল তারা ঘুড়িটি পাবার লোভে ছুটে গেল সে বাড়ীর সামনে। প্রদীপ সে বাড়ীর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলোকে লক্ষ্য করছিল। কেউ পেল না সেই ঘুড়িটা। সকলে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। এবার তারও ফিরে যাবার পালা। সেই মুহূর্ত্তে ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়তেই তিনি ইশারায় তাকে ডাকলেন। এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! সে তো ঘুড়িটা নেবার জন্যে তাঁর কাছে যায় নি।

মল্লিকার আহ্বান পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতন সেই প্রথম এ বাড়ীতে এসেছিল প্রদীপ, শুভেন রায়ের বড় ছেলে। প্রথম দিনেই খুব ভালবেসেছিল মল্লিকা। সেই সুন্দর রঙীন ঘুড়িটা ছাড়া আরও অনেকগুলো ঘুড়ি তাকে দিয়েছিল মল্লিকা। কাছে বসিয়ে চকলেট, বিস্কুট, সন্দেশ খেতে দিয়েছিল তাকে। তারপর তার নিজের নাম, বাবার নাম, বাড়ীর ঠিকানা সমস্ত খবর জেনে নিয়েছিল মল্লিকা। নিজের অনুমান সত্য হতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল মল্লিকা। প্রদীপকে কিছু বুঝতে দেয়নি, তার মন সোহাগে, আদরে ভরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন তাকে বাড়ী ছাড়বার মুখে তার

কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল মল্লিকা যে, প্রতিদিন বিকেলের দিকে প্রদীপ যেন তা'র কাছে আসে। শিশু মন ঘুড়ি লাটাই পাবার আশায় উন্মুখ ছিল। তাই নতুন মায়ের সোহাগ আদরের লোভে ও ঘুড়ি, লাটাই প্রভৃতি খেলবার জিনিষ পাবার আশায় প্রতিদিন বিকেলের দিকে মল্লিকার কাছে আসতে আরম্ভ করেছিল প্রদীপ। মল্লিকার উপদেশানুযায়ী বাপ, মা আত্মীয় স্বজন বা কোন বন্ধুকে এই নতুন মায়ের কথা সে বলেনি। মল্লিকা তার কথা যেমন গোপন রাখতে বলেছে, ঠিক সেই ভাবে গত কয়েক দিন তার কথা কারো'র কাছে বলেনি। নতুন মা তা'কে ঠিক বলেছেন, অন্য বন্ধুরা এখানকার খবর জানতে পারলে তারাও প্রতিদিন এখানে ঘুড়ি লাটাই চাইতে আসবে।

ঘুড়ি, লাটাই ও লোভনীয় খাবারের আকর্ষণে প্রদীপ নিয়মিত আসতে আরম্ভ করেছে মল্লিকার কাছে। তার কাছে এই সোহাগ, আদর খুবই আনন্দের। আর ঘুড়ি, লাটাই বা অন্য খেলবার জিনিসের ব্যাপারে কেউ খোঁজ করলে মিথ্যে করে পাড়ার দাদাদের নাম বলে দেয়। শেষ পর্য্যন্ত কেউ এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করে না। তাই খোশ মেজাজে প্রদীপ যাতায়াত করছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ঠিক নিজের মায়ের মতন ভাল লেগেছে মল্লিকাকে। এদিকে নিজের প্রতি প্রদীপের অনুরাগ লক্ষ্য করে তাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তান-স্নেহে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে মল্লিকা।

সেই অনুপ্রেরণায় ও ঘটনার পারস্পরিক যোগসূত্রে প্রদীপের ওপর জোর খাটাল মল্লিকা। সেদিন বিকেল থেকেই মেঘ জমেছিল আকাশে। মুহূর্ত্তের মধ্যে এক ভীষণ দুর্য্যোগ যে এই পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে সেই চিন্তা শিশু প্রদীপের মনকে উতলা করেনি। তখন তার মন ছিল নতুন নতুন খেলনা সংগ্রহের দিকে। সেই সময় আরম্ভ হয়েছিল দুর্য্যোগ,—একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা বৃষ্টি। প্রদীপের বাড়ী ফেরবার সময় উৎরে গেল।

প্রদীপকে মল্লিকা বলে, রাত প্রায় নটা বা'জে, এত রাতে রাস্তার জল ভেঙ্গে তুই কেমন করে বাড়ী যাবি প্রদীপ। তাই বলছি আজ এখানে থেকে যা বাবা!

—কিন্তু আজ এখানে থেকে গেলে কাল মা-বাবাকে কি বলব' নতুন মা?

—তবু এত রাতে আজ তোকে আমি কিছুতেই একলা বাড়ী যেতে দেব না প্রদীপ। তুই আমাকে ভাবনায় ফেলে বাড়ী যাস্‌নে বাবা। বরঞ্চ কা'ল ভোরে উঠে বাড়ী যাবি।

যাই হোক নতুন মায়ের কথা শুনে থেকে গেল প্রদীপ। আজ যখন রাত হয়েই গেছে, তখন এই সময় কোন রকমে বাড়ী পৌছলেও বাবার হাত থেকে নিস্তার নেই। তার ওপর রাতের অন্ধকারে হাঁটু পর্য্যন্ত জল ভেঙ্গে একা একা যেতে গেলে ভয়ে বুক কাঁপবে। কিন্তু ভোর হবার পর দুশ্চিন্তা ও ভয়ে তার ছোট্ট মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। এ যে কল্পনাই করা যায় না,—সারা রাত সে বাড়ী ছাড়া। মা, বাবা, চেনা জানা সকলে নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে না পেয়ে বা কোন হদিশ ঠিক করতে না পেরে হয়রান হয়ে ফিরেছে। নিশ্চয়ই, মা-বাবার সঙ্গে আরো অনেকে তার কথা ভেবে ঘুমো'তে পারেননি রাত্রে। আর এদিকে সে নতুন মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন তো তার কো'ন রকমে ফিরে যাবার পথ নেই। তাই কিছুদিনের মতন সে যদি বাড়ী না ফেরে, এখানে এই নতুন মায়ের কাছে আদর-যত্নে দিনকাটায়, তাতে তার লাভ ছাড়া লোকসান কোথায়! এমন ভাল খাবার সে বাড়ীতে খেতে পায় না। তা'দের পাঁচজনের সংসার ছোট হলেও বাবার একলার রোজগারে কুলোয় না। এই নিয়ে বাবা মার মধ্যে অশান্তি লেগেই আছে। তাই সে মা-বাবাকে ভুলে, বন্ধুবান্ধবদের ভুলে এখানেই থাকবে। এতে সে ও নতুন-মা দুজনেই সুখে, শান্তিতে থাকবে।

যে ছেলে সন্ধ্যা হবার পূর্ব্বে বাড়ী ঢোকে তাকে রাত ন'টা পর্য্যন্ত ফিরতে না দেখে ভীষণ ভয় পেল সুলতা। তাহ'লে প্রদীপের কি কোন দুর্ঘটনা ঘটল পথে? যে ভাবে দুর্য্যোগ আরম্ভ হয়েছে দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঐ যে তাদের আশা ভরসার স্থল। ওর মুখ চেয়েই যে দিন গুনছে সুলতা। প্রদীপ যখন বড় হবে, মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠবে, খুব ভাল চাকরী করবে বা ব্যবসা করে টাকা রোজগার করবে তখন

তাদের সংসারে আর অভাব থাকবে না। প্রতিদিন তাকে সেই কথা শুনিয়েছে সুলতা। ছেলে তার বুঝেছে। সে মাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। মন আনচান করায় কাজ ফেলে রেখে বার বার বাড়ী থেকে বে'রিয়ে গলির মুখে এসে দাঁড়ায় সুলতা। বৃষ্টি তখন থেমেছে, রাত নটা থেকে দশটা হোল। আশে পাশে প্রত্যেক বাড়ীতে খোঁজ করা হোল প্রদীপের। না, কেউ তার খবর বলতে পারল না। তারা শুধু এইটুকু বলতে পারে যে খেলার মাঠ থেকে খেলা ভাঙবার আগেই সে মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। তাহ'লে সে গেল কোথায়? কেউ তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দূরে কোথাও নিয়ে যায়নি তো? যা সরল ছেলে।

এবার দূরে দূরে খোঁজ আরম্ভ করা হোল। হাসপাতালগুলোতে ও সমস্ত থানায় খোঁজ করা হোল তার। না, বর্ণনানুযায়ী প্রদীপ নামে কোন ছেলের 'কেশ' তারা পায়নি। এ তো দেখা যাচ্ছে ভীষণ ব্যাপার। ছেলেটার কোন পাত্তা নেই।

এক মা সন্তানের খোঁজ না পেয়ে সারা রাত চোখের জল ফেলে অনিদ্রায় কাটাল, আর এ বাড়ীতে প্রদীপের নতুন মায়ের আনন্দের সীমা নেই। আজ সারা রাত সে প্রদীপকে বুকের কাছটিতে পেয়েছে। খুশীর আমেজে নিজে ঘুমোতে পারেনি। যত কিছু জানবার আছে তাই প্রদীপের কাছ থেকে জেনে নিতে চায় মল্লিকা। প্রদীপের ঘামে ভেজা মুখটাকে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় মল্লিকা। তারপর খুশীতে চোখ দুটো বড় করে বলে, প্রদীপ, তোর বাড়ীর জন্যে খুব মন কেমন করছে না রে? কার জন্যে বেশী মন কেমন করছে—মায়ের জন্যে না ছোট বোনটার জন্যে? কি রে আমাকে বল্‌বি না? আমার কিন্তু বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে।

—আমি তবু আপনাকে বলবো না।

—আমি তবু তোর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি যে দিদি আর ছোট বোন মিঠুর জন্যে তুই ঘুমোতে পারছিস্ না।

—আপনি মুখ দেখে সব বলতে পারেন?

—সব নয়, তবে অনেক।

—আচ্ছা, মা আর মিঠুর কথা ভাবছি বলে আপনি রাগ করেন নি তো?

—রাগ করবো কেন? কোন ছেলে তার মা আর ছোট বোনের কথা ভাবলে কেউ রাগ করে? তোকে যে আমি আজকে বুকের মধ্যে পেয়েছি সে যে কত দিন অপেক্ষা করবার পর তা তুই বুঝতে পারবি না, বাবা। এখন বাড়ীর জন্যে মন খারাপ না করে ঘুমিয়ে পড়।

—বাড়ীর জন্যে আমার মন খারাপ হয়নি, শুধু মায়ের জন্যে। আমি ফিরতে না পাবার দরুন, মা ঠিক সারা রাত আমার জন্যে কাঁদবে। তাই মায়ের কথা ভাবতেই ঘুম আসছে না।

—হ্যাঁরে দিদি কি তোকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে? বাবা কাকে ভালবাসে?

—মা ভালবাসে আমাকে। আর সুদীপকে বাবা বেশী ভালবাসে। কেন জানেন? বাবার সব কথা আমি শুনি না। যখন কোন অন্যায় কাজ করতে বলেন, তখন তাঁর কথা মতন কাজ করি না বলে তিনি আমাকে মারেন। সুদীপ কিন্তু বাবার সব কথা শোনে, সেই কারণ বাবা ওকে বকেন না, মারেন না, যা বায়না করে তাই কিনে দেন। আমি সেইজন্য বাবার সঙ্গে কথা বলি না।

বেশ বড় ধরণের দু ফোঁটা জল চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল প্রদীপের গালে। তাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরে মল্লিকা। সযত্নে মুছিয়ে দিল তার চোখের জল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, ছিঃ বাবা, ওরকম করতে নেই। তোমার বাবা গুরুজন, মায়ের মতন তাঁকেও ভালবাসবে, তাঁকেও শ্রদ্ধা করবে। নাও এবার ঘুমিয়ে পড়ো।

প্রদীপ ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু মল্লিকার চোখে ঘুম নেই। প্রদীপের মাথাটা বুকের মাঝখানে চেপে ধরে এক নতুন ধরণের অনুভূতিতে থিতিয়ে রইল মল্লিকা।

পরের দিন সকালেই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রদীপ বাড়ী ফেরার কথা জানাল মল্লিকাকে। প্রদীপ যে তার কাছে একদিনের বেশী দুদিন থাকতে পারবে না, তা বুঝতে পেরেছিল মল্লিকা। তবু এক রাতের মধ্যে ছেলেটার ওপর তার স্নেহের টান জোয়ারের মতন

বেড়েছিল। ভুলিয়ে ভালিয়ে, মিথ্যে ভয় দেখিয়ে প্রদীপকে সে আরো দিনকয়েক এখানে সে আটকে রাখতে পারে, আর সেই ইচ্ছাটাই মনকে প্রবল বেগে নাড়া দিয়েছে। তবু ওকে ছলনা করে আটকে রাখা যায় না। আজ থেকে সেও প্রদীপেরও মা। তাই মা ও সন্তানের মধ্যে কোন ছলনার স্থান নেই।

—বেশ, আজ আর তোকে আটকে রাখব না। তবে এবেলাটা তোকে থাকতে হবে প্রদীপ। যশোদাকে বাজারে পাঠিয়েছি, আজ তোকে আমি মাছের ঝোল-ভাত রেঁধে খাওয়াবো। খেয়ে বলতে হবে কার হাতের রান্না ভাল—আমার, না তোর মায়ের? ও কি? হেসে মাথা লুকোচ্ছিস্ কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি যে আমি ভাল রাঁধতে পারি?

—আমি কিন্তু ভাত খেয়েই চলে যাব।

—ওঃ ছেলের বাড়ী যাবার জন্যে মন একেবারে আকুলি বিকুলি করছে!

বাসন্তী দেবী পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বল্লেন,—তা করবে না? ঐটুকু ছেলে কাল বিকেল থেকে বাড়ী ছেড়ে এখানে আছে। ওকে তুই আর ধরে রাখিস্‌নে মলি? বলা যায় না, এর ফলে হয়ত অনেকে দুর্ভোগ কপালে জুটবে। তোর যেমন পাগলামি! যাই, আহ্নিকের সময় হয়ে গেল।

সকালের পর দুপুরে কেটেছে। এখন বেলা প্রায় পাঁচটা। বাড়ী ফেরার জন্যে তৈরী হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ একটা বড় কাল মেঘ ঢেকে ফেলল সারা আকাশ। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়,—জ্যৈষ্ঠের শেষে কাল-বৈশেখী ঝড়।

এই ঝড়ের মধ্যে কিছুতেই ছাড়া যাবে না প্রদীপকে। ঝড় থামুক, তারপরে যাবে।

কিন্তু ঝড় থামবার পর, কালকের মতন সেই মুষল ধারায় জল আরম্ভ হল।

হঠাৎ শুভেনের কথা মনে পড়ল মল্লিকার। সেই দিন থেকে সে এ বাড়ীতে আর আসেনি। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার ছেলে এসেছে এখানে। এখনও রয়েছে তার পাশে। বলা যায় না, ছেলের খোঁজে এখানে সে ছুটে আসতেও পারে। মল্লিকার সেই আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। ঝড়, জল—এই ভীষণ দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এখানে ছুটে এসেছে শুভেন। আজ সদরে কড়া নাড়বার প্রয়োজন হয়নি। সাধারণতঃ এ সময়ে এ বাড়ীতে সে কোন দিন আসেনি। সদর খোলা দেখে মন্থর গতিতে ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে।

সামনের ঘরে মল্লিকাকে দেখতে না পেয়ে ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল শুভেন। তারপর জানালার ফাঁক দিয়ে কোণের ঘরের ভিতর নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। এ যে অভাবনীয়, অকল্পনীয় ঘটনা! প্রদীপ তাহলে সুস্থ দেহে বেঁচে আছে? শুধু তাই নয়, কাল থেকে মল্লিকার কাছে রয়েছে প্রদীপ। আর এখনকার দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রদীপকে মনের মতন সাজাতে সাজাতে এক মাতৃত্বময়ী নারীর মতন তার কপালে, গালে স্নেহ-চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে মল্লিকা। এই মুহূর্তে প্রদীপকে কোলের কাছে টেনে এনে স্নেহময়ী জননী সেজেছে মল্লিকা। এরূপ দেখবার সৌভাগ্য ঘটেনি শুভেনের। কতক্ষণ যে এই দৃশ্য উপভোগ করেছে শুভেন, তা তার নিজের খেয়ালে বলতে পারবে না সে। শুভেনকে প্রদীপই প্রথম দেখতে পেল। প্রদীপ মল্লিকাকে হাতের ইসারায় শুভেনের উপস্থিতির কথা জানাতেই সেই দিকে মুখ ঘোরায় মল্লিকা। কিছুটা লজ্জা পায়, কিন্তু তার চোখে বিস্ময়ের ঘোরই বেশী। তাহলে কি ছেলের টানই শুভেনকে এ বাড়ীতে পুনর্বার এনেছে?

শুভেনকে এখানে আসতে দেখে ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল প্রদীপ। তার শিশু-মন শুভেনের রুদ্র-মূর্তিকে ভোলেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যদি শুভেনের মুখ ভাল ভাবে লক্ষ্য করত, তাহলে তার আশঙ্কার কারণ থাকত না। প্রদীপের ভীত ও ত্রস্ত ভাব দেখে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয় মল্লিকা। বুঝতে পারে সে শুভেনের উপস্থিতিতে প্রদীপের মন উদ্বেগে চঞ্চল। তাই তাকে সান্ত্বনা দিতে হাসতে হাসতে সে বলে,—বুঝতে পেরেছি যে তোর বাবা এসেছেন এখানে। তাতে ভয় পাচ্ছিস কেন? তোর কোন ভয় নেই প্রদীপ। তুই এখানে সারা রাত আমার কাছে ছিলি বলে উনি তোকে একদম বকবেন না। উনি এখন সহজেই বুঝতে পারছেন যে মায়ের কাছেই ছেলে গচ্ছিত ছিল। তোকে কেউ চুরি করেনি, তোর কোন অমঙ্গল হোক—এমন কাজ কেউ

করে নি। বরঞ্চ দুর্য্যোগের রাতে নিজের ডানা দিয়ে ঢেকে তোকে আমি আমার মনের কথা জানিয়েছি প্রদীপ যে আমিও তোর মা। আমাকেও তোর দরকার আছে। আর তোকে না ভালবাসলে, বা তোকে না আদর করলে আমিও পাগল হয়ে যাব। এখন বাবার সঙ্গে বাড়ী যাও। আর তোমার এই নতুন-মাকে দেখবার জন্যে প্রতিদিন একবার আসবে—এই কথা যেন ভুল না হয়।

একটু থামল মল্লিকা। তারপর শুভেনের দিকে হাসিমুখ তুলে বলতে লাগল, তোমার ছেলেকে যখন নিজের বলে ভেবে নিয়েছি, মমতা দিয়ে ভালবেসেছি, তখন তোমার অস্তিত্বকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। তাই প্রার্থনা করছি আমার অপরাধ তুমি নিজগুণে ক্ষমা ক'র। আজ আমার আনন্দের দিন। আজ আমি প্রদীপকে দেখিয়ে সকলের কাছে বলতে পারব যে, আমি প্রদীপের মা। সেই অধিকারে আজ কোন মানুষের চোখে আমি ছোট নই। আমার সন্তানই আমাকে জয়ের পথে, আলোকের পথে নিয়ে যাবে।

বক্তৃতা শেষ হবার পরও চমক ভাঙেনি শুভেনের। আজ সে ঠিক চিনতে পারছিল না মল্লিকাকে। এ তো সেই অতি পরিচিতা মল্লিকা নয়। এ যেন অন্য মেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। ওর প্রতিটি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ যেন বক্তৃতার তালে তালে সজীব হয়ে উঠেছে। ওর অনুরোধ ঠিক আদেশের মতন। আজ ওকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। নির্বিকার শুভেন সেই মুহূর্তে কিছু বলতে পারল না, শুধু প্রদীপকে কাছে টেনে নিয়ে এগিয়ে গেল সদরের দিকে।

প্রত্যাশা

আইভি রাহা

মনের গভীরে মোর—কেন এ প্রত্যাশা ?
কবোষ্ণ তাপেতে ভরা সীমাহীন তৃষা !
কেন মন বোঝে নাকো যত সঞ্চয়,
ফুরায়ে ফেলেছি সব করে অপচয়
চেয়ে চেয়ে কোনদিন পাব নাকো জানি !
উত্তাপ আশ্রয়ে—তুমি নেবে নাকো টানি !
তবু কেন ছুটে আসা, লয়ে এত আশা !

মিছে কেন রেখে যাওয়া সব ভালবাসা ;
ছড়ায়ে ফেলিবে জানি অবহেলা করে,
তবু কেন দিতে চাই—হাত দুটি ভরে।
না পাওয়ার ব্যথা মোর যন্ত্রণা গভীর,
কোন দিন দেখিবে কি সে ব্যথা নিবি
ভুল করে কোনদিন, মৌন মুখখানি—
আমার অধর সীমায় আসিবে কি নাকি

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

াষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন-এর ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত রছি :—

প্রাচীন অধিবাসীদের কাছে 'কোহান গো রুতা' স্পেনিশদের কাছে এস্পিরিতু সেন্টো (Espiritu Santo) প্রথম ইংরেজ পর্যটকের কাছে 'এলিজাবেথ,' জর্জ ক্যালভার্টের (পরে লর্ড বাল্টিমোর) সহকর্মীদের কাছে 'সেন্ট গ্রেগারী' হঠাৎ হ'য়ে উঠল যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। রাজধানী স্থাপনের প্রাচীন ঐতিহাসিক ধারা পুরাতন বড় সহরকে রাজধানী আখ্যা দেওয়ার রীতি। সেই আদর্শ ত্যাগ ক'রে নব অভ্যুদিত জাতির নতুন রাজধানী সহসা সুরু হ'য়ে গেল একেবারে নতুন করে পেটোম্যাক নদীর তীরে জনহীন ভূখণ্ডে। স্বাধীন মার্কিন জাতির রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম সাধনার ও শাসন পরিচালনার মহাকেন্দ্র রূপে গ'ড়ে উঠতে লাগল এই অঞ্চলে।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলের প্রাচীনতম স্পেনিশ নৌ অভিযানকারী 'পেড্রো মেনেন্দিজ' এখানে 'সেন্ট অগষ্টিন' নামে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর বিল জর্জ ওয়াশিংটন এই অঞ্চলে স্থাপনের জন্য পাশ করিয়ে নেন। কিন্তু তখনও পাকাপাকি স্থানটি নির্দিষ্ট হয় নি। বিদেশী (বিশেষজ্ঞরা) বারংবার প্রশ্ন করেছেন যেখানে কোন শিল্প বা বাণিজ্যকেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে নি, যেখানে কোন পুণ্যস্থান বা বিরাট সৈন্যাবাস নেই এবং যার প্রাচীন সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য নেই সেখানে কেমন ক'রে একটা নব নগরী বেঁচে থাকতে পারে? প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসে দেখা গেছে যে দেশের রাজধানী প্রাচীন নগরীগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল, যেমন লণ্ডন, প্যারিস, রোম, লিসবন, মস্কো, বার্ন, বের্লিন। নবভূমিষ্ঠ স্বাধীন রাষ্ট্রের নতুন রাজধানীর স্থান মনোনয়নে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মহা দ্বন্দ্ব সুরু হ'ল। এক ভোজের টেবিলে প্রচুর আহার ও উগ্র পানীয়ের পরিবেশে নিউ ইয়র্কের আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন্ এই শর্তে রাজী হ'লেন দক্ষিণ অঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের মত দিতে যদি ভার্জিনিয়ার টমাস জেফারসন কংগ্রেসকে সমর-ঋণ গ্রহণ করতে রাজী করাতে পারেন। ঠিক হয় যে আরও দশ বছর ফিলাডেলফিয়ায় রাজধানী থাকবে। পরিশেষে কংগ্রেস জর্জ ওয়াশিংটনকে পেটোম্যাক নদীর কূলে তাঁর ইচ্ছামত কোন এক জায়গায় রাজধানী স্থাপনের স্থান নির্ণয়ের ভার দিলেন। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা বিচার বিবেচনা ক'রে পেটোম্যাক ও এনকোষ্টিয়া নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ ভূখণ্ডকেই উপযুক্ত বিবেচনা করলেন। কারণ এই স্থানটি উত্তরে নিউ ইংলণ্ড অঞ্চল ও দক্ষিণে জর্জিয়া অঞ্চল থেকে সমান দূরে এবং সমুদ্রোপকূল থেকে কিছুটা ভেতরে যাতে শত্রুর নৌ আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তখন বিমানের স্বপ্নও কেউ দেখে নি। দুই নদীর বাহুর মধ্যে গঠিত ত্রিভুজের কেন্দ্রে রয়েছে একটা ছোট পাহাড় বা বড় রকমের ঢিপি। তার উপর স্থাপিত হবে রাষ্ট্রপ্রাসাদ। এটাই কেপিটোল বা কেপিটল (capitol) নির্মাণের উপযুক্ত স্থান ব'লে গণ্য হ'ল। এর উপর থেকেই বহুদূর দিকচক্রবালে প্রসারিত বিস্তৃত শ্যামল সমতল ক্ষেত্র দেখা যায়। ওয়াশিংটন রাস্তা ও রম্যোদ্যান বিন্যাসের পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য মেজর 'পিয়ারী চার্লস্ লা আঁফাৎ '(Pierre Charles La Enfant)-কে প্রধান স্থপতি হিসেবে নিয়োগ করলেন। লাঁ ফাঁতের ছিল সুদীর্ঘ

দূরদৃষ্টি, অনন্য সাধারণ সাহস ও গভীর চিন্তাশীলতা। তাঁর মাথায় সুন্দরী মহানগরী প্যারী ও বিখ্যাত ভর্সাই প্রাসাদ ও সন্নিহিত অঞ্চলের স্বপ্ন ও চিন্তা তখন ঘুরছে। তারই মধ্যে একটা সাম্য রেখে নবনগরীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। এখানে রাস্তা শুধু ডাইনে-বাঁয়ে ও সামনে পিছনে নয়, বেশ কয়েকটা কোণাকুণি রাস্তা বিভিন্ন পার্কের কেন্দ্র হ'তে বেরিয়ে গেছে। প্যারিসের 'সঁপ স্ত এলীব' মত The Mall গ'ড়ে উঠেছে।

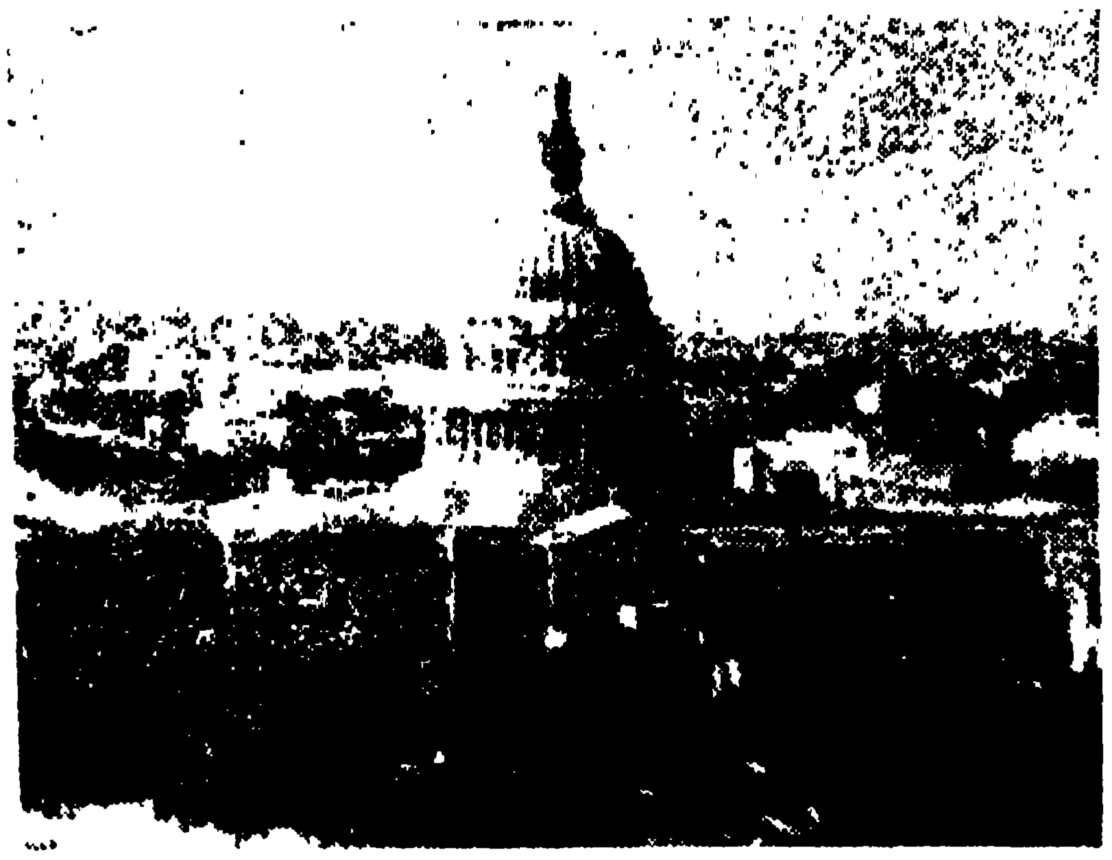

কেপিটল—ওয়াশিংটন

উঁচু ঢিপির ওপর কেপিটোল (capitol) হর্ম্যটীকে কেন্দ্র ক'রে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে রেখা টেনে সারা সহরটীকে NW, SW, NE ও SE এই চারটি মুখ্য ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই নিয়মেই ঠিকানা লেখা হয়। উত্তরে 'নর্থ কেপিটোল রাস্তা,' দক্ষিণে সাউথ কেপিটোল রাস্তা, পূর্বে 'ইষ্ট কেপিটোল রাস্তা' এবং পশ্চিমে 'দি মল্,' ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট, লিংকন মেমোরিয়ল প্রতিফলন হ্রদ ও লিংকন স্মৃতি মন্দির পার পোটোম্যাক নদী। কেপিটোলকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাম দিয়ে কোণাকুণি রাস্তার নাম হ'ল নিউ জার্সি এভিন্যু, পেনসিলভানিয়া এভিন্যু, মেরিল্যাণ্ড এভিন্যু ও দেলওয়ার এভিন্যু।

'ওয়াশিংটন' নগরীর নাম জর্জ ওয়াশিংটন দেননি। তিনি সব সময়ই বলতেন 'The Federal City'। নগর পরিকল্পনা পরিচালক মণ্ডলী স্থপতি লা এঁফাংকে চূড়ান্ত নক্সায় "A Map of the City of Washington in the Territory of Columbia" শিরোনামা লিখতে বলেন। এই নামকরণে জনগণের যে সমর্থন আছে তা তিনি জানতেন কিন্তু তিনি এই নামকরণে আপত্তি কি সমর্থন কিছুই জানান নি। কিন্তু তাঁর উইলে তাঁর পোষ্যপুত্র 'জর্জ ওয়াশিংটন পার্ক কুর্টিস্'কে সম্পত্তি দানের কথায় বর্ণিত আছে সেখানে 'City of Washington' কথাটীর উল্লেখ আছে। যদিও কোনদিন এই দানপত্রে লিখিত সম্পত্তির কোন ব্যবহার কেউ করেন নি। রাজস্বের দায়ে ঐ ভূখণ্ড নিলামে বিক্রী হ'য়ে যায়।

দশবছর পরে :—

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস রাষ্ট্র সরকারের দলিল দস্তবেজ ওয়াগণভর্তি ক'রে উঠে এলেন তখন 'কেপিটোলে'র মাত্র এক অংশ শেষ হয়েছে। হোয়াইট হাউসের কাজ সামান্য হয়েছে। তখন এই বাড়ীটিকে 'Executive Mansion' বলা হ'ত। সামান্য যা' গ'ড়ে উঠেছিল তাতেই নানা সরকারী দপ্তরের কাজ কোন গতিকে চলতে লাগল। ঐ অঞ্চলে বসবাসের ভাল বাড়ী না থাকায় রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই 'জর্জ টাউনে' থাকতেন। ঘোড়াটানা লম্বা লম্বা গাড়ী ক'রে নিদাঘে ধুলো ও বর্ষায় কাদা ভর্তি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট কিছুই গ'ড়ে ওঠেনি। এখানে বেসরকারী খদ্দের নেই জমি কেনার। আগে যাঁরা The Mall অঞ্চলে বসবাস করতেন তখন এ অঞ্চলের নাম দিয়েছিলেন Rome ও পাশের ক্ষীণস্রোতা শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনীর নাম দিয়েছিলেন Tiber। যদিও পরে সেই নদী বুজিয়ে বাস উঠিয়ে The Mallএর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তখনকার দিনের এই ওয়াশিংটন নগরীকে ঠাট্টা করে দ্বিতীয় 'রোম' বলে আইরিশ কবি 'টমাস্ মুর' এই নগরীর ওপর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে একটী ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করেন।

অগ্রগতির পথে এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলের পরিচালনায় মহা গণ্ডগোল দেখা দিল। 'ওয়াশিংটন' ও 'জর্জ টাউনের' পরিচালনার ভার দু'জন মেয়রের উপর ন্যস্ত ছিল। রাস্তা পাকা করা, জলের কল স্থাপন, ময়লাজলের নল বসানো, গ্যাসের পাইপ লাগানোর কাজ পুরোদমে চলতে লাগলো। কাজে বহু দেনা হ'য়ে যাওয়ায় কংগ্রেস নির্দেশ দেন যে এটীর পরিচালন ভার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত তিন জন

সদস্যের উপর ন্যস্ত থাকবে। ভোটাভুটি হবে না; স্থানীয় নির্বাচনও হবে না। অধিবাসীদের পৌরশাসন ব্যবস্থায় কোন হাত থাকবে না। ১৯৫৫ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ডেলিগেট মনোনয়নে অধিবাসীদের একমাত্র ভোট আছে। এখানে একটা সুপ্রচলিত ক্ষুব্ধ উক্তি আছে—Taxation without representation is tyrany। বর্তমানে শাসনকার্য District of Columbia নামেই চলে। শুধু পোষ্টাফিসে Washington, D.C. ছাপ মারা হয়। আরও খুদে 'ওয়াশিংটন' নামে বহু সহর স্থাপিত হয়েছে। অনেকের ধারণা এ নগরীতে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকলা নেই। এ কথা ঠিক নয়। এখানের শিল্প হ'ল সরকারী দপ্তরের কাজ। এখানে পুলিশই বহু রকমের আছে এবং তাদের আরক্ষ দায়িত্বও বিভিন্ন। যেমন Metropolition Police Force, Park Police of National Capital Parks। হোয়াইট হাউস ও প্রেসিডেণ্টের জন্য Secret Services। তা'ছাড়া National Zoological Park Police, Armed Forces Police প্রভৃতি।

এত পুলিশের সমারোহ কিন্তু এখানেই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল ফোর্ডস্ থিয়েটারে আততায়ীর গুলিতে অভিনয় দেখার সময় ক্রীতদাস প্রথা অবসানের জনক আব্রাহাম লিংকনের জীবনাবসান ঘটে। সে স্থান আজ একটী স্মৃতি মন্দির ও সংগ্রহাগার। এর পর দীর্ঘ বারো বছর চলে মার্কিন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক বিষম বিপর্যয়। এইখানেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই চার্লস্, জে, গুইটিনের গুলিতে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড নিহত হন। আরও দু'জন প্রেসিডেণ্ট আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। একজন ম্যাক্‌ফিনলে, অপরজন জন কেনেডী। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে 'বাফেলো' মহানগরীতে ম্যাকফিনলে ও 'ডালাস্' সহরে জন কেনেডী নিহত হন।

এই হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট ক্লীভল্যাণ্ডের শুভ পরিণয় হয়। এখানেই কত প্রেসিডেণ্ট পত্নী কত না সন্তান প্রসব করেন। এখানেই কেনেডী পত্নীর শিশু সন্তানের জন্ম হয়। আবার স্বামীর অকাল মৃত্যুতে এখানের আরাম নিকেতন ছেড়ে শিশু পুত্র কন্যার হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে হোয়াইট হাউসের মর্মর সোপান বেয়ে বেরিয়ে যান। নব নিযুক্ত প্রেসিডেণ্ট জনসন বিদায় কালে বলেছিলেন—এত শীগগির চ'লে যাবার তাড়া কিসের? আর কয়েক দিন থেকে যান না।

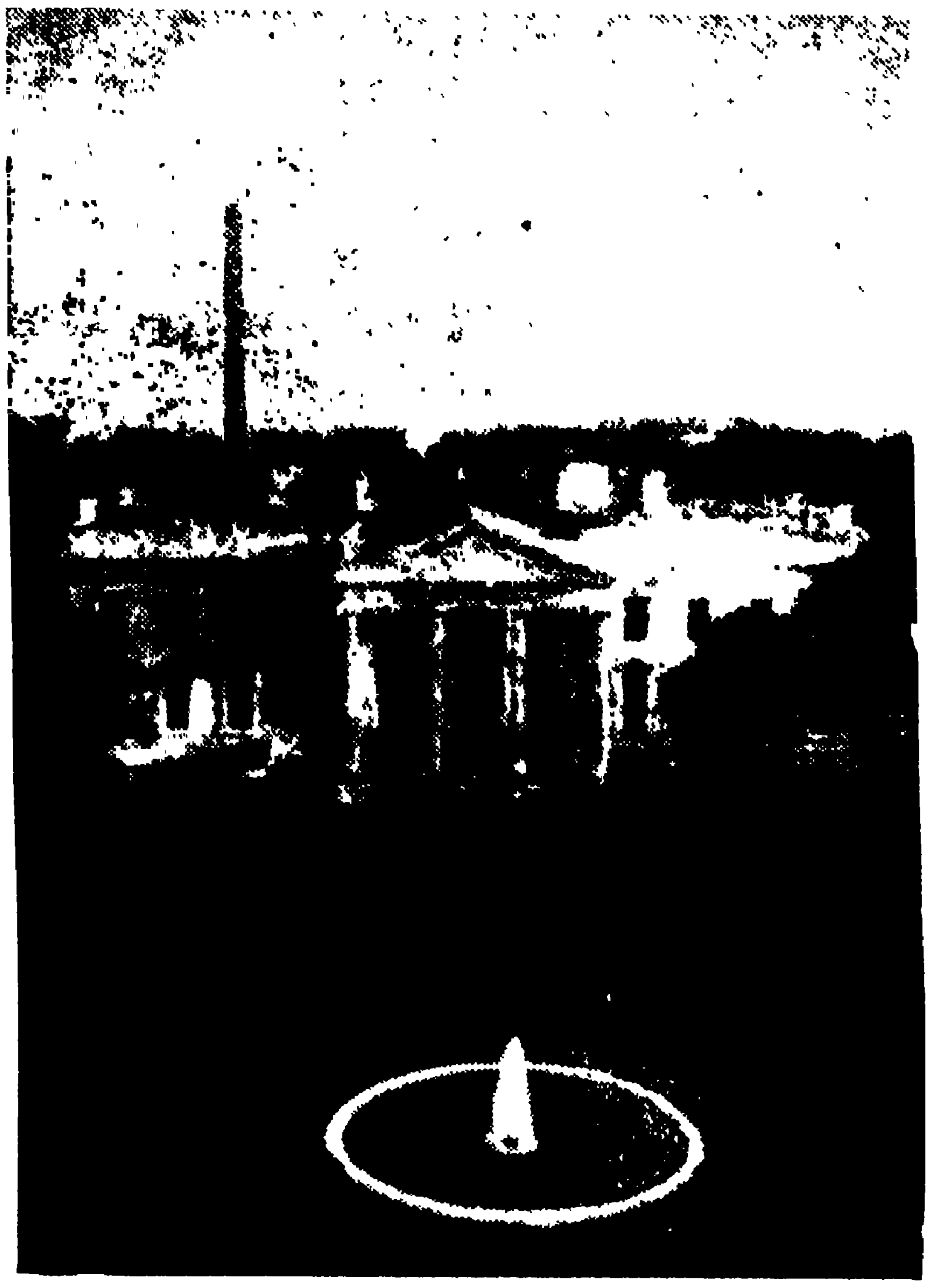

হোয়াইট্ হাউস—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট-এর সরকারী বাসভবন। দূরে সুউচ্চ ওয়াশিংটন্ স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যাচ্ছে।

অসিতবসনা কৃশাঙ্গী তন্বী সুন্দরী ম্যাকেলিন পিছন ফিরে চেয়ে বলেছিলেন—'ধন্যবাদ'।

জনসংখ্যা:

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে কি ধারায় যে জনসংখ্যা বেড়েছিল তা দেখলে বোঝা যবে বৃদ্ধির স্বরূপটী কী? ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যে চোদ্দ হাজার মানুষ বসবাস করতে এসেছিলেন আজ তা প্রায় দশ লক্ষ দাঁড়িয়েছে।

১৮০০—১৪,০০০	১৮৬০—৭৫,০৮০
১৮১০—২৪,০২৩	১৮৭০—১,৩১,৭০০
১৮২০—৩৩,০৯৩	১৮৮০—১,৭৭,৬২৪
১৮৩০—৩৯,৮৩৪	১৮৯০—২,৩০,৩৯২
১৮৪০—৪৩,৭১২	১৯০০—২৭৮,৭১৮
১৮৫০—৫১,৮৬৭	১৯১০—৩৩১,০৬৯

১৯২০—৪৩৭,৫৭১ ১৯৬০—৭৬৪,০০০(১,৯/৯,০০০) *
১৯৩০—৪৮৬,৮৬৯ ১৯৬৫—(২,৪০৮,০০০) *
১৯৪০—৬৬৩,০৯১
১৯৫০—৮০২,১৭৮

* বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা মেট্রোপলিটন নগরীর।

যেহেতু ওয়াশিংটনের বিস্তৃতি সীমিত, যার বাড়া ও কমার উপায় নেই, তাই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুলোক বসবাস করতে উঠে যাচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে নিগ্রো প্রতিপত্তি বেশী। তথাকথিত সহরতলী অঞ্চলে বহু নতুন লোক বসবাস সুরু করছে।

ওয়াশিংটনের নিগ্রো:

কেউ কেউ ওয়াশিংটনকে Coloured City অর্থাৎ কালা আদমীর নগরী আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৬১৫২ জন স্বাধীন নিগ্রো ও ৬১১৩ জন ক্রীতদাস নিগ্রো ছিল। সেই সংখ্যা তিরিশ বছরে দাঁড়ায় ১১,১৩১ স্বাধীন নিগ্রো ও ৩১৮৫ জন ক্রীতদাসে। আব্রাহাম লিংকনের প্রচেষ্টায় ক্রীতদাসেরা তো মুক্তি পেল, কিন্তু শিশু শিক্ষার অভাবে এই নিগ্রোরা ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কি করবে? করুণার বশবর্তী হ'য়ে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কালো ছেলেদের জন্য এক স্কুল স্থাপন করলেন। এতে অর্থানুকূল্য করলেন হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোয়ী ও জনস্ হপকিনস্। বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গরা ঐ বিদ্যালয়ে অগ্নি সংযোগ ক'রে সমস্ত ধ্বংস ক'রে দেয়। এর পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পিস্তল ছোঁড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ বিদ্যালয়ে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১২০০ নিগ্রো ছেলে পড়তে সুরু করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে যখন দাস প্রথার বিলোপ সাধন করা হয় তখন আব্রাহাম্ লিংকন নিগ্রোদের সৈন্যদলে ভর্তি হবার সুযোগ দেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে মোট জন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৫৯,৬৭৬ জন অধিবাসী ছিল নিগ্রো। নিগ্রোরা সাধারণতঃ কায়িক ও নিম্ন শ্রেণীর কায়িক পরিশ্রম করেন। এঁরা খেত-খামারে কাজ করেন, করেন ড্রেন পরিষ্কারের কাজ, ময়লা সাফা করার কাজ, মোট বইবার কাজ প্রভৃতি। নিগ্রোরা মদও খায় যেমন, মাৎলামি ও নোংরা কাজও করে তেমনি। তবে নিশ্চয়ই সবাই নয়। নিগ্রোদের উন্নতি বিধানের জন্য সরকারী তরফ থেকে ফ্রীডম্যানস্ হাসপাতাল, হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বহু শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। নিগ্রোকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত ভগবদ্ভক্তি উদ্রেকী। ধর্ম-সংগীতে এঁদের শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা আমি স্বকর্ণে শুনেছি। পল রবসনের মত গায়ক সত্যিই দুর্লভ। এঁদের বক্সিং খেলায়, ভারী ওজন তোলায়, বেস্ বল প্রভৃতি খেলায় যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর আছে। অনেক বুদ্ধিমান মন্তব্য করেন যে ভবিষ্যতে ওয়াশিংটনে নিগ্রোদের সংখ্যাধিক্য হবার সম্ভাবনায় ওয়াশিংটনের শাসনভার নিগ্রোদের মধ্যে চ'লে যাওয়ার আশংকায় এখানের অধিবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি।

কালো-সাদায় নিত্যকালের দ্বন্দ্ব। সর্বকালেই সর্বদোষ হরে গোরা। আগেকার দিনে নিগ্রো যদি সাদা চামড়ার লোককে চড় মারে, সেই নিগ্রোর কান কেটে দেবার শাস্তি ছিল। এখানে নিগ্রোদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার মত অমানুষিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে একবার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের একটা দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গা সুরু হবার কারণ হ'ল এক শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে এক কালা আদমি প্রহার করেছে। এ যেন কাকে কান নিয়ে গেছে, অতএব কাকের পশ্চাদ্ধাবন করার মত। এই সংবাদে বহু নির্দোষ নিগ্রোকে হত্যা করা হয়। নিগ্রোরাও দল বেঁধে শ্বেতাঙ্গদের উপর হামলা সুরু করে। এই তো সেদিন সমানাধিকার দাবীর মূর্ত প্রতীক ডাক্তার মার্টিন লুথার কিংকে 'মেমফিসে' হত্যা করা হ'ল। সেই সঙ্গে সারা যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক ব্যাপক দাঙ্গাও সুরু হ'ল। তবে আশু শুভবুদ্ধি ফিরে আসাতে শান্তভাব শীঘ্রই ধারণ করে। বর্তমানে বহু সাদা কালো ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। সাদা কালোর সন্তানদের ত্বকের কিছুটা কৃষ্ণভাব কেটে যাচ্ছে এই সম্প্রদায়কে 'সিংকী' বলা হয়। এমন নিগ্রো মেয়ে দেখেছি যে রং ধপধপে কিন্তু কাঠামোটা সম্পূর্ণ নিগ্রো —সেই পুরু ঠোঁট, হনুওঠা, খুলির চেহারা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়েও বর্ণ বৈষম্যের গণ্ডী দূর ক'রে সেদিন ডীন রাস্কের মেয়ে এক নিগ্রো যুবককে বিয়ে করল।

বর্তমানে নিগ্রোদের মধ্যে বহুজনের সাহিত্যে, সঙ্গীতে

কাব্যে, সংস্কৃতিতে, অভিনয়ে, ক্রীড়া-কৌতুকে, এমন কি কঠোর কায়িক পরিশ্রমে এবং নানা ক্ষেত্রে বহু কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ওয়াশিংটনের স্থাপত্য :

ওয়াশিংটনের কোন মৌল স্থাপত্য নেই ; নানা ক্লাসিক স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গ'ড়ে উঠেছে এ নগরী। এখানে গ্রীক স্থাপত্যের প্রভাব, রোমক স্থাপত্যের প্রভাব, বাইজানটাইন ও গথিক স্থাপত্যের প্রভাব বর্তমান। ওয়াশিংটনের সরকারী মহলের উক্তিতে জানা যায় সরকারী বাড়ীগুলো প্রাচীন স্থাপত্যের স্মৃতির ধারক। নতুন মহাদেশে মহামিশ্রণে এর নব জন্ম হয়েছে। বিশিষ্ট স্থাপত্য প্রকাশক হর্ম্যরাজি হ'ল সরকারী ইমারৎ ও নানা দেশের দূতাবাসগুলি। ইঁটই এখানের প্রধান গঠন সামগ্রী কিন্তু সরকারী ইমারতে যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঞ্চল থেকে আনা রকমের পাথরের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

এখানের স্থাপত্যে French Ecoe des Beaux Arts এর প্রভাব বেশ কিছুদিন পড়েছিল। এই প্রভাব সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের (Frank Lloyd Wright) গুরুদেব লুই সুলিভ্যান বলেন "The change brought by the world's Fair will last for half a century from its date."

স্থপতিবর সুলিভ্যানের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হ'য়েছিল নতুন স্থাপত্যের আবির্ভাবে। ১৯০১ সালে স্থাপিত ম্যাকমিলন্-কমিশন (সদস্যরা হ'লেন ড্যানিয়েল বুর্ণহ্যাম, চার্লস, এফ্ ম্যাককিন্, ফ্রেডারিক এল, ওলস্টেড ও অগষ্টস্ সেণ্ট গডাস্) ওয়াশিংটনের উন্নয়নের জন্য যে খসড়া প্রণয়ন করেন, তাতে শুধু 'পার্ক' উন্নয়নে সীমিত ছিল না। সমস্ত The Mall অঞ্চল উন্নয়নেরও তাঁরা নির্দেশ দেন। তাঁদের সুপারিশে ক্লাসিক ষ্টাইল পুনরাবর্তন, সমোচ্চ কার্ণিশ নির্মাণ, মহাত্রিভূজের (Federal Triangle) মধ্যে বহু রাষ্ট্রীয় ইমারতের সন্নিবেশ, 'মলে'র ধারে 'কেপিটোল' ও 'হোয়াইট হাউসে'র চারিপাশে বহু অট্টালিকার সমাবেশ প্রভৃতি।

ভজনালয় নগরী :

সত্যিই ওয়াশিংটন ভজনালয় পূর্ণ নগরী। এখানে ষাট রকমের ধর্ম বিশ্বাসীরা পাঁচশোর অধিক চার্চে প্রার্থনা করতে যান। স্বয়ং প্রেসিডেণ্টও নিয়মিত প্রতি রবিবার চার্চ সার্ভিসে যোগ দেন 'কেপিটোলে' প্রার্থনা করার এক নিভৃত কক্ষ আছে যেখানে সদস্যরা নির্জনে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয় আলোচনা করতে ও নির্দেশ পেতে পারেন। এখানের বিখ্যাত চার্চ হ'ল 'ওয়াশিংটন কেথিড্রেল'। এর আগের নাম ছিল "কেথিড্রেল চার্চ অব 'সেণ্ট পীটার'ও সেণ্ট পল।" এটী 'মাসাচুসেট' ও 'উইস্কনসিন্' এভিন্যুর সংযোগস্থল অবস্থিত। এর বহিরাবরণে 'গথিক' স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। চাঁদার টাকায় এর কাজ ; তাই এখনও কাজ শেষ হয় নি। অর্ধেকের কিছু বেশী কাজেতেই ১২ কোটী ডলার ব্যয় হয়েছে। এরই সংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন্,' সেক্রেটারী অব ষ্টেস্ 'কর্ডেল হাল,' 'ফ্র্যাঙ্ক বেল্লগ,' 'জর্জ ডিউয়ী' প্রভৃতির মরদেহ সমাধিস্থ আছে। কেথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে National Shrine of Immaculate Conception আমেরিকার সবচেয়ে বড় চার্চ স্থাপিত। ১৯৫৯ সালে অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই এটীর উদ্বোধন করা হয়। এখানে বাইজেনটাইন ও রোমান স্থাপত্যেরসুসম মিলন সম্ভব হয়েছে। এর ছাদের গম্বুজটী মাটী থেকে ২৩৭ ফীট উর্দ্ধে উঠে আকাশ বিদ্ধ করছে। আজ পর্যন্ত এর নির্মাণ ব্যয় দেড় কোটী ডলার উঠেছে। এ ছাড়া রয়েছে Chapel of Notre Dome, The Franciscon Garden and Monastry। এর বাগানে ফুলের প্লাবন ব'য়ে যায়। বসন্তে ডেফোডিল ও পরে লিলি ও নানা রকমের গোলাপ ফোটে।

এখানের 'ওয়াশিংটন মস্জিদ' (Washington Mosque) নতুন মহাদেশে মুসলিম জগতের এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। আমেরিকার বড় বড় সহরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও পরমহংস যোগানন্দ সম্প্রদায়ের বহু মঠ ও প্রার্থনা-মন্দির আছে কিন্তু মুসলমানদের এই মসজিদের মত এত বিরাট নয়। এত বড় মসজিদ গ'ড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে কেননা এখানে পনেরোটি মুসলমান রাষ্ট্র থেকে নির্মাণের জন্য বহু গঠন উপাদান ও অর্থ সাহায্য এসেছে। এই মসজিদের মিনারে সারাশেনীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন দূর হ'তে দেখা যায়। এটীর উদ্বোধন হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে প্রার্থনা ছাড়াও ইসলামী ধর্ম ও সংস্কৃতির সাধনা ও গবেষণা

হয়। দিনে পাঁচবার নামাজের আজান দেবার জন্য মুয়াজ্জিন মিনার থেকে হাঁক না দিয়ে টেপ রেকর্ড করা

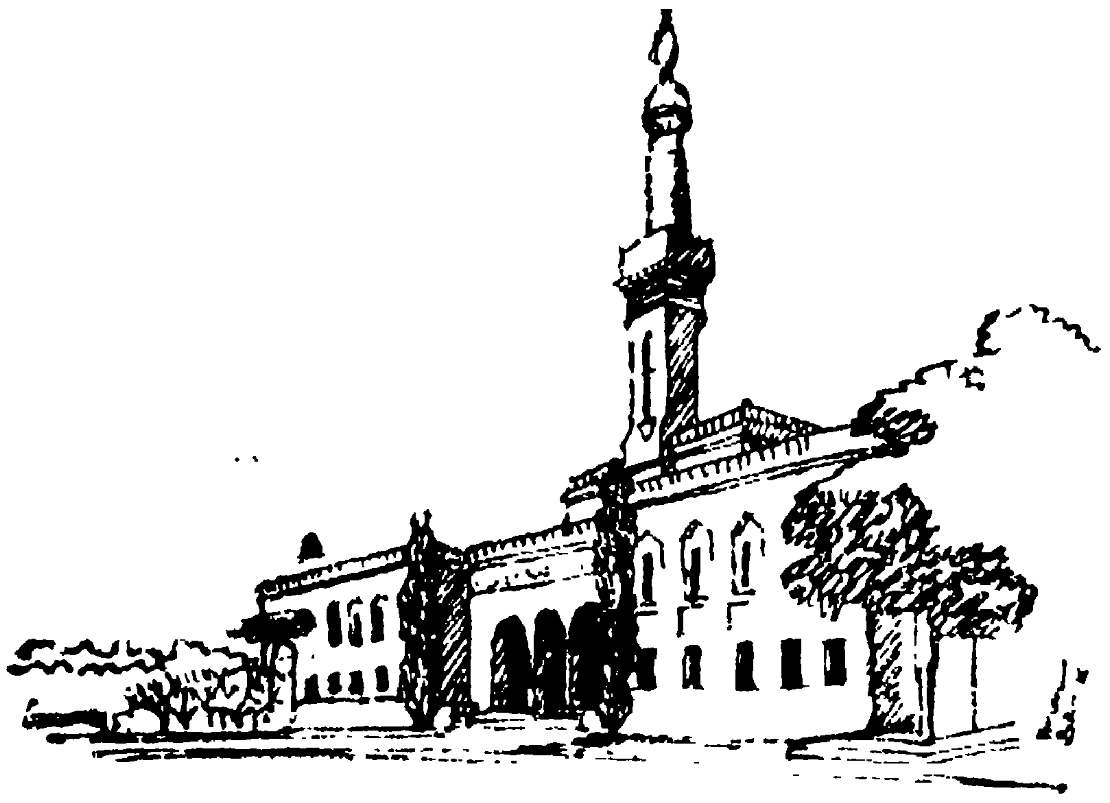

মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র — ওয়াশিংটন

'লা আল্লা, ইস্মিল্লা মহম্মদ রসুল অাল্লা' ধ্বনি তোলা হয়। এ মসজিদের মেঝের টালি তুরস্ক থেকে, পারস্যের কার্পেট ইরাণের 'সাহে'র কাছ থেকে, মিশর থেকে পঞ্চাশমণী ব্রোঞ্জ ও নিকেলের বিরাট ঝাড়লণ্ঠন এসেছিল, আরও কত কী কত ইসলামী দেশ থেকে এসেছিল তার ইয়ত্তা নেই।

কংগ্রেস গ্রন্থাগার (Library of Congress):

এটী পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার। প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহে হয় তো 'বৃটিশ মিউজিয়াম্'। বিনামূল্যে দর্শকদের এখানে দেখতে দেওয়া হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ধ'রে এই বৃহৎ অট্টালিকাটী নির্মিত হয়। প্রয়োজন বোধে এর সংলগ্ন জমিতে এক নতুন সংযোগভবন তৈরি হয়। দু'টী অট্টালিকা নির্মাণে খরচ পড়ে প্রায় দু'কোটী ডলার। এই গ্রন্থাগারে ৪১৪ মাইল লম্বা তাক, ষাটলক্ষ বই ও পুস্তিকা, পনেরোলক্ষ মানচিত্র ও ছবি, সাড়ে এগার লক্ষ সংবাদ পত্রের বাঁধানো খণ্ড আছে। এই গ্রন্থশালাটী কংগ্রেসের 'নির্দেশ-গ্রন্থাগার' হিসেবে মৌল ব্যবহারের জন্য স্থাপিত হয়। তবে এখানে এখন এগারটী পড়ার ঘর, ২২৬টী গবেষণাকারীদের ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। গ্রন্থশালার বিশিষ্ট তাকের সংলগ্ন ২২০টী পড়ার টেবিল। এই গ্রন্থাগারটী চীনের বাইরে চীনা বইয়ের সব চেয়ে বেশী সংগ্রহ, আর রাশিয়ার বাইরে সবচেয়ে বেশী রুশী পুস্তকের সংগ্রহ এখানে রয়েছে।

এর সুরু হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। পাঁচ হাজার ডলার ব্যয়ে এটী স্থাপিত হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের ওয়াশিংটন আক্রমণে এই পুস্তকাগার ভস্মীভূত করা হয়, যেমন পুড়িয়ে দিয়েছিল অন্ধকার যুগে মুসলমানেরা আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিখ্যাত গ্রন্থশালা। তখন পুস্তক সংখ্যা মাত্র কিঞ্চিদধিক তিন হাজার। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে টমাস্ জেফারসন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ গ্রন্থাগারের ৬৪৮৭টী পুস্তক চব্বিশ হাজার ডলারে বিক্রি করেন। তখন গ্রন্থাগারটী Capitolএর দুটী ঘরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থাগার 'কপিরাইট আইন' অনুযায়ী সারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের দু'খণ্ড বিনামূল্যে পেতে থাকেন।

এখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংগ্রহ শালায় প্রায় একলক্ষ বিরল পুস্তক সংগৃহীত আছে। তার মধ্যে ১০৮৩টী বাইবেল, ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী। গ্রীক মহাকাব্যের প্রথম সংস্করণ, মিলটনের Paradise Lostএর প্রথম সংস্করণ, প্রাচীন নিউ ইংলণ্ডে প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রভৃতি।

মূলগ্রন্থাগারের সংযোগ ভবনটীতে বহু পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারের উত্তরে Folger Shakespeare Library। এক ধনী তৈল ব্যবসায়ী ফলজার সাহেব তাঁর আহরিত সেক্সপীয়রের বিরাট সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। এই গ্রন্থাগারের ভিতরটি সেক্সপীয়রের আবির্ভাবকালে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময়ের আঙ্গিকে ও ধাঁচে তৈরি করা হয়। 'ওক' কাঠের প্যানেলের ওপর সেক্সপীয়রের ও তাঁর নাটক সংক্রান্ত বহু চিত্রাবলী আঁকা আছে।

'লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে'র প্রকাশিত বহু পুস্তক ও দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায় এখানে। যেমন বিরল চিত্র, প্রাচীন ফটো, ম্যাথু ব্রাডীর আঁকা যুদ্ধের ছবি, টি, এস, ইলিয়টের The Waste Land কবিতার আবৃত্তি রেকর্ড প্রাচীন গল্পের কাহিনীর রেকর্ড প্রভৃতি। প্রতি সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতি আধঘণ্টা অন্তর অনুবর্তিত দর্শনের ব্যবস্থা আছে। প্রদর্শক ইতিহাস বিমণ্ডিত এই সংগ্রহশালার কাহিনী অপূর্ব গ্রন্থনায় ব'লে যায়।

স্মিথশোনীয়ান প্রতিষ্ঠান (Smithsonian Institution

ওয়াশিংটনে জ্ঞানবিজ্ঞানের মুখ্য প্রচার কেন্দ্র হ'

স্মিথসোনীয়ান প্রতিষ্ঠান, যাঁর স্থাপয়িতা জীবনে আমেরিকার মাটী স্পর্শ করেননি! তিনি এক নব অভ্যুদিত জাতিকে এত গভীর ভাবে ভালবেসেছিলেন যে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০৫ বস্তা সোনা (যার তদানীন্তন মূল্য হবে ৫৫০,০০০ ডলার) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মর্মে পাঠান আমেরিকায় যে জ্ঞানের প্রসারের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হ'ক। সেই দানপত্রে তিনি লিখেছিলেন :—

"Used to found at Washington, under the name of Smith Sonian Institution, an establishment for the increase and diffusion of knowledge among men".

সেই সোনা গালিয়ে নতুন রাষ্ট্র দশলক্ষ মার্কিণ ডলার মুদ্রা ফিলাডেলফিয়ার টাঁকশালে প্রস্তুত করান। বৈরী পক্ষের একজন দানবীর কেন যে স্বর্ণ দান ক'রে জ্ঞানের ফসল এই নতুন মহাদেশে ফলাতে চেয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। তাঁর এই দান সাধক রামপ্রসাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় এখানেই তো মানব জমির আবাদ হয়েছিল বলেই খেতে খেতে সোণা ফলেছে। প্রচুর জমিতে ফসল ফলেছে। যার ফলে খাদ্যের রপ্তানী ক্ষুধার্ত মানবদের কাছে করা হচ্ছে। মনের ও জ্ঞানের ফসল (হয়তো পরমার্থিক জ্ঞান নয়ও) যথেষ্ট ফ'লছে যার নিদর্শন আমেরিকায় নোবেল লরেটের সংখ্যাধিক্যে।

এরপর এই প্রতিষ্ঠানে বহু বিত্তবান্ ব্যক্তিরা বহু অর্থদান করেছেন তাই দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে সংগ্রহশালা ও বহু-সংখ্যক ভবন। এই প্রতিষ্ঠান বরফে ঢাকা এস্কিমোর দেশে ও আফ্রিকায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়েছিলেন।

অনেকের ধারণা স্মিথসোনীয়ান ইনষ্টিটিউশন একটী সংগ্রহশালা মাত্র। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের সব রকম প্রকাশনার বিরাট এক সমাবেশ এখানে করা হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গাবষণারও এক সময়ে এটী একটী মুখ্য কেন্দ্র ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সচিব 'জোসেফ হেনরী' প্রথম তড়িৎ চুম্বক আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সচিব 'স্যামুয়েল ল্যাংলে' প্রথম বিমান চালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতি পদার্থ বিদ্যার পর্যবেক্ষণাগার ও আরও দু'শো বীক্ষণকেন্দ্র থেকে দূরবীক্ষণ ক্যামেরার সাহায্যে নভোনিরীক্ষণ ও কৃত্রিম গ্রহের নিত্য পরিক্রমা পথের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। এখানের তিনটী আর্ট গ্যালারীর (Freer, National gallery of arts ও National Callection of Fine Arts) পরিচালনার ভার এরই আওতায় নতুন এক বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। জাতীয় পশুশালা, ব্যুরো অব আমেরিকান এথনোলজী (Ethnology), আন্তর্জাতিক বিনিময় সেবাক্রম (International Exchange Service) পরিচালনা করেন। এটী তেরোটী সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ক'রে থাকেন। যথা National History Museum, Museum of History & Technology, Astrophysical Observatory, জাতীয় পশুশালা, Radiation Biology laboratory, National Portrait Gallery, National Air Space Museum, Canel Zone Biological Area প্রভৃতি।

ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ :

সেই প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক মিশরীয় সভ্যতার যুগ হ'তে পৃথিবীতে বহু স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে কিন্তু

ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ ও সম্মুখে আলোকোজ্জ্বল খৃষ্টমাস তরু

ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ। এটী চতুষ্কোণ ভিত্তের উপর থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে ক্ষীণ হ'য়ে গেছে। এটীর উচ্চতা ৫৫৫ ফুট পাঁচ পূর্ণ একের চার ইঞ্চি। এটী ১২৬´-৬´´ চতুষ্কোণ ভিত্তি মাটীর নীচে আরও ৩৭ ফীট চ'লে গেছে। এই মিশরীয় ধাঁচের চতুষ্কোণ স্তম্ভটীর উপপীঠের উপর ৫৫´-৬´´ ভুজের মধ্যে ৫ ফুট চওড়া হেলানো দেওয়াল উর্দ্ধে উঠে গেছে। চূড়ায় এটীর চওড়া মাত্র দেড় ফুট। এর ওজন ৮১,১২০ টন এবং গা শ্বেত পাথরের তৈরী। মধ্যস্থানে ওপরে ওঠার লিফ্‌ট আছে ও ৮৯৮টি ঘোরানো সিঁড়ি আছে। এর চূড়া থেকে বহু দূর দিগন্ত দেখা যায়। এটি প্যারিসের "এইফিল টাওয়ার-এর" অনুরূপ। এটী পাথরের অপরটি ইস্পাতের। বহু মার্কিন দর্শক লিফটে ওপরে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন।

ওয়াশিংটনের স্মৃতি রক্ষার প্রচেষ্টা ওয়াশিংটনের জীবদ্দশাতেই ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সূত্রপাত হয়। এতে তিনি ঘোরতর আপত্তি করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর কংগ্রেস এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন কিন্তু কোন টাকা মঞ্জুর করেন না। এই প্রচেষ্টা পরবর্তী প্রেসিডেন্টের সময় চলে কিন্তু কিছু ফল পাওয়া যায় না। অবশেষে Washington National Monument Society এই কার্যভার গ্রহণ করেন ও স্মৃতিস্তম্ভের নক্সার প্রতিযোগিতা ডাকা হয়। রবার্ট মিলের নক্সা মনোনীত হওয়ায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দশ লক্ষ ডলার আনুমানিক ব্যয়ের স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। রোমের Temple of Concord-এর একখণ্ড শ্বেত পাথর পোপের দান হিসেবে পাঠানো হয়। বিদেশী-বিদ্বেষী ও ক্যাথলিক বিদ্বেষীরা শাস্ত্রীদের কাবু ক'রে পাথর চুরি করে ও ভেঙ্গে চুর ক'রে পোটোম্যাক নদীর জলে ফেলে দেয়। এর ফলে সারা বিশ্বে এই ঘৃণিত কর্মের বিরুদ্ধে এক বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয় ও বহিরাগত সাহায্য বন্ধ হ'য়ে যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পরিচালক মণ্ডলী কংগ্রেসের কাছে দু'লক্ষ ডলারের সাহায্য প্রার্থী হন। কর্মকর্তাদের অব্যবস্থায় 'Know Nothings' এর দলকে কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় না। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস দু'লক্ষ ডলার বছরে ৫০,০০০ হাজার হারে মঞ্জুর করেন ও সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল টমাস, এল. কেশীর উপর নির্মাণভার ন্যস্ত হয়। তলার ভিত যথোপযুক্ত না হওয়ায় গঠন কিছুটা হেলে যায়। সেটী ত ভিৎ প্রসারিত ক'রে কাজ সুরু হয়। সেই সময় 'মিলে'র পরিকল্পনায় ৭০০ ফুট দৈর্ঘ্যের বদলে ৫৫৫ ফুট পাঁচ ফুট একের আট ইঞ্চিতে নামানো হয়। স্মৃতি স্তম্ভ ঘিরে গ্রীক ও মিশরীয় স্থাপত্যের আঙ্গিকে রচিত হর্ম্য তোলার কথা ছিল। সেটীও পরিত্যাগ করা হয়। টোপরের মত শিরোভূষণের বদলে পিরামিডের আকৃতির একটী চূড়ো দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে সেই সময় চীন থেকে ফু চো ফু' পাথর পাঠিয়ে ছিলেন। এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে দান আসে চীন ব্রেজিল, গ্রীস, জাপান, শ্যাম, সুইজারল্যাণ্ড ও তুরস্ক থেকে আসে। মাথায় যে আলুমিনিয়মের ধাতবখণ্ডটী শিরোদেশ অলংকৃত করছে, সেটী যখন নিউ ইয়র্কে ওপরে ওয়াশিংটনে এল তখন বহু দর্শক এটীকে অতিক্রম ক'রে বলতেন:—"আমরা ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের চূড়া অতিক্রম করেছি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। ওপরে ওঠার জন্য পূর্বে ষ্টীম চালিত এলিভেটার দিয়ে কাজ সুরু হয় ও ১৯০০

জেফারসন্ স্মৃতি সৌধ—ওয়াশিংটন।
যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন্ যুক্তরাষ্ট্রের Declaration of Independence রচনা করেছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন্ ও আব্রাহাম্ লিংকন্-এর সঙ্গে টমাস জেফারসনকেও অমর আমেরিকান্ ত্রয়ীর একজন বলে অভিহিত করা হয়।

খ্রীষ্টাব্দে এটীতে বিদ্যুৎ চালিত লিফটের ব্যবহার সুরু হয়। আগে ওপরে উঠতে ৫ মিনিট সময় লাগতো। ১৯২২ সালে শক্তিশালী লিফ্‌ট ব্যবহারে সময় দাঁড়িয়েছে মাত্র দেড় মিনিট। এটীর নির্মাণ খরচ প্রায় পনেরো লক্ষ ডলার পড়ে। বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ দর্শক এখানে আসেন। এটীর প্রথম সংস্কার হয় ১৯৩৪-৫ সালে অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে।

ফেডারল ত্রিকোণ :

হোয়াইট হাউসের সন্নিহিত এই ত্রিভূজাকৃতি অঞ্চলটী ফেডারল সরকারের দপ্তরের বাড়ীতে ভর্তি। এটীর দক্ষিণে কন্‌ষ্টিটিউশন এভিন্যু, কোণাকুণি পেন্‌সিলভেনিয়া এভিন্যু ও, পশ্চিমে 15th ষ্ট্রীট দিয়ে সীমিত। হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ পূব ও 'দি ইলিপ্‌সের পূর্বদিকে সমকোণ ত্রিভুজাকৃতিভূমির উপর বারোটী বৃহৎ সরকারী অট্টালিকার সমাহারে 'দি ফেডারল ত্রিকোণ' গঠিত। এর ন'টী বাড়ী ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। এরমূল্য প্রায় আটকোটী ডলার। ত্রিকোণের সূক্ষতম কোণে ফেডারল ট্রেড কমিশন। তার পশ্চিমে পরপর বাড়ী হ'ল জাতীয় সংগ্রহশালা (National Archives)। এখানে চারটী বিভাগে কাজ পরিচালিত হয় যথা আইন, ইতিহাস, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা। তিনটী অনুসন্ধান ঘরে লেখা আছে ধূমপান, নকল ও কলমের ব্যবহার নিষেধ (No Smoking, No tracings may be made, no pens may be used in these rooms)

পরেরটি হ'ল বিচার বিভাগের আটতলা বাড়ী। এখানে Justice Department গ্রন্থাগার, Federal Bureau of Investigation (F.B.I)-এর প্রদর্শনশালা। এখানের Division of Idetification-এ প্রায় দেড় কোটী আঙুলের টিপ সই সংগৃহীত আছে। যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দু মিনিটের মধ্যে কোন এক অজানা টিপ কোন লোকের টিপের সঙ্গে মিলছে তা' বের ক'রে দিতে পারে।

এর পরের বাড়ী হল Internal Revenue Building। এই বাড়ীর পূর্বে 10th ষ্ট্রীট ও পশ্চিমে 12th ষ্ট্রীট। ওতে ১৭৫০টী অফিস ঘর আছে, তার সঙ্গে রয়েছে লম্বা লম্বা করিডর, পায়খানা, স্নানঘর, সিঁড়ি, লিফটের জায়গা ইত্যাদি নিয়ে দশ বিঘে জায়গা জুড়ে এই ইমারত। এর পরের অট্টালিকা হ'ল পুরাতন ডাকঘর। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এটী ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ হয়। মহানগর পোষ্টমাষ্টার জেমস্ উইলেট এলিভেটারের দরজা দিয়ে প'ড়ে গিয়ে মারা যান। এরপর এল Labour ও Inter-State Commerce Commission-এর বিরাট প্রাসাদ ও পরে বাণিজ্য দপ্তরের বাড়ী।

লিংকন স্মৃতি-মন্দির :

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের সুদীর্ঘ স্তম্ভের সুদূর বিপরীত প্রান্তে দাসপ্রথা বিলোপের জনক আব্রাহাম লিংকনের স্মৃতি মন্দির। আমেরিকার দুই জাতীয় মহাপুরুষ যেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক ও জাতীয় জীবনের প্রতীক হ'য়ে দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে। এটী ১২০০ ফুট ব্যাসের ভূমির উপর

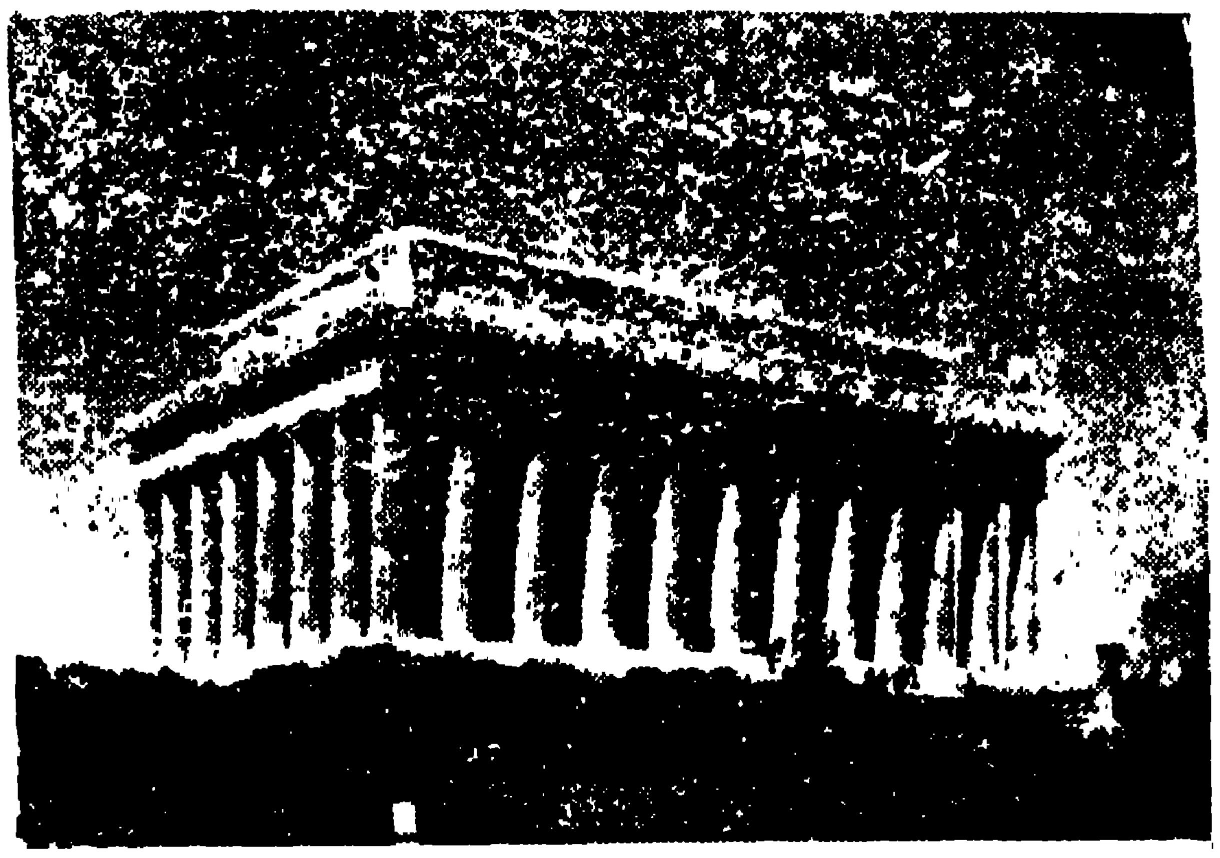

লিংকন্ স্মৃতি মন্দির—ওয়াশিংটন্

স্থাপিত। স্মৃতিমন্দিরের ৩৬টী দীর্ঘ 'ডরিক'থাম লিংকনের সময়ে ৩৬টী রাজ্যের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে। ৬০ ফুট চওড়া ৭০ ফুট লম্বা ও ৬০ ফুট উঁচু প্রকোষ্ঠের মধ্যে ১৯ফুট উঁচু লিংকনের মর্মরের প্রতিমূর্তি সাড়ে বারো ফুট উঁচু চেয়ারে আসীন। উত্তর ও দক্ষিণের হলের দেওয়ালে ব্রোঞ্জের উপর লিংকনের গেটিসবার্গ অভিভাষণ ও দ্বিতীয় উদ্বোধনী অভিভাষণ খোদা আছে। প্রতিমূর্তিটী 'ডেনিয়াল চেষ্টার ফ্রেঞ্চ' প্রস্তুত করেন। আততায়ীর গুলির আঘাতে মানবের সমান অধিকারের প্রধান ঘনিষ্ঠ উদ্গোক্তা লিংকনের অপঘাত মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা সুরু হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১১ সালে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস লিংকন মেমোরিয়াল কমিশন স্থাপন করেন ও ১৯১৫ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারিতে এর শিলান্যাস হয়।

১৯২২ সালে 'মেমোরিয়াল দিনে' লিংকনের ১০৬তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এটীর উদ্বোধন হয়।

জাতীয় চিত্রশালা :

বুধবার আমি দুপুরের কাজ সেরে 'গেলাম 'ন্যাশানাল গেলারী অব আর্টস ও ন্যাচারাল হিষ্ট্রি' বিল্ডিংয়ে। সময়ের অভাবে অতিদ্রুত দেখা, যেন সব কিছু গোগ্রাসে গেলা। প্রত্যেকটী সংগ্রহশালার উপর বেশ কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনা করা যায়। এত বিরাট এই সংগ্রহশালা। একটিতে দুই dimension এ জগতের নানা সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পীর

জাতীয় চিত্রশালা—ওয়াশিংটন

এই গবাক্ষহীন মর্মর প্রাসাদটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আশ্চর্য সৃষ্টি অর্থবলে এই জাতীয় সংগ্রহ শালায় সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে। তখনকার দিনে দেড় কোটী ডলার ব্যয়ে বহু প্রকোষ্ঠ যুক্ত এই প্রাসাদ গোলাপী আভার টেনেসীর মর্মরে নির্মিত হয়। এখানে শতাধিক ছবির গ্যালারী আছে। প্রতি ঘরে ছাপা কাগজ আছে আর সেই ঘরের ছবির ইতিহাস ও বিবরণ দেওয়া। বিনামূল্যে যে কেউ একখানি ক'রে তুলে নিতে পারেন। এখানেই ইতালী, ডাচ, ইংলিস, স্পেনিস্, আমেরিকার বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্র, ফ্রেস্কো, ভাস্করের ভাস্কর্য ও রেখকের রেখাচিত্র প্রভৃতি, সাজানো আছে। রঙিন তুলির স্পর্শে প্রাণবন্ত চিত্র গড়ে তুলেছিলেন—জেকাপো বেলিনি, গিয়োভান্নি বেলিনি, গিওর গিয়োনি (Giorgione)। টিশিয়েন, টিনটোরে ট্টা, টিয়েপোলো, গুয়াডি (Guardi), কেনেলেট্টো (Canalatto), ম্যাগনাসকো (Magnasco) প্রভৃতি। ওদিকে ডাচ শিল্পীদের প্রধান রেমব্রাঁ, ভারমিয়ার, জেরাউটার বর্ক (Gerard ter Borch) ও বৃটিশ শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন স্যার জসুয়া রেণল্ডস্ (Reynolds), কনষ্টেবল, টার্ণার গেণসবারো (Gainborough), রোমনী, লরেন্স, স্যার হেনরী রেবার্ণ প্রভৃতি।

যাদুঘর বা Natural History Building :

এটী আবাল যুবাবৃদ্ধ বনিতার মহা আকর্ষণীয় স্থান। এটী স্মিথশোনীয়ান শ্রেণীভুক্ত বাড়ী, যেটী ফেডারল ত্রিকোণের দক্ষিণ Constitution Avenue উপর 9th ও 12th Street দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিক যথাক্রমে সীমিত। এটী জাতীয় সংগ্রহাগার নামেই বেশী চালু। এককোটী সত্তর লক্ষ (১,৭০,০০,০০০) সংগ্রহ সামগ্রী এইখানে সাজানো আছে। বছরে প্রায় আটলক্ষ দর্শক 'সংগ্রহ সামগ্রী' দেখতে আসেন। ৩৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ১৯১০ সালে এই সংগ্রহাগারটীর নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ৭৯ ফুট ব্যাসের গোল ঘরের উত্তর বাহুতে প্রখ্যাত শিল্পীর চিত্রাবলী, রেখা চিত্র, শিল্পের পুস্তক রাখা আছে। পূর্ব বাহুতে সমান্তরাল তিনটী হ'লকে বলা হয় 'বিবর্তন হল' (Halls of Evolution)। সেখানে জীবাশ্ম ও বৃহদাকার প্রাগৈতিহাসিক জীবের অস্থি রাখা আছে। একটী ১২০ফুট লম্বা ফ্রেমের মধ্যে জীব ও উদ্ভিদের অশ্ম (Fossil) বিভিন্ন যুগের অবস্থানের জায়গায় রাখা হয়েছে যেখানে মাত্র শেষ এক ফুট নির্দেশ করে মানব জীবনের সুত্রপাত হ'তে বর্তমান কাল। পূর্ব বাহুর মধ্যের 'হলে' একটী ৭০ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট খাড়াই ডিপ্লোডোকাসের (Diplodocus) অস্থি ও অপর পাশে ইয়োসীন যুগের (Eocene epoch) বেসিলোসোরাস (Basilosaurus) অর্থাৎ তিমি মাছের অস্থি রাখা, যার জোড়া পৃথিবীতে আজও আবিষ্কৃত হয় নি। আমেরিকান হাতীর পূর্ব পুরুষের কংকাল এর পাশেই রাখা। একটু এগুলেই দেখা যাবে উড়ন্ত কুমীরের (Pteranodon) হাড়। কত রকমের পাথরের টুকরো, কত রকমের মণিমাণিক্য, তৈজসপত্র, মাটীর চিত্রিত হাঁড়িকুঁড়ি, প্রাচীন মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসম্ভার কত সুন্দরভাবে পেছনে আলো দিয়ে, পটভূমিকা চিত্রিত ক'রে দৃশ্যকে বর্ণনা দিয়ে সাজানো।

আমি সত্য মায়া সভ্যতার দেশ থেকে ঘুরে এসেছি। দেখলাম উত্তর বাহুর বিশাল প্রকোষ্ঠে খানিকটা জায়গায়

প্রাচীন মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার প্রাচীন কীর্তি কলাপের সংগৃহীত বস্তু রাখা হয়েছে। সেখানে চিচেন ইওজার 'বীরমন্দিরে'র পোর্টাল (Portal) তুলে এনে রাখা হয়েছে। এখানে মায়া সভ্যতার কয়েকটী রঙিন সবাক চিত্র ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেখানো হচ্ছে। তাতে মায়া সভ্যতার বহু স্থানের মন্দিরের ছবি ও সেই সাথে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ চলেছে। মিনিট দশেক দেখানোর পর একটু সময় বাদে আবার গোড়া থেকে সুরু হ'য়ে এর একই পুনরাবৃত্তি চলেছে। এস্‌টিক (Aztec) পাঁজির নকল ও প্রাচীন যুগের এজটেক ভাস্কর্যের নিদর্শনও সংগৃহীত রয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট :—

জর্জ ওয়াশিংটনের (১৭৮৯-১৭৯৭) পর থেকে যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন তাঁরা হলেন :—

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯৭—জন এডামস্

„ ১৮০১—টমাস জেফারসন ওয়াশিংটন নগরীর 'মেয়র-কাউন্‌সিল' পৌর সরকার স্থাপন করেন।

„ ১৮০৯—জেমস্ মেডিসন

„ ১৮১৭—জেমস্ মুনরো

„ ১৮২৫—জন কুইন্সি এডামস্

„ ১৮২৯—এন্‌ড্রু জ্যাকসন্

„ ১৮৩৭—মার্টিন ভ্যান বুয়েন

„ ১৮৪১—উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন্ (একমাস) সহসা মৃত

„ ১৮৪১—জন টাইলার

„ ১৮৪৫—জেমস নক্স পোক্

„ ১৮৪৯—জাকেরী টেলার (সহসা মৃত)

„ ১৮৫০—মিলার্ড ফিলমোর

„ ১৮৫৩—ফ্রেঙ্কলিন পিয়ার্স

„ ১৮৫৭—জেমস্ বুকানন্

„ ১৮৬১—এব্রহাম লিংকন্ (সমান অধিকার ও দাসপ্রথা বিলোপের জনক) আততায়ীর গুলিতে হত)

„ ১৮৬৫—এনড্রু জন্‌সন্

„ ১৮৬৯—ইউ. এস. গ্রাণ্ট

„ ১৮৭৭—রাদারফোর্ড বি. হেস

„ ১৮৮১—জেমস গারফিল্ড (সহসা মৃত)

„ ১৮৮১—চেষ্টার এলেন আর্থার

„ ১৮৮৫—গ্রোভ'র ক্লীভল্যাণ্ড

„ ১৮৮৯—বেঞ্জমিন হ্যারিসন

„ ১৮৯৩—গ্রোভ'র ক্লীভল্যাণ্ড

„ ১৮৯৭—উইলিয়ম ম্যাকিনলে (বাফেলোয় নিহত হন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে)

„ ১৯০১—থিয়োডর রুজভেল্ট

„ ১৯০৯—উইলিয়াম এইচ টাফ্‌ট

„ ১৯১৩—উড্রো উইলসন (এঁরই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু ও সমাপ্তি হয়)

„ ১৯২১—ওয়ারেণ জি. হার্ডিঙ্গ (সহসা মৃত)

„ ১৯২৩—কেন্‌ভিল কুলিজ (হার্ডিঙ্গের মৃত্যুর পর)

„ ১৯২৯—হারবার্ট হুভার

„ ১৯৩৩—ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট (প্রেসিডেণ্ট অবস্থায় মৃত্যু ও ওঁরই সময় ২য় মহাযুদ্ধ সুরু)

„ ১৯৪৫—হ্যারী ট্রুম্যান (ইনি ভাইস প্রেসিডেণ্ট থেকে প্রেসিডেণ্ট ও পরবর্তী নির্বাচনে দু'বার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন)

„ ১৯৫৩—জেনারেল ডুইট আইসেন্‌হাওয়ার (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক)

„ ১৯৬১—জন. এফ. কেনেডি (আততায়ীর গুলিতে নিহত)

„ ১৯৬৩—লিনডেন জনসন (ভাইস প্রেসিডেণ্ট থেকে প্রেসিডেণ্ট ও পরে সাধারণ নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট)

এখানেই আততায়ীর গুলিতে হত হয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন বাফেলোয় নিহত হ'ন। প্রেসিডেণ্ট ম্যাককীন্‌লে (Makinlay) ও ডালাসে কেনেডী। তাদের মৃতদেহ এখানেই নীত হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন হেনরী হ্যারিসন, আব্রাহাম লিংকন, জেমস গারফিল্ড, উইলিয়ম ম্যাকিন্‌লে, ওয়ারেন হার্ডিঙ্গ, রুজভেল্ট ও কেনেডী। এখানেই অভিসংসিত হন প্রেসিডেণ্ট এণ্ড্রু জন্‌সন্। এখানেই

পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড প্রণয়িনী ফ্রান্সিস ফলসনের সঙ্গে। এখানেই কতনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলারা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পত্নীরা সন্তান-সন্ততি প্রসব করেছেন। পঁয়ত্রিশ জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে Epibcopalian Church এর অন্তর্ভুক্ত হ'লেন আটজন। বাকী প্রেসিডেন্টরা অন্য'ন্য চার্চের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। যেমন প্রেসবিটেরিয়ান, ইউনেটেরিয়ান্, মেথডিষ্ট প্রভৃতি। জেফারসন, লিংকন, এণ্ড্রু জনসন ও হেস্ কোন ধর্মীয় চার্চের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট হুভার আবার 'কোয়েকার' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

এঁদের বিশেষ কয়েকজনের খ্যাতিমান্ প্রেসিডেন্টের প্রতিকৃতি বিভিন্ন মূল্যের নোটে ছাপা। যেমন এক ডলারের নোটে জর্জ ওয়াশিংটনের, দুই ডলারের নোটে টমাস জেফারসনের, পাচ ডলারের নোটে এব্রাহাম লিংকনের, দশ ডলারের নোটে থিয়োডর রুজভেল্টের, বিশ ডলারের নোটে এণ্ড্রু জ্যাকসনের, পঞ্চাশ ডলারের নোটে ইউ, এস, গ্রান্টের. একশো ডলারের নোটে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের, পাঁচশো ডলারের নোটে উইলিয়ম ম্যাকিনলের প্রতিমূর্তি ছাপানো হয়েছে। স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এ এক সহজ অথচ অমূল্য পন্থা। যুক্তরাজ্যে যেমন যখন যিনি রাজা ও রানী থাকেন তঁাদের প্রতিকৃতি নোট ও মুদ্রায় ছাপানো হয়। আমাদের স্বাধীন ভারতে জহর-লালের প্রতিমূর্তি আধুলিতে ছাপা হয়েছে।

পেন্টাগন্—ওয়াশিংটন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর দপ্তর

পেন্টাগন :—

সারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমর দপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হ'ল বিখ্যাত পেন্টাগন। সাধারণতঃ 'পেন্টাগন' বললে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার পরিচালন-কেন্দ্র বলেই বুঝায়। যেহেতু প্রেসিডেন্ট জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক অতএব পোটম্যাক নদীর পশ্চিমপারে পঞ্চবাহু সম্বলিত (পঞ্চরত্নের মন্দিরের অনুরূপে নয়) বিরাট রিনফোর্স'ড কংক্রীটের পরিতল বাড়ী যার এক একটি বাহু হ'ল ৯২১ ফিট,। এটির নির্মাণ ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে আট কোটী ডলার। এটীতে ৯২ একর (অর্থাৎ সাঁইত্রিশ লক্ষ বর্গফুট) ব্যবহার্য স্থান আছে; সেখানে ৩০,০০০ কর্মী নিযুক্ত। এখানে ৮০০ গাড়ী পার্ক করার দুটী পার্কিংএর জায়গা রয়েছে। এটা মূল ওয়াশিংটনের বাইরে আর নদীপার লিংকা কাউন্টির মধ্যে। এই অঞ্চল ছ'টি সেতুদিয়ে সংযুক্ত। পাশাপাশি লংব্রিজ, রোকেস্ স্মৃতি সেতু ও জর্জ মেশন স্মৃতি সেতু গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে প্রথমটি রেল রাস্তার জন্য। অন্য দুটির উপর দিয়ে ৯৫নং জাতীয় সড়ক পেন্টাগনের দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে গেছে। পূর্ব দিক দিয়ে জেফারসন্ ডেভিস্ হাইওয়ে ও পশ্চিম পাশ ঘেঁসে ওয়াশিংটন বুলিভার্ড জেফারসন্ ডেভিস্ হাইওয়েকে ছেদ না করে ওপর দিয়ে চলে গেছে। পেন্টাগণের দো-তলায় কাফেটেরিয়া ড্রাগষ্টোর, নাপিতের দোকান, খবরের কাগজ বিক্রীর দোকান রয়েছে। এ সবই যেন একটি ছোট সহরের অধিবাসীদের চাহিদা মেটাতে। পেন্টাগনের পরিকল্পনা ক'রে দিয়েছিলেন পরিকল্পনাবিদ লস এন- জেলিসের জর্জ এডুইন বার্গষ্টম' (George Edwin Bergstrom),

এটীকে পৃথিবীর বৃহত্তম অফিস বাড়ী বলা হয়। এর মধ্যে একশো দু (১০২) তলা পৃথিবীর দীর্ঘতম বাড়ী এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এ যত ব্যবহার্য স্থান আছে তার প্রায় তিনগুণ স্থান রয়েছে।

ওয়াশিংটন মহানগরীর এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

[ক্রমশঃ]

একটি কথা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

একটি কথা ব'লবো ব'লে
ক'রেছিলাম কতোই আশা,—
হায়রে কপাল! ঠোঁটের কোণেই
মিলিয়ে গেল মনের ভাষা!
এখন বলি, তখন বলি,—
এম্নি ক'রেই নিজকে ছলি;—
চেয়েছিলাম এমন কী আর,—
একটি দিনের ভালোবাসা!

অবাক্ হ'য়ে তাকাও কেন:—
খুলেই বলো ব্যাপারখানা;
চাও কি কেবল জীবন ভ'রে
ছেঁদো কথার কাব্যিয়ানা?
ঘণ্টা দুয়ের ওগো সাথী,
সফল করো একটি রাতি
অন্তত মোর! তোমার গাঙে
ডিঙ্গা বেয়েই বেড়াই থামা।

সবচেয়ে মোর আপন তুমি,—
কইবো কিসে এমন মিছে!
নেই বুঝি কাজ খেয়ে দেয়ে—
ম'রবো ছুটে তোমার পিছে!

সিন্ধুতে মোর আজ অনীহা,
বিন্দুতে তাই কেবল স্পৃহা;—
কণ্ঠ ভ'রে কী কাজ পিয়ে;—
গণ্ডূষেতেই যায় পিপাসা।

কিসের ক্ষুধা আমার প্রাণে—
সেটা তোমার জানাই আছে,
একটু স্তুতি-আরাধনা
চাওকি দেবী, দীনের কাছে?
ভুল ব'লেছি—নওকো দেবী,
কী ফল তোমার চরণ সেবি'!
তুমি আমার সোনার হরিণ,
তুমি সকল কর্মনাশা!

মিছে কেন ঘোরাও আমায়
ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর ঘোড়ার মতো,
যতোই আমায় দিচ্ছ জ্বালা—
নিজেও তুমি জ্ব'লছো ততো।
আজকে সাঁঝের আকাশ-তলায়
প্রাণের কথা কী দোষ বলায়!—
আঁধার আসে,—স্তব্ধ হবে
একটু পরেই কান্নাহাসা!

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডার বাড়ীতে আহারাদি করে ওরা গেল গিরি গোবর্দ্ধন দেখতে। একখানা টাঙ্গার পেছনে দুজনে পাশাপাশি বসে দীর্ঘ পথ নানারকম কথা কইতে কইতে ওরা যেতে লাগলো। আশে পাশে ছোট খাটো মন্দির। লোক নয়, মাঝে জমি গাছপালা, প্রান্তর সমস্ত পার হতে হতে রেণুর কেবলই মনে হতে লাগলো, সে যেন নতুন জীবন লাভ করেছে। দূরে একটা গাছের ওপোর এক ঝাঁক ময়ূর দেখে রেণু উচ্ছ্বসিত হয়ে একেবারে সমীরের হাত ধরে বল্লে, দেখুন দেখুন কি সুন্দর ঐ ময়ূরগুলো। আচ্ছা, এখানে কেউ ময়ূর ধরে না?

সমীর যা খুসি একটা উত্তর দিয়ে কেবলই যেন আপন মনে কি ভাবতে লাগলো।

রেণু আপন মনে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা কইতে কইতে শেষে বুঝতে পারলে যে সমীর সামান্য হ্যাঁ না ছাড়া অনেকক্ষণ ধরে বিশেষ কোন কথাই কইছে না। শেষে দারুণ আগ্রহ নিয়ে রেণু বল্লে কি ভাবছেন বলুন-না, আপনি কোন কথা কইছেন না কেন?

রেণু যে এত কথা কইতে পারে, তার একটি মাত্র চক্ষুতে যে এত দৃষ্টি আছে, তার নিরক্ষর মনে যে এই আশা, এই উদ্দীপনা আছে সেটা সমীর আজ সূর্য্যোদয়ের পর থেকে প্রতি মিনিটেই নতুন করে আবিষ্কার করতে পারছিল। শেষে সেই আবিষ্কারের ওপোর চরম আঘাত দিয়েছে গোবিন্দজীর বৃদ্ধ বাঙ্গালী পাণ্ডাটি। সেই পাণ্ডার বাড়ীতেই আজ ওদের আহারাদি হয়েছে, এবং পাণ্ডা মহারাজ কথা প্রসঙ্গে অল্পে অল্পে জেনে নিয়েছে যে সমীর অবিবাহিত এবং রেণু ওর দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী। কিন্তু রেণু আর সমীরের সমস্ত কথাবার্তা এবং ওদের জিনিষ পত্রের সংকীর্ণতা ও বায়ের বাহুল্য থেকে বৃদ্ধ পাণ্ডা যেন আরও কিছু আবিষ্কার করেছিল। পাণ্ডা মহারাজ গল্পচ্ছলে সমীরকে বলেছিল যে, অনেক যাত্রী এই বৃন্দাবনে আসে এবং এখানে এসে বৈষ্ণব মতে মালা বদল করে বিবাহ করে ঘরে যায়। এতে বেশী কিছু খরচ হয় না। সামান্য দক্ষিণা এবং বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয় এবং ইত্যাদি—। চতুর সমীরের বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, পাণ্ডার নজরে ওদের সমস্ত আবরণ খুলে গেছে। কি জানি হয়ত রেণুই বোকামি করে কিছু প্রকাশ করে ফেলেছে।

রেণু যখন সমীরকে কথা বলার জন্য বার বার করে অনুরোধ করতে লাগলো তখন সমীর আস্তে আস্তে পাণ্ডার সন্দেহের কথা উল্লেখ করে বল্লে, তুমি কি ওদের বাড়ীর মেয়েদের কাছে কিছু বলেছ রেণু?

সবিস্ময়ে রেণু তার একচক্ষুর দৃষ্টি তুলে সমীরের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, কই না ত। আমি ত কিছুই বলি নি।

রেণুর মন বোঝবার জন্য সমীর বল্লে, আচ্ছা সে যা হয় হোক, কিন্তু পাণ্ডার এই কথার কি উত্তর দেব বল ত রেণু।

রেণু একটু চুপ করে থেকে বল্লে, দূর, তাও কি আবার হয় না কি, আমি যে বিধবা।

তোমার স্বামীকে মনে পড়ে?

একটু ভেবে নিয়ে রেণু বল্লে, পড়ে, খুব সামান্য।

কি রকম দেখতে ছিল?

ঠিক মনে নেই। চোখ মুখ কিছুই মনে পড়ে না। তবে আমার দিদিমা বলেছিল খাসা বর হয়েছে।

তোমার তখন বয়স কত?

আমার বয়স ছিল নয়। আর তার বয়স শুনেছিলুম বাইশ।

কতদিন শ্বশুরবাড়ী ছিলে?

মোটে সাতদিন। বিয়ের কণে ফিরে আসার পরই শুনেছিলুম, ওকে যেন কি কারণে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। তারপর জেলখানাতেই অসুখ হয়ে মারা যায়।

একথাটা সমীরের শোনা ছিল না। সে জানত, রেণুর বিয়ের পরেই ওর স্বামী মারা যায়। কিন্তু জেলের কথা সমীর পূর্বে শোনে নি। নতুন কথায় একটু আগ্রহান্বিত হয়ে বল্লে, কি রকম? জেলে গিয়েছিল কেন?

রেণু বল্লে, স্বদেশী করে।

সমীর বল্লে, আচ্ছা, সে কতদিন আগের কথা বল ত?

রেণু মুখে মুখে হিসেব করে বল্লে, প্রায় এগারো বারো বছর হবে।

সমীর মনে মনে হিসেব করে বল্লে, আচ্ছা কোথাকার জেলে সে মারা যায় তা জানো?

রেণু বল্লে, ইংরেজের জেলে।

সমীর হেসে বল্লে, হ্যাঁ, কিন্তু কোন্ জায়গায়?

তা জানি না।

তার নামটা বল্‌তে পারো?

নাম কি করে বল্‌বো? তারপর একটু ভেবে বল্লে, কেন, আমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সমীর বল্লে, না, এম্‌নি। একটু থেমে বল্লে, তুমি তাহলে বৃন্দাবন ঘুরে আজ রাত্রির গাড়ীতেই কাশী যাবে ত?

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বা হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে ধারণ করে সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করতে করতে রেণু বল্লে, তাই। যাতে আপনার সুবিধে হয়।

পিসীমার কাছে তোমার কি পরিচয় দেবো?

একটু চুপ করে থেকে রেণু বল্লে, যা সত্যি পরিচয়। একটু শঙ্কিত হয়ে সে প্রশ্ন করলে, তিনি আমায় রাখবেন ত?

রাখবেন বই কি, তুমি থাকলেই তিনি রাখবেন, উত্তরের মধ্যে দিয়ে সমীরের পরম নির্ভরশীলতা ফুটে উঠলো।

টাঙ্গাওয়ালা চাবুকটা ঘোরাতে ঘোরাতে বল্লে, আগয়া বাবুজী, বলেই চাবুকের ডগা উঁচু করে সমীরকে গিরি গোবর্দ্ধনের ছোট্ট মন্দিরটা দেখিয়ে দিলে। রেণু দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

মন্দির থেকে ফিরে আসতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। গোবিন্দজীর সেই পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়ে সেখান থেকে কাপড় চোপড় নিয়ে দোকানে পুরী মিঠাই ও দুগ্ধ পান করে বাসে চড়ে ওরা প্রায় দশটা নাগাদ মথুরা ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হোল। ট্রেন রাত্রি বারোটায়, বাসে আসতে আসতে সমীর বল্লে, রেণু, আগ্রার তাজমহল দেখেছ?

সরল ভাবে দৃষ্টি ক্ষেপ করে রেণু বল্লে, না, দেখি নি ত?

সমীর বল্লে, আচ্ছা, দিল্লীতে কতদিন হোল এসেছ?

রেণু বল্লে, এই আশ্বিন মাস এলে পুরো চার বছর হবে। পূজোর সময় বড়দাবাবু দেশে গিয়ে আমার কেউ নেই বলে দয়া করে সঙ্গে এনেছিলেন সেই যে বছর হিন্দু মুসলমানে খুব দাঙ্গা হয়।

সমীর বল্লে, আশ্চর্য্য, প্রায় চার বছর হোল' এখানে রয়েছ, এ সব কিছুই দেখ নি? রেণু বলে—অথচ বড়দাবাবু ওসব মোটেই ভালোবাসেন না যে। দিদিমণি এজন্য কত দুঃখু করেন।

তোমার দিদিমণি কি রকম লোক রেণু?

সে আর আমি কি বল্‌বো। আমার চেয়ে আপন ত ভালো জানেন তাকে।

আচ্ছা আমার সঙ্গে তিনি যেরকম ব্যবহারটা করলেন সে রকমটা কি আরও অন্য লোকের সঙ্গেও—

জিভ কেটে রেণু বল্লে, না না, সে কি কথা, ছিঃ। আড়ালের কথা মিথ্যে বল্‌তে পারবো না। দিদিমণির কোনরকম বেচাল আমি এর আগে আর কখনও দেখি নি।

সহযাত্রীদের দেখে মনে হয় তারা কেউই বাংলা বোঝে না, তা ছাড়া অধিকাংশই ঝিমুচ্ছিল, বাসখানা একটানা মথুরার দিকে ছুটেছে।

মথুরায় নেমে সমীর বল্লে, তাহলে চল, কাল তোমায় আগ্রাটা ঘুরিয়ে দিই। তারপর কাশী পৌঁছে দেব।

বাস থেকে নেমে কাপড়ের পুটলীটা হাতে করে

পাশাপাশি চল্‌তে চল্‌তে রেণু বল্লে, আপনি আবার করে কাশী যাবেন ?

এই ত তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি, সমীর উত্তর দিলে।

হ্যাঁ, এর পর আবার কবে যাবেন, রেণু প্রশ্ন করলে।

তার কি ঠিক আছে রেণু ? তোমায় পৌঁছে দিয়েই দিল্লী ফিরে আসবো। তারপর আবার যখন ছুটী পাবো—

ঐ বাসাতেই থাকবেন ?

দেখি, হয়ত ওখানে থাকা হবে না।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে রেণু বল্লে, ঐখানেই থাকতে হবে, অন্য কোথাও আপনার থাকা চল্‌বে না।

দুজনে এসে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের মধ্যে বসলো। থার্ড ক্লাসের যাত্রী হলেও সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে বস্‌তে সমীর অভ্যস্ত ছিল।

আরাম করে বসে সমীর বল্লে, রেণু, চা কি সরবৎ কি খাবে বল ?

একটু জল পেলে ভালো হোত, রেণু উত্তর দিলে।

আচ্ছা। সমীর উঠে গেল। একটু পরে দুগেলাস সরবৎ এবং দুটো পান নিয়ে সমীর এসে ঢুকলো। বল্লে, জল আর কি খাবে, তার চেয়ে বরফ দেওয়া সরবৎ খাও।

সরবৎটা নিঃশেষ করে, পানটা মুখে দিয়ে রেণু বললে, বেশ পানটা! কেমন সুগন্ধ।

সমীর কোন উত্তর না দিয়ে পান খেতে খেতে আর একটা সিগারেট ধরালো। এমন সময় বয় এসে খালি গেলাস ও সরবতের দাম নিয়ে চলে গেল।

একটু পরে রেণু বল্লে, এমন দিন আর হবে না, কি বলেন ?

ভালো লাগছে ?

খুব। বলেই রেণু যেন লজ্জায় মরে গেল।

পরদিন আগ্রার তাজমহলে ঢুকে রেণু অবাক্ হয়ে গেল। সমীরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বল্লে, এ কিসের মন্দির, না এ মস্‌জিদ্ বুঝি ?

সমীর বল্লে, না, এ মন্দিরও নয়, মসজিদও নয়। এ হচ্ছে কবরখানা। রানী মরে যাওয়ার পর রাজা তার কবরের ওপোর এই তাজমহল তৈরী করিয়েছিলেন। তারপর রাজার নিজের মৃত্যুর পর তাঁরও সমাধি হয় রানীর কবরের পাশে। চল, ভেতরে গিয়ে দেখতে পাবে রাজা-রানী পাশাপাশিই আছেন।

সমীরের পাশে পাশে রেণু সমস্ত তাজমহলটা ঘুরলে। তলায় কবরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপলকনেত্রে সেই দিকে চেয়ে রইলো। ওপোরে যেখানে মোল্লারা সুর করে চেঁচায় সেইখানে দাঁড়িয়ে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির খেলা সে শুনলে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমীরের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে হেঁট হয়ে জুতো পরতে গিয়ে সমীরের বুকপকেট থেকে সিগারেটের কেস্‌টা মেঝেয় পড়ে গেল। রেণু তাড়াতাড়ি ওটা কুড়িয়ে নিয়ে সমীরকে এগিয়ে দিলে, তারপর ওরা দুজনে মিলে চল্‌লো মিনারের দিকে।

মিনারে উঠে রেণু খুব আনন্দ করে বল্লে, এই রকম একটাতে আমাদের উঠিয়েছিলেন না আপনি। সেটার নাম বুঝি কুতবমিনার ?

হ্যাঁ।

মিনারের ওপোরটায় হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। কদিন ধরে সময়ে খাওয়া নেই, ঘুম নেই, দুশ্চিন্তাও কিছু কিছু আছে। সমীরের বেশ একটা দৈহিক ক্লান্তি এসে গিয়েছিল, কিন্তু ক্লান্তি সত্বেও তার যেন মনে একটা স্ফূর্তিও ছিল। দেওয়ালের গায়ে পেন্সিলে লেখা বিভিন্ন নাম দেখতে দেখতে হঠাৎ সে দেখ্‌লে কে এক রসরাজ, ইংরাজীতে লিখে গেছে, সাবিত্রী, আমি তোমায় ভালোবাসি।

লেখাটা বার বার পড়তে পড়তে সমীরের হাসি এলো। রেণু ওর মুখের দিকে লক্ষ্য করছিল, বল্লে, হাস্‌ছেন কেন ?

সমীর বল্লো—না, ও কিছু নয়।

না বলুন, কি হয়েছে বলুন না ? রেণুর মুখে যেন হঠাৎ খুকীর মত ভাব।

সমীর বল্লে, কে একজন রসরাজ এখানে লিখে গেছে যে সে সাবিত্রীকে ভালোবাসে।

রেণু অনেকক্ষণ ধরে লেখাটার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে, চলুন, নামতে হবে না ?

রেণুর মুখের দিকে চেয়ে সমীর সিঁড়ির মধ্যে পা ঝুলিয়ে চেপে বসলো। বল্লে, এত তাড়া কিসের ?

রেণু বল্লো আমার আর তাড়া কিসের, তবে আপনার নাওয়া খাওয়া ত করতে হবে।

সে হবে'খন, তুমি বোসো।

অগত্যা রেণু ওর পাশেই বসলো।

বেলা তখন আন্দাজ সাড়ে ন'টা কি দশটা। এই প্রশস্ত দিবালোকে মাটী থেকে অনেক উঁচুতে তাজমহলের মিনারে সমীর হঠাৎ রেণুর বাসনমাজা কড়া-পড়া কালো হাতখানা জোর করে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ করে বসলো। হু হু করে হাওয়া বইছে, সেই হাওয়ায় রেণুর মাথার শুক্ন চুলগুলো দুচার গাছা করে ওর মুখের ওপোর উড়ে উড়ে এসে পড়তে লাগলো। এ মিনারে তখন অন্য কোন যাত্রী আর নেই, তবে সামনের মিনারে এক দল স্ত্রীপুরুষ ও কয়েকটি বাচ্চা নিজেদের আনন্দেই নিজেরা মশগুল হয়ে চেঁচামেচি করছিল।

রেণুর মুখের দিকে চেয়ে সমীর বল্লে, আচ্ছা রেণু, তুমি কি আমায় সত্যিই ভালোবাসো?

রেণু নিরুত্তর।

বল, বল, তুমি কি আমায় সত্যিই ভালোবাসো রেণু? সমীরের প্রশ্নের মধ্যে কেমন যেন উন্মাদনা এসে গেছে। রেণু কিন্তু নিরুত্তর।

চুপ করে থেকো না রেণু,, বল। সঙ্গে সঙ্গে সমীর হাতের ওপোর বড় রকম একটা ঝাঁকানি দিলে।

ঘাড় হেঁট করে রেণু উত্তর দিলে, আমি যে বিধবা। কিন্তু হাত সে টেনে নিলে না, স্থাণুর মত নিশ্চল হয়েই বসে রইলো।

তা হোক, বিধবারও বিয়ে হয়। তুমি বল রেণু, তোমার আপত্তি আছে?

রেণু চুপ করেই বসে রইলো, কেবল তার হাতটা বেশ কাঁপছিল।

তোমার ত কেউই নেই রেণু, তবে তোমার ভয় কিসের? বাধাই বা কোথায়? বল, আমি তোমায় বিধবা বিয়ে করবো।

হঠাৎ রেণুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরে পড়লো।

কাঁদছো কেন? সমীর সস্নেহে প্রশ্ন করলে।

ছোটো দাবাবু, আমি বিধবা, এ জন্মের মত আমায় রেহাই দিন। আপনি কত বড়, আর আমি কত ছোট, লোকের বাড়ী ঝি-রাঁধুনির কাজ করি। চোখের জল মুছে রেণু বল্লে, আপনার পায়ে পড়ি দাদাবাবু, আমায় আপনি পিসিমার কাছে কাশীতে রেখে বেশ ভালো দেখে একটি বিয়ে করে সংসারী হোন, বরং আপনাদের সংসারের সমস্ত কাজ আমি করে দেব, আমাকে আপনি খেতে পরতে দেবেন।

সমীর আস্তে আস্তে রেণুর হাতটা ছেড়ে দিলে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, চল যাই, টাঙ্গাওয়ালা আবার চেঁচামেচি করবে।

রেণুও উঠে দাঁড়ালো। সিঁড়িতে পা দিয়েই বল্লে, আমার ওপোর রাগ করলেন?

সমীর বল্লে, না, তোমার ওপোর রাগ করি নি কিন্তু প্রণাম করি সেই হিন্দুত্বকে, যে নিরক্ষরের মধ্যেও এমন পবিত্র সংস্কার এত প্রবল করে ও স্থায়ীভাবে খোদাই করে দিয়েছে।

এগারো

সমীর যেদিন সকালে বৃন্দাবনে পৌঁচেছিল, সেই দিন সকালে আটটার সময় সমীরের সাইকেলটা নিয়ে অর্জ্জুন প্রসাদ সদাশিবের বাংলোয় এসে হাজির হোল। নম্বর খুঁজে বাংলোটা বার করে সে বার বার হাঁক দিতে লাগলো, হ্যালো মিষ্টার, হ্যালো মিষ্টার,—কারণ এ বাসার কারুর নামই সে জানতো না।

সদাশিব তখন বাজারে গেছে। গৌরীর শরীরটা কাল রাত থেকে আবার খারাপ হয়েছিল। সে তখনও শুয়েই ছিল। বাড়ীতে অন্য কেউ না থাকায় বেচারা অর্জ্জুন প্রসাদ দু'চার বার ব্যর্থ আহ্বান করে শেষে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে লাগলো।

সাইকেলের আওয়াজটা কানে যেতেই গৌরী উৎকর্ণ হয়ে শুনলে, এত সমীরের গাড়ীর শব্দ! কোনমতে টল্‌তে টল্‌তে উঠে এসে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে অচেনা লোকের হাতে সমীরের সাইকেলটা দেখে একেবারেই প্রমাদ গনলে, কি ব্যাপার? তবে কি কোন—

অর্জ্জুনপ্রসাদ প্রশ্ন করলে, এটা কি সমীর বসুর বাংলো? গৌরী সাগ্রহে উত্তর দিলে হ্যাঁ, বাবু কোথায়?

অর্জ্জুন বিনীতভাবে বল্লে, মায়িজী, সমীর বাবু কাল রাত্রের ট্রেনে কাশী গেছেন, আর যাওয়ার সময় আমায় তার সাইকেলখানা দিয়ে বলে গেলেন, এই বাড়ীতে পৌঁছে

দিতে। সমীর বাবু এই বাড়ীতেই থাকেন আর এইখানেই ত ফিরবেন ?

গৌরীর এতদিন শুনে শুনে হিন্দী এবং উর্দ্দুর চলনসই জ্ঞান হয়ে কথা বলতে তার আটকায় না। পরিষ্কার উর্দ্দুতে বলে দিলে যে, সমীরবাবু এই বাড়ীতেই থাকেন ও এইখানেই ফিরবেন এবং ঘরের মধ্যের স্ট্যাণ্ডটা দেখিয়ে বল্লে, ঐখানে মেহেরবাণী করে গাড়ীটা তুলে দিন।

অর্জ্জুনপ্রসাদ ঘরে ঢুকে বাইকটা যথাস্থানে রাখতেই গৌরী প্রশ্ন করলে, বাবু কাশীতে কেন গেলেন বল্‌তে পারেন ?

অর্জ্জুনপ্রসাদ একটা ঢোঁক গিলে বল্লে, তা ত জানি না।

গৌরী বল্লে, কবে ফিরবেন ? তার অফিসের কি হবে ?

অর্জুন মনে মনে হিসেব করলে যে, সেই আওরাৎটিকে কাশীতে তার পিসীর কাছে পৌঁছেই ফিরে আস্‌তে হয়ত তিনদিন লাগতে পারে। একটু থেমে সে উত্তর দিলে, তিনচার দিনের মধ্যেই বোধহয় ফিরবেন।

গৌরী বল্লে, আপনার নামটা কি জানতে পারি, তিনি এলে বলবো।

অর্জুনপ্রসাদ শর্মা।

অর্জুন দরজার কাছাকাছি আস্‌তেই গৌরী বল্লে, শর্মাজী তার পিসিমার কোন জরুরী খবর পেয়েই কি তিনি কাশীতে গেছেন ?

পিসিমার কথা শুনে অর্জুনের মনে হোল, কার পিসিমা ? সমীর বাবু ত বলেছিলেন, সেই আওরাৎটির পিসিমা কাশীতে থাকেন ! তাহলে ? বেচারা চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে গেল।

গৌরী পুনরায় প্রশ্ন করলে, বল্লে, সমীর বাবুর পিসিমার কোন খবর জানেন কি :

অর্জুন বল্লে তার মর্ম্মার্থ এই যে পিসিমার কোন খবর সে জানে না, তবে পিসিমার কাছেই তিনি যাবেন, একজনকে নিয়ে। তিনি যাবেন আর ফিরে আসবেন, এবং অফিসেও এরই মর্ম্মে ফোন করে দিয়েছেন।

কাকে নিয়ে যাবেন ? গৌরীর চক্ষে সন্দেহের ভ্রূকুটি !

অর্জুন একটু থেমে যা বল্লে, তার অর্থ এই যে কাকে নিয়ে সমীর বাবু যাবেন, তা সে জানে না।

গৌরী বল্লে, আচ্ছা কোন স্ত্রীলোককে নিয়ে কি তিনি যাচ্ছেন, কোন স্ত্রীলোক, যার এক চক্ষু কাণা।

অর্জুন মনে করলে, বা রে ! সমীর বাবু যাকে বল্লে নিরুদ্দেশ, ইনি ত তাকে বেশ ভালোই জানেন। চট করে অর্জুনের মনে হোল, এটাই বা কি ? সমীর বাবুর আলাদা কোয়ার্টার্স রয়েছে এখানে স্ত্রীলোকও রয়েছে, হয়ত বা সমীর বাবুর স্ত্রীই হবেন ইনি, তা'হলে ট্রেনের দুঘণ্টা সময় থাকা সত্ত্বেও সমীর বাবুর বাসায় না ফেরার কারণ কি ? তবে কি—? নাঃ, মেয়েটার যা মূর্ত্তি, তাতে অন্য কিছু সন্দেহ করাও যায় না, তা হলে—

গৌরী সাগ্রহে আর একবার প্রশ্ন করলে, চালাকী করে বল্লে, বলুন বলুন শর্মাজী, সমীর বাবু আর সেই কানা মেয়েটির জন্য আমরা খুবই চিন্তিত আছি।

তখন অর্জুন গান্ধীঘাটের প্রসঙ্গ থেকে সুরু করে সব কথাই আনুপূর্ব্বিক বলে গেল।

গৌরী বল্লে, আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছি। তার মুখে চোখে ফুটে উঠলো এমন একটা ভাব, যাতে অর্জ্জুন মনে করলে, সে বেশ স্বস্তি লাভ করেছে, কিন্তু গৌরীর ভেতরটা তখন একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। সে যেন একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়েছিল।

অর্জুন প্রসাদ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্লে, নমস্তে মাঈজী এবং তারপর রোয়াক থেকে কাঁকর ঢালা রাস্তায় নেমে দ্রুতপদে চলতে লাগলো। যে-কথা মাঈজী সবই জানে, সে কথা সমীরবাবু প্রকাশ না করার জন্য কেন অনুরোধ করেছিলেন সে বিষয় কিছুক্ষণ যাবৎ নিষ্ফল চিন্তা করে অর্জ্জুনপ্রসাদ ভাবলে, যানে দেও, বাঙ্গালীর বাড়ীর কথায় তার অত মাথা ঘামাবার কি-ই বা আছে।

অর্জুন প্রসাদের নমস্তের প্রতিনমস্কারটি পর্য্যন্ত না করে গৌরী কোনরকমে অপেক্ষা করছিল তার যাওয়ার জন্য। যে মুহূর্ত্তে সে রোয়াক থেকে রাস্তায় নামলো, সেই মুহূর্ত্তেই গৌরী যেন একেবারে ভেঙে পড়লো নেওয়ারের খাটখানার ওপোর।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। বোধহয় যেন পাঁচ দশ ঘণ্টাই হবে ! কিন্তু টাইমপিস ঘড়িটায় টং করে

সাড়ে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরী যেন স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো টপ করে উঠেই ব্রাকেটে ঝোলানো সমীরের হ্যাভারস্যাকের মধ্যে হাত ভরে সেখান থেকে সমীরের বাক্সের চাবিটা বার করে খুব তাড়াতাড়ি সমীরের সুট-কেশ খুলে সুটকেসের তলায় হাত চালিয়ে সেখান থেকে একটা মোটা সরকারী খাম বার করে নিলে। খামখানা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলে তার মধ্যে একখানাও নোট নেই, অথচ গৌরী স্থির জানে যে এই খামের মধ্যে সমীরের দু'শো একশ' টাকা সর্বদাই থাকে, অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশের কম কিছুতেই নয়। পঞ্চাশের কম হয়ে গেলেই সমীর যেখান থেকে পাবে টাকা সংগ্রহ করে এই খাম ভর্তি করে রাখে। বহু মধ্যাহ্ন-আলাপের মধ্য দিয়ে গৌরী সমীরের কাছ থেকে এই সব তথ্য আবিষ্কার করেছিল।

দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে গৌরী কিছুক্ষণ চিন্তা করলে, তারপর খামটা যথাস্থানে রেখে বাক্সে চাবি দিয়ে টেবিলের ওপোর বসানো গোল্ড ফ্লেকের টিনটা খুলে দেখলে একটাও সিগারেট নেই। তখন তার স্থির বিশ্বাস হোল যে, অর্জুনপ্রসাদ হয়ত ঠিক জানে না। রেণুর সঙ্গে সমীরের গান্ধীঘাটে দেখা হওয়াটা আকস্মিক ঘটনা না, এটা পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল, কিম্বা হয় ত অর্জুনপ্রসাদ কিছুটা সাজিয়ে বলেছে, কারণ প্রথম থেকেই বুঝা গিয়েছিল যে, অর্জুন যেন তাকে বেশ কিছু গোপন করার চেষ্টা করছিল। সবটা ভাবতে ভাবতে গৌরীর মনে এলো দারুণ অবসাদ। চুলোয় যাক্ সমীর আর চুলোয় যাক্ রেণু, ওরা ওর কে? দুদিনের জন্য স্বামীর বন্ধু হয়ে এসেছিল, দিল্লীতে কোথাও থাকবার জায়গা জোটে নি বলে এখানে এসেছিল আশ্রয়ের খোঁজে। হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল এসে গেল। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে সে যেন নিজেই আজ আশ্রয়হারা। কথাটা মনে হতেই গৌরী নিজেই নিজের গালে চড় মারলে। কিসের আশ্রয়হারা, কেন আশ্রয়হারা, কোন শক্রতে বলে, সে আশ্রয়হারা! সদাশিব ত তাকে আগের মতোই ভালো-বাসে। আগের মতই যত্ন করে। সমীর ত বলেই গেছে, এ সব তাস খেলা। তবে? এখানকার তাস খেলা ফুরিয়েছে; সে এখন অন্যত্র তাস খেলায় মেতে গেছে। সে আমার কে? বুঝুক ঐ কাণী মাগীটা! ছিলি সুখে, কোন ভাবনা না করেই দুবেলা পেট ভরে খেতে পরতে পারছিলি, এখন দেখবি মজা! এমন লোক নিয়ে নিজের মুখে নিজে হাতে কালি মাখলি যে কালামুখা মাগী দুদিনেই টের পাবি, কি হাড়ীর হাল তোর হয়! বেশ হয়, ভালো হয়। একটা আধমরা ছেলে কোলে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যখন ভিক্ষে করে বেড়াবি, তখন বুঝতে পারবি, দিদিমণির সর্বনাশ করার মজাটা! ঐ সমীর! ও কক্ষনো ঐ মাগীকে ছ'মাসের বেশী দেখবে না। আর সমীর? কংগ্রেসের কর্মী, বোমার আসামী, দেশ উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে সুনাম করেছে! যাবে, ঐ সমস্ত সুনাম, একটা কাণী ঝিয়ের জন্য রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে। আচ্ছা, এই রকম চরিত্রহীন লোককে গভর্ণমেণ্ট চাকরীতে রাখে? দেবো না কি ওর অফিসারকে একখানা চিঠি? অফিসের কাজ ফাঁকী দিয়ে একটা ঝি নিয়ে দেশত্যাগী হওয়া! তিনদিন পরে সে কক্ষনো ফিরবে না। এই ছ'মাসের চাকরী হতে না হতে বার বার করে বেরোনো, তাও না হয় বুঝলুম অফিসের কাজে! আর এবার? একটা মেয়ে চুরী করে যে পালায়, তাকে কি আর অফিসে ঢুকতে দেওয়া উচিত? কখনও নয়?

র‍্যাশান ব্যাগে সামান্য টুকিটাকি বাজার করে একখানা পাউরুটী হাতে নিয়ে সদাশিব ঘরে এসে ঢুকলো। ঢুকেই গৌরীকে এবরে দেখে প্রথমে প্রশ্ন করলে, কি একটু ভালো বোধ করছো! তারপরেই সমীরের সাইকেলের দিকে নজর পড়তেই বল্লে কথ। এলো সমীর? গেল কোথায়?

ঠোঁটটা উল্টে গৌরী বল্লে, বাবু কাশী গেছেন, হয়ত বা পুণ্য করতে!

থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে সদাশিব বল্লে, তার মানে? কাশী গেছে কে বল্লে? সাইকেল এলো কোত্থেকে?

কে একজন তোমাদের শর্মা আছে, সে এসে সাই-কেলটা দিয়ে বলে গেল, বাবু একটা কাণী মেয়ে মানুষকে নিয়ে রাতের ট্রেনে কাশী গেছে, হয়ত তিন চার দিন পরে ফিরে আসতে পারে।

অবাক বিস্ময়ে সদাশিব গৌরীর মুখের দিকে মূঢ়ের মতো দৃষ্টিক্ষেপ করে বল্লে, কাণী মেয়ে মানুষকে নিয়ে, মানে রেণুকে নিয়ে সে গেল কাশীতে? সে কি কথা?

আর আমরা এখানে লোকের অভাবে পাউরুটী খেয়ে অফিসে যাবো ?

হাঁ৷ হাঁ৷, এই তোমার বন্ধু ! এই বন্ধুকেই তুমি ঘরে এনে পুষেছিলে ?

টেবিলের ওপোর রুটীখানা রেখে, মেঝের ওপোর থলেটা ফেলে সদাশিব ডেক চেয়ারে বসে কোঁচার কাপড় দিয়ে মুখের ঘাম মুছে জামাটা খুলে ফেললে। জামার বোতামগুলো আগে থেকেই খোলা ছিল, মাথা গলিয়ে জামা খুলতে গিয়ে অতর্কিতে পকেট থেকে খুচরাগুলো কতক চেয়ারে, কতক মেঝেয় ছড়িয়ে পড়লো।

আঃ, জ্বালাতন করলে! সদাশিব আপন মনেই বিরক্তি প্রকাশ করে হেঁট হয়ে পয়সাগুলো কুড়োতে লাগলো।

হঠাৎ গৌরী উঠে পড়ে মেঝের ওপোর থেকে গোটা কয়েক খুচরা ইত্যাদি তুলে নিয়ে সদাশিবের হাতে দিয়ে বহুকালের মধ্যে যা করে নি, তাই করে বসলো। সে নিজের আঁচলের কাপড় দিয়ে সদাশিবের বুক পিঠের ঘাম মুছিয়ে দিতে লাগলো।

সদাশিব ত অবাক্! একি, একি! এ আবার কি ?

গৌরী সস্নেহে উত্তর করলে, নিজেই খালি রোগে ভুগে মরি, তোমার আর যত্ন করবে কে ? ওঃ, তোমার চেহারা যে কি হয়ে গেছে! অথচ এটা পরম সত্যি যে গত কয় বছরের মধ্যে সদাশিবের স্বাস্থ্য একইভাবে চলেছে, বরং এখন একটু উন্নতির দিকে, কারণ সমীরের কৃপায় এখন আহারাদি, বিশেষকরে প্রাতরাশটা পূর্ব্বের তুলনায় খুব ভালোই হচ্ছিল। তাছাড়া মাসিক একশ টা করে টাকা বাড়তি পেয়ে সদাশিবের মনটা বেশ খুসিই ছিল।

ঘাম-টাম মুছিয়ে দিয়ে গৌরী বল্লে, নাও, স্নান, করে পুজো আহ্নিক সেরে নাও, আজ ত সকাল থেকে ওসব কিছুই করতে পারো নি, চা-টুকু পর্য্যন্ত পেটে পড়ে নি। খুব নরম করে বল্লে হাঁ৷ গা, রান্নার লোক-টোক পেলে ? সদাশিব আজ ভোরে উঠেই রান্নার লোক খুঁজতে বেরিয়েছিল।

একটু বিরক্ত হয়ে সদা বল্লে, লোক ত পাওয়া যায়। কিন্তু তোলা মাইনে তিরিশ টাকা, এবং রাতদিনের খাওয়া-পরা হলে কুড়ি বাইশ টাকা মাইনের কমে একটা বাচ্চা ছেলে পর্য্যন্ত মেলে না। এই ত দিল্লীর অবস্থা।

গৌরী বল্লে, থাক্‌গে যাক, কাল থেকে আমিই রান্না করবো। ভারি ত দুটো লোকের রান্না, সেজন্যে আবার—। একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, এক কাজ করো, একটা কুকার এনে দিও, তাতেই একসঙ্গে ভাত, ডাল, তরকারী হয়ে যাবে, আর একটা ইলেকিট্রিক ষ্টোভ থাক্‌লে, চা জলখাবার ইত্যাদি—। এতে আগুনতাত লাগবারও ভয় থাকবে না, তথা মাসে মাসে অনেকগুলো টাকাও বেঁচে যাবে।

সদাশিব স্ত্রীর মুখের দিকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখলে। ও কি পারবে ? অসুস্থ শরীর নিয়ে দু'দিন খাটা-খাটুনী করে, শেষে আবার— ?

গৌরী সঙ্গে সঙ্গেই সদাশিবের সন্দেহ বুঝে নিয়েছে। বল্লে, কোন ভয় নেই গো, ঐরকম ব্যবস্থা করে নিলে আমার শরীরের কোন ক্ষতিই হবে না। আর তাছাড়া কুকারে খাওয়া ত ভালোই।

সদাশিব বল্লে, কুকারে খাওয়া ত আমার অভ্যাসই ছিল। আগে যখন দিল্লীতে আমি একলা ছিলুম, তখন দিনকতক মেসে খেয়ে আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর নিজে হাতে কুকারের ব্যবস্থা করে তবে সেরে উঠি, কাজেই—

এ গল্প গৌরী খুব কম করেও একশ'বার শুনেছে। তবুও আজ এই পুরাতন কথাতেই সে আগ্রহ ভরে বল্লে, তবে ? তবে আর ভাবনা কি ? যদিই আমার শরীর কোনদিন খারাপ হয়, তাহলে তুমিই কুকারে ভাতটা ফুটিয়ে নিতে পারবে। এ-ভাবে ত আর পাউরুটী চিবিয়ে অফিসে যেতে হবে না।

স্নানাহ্নিক সেরে খেতে এসে সদাশিব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। যেভাবে রেণু আসন পেতে জায়গা করে দিত, গৌরী আজ সেই ভাবে আসন পেতে থালা দিয়েছে। পাউরুটী টোষ্ট করে মরিচ গুঁড়িয়ে এনে দিয়েছে, পাশে চিনির জারটা বসিয়ে দিয়েছে। কেটলীতে করে চা এনে রেখেছে, এবং সদাশিব আসনে বসতেই গৌরী নিজের খাওয়ার জন্য রেখে দেওয়া আপেলটা এনে একটা

বঁটী নিয়ে পাশে বসে বল্লে, তুমি খাও, আমি ততক্ষণ এটা ছাড়াই।

আশ্চর্য্য, গৌরী যেন একদিনেই বদ্‌লে গেছে। এর পরেও বিস্ময় আছে। গৌরী আধখানা আপেল ছাড়িয়ে হঠাৎ সেই কুঁচোগুলো সদার পাতে ফেলে দিলে। এই আপেল জিনিষটা গৌরী খুবই ভালোবাসে অথচ দাম বেশী বলে সদা বড় একটা কেনে না, নেহাৎ রোগ বাড়লে তবে কিনতে বাধ্য হয়। তাই গৌরীর জন্য সদা একটা মাত্র আপেল এনেছিলো সন্ধ্যের পর, আজ সকালে সদা ঠিক জানতো যে গৌরী সদার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজে পাশে বসে আপেল ছাড়িয়ে খাবে কিন্তু একি, হঠাৎ আধখানাই সদাশিবের পাতে? ব্যাপার কি?

উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই সদাশিবের মনে হোল জিনিষটার অপব্যয়। দারুণ অপব্যয়। ছ'আনা দামের আপেলটা কি সদাশিব এই ভাবে নিজে খাওয়ার জন্য এনেছে? নেহাৎ রোগীর দরকার, তাই সে—

তেড়েমেড়ে উঠে সে গৌরীকে বল্লে, একি, একি, আমার পাতে এ সব কেন? মিছামিছি এইভাবে পয়সা নষ্ট কোরো না, ছিঃ।

গৌরী এই ধমকটা গায়ে না মেখেই বল্লে, একটা গোটা আপেল কি খাওয়া যায়! তাই তোমাকে আধখানা দিয়ে—

মুখের পাউরুটী গলাধঃকরণ করে সদা বল্‌লে, খাওয়া না গেলে আধখানা রেখে দেবে, বিকেলের জন্য; আমাকে দিয়ে কি লাভ। একখণ্ড আপেল মুখে দিয়ে বল্‌লো সস্তার জিনিষ হলে আপত্তি ছিল না, কিন্তু মনে করো; এইটুকু একটা ফল, ছ'আনা এর দাম।

আহারাদি শেষ করে অফিসে বেরোবার সময় সদা বল্লে, তাইতো, আজ তুমি সারাদিন নিছক একলাটি থাকবে! কি যে হবে, তা জানি না। একটু থেমে বল্‌লে, শেষে কি না সমীর আমার অমন লোকটাকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেল!

গৌরী বল্‌লো যাক্, যাক্, ওঁদের আর নাম পর্য্যন্ত মুখে এনো না। ও সব বাইরের লোক যত যায় ততই ভালো। কিন্তু আমি ভাবছি, আজ তুমি অফিসে কি খাবে! আচ্ছা দেখ, এক কাজ কর, আজকের দিনটা যে রকম করে হোক, তুমি চালিয়ে দিও। কাল থেকে আমি সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলবো। তবে কুকারটা আর ষ্টোভটা আজ অফিস থেকে ফেরবার সময়—

সদাশিব ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, এমাসে কত খরচ হয়েছে, তা মনে আছে কি? নেহাৎ সমীর ঐ টাকাটা দিয়েছে,

কিন্তু গৌরী স্থির জানে যে, সমীরের দেওয়া একশ' টাকার নোট সুস্থ শরীরেই অন্যান্য নোটের সঙ্গে সদাশিবের পোষ্ট অফিসের খাতায় চিরদিনের মত আশ্রয় লাভ করেছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে সদাশিব যে ভুয়োভুয়ো মিথ্যা কাঁদুনী গাইতে ভালবাসে বা ঐ কাঁদুনীতে সে যে আনন্দ পায়, সে কথা গৌরী কেন, রেণুও জানতো। এমন কি নীরোদবাবুদের বাড়ীর কুকুরটাও বোধ হয় জানে।

তিনবার দুর্গা শ্রীহরি নাম জপ করে টাইমপিসের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেই সদাশিব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

দুপুরে গৌরীর সময় আর কাটতে চায় না। নিজের ঘরে এসে আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে সে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে চেষ্টা করলে, ভালো লাগলো না। পুরাতন একটা গল্পের বই পড়েছিল, সেখানা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলো, কিন্তু সেও বড় বিশ্রী মনে হল। অনেকক্ষণ বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইলো তারপর টপ করে উঠে বইরের ঘরে এসে হঠাৎ সমীরের কাগজপত্র নিয়ে ঘাটতে সুরু করে দিলে। ঘাটতে ঘাটতে একখানা পুরাতন পোষ্টকার্ড হাতে পেয়ে খুব মন দিয়ে সেখানা দেখে নিয়ে সেই পোষ্টকার্ডের ওপোর থেকে সে কাশীর ঠিকানাটা সংগ্রহ করলে। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে দোয়াত কলম ও কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো।

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে সে সুরু করলে, শ্রীচরণ-কমলেষু। তারপর কি লেখা যায়! লিখলে, 'পাসণা, আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই তবে হয়ত আমার পরিচয় জানেন। আপনার ভাইপো অর্থাৎ সমীর বাবু দিল্লীতে আমাদেরই বাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁর বন্ধুর স্ত্রী। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে লিখলে 'আমি আজ এরূপ একটি কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি, যাহা আপনার ন্যায় গুরুজনের নিকট না বলিলেই ভালো হইত,

কিন্তু উপায় নাই বলিয়াই লিখিতে বাধ্য হইলাম। সমীর বাবু এখানে বন্ধুভাবে আসিয়া এমন অপযশের কাজ করিয়া গিয়াছেন যে—'

এতদূর লিখে গৌরী আবার ভাবতে লাগলো যে কি? তাকে কি আর এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দেব? আচ্ছা, যদি—

দু'ঘণ্টার চেষ্টায় চিঠিটা বোধ হয় যেন সম্পূর্ণ হোল। কিন্তু চিঠিটায় নানা রকম কাটাকুটি হয়ে গেল। অতএব, আর একখানা কাগজ নিয়ে সেটা ভালো করে লেখা উচিত। কিন্তু এতক্ষণ ধরে ঘাড় হেঁট করে বসে বসে লিখে মাথা-টাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। কি করা যায়! এত কড়া করে চিঠি দেওয়া কি উচিত! এতে ত চিরদিনের মত সম্বন্ধ কেটে যায়। হঠাৎ এক পৈশাচিক আনন্দ এলো গৌরীর মনে। এই ভালো, এই ঠিক হয়েছে! বুঝুক সে! যা খুসি করবে আর গৌরী তাকে একটানা যত্ন করে যাবে, এমন নির্লজ্জ মেয়ে গৌরী নয়। শত্রুর নাকের সামনে দরজা বন্ধ করে দেওয়াতেই একটা আনন্দ আছে। চিঠি লিখে গৌরী ঠিক সেই আনন্দই পাচ্ছে। তা'হলে এ চিঠি আজই ফেলা দরকার। বেশ হয়েছে, আজ বিকেল নাগাদ সমীর সেই কাণীটাকে নিয়ে কাশী পৌছুবে, আর কাল দুপুর নাগাদ যদি ওর চিঠি গিয়ে পিসিমার হাতে পড়ে, তা'হলে বেশ হবে। তবে একটা কথা, পিসিমা কি লেখা পড়া জানেন? চিঠিটা কি তিনি নিজে পড়তে পারবেন? তা যদি না হয় তাহলে হয়ত তিনি ঐ চিঠি তার ভাইপোকেই পড়তে দেবেন। গৌরীর মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। খুব ভালো হয়—সব চেয়ে ভালো হয়। সমীর তার হাতের লেখা চিঠিটা স্বচক্ষে পড়ে দেখুক গৌরী সমীরকে কত ঘৃণা করে। এবং তারপর আরও মজা হবে, পিসিমা যখন নানাভাবে জিজ্ঞাসা করবে কে লিখেছে কি লিখেছে, কোত্থেকে লিখেছে, তখন ধূর্ত সমীর কিভাবে উত্তর দেবে? চিঠিটা একটু বড়ো হয়েছে, তা হোক, নকল করার সময় আরও বেশ কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে, এই এই জায়গাগুলোয়। অতঃপর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে গৌরী আবার নতুন কাগজ নিয়ে লেগে পড়লো চিঠিখানা নকল করতে। নকলের ভাষাটা আরও কড়া হয়ে গেল। আরও চোখা-চোখা শব্দ সে খুঁজে খুঁজে বসালে। এবার তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, চিঠির ব্যাপার—আর কেউই জানবে না, শুধু সে লিখছে আর সমীর পড়ছে। কিন্তু আজই, এক্ষুনি এই চিঠি শেষ করে ডাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

বেলা তিনটে নাগাদ চিঠি লেখা শেষ হোল। চিঠি লিখে উঠে দাঁড়াতেই গৌরীর মাথা-টাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। দু'মিনিটের মধ্যেই সে প্রকৃতিস্থ হয়ে ও চিঠিখানা, একটা খাম এবং পিসিমার কাছ থেকে সমীরের কাছে লেখা সেই পুরাতন পোষ্ট-কার্ড নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো নীরোদবাবুদের বাড়ীর দিকে। সেখানে গিয়ে নীরোদবাবুর পুত্রবধূর কাছ থেকে ডাক টিকিট সংগ্রহ করে তার দাম দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয় করলে, সে কিন্তু কিছুতেই নিলে না। শেষে ঐ খামটায় টিকিট লাগিয়ে ঠিকানা লিখে গৌরী বল্লে, ভাই, এই চিঠিটা এখনই পোষ্ট অফিসে ফেলিয়ে দিতে হবে, বড় জরুরী কি না।

সে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে লিখছেন ভাই, এত জরুরী চিঠি, কি ব্যাপার!

জিনিষটাকে রহস্যমণ্ডিত করে গৌরী বল্লে, বিশেষ জরুরী কাজ, যদি সফল হয়, তাহলে পরে বল্‌বো।

ওরা ওদের বাড়ীর চাকরকে দিয়ে চিঠিখানা পোষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দিলে।

দু'চার মিনিট এদিক ওদিক গল্প করে গৌরীর হুঁস্ হোল, যে তার নিজের বাড়ীর দরজা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে এলো।

অসুস্থ শরীর নিয়ে সারাদিন ধরে লেখালেখি করে এতক্ষণ পরে শরীরটা খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তেই হঠাৎ বহু পূর্ব্বের দেখা কালীপূজার সময়ের একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। সে প্রায় আট দশ বছর আগেকার কথা। কালীপূজার পরের দিন সকালে ওর বাপের বাড়ীর দেশের এক পূজামণ্ডপে পূজার পরের দিন সকালে ও গিয়ে দেখেছিল হাঁড়িকাঠের পাশে এক বৃহদাকার মহিষ পড়ে আছে, আর সেই মহিষের পেটের কাছে পড়ে আছে তার ছিন্নমুণ্ড। সমস্ত জায়গাটা

রক্ত জমে চাপ হয়ে আছে। মহিষের চোখ দুটো তখনও চেয়ে ছিল, আর তার চারটে পা আড়ষ্ট হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে আজ বিছানায় শুয়ে চোখ বুজতেই কেন জানি না, হঠাৎ সেই দৃশ্যটাই ওর মানসপটে বড় উগ্র হয়ে ফুটে উঠলো।

আধঘণ্টার মধ্যেই ওর মনে বারবার করে একটাই প্রশ্ন জাগতে লাগলো, কাজটা কি ভালো হোলো—কাজটা কি ভালো হোলো?

[ক্রমশঃ]

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদ

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গ মাশ্মরথ্যঃ (২০)

প্রতিজ্ঞা হেথা সিদ্ধ হয়েছে আশ্মরথ্যে কন
আত্মা জানিলে সকল জগৎ তবে তিনি জ্ঞাত হন
সবের মধ্যে আত্ম প্রকাশ
আত্মার জেন নাহিক বিনাশ
জীবাত্মা সাথে পরমাত্মার ভিন্নতা কভু নয়
প্রতিটি জীবেতে শিব সেই রাজে এই জ্ঞান যেন হয়।

উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবৎ ইতি উড়ুলোমিঃ (১৯)

উড়ুলোমির মত এইখানে এ দীনা লেখিকা কয়
জীবাত্মা শেষে পরমাত্মায় এক হয়ে মিশে যায়
এই দেহ হতে আত্মা সে যায়
পরমাত্মার সাথে মিশে যায়
নাম রূপ ছাড়ি পরম জ্যোতিতে হইয়া জ্যোতির্ময়
নদীর মতন আপনা হারায়ে সাগরে মিশিয়া যায়

অবস্থিতে রিতি কাশকৃৎস্নঃ (২২)

শঙ্কর কন পরমাত্মাই জীব রূপে জীবে রন
কাশকৃৎস্নের মত জেনে রাখো তিনিও এরূপ কন
উপনিষদেতে আছে এই কথা
জীবের মধ্যে প্রকাশিব যথা
নাম রূপধরি প্রবেশি সেথায় ভিন্ন তবুও নয়
আত্ম শব্দে পরমাত্মাই সব ঋষিগণে কয়
আশ্মরথ্যের মত এইরূপ জীবাত্মা মত হয়
পরমাত্মার অংশই তাহা ভিন্ন কখন নয়
ভিন্ন রূপেতে অভিন্ন রন
প্রতিটি জীবেতে শিবময় হন
শ্রুতিতে বলিছে সত্য একথা সবি জেন হরিময়
হরির চরণে সৃষ্ট জগৎ হরিতে মিশিয়া যায়॥

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জার্মানির একীকরণের পর সোভিয়েট রাষ্ট্রসম্মিলনের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্গত স্লোভাকভাষী এলাকা স্লোভাকিয়া, হুন্‌গারি বা হাঙ্গেরি এবং রুমানিয়ার সীমানা সংশোধনের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বা রুশ জাতি জার্মানিদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও লিথুআনিআকে কিছু কিছু জার্মান এলাকা দান করে; অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিঅনের পশ্চিম সীমান্ত এমন ভাবে পশ্চিমে ঠেলে দেওয়া হয় যাতে সোভিয়েট এলাকার সীমানা ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া ছাড়া চেকোস্লোভাকিয়া ও হুঙ্গারিরও সন্নিহিত হয়, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ছিল না। রুশিয়া, ফিনল্যাণ্ডের কাছে কারেলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল অধিকার ক'রে নরওয়ের সন্নিহিত হয়েছে। পোল্যাণ্ডে কার্জন-রেখা অতিক্রম করে একটি বৃহৎ পোল এলাকা শ্বেত রুশ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের বর্তমান আয়তন যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার চেয়ে তো বটেই, এমন কি নাৎসি জার্মানির দাবি পূরণের পরের অবস্থার চেয়েও কমে গেছে। অর্থাৎ হিটলার ডানজিগ অধিকার করে পোল্যাণ্ডের আয়তন যা দাঁড় করিয়েছিলেন, রুশমৈত্রী লাভে ধন্য পোল্যাণ্ডের আয়তন স্তালিনের হাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার চেয়ে অনেক কমে গেছে! রুশ রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিঅন রুমানিয়ার কাছে উক্রাইনের তরফ থেকে মোলদাভিয়া ও অন্যান্য এলাকা আয়ত্ত করে। পরে মোলদাভিয়াকে স্বতন্ত্র একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হয়। কিন্তু তাকে সোভিয়েট অধিকারের বাইরে যেতে দেওয়া হয় নি। চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলার চেক ও স্লোভাক, দুটি জাতির দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেকিয়া ও স্লোভাকিয়ায় পরিণত করেন। রুশরা ক্ষুদ্র স্লোভাকিয়া আর হুঙ্গারিরও কিছু কিছু অঞ্চল উক্রাইনের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

Geopolitics বা ভৌগোলিক রাজনীতির দিক থেকে বিশদভাবে বলতে গেলে রুশিয়া বিয়েলোরুশিয়ার সঙ্গে পোল্যাণ্ডের এবং উক্রাইনের সঙ্গে পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হুঙ্গারি ও রুমানিয়ার বিবাদের বন্দোবস্ত পাকা করে রেখেছে। পূর্ব-জার্মানির সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও লিথুআনিআর সীমান্তবিরোধও আগে থেকে তৈরি করে রাখা আছে।

সোভিয়েট ইউনিঅনের পশ্চিম সীমারেখা এখন এমন এক রেখায় অবস্থিত যাতে লাল ফৌজ যে কোন মুহূর্তে রুমানিয়া, হুঙ্গারি, স্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। বিখ্যাত রণদুর্মদ প্রাসিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্পেনের সফল রাষ্ট্রনায়ক সেনাপতি ফ্রাঙ্কো বলেছিলেন, রুশিয়া জার্মানি ছাড়াও পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে অন্তত ১২টি রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ঐ বারোটি রাষ্ট্রের মধ্যে ইউগোস্লাভিয়া আজ রুশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রে পরিণত। বুলগারিয়া ও আলবানিয়া রুশ-কৃত ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে। অষ্ট্রিয়া জার্মানির সঙ্গে এখনও মিলিত হতে না পারলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন। বাকি আটটির মধ্যে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুআনিআকে সোভিয়েট ইউনিঅনের অন্তর্গত করা হয়েছে। ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হুঙ্গারি ও রুমানিয়ার রাজ্যাংশ অধিকারের কথা এইমাত্র আলোচিত হয়েছে। জার্মান রাজ্য প্রুসিয়া এখন দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পোল্যাণ্ড ও লিথুআনিআর অন্তর্গত।

জার্মান সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সীমান্তসংশোধনের ব্যাপারটা দ্রুত সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি। পোল্যাণ্ড জার্মানির

দাবির ভয়ে বিয়েলোরুশিয়া এবং উক্রাইনের কাছে প্রাপ্য এলাকা দাবি করার সাহস প্রকাশ করবে না। পোল্যাণ্ডও দাবির ভয়ে শ্বেত রুশিয়া ও উক্রাইনে সোভিয়েট সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সাহস দেখাতে পারবে না। রুশ কূটনীতি মোটামুটি এই ছাঁচে ঢালা হয়েছে। যাঁরা রুশ জাতির বাদশাহি মেজাজ ও মনোভাবের সঙ্গে একটুও পরিচিত, তাঁরা জানেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোভিয়েট ইউনিঅনের বিকেন্দ্রীকরণ তথা অন্যান্য পশ্চিম সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সীমারেখা সংশোধন কত কঠিন।

এরপর পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যের সীমারেখা সংশোধনের ব্যাপারটা আলোচ্য। ছোটখাট সীমানা সংশোধনের কথা বাদ দিলে সেখানে খুব বড় কোন সমস্যা নেই। ইতালি-ইউগোস্লাভিয়া সীমান্তবিরোধ একটি সমস্যাসংকুল ব্যাপার যা নিয়ে একদা বিখ্যাত ইতালীয় সাহিত্যিক দানুনত্সিও স্বয়ং অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তিরোলের জার্মানভাষী যে-অংশটুকু ইতালির অধিকারে, তা অষ্ট্রীয়ার ফিরে পাওয়া উচিত। ইতালি ফ্রান্স, সুইট্সারল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও ইউগোস্লাভিয়ার কাছে যথাক্রমে কর্সিকা দ্বীপ ও নিচে-সন্নিহিত রিভিএরা, সুইস-ইতালীয় ও রেতো-রোমান অঞ্চল, মালটা-গোজো-কমিনোদ্বীপাবলী এবং ত্রিএস্তে-ফিউমে এলাকাগুলি পাবার দাবি করতে পারে। মাল্টা দ্বীপপুঞ্জ এখন [illegible]নের দখলে বটে, কিন্তু ব্রিটেন স্বেচ্ছায় হঠাৎ একদিন স্ব-অধিকার ত্যাগ করতেও পারে।

বালকান উপদ্বীপে ভাষাসমস্যার সমাধান করা হ[illegible] ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন ক'রে। বহুভাষী এলাক[illegible] আর কোন সমাধান গ্রাহ্য নয়। ফরাসি [illegible] অন্তর্নিহিত বাণী হার্ডারের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে আরও দৃঢ় করায় উনিশশতক থেকে বালকান উপদ্বীপ ক্রমাগত ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের পথে চলেছে। হুঙ্গারি, রুমানিয়া, বুলগারিয়া, আলবানিয়া, গ্রিস, তুরস্ক—বালকানের এই রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিই ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। চেকোস্লোভাকিয়া বালকানের অন্তর্গত না হলেও এমন একটি দ্বিভাষিক রাষ্ট্র, যা যে কোন সময়ে দুটি সুনির্দিষ্ট ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

ইউগোস্লাভিয়া বাল্কানের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র, কিন্তু এটিও ভাষার ভিত্তিতে গঠিত একটি ত্রিভাষিক বা চতুর্ভাষিক রাষ্ট্র যার প্রশাসনিক বিভাগগুলি নিতান্ত ভাষার ভিত্তিতে গঠিত। ভবিষ্যতে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে এই রাষ্ট্র স্লোভেনিয়া, সার্বিয়া, ক্রোশিয়া ও মাকেদোনিয়া—এই চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করতে পারে।

ভারতে কথায় কথায় বাল্কানীভবনের কথা তুলে ভয় দেখানো হয় এবং সুইট্সারল্যাণ্ড, ইউগোস্লাভিয়া, সোভিয়েট ইউনিঅন, কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি একাধিকভাষী রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে বলা হয়। সুইট্সারল্যাণ্ড একটি চতুর্ভাষিক রাষ্ট্র; সেখানে অতি অল্প সংখ্যক রেতো-রোমানের ভাষাও সরকারি মর্যাদা লাভ করেছে; সেখানে চারটি রাষ্ট্র ভাষা। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ষোলটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে, এমন কথা ভাবা বাস্তব বোধের পরিচায়ক নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম কি সিন্ধি বা অসমিয়া ভাষাতেও চালানো হবে? কানাডায় ইংরেজি ও ফরাসি দুটিই রাষ্ট্রভাষা হলেও ফরাসিরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা চিন্তা করছে। বেলজিঅম ও চেকোস্লোভাকিয়ার মতো দ্বিভাষিক রাষ্ট্রে দুটি ভাষাকে সমান মর্যাদা দিয়ে তবে রাষ্ট্রের কাজ চলে। সোভিয়েট ইউনিঅন প্রকৃতপক্ষে রুশভাষী। ইউগোস্লাভিয়ার নেতা মার্শাল তিতো সার্ব, জাতির লোক; তিনি যে খুব গণতান্ত্রিক মেজাজের লোক নন, মিলোভান জিলাসের ব্যাপারে তা প্রমাণিত। [illegible] তাঁকেও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করে সার্ব, [illegible]াট, স্লোভিন ও মাকেদোনীয়—চারটি ভাষা রাষ্ট্র-ভা[illegible]রূপে মেনে নিতে হয়েছে। ঐ নীতি ভারতের মতো অ[illegible] ষোলটি ভাষাব্যবহারকারী রাষ্ট্রে বাস্তবে রূপায়িত [illegible] একেবারে অসম্ভব।

ইউরোপে যদি সোভিয়েট ইউনিঅন এবং ইউগো-স্লাভিয়া বিকেন্দ্রীভূত হবার পর বিশুদ্ধ ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাস হয় তাহলে খেলনা রাষ্ট্রসমেত মোট ৩৩টি রাষ্ট্রের পরিবর্তে কতগুলি প্রশাসনিক বিভাগের প্রয়োজন হতে পারে, দেখা যাক। এই প্রশাসনিক বিভাগগুলি এখনই গঠিত হয়ে আছে। কেবল বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে সীমারেখা সংশোধনের প্রয়োজন আছে।

তারপর সেই বিভাগগুলিকে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সংশ্লিষ্ট সমভাষী বড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে পুনর্বিন্যস্ত ইউরোপে তুরস্কসমেত রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে ৩১টি, তুরস্ক বাদে ত্রিশটি।

স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, প্রভাঁস, কাতালোনিয়া, ক্রোশিয়া, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, লাপল্যাণ্ড, মর্দোভিয়া—এই এলাকাগুলিকে এই হিসেবের মধ্যে সম্ভাব্য স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গণনা করা হয় নি। ককেশীয় রাষ্ট্র তিনটিকেও এশীয় রাষ্ট্ররূপে গণনা করা যুক্তি সঙ্গত। পাঠকদের বুঝবার সুবিধার জন্যে বর্তমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ও যে যে ভাষার ভিত্তিতে সেগুলি গঠিত, সেই সব ভাষার নাম দেওয়া হল :

(১) আইসল্যাণ্ড—আইসল্যাণ্ডিক (২) এইরে—আইরিশ (৩) ইউ,কে,—ইংরেজি (৪) ফ্রান্স ফরাসি (৫) স্পেন—স্পেনীয় (৬) পোর্তুগাল—পোর্তুগিস (৭) হল্যাণ্ড—ডাচ (৮) বেলজিঅম-ফ্লেমিশ ও ফরাসি (৯) লুক্সেমবুর্গ—লেৎসেবুর্গেশ বা ডাচের প্রভাবভেদ (১০) আনদরা—স্পেনীয় (১১) সান মারিনো—ইতালীয় (১২) ভ্যাটিকান—ইতালীয় (১৩) লিখটেনস্টাইন—জার্মান (১১) মোনাকো—ইতালীয় (১৫) সুইট্‌সারল্যাণ্ড—জার্মান, ফরাসি, ইতালীয় ও রেতো-রোমান (১৬) ইতালি—ইতালীয় (১৭) অস্ট্রিয়া—জার্মান (১৮) পশ্চিম জার্মানি—জার্মান (১৯) পূর্ব জার্মানি—জার্মান (২০) চেকোস্লোভাকিয়া—চেক ও স্লোভাক (২১) হুঙ্গারি—মাজার (২২) পোল্যাণ্ড—পোলিশ (২৩) রুমানিয়া—রুমানীয় (২৪) বুলগারিয়া—বুলগার (২৫) গ্রিস—গ্রিক (২৬) আলবানিয়া—আলবান (২৭) ইউগোস্লাভিয়া—সার্ব, ক্রোট, মাকেদোনীয় ও স্লোভিন (২৮) ডেনমার্ক—ড্যানিশ (২৯) নরওয়ে—নরওয়েজীয় (৩০) সুইডেন—সোয়েডিশ (৩১) ফিনল্যাণ্ড—ফিন (৩২) সোভিয়েট ইউনিঅন—রুশ (৩৩) তুরস্ক—তুর্কি।

এই রাষ্ট্রগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করলে একভাষী মোট যে একত্রিশটি রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, তাদের নাম :—

(১) আইসল্যাণ্ড (২) আয়ারল্যাণ্ড (৩) ব্রিটেন (৪) ফ্রান্স (৫) স্পেন (৬) পোর্তুগাল (৭) বেনেলুক্স (৮) ইতালি (৯) জার্মানি (১০) হুঙ্গারি (১১) চেকিয়া (১২) স্লোভাকিয়া (১৩) পোল্যাণ্ড (১৪) রুমানিয়া (১৫) বুলগারিয়া (১৬) গ্রিস (১৭) আলবানিয়া (১৮) মাকেদোনিয়া বা ম্যাসিডোনিয়া (১৯) সার্বিয়া (২০) স্লোভেনিয়া (২১) ডেনমার্ক (২২) নরওয়ে (২৩) সুইডেন (২৪) ফিনল্যাণ্ড (২৫) এস্তোনিয়া (২৬) লাটভিয়া (২৭) লিথুআনিআ (২৮) বিয়েলোরুশিয়া (২৯) উক্রাইনে (৩০) রুশিয়া (৩১) তুরস্ক।

এই পুনর্বিন্যাসের জন্যে খুব ভয়ানক একটা আলোড়ন দরকার হয় না যদি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় ইচ্ছুক হয়। একটু ব্যাখ্যা করা যাক ঠিক কি কি ব্যবস্থা ঐ পুনর্বিন্যাসের জন্যে গ্রহণীয় :—

(১) উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বা প্রোটেস্টান্ট আয়ারল্যাণ্ড আইরিশ ফ্রি স্টেট বা ডি ভ্যালেরার স্বাধীন আয়ার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হবে; বলা বাহুল্য তা হবার আগে এইরে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করতে হবে এবং সেখানে যে কোন বই পড়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। তা না হলে প্রোটেস্টান্ট উত্তর আয়ারল্যাণ্ড কোনদিনই স্বাধীন এইরে রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে ভরসা পাবে না।

(২) ভালোন্-ফরাসি ও সুইস-ফরাসি এলাকা ফ্রান্সে যুক্ত হবে বেলজিঅম ও সুইট্‌সারল্যাণ্ড থেকে।

(৩) জিব্রালটার ও আনদরা স্পেনের সঙ্গে যুক্ত হবে।

(৪) ইতালির সঙ্গে ভ্যাটিকান, সান মারিনো, মোনাকো, কর্সিকা, নিচে, ত্রিএস্তে, ফিউমে, মাল্টা দ্বীপপুঞ্জ, সুইস-ইতালীয় ও রেতো-রোমান এলাকা যুক্ত হবে।

(৫) দুই জার্মানি ও দুই বার্লিনকে একত্রে ক'রে বার্লিনে মিলিত জার্মানির রাজধানী পুনঃস্থাপিত হবে; অস্ট্রিয়া, লিখটেনস্টাইন, সুইস্-জার্মান এলাকা, তিরোলের দক্ষিণাংশ, সুডেটেনলাণ্ট, পোলিশ করিডর, ডানজিগ বন্দর, প্রুসিয়া, মেমেল বন্দর, আলসাস-লোরেন এলাকা, শ্লেসহ্বিক্‌ হলস্টাইন এলাকা জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হবে। এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্যে মিলিত জার্মানির সীমান্তবর্তী দশটি রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানির সীমা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) হল্যাণ্ড, বেলজিঅম ও লুকসেমবুর্গ একত্র হয়ে বেনেলুক্স রাষ্ট্র গঠিত হবে।

(৭) চেকোস্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্র বিকেন্দ্রীকৃত হবে।

(৮) ইউগোস্লাভিয়া বিকেন্দ্রীভূত হয়ে সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া ও মাকেদোনিয়া নামে তিনটি রাষ্ট্র গঠিত হবে। সার্বিয়াকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়ে রোমক লিপি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী রোমক লিপি ব্যবহারকারী ক্রোশিয়া পরে সার্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

(৯) সোভিয়েট রাষ্ট্রসম্মিলন বিচ্ছিন্ন হয়ে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুআনিআ, বিয়েলোরুশিয়া ও উক্রাইনে রাষ্ট্র পাঁচটি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।

(১০) মোল্দাভিয়া রুমানিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে।

(১১) কারেলিয়া ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে।

(১২) সোভিয়েট এলাকার সঙ্গে পোল্যাণ্ড, স্লোভাকিয়া ও হুঙ্গারির সীমারেখা নির্ধারিত হবে।

(১৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষুদ্র সীমান্তবিরোধগুলি সর্বদাই ভাষার ভিত্তিতে মীমাংসিত হবে।

মাত্র এই ব্যবস্থা ক'টি গৃহীত হলে ইউরোপে আর কখনও মহাযুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মনে হয় এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের আগে ইউরোপ আর কয়েকটা যুদ্ধ না ক'রে ক্ষান্ত হবে না। অবশ্য এই ব্যবস্থাগুলি প্রকৃতির অনিবার্য্য বিধানে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে একদিন গৃহীত হবে। বর্তমান ইউরোপের ছটি খেলনা রাষ্ট্র, সুইট্সার্ল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিঅম, অষ্ট্রিয়া, দুই জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, ইউগোস্লাভিয়া ও সোভিয়েট ইউনিঅনের পরিবর্তে বেনেলুক্স, জার্মানি, চেকিয়া, স্লোভাকিয়া, সার্বিয়া, মাকেদোনিয়া, স্লোভেনিয়া, উক্রাইনে, বিয়েলোরুশিয়া, লিথুআনিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও রুশিয়া রাষ্ট্রগুলি গ'ড়ে উঠবে। পনেরোটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে চোদ্দটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে।

মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার আশা করেছিলেন :—

"সাত কোটি জার্মান নরনারী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের অন্তর্গত হবে। ১৯১৯ সনের ভ্যার্সাই সন্ধিতে বহু সংখ্যক জার্মান নরনারী ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের গোলাম ছিল। ১৯৪৮-এর সন্ধিতে কোনো জার্মান লোক আর বিদেশি রাষ্ট্রের গোলাম থাকবে না। কাজেই লড়াইএ হেরেও জার্মানরা সত্যি সত্যি জিতে যাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আত্মরক্ষার জন্য ইয়োরোপে শক্তিশালী আর ঐক্যবদ্ধ জার্মানি আবশ্যক। ইংরেজের পক্ষে জার্মানরা বেশি বিপজ্জনক না রুশরা বেশি বিপজ্জনক? এই হচ্ছে বর্তমানের নসওয়াল। ১৯১৯ সনের অবস্থা ইংরেজ জাত ভুলে গেছে। আর ইংরেজরা ১৯৩৯ সনের অবস্থা মাফিক ব্যবস্থা করবে। সাত কোটি জার্মান বনাম বিশ কোটি রুশ—এই সমস্যার সম্মুখে এসে পড়ল ইংরেজের জাত। ইতিমধ্যেই বিশ কোটি রুশের অভিবৃদ্ধি ঘটেছে। জার্মানরা কায়দা ক'রে ইয়োরোপের অনেকগুলো দেশ রুশিয়ার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সেই সব দেশ রুশিয়ার গোলামে পরিণত হয়েছে।"

বিনয়কুমারের এই আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নি। সাত কোটি জার্মানকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে ইঙ্গ-মার্কিনরা চেয়েছিল বটে, কিন্তু তার জন্যে তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে সম্মত হয় নি। তার কারণ বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর Fact and Fiction গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার দায়িত্ব মূর্খ গোঁয়ার ছাড়া আর কারো পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং ১৯৬৮ সালেও ইউরোপে জার্মানির পুনর্বিন্যাসই প্রধান সমস্যা হয়ে আছে।

ইউরোপ থেকে আমেরিকার ভাষা-পরিক্রমায় যাত্রা করলে দেখা যায়, উত্তরে বেরিং প্রণালী থেকে দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় যথাক্রমে ইংরেজি, স্পেনীয়, পোর্তুগিস, ফরাসি ও ডাচ ভাষার প্রসার। উত্তর আমেরিকার বৃহদংশে ইংরেজিভাষী কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজিভাষী ঔপনিবেশিকদের বসতিবিস্তার। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও গুই আনায় যদিও ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা, তবু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিটিশ হণ্ডুরাস আর গুই-আনার বেশির ভাগ অধিবাসীর মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। কিন্তু অস্ট্রেলিকায় ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা যতই হোক না কেন, দুই আমেরিকায় মাত্র ঐ পাঁচটি ইউরোপীয় ভাষা বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফরাসি ভাষী কানাডা বা কুইবেক বা কবেক, নিগ্রো রাষ্ট্র হাইতি ও ফরাসি গিআনায় ফরাসিভাষা প্রচলিত। সুরিনাম বা ডাচ গিআনায় ডাচ ভাষা প্রচলিত। ব্রাসিলে পোর্তুগিস-ভাষী ঔপনিবেশিকদের রাজত্ব। অবশিষ্ট দুই আমেরিকায় কালিফোর্নিআ থেকে হর্ন অন্তরীপ পর্যন্ত সমস্ত এলাকায়

স্প্যানিশভাষীদের রাজত্ব স্পেনীয়ভাষী রাষ্ট্র সংখ্যা আঠারোটি।

সমস্ত পশ্চিম গোলার্ধে একমাত্র কানাডা দ্বিভাষিক রাষ্ট্র। অন্য সব রাষ্ট্রই একভাষী। কানাডাতেও ফরাসি-ভাষী এলাকা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্যে তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিম গোলার্ধে এখন পর্যন্ত মোট ২৪টী স্বাধীন রাষ্ট্র আছে। পুয়ের্তোরিকো, ফরাসি গিআনা ও সুরিনাম স্বাধীনতা পেলে ঐ সংখ্যা সাতাশে দাঁড়াবে। ফরাসিরা যদি কানাডায় কেবেক রাষ্ট্র গঠন করে, তা হলে মোট ২৮টি রাষ্ট্র দুই আমেরিকায় শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠতে পারে।

যদি ভাষার ভিত্তিতে দুই আমেরিকার পুনর্বণ্টন করা যায় তা হলে মাত্র ৯টি রাষ্ট্র গঠিত হবে :—

(১) ইউ, এস, এ, বা ইংরেজিভাষী মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র; পৃথিবীতে একমাত্র এই রাষ্ট্রের কোন নামকরণ স্থির হয় নি। (২) কেবেক বা ফরাসিভাষী কানাডা (৩) স্পেনীয় আমেরিকা (৪) ব্রাসিল বা ব্রেজিল বা পোর্তুগিস আমেরিকা (৫) সুরিনাম বা ডাচ গিআনা (৬) হাইতি বা ফরাসিভাষী নিগ্রোদের রাজ্য (৭) ফরাসি গিআনা (৮) গুইআনা (৯) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। ব্রিটিশ হণ্ডুরাস স্বাধীন হলে স্পেনীয়ভাষী হণ্ডুরাসের সঙ্গে বা স্পেনীয় আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠলে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

স্পেনীয়ভাষী আঠারোটি রাষ্ট্র বর্তমানে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের কূট-কৌশলে আর নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এদের একীকরণ পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই ১৮টি রাষ্ট্র ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে সংগ্রাম করছে পুয়ের্তোরিকো নামে আর একটি স্প্যানিশভাষী এলাকা। এটি স্বাধীনতা পেলে মোট উনিশটি স্পেনীয়ভাষী রাষ্ট্রকে এক ক'রে গ'ড়ে উঠতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনীয় আমেরিকা। এ-রাষ্ট্র হবে পৃথিবীর একটী প্রধান শক্তি-শালী রাষ্ট্র।

যাদের ধারণা আছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর মার্কিনরা যদি শূন্য স্থান পূর্ণ করে, তা হলে ভালো হবে, তারা পুয়ের্তোরিকোর দৃষ্টান্ত দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। ব্রিটেন চলে যাবার পর ভূতপূর্ব ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অংশবিশেষের ভার মার্কিনরা গ্রহণ করলে অবস্থা আরও খারাপ হবার কথা। প্রচুর ধনসমৃদ্ধি সত্ত্বেও মার্কিনদের নেই সেই প্রশাসনিক প্রতিভা যা ইংরেজদের ছিল ব'লে জন গান্টার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন।

বস্তুত সাম্রাজ্য স্থাপনে ও শাসনে ইংরেজের কোন তুলনা নেই। শ্রী, সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে যা ছিল বা আছে, তা অন্য কোন সাম্রাজ্যে ছিল না, এখনও নেই। বিপ্লবী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'পথের দাবী' উপন্যাসে স্বীকার করেছেন যে, ওলন্দাজ, জাপানি প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলি তুলনায় হীনতর।

পুয়ের্তোরিকো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক লজ্জা-জনক দৃষ্টান্ত। বাকি আঠারোটি স্পেনীয়ভাষী রাষ্ট্রই পূর্ণ স্বাধীন। ইংরেজীভাষী রাষ্ট্র মোট চারটি : কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও গুইআনা। ফরাসী-ভাষী রাষ্ট্র মাত্র একটি : হাইতি; তবে কানাডা ... রাষ্ট্র ব'লে তাকেও ফরাসীভাষী বলা চলতে ... । ব্রাসিল হল একমাত্র পোর্তুগিসভাষী রাষ্ট্র। স্বাধীনতা পেলে সুরিনাম ডাচভাষী একমাত্র রাষ্ট্র হবে। ফ... । স্বাধীনতা পেলে ফরাসীভাষী রাষ্ট্রের সংখ্যা আ... বে।

গুই... ও য়েস্ট ইণ্ডিজ বা জামাইকায় বেশির ভাগ আফ্রিকী ভারতীয় নিগ্রোদের বংশধর। এরা ইংরেজ শাসনে ইংরেজদের দ্বারা ভারত ও আফ্রিকা থেকে আনীত। ঔপনিবেশিক ...প নিগ্রো ও ভারতীয়দের নিজেদের কোন কৃতিত্ব নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ইংরেজিভাষী এলাকা, এখানে ইউরোপের যে দেশ থেকেই ঔপনিবেশিক এসে থাক না কেন, তাকে তার পূর্ব মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইংরেজগরিষ্ঠ ইংরেজিভাষী যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতে এমন নির্বোধ লোকের অভাব নেই, যে এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে বলে,

ভারতের সমস্ত অহিন্দীভাষীদের উচিত নিজেদের মাতৃভাষাগুলিকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দিকেই একমাত্র মাতৃভাষারূপে গ্রহণকরা। ভারত যেন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মতো হিন্দীভাষীদের দ্বারা স্থাপিত এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি উপনিবেশ যেখানে অহিন্দিভাষীরা তাদের দয়ায় বাইরে থেকে এসে বসতি লাভের সুযোগ পেয়েছে !

কানাডায় বেশির ভাগ লোক ইংরেজিভাষী এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বংশধর। কানাডায় দুটি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলেও ইংরেজির প্রাধান্য বেশি। ফরাসিভাষীরা সেই জন্যে যে-অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই কুইবেক বা কেবেক অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ফরাসিভাষীরা কানাডায় শতকরা ৩৫জন এবং কুইবেক এলাকায় তারা বিপুল ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর দ্বারা নতুন মহাদেশেও হার্ডারের মতবাদ সমর্থিত হচ্ছে। দ্বিভাষিক রাষ্ট্রও যে মানুষের জাতীয় আত্মার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যে যথেষ্ট নয়, কানাডা তা প্রমাণ করছে। মানুষ স্বরূপত একভাষী ব'লেই সে দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক রাষ্ট্রে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। প্রত্যেক মানুষকে হরবোলা সাজানো কোন রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ে পৈতৃক নাম ভোলানোর কথা বাংলা দেশে শোনা যায়; কিন্তু মাতৃভাষা ভোলানো সেখানেও সম্ভব হবে না।

ফরাসি আমেরিকায় ফরাসিভাষী পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র একমাত্র হাইতি, যা নিগ্রোদের রাষ্ট্র; এখানকার নিগ্রো অধিবাসীরা আগে ফ্রান্সের অধীনে ছিল। এ-রাজ্যকে লাইবেরিয়ার ফরাসি সংস্করণ বলা যায়। লাইবেরিয়া যেমন ইংরেজিভাষী নিগ্রো ভূতপূর্ব ক্রীতদাসদের ও তাদের বর্তমান বংশধরদের মুক্ত রাষ্ট্র, হাইতিও তেমনি ফরাসিভাষী নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তি লাভের পর গঠিত এক রাষ্ট্র। একই দ্বীপের পশ্চিমে ফরাসিভাষী হাইতি রাষ্ট্র, পূর্বাংশে স্পেনীয়ভাষী ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র দুটি জ গোষ্ঠী দুটি স্বতন্ত্র জাতি গঠন করতে বাধ্য। একভাষী জাতি আঠারো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও প্রতিটি খণ্ড একভাষী থাকে, যেমন হয়েছে স্পেনীয় আমেরিকার ক্ষেত্রে।

স্পেনীয়, পোর্তুগিস ও ফরাসিভাষী আমেরিকা একত্র লাতিন আমেরিকা নামে বর্ণিত। যদি কানাডা থেকে ফরাসিভাষী এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাজ্য গঠন করে, তখন ইংরেজিভাষী কানাডার অবশিষ্টাংশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হতে পারে। কানাডা যদি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করে, তা হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হবে। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ ও পাহারার কড়াকড়ি থেকে মোটামুটি মুক্ত।

ইংরেজিভাষী আমেরিকা একত্র হলে একটি বিরাট রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে। ডাচ আমেরিকা এখনও স্বাধীন হয় নি। একত্র এই দুই এলাকাকে টিউটন আমেরিকা বলা যায়। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ দু'টি টিউটন ও লাতিন ভাষাগোষ্ঠীর আয়ত্তে গেছে।

পৃথিবীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র রাজ্য যা কতটা সম্প্রসারিত হবে তা আজ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্থির হয় নি। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপারটি উপলব্ধি করে লিখেছিলেন, "পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়!" মেক্সিকোর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেক্সাসের দক্ষিণে রিও গ্রান্দে নদীর পর পারে তাদের যে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নেই, সে-কথা ঘোষণা করতে সম্মত হয় নি। পৃথিবীর সমস্ত ইংরেজিভাষী এলাকা একে একে এই যুক্তরাষ্ট্রের আওতায় এসে গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না, বরং সেটাই হবে পরম স্বাভাবিক। উইনস্টন চার্চিল তাঁর "A History of the English Speaking Peoples" গ্রন্থের একেবারে শেষে বলেছেন, "Nor should we now seek to define precisely the exact terms of ultimate union." সুতরাং ইংল্যাণ্ড, ইউ, এস, এ, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেসিয়া প্রভৃতি সমস্ত ইংরেজিভাষী দেশ, দ্বীপ, দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি এলাকা কোন ভিত্তিতে একত্র হতে পারে তার চূড়ান্ত সর্তাবলী এখনই নিরূপণ করা না গেলেও একথা বলা যায় যে, ঐ একত্রীকরণের মূল ভিত্তি হবে একভাষিত্ব।

আইয়া দে লা তররে, খেরমান আর্থিনিএগাস প্রভৃতি মনীষীদের দীর্ঘকালের স্বপ্ন স্প্যানিশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

গঠন। তা যাতে গঠিত হতে না পারে তার জন্যে মার্কিন-দের চেষ্টার ত্রুটি নেই। সুতরাং প্রায় ৪৫ লক্ষ বর্গ মাইল আয়তনের এই বিশাল রাষ্ট্রের উদ্ভব হবার আগে বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী স্পেনীয়ভাষী লাতিন আমেরিকার জন-নায়ক সিমন বলিভারকে আরো কত বার তাঁর কবরের মধ্যে পাশ ফিরে শুতে হবে তার ঠিক নেই।

ইউরোপ ও আমেরিকার ভাষাগত পরিক্রমায় দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য জগতে সর্বত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। একাধিকভাষী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক এলাকাগুলি সর্বদা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত, কদাচিৎ একভাষী এলাকা ধর্মগত কারণে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। সুতরাং এই যে ভূরাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(ক্রমশঃ)

শুধু ছায়া

মদনমোহন বিশ্বাস

সব শেষ করে ফিরি
নিঃস্ব হাতে
শেষ ছায়া পিছু নেয়
বেদনাতে
সহসা যে ছায়া নেই
পিছু চাই
পুনরায় ফিরে চলি
যদি পাই
গিয়ে দেখি সব শেষ
অবহেলে
পুনরায় পিছনে যে
ছায়া চলে।

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিয়ন আলোর ভেতরের গ্যাসগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরপাক খেলো বার কয়েক। একটা দেশী কুকুর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাইরের দরজার সামনে থেকে সুহাসের দিকে জলজ্বল চোখের দৃষ্টিতে কয়েকবার তাকিয়ে গরজে উঠল বারকয়েক। তারপর জাতীয় বৈশিষ্ট্যে অল্পক্ষণ পরেই ধীরপদে চলে গেল নিজের খেয়ালে।

দূর থেকে একটা মোটরের আওয়াজ ক্রমশঃ নিকট হতে নিকটতর হতে হতে এসে থেমে গেল বস্তী বাড়ীটার সামনে। গাড়ীর দরজা খোলা আর বন্ধের আওয়াজও প্রকট হয়ে উঠল।

ঘরে এসে ঢুকল শ্রীপৎ স্বয়ং।

সুহাসকে সামনে দেখতে পেয়েই সে বলে উঠল, আরে মুহুরীবাবু যে, উকিলবাবু আপনাকে পাঠিয়েছেন বোধ হয়?

সুহাস বলে উঠল, না না, উকিলবাবু আমাকে পাঠান নি। আমি নিজেই—কথা শেষ করতে না দিয়ে, আপন খেয়ালেই শ্রীপৎ বলে যেতে লাগল, বুঝতে পেরেছি, আজও উকিলবাবু আমাকে বিশ্বাস করতে পারে না। কাল আমার কাছ থেকে ট্যাক্সি চালাবার কথা শুনে, আজ অমনি মুহুরীবাবুকে পাঠিয়েছেন সত্যি মিথ্যে যাচাই করার জন্যে?

কথাগুলো তাড়াতাড়ি বলে ফেলে শ্রীপৎ একটু হো হো করে হেসে নিল।

সুহাস বুঝল, কিছু অলীয় পদার্থ স্বাভাবিক শ্রীপতকে একটু অস্থিরতার আবেগ দিয়েছে।

হাসি থামিয়েই শ্রীপৎ বলে উঠল, নিন্ মুহুরীবাবু মিলিয়ে নিন। তাপসীর জন্যে এই রেডিওটা কিনেছি, গান শুনতে ও ভারী ভালবাসে। ভাঙা চৌকিটা কেটে কেটে উনুন জেলে জেলে 'ফিনিশ্' করে দিয়েছি। তার বদলে তাপসীর জন্যে এনেছি এই খাটটা। তাপসী একদিন বলল, আজ না হয় আমরা দু'জন দু'দিন পরে সংসার বেড়ে যাবে তো, তাই আগের থেকে সব গুছিয়ে রাখতে হবে। আমি শুধু বললাম, আমাকে কি করতে হবে তাপসী? তাপসী বলল, একটা আলমারী চাই। এই দেখুন সেই আলমারী। বলে, সুহাসকে আঙুল দিয়ে আলমারটার দিকে দেখিয়ে দিল। তারপরই শ্রীপৎ আবার বলল, এই দেখুন। বলে, পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে বলল, চোর শ্রীপতের পুরস্কার।

সুহাস অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল শ্রীপতের মুখের দিকে।

শ্রীপৎ বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না? আজই আমার ট্যাক্সিতে এক ভদ্রলোক বিয়ের বাজার করে ফিরলেন। নেমে যাবার সময় অনেক জিনিষ নিয়ে ঢুকে পড়লেন বাড়ীতে। ফেলে গেলেন শুধু গয়না ভর্তি চামড়ার ব্যাগটা।

পার্কপাড়ায় প্যাসেঞ্জার ছাড়লুম আর ব্যাগের দিকে আমার নজর পড়ল চৌরঙ্গী পাড়ায় গিয়ে। নেহাৎ দিনের বেলায় তাই, নইলে এর মধ্যে হয়ত অন্য প্যাসেঞ্জার উঠে ব্যাগটা নিয়ে চম্পট দিতো। যাই হোক, ব্যাগটা দেখতে পেয়ে আমি মুখ ঘুরালাম গাড়ীর।

তারপর ব্যাগটা নিয়ে দেখি, আরে বাব্বা, ঝকঝক

করছে গয়না। তাড়াতাড়ি সেটাকে পাশে রেখে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী চালিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে খোঁজ করলুম। শুনলুম ভদ্রলোক থানায় গেছেন আমার গাড়ীর নম্বর নিয়ে। আমি মনে মনে হাসলুম। ভাবলুম, ভদ্রলোক গাড়ীর নম্বর নিতে ভুল করেননি বলেই, ব্যাগটা নিতে ভুলে গেছেন।

তারপর আমাকে দেখে আর গয়নার কথা শুনে বাড়ীতে একটা আনন্দের উৎসব পড়ে গেল। এক ভদ্রমহিলা, বোধহয় বাড়ীর গিন্নী হবেন, তিনি আমার কাছ থেকে গয়নাগুলো চাইলেন। গাড়ীর নম্বর নিয়ে থানায় গিয়েছে শুনে, আমি ব্যাগটা হাত ছাড়া না করে থানায় যাবার উদ্দেশ্যে গাড়ীতে বসলাম।

গাড়ীর চতুর্দিকে লোকে ভর্তি। সকলেই তাকিয়ে দেখছে আমার দিকে। বেশ আনন্দ পেলুম। তারপর একটা যুবতী মেয়ে এসে উঠে পড়ল গাড়ীতে। বোধহয় থানার নাম করে পালিয়ে না যাই তারই প্রহরী হিসেবে।

মাল আর মানুষ, দুই নিয়েই গাড়ী ঢোকালাম থানার মধ্যে। তখন আমারই গাড়ীর নম্বর নিয়ে কেস্ লিখছেন এক অফিসার। তিনি যখন শুনলেন, গয়না ফেরৎ দেবার জন্যে ড্রাইভার নিজেই বাড়ী হয়ে থানায় এসেছে, তখন হাত ফস্‌কে গেল ভেবে বোধহয় তাঁর হাতটা একটু নিশপিশ করে উঠল। গয়নার মালিক ভদ্রলোক ভগবানের নাম করে অনেকবার ধন্যবাদ জানালেন।

এমন সময় থানার বড়বাবু এসে দাঁড়ালেন সে জায়গায়। তিনি আমাকে দেখেই চিনতে পেরে বললেন, কি রে শ্রীপৎ, তুই আজকাল ট্যাক্সি চালাচ্ছিস না কি?

—কি করব হুজুর পেটের দায়ে।

বড়বাবু বললেন, তা পেটের দায়ে পড়েই হোক আর যেজন্যেই হোক তোর এ কাজ প্রশংসা পাবার যোগ্য।

বলে, তিনি গয়নার মালিক ভদ্রলোককে বললে, জানেন মশাই, এই শ্রীপৎ ছিল কোলকাতা সহরের নাম করা দাগী চোর। সে ফিরিয়ে দিচ্ছে আপনার গয়না। একে কিছু বকশিস্ দেবেন।

ভদ্রলোক গদগদ হয়ে বললেন, স্যার, আমি আগেই চিন্তা করেছিলুম, তবে আমার সঙ্গে কিছু নেই কি না, তাই একে নিয়ে আমি বাড়ী যাবো।

বড়বাবু কেসের কাগজটা নিয়ে কি সব লিখলেন তাতে। তারপর ভদ্রলোককে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলেন সকলকে।

আমরা গাড়ীতে এসে উঠলুম। এতক্ষণে গাড়ীতে বসে বোঝা গেল সঙ্গে যে তরুণীটি এসেছিল সে এই ভদ্রলোকের শালী।

গাড়ী এসে পৌঁছল ভদ্রলোকের বাড়ীতে। ভদ্রলোক আমাকে ভেতরে নিয়ে মিষ্টি মুখ করালেন আর পুরস্কার হিসেবে দিলেন এই দু'শো টাকা। অবশ্য এখানে দু'শোর একটু কম আছে। মানে বড় একটা খাই না। মানে একটু আনন্দের চোটে এ্যাই একটু ইয়ে। মানে আমার নেশা-টেশা হয়নি মুহুরীবাবু। এরজন্যে কিন্তু তাপসী কিছু বলবে না। ও জানে আনন্দ হলে—আচ্ছা আমি এ কথা প্রমাণ করে দেবো?

তবে এই বাকী টাকায় তাপসীর কানের দুল আর ও অনেক দিনের শখ একটা হাত ঘড়ি, কিনে দেবো আপনি সব মিলিয়ে নিন, উকিলবাবুকে গিয়ে বলবেন আর তাও যদি বিশ্বাস না হয় তাপসীকে ডেকে জে নিতে পারেন।

বলে, সে দরজার বাইরে মুখ বের করে হেঁকে উঠ হালো টাপ্‌সী, কম্ হিয়ার।

তাপসী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে হাত ধরে ওকে বাই নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুহাস আর শ্রীপতের খাবার জায়গা ক দিল তাপসী।

সুহাসের পাশে মাথা নীচু করে এসে শ্রীপৎ বস দু'জনেরই খাওয়া শেষ হল। কিন্তু শ্রীপৎ একটি কথ বলল না।

খাটের ওপর শ্রীপতের সঙ্গে সুহাসেরও বিছানা ক দিল তাপসী।

তাপসীর উদ্দেশ্যে সুহাস বলে উঠল, আমরাই বিছানা দখল করে নিলাম, আপনার শোবার ব্যবস্থার করবেন?

শ্রীপৎ এবার বলল, সে চিন্তা নেই মুহুরীবাবু। পাশের ঘরে ওর এক পাতানো বিধবা পিসী আছে, সেখানেই ও শোবে।

তাপসী হাসিমুখে শ্রীপতের দিকে একবার তাকিয়ে নিল, তারপর সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলল, নিন্ শুয়ে পড়ুন।

সুহাস বিছানায় উঠতে তাপসী আলো নিভিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

শ্রীপৎ আর সুহাস, দু'জনেই শুয়ে আছে পাশাপাশি। সুহাস চলে গেছে আপন রাজ্যের বাস্তব চিন্তার মুখোমুখি।

শ্রীপৎ কিছুক্ষণ পরে একটু এ পাশ ওপাশ করে, নীচু গলায় বলে উঠল, কিছু চিন্তা করবেন না মুহুরীবাবু। আওরাৎ তো নয়, মরদ আপনি। গতর খাটিয়ে দু'বেলা দুমুঠো ঠিকই জোগাড় করে নিতে পারবেন। চাইতো আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে বেরুলে দু'টাকা রোজ তো বাঁধা।

এ কথা শুনতে সুহাস কোন উত্তর দিলনা।

শ্রীপৎ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল উত্তরের আশায়। তারপর আস্তে আস্তে চুপ করে গিয়ে মিশে গেল বিছানায়।

সুহাসের ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। পাশে শ্রীপৎ নেই। তাপসী ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন গোছাতে ব্যস্ত। সুহাস তাপসীর কাছ থেকে শুনল, শ্রীপৎ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছে অন্ধকার মেশানো ভোরে।

মুখ হাত পা ধুয়ে, সামান্য জলযোগ পর্ব সেরে সুহাস আবার হাতে তুলে নিল আর যাযাবরী জীবনের পুঁটলি।

তাপসী এসে হাতে তুলে দিলে দশ টাকার একটা নোট। সুহাস নিল না। বলল, যদি কোনদিন দরকার পড়ে, চেয়ে নিয়ে যাবো আমার তাপসীদির কাছ থেকে।

তাপসী একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। সুহাস আপন মনে পথ চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে।

একফালি আকাশের নীচে চড়ন্ত রোদ প্রতিহত হয়ে ছায়া মেলেছে পথের এক পাশে। অগণিত জনরাশির মধ্যে পা ফেলে চলতে চলতে ভারী ভাল লাগল সুহাসের, তাপসী আর শ্রীপতের কথা মনে পড়ায়। ওদের সংসারটা আকৃষ্ট করেছে সুহাসের মনকে। আওরাৎ নয়, মরদ শ্রীপৎ উদয় অস্ত শুধু গতর খাটিয়ে চলেছে তাপসীকে সুখী করার জন্যে।

তাপসী ধরে রেখেছে শ্রীপতের দেহ, মন, কর্মচাঞ্চল্য এমনকি সমস্ত অস্তিত্বকে তার অনুভূতি দিয়ে। প্রেমের নিখিলে একটা মনকে কেন্দ্র করে শ্রীপতের ঘোরাফেরা, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তাই দাগী চোরের পুরস্কারের সম্মান দক্ষিণা ফুল হয়ে দুলে উঠবে শ্রীপতের প্রাণের শ্রেষ্ঠ কামনায় ফুল তাপসীর কানে। আর সেই গর্বে শ্রীপৎ আরো ভাল হবে, আরো বেশী পরিশ্রম করে আরো অনেক বেশী আনন্দ দেবার চেষ্টা করবে তাপসীর মনে।

সুহাস ভাবল, এই তো জগৎ, এই তো জীবন। আজ যদি ভবনাথবাবু এদের জীবনকে প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন।

সুহাসের মনে পড়ল ব্যথাতুরা কাকীমার কথা। তাঁর মেয়েদের কথা। আনন্দের আশা পথের দিকে তাকিয়ে থাকা রুণুর কথা।

তার মনে হল শ্রীপতের ভাষায় সে যখন মরদ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তখন যে কোন উপায়ে, যে কোন পরিশ্রমের বিনিময়ে কাকীমার সংসারের দুঃখ দূর করবে, রুণুকে মানুষ করবে। তার আশার অন্তরালে চাপা পড়ে থাকা মনটাকে আনন্দের স্রোতে প্রবাহিত করবে।

চিন্তার ফাঁকে এক সময়ে সে এসে দাঁড়াল গোবিন্দ বাবুর বাড়ীর সামনে। সামনের ফেলে যাওয়া বহু স্মৃতি জড়ানো চেম্বার কক্ষটা নতুন লোকের আগমনে সুর পাল্টেছে। ওখানকার নিস্তব্ধ রাতে ভবনাথবাবুর আইন বই পড়ার কণ্ঠস্বর আর কারো মনে ব্যথার কথা নিয়ে ভেসে উঠবেনা। বাড়ীওয়ালা রঞ্জনবাবুর মনোরঞ্জন হয় ভাড়ার টাকা মাসে মাসে ঠিক মত পেলেই। তাই ঘরটা খালি পড়ে থাকেনি। ওখানে সাপ্লাই এজেন্সীর একটা অফিস ঘর খোলা হয়েছে।

গোবিন্দ বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তিনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লরী থেকে লোহার পাইপ গুণে কুলিদের নামিয়ে নিতে বলে ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সুহাসের দিকে দৃষ্টি পড়তে একটু দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আরে মুহুরীবাবু না, কি খবর ?

সুহাস বলল, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে এলুম ?

—আমার সঙ্গে ?

বলে, তিনি সুহাসকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন সেই নেটের পর্দা ঝোলানো ঘরটায়।

সুহাস সবই খুলে জানালো গোবিন্দ বাবুকে। এবং যে কোন একটা কাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহের দাবী জানালো তাঁর কাছে।

সব শুনে গোবিন্দ বাবু একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন, ভবনাথ বাবুর জন্যে। তারপর সুহাসের উদ্দেশ্যে বললেন, আসল কথা কি জানেন, আজকাল এই ওকালতি-টোকালতি না বিদ্যে বুদ্ধির লেখাপড়া টেখাপড়ার কাজ আর চলবে না। ইতিহাসের শিল্প-সাহিত্যের যুগ, লৌহ, প্রস্তর, স্বর্ণের যুগ পার হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। যারা মাথা ঘামিয়ে সঠিক ইতিহাস বুঝে কাজ করে, তারা বলবে, এটা সিমেণ্টের যুগ।

বলে তিনি সুর ঘুরিয়ে আবার সুরু করলেন, এই যে আমার ছেলেটার পড়াশুনা বন্ধ করিয়ে দিলুম। লোকে বলল, আপনার একটা মাত্র ছেলে, এত পয়সা আপনার, ছেলেটাকে কোথায় বিলেতে টিলেতে পাঠাবেন, না পড়াশুনাই বন্ধ করিয়ে দিলেন ?

আমি ভাবলুম, ঐ যে সত্যিকারের ইতিহাস ? বিলেতে গিয়ে বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ী আর মেম সাহেব দেখে কি ছেলের হাত-পা গজাবে। তার চাইতে দিলাম সিমেণ্টের যুগের সঙ্গে সাঁতার কাটতে। কেলাস এইট অবধি পড়লে কি হবে, গভর্ণমেণ্টের বড় বড় বাড়ী তৈরী করে সে এখন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। কত এম, এ পাশ এখন তার কাছে কাজ করবার জন্যে ঝুড়ি ঝুড়ি দরখাস্ত পাঠাচ্ছে।

বলে, গোবিন্দবাবু একবার সুহাসের মুখের দিকে তাকালেন। বোধহয় নিজের উক্তির স্বপক্ষে কিছু শোনার আশায়।

সুহাস নির্বিকার। এখন তার মতামতের কোন মূল্য নেই বলেই সে জানে। এখন তার প্রয়োজন কাজের আর তার বিনিময়ে অর্থের।

সুহাসকে নিরুত্তর দেখে গোবিন্দবাবু বললেন, আপনি কিন্তু আমার ব্যবসার সঙ্গে থাকবেন। ছেলের কাছে আর পাঠালাম না। আমার লরীতে করে ড্রাইভারের সঙ্গে মাল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেবেন। আপনাকে আর কি উপদেশ দেবো। আপনি ছিলেন ফৌজদারী কোর্টের পাকা মুহুরী। চোর ছ্যাঁচোড় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অভ্যেস আছে। তাই আপনার প্রধান কাজ হবে লরীতে মাল নিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য রাখা যাতে একটিও মাল চুরি না যায়। যা দিনকাল পড়েছে কাউকে আর বিশ্বাস করার উপায় নেই।

সুহাস অবাক বিস্ময়ে একবার তাকিয়ে দেখল গোবিন্দ-বাবুর মুখের দিকে। কারণ গোবিন্দবাবুর শেষ উক্তিটি যদি তাঁর মনের কথা হয় তাহলে তিনি সুহাসকেই বা বিশ্বাস করেন কি করে ?

গোবিন্দবাবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বলতে লাগলেন, তাহলে আজ থেকেই কাজে লেগে যান। কোলকাতায় কাজ হলে পাবেন দৈনিক তিন টাকা। আর কোলকাতার বাইরে হলে পাবেন চার টাকা। আপনি আমার এই চিঠি নিয়ে চলে যান গ্যারেজ বাবুর কাছে। সেখানে গিয়ে সব বুঝে-সুঝে নিয়ে কাজে লেগে যান।

বলে, গোবিন্দবাবু একটা চিঠি লিখে দিলেন সুহাসের হাতে। সুহাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে গ্যারেজের উদ্দেশ্যে।

[ক্রমশঃ]

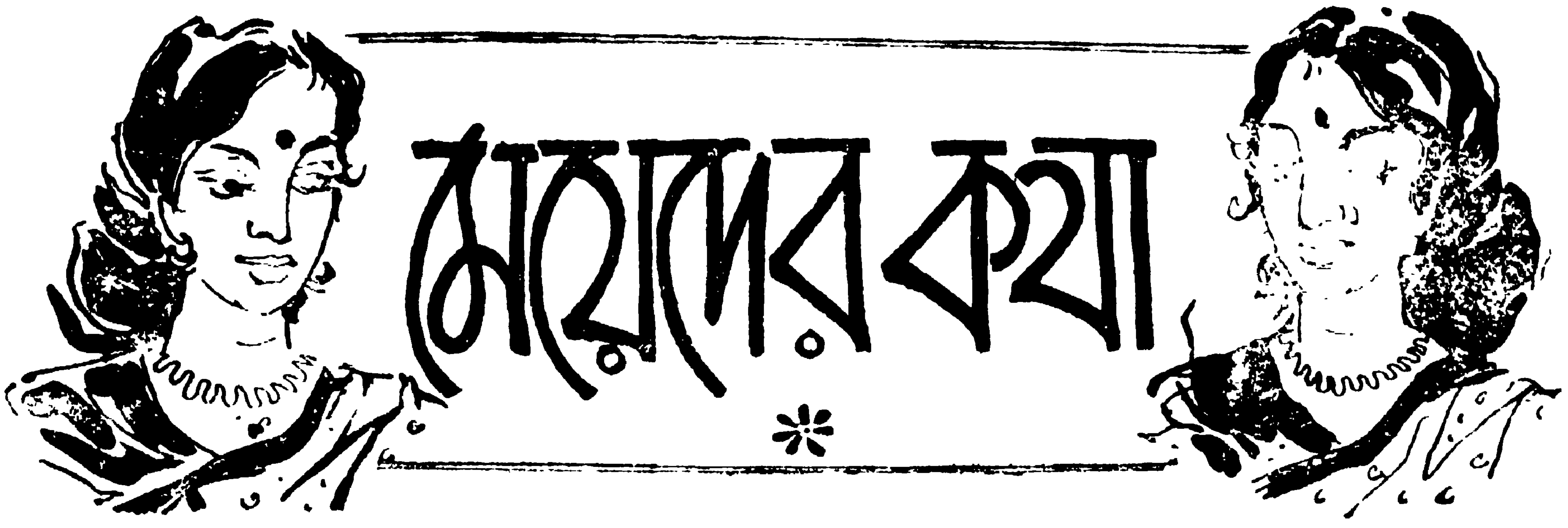

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শেষ বয়েসে রোগের সময় যে নারী (কবির নাতনী নন্দিতা) কবির সেবা করেছে, তাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, ওর ঘৃণা নেই, ওর ক্লান্তি নেই, ও বুঝি রোগী দেহের মধ্যে শিশুকে দেখেছে। কবি বলেছেন,

"এ মাধুরী করিতে সার্থক
এত খানি দুর্বলের ছিল আবশ্যক।"

দুর্বলকে দেখে, রোগীকে দেখে, বিকৃত বিকলাঙ্গকে দেখে নারীর যে উদ্বেলিত স্নেহ, সেই তার মাধুর্যের চরম সার্থকতা। নারী প্রকৃতি যেখানে অসম্পূর্ণ সেখানে এই ভাবের অনুভূতি থেকে সে বঞ্চিত। কিন্তু একদিন যখন সে সম্পূর্ণতা লাভ করে তখন সে অসুন্দরের মাঝেও সুন্দরকে দেখতে পায়। এই কথা নিয়ে কবি লিখেছেন তাঁর 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য। কুরূপ রাজার রাণীকে দেখা দিতে সংকোচ, কারণ রাজা জানেন, এখনো রাণীর মনে প্রেম জাগেনি তাই রাজা বলেন—শুভদৃষ্টির সময় এখনো আসেনি। প্রেমের দৃষ্টিই হল শুভদৃষ্টি, প্রেমেরই সেই ক্ষমতা যা দিয়ে কুরূপের মধ্যেও পরম রূপকে দেখা যায়। রাণী যে দিন জোর করে ভোরের প্রথম আলোয় রাজাকে দেখল, তখনো তার অন্তরের প্রেম, তার নারী প্রকৃতির সম্পূর্ণতা জেগে ওঠেনি। তাই কুৎসিতকে দেখে অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "একি অন্যায় একি অবিচার।" যে দিন বসন্ত উৎসবে রাণী ছাতের ওপর থেকে বন্ধুদের সঙ্গে রাজার নাচ দেখেছিল তখনো রাণী রাজাকে চিনত না। সে দিন রাতে রাজাকে বললে, "দেখলাম যেন ওরা চন্দ্রলোকের মানুষ, ওদের নাচ যেন মঞ্জরিত শাল বনে বসন্তের হাওয়ার হিল্লোল। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন কুরূপ রস ভঙ্গ করল কেন? ওখানে ও প্রবেশের অধিকার পেল কোন্ গুণে? রাজা বললেন, যাকে করুণা করলে তোমার মন ভরে উঠত তাকে ঘৃণা করে মনকে পাথর করলে কেন? রাণী অধৈর্য্য হয়ে বললেন, কুরূপের প্রতি তোমার এই করুণার অর্থ বুঝি না। বললেন, "রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে।"

রাণী যেদিন রাজাকে ছেড়ে চলে গেলেন সেদিনও রাজা হার মানলেন না, তিনি প্রতীক্ষা করে রইলেন, প্রেম দিয়ে রাণীর মনে প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে। প্রেমিক রাজা রোজ রাতের অন্ধকারে রাণীর বাগান বাড়ীর গাছের ছায়ায় তার বাঁশী বাজাতে থাকেন। সেই বাঁশীর সুর শুনে শুনে রাণীর মন আকুল হয়ে ওঠে। যেন কোন রাত-জাগা পাখী তার পাখা দিয়ে ঘুমন্ত পাখীর নীড় ছুঁয়ে যায়। তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। এমনি করে রাজার রাত জাগা প্রাণ রাণীর ঘুমন্ত প্রাণকে জাগিয়ে তোলে। তখন রাণী বলেন—ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আমার আর দেরী

নেই। রাণী বলেন, আর আমি ভয় করিনে নিজের চোখকে। প্রদীপ জেলে বুকের আঁচলের আড়াল দিয়ে ঢেকে রাণী চললেন রাজার কাছে, সেই অন্ধকার গাছ-তলায় যেখানে বিরহীর বাঁশি বাজছে। অন্ধকারে শুকনো ঝরা-পাতা রাণীর পায়ে পায়ে বেজে চলে। রাজা বললেন রাণীকে, ভয় পেয়ো না প্রিয়ে। রাণী বললেন আর আমার ভয় নেই। এই বলে প্রদীপ বের করে রাজার মুখে তুলে ধরে বললেন, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার, একি সুন্দর রূপ তোমার।" এই প্রদীপ নারীর আপন অন্তরের আলো। এই প্রদীপ যে দিন জ্বলে সেদিন নারী অসুন্দরের মধ্যে পরম সুন্দরের দেখা পায়। বেশীর ভাগ মেয়ে এই প্রদীপ বুকে নিয়ে জন্মায়। এমনি করেই নারী সংসারের অভিশাপ মোচন করে দেয়। দেবতার অভিশাপে যে মানুষ জন্মেছে কদর্য্য কুরূপ নিয়ে, নারী আপন অন্তরের দীপালোকে তার সেই অসৌন্দর্য্যের অভিশাপকে ঘুচিয়ে দেয়। দেবতার অভিশাপের ওপরে জয়ী হয় নারীর প্রেম। মানুষকে সে মুক্তি দেয় দেবতার অভিশাপ থেকে।

নারীর প্রেম পুরুষের জীবনে পরম সম্পদ। নারীর প্রেমে পুরুষ নিজের পরম মূল্য উপলব্ধি করতে পারে। নারীর প্রেম পুরুষকে পরম গৌরব দান করে। নারীর প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুরুষ সংসারে নির্ভয়শক্তিতে মাথা তুলে আত্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করবার শক্তি নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে।

'পুনশ্চ' বইয়ের একটি কবিতায় কবি লিখেছেন—বটকৃষ্ণ লোকের বিকৃত নাম করণ করে তাদের বিদ্রূপ করে। এই নাম বিকৃতি মানুষের পক্ষে যে কত বড় মর্মান্তিক কবি তা 'গিন্নী' গল্পে আশুর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন। গুরুমশাই আশুর 'গিন্নী' নামকরণ করে তাকে যে মর্মান্তিক দুঃখ ও লজ্জা দিল তার চেয়ে মারের সাজাও ছিল ভাল। সেখানে কবি লিখেছেন—এত দিনে আশুর অনেক বয়স হয়েছে। নিশ্চয় তার জীবনে অনেক গুরুতর সুখ ও দুঃখ এসেছে। কিন্তু সে দিনের সেই দুঃখের সঙ্গে কোন দুঃখের তুলনাই হতে পারে না।

বটকৃষ্ণ সুনীতের নাম রেখেছিল হাঁসখালি। এর কোনো অর্থ ই নেই। কিন্তু নিছক নিরর্থক বিকৃত বলেই এটা সুনীতের বুকে বাজত। সুনীত ভালোবাসে তার বোনের বান্ধবী উমারাণীকে। সে দিন ঘন বর্ষার দিনে উমা ছিল পাশের ঘরে। সুনীতের দুষ্টু ছোট বোন দাদার মনের কথা জানে। সেদিন সুনীতকে এসে বলল—তোমাকে আজ গান গাইতেই হবে। নইলে উমা কিছুতেই ছাড়ে না। এ দিকে পাশের ঘর থেকে ওর এই কথা শুনে—

> "লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
> এ মিথ্যা কথার
> কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
> ভেবে সে পেল না।"

দুষ্টু মেয়ে এই লজ্জাকাতর সখীকে জানত বলেই সে তার নামে মিথ্যা বলে কৌতুক করেছিল। নিরুপায়ের এই দুর্দশা দেখে সে হেসেছিল। সুনীত গান ধরল—"আওরে পিয়রওয়া, রিমি ঝিমি বরিখন লাগে।"

তারপরে কবি লিখেছেন সেদিন সন্ধ্যেবেলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বটকৃষ্ণ হাঁক দিল "ওরে হাঁসখালি কোথা গেলি হাঁসখালি।" বটকৃষ্ণ জানত না আজ সুনীত কোন্ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে কোন রাজমুকুট মাথায় প'রে আছে। যে সুনীত এত দিন নীরবে ওর বিদ্রূপের দাহ সহ্য করেছে আজ সে ওকে এমন ধমক দিল যে বটকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চুপ হয়ে গেল—"অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের মতন।" বটকৃষ্ণের ভেকের ডাক, তার বিদ্রূপ জন্মের মত শেষ হয়ে গেল। কবি দেখিয়েছেন সুনীত আজ উমার প্রেমে নিজের গৌরব উপলব্ধি করেছে। আজ তার আত্মদৈন্য ঘুচে গেছে। যার অমন নবীন সুন্দর। আরক্তিম মাধুরী—সে যখন তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে তখন সেত আর তুচ্ছ নয়। সংসারে কারোকে আর তার ভয় নেই। একখানি প্রীতি স্নিগ্ধ প্রেম মুগ্ধ হৃদয়ের সম্মান তাকে সংসারের সর্বত্র নির্ভয় করে দিয়েছে।

লিপিকার একটি কাহিনীতে কবি প্রেমের এই গৌরবের কথা লিখেছেন। কোন একটি লোক যাচ্ছিল পাহাড়ের পথ দিয়ে। তিনটি মেয়ের সংগে তার দেখা হ'ল সেই পথে। ওকে দেখে বড় দুটি বোন মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল কিন্তু ছোটটি হেসে উঠল খিলখিল করে।

তখন ওই লোকটির মনে পড়ল সে যখন তার গ্রাম থেকে বিদেশে যাত্রা করে, তখন একটি মেয়ে চোখের জলে ভেসে তাকে বলেছিল—"তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

যে নিতান্তই তুচ্ছ, একজনের কাছে যে উপহাসের পাত্র, প্রণয়িনী নারী তাকেও পরম মূল্যবান করে রেখে। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় কবি বলেছেন স্বর্গের অপ্সরীর চেয়ে এই মর্ত্যের তুচ্ছতম নারীও বেশী ভালো। মর্ত্যের নারী তার বালিকা বয়স থেকে শিবপুজো করে স্বামীর জন্যে। পুরুষকে সে দেবতার বর বলে আপন জীবনে বরণ করে নেয়। উৎসবের বাঁশির সঙ্গীতে, চন্দন চর্চিত ললাটে, রক্তাম্বরে বধূ যে দিন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়, তারপর দিন হতেই সে স্বামীর সুখে দুঃখে সঙ্গিনী। কল্যাণী গৃহিণীর রূপে সে তার জীবনে সান্ত্বনা সঞ্চার করে রাখে। তার সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু আর তার হাতের কঙ্কণ এ সমস্তই তার স্বামীর কল্যাণের মঙ্গল চিহ্ন। নারী যেন পুরুষের কাছে—

পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।"

পূর্ণিমার চাঁদ যেমন অন্ধকার সমুদ্রের বুকে স্নিগ্ধ আলোক ধারা বর্ষণ করে, তেমনি নারী সংসারের সমস্ত দুঃখ বিপদ দুর্দিনে পুরুষের চিত্তে শান্তি ও সান্ত্বনার স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করতে থাকে। নারীর প্রেমে কবি স্বর্গের সুখের স্বাদ পেয়েছেন। কবি লিখেছেন বসন্তের জ্যোৎস্না রাতে যেদিন দূরের বনশাখায় বিনিদ্র কোকিল ডাকতে থাকবে তখন নিদ্রিতা প্রেয়সী আমায়, লতার মত বুকে জড়িয়ে ধরবে, তখনি মনে পড়বে স্বর্গের স্মৃতি।

নারী মায়াময়ী। পুরুষকে সে বেঁধে রাখতে চায়। পুরুষকে মুগ্ধ করবার মন্ত্র প্রকৃতিই তাকে শিখিয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ে যে বীর, যে জগতের কল্যাণ সাধন করবে, সে এই মায়ার বন্ধন কাটিয়ে বীর্য্যের পথে চলে যায়। কচ ও দেবযানী কাহিনীর কবি এই অর্থই করেছেন। পুরুষের কাজ কঠিন। এই জন্য অনেক সময়ে তাকে দূরে দুর্গমে যেতে হয়। তখন নারীর প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকলে তার চলে না। কচ ও দেবযানীর কাহিনীতে কবি সেই চিরন্তন বীর পুরুষ ও চিরন্তনী মায়াবিনী নারীর কথাই দেখতে পেয়েছেন।

কচ এসেছে শুক্রাচার্য্যের তপোবনে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শেখবার জন্যে। সে দেবলোকে ফিরে গিয়ে এই বিদ্যা-দেবতাদের দান করবে। কিন্তু তপোবনে তার দেখা শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানীর সঙ্গে। দুজনেই ভালোবাসল দুজনকে। কিন্তু যে দিন বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হল, সে দিন দেবযানী কচকে ধরে রাখতে পারল না। যখন মহত্তর কর্তব্য কচের সামনে অপেক্ষা করে আছে তখন সে আপনার সুখে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে না। কচ দেবযানীকে বলল—যদি স্বর্গ আর স্বর্গ বলে মনে না লাগে, যদি আমার চিত্ত বাণবিদ্ধ মৃগের মতই এই দূর বনান্ত তলে ঘুরে মরে, তবু আমাকে সেই সুখ হীন স্বর্গেই ফিরে যেতে হবে। তাকে তার মহত্তর ব্রত সমাপ্ত করতেই হবে।

[ক্রমশঃ]

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আবহমানকালযাবৎ সুসভ্য সমাজের পুরুষ ও রূপচর্চ্চাবিশারদেরা সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে আসছেন যে রূপসী নারীর দেহটি হবে পল্লবের মতোই পেলব-সুন্দর। কারণ, যথাযথ আহার-বিহার, ব্যায়াম ও রূপপরিচর্য্যার অভাবে বা উদাসীনতার ফলে, অপ্রয়োজনীয় মেদ-বাহুল্যের দরুণ দেহ ভারী, মোটা বা জঘনদেশ স্থূল-বর্ত্তুলাকার হয়ে উঠলে, রমণীর রূপ-যৌবনের কোনো মূল্য এবং কদর থাকে না। তাই সচরাচর নজরে পড়ে যে অধুনা-কালের প্রতীচ্য এবং পাশ্চাত্য সমাজে স্থূলাঙ্গী রমণীর লজ্জা ও দুর্ভোগ-কষ্টের সীমা নেই। এ-ধরণের লজ্জা দুর্ভোগ-কষ্ট মোচনের উদ্দেশ্যে আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা বলেন—রমণীদের মধ্যে যাঁরা রূপ-যৌবন

এবং দেহের গড়ন সুঠাম-সুন্দর রাখতে চান, তাঁদের উচিত —দেহ যেন ভারী না হয় সেদিকে সদা-সজাগ-দৃষ্টি রাখা। কারণ, দেহ মোটা ও ভারী হয়ে উঠলে, রমণীর রূপ-সৌন্দর্য্য এবং দৈহিক গঠনের কোনো শ্রী বা ছাঁদ থাকে না।

তাই আধুনিক রূপচর্চ্চাবিদেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে রমণীর কোমর এবং জঘনদেশ—এই দুইয়ের গড়নে সামঞ্জস্য বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, অবহেলা-ঔদাসীন্যের ফলে, মেদ-বাহুল্যের দরুণ কোমর এবং জঘনদেশ স্থূল-বর্ত্তুলাকার হয়ে উঠলে অসামান্য-রূপসী যুবতীকেও কদর্য-কুশ্রী দেখায়। অথচ, সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করলেই, এ দুর্ভোগ-লজ্জার কবল থেকে সহজেই রেহাই পাওয়া যায় এবং দৈহিক রূপ-যৌবনও সুদীর্ঘকাল অটুট-অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। একালের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ রূপচর্চ্চাবিশারদেরা তাই উপদেশ দিয়ে থাকেন যে রমণীর কোমর এবং জঘনদেশ সুঠাম-সুন্দর রাখার জন্য প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বিশেষ-ধরণের কয়েককটি সহজসাধ্য 'ঘরোয়া' ব্যায়াম-পরিচর্য্যা অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ সব ব্যায়াম-পরিচর্য্যায় দেহের ছাঁদ ভালো থাকে এবং নিত্য-নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে, তলপেট ও উদরদেশের পেশীগুলি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে বলেই রমণী-দেহ বেঢপ-বেয়াড়া গড়নের হয়ে ওঠে না। এবারে তাই এমনি-ধরণের কয়েকটি সহজ-সরল ব্যায়াম-ভঙ্গীর মোটামুটি হদিশ দিই। তবে এ সব ব্যায়াম অনুশীলন-কালে গোড়াতেই নজর রাখতে হবে—বসা, দাঁড়ানো এবং চলে-ফিরে-বেড়ানোর ভঙ্গীর দিকে। কারণ, যেমন-তেমনভাবে বসলে, দাঁড়ালে এবং চলে-ফিরে বেড়ালে দেহের গঠনে ছন্দ-তালের ব্যাঘাত ঘটে, শরীর ক্রমেই স্থূল-বর্ত্তুলাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়।

কোমর, জঘন এবং উদরদেশকে যদি সমঞ্জসভাবে গড়ে তুলতে চান, তাহলে দুটি কথা মনে রাখতে হবে।

১। নিত্য নিয়মিতধারায় ব্যায়ামচর্চ্চা।

২। ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, চলে-ফিরে বেড়ানোর সময় দেহের বিশিষ্ট ভঙ্গী সর্ব্বদা রক্ষা করে চলতে হবে।

এদিকে লক্ষ্য রেখে চললে, দেহ কখনো বিশ্রী বা বেয়াড়া-বেঢপ ছাঁদের হবে না—শরীরের গঠন শ্রীও থাকবে যৌবনদীপ্ত ও সুন্দর।

সচরাচর দেখা যায় যে একটু বয়স হলে মেয়েদের তলপেট মেদে ভরে উঠে ভারী ও স্থূল হয় এবং ঝুলে পড়ে। জঘনদেশ মেদে স্ফীত এবং কদর্য্য হয়ে ওঠে। এমনটি হবার কারণ,—বসা-দাঁড়ানোর বিধি মেনে না চলা। যেখানে যেমন খুশী থপ্ করে বসে পড়লুম··· চললুম-ফিরলুম এলোমেলো নানান্ ভঙ্গীতে···এ সবের ফলে, দেহ সমানভাবে বাড়তে পায় না—কোনোদিক সঙ্কুচিত হয়, কোনোদিক বা ফুলে-ফেঁপে স্থূল-ভারী হয়ে ওঠে···এবং এই অসামঞ্জস্য ঘটবামাত্র অনাবশ্যক মেদ জমে দেহকে ক্রমেই ভারাক্রান্ত আর অঙ্গ মাধুরীকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে। তাই আধুনিক রূপচর্চ্চাবিশারদেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে এলোমেলো-ভঙ্গীতে হেলে-দুলে চলা এবং যেমন-তেমনভাবে বসা-দাঁড়ানোর কদভ্যাসে মেয়েদের কোমর, উদর এবং জঘনদেশ মেদ-বাহুল্যে স্থূল-বিশাল ও বিশ্রী হয়ে ওঠে এবং তন্বী-দেহের ছাঁদ অবহেলা-ঔদাসীন্যে এভাবে একবার নষ্ট হলে, সে ত্রুটি-মোচন বহুক্ষেত্রেই ইহ-জন্মে আর সম্ভবপর হয় না। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ, উদর, কোমর আর জঘনদেশের সুসম-ছন্দের উপর মেয়েদের মনোহারিত্ব নির্ভর করে অনেকখানি।

অনেকের ধারণা, সন্তান-প্রসবের ফলে, মেয়েদের দেহের শ্রী-ছাঁদে ভাঙন ধরার জন্যই এ অনর্থের সৃষ্টি হয়। এ ধারণা কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ঠিক নয়। তবে অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন সন্তান-প্রসবের ফলে এবং যথোচিত যত্ন-পরিচর্য্যা-ব্যায়াম প্রভৃতির অভাবে-ঔদাসীন্যে এমন ক্ষতি যে অল্প-বিস্তর ঘটে, সে দৃষ্টান্তও হামেশা নজরে পড়ে। তাই একালের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসকেরা প্রায়ই মেয়েদের উদর, কোমর, জঘনদেশের গঠন-সৌন্দর্য্য যাতে সুস্থ-সুন্দর থাকে, সেজন্য বিশেষ ধরণের ব্যায়াম-পরিচর্য্যারও বিধান দিয়ে থাকেন। তার কারণ, নিত্য-নিয়মিতভাবে সে সব ব্যায়াম-পরিচর্য্যা ফলে, তলপেটের অস্থি ও পেশী সুস্থ থাকবে এবং উদর আর জঘনদেশ স্থূল ও ভারী হয়ে উঠে নারী রূপশ্রীকে কদর্য্য করে তুলবে না।

একালের বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসকেরা এবং রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা বলেন যে মেয়েদের দাঁড়ানোর ভঙ্গীর উপর জঘনদেশের গঠন প্রধানতঃ নির্ভর করে। মেয়েরা যদি খুব বেশী ঝুঁকে চলা-ফেরা করেন, তাহলে তাঁদের জঘনদেশের গঠনে অচিরেই বিকৃতি ঘটে। কারণ, খুব বেশী ঝুঁকে চলাফেরার ফলে, দেহ সামনের দিকে ঝোঁকে···এই কদভ্যাসের দরুণ জঘনদেশ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে ক্রমশঃ বিশ্রী-বেমানান হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে, শুধু যে মেয়েদের বুকের গঠন আর দেহের শোভা নষ্ট হয় তাই নয়, উদরের অভ্যন্তরে পাকস্থলী এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও কদর্য্য হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা আরো অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে দাঁড়ানো এবং চলাফেরার সময়েও তলপেটের অস্থি যেন তলপেটের খাঁজে খাঁজে আশ্রয় পায়···বুক যেন সরল-সিধাভাবে খাড়া সোজা থাকে—ঘাড় ও পদ-যুগল যেন সমরেখায় অবস্থান করে—সেদিকে মেয়েদের সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এ ছাড়াও, তাঁরা বলেন যে বেশীক্ষণ এক পায়ে দাঁড়ানো মেয়েদের পক্ষে কদাচ অভ্যাস করা উচিত নয়। এ কদভ্যাসের ফলে, জঘনদেশ ও কাঁধের সমতা বা Balance নষ্ট হয়। কাজেই, যখনি দাঁড়াবেন—দুই পা এক করে সমানভাবে দাঁড়াবেন···দেহের কোনো অংশ যেন অযথা বেঁকে বা একপাশে ঝুঁকে না থাকে, সেদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখবেন।

অপাততঃ মেয়েদের উদর, কোমর এবং জঘনদেশ সুঠাম-সুস্থ রাখার উপযোগী বিশেষ-ধরণের কয়েকটি ব্যায়ামভঙ্গীর মোটামুটি হদিশ দিই।

এ ধরণের ব্যায়াম চর্চ্চার প্রথম ভঙ্গীটি হলো,—দেহটিকে সটান-সিধা রেখে সমতল মেঝের উপর স্থির হয়ে দাঁড়ান। তারপর জঘনদেশের উপর দুই পাশে দুই হাতের তালু ন্যস্ত করে রাখুন···এভাবে রাখার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি যেন বেশ ছড়ানোভাবে থাকে—সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এবারে ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের সামনের অংশ, অর্থাৎ, আঙ্গুলগুলির উপরমাত্র দেহের ভর রেখে নৃত্য-ছন্দে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। এভাবে ঘোরবার সময়, পালাক্রমে এক-পা তুলে অন্য পা মেঝেতে রাখবেন। যে-পা মেঝেতে রাখবেন, সে পায়ের সামনের দিকমাত্র মেঝে স্পর্শ করে থাকবে—পায়ের গোড়ালি যেন ভূমি-স্পর্শ না করে। যে পা শূন্যে তুলে রাখবেন, সে-পা তুলতে হবে দেহের পিছন দিকে এবং সে সময় হাঁটু থাকবে আগাগোড়া সিধা। এক-পায়ে যখন ভূমি স্পর্শ করবেন, তখন সে পায়ের উপর সারা দেহের ভর রেখে প্রতিবার দশ-বারো সেকেণ্ড করে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

স্থানাভাবের কারণে, এবারে মেয়েদের উদর, কোমর ও জঘনদেশের সুঠাম শোভাবর্দ্ধনের উপযোগী বিশেষ ধরণের অন্যান্য ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলির হদিশ দেওয়া সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করবো।

—

সূচীশিল্প

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের রীতি সম্বন্ধে গত সংখ্যায় মোটামুটি যে সব হদিশ দিয়েছি, সূচীশিল্পানুরাগিণীদের সুবিধার্থে এবারে সে প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি দরকারী কথা বলে রাখি।

'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের কাজ করবার সময়, কাপড়ে ইচ্ছামত বেশী কিম্বা অল্প 'কোঁচ' (Gatherings বা Folds) দিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে—এ কাজের সময়, কাপড়ে যত 'কোঁচ'

দিতে হবে, সেই হিসাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অন্ততঃ-পক্ষে দ্বিগুণ পরিমাণ কাপড় নেবেন।

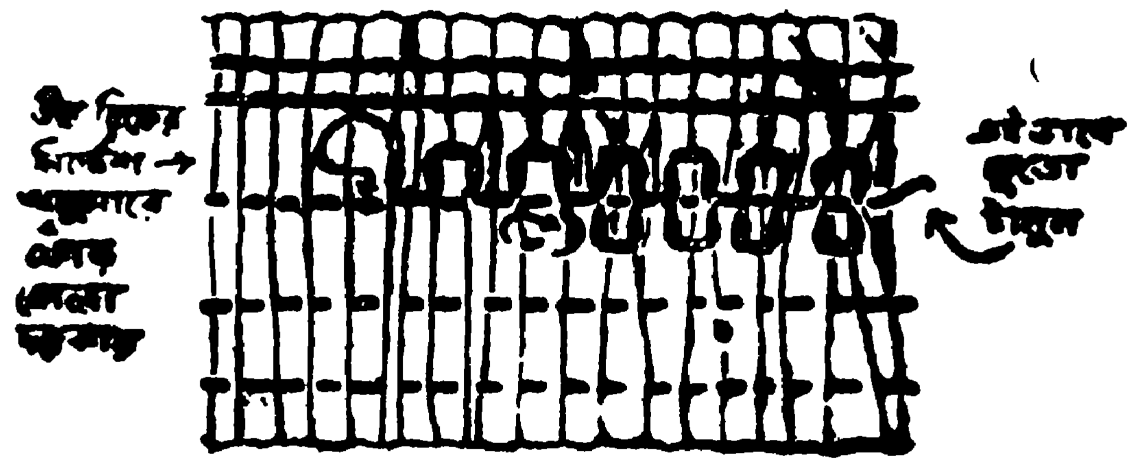

৩

তাছাড়া আরো খেয়াল রাখতে হবে যে, এ সেলাইয়ের রীতির আরেকটি উদ্দেশ্য মোটা কাপড়ে স্বাভাবিক যে 'কোঁচ' পড়ে, সেগুলিকে সুসমঞ্জসভাবে পাটে-পাটে ভাঁজ করে সুকৌশলে ও সুদৃশ্য-পরিপাটি-ছাঁদে গেঁথে রাখা। সুতরাং 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের কাজ করতে গেলে, সব-প্রথমে দেখতে হবে—কাপড়ে সাধারণতঃ 'কোঁচ' যেন প্রত্যেকটি সমান-ধরণের হয়। একটি 'কোঁচে' বেশী কাপড় এবং অপরটিতে কম, এভাবে অ-সমান ছাঁদে কাপড়কে কোঁচকালে, সেলাইয়ের ধারাবাহিকতা (Continuity) ও সৌন্দর্য্য-শোভা নষ্ট হবে এবং সে-সেলাই বিশ্রী তালগোল-পাকানো-গোছ দেখাবে। এ বিপত্তি থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত হদিশ-অনুসারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত-পরিমাণে কাপড় ব্যবহার ও সমান-মাপে আগাগোড়া প্রত্যেকটি 'কোঁচ' সেলাই করা আবশ্যক।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে, উপরের ৩নং ছবিতে দেখানো নমুনা-অনুসারে, 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের কাজ সুরু করলে সহজেই সাফল্য মিলবে। উপরের ছবিটি দেখলেই সুস্পষ্ট হদিশ পাবেন যে কাপড়ের 'কোঁচগুলি' কিভাবে সমান-ছাঁদে রচনা করা এবং সুষ্ঠু-পরিপাটি-ভঙ্গীতে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সেগুলিকে আগাগোড়া কিভাবে গেঁথে রাখা হয়েছে। এভাবে গেঁথে নেওয়ার সময়, অনেক ক্ষেত্রে সূচীশিল্প-কারিণীর অনভিজ্ঞতা বা অসাবধানতার ফলে, কাপড়ের উপরের 'কোঁচগুলি' আসন্ন কাজ-আরম্ভের কালে আচমকা আলগা বা এলোমেলো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তবে সে অসুবিধা থেকে রেহাই পেতে হলে, পাশের ৪ নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেই রীতি অনুসরণ করে চললে, কাজের সুবিধা হবে এবং কাপড়ের 'কোঁচগুলি' অযথা এলোমেলো হয়ে যাবার আশঙ্কাও কমবে অনেকখানি।

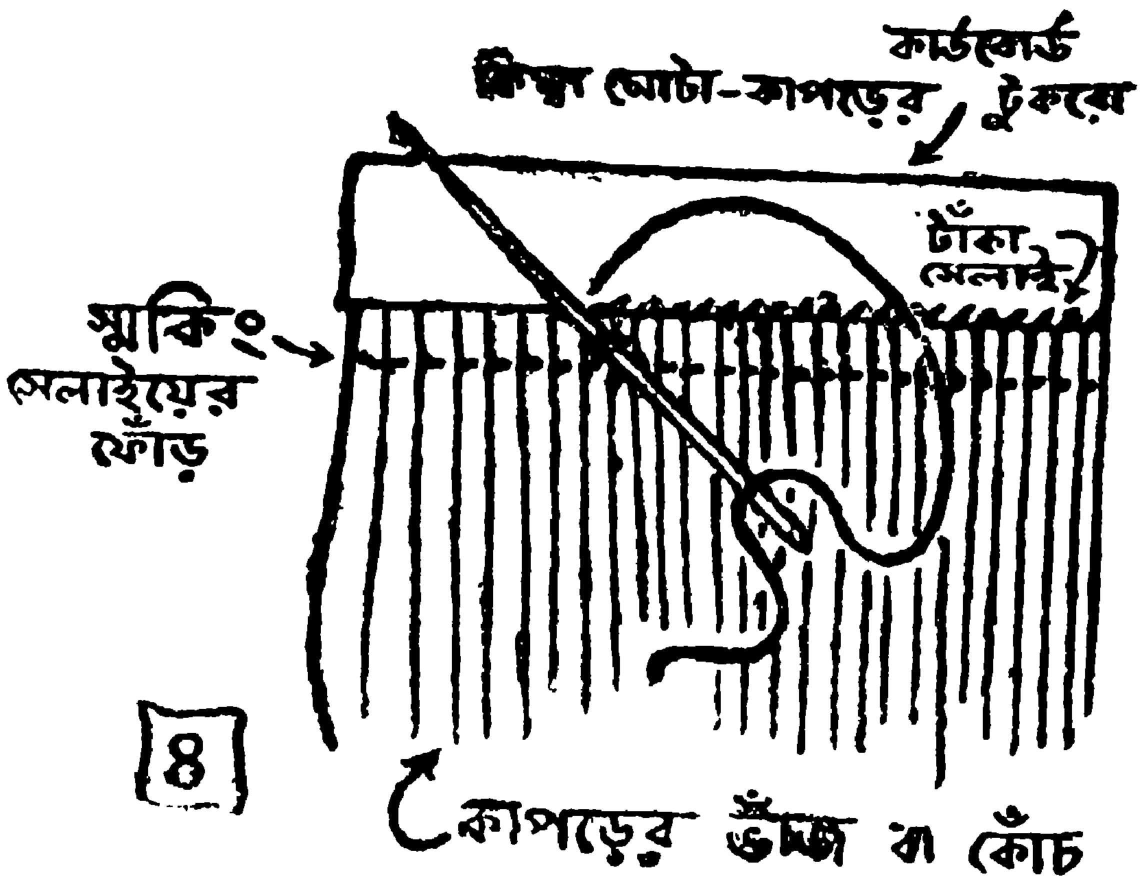

৪

উপরের ৪নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেই নমুনা-অনুসারে, 'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সেলাইয়ের কাজ সুরু করবার সময়, কাপড়ের 'কোঁচগুলিকে' আগাগোড়া যথাযথভাবে ও সমান-ছাঁদে ভাঁজ করে নিয়ে, সেই ভাঁজ-করা অংশের মাথায় লম্বালম্বি-আকারের এক-ফালি মজবুত কার্ডবোর্ড কিম্বা মোটা-কাপড়ের টুকরোকে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে 'টাঁকা-সেলাই' দিয়ে গেঁথে কাপড়ের 'কোঁচ-গুলিকে' সুসংবদ্ধভাবে যদি আটকে রাখেন, তাহলে আর কাজের সময় বিশেষ কোনো অসুবিধার আশঙ্কা থাকবে না এবং নির্ঝঞ্ঝাটে সুষ্ঠুভাবে সূচীশিল্প-সামগ্রীটিকেও রচনা করা সম্ভব হয়। এমনি উপায়ে পরিপাটি-ছাঁদে সূচীশিল্প-সামগ্রীটি আগাগোড়া রচিত হয়ে যাবার পর কাঁচির সাহায্যে সুকৌশলে কার্ডবোর্ড বা মোটা-কাপড়ের টুকরোয় গাঁথা 'টাঁকা-সেলাইয়ের' বন্ধনীগুলিকে একে একে ছেঁটে দিলেই, সেলাইয়ের কাপড়ের 'কোঁচগুলি' নিখুঁত-সুন্দর ও সমান-ছাঁদের হয়ে উঠবে এবং সেলাইয়ের ধারাবাহিকতাও (Continuity) বজায় থাকবে পুরোপুরি ভাবে।

'স্মকিং' বা 'হনিকোম্ব' সূচীশিল্প-রীতি প্রসঙ্গে মোটা-মুটি যে সব হদিশ আপাততঃ দেওয়া হলো, শিক্ষার্থীদের পক্ষে, সেগুলি সহজসাধ্য বলেই ধারণা হয়। বারান্তরে, এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি দরকারী প্রসঙ্গালোচনার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

গল্প

অন্য নামে ডাকো

নারায়ণ সেনগুপ্ত

আসল নাম ওর কমলা। কেউ বলে কমলিনী··· আবার কেউবা সোহাগ করে ডাকে কম্‌লী। হ্যাঁ সোহাগের লোক আছে বটে অনেক। এদিকে বেশ নাম ডাক আছে কম্‌লীর। এই কমলার কথাই শুনিয়েছিল রমানাথ।

অদ্ভুত গল্প। সত্যিই অদ্ভুত। সুরুতেই ভ্রু কুঁচকে বললাম—এ আবার কি গল্প? ঐ সব নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে গল্প লেখা এবং পড়া দুটোই কুরুচির পরিচয়। তাছাড়া···।

একটা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল রমানাথ। বল্লে পঙ্কিল আবর্তের মধ্যেই ত কমলের জন্ম। এ কমলও ঠিক তাই। আবর্জনা থেকেই ত সৃষ্টি হয়েছে মার্স-গ্যাস—এ কথা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? সবটা শোনই না···।

অনেকক্ষণ থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। খান কয়েক সরকারী ও বেসরকারী জীপ গাড়ি স্টেশনের বাইরে যাত্রীর অপেক্ষায় রয়েছে। ঠিক যেমন ভাবে রাত দুপুরে অপেক্ষা করে কমলী। এ অপেক্ষার বিরাম নেই। রোজ আসে এবং আসবেও।

রেলওয়ে প্লাটফরমের শেষে বিরাটকায় হলদে বোর্ডের উপর লেখা "চম্পা"। ঠিক তারই গা ঘেঁসে সরকারী রাস্তা। পিচের বটে। তবে মাঝে মাঝে চটা উঠে গিয়ে ঠিক কালো শরীরে বসন্তের দাগের মত মনে হয়। রাস্তার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেই যেন রেলবাবুদের ডেরাগুলো তৈরী হয়েছে। ঠিক তারই পিছনে কমলার বাসা। পুরানো দেওয়ালের উপর তকমা আঁটা খাপড়ার অপূর্ব সমাবেশ। আশে পাশের বাসিন্দারা সবাই চেনে কমলীকে। অচেনার আর কি আছে?

বয়স হয়েছে কমলীর। ভাল করে নজর রাখলে দেখা যায় চোখের কোণে কালি জমেছে। গালজোড়া ভেঙে গেছে। একটু যেন কুঁজো হয়ে চলে। মাথার চুলও তেমন ঘন নয়। তবে হ্যাঁ একদিন ছিল···রূপসী বলে অনেকেরই ভুল হতো। আঁট-সাঁট দেহবল্লরী অনেক মেয়ের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু ছিল। একজোড়া কালো মিস্‌মিসে ভ্রূযুক্ত হরিণ চোখ অনেকের বুকে আগুন জ্বালিয়েছিল। কিন্তু··· না থাক। তখনকার কমল শুধু এক দেবতার পুষ্পাঞ্জলির জন্য আপনি বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু সেদিন গেল। কাল বৈশেখীর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল। সে কমলের সব কটি পাপড়ি শুকিয়ে গেল। কিন্তু মরলো না।

নতুন কমলের জন্ম হলো।

বন্ধু হঠাৎ কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে—ঐ দেখ···ঐ যে···

সন্ধ্যের ছিপছিপে অন্ধকারে এতটুকু চিনতে ভুল হলোনা কমলাকে। দিব্যি একটা ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে হাত ধরে চলেছে। মুখে চটুল হাসি···চোখে শিকারের নিশানা।

বন্ধু বললে—কিরে ঘাবড়ে গেলি? ঐ একটা মেয়ে গোটা একটা নারী সমাজের প্রতিমূর্তি।

—ছিঃ ছিঃ নারী সমাজকে তুমি এত জঘন্য ঠাওরা নাকি? রাগে ফুলে উঠলো যেন সারা শরীর।

রমানাথ হাসলো। বললে, দাদার তুমি এখনও শিশু তুমি মেয়ে দেখেছ কিন্তু মেয়ে চেনোনা যেমন চেনে আরো অনেকে। এটা বেহুলার দেশ। সতী সাবিত্রী মাটির ওপর আমরা চলাফেরা করি।

—কিন্তু···

—থামিয়ে দিল বন্ধু। রাত আরো গভীর হয়ে আসবে। লোক চলাচল বন্ধ হবে রাস্তায়। ভিক্টি

ষ্টেশনের চৌকিদার লাঠির উপর ভর করেই একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। মেটিরিয়াল ট্রেন সাইডিং লাইনে দাঁড়িয়ে রোগীর মত হাঁস ফাঁস করবে। তখনও দেখবে কমলার ঘরে আলো জ্বলছে। এ আলো আমাদের খুব চেনা। এ আলোর একটি রশ্মি দেখে বলে দিতে পারবো যে মিষ্টার রায় কখন আসবেন কিংবা মিলের সুপার ভাইজার চলে গেল কিনা!

লোকের সকাল হবার বহু পরে ভোর হয় কমলার। রাত জাগার দরুণ চোখ দুটো ফোলা ফোলা। ছাপ শাড়ি বেশ আঁট করে জড়িয়ে কাঁধের উপর কলসী নিয়ে জল আনতে যায়। কোমরের উপর রূপার বজু তালে তালে দোলে! পায়ের মল অভিমানে সুর তোলে···ঝুম ঝুমা ঝুম। পাড়ার বৌ-ঝিরা এ আওয়াজের সাথে খুব পরিচিত। না দেখেই বলে দেবে এই যে ননদিনী চললো। পাড়ার ছেলেরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু এ সবের খেয়াল নেই কমলার।

মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ডাক আসে কমলার। যেতেও হয়। সেদিনও গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। খোঁপায় কনক চাঁপা গুঁজে···চোখে সুর্মা···ঠোঁট দুটো গাঢ় আবীর রঙ করে উঠে গেল গাড়িতে। ফিরলো অনেক রাত্রে। তখন পাড়া নিঝুম।

সেদিনই প্রথম মদ খেয়েছিল। মাত্রা বেশী হয়েছিল। সামলাতে পারেনি। বমি করলো। টলতে টলতে উঠে গেল ভিতরে। গা রি রি করে ওঠে রমানাথের।

কি জানি কেন কমলাকে ভাল লাগে রমানাথের। একটু যেন স্নেহ! দরদও বুঝিবা।

ঐ মদ খাওয়াটাই বুঝি ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। অথচ নেশা যে একান্ত আপন বন্ধু—সে কথা অন্যকে কি করে বোঝাবে কমলা? সেই কি আর ছাই বুঝতে পারতো আগে? কেউ মদ খেলে সর্বাঙ্গ জ্বালা করতো। আর এখন? এখন আর অবুঝের মত দোষ দেয়না কমলা। সত্যিই বড় দুঃখ হয় নিজের জন্যে। চোখের উপর কিভাবে স্বপ্নময় দিনগুলো ঝরে গেল। সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে গেল। সে শুধু একা স্থির অবিচল রয়ে গেল। মাত্র ত কয়েকটা মাস এরই মধ্যে এত পরিবর্তন? তখনও পাড়ায় আর পাঁচজন বৌ-ঝির সাথে ওঠা বসা করতো। অলস দুপুরে গালগল্প জমতো। টীকা···টিপ্পনী···ইয়ার্কী ···ফাজলামোর শেষ ছিল না। কাজলটাই ছিল বড় দুষ্টু। সে আর এখানে থাকেনা। স্বামী বদলী হয়েছে নয়নপুরে। চলে গেছে। বেঁচে গেছে কমলা। অন্ততঃ দুনিয়ার বুকে একজন আছে যে আগের কমলাকে চেনে এবং জানে।

অদ্ভুত জীবন কমলার। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকায়। ঝম ঝম করে ঝাঁপে বৃষ্টি আসুক। হঠাৎ নিজের নির্বুদ্ধিতায় হেসে ওঠে কমলা। না, তাহলে কপালে আর বিশ্রাম নেই। এই বৃষ্টি মাথায় করে দিব্যি এসে জুটবে ২।১ জন। স্থথ পদে। নিশাবিহারীদের পক্ষে এই নাকি পরম লগ্ন। বৃষ্টির প্রহরী মোতায়েন। ভিতরে যথেচ্ছা কাটানোর ও আলাপের সুযোগ। চুপ করে বসে থাকার উপায় থাকে না। ওসব হতভাগ্যদের জন্য প্রাণটা কেঁদে ওঠে কমলার। বেসুরা গলায় মাঝে মাঝে সুর জাগাতে হয়। প্রয়োজন বোধে সুরা। কখনো বা হাসির ফোয়োরা। কাঁচের কাপ ডিসের ঠুন ঠুন।

কত রকম লোকই ত দেখলো কমলা। কোলের উপর মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। আপন জন ভেবে মনের গোপন কথা ব্যক্ত করেছে। দু'হাত উজার করে কেউ দিয়েছে রূপেয়া, আবার কেউবা পশুর মত আঁকড়ে ধরেছে রূপকে। কমলা পারেনা। হাঁফিয়ে ওঠে ও। মুক্তি চাই। একেবারে মুক্তি। এ পঙ্কিল আবর্ত থেকে মুক্তি—নিষ্কৃতি।

মুক্তি পাবার লোকও চাই। কচি কচি মাথাগুলো মুচড়ে খাচ্ছে কমলা। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। জটলা চলছে অহোরাত্র। বুড়ো ছোঁড়ার মজলিসে···বুড়ি ছুঁড়ির এজলাসে। অভিযোগ···বিরাট অভিযোগ। ভদ্র পাড়ায় এসব কি? আমাদের পরিবার ছেলেমেয়ে আছে। চোখের উপর তাদের সর্বনাশ কে দেখতে চায়?

কমলার কানেও সে খবর গেছে। সে শুধু হেসেছে। ভরসায় না হতাশায় বলা কঠিন।

লোক তবু আসে কমলার সান্নিধ্যে। লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক ছিঁচকে চোরের মত। বড় বড় ডাকাতেরা যে একেবারেই আসেনা—তাই বা বলি কি করে? তবে তারা

আসে পুরুষের মত। তখন আর আমেজ করে পড়ে থাকার সুযোগ থাকে না কমলার। ধীরে ধীরে দেহটাকে টেনে টেনে নিয়ে যায় দরজা ভাঙা স্নান ঘরের ভিতর। ক্ষয়ে পড়া সানলাইটের অংশ ঘষে কিছুটা জৌলুস বাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে। অল্প দামী ক্রীমের কৌটার তকদেশে আঙুল চালিয়ে যা আসে তা দিয়ে ভাঙা গাল দুটোয় ঘষে দেয়। আনলায় তুলে রাখা শাড়ি ব্লাউজ জড়িয়ে নেয় সর্বাঙ্গে। তারপর একবার কাঁচ ভাঙা আয়নার বুকে নিজের ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের প্রতিচ্ছবি দেখে নিজেই একবার চমকে ওঠে। এ চমকানো রোগটা আজও দূর হলো না কমলার।

সে রাত্রের ছিঁটে ফোঁটা নমুনা পরদিন সকালেও টিকে থাকে। ঘরের দরজা অনেক বেলা পর্যন্ত বন্ধ। রাস্তায় উচ্ছিষ্ট মাংস হাড়ের মজলিসে কুকুরের আনন্দোৎসব; দু'একটা ভাঙা সোডার বোতলের চিহ্ন। আর আছে কমলার ঠোঁটে লোহিত আভা। শাড়ীর ভাঁজে পানের দাগ...মনের খাঁজে আনন্দের ঢেউ।

রাতের কমলা আর দিনের কমলা বুঝি অন্য একজন! সারাদিন দরজা ভেজিয়ে কি যে ছাই কাজ করে তা পাড়ার পাঁচজনের জ্ঞাতব্যের বাইরে। কেউ জানে না সে ঘরের মধ্যে কি করে। শুধু মাঝে মাঝে গলা শোনা যায়। স্বর যা সুর বোঝা শক্ত।

অনেকে বলেছে এটাই নাকি ও-শ্রেণীর মেয়েদের বৈশিষ্ট্য। পচা শকুনির গন্ধে নাক বন্ধ করার মত এ কথায় অনেকে কান বন্ধ করে।

বাইরে গ্যাসপোষ্টে আলো জ্বলে গেছে। অফিস-ফেরা কেরাণীকুল আলাপ জমিয়েছে যত্রতত্র। সোহাগের লেনদেন চলেছে কোন কুঠরীতে। একটা ভাঙা লরী আর্তনাদ করছে পথের ধারে।

অন্যমনস্কভাবে গরম চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মুখ পুড়ালো কমলা। একটু আঃ উঃ নয়। বৃথা আফ-শোষ নয়। কেবল কি যেন ভাবলো কমলা নিজের জীবনটাও বুঝি এভাবে পুড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর সহ্য হয় না জ্বালা। বড় যন্ত্রণা। ভেতরের—বাইরে প্রকাশের নয়।

এমন সময় বাইরের দরজায় ঘনঘন করাঘাত। এক সঙ্গে হাজারো ঝাঁঝালো গলা। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার কথা বুঝি আর একবার মনে পড়লো কমলার। ঠিক এমনি করেই সংখ্যাগুরুর দল লঘুদলের উপর নির্মম অত্যাচার করেছিল। তবে...তবে কি তারও আজ...। না-না। ভয়ের ছিঁটে ফোঁটা নেই। শঙ্কার কারণ নেই। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কমলা। জনারণ্য। কোন দুর্ঘটনায় বুঝি এত লোক জমে। হাঁ দুর্ঘটনাই বটে! পাড়ার পুরুষমহল। সবাই প্রায় চেনা চেনা। না, আজ তারা অচেনা—তারা কেউ নয় কমলার। তারা পাড়ায় শান্তি চায়। তারা ঘরের কল্যাণ চায়। ওদের দিকে তাকিয়ে মথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে কমলার। পায়ের নীচের মাটিও বুঝি সরে যায় আপনা থেকে। তবু নিজেকে এতটুকু দুর্বলতার সুযোগ দিল না কমলা। বেঁকে পড়া মেরুদণ্ড সোজা করে বললে—বুঝলাম, আপনাদের দাবী অযুক্তির নয়। আমি হলেও ঠিক একথা বলতাম। ভদ্রপাড়ার একজন... হঠাৎ সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে কমলার। কপাল দেশে জমে ওঠে ঘাম। তবু বললো কমলা—এতদিন আপনারা ছিলেন কোথায়? যখন ঐ চালকলের মেশিনে স্বামীর গোটা একটা পা পিশে গেছিল যখন সকলের দরজায় দরজায় শুধু একটু সাহায্যের জন্য হাত পেতেছিলাম... বুকের রক্ত দিয়ে দাসীপনা করে ঋণ শোধ করে দেবো! তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? একটা দম নিল কমলা। মুখটা বেঁকিয়ে...ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললে—টাকা হাঁা টাকা চাই আমার—উপদেশ নয়।

সারা শরীরটা টলছে কমলার। চোখ দুটো জ্বলছে মাথার চুল পাগলের মত টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কিন্তু না। সামলে নিল নিজেকে কমলা।

জনতার মধ্যে থেকে আওয়াজ আসছে। টাকাই যদি চান, জাত খুইয়ে...বেপাড়ায় যান—এখানে কেন দিব্যি নিশ্চিন্তে—

হাঁা যাবো। দৃঢ়কণ্ঠে বললে কমলা। তবে এপাড়া ওপাড়া নয়। খিদিরপুর গলি বা বাঙ্গী লেনও নয়। এবার সদর কোলকাতা।

উঠতি বয়সি কে একজন বল্লে কেন চুনোপুঁটিতে বুঝি পোষায় না আজকাল।

কোন উত্তর করলো না, হাসলো না। ঢলে পড়লো না...টাল খেলো না। সব শক্তি বুঝি তার নিঃশেষ হত অনেক চেষ্টার পর হঠাৎ সহ্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে গেল কমলার। কান্না-ভেজা সুরে বল্লে—টাকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এবার চিকিৎসা...হাঁা স্বামীর চিকিৎসা করাতেই যাবো কোলকাতায়!

আবার নিহত নায়ক—

আমেরিকার নিহত প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডির ভ্রাতা সেনেটর রবার্ট কেনেডি এবার আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। গত ৫ই জুন লস্ এঞ্জেলিস্ নামক স্থানে স্থানীয় নির্ব্বাচনে জয়লাভের পর তিনি যখন জনতার নিকট হইতে অভিনন্দন পাইতেছিলেন তখন ভীড়ের মধ্যে একজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি মারে। মাথায় ও কাঁধে গুলি লাগায় তিনি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া যান। তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু পঁচিশ ঘটা পরে তিনি হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। এইরূপ ঘটনা জগতের ইতিহাসে কম দেখা যায়। কেনেডি পরিবার আমেরিকায় তাহাদের পাণ্ডিত্য ও দেশসেবার জন্য সর্বজন পরিচিত। কিন্তু বারে বারে এই পরিবারের গুণী পুত্রদের যে ভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে তা বিশেষ বেদনাদায়ক। সমস্ত বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণ মার্কিন দেশের এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার ও অপরাধীর শাস্তি কামনা করিতেছে।

শ্রীমতী ইলাপাল চৌধুরী—

প্রবীণ দেশসেবক সুপণ্ডিত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গে একটি এম, পি, পদ খালি হইয়াছিল। হরিপদবাবু নদীয়া কৃষ্ণনগর কেন্দ্র হইতে ১৯৬২ সালে কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া এম, পি, নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্ব্বাচনে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ঐ কেন্দ্রে এম, পি, নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি পরলোক গমন করায়, শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী উপনির্ব্বাচনে ও ১৯৫৭ সালে সাধারণ নির্ব্বাচনে এম, পি, হইয়াছিলেন।

গত মে মাসে উপনির্ব্বাচনে শ্রীমতী পালচৌধুরী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালকে প্রায় ৪২ হাজার ভোটে পরাজিত করিয়া আবার এম, পি, হইলেন।

নদীয়া জেলার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র লইয়া এই লোকসভা কেন্দ্রটি গঠিত। সর্বত্রই শ্রীমতী ইলা অধিক ভোট পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, উচ্চশিক্ষিতা এবং নদীয়া কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ একগ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের পুত্রবধূ! বহু বৎসর হইতেই তিনি কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া জনসেবার কাজ করিতেছেন। ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দি, তিনটি ভাষাতেই শ্রীমতী পালচৌধুরী ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন।

পূর্বে এম, পি থাকার সময় তাঁহার কার্য্যের সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নির্বাচনসাফল্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

দুর্নীতির অভিযোগ—

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি সম্বন্ধে বহু অভিযোগ সরকারী দপ্তরে জমা হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য উচ্চস্তরের লোক লইয়া একটী কমিটীও গঠিত হইয়াছিল। গত ১লা মে কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ২৭৭ জন গেজেটেড্ অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের কথা আছে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তাহার পর একমাসের অধিক অতীত হইলেও কোন অফিসারের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর সম্বন্ধে তাঁহার অনেক গুণের কথা শোনা যায়। তিনি যদি কঠোরতার সহিত তদন্ত কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া পরিবর্তিত হইবে। বর্ত্তমানে দেশে সাহসী ও শক্তিশালী মানুষের অভাব, কাজেই দুর্নীতিদমনে কে অগ্রসর হইবে?

দেশের জনমতও এ বিষয়ে নীরব। কারণ দুর্নীতি জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। একজনকে ধরিতে গেলে একশতগুণ জড়াইয়া পড়িবে। সেজন্য কেহই অপরাধীদের শাস্তি চাহে না—মুখেই শুধু শাস্তির কথা বলেন।

ফরাক্কা লইয়া মতভেদ—

ভারত সরকারের চেষ্টায় ফরাক্কায় বাঁধ নির্ম্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু পাকিস্তান প্রথম হইতেই নানা বাজে কথা বলিয়া এই বাঁধ নির্মাণে বাধা দিতেছে। গত ৯ই মে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ হুমকী দিয়াছে বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হইলে পূর্ব পাকিস্তানে গঙ্গার জল কম যাইবে ও তাহার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে চাষের ক্ষতি হইবে। সেই জন্য পাকিস্তান এবিষয়ে বিশ্বব্যাঙ্কে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে। গত ২১ বৎসর ধরিয়া ভারত রাষ্ট্র পাকিস্তানের কথায় বহু ব্যাপারে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছে। পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করিয়াও তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। কাজেই ভারত রাষ্ট্রের এখন অধিকতর দৃঢ়তার সহিত পাকিস্তানের বাজে আপত্তি উপেক্ষা করা উচিত। ফরাক্কার কাজে বিলম্ব হইলে কলিকাতা সহরের ও নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের যে বিপুল ক্ষতি হইবে তাহা মনে রাখিয়া এখন কাজ করা উচিত।

ভুটানে নূতন পথ—

ভুটান রাজ্য ভারতের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত কিন্তু রাজ্যটা পর্বত ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সম্প্রতি ভারতের সহযোগিতায় ঐ রাজ্যে একটী ১২৭ মাইল লম্বা নূতন পথ নির্মিত হইয়াছে ফলে ভারতে যাতায়াতের যেমন সুবিধা হইবে, তেমনই ভুটানের ব্যবসা বাণিজ্যও বাড়িতে পারিবে। গত ৩রা মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভুটানের থিমপু সহরে যাইয়া ঐ পথের উদ্বোধন করেন। চীনারা ভুটানের মধ্য দিয়া ভারত আক্রমণের আশা রাখে, কাজেই ভুটানকে সুরক্ষিত রাখা ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ব প্রান্তে নেফা বা উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত রাজ্য ও পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তান তাহার মধ্যে নেপাল, সিকিম ও ভুটান তিনটী স্বাধীন রাজ্য আছে। ঐই তিনটী স্বাধীন রাজ্য বলবান থাকিলে ভারতের পক্ষে মঙ্গল। সেই জন্যই শ্রীমতী গান্ধী কয়দিন ভুটানে থাকিয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। ভুটানে তাহার নিজস্ব কয়েকটী বিশেষ জিনিষের উৎপাদন ছাড়াও এমন প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে, সে কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা করা দরকার।

বৃহত্তর কলিকাতা নির্ম্মাণের সাহায্য—

কলিকাতা ও সহরতলীর জলসরবরাহ, পথ নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে "সি, এম্, পি, ও" বা "কলিকাতা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন সংস্থা" ভারত সরকারের নিকট ১০০ কোটী টাকা অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকা ঐ ব্যাপারে ৩০ কোটী টাকা অর্থ সাহায্য দিতে সম্মত হইয়াছে। কলিকাতার চারিদিকে বাস গৃহের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংখ্যাও বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের জন্য জল, আলো, যান-বাহন চলাচলের পথ প্রভৃতি বহু পরিমাণে বাড়ানো দরকার। এই ব্যাপারে আমেরিকার সাহায্য দেশবাসীর বিশেষ কাজে লাগিবে।

আজব নগরে সাহিত্য সম্মেলন—

নদীয়া জেলার সিমুরালি রেলস্টেশনের কাছে গঙ্গার চরের ওপর শ্রীরমেশ পাল নামক এক ভদ্রলোক একটি নূতন পল্লী গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি নিজে পঞ্চাশ বিঘা জমি লইয়া সেখানে বাস করেন ও উন্নত প্রণালীতে কৃষি কার্য্য করেন। খ্যাতনামা দলনেতা শ্রীসৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর নূতন পল্লীর নাম দিয়াছেন, আজব নগর। তথায় রামমোহন পাঠাগার নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে ও একটি বড় গোল চালা ঘরে নানারূপ সভা সমিতি হইয়া থাকে। সম্প্রতি শ্রীকুমারেশ ঘোষের সভাপতিত্বে তথায় এক সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল এবং তাহাতে অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্রীবাণী বসু, শ্রীরবি গুহ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় তিরিশজন সাহিত্যিক কলিকাতা হইতে যাইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। রমেশবাবু সকলের দুইদিন বাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রমেশবাবুর নিমন্ত্রণে প্রায়ই কলিকাতা হইতে বহু গুণী ব্যক্তি সেখানে যাইয়া আধুনিক প্রথায় কৃষি, গোপালন, পক্ষী পালন প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়া থাকেন।

ভূমিহীন কৃষককে জমিদান—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন আইন করিয়া যে সকল কৃষক

প্রয়োজনের অধিক জমিতে চাষ করিত তাহা কাড়িয়া লইয়া ঐ জমি সরকারী জমি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ সকল জমি গত ছয়বৎসর ভূমিহীন কৃষকদিগকে এক বৎসরের মিয়াদে চাষের জন্য ইজারা দেওয়া হইত। নূতন ভূমি ব্যবস্থায় প্রায় ৪০ লক্ষ কৃষক ভূমিহীন হইয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র আড়াইলক্ষ চাষী চাষের জমি পাইত। বাকী জমি জমির মালিকরা নানাভাবে বেনামী করিয়া দখল করিয়া আছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরাজস্ব বিভাগ স্থির করিয়াছেন সরকারী জমিগুলি পাকাপাকি ভাবে কৃষকদের মধ্যে বিলি করিয়া দিবেন। নিজস্ব ভূমি না হইলে কৃষক সার, বীজ, চাষের জল প্রভৃতি পায় না ফলে তাহারা পুর্ণভাবে চাষ করেনা। নূতন ব্যবস্থায় যদি খাদ্য উৎপাদন বাড়ে, তবেই মঙ্গলের কথা। বাংলা দেশের ভূমিবিলি ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। প্রায় দুইশত বৎসরের পরিবর্ত্তনের ফলেও এখন পর্য্যন্ত ভাল ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে নূতন চেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করি।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮০ বৎসর বয়স্ক দেশনেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৮ বৎসর কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিয়া গত ১০ই জুন আবার কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষ ডি, এস, সি উপাধি লাভের পর ১৯২০ সালে মোটা টাকার সরকারী চাকরী ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। সেই সময় হইতে গত প্রায় ৫০ বৎসর তিনি সকল প্রকার ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করিয়া দেশ সেবা করিতেছেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তিনি কয়েকমাস পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। আবার ১৯৬৭ সালে নয়মাস মন্ত্রী ও তিনমাস মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি প্রায় ১৫ জন সহকর্মী লইয়া পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করায় কংগ্রেসের শক্তি বাড়িল। সাধারণ লোকে তাঁহার নিকট হইতে দেশের ও জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতিমূলক কার্য্য আশা করিতেছে।

হরিয়ানার নূতন মুখ্যমন্ত্রী

গত ২০শে মে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার উপস্থিতিতে চৌধুরী বংশীলাল উত্তর ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্থির হইয়াছেন। তিনি বয়সে তরুণ তবে রাজনীতিতে তাঁর দক্ষতা আছে। হরিয়ানা রাজ্যে কংগ্রেসদল বিধানসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়াছে। কাজেই নূতন মন্ত্রীসভা দীর্ঘস্থায়ী হইবে আশা করা যায়।

নেতাজীর তরবারী—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত একটী ৪ ফুট লম্বা তরবারী গত ১০ই মে কলিকাতা এলগিন রোডস্থ নেতাজী ভবন হইতে চুরি গিয়াছিল। সম্প্রতি তরবারী খানি একটী আলকাতরার পিপার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তরবারীটী অধিক মূল্যবান ধাতুতে নির্মিত নয় বলিয়াই বোধ হয় চোর তাহা লইয়া যায় নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে এই তরবারী অমূল্য! জনসাধারণ আবার তরবারীটি নেতাজী ভবনে দেখিতে পাইবে।

সিনেমা ধর্ম্মঘট—

সিনেমা কর্ম্মীদের সহিত মালিকদের বিরোধের ফলে সকল সিনেমা ৮৪ দিন বন্ধ থাকার পর গত ৪ঠা জুন হইতে কিছু কিছু সিনেমার দরজা খুলিতেছে এবং আশা হয় ধর্ম্মঘট শেষ হইয়া অচিরেই সকল সিনেমা হলের দরজা খুলিবে। সিনেমা কর্ম্মীরা একেই সাধারণতঃ কম বেতন পায় তাহার উপর প্রায় তিনমাস বেকার থাকার ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা চরমে উঠিয়াছিল। কাহার দোষে ধর্মঘট হইয়াছিল সে কথা বিচারের প্রয়োজন নাই। মালিকরা সিনেমা হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, কাজেই যাহারা তিনমাস বেকার ছিল, তাহাদের বেকারকালীন বেতন সম্বন্ধে যাহাতে সুবিবেচনা হয়, আমরা সরকারী শ্রমবিভাগকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে আবেদন জানাই।

বঙ্কিম চন্দ্র সেন—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র সেন গত ৯ই জুন রবিবার সকালে ৭৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রে তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হইয়াছিল। কিছুদিন ললিতমোহন গুপ্তের হিন্দুস্থান বাংলা দৈনিকে কাজ করার পর, তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং বহুদিন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ট্রাম-দুর্ঘটনায় তাঁহার একটী পা নষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরও প্রায় ২০ বৎসর তিনি আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল এবং বহু কাল যাবৎ লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার ধর্মবক্তৃতা শুনিত। তাঁহার দুই পুত্র ও চার কন্যা বর্ত্তমান। তিনি কয়েকখানি ভাল গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিমলকুমার সুর

রাষ্ট্রগত বিচারে আষাঢ় মাস একটি দুর্য্যোগের মাস। রবি মঙ্গল পরস্পর অত্যন্ত সমীপবর্তী হয়ে প্রজাপতি ও বরুণ কর্তৃক তপ্ত। রবি রাজসরকারের কারক এবং মঙ্গল শৌর্য্য বীর্য্য ভূমি ইত্যাদির কারক। কাজেই কতকগুলি রাজসরকার ওলট পালট হবার অবস্থায় পতিত হবে। নানাভাবে হঠাৎ বিপর্য্যয় দেখা দেবে। গুপ্ত চক্রান্ত ও শত্রুতার জন্য সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। বহু রাজশক্তি নানান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সন্দেহ নাই। বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের রবি মঙ্গলের উপর গুপ্ত স্নেহ দৃষ্টি থাকাতে অনেক দোলন বা আন্দোলনের পর স্থিতি সূচক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে। সাধারণ হিসাবে এই মাসে অনেক কিছু Liquid Staff যে অর্থাৎ অনিশ্চয় অবস্থায় থাকবে। এই মাসে ভাল আশা করা মানে আগে তার উপযুক্ত মাশুল দেওয়া। তাও পরে যা লাভ হবে মাশুলের কতখানি উশুল হবে তাহা সময়সাপেক্ষ। এই মাসে পুলিশ শক্তি ও মিলিটারী শক্তির তৎপরতা খুবই বাড়বে।

শুক্রগ্রহ যে পরিস্থিতিতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে মনে হয় অনেক আমোদ-প্রমোদের স্থানে অনেক ঝঞ্ঝাটই দেখা দেবে। যাঁদের কোন ভোগ বিলাস বা কোন নেশা আছে তাদের সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। অনেকের অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদির নাশ বা ক্ষতি দেখা যায়। প্রেম বা প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে হঠাৎ অনেক বাধা বিপত্তি এসে পড়বে।

Puclic কারক চন্দ্রগ্রহ একাকী পরিক্রম করায় public-এর নিকট হতে সংঘবদ্ধ উৎসাহ বা কর্মসূচী পাওয়া যাবে না। খেই-হারা আলোড়ন হতে পারে এই পর্য্যন্ত।

এখন ব্যক্তিগত হিসাবে প্রতি মাসের জাতক জাতিকার আষাঢ় মাসটি কেমন যাবে দেখা যাক।

আগে বলেছি এবং এখনও বলছি, মাসফল রবি গ্রহকে কেন্দ্র করে করা হয়। কিন্তু চন্দ্র ও লগ্ন হতেও এই ফল আংশিক মেলে। কাজেই যাঁহারা নিজেদের লগ্ন বা জন্ম রাশি (অর্থাৎ যে রাশিতে জন্মকালীন চন্দ্র থাকে) জানেন তাঁহারা এই ফল লগ্ন ও চন্দ্র থেকে মিলিয়ে দেখবেন।

দ্বাদশটি রাশির নাম আগেই বলেছি। কাজেই তার পুনরুল্লেখ করলাম না। এখন আষাঢ় মাসের ফল শুনুন।

যাঁদের বৈশাখ মাসে জন্ম, বা যাঁদের জন্ম লগ্ন বা জন্ম রাশি মেষ তাঁদের আষাঢ় মাস এই রকম যাবে।

কর্মে উদ্যম ও উৎসাহ বাড়বে, এবং কর্মক্ষেত্রে প্রাধান্য বা প্রসারতাও সম্ভব। জনগণের সহিত কর্মসূত্রে অধিক সংশ্লিষ্ট হবার যোগ রয়েছে। ঘাড়ে শীঘ্রই গুরু দায়িত্ব এসে পড়ছে। তার জন্য irritation বোধ হওয়া সম্ভব। টাকা কড়ি অনেকটা আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয়িত হবে। স্বামীর বা স্ত্রীর শরীরটা হঠাৎ বেয়াড়া হতে পারে। বিশ্রাম বা relaxation অনেকটা উপকার করবে। ছোট খাটো ভ্রমণে বা পথি মধ্যে হঠাৎ অনর্থ-ঘটতে পারে। চিঠি পত্র উদ্বেগ-পূর্ণ খবর আনতে পারে। সহি সাবুদ দেখে শুনে করাই ভাল। সন্তানের স্বাস্থ্য মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বেশী খারাপ হতে পারে।

যাঁদের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম বা যাঁদের জন্ম লগ্ন বা জন্ম রাশি বৃষ তাদের আষাঢ় মাসের ফলাফল :—

অনেক পাকা সুযোগ সুবিধা যা পেয়ে আসছিলেন সেগুলি কমতে থাকবে। বরং ব্যয় বাহুল্য এসে পড়ে

কর্ম্মে দিগদারী দেখা দিতে পারে। এ মাসে আপনার ব্যয় প্রচুর, কতকটা হঠাৎ বিধ্বস্ত করার মত। ছোট খাটো ভ্রমণের সুযোগ পেলে ছাড়বেন না। ভাই বোনের কারুর কিছু সুবিধা হতে পারে। সন্তান সংক্রান্ত ঝঞ্ঝাট মাঝে মাঝে ভোগ করতে হবে। তবে সাধারণ হিসাবে এতকাল সন্তান বিষয়ক যে অসুবিধা অশান্তিগুলি চলছিল, তার শতকরা ৫০ ভাগ কমে যাবে। বিদ্যালাভ বা কোন প্রকার সাধনার বাধাও অনেকটা কমে যাবে। বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। যদি ঘর বাড়ির জন্য খরচ করতে হয়, তা করবেন, বেকার যাবে না। খাওয়া দাওয়া ধরাকাটে রাখা ভাল নচেৎ পেটের জন্য মধ্যে মধ্যে ভুগতে হবে।

যাঁদের আষাঢ় মাসে জন্ম বা যাঁদের জন্ম লগ্ন বা জন্ম রাশি মিথুন তাদের আষাঢ় মাসের ফল এই :—

কঠিন পরিশ্রম করুন এবং নিষ্ঠার সহিত কাজকর্ম্ম করুন, আয় বৃদ্ধি হবে এবং ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। উদ্যম, উৎসাহ যত বাড়াবেন, ততই ভাল। সাংসারিক ঝামেলা কমছে বটে, তবে এখনও মধ্যে মধ্যে পারিবারিক কারণে উদ্বেগ অশান্তি না ভোগ করে উপায় নাই। মা'র সম্বন্ধে এ মাসটা তেমন ভাল নয়। পতি বা পত্নীর তেজস্বিতা, প্রতিষ্ঠা ভালই থাকবে। সন্তানদের জন্য অনেক ব্যয় করেছেন বলে মনে হয়। এবার কিছু কমবে। কিন্তু শনি ঠাকুর যেমন এগিয়ে আসছেন, তাতে মনে হয় সন্তানদের বিষয় দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তা দুইই বাড়ার পথে, লেখাপড়ায় মন দিন, তবে অনেক খেটে খুটেই এ সব ব্যাপারে কোন আশা রাখবেন। ফাঁকির দিন আর আপনার নাই। এখন ঝাঁকি দিয়ে কাজ করা দরকার। তবে দুটো ফুল কুড়াতে পারবেন। অর্থনাশ কিছু আছে। অর্থ কারণে উদ্বেগ থাকবে সন্দেহ নাই, এবং মধ্যে মধ্যে মোটা খরচও হবে; কিন্তু আপনার ঠিক আটকাবে না।

কর্ম্মে দায় দায়িত্ব চলবে। কর্ম্ম প্রসারতার দিকে লক্ষ্য রাখবেন, গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন না। কর্ম্মই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে এবং প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে।

যাদের শ্রাবণ মাসে জন্ম বা যাঁদের জন্মলগ্ন বা জন্ম রাশি কর্কট তাঁদের আষাঢ় মাসের ফলাফল এইরূপ :—

জ্ঞাতি-আত্মীয়ের ঝামেলা অনেকটা কমে আসছে! কিন্তু তাঁদের জন্য ব্যয় এখনও কিছুকাল চলবে। পড়া-লেখা, কাজকর্ম্ম এ মাসটায় সুবিধাজনক নয়। সন্তানদের কারণেও অনেক ব্যয় চলবে এবং তাদের কোন সুব্যবস্থা করতে হলে অনেক বেগ পেতে হবে। সাংসারিক দায়দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে এসে পড়ছে, বেশ কিছুকাল চলবে। সাংসারিক অবহেলা করলে অধিক অসুবিধায় পড়বেন। কাজেই নিত্য routine অপরিহার্য। পিতা মাতার শরীরও প্রায় ভাঙতে বসলো। তাঁদের দায়দায়িত্ব দুশ্চিন্তা কম থাকবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে আপনারও দায়-দায়িত্ব এসে পড়লো অনেক। কয়েক বৎসরই চলবে। ধৈর্য্য হারাবেন না। যত সংযত হয়ে কাজ চালাতে পারবেন, ভবিষ্যতে লাভ ততই বেশী। এ মাসে আপনার বিবাহের যোগ বেশী। প্রণয়-সাফল্যও আশা করা যায়। আপনার আলাপ-পরিচয় এ মাসে বাড়ার কথা। টাকা-কড়ি অত্যন্ত ব্যয় হবে।

যদি আপনার ভাদ্র মাসে জন্ম হয় বা জন্মলগ্ন, জন্মরাশি সিংহ হয় তা'হলে আপনার আষাঢ় মাসের ফল এইরকম :—

আপনার আয় বাড়বে। উদ্যম নিয়ে কাজ করলে কৃতকার্য্য ও লাভবান্ হবেন। অর্থের দুশ্চিন্তা যা এতদিন ভোগ করে আসছিলেন, এবার আস্তে আস্তে শতকরা ৫০ ভাগ কমবে। আপনার ভ্রাতাভগ্নীর স্থানটা সুবিধাজনক হলো না। কারণ তাদের এবার দায়দায়িত্ব এসে পড়ছে। আপনার শত্রুরা এবার মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করবে, এতদিন তারা মরে পড়েছিল। মাতুল বংশও আস্তে আস্তে উঠবে। আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য বা স্বাধীন বৃত্তির সুবিধা সুরু হবে। এবং কয়েক বৎসর চলবে। মধ্যে মধ্যে মোটা মোটা টাকা অবশ্য বেরিয়ে যাবে। ব্যয় যাই হোক্, আয় ভালই হবে, এবং প্রতিষ্ঠা বাড়বে বই কমবে না।

যাঁদের আশ্বিন মাসে জন্ম বা যাঁদের জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি কন্যা তাঁদের আষাঢ় মাসের ফল এই :—

আপনার অনেকটা দুশ্চিন্তা কমলো বটে, কিন্তু ঠিক্ জানা গেল না। টাকাকড়ির দুশ্চিন্তা বাড়তে চললো। সন্তান, বিদ্যা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বাধাবিপত্তির সৃষ্টি এবার সুরু হলো। আপনিও এবার অনেক ভুল কাজ করে পস্তাতে পারেন। শত্রুর জারিজুরি এবার কমবে। আপনি

এখন কর্ম্মময় মাসে এসে পড়েছেন। পেটের অসুস্থতা মধ্যে মধ্যে দেখা দেবে। সতর্কতা অবলম্বন না করলে কোন রোগ chronic patternএর হতে পারে।

যাঁদের কার্ত্তিক মাসে জন্ম বা যাদের জন্মলগ্ন বা জন্ম-রাশি তুলা তাঁদের আষাঢ় মাস এই রকম যাবে :—

আয় ভালই হবে। ধর্ম্ম বা তীর্থপর্য্যটনে ঝোঁক থাকলে এই সময়টা কাজে লাগাতে পারেন। আপনার দুশ্চিন্তা দায়দায়িত্ব আসছে। সংসার সম্বন্ধে দেখশুনা করলে এদিকটা কতকটা গুছিয়ে নিতে পারবেন। আপনার সন্তানেরা কতকটা অশান্ত হয়ে পড়বে। বন্ধু দ্বারা লাভবান্ হতে পারেন।

আপনার স্ত্রী বা স্বামী কাজের চাপে বা ঘূর্ণিপাকে আড়ষ্ট বোধ করতে পারেন, অর্থাৎ স্বাধীন কর্ম্মধারা কিছু ব্যাহত হবে। আপনার আয় খারাপ দেখিনা। ব্যয়ের মাত্রা আগের চেয়ে কিছু কমতে পারে।

যদি আপনার অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম হয় বা যদি জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি বৃশ্চিক হয় তা'হলে আষাঢ় মাস এই রকম যবে : কর্ম্মে অনেক ঝঞ্ঝাট অশান্তি যাবে। আপনি নিজে অনেক দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলবেন এবং নিজেকে বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যাবেন। পিতার পক্ষে সময়টা ভাল নয়। মাতুলদের অনেক ঝঞ্ঝাট ভোগ হবে। স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। জ্ঞাতি-আত্মীয়ের চিন্তা বেশী হতে পারে। ছোট-খাটো ভ্রমণের সুযোগ পেলে করে নিতে পারেন। আয়ের জন্য আপনার উদ্বেগ রয়েছে, এবং আপনার ব্যয়ের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে চলেছে।

আপনার যদি পৌষ মাসে জন্ম হয় বা যদি আপনার জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি ধনু হয় তা'হলে আষাঢ় মাস আপনার এইরকম যাবে। আপনার ভাইবোনেদের এবার সুবিধে হবে। আপনার কর্ম্মচিন্তার শতকরা ৫০ ভাগ লাঘব হবে। আপনি ব্যবসায়ী হলে, ব্যবসায়ে ভাল কাজ পেতে পারেন। ভাল chance এলে ছাড়বেন না। ধর্ম্মে ঝোঁকটা ভালই আছে। এটা বাড়িয়ে যান। কাজের পিতা সংক্রান্ত যে চাপ ছিল তা কমতে থাকবে।

আপনার যদি মাঘ মাসে জন্ম হয় বা আপনার জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি যদি মকর হয়, তা'হলে আষাঢ় মাসের ফল জানবেন এইরকম : বিবাহের যোগাযোগ প্রবল। বিবাহে সুখীও হতে পারেন। টাকা পয়সার চিন্তায় মাথা গরম করবেন না। এই বিষয়ে মোটামুটি আপনার একটা soundness আছে। ভাগ্য গড়ায় দুশ্চিন্তা করে লাভ কি? বাধা ত অনেকটা অপসারিত হল। বিদ্যার্জ্জন সুবিধা হবে। পরিশ্রম করুন ফল পাবেন। জ্ঞাতি-আত্মীয় মারফৎ সুখসুবিধা পাবার এখনও সময় হয়নি সাংসারিক অসুবিধা এই মাসটা চলবে। কয়েকজন বন্ধুর ব্যবহারও মনঃপূত হবে না। আপনার মাতুলদের উপর হঠাৎ অনেক ঝঞ্ঝাট এসে পড়ছে।

আপনার যদি ফাল্গুন মাসে জন্ম হয় বা জন্মলগ্ন বা জন্ম-রাশি কুম্ভ হয়, তাহলে আষাঢ় মাস কেমন যাবে শুনুন :

আপনার বিক্রম প্রতিষ্ঠা বাড়বে। সদ্‌ভাব ও সাধুভাব আপনার বেশী করে আসতে থাকবে। ধর্ম ও ভাগ্য দুই বাড়াতে পারবেন। আপনার মাথা মাঝে মাঝে গরম হয়ে পড়বে। ধীরতা যত রাখতে পারেন ততই ভাল। আপনার মোটা খরচ চলতে থাকবে।

ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে আপনার Interest বাড়বে। কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাবার যোগাযোগ আছে। ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটা ভালই।

আপনার যদি জন্মমাস চৈত্র হয় বা জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি মীন হয় তাহলে আষাঢ় মাস আপনার এইরূপ যাবে। গুরু দায়িত্ব যা এতদিন মাথায় চেপে বসেছিল তা অনেকটা কাটল। এখন আপনি প্রয়োজন হলে লাঠি ঘোরাতে পারবেন। আয় আপনার ভালই হবে। বিদ্যা, বুদ্ধি ও সন্তান সংক্রান্ত শুভ ফল পাবেন। এখনও আপনাকে উদ্যমের সহিতই কাজ করে যেতে হবে, নচেৎ বে-কায়দায় পড়ে যাবেন। সাংসারিক পারিবারিক বহু শুভাশুভ ঘটনা ঘটতে পারে। গৃহবাটীর ব্যাপারে কোন সুবন্দোবস্ত করতে হলে আপনাকে এখনও বেশ খানিকটা চেষ্টা করতে হবে। মধ্যে মধ্যে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। আপনার গৃহে বহু বন্ধুবান্ধব বা অতিথির সমাগম হতে পারে। আপনার ভ্রাতা ভগ্নীদের মধ্যে কেহ নূতন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে যাচ্ছেন। পতি বা পত্নীর ব্যাপারে উদ্বেগ চলবে, যদিও কিছুটা হ্রাস পাবে দেখছি ব্যবসায়ী হলে, অনেক যোগাযোগ আসবে। কেমন ভাবে সুযোগটা নিতে পারবেন, তা আপনার হাতে।

——

চাঁদেরে বাসিয়া ভালো

গীতি সেনগুপ্ত

চাঁদ তার আলো ভুবনে ছড়ালো
ভরে গেলো মোর আঁখি।
সে আলোর 'রাণী তার আলো খানি
পরাণে নিয়েছি মাখি।'

সুদূর আকাশে চাঁদ রোজ হাসে
দেখে আমি দিশাহারা।
তার আগমনে সাগরে কাননে—
দিকে দিকে পড়ে সাড়া।

কোথা সে আঁধার শুধু চারিধার
ছুটেছে আলোর বান—
সবারে শোনায় রাতের বীণায়
ঘুম পাড়ানীর গান।

সেই গান শুনে চলি জাল বুনে
রঙিন স্বপ্ন কত।
ছিল ব্যথা প্রাণে, তার মধু গানে
হল সব অপগত।

রোজ দেখি তারে, তবু বারে বারে
দেখিবার সাধ জাগে,
বুঝিনাতো কেন এ বিলাস হেন
কেন এত ভালো লাগে।

চাঁদ মোরে টানে কি জাদু যে জানে
আছে তার মায়া কি যে!
তারে দেখে দেখে আমি দূরে থেকে
ভালবেসে ফেলেছি যে।

'কবে কাছে যাবো.' 'তারে কাছে পাবো,'
ভাবি বসে সারাদিন,
পারি না ভাবিতে এই পৃথিবীতে
আমি আছি চাঁদ হীন।

শুধু অকারণে আমি মনে মনে
তার সাথে কথা কই,
সাঁঝবেলা ধরে শুধু তার তরে
উন্মুখ হ'য়ে রই।

একদিন শেষে চাঁদ বলে হেসে
"শোনাবো আমার গান—
এসো এই পারে শোনাবো তোমারে,"
দুলে ওঠে মোর প্রাণ।

এ যে অভাবিত, আমি পুলকিত,
এ কী সুধা ঢেলে দিল!
মনে ভাবি তাই আর কী বা চাই
এমন রত্ন পেলে।

কিন্তু সেথায় হল নাতো হায়
গিয়ে মোর গান শোনা।
তার কাছে বসে সুরের পরশে
জীবন হল না সোনা।

চোখে লাগে ধাঁধাঁ পদে পদে বাধা
পারিনা তো কাছে যেতে,
হায়, ক্ষণে ক্ষণে মোরে অকারণে
ব্যথা শুধু হ'ল পেতে।

আকাশের পারে প্রতিদিন তারে
শত তারা ঘিরে রয়,
জানি আমি জানি— সে আলোর 'রাণী'
মোর কী বা পরিচয়!

সহজেই তাই বুঝি নাহি পাই
মোর আলো নেই বলে,
তবু কী আশারে যাই বারে বারে
বারে বারে আমি চলে।

জানি না তো কবে এ সফল হবে
তাহারে করিব জয়
না-ই থাক্ আলো, তারে বাসি ভালো
সে কি মোর আলো নয়?

পারি না তো আর মানিয়াছি হার
কী ব্যথা যে বুকে বাজে!
আলো নেই যার বুঝেছি তাহার
এ বিলাস নাহি সাজে।

মিছে কাল গোনা হলো না তো সোনা
কাছে বসে তার গান।
তবু মোর প্রাণে আনন্দ আনে
তার সেই আহ্বান।

মনে থাক্ ক্ষোভ, করিবো না লোভ
বাড়া.ত আর ব্যথারে
কিছু নাহি চাই দূরে থাকি তাই
বেঁধে রাখি মনটারে

যেই সুখ হায় মন শুধু চায়
নেই তাতে বেদনা রে
সেই সুখ পেতে নীরবে নিভৃতে
ভালোবেসে যাবো তারে।

হেথা আমি পড়ে ধরা আলো করে
চাঁদ থাকে বহুদূরে
যতটুকু আলো আমারে বিলালো
তা-ই থাক আঁখি জুড়ে।

চেতনা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পূর্ণ রয়েছে জীবন-পাত্র
বিচিত্র অমৃতের স্বাদে
আপনার ধনে লহগো লুটিয়া
নাহি কাজ পরমাদে।
অমূল্য রতনে ফেলি,
'নাহি নাহি' রোল তুলি,
দীনতার ছাপ নিয়ে
কেন মিছে হা হুতাশ!
আঁধার হয়ো না আগে;
জীবনে জীবন যোগে—
যাহা পাবে তাহাই মধুর
অমৃতের পূর্ণ বিকাশ।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

শ্রীজ্ঞান

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গেয়ে গেছিলেন—"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী...।" তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণ তাই আমরা বারে বারে পাই।—পৃথিবী যে তার সেই আদিম হিংসাকে ভুলতে পারে নি, বিশেষ করেই মনে রেখেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়েই নয়, নানা রকম ঘৃণিত হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েও। যখন এই রকম জঘন্য হত্যা সংঘটিত হয়, তখন সাধারণ মানুষ হতবাক্ হয়ে যায় মানব মনের এই বিকৃতি, এই পশুভাবের পরিচয় পেয়ে। অপরাধী হয়ত কখনও ধরা পড়ে শাস্তি পায়, আবার কখনও পায় না—মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু আবার এই রকম ঘটনা ঘটে।

এই সেদিনই ঘটে গেল এইরকম একটা ঘটনা যা সমস্ত পৃথিবীকে আলোড়িত করে তুলল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর রবার্ট কেনেডি নিহত হলেন নির্মম ভাবে সকলের চোখের সামনেহত্যাকারীর গুলিতে। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর লস এঞ্জেলিস-এ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী সেনেটর রবার্ট কেনেডির এই হীন হত্যা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয়, সারা বিশ্বের কলঙ্ক। কিন্তু এই কলঙ্কই লেপন করে চলেছে বারে বারে অমানুষ হত্যাকারীর রক্তাক্ত হাত! এর কি শেষ নেই?

রোমান সেনেটের মধ্যে জুলিয়াস্ সিজার নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিলেন, যীশু খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে এক হীন হত্যা সংঘটিত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহান প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন হত হয়েছিলেন আততায়ীর গুলীতে, বিশ্বের মহান্ নায়ক মহাত্মা গান্ধীকে প্রার্থনা সভার প্রাঙ্গণে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল, সাম্যবাদী নেতা ট্রটস্কিকে জন্মভূমি থেকে দূর বিদেশে নির্মমভাবে নিহত করা হয়েছিল মতবিরোধের জন্য, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডিও নিহত হয়েছিলেন অদৃশ্য হত্যাকারীর গুলীতে! আরও কত যে এই রকম নির্মম হত্যা সংঘটিত হয়েছে তার হিসাব নেই। কিন্তু মানুষ কি এ সবই বারে বারে ভুলে যাবে? এর কি কোন প্রতিকার হবে না? বারে বারে নৃশংস, নির্মম হত্যাকারী মহান প্রাণের এই রকম মৃত্যু ঘটিয়ে মহৎ জীবনের ওপর আচম্বিতে ঠেলে দেবে কালো যবনিকা? মানুষ কি কোনও দিনই তার তথাকথিত সভ্যতার মুখোশ খুলে সত্যকার সুসভ্য মানুষে পরিণত হবে না?—এ প্রশ্ন আজ নিশ্চয়ই সভ্য, সুস্থ, সু-নাগরিকদের মনে জাগছে। কিন্তু এর প্রতিকারের উপায় কেউই খুঁজে পাচ্ছে না! আইন করে, দণ্ড দিয়ে এর স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব নয়। হত্যার মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দেবার এই আদিম প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা পেতে হলে তার মনের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। তার মানসিক গঠনকে বদলাতে হবে—মনকে শান্ত, সুস্থ, সুন্দর করে তুলতে হবে। এর জন্য অনুশীলন দরকার—দরকার অনুকূল পরিবেশেরও। ছোটবেলা থেকেই যদি বালক-বালিকাদের শান্ত, সুন্দর

পরিবেশে মানুষ করা যায়; আদর্শ শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তোলা যায়, সুস্থ, সতেজ, স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বড় হয়ে সুনাগরিকই হবে। উচ্ছৃঙ্খল, অসভ্য ব্যবহার তারা কখনও করবে না। অমানুষিক নৃশংস ব্যবহার তাদের ধাতে সইবে না।

প্রতি দেশেই, বিশেষ করে আমাদের মত অনগ্রসর দেশের বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ও পরিবেশের প্রতি যদি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতে এর বিষময় পরিণতি সমাজ জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে তুলবে। তুলবেই শুধু নয়, আজ সমাজ জীবন যে বিপর্য্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রমাণ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে! অভিভাবকদের এবং কিশোর-কিশোরীদেরও এ বিষয়ে চিন্তা করবার আজ সময় এসেছে।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঝলকে ঝলকে গ্যালন গ্যালন জল কূপের ভিতর পড়ছিল। কূপের গায়ে লাগানো গুপ্ত জলের নল খুঁজতে খুঁজতে নৃপেন দেখল সেই অল্প সময়ের মধ্যেই এ পরিমাণ জল জমেছে যে তাদের জুতার তলা ডুবে গেছে।

কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর নলের মুখটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ওটা এমনভাবে গাঁথা যে কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। দেবেশ প্রথমে নলের ভিতর রুমাল গুজে দিল দেবেশ তার কোটের খানিকটা ছিড়ে নিয়ে নলের ভিতর দিল। কিন্তু পাম্পের এক ধাক্কায় সে সমস্তই বাহির হ'য়ে এল।

হতাশ হয়ে দেবেশ বলল—"শেষে ইঁদুরের মতই জলে ডুবে মরতে হল।"

নৃপেন বললেন—"আগেই নিরাশ হই কেন? এসো বাইরে যাবার চেষ্টা করি। নীচ থেকে ঠেলে কি মুখের পাথরখানা সরাতে পারবো না? এসো দেখি—উপরে উঠি।"

দুজনে তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। সেত সিঁড়ি —কাঠের ছোট একখানা মই। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ানো চলে না। মইএর উপরে উঠে নৃপেন প্রাণপণে ঠেললেন – তাঁর সমস্ত শরীর অতিরিক্ত পরিশ্রমে ঘামে ভিজে গেল; কিন্তু পাথর নড়ল না। নিরুপায় হয়ে তিনি নেমে এলেন। দেবেশ উপরে উঠে চেষ্টা করল—কোনই ফল হল না। দুইজনে যদি একসঙ্গে ঠেলতে পারত তবে হয়ত পাথরখানা সরানো যেত; কিন্তু সে উপায় ছিল না।

নৃপেন ও দেবেশ মই বেয়ে আবার নীচে নেমে এলো। দেখল নলের মুখে জল পড়ছে ঝলকে ঝলকে—জলের উপর জল পড়ে মূক ইঁদারাকে ক্রমেই মুখর করে তুলছে—জল জুতা ছাড়িয়ে জানু পর্য্যন্ত উঠেছে। রেডিয়ামের আলোকে দীপ্তিমান্ হয়ে জলের ছোট ছোট ঢেউ কূপের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে।

নৃপেন বললেন "যাক। একটা দায় থেকে তো বাঁচা গেল; আর টর্চটা জ্বালতে হবে না।

দেবেশ হতাশ ভাবে বলল—"তারপর?"

"তারপর আর কি? যেমন করে হোক বেরোতেই হবে। জলে আর কেন দাঁড়াই—এসো মই বেয়ে উপরে উঠি।"

দু'জনে আবার উপরে উঠলো। কিছুক্ষণ চিন্তার পর নৃপেন বল্লেন—"দেবেশ, আমার মনে হচ্ছে পথ পেয়েছি।"

দেবেশ অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। নৃপেন তখন সেই পাথরের গায়ের একটি অতি সরু ছিদ্র পরীক্ষা করছিলেন; ভাল করে দেখে বললেন—"এখান থেকে একটু পাথর কোনো কারণে গুড়ো হয়ে ঝরে পড়েছে। পাথরখানা একটু জখম হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা হয়ত বেঁচে গেছি।"

দেবেশ বলল—"ওইখানে যদি পাথরখানাকে চির ধরিয়ে দেওয়া যায় তা' হলেই ঠেলে সরানো যাবে।"

"আমিও তাই ভাবছি।'

আর কোন কথা না ব'লে পকেট থেকে একটা কার্তুজ নিয়ে নৃপেন কার্তুজটাকে সেই ছিদ্রপথে ঢুকাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কার্তুজটা ঢুকল বটে, কিন্তু পাথরের মধ্যে একেবারে ডুবে গেল। নৃপেন বললেন—

"দেবেশ, নীচে থেকে একটু কাদা আগে দেখি।

সামান্য একটু চাই। একখানা চায়ের চাম্‌চেতে যত-টুক্‌ ধরে সেইটুক্‌ হলেই চল্‌বে।'

দেবেশ চারদিকে চেয়ে দেখল যে কাদা দেখা যায় না। জল তখন এত বেশী হয়েছে যে সবই ডুবে গেছে। সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকবারও তখন আর উপায় নাই। দেবেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। নৃপেন বলল—

"কৈ পেয়েছ ?"

অকস্মাৎ দেবেশের হাত মইয়ের একখানা কাঠে পড়ামাত্র, হাতে চট্‌চটে কি যেন লাগল। সে দেখ্‌ল, সেই কাঠের গায়ে সামান্য একটু কাদা লেগে রয়েছে। দেবেশ তাড়াতাড়ি কাদাটুকু নিয়ে নৃপেনের হাতে দিল। পাথরের সেই সরু ছিদ্রের গায়ে কাদা মাখিয়ে নৃপেন যখন কার্তুজটা এঁটে দিচ্ছিল, তখন সহসা সেটা সরে গিয়ে নীচে জলের মধ্যে পড়ে গেল। নৃপেন পকেট থেকে আর একটা কার্তুজ নিয়ে ছিদ্রের মুখে আঁটতে সুরু করল। জল তখন এতই বেশী হয়েছে যে, মই এর নিম্নাংশ ডুবে গিয়ে দেবেশের জুতা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দিল। জল ক্রমেই উপরে উঠতে লাগল। ক্রমে দেবেশের পা ডুবল। জানু ডুবল,—শেষে জানু ছাড়িয়ে উরুতে লাগল। দেবেশ বুঝল যে এখন অধৈর্য্য হলে সব কিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। যদি এখন তাড়াতাড়িতে নৃপেনের হাতের কার্তুজটা পড়ে যায়, তা'হলে আর একটা লাগাতে না লাগাতেই যে জল তাদের ডুবিয়ে দেবে। সে নীরব হয়ে রইল।

কার্তুজ অবশেষে ঠিক মত লাগল দেখে নৃপেন মই বেয়ে দু'তিন পা নীচের দিকে নেমেই একটু অস্ফুটস্বরে বলল—

"তাহলে দেখছি আর বেশী সময় নেই! দেবেশ, হয় এইবার না হলে সব শেষ। একবার মনে প্রাণে ভগবানকে ডাক যেন বিফল মনোরথ না হই।"

কূপের জল বৃদ্ধি পেয়ে তখন দেবেশের কাঁধ স্পর্শ করেছিল। নৃপেন যতটা পারল নীচের দিকে নামল এবং ধীর অকম্পিত হস্তে রিভলবারটি ধরে বলল—"দেবেশ, তোমার টর্চটা জেলে পাথরের গায়ে কাদার দাগের উপর আলো ফেল। কার্তুজটায় গুলি মেরে আমি পাথরখানা কাটিয়ে ফেলতে চাই। যদি পারি তবেই বাঁচবো—নতুবা এই শেষ। গুলিটা যদি ঠিক ছিদ্রের মধ্যে না ঢোকে, তবে পাথরে লেগে কোথায় যে ছিট্‌কে পড়বে তা জানিনে। হয়ত আমার গায়েও লাগতে পারে, তোমার গায়েও লাগতে পারে—কিম্বা দু'জনকেই শেষ করতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া তো আর পথ নেই। সাহস কর। টর্চটা ঠিক মত ধরে রাখো।"

নৃপেন কাদার সেই ছোট দাগটুকুর উপর নিশানা করে নিলেন। পর মুহূর্ত্তেই ইন্দারার সেই বদ্ধস্থানটুকুকে মেঘ গর্জ্জনের মত শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ আর্তনাদ করে উঠল। তার হাতের টর্চটা জলে পড়ে গেল।

নৃপেনের লক্ষ্য বৃথা হল। গুলিটা এক চুলের জন্য কার্তুজে না লেগে পাথরের গা ঘেসে ছিটকে গেল।

গম্ভীরস্বরে নৃপেন বললেন—"দেবেশ, আবার টর্চটা জ্বালো। আমি আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।"

দেবেশের আঙুল দিয়ে তখন ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছিল। গুলিটা ঠিক মত না গেলে দেবেশের আঙুল ছুঁয়ে গিয়েছিল। আঘাত লেগে এমন যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, তার আঙুলটা যেন ছিঁড়ে পড়বে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার অবসর তার ছিল না। কূপের মধ্যে জল তখন তার কর্ণমূল স্পর্শ করেছিল। দেবেশ দৃঢ় হস্তে টর্চটি ধরে আবার আলো ফেলল।

নৃপেন আবার রিভলবার তুলে ধরলেন। টর্চের আলোতে লক্ষ্যস্থানটি আবার ভাল করে দেখে নিলেন। পরক্ষণেই রিভলবারের ঘোড়া টিপতেই এক সঙ্গে দুইটী গুলির আওয়াজ শোনা গেল। নৃপেন আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন "ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে, পাথরখানা ভেঙ্গেছে।"

নৃপেন ও দেবেশ তখন আবার সেই পাথরের ভাঙ্গা অংশটি জোড় দিয়ে ঠেলতে লাগল। তাদের দুজনের ভরে মইটা বেঁকে গেল—মট মট করে শব্দ হতে লাগল। শেষে মইটা ভেঙ্গেই গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাথরেরও আধখানা উল্টে গিয়ে অপর অর্দ্ধেকের উপর পড়ল। চক্ষের নিমেষে ইন্দারার মুখের উপর উঠে নৃপেনবাবু ডুবন্ত দেবেশকে টেনে তুললেন।

বাহিরে তখনো পাম্প চলছিল। কূপের জল তখনও ফুলে উঠছিল। নৃপেন ও দেবেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বাউলীর বাইরে এসে মুক্ত বাতাসে দাঁড়ালো। [ক্রমশঃ]

ছুটির ঘন্টায়

চিত্রগুপ্ত

ইতিপূর্বে গত কয়েকটি সংখ্যায় বিজ্ঞানের বিচিত্র-বিধানে বিভিন্ন রাসায়নিক-পদার্থের অভিনব-প্রক্রিয়ার ফলে, রঙ-বদলানোর যে সব আজব-মজার কারসাজির পরিচয় দিয়েছি, এবারেও তেমনি-ধরণের আরো কয়েকটি নতুন-নতুন খেলার কথা বলছি। ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে এ সব কারসাজি দেখিয়ে সবাই মিলে শুধু যে প্রচুর মজা আর আনন্দ উপভোগ করতে পারো তাই নয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের নানান অজানা তথ্য-কৌশল সম্বন্ধেও জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাবে।

আপাততঃ শোনো বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে বিভিন্ন-ধরণের রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, আরো দুয়েকটি আজব-মজার 'রঙ-বদলানোর' কলা-কৌশলের কাহিনী।

Acid বা অম্ল-জাতীয় রাসায়নিক-পদার্থের সঙ্গে Alkaline বা ক্ষার কষায়-জাতীয় কোনো পদার্থের সংমিশ্রণে বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়ায় রঙ-বদলানো সম্ভব হয়, সে কথা তোমরা ইতিপূর্বেই জেনে রেখেছো। কাজেই এবারে তোমাদের রঙ-বদলানোর আগে যে সব কলা-কৌশলের পরিচয় দেবো, সেগুলি অনায়াসেই তোমরা নিজেরা পরখ করে দেখে নিতে পারবে।

তোমরা সকলেই দেখেছো—সচরাচর দোলের মরশুমে বাজারে এক-ধরণের তরল 'ম্যাজিক-রঙ' বিক্রী হয়। এটি সাধারণতঃ লাল-রঙেরই হয় এবং কারো জামা-কাপড়ে সে রঙ ছিটিয়ে দেবার কিছুক্ষণ বাদেই সেই রঙ-লাগানো ভিজা-কাপড়টুকু বাতাসে-রোদে শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লাল-রঙটি কিন্তু ক্রমশঃ বেমালুম অদৃশ্য ও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়—ঠিক যেন কোন মায়াবী-যাদুকরের আজব মন্ত্রবলে ভোজবাজীর কশরতের মতো। এমনটি ঘটে আসলে—বিজ্ঞানের বিধানে…রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে। অর্থাৎ, 'ফিনলপ-থলীন' (phenolphthalien) নামে বিচিত্র একটি রাসায়নিক-পদার্থ আছে, সেটি সাধারণতঃ বর্ণহীন…তবে সোডা চূর্ণ-অর্থাৎ কোনো Alkaline বা ক্ষার-কষায় জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে এলে অচিরেই লাল-রঙের হয়ে যায়। দোলের মরশুমে বাজারে যে 'ম্যাজিক-রঙ' পাওয়া যায়, সেটিও এই উপায়ে তৈরী। পরীক্ষার জন্য, তোমরা বরং সহরের ভালো এবং বড় কোনো ওষুধের দোকান থেকে খানিকটা 'ফিনলপথলীন-সলিউশান' (phenolphthalien solution) আর 'অ্যামোনিয়া' (Amonia) কিনে এনে মিশিয়ে দেখো—তাহলেই বাড়ীতে বসে নিজেরাই এমনি-ধরণের 'ম্যাজিক-রঙ' বানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এই 'ম্যাজিক-রঙ' যতক্ষণ ভিজা থাকবে, ততক্ষণই লাল, রোদে-বাতাসে ভিজা-কাপড় শুকিয়ে গেলেই আবার শাদা ধবধবে হয়ে উঠবে। তার কারণ, বাতাসে থাকে 'কার্ব্বনিক এ্যাসিড' (Corbonic Acid)। ভিজে কাপড় শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই এ্যাসিড লেগে সোডা বা চুনের 'Alkali' টুকু লোপ পায়। কাজেই বর্ণহীন শাদা হয়ে ওঠে। এই হলো,—'ম্যাজিক রঙের' আসল রাসায়নিক-রহস্য।

এছাড়া আরেক রকমের রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার সাহায্যেও 'রঙ-বদলানোর' আজব-মজার কারসাজি দেখানো যায়। সেটি হলো,—'পটাসিয়াম পারম্যানগানেট সলিউশ্যন' আর 'অকসালিক এ্যাসিড সলিউশ্যনের' সংমিশ্রণে। এ দুটি রাসায়নিক-পদার্থও তোমরা অল্প-খরচে সহরের যে কোনো নামজাদা ওষুধের দোকান থেকে অনায়াসেই জোগাড় করে আনতে পারবে। রঙ-বদলানোর এ কারসাজিটির আসল রহস্য হলো,—'পটাসিয়াম পারম্যানগানেট সলিউশ্যন' রাসায়নিক-পদার্থটি গাঢ় বেগুনী রঙের, সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে কারো গায়ে বা জামা কাপড়ে ছিটিয়ে দিলে, সহজে সে রঙের ছোপ উঠে যায় না। কিন্তু সেই রঙের ছোপ লাগানো অংশে যদি খানিকটা 'অকসালিক এ্যাসিড' ছিটিয়ে দাও, তাহলেই দেখবে বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, সেই

গাঢ় বেগুনী রঙের দাগটুকু ক্রমেই মিলিয়ে অদৃশ্য এবং বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আপাততঃ, এ দুটি রঙ বদলানোর কারসাজির কথাই বলে রাখি। আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞানের বিচিত্র কলা কৌশলের আরো কয়েকটি নতুন নতুন মজার খেলার হদিশ দেবো।

ধাঁধা হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। আজব মজার হেঁয়ালী ঃ

দৈত্য নয়, দানব নয়, রাক্ষস বা ভূত প্রেতও নয়··· নিছক কল্পনা বা রূপকথা, কিম্বা যাদুকরের ভোজবাজীর তো নয়ই, নিতান্তই বাস্তব এবং পার্থিব সে! মুখে তার কথা নেই, অথচ শব্দ আছে···হাত নেই, পা নেই— অথচ গতি আছে···দুনিয়াতে সকলেই তাকে দেখে··ভালবাসে···আবার ভয়ও পায় মাঝে মাঝে যখন সে দুরন্ত অবাধ্য হয়ে ওঠে! তাছাড়া সব চেয়ে মজার বিষয় হলো—তার শরীরের চেয়ে মুখটি কিন্তু অনেকখানি বড়। বলতে পারো—এ দুনিয়াতে এমন কি আছে—এই হলো, যার পরিচয়?

রচনা : শান্তনু মুখোপাধ্যায়

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

দূর আকাশে থাকি আমি—
সবাই মোরে চায়।
আকার সহ সামনে এলেই,
সবে পিছু হটে যায়!

রচনা : বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা)

গত মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :

১। আয়না

২।

	১৩	
১২	৫০	১৩
	১২	

৩। বিছানা

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু, নিপু ও খোকা মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), দোলন, পিন্টু ও ফণী সাহা (কলিকাতা), বটুক, শ্যামল, চন্দন, মানসী, প্রতিমা ও নানটু সেন (চাঁইবাসা), পুষ্প, শোভনা, মিতুল, চাঁপা, গোপা, বাসুদেব, প্রভবদেব ও বোপদেব রায়চৌধুরী (নাগপুর). হাসি, শৈলেন, শীতাংশু, হারাণ, শোভনা, হিমাংশু, অলকা ও সুধাংশু (কলিকাতা), জয়ন্ত, সুলতা, বুড়ো ও পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় (ইছাপুর). অমিয়, লতিকা, অশক, সুপর্ণা ও তিলক রায় (কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, লক্ষ্মী, নমিতা, সুনীল, অমিয়, সঞ্জয়, মুরারি ও জয়াদিদি (ভিলাই), ঘনশ্যাম, মৃগাঙ্কমৌলী, সত্যসেবক ও নরেন্দ্র চৌধুরী (কলিকাতা)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), বিপুলানন্দ, শৈলজানন্দ, শ্যামানন্দ, রামানন্দ ও নন্দিনী গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা), অভয়া, আলপনা, কল্পনা, নীলাঞ্জনা, বসন্ত, হেমন্ত ও শ্রীমন্ত ঘোষ (আসানসোল), প্রশান্ত, রবি, কৃষ্ণলাল, ভাস্কর, তিনকড়ি, ভুবনমোহন, অরবিন্দ, অভীক, শমীক ও নিত্যানন্দ (কলিকাতা), লীলা, নীলা, মিলু, ভোলানাথ, উষানাথ, নিশানাথ ও রাধাকান্ত হালদার (কৃষ্ণনগর), কাটু, লাটু, ছোটু ও বাবুন (লক্ষ্মীকান্তপুর), নবীন, বকুল, চন্দনা, পারুল, ছোটন, বাপি ও মণিমালা (কলিকাতা), নীহার, স্নেহময়, সুখময়, পারিজাত ও কঙ্কাবতী রায় (দুর্গাপুর), বিনয়েন্দ্র, বিজয়েন্দ্র, অজয়েন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), অমিতাভ ও মঞ্জুশ্রী সেন রায় (কলিকাতা), জোনাকী বাগাচি, পূর্বপুঠিয়ারী।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

টুটু, নাটু, পাটু ও চন্দ্রিমা চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), ললিত, কুসুম, ইন্দ্রাণী, সবিতা, আশীষ, শোভেন, মৃণাল, আশুতোষ, কৃষ্ণকিশোর, আনন্দমোহন, কৃষ্ণা ও গোবিন্দ লাল বসু (রাঁচী), চিন্ময়োহন, রুমা, উমা, অশোক, শিবানী, বিজয়, অরুণা, আভা ও চিনকু বাগচী (কলিকাতা), অভিজিৎ, রণজিৎ, পম্পা, শম্পা ও পাহাড়ী (কোটাগিরি), নবু, অপু, পুঁটে, ননী, গোপাল ও সন্তু (সোনারপুর), রেণু, কমল, ধীরা, মীরা, রামদেব, জয়দেব ও অনন্তদেব লাহিড়ী (কলিকাতা), কণিকা, মণিকা, দীপঙ্কর, শঙ্কর ও রঞ্জনা সান্যাল (বোম্বাই), চামেলী, বকুল, ইন্দ্রনাথ ও দেবনাথ কুণ্ডগ্রামী (কলিকাতা), অলক (কলিকাতা)।

গল্প

ঘরে বাইরে

বিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহস্বামী রাজীবলোচন শুধু যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই নন, বৈঠকখানার নিয়মিত সান্ধ্যচক্রের আনুষঙ্গিক ব্যয়ভারের দায়িত্বও তাঁরই।

তাই যেকোনও বিষয়ের তর্কে-আলোচনায় তাঁর মতামত রায়-বিশেষ।

সেদিন সন্ধ্যায় আলোচনাটা আবার তুমুল পর্যায়ে উঠেছিল।

ঘনশ্যাম বাগচীর স-তোড় বক্তৃতা যখন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চরমে পৌঁছবার উপক্রম করছিল, ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ একটা বেয়াড়া শব্দ উঠলো—ঠক্।

সব কটা চোখ এক সঙ্গে দৃষ্টি দিল শব্দের উৎসের দিকে।

ডিসের ওপরে শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখেছেন রাজীবলোচন।

ওটা সিগ্‌ন্যাল। হাকিমের যেমন হাতুড়ি ঠোকা। পণ্ডিতের যেমন বেত-আছড়ানো।

গলায় বেধে গেল ঘনশ্যামের বক্তৃতা।

সোৎসুকে সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগলো রাজীব—বাণীর।

রাজীবলোচন বলে উঠলেন: বক্তৃতা দিতে তুমি যে খুব পারো ঘনা,—তা সবাই জানে। কিন্তু না, কথা নয়। কথার তুবড়ি-হাউই অদ্যাবধি আমরা ঢের ফোটাতে শুনেছি। মাঠে-পার্কে, কাগজে-সভায়, অনেক বক্তৃতা শুনেছি। শুধু কথায় আজ আর কিছু হবে না, কাজ চাই—কাজ।

তোড়ের মুখে বেধড়কা বাধা পেয়ে ঘনশ্যাম প্রথমটায় হয়তো একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরিস্থিতিটাকে ভাল করে সমঝে নিয়ে একান্ত অনুগতের মতন এবার সে-ও সায় দিয়ে উঠলো রাজীবলোচনের প্রস্তাবে।

: অবশ্য, তা ঠিক।

উৎসাহের আগুনে সমর্থনের আহুতি পড়লো।

রাজীবলোচন আবার সুরু করলেন: এই ধরো না কেন, আমাদেরই ফ্যাক্টরীর কথা। সেই ধর্মঘট হল, শেষ অবধি মালিকদের সায়ও দিতে হল আমাদের দাবীতে। অথচ গোড়ায় কোন মিঞা কি সাহস করেছিল? আমিই না প্রথম মালিকদের গিয়ে বললাম—

: তুমি বললে?

খেঁকিয়ে উঠলেন কবিরাজ ধনকেষ্ট শাস্ত্রী।

সঙ্গে সঙ্গে রাজীবলোচনের একটা চোখ একটু কুঁচকে উঠলো। কবিরাজের প্রশ্নে তিনি যেন সন্দেহের স্বাদ পেলেন।

জ্বলে উঠে বললেন: না তো কি আমাদের ফ্যাক্টরীতে তুমি সর্দারী করতে গিয়েছিলে কোবরেজ? কেন বলবো না? ন্যায্য কথা বলতে রাজীবলোচন চক্রবর্তী যে খোদ রাষ্ট্রপতিকে অবধি গ্রাহ্য করে না, তা জানো না? সাফ সাফ মুখের ওপর বলে দিলাম—কোটি কোটি টাকা মুনাফা কুড়িয়েছ তোমরা কী করে? গায়ের রক্ত জল করে আমরা খেটেছি তোমাদের জন্য, তবেই না? এখন আমাদের জন্য তার ভাগ উগরে দিতে বুক বড্ড চড় চড় করছে, না? ভালয় ভালয় দেবে তা দাও, নইলে ধর্মঘট ঠুকে দিয়ে তোমাদের অধর্মঘট দিলাম ছেঁদা করে।

: রাজি হল?

: তাই কি হয় টপ করে? চুষে নিতেই শিখেছে, ওগরাতে জানে না। অবশ্য না উগরে পারে কেন আমার সঙ্গে? জোঁকের মুখে নুন ভরে দিলাম।

: নুন?

: হ্যাঁ, নুন। মানে ধর্মঘট। যে যেমন বেয়াড়া জোঁক, তার পোড়ামুখে তেমনিই চোখা নুন ঘষে দিতে হবে তো?

এই কথাটাই ওদের আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মুনাফার টাকাটা শুধু ওদেরই পাওনা নয়, আমাদেরও ভাগ আছে তার মধ্যে, হক আছে।

মিনমিন করতে করতে অনুযোগ করলো মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী জীবনধন: বলি তো রাজুদা। তাতে জবাব কি দেয় জানো?

: কী?

: বলে—চড়া বাজারের জন্য আমাদের ডিয়ারনেস্ দেওয়া হচ্ছে। আবার কেন?

: "কেন" বললেই কেন?

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রাজীবলোচন: অঃ, ডিয়ারনেস দেওয়া হচ্ছে। কী ন'শো—পচানব্বই টাকা ডিয়ারনেস দিস্ রে? কেউ টাকায় দশ পয়সা, কেউ বা পনেরো পয়সা। তাতে কী হয় রে? জিনিসের দাম এদিকে ক'গুণ বেড়েছে তার হিসেব করবে কি? গলদা চিংড়ির দামে আজকাল যে কচুও মেলে না, সেটার কী হবে?

: তাও তো বলি আমরা।

আত্মপক্ষ সমর্থনে তবু বললো জীবনধন।

বিদ্রূপ ব্যাজার ব্যাজার সুরে জেরা ছুঁড়ে দিলেন রাজীবলোচন: শুনে কী জবাব দেন প্রভুরা?

: বলে, ওর বেশী দিতে হলে ওদের লোকসান হয়।

: আর তোমরা অমনি চুপটি করে তাই মেনে নাও, এইতো? বলিহারী যাই তোমাদের!

জীবনধনের দিকে একটা অনুকম্পা মেশানো কটাক্ষ নিক্ষেপ করে একটা বিড়ি ধরালেন রাজীবলোচন। পরমতৃপ্তিভরে সেটাতে গোটাকয়েক ব্রহ্মটান দিতেই সুতো-পট্টিতে আগুন ধরে পটপট শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো বিড়িটা।

কণ্ঠস্থ এক চিমণি ধূম্রকুণ্ডলীকে টিপে টিপে রূপান্তরে মুক্তি দিয়ে বার দুই কেশে নিলেন রাজীবলোচন।

তারপর আবার নতুন দমকে সুরু করলেন: ওসব বলা-কওয়ায় কিস্সু হবে না, কিস্সু হবে না। কাজ চাই, কাজ: ঠিক আমরা যেমন করলুম। দাও দেখি, সবাই মিলে একজোট হয়ে ধর্মঘট ঠুকে। রাজী না হয়ে পথ পাবে না বাছাধনেরা।

ধনকেষ্ট কবিরাজ সায় দিলেন: বিলক্ষণ।

পরিপূর্ণ উৎসাহভরে রাজীবলোচন তেড়ে তেড়ে বলে চললেন: আরে ভাই, অনেককাল ধরে গোটা জাতটা এই জুলুম মুখ বুঁজে সহ্য করেছে। আর নয়, বুঝলে হে, আর নয়—এখন আলটিমেটাম ছাড়ো, শুনিয়ে দাও সিধে বুলি। দেখবে, ঐ যত শিমুল গাছ সব চড় চড় করে তেল হয়ে যাবে।

চক্রুদস্থদের কারও একটা সামান্যতম প্রতিবাদ পর্যন্ত করার সাহস হোল না এহেন কড়া বুলি আর উদাহরণের সামনে। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করাই সার হোল।

খুশিমনে রাজীবলোচন আবার একটা বিড়ি ধরালেন।

সকালে রাজীব-গিন্নি বললেন: ওগো, গবার-মা আর বোধহয় কাজ করবে না।

গবার-মা বাড়ির পুরানো ঝি।

ভ্রূ কুঁচকে রাজীবলোচন জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

গিন্নি জবাব দিলেন: মাইনে না বাড়লে ওর নাকি আর পোষাচ্ছে না।

: এতদিন কী করে পোষাচ্ছিল, শুনি?

: বলছে, এতদিন তবু যাহোক ক'রে ওতেই চালিয়ে নিচ্ছিলো। এখন জিনিস পত্তর সব এমন আক্রা হয়েছে যে—সত্যি বাপু, তখন দশ টাকায় চলেছে বলে কি আজও চলে?

: বটে? তা কী করতে হবে শুনি?

আড়চোখে তাকালেন কর্তা।

সে-চাহনির নিহিত অর্থটুকু বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হল না গিন্নির।

তবুও মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন: তা এই বাজারে সকলেরই যখন দিন দিন মাইনে বাড়ছে, দাওনা বাপু ওকেও দুটাকা বাড়িয়ে।

: ওঃ, দরদ যে আর ধরে না দেখছি!

প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন রাজীবলোচন: তোমারই আস্কারায় ঐ ছোটলোক মেয়েমানুষের এতো বাড় হয়েছে। তা নাহলে—যাক্, বলে দিও ওকে, একটি পয়সাও বাড়াচ্ছি না মাইনে। করতে হয় ঐ দশ টাকাতেই যেমন কাজ করছিল তেমনি করুক। নয়তো দূর হয়ে যাক। ব্যস, আমার এক কথা।

কথাটা শেষ করে ভস্মলোচনের মত গিন্নিকে আর এক একবার নিরীক্ষণ করে নিয়ে রাজীবলোচন ব্যাঙ্কের পাশবই খানায় চোখ বুলুতে সুরু করলেন।

সব কটা জমার অংক ঠিক ঠিক তুলেছে তো?…

—

নেতাজির অন্তর্দ্ধান রহস্য

সবিনয় নিবেদন,

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রাণপুরুষ যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই,—প্রধানতম কিনা তাহা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। যেদিন তিনি দুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিলেন সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায় স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করিয়া কপর্দ্দকহীন অবস্থায় একমাত্র আপন যশ ও চরিত্রবল সম্বল করিয়া তিনি দূর বিদেশে গমন করিয়া অলৌকিক কর্ম সমাধা করিলেন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজের গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের একত্র করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া তিনি ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ করিলেন। বর্ম্মা মালয়ের হাজার হাজার ভারতীয় তাঁর হাতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া দিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিবার জন্য ভারতীয়দের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরাজিত হইল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে পৌছিয়া দিয়া গেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ দান একথা বলিলে হয়ত অসঙ্গত হইবে না।

কিন্তু আজিও নেতাজির জন্মদিন সর্ব্বভারতীয় ছুটি বা আনন্দের দিন বলিয়া রাষ্ট্রনায়কগণ স্বীকার করিতে পারেন নাই। এমন কি তাঁহার অন্তর্দ্ধান রহস্যের সমাধানেও তাঁহারা বিশেষ আগ্রহী বলিয়া মনে হয় না। আজাদ হিন্দ সেনানায়ক কর্নেল হবিবুর রহমান কথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সংবাদ অনেকেই বিশ্বাস করেন না, যদিও শাহ নাওয়াজ খানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারী তদন্ত কমিশন উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদন্ত কমিশনের সদস্য, নেতাজির অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয় নাই এরূপ বলিয়াছেন। ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহ নেতাজি বর্ত্তমানে রাশিয়ার কোন কারাগারে বন্দী জীবনযাপন করিতেছেন এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগী মেজর সত্য গুপ্ত শৌলমারীর সাধু স্বামী সারদানন্দকে নেতাজি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতসরকার বলিয়াছেন স্বামী সারদানন্দ নেতাজি নহেন; কিন্তু সারদানন্দের পরিচয় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। নেতাজির অন্তর্দ্ধান রহস্য কাজেই তিমিরাবৃত হইয়াই রহিয়াছে।

সম্প্রতি লুই. পি. লকনার নামক একজন আমেরিকান সাংবাদিক কর্তৃক সম্পাদিত নাৎসী গভর্নমেণ্টের প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবলসের ডায়েরী (The Goebbells' Diary—Popular Library, New York) হইতে নেতাজি সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। ডাঃ গোয়েবলসের মত পদস্থ জার্মান নায়ক হিটলারের পরে আর কেহই ছিলেন কিনা সন্দেহ। এই ডায়েরীতে ডাঃ গোয়েবেলস্ ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মাত্র দুইজনের নামোল্লেখ করিয়াছেন—গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র। অন্য কোন ভারতীয় নেতার নাম ডাঃ গোয়েবেলসের মনে স্থান পায় নাই। গান্ধীজির সম্বন্ধে ডাঃ গোয়েবেলসের মত অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ ("Gandhi's policies have thus for brought nothing but misfortune to India." "He is a fool whose policeis seen merely calculated to crag India further and further to misfortune"); কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রশংসায় নাৎসী

প্রচারসচিব পঞ্চমুখ ("Bose's appeal has made a deep impression on world public opinion. "The crisis in India can no lorge be denied." "Bose is an excellent work". The propaganda by Bose is gradually getting on the nerves of the British") ।

এই গ্রন্থের আমেরিকান সম্পাদক, যিনি সুদীর্ঘকাল জার্ম্মানীতে বাস করিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনস্থ ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের অধিনায়ক ছিলেন। পণ্ডিত কে, এ, ভট্টের সম্পাদনায় তিনি "আজাদ হিন্দ" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন।···পরবর্ত্তীকালে তিনি জাপানে যান এবং তথায় আমেরিকানদের হাতে বন্দী হন—বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় ("Later he left for Japan and, according to reports, was seized there by the Americans, tried and executed for treason")। এই তথ্য ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। আপনার পত্রিকার মাধ্যমে নেতাজি সম্বন্ধে এই নূতন তথ্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিনীত—
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী
পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি

ভারতবর্ষ কি সত্যই জনসংখ্যার চাপে বিহ্বল ?

সবিনয় নিবেদন,

যা প্রচার চলেছে তাতে এ প্রশ্ন করবার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কে বলবে ভারত জনসংখ্যার চাপে বিহ্বল নয়? জনসংখ্যা এত বিপুল বলেই তো জনগণের ভোটে নির্বাচিত জন-সেবকগণ জনগণের সেবায় তেমন সাফল্য লাভ করে উঠতে পারছেন না। যদি জনসংখ্যা আরও কম হতো তবে যা সম্পদ্ আছে বা যা চাল গম ভিক্ষে পাওয়া যায় তাতেই জনসেবকগণ জনগণকে পরম তৃপ্তির মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। কেবল জনসংখ্যার বিপুল চাপ বশতঃই তাঁদের এত প্রতিভাসত্বেও এত অসাফল্য! সেদিন একটা পত্রিকায় দেখলুম এক ভদ্রলোক রাজকুমারী অমৃত কাউরকে পর্যন্ত জনসংখ্যা হ্রাসে অসার্থকতার জন্যে দায়ী করেছেন। এই সব প্রতিভাবান লেখকদের দুর্জয় প্রতিভার প্রশংসা না করে কি উপায় আছে বলুন? তাঁরা কি দেখেছেন ভারতে কত জমি পতিত আছে? কত জমি উদ্ধার করা যেতে পারে? কত মানুষের বাসস্থান, কত মানুষের আহার যোগান যেতে পারে? সে-সকল বিচার না করে যাঁরা বিদেশীদের বাণী অনুসরণ করে জন্ম নিরোধের কথা বলছেন তাঁদের আমরা বিশ্বাস করব কি করে? দেশের অর্থ নৈতিক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে গবেষণা করে কিছু নির্ভর যোগ্য তথ্য প্রকাশ করলে দেশবাসী হয়ত প্রকৃত পথের সন্ধান পেতে পারে। পতিত জমি উদ্ধার করে এবং জঙ্গল পরিস্কার করে বসতি স্থাপন আরম্ভ করলে শহর গ্রামাঞ্চলে লোকসংখ্যার চাপ কমে যাবে, আহার্য সংস্থানও হবে, আর জন্ম নিরোধের জন্য চীৎকার করবার প্রয়োজন হবে না। এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের মত জানতে ইচ্ছা করি।

বিনীত—
অমৃত রায়
কলিকাতা—৭

গর্ভস্থ সন্তানের পুত্রত্ব বা কন্যাত্ব নিশ্চিতকরণ

সবিনয় নিবেদন,

সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা চালিয়ে বিস্ময়কর ফল লাভ করেছেন। তাঁরা খরগোস নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন জরায়ুর মুখ থেকে স্ত্রী-বীজ যুক্ত বা পুং-বীজ যুক্ত ডিম্ব সকল বের করে আনা যায়—তাদের পৃথক করা যায়, তখন ইচ্ছানুসারে পুং কিংবা স্ত্রী-বীজ যুক্ত ডিম্ব সকল জরায়ু অভ্যন্তরে স্থাপন করা যায়। এভাবে যদৃচ্ছা পুরুষ বা স্ত্রী জীবের জন্ম ঘটানো সম্ভব। শুধু তাই নয়, মানুষের পক্ষেও এ প্রক্রিয়া দ্বারা ছেলের মা বা মেয়ের মা হওয়া সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ প্রক্রিয়া কতটা নীতি শাস্ত্র সম্মত। "ভারতবর্ষ পত্রিকায়" বহু জ্ঞানী, গুণী, দার্শনিক ও সাধক সাধিকা লিখে থাকেন দেখেছি। তাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করলে দীন পত্রলেখক ও তার মত আরও অনেক জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে।

বিনীত—
চিত্তরঞ্জন দেব
কলিকাতা-২৬

মতামত সম্পূর্ণরূপে পত্র প্রেরকদের—এর জন্য কোনও সম্পাদক দায়ী নন।

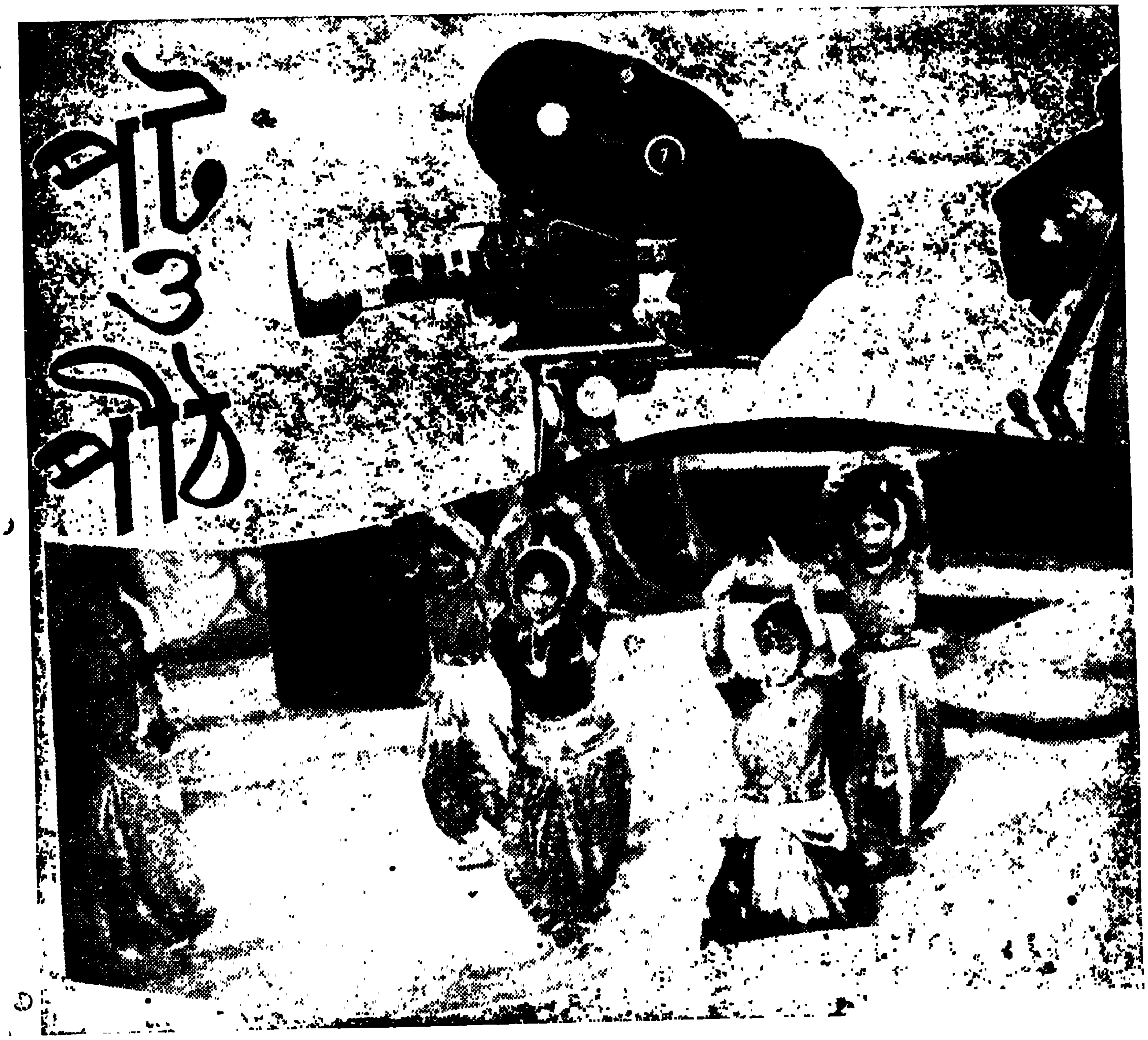

সঙ্কট সন্ধিক্ষণে

।'শ'

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প যে এখন এক সঙ্কট সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলেছে তা এই শিল্প সংশ্লিষ্ট মহলের সকলেই স্বীকার করবেন। সিনেমা গৃহগুলিতে একটানা তিন মাস ব্যাপি ধর্ম্মঘটের ফলে প্রভূত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল বাংলা চিত্রশিল্পকে। তার ওপর হিন্দী চিত্রের দাপটে নিজ গৃহে পরবাসীর মত বাংলা চিত্র আজ বাংলা দেশেই ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। চিত্র নির্ম্মাণের ব্যয় (Production Cost) ক্রমশই উর্দ্ধগামী। আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র সীমানার বাইরে বাংলা চিত্রের, তার শত গুণ থাকা সত্বেও, বিশেষ চাহিদা নেই ; কারণ ভাষার বাধা ! তার ওপর আগেই বলেছি, বাঙালী দর্শক আজ হিন্দী চিত্রের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে ক্রমশই ঐ স্তরের চিত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছে ! ফলে বাঙ্গালীর গর্ব্ব, ভারতের গৌরব, বিশ্ব-চলচ্চিত্র আসরের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত এই বাংলা চিত্র আজ আর্থিক সমস্যায় পীড়িত, জর্জ্জরিত ! কিন্তু, এ সমস্যার কি সমাধান নেই ? এ

সঙ্কটের কি সমাপ্তি নেই?—আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে এবং তা সংশ্লিষ্ট মহলকে খুঁজে বার করতে হবে।

বাংলা চিত্রের এই সঙ্কটমোচনের দায়িত্ব আজ সকলেরই—বাঙালী মাত্রেরই। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতৃবর্গ, কলাকুশলী—সকলকেই আজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সচেষ্ট হতে হবে এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে বাংলা চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, এর উন্নতি করবার জন্য। সকলকেই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, স্বার্থ ছাড়তে হবে। অর্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বাংলা সিনেমা সংশ্লিষ্ট সকলকেই আজ এই শিল্পের একনিষ্ঠ সাধকের ভূমিকায় নামতে হবে। তবেই এই মহান শিল্পের সঙ্কটমোচন হয়ে স্থায়িত্ব আসবে, উন্নতি হবে, সম্মান বৃদ্ধি পাবে বিশ্বের দরবারে। বাংলা দেশের দর্শকদেরও এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এই চিত্রশিল্পের সঙ্কট সমাধানে। কারণ তাঁদের ওপরই মূলতঃ নির্ভর করছে চিত্রের আর্থিক সাফল্য। তাঁ যদি তাঁদের নিজস্ব বাংলা ছবি না দেখে অন্য ভা চিত্রের প্রতি অনুরক্ত হন তবে বাংলা চিত্র বক্স অফিসের দিক দিয়ে কি করে সাফল্য লাভ করবে বাঙালী দর্শকমাত্রকেই আজ একান্তভাবে একথা ভে দেখতে অনুরোধ করি—অনুরোধ করি তাঁদের যে ত তাঁরা চলচ্চিত্র দর্শনে ব্যয় করেন তার সবটুকুই যে বাংলা ছবি দেখায় ব্যয়িত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে তাঁরা যেন মনে রাখেন এ অর্থের একটি ক্ষুদ্রতম অং অপব্যয় হবে না, তা বাংলার এক জনগণম জয়কারী শিল্পের সমৃদ্ধিতেই নিয়োজিত হবে।

এ বিষয়ে সকলে অবহিত হ'ন—বাংলা চিত্রকে বাঁচি রাখুন, জাগিয়ে তুলুন, বাংলা ছবিই শুধু দেখুন।

———

* * * * * * *

প্রশ্নোত্তর

অমরেন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা-৯

সবিনয় নিবেদন,

গত ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় আপনি "চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি"-র যে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং বাংলা চলচ্চিত্র প্রচারের জন্যে আপনি যে প্রচেষ্টা করছেন তার জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলা চলচ্চিত্র যে হিন্দী চিত্রের দাপটে নিজ দেশেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে তা আজ দর্শকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারছেন। কিন্তু বুঝতে পারলেও সাধারণ দর্শকরা হিন্দী চিত্র দেখায় যে নিবৃত্ত হচ্ছেন, তাও তো নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দী চিত্রের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং এই জনপ্রিয়তা থাকলে হিন্দী চিত্র তো চলবেই, আর বাংলা চিত্র ক্রমশই পেছিয়ে পড়বে তার, যথেষ্ট গুণ থাকা সত্বেও।

তাই আমার জিজ্ঞাস্য যে হিন্দী চিত্রকে ছাপিয়ে বাংলা চিত্রের জনপ্রিয়তা কি করে বাড়ান যায়?—এ সম্ব আপনাদের কি অভিমত।

বিনীত—
অমরেন্দ্র চৌধুরী
কলিকাতা-৯

* অভিনন্দন যখন দিয়েছেন তখন তা সাদরে গ্র করলাম, কিন্তু অভিনন্দন পাবার মত কোন কা আমি করেছি বলে মনে হয় না। বাঙালী হিসে যেটুকু আমার অবশ্য কর্তব্য সেটুকুই মাত্র করবার চে করেছি তার জন্যে অভিনন্দনের কোন প্রশ্ন আসত পারে না।

যাই হোক, আপনার যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ হিন্দি চিত্রকে বাংলা দেশে জনপ্রিয় করেছেন বাঙা জনসাধারণই। এখন সময় এসেছে এইসব নিম্ন মানে চিত্র না দেখবার। প্রত্যেকেই যদি চেষ্টা করে

তাঁদের রুচিকে উন্নত করতে, তাহলে দেখবেন হিন্দি চিত্র কারুরই ভাল লাগছে না, লাগতে পারে না, কারণ হিন্দি চিত্রে আর যাই থাকুক রুচির বালাই যে কোনদিনই থাকে না এটুকু আমার চাইতে আপনারা আরও ভালভাবেই জানেন।

তাছাড়া এটাও মনে রাখবেন যে সব কলাকুশলীরা নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আপনাদের খুসী করবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন তাঁদের কথা। তারা বাঙালী এবং আপনাদেরই ওপর নির্ভরশীল, আপনারাই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন ও রাখবেন।

* চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতিও চিন্তা করছেন কি করে বাংলা ছবিকে অধিক জনপ্রিয় করা যায়। সে রিপোর্টও যথাসময়ে আপনাদের কাছে পেশ করা হবে। আমাদের মত হল এই যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর এইসব চিত্র দেখা প্রত্যেক বাঙালী মাত্রেরই বর্জন করা উচিত যদি তার নিজের মাতৃভাষার প্রতি সামান্য একটুও ভালবাসা থাকে। প্রত্যেক বাঙালীরই উচিত বাঙলা ছবি দেখা এবং অপরকে দেখতে অনুরোধ করা। বাঙলা ছবির জনপ্রিয়তা বাড়াবার অস্ত্র একমাত্র বাঙালীরই হাতে আছে।

*　　*　　*

দেবকীরাণী সিংহ—বাগওয়াড়া, নৈনিতাল।

..................."পট ও পীঠ"-এর মধ্যেও বেশ নতুনত্ব আছে। এ বিভাগটা আবার নতুন করে খোলার জন্যে ধন্যবাদ। বিশেষতঃ শ্রীকান্তর লেখন ভঙ্গী ভারী চমৎকার। পড়া শেষ হওয়ার পর মনে একটা রেশ জাগিয়ে থাকে।

* আপনার সম্পূর্ণ চিঠিখানি স্থানাভাবে ছাপতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনার সব অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়, আমাদের ত্রুটি সম্বন্ধে আমরা সজাগ আছি এবং সবসময়েই চেষ্টা করি তা সংশোধন করতে। ভবিষ্যতে যাতে আরও ভাল করা যায় সে বিষয়েও আমরা চেষ্টা করব। আর আপনারা কিছু Suggestion পাঠালে আমাদের সুবিধে হয়।

শ্রীকান্তর লেখা ভাল লেগেছে জেনে খুসী হলাম। কিন্তু ও যা কুঁড়ে লোক, কিছুতেই লিখতে চায় না। অনুরোধ করলে বলে "ও সব বুর্জোয়া প্যাঁচ আমার কাছে চলবে না। গ্রাহকদের আর কাজকর্ম নেই তারা আমার ওই সব ছাই ভস্ম লেখা পড়বার জন্যে বসে থাকবে!" কি করে ওকে দিয়ে আরও ভাল লেখান যায় বলুন তো?

সুলতা চট্টোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন

*　　*　　*

"পট ও পীঠ" বিভাগে শ্রীশ'র রচনায় আমরা বহুকাল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এসেছি। ইদানীং এই বিভাগে রচিত প্রবন্ধে নতুনত্ব দেখে আরও উল্লসিত হয়েছি। শ্রীকান্তর রচনাভঙ্গি অভিনব, তৎসঙ্গের চিত্রাবলীও। তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও আশা করছি।

* শ্রীশ'র রচনায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আপনাদের ভাল অথবা মন্দ লেগেছে তা তো বিলকুল চেপে গেছেন। উৎসাহ পাব কোথা থেকে আপনিই বলুন?

শ্রীকান্তর কাছ হতে আরও আশা করছেন? ভুল করেছেন। ওরকম ফাঁকিবাজ লোক-ভুভারতে আর দুটো খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আপনার চিঠি ওকে দেখাতে গেলাম যখন তখন ও দিব্যি টেবিলের ওপর একগাদা ফাইল সাজিয়ে রেখে তার আড়ালে ঘুম দিচ্ছিল। চিঠি পড়ে বলল ওটা মালিকপক্ষের কারসাজি। পিঠ চাপড়ে আরও বেশী করে খাটিয়ে নেবার মতলব।

*　　*　　*

অশোক ঠাকুর—কলিকাতা-৩৬

বাংলা চলচ্চিত্রের সৎ-সমালোচনা আজ বড় একটা দেখতে পাই না। শুনেছি এক সময়ে আজকের দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা (অবশ্যই আমার মতে) রাধামোহন ভট্টাচার্য Statesman পত্রিকায় অত্যন্ত সাহসের সহিত বাংলা ছবির সৎ-সমালোচনা করে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। এর জন্যে ঐ অভিনেতাকে যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে। বয়স কম থাকায় তাঁর সমালোচনা পড়বার সৌভাগ্য হয় নাই। তাঁর লেখা বাংলা ছবির সমালোচনার বিষয়ে আপনারা যদি কিছু জানান, বাধিত হবো। ভারতবর্ষে অথবা পৃথিবীতে এমন কোন অভিনেতা আছেন কি যিনি একজন চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন?

*　　*　　*

* আমরা, মানেবাঙালীরা কাজ করার চাইতেও সমালোচনা করতেই ও শুনতেইবেশী ভালবাসি। বোধ হয় এটি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির বর্তমান যে কি অবস্থা চলছে সে বিষয়ে যদি কোন খোঁজ রাখতেন তাহলে সমালোচনা নিয়ে এখন বোধহয় লিখতে পারতেন না। এখন একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সামনে যে, কি করে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। সমালোচনার সময় এখন নয়। একটা কথা মনে রাখবেন যে আজ বাংলা ছবি যদি খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীরও হয় তাহলেও তাকে খারাপ বলবার কোন অধিকার আমাদের নেই। সে অধিকার আমরা হারিয়েছি দিনের পর দিন হিন্দি ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করে। আগে বাংলা ছবিকে বাংলা দেশে তার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করুন তারপরে সমালোচনা করবেন। তার আগে নয়। রাধামোহনবাবুর সমালোচনার ব্যাপারে আমরা কিছু জানাতে অক্ষম। আপনি Statesman পত্রিকায় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

চার্লি চ্যাপ্‌লিনের নিজের লেখা তাঁর Autobiography পড়ে দেখতে পারেন, হয়ত আপনার প্রশ্নের উত্তর ওখানে পেলেও পেতে পারেন।

*   *   *

শ্যামলবরণ মুখার্জি, এলাহাবাদ

সবিনয় নিবেদন,

সর্ব্বপ্রথমে আপনি আমার বৈশাখী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

মহাশয়, আমি চিরকাল আপনার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যতশীঘ্র সম্ভব নিম্নলিখিত চিত্রতারকাদের ঠিকানা জানান (অবশ্যই যতগুলি আপনার পক্ষে সম্ভব):—

শ্রীযুক্ত উত্তমকুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, ভানু ব্যানার্জী, জহর রায়, শ্রীযুক্তা মাধবী মুখার্জী, সন্ধ্যা রায় মৌসুমী চ্যাটার্জী এবং দুএকজন যাঁরা খেলোয়াড় বা শিল্পী পরিচিতি লিখিয়া থাকেন।

অধিক কি? আশা করি নিরাশ করিবেন না আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম॥ নমস্কার॥

বিনীত—

শ্যামলবরণ মুখার্জি

৩৩৩, মহৎশিমগঞ্জ,

এলাহাবাদ-৩

* বৈশাখী অভিনন্দন-এর জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে শিল্পীদের ঠিকানা জানতে চেয়েছেন তা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঠিকানা আমরা কাউকে জানাই না। খেলোয়াড় অথচ শিল্পী পরিচিতি লেখেন এরকম কারুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। তবে আপনি শ্রীসরোজকুমার সেনগুপ্ত, C/o. "উল্টোরথ" এই ঠিকানায় পত্র দিয়ে দেখতে পারেন।

---

* প্রশ্নের সঙ্গে কোনরকম খাম, পোষ্টকার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাবেন না। ব্যক্তিগত ভাবে কোন উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

*   *   *   *   *

চিত্রলেখা

"বিপদের সময় উত্তেজিত হলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করে তবে এগোতে হবে"—বললেন পরিচালক তরুণ মজুমদার।

অদূরে স্কোরিং থিয়েটারে "চৌরঙ্গী" ছবির ডাবিং-এর কাজ চলছিলো। কি একটা দরকারে পরিচালক পিনাকী মুখার্জি একবার বাইরে এসেছিলেন। তরুণবাবুর কথাটা কানে যেতেই এগিয়ে এসে সায় দিয়ে বললেন "ঠিক উত্তেজিত হলে সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে। আমাদের এখনও অনেক চড়াই উৎরাই রয়েছে।"

কথা হচ্ছিল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর ক্যাণ্টিনে ল্যাবরেটরীর ক্যাণ্টিনে এবং চত্বরে একবার ঘুরে গোটা ফিল্ম লাইনের নাড়ির অবস্থা কি রকম

মোটামুটী তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

মন মেজাজ ইদানীং কারুরই ভাল নেই। প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটছে উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে। রোজ দুবেলা কতগুলো করে যে মিটিং হচ্ছে তার হিসেব রাখতে গেলে স্বয়ং ভগবানও বোধহয় পদত্যাগপত্র পেশ করতেন।

১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়কে আবার দেখা যাবে অজয় কর পরিচালিত "পরিণীতা" চিত্রে ললিতার ভূমিকায়।

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির ব্যাপারে ইদানীং ফিল্ম লাইনে বেশ একটু মন কষাকষির সৃষ্টি হয়েছিল। নোংরা কূটনীতির একটা লম্বা অদৃশ্য ছায়া এসে নানারকম ভাবে বাধার সৃষ্টি করছিল। ফলে নানারকম ভাবে মতান্তরও ঘটছিল।

যে ইণ্ডাষ্ট্রিতে কয়েক হাজার লোক নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্ত সুখ দুঃখ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সৃজনশীল কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে আজ অব্দি একে টিকিয়ে রেখেছেন সেখানে, মতান্তর হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিকই বলা যেতে পারে। নতুন কিছু একটা গড়তে গেলে তাতে নানারকম বাধাবিপত্তি আসবেই। কিন্তু তাতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতেই হবে, বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের মান আরও উন্নত করতে হবে, এইটাই হচ্ছে আজকের দিনের একমাত্র লক্ষ্য। অনেক ঝড় ঝাপটা এসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিনা বাধা পৃথিবীতে আজ অব্দি কোন কিছুর সৃষ্টি হয়নি।

এ লাইনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি কলাকুশলী অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, পরিবেশক এব প্রদর্শকদেরও মনে রাখতে হবে যে এটা চটকল ইণ্ডাষ্ট্রি নয় কোনরকম ইজমের জায়গাও এটা নয়। এটা একটা বৃহ ও মহৎ শিল্পের পীঠস্থান। সর্বরকম রাজনীতির সংস্প থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেই হবে, কারণ আজ.ক পৃথিবীতে বারবার প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে রাজনীতি জিনিষটা অতি জঘন্য ও নোংরা জিনিষ। তাছাড়া এটাও তাঁদের মনে রাখতে হবে যে শিল্পী হলেও জাতি প্রতি তাঁদের একটা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে শিল্পী বলতে এখানে শুধুমাত্র অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী দের কথা আসছে না। এই শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিমাত্রেই শিল্পী। অতএব বাঙালী জাতি আগামী দিনের ইতিহাসের পাতায় কোন্ রঙের কালিতে তাঁরা তাঁদের নিজেদের ভূমিকা লিখে রেখে যাবেন সে তাঁদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে এট মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে পৃথিবীতে একম ইতিহাসই হচ্ছে চিরস্থায়ী এবং ইতিহাস কোনদিন কাউ ক্ষমা করে না—সে নির্ম্মম ও নির্ভীক!

অবশেষে মোটা-মুটীভাবে সব সন্দে অবশান ঘটল সাতই জুন সন্ধেবেলা ক্যালক্য মুভিটোনের মাঠে। সংরক্ষণ সমিতির উ পূর্ণ আস্থা জানিয়ে গেলেন এ রাজ্যের প্রতিটি কলাকুশ ও শিল্পী। কি ছোট কি বড় সবায়ের মুখে একই রক দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল সেদিন। মতান্তর হোক ক্ি কোনরকম মনান্তর হতে দেব না।

অহেতুক ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবার বাসনা নেই ক্ি সবায়ের কাছে অনুরোধ যে দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ ও প্র রাখতে, কারণ নোংরা কূটনীতির লম্বা অদৃশ্য ছায়া নেপ চুপ করে বসে থাকবে না। প্রতিশোধ নেবার রাস্তা খুঁজবেই। এইটাই তার একমাত্র ধর্ম। শিল্প সৃষ্টির ক তার কোন নাড়ীর বাঁধন নেই। তার বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে ইতিমধ্যেই সে বসে গেছে ভবিষ্য ভাঙনের ছক তৈরী করতে।

জীবনে অনেক ধরনের লোক দেখেছি কিন্তু এই পত্রিকার সম্পাদকের মত এরকম দজ্জাল ও তেএঁটে লোক আমি দুটো দেখিনি। যতই বলি "পট ও পীঠ"-এর লেখা এখন লিখতে পারব না, কারণ সিনেমা হাউশগুলোতে দীর্ঘ দিন ধরে ধর্মঘটের ফলে ষ্টুডিওর কাজ কর্ম এক রকম প্রায় বন্ধই, তার ওপর নিজেদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে কলাকুশলীরা ভয়ানক রকমের উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, খবর জোগাড় করতে গেলে তারা হয়ত উত্তম মধ্যম দিয়ে দেবে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! ঘরে ডেকে চাটুজ্জেমশাই কতকগুলো চিঠি নাকের সামনে ধরে বললেন "না লিখলে চলবে না, পাঠকপাঠিকাদের কাছ হতে অনবরত তাগাদা আসছে লেখার জন্যে, অতএব যেমন করে হোক খবর জোগাড় করে লিখতেই হবে।" বুঝুন কাণ্ড, লোকে আমাকে গবেট বলে; এটুকু বিনা আপত্তিতেই মেনে নিয়েছি। কেননা আজ অবধি একটা মেয়েও আমার সঙ্গে প্রেম করতে রাজী হল না। সে কথা যাক, পাঠক-পাঠিকাদের কি এমন দায় পড়েছে যে তাঁদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তাঁরা শ্রীকান্তর লেখা পড়বার জন্যে হন্যে হয়ে বসে থাকবেন? আর এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আর কচুপোড়া লিখবটাই বা কি? শ্মশানে বসে আজ অব্দি কেউ বাইস্কোপের খবরাখবর লিখেছে বলে তো আমার জানা নেই।" তারপর নিজের ঘাড় থেকে কাজটা transfer করবার উদ্দেশ্যে বললাম—"শ্রী'শ'-ই এবার সমস্তটা লিখুন না। সিনেমা হাউসগুলোতো এখন বন্ধ কিন্তু থিয়েটারগুলোতো খোলা আছে, থিয়েটারগুলো একবার ঘুরে এসে কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়লেই খবর তৈরী হয়ে যাবে।" আমার প্রস্তাব শুনে শ্রী"শ"—চশমাটা খুলে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে পুরো জহরলাল নেহরুর পোজ নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন "লিখতে আমার একটুও আপত্তি নেই, সব সময়েই লিখতে আমি রাজী, কিন্তু জনগণ আপনাকে চায়, তাঁদের দাবী উপেক্ষা করবার কোন অধিকার আপনার নেই। তাছাড়া আজকালকার ছেলে-মেয়েরা জন্মেই প্রথমে বলে "মা" তারপরেই বলে "সিনেমা।" ওদের মনস্তত্ব আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি এখনও, অতএব ও ব্যাপারে হাত দিয়ে আমি ওদের অভিশাপ কুড়াতে চাই না।" বলেই স্পেন্সার ট্রেসীর মত একটা পোজ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বুঝলেন তো ব্যাপারখানা, এরকম চালু লোক আর কোথাও দেখেছেন আপনারা!

সংরক্ষণ সমিতির ব্যাপারে আলোচনারত (বাঁদিক হতে) বোসসাহেব, মৌসুমী চ্যাটার্জি, পরিচালক অজয় কর (ক্যামেরার দিকে পিছন করে), পরিচালক ইন্দর সেন, বিকাশ রায় ও পরিচালক তরুণ মজুমদার।

ইদানীং বাংলা ছবিতে যেমন বেশ কিছু নতুন মুখের দেখা পাওয়া গেছে তেমন বেশ কিছু নতুন পরিচালকও পাওয়া গেছে। যেমন ধরুন ইন্দর সেন। এঁর প্রথম ছবির নাম হচ্ছে "প্রথম কদম ফুল"। গল্প হচ্ছে শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তর, চিত্রনাট্য করে দিয়েছেন ইন্দরবাবুর গুরু স্বয়ং মৃণাল সেন। সৌমিত্র ও তনুজাকে নিয়ে এরই মধ্যে বেশ অনেকখানি সুটিং করে ফেলেছেন ইন্দরবাবু। আর একজন নবীন পরিচালক হলেন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর প্রধান সহকারী সুনীলকুমার ব্যানার্জি। প্রথম ছবিতেই বেশ খানিকটা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সুনীলবাবু।

তাঁর ছবির মূল উপাদান সংগ্রহ করেছেন রবীন্দ্রনাথের "ছেলেটা" কবিতা হতে। শিশু মনস্তত্ত্ব সুনীলবাবু বেশ ভালই বোঝেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি C. L. T-র সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। কবিতার চিত্ররূপ দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়; সেইজন্যে সুনীলবাবুর সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। তৃতীয়জন হলেন রঞ্জন মজুমদার। ছবির নাম হচ্ছে "দৃষ্টিদর্পণ"। এটি একটি অন্ধমেয়ের জীবনকাহিনী। গল্প এবং চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছেন শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী। রঞ্জনবাবু তাঁর ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রের জন্যে নির্বাচিত করেছেন মাধবী মুখার্জি, বিকাশ রায় ও অনিল চ্যাটার্জিকে। সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রকে নিয়ে ইতিমধ্যেই দু'খানা গান ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে রেকর্ডিং করে ফেলেছেন রঞ্জনবাবু। বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে দীনেন গুপ্তর নাম নিশ্চয়ই অজানা নয়। একজন প্রখ্যাত আলোকচিত্র-শিল্পী দীনেনবাবু। বহু সার্থক-চিত্র তাঁর হাত দিয়ে যেমন বেরিয়েছে তেমনি বহু প্রখ্যাত পরিচালকদের সংস্পর্শেও এসেছেন তিনি। ক্যামেরা হাতে নিয়েই এবারে দীনেনবাবু পরিচালনার আসরে নেমেছেন। তাঁর

নবাগতা রোমী চৌধুরীকে "ছুটি" ছবিতে আপনারা দেখেছিলেন। আবার দেখতে পাবেন অজয় কর পরিচালিত "পরিণীতা" ও অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত "মেঘ ও রৌদ্র" ছবিতে

প্রথম ছবির নাম হচ্ছে "নতুন পাতা"। প্রতিভা বসুর রচিত এ গল্পের পটভূমি হচ্ছে গ্রাম বাংলা। পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ইতিমধ্যেই ছবির প্রায় তিনভাগ কাজ শেষ করে ফেলেছেন দীনেনবাবু। কিশোর বয়সের সমস্যা আর তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমন্বিত এই কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন শম্ভু মিত্র, কাজল গুপ্ত, গীতা দে, চিন্ময় রায়, উমানাথ ভট্টাচার্য্য ও নবাগতা আরতি গঙ্গোপাধ্যায়।

নতুন শিল্পী যারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে নন্দিনী মালিয়া ('ছুটি'), স্বরূপ দত্ত ('মেঘ ও রৌদ্র' এবং 'পিতাপুত্র') নীরা মালিয়া ('পরিণীতা') মৌসুমী চ্যাটার্জি ('বালিকা বধূ' ও 'পরিণীতা') রোমী চৌধুরী ('ছুটি', 'পরিণীতা', 'মেঘ ও রৌদ্র') যূই ব্যানার্জি, (বালিকা বধূ, মেঘ ও রৌদ্র,) পার্থ মুখোপাধ্যায় ('অতিথি', 'হাটে বাজারে', 'বালিকা বধূ', 'আপনজন') মৃণাল মুখোপাধ্যায় ('ছুটি', 'আঁধার সূর্য্য') শমিত ভঞ্জ ('আপনজন', 'পরিণীতা', 'শুক-সারী') প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। একমাত্র স্বরূপ দত্ত, নীরা মালিয়া ও শমিতের ছবি এখনও রিলিজ হয়নি। এ ছাড়া প্রত্যেকেই জনসাধারণের কাছ হতে পেয়েছেন বিপুল অভিনন্দন। নতুন পরিচালক ও শিল্পীদের দেখে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকখানি আশা জাগে। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই বয়সের দিক দিয়ে নবীন এবং প্রত্যেকেই আশাবাদী। নতুন পরিচালক ও শিল্পীদের নবীন রক্ত বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে আবার নতুনভাবে জনসাধারণকে নতুন উপহার দেবেন এই কামনাই করব। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী এঁরাই।

হীরেনবাবুকে আপনারা চেনেন নিশ্চয়ই। পরিচালক হীরেন নাগ। সিনেমা হাউসগুলো বন্ধ না থাকলে এতদিনে তাঁর নতুন ছবি "চেনা অচেনা" আপনারা দেখতে পেতেন। হীরেনবাবুর আর একখানি নতুন ছবি "সাবরমতী" প্রায় শেষের মুখে। শব্দযন্ত্রী দেবেশ ঘোষ প্রযোজনা করছেন "সাবরমতী"। চুপি চুপি বলে

রাখি হীরেনবাবু আরও একখানি নতুন ছবির চিত্রনাট্য রচনায় বর্ত্তমানে ব্যস্ত। অবশ্য ছবিটির পরিচালকও তিনি নিজেই। এ ছবিটির নাম হচ্ছে "তিন ভরঙ্গ"। বাকী খবর এখন বলা সম্ভব নয়। যাইহোক, ভাবলাম হীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে "সাবরমতী"র কাজ কতদূর বাকি জেনে নেব। খোঁজ নিয়ে জানলাম হীরেনবাবু এডিটিং রুমে রয়েছেন। এডিটিং রুমের কাছাকাছি গিয়ে দেখি সামনের বারান্দায় হীরেনবাবু খালি পায়ে চোখ বন্ধ করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রখ্যাত মেক্‌আপ্‌ ম্যান্‌ শ্রীপ্রাণানন্দ গোস্বামী। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। কাছে এগিয়ে যেতেই কানে এল হীরেনবাবু সমাধির অবস্থা হতেই বলছেন "প্রভু আমার কি হবে দয়া করে একটু বলে দাও। তুমি আলো না দিলে আমাকে শেষে অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে চানাচুর বিক্রি করতে হবে। দেখা যখন পেয়েছি প্রভু তখন আমার একটা উপায় না করে দিলে তোমার শ্রীচরণ আজ আমি আর ছাড়ছি না।" গোস্বামীবাবু একটা ধমক দিয়ে বললেন আঃ, কি হচ্ছে কি? যা বলেদিয়েছি তাই ভাঙিয়েই এখন চালাও পরের কথা পরে ভাবা যাবে।" হীরেনবাবু আবার বললেন "না প্রভু, পরে নয়, আজই ভাবতে হবে, এখুনিই ভাবতে হবে। তোমার আশীর্বাদ না নিয়ে বাড়ি ফিরলে গৃহিণী আমাকে Divorce করবে বলে নোটীশ দিয়েছে।" গোস্বামী বাবু পকেট হতে দেশলাই বার করে একটা কাঠি নিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন "তখন হতে বকিয়ে মারছ বৎস, এদিকে গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।" বুদ্ধিমানদের পক্ষে সামান্য ইশারাই যথেষ্ট। বলতে ভুলে গেছিলাম জ্যোতিষশাস্ত্রে যেমন দখল গোস্বামীবাবুর, তেমনি তার চাইতেও আরও বেশী দখল আছে তাঁর ভোজনশাস্ত্রে। একজন উচ্চাঙ্গের ভোজনরসিক মহাশয় তিনি। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে গোটা ফিল্মলাইনে এমন একজনও নেই। যাইহোক এতক্ষণে হীরেনবাবুর খেয়াল হল যে গুরুদেবকে তিনি এতক্ষণ বিনা দক্ষিণাতেই দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তাড়াতাড়ি ক্যান্টিনের দিকে চেয়ে দরাজ গলায় একটা হাঁক দিলেন "ওরে কে আছিস, শিগ্‌গির দুটো টোষ্ট, একটা ডবল ওমলেট, আর একটা কড়া করে চা"। এবারে গুরুদেবের মুখে হাসি ফুটল, দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে দিয়ে বললেন "হয়েছে, আর ফাজলামী করতে হবে না, দেখি একবার ডান হাতখানা।" বলেই তাঁর বিখ্যাত ঝোলার ভেতর হতে পেল্লায় সাইজের একখানা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করলেন।

প্রখ্যাত নাট্যকার, সাহিত্যিক ও চরিত্রাভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য্যকে বাউলের চরিত্রে রূপান্তরিত করছেন মেক্‌আপের মাধ্যমে শ্রীপ্রাণানন্দ গোস্বামী।

গুরুদেবকে নিয়ে হীরেনবাবু যেরকম বুঁদ হয়ে রয়েছেন তাতে "সাবরমতী"র খবরের ব্যাপারে কোন সুবিধেই এখন হবে বলে মনে হলনা। অতএব এখান হতে এখন সরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। একটু হতাশ হয়েই নীচে নেমে এলাম। প্রজেকশান থিয়েটারের সামনে আসতেই পাকড়াও করলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন "এই শোন, আমার মাইয়াটারে দেকস্‌স্‌? "আমি বললাম "অ ইলাম তো এইখন, তোমার মাইয়ারে দেখুম ক্যামনে?" ভানুদা রেগে গিয়ে বললেন "ফাজলামি করনের জায়গা পাও নাই, আমার লগে মস্করা অইতাসে?" আমি হাত দুয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে বললাম "বোঝ ঠ্যালা, তোমার লগে মস্করা করুম কিয়ার লাইগা?" ল্যাবরেটরী ইনচার্জ আর, বি, মেহতা সাহেব কি একটা কাজে যাচ্ছিলেন, ভানুদাকে

দেখে কাছে এগিয়ে এসে বললেন "আরে ভানুবাবু ক্যা, হুয়া ?" ভানুদা বললেন "কেয়া নেই হুয় ! ঘোর কলি বুঝলেন ঘোর কলি, ভুভারতে কেউ কোনদিন শুনেছে যে একটি Pure ঘটি বাঙাল ভাষায় বাঙালের সঙ্গে কথা বলছে ?" মেহতাজী একটু হেসে বললেন "ইয়ে ভী এক সোঁচনেকা বাত হ্যায়" বলে নিজের কাজে চলে গেলেন।

নীরা মালিয়া একটি ছোটখাট শান্তশিষ্ট খুকী। ক্যামেরার পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল কে জানে ? অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বসেছিল বেচারা। শেষে আর থাকতে না পেরে সহকারী চিত্রশিল্পী রেজাসাহেবকে জিজ্ঞেসই করে ফেললো "আচ্ছা, ক্যামেরা দিয়ে দেখতে গেলে কত টাকা লাগে ? ক্যামেরা দিয়ে দেখতে গেলে যে টাকা লাগে এটা অবশ্য আমিও জানতাম না। কেননা এরকম কোন নিয়ম চালু আছে বলেও আমার জানা নেই। রেজাসাহেব একটু হেসে বললেন "সেটে কতজন লোক আছে আগে গুণে এস, তারপরে বলব। নীরা তো মহাখুসী হয়ে নাচতে নাচতে লোক গুণতে চলে গেল। আমিও ধাঁধাঁয় পড়লাম। ক্যামেরা দিয়ে দেখার সঙ্গে আদমসুমারীর কি সম্পর্ক ? যাই হোক্ মিনিট কয়েকের মধ্যে নীরা ফিরে এসে বলল "আটচল্লিশ জন লোক আছে।" রেজাসাহেব জিজ্ঞেস করলেন ঠিক করে গুণেছ। কাউকে বাদ দাওনি তো ?" নীরা মাথা নেড়ে বললে "না তো।" রেজাসাহেব বললেন "Very Good এবার তাহলে আটচল্লিশকে চল্লিশ দিয়ে গুণ করে চটপট বল দেখি কত হয় ?" নীরা বেচারী এবারে একটু মুষড়ে পড়ল। কি আর করবে, কাগজ পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। আমারও বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ক্যামেরা দিয়ে দেখতে গেলে যে এত ঝামেলা তা কে জানত ! প্রথম কথা ফি দিতে হবে, দ্বিতীয় লোক গণনা করতে হবে, তৃতীয় অঙ্ক কষতে হবে—হঠাৎ চমক ভেঙে গেল। সেটে যত লোক ছিল নীরা ও আমি বাদে সবাই একযোগে হাততালি দিয়ে চলেছে। একতলা থেকে শুরু করে তিনতলার গ্যাঙওয়ের ওপর ইলেক্ট্রিশিয়ানরা পর্যন্ত। আর সে কি হাততালি ! এরকম বিদঘুটে হাততালি আমি কোনদিনও শুনিনি। এবারে আমার সন্দেহ হতে লাগল নিশ্চয়ই ষ্টুডিওর বদলে কোন পাগলা গারদে এসে পড়েছি। নইলে খামোকা এতগুলো লোক মিলে একসঙ্গে হাততালি দেয় কেন ? যাই হোক, হাততালি থামলে দেখি ক্যামেরার কাছে দাঁড়িয়ে টেকনিসিয়ানরা হাসছে এবং ক্যামেরার পিছনে হাতল ধরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পাওয়া আপনাদের প্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়। ইন্দিরা ঠাকুরুণের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে ও চুরি করে তেঁতুলের আচার খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। এগিয়ে এলেন শ্রীবিকাশ রায়। জজসাহেবের মতন গম্ভীর গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন "ইন্দু তুমি ক্যামেরা দিয়ে দেখেছ ? ভয়ে ভয়ে ইন্দু মাথা নেড়ে বলল 'হ্যাঁ'। বিকাশবাবু বললেন "তাহলে তোমাকে নিয়ম পালন করতেই হবে।" এবারে ইন্দু একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করল "কি নিয়ম ?" বিকাশবাবু বললেন "সেটে যতজন লোক আছে সবাইকে এক এক বোতল করে কোকা-কোলা খাওয়াতে হবে এইটাই হচ্ছে নিয়ম।" "তাহলে খাওয়াব" বলল ইন্দু, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো, কাঁদতে কাঁদতে বলল—"ছেলেমানুষ পেয়ে আমাকে সবাই বোকা বানাচ্ছে।"

বোকা হওয়ার দুঃখে ভয়ানক রকমের কাঁদতে লাগল ও। বিকাশবাবু কাছে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে এতে বোকা হওয়ার কিছু নেই। টেকনিসিয়ানরা ছাড়া অন্য যে কেউ ক্যামেরা দিয়ে দেখলে কোকাকোলার জরিমানা দিতেই হয়, এটাই নিয়ম।

এর মধ্যে ইন্দুর বন্ধু বাসবী এসে উপস্থিত হল। হাতে একঠোঙা চানাচুর। বাসবীকেও আপনারা ভাল করে চেনেন। তপন সিংহের "অতিথি" ছবির জমিদারের সেই বদরাগী মেয়েটিকে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ?

চানাচুর খাওয়ার আনন্দে মসগুল দুইসখা বাসবী ও মৌসুমী

অবশ্য সত্যিকারের বদরাগী মেয়ে ও নয়। ওর বাবাকেও আপনারা সবাই চেনেন। হাস্যরসিক ভানু বন্দোপাধ্যায়কে আপনারা বহুভাবে বহু ছবিতেই দেখেছেন। বাসবী আর ছবি করবে কি না জানিনা তবে আমার মনে হয় ঠিকমত অভিনয়ের সুযোগ পেলে ওর বাবার চাইতেও ও বেশী নাম করে ফেলবে। একটু আগে ওর বাবা যখন ওকে খুঁজছিলেন তখন ও চানাচুর কিনতেই গিয়েছিল।

বাসবীকে দেখে ইন্দু কান্না থামিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। বাসবী ইন্দুকে চুপি চুপি জানাল বেশী দেরী করলে চানাচুরগুলো নরম হয়ে যাবে। অতঃপর একটি চেয়ারে বসে দুই সখীতে চানাচুর বংশ ধ্বংস করার কাজে মন দিল।

কোকাকোলা এল। দেখে চানচুর খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ইন্দিরা। Sorry, আপনাদের মৌসুমী। এই যাঃ, ওর নামটা বলে ফেললাম। দেখবেন আপনারা যেন ওকে বলে দেবেন না যে ওর আসল নামটা আমি বলে ফেলেছি। এমনিতে আমি লোকটা খুব সুবিধের নয় বলেই ওর ধারণা।

কোকাকোলার বোতলগুলো খোলা হল। চানাচুর খেতে খেতে সবাইকে পরিবেশন করল মৌসুমী। এ অধমের ভাগ্যেও একবোতল জুটল। কোকাকোলার সঙ্গে এক মুঠো করে চানাচুরও সবাইকে দিল। ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টকে একটু বেশীই খাতির করল মৌসুমী। ওদের দুমুঠো করে চানাচুর দেওয়া হল। শুনলাম ইদানীং অভিনয় করার দিকে ওর তত ঝোঁক নেই। ক্যামেরার কাজ শিখে ক্যামেরাম্যান্, Sorry, ক্যামেরাওমেন্ হবার তালে আছে ও। অভিনয় করার মধ্যে কোন মজা নেই, ও যে কেউ করতে পারে।

কোকাকোলা খেয়ে ইতিমধ্যে নীরা মালিয়ার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি অন্ধ কথা শেষ করে এসে রেজাসাহেবকে জিজ্ঞেস করল "টাকাটা নিয়ে আসব এখুনি ?" রেজাসাহেব বললেন "কেন ?" নীরা বললে "বাঃ, ক্যামেরা দিয়ে দেখলে সবাইকে কোকাকোলা খাওয়াতে হবে না !"

একদিনে দুটো কোকাকোলা খাওয়া বোধহয় উচিত নয়। রেজাসাহেব একটু ভেবে "বললেন আজ থাক, আরেকদিন হবে'খন"।

কোকাকোলা খেতে খেতে ক্যামেরাম্যান্ বিশু চক্রবর্তী ইলেকট্রিসিয়ান সুধীরকে বলছিলেন "যেদিন আমি মারা যাব সেদিন আমার বাড়ি গিয়ে ঠিকমত Death Scene-এর Lightingটা করে নিয়ে আসবি। পারবি তো ? এতদিন ধরে তোকে তাহলে Mood Lighting-এর কি শেখালাম ?

সুধীর বললে "কোন চিন্তা করবেন না, সে আমি সব ঠিক করে দেব। কিন্তু আমার Death Sceneএ Dramaটা কি করে climaxএ তোলা যায় বলুন দেখি ?"

বিশুবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন "কেন এত লাইট রয়েছে, বেশ লম্বা দেখে খানিকটা cable বেছে নিয়ে গলায় জড়িয়ে ঝুলে পড়বি।"

"শুধু cableএ কি করে হবে ? পায়ের দিকে ওজন লাগবে না ?" প্রশ্ন করল সুধীর।

বিশুবাবু বললেন "তার জন্যে চিন্তা কি ! পায়েতে একটা দু'কিলো লাইট বেঁধে নিস, তাহলে Dramaটা তাড়াতাড়ি climaxএ উঠে যাবে।"

বুঝলাম জীবন-মৃত্যু টেকনিশিয়ানদের পায়ের ভৃত্য।

—শ্রীকান্ত

বাঁ দিকে হীরেন নাগ পরিচালিত "চেনা অচেনা" ছবিতে সুমিত্রা সান্যাল ও পিটার দে এবং ডান দিকে স্বদেশ সরকার পরিচালিত "শাস্তি" ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গল্প

পাপ পুণ্য পেরিয়ে

সমীরণ রুদ্র

সেদিন মাদ্রাজ মেলের থার্ডক্লাস কামরার জানালার ধারে একটি কাঠের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসেছিলাম। ট্রেন চলছে ঝিক্‌ঝিক্ শব্দে। বাইরে বিকালের ম্লান আলোয় খালের জলে পানকৌড়ি আর বকের সারি।

একটু আগে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠবার সময় এক বন্ধুর মুখে মন্দিরার মৃত্যু সংবাদ শুনেছি। তাই কিছু ভাল লাগছিল না, মনটা তোলপাড় করছিল কত স্মৃতি, ব্যথা আর ঘটনার ঢেউএ। মন্দিরা একটি সামান্য মেয়ে। একটি মেয়ে-স্কুলের সামান্য শিক্ষিকা ছিল। কিন্তু সর্বভয়হীনা ছিল সেই মেয়ে। তাকে প্রথম যখন আমি দেখি তখন তার ভরা যৌবন, নিটোল পুরন্ত গড়ন। গায়ের রঙ ময়লা ছিল বটে, মুখখানাও হয়তো তত সুন্দর বলা চলতো না, কিন্তু তার মধ্যে একটা দুরন্ত আকর্ষণ ছিল। আজ এখন তাই ভাবি ঐ হাড়মাসের হিজিবিজির মধ্যে কোথায় ছিল সেই অলৌকিকের ঠিকানা। লোকে বলে অলৌকিক বলে কিছু নেই। মন্দিরার মধ্যে ওই যে ছিল—শান্ত সংযত প্রেম, যা পাঁককে সোনা করেছিল। তুচ্ছকে অসীম। তাকি অলৌকিকের চেয়ে কিছু কম? আপন দেহলীর উপর অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে মন্দিরা ভালবেসেছিল মানবকে—একটা বখা, হতচ্ছাড়া লোক ছাড়া যে আর কিছুই ছিল না। মন্দিরা তাকে দুবেলা খেতে দিত, তার জামা কাপড় কিনে দিত, তাকে হাত খরচের টাকা দিত, তাকে কোন কাজ করতে দিত না। কেন না তা আমি জানি না। অথচ মন্দিরার সংস্পর্শে এসে সেই বাজে লোকটাই না একদিন কত ভাল হয়েছিল, কিন্তু সে কথা আলাদা, সে কথা পরে বলছি। এখন চলন্ত ট্রেনের কামরায় ধীরে ধীরে মনে পড়ল এক বর্ষা সন্ধ্যায় যখন মেঘে আকাশটা কালো হয়েছিল, রিম-ঝিম করে বৃষ্টিধারা ঝরছিল কোলকাতার বুকে, মন্দিরা তখন গাইছিল "জানি, পৃথিবী আমায় যাবে ভুলে।" সেদিন গান থামতে তাকে আমি বলেছিলুম "এ পৃথিবী তোমায় কোনদিনই ভুলবে না মন্দিরা। কারণ তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু।" সে হেসে বলেছিল "বলো, মহুয়ার চেয়েও আরো মিষ্টি?" বলেছিলাম "হ্যাঁ নতুন আখের মতই মিষ্টি।" সে হেসে এরপর বলল—"তুমি একটি হিংসের কাঁটালতা শেখরদা, মানবকে তুমি হিংসে করো। অথচ তুমি জান মানব ভেঙেছে তার বিলাসের ও সম্ভোগের জীবনকে। ভেঙেছে পুরানো কালের অভ্যাসকে, ভেঙেছে পুরানো চিন্তাধারাকে তাই সকলে ওকে খারাপ বলে।"

সবিস্ময়ে বললাম "হ্যাঁ তাই, তুমি হলে অমৃতবর্তি, তুমি ঐ লোফারটাকে কি করে ভালবাস? ও একটা গুণ্ডা, একটা গোঁয়ার গোবিন্দ মার্কা লোক।"

স্মিতমুখে মন্দিরা বলল "ভালবাসা কি কেউ বাসে? ভালবাসা আপনি আসে।" সে আরো বলেছিল "শেখরদা, বুকের পাঁজরগুলো যদি বিষাক্ত হয়, যদি তাতে খুঁত থাকে, তবু সেগুলো ভেঙে ফেলে দেওয়া যায় না। যে ভালবাসে সে ভালবেসেই সুখী। প্রিয়জনকে কাছে পেয়েই তার সাধ মেটে। প্রিয়জনের স্বভাব চরিত্র সে বিচার করে না।" আমি চুপ করে জানালা দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছিলাম। কোন উত্তর দিতে পারিনি। একটু থেমে মন্দিরা আবার বলেছিল—"মানব মূর্খ হতে পারে—শেখরদা, কিন্তু ও সমাজবিরোধী লোক নয়, চোর নয়, লম্পট নয়। ওর ঐ ব্যায়াম করা মাংস পেশী, ওর বলবান বুকের ছাতি এসব আমায় মুগ্ধ করেছে।

তাছাড়া ওর মন দুর্বল নয়, নোংরা নয় এইটাই বড় কথা। ও আমাকে কাঁধে নিয়ে কেদার ও বদরী ঘুরিয়ে এনেছে। মানব আমাকে বলে কি জানো? বলে—'আমার চেহারা তোমার শেখরদার মত সুন্দর নয়, আমি ছাত্র হিসেবে অপদার্থ ছিলাম। আমার কোন গুণ নেই, শেখরবাবুর মত আমি কলেজের অধ্যাপক নই। আমি গাইতে পারি না, বাজাতে পারি না, খেলতে পারি না, কবিতা লিখতে পারি না, ছবিও আঁকতে পারি না। যে বখা আর হতচ্ছাড়া সে আর কি করবে, কি করে তার প্রেম জানাবে? তাই আমি রোজ তোমার কাছে আসি। তাই তোমায় সহস্র রকমে বিরক্ত করি। তোমাকে খেপিয়ে তুলি। তোমাকে তো আলো করতে পারি না তাই তোমাকে জ্বালাতন করি। মুঠো মুঠো পারি শুধু তোমার ঘৃণা কুড়োতে।'—বলো তো শেখরদা, এই মানুষকে কি করে ঘৃণা করা যায়? কি করবো বলো আমার জীবনের পরমাশ্চর্য যে এই ভাবেই এসেছে। হিসেবের খাতায় অঙ্ক মিলিয়ে তো আসে নি। আসে নি সমতল সামঞ্জস্যের পথ দিয়ে। অথচ ওকে যখন দেখি মনে হয় সন্ধ্যার আরতির আলোকে দেবতার মুখই বুঝি দেখছি।—এই বলে মন্দিরা তার দুই চোখ স্বপ্ন পরিপূর্ণ করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। বৃষ্টি ঝড়া সন্ধ্যায় সেদিন আমাদের দুজনের মধ্যে এই সব কথাই হচ্ছিল মন্দিরাদের মেয়ে স্কুলের একটি ঘরে। বেশ মনে পরে সেদিন একটা ছুটির দিন ছিল। মন্দিরাকে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঐ বাড়ীর ছাদের একটি ঘরে সাময়িকভাবে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। মন্দিরার বাবা ও মা এর অনেক আগেই মারা গেছলেন। মন্দিরা ওর দাদা ও বৌদির সংসারেই থাকতো। কিন্তু বৌদির সঙ্গে ওর ক্রমশঃ বনিবনা না হওয়াতে মন্দিরা স্কুলের সেক্রেটারীর অনুমতি নিয়ে স্কুল বাড়ীতে এসেই উঠেছিল। সেখানেই ও থাকতো। নিচে স্কুলের বুড়ো দারোয়ান ও তিনচারজন ঝিয়েরা মাত্র থাকতো। ও থাকতো উপরে, একেবারে ছাদের একটি ঘরে। আমি জানতাম স্কুলের সেক্রেটারী মন্দিরাকে মেয়ের মতই স্নেহ করতেন। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক সৎ, মহৎ ও শিক্ষিত ছিলেন। আমাকেও অনেকদিন থেকে তিনি চিনতেন ও খুব ভালবাসতেন। ওঁর সুপারিশেই আমি আমার এই কলেজের চাকরি পেয়েছিলাম। আবার মন্দিরা যখন বি-এ, বি-টি পাশ করল, তখন আমার সুপারিশেই সে ঐ মেয়ে স্কুলের চাকরিটি পেল। যাক যা বলছিলাম তাই আবার বলি। সেদিন ওকে আমি আবার বললাম "মন্দিরা, আমি জানি জীবন অনেক বড় এবং বৈচিত্র্যময়—মানুষের সকল কল্পনাকে সে কথায় কথায় অতিক্রম করে যায়। তা না হলে তোমার মত একজন শিক্ষিতা মেয়ে কি করে ভালবাসে এমন একজন পুরুষকে যে ম্যাট্রিক পাশও করেনি? আমি বুঝেছি তোমাদের দুজনের ভাল লাগা থেকে বাসা বেঁধেছে ভালবাসা। ভালবাসা খোঁজে সান্নিধ্য, সাথীত্ব। তোমরা তাই খুঁজছ নিবিড় সঙ্গ, নিভৃতের মন জানাজানি। কিন্তু তোমরা বিয়ে করছ না কেন?"

মন্দিরা হেসে উঠল ঠিক যেন অনেকগুলি সোনার বাটিতে রূপোর কাঠির আঘাতে বেজে উঠল এক জলতরঙ্গ। তারপর তার ডাগর দীঘল—চোখ আমার দিকে মেলে ধরে সে বলল "শেখরদা, বিয়ে হয়তো আমার জন্যে নয় বিয়ে মানে বাঁধন। বিয়ে মানে ভালবাসার অপমৃত্যু। বিয়ে মানে চক্ষুলজ্জা, আড়ষ্টতা ও বাধ্য বাধকতা। আজকের দিনে বিয়ে হল দেখতে পাচ্ছ তো যেন ভালবাসা হীন চুক্তি সর্বস্ব নরনারীর মিলন মাত্র। যা সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ। আমাদের ভারতের প্রতিদিন পঞ্চান্ন হাজার শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। এই রকম জন সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যায় দেশ আজ যখন এত জর্জরিত, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন আজ এত সমস্যা, তখন ক্ষণিক আনন্দের আতিশয্য আমার কাছে মনে হয় এক ঘেন্নার বস্তু। তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই শেখরদা, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যৌন আবেদনকেও আমরা দুজনে সম্পূর্ণরূপে সংযমের দ্বারা বেঁধেছি। হ্যাঁ, মানবের এতে পূর্ণ মত আছে। তাই একটু আগে বলেছিলুম শেখরদা ও মূর্খ হতে পারে কিন্তু ওর মন দুর্বল নয়, নোংরা নয়। ও লম্পট নয়। নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে নিজেদের প্রজনন ক্ষমতাকে তাই আমরা নিয়ন্ত্রিত করেছি। জাতির স্বার্থে আমরা আমাদের বিয়ে এখন মুলতুবী রেখেছি। তাই বলে ভেবনা এ গোপন ব্যাভিচার। আমার শিক্ষার সংস্কার একটু অন্য রকমের

সেই নিষ্পাপিলিশ নিরীহ মেয়ে একটু থেমে আবার মিষ্টি সুরে বলতে লাগল যেন রাখালিয়া বাঁশির মিঠে সুরের টানে "শেখরদা, আমরা দুজনেও অনুভব করি বৈকি দেহের ভিতরকার অরণ্যে অরণ্যে দাবানল, রক্তে রক্তে কাল বন্যার দোলা। কিন্তু এও জানি আসঙ্গের আয়ু হল স্বল্পকালের। আমরা কি দুজনে মিলেছি বাসনার আগুনে পুড়ে ছাই হবো বলে? কিন্তু তারপরে যে আসবে নির্লজ্জ পরিতৃপ্তির অবসাদ। শিথিল, দুর্বল, তেজঃশক্তিহীন সেই নিদ্রা এক আতুর ক্লান্তির। না শেখরদা, সেই ক্লান্তি বা অবসাদ আমরা চাইনে। তাই বিয়ে আমরা পিছিয়ে দিয়েছি।" তার ভরা ঘাটের মত ছলছলে যৌবনের দিকে তাকিয়ে—আমি বললাম "রমণীর দেহ কি এক বিপুল সম্ভোগের ক্ষেত্র নয়?" সেই জ্যোতির্ময়ী নারীর প্রসন্ন মুখের উপর দিয়ে পলকের জন্য দিব্যাভা যেন তার ছায়া ফেলে গেল। তার চোখে বিস্ময়ের রামধনু। বলবার ভঙ্গিতে একটা স্নিগ্ধ আলস্য এনে সে বললে "না শেখরদা, তা নয়। নারী হল গৃহলক্ষ্মী, দেশ লক্ষ্মী। তাছাড়া আমি বিপ্লববাদিনী। এক বিদ্রোহিনী মেয়েও বলতে পার। বাসনায় পুড়ে আমি ছাই হতে চাইনে শেখরদা, বাসনাকেই আমি পুড়িয়ে মারতে চাই। আমার কথা বাদ দাও। আমার সঙ্গে অন্য মেয়ের মিলবে না। আমার রুচিবোধ ভিন্ন ধরনের। আমি সকল ধর্ম ও সমাজের বাইরে। জাতি-বর্ণ-গণ-গোত্র-গোষ্ঠি কিছু নেই আমার। তা না হলে আমি ময়রার মেয়ে হয়ে ভালবাসলুম কি করে এক কুলীন বামুনের ছেলেকে? বি, এ, বি, টি পাশ করে ভালবাসলুম কি করে এক নন-ম্যাট্রিককে? তুমি হয়ত বলবে অনুরাগের অঞ্জন যখন চোখে লাগে তখন আবার জাত আর ধর্ম! তখন যে সবই মধুময়। কিন্তু না শেখরদা তুমিও তো মানবকে দেখেছ। ও সরল, সংযমী, সাদাসিধে, ও ভগবানে বিশ্বাস করে, ধর্ম মানে, আচার বিচার মানে, প্রতিদিন দেবালয়ে গিয়ে ও পূজা আচ্চা করে। ওর জীবন এক নিস্পৃহ তপস্বীর, এক ব্রতচারীর। ওর এমন গায়ের রং, এমন রাঙা ঠোঁট, চোখের পাতায় যেন কাজল মাখানো, ওর বুকের গড়ন কেউ যেন ছেনি দিয়ে কুঁদে বার করেছে। তাই তো আমার বায়লজির সঙ্গে ও বিলীন হয়ে আছে। তাই ও সিংহাসন পেতেছে আমার সত্তায়সত্তায়। আমি জানি অন্ধকার রাতে ঝড়উঠলে ও আমার তরী ঠিক পৌঁছে দেবে পূর্ণ ঘটের ঘাটে। তুমিই না বললে একটু আগে শেখরদা যে জগতটা অনেক বড়, জীবন সেখানে অনেক বিচিত্র।" এই মুহূর্তে ঐ দোহারা চেহারার মেয়েটিকে আমার মনে হল যেন একটি নিষ্কলঙ্ক দীপশিখা। আর ওই উজ্জল দীপশিখার মত দৃপ্ত মূর্তিটার দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলুম। সে আবার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে "তুমি আমাদের দুজনকে ভুল বুঝোনা শেখরদা। আমাদের এই পবিত্র ভালবাসার মধ্যে, আমাদের এই স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে কোন দায়- দায়িত্ব নেই, কেউ কারও বন্ধনের মধ্যে নেই,—উভয়ের যাওয়া-আসার পথ সম্পূর্ণ খোলা। তাই আমরা এখনো বিয়ে করিনি। দেশের সুদিন এলে তখন করবো। ভারতের জন্ম-সংখ্যা আজ এত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের চারিদিকে আজ এত সমস্যা, আর এত দুর্গতি, এর মধ্যে আমরা মেয়েরা, যারা দেশলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী তারা কি এখন কামাতুরা হয়ে উঠবো? নির্বোধ পুরুষের কাছ থেকে কোন মতে একটি দুটি করে কতোগুলি অপগণ্ড ছেলেমেয়ে শুধু আদায় করে নেবো? বিছানায় গিয়ে শুলো রমণী, আর বিছানা ছেড়ে যখন সে উঠলো তখন জননী। ছিঃ ছিঃ এসব ভাবতে এবং শুনতেও আমার ভীষণ ঘেন্না করে। বেচারা স্বামীকে গলাটিপে বাজারে পাঠাবো, মুদির দোকানে ছোটাবো, রেশনের দোকানে, ও দুধের ক্যান্টিনে কিউতে দাঁড় করাবো। সে আমার দ্বারা হবে না। সে মেয়ে আমি নই। তুমি চোখ বুজে কল্পনা কর শেখরদা অপুষ্টি জনিত রোগে আমাদের একটি বাচ্চা হয়ত ভুগছে। ক্ষিদের জ্বালায় খাবার জন্য আর একটি বাচ্চা হয়তো অনবরত ঘ্যান ঘ্যান করছে। দারিদ্র্যেরজন্য আমাদের বড় ছেলেটি হয়তো চোর হয়েছে। বড় মেয়েটি হয়তো আর একজনের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। এই অনটনের মধ্যে আবার আর একটি সন্তান হয়তো আমাদের আসন্ন। উঃ, এসব ভাবতেও আমার কেমন খারাপ লাগে শেখরদা। আজকের দিনে আমাদের মত মধ্যবিত্তদের বিয়ে না করাই উচিত। কারণ আজকের দিনে সন্তান মানে দুঃখ ও সমস্যা। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত নও?"

বললাম "তোমার মধ্যে নতুন ভাবনার যেন আভাষ পাচ্ছি, মন্দিরা।" সে বললে "ভাবনা মানেই জীবন। নতুন ভাবনা মানে নতুন কাল, নতুন যুগ। শুধু মানুষ নয়— তার মন, এই মন হাঁটে বলেই তো জীবনের গতি পায় শেখরদা।"

বললাম "মনে হচ্ছে তুমি চাইছ মানবাত্মার নতুন উদ্বোধন, যেটাকে বলতে পারা যায় রিভল্যুশনারি হিউম্যানিজম্‌।"

শান্ত গলায় স্মিতমুখে সে আবার বললে "হ্যাঁ শেখরদা তাই। তুমি তো জানো, মানুষের প্রকৃতির ভেতরে এক আশ্চর্য বিজ্ঞানের খেলা চলছে। কে খেলছে সেই খেলা, কে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই চিত্তবিজ্ঞান—তুমি কি বলতে পারো? মানুষের পাঁজরের মধ্যে কোথায় গুপ্ত রয়েছে সেই অদৃশ্য এটমের একটি সূক্ষ্ম বিন্দু—কেউ কি জেনেছে তার রীতি? বোধহয় তারই জন্যে শুধু মানুষেরই প্রকৃতি বদলায় শেখরদা, জন্তু জানোয়ারের প্রকৃতির কোন অদলবদল ঘটে না। তাই মানুষ নবজন্ম লাভ করে প্রতিদিন প্রভাতে। আসে তার নতুন ভাবনা আর উদ্দীপনা, নতুন রুচি আর বৈচিত্র্যবোধ। নতুন প্রাণের চেতনা, নতুন দৃষ্টি।"

উদ্ধত যৌবনের স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত একটা দুঃসাহসী বুককে লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। এর মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে সেই প্রমত্ত ঝড় যে ঝড়ের উত্তাল আভাষ আমি পাচ্ছিলাম? ভাবছিলাম সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্বই যখন আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে; মানুষের অন্তরলোকে যখন মানুষ আজ নিঃস্ব, রিক্ত ও সর্বস্বান্ত তখন সারা দেশের এই ভাঙনের মাঝে এরা এ কোন্‌ প্রেমের আদর্শ তুলে ধরেছে? এদের ভাবনা কতো বিশাল। এ সৃষ্টির যে আদিম দেওয়া নেওয়া নরনারীর মধ্যে তা এদের মধ্যে দেহবাদের সীমানা পার হয়ে এক আশ্চর্য রাজ্যের দ্বার যেন খুলে দিয়েছে মানুষের সম্মুখে। নরনারীর দেহ দেওয়া নেওয়া, মন দেওয়া নেওয়ার অপরূপ পরিণতি এবং পবিত্রতা লাভ করে এরা মানবীয় জীবনে ফুটিয়েছে এক চির অম্লান অমূল্য কমল।

কখন্‌ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে টের পাইনি। ট্রেনটা খুব জোরে ছুটছিল। একেবারে ঝড়ের বেগে। মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করে ছুটছিল। দ্রুত বিলীয়মান অস্পষ্ট জোছনাভরা মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে পড়ল ঐ ঘটনার তিনচার বছর পর আমার স্ত্রী মহুয়া হঠাৎ মারা গেলেন। তখন একটি মাত্র শিশু পুত্র নিয়ে আমি বড় বিব্রত হয়ে পড়ি। শিশুটির বয়স তখন পাঁচ বছর হবে। এই সময় মন্দিরা এসে স্বেচ্ছায় আমার শিশু পুত্রের শিক্ষার ভার নিল। রোজ সকালে সে এসে ছেলেটাকে মুখ ধুইয়ে, জল খাইয়ে, কোলে করে নিয়ে পড়াতে বসত। প্রায় প্রত্যেক দিনই সে আমার ছেলের জন্য কিছু না কিছু জিনিষ আনত। কোনদিন বা খেলনা, কোনদিন ছবির বই, কোনদিন খাতা, কোনদিন কলম ও পেনসিল ইত্যাদি। বারণ করলেও সে শুনতো না। একটা কথা বলে রাখি নিজে মা হতে তার দেশের এই দুর্দিনে আপত্তি ছিল বটে কিন্তু শিশুদের সে ভালবাসতো গভীরভাবে। মাসের শেষে তার হাতে যখন আমি কিছু টাকা তার পারিশ্রমিক হিসাবে তাকে দিতে গেলাম সে জিভ কেটে বললে "ছিঃ শেখরদা, তোমার ছেলেকে পড়ানোর বিনিময়ে আমি টাকা নেবো? ও কি আমার পর? তুমি আমাকে এত ছোট ভাবো?" এরপর সে আর আসতো না। নানা ঝামেলায় তখন আমিও খুব জড়িয়ে পড়েছিলাম। তাই ছেলেটিকে তার মামাবাড়ীতে পাঠিয়ে দেই। এই সময় আমার ছোট্ট বাসাটাও হঠাৎ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। আমি তখন প্রায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার একদিন এই পথেই দেখা হল ওই মন্দিরার সঙ্গে। না, তখনো তারা বিয়ে করেনি, সুদিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। যাকগে এখন আমার সব কথা শুনে সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তার নতুন বাসায়। সে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট তখন সি-আই-টি রোডে ভাড়া নিয়েছে। আমাকে ছাড়লো না। ক'দিন তার বাসাতেই সে আমাকে রেখে দিল। দুবেলা আহার জোগাল। খোরাকিবাবদ তার হাতে যখন আবার কিছু টাকা আমি দিতে গেলাম সে তেমনি জিভ কেটে বললে "ছিঃ শেখরদা, তোমাকে দুদিন খাইয়েছি বৈতো নয়, তার বিনিময়ে আমি টাকা নেবো?

তুমি কি আমাকে এত ছোট ভাবো?" সেবার মন্দিরাই চেষ্টা করে আমাকে একটা ছোট বাসাও তাদের কাছাকাছি—জোগাড় করে দিল। এই সময় মানবকে আমি কাছের থেকে দেখলাম। শান্ত, স্নিগ্ধ, যেন মন্দিরে পিলসুজের আলোটির মতই পবিত্র। একদিন মানবকে আমি বললাম "তোমরা যে এইভাবে বাস করছ, এতে বদনামের ভয় আছে। কলঙ্ককে কি ভয় করো না?"

মানব হেসে বলল "জীবন মানেই যুদ্ধ, যে ভয় পায় সে পিছিয়ে পড়ে মরে। উদ্দেশ্য যদি বড় হয়, আমাদের মধ্যে মন্দ যদি কিছু না থাকে, তবে নিন্দেতে ভয় পাবো কেন? দুষ্ট শক্তির সামনে আমরা নির্ভয়ে হাসি মুখে দাঁড়াতে চাই শেখরদা। আপনি আমাদের সেই আশীর্বাদ করুন। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম পাপ আর মহোত্তম পুণ্যের মাঝখানে ঐ মন্দিরা দাঁড়িয়ে আছে শুচি শুদ্ধ হয়ে। মন্দিরা কঠিন মেয়ে, ওর মেরুদণ্ড শক্ত। ও ছুটেছে এক মহৎ সত্যের দিকে, ওর পথ ও ঠিক চেনে। ওকে ভয় দেখাবে কে? ও কি কলঙ্ককে ভয় করে? শুধু মন্দিরা কেন মানবের মধ্যেও এই সময় পুনর্জ্জীবন লাভের শুভ এক সূচনা আমি দেখেছিলাম। আপন পৌরুষ নিয়ে, আপন মনুষ্যত্ব নিয়ে সে যেন দাঁড়াতে চায়। আঘাত হানতে চায় দুর্নীতির বিষাক্ত ফণায়। দুষ্ট চক্রান্তকে উৎপাটন করতেই যেন তার দুর্জয় সঙ্কল্প। এই সময়েই শুনলাম মানব মন্দিরার কাছে পড়ে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক ও প্রি ইউনিভারসিটি পরীক্ষায় পাশ করেছে। আর ঐ মেয়ে স্কুলের কেরাণীর চাকরীটাও সে গ্রহণ করেছে। আবার প্রাইভেটে সে বি-এ দেবে। তারপর এম-এ। বুঝলাম ভালবাসা যে স্পর্শমণি একথা সত্য। এক নিরাসক্ত সন্ন্যাসী যেন কঠোর তপস্যা করছে, বীর হস্তে সে বীরমাল্য পরিয়ে দেবে তার অক্ষত, অব্যাহত ও সমগ্রকে। ট্রেনটা দুলছিল। আমিও দুলছিলাম। নিশুতি রাত, সমস্ত কামরা ঘুমে অচৈতন্য। শুধু ট্রেনের গতির একটানা শব্দ। মনে পড়ল হাওড়া ষ্টেশনে আমার সেই বন্ধুর কথা। বন্ধু বলেছিল "শেখর, মন্দিরার অত অসুখ করেছিল বটে কিন্তু মানব তাকে অবহেলা করে হাসপাতালে ফেলে দেয়নি, বাড়ীতে রেখে নিজে সব করেছে। ডাক্তার ডেকে এনেছে, ওষুধ খাইয়েছে, পথ্য তৈরী করে দিয়েছে, দিনরাত কাছে কাছে থেকে তার সেবা করেছে। স্কুলে কাজের থেকে ছুটি নিয়েছে—তবু মন্দিরাকে মানব চোখের আড়াল করেনি। ভাল ভাল ডাক্তার দেখিয়েছে। সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি করেনি। মন্দিরাও ওর নিজের অর্জিত এবং ওর পিতার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি, তা প্রায় নগদ বারো হাজার টাকার মত হবে, সমস্তই সে মানবের নামে দান পত্র করে লিখে দিয়েছিল। মানবও আবার সেই টাকা তার পরের দিন মন্দিরার সামনেই মন্দিরার নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দিয়েছে। একটি পয়সাও সে নিজে নেয়নি। বরং মন্দিরার সমস্ত চিকিৎসা করেছে মানব তার নিজের পয়সায়। দেখ কি অটল; আত্মস্থ ও স্থিতধী পুরুষ ঐ মানব।"

ট্রেনটা তখন কোন একটা নদীর সাঁকো পার হচ্ছিল। দেখলাম দূর পশ্চিম দিগন্তে নবমীর চাঁদটুকু যেন মৃত্যু শয্যায় শয়ান। তার শেষ আভাটুকু পড়ে নদীর জল চিক চিক করছিল। ঠাণ্ডা রুক্ষ হাওয়া এক একবার আমার জানালায় ঝাপট দিয়ে যাচ্ছিল। সেই দমকা হাওয়ায় আমি যেন মন্দিরার গলার স্বরই শুনতে পাচ্ছিলুম। সে যেন বলছে সেই আগেকার মত করে "শেখরদা, তুমি কি জানো আমাদের দেশে প্রতিদিন কত শিশু জন্মাচ্ছে এবং এই জন্ম দিতে গিয়ে কত মা অকালে প্রাণ হারাচ্ছে? এখন আমাদের দেশের মেয়েরা যদি মূঢ় হয়ে থাকে তবে তারা দুঃখ পাবে। যদি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তবে তারা কাঁদবে। পুরনো কালকে যদি এমনি করে আজ আঁকড়ে ধরে থাকে তবে তারা মরবে। তুমি অধ্যাপক, আর আমি শিক্ষিকা, দেশের, এই দুদিনে জাতির প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্য নেই? খাদ্য সমস্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আজ জাতির সামনে ভীষণ ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু কি এই, চেয়ে দেখ সভ্যতা মরছে আজ উপবাস করে, সাধুতা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, অথচ অন্যায়, লোভ আর বর্বরতা,—চোরাকারবারী, কালোবাজারী, আর মজুতদারী—সারা দেশ জুড়ে তাদের রাজ্যপাট বিস্তার করে বসে আছে। শেখরদা কোথায় অদৃশ্য হল আজ তারা যারা দধীচির কঙ্কাল থেকে বজ্রদণ্ড তুলে এনেছিল? কোথায় মিলিয়ে গেল তারা যারা মৃত্যুর থেকে খুঁজে পেয়েছিল অমৃত?

সত্যের সেই জ্যোতির্ময়তা কই ? বলতে পারো শেখরদা, আজকের দিনের জীবনের এই বিপুল অ ংচয়কে রোধ করার জন্য কবে কোথা দিয়ে আসবে আমাদের দেশের সেই কল্যাণব্রতীর দল ?" গাড়ীর তলায় জাঁতা-পেষার মত একটানা একটা শব্দ হচ্ছিল। ওই শব্দে দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের একটি বিপ্লবী কণ্ঠ—মন্দিরার সেই দুঃসাহসিক কণ্ঠস্বর চিরতরে বুঝি হারিয়ে গেল। মনে হল সত্যের ভয়হীন জয় যাত্রায় সে এখান থেকে পরলোকে চলে গেছে। চিরকালের মত মাটীর ফোঁটার একটি তিলক ললাটে এঁকে এই পৃথিবীর প্রতি শেষ প্রণামের প্রদীপ জ্বালিয়ে গভীর মৃত্যুর অন্ধকারে সে আত্মগোপন করেছে। এই আত্মগোপন তার ক্ষেত্রে বোধকরি আত্মনিবেদন, কেবল মাত্র অজানাকে জানবারই একান্ত কামনায়। দুরন্ত অভিমানে ক্লান্ত চোখ দুটি আমার ভিজে ভারী হয়ে এল। বাইরে পূর্ব দিগন্তে তখন সবুজ হয়ে জাগছে ভোর।

তুমি তখন জাগিবে স্বপ্ন থেকে

সুরেশ ভট্টাচার্য

দুজনে আমরা ভালবাসা নিয়ে গড়েছি জীবন বটে
নিবেদন তরে কেন নেই সাধ, বুঝিতে নারিনু কভু।
প্রতি দিবসের ভাবাবেশ লয়ে রচিলাম হৃদিপটে,
রঙ্ ছুট্ ছবি দেখে গেলে শুধু, কহিলেনা কিছু তবু।
সাগরের সাথে তারাদের দলে ভালোবাসা চিরদিন,
আকাশের বুকে জমে আছে আজো অনাদি কালের ঋণ।

সুরের আলাপে কথা কেঁপে ওঠ সুরবাহারের তারে,
ঝাউ ঝরাবনে ঢেউ লাগে তার নদীটির কিনারায়।
কত মেঘ ঝড় এসেছে মোদের যৌবনে বারে বারে,
আজি কি আকাশ স্বচ্ছ সুনীল সিন্ধুর মমতায়।
জোনাকির রঙে ঝিলমিল হোলো সবুজ বসন তব,
নিদ্রাবিহীন নয়নে আমার তুমি যেন অভিনব।

তোমার গানের মঞ্জরী যেন অমেয় মাধুরী ভরা,
দীঘল পথের ক্লান্তি আমার হরণ করেছ তুমি।
প্রণয়লোলুপ পান্থজনের বাহুতে দাওনি ধরা,
কুসুম কোথায় ফুটিয়াছে তব অলির পরশ চুমি ?
মনের ভুগোলে রহিলে নি৴ত বিষুবরেখার মত—
তোমারে হেরিব ভাবি নাই কভু পথ চলিবার মাঝে,
পোতাশ্রয়ের বাতিঘর সম দেখেছি ললনা কত—
হারাতে হারাতে দিনগুলি গেছে স্মৃতি হয়ে তাং৷ রাজে।

তোমার আমার মিলনের সেতু সময়ের স্রোত ঠেলে
কে আজ রচেছে কেবা জানে তাহা ? যেন রহস্যময় !
পৃথিবীর গতি ঘুরে যেতে পারে সব কিছু শেষে ফেলে,
হয় তো আবার ফেরারি প্রাণের পড়ে রবে পরাজয়
রাত্রি এখন গভীর হয়েছে, প্রান্তরে ড কে পাখী
ভবিষ্যতের ভোরের বেলায় উদয়ের আলো মেখে
হয় তো নীড়ের বিহগমিথুন পাতায় পালক রাখি
চলে যাবে দূরে ; তুমি কি ত৺ন জাগিবে স্বপ্ন থেকে ?

——

খেলাধুলা

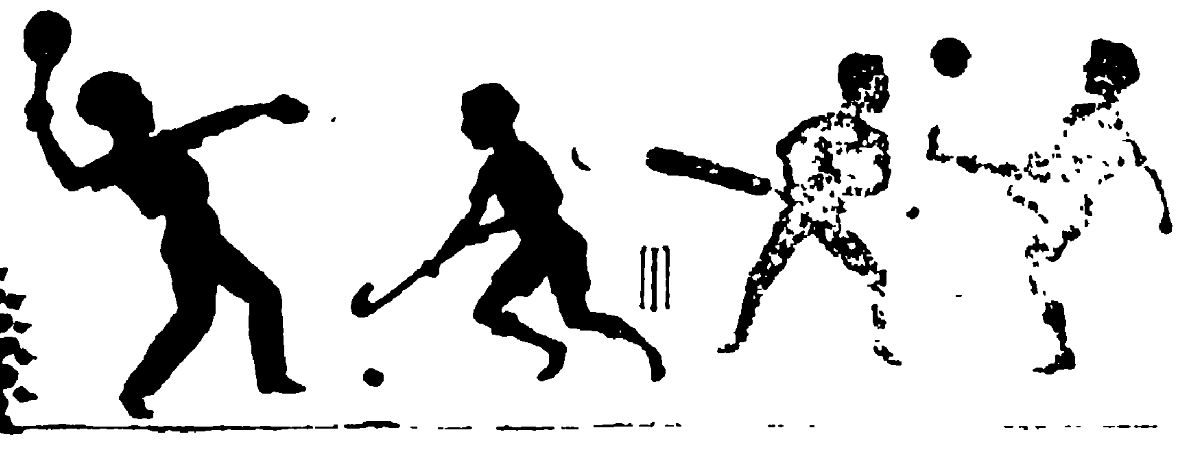

শৈল চট্টোপাধ্যায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

॥ উন্মুক্ত উইম্‌ব্লেডন্ ॥

বিশ্ব-টেনিসের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা এবং বেসরকারী ভাবে স্বীকৃত টেনিসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্ হচ্ছে ইংলণ্ডের এই উইম্‌ব্লেডন্ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার বয়স হচ্ছে বিরাশি বৎসর। এই ৮২ বৎসরের ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার ইতিহাস ঘ াটলে দেখা যায় এতকাল এই প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়েরাই যোগদান করবার অধিকার পেয়ে এসেছে। পেশাদার খেলোয়াড়, তিনি যত বড় খেলোয়াড়ই হন, এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার তাঁর অধিকার ছিল না। তাই অনেক প্রখ্যাত উইম্‌ব্লেডন্ চ্যাম্পিয়ান্‌ই পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করায় পুনরায় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। ফলে দেখা যাচ্ছিল যে একে একে বিশ্ব-টেনিসের শ্রেষ্ঠ তারকাগুলি পেশাদার বৃত্তির লোভনীয় আকর্ষণে উইম্‌ব্লেডনের আসর ত্যাগ করছিলেন. আর টেনিস জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলির অদর্শনে উইম্‌ব্লেডন্-এর উজ্জ্বলতাও ক্রমশই যেন হ্রাস পাচ্ছিল।

৴।কলস্তরের খেলোয়াড়ের যোগদান

বেশ কিছুদিন থেকেই তাই চেষ্টা চলছিল পেশাদার খেলোয়াড়দেরও উইম্‌ব্লেডন্-এ অংশ গ্রহণের অধিকার দেবার জন্য। কিন্তু পেশাদার বৃত্তি নিবারণে সচেষ্ট টেনিস-মহল এ প্রচেষ্টায় বাধা দান করে আসছিলেন এতদিন। এবারে তাঁদের সুমতি হয়েছে এবং উইম্‌ব্লেডন্-এর এবারের এই ৮২তম প্রতিযোগিতায় পেশাদার-অপেশাদার সকল খেলোয়াড়কেই যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই এবার থেকে সকল বাধা-নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে উইম্‌ব্লেডন্ হ'ল উন্মুক্ত উইম্‌ব্লেডন্ (Open Wimbledon)! বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে সৃষ্টি হল এক নব ইতিহাসের—সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আজ তাই এই উন্মুক্ত উইম্‌ব্লেডন্-এর দিকে।

বিশ্বের টেনিস ইতিহাসে যা কখনও হয় নি এবারে তাই সম্ভব হল। পেশাদার, অপেশাদার সমেত বর্ত্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস্ প্রতিভার সমাবেশ হয়েছে এবারকার উইম্‌ব্লেডন্-এ। সারা জগতের টেনিস খেলোয়াড়দের পীঠস্থান স্বরূপ উইম্‌ব্লেডন্-এর 'সেণ্টার কোর্ট' এবার টেনিস জগতের সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের পদতাড়নে প্রফুল্ল হয়ে উঠবে। তাই এ ারকার এই প্রথম উন্মুক্ত উইম্‌ব্লেডন্-এ খেলবার সুযোগ যাঁরা পেলেন তাঁরা ভাগ্যবান। এমনকি যাঁরা .দখবার সুযোগও পেয়েছেন তাঁরাও যে সৌভাগ্যবান তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নদের যোগদান

এবারকার উইম্‌ব্লেডন্-এ যেসব কীর্ত্তিমান্ প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান্ যোগদান করেছেন তাঁরা হচ্ছেন—লু হোড্ (১৯৫৬ ৫৭), অ্যালেক্স অলমেডো (.৯৫৯), রড্ লেভর (১৯৬১-৬২), রয় এমারসন্ (১৯৬৪-৬৫), স্পেনের ম্যানুয়েল্ সান্তানা (১৯৬৬) এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন জন্ নিউকোম্ব (১৯৬৭)। অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইম্‌ব্লেডন্ চ্যাম্পিয়ন্ ফ্র্যাঙ্ক সেজ্‌ম্যান্‌ও যোগদান করেছিলেন, কিন্তু হাতের আঘাতের জন্য তিনি

প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এঁরা ছাড়া প্রাক্তন ফাইনালিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার কেন্ রোজওয়াল্ (১৯৫৪ ৫৬), ফ্রেড্ ষ্টোল্ (১৯৬৩-৬৫) এবং ডেনিস্ র্যাল্‌ষ্টোন্ (৯৬৬)। এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন উঠ্‌তি তরুণ অপেশাদার খেলোয়াড় রয়েছেন, যেমন—ডাচ্ খেলোয়াড় টম্ ওক্কের এবং মার্কিন ডেভিল্ কাপ্ খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস্ চার্লি প্যাসারেল ও ক্লার্ক গ্রেব্‌নার।

এবার কে জয়লাভ করবে ?

মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন গত দুবারের চ্যাম্পিয়ান্ শ্রীমতী বিলি জিন্ কিং, যিনি গত এপ্রিল মাসে পেশাদার হয়েছেন, তাঁর উপর্য্যুপরি তৃতীয়বার মহিলা বিভাগে জয়ী হবার সম্ভাবনা রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর শারীরিক পটুতার সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে অনেকের মনে। বিলি জিন্ কিং-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিনী অষ্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (পূর্ব্বতন মার্গারেট স্মিথ—১৯৬৩ ও ৬৫ সালের বিজয়িনী) কিছুদিন বিশ্রামের পর আবার নতুন উদ্যমে খেলছেন এবং তাঁর চ্যাম্পিয়ন্ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এঁদের দু'জনের পরই পঁচিশ বৎসর বয়স্কা টেক্সাসের ন্যান্‌সি রিচির নাম করা যায়। সম্প্রতি সমাপ্ত ফরাসী ওপেন চ্যাম্পিয়ান্‌শিপে তিনি বিজয়িনী হয়েছেন। এরপর ছয় নম্বর সিডিং-এ রয়েছেন আটাশ বৎসর বয়স্কা ব্রাজিলের তিনবার উইম্‌ব্লেডন্ বিজয়িনী মারিয়া বুয়েনো। তিনিও যে আবার বিজয়িনী হবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করবেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের দিকে তাকিয়ে রড্ লেভার ও মার্গারেট কোর্ট-এর নামই বিজয়ী ও বিজয়িনী রূপে মনে আসছে, কিন্তু সব গণনা উল্টে দিয়ে অন্য কোনও দু'জনই হয়ত এবারের বিজয়ী ও বিজয়িনীর মুকুট লাভ করবেন।

ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিরাশ করলেন

তবে এবারের এই উন্মুক্ত উইম্‌ব্লেডন্ প্রতিযোগিতা ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে কিন্তু বিশেষ আশাপ্রদ হয় নি। ভারতের প্রখ্যাত ত্রয়ী রমানাথন্ কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জ্জি ও প্রেমজিত লাল একে একে প্রথম রাউণ্ডেই বিদায় গ্রহণ করেছেন। ভারতের কীর্তিমান্ খেলোয়াড় ৩১ বৎসর বয়স্ক রমানাথন্ কৃষ্ণন্, যিনি দুবার ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে উইম্‌ব্লেডন্ সেমিফাইনালে পৌঁছ'বার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁকে প্রথমেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল আমেরিকার প্রখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড় ৪০ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ পাঞ্চো গঞ্জালেসের সঙ্গে। সেণ্টার কোর্টে এই খেলাটি হয় এবং কৃষ্ণানকে পরাজয় বরণ করতে হয় ২-৬, ৪-৬ ও ৩-৬ সেটে। গঞ্জালেস এবার আট নম্বর সিডিং পেয়েছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ডবলসে উইম্‌ব্লডন্ চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্ লাভ করেছিলেন। কিন্তু গঞ্জালেসও বেশীদূর এগুতে পারলেন না। পরের রাউণ্ডেই তিনি পরাজিত হলেন ২১ বছর বয়স্ক রুশ ছাত্র আলেক্সি মেত্রেভেলীর কাছে।

জয়দীপ মুখার্জ্জি গত বৎসর তৃতীয় রাউণ্ড অবধি উঠেছিলেন। যেখানে সেবারের পঞ্চম সিডিং প্রাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লিফ্ ড্রাইস্‌ডেল্-এর কাছে পরাজিত হন। এবারে জয়দীপকে দু'নম্বর কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল সপ্তম সিডিং প্রাপ্ত অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইম্‌ব্লেডন্ চ্যাম্পিয়ন্ পেশাদার খেলোয়াড় লু হোড্-এর সঙ্গে এবং জয়দীপ পরাজিত হলেন ৩-৬, ৪ ৬ ও ২-৬ সেটে।

ভারতের তৃতীয় খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লাল, যিনি গতবারে প্রথম রাউণ্ডে জিতেছিলেন, এবারে খেললেন মিশরের (ইউ, এ, আর) এল্ সাফি-র সঙ্গে এবং পরাজিত হলেন ৪ ৬, ৪-৬, ৬-৩ ও ২-৬ সেটে।

সুতরাং এবারকার উইম্‌ব্লেডন্ যে ভারতীয় টেনিস মহলে নৈরাশ্য জাগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এখন নতুন ও তরুণ খেলোয়াড় তৈরীর দিকে ভারতীয় লন্ টেনিস এসোসিয়েশন্‌কে একান্তভাবে মনোযোগী হতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে রমানাথন কৃষ্ণনের, মতন আরও খেলোয়াড় ভারতের টেনিস কোর্টে তৈরী হয়।

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্ রূপে গণ্য করা হোক :

যাই হোক, এবারকার এই যুগান্তর সৃষ্টিকারী উন্মুক্ত উইম্‌ব্লেডন্‌কে সারা বিশ্বের টেনিস মহলের সঙ্গে আমরাও স্বাগত জানাচ্ছি—স্বাগত জানাচ্ছি এই জন্যে যে এই উইম্‌-ব্লেডন্ প্রাঙ্গণে বিশ্বের পেশাদার অপেশাদার সর্ব্বস্তরের

শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার এবার থেকে সুযোগ পেলেন এবং এতে বিশ্বের টেনিস খেলার মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে হয়। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না—এতদিন উইম্‌ব্লেডন্‌কে বেসরকারী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ্ রূপেই পরিগণিত করা হয়ে আসছে; কিন্তু এবার সময় এসেছে এই অল্‌-ইংলণ্ড বা উইম্‌ব্লডন্ প্রতিযোগিতাকে সরকারীভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপরূপে স্বীকৃতি দানের। অর্থাৎ এবার থেকে উন্মুক্ত উইম্‌ব্লডন্ বিজয়ী-বিজয়িনীদের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নের সম্মানে ভূষিত করা হোক। সংশ্লিষ্ট মহলও হয়ত এ কথা ভাবছেন।

॥ "আসেজ"-এর যুদ্ধ ॥

ঐতিহাসিক "অ্যাসেজ" জয়ের পুরাতন যুদ্ধ আবার নতুন ভাবে সুরু হয়েছে। এ পর্য্যায়ের ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ এখন ইংলণ্ডের মাটিতে চল্‌ছে। প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া দল বেশ ভালভাবেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী ইংলণ্ড দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় টেষ্টে এই বিজয় গর্ব্বে গর্ব্বিত দল কোনও রকমে বৃষ্টির জন্য খেলাটি অমীমাংসিত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কে "রাবার" জিতবে?

এবারের ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়ায় এই টেষ্ট পর্য্যায়ে ইংলণ্ডই "রাবার" লাভ করবে এই আশাই বেশীর ভাগ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রথম ধাপেই অষ্ট্রেলিয়ার এই অপেক্ষাকৃত তরুণ দল জয়মাল্য লাভ করল। প্রথম টেষ্টে যে ইংলণ্ড দল এ-ভাবে পরাজিত হবে তা বোধ হয় কেহই ভাবে নি। কারণ বেসরকারী ভাবে হলেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান্ বা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং সদ্য সদ্য সেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মাটিতেই হারিয়ে ইংলণ্ড সগৌরবে 'রাবার' জয় করে এসেছে। সুতরাং ইংলণ্ড দলকে এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল বলা চলে। ওদিকে, অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পরাজিত হবার পর এই ইংলণ্ড সফরে এসেছে। অষ্ট্রেলিয়া দলে এবার নামকরা খেলোয়াড়ও বেশী নেই। সুদক্ষ অধিনায়ক সিম্‌সন্ অবসর নিয়েছেন তাই বিল্ লরীর ওপরই দল পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে। বিল্ লরী অধিনায়করূপে কতটা সফল হবেন এবং নিজের স্বাভাবিক খেলা অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খেলতে পারবেন কি না—এ সব প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদয় হয়েছিল। তার ওপর আগেই বলেছি দলটিতে নামকরা পুরাণ খেলোয়াড় বেশী নেই। ইংলণ্ডের বৃষ্টি ভেজা নরম পীচে অষ্ট্রেলিয়ার অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না বলেই অনেকে ধারণা করেছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয় খেলোয়াড়রা, বিশেষ করে তাঁদের ব্যাটস্‌ম্যান্‌রা, এ ধারণা যে ভুল তা প্রমাণ করে দিলেন। তাই দ্বিতীয় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয় দল লর্ডস্ মাঠে খেলতে নামলেন, তাঁদের পূর্ব্বতন বিজয়ের জন্য, একটু যেন অসতর্ক ভাবেই। ফলে ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ৩৫১ রাণ উঠল। অষ্ট্রেলিয় বোলাররা বোলিং-এ বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁদের দ্রুতগামী ওপনিং বোলার গ্র্যাহাম মেকেঞ্জি একটিও উইকেট পেলেন না। অবশ্য নেল্ হক ৩টি উইকেট (এড্‌রিচ, বয়কট ও কউড্রে) লাভ করেছেন ১১১ রাণ দিয়ে, আর কনোলী পেয়েছেন ৫৫ রাণ দিয়ে ২টি উইকেট (ব্যারিংটন্ ও গ্রেভ্‌নী)।

ইংলণ্ডের প্রচণ্ড বোলিং

ইংলণ্ড দল তাঁদের প্রথম টেষ্টের পরাজয়ের গ্লানি মোচন করতে এই টেষ্টে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই যে নেমেছিল তা তাঁদের খেলার ধরণ থেকেই বোঝা যায়। ইংলণ্ডের ফাষ্ট বোলার ডেভিড্ ব্রাউন, জন স্নো ও ব্যারি নাইট্ অপূর্ব্ব দক্ষতায় বলকে 'সুইং' করিয়ে অষ্ট্রেলিয় দলকে মাত্র ৭৮ রাণে নামিয়ে দিলেন। বিশেষ করে ইংলণ্ডের ফাষ্ট বোলার ডেভিড্ ব্রাউন্-এর সিম্ বোলিং সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। তিনি যেন অষ্ট্রেলিয় ফাষ্ট বোলার মেকেঞ্জি ও হক্-কে দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে লর্ডস্ মাঠের এই পুরাণ পীচে বল করতে হয়। তাঁর বলে অষ্ট্রেলিয়ার কোনও ব্যাটস্‌ম্যানই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে পারেন নি। ব্রাউন্ মাত্র ৪২ রান দিয়ে ৫টি উইকেট পেয়েছেন। ইংলণ্ডের অপর ফাষ্ট বোলার জন স্নো ও ব্যারি নাইটও প্রশংসনীয় ভাবে বল করেছেন। স্নো ৯ ওভার বল দিয়েছেন তার মধ্যে ৫টি

ওভার 'মেডেন' অর্থাৎ কোনও রাণই হয় নি এবং বাকি ৪টি ওভারে ১৪ রাণ দিয়ে ১টি উইকেট (কাউপার) পেয়েছেন। তাঁর বলই কিন্তু অষ্ট্রেলিয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌দের বিশেষ ক্ষতি সাধন করেছে। অপর বোলার ব্যারি নাইট্‌ ১০'৪ ওভার বল দিয়ে ৩টি উইকেট পেয়েছেন মাত্র ১৬ রাণে। তাঁরও ৫টি ওভার ছিল 'মেডেন্‌'। অষ্ট্রেলিয়ার এই ৭৮ রানের প্রথম ইনিংসে দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডের তিনজন বোলার বল করেছেন ৯+১৪+১০'৪=৩৩'৪ ওভার=২০২টি বল। এর মধ্যে ১৫টি ওভার ছিল মেডেন্‌ অর্থাৎ কোনও রান হয় নি। এই ২০২টি বল এই ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার ১১ জন ব্যাটস্‌ম্যান্‌ খেলতে পেয়েছিলেন এবং তার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র ৭৮টি রান। ইংলণ্ড দলের বোলিং যে কত ভাল হয়েছিল এর থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে অষ্ট্রেলিয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌দের সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে তাঁরা ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌দের মতন শক্ত ও নির্দোষ উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত। লর্ডস্‌ মাঠের বৃষ্টি ভেজা নরম পীচে তাঁদের অনভিজ্ঞ তরুণ খেলোয়াড়রা সুবিধা করতে পারেন নি। বিশেষ করে লর্ডস্‌ মাঠের পুরাণ পীচে এবং ইংলণ্ডের ভারী হাওয়ার মধ্য দিয়ে সুইং বোলিং-এ অভ্যস্ত স্নো, ব্রাউন্‌ ও নাইটের আক্রমণাত্মক বোলিং-এ তাঁরা প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। এই আক্রমণাত্মক বোলিং এ বল প্রায় সব সময়েই উইকেটের মধ্যে থাকে এবং তাকে খেলতেই হয়, ছাড়বার উপায় নেই, অবশ্য রাণ ওঠবার সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌রা রান তোলা তো দূরের কথা উইকেট টিঁকে থাকতেও পারেন নি। বরঞ্চ মারতে গিয়ে, না মেরে উপায় ছিল না, তাঁরা উপর্যুপরি 'ক্যাচ্‌' দিয়ে গেছেন; আর ইংলণ্ডের ফিল্ডাররা বাজের মত ছোঁ মেরে সব ক্যাচ্‌গুলিই ধরেছেন।

'ক্যাচ' ধরার রেকর্ড

ইংলণ্ডের উইকেট্‌ রক্ষক নট্‌ দুটি ক্যাচ ধরেছেন। এর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ও ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান্‌ বিল লরীর ক্যাচ ধরাটি হয়েছিল চমকপ্রদ! লরী ব্রাউনের বলে পেছিয়ে খেলতে গেলে বল বেশী সুইং করে তাঁর ব্যাটের ভিতরের দিকের কানায় বা ধারে লাগে এবং উইকেটরক্ষক নট্‌ অপূর্ব্ব দক্ষতায় এই 'ক্যাচ' ধরে অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রধান ব্যাটস্‌ম্যান্‌ ও অধিনায়ককে শূন্য রানে প্যাভেলিয়নে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। এর পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংলণ্ড অধিনায়ক বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান্‌ ও ফিল্ডার কলিন্‌ কাউড্রে এই ম্যাচে 'ক্যাচ্‌' ধরা। এই টেষ্টে কলিন্‌ কাউড্রে তিনটি চমৎকার 'ক্যাচ্‌' ধরে, ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান্‌ ও ফিল্ডার ওয়াল্টার হ্যামণ্ড-এর ১১০টি 'ক্যাচ্‌' ধরার রেকর্ড অতিক্রম করে, ইংলণ্ডের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ক্যাচ্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌" রূপে পরিগণিত হলেন!—সাবাস কাউড্রে! ব্যাটিং, ফিল্ডিং ও অধিনায়কত্বে তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন তা শুধু ইংলণ্ডই নয়, সমগ্র ক্রীকেট জগৎ শ্রদ্ধার সহিত বহুকাল স্মরণ করবে।

ইংলণ্ড জয়লাভে বঞ্চিত হল

কিন্তু এত করেও ইংলণ্ড দল এই টেষ্টে জয়মাল্য লাভ করতে পারল না। বৃষ্টির জন্য অনেক সময় আগেই নষ্ট হয়েছিল, তার ওপর শেষ দিনে অষ্ট্রেলিয়া যখন "ফলো অন্‌" করে আবার ব্যাট করছিলেন, তখন তাঁদের কোনও উইকেট না হারিয়ে ৫০ রাণ ওঠার পর জোর বৃষ্টি নামায় খেলা পরিত্যক্ত হয় এবং অষ্ট্রেলিয়া দল খেলাটি অমিমাংসিত রাখতে সক্ষম হয়ে মান রক্ষা করেন।

আগামী টেষ্টেও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে

এখন তৃতীয় টেষ্টের দিকে বিশ্বের ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীরা তাকিয়ে আছেন, আর কোন দল জিতবে তা নিয়ে গবেষণা করছেন। অষ্ট্রেলিয়া একটি টেষ্ট জিতে এগিয়ে আছে। বাকি তিনটি টেষ্ট যদি অমীমাংসিত ভাবেও শেষ হয় তাহলেও তাঁরা 'রাবার' জিতে ঐতিহাসিক "অ্যাসেজ" তাঁদের দখলে রাখতে পারবেন। তবে তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড দল জয়লাভের জন্যে যথাশক্তি চেষ্টা যে করবে তাতে সন্দেহ নেই, আর অষ্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় টেষ্টের এই বিপর্যায়ের পর অত্যন্ত সতর্কভাবে সর্ব্বশক্তি দিয়ে ইংলণ্ডকে রুখবার চেষ্টা করবে। তাই এজ্‌বাষ্টনের আগামী তৃতীয় টেষ্টের দিকে ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীরা সাগ্রহে চেয়ে আছেন দুই পুরাণ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখবার জন্য।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৫

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

গায়ত্রী উপাসনা

শ্রীঅনিলবরণ রায়

সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াই ঋগ্বেদের শেষ হইয়াছে—

ওঁ সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানী:
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েব
সমানেন বো হবিষা জুহোমি
ওঁ সমানীব আকুতিঃ সমানং হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

আমাদের মন্ত্র হউক এক, মন প্রাণ হৃদয় হউক এক, আমাদের উপাসনা হউক এক, সমগ্র মানবজাতি হউক এক সমিতি এক সমাজ। আজ পর্য্যন্ত এই আহ্বান কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু হাজার হাজার বৎসরের সাধনার দ্বারা বহু পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা দিয়া আসিয়া আজ মানবজাতি সেই আদর্শে উপনীত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ নানা ধর্ম্ম নানা পথের বিকাশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এখন আর সেই সব পশ্চাতে-ফেলা পথের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার আবশ্যকতা নাই—এখন সকলকে এক মন্ত্র এক উপাসনা দিয়া এক মানবীয় সমিতি, মানবীয় সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই এক মন্ত্র, সেই এক উপাসনা কি হইবে বেদের মধ্যেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। সেই মন্ত্র গায়ত্রী এবং সেই উপাসনার স্বরূপ রহিয়াছে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে। কিন্তু বেদ উপনিষদের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করা আজ ভারতীয়দের

মধ্যেই সাতিশয় কঠিন, অন্যান্য দেশের ত কথাই নাই। কিন্তু গীতার মধ্যেই বেদ উপনিষদের শিক্ষার সার এমন ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যাহা শুধু ভারতবাসী নহে, সমগ্র জগদ্বাসীই সহজে গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃ হইতেছে তাহাই—আজ ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি প্রগতিশীল পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ গীতা-পুস্তক সাদরে পঠিত হইতেছে—এমনটি আর পৃথিবীর অন্য কোন শাস্ত্রসম্বন্ধেই বলা যায়না। সকল শাস্ত্রেই দুইরকমের সত্য থাকে, এক রকমের সত্য, সনাতন সত্য সকল দেশে ও কালে সত্য, আর এক রকম সত্য কোন বিশেষ দেশ ও কালের উপযোগী। গীতাতে এই দ্বিতীয় প্রকারের সত্য খুব কমই আছে এবং যাহা আছে তাহার এমন ব্যাখ্যা করা যায় যাহাতে তাহা সকল দেশের ও কালের উপযোগী হইতে পারে—এই জন্যই গীতা সার্বজনীন শাস্ত্র Universal Scripture হইয়া উঠিয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝান যাইতে পারে। গীতা যজ্ঞের কথা বলিয়াছে উহা প্রাচীন ভারতের ধর্মানুষ্ঠান—কিন্তু গীতায় উহা যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত পাশ্চাত্য মানবধর্ম বা humanism-এর কোনই প্রভেদ নাই—সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। গীতার যজ্ঞ—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।

ইহা যে বাহ্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া যজ্ঞ করা নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

অন্য দিকে পুরাণ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রে জগৎসৃষ্টির যে বর্ণনা আছে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সে-সবের সম্পূর্ণ বিরোধ তাই আধুনিক মানুষ সে-সবে বিশ্বাস করিতে পারে না, আর শ্রদ্ধাবিহীন ধর্ম কর্ম্মে কোন ফলই হয় না। বর্ত্তমানে তাহাই হইয়াছে। যোগীরাজ ব্রহ্মানন্দ পরমহংস বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান যুগে সকল জিনিষেই ভেজাল আসিয়াছে আমাদের সুপ্রাচীন ধর্ম্মেও ভেজাল আসিতে আসিতে সম্পূর্ণ ভেজালে পরিণত হইয়াছে। ভেজাল ত্যাগ করিয়া সত্যের আশ্রয়ে না চলিলে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা পাইবে না।"

যাহারা অন্ধভাবে গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণ করিতেছে তাহারা চোখ-বাধা বলদের মত ঘানির চারি পাশে ঘুরিতেছে মাত্র, নিঃশ্রেয়সের পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারিবেনা। তাহাদের উপর কোনরূপ চাপ দেওয়া ঠিক হইবে না। তাহারা যখন ইহা উপলব্ধি করিবে তখন তাহারা নিজেরাই সত্যের অনুসরণ করিবে। ইতিমধ্যে যাহারা জাগ্রত হইয়াছেন তাহাদের কর্ত্তব্য ঐ সকল গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অনুসরণ করা। ঠিক এইভাবেই গীতা বেদবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান-কেও তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছে।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

২।৪২-৪৩

আজও হিন্দুর পূজা পার্ব্বণ সেই বেদবাদের অনুসরণ করিয়া "ক্রিয়া বিশেষ বহুল"। যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতি বাহ্য অনুষ্ঠানেই বাহুল্য - কার্য্যতঃ এ-সবের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া গিয়াছে, এ-সব কেবল সামাজিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যত্র গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।

"বাহ্য দ্রব্য লইয়া যজ্ঞ করা অপেক্ষা অন্তরের যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ"। মানুষ মনোময় জীব—মানস চৈতন্যের উন্নতি সাধন করিয়াই মানুষ উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে; যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। মানুষের চিত্তকে ভগবদ্‌মুখী করাই প্রকৃত ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম সাধনা—

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। গীতা
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬.৪

"প্রশান্ত ভাব যুক্ত, সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া মনকে সংযত করিয়া সর্ব্বদা চিত্তকে আমার চিন্তায় পূর্ণ রাখিয়া আমাকেই পরমগতি জানিয়া আমার সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হইয়া থাকিবে।" এই একটি শ্লোকেই গীতার সকল শিক্ষার সার সংগ্রথিত রহিয়াছে এবং গীতা ইহাকেই দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই সাধনার দ্বারাই মানুষের চৈতন্যের রূপান্তর সাধিত হয়, মানুষ ভগবদ্ভাব লাভ করিতে পারে—এইটিই সকল সাধনার লক্ষ্য, মম সাধর্ম্ম্যম্, মদ্ভাবম্। গীতা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে বলে নাই—কিন্তু বেদের এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা জানিলে গীতা যে

জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলিয়াছে তাহাতে সাহায্য হইবে। সেই মন্ত্রটি এইরূপ—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

গীতায় বলা হইয়াছে ওঁ একাক্ষর ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক। সাধারণে ভগবান্, God, আল্লা বলিতে যাহাকে বুঝে—এ-সব কোন শব্দের দ্বারাই তাহার ঠিক পরিচয় দেওয়া যায় না—তার একটা দিক নির্দেশ করা যায় ত অন্য অনেক দিক বাকী পড়িয়া যায়, তাই ত ধর্মে ধর্মে এত ভেদ, এত দ্বন্দ্ব। বেদে তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে এবং ওঁ শব্দের দ্বারা তাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে। অ উ ম এবং বিন্দু এই চারিটি ধ্বনির সংযোগে ওঁ উচ্চারিত হয়। ব্রহ্মের আছে চারি অবস্থা—এক একটি অবস্থার জন্য এক একটি ধ্বনি। ব্রহ্ম বচন মনের অতীত, তথাপি মানুষ যাহাতে তাহার দিকে মন দিতে পারে, তাহাকে চিন্তা বা ধ্যান করিতে পারে—মাণ্ডূক্য উপনিষদে ব্রহ্মের সেইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—

ওঁ মিত্যেতদক্ষর মিদং সর্বম্। সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাদঃ।

ওঁ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝায়—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই সমুদয় জগৎ সবই ব্রহ্ম। ভূত, ভবিষ্যৎ, জগৎ এ-সবই আমাদের পরিচিত—এই সবকেই ব্রহ্ম বলা হইল তাহাতে আমরা ব্রহ্মের কিছু পরিচয় পাইলাম। কিন্তু এরূপ ব্রহ্ম এত বিরাট, বিশাল, অনন্ত যে মানুষের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। তাই বলা হইল প্রত্যেক মানুষের যে মূল সত্তা, অন্তরাত্মা তাহাই ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে মানুষের এত নিকটে আনিয়া দেওয়া আর কোন উপদেষ্টা বা শাস্ত্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে কি? আমি "আমি" বলিতে যাহা বুঝি মূলতঃ তাহাই ব্রহ্ম—এ ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি? আমি যে সত্য, আমি যে আছি—এ অনুভব এত নিবিড় এত প্রত্যক্ষ যে ইহার জন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না। "আমি"র উপলব্ধি ধরিয়া ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য বলা হইল - মানুষের যেমন বিভিন্ন অবস্থা জাগ্রত, স্বপ্ন, গভীর নিদ্রা ব্রহ্মেরও সেইরূপ তিন অবস্থার নামকরণ করা হইল—জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্ত। ব্রহ্মের আর একটি অবস্থার নাম তুরীয়, তাহাই চতুর্থ, তাহাই উচ্চতম পরমতম—তাহা কি তাহা বলা যায় না, তবে তাহা কি নহে তাহা বলিয়া সেই অবস্থারও কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে যদিও ব্রহ্মের বিভিন্ন অবস্থার নামকরণ হইয়াছে—তথাপি তাহারা এক নহে। যথা মানুষের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই সবই ব্রহ্মের জাগ্রৎ অবস্থার অন্তর্গত।

জাগরিত স্থানো বহিঃ প্রজ্ঞ স্থূলভুক্, প্রথমঃ পাদঃ ॥
স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্তভুক্ তেজসা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

সাধারণ জীবনে মানুষ বহির্মুখী—তাহার সমস্ত ভোগই ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া হয়। যখন সে ইন্দ্রিয়ের ভিতর প্রত্যক্ষ বা ভোগ না করে—মনে মনে সে সব চিন্তা করে সে সবেরও ভিত্তি হইতেছে ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিও উপলব্ধি। অনেকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে সে-সব চিন্তাকরে বস্তুতঃ পক্ষে ত্যাগ নহে—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তাহাও এই বাহ্য অনুভূতি উপলব্ধির স্মৃতি লইয়া ভাঙ্গাগড়া। তবে গভীর নিদ্রার অবস্থায় সেও উচ্চতর চৈতন্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ উচ্চতর পদে যাইতে পারে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় সে-সব কিছুই তাহার মনে থাকে না। সাধারণ মানুষের এই অবস্থাই ব্রহ্মের জাগ্রৎ অবস্থা—তাহা বহিঃ প্রজ্ঞ, স্থূলভুক্। কিন্তু য-সব মানুষের মধ্যে মানস চৈতন্যের উচ্চতর বিকাশ হইয়াছে তাহারা নানারূপ ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি উপলব্ধি লাভ করিতে পারে—তাহাদের দ্বারাই মানুষের সাহিত্য, কাব্য, দর্শন আদি রচিত হয়। মনই মূল ইন্দ্রিয়—অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই শক্তি। যাহাদের মধ্যে মানস চৈতন্যের উচ্চতর বিকাশ হইয়াছে তাহারা কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত দূর হইতে শব্দ শ্রবণ করিতে পারে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত দূরের দৃশ্য দেখিতে পারে—তাহারা বাহিরের ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শ ব্যতীতও আভ্যন্তরীন আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। ইহাই ব্রহ্মের স্বপ্নাবস্থা। মানুষের মধ্যে এই অবস্থার শ্রেষ্ঠ বিকাশই যোগীর অবস্থা—অন্তঃ প্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্ত-ভুক্—এখানকার ভোগ স্থূল ইন্দ্রিয় ভোগ নহে, ইহা সূক্ষ্ম ভোগ। গীতার ভাষায়—

বাহ্য স্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫।২১

এই দুইটিই হইতেছে জীবের অবস্থা—ব্রহ্মের জীব ভাব *

প্রথমটি সাধারণ মানুষের চৈতন্য, দ্বিতীয়টি যোগীর চৈতন্য। গীতায় এই দুইটি অবস্থার এইরূপ প্রভেদ করা হইয়াছে—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ২।৬৯

যোগীরা যে আত্মচৈতন্যের মধ্যে বাস করেন—যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। এই অবস্থার মধ্য দিয়া যোগী ব্রহ্মের চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় গিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারেন,

স যোগী ব্রহ্ম নির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।

সাধারণ মানুষ এই চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই—তাই এটা তাহাদের পক্ষে নিশা বা অন্ধকার স্বরূপ। আর তাহাদের পক্ষে যেটা জাগ্রত অবস্থা, যোগীরা দেখেন সেটা বাস্তবিক যেন একটা নিদ্রার অবস্থা। তাই উপনিষদ সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

"উঠ,জাগো, যোগী ঋষিদের সন্ধান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জ্ঞানের আলোক লাভ কর"।

জাগ্রত ও স্বপ্ন, ব্রহ্মের এই দুইটির অবস্থার উপর তাহার যে তৃতীয় অবস্থা, সুষুপ্তিস্থান—সেইটিই হইতেছে ব্রহ্মের ঈশ্বরভাব।

সুষুপ্তিস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো জ্ঞানানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়পাদঃ। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য—প্রভবাপ্যয়ৌ ভূতানাম্।

ইহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মের যে চতুর্থপাদ, তুরীয় তাহা সকল ভাবের অতীত, বচন মনের অতীত। উপনিষদ তাহার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছে—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে।

* জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ—শঙ্করাচার্য্য

ব্রহ্মের এই অবস্থায় বিশ্ব নাই, সৃষ্টি নাই, কিছু দেখিবার জানিবার নাই—আত্মা শুধু আত্মার নিবিড় উপলব্ধি লইয়া আছে—একাত্মপ্রত্যয়সারঃ।

এই আত্মচৈতন্যে যখনই সৃষ্টির ইচ্ছা জাগিল তখনই ব্রহ্ম চতুর্থপাদ হইতে তৃতীয় পাদে নামিয়া আসিলেন—সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হইলেন। সৃষ্টির মূল আদি ব্রহ্ম-সঙ্কল্প। তিনি কামনা করিলেন, আমি এক আছি, বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব (সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম প্রজায়েয়েতি)। তখন তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন। এইহেতু তাঁহাকে সুকৃত বা স্বয়ং কর্তা বলা হয় (তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—তৈত্তি ২।৭)। তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ কিভাবে করিলেন বৃহদারণ্যক উপনিষদ তাহা বলা হইয়াছে—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়ঃ স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ।—১।৪

"প্রথমতঃ এই জগৎ পুরুষবিধ আত্মারূপেই ছিল। তিনি দেখিলেন তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই। রতি বা মিলনের আনন্দ একা একা হয় না, তাই তিনি নিজকেই দুইভাগে পাতন বা বিভাজন করিলেন, স্ত্রী-পুরুষ যেমন যৌনক্রিয়ায় আলিঙ্গিত হইয়া থাকে তিনি সেইরূপ হইলেন—ছোলা ইত্যাদি শস্য যেমন দুই ভাগ, একই দুই—তিনি তেমনই হইলেন—উপনিষদে এখানে একভাগকে পতি আর একভাগকে পত্নী বলা হইয়াছে কারণ পাতন বা বিভাজনের দ্বারাই এক তিনি যেন দুই হইয়াছেন—সাংখ্যের অনুসরণে গীতা এই দুইটিকে পুরুষ ও প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং বলিয়াছে এই দুইয়ের সংযোগে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষা গ্রহণ করিয়াই গীতা প্রকৃতিকে তাহার যোনি বলিয়াছে—

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪।৩

একাকে বহু হইতে হইবে, তাই প্রকৃতিকে ধরিয়া পুরুষ বহু দেহ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রত্যেক দেহে নিজেই আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, এইভাবে একই

বহু হইলেন—কিন্তু এইটি হইতে যুগযুগান্ত কাটিয়া গিয়াছে, ব্রহ্ম এই জন্য প্রথমে জড় হইলেন, তাহা হইতে প্রাণ, তাহা হইতে মন, এইভাবে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্‌॥
—মুঃ ১।১২

জড়ই হইতেছে মানব জীবনের আধার—মনোময় প্রাণ শরীর নেতা, ইহাই হ'তেছ মানুষের সংজ্ঞা, definition. কিন্তু মানুষ এখনও ব্রহ্ম হয় নাই, ব্রহ্মেরও বহু হওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই। মনের উপরে যে বিজ্ঞান চৈতন্য রহিয়াছে, যখন তাহার বিকাশ হইবে তখনই মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ পূর্ণ হইবে—এই পৃথিবীতেই মানুষের হইবে দিব্য জীবন। স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান এই দুইয়ের মধ্যে যোগ ছিন্ন করিতে হইয়াছিল—নতুবা এক বহু হইতে পারিত না—ইহারই জন্য ব্রহ্মচৈতন্যে হইয়াছে অহঙ্কারের আবির্ভাব—এই অহঙ্কারের বলেই আমরা আমাদিগকে অন্য সব কিছু হইতে বিভিন্ন মনে করি, সব কিছুর মধ্যে যে একই আত্মা রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাই না—এই পার্থক্যকে সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য অহং হইতেই মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের আবির্ভাব হইতেছে * এইগুলি লইয়াই হইয়াছে গীতার অপরা প্রকৃতি, এবং সুষুপ্তি চৈতন্য, যাহা সৃষ্টির মূল তাহাই গীতার পরাপ্রকৃতি। এইজন্যই গীতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, অপরা প্রকৃতি তাঁহার স্বীয় প্রকৃতি নহে, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই সব ভাব তাহা হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি তাহাদের মধ্যে নাই। এই গুণময়ী অপরা প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া যখন আমাদের ব্যষ্টিভাব, বহুভাব, জীবভাব সুদৃঢ় হইবে—তখন দেহ-প্রাণাশ্রিত মনের মধ্যে বিজ্ঞান চৈতন্যের বিকাশ হইলে আবার আমরা আত্মজ্ঞান ফিরিয়া পাইব, অপরা প্রকৃতির অহংভাব লোপ পাইবে—তখন আমরা বহু হইয়াও এক হইব, তখনই একের বহু হওয়া সুসিদ্ধ হইবে।

বৈদিক যুগ হইতে ভারতে এবং ভারতের অনুসরণে জগতের সর্ব্বত্র যে নানা ধর্ম, নানা উপাসনার আবির্ভাব হইয়াছে, যত মত তত পথ, সেই সবের ভিতর দিয়া মানব-জাতি এক নব রূপান্তরের সম্মুখীন হইয়াছে। এতদিন মানুষ নানাভাবে ভগবানের ও আত্মার সন্ধান করিয়াছে বহু লোক বহু কঠোর তপস্যা করিয়াছেন কারণ ইহা মোটেই সহজ নহে—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ।

কিন্তু আজ আর পথের সে দুর্গমতা নাই—সুষুপ্তি স্থান হইতে যে জ্যোতি ও শক্তির অবতরণ হইতেছে তাহা দ্বারাই মানবজীবনের রূপান্তর সাধিত হইবে—এখন মানুষের কাজ হইতেছে নিজেকে সেই জ্যোতির দিকে খুলিয়া ধরা, সেই দিব্য শক্তির ক্রিয়ার জন্য মাথা পাতিয়া দেওয়া। গায়ত্রী মন্ত্রই এই অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষ সহায় হইতে পারে। ব্রহ্ম কি, তিনি নিজেই কিভাবে জীব জগৎ হইয়াছেন, কিভাবে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ পূর্ণ হইবে—সব কিছু বেদের ঐ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রটির মধ্যেই রহিয়াছে। ব্রহ্মের চারি অবস্থা একই সঙ্গে তাহারমধ্যে রহিয়াছে। এইসব লইয়াই ব্রহ্ম—ওঁ অক্ষরটি তাহারই প্রতীক। এইটি একটি অক্ষর কিন্তু ইহার চারিটি অংশ, ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা বা পাদকে নির্দ্দেশ করে অ-জাগ্রৎ, উ-স্বপ্ন, ম-সুষুপ্তি, বিন্দু-তুরীয়। ওঁ উচ্চারণ করিয়া সেই পূর্ণ পরম ব্রহ্মকে স্মরণ করা হইল। ভূর্ভুব হইতেছে জাগ্রত, স্বঃ হইতেছে স্বপ্ন এবং এই দুইয়ের সৃষ্টি কর্ত্তা সবিতা হইতেছে সুষুপ্তি। গায়ত্রী মন্ত্রে ঐ সবিতার জ্যোতিকে আহ্বান করা হইতেছে সাধকের অন্তরকে আলোকিত করিতে। সবিতার স্থূল প্রতীক সূর্য্য—সূর্য্যের জ্যোতিঃ যেমন পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে তেমনই সৃষ্টি কর্ত্তার দিব্য জ্যোতি ও শক্তি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়া আমাদিগকে বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত করুক, দিব্য আনন্দে পূর্ণ করুক। এই উপাসনা যে বেদের সংস্কৃত মন্ত্রের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে তাহা নহে যে-কোন ভাষাই হউক এই ভাবটি প্রকাশিত হইলেই হইল—আর অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই।

ইহার সঙ্গে কিছু বাহ্য তপস্যাও আবশ্যক। বেদে যাগ যজ্ঞাদি ছিল এইরূপ বাহ্য ক্রিয়া। মহাভারতের যুগেই সে-সব লোপ পায়, তাহাদের পরিবর্ত্তে তাহাদেরই

* মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ গীতা ১৫।৭

অনুকরণে নূতন নূতন ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। আবার পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে সে-সবের পরিবর্ত্তন হয়। শ্রীচৈতন্য জীবে দয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনকেই প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিলেন—

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন।

এখন আর নাম সঙ্কীর্তনেরও সে সার্থকতা নাই—উহাও গতানুগতিক প্রাণহীন আচারে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের জীবন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে মানবের সেবা ও হিত সাধন, Humanism. স্বামী বিবেকানন্দ এইটিই প্রচার করিয়াছেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বর্ত্তমান যুগে সকল দেশে সকল ধর্ম্মেই আজ এইটিকেই ধর্ম্মের সার বলা হইতেছে। একজন বাঙ্গালী মুসলমান কবি বলিয়াছেন—

ইসলাম আজ মানুষের বুকে মানবতা হয়ে জাগে।

গীতা যেমন মানবধর্ম্মের শাস্ত্র এমন আর কোন শাস্ত্রই নহে। গায়ত্রী ও গীতাকে ধরিয়াই সমগ্র মানব জাতি আজ এক সমিতি হইতে পারিবে।

———

বাইশে শ্রাবণ

সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তুমি চলে গেছ দূরে—
তবু তব ছায়াখানি ভেসে ওঠে স্মৃতির মুকুরে
আশ্বিনের ঘন নীলাকাশে শুভ্র মেঘখণ্ড সম;
কি গভীর বেদনায় শ্রাবণের অশান্ত আকাশ
কেঁদে কেঁদে মরে,
মেঘে মেঘে মেঘলোকে সকরুণ করুণ সুর
ঝরে ঝরে পড়ে
মানস সাগরে।
কত শত কল্পকথা চেতনার প্রান্ত ছুঁয়ে যায়,
হৃদয়ের স্তব্ধ বনছায়
মূক হয়ে রয়।
ভাষাহীন ছন্দহারা কল্পস্রোতে মেলে দিয়ে পাল,
নিঃসঙ্গ এখন একা;
নিরন্ধ্র তিমির হ'তে
কেবা তারে নিয়ে যাবে আলোকের ঝর্ণাধারা স্রোতে।
তুমি আজ নাই—
সবুজের সব সুর মৌন আজি, স্তব্ধ আজি তাই!

——

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চৌদ্দ

রোজকার মতন ওরা মন্দিরে গেল। ললিতা গেল মার ঘরের চৌকাঠ পেরিয়েই। তার ডানদিকে অসিত তারপরে প্রেমল প্রণব।

জন্মাষ্টমী। পুণ্য দিন। পাহাড়ীরা অনেক বনফুল এনেছিল। সুরথ ও ফ্লোরা পাঠিয়েছিলেন নানা মিষ্টান্ন ধূপ ও ফল।

ললিতা ঠাকুরের জন্যে বিশেষ পরমান্নভোগ বেঁধেছিল।

প্রথমে ললিতা গাইল গোবিন্দ দাসের বিখ্যাত গান "নন্দনন্দন চন্দচন্দন নন্দ নিন্দিত অঙ্গ।" তারপর আরতি হ'ল। সব শেষে প্রেমল অসিতকে গাইতে বলল তার সবচেয়ে প্রিয় গান: বৃন্দাবনের লীলা। অসিত গাইল ভক্তির আবেগে।

সেই বৃন্দাবনের লীলা পড়ে আজ মনে
সেই নন্দগোপাল কান্ত কিশোর
দীপ্তি দুলাল মরি মনচোর
নাচিত যে রাসে প্রণয়ের মধুবনে:
আজ পড়ে মনে তায়—পড়ে ফিরে ফিরে মনে ॥
প্রাণ তুফানে জ্বলিত তারাদীপে যে গগনে,
সেই কালো নিরাশায় আলো নন্দন,
ধূসর ধরায় রঙিন স্বপন,
রজনী-বেদনা পোহাত যা'র বরণে,
আজ পড়ে মনে তায় পড়ে ফিরে ফিরে মনে ॥
মরু ক্ষুধায় ঝরিত যে সুধানির্ঝরণে,
যত ম্লান অনিত্য বাঁধন মায়ার
কাটিত স্নিগ্ধ চাহনিতে যার,
উছসিত প্রাণ যার প্রেম পরশনে:
আজ পড়ে মনে তায় পড়ে ফিরে ফিরে মনে ॥

যত ক্ষয় ক্ষতি আনে অবসাদ এ জীবনে,
যত চিন্তা ভাবনা জয় পরাজয়, (কামনা বাসনা)
সুখের সাধনা লোকলাজ ভয়,
ভুলিতাম যার "আয় আয়" বাঁশিস্বনে:
আজ পড়ে মনে তায় পড়ে ফিরে ফিরে মনে ॥
ভালো বাসা যে বিলাতে এসেছিল জনে জনে,
দিতে ঠাঁই না চাহিতে তার রাঙা পায়,
বিধুর নিশিথে মধুর উষায়,
ডাকে আজো সখী, সে হৃদি বৃন্দাবনে
তার ঘরছাড়া নীল মুরলীর সুরছনে।
চল্ বরিতে লো তার চরণ চিরন্তনে ॥
ওরা হাসে, বলে: ওরে পাগল, রাখিস মনে
হায় অমৃত-স্বপন ফলে না রে জাগ নে।
চির-রঙিনের ছবি শুধু কবি কল্পনা.
ছায়া-ইন্দ্রধনুর মায়া জল জল্পনা
চিরজীবন কোথায় মরণধরায় বল্?
চিরসুখ আশা শুধু সোনার হরিণ ছল,
শুধু বেদনার ধূ ধূ মরু ছায় এ-জীবনে।

ওরা হাসে, কলভাষে, 'ওরা জানেনা', তাই হাসে, ওরা জানেনা
তাই মানে না, আমি জানি, তাই মানি, আমি শুনেছি তোমার
বাঁশি অন্তরে তাই বঁধু আমি জানি; ডাকে যে তোমায়—
তায় লও রাঙা পায় টানি, তুমি এসেছিলে ভালোবেসেছিলে আমি জানি
সুধাধারে ক্ষুধাবুকে ঝরেছিল আমি জানি—

শুধু এসেছিলে নয় আসো, তুমি ডাকিলেই কাছে আসো
আজো বাঁশিসুরে ভালোবাসো
ডাকি ওঁ খিজলে যেই "কোথা তুমি" সেই করুণায় নেমে আসো

তুমি নয়ন মুছাতে আসো
তুমি করো বুকে বুকে যুগে যুগে গান বঁধু,
তাই বয়ে তব ঝরে সুখে দুখে আজো মধু
তাই আনন্দে পাই যারে
পাই বেদনায়ও ফিরে তারে.
দুখ-বাদলে তোমায় জানি সুখ-কিরণে তোমায় জানি
বঁধু, বিরহে তোমায় জানি মধু-মিলনে তোমায় জানি
আমি জীবনে তোমায় মানি স্বামী, মরণে তোমায় জানি

গানের শেষে আঁখর দিতে দিতে অসিতের মনের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাস জেগে উঠল। আঁখরের পর আঁখর জোগাতে লাগল কে যে! এত আঁখর সে কখনো দেয় নি। চোখের জলও বাধা মানে না আর। বুকের মধ্যে ভক্তির বান ডেকে যায়।

গান শেষ হতে মন্দিরের মধ্যে অপরূপ নৈঃশব্দ্য। অসিত চেয়ে দেখে ললিতা দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে। প্রেমল একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে চেয়ে, চোখে অশ্রু-আভাষ।

প্রেমলের হঠাৎ প্রণব মৃদু স্বরে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল: "জানো প্রেমল মা বাহিরের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে গান শুনছিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের চমক ভাঙল। সে চকিতে প্রণবের দিকে ফিরে বলল: "সে কি? মা! খোলা বারান্দায়?

ললিতা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল: "মার বুকে কাশি বসেছে যে।"

প্রণব (ঘাড় নেড়ে): বটেই তো। মা খুবই অন্যায় করেছেন। এই ঠাণ্ডায়—

প্রেমল (লাফিয়ে উঠে): তাহলে মা নিশ্চয়ই ওদিক দিয়ে ঘুরে এসেছিলেন—গান শুনতে। কারণ এদিকে চৌকাঠের কাছে ললিতা বসেছিল তার ঘাড়ের উপর দিয়ে তো আসতে পারবেন না।

প্রণব: তাই তো ভাবছি—

প্রেমল: চলো চলো।

ওরা চৌকাঠ পেরিয়েই ফিরে এলো মা-র শোবার ঘরে।

দেখল মা স্থির হয়ে তাঁর খাটটিতে বসে দেওয়ালের দিকে চেয়ে। হাত দুটি কোলের উপর।

প্রেমল বলল: "মা তুমি কি বলে—

ললিতা হাত তুলে বলল: "শ্‌—শ্‌। দেখছ না মা সমাধিতে।

ওরা দাঁড়িয়ে রইল হাত জোড় করে।

* * *

সাড় ফিরে আসতেই মা অসিতের দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। সে এগিয়ে আসতেই ধরা গলার স্বরে বললেন: বোসো বাবা বোসো—না, মাটিতে নয়—আমার খাটে বোসো আরো কাছে, আমার কাছে সরে এসো · আরো।"

অসিত ঈষৎ কুণ্ঠিত হ'য়ে বসল। কারণ মা-র খাটে সে এর আগে কোনোদিন বসে নি তো। প্রেমল প্রণব ও ললিতা রোজকার মতন মাটিতেই বসল সতরঞ্চের উপরে।

মা গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মৃদু স্বরে বললেন: "কিছু দেখতে পেলে না বাবা?"

অসিত (চমকে): দেখতে? কী মা?

মা: ঠা…ঠাকুর।

অসিত (শিউরে উঠে): ঠাকুর? মানে কৃষ্ণ?

মা: আমার ঠাকুর আর কে বাবা? (ফের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে জোর ক'রে) তুমি যখন…শেষের দিকে…মানে আঁখর দিচ্ছিলে না?…ঠিক সেই সময়ে—

অসিত প্রশ্নোৎসুক কণ্ঠে তাকিয়ে থাকে…

মা: ঠাকুর এসেছিলেন।…হ্যাঁ বাবা, প্রথমে এসেছিলেন আমার ঘরে। তারপর…গেলেন ঐ চৌকাঠ পেরিয়ে ··মন্দিরে। আমি তো ওদিক দিয়ে ঢুকতে পারতাম না…ললিতার জন্যে। তাই…আমাকে…ও দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হ'ল—ঠাকুর যে বাবা! ছুটে না গিয়ে পারি?…তিনি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ঠায় চুপ ক'রে শুনছিলেন। হ্যাঁ বাবা…দেখেছি আমি খোলা চোখেই… কিন্তু তুমি দেখতে পাওনি?

অসিত (বিহ্বল): না মা…তবে…

মা (একটানা—থেমে থেমে।): হ্যাঁ ঠাকুর। ঠাকুর!…নিজে এসেছিলেন…শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তোমার

দিকে চেয়ে···ঠোঁটের কোণে অপরূপ···হা···হাসি। ও ঠাকুর ঠাকুর! (চোখ দিয়ে জল ঝ'রে পড়ে ললিতা উঠে এসে চোখ মুছিয়ে দেয়, মা ভাবমুখে ব'লে চলেন শুধু) ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর···

অসিত নত হ'য়ে মা-র পায়ে মাথা রাখে। চোখের জল তারও বাধা মানে না।

* *

মা-র মুখ খুলে গেল। একের পর এক ব'লে চললেন তাঁর নানা দর্শন শ্রবণ অনুভূতির কথা···নানা দেব দেবীর আবির্ভাবের কথা···প্রসাদের কথা···আরো কত কী। অসিত ঠিক ক'রে রেখেছিল সব তার ডায়রিতে টুকে রাখবে যেমন রোজই রাতে রাখছিল।···

মার বলা শেষ হ'লে অসিত গাঢ় কণ্ঠে শুধালো: "আপনি কি ঠাকুরকে সর্বদাই দেখতে পান মা?"

মা: নিজের হৃদয়ে সর্বদাই দেখি বাবা,···তবে বাইরে আর দেখতে পাই না—যেমন যেমন···আজ ঠাকুর দেখা দিলেন। আগে আগে বাইরেও দেখতে পেতাম—প্রায়ই।

অসিত: তাহ'লে আজকাল আর পান না কেন মা?

মা (একটু চুপ ক'রে থেকে): ঠাকুর বললেন—যদি বাইরে আমি তাঁকে বেশী দেখি তাহ'লে আমার দেহ প'ড়ে যাবে।

অসিতের বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠল। মনে পড়ল মা-র কথা: আমার কাজ শেষ হয়েছে বাবা। এখন শুধু অপেক্ষা ক'রে আছি—কখন ডাক আসে।"

সকলে একে একে মা-র পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় নিল। শুধু প্রেমল রইল।

অসিত ঘর থেকে বেরুবার সময়ে মা তাকে ডাকলেন। সে ফিরে আসতেই বললেন: "বোসো বাবা, এক মিনিট। একটি কথা বলার আছে।"

অসিত: কী মা?

মা: ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন···তোমাকে ধ্যান ট্যান বেশি করতে হবে না! তুমি তাঁকে ঐ··· গানের মধ্যে দিয়েই পাবে।···বেঁচে থাকো বাবা—যার গান শুনতে ঠাকুর নিজে আসেন নিত্যবৃন্দাবন থেকে।···

(প্রথমার্ধ সমাপ্ত)

[ক্রমশঃ]

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাবিংশতি মন্ত্র (১।১।২২)

মন্ত্র :—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয় মাত্থ।
বক্তাচাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥

অর্থ:—(নচিকেতা বলিলেন :) "দেবতাগণেরও যখন এই বিষয়ে সত্যই সংশয় হইয়াছিল, এবং হে যমরাজ, আপনিও যখন বলিতেছেন যে ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে, তখন এই আত্মতত্ত্বের বক্তা আপনার সদৃশ আর কাহাকেও পাওয়া ত সম্ভবপর নহে, এবং এই বরের সদৃশ অন্য বর ত থাকিতে পারে না।"

ব্যাখ্যা :—আত্মা সম্বন্ধে দেবতাদেরও যে সংশয় হইয়াছিল, একথা বলিয়া নচিকেতা আমাদেরও বল দিতেছেন। সেখানে সংশয়ের সামর্থ, সেখানেই অসংশয় হইবার শক্তি বিরাজিত। অবিশ্বাস যদি প্রবল হয়, সেই খানেই বিশ্বাসের জন্ম হয়। হিরণ্যকশিপুর সন্তান হলেন প্রহ্লাদ। আমাদের শুনিয়া ধারণা জন্মাইতেছে যমরাজের মত দেবতার যখন আত্মা সম্বন্ধে সংশয় পূর্ব্বে ছিল বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেছেন, তখন ইহাই কি প্রকারে বিশ্বাসে পরিণত হইল, তাহা উত্তম মধ্যম ভাবে তিনিই আমাদিগকে বুঝাইতে পারিবেন। তাঁহার মত গুরু আমরা কোথায় পাইব? তাহা ছাড়া সে আত্মতত্ত্ব তিনি যে ভাবে লাভ করেন, ঠিক সেইভাবে যদি আমরা তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারি, তাহাতে আমাদের অশেষ উপকার হইবে। যমরাজ ত নচিকেতাকে "রত্নময়ী শব্দময়ী মালা" (উপরে ১৬ মন্ত্র) প্রদান করিয়া তাঁহার সাহসও সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতটা যখন করিয়াছেন, তখন নচিকেতা আর তাঁহাকে ছাড়িবেন কেন? যমরাজকে সৃষ্টি সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিতেই হইবে।

ত্রয়োবিংশতি মন্ত্র (১।১।২৩)

মন্ত্র— শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃনীষ ;
বহূন্ পশূন্ হস্তি হিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ,
স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥

অর্থ—(যম বলিলেন) "তুমি শতায়ু পুত্র পৌত্র সমূহ এবং বহু গবাদিপশু, হস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব ও এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর। ইহা ছাড়া তুমি নিজে যত বৎসর জীবন ধারণ করিতে চাও, ততকাল জীবিত থাক।"

ব্যাখ্যা :—সেকালের মানুষেরা যে একশত বৎসর জীবন ধারণ করিলে পূর্ণ আয়ু পাওয়া গেল মনে করিতেন, তাহা এখানে সুস্পষ্ট। নচিকেতাকে আশা দেওয়া হইল যে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ নচিকেতার জীবনে তাঁহাকে কোন পারিবারিক শোক পাইতে হইবে না। আরও জানিলাম সেকালের বৎসর, কাহাদের হিসাবে, শরৎকাল পূর্ণ হইলে আবার আরম্ভ হইত। তাইবৎসর কে "শারদ" বলা হইল (তবে কি সেকালে অগ্রহায়ণ মাসে দেবোত্থান একাদশী হইতে মানব সমাজে বৎসর আরম্ভ হইত? সেই কারণে কি গীতায় (১০.৩৫) ভগবান্ কৃষ্ণ বলিতেছেন যে মাসগুলির মধ্যে তিনি নিজে অগ্রহায়ণ মাস ?)

এই সঙ্গে নচিকেতাকে ইহাও অঙ্গীকার করা হইল যে তাঁহার ইচ্ছা-মৃত্যু পর্য্যন্ত বর দেওয়া হইবে, যদি তিনি আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা প্রত্যাহার করেন। তারপর নচিকেতাকে রাজার ন্যায় বিত্ত, শক্তি ও সাম্রাজ্য প্রদান করিবার লোভ দেখান হইল, যদি তিনি আত্মতত্ত্ব জানিবার বর প্রার্থনা হইতে বিমুখ হ'ন। যমরাজ কি নচিকেতার স্বভাব এখনও পরীক্ষা করিতেছেন? প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, যাঁহার গৃহে অন্ন নাই এবং তথাপি তিনি

অন্নের কাঙালী নহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের "অকাশবৃত্তি" চলে অর্থাৎ ভগবান তাঁহার পরিবার বর্গের ভরণপোষণের ভার ল'ন। নচিকেতার পিতা যখন সর্ব্বস্ব দান করিয়া দিলেন, তখনও ভরণ পোষণের জন্য নচিকেতার বিন্দুমাত্র চিন্তা হয় নাই। যমরাজ সেইজন্য তাঁহাকে স্বভাব ব্রাহ্মণ জানিয়া যথাযথ অতিথি সৎকার করিলেন। তবে কেন এ সকল পার্থিব ধন সম্পত্তি দিয়া নচিকেতাকে এক্ষণে প্রলুব্ধ করা হইতেছে?

মহাভারতে, সাবিত্রী-সত্যবান্ উপাখ্যান শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের হিতার্থে বর প্রাপ্তির পর আদর্শ স্ত্রী চরিত্র সাবিত্রী যমরাজের নিকট একশত সন্তান প্রার্থনা করিয়া স্বীয় মৃত পতির জীবন ফিরিয়া পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। ভারতের মহিলা কেন, জগতের সকল মহিলাই সন্তানকে নিজ নাড়ীর সঙ্গে জড়িত দেখেন ও ঐহিক সুখ কল্যাণ কামনা করেন। তাঁহাদের দৃষ্টি মনুষ্য জীবনের জন্ম ও অভ্যুদয়ের দিকে ও সেই জন্য এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই বেশী। এই কারণে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি হিসাবে, নারী স্বামীর ও তাঁহার সন্তানাদির মঙ্গল চান। অপরদিকে পুরুষ, সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে, আত্মার অনুধাবনে তৎপর। তাঁহার দৃষ্টি পিতৃলোকের দিকে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে। ইহলোক, ভারতে মাতৃলোক বলিয়া বিবেচিত হয়, পরলোক, পিতৃলোক। নচিকেতা এই দেশের পুরুষ সন্তান হইয়া কি ঐহিক সুখ সম্পদ চাহিবেন? তবু যমরাজ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। নচিকেতা বালক। কত বয়স হইবে? আমাদের মনে হয়, এগারো কি বারো বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে। পূর্ণভাবে পিতৃসত্তা কি মাতৃসত্তা কি তাঁহার জীবনে প্রতিপত্তিলাভ করিবে, তাহার স্থির নিদর্শন এখনও কি ঠিক দেখা যায় নাই? তাই কি যমরাজ অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন? অথচ এই রূপ কিশোর বয়সেই পিতামাতার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া তরুণ ব্রহ্মচারী সেকালে গুরুগৃহে যাইতেন। যদি নচিকেতার মন এখনও ফিরে, তাই যমরাজ বার বার সন্ধান করিতেছেন।

[ক্রমশঃ]

নিজেরে হারাতে গিয়ে

সুবোধ সেন

উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় নিয়ে বেরিয়েছি সবুজ বনপথে,—
বাঁশের ছায়া-ম্লান আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ
নীল-সবুজের নিবিড় দিগন্তে হারানো;

বিহ্বল চোখের ইশারার মতো বনকেতকীর মৃদুসুরভি,
ছায়া-ম্লান সবুজ বনপথের সবুজ কাঁচা গন্ধ
কি আবেশ আনে হৃদয়ে, স্বপ্নজড়ায় এ-মনে—
যেন ইতস্ততঃ ম্লান গোধূলিতে তোমার নিবিড় পরশ
আর দলিত কুসুমের অবস চাহনির মায়া।

বাঁশের ছায়াম্লান আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথের মতো
জীবনের আঁকাবাঁকা পথে
যেতে যেতে যদি সবুজের সীমায় নিজেরে হারাতে চাই
তবু যেন মনে হবে—
কারো মৃদু পিছু ডাক
খুঁজে খুঁজে হৃদয়ে স্পন্দন তোলে হাওয়া লাগা বনের মতো॥

গল্প

গরল

শ্রীসুখেন্দু চক্রবর্তী

১

পলাশপুরের সাপুড়ে মণিরুদ্দিনের নাম আশেপাশের দশ গাঁয়ের লোক জানে। কেউ বলে 'লোকটা যাদু জানে।' কেউ বলে ওসব স্রেফ্, হাতের কারসাজি বুঝেছ। অনেকের ধারণা ও মন্ত্রতন্ত্র নিশ্চয়ই কিছু জানে, এবং বলাবলি করে—'তা না হ'লে গতপুজোয় অষ্টমীর দিন রাত্রে যখন হারান পণ্ডিতের ছেলেকে সাপে কাটলো; সেই মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়ে মণিরুদ্দিন কেমন ভেল্কি দেখিয়ে দিলে—সে'তো আমরা সকলেই জানি।'

বাঁশি বাজিয়ে বন থেকে মণিরুদ্দিন সাপ ধরে। আর বেতের ঝাঁপি খুলে সে যখন লোকের সামনে খেলা দেখায়;—

ফণা তুলে গর্জে ওঠা সাপের কাছে বিড়বিড় মন্ত্র পড়ে; আর ডান হাতের মুঠিটা যখন নাচায়, মণিরুদ্দিনের জ্বল জ্বলে চোখদুটো যেন তখন উল্লাসে নাচে। তামাটে বলিষ্ঠ শরীর তার।

একগাল লম্বা দাড়ি; আর মাথায় ঝাকড়া চুল। পায়ে হেটে পাঁচ গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। প্রায়ই তার সাথে থাকে ফুটফুটে একটি ছেলে। টানাটানা ডাগর চোখ। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। নাম লালু। বাবার হাত ধরে সেও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাবা বাঁশি বাজালে তার তালে তালে লালু সুন্দর নাচে। প্রথম প্রথম হয়তো অনেকে জিজ্ঞেস্ করতো মিঞা ছেলেটি কার? মণিরুদ্দিন হেসে উত্তর দিত আর বলেন কেন! খোদার মর্জি, আমারই ব্যাটা। তখন লালুর গালটা ধরে আদর করে সে হয়তো বলতো "কিরে ক্ষিদে পেয়েছে?—কিছু খাবি?"

মণিরুদ্দিন তার ঝোলা থেকে একমুঠো চিঁড়ে আর সামান্য একটু গুড় বার করে লালুকে খেতে দিত।

খেলা দেখাতে শুরু করলে মণিরুদ্দিনের কিছু খেয়াল থাকে না।

সূর্য্য ঢলে পড়লে লালু বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে আব্বা! চল আব্বা, ঘর যাবো—

হ্যাঁরে ব্যাটা। তাইতো বেলা পড়ে গেছে চল, চল—

বাবার হাত ধরে লালু বাড়ী ফেরে। তখন পথে অন্ধকার নেমে আসে। রাস্তার দু'ধারের ঝোপঝাড় থেকে ঝি-ঝি পোকার আওয়াজ শোনা যায়।

পথে হাটতে হাটতে হয়তো মণিরুদ্দিনের আমিনার কথা মনে পড়ে।—ঘরের বারান্দায় সে একটি ছোট্ট আলো জালিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আর হয়তো পথের দিকে চেয়ে আছে, কখন তার লালু ঘরে ফিরবে।

মণিরুদ্দিনের ঘরে ঢোকায় আগেই লালু ছুটে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। 'আম্মা! আম্মা!'—করে ডেকে মাকে মুহূর্ত্তেই ব্যস্ত করে তোলে।

আমিনা চায়না লালু তার বাপের মত বনেজঙ্গলে ঘুরে সাপ ধরুক আর তাই নিয়ে দশগাঁয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়াক।

"কোন্ সকালে ছেলেটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছ আর এখন বাড়ীতে পা দিলে! বলি,—তোমার একটা আক্কেল বলে কিছু নেই। আমি সেবার পীরপুরের মেলা থেকে ওকে শ্লেট, খড়ি, বই কিনে দিলাম, যাতে পণ্ডিতের পাঠশালায় গিয়ে একটু পড়াশুনা করে। সে তো চুলোয় গেছে বাপের সাথে ছেলেও ধেই ধেই করে নাচছে।"—বলতে বলতে আমিনা রাগে ফেটে পড়ে। আসন পেতে বাপ ব্যাটাকে খেতে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। খাওয়াদাওয়া সেরে বারান্দায় বসে একটা বিড়ি

ধরায় মণিরুদ্দিন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। ঘরে গিয়ে বিছানো মাদুরে গা এলিয়ে দেয়। একটা হাই তুলে নীচু গলায় বলে—"লালু ঘুমিয়েছে বিবি ?" এমনি সময় হয়তো মাঝে মাঝে তার আমিনার সাথে তুমুল কথা কাটাকাটি হয়।

মণিরুদ্দিন বলে "আমি কি নিজের শখে—লালুকে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি। বাড়ী রেখে গেলেও তো তুমি সামলাতে পার না। পাঠশালার নাম করে, ঘোষদের বাড়ীতে সাপ ধরতে যাবে। নয় তো বনে গিয়ে বন্ধুদের সাথে গাছে উঠে পাখির বাচ্চা ধরবে। আমিই বা কি করবো। মারধোর করেও তো দেখেছি—কোন ফল হয় না।" 'তা' হবে কেন। রক্তের গুণ যাবে কোথায় ? এইটুকু বয়স থেকেই ফোঁস করে ওঠে"—বলে আমিনা কথার মোড় ঘুরিয়ে সংসারের অভাব অভিযোগের কথা মণিরুদ্দিনের কানে তোলে।

"সামনের বর্ষা আসার আগেই ঘরে নতুন করে ছাউনি দিতে হবে ; তা না হ'লে ঘরে জল পড়বে। নসুমিঞার টাকাটা বাকি পড়ে আছে অনেকদিন, ওটা শোধ দেওয়া দরকার। ইতিমধ্যে কয়েকবার তাগাদাও দিয়ে গেছে। তুমি ঘরে থাক না। তাই তোমার কোন ঝামেলা নেই। পাড়াপড়শির কাছে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারি না।"—আমিনার সমস্ত কথাই তার কানে এসে পৌঁছয়।

চাঁদের আলো হয় তো জানালা দিয়ে এসে মণিরুদ্দিনের চোখে পড়ে। তখন খানিকটা উদাসী হয়ে, আমিনার কথা ভাবে। ভাবে—সংসারের অভাবের কথা। আরও ভাবে—

তখন মণিরুদ্দিনের চোখে কত স্বপ্ন ছিল, মনে কত আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো আমিনা।

তুমি শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রেখো। দেখবে, তাহ'লেই আল্লা আমাদের মঙ্গল করবেন। সেই তো কত কথা। জীবনের সে কোন এক সোনালী প্রত্যূষে আমিনা তার সমস্ত আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে তার হাত ধরে বেড়িয়ে পড়েছিল। তারপর অনেক উত্থানপতন, অনেক ভাঙ্গাগড়া। শেষে এই তো পলাশপুর। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় মণিরুদ্দিন পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

সেবার পীরপুরে গাজনের মেলা বসলো। শহর থেকে সিনেমা, সার্কাস এসেছে। রকমারি জিনিষের দোকান বসেছে। মেলা এবার জমজমাট। গাঁয়ের লোকের মহা আনন্দ। হৈ চৈ কেনাকাটার ধুম। মণিরুদ্দিনের শরীরটা কিছুদিন যাবৎ ভাল নেই। পায়ে হেঁটে খেলা দেখাতে দেখাতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এখন লালুকে নিয়ে আর বড় বিশেষ বেড়য় না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে ঘরে রেখে যায়।

সেদিন সকালে উঠে মণিরুদ্দিন ডাকলো "লালু! চল আমার সাথে। গাজনের মেলা দেখিয়ে আনবো।"

শুনে তো লালু নাচতে শুরু করেছে। "আমি বাঘ ভালুক দেখবো আব্বা। আমায় কিন্তু একটা কাঠের ঘোড়া কিনে দিতে হবে।" নানা বায়না লালুর। 'সে দেখা যাবে'— বলে মণিরুদ্দিন জোর গলায় ডাকে—'কই গো বিবি! চিড়ে মুড়ি কিছু বেঁধে দাও গামছায়।'

গতরাতে আমিনার সাথে মণিরুদ্দিনের তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। "খরায় ধান জলে গেল। আসছে সনে ধানচাল মাগ্‌গি হবে তার কিছু জোগান চাই। ঘরের ছাউনিতে আজও নতুন বিচুলী পড়েনি। মধুসূদনের বৌ উৎসব অনুষ্ঠানে পাটভাঙ্গা নতুন নতুন শাড়ী পরে। আমি ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাই। আমার সাধও নেই, আহ্লাদও নেই, সবই আমার নছিবের দোষ।" গতরাতের আমিনার এসব কথাগুলো এখনও যেন মণিরুদ্দিনের কানে লেগে আছে। নানা অভি-যোগ তার, নানা বায়না, চটপট ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বার আয়োজন করে।

মণিরুদ্দিনের বয়স বাড়ছে। চোখেমুখে তার ছাপ স্পষ্ট হচ্ছে।

ঝাঁপির সাপগুলোও যেন দিন দিন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। ফোঁস ফোঁস শব্দে আর তেমন গর্জে ওঠে না। বন জঙ্গল থেকে নিত্য নূতন সাপ ধরার সে উৎসাহ মণিরুদ্দিনের আর নেই। কেমন যেন একটা অবসাদ, ক্লান্তি ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করছে। রোজগার আর তেমন একটা হয় না, বাজারও মন্দা। ভিন-

গাঁয়ের নতুন সাপুড়ে কালুয়া নাকি আজকাল খুব ভাল খেলা দেখায়। তার ঝোলাতে নিত্যনতুন সাপ আর তাদের তেজও নাকি ভয়ানক, সেইসব সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে দশ হাত দূরে দাঁড়াতেও লোকে নাকি ভয় পায়, এসব কথা মণিরুদ্দিনের কানে এসে যে না পৌঁছেছে তা নয়। তবে তা নিয়ে সে খুব একটা ভাবে না।

মেলায় যাবার পথে আজ কয়েক জায়গায় খেলা দেখিয়ে তার রোজগার মন্দ হয়নি। রাস্তায় দশ গাঁয়ের লোক মিছিল করে এগিয়ে চলেছে গাজনের মেলায়, মেলার ভেতর ঢুকে লালু তার ইচ্ছেমত কাঠের নীল ঘোড়া, ঝুমঝুমি তালপাতার বাঁশি কিনেছে। লজেন্স খেতে খেতে বাবার হাত ধরে মেলার চারদিকে ভাল করে ঘুরেছে। কাঠের ঘোড়ায় চড়ে আটদশ মিনিট শূন্যে পাকও খেয়েছে, তাতে লালুর আনন্দ আর ধরে না। "এবার চল্ লালু, আর নয়। ঘরে ফিরতে হবে যে,—তা না হলে যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।" বলে মণিরুদ্দিন ভীড় ঠেলে লালুর হাত ধরে মেলার বাইরে চলে আসে। এরই একফাঁকে মণিরুদ্দিন আমিনার জন্য একখানা ফুলতোলা ছাপার শাড়ী কিনেছে, এক-শিশি আলতা, কুমকুম, টিপ, ফুলেল তেলও কিনে ঝোলায় ভরে নিয়েছে। তখন লালু বলেছে "আব্বা! এসব আম্মাকে দেবে?" "হাঁরে ব্যাটা, ঘর গিয়ে আগে থেকে বলিস্‌নি যেন। দেখবি তোর আম্মাকে কেমন চমকে দেবো।" বলে মণিরুদ্দিন হেসে ছেলের গালটা একটু নেড়ে আদর করে। দ্বিগুণ উৎসাহে দু'জনে পা চালায় কারণ সন্ধ্যের আগেই ঘরে ফিরতে হবে।

"কতদূর এলাম আব্বা?" বলে বাবার মুখের দিকে তাকায় লালু।

"এই তো কৈলাসপুরে পা দিয়েছি। ওই যে বিরাট উঁচু ফটকওয়ালা বাড়ীটা দেখছিস, ওটা কাদের জানিস্। রায়বাহাদুরদের। এদের এককালে ভীষণ প্রতাপ ছিল রে—সেই সাহেবদের আমলে। দশগাঁয়ের লোক এখনও বাবুদের কথায় ওঠে বসে, বুঝেছিস্। আমি কতবার এখানে খেলা দেখিয়ে দু'হাত ভরে টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছি। ছোটবাবু তো একবার দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সোনার একটা মেডেলই উপহার দিয়েছিলেন। বুঝেছিস লালু।"

"আব্বা! আব্বা! মেডেলে কি হয় আব্বা, বলো না।"

'কিছু না, বড় হলে সব বুঝবি'—বলে মণিরুদ্দিন লালুর হাত ধরে জোরে পা চালায়।

"ওখানে এত ভীড় কেন আব্বা?"

"তাই তো রায়বাহাদুরদের ফটকে এত লোক জমায়েত কেন?

"তুই ফটকের এখানটায় একটু দাঁড়া লালু"—বলে মণিরুদ্দিন ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে "কি হয়েছে?" তাকে দেখতে পেয়েই রায়বাহাদুরের বাড়ীর পুরোনো চাকর নেতাই ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে।

মণিরুদ্দিনের হাত ধরে কেঁদে ফেলে। "মিঞা! বড়ঠাকরুণকে সাপে কেটেছে। তুমি তো সাপ বশ কর। ঝাড়ফুঁক, ওঝাগিরি কর। তোমার হাত যশ আছে। একবার চেষ্টা করে দেখনা মিঞা কিছু করতে পার কি না? মণ্ডপ ঘরে বেদীর তলায় সেই যে সাপটা লুকালো কালুয়াতো শত চেষ্টা করেও তার হদিশ পেল না।"

হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ভেতরে নিয়ে যায় নেতাই। আমি তোমার বাড়ীতে লোক পাঠিয়েছিলাম মণিরুদ্দিন, তুমি যা চাও তা'ই পাবে। তবু যদি তোমার মা ঠাকুরণকে"—কথাটা শেষ করতে পারে না বৃদ্ধ রায়-বাহাদুর, কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মুহূর্তে মণিরুদ্দিনের মা ঠাকুরণের কথা মনে পড়ে। এত সহজ, এত ভালো মানুষ ছিল···আর ভাবতে পারে না। হঠাৎ দূরে কালুয়ার চোখে চোখ পড়ে তার। মনে হলো বুকের ওপর যেন কয়েকটা হাতুড়ীর ঘা পড়লো। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মণিরুদ্দিনের বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে। লালু কোন ফাঁকে যেন ভীড় কাটিয়ে বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সূর্য্য ঢলে পড়তে খুব বেশী দেরী নেই। আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে সে বাঁশিটা ঝোলা থেকে বার করে হাতে তুলে নিল। তারপর লালুকে বললো "ব্যাটা, তুই এখান

থেকে সরে যা। ওই দূরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়া।"

মণিরুদ্দিন বিড়বিড় মন্ত্রপড়ে একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে দেয় ওপরে।

তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

মুহূর্তে তার লালচে চোখ যেন আক্রোশে জ্বলে ওঠে।

একটানা বাঁশি বাজাতে বাজাতে সে মণ্ডপের কাছে এগিয়ে আসে। কয়েক মুহূর্ত—। সবাই চীৎকার করে ওঠে—"ওইতো—ওইতো—; বেরিয়েছে।"

সাবাস্ মিঞা! সাবাস্! চারদিকে গুঞ্জন শোনা যায়।

লালু কিন্তু বাবার পেছন ছাড়েনি। মণিরুদ্দিন ওকে বার বার হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। চারদিকে সবাই ভয়ে জড়সড়ো।

"এ যে গোখ্রো"—গুঞ্জন ওঠে।

হাত দেড়েক ফণা তুলে বাঁশির তালে তালে মাথা দুলিয়ে সাপটা এগিয়ে আসছে—কাছে; মণিরুদ্দিনের আরও কাছে।

অন্যকোন দিকে তার খেয়াল নেই। ঘাড় দুলিয়ে সে একটানা বাঁশি বাজিয়েই চলেছে। 'আ—ব্বা' বলে লালু চীৎকার করে বাবার কাঁধের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। মণিরুদ্দিন বিরক্তিতে কনুই দিয়ে লালুকে পেছনে ঠেলে দেয়।

হাত দুয়েক দূরে সাপটা ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস শব্দে ভীষণ গর্জে উঠছে। এবার বাঁশি রেখে দিয়ে ধুলো পড়ে সে ডান হাতের মুঠোটা নাচাতে শুরু করে।

"তোমার আঙুলে আংটি নেই, পাথর নেই আব্বা। তুমি সরে এসো আব্বা"—চীৎকার করে ব'লে কেঁদে ফেলে লালু। কারণ লালু তার আম্মার কাছে শুনেছিল আব্বার হাতের ওই পাথর বসানো আংটি থাকলে যে কোন সাপ বশ করা যায়।

মণিরুদ্দিনের এতক্ষণ কিছুই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ হাতের আঙুলের ওপর চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠলো সে।

সাপের ফণাটা ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে তার চোখে। যেন ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দে গর্জে উঠছে।

"মিঞা! তুমি যাদু জানো মিঞা, সাবাস।" শতলোকের কণ্ঠস্বর তার কানে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। বৃদ্ধ রায় বাহাদুরের কান্নায় ভেজা চোখ। কালুয়ার শাণিত 'ছুরির' মত তির্যক দৃষ্টি। লালু, আমিনা—সমস্তই মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল মণিরুদ্দিন। "আব্বা! আব্বা!" বলে পেছনে আরেকবার কেঁদে উঠলো লালু। কিন্তু মণিরুদ্দিন সাপুড়ে। সাপ বশ করাই তার কাজ। এখন আর পেছন ফিরে তাকাবার মত সময় নেই। ভাববার অবসর নেই।

কয়েক মুহূর্ত।—

"কি হ'লো? মণিরুদ্দিন লালু বলে চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো কেন?" অসংখ্য জমায়েত লোকের একই জিজ্ঞাসা। "পালালো—পালালো—সাপটা পালিয়ে গেল।"—বলে লাঠি বল্লম নিয়ে অনেকে সাপটার পিছু নিল।

এমন সময় সমস্ত ভীড় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো মণিরুদ্দিনের ভূলুণ্ঠিত দেহের ওপর। লালু ছুটে এসে "আব্বা! আব্বা!" বলে বাবার বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো।

মণিরুদ্দিনের সমস্ত শরীরটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কেমন নীল এবং কঠিন হয়ে গেল।

লালু তার বাবার গালের ওপর আঙুল রেখে কেঁদে উঠলো,—"আব্বা! আব্বা! তুমি কথা বলছ না কেন আব্বা?"—

পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য্য ঢলে পড়েছে। ম্লান, ক্লান্ত আলো এসে মণিরুদ্দিনের চিবুকের ওপর পড়েছে। সেখানে তার চোখের পাতা থেকে গড়িয়ে পরা জলের রেখা চিক্‌চিক্ করছে। আর তার পাশে ঝোলার ভেতর লালুর নীলঘোড়া, আমিনার ছাপতোলা শাড়ী, কুমকুম, টিপ... এই সব।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। অন্ধকার নেমে এলে হ'তো সব কিছু মুছে যাবে, ধুয়ে যাবে। কিন্তু আমিনা!—আমিনা আজও হয়তো একটা ছোট্ট আলো জ্বেলে বারান্দার কোণে বসে অপেক্ষা করছে!—

——

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ওশিয়ানিয়া বা অষ্ট্রেলেশিয়ামহাদেশের ভাষাপরিক্রমায় বিশেষ কিছু বলার নেই। সমস্ত মহাদেশই ইংরেজিভাষী; সমস্ত মহাদেশে দুটি মাত্র রাষ্ট্র আছে: অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ড। নিউ জিল্যাণ্ডে মাওরি নামক অষ্ট্রেলেশীয় জাতিকে তাদের দুর্দান্ত সামরিক শক্তির জন্যে একেবারে লুপ্ত করতে না পেরে মাওরি ভাষাকে আঞ্চলিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উত্তর নিউজিল্যাণ্ডেমাওরিদের বেশিরভাগ বাস করে। মাওরি জাতির মোট লোকসংখ্যা লক্ষাধিক। প্রশান্ত মহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জ বা মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া ও অন্যান্য দ্বীপের কথা আলোচনা ক'রে লাভ নেই। ভবিষ্যতে এগুলি বিভিন্ন নাম ও আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেরিটরিতে পরিগণিত হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। এই সব দ্বীপ এখন পাশ্চাত্য-শোণিতমিশ্র অষ্ট্রেলেশীয় বর্ণসঙ্করদের বাসভূমি। কোথাও কোথাও কিছু কিছু চীনা, জাপানি, ভারতীয় ও নিগ্রো ঔপনিবেশিকও আছে যারা অচিরে বর্ণসঙ্করদের সঙ্গে মিশে যাবে। দ্বীপগুলি যে যে পাশ্চাত্য জাতির অধীন, সেই সেই জাতির ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কোন কোন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতা পেয়েছে ও পাবে; কিন্তু তাদের পক্ষে বহু মিশ্র জনতার বাসভূমিরূপে নিজস্ব কোন জাতীয় ভাষা গ'ড়ে তোলা একরকম অসম্ভব। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যেমন জামাইকা ও ত্রিনিদাদ এবং তোবাগো নামে দুটি দ্বীপরাষ্ট্র গঠন করা গেলেও প্রত্যেকটি দ্বীপকে আলাদা রাষ্ট্র করা উচিত বা সম্ভব নয়, প্রশান্ত মহাসাগরেও সেই সমস্যা আছে। জাপান ও চীনের ভয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র গঠনে মার্কিনরা সম্মতি দেবে কিনা সন্দেহ।

এবার আফ্রিকা মহাদেশের ভাষা ও রাষ্ট্র গঠনের প্রসঙ্গটি আলোচ্য। আফ্রিকা এখনও এত অনুন্নত যে, ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা সেখানে অকল্পনীয় বলা চলে। কোথাও কোথাও ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় চেতনা দেখা দিলেও বেশির ভাগ রাজ্য নবলব্ধ স্বাধীনতা নিয়ে ব্যস্ত। ভাষাভিত্তিক বিশ্ব গঠনের কাজে আফ্রিকাও অল্পবিস্তর সক্রিয়, তার প্রমাণ আছে।

সুয়েজ খালের পশ্চিম তীর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে সাহারা মরুভূমিও সুদান পর্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকা মোটামুটি আরবিভাষী অঞ্চল। আরবি ভাষা সুয়েজের পূর্বতীরে বাহ্‌রাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষা ও ধর্মের দিক থেকে পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এক অঞ্চলের এক রাষ্ট্রে পরিণত হতে কোন বাধা নেই। এই অঞ্চলের কিছু শ্বেতাঙ্গ ফরাসি, ইতালীয় ও বের্‌বের ঔপনিবেশিক বাদে সমস্ত লোক আরবি ভাষায় কথা বলে এবং কিছু খ্রীষ্টান বাদে সবাই ধর্মে মুসলমান। কিন্তু প্যান-ইসলামিসমের আবেদন সত্ত্বেও বিশ্বের সমস্ত মুসলমান এক হওয়া দূরে থাক, কেবল আরবিভাষী মুসলমানরাও এক হতে পারেনি। বাদশা—সুলতান—নবাব-শেখ—উজির-আমির-শাসিত এই বিশাল আরবী জগৎ প্রায় আট কোটি লোকের বাসস্থান যারা একটিমাত্র রাষ্ট্রে সংহত হতে না পেরে অন্তত ষোলটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আছে:—

(১) কাতার (২) কুওয়াইত (৩) বাহ্‌রাইন (৪) আদেন (৫) ওমান (৬) ইএমেন (৭) ইরাক (৮) জর্দান (৯) সাউদি আরব (১০) সিরিয়া (১১) লেবানন (১২) মিশর বা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (১৩) লিবিয়া (১৪) তুনিসিয়া (১৫) আলজেরিয়া (১৬) মরক্কো। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র লেবাননে খ্রীষ্টানরা বহু সংখ্যায় বাস করে।

নাসের একদা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে মিশর-সিরিয়া-ইএমেন রাষ্ট্র তিনটিকে কতকটা সংহত করতে পেরেছিলেন; আশা হয়েছিল যে, তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র আরব-জগৎ এক রাষ্ট্রে সংহত হবে। কিন্তু অতি অল্প দিনের

মধ্যেই সিরিয়া ও ইএমেন মিশর থেকে পৃথক্‌ হয়ে দাঁড়ায়। নাসেরের জীবনে আরব্য জগৎ একত্র হবার সম্ভাবনা নেই। তার কারণ আচার্য বিনয়কুমারের ভাষায় এই :—

"একটা বিপুল মুসলমান দুনিয়া আছে। তার ভিতর ঐক্যমোটেইনাই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের ধারণা মুসলমানেরা ভয়ানক ঐক্যগ্রথিত। যে মুহূর্তে আমরা আরবি, ফার্সি আর উর্দু পড়িতে আরম্ভ করিব সেই মুহূর্তে বুঝিব মুসলমান-ঐক্য বলিয়া সংসারে যে একটা কথা রটিয়াছে তাতে কোনো বস্তু নাই।" (নয়া বাংলার গোড়াপত্তন, ২য় ভাগ ৯১৬ পৃষ্ঠা।)

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, স্পেনীয় আমেরিকা যেমন এক ভাষা ও এক ধর্ম সত্ত্বেও বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং অংশত পরাধীন, আরব দুনিয়াও তেমনি বহু রাজ্যে বিভক্ত এক ভাষা ও এক ধর্মের বন্ধন থাকলেও এবং তার সামান্য অংশ আজও বিদেশির অধিকারে। এই জগতে আরো অনেক বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে : ধর্মান্ধতা, পশ্চাদ্বর্তিতা, বংশবৃদ্ধির প্রবণতা, বর্ণসঙ্করের প্রাচুর্য, পেট্রোলের ঐশ্বর্য ইত্যাদি আমাদের আলোচ্য বিষয় ভাষা প্রসঙ্গে দুই জগতের মধ্যে এক প্রবল সাদৃশ্য আছে। স্পেনীয় ঔপনিবেশিক ও বর্ণ-সঙ্করদের মতো আরব ও আরবমিশ্র জনগোষ্ঠী এক রাষ্ট্র-বন্ধনে আবদ্ধ না হলেও তারা সর্বত্র একভাষী রাষ্ট্র গঠন করেছে। কোথাও ভিন্নভাষীদের সঙ্গে মিলে স্পেনীয় বা আরব এক রাষ্ট্র গঠন করেনি। বিপুলসংখ্যক আদিবাসীকে দুই এলাকাতেই আত্মসাৎ করা হয়েছে ও হচ্ছে। এক দিন তারা এক রাষ্ট্রও স্থাপন করবে। কিন্তু তার আগে তারা কোথাও দ্বিভাষিক রাষ্ট্র স্থাপন করে নি।

উত্তরপূর্ব আফ্রিকায় সোমালিয়া রাষ্ট্রটি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত। ইতালীয় সোমালি এলাকা নিয়ে প্রথমে সোমালি-ল্যাণ্ড বা সোমালিয়া রাষ্ট্র গঠিত হলে পরে ব্রিটিশ এলাকা তার সঙ্গে যোগ দেয়। এখন সোমালিয়া ফরাসি এলাকা দাবি করছে। তা ছাড়া আবিসিনিয়া বা এথিওপিআর অন্তর্ভুক্ত সোমালি এলাকাও তারা দাবি করছে। এথিও-পীয় সরকার অবশ্য প্রাণপণে তা প্রতিরোধ করছে।

আবিসিনিয়া গত শতাব্দীকালের মধ্যে দু'বার ইতালির দ্বারা আক্রান্ত এবং দ্বিতীয়বার ১৯৩৬ সালে পর্যুদস্ত হওয়ায় ভারতে বহু লোকের অকারণ সহানুভূতির পাত্র হয়েছিল। এ দেশটি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ এখনও অবশিষ্ট আছে, আবিসিনিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। এর রাষ্ট্রভাষা আমহারিক হলেও তার জাতি আরো পাঁচটি ভাষা সেখানে চলে। ভিন্নভাষী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এরিত্রেআ-কে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতালির অধিকার থেকে কেড়ে নিয়ে স্বাধীনতা না দিয়ে অন্যায়ভাবে এথিওপিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরিত্রেআ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র; সেখানকার ভাষাও আলাদা; সুতরাং এরিত্রেআর লোকেরা স্বাধীনতা লাভের জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ইতালির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে এথিও-পিআর দাসত্ব করতে চায় না। তাই মনে হয় এরিত্রেআর তিগ্রে, তিগ্রিনিয়া প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারকারী জনগণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন না ক'রে ক্ষান্ত হবে না।

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের অদূরে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের মাদাগাস্কার দ্বীপের রাষ্ট্র মালাগাসি প্রজাতন্ত্র একভাষী রাষ্ট্র।

আফ্রিকার নিগ্রোভাষী অর্থাৎ সুদানীয় ও বান্‌টু-ভাষাগোষ্ঠী দুটির ভাষাগুলি অবশিষ্ট আফ্রিকায় ছড়ানো; এদের ভিত্তিতে বাকি আফ্রিকাকে ৩৪টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে পারলে সুবিধা হত বটে, কিন্তু এখনও তা অসম্ভব। বাকি আফ্রিকা তার চেয়ে বেশি খণ্ডে এখন বিভক্ত। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা এক একটি এলাকা ভাষার ভিত্তিতে দখল করে নি। তারা যে যেখানে যেমন ভাবে যখন যা খানি পেরেছিল, গ্রাস ক'রে এলোমেলোভাবে আফ্রিকায় ব্রিটিশ, ফরাসি, পোর্তুগিস, জার্মান, বেলজীয়, ইতালীয়, স্পেনীয় ও ডাচ সাম্রাজ্য গড়েছিল। এদের মধ্যে পর্তুগিস, স্পেনীয় ও ডাচ আফ্রিকা এখনও পুরোপুরি বর্তমান আছে, ব্রিটিশ আফ্রি-কাও লোপ না পেয়ে ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। অন্যরা চলে যাবার পর আফ্রিকায় এলোমেলোভাবে কয়েকটি কু-গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র দেখা যাচ্ছে এই মাত্র। সব সাম্রাজ্য-বাদী আফ্রিকা ছেড়ে চ'লে যাবার পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পারিক আলোচনার সাহায্যে আফ্রিকায় এক এক ক'রে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগুলি গ'ড়ে উঠতে পারে।

নাইজেরিয়া স্বাধীন হবার পর সেখানে ইবো আর

ইওরুবা ভাষাভাষীরা নাইজেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্যে আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাচ্ছে।

ফরাসি সোমালিল্যাণ্ড ও সাহারা মরুভূমির কিয়দংশ ছাড়া ফরাসি আফ্রিকা এখন স্বাধীনতা পেয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান আফ্রিকা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতালীয় আফ্রিকা লুপ্ত হয়েছে। বেলজীয় আফ্রিকা কিছু কাল আগে স্বাধীনতা পেয়েছে। ব্রিটিশ আফ্রিকার এক বৃহদংশ মুক্তি পেয়েছে; কিন্তু অপর অংশ রূপান্তরিত হয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পোর্তুগিস আর ডাচরা সহজে আফ্রিকা ছাড়বে না। তবে স্পেনীয়রা তাদের সাম্রাজ্যকে মুক্ত ক'রে দেবে ঠিক করেছে।

আফ্রিকায় পোর্তুগিস সাম্রাজ্য, ইঙ্গ-ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসিত রোডেসিয়া নিগ্রো আফ্রিকার আত্মবিকাশ ও অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধকস্বরূপ। অবশিষ্ট আফ্রিকা মোটামুটিভাবে মুক্ত বা অচিরে স্বাধীন হবে। কিন্তু পোর্তুগিস গিনি, আঙ্গোলা, মোসাম্বিক, রোডেসিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা—এই পাঁচটি রাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত বাসুতোল্যাণ্ডেরও সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে সহজে সম্ভব নয়।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা যে অঞ্চলের জলবায়ু তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা তথা বংশধারার অনুকূল সেখানে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। আফ্রিকার সর্বত্রই তারা এক কালে বসতি স্থাপনের পরীক্ষা ক'রে দেখেছিল। কারণ, আফ্রিকা ছিল ইউরোপের তুলনায় এক রকম জনশূন্য। এশিয়া একে জনবহুল তার ওপর প্রবল পরাক্রান্ত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সামরিক দিক দিয়ে ইউরোপের চেয়ে ঢের বেশি বলবান্। এশিয়া প্রথম থেকেই বসতি বিস্তারের অনুপযোগী ব'লে ধার্য হয়। কেবল রুশ জাতি সাইবেরিয়া অঞ্চলে বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করে। পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে দুই আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়ার পর আফ্রিকা উপনিবেশ স্থাপনের যোগ্যতম ক্ষেত্র ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। ডাচ ঔপনিবেশিকেরা এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়ে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করে।

আফ্রিকা সাইবেরিয়ার মতো নির্জন না হলেও মধ্য-যুগে সেখানে পাশ্চাত্য শ্বেতকায় জাতিগুলি পদার্পণ করার সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার তুলনায় প্রায় নির্জন ছিল। শ্বেতকায় দাসব্যবসায়ী দস্যুরা ছাড়া বহু শ্বেতাঙ্গ কৃষক ঔপনিবেশিক পরিবার সেখানে গিয়েছিল জঙ্গল কেটে অনাবাদী জমি উদ্ধার ক'রে চাষবাস করার সঙ্কল্প নিয়ে। তাদের মধ্যে ওলন্দাজ কৃষক বা বুর (Boer) জাতি দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বদেশ বা জন্মভূমি স্বরূপ গ্রহণ ক'রে ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায় ইংরেজরা আসবার অনেক আগে। এই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সমস্যার সুরু।

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা আফ্রিকার সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়ে ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারে যে, আরব আফ্রিকা বা উত্তর আফ্রিকা শক্তিশালী আরবদের দাপটে নিরাপদ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার অযোগ্য। আরব ঔপনিবেশিকরা উত্তর আফ্রিকার আদিবাসী হামীয় জাতিগুলিকে ধ্বংস বা আত্মসাৎ ক'রে সেখানে নিজেদের স্বদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল বহু শতাব্দী আগেই। আরবদের যদি উত্তর আফ্রিকাকে আরবভূমিতে পরিণত করার অধিকার থাকে, তাহলে ডাচদের দক্ষিণ আফ্রিকার নির্জন তটভূমিতে বসতি বিস্তারের অধিকার থাকবে না কেন, সে-প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই। আরব আফ্রিকা ছাড়া উত্তরপূর্ব আফ্রিকার সেমীয়-হামীয় ভাষাগোষ্ঠীর এলাকাও পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মাতৃভূমিরূপে পুনর্গঠিত হওয়া অসম্ভব। খ্রীষ্টান এথিওপিআ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা নানা কারণে অবাঞ্ছিত ছিল। ও সব জায়গায় সুপ্রাচীন বলিষ্ঠ সভ্য জাতি বহু দিন ধরে সুপ্রতিষ্ঠ।

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম ও কঙ্গোর মতো মধ্য অঞ্চল জলবায়ুর দিক থেকে ইউরোপীয় শ্বেতকায়ের পক্ষে আয়ু-হানিকর। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বভাগ ইউরোপীয়দের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ভূখণ্ড। এই এলাকাতে খাঁটি শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি কেবল সাম্রাজ্য নয়, উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগে কাইরো থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর অঞ্চলটি ইংরেজের অধিকারে ছিল। এ-অঞ্চল আফ্রিকার সর্বোত্তম

বংশ সব দিক থেকে। এদিকে নিগ্রো গোষ্ঠীর বান্টু শাখার লোকদের বাস। তারা নিগ্রো গোষ্ঠীর সুদানি শাখার মতো অত কালো ও অসভ্য নয়। বরং সম্ভ্রান্ত বান্টু মহিলাদের রূপসী বলা চলে। বান্টুদের মধ্যে সভ্য ও দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিও আছে। সে-সময়ে কেপ-কাইরো রেলপথ গঠনের পরিকল্পনা ইংরেজের মাথায় আসে। এ ধরণের মহাদেশীয় রেলপথ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও সাইবেরিয়ায় নির্মিত হয়। ঐ রেল-পথ নির্মাণের পর ইংরেজের আফ্রিকান সাম্রাজ্য তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হতে পারত।

কিন্তু পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ইংরেজের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ার ইংরেজের সাম্রাজ্য ক্রমশ গুটিয়ে নিতে হয়। সামরিক বা রাজনৈতিক কারণে ততটা নয়, যতটা অর্থনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অকস্মাৎ তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়তে থাকে।

ইতিমধ্যে ইউনিঅন-অফ্-সাউথ-আফ্রিকা বা দক্ষিণ-আফ্রিকা রাষ্ট্রে বুর জাতি অফ্রিকান্স্ ভাষার ভিত্তিতে তাদের মাতৃভূমি গঠন করেছে। ইংরেজি ওলন্দাজ—দুটি ভাষায় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের কাজ চলে। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ কমন ওয়েল্থ্ পরিত্যাগ ক'রে এখন প্রজাতন্ত্রে পরিণত। ১৯০১ সালে ইংরেজরা বুরদের পরাস্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রেখেছিল বটে, কিন্তু এখন সেখানে ইংরেজদের কোন সরকারি ক্ষমতা নেই। স্থানীয় ইংরেজ ও বুর ঔপনিবেশিক মিলে-মিশে এই যে রাষ্ট্র গঠন করেছে, এ ব্রিটেনের কোন ধার আর ধারে না।

এই রাষ্ট্রে ইংরেজদের স্বার্থে বহু ভারতীয় আমদানি করা হলেও এখানে জুলুভাষী আফ্রিকানরা এখনও বিশেষ ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ অঞ্চল তাদেরও মাতৃভূমি এবং তাদেরই আদি মাতৃভূমি। ঐতিহাসিক জুলু যুদ্ধে তারা পরাস্ত হলেও তাদের জন্মভূমির স্বাধীনতার দাবি কখনই ত্যাগ করে নি। এই রাষ্ট্রে এখনও ইংরেজিভাষী ও আফ্রিকান্স্ ভাষীদের পাশাপাশি জুলুভাষী আফ্রিকান ও ভারতীয় আর পাকিস্থানি বিভিন্নভাষীদের বাস। এখানে ভাষাসমস্যা প্রবল নয়। কিন্তু জাতিসমস্যা উৎকট। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয় প্রভৃতি এশীয়দের জন্যে তিনটি স্বতন্ত্র বাসক্ষেত্রের ব্যবস্থা করায় সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, আফ্রিকানরা শুধু ইউরোপীয়দের উৎখাত করতে চায় তাই নয়, তারা ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় জাতিগুলিরও নির্বাসন চায়। ভারতীয়দের নিরাপদে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করতে হলে Apartheid Ghetto বা স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। একত্র বাস করতে গেলে হিংস্র কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের ধ্বংস করবে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তার মতো অদূরদর্শী রাজনৈতিক প্রয়াস খুব কম দেখা যায়। আফ্রিকানদের অত্যাচার থেকে ভারতীয়দের রক্ষার জন্যে কি করা দরকার, তা তিনি কখনও ভেবে দেখেননি। তামাম আফ্রিকায় ভারতীয়রা কেবল ইংরেজদের বাহুবলে রক্ষিত ছিল, সেকথা এখন বোঝা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান ভারত সরকারের অযৌক্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বিরোধিতার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয়রা একদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। আজ কৃষ্ণাঙ্গদের আক্রমণে জর্জরিত ভারতীয়দের দলে দলে আফ্রিকা ত্যাগ ক'রে পালাতে হচ্ছে। ভাগ্যের পরিহাস অকারণে নিষ্ঠুর হয়নি।

আফ্রিকানদের ক্রমবর্ধমান মুক্তি-আন্দোলনের চাপে ইংরেজরা বেচুআনা, বাসুতো, সোয়াজি জাতি তিনটিকে এবং জাম্বিয়া ও মালাবি (ব-এর উচ্চারণ অন্তঃস্থ) রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীনতা দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেসিয়া বা এখন রোডেসিয়া রাষ্ট্রদুটির কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের স্বাধীনতা দেবার ব্যবস্থা করা ব্রিটেনের পক্ষে তার বর্তমান সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মতো পাশ্চাত্য জাতিগুলির বসবাসের উপযোগী হওয়ায় স্থানীয় শ্বেতাঙ্গরা আঙ্গোলা, মোসাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়া রাষ্ট্রগুলি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক।

তারা পোর্তুগিস গিনি ত্যাগ করতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার বদনাম আছে শ্বেতকায় জাতির গোরস্থান-রূপে। সুতরাং পোর্তুগিসরা গিনি ত্যাগ করবে। কিন্তু তাদের আঙ্গোলা ও মোসাম্বিক সহজে ত্যাগ করানো যাবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়া এখন ব্রিটিশ কমন-ওয়েল্থের বাইরে দুটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের স্বাধীনতা ব্রিটেন অনুমোদন না করলেও বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। রোডেসিয়ায় চার মিলিঅন আফ্রিকান মাত্র দুলক্ষ শ্বেতকায়ের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। তার কারণ, অশিক্ষিত আফ্রিকান গেরিলারা আয়ান স্মিথের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে কেবলই পরাজিত হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গরা তাদের বাসভূমিকে স্বদেশ ব'লে মনে করে এবং তাদের স্বদেশপ্রেম খুব তীব্র।

রোডেসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম প্রদেশরূপে গণ্য হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। ১৯২৩ সালে রোডেসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয় নি কেবল ডাচ বা আফ্রিকান্স্ ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণে ইংরেজ রোডেসিয়াবাসীদের তীব্র আপত্তি ছিল ব'লে। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ অধিবাসীদের দ্বারা শাসিত হওয়ার পরিবর্তে রোডেসিয়াবাসী ইংরেজিভাষীরা একটি স্বাধীন ইংরেজিভাষী রাষ্ট্র গঠন করা বেশি পছন্দ করেছিল। ১৯২৩ সাল থেকে রোডেসিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে কাজ চালিয়ে আসছিল। ১৯৬৫ সালে রোডেসিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো।

এটা নিশ্চিত যে, আফ্রিকাকে উত্তর দিক থেকে আরব এবং দক্ষিণ দিক থেকে শ্বেতাঙ্গরা ক্রমশ গ্রাস করতে উদ্যত। আফ্রিকার আদিবাসীদের পৌত্তলিক ধর্মও ইসলাম ও খ্রীস্ট ধর্মের চাপে বিলুপ্তির পথে ধাবিত। অতি প্রচণ্ড সামরিক বলপ্রয়োগ ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগ থেকে ইঙ্গ-ওলন্দাজ-পোর্তুগিস অধিবাসীদের "জন্মভূমি" ত্যাগে বাধ্য করা যাবে না। ফরাসি উত্তর আফ্রিকাতেও একাধিক মিলিঅন ফরাসি ও ইতালীয় ঔপনিবেশিক বাস করত। কিন্তু সেখানে আরবশক্তির চাপে ও রুশ হস্তক্ষেপের ভয়ে ফরাসিরা আরবদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও তৎসংলগ্ন রা গুলির ক্ষেত্রে এমন কোন আশু হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং দূর ভবিষ্যতে—একবিংশ শতাব্দীতে—আফ্রিকা ভাষার ভিত্তিতে প্রশাসনিক দিক থেকে সুগঠিত হলে যদি পোর্তুগিজরা চলেও যায় তা হলেও অন্তত আরো দুটি ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষী রাষ্ট্র আফ্রিকার রাষ্ট্রযূথের মধ্যে দেখা যাবে—ইংরেজি ও আফ্রিকানস্‌ভাষী দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংরেজিভাষী রোডেসিয়া। শ্বেতাঙ্গদের বৃদ্ধির হার যেমন দ্রুত এবং আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা যেমন ক্ষয়িষ্ণু, তাতে ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়া অস্ট্রেলিয়ার মতো শ্বেতাঙ্গপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আমরা ভাবতে যতই শিউরে উঠি না কেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেসিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য ও কয়েকটি কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি নিয়ে গড়া গ্রামের সমাবেশ যে আফ্রিকার জনপদ, তার বদলে বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত সুরম্য হর্ম্যশোভিত শ্বেতকায় নরনারী পূর্ণ সুবিন্যস্ত নগর ও গ্রামে ভরা আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্র গড়ে উঠলে মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি সমৃদ্ধ হবে, সে বি ার সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা করতে করতে উদ্বর্তনের নিয়ম প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করে যাবে।

বর্তমানে আফ্রিকা মোট ৫০টি স্বাধীন ও পরাধীন রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত। ভাষায় ভিত্তিতে সমগ্র আফ্রিকার পুনর্বিন্যাস করলে রাষ্ট্রসংখ্যা ক'মে গিয়ে ৪৪টি হবে।

সমস্ত নিগ্রো আফ্রিকা আধুনিক লিপিমালা গ্রহণ ক'রে নিগ্রো ভাষাগুলির সুনির্দিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তোলার পর আফ্রিকার ভাষাভিত্তিক গঠন-কার্য সুরু হবে। আফ্রি-কার রাষ্ট্রসংখ্যা ঠিক কত হবে তা তখন জানা যাবে। সব নির্ভর করে নিগ্রো জনমণ্ডলীর সংহতি সাধনশক্তি ও সাংস্কৃতিক দক্ষতার ওপর। ইংরেজিভাষী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লাইবেরিয়াকে দেখলে মনে হয়, নিগ্রোদের কাছে জগতের খুব বেশি আশা করার নেই। আমেরিকান রাষ্ট্র ফরাসিভাষী হাইতিকে দেখলেও তাই মনে হয়।

এর পর এশিয়া মহাদেশে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের কথা বিচার্য। আরব এশিয়ার কথা আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। আরবভাষী উত্তর আফ্রিকার মতো আরবভাষী সমস্ত পশ্চিম এশিয়া এক রাষ্ট্র হয়ে যেতে পারে। তবে ইহুদি রাষ্ট্রকে গ্রাস ক'রে কোন অখণ্ড আরবস্থান গঠন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাএলকে লুপ্ত করা যাবে না। যাতে জগতের সব ইহুদি একত্র বসবাস করতে পারে তেমন একটি বাসভূমি তাদের সাধ্য বস্তু। ইসরাএল রাষ্ট্রের আশেপাশে সেই পরিমাণ ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা তারা করবে। ইসরাএলের ৭৯৭৮ বর্গমাইল আয়তনের সঙ্গে সম্প্রতি মিশরের সুয়েজ পূর্ববর্তী এলাকা বা সিনাই উপদ্বীপ সংযুক্ত হয়েছে। ঐ এলাকা মিশর আর ফিরে পাবে না। জর্দানের ৩৪৭৫০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে জর্দান নদীর দুই তীরে ইহুদি বাসভূমি সম্পূর্ণ করা ইহুদিদের লক্ষ্য। ঐ বাসভূমিতে সব ইহুদির স্থান সঙ্কুলান হবে ব'লে ইহুদিদের বিশ্বাস। ইহুদি রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চিত।

সুয়েজ খালের পূর্ব তীরবর্তী সমস্ত মিশরীয় এলাকা ইসরাএলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটি গুরুতর ব্যাপার। এর ফলে এশীয় মিশরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। মিশর সম্পূর্ণভাবে আফ্রিকার এক রাষ্ট্রে পরিণত হল। সবচেয়ে বড় কথা, আরব জগৎ ইসরাএলের দ্বারা স্থায়ীভাবে বিখণ্ডিত হল। ইসরাএল, সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগরের দ্বারা আরব-দুনিয়া এখন এশীয় ও উত্তর আফ্রিকান, দুটি পৃথক্ খণ্ডে বিভক্ত। ইসরাএলের অস্তিত্ব বজায় থাকলে আরবরা কখনও অখণ্ড রাষ্ট্র গড়তে পারবে না। অর্থাৎ আরব-ইহুদি বিরোধ প্রায় সনাতন হয়ে থাকল।

এর পর সোভিয়েট এশিয়ার কথা আলোচ্য। এটির এগারোটি প্রশাসনিক এলাকা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত। এদের কথা আগে সোভিয়েট ইউনিঅন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মঙ্গোল জাতিসমূহের অবক্ষয় ও চীনা সাম্রাজ্যের সাময়িক দুর্বলতার সুযোগে রুশজাতি এশিয়ার স্বদেশসংলগ্ন এলাকায় উপনিবেশ স্থাপনে সমর্থ হয়। আর কোন শ্বেতকায় জাতি এশিয়ায় স্থায়ী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

তুর্কি ইউরোপীয় রাষ্ট্ররূপে গণ্য হলেও আসলে এটি এশীয় রাষ্ট্র। এমন অসৎ ও হিংস্র রাষ্ট্র পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। তুর্কিরা ভারত-ইউরোপীয় ভাষা তথা জাতিবর্গের ঘোর শত্রু। প্রাচীন কালে হিত্তি প্রভৃতি বহু আর্যজাতির বিনাশের কারণ এই জাতি সম্প্রতি এশিয়া মাইনর থেকে গ্রিকদের উচ্ছেদের কারণ হয়েছে। সাইপ্রাস দ্বীপের অশান্তির জন্যেও তুর্কিরা দায়ী। এরিভান থেকে এরজুরুম পর্যন্ত বিস্তৃত আর্মেনীয় রাষ্ট্রের সংকোচ সাধন এদের একটি বীভৎস কুকীর্তি। স্বাধীন আর্মেনিয়া এদের অত্যাচারে রুশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কুর্দিস্থানও ভিনখণ্ডে বিভক্ত হয়ে ইরান, ইরাক ও তুরস্কের দ্বারা পিষ্ট। কুর্দ এলাকার যে-অংশ তুর্কিদের হাতে, সেখানে দুঃসহ পীড়ন।

আর্মেনিয়া স্বাধীনতা ভোগ করেছিল মাত্র ১৯১৮ সালের ২৮শে মে থেকে ১৯২০ সালের ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্যে। তার পর একে তুরস্ক ও সোভিয়েট ইউনিঅন ভাগ ক'রে নেয়। আর্মেনিয়া একটি সুপ্রাচীন খ্রীস্টান রাষ্ট্র; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগুলি একে রক্ষা করার কোন চেষ্টা করে নি।

সোভিয়েট আজের-বাইজান ও ইরানি আজের-বাইজান একত্র হয়ে একটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত। এশিয়াতেও আফ্রিকার মতো অতটা না হলেও বিভিন্ন পুরাতন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ও অযত্নসম্ভূত রাষ্ট্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে যার ফলে অনেক কু-গঠিত ও কুবিভক্ত রাষ্ট্রের বা প্রশাসনিক ব্যষ্টির উদ্ভব হয়েছে। আজের-বাইজান, কুর্দিস্থান প্রভৃতি এই এলোমেলো অবস্থার নিদর্শন। সোভিয়েট ইউনিঅন তার এলাকাগুলি যথাসম্ভব ভাষার ভিত্তিতে বিন্যস্ত ক'রে এ-ব্যাপারে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে সংলগ্ন দেশগুলি ভাষাগত প্রশাসনিক এলাকা রচনায় উৎসাহিত হচ্ছে। ইরান ও আফগানিস্থানের সঙ্গে সোভিয়েট এলাকার সীমারেখা ভাষার ভিত্তিতে সংশোধিত হলে তাজিকিস্তান, আজেরবাইজান প্রভৃতি রাষ্ট্র প্রথমে অখণ্ডতা ও পরে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে।

তুর্কি, ইরাক ও ইরানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে একটি

স্বাধীন কুর্দ্ রাষ্ট্র গঠনের জন্যে কুর্দ্ জাতি আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এমন মুক্তিকাম জাতি এশিয়ায় এখন দিকে দিকে দেখা দিচ্ছে।

এশিয়ার তুর্কি, ইসরাএল, সিরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র মোটা-মুটি একভাষী; স্বাধীনতাকামী অন্য জাতিদের কিছু কিছু এলাকা এরা কেউ কেউ আত্মসাৎ ক'রে রেখেছে; কিন্তু ছোটখাট সীমানা সংশোধনের দ্বারা সে-ত্রুটি দূর করা যায়। কিন্তু ইরান, পাকিস্থান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া—এগুলি বহুভাষী রাষ্ট্র; এদের পুনর্গঠন ও সুবিন্যাস অতি জটিল ব্যাপার। এশিয়ার মতো পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে বর্তমানে তা বেশ সময় সাপেক্ষ।

ইউরোপের হিসেবের মধ্যে পড়ে এমন দুটি রাষ্ট্রের সীমা এশিয়ায় তাদের বৃহদংশ নিয়ে প্রসারিত—রুশিয়া ও তুরস্ক। এদের সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, রুশ জাতির বেশির ভাগ লোক ইউরোপীয় রুশিয়াতে বাস করে, রুশরা এশিয়াতে এসেছে ঔপনিবেশিকরূপে তারা এশিয়ার স্থানীয় আদিবাসী নয় বা আদি আর্যস্থান থেকে বেরিয়ে এসে তারা প্রথম থেকে এশিয়াতে বাস ক'রে আসে নি। আর্যদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে বিদ্যানিধি বা ব্রাণ্ডেনষ্টাইন যাঁর মতই ঠিক হোক, রুশরা সুবিদিত ঐতিহাসিক কাল থেকে উরাল পর্বতের পশ্চিম দিকের এলাকার অধিবাসী ও আদিবাসী। অতএব রুশিয়া বা বৃহৎ রুশ প্রজাতন্ত্রকে ইউ-রোপীয় রাষ্ট্র বলা সঙ্গত। অনুরূপ কারণে তুরস্ককে এশীয় রাষ্ট্র বলতে হবে। তুর্করা এশিয়াতে উদ্ভূত জাতি এবং ইউরোপে তারা গিয়েছিল মাত্র সাম্রাজ্যবাদী জাতিরূপে। ইউরোপে এখনও তাদের যে অবশেষটুকু আছে, তা ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশের অনুগ্রহপ্রাপ্ত। তুর্কিদের বেশির ভাগ লোক এশিয়াতে বাস করে।

ইরাণ ও আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্থানের সীমানা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন যাতে ইরানি ও পাকিস্থানি বালুচ এলাকা দুটি মিলিত হয়ে অখণ্ড বালুচি-স্তান এবং আফগানি ও পাকিস্থানি পাঠান মুল্লুক দুটি একত্র হয়ে অখণ্ড পাঠানিস্তান রাষ্ট্রদুটি গ'ড়ে উঠতে পারে। বালুচ নেতা আবদুল সামাদ খান আর পাঠান নেতা আব-দুল গফুর খানের জীবন-সাধনা এই নিয়ে ব্যাপৃত। ভারত উপ-মহাদেশ বা ভৌগোলিক ভারতবর্ষ নিয়ে ভাষা-পরিক্রমার সময়ে এ-বিষয়ে আরও আলোচনা করা হবে।

সাইপ্রাস দ্বীপের সমস্যার একটি বিশিষ্টতা আছে। হয় সাইপ্রাসকে গ্রিসের সঙ্গে গ্রিক গরিষ্ঠ এলাকারূপে যুক্ত করতে হয়, নয় একে গ্রিক ও তুর্কিভাষী দুটি এলাকায় বিভক্ত করতে হয় এবং গ্রিকভাষী এলাকা গ্রিসের সঙ্গে আর তুর্কিভাষী এলাকা তুরস্কের সঙ্গে যোগ দেবে। সে-ক্ষেত্রে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত যেমন সাখালিন দ্বীপের এক অংশ রুশ ও অন্য অংশে জাপানের কর্তৃত্ব ছিল ৫০° উত্তর অক্ষ-রেখাকে দুই রাষ্ট্রের সীমারেখারূপে সাব্যস্ত করে, তেমন ভাবে সাইপ্রাসে গ্রিস ও তুরস্ক পরস্পরের সম্মুখীন হবে। এখনও কার্যত তাই আছে। ভবিষ্যতে সাইপ্রাসকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করা যায় না। সাইপ্রাস-নামে কোন ভাষা বা জাতি নেই, ওটা নিছক ভৌগোলিক সত্তা, দ্বীপময় অস্তিত্ব। কালের গতিতে একদিন জিব্রালটার স্পেনের সঙ্গে, মাল্টা দ্বীপাবলী ইতালীর সঙ্গে আর সাইপ্রাস গ্রিসের সঙ্গে যুক্ত হবে। যদি সাইপ্রাস বিভক্ত হয়, তাহলে তার এক ক্ষুদ্র অংশ তুরস্কের সঙ্গে মিলিত হবে।

এশিয়ায় জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্বোদিয়া, লাও দেশ, থাইভূমি—এগুলি একভাষী রাজ্য। ব্রহ্মদেশকে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে সীমানা সংশোধনের পর ভাষার ভিত্তিতে শান ও কারেন রাষ্ট্রদুটি মঞ্জুর করতে হবে। কারেনিয়া গঠন করতে দিলে বহু কাল আগে ব্রহ্মে অন্তর্বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে যেত। কারেনরা বর্মীদের থেকে স্বতন্ত্র জাতি। ব্রহ্মের নাগারাও ভারতের নাগাদের সঙ্গে এক জাতি। ব্রহ্ম ও ভারতের সীমারেখা এমন ক'রে সংশোধন করা উচিত যেন ভারতীয় ও বর্মী নাগাভূমি দুটি একত্র স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। আমা-দের স্মরণ রাখা ভাল যে নাগাল্যাণ্ড কার্যত স্বাধীন সেখানে অযথা রক্তক্ষয় ও অর্থব্যয় ক'রে ভারতের কোন লাভ নেই। নাগাদের অন্তরালে প্রথমদিকে চীনা সমর্থ সক্রিয় ছিল না। ভারতের প্রতিরক্ষার দিক থেকেও নাগা-ল্যাণ্ডের কোন মূল্য নেই। কারণ, ভারত ব্রহ্ম কর্তৃক আক্রান্ত হবার ভয় নেই। ইংরেজরা সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রয়োজনে ব্রহ্ম দখলে রাখার উদ্দেশ্যে নাগাভূমি দখল করেছিল। ভারতে এখন আর নাগা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাগাপাহাড় দখল ক'রে রাখার কোন মানে হয় না।' ব

স্বাধীন নাগাভূমি গঠনে ভারতের প্রতিরক্ষাব্যয় হ্রাস পাবে; নাগাল্যাণ্ড কতকটা "বাফারস্টেট" বা মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাজ করবে। নাগাল্যাণ্ড কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হবার উপক্রম হলে তখন ভারত সেখানে সসৈন্যে প্রবেশ করতে পারবে। নাগা রাষ্ট্রকে ভারতের আশ্রিত রাজ্য বা Protectorateকরা চলতে পারে। ভারতের পূর্বাংশে কয়েকটি ক্ষুদ্র একভাষী স্বাধীন রাষ্ট্র থাকলে ভারতের কোন ক্ষতি নেই বরং তাদের মিত্রভাবাপন্ন ক'রে তুলতে পারলে ভারতের পূর্বসীমান্ত সুস্থ, শান্ত ও নিরাপদ থাকে, তার প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অনাবশ্যক আধিক্য হ্রাস পেলে সে অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সংস্কারের কাজে মন দিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

—

দুঃখের হলুদ বৃন্তে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

দুঃখের হলুদ বৃন্তে আমি প্রায় মৃত্যুঞ্জয় হয়ে যেতে পারি।
অথচ হব না জানি। প্রত্যহের শোকে
ম্রিয়মাণ হয়ে থাকব। কৌমার্য-নিপুণ অঙ্গে
—ব্যথার নির্জন আলোচনা
আজ তাই। আশ্চর্য গভীর পদ্ম রৌদ্রের পূজারী
হতে গিয়ে ঝরে পড়ল। পূর্ণতার ছদ্মবেশ মৃত্যুর আলোকে
পরিপূর্ণ হতে পারত। অথচ হল না।
যৌবন জীবন আলো— অতঃপর সময়ের নিষ্ঠুর ছলনা।
দিন এত ম্রিয়মাণ, রাত্রি এত যন্ত্রণার রঙ—
কিছুই বুঝি না আমি—কে বাজায় গৌড়-সারঙ্?
কার এত আলোকিত যন্ত্রণার দূর সমন্বয়ে
স্নিগ্ধতার স্বাদ! আহা কুশীলব স্থাখো স্থাখো কেমন চেহারা
বেচারারা বহুদিন অভুক্ত। অথচ বলতে মানা।
এ নিপুণ ছদ্মবেশে বেজে উঠবে প্রভূত বিস্ময়ে
আশ্চর্য ধ্রুপদী।—এই জীবন-প্রমারা।
ছক্কা পাঞ্জা দুরি তিরি যাই খেল—এক ছকে টানা
পূর্ব-পরিকল্পিত ভূমিকা।
বয়স অনেক হল—তাছাড়া যে বেআইনী ভিড়!
কে দেবে নতুন করে নবতর সৃষ্টির ভূমিকা!
মাসোহারা যা সামান্য—তাতে জানি চলে না সংসার।
তবুও অনন্যোপায়—সময় শিশির
এই সব মেনে ধূর্ত অধিকারীটার
যথেচ্ছ ব্যবহার মাৎস্যন্যায় মেনে নিতে হয়।
মনের আফসোস সব মনে রেখে চুপে পথ চলার বিস্ময়।

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারো

তাজমহল ও ফোর্ট ঘুরে সমীর এবং রেণু বেলা তিনটে নাগাদ ষ্টেশনে ফিরে এলো। এখানে এসে সমীর কোন হোটেল বা ধর্ম্মশালায় ওঠে নি, কারণ লোকেরা ওদের দিকে যে ভাবে তাকায়, সেই দৃষ্টিটা সমীরের আদৌ ভালো লাগে না। সত্যি ওদের সঙ্গে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই, ওদের জিনিষ পত্রও এত কম যে প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন যেন সন্দেহের উদয় হয়। ওদের দুজনের চেহারার পার্থক্য এতই উৎকট যে, ওরা যে পরস্পরের সম্পর্কীত ব্যক্তি তাও মনে করা নিদারুণ কষ্টকল্পনা,—অন্ততঃ সমীর মনে করে যে প্রত্যেকেই বোধহয় ওদের দিকে তাকিয়ে এই সব অস্বস্তিকর কথা চিন্তা করছে।

ষ্টেশনে এসে হাত মুখ ধুয়ে রেণু কাপড় চোপড় ছেড়ে নিলে। এর মধ্যে রেণুর আরও দুখানা কাপড় জামা ইত্যাদি হয়েছে, কারণ কাশীতে গিয়ে ত একেবারে এক কাপড়ে দাঁড়ানো যায় না। সমীর নিজেও একখানা কাপড়, একটা সার্ট কিনে নিয়েছে কারণ এ সবের দরকার ত আছেই। আগ্রার বাজার থেকে রেণুর জন্য আজ একটা টিনের সুটকেশও কিন্‌তে হোল, একটা ষ্ট্রাপ দিয়ে ঝোলানো মোরাদাবাদি জলের জায়গাও কেনা হোল, নইলে রেলে বড় কষ্ট হয়। যাযাবরের একদিনের সংসার এম্‌নি ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু দুজনেই জানে কাল বিকালে কাশীতে পৌঁছালেই ওদের এই ভ্রাম্যমাণ সংসারের সমাধি হবে।

ষ্টেশনের দোকান থেকে সমীর ও রেণুর পুরী মিঠাই ও দুধের ভুরিভোজ তৃপ্তি সহকারেই সম্পন্ন হোল। সন্ধ্যে ছ'টার সময় ট্রেন। এই ট্রেনে কাল দুপুরে মোগলসরাইয়ে পৌঁছে কাশীর গাড়ীতে বদলি করতে হবে। অর্থাৎ কা[ল] বেলা পাঁচটা নাগাদ পিসিমার আস্তানায় পৌঁছানে[া] যাবে।

ওয়েটিং রুমের ইজি চেয়ারে শুয়ে সমীর বেশ লম্বা নিদ্র[া] দিলে। কদিনের রাত্রি জাগরণের অবসাদ কাটিয়ে যখ[ন] ওর ঘুম ভাঙ্গলো, তখন দেখ্‌লো অপর একটা বে[ঞ্চে] রেণু হাত মাথায় দিয়ে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সমী[র] ঘুম থেকে উঠে ঘড়ি দেখে বাথরুম থেকে হাতমুখ ধু[য়ে] বাইরে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘাড় গলা বেশ চে[পে] চেপে মুছ্‌তে মুছ্‌তে ভাব্‌লে, এবার রেণুকে ডাকা দরকা[র] কারণ ট্রেনের দেরী আছে মাত্র আধ ঘণ্টা। এমন সম[য়] রেষ্টুরেণ্টের বয় এসে সেলাম দিলে।

কদিন ধরে রেণুর সঙ্গে পুরী মেঠাই খেয়ে ওর মেজা[জ] বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। রেণু ঘুমুচ্ছে দেখে ও বয়টাকে [...] টোষ্ট, কেক ইত্যাদি প্রিয় খাদ্যের অর্ডার দিয়ে চট্‌ ক[রে] ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ষ্টেশনের বাইরে ষ্টল থে[কে] সিঙ্গাপুরী কলা, আপেল, ও পেঁড়া সন্দেশ কিনে নি[য়ে] এলো। মনে ভাব্‌লে, আজই ত এই যাত্রার শেষ। এব[ার] ট্রেনে উঠলেই ফুরিয়ে যাবে। খাবারগুলো এনে বে[ঞ্চে] বেঞ্চে রেখে নিজে বস্‌লো টেবিলের ধারের চেয়ারটায়।

বয় এসে ঢুক্‌লো। ট্রে-তে সমস্ত জিনিষ সে গুছি[য়ে] এনেছে। সমীর ট্রের দিকে মনোযোগ দিয়ে বয়কে বল্‌[লে] মায়িজীকে ডাক্‌তে। বল্‌লে, জিজ্ঞাসা করো মায়ি[জী] চা খাবে, কি সরবৎ চাই।

রেণুর ঘুম ভাঙ্গালে রেষ্টুরেণ্টের বয়। রেণু ঘুম থে[কে]

উঠে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললে আমি ভেবেছিলুম, একটু শুয়ে নিই, কিন্তু—

সমীর বললে, এতে আর কিন্তু কি ? যাও, হাত মুখ ধুয়ে নাও, তোমার জন্য ফল মিষ্টি এনে দিয়েছি। এখন বল, চা চাই, কি সরবৎ।

রেণু বললে, এ সব আবার কেন, আমার জন্যে—

সমীর বললো বেশী সময় নেই, এখনই ট্রেনে উঠতে হবে, চপ্‌পট্ কাজ সেরে নাও। আর ওকে বলে দাও, কি দেবে ?

সলজ্জভাবে রেণু বললে, চা-ই দিক। এর পর কল-ঘরের দিকে চলে গেল।

একখানা থার্ডক্লাস কামরায় ঢুকনে পাশাপাশি বসে যেতে লাগ্‌লো। কেমন যেন মন-মরা ভাব। সমীরের ইচ্ছে ছিল সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করে রেণুকে রেলের আরাম ও বিলাসিতাটা একবার দেখিয়ে দেবে, কিন্তু হিসেব করে দেখলে যে টাকায় ঠিক কুলোবে না। কাশী থেকে ফেরবার সময় ওর হাতেও ত নগদ কিছু দিয়ে আস্‌তে হবে। রেলে বাসে ফুরিয়ে গেলে টাকা সে কোথায় পাবে ?

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো, কিন্তু গাড়ীখানা এমনই যে, আলো আর জললো না। দু' একটি যাত্রী এ নিয়ে একটা ষ্টেশনে নেমে কিছু হৈ চৈ করলো কিন্তু গাড়ীর কি যেন বিগ্‌ড়ে গেছে, বোঝা গেল যে আলো আর এ রাত্রে জল্‌বে না।

ক্রমে দু'চার জন নাম্‌তে নাম্‌তে রেণু আর সমীর দেওয়ালের দিকের সিটটা পেয়ে গেল। সুটকেশটা দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে তার ওপোর লোমদার তোয়ালে-খানা পাট করে দিয়ে রেণুকে সেইখানে বসিয়ে তার পাশেই বসলো সমীর। গাড়ীতে খুব বেশী কিছু ভিড় ছিল না। সমীর তার ডান হাতটা রেণুর পিঠের পেছন দিয়ে প্রায় দেওয়াল অবধি ঠেকিয়ে দিয়ে আড় হয়ে বসে বসে বাঁ হাত দিয়ে সিগারেট টানছিল, আর রেণু আপন মনে খোলা জানলা দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে পিছিয়ে যাওয়া বহি-জগতের গাছ-পালা, ও টেলিগ্রাফের থামগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি ভাবছিল, কে জানে !

সিগারেটটা শেষ করে তার জলন্ত অংশটুকু জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুহাত দিয়ে নিজের কপাল ও মুখটা ঘষে নিয়ে ডানহাতখানা আবার পূর্ব্ববৎ স্থাপন করে সমীর ডাকলে, রেণু—

কি ?

জেগে আছ ?

হুঁ।

কি ভাবছো ?

কিছুই নয়।

সমীর তার ডান হাত দিয়ে রেণুর কাঁধের ওপোর আল্‌তো একটা চাপ দিয়ে বললে, কাল এমন সময় কাশীতে পিসিমার বাড়ীতে।

রেণু বললে, আচ্ছা, আপনার পিসিমা কেমন লোক ? খুব শুচিবায়ু আছে না কি ?

বিস্মিত হয়ে সমীর বললে, কই না ত। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করচো কেন ?

না। এমনি।

খুব আস্তে আস্তে সমীর রেণুকে বললে, আমার কথা তোমার মনে থাক্‌বে ? কাঁধে আরও একটু চাপ দিলে।

অন্ধকারেই বেশ বোঝা গেল যে, রেণু ওর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে ওর মনটা বোঝবার চেষ্টা করলে। বললে, আপনি ভুলবেন না ত ?

সমীর অস্পষ্ট হাস্‌লে, আরও একটু নিবিড়ভাবে রেণুকে নিজের গায়ের ওপোর টেনে নিয়ে বললে ট্রেন যাত্রার আজই ত শেষ !

রেণু নিজেকে সমীরের এই আংশিক আলিঙ্গনের মধ্যে বেমালুম ছেড়ে দিলে, কোন রূপ আপত্তি তার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পেল না। বোধ হয় যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখে বললে সত্যি, এমন দিন আর হবে না।

তুমি মনে করলেই হতে পারে।

অনুনয়ের সুরে রেণু বললে, ওরকম করে করে লোভ দেখাবেন না আমাকে। পূর্ব্ব জন্মে কতইনা পাপ করেছি তাই এ জন্মে এই অবস্থা, আবার এ জন্মে যদি—

সমীর বললে, আস্তে কেউ না শোনে যেন।

রেণু খুব চাপা গলায় বললে, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বেশীদিন না থাকতে হয় আর যে কটা দিন থাকি,

যেন বিশ্বেশ্বরের চরণেই নিজের জীবনটা শেষ করতে পারি।

রেণুর পিঠ থেকে হাতখানা আস্তে আস্তে শিথিল করে সমীর বল্লে, আমি তোমায় কি আশীর্ব্বাদ করবো রেণু, তুমি আমার আশীর্ব্বাদের অনেক ওপোরে।

ওকি কথা বলছেন দাদাবাবু, আপনি কত বড়ো—

ট্রেন আপন মনেই চলেছে। মাঝে মাঝে ষ্টেশন আসে ষ্টেশনের আলোয় কামরাটা আলোকিত হয়। কত লোক ওঠে, কত লোক নামে। রেণুও ঝিমোয়, সমীরও ঝিমোয়। এক একবার সমীরের মাথাটা রেণুর কাঁধের ওপোর এসে পড়ে। রেণু টের পায়, আপত্তি করে না। এক সময় সে চোখের জল মুছেছিল। সমীরের পাশে যে কজন শেওলা-রঙের পোষাক পরা পাঞ্জাবী সৈনিক যাত্রী ছিল, তারা একজন আর একজনের ঘাড়ের ওপোর ভারী বুটসমেত পা তুলে দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সামনের বেঞ্চে লম্বা ঘোম্‌টা দেওয়া কয়েকজন বুড়ী মাড়োয়ারী মহিলা ও একজন প্রৌঢ় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ছিল। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আধঘণ্টা অন্তর টর্চ জ্বালিয়ে বাথ রুমে যাতায়াত করছিল। সমীরের এক একবার তন্দ্রা ভাঙে, এক একবার আচ্ছন্নের মতো হয়ে বসে থাকে। এ যেন কি এক স্বপ্নলোক, কি যেন এক মায়াপুরী। এক সময়ে ষ্টেশনের আলোয় সমীর তার হাতে-বাঁধা ঘড়িতে দেখ্‌লে রাত্রি তিনটা। রেণু একটু নড়ে চড়ে টিনের স্যুট-কেসের ওপর ডান হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে বল্লে, কটা বাজে?

সমীর বল্লে তিনটে।

সমীর উঠ্‌লো। সদ্য কেনা মোরাদাবাদী জলপাত্র থেকে জলপান করে রেণুকে বল্লে জল কি চা কিছু খাবে নাকি?

রেণু ঘাড় নেড়ে বল্লে, না।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সমীর নিজের জায়গায় বসে বড় করে হাই তুলে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। ট্রেন তার প্রথামত বাঁশী বাজিয়ে দিয়া আবার চলতে সুরু করলো।

সিগারেটটা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে সমীর সেটাকে ফেলে দিয়ে সামনের বেঞ্চের তলায় লম্বা করে পা দুখানা ছড়িয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব পিছনে হেলান দেওয়ার চেষ্টা করলো। দেহের ডানদিকটার অনেকখানি অংশ সারারাত ধরেই রেণুর দেহের বাম অংশের সঙ্গে ঠেকে রইল। কিন্তু তবুও যেন মনে হয় ও কত—কত দূরে। ঐ পল্লী-গ্রামের সামান্য নিরক্ষর মেয়েটা, ঐ একেবারে নিঃস্ব সহায় সম্বলহীন কুশ্রী কানী মেয়েটা যে কেন সদাসিবের স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে সকলের অজ্ঞাতে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, এবং সমীরের আশ্বাস পেয়ে যদিও বা আত্মহত্যার ইচ্ছা সম্বরণ করে ওর সঙ্গে এলো, তাহলে আবার সমীরের প্রতি প্রস্তাবেই ওর বৈধব্য এবং ধর্ম্মের সংস্কারের অব্যর্থ মন্ত্র দিয়ে কেন যে সমীরের উদ্যত অজ-গরকে প্রত্যেক বারেই শান্ত ও স্তব্ধ ও করে দিচ্ছে, তা সমীর কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে না। ঐ সর্ব্বহারা প্রায় মৌন, ভবিষ্যৎশূন্য মেয়েটা কি যে চায়; কি ভাবে কি পেলে খুশী হয়, তা সমীর কিছুতেই নির্ণয় করতে পারে না। ঐ মেয়েটার আছে কি? না বিদ্যা, না সৌন্দর্য্য, না কোন নারীসুলভ চটুলতা, কিন্তু ওর চারিপাশ ঘিরে ও এমন এক অচ্ছেদ্য ধর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে যে, সমীরের মত ব্যক্তি, যে ওর তুলনায় রূপে গুণে শতগুণ উচ্চস্তরের গৌরীকে তার স্বামীর অঙ্ক থেকে বিনা ইচ্ছা এবং চেষ্টাতেই এমন সর্ব্বাঙ্গীনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, তাতে করে ও নিজেই বিব্রত বোধ করে, সেই সমীরই ওকে জয় করার চেষ্টা করে বার বার পরাস্ত হচ্ছে। সমীর ত প্রথমে ওকে বিবাহ করার কথা কল্পনাও করে নি, কিন্তু ওর ঐ কাঠিন্যে, ওর কাছে পরাজিত হয়েই অসহায়ভাবেই বিবাহের প্রস্তাবটা সে এনেছিল। এই প্রস্তাব যেন বিজিত রাজার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে সন্ধি করার ব্যাকুল প্রয়াস!

পঁয়তাল্লিশ বছরের বলিষ্ঠ বুদ্ধিমান সমীর তার সমস্ত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিষ্কারভাবে সমস্ত জিনিষটা এই ট্রেনে বসে বসেই তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। একদিকে গৌরীর অত্যাগ্রাহী প্রগল্‌ভতা ও লজ্জাশূন্যতা অন্যদিকে রেণুর সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থা সত্বেও সহজ কাঠিন্য এই দুয়ের সমন্বয়ে সমীরের অন্তরে রেণুর জন্য জেগেছিল এক প্রবল আকর্ষণ! প্রথমে ও চেয়েছিল রেণুকে শুধুমাত্র উপকার করতে, কিন্তু গান্ধীঘাটে দেখা হওয়ার পর থেকে ও কিছুতেই রেণুকে পরিষ্কারভাবে

বুঝতে পারছিল না এবং ঐ দুর্বোধ্যতাই বিশেষ করে সমীরকে রেণুর দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছিল। যে রহস্যের অন্ধকার যুগ-যুগান্তর ধরে কৌতূহলী মানবকে অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করে, যে অজ্ঞাত জটীলতার কারণ নির্ণয় করতে হাজার হাজার সন্ধানী মন নিশ্চিত মৃত্যুকে সানন্দে সাগ্রহে বরণ করে যে আলো-ছায়ার পাই-কি-না-পাই ভাব বিজ্ঞানের গবেষক-দের উন্মাদ করে কঠিন গবেষণা কার্যে বছরের পর বছর আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়ে রাখে, এমন কি শিষ্য পরম্পরায় আকর্ষণ করতে থাকে, আপাতদৃষ্টিতে ঐ অপদার্থ রেণু মেয়েটা যেন সমীরের মনে সেই রকমই এক অপূর্ব্ব মায়া-জাল সৃষ্টি করে তাকে এমনই উন্মাদ ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য করে তুলেছিল। সমীর চিরদিনই বপরোয়া চিরদিনই স্বাধীন দু-একটা প্রেমের খাতায় সে ইতিপূর্ব্বে অভিজ্ঞতাও লাভ করেছে, সেইসব নারী কোনদিনই তার মনের মণি-কোঠায় তিলমাত্র স্থানও অধিকার করতে পারেনি। যত নারীর সংস্রবে সে এসেছে, তাদের মধ্যে কেউ একেবারে দূরে দূরে থেকে গিয়েছে, আর ধরা দিতে চেয়েছে কিন্তু ধরা সে কোথাও পড়ে নি, এমন কি কারুর প্রসঙ্গ মনে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেনি, কিন্তু এই একচক্ষু রেণুর মধ্যে সে পেয়েছে এক সম্পূর্ণ অভিনত্ব। এ না থাকে দূরে, না দেয় ধরা। তাই বোধ হয় এর আকর্ষণ সমীরকে এতটা উদ্‌ভ্রান্ত, এতটা বিচলিত করে তুলেছে।

সমীর ঠিক এইভাবেই এতগুলো কথা ভাবছিল কি না কে জানে, কিন্তু শেষ রাত্রের এই সময়টা মানুষকে এমনই অবশ করে দেয়। বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর বসে থাকা ট্রেন-যাত্রীদের যে, তাদের আর কারুরই কোন বাঁধন থাকে না। সারা কামরায় যে যেমন করে পেরেছে, এলিয়ে পড়েছে। কারুর কোন সাড়া নেই, এমন কি বিড়িটা পর্য্যন্ত কেউ খাবে না। বিশেষ করে কামরাটা অন্ধকার বলে এই স্বাভাবিক এলিয়ে-পড়া ভাবটাকে আরও একটু বেশী করে এলিয়ে দিয়েছে। সামনের মাড়োয়ারী বুড়ীগুলো সবাই মিলে যেন দলা পাকিয়ে আছে। পাশের পাঞ্জাবী সৈনিকগুলো পরস্পরের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে এমন হয়ে গেছে যে, কোনটা কার হাত, কোনটা কার পা তা রীতিমত বেছে বেছে বার করতে হয়। সমীরের মাথাটাও ধীরে ধীরে বোধহয় যেন সকলের অজ্ঞাতসারেই পেছনের ঠেসান দেওয়ার কাঠ থেকে নেমে রেণুর কোলের ওপোর পড়ে গেল। রেণু সেটা টের পেলে, কিন্তু কোনরকম আপত্তি না করে পরম স্নেহে বাম হাতখানি ওর বুকের ওপোর রেখে ডান হাতখানা ওর মাথা এবং কপালে বুলোতে লাগলো। সমীর ঐ বাসন-মাজা হাতের কঠিন স্পর্শে রেণুর সুকোমল অন্তরের নিবিড়তাই বোধহয় যেন উপলব্ধি করছিল, কিন্তু উভয়পক্ষের কেউই কোন সঙ্কোচ বোধ করে নি। ট্রেনের শেষরাত্রি কিছুক্ষণ পরে রেণুকেও গ্রাস করলে। সে বেচারা তন্দ্রায় অর্দ্ধ-অচেতন হয়ে সমীরের বুকের ওপোর মাথাটা কাৎ করে দিলে। তবে উভয়েরই অবচেতন মনে এই জ্ঞানটুকু বোধহয় টনটনে ছিল, যে গাড়ীতে কোন আলো নেই, এবং ষ্টেশন এলেই ভালো হয়ে উঠে বসা যাবে।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিল কে জানে। কোন ষ্টেশন এসেছে কি না, তাও ঠিক জানা নেই, কিন্তু উষার প্রথম আলোক চলন্ত গাড়ীর জানলা দিয়ে কামরার মধ্যে প্রবেশ করতেই রেণু তার মাথা তুললে। পাছে সমীরের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় সেদিকে সস্নেহ দৃষ্টি রেখে সে যতটা সম্ভব সোজা হয়ে বসে তার আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছে নিলে এবং তারপর আপন মনেই বসে বসে উষার ক্ষীণ আলোকে রেলের ঝাঁকানীর তালে তালে সমীরের নড়ন্ত দেহটাকে দেখতে দেখতে তার মাথার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলো।

উষার প্রভাব সকলের মধ্যেই দেখা দিলে। মাড়োয়ারী প্রৌঢ়ারা নিজেদের জট ছাড়িয়ে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র হয়ে নিলে, সামনের বাঙ্কে যে কাপড়-পরা লোকটি শুয়েছিল, সে তার কাপড়খানাকে একটু সংযত করে নিল, সমীরও ধীরে ধীরে চোখ চেয়ে দেখলে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে রেণুর মুখখানা দেখতে পেলে। তার একাক্ষের গভীরতার সঙ্গে সমীরের দুই চক্ষের দৃষ্টি মিলিত হোল। রেণুর ডান হাতখানা তখনও ওর মাথার ওপোরেই ছিল আর বাম হাতখানা ছিল ওর বুকের পাশে। পরম নির্ভয়ে সমীর রেণুর হাঁটুর ওপোর হাতের চাপ দিয়ে ওর কোল থেকে মাথা তুলে উঁচু হয়ে বসলো। যেন একটু লজ্জিত

হয়েই বল্লে, ওঃ, খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তোমার পায়ে লাগে নি ত ?

ধরা গলায় রেণু বল্লে, না। একটু থেমে বল্লে এর মধ্যেই উঠলেন কেন ? আর একটু শুলেই ত পারতেন।

নাঃ, সকাল হয়ে গেছে, সমীর উত্তর দিলে।

সোজা হয়ে বসে নিয়ে সমীর বল্লে, তোমার একটুও ঘুম হয় নি ?

রেণু তার কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে পা-টা একটু নাড়াচাড়া করে বল্লে, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছি। তার সমস্ত বাঁ পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরে গিয়েছিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেল।

একটা ষ্টেশন আস্‌তেই সমীর উঠে পড়লো। প্ল্যাটফরমের কলে মুখ ধুয়ে জলের জায়গাটা ভর্ত্তি করে অন্য কিছুর অভাবে দু'ভাঁড় চা নিয়ে গাড়ীর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করলে। একভাঁড় চা রেণুর হাতে দিয়ে কাঁধ থেকে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ ঝোলানো মোরাদাবাদি জলপাত্রটা নামিয়ে ওকে ডেকে বল্লে, নাও, মুখ ধুয়ে নিয়ে একটু চা-সেবা কর। বলেই নিজের রসিকতায় নিজে হেসে উঠ্‌লো! এই সেবা কথাটা বৃন্দাবনের পাণ্ডার কাছ থেকে ভালো করে শিখে নিয়ে ও ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার ব্যবহার করেছে।

রেণু কোন কথা না বলে সামান্য জল দিয়ে মুখ ধুয়ে পূর্ব্বের উদীয়মান তরুণ সূর্য্যকে নমস্কার করে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে সুরু করলে। ইতিমধ্যে সমীর চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে বসেছে।

এম্‌নি ভাবে প্রায় চুপচাপেই ঘণ্টাখানেক কাট্‌লো। যেন মনে হয় বলার মত কথা আর কারুরই কিছু নেই। এর কারণ হয়ত অতিরিক্ত পূর্ণতা কিম্বা নিদারুণ রিক্ততা। হয়ত উভয়ই, কিম্বা হয়ত একজনের একটা অপরজনের অন্যটা, কিন্তু কোন্‌টা কার, কে জানে ?

বেলা বোধহয় সাতটা হবে। ট্রেণখানা অভ্যাসমত ছুটেছে। হঠাৎ যেন রেণুর চমক ভাঙ্গলে, সমীরের দিকে চেয়ে বল্লে, আর কিছু খাবেন না ?

সমীর বল্লে, খাবো। সাড়ে আটটার সময় এলাহাবাদ আসবে। বেশ বড় ষ্টেশন সেইখানেই ভালো করে খাও যাবে।

রেণু বল্লে, আমরা কাশী পৌঁছাব কখন ?

সমীর ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, বিকেলে। এ গাড়ী কাশী যাবে না, মোগলসরাইতে আমাদের বদলী হতে হবে।

ওঃ, রেণু, আপনমনেই বল্লে। তারপর বল্লে এলাহাবাদে গাড়ী কতক্ষণ থাম্‌বে ?

কেন ?

একবার নেমে কলে গিয়ে হাতমুখ ধোব, সুবিধে হলে মাথাটাও ধুয়ে নেব।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে মাথা ধোয়ার কথায় সমীর যেন নতুন একটা আশার আলো দেখতে পেলে। বল্লে এলাহাবাদে স্নান করবে, প্রয়াগে ?

রেণু সমীরের মুখের দিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেন। বল্লে আচ্ছা ঐ এলাহাবাদই প্রয়াগ ? তাই না ?

সমীর বল্লে, হ্যাঁ।

রেণু বল্লে হ্যাঁ, ঐখানেই নাম্‌বে। দিদিমার মুখে শুনতুম, পৈরাগেতে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যেথা সেথা। আমায় পৈরাগে নিয়ে যাবেন ?

চল—সমীর উত্তর দিলে।

তাহলে গুছিয়ে নিই। রেণুর মুখেচোখে একরাশ আনন্দ।

রেণুর এই ভাবটা সমীরের বড় ভালো লাগলো। দুই চোখ দিয়ে সে যেন রেণুর এই আনন্দটা আকণ্ঠ পান করতে লাগলো। মুখে বল্লে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই এখনও দেড় ঘণ্টা দেরী।

রেণু আবার স্থির হয়ে বসলো। হঠাৎ একটু হেসে বল্লে, ওঃ, বড়দাবাবু কি রকম ব্যস্তবাগীশ লোক। ওঁর সঙ্গে যখন দিল্লীতে যাই, সেই চারবছর আগে, তখন গাড়ীতে বেশ জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। আমরা সব ঘুমুচ্ছিলুম, আর উনি রাত চারটের সময় আমাদের সকলকে ডেকে তুলে দিলেন, বল্লেন, সব গুছিয়ে নাও, সময় হয়ে এলো ইত্যাদি। দিদিমণি ত চটেই অস্থির আমি মনে ভাবি, না জানি কিই বা। শেষে শুন্‌লুম, বেলা সাড়ে আটটায় সময় নামতে হবে। বড়দাবাবু বলেন, দরকার কি, কলকাতার ব্যাপার, একটু তৈরী হয়ে থাকাই ভালো।

সমীর ও রেণু দুজনেই খুব হাসলে। রেণু একটু চুপ করে থেকে বল্লে, বড়দাবাবু চমৎকার লোক, একেবারে মাটীর মানুষ। কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। দেখলে ভারী ভক্তি করতে ইচ্ছে হয়, একবারে শিবের মতো।

আর আমি কি রকম রেণু? সমীর প্রশ্ন করলে, মুখে তার দুষ্টামির হাসি।

আপনিও ভালো— রেণু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়ে হঠাৎ লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে ফেল্লে।

আমাকে দেখলে ভক্তি করতে ইচ্ছে হয়? সমীরের পুনরায় দুষ্টামির প্রশ্ন!

রেণু নিরুত্তর।

কই, কোন উত্তর দিলে না? সমীর উত্তরের জন্য পীড়াপীড় করতে লাগলো।

জানি না, রেণু সংক্ষেপে জবাব দিলে।

একটা ষ্টেশন এগিয়ে আসছে। অনেক গ্রাম ও লাল রঙের কোয়ার্টার্স চোখে পড়লো, এবং তলায় লাইন থেকে লাইনে বদলী হওয়ার শব্দ হতে লাগলো! তারপর প্ল্যাটফরম, যাত্রীদের ওঠানামা, পানবিড়ি সিগারেট, চা গরম, কেলা, সান্ত্রা, আমরুদের আহ্বান, দুধ গরম, পুরী মিঠাই, পানিপাড়ে, সারা রাত্রির পর প্রভাতের প্রথম কলরব।

আরও প্রায় সওয়া একঘণ্টা পরে গাড়ী এলো এলাহাবাদ। পরিষ্কার ঢাকা দেওয়া ষ্টেশন। সমীর ও রেণু দুজনেই নেমে পড়লো। ষ্টেশনের ঘড়ির সঙ্গে সমীর তার হাতের ঘড়িটা একবার মিলিয়ে নিয়ে টিনের সুটকেশ হাতে এগিয়ে চললো। গেটের কাছে টিকিট দেখিয়ে সমীর বাইরে আসতেই রেণু বল্লে, কই টিকিট ত দিলেন না।

সমীর বল্লে, বা রে, এ ত আমার কাশীর টিকিট। এখানে টিকিট দেব কেন?

ও, তাই বুঝি হয়, রেণু বল্লে।

হবে না, এখানে টিকিট দিলে কাশী যাবো কি করে?

টাঙ্গাওয়ালা এসে ইতিমধ্যেই সমীরকে ঘিরে ধরেছে, বাবু কাঁহা যাওয়েঙ্গে?

প্রয়াগ।

চলিয়ে জী, চলিয়ে ইত্যাদি, একখানা টাঙ্গা নিয়ে ওরা সোজা চলে এলো প্রয়াগের এক ধর্মশালায়।

সুটকেশটা রেখে রেণুকে বসিয়ে সমীর প্রথম বেরুলো চাবিতালা কিনতে, এখন সুটকেশ হয়েছে, কাজেই চাবি তালা চাই। চাবিতালা এবং একটা চাবির রিং কিনে ও ফিরে এলো। রিং এর মধ্যে সুটকেশের চাবী দুটো এবং তালার চাবি দুটো ভরে ও এসে হাসিমুখে রেণুর আঁচলটা ধরে তাইতে চাবির রিংটা বেঁধে দিলে। রেণু নতমুখে সমস্তটা দেখলে, কোন আপত্তিও করলে না, কোন আগ্রহও দেখালে না।

প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে ওরা বেরুলো গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের উদ্দেশ্যে। সঙ্গমের ধারে এসে রেণুর সে কি আনন্দ! এ সময়ে গঙ্গায় তেমন চর নেই, গঙ্গা ও যমুনা প্রায় কূলেকূলে ভর্ত্তি। গঙ্গার সাদা জলের সঙ্গে যমুনার নীল জল এসে মিশেছে, এবং মিলিত গঙ্গা-যমুনা অনেকদূর পর্য্যন্ত দুই রঙের দুইটি স্পষ্ট ধারা যেন একত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে সমীরের মনে হোল এই দুটি ধারা কি সমীর ও রেণুর ধারা! কথাটা মনে হতেই সমীর আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কই এর আগে ত এরকম কবি সে কখনও ছিল না!

সঙ্গমের ঘাটে কতকগুলি লোক ইতস্ততঃ ঘুরছে। দু'একজন পাণ্ডা সেই ধর্মশালা থেকেই ওদের পেছু নিয়েছিল। সমীর তাদের কোন আমোলই দিচ্ছিল না, কিন্তু তারাও নাছোড়বান্দা। পেছন পেছন চলেছে। সঙ্গমের ধারে পর্য্যন্ত এসে তারা নানারকম অযাচিত সহায্য করার জন্য উদ্‌গ্রীব। শেষে এক জনকে রেণুর আগ্রহ মতই ঠিক করা হোল। রেণু বল্লে, আমি একটু এখানে বসি, আপনি ততক্ষণ স্নান করে নিন।

পাণ্ডা বল্লে, এখানে স্নান হবে না, নৌকো নিয়ে সঙ্গমের মাঝখানে গিয়ে ঐ যেখানে জলের মাঝখানে পূজারীরা খোঁটার সঙ্গে চৌকি বেঁধে দ্বীপ তৈরী করে বসে আছে, ঐখানে স্নান করতে হবে।

সমীর বল্লে, আর ওখানে যায় না, এইখান থেকেই ভালো।

খুকীর মত আগ্রহ নিয়ে রেণু বল্লে, না ছোটদাবাবু,

এতদূরেই যখন নিয়ে এলেন—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে সমীর বল্লে, আচ্ছা। ইতিমধ্যেই নৌকাওয়ালাও এসে পড়েছে। সমীর তাদের সঙ্গে দর করতে লাগলো।

রেণু বল্লে, ছোটদাবাবু, আমাকে চার আনা পয়সা দিন না, একটু দরকার আছে।

সমীর অবাক হয়ে গেল। এতকালের মধ্যে রেণু কখনও একটিও পয়সা চায় নি! একটু আনন্দও হোল, সে মুখ ফুটে চাইছে। কিন্তু মনোভাব চেপে রেখে সমীর বল্লে, কেন, কি হবে?

দিন না, দরকার আছে। আমার জন্যে ত কতই খরচ করছেন, এটাও না হয় করলেন।

কৌতূহলী সমীর ব্যাগ থেকে একটা সিকি বার করে ওর হাতে দিলে। রেণু পয়সাটা নিয়ে নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চল্লো। কিছু দূরে একটা ভিখারী মেয়ে দুটি উলঙ্গ শিশু নিয়ে বসেছিল। সমীর ভাবলে, রেণু বোধহয় ওদেরই দিকে যাচ্ছে।

নৌকো এবং পাণ্ডার সঙ্গে সমীরের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওদের দুজনকে সঙ্গমে স্নান করিয়ে মন্দির, অক্ষয় বট ইত্যাদি সমস্ত দেখিয়ে কেল্লার মধ্যে অশোকস্তম্ভটা দেখার পাশ যোগাড় করে সেটা দেখিয়ে আবার ঘাটে পৌঁছে দেবে। সব ঠিক করে সমীর মাঝিকে বল্লে, মাঝি, কতক্ষণ লাগবে?

সে বল্লে ঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা-ভোর লোগা।

এ পর্ব্ব চুকিয়ে সমীর এদিক ওদিক চেয়ে রেণুর সন্ধান করতে লাগলো। সে যে সেই চার আনা পয়সা নিয়ে গেছে, সে গেল কোথায়?

সমীর আগেই নজর দিলে ভিখারী মেয়েটার দিকে। দেখতে গিয়েই তাজ্জব হয়ে গেল। একি? ভিখারীটার কাছে ছিল নাপিত, রেণু তার কাছে গিয়ে মাথা কামাতে বসেছে, এবং ইতিমধ্যে মাথার প্রায় একটা ধার কামানো হয়েও গেছে।

আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালো সমীর, নিঃশব্দে। রেণু একবার ঘাড় কাৎ করে সমীরের দিকে চেয়ে দেখে মুখ টিপে হাসলে। কেউই কোন কথা বল্লে না। কেবল সমীরের মুখখানা ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এ মেয়েকে চেনা অসম্ভব, এ ধরা-দেওয়ার মেয়েই নয়।

একখানা চক্চকে সাদা মাথা নিয়ে রেণু উঠে দাঁড়ালো। বিনুনী বাঁধা চুলটা মাটীতে পড়ে জলে ও বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

চারিদিকে চেয়ে নিয়ে হাসিমুখে হেঁট হয়ে রেণু তার চুলের বিনুনীটা হাত দিয়ে তুলে নিলে, বল্লে, চলুন, দাদা, এটাকে অনেকদিন মাথায় করে রেখেছিলুম, আজ একে গঙ্গায় দিয়ে যাই। এই সে সমীরকে প্রথম দাদা বল্লে, ছোটদাবাবু নয়।

সমীর নিঃশব্দে রেণুর সঙ্গে চলতে লাগলো। রেণু আগে আগে নৌকার কাছে আসতেই মাঝি বল্লে চলিয়ে মায়িজী চলিয়ে।

ওরা দুজনেই এসে নৌকায় উঠলো। মাঝি নৌকাটা ঠেলে দিয়ে নিজেও চড়ে বসলো।

নৌকো খানিকটা এগিয়ে সঙ্গমের মধ্যে পৌঁছাতেই রেণু তার বিনুনীশুদ্ধ চুলটা জলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে। হাত বাড়িয়ে একটু জল নিয়ে নিজের মাথায় দিয়ে বল্লে জানেন দাদা, দিদিমা বলতো, 'পৈরাগেতে মুড়িয়ে মাথা মরগে পাপী যেথা সেথা।' ওঃ, কত পাপ করেছি তাই এজন্মে এত দুঃখ পাচ্ছি।

এতক্ষণ পরে সমীর কথা কইলে, বল্লে কি দুঃখ রেণু? দুঃখ ত সবাই পায়, তোমার আবার বিশেষ দুঃখটা কি শুনি। কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা অনাসক্ত ভাব, যেন অনেকদূর থেকে শব্দগুলো ভেসে এলো।

ওর মুখের দিকে চেয়ে রেণু বল্লে, সে আর আপনি কি বুঝবেন দাদা, মেয়েমানুষের দুঃখ কি পুরুষে বোঝে? একটু থেমে বল্লে, পেয়ে হারানো, আর পেয়ে না-পাওয়া, এ দুটো না-পাওয়ার চেয়েও যে কত দুঃখের, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কি আর কথা বলে বোঝানো যায় দাদা? আমার সেই দুটোই হয়েছে—কথাগুলো বলে সে ওপারের মন্দিরের দিকে উদাস হয়ে চেয়ে রইলো।

সমীর একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। ঐ নিরক্ষর লাজুক মুখ-চোরা মেয়েটির মুখ দিয়ে যে এরকম ভাষ বেরুতে পারে তা সমীর কখনও কল্পনাও করে নি। শুধু তাই নয়, এর আগে দুএকবার দুএকটা বড়ো কথা বলে ফেলেই রেণু লজ্জায় মুখ হেঁট করতো। কিন্তু

এখন লজ্জার চিহ্নটুকুও আর নেই। এমন কি মাথা কামানোর মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সে একবারও সমীরের মত নিলে না। শুধু তাই নয়, পয়সা চেয়ে নেওয়ার সময় ইচ্ছে করেই তার এই অদ্ভুত বাসনাকে সে সমীরের কাছ থেকে গোপন রেখেছিল।

তীর্থের কাজ সমাপন করে ফলমিষ্টি ও দুধ খেয়ে রেণুরা যখন এলাহাবাদ ষ্টেশনে এলো, বেলা তখন একটা। চুয়ান্নর প্যাসেঞ্জারে উঠে যথাসময়ে গাড়ী বদল করে ওরা বেনারস ক্যান্টনমেন্টে এসে পৌছাল রাত্রি দশটা নাগাদ।

[ক্রমশঃ]

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ

(প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ) ২৩)

শঙ্কর কন ব্রহ্ম যে হন জগতের উপাদান
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট জগৎ জানেন যে জ্ঞানবান
উপনিষদেতে প্রতিজ্ঞা হয়
দৃষ্টান্ত যাতে বাধা নাহি পায়
সিদ্ধান্ত এই মনেতে করিয়া সত্য বলিয়া জানো
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট জগৎ প্রলয়েও তাই মানো।
প্রলয় কালেতে ব্রহ্ম মাঝেতে সৃষ্টি যে লয় পায়
ব্রহ্মই শুধু একক সেথায় আর কিছু নাহি তায়
ব্রহ্মই সেই নিমিত্তকারণ
আবার ব্রহ্ম উপাদানে রন
ব্রহ্ম ব্যতীত সৃষ্টির জেন অন্য কিছু না হয়
ব্রহ্ম স্রষ্টা ব্রহ্ম সৃষ্টি ব্রহ্মজগৎময়।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ (২৪)

অভিধ্যা মানে ধ্যান উপদেশ ইহার অর্থ হয়
ব্রহ্ম জগৎ গড়েন ভাঙ্গেন সকলি ব্রহ্ম ময়
এক হয়ে সাধ মিটিল না তাঁর
ধরেন তখন বহুর আকার
বোঝা যায় এতে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট সকলি হয়
তাঁহারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ যেজন ইচ্ছাময়।

সাক্ষাৎ চ উভয়াম্নানাৎ (২৫)

কন শঙ্কর স্পষ্ট ভাবেতে উৎপত্তি প্রলয় যাহা
সবেরই কারণ ব্রহ্ম আপনি মূলেতে ব্রহ্ম তাহা
আকাশ হইতে সবকিছু হয়
আকাশ এখানে ব্রহ্ম বুঝায়
এই জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মই জেনো সব
ব্রহ্মের মাঝে হইবে বিলীন ব্রহ্মেই উদ্ভব।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ (২৬)

কন শঙ্কর এতেও বুঝায় কর্মকর্তা সেই
কর্ম রূপেও বিরাজে ব্রহ্ম কর্তা ব্রহ্ম সেই
"তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত"
এর অর্থেও জগৎ সুস্পষ্ট
ব্রহ্ম নিজেকে জগৎ রূপেতে করিলেন পরিণত
ব্রহ্মের মাঝে জনমে সকলে ব্রহ্মতে হয় গত।

যোনিশ্চ হি গীয়তে (২)

ব্রহ্মকে হেথা যোনি বলা হয় সবার জনম স্থান
মুণ্ডক উপনিষদেতে আছে এ কথার ব্যাখান
"কর্তারম্ ঈশম্ পুরুষম্
ব্রহ্মযোনিম"
সুধী জন জানে সবার সৃষ্টি ব্রহ্ম হতেই হয়
যোনি শব্দের প্রয়োগে সেকথা সহজে বুঝায়ে কয়॥

এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ (২৮)

এই অধ্যায় সমাপ্তি তরে ব্যাখ্যাতা দুবার কয়
সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ উপনিষদ এই ভাবে যেন হয়
বিশেষ দর্শনে পরমাণুবাদ
উপনিষদেতে তাহারি প্রমাদ
ব্রহ্মে জানিও স্থির নিশ্চয় সকল জীবের মূল
স্রষ্টা সেজন সৃষ্টি সেজন ইহাতে নাহিক ভুল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥

সাধকের সাথে - ৪

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(ডেরাডুন – ২)

শ্রীমদ্ ভৈরবানন্দ তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস মহারাজ ১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ডেরাডুনে আমাদের সাথে ছিলেন, তখন একদিন সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতি দেবতার বাহন মূষিকের প্রসঙ্গে বলিলেন, আমি গণেশদাদার কাছে অভিযোগ করেছিলাম, "দাদা তোমার বাহনের আচরণ আর কার্য্যকলাপ দেখো, আমার গরম জামা আর কম্বল কিভাবে কেটেছে। আর তুমি এই জীবটিকে তোমার বাহনরূপে কেন বাছিয়াছিলে? ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতার বাহন দ্রুতগামী। তোমার শরীর অন্য দেবতাদের দেহ অপেক্ষা স্থূল কিন্তু তোমার বাহনটি তাঁদের বাহনগুলির তুলনায় ক্ষুদ্রকায় আর তোমার কলেবরের সহিত বেমানান। এ ব্যাপারের কারণ বোঝা যায় না। দাদা তখন ব্যাপারটি বোঝালেন।

"শাস্ত্রাদিতে বলা হয় এবং সাধকগণ সাধনার দ্বারা জানতে পারেন যে কোন দেবতার আরাধনা করা হ'ক বা যে কোন কর্ম সম্পাদিত হ'ক তার সিদ্ধিফল দাতা একমাত্র গণপতি দেবতাই। এই কারণে তাঁকে সর্ব সিদ্ধিদাতা বলা হয়।"

"যখন সাধক বা কর্মবীর মনকে ফাঁকি না দিয়া বিজ্ঞান সম্মত ধারায় সাধনা বা কর্ম করে তখন তার প্রারব্ধানুযায়ী সিদ্ধি প্রাপ্তির যোগ হয় এবং গণপতি নিজের ক্ষুদ্র বাহনে আরূঢ় হ'য়ে মন্থর গতিতে সিদ্ধিদানের জন্য যাত্রা আরম্ভ করেন আর এই অবসরে সাধক বা কর্মী সিদ্ধিফল ভোগ করার সামর্থ্য অর্জন কর্ত্তে থাকে। সমর্থ হওয়ার পর ফলপ্রাপ্তি কল্যাণ জনক হয়। ফলভোগ কাল পর্য্যন্ত যে সকল অশুভ বর্তমান থাকতে পারে, তাহা মূষিক কেটে ধ্বংস করে দেন। গণপতির বাহনের দ্বারা ধ্বংসিত অশুভগুলি কার্য্যকর হয় না। সাধক বা কর্মবীরকে আশু সিদ্ধি দিলে তার বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সিদ্ধিফল ভোগের সামর্থ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় যা'তে সাধক বা কর্মবীর পায় আর অশুভগুলি কর্তিত হতে পারে এই দুটি উদ্দেশ্য যা'তে সিদ্ধ হয় তাই সিদ্ধিদাতার বাহন ক্ষুদ্র মূষিক।

হিন্দু ধর্ম সাধনার মুখ্য পাচটি ধারার অন্যতম গাণপত্য সাধনা। মহারাজ বলিলেন, "গণেশ সাধনা ত্রেতাযুগের দ্বিতীয়পাদে মর্ত্যে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ইহা প্রকাশিত করেন কিন্তু তিনি মূল মন্ত্রটি ব্যতিরিক্ত সাধন বিষয় ব্যক্ত করেন নি। এই মন্ত্রটি অষ্টাদশ অক্ষরের "ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ে নমঃ। সেই যুগে অষ্টাঙ্গ যোগ ও অষ্টাঙ্গ প্রাণায়মের মধ্য দিয়া ইহা সাধিত হইত। অর্থাৎ এই সাধনে সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ ও অষ্টাঙ্গ প্রাণায়াম বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হত। ত্রেতা হতে এখন পর্যান্ত একটি মাত্র সাধক এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন। ইনি দ্বাপরের লোক নাম গণপতি শর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের লিপিকার ইনিই।

'প্রবাদ আছে গণপতি দেবতাই মহাভারতের লিপিকার। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। দেবতারা সূক্ষ্ম শরীরী এবং তাঁহাদের চরণ ভূমি স্পর্শ করে না। অতএব সূক্ষ্ম শরীরে শূন্যে স্থিত হ'য়ে মহাভারত লেখা সম্ভব হ'তে পারে না। ব্যাসদেবকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম – "প্রবাদ আছে যে মহাভারত রচনা করা স্থির করিয়া, উহার লিপিকার রূপে আপনি গণেশ দাদার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, আর গণেশদাদা মহাভারত লিখিতে এই শর্তে সম্মত হয়েছিলেন যে, তিনি লিখিতে আরম্ভ করার পর যদি রচনা প্রস্তুত না থাকার জন্য তাঁহার লেখনী থামে তা'হলে তিনি আর লিখবেন না। আপনি বলেছিলেন তাই হবে, কিন্তু গণেশ দাদা যেন শ্লোকার্থ বুঝিয়া লেখেন। রচনা

ভাবিয়া লইবার সময় পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কূট বা দুর্বোধ্য শ্লোক ছেড়েছিলেন যেগুলির অর্থ বুঝিতে গণেশ দাদারও কিছু সময় লাগতো। ইহা শ্রবণ ক'রে গুরুদেব (ব্যাসদেব) উচ্চহাস্য করে বললেন, 'এ আবার কি রকম কথা। বিদ্যাবারিধি সর্বশাস্ত্র জ্ঞাতা, বুদ্ধিবিধাতা, সকল-গুণনিধি, ব্রহ্মমূর্তি গণপতি দেবতাকে এইরূপ কথা বলিবার প্রগল্‌ভতা আর দুঃসাহস ব্যাসের হইতে পারে না। আমার মহাভারত লিখেছিলেন সিদ্ধিদাতার সিদ্ধ সাধক শ্রীগণপতি শর্মা।'

'আমার অনুরোধে কৃপা পরবশ হইয়া গণেশদাদা মন্ত্র যোগ পথে (কলিকালের উপযোগী) তাঁহার সাধন আমার কাছে যেরূপ প্রকাশ করেছিলেন, তাহা অষ্টাদশ চক্রের সাধন।"

এই সাধন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি অপর সাতটি সাধন মার্গের বিস্তৃত বর্ণন, উপদেশাদি এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণের সহিত মহারাজের প্রণীত (সদ্য প্রকাশিত) "মন্ত্রযোগে পুরুষোত্তম লাভ" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই এখানে লেখা হইল না।

পূর্ব প্রবন্ধে (সাধকের সাথে—৩, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৭৪ সংখ্যায়) গুরুর কর্তব্যের আভাস দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজের প্রণীত উক্ত গ্রন্থে গুরুতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তবু মহারাজের নিকট শ্রবণ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহার আধারে এ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ পরিবেষণ করা হইতেছে।

প্রয়োজনীয় সাধনবৈভব যাঁহার আছে এবং যিনি সাধন মার্গে শিষ্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণে সমর্থ এইরূপ গুরু অতিশয় দুর্লভ। সাধকের সুকৃতির ফলে সদ্‌গুরুলাভ হইতে পারে। মন্ত্রগুরুর কার্য্য অত্যন্ত কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ।

সকল ধর্ম মার্গে মন্ত্রযোগে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে সদ্‌-গুরুকে নিম্নলিখিতগুলি সাধন বলে দেখিতে বা করিতে হয়—

১। যোগবলে দীক্ষা প্রার্থীর পূর্বজন্ম দেখিয়া জানিতে হয় কোন্ পাপ বা পুণ্যের ফলে তাহার এবার জন্ম হইয়াছে।

২। গত জন্মে কোন্ স্তর পর্য্যন্ত সে সাধনা করিয়াছিল।

৩। গত জন্মের ইষ্ট দেবতাকে তাহার হৃদয়ে দেখা যাইতেছে কি?

৪। যদি পূর্ব জন্মের ইষ্টের স্থানে অন্য ইষ্ট দেবতা দৃষ্ট হন, তাহলে কেন এরূপ হইল ইহা জানিতে হইবে।

৫। পূর্ব জন্মে যে বীজমন্ত্রে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহা ইষ্টের হৃদয়ে দৃষ্ট হইতেছে কি না? যদি না দৃষ্ট হয়, তাহলে গুরু কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

৬। এ জীবনে কোন্ স্তর পর্য্যন্ত তাহার সাধন অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে।

৭। তাহার সাধনা ত্যাগে বা ভোগে বা ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগে হইবে।

৮। প্রার্থীকে জীবনে কু ও সু গ্রহগুলির প্রভাব কখন এবং কোন্ সময় পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইবে।

৯। প্রতিকূল গ্রহের দ্বারা সূচিত ফলের ভোগের প্রতিকার শিষ্যকে ভোগের পূর্বে জানাইতে হইবে।

১০। শিষ্যের সাধনের পরিচালনা এমন ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে তাহার কর্তব্য কর্মধারা বিশৃঙ্খলিত না হয়।

১১। শিষ্যের ইষ্ট ও মন্ত্রের নির্ভুল নির্বাচন।

১২। দীক্ষা কালে মন্ত্র চৈতন্য করা ও সুষুম্নাদ্বার উন্মুক্ত করা।

উপরোক্ত সকল কার্য্যগুলি উত্তম ও সর্বোত্তম গুরুগণ করিতে পারেন অন্ততঃ ১১ ও ১২ সংখ্যক কার্য্যগুলি যিনি ঠিক ভাবে করিতে অপারক তিনি গুরু হতে পারেন না। শিষ্যের ইষ্ট ও মন্ত্র নির্বাচনের নিমিত্ত তাহার হৃদয়স্থ ইষ্ট মূর্তি এবং মন্ত্র দেখিবার শক্তি থাকা গুরুর প্রয়োজন অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি থাকা চাই। ইহা সম্ভব হয় যদি গুরুর সাধনা আজ্ঞাচক্র অতিক্রম করিয়া, অন্ততঃ বিন্দুপীঠ জয় করিয়া থাকে। আজ্ঞাচক্রে দিব্যদৃষ্টি হয় না।

ডেরাদুন ত্যাগ করিবার একদিন পূর্বে অপরাহ্নে মহারাজের দর্শন প্রার্থীদের মধ্য কয়েকজনকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের প্রতিবেশিনী ডাঃ থাপা-র সহিত তিনটি মহিলা আর একজন পুরুষ আসিলেন। শেষোক্তটি ছিলেন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ সরকারী ডাক্তার। ইনি সাধক, যোগাভ্যাসী, দীক্ষিত। কিন্তু তাঁহার দীক্ষা প্রকৃতিগত ইষ্ট মন্ত্রে হয়

নাই। তাঁহার ইষ্ট ও মন্ত্র মহারাজ আমাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন। আমি তাহা লিখিয়া তাঁহাকে দিলাম এবং মহারাজের উপদেশ তাঁহাকে হিন্দী ও ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলাম। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা অবাঙ্গালী—বাংলাভাষা জানিতেন না।

মহিলা তিনটি ছিলেন বিধবা—দুইজন প্রৌঢ়া আর একটি যুবতী। তাঁহারা অল্লাধিক সাধনা করিতেছিলেন। প্রৌঢ়া দুইটির মধ্যে একটি নিজের ইষ্ট ও মন্ত্র জানিয়া লইলেন এবং মহারাজ অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার মন্ত্র চৈতন্য করিয়া দিলেন। অপর দুটি মহিলা প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্র পাইয়াছিলেন। যুবতীর গুরু দীক্ষাকালে তাহার মন্ত্রচৈতন্য করিয়া দেন নাই। ইনি কৃচ্ছ্রব্রতিনী হইয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভাবে সাধনা করিতেছিলেন, আর বোধহয় গুরুর উপদেশগুলি ঠিকভাবে পালন করছিলেন না। শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনা হইয়া ইনি কঠোর সাধন করিতেছিলেন, মাঝে মাঝে চব্বিশ ঘণ্টা বা ততোধিক সময় আসনে সাধনায় থাকিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী জাগেন নাই—তাঁহার কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা ফলদ হয় নাই। স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া হইল, যাহা ঠিকভাবে পালন করিলে এক বৎসরে কুলকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হইতে পারেন। মহারাজ তাহাকে ক্লেশকর সাধনা করিতে বারংবার নিষেধ করিলেন, এবং নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া পরিমিত সাধনা নিয়মিত ভাবে করিতে বলিলেন।

তৃতীয়া মহিলাটি মহারাষ্ট্র দেশীয়া। ইঁহার পতি মৃত্যুর পূর্বে এঁকে একটি মন্ত্র দিয়াছিলেন। ইনি সেই ইষ্টের অর্চনা ও মন্ত্রজপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত করিতেছিলেন। ইনি মৌনাবলম্বনে বসিয়া ছিলেন, কোন প্রশ্ন করছিলেন না এবং কোন প্রশ্নের উত্তরও দিতেছিলেন না। পরে জানিয়াছিলাম ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন যে কোন কথা বলিবেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আরাধিত ইষ্ট ও মন্ত্র মহারাজ স্বতঃ না ব্যক্ত করেন। মহারাজ স্মিত মুখে আমাকে বলিলেন, "ইনি বড় চতুরা। এঁকে গৌরীভাব লইয়া শিবের সাধনা করতে বলুন এবং শিবের মন্ত্র কাগজে লিখে দিন্।" আমি তাহাই করিয়া, কাগজটি তাঁহাকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "এই মন্ত্র সাধনা করিতেছেন?" তিনি স্বীকার করিয়া অতি প্রসন্ন হইয়া মহারাজকে প্রণতি জানাইলেন। মহারাজ বলিলেন, এঁর সাধনা ঠিক হইতেছে, কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে এবং উঠিতেছে। এই মন্ত্রেই ক্রমে এঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। অন্য কোন মন্ত্র বা সাধনার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া কিছু সাধন উপদেশ দিয়া বিদায় করা হইল।

ইহার পর আসিলেন আমার বন্ধু উত্তরপ্রদেশের P. W. D.র অবসর প্রাপ্ত এক্জিকুটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত প্রকাশ। ইনি গাজিয়াবাদ হইতে মহারাজের দর্শনার্থে আসিলেন। ইনি যোগ্য, অতি কর্মনিষ্ঠ, অত্যন্ত সদাশয় ও সদাচারী ব্যক্তি, মিরাট জেলার বাসিন্দা। ইনি কয়েক মাস পূর্বে একদিন নিজের ইষ্ট ও সাধনাদির সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি এঁর একটি ফোটো লইয়া মহারাজের নিকট মাকড়দহে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এঁর ইষ্ট কোন দেবতা আর ইষ্টমন্ত্র কি হইবে। পত্রোত্তরে মহারাজ জানাইয়াছিলেন এঁকে সাক্ষাৎ দেখিতে হইবে। পরে মহারাজের সহিত এঁর বিষয়ে আলোচনাতে বলিয়াছিলেন, "এঁর পূর্ব দুই তিন জন্ম দেখিলাম। প্রত্যেকটি জন্মে ইনি একটি ভিন্ন ইষ্টের সাধনা করেছেন। গত জন্মের ইষ্ট ছিলেন শিব, তার পূর্বেরটিতে দুর্গা এবং তৃতীয়টিতে শ্রীরামচন্দ্রদেব। এ জন্মে কোন ইষ্ট এঁর প্রকৃতির অধিক অনুকূল, তাহা ফোটোর দ্বারা ঠিকভাবে জানা কঠিন, চাক্ষুষ লোকটিকে দেখতে হবে।" তাই এঁকে ডেরাদুনে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলাম।

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইনি আসিলেন, তখন মহারাজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন। একবার ক্ষণিকের জন্য এঁর দিকে তাকাইয়া ছিলেন। এঁকে বসিবার কামরায় বসাইয়া কুশল প্রশ্নাদির পর তাঁহার বিগত তিনটি জীবনগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবতা থাকায় ব্যাপারটি জানাইলাম। শ্রবণ করিয়া তিনি সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "আমি ঐ তিন দেবতার পূজা এখনও করি।" আমি বলিলাম এখন মহারাজ দেখিবেন আপনার হৃদয়স্থ কোন্ দেবতা আপনার প্রকৃতির অত্যধিক অনুকূল (প্রকৃতিগত)।"

অল্পক্ষণ পরে মহারাজ সেই কক্ষে এলেন এবং আমি যখন প্রকাশের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলাম, মহারাজ বলিলেন, "ইনি যখন এলেন তখনই আমি এঁকে চিনেছিলাম। এঁর সাথে এক অশরীরীও এসেছেন, সম্ভবতঃ এঁর পিতার-আত্মা।" মহারাজের প্রদত্ত বর্ণনা হইতে প্রকাশ স্বীকার করিলেন, তাঁহার পিতৃদেবের দেহের বর্ণনা ঐরূপ। প্রকাশ আমার সহিত হিন্দীতে কথা বলিতে ছিলেন। মহারাজ আমার পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন।

প্রকাশ বলিলেন তাঁহার পিতা অত্যন্ত পরিশ্রমী সদাচারী ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন এবং নিজের উদ্যম ও দূরদর্শিতার দ্বারা ক্রমে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তদানীন্তন সরকারের নিকট তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল এবং ঐ অঞ্চলে তিনি সমৃদ্ধ ও সম্মানিত জমিদার ছিলেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, সাধুসঙ্গ ভালবাসিতেন আর একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিপালক ছিলেন।

সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে এক বিভূতি সম্পন্ন প্রসিদ্ধ সাধু থাকিতেন। অনেকেরই তাঁহার প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা ছিল এবং কেহ কেহ তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বা তাঁহার অনুগ্রহে বিপদাদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রকাশের পিতা মাঝে মাঝে তাঁহার নিকটে দর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যাইতেন এবং সাধুও তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একদিন তিনি সাধুর কাছে প্রার্থনা জানাইলেন যে সাধু মহারাজ তাঁহাদের বাটিতে বাস করিয়া তাহাদের সাধুসেবার সুযোগ দান করেন। সাধু সম্মত হইলেন দুইটি সর্তে (১) তাঁহার কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তাঁহাকে না করা। (২) কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট একাধিবার অনুরোধ না করা। প্রকাশের পিতা ঐ শর্ত দুটি পালন করিবেন এই কথা দিয়া সাধুকে সসম্মানে নিজগৃহে আনিলেন এবং সাধু সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নিত্য গঙ্গাস্নায়ী ছিলেন। যদিও গঙ্গা বাড়ি হইতে দ্বাদশ মাইল দূরে অবস্থিত, তবু সাধু প্রত্যহ রাত্রি তিনটায় পদব্রজে স্নান করিতে যাইতেন, অতি দ্রুতবেগে হাঁটিতেন, আর স্নানান্তে প্রাতে সাতটা পর্য্যন্ত ফিরিতেন।

জন্মের পর হইতেই প্রকাশের চক্ষুরোগ হইয়াছিল এবং সাধ্যমত সকল চিকিৎসা সত্ত্বেও উহা সারে নাই। চোখ মেলিয়া চাহিতে তাঁহার কষ্ট হইত এবং মাঝে মাঝে বেদনা বালককে অস্থির করিত। তিনি পাঁচ বছর বয়ঃকাল পর্য্যন্ত ঐ রোগে ভুগিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সাধুর নিকট রোগের কথা বলিয়া কোনরূপ আশ্বাস পান নাই এবং বালকের কষ্টে দুঃখিতা মাতারও সাধুর নিকট রোগ প্রতিকারের আবেদনে তিনি একটি হুঙ্কার ব্যতীত কোন সাড়া দেন নাই। কয়েকদিন পরে তিনি বালকের চক্ষু দুটিতে তাঁহার হস্তের স্পর্শ একটি বার দিলেন এবং চক্ষু রোগ সেই দিন হইতে কমিয়া শীঘ্রই সম্পূর্ণ সাড়িয়া গেল। চোখের দৃষ্টি ও সকল ক্রিয়া স্বাভাবিক হইল। সকলেই সাধুর অলৌকিক বিভূতি ও দয়ার ভূয়সী প্রশংসা করিল।

গ্রামে গমের ফসল কাটা হইতেছিল। সাধু একদিন প্রকাশের পিতাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার গম কাটা ও ঘরে আনা হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, "কাটা হয়েছে, বাড়িতে আনা হয়নি, এখন হবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সাধু বলিলেন, "অবিলম্বে সমস্ত গম বাটিতে আনাও।" পিতা গম আনিবার জন্য গাড়ি পাঠাইলেন এবং সাধুর নির্দেশ মতো নিজের লোকজনদের আদেশ দিলেন। অল্প সময় পরে সাধু পুনঃ প্রশ্ন করিলেন গম বাটিতে আনীত হইয়াছে কি এবং তাহা হয় নাই জানিয়া স্বয়ং দ্রুতপদে ক্ষেতে যাইয়া, আরও গাড়ি ত্বরিত আনিতে বলিয়া, অন্য কর্মীদের সাথে নিজেও গম গাড়িতে বোঝাই করিতে লাগিলেন—একা চারিজনের সমান প্রচণ্ডবেগে গম ভরতি করিয়া গাড়িগুলি বাড়িতে পাঠাইলেন, এবং যখন বাড়িতে ফিরিয়া দেখিলেন, গম যথাস্থানে রাখা হইয়াছে তখন তাঁহার উদ্বেগ যেন শান্ত হইল। অল্পক্ষণ পরে ঝড় উঠিল, এবং মুষল ধারায় অপ্রত্যাশিত বারি পাত হইয়া সমগ্র অঞ্চল জলপ্লাবিত হইল। অনেক কৃষকের গম নষ্ট হইল, ভাসিয়া গেল। সাধুর কৃপায় প্রকাশদের গমের রক্ষা হইল।

ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে সাধুকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—একদিন অনুগ্রহ

পূর্ব্বক তিনি সেবা গ্রহণ করেন। যদিও তিনি ভোজন গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন কোন্ দিন তাঁহার সুবিধা হইবে কাহাকেও জানান নাই। পরে একটি দিন স্থির করিয়া প্রত্যেক নিমন্ত্রককে বলিলেন "আমার জন্য যে ভোজন প্রস্তুত করিবে, তাহা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশদের বাড়িতে আনিবে। আমি উহা সেখানে গ্রহণ করিব। ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে উপস্থিত হইয়া ভোজন গ্রহণ করা হবে না।" অগত্যা তাই করা হইল এবং সেই একত্রিত খাদ্যরাশি সাধু ভোজনে বসিয়া অক্লেশে আহার করিয়া নিজের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন। সাধুর উপদেশ মূলক কথাদি শ্রবণ করিয়া এবং বিপদে তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া ঐ অঞ্চলের জনগণ উপকৃত হইতেছিলেন। একদিন হঠাৎ প্রাতঃকাল হইতে কেউ সাধুকে আর দেখিতে পাইল না। প্রকাশের পিতা নানাস্থানে অন্বেষণের জন্য লোক পাঠাইলেন, বহু অর্থ ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান আর মিলিল না।

প্রকাশ যখন সাধুর কথা বলা শেষ করিলেন, তখন মহারাজ বলিলেন, "একটি সূক্ষ্ম শরীরী এসেছে গৌরবর্ণ বিশাল দেহ যেমন লম্বা তেমনিই স্থূল, বিরাট মস্তক, আয়ত চক্ষু দুটিতে তীব্র দৃষ্টি। বর্ণনা শ্রবণে প্রকাশ বলিলেন, হ্যাঁ ঐ সাধু ঐ রকমই ছিলেন। মহারাজের প্রশ্নে সূক্ষ্ম শরীরীও স্বীকার করিলেন তিনি সেই সাধু। তিনি মহারাজকে বলিলেন, "আপনি ঠিকপথ ধরেছেন। বিভূতি ত্যাগ করেছেন, তার বশীভূত হননি।" তিনি মহারাজের নিকট ঊর্দ্ধসাধন প্রার্থী হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "বাপু, এখনও কর্মফল ভোগ কর্ত্তে হবে। স্থূল দেহে বিভূতির খেলা দেখিয়ে নাম যশঃ অর্জ্জন করেছিলে। প্রকাশদের ছেড়ে পালিয়েছিলে কেন?" উত্তর হইল, বিষয়ী লোকদের সমাগম বেড়ে যাচ্ছিল, তাই পালিয়েছিলাম। কিন্তু পালিয়েও বিভূতি ভোগের ফল হইতে রেহাই পেলাম না।"

নিজের স্বর্গত পিতার বিষয়ে প্রকাশের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "এর পিতা স্বর্গের সত্ত্ব স্তর বাসী পুণ্যবান। প্রকাশকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া এসেছেন।" প্রকাশ মহারাজের কৃপায় পিতার আত্মার নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তর তাঁহার স্থিতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য এবং তাঁহার আত্মার নিকট কিছু প্রশ্নের উত্তরাদি জানিয়া লইলেন। মহারাজের আহ্বানে তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরী মাতা আসিয়াছিলেন স্বর্গলোক হইতে। সূক্ষ্ম শরীরীদের সহিত কথোপকথন প্রকাশনীয় নহে।

প্রকাশের পত্নী তাঁহার সহিত আসেন নাই। তিনি গাজিয়াবাদে ছিলেন। মহারাজ যোগীর দূর দর্শনের ক্ষমতার দ্বারা দেখিয়া প্রকাশের বাসার বর্ণন, তাঁহার দেহ প্রকৃতি ভাবধারাদির বর্ণনা করিলেন। প্রকাশ বলিলেন উহা সর্বাংশে সত্য। তাঁহার পত্নী সে সময় কি করিতেছিলেন, তাহাও জানাইলেন।

প্রকাশকে তাঁহার জ্ঞাতব্য জানাইয়া প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দেওয়া হইল এবং তিনি উহার করণীয় সকল বুঝিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

ডেরাদুনে যখন মহারাজ ছিলেন তখন তিন চারজনের বিধিবৎ দীক্ষা হইয়াছিল। ইহাদের একজন ছিল আমাদের পুরাতন পাচক ব্রাহ্মণ। তাহার দীক্ষার সময়ে মহারাজ যখন সমাহিত চিত্তে তাহার সাধনদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিজ যোগশক্তির দ্বারা তাহার কুলকুণ্ডলিনীকে ঊর্দ্ধে তুলিতে ছিলেন, তখন পিতৃলোক বাসী এক অশরীরী বিঘ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি দেখিলাম হঠাৎ মহারাজ উগ্রমূর্তিতে একদিকে হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে যেন কোন অদৃশ্য ব্যক্তিকে স্থানত্যাগের আদেশ দিতেছেন। একটু পরে আবার আরও কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া হাত নাড়িয়া একদিকে একটি পুষ্প দিয়া পুনঃ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তাঁহার নিকট জানিলাম যে পাচকের পূর্ব জন্মের গুরু ঈর্ষা বশতঃ বাধা দিতেছিল। প্রথম বার সেই অশরীরীকে তাড়াইবার পর আবার আসিয়া বাধা দেওয়ার চেষ্টা করাতে মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে সে বিঘ্ন না করিতে পারে।

এই স্তরের হীনমতি গুরুরা শিষ্যের প্রকৃত কল্যাণকামী হন না। শিষ্যের উন্নতি তাঁহারা দেখিতে পারেন না। বাধা বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করেন। আদেশ অগ্রাহ্য করিলে এঁদের জন্য শাস্তি দিতে হয়।

মহারাজ বলিলেন, যাহার দ্বারা ইহলোকে কল্যাণ এবং পরলোকে মোক্ষ লাভ হয় তাহাই ধর্ম। আমা-

দের সংস্কৃতির মূলে ছিল এবং সর্বদা হওয়া চাই ধর্ম। বাল্যে ধর্ম কাহিনীর শ্রবণ ও আলোচনা এবং কৈশোরের প্রারম্ভেই ধর্ম শিক্ষা ও প্রকৃতিগত ইষ্ট মন্ত্রে সাধনা আরম্ভ করিয়া যাবজ্জীবন নিয়মিতভাবে যথা সম্ভব সাধনা করায় সকল রকম কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। ধর্মের ভিত্তি বিনা উন্নতির চেষ্টায় স্থায়ী ফল হয় না, অশান্তি ও হতাশা বৃদ্ধি হইতে থাকে, নৈতিক জীবনের কলুষ দূর হয় না।"

প্রেম

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

প্রেম নয় মরীচিকা তৃষাদীর্ণ মানুষের চোখে।
সোনার হরিণও নয় পৃথিবীর স্বপ্নময়
মায়াবি মিছিলে। মৃত্যুশীল মানবের
জীবনে যৌবনে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা আর
তৃপ্তিহীন কামনার তরঙ্গ উল্লাস রূপ নেয় ভোগৈশ্বর্য্যে।
তাই অসংযমী চেতনার রূপান্ধ জগতে দৈহিক উল্লাসে
প্রেমের নেইকো ঠাঁই।
কামনার বাসনার, দুঃসহ দহনদাহ বেদনার
বহু উর্দ্ধে, চৈতন্যের উত্তুঙ্গ শিখরে প্রেমের আসন।
প্রেম সে তো অগ্নিশুদ্ধ
কাঞ্চনের মতো আপন ঐশ্বর্য্যে সমুজ্জ্বল।
সে পরশমণি,
পবিত্র পরশে তার
ধরায় স্মরায় স্বর্গ মুক্ত করে আলোকের দ্বার।

আমি যে দেখেছি তার
লীলায়িত বিচিত্র বিলাস।
ক্রন্দসী পৃথ্বীর বুকে,
আত্মার অমর বৃন্তে
মিলনে-বিরহে-শোকে উত্থানে পতনে সর্ব্বত্রই উঠে তার
চিরন্তনী জয় শঙ্খ নাদ।
আমি যে শুনেছি তার নূপুর নিক্কন
যৌবন যমুনাতটে মন্দাক্রান্তা জীবনের সুরে।

উজ্জয়িনী, অলকায়, পঞ্চাল প্রান্তরে
নক্ষত্রের লোকে—
বিরহী যক্ষের বুকে,—রাধিকার চোখে
যে প্রেম ছড়িয়ে গেছে প্রণয়ের রোমাঞ্চ গভীর
আর
যুগান্তের মিলন পিপাসা—
সে প্রেমের লাগি'
কত রাজা রাজৈশ্বর্য্য রাজদণ্ড ছাড়ি'
প্রশস্ত ললাটে এঁকে ত্যাগের বিভূতি,
পথের ভিখারী হলো,
হলো সর্ব্বত্যাগী
বৈরাগী—সন্ন্যাসী !!

তপঃক্লিষ্ট সাধকের চোখে
দেখেছি প্রেমের রূপ
যার রূপে বিশ্ব ম্রিয়মাণ।
প্রেম সে পরম দ্যুতি—আত্মার আরতি
ধরণীর ধূলিতীর্থে তার চির আনন্দের
যজ্ঞ অধিষ্ঠান।
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
অন্তরে অন্তরে
সত্তার নিগূঢ় তত্ত্বে,
ধ্যানের জগতে,
সর্ব্বত্র ধ্বনিয়া উঠে তার
জয়গান।

খেলাঘর

সুস্মিতা সান্ন্যাল

একমাত্র ছেলে ছন্দকের মৃতদেহটা কোলে নিয়ে মৈত্রী বসে রইল পাথর হয়ে! চোখের জল ফেলতেও ভুলে গেল।—কেন? কেন এমন নিষ্ঠুর ভগবান্? তিনি নাকি জগন্মাতা—মঙ্গলময়ী! তবে? মায়ের দুঃখ কেন তিনি বোঝেন না—কি এমন বিরাট অপরাধে অপরাধিনী মৈত্রী তাঁর কাছে? তাই এত বড় খেলাটা তিনি মৈত্রীকে নিয়ে খেললেন যেমন ছোট বেলায় খেলতো মৈত্রী তার বড় আদরের জন্মদিনে পাওয়া ডলকে নিয়ে। সেদিনও তার ডলকে কোলে নিয়ে কেঁদেছিল মৈত্রী—মা সান্ত্বনা দিতে এসে হেসে ফেলেছিলেন—বড়দি মুচকি হেসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল—"তোর বর কোথায় রে মৈত্রী?" মৈত্রী গম্ভীর মুখে ফোলা ফোলা চোখে জবাব দিয়েছিল,—"মরে গেছে!" সেই দিনের বিশেষ মুহূর্তের সমস্ত ঘটনাটা যে তার জীবনে এত বড় বাস্তব সত্য হয়ে ধরা দেবে—তা কি করে জানবে মৈত্রী! আশ্চর্য! আশ্চর্য বিধাতার পরিহাস! সেদিনকার খেলাঘরের শোক ভুলেছিল পরদিনই একটা নতুন ডল পেয়ে আর মা-বাবা-দিদির আদরে—কিন্তু আজ? আজ কোন বিধাতা এসে ফিরিয়ে দেবেন তার প্রাণের দুলাল ছন্দককে! সাবিত্রী সত্যবানকে বাঁচিয়েছিল যমরাজকে সন্তুষ্ট করে! সাবিত্রী কেন? সেওকি পারে না যদি সত্যই যমরাজ আসে তাকে পরীক্ষা করতে? না-কি সে শুধুই গল্প! মায়ের অন্তরের করুণ আর্তনাদ সেখানে জয়ী হতে পারে না। ছন্দক! দু'বছরের শিশু! ঢলঢলে কচি মুখখানি—মাত্র কয়েকঘণ্টা আগেও সে-মুখে শুনেছিল মাতৃ সম্বোধন—কত আশা ছিল এই ছন্দককে নিয়ে তার আর সুমন্তের।

সুমন্ত! তার স্বামী! যার ফটোটা এখনো রয়েছে ঐ টেবিলের ওপর আর দেওয়ালের গায়ে। দিন-সাতেক আগের দেওয়া বেলফুলের মালাটা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝুলছে। মনে পড়ে সেদিনের কথা—যেদিন সুমন্তের হাত ধরে এসেছিল এবাড়ীতে—তখন তার পরণে ছিল রাঙা চেলী সিঁথিতে ছিল রাঙা সিঁদুর আর চোখে ছিল সোনালী স্বপ্ন—যার রং ছিল বর্ণালী। আর আজ সব কিছু শেষ হয়ে দেখা দিল বিরাট শূন্যতা—যার কোন রং-ই নেই।

উনিশ বছর বয়সেই বিয়ে হয় মৈত্রীর! এ বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হননি মৈত্রীর বাবা, কিন্তু সেবার পুজোর সময় হাজারীবাগে বেড়াতে গিয়ে সুমন্তের মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় মৈত্রীদের। সুমন্তের মায়ের ভারী পছন্দ হয় লাবণ্যময়ী কিশোরী মৈত্রীকে—আর শেষ পর্য্যন্ত মায়ের ইচ্ছেতেই ফাল্গুন মাসেই বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। সুমন্ত তখন সবে বি, এ, পাশ করে চাকরীতে ঢুকেছে। সুপ্রতিভ অথচ বিনয়ী ছেলেটিকে মায়েরও ভারী মনে লেগেছিল—তাই বলেছিলেন—"আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে—এখন দিলেই বা ক্ষতি কি! ভাল ছেলে যখন পাওয়া গেছে।" কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতিই বোধহয় করেছিলেন সেদিন মৈত্রীর মা। ছন্দকের জন্মের একটি বছর পরেই হঠাৎ একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সুমন্তর। মনে আছে—সুমন্তের বাণী—"ত্যাগ ও সেবার ব্রতে দীক্ষিত করে ছেলেকে মানুষ করতে হবে। যেন জগতের মাঝে ও যেন সকলের হয়ে বেঁচে থাকতে পারে, স্বার্থপর না হয়ে।" তারপরই এল সেই ভীষণ সর্বনাশা দিনটা! অফিসের কাজে দিল্লী গিয়েছিল সুমন্ত। আসার পথে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। বহু যাত্রী হতাহত হয়। পরের দিন কাগজে নিহতদের তালিকায় সুমন্তের নাম দেখেই অচেতন হয়ে গিয়েছিল মৈত্রী। তারপর—আবার বুক বেঁধে দাঁড়াল মৈত্রী—ছন্দককে মানুষ করতে হবে—ঠিক তেমনি করেই যা তার স্বামীর আদর্শ ছিল—তাই সমস্ত সত্তা দিয়ে স্বপ্ন সার্থক করতে চেয়েছিল, কিন্তু ভগবান্ তাও সইতে পারলেন না—এই দুধের শিশু ছন্দকের

বুকের রক্তের ওপর তাকালেন লোলুপ দৃষ্টিতে। মৈত্রীর এতটুকু স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন! যেন মৈত্রীর পার্থিব সামান্য কিছু চাওয়াও মহা অপরাধ—কণামাত্র সুখের কল্পনা করাও মহাপাপ!

সেইদিন ছোটবেলায় সেই পুতুলটা ভেঙে যেতে কই না কেঁদেছিল মৈত্রী। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় কশাঘাতে তার চোখে এক ফোঁটা জলও নেই যে সেই অশ্রুরাশি ঝরিয়ে নিজেকে একটু হাল্কা করে নিতে পারে। সেদিনকার খেলাঘরের মিথ্যেটাই যে এমনভাবে নির্মম সত্য হয়ে দেখা দেবে তার জীবনে—কে জানতো? নয়তো—মা সেদিন না হেসে হয়তো কাঁদতেই বসতেন—বড়দিও সেদিন কৌতুক করে জিজ্ঞেস করতো না—"তোর বর কোথায় রে?" ভবিষ্যতকে কেউ যদি দেখতে পেত তবে তখনই বড়দি হয়তো বড় বড় চোখে চেয়ে থাকতো উদাস দৃষ্টিতে! সবচেয়ে আশ্চর্য্য কথাটা উচ্চারণ করেছিল সেদিন মৈত্রী-ই! "বর মরে গেছে"—শিশু-মনে শিশু-কল্পনাতেই ঐ নির্মম কথাটা বলল কি করে মৈত্রী? না-কি একমাত্র মৈত্রীই দেখতে পেয়েছিল অদূর ভবিষ্যৎকে—তাই বুঝি সেই ভাগ্যবিধাতাই—যিনি এত বড় কাণ্ডটা করলেন অলক্ষ্যে থেকে তিনিই ঐ চরম আর ভীষণ সত্যটা মৈত্রীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন—কে-জানে?.. এ কি! ঘরে এত লোক কেন! কারা যেন ছন্দককে নিয়ে যেতে চায়—না-না মায়ের কোল ছেড়ে কোথায় গিয়ে আরাম পাবে তার আদরের ধন! না—না—না—কিছুতেই না, ছন্দককে যে ত্যাগ ও সেবায় মহীয়ান্ করে তুলতে হবে—তবুও শুনবে না জোর করে কেড়ে নেবে মায়ের কোল থেকে ছেলেকে—মূর্চ্ছিতা হয়ে লুটিয়ে পড়ে মৈত্রী।

চলার পথে

অমরনাথ বসু

আকাশে এখন বিষণ্ণ নীরক্ত রাত্রি
ঝিলমিল তারাদের মিটমিটে হাসি
প্রচ্ছন্ন বাতাসে দুর্গন্ধ বিষের বাঁশি
দুর্গম পথের আমরা সবাই যাত্রী।
নীরক্ত রাত্রির বুকে আমাদের দেখে
মৃতের প্রেতাত্মা এখন উল্লাস করে

কিছুক্ষণ আচমকা থমথম করে
তবুও কিসের হাসি জনতার চোখে
পথের নির্জনতায় অভুক্ত যন্ত্রণা
হারিয়ে গেল কোথায় জনতা জানে
পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে মৃত্যুর নিশানা,
এখন সর্বত্র, তবু কেন কাঁদছি না!

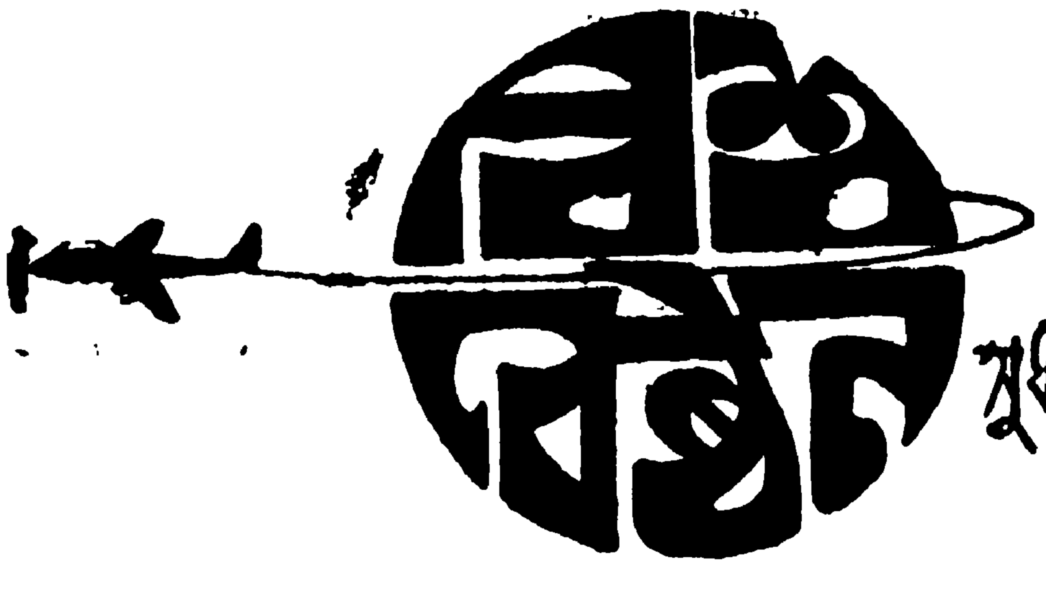

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাঙালী পরিবেশ :

ভারতীয় দূতাবাসের সামনেই ফেয়ার ফ্যাক্স হোটেল পার হ'য়ে কিছুদূর যেতেই অদূরে দেখি সাদা পাঞ্জাবী পরে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তিনিই আমার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ আকর্ষণ করলেন তাঁর বাঙালীর নিজস্ব বেশে। তিনি হলেন শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায় ও পাশেই ছিলেন রঞ্জন সেন ও তাদের ছেলে মেয়েরা, ওঁদের সঙ্গে দোতলায় রঞ্জন সেনের বসার ঘরে গিয়ে বসলাম, শ্রীমতী ভারতী সেনের সঙ্গে পরিচয় হল। আমাদের ভারতীয় প্রথায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মনে একটা বৃহত্তর আত্মিকবোধ জাগিয়ে তোলে, শ্রীমতীর বাপের বাড়ীর চাঁইবাসার কথা, রঞ্জন সেনের দেশের কথা, শ্রীনিবাস চাটুজ্জের বালির বাড়ীর কথা। আজ রঞ্জন সেনের বাড়ীতে শ্রীনিবাস চ্যাটার্জির ও শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের নিমন্ত্রণ ছিল। ভট্টাচার্যের স্ত্রীও দূতাবাসে কাজ করেন, ফলে আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ায় তিনি একটা ছোট গাড়ী কিনেছেন, দুজনেই গাড়ী ক'রে কাজে যান। এঁদের বাড়ীর এত কাছে অফিস যে হেঁটে যাওয়াই সহজ। সেন ও চট্টোপাধ্যায়দের গাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন নেই। ওখানে গাড়ীচোর না থাকায় গাড়ীর গ্যারেজ খুব কম লোকেরই আছে। গাড়ী রাস্তায়ই চাবী বন্ধ হ'য়ে পড়ে থাকে। ভারতী সেন বিদুষী, প্রবন্ধাদি লেখারও ঝোঁক আছে। সুরেন নিয়োগীর কাগজ সংহতিতে শ্রীমতী ভারতীর লেখা বেরিয়েছিল। সুরেনবাবুর সঙ্গে এঁদের বাপের বাড়ীর চেনা অনেক দিনের।

এদের মাঝে এসে মনে হ'ল, কলকাতায় আমার কোন আত্মীয় বাড়ীতে এসেছি, আমার পৃথিবী পরিক্রমার কাহিনী বললাম, ছেলে মেয়েদের কাছে। কাছে তাদের বসিয়ে রাখলাম। আমার ক্যামারাতে ছবি তুলে দিল শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জন সেন মিলে, ওঁরা যেহেতু রাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মী, তাই স্থানীয় শুল্ক এঁদের বহু জিনিষে দিতে হয় না, ওদের এদিক দিয়ে সুবিধে আছে, আমার একটা 'রোলেক্স অয়েষ্টার' ঘড়ি কেনার ইচ্ছে ছিল, যদিও আমি সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছি, তবুও শুল্কমুক্ত মূল্য সুইজারল্যাণ্ডের চেয়েও সস্তা। ওমেগা ঘড়ি পাওয়া গেল কিন্তু রোলেক্স পাওয়া গেল না। আমার নির্লিপ্ত প্রয়োজনকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন আবার ওঁরা। কখন বলেছিলাম যে আমার ছোট বৌমা সদ্য সন্তানসম্ভবা। তাই ওঁরা ছোট ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জিনিষ পত্র কিনে দেবে-ই ; দেবেন সস্তায় ফাউণ্টেন পেন কিনে। জননীও ভগিনী সুলভ আত্মিকতায় আমার বাড়ীর প্রয়োজনকে নিজদের মনের মুকুরে প্রতিভাত ক'রে ওঁরা দেখতে পারেন, আমি পারিনা, সাংসারিক প্রয়োজনের মান নির্ণয় করতে ওঁরা পারেন, আমি তা পারি না। বুঝতে পারিনা এই গভীর প্রীতির উৎস কোথায়? শুধু বললাম 'আমায় অযথা ভারাক্রান্ত না করে আপনারা দুই গৃহিণীতে বাজারে যান ও যা' ভাল বুঝবেন এনে দিন। এই কুড়ি ডলার নিয়ে যান। পুরুষদের সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যস্মিন দেশে সদাচার।

আপনারাই এ বিষয়ে বেশী বোদ্ধা। আমরা নীরব দর্শক মাত্র। বিদেশে বাঙালী মেয়েরা যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিধি এত সুবিস্তৃত করতে পেরেছেন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি।

রাতে আহারের টেবিলে বাঙালীর আহার্যের সঙ্গে মুর্গী (যদিও দেশে কিছু ব্যতিক্রম, এখানে নয় ; এখানে

মুর্গীই সস্তা) মৎস্য সংযোগে পোলাও ও লুচি, কপির ডালনা, ডাল, চপ ও চাটনী বাড়ীর তৈরী সন্দেশ ও দই খেয়ে মনে হল যেন কোন বাঙালী নেমন্তন্ন বাড়ীতে এসেছি।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় আমায় আগামী কাল তাঁদের ওখানে রাতের আহার ও শ্রীমতী ভারতীর পরের দিনও আসার সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেল্‌তে পারলাম না, পৃথিবীর নানা দেশে নানা মানব চরিত্র অনুধাবন করার বারংবার সুযোগ হয়েছে। এটা অন্ততঃ বুঝতে পারি কোথায় রয়েছে আত্মিক আকর্ষণ, কোথায় রয়েছে গভীর অন্তরিকতা যার অদৃশ্য বন্ধন মুক্ত হবার কোন ক্ষমতা তো নেই, সে বাঁধন স্বেচ্ছায় বরণ না করা ছাড়াও উপায় নেই।

'আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন যে তোদের আছে ?
আমি যে বন্দী হবার সন্ধি করি তাদের কাছে।'

কে তিন দিন পর পর একই বাড়ীতে (যদিও তলা বদল হবে প্রতিদিন) অতিথি হ'তে যায় ? এখানে আমি হঠাৎ কুড়িয়ে পেলাম আমার দেশে ফেলে-আসা প্রিয় জনদের, যাঁদের দুর্নিবার আপন করার আকর্ষণ, যাঁদের সুগভীর আন্তরিকতা, যাঁদের অকুণ্ঠ স্বতঃ প্রবৃত্ত সেবাযত্ন আমার লৌকিক ভদ্রতার মুখোসকে দূরে ফেলে দিয়ে ওদের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দিল, বাহ্যিক সৌজন্য ও লৌকিক ভব্যতার পর্দা আমার মনের রঙ্গমঞ্চ থেকে উঠে গেল। আমি যেন হারিয়ে-যাওয়া আত্মীয়দের মাঝে আবার ফিরে এসেছি দীর্ঘদিনের অজ্ঞাত বাসের অবসানে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য তাঁদের ওখানে একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিতে পারেন নি সত্য কিন্তু তাঁর বাহনে আমায় বাসায় পৌছে দিতেন রোজই। ওয়াসিংটনে যখন এঁরা আমার লেখা বিদেশের চিঠি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পড়েছেন কিছুদিন পর যে এঁদের কথাও উঠবে তাঁরা জানতেন। শেষের দিনে 'সুর ও সুরভি' থেকে কয়েকটী কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালাম। বিদায়ের পূর্ব-ক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'কল্যাণী' কবিতা থেকে প'ড়ে শোনালাম। যেন ওদের নিয়ে আমার মনের না-বলা বাণীর অক্ষম প্রকাশ প্রায় বিশ বছর আগে যা আক্ষরিত হয়েছিল, তা হ'ল—

• "প্রবাসের দীর্ঘ অবসর পূর্ণ ক'রে দিলে তুমি মম
হে কল্যাণী ! নিদাঘের দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণমেঘ সম
শান্ত ছায়া খানি বিস্তারিয়া দিগন্তের শূন্য নীলিমায়।"

তখন তাঁরা বলেন 'আগে কেন বলেন নি। আমরা আরও শুনতাম।'

শনিবার অতি প্রভাতে রঞ্জন সেন ও শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায় দুজনে এসে হাজির আমার হোটেলে যখন আমি বিমান বন্দরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। তারা আমায় বিমান বন্দরে বিদায় দিয়ে আসবে। প্রীতির আকর্ষণ শেষ হ'য়ে যাবে জেনেও মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। আমার নতুন-পাওয়া বন্ধুদের গভীর মমত্ব-বোধ আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমার স্মরণে এ কাহিনী আজও স্পষ্ট জাগরূক। ওঁদের কাহিনী বহু জায়গায় বলেছি। মার্কিন মুলুক থেকে সদ্য প্রত্যাগত মণিশংকর (শংকর) আমায় শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছিল। আজও তারা আমার খোঁজ করে। আমি পত্র বিনিময়ে বন্ধন কঠিন ক'রে রাখতে না পারার অক্ষমতায় লজ্জা পাই।

এবার ওয়াশিংটনের ইতিহাস আর একটুখানি বলে "সিকাগো"-র কথা বলব।

১৮১৪ সালে বৃটিশ জেনারেল রস্, ও, ককবার্ণ (Ross O' Cockburn) কর্ত্তৃক অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হয়েছিল ওয়াশিংটনের কেপিটোল, হোয়াইট হাউস ও অন্যান্য সরকারী অফিস। ১৮৮১ সালের বন্যায় চারহাত জলের তলায় ডুবেছিল ওয়াশিংটন, ১৮৮৮ ও ১৮৯৯ সালে হিমঝঞ্ঝায় f ধ্বস্ত হয়েছিল এই নগরী, ১৮ ৬ ভূকম্পনে নষ্ট হয়েছিল এর প্রচুর গৃহসম্পত্তি ও জীবজন্তু। ১৮৯১ সালে 'Soldiers' Home'এর এক মাইলের মধ্যে মাদক দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়েছিল। কত দেশবিদেশের রাজারানী এখানে এসেছেন ও গিয়েছেন! কত ক্ষুধার্ত জনগণ ১৯৩১-৩২ সালে ওয়াশিংটনে প্রবেশ করেছিল। কত স্মৃতি মন্দির, কত জ্ঞানের মন্দির এই ধনিকোত্তম রাজ্যে গড়ে উঠেছে, তবু শান্তি আসেনি সাদা কি কালো ওয়াশিংটনের অধিবাসীদের মধ্যে, এমন কি বিশ্ববাসীর মনে। তাইতো শ্বেত আততায়ীর গুলিতে শান্তির নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত উনচল্লিশ বছরের নিগ্রো নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং নিহত হলেন ; এক অহিংসা ও বর্ণ-

বিভেদ প্রকৃত উদ্দেশ্যের উজ্জ্বল দীপশিখা নিভে গেল। সমস্ত জগৎ আজ বেদনায় আতুর।

ওয়াশিংটনের কথা লিখে শেষ করা যায় না। এখানে সব কিছুরই যেন একটা বীভৎস ভিড়। ভোক্তার চেয়ে ভোজ্য বেশী। এই এক ওয়াশিংটনের ওপর নানা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বহু বিশ্লেষণ ক'রে প্রায় শ'দুয়েক বই আছে। যেমন সাধারণ বর্ণনা, ইতিহাস, পূর্বের নগরীর বিবরণী, এর স্থাপত্য, কলা ও পরিকল্পনার বিবর্তন, কেপিটোল, সাদা বাড়ীটা (White House) রাজনীতি ও খ্যাতিমানদের কাহিনী, এর পৌর শাসনব্যবস্থা, এখানের জীব ও উদ্ভিদ, স্মৃতিচারণ, ওয়াশিংটনের নিগ্রো, এখানের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ও সাধারণ সহায়ক পুস্তক প্রভৃতি।

বিমান বন্দরে যাবার সময় আমার দুই তরুণ বন্ধু রঞ্জন ও শ্রীনিবাস 'এলেন লী হোটেলে' হাজির। তখন প্রায় সকাল সাড়ে দশটা। বেলা একটায় বিমান ছাড়বে। বিদেশ বিভূঁয়ে দেশের লোক পেলে বুকে যথেষ্ট বল পাওয়া যায়। মনে হয় না নিঃসঙ্গ একাকী আমি এই পরদেশে, পরবাসে। উপরন্তু মাতৃভাষায় কথাবার্তাও বলা যায়। সেটা কি কম লাভ। সবাই এখানে সাহায্য করার জন্য উন্মুখ। শ্রীশ্রীনিবাস আমার আধমণী ব্যাগটা হোটেলের বাইরে ট্যাক্সিতে তোলবার জন্য নিয়ে চললেন। হোটেলের সামনে ট্যাক্সি পাওয়া গেলনা ও লিমোশীনও এলোনা দেখে দু'দশ পা এগিয়েই মোড়ের মাথার দিকে চলেছি। সেখানে ট্যাক্সি নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এই খানেই কয়েক দিন আগে বিরাট 'ম্যানহোল' (Manhole) খুলে টেলিফোনের লোকেরা কাজ করছিল। তাদের কি কাজের জন্য এই ম্যানহোল খোলা হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে বলল যে আরশোলায় টেলিফোন কেব্‌লের আস্তরণ খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে ও ফলে টেলিফোনের লাইনে নানা গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে। যেখানে বহু কেব্‌ল যোগ করেছে সেখানের সঙ্গমস্থলটী মাটী চাপা না দিয়ে ঢালাই লোহার ঢাকনি চাপা দেওয়া চৌবাচ্চা গেঁথে বহু টেলিফোনের তারের জোড় ঝালা হয়েছে যাতে সহজে ও অল্পসময়ে সারিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।

এবার আমি 'ফ্রেণ্ডশীপ বিমান বন্দরে'র বদলে 'ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে' চললাম। আমার ব্রীফকেসটা শ্রীরঞ্জন সেন ও আমি সদ্যকেনা শিশুদের বোতল ব্যাগ (Baby's Bottle Bag) নিয়ে চললাম। এটী কিনে এনেছিলেন শ্রীমতী ভারতী সেন ও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী সেন কিনে এনে দিয়েছিলেন একটা দামী ফাউন্টেন পেন সস্তা দামে।

আমরা একটা হলদে ট্যাক্সিতে চড়ে বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে চললাম। ট্যাক্সিতে মিটার রয়েছে। নিগ্রো চালককে বললাম—মিটার ফেলছ না কেন, মিটার যখন রয়েছে?

—আমি এখন 'লিমোশীন' হ'য়ে যাচ্ছি। এতে সস্তা হবে। বিমান বন্দরে নেমে বলে যে চার ডলার পাঁচ সেন্ট দিতে, প্রতি জন পিছু এক ডলার পঁয়ত্রিশ সেন্ট হিসেবে। তাকে বললাম—যে পথ এলে তাতে দেড় ডলারও ভাড়া উঠতো না তোমার ট্যাক্সিতে চড়ার সময় মাইল হিসেব ক'রে দেখেছি।

—দেখো; এখানে লিমোশীনের ভাড়া লেখা আছে।

বুঝলাম ব্যাটা ঠকিয়ে নিচ্ছে। কে সামান্য কটা ডলারের জন্য ঝগড়া করে। ওকে হিসেব ক'রে চার ডলার পাঁচ সেন্ট দিয়ে আমরা তিনজনে বিমান বন্দরে ঢুকলাম।

এটী 'আমেরিকান এয়ার লাইন্‌সের' সিকাগোগামী বিমান। মাঝখানে কোথাও থামা নেই। সোজা চলে যাবে 'সিকাগোয়'। আমার দুই তরুণ বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে বিমানে চড়ার জন্যে এগুলাম।

॥ সিকাগো ॥

বিমান ছাড়লো বেলা একটায় ও পৌছাল বেলা একটা বিয়াল্লিশ (১টা ৪২) মিনিটে। ওয়াশিংটন—সিকাগোর যা দূরত্ব তাতে ওড়ার সময় লাগে ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। যেহেতু ওয়াশিংটন—সিকাগোর অবস্থিতির মধ্যে ১ ঘণ্টা ঘড়ির তফাৎ তাই দেখাচ্ছে যেন ৪২ মিনিটে পৌছে গেলাম। বিমানে শুধু এক পেয়ালা কফি দিয়ে আহারের পর্ব শেষ হ'ল। মাত্র পৌনে দু ঘণ্টা সময়। নীচে এত মেঘ ছিল ও বিমান এত উপর দিয়ে উড়ে গেল যে নীচে

মাটীর কিছুই দেখা গেল না। সিকাগোতে বিমান থেকে নেমে বাইরে এসেছি এক ভদ্রলোক হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি মিঃ চাটার্জ্জি ?

সিকাগোর একটি সরকারী ভবন

—আমি যে মিঃ চাটর্জ্জি কেমন করে বুঝলেন ? নিশ্চয় রং দেখে ?

—এমনিই মনে হ'ল। এবং আমিই যে আপনাকে নিতে এসেছি।

অতএব খুঁজে বের করা যে আমার দায়িত্ব।

আমি মিঃ ডাল্টন, বেকণ সাহেবের সহকারী।

সিকাগোতে এলে আমায় দেখানোর ভার নেবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স থেকে জো কিনী ও মেটকাফ এণ্ড এডী থেকে এডী সাহেব বেকণ সাহেব ও ডল্টন সাহেবকে লিখে দিয়েছিলেন। বেকণ ছেলের বিয়ে দিতে বাড়ী গেছেন বলে তিনি আসতে পারেন নি, তাই তাঁর সহকারী ডল্টন সাহেবকে এই ভার দিয়েছিলেন। হাত থেকে ডল্টন সাহেব আমার ভারী ব্যাগটা নিয়ে মোটরের দিকে চলতে লাগলেন। আমি নিয়ে চললাম আমার ব্রীফ কেসটা ও কাঁধে বোতল ব্যাগ। বেকণ সাহেব আসেন নি তাই তার গাড়ীটা ডল্টন চালিয়ে নিয়ে এসেছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট 'জো কিনী' আমার থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন মিচিগান হ্রদের ধারে গ্রাণ্ট পার্কের বিখ্যাত 'বাকিংহাম ফোয়ারা'র সামনে বহুতল 'পিক্ কংগ্রেস' হোটেলে। ঐ হোটেলের কর্ণকর্তা হলেন জো কিনীর বাল্যবন্ধু, 'লি রয়'। এখানে থাকার সময় একদিন 'লি রয়ে'র (Lee Roy) সঙ্গে তার অফিসে দেখা করতে গেলাম আমার সম্বর্দ্ধনাকারী বন্ধুবরকে নিয়ে। লি রয় বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন ক'রে তাঁদের পরস্পরের ছেলেবেলাকার অতি ঘনিষ্ঠতার কাহিনী সব ব'লে গেলেন। তাঁদের হোটেল সমূহ পরিচালনার মূল অফিস হোটেলের বাইরে অন্য এক বাড়ীতে। হোটেলে এখন বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নতুন লিফ্‌টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেখা গেছে যে উপর নীচে উঠা নামার লিফটের মর্যাদা বর্ত্তমানের মানদণ্ডে কিছু কম হ'য়ে গেছে। তারই সংশোধনী পর্ব এখন চলেছে। বর্তমানে লিফটের মুখে ভিড় লেগেই আছে কি সকালে, কি বিকেলে—হাওড়া ব্রীজে গাড়ীর ভিড়ের মত।

আজ শনিবার অফিস বন্ধ। তাই মোটর ক'রে প্রথমে 'পিক্ কংগ্রেস হোটেলে' না ঢুকেই পথে যা 'দর্শনীয় বস্তু তা' দেখতে দেখতে কিছু সময় কাটিয়ে চললাম। ডল্টন বক্তা আমি শ্রোতা। তবে হরপার্বতীর আগম-নিগমের বক্তা-শ্রোতার মত নয় শুধু বক্তাই বলে যাবেন বক্তব্য বিষয়, আর শ্রোতা নীরব হ'য়ে শুনে যাবেন; কোন কিছু প্রতিবাদ ও বিশ্লেষণের দাবী জানাতে পারবেন না, এমন নয়। আমি তাঁকে অজস্র প্রশ্ন করতে লাগলাম। যথাসম্ভব যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে তিনি ত্রুটীও করেন নি একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব।

সিকাগোর গোড়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন —মানুষের প্রথম পদক্ষেপের আগেই অনেকের ধারণা হারিয়ে-যাওয়া ইহুদীদের একদল এখানে বসবাস করে-ছিলেন। কেউবা মনে করেন এঁরা ছিলেন 'মায়া' সভ্যতার ও 'আজতেক' মানুষের আত্মীয় কুটুম্বেরা, যাঁরা নদীর ধারে মাটীর ওপর নানা আকৃতির ঢিপি গ'ড়ে তুলেছিলেন। ঢিপিগুলোর আকৃতি কোথাও পাখীর মত, কোথাও বা পশুর মত। কেউবা ভাবেন খৃষ্ট জন্মের সময় মিসিসিপির অববাহিকায় এক উন্নত জাতি নতুন সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নব নগরী গঠন করেছিলেন, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেছিলেন,

আবার একদিন বিলুপ্ত হয়ে গেলেন সময়ের অনন্ত চলমান স্রোতে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে ঐ যে বিরাট বিপুল মৃত্তিকা স্তূপগুলি গ'ড়ে উঠেছিল তার সবই একই উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। কতকগুলো পিরামিডের অনুকরণে মৃত ব্যক্তিদের গোর দেবার জন্য, কতকগুলো আবার উচ্চ পূজা বেদী ও বধ্য পশুদের বলির স্থান, অনেকগুলো আবার প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ। এগুলো আবার বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, তা' হ'লে প্রাচীন কালে গোর দেবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল? বলতে পার মৃতদেহ গোর দেওয়া এবং পুড়িয়ে ফেলার মধ্যে কোন্‌টা বেশী প্রাচীন ও কোনটা স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতি?

—গোর দেওয়াটা যে প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ আগুন আবিষ্কারের বহু বহু যুগ আগে থেকেই মৃতদেহে পরিণত হচ্ছে। তখন পোড়ানোর প্রশ্ন আসেনি, পোড়ানো পর্বের বহু পূর্বেই গোর দেওয়া প্রথাই প্রচলিত ছিল।

—তবে মৃতদেহ গোর না দিয়ে কোন এক খোলা যায়গায় ছেড়ে আসতেও হো পারে। আজও যেমন পার্শীদের বেলা করা হয়। তাদের ধারণা মরেও যদি অন্য কোন জীবের কাজে লাগি, সেটাই ভাল। তবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তেমনি পুড়িয়ে ফেলা যে বেশী স্বাস্থ্যসম্মত তার কারণ, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের রোগ বীজাণু সব ধ্বংস হয়ে যাবে। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'?

—এ রকম দশ হাজার স্তূপ এই 'ইলিনয়স্‌' রাষ্ট্র জুড়ে ছড়ানো আছে। এই রাষ্ট্রটি অনেকগুলি নদীর সঙ্গমস্থল। এখানে আদিম অধিবাসীদের প্রতিবেশী জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে কখন দূরে চ'লে গেছে তাদের স্থাবর সম্পত্তি ফেলে।

ফাদার আলুয়েজ প্রথম ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে এমনি ইলিনয়ের আদিম অধিবাসীদের একটী দলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সূত্রে পরিচিত হন। দু'বছর পরে তিনি এ অঞ্চলে একটি আস্তানা গ'ড়ে তোলেন। এরপর এলেন ফাদার মার্কোয়েই যিনি পরে 'কসফসিকা' আদিম অধিবাসী-গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। আর এলেন ফাদার 'হেনীপীণ' 'ফাদার সীবাষ্টী রেসেনস্‌' প্রভৃতি।

এরপর এল ব্ল্যাক হকের (Black Hawk) যুদ্ধ। ওখানের আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এক বিরাট যুদ্ধ হয়েছিল।

আমি বললাম—টেলিভিসনে পূর্বানুবৃত্তিক নাটক মানেই আদিম ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধ। আর শ্বেতকায়দের বন্দুকের গুলিতে কেবল রেড ইণ্ডিয়ানরা হত হচ্ছে। অতি প্রাচীন কালেও যত রেড ইণ্ডিয়ান ছিল তাদের সবাই কয়েকবার ক'রে মরে গেছে ব'লে মনে হবে এই শ্বেতকায়দের সঙ্গে যুদ্ধে। আমার গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক কাহিনী ম'নে পড়ে। সেটা হ'ল আমরা বার্লিন রেডিও থেকে প্রতিদিন এত গুলো ক'রে 'বার্তানিয়া হওয়াই জাহাজ' ভূপাতিত ও জলজাহাজনিমজ্জিত হ'ত শুনলাম যে যার যোগফল নিলে সারা বিশ্বের যুদ্ধ জাহাজের ও উড়ো জাহাজের মোট সংখ্যাকে বহুবার ছাড়িয়ে যাবে। জানিনা রেড ইণ্ডিয়ান হত্যার নির্লজ্জ কাহিনী তোমাদের কত ভাল লাগে।

—আমার ব্যক্তি বিশেষকে প্রশ্ন করলে আমি বলব 'এটা নিম্নস্তরের রুচির পরিচয়।'

—তা হ'লে কি বুঝবো যে নাটকীয় মালমসলার দৈন্য তোমাদের এসেছে আর যুদ্ধ বিগ্রহ দেখাতে গেলেই Black hawk বা ঐ রকম কোন যুদ্ধের কাহিনী (যদিও তা অতি সামান্যই) দেখাতেই হবে? ট্রয়ের যুদ্ধ দেখাচ্ছো না কেন? কেন মহাভারতের যুদ্ধ দেখাচ্ছ না? সে গুলো দেশীয় নয় ব'লে? এটা বিশেষ দেশের ব্যাপার নয়। এটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠে গেছে বিশেষ করে এই সংকোচনশীল বিশ্বে। তবে দেখাও বিশ্ব মহাযুদ্ধের কাহিনী।

—কথাটা সত্যি। দৈন্যই বটে। যুদ্ধ বলতে গেলেই রেড ইণ্ডিয়ানদের আনতে হবে। আর তার পরিণতিই বা কী তা' অতিবড় নির্বোধেরও জানা।

—যাক সে কথা। এখন সিকাগোর কাহিনী কিছু বল। শুনেছি সিকাগো যদিও দ্বিতীয় বৃহত্তম মার্কিন নগরী তবে এখানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলকল, বৃহত্তম ময়লাকল, বৃহত্তম শিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি আছে।

—তবে বলি শোন। আজকের 'The most

enlightened city of world to day'র উৎস সন্ধানে দেখি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট ডিয়ারবর্ণ স্থাপনকে কেন্দ্র ক'রেই এই নগরীর উৎপত্তি। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ানরা সিকাগো সহরেকে পুড়িয়ে দেয়। তিন বছর বাদে সেই জায়গাতেই আবার নতুন ক'রে দুর্গ গ'ড়ে ওঠে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না যথেষ্ট উপনিবেশকারীরা এখানে এসে একটী গ্রাম স্থাপন করেছেন। তার পরের অগ্রগতি এক বিস্ময়কর ঘটনা। ১৮৩৩ সালে যেখানে ৩৫০ জন অধিবাসী ছিল; ১৮৬০ সালে সেখানে এক লক্ষ দশ হাজার (১,১০,০০০) লোক আর ১৯০০ সালে সতের লক্ষ (১৭, ০০, ০০০) ও ১০৬০ সালে সাড়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ (৩৫,৫০.০০০)। মিচিগান হ্রদের ধারে এই স্থান মনোনয়ন পূর্বপুরুষদের প্রচুর বুদ্ধিমত্তার প'রিচয় দিচ্ছে। কে জানতো সম্ভব হবে এই মহাদেশের কেন্দ্র স্থানে স্থাপিত সমুদ্রোপকূল থেকে সহস্রাধিক মাইল দূরের এই মহানগরী কেমন ক'রে St, Lawrence sea way দিয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হবে? ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যে বহ্নিলীলা নগর কেন্দ্রের২,১২৪ একর ব্যাপী ধনসম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি করেছিল যার অর্থমূল্যে পরিমাণ ছিল ২০ কোটী ডলার তা বিশ বছর বাদে আন্তর্জাতিক মহামেলা—World's Columbian Exposition—স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল এখানের অধিবাসীরা। সেই সময়েই স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়রগণ দীর্ঘাঙ্গী অট্টালিকা নির্মাণে, সমাজ নেতারা আর্ট ইনষ্টিটিউট, সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, সিম্ফনী অর্কেষ্ট্রা, ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণে সমর্থ হ'ন। বর্তমান সিকাগো নগর পরিকল্পনা ও প্রাচীন অংশের পুনর্গঠন পরিকল্পনা, নবতম অট্টালিকা পরিকল্পনার ভিত্তিতে চলে।

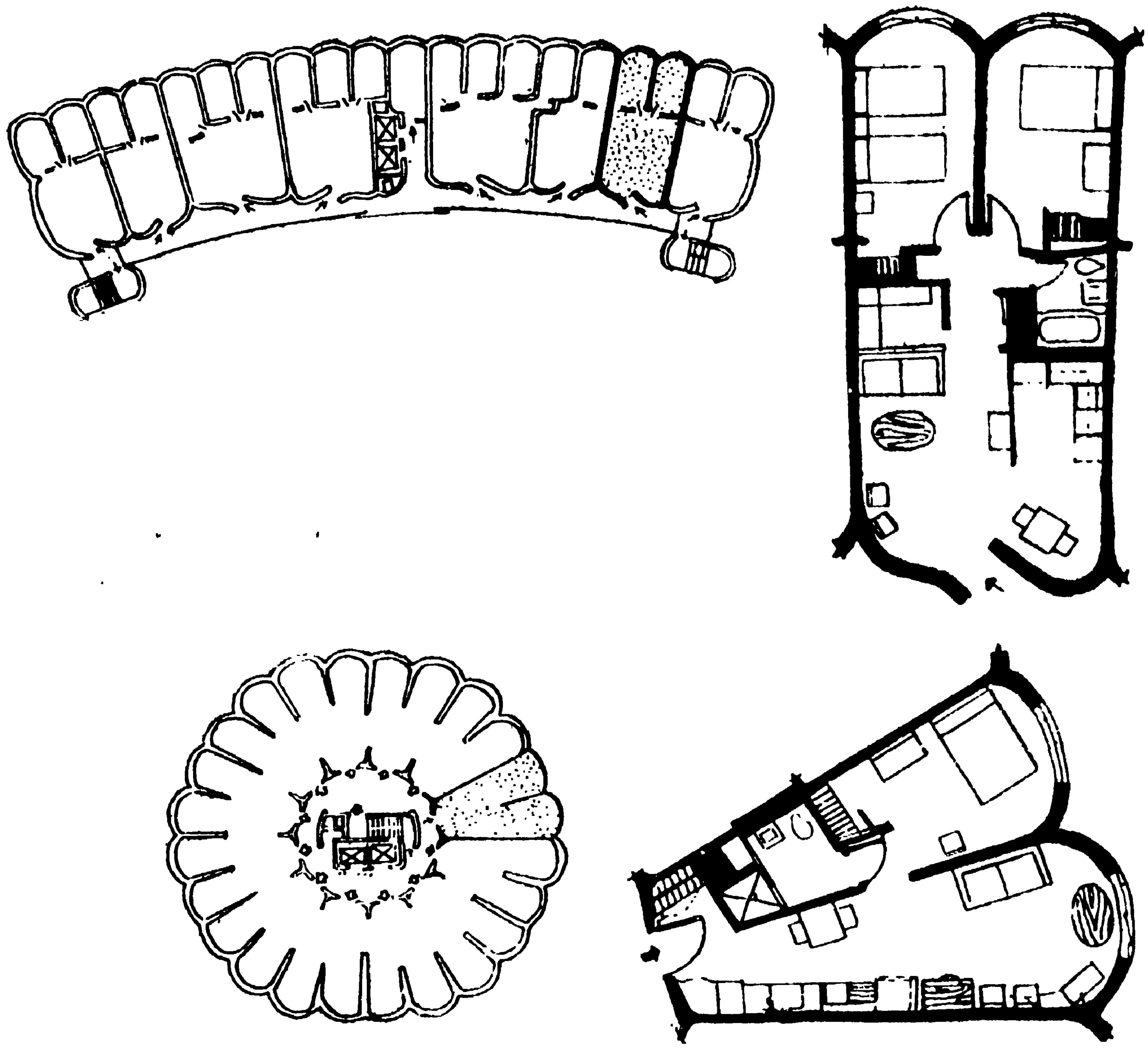

সিকাগোর নবতম গৃহ ব্যবস্থা

এই মিচিগান হ্রদ যুক্তরাষ্ট্রের ছ'টী হ্রদের অন্যতম। এই ছটী হ্রদ সুপিরিয়ার, মিচিগান, হুরোণ, সেণ্ট ক্লেয়ার,

ইরি ও ওণ্টারিও এক৮লক্ষ বর্গ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলের বৃষ্টির জল ও বরফগলা জল সঞ্চয় করে। মিচিগগান হ্রদ ছাড়া বাকী পাঁচটী হ্রদের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমারেখা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে পৃথক্ ক'রে চলে গেছে। পাঁচটী নদী পাঁচটী হ্রদকে সেবা ক'রে যাচ্ছে এক একটী হ্রদের নির্গম পথ হ'য়ে। যেমন

সুপিরিয়ার হ্রদের—সেণ্ট মেরীন্ নদী

হুরোণ হ্রদের—সেণ্ট ক্লেয়ার নদী

সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদের—ডিট্রয়েট নদী

ইরি হ্রদের—নায়েগারা নদী

ওণ্টারিও হ্রদের—সেণ্ট লরেন্স নদী।

এই সেণ্ট লরেন্স নদী মণ্ট্রিয়াল ও কুইবেক সহরের পাশ দিয়ে পড়েছে অতলান্তিক মহাসাগরে। মিচিগান হ্রদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে হুরোণ হ্রদের ম্যাকিণ্যাক প্রণালী।

লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে WINDY CITY, সওদাগরদের কাছে Midwest Titan "half noted, sweating, proud to be hog butcher, Tool maker, Stacker of wheat, player with Railroads and Freight Handler to the nation" এখানকার অধিবাসীদের বিখ্যাতি ওদের ভাষায়ই ছিল 'gamblers, horse thieves, holdupmenf, prostitutes, rulfians, and rogues of every description, white, black, brown or red', সত্য কিন্তু অন্যদিকে আকাশচুম্বী হর্ম্যের মুখ্য বিকাশস্থল এখানে। ইস্পাত ও কংক্রীটের সমন্বয়ে গঠিত অট্টালিকার মাধ্যমে নতুন স্থাপত্যের প্রকাশকেন্দ্র ও পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক মিচিগান হ্রদের কর্দমময় বেলাভূমিতেই গড়ে উঠেছিল। মিচিগান ও সংযুক্ত হ্রদে নৌবাণিজ্য চলত ও সিকাগোতে বহু রেলরাস্তার সঙ্গম স্থল ছিল। চতুষ্পার্শ্বের শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের মাঝে এক গণ-আকর্ষণের মহাচুম্বকরূপে সিকাগো আজও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান বিষয়ে সিকাগোর মহা আপত্তি ছিল সত্য কিন্তু যখন রাষ্ট্র মহাযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তখন আবার সিকাগোই পাঠিয়েছিল সকল রাষ্ট্রের তুলনায় সবচেয়ে বেশী সৈন্য। যুদ্ধে বহুকর্মীর যোগদানের ফলে এল উন্নয়নশীল শিল্প ও বাণিজ্যে পারদর্শী কর্মীর অনটন। তার ফলে এল ৬৫,০০০ দক্ষিণ অঞ্চলের নিগ্রো শ্রমিক। এদের সঙ্গে সাদা চামড়ার মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। মারামারি ও খুনোখুনি কখন কখন লাগতো। ১৯১৯ সালে জুলাই মাসে সাদা-কালোর সংঘর্ষে ২ জন নিগ্রো ও ১৬ জন শ্বেতকায় নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর, শ' ছয়েকের (৬০০) কাছাকাছি।

সিকাগোর প্রতি ভারতবাসীর প্রীতির অন্ত নেই। কেননা এই সহরের এক মার্কিন পরিবার (হেল পরিবার) স্থান দিয়েছিল নরেন দত্তকে যিনি উত্তরকালে 'বিবেকানন্দ' রূপে সারা বিশ্বে বিখ্যাত হন। এই সিকাগো সহরেই Parliament of religion-এ প্রথম বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়েই বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের বিবেকে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। হেল ভগিনীরা বিবেকানন্দকে দিয়েছিল অন্তরের প্রীতি, প্রেরণা ও স্নেহ যাতে প্রবাসের নিঃসঙ্গ জীবনে একাকিত্বের বেদনা দূর হয়। সিকাগোর দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় কী বিপুল কর্মের সূচনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্প্রসারিত হয়েছিল শিল্পশালা ও কারখানা-জাত সামগ্রীর আমদানী রপ্তানীর বৃদ্ধি, প্রচুর গো মাংস কৌটো ও টিন ভর্তি ক'রে রপ্তানি পর্ব চলেছিল। একসময় এটা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম গোহত্যা ও মাংস রপ্তানীর কেন্দ্র। আজ তার সে খ্যাতি কিঞ্চিৎ ম্লান হয়েছে।

সিকাগো নদী ও সিকাগো বন্দর :—

ডলটন সাহেবের সঙ্গে বহুতল বাড়ী ও নতুন এক্সপ্রেস-ওয়ে দেখতে দেখতে আমরা মিচিগান হ্রদের ধারে চ'লে এলাম। সেখানটীতে সিকাগো নদীর মোহনা আগে ছিল। সিকাগো নদী প্রাকৃতিক নিয়মে পড়তো মিচিগান হ্রদে আবার এই হ্রদ থেকেই মহানগরীর পানীয় জল সংগ্রহ করা হয়। আর এই সিকাগো নদীই মহানগরীর ব্যবহৃত ময়লা জল, কত গরু-ভেড়া কাটা রক্ত, নানা রকমের শিল্পোদ্ভূত দূষিত ও ক্ষতিকারক পরিত্যক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব'য়ে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আসতো। আজ সেই নদীর মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নদী আর হ্রদে না পড়ে বিপরীত দিকে মিসিসিপি নদীর

একটা সামান্য শাখানদীর কাজ করছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীর যত ময়লা তা সারা যুক্তরাষ্ট্র ভেদ ক'রে দক্ষিণে নিউ অরলিনসের পাশ দিয়ে সমুদ্রে পড়ছে। নৌচলাচল অব্যাহত রাখার জন্য একটা খাল কাটা হয়েছে। সেই জল Lock Gate দিয়ে আটক রাখা আছে। নইলে হ্রদের জল ক্রমশঃ ঐ নদী দিয়ে বেয়ে অনেক নীচে নেমে যাবে। সিকাগো, মিলওয়াকী প্রভৃতি বড় বড় শহর একই মিচিগান হ্রদ থেকে জল নিচ্ছে। যদি না বৃষ্টির জল এসে বছরে পরিপূরণ করে তাহ'লে হ্রদের জল ক্রমশঃ নেমে যাবে এবং একদিন শুকিয়েও যেতে পারে। যে সিকাগো নদীর জল এনে মিচিগান হ্রদে ফেলার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ছিল, সে আজ জল বের ক'রে নিয়ে চলেছে। যে হেতু এখানে বহু বোট যাতায়াত করে তাই কয়েকটা বোট একসঙ্গে জমা হ'লে 'লক্ গেট' খোলা হচ্ছে। লকের মধ্যে ঢুকে পড়লে ওপরের লক গেট বন্ধ ক'রে নীচের 'লক গেট' খুলে দিচ্ছে যাতে ক'রে হ্রদ থেকে সিকাগো নদীতে ও সিকাগো নদী থেকে হ্রদে বোটগুলো বেরিয়ে যেতে পারে। এ কাজের যেন বিরাম নেই। দিনরাতই খোলা-বন্ধের কাজ চলছে। ছুটীর দিন একজন কর্মী তার ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছে কাজের জায়গায়।

ছেলেটি এনেছে একটা ছিপ ও ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। মাছ তখন একটাও ধরা পড়েনি। হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে জলযানের যাতায়াত খানিকক্ষণ দেখলাম। এর পাশেই Navy Pier ও তার উত্তরে নবনির্মিত বৃহত্তম জল পরিশোধনাগার। বহুকোটী ডলার ব্যয়ে এটা নির্মিত হয়েছে। নির্মাণপর্ব দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল চারিদিকে Sheet Pile পুঁতে। হ্রদের জল ছেঁচে বের ক'রে তার ভেতরে সুবৃহৎ পানীয় জলের কারখানা প্রস্তুত হয়েছে। বাইরে থেকে বোঝা যাবে না যে এটা এত বড় জল শোধনাগার। আজ ছুটী বলে দেখা সম্ভব হ'ল না কেননা আগে থেকে বলাও ছিল না। এরপর সে আমায় তাদের ১০০ ইষ্ট্ ইরি ষ্ট্রীটের অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে তার ঘর, সর্বাধ্যক্ষ বেকন সাহেবের ঘর দেখালেন। নিজের চাবি দিয়ে নিজের ঘর খুললেন। অফিসের নীচের তলায় মোটর রাখার জায়গা। তাদের অফিস থেকে আমায় সে নিয়ে এল 'পিক কংগ্রেস' হোটেলে। আগে থেকেই চিঠি দেওয়া ছিল। যাওয়ামাত্রই কাউন্টারের সুন্দরী আমার কয়েকটি চিঠি দিলেন ও 'বেলবয়'কে আমার ঘরের নম্বর ও চাবি দিয়ে আমার বড় ব্যাগটা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ডল্টন ও আমি নিজের ঘরে গেলাম। ঘরটি মিচিগান এ্যাভিন্যুর উপর। সামনেই পৃথিবীর বৃহত্তম ফোয়ারা—গ্রাণ্ট পার্কের মধ্যে বাকিংহাম ফোয়ারা। আরও দূরে পূর্বে চিকাগো বন্দর ও মিচিগান হ্রদ। আমায় হোটেলে ছেড়ে দিয়ে ডল্টন সাহেব যখন বলল যে কাল তার বিশেষ কাজ থাকায় সে আসতে পারবে না। সোমবার সকালে এসে আমায় পরিদর্শনে নিয়ে যাবে। তাদের সংস্থা 'দি মেট্রোপলিটান স্যানিটারী ডিষ্ট্রিক্ট অব গ্রেটার সিকাগো'—কিন্তু আমায় তাকে নবনির্মিত বৃহত্তম জলকল, এখানের অন্নভাড়ার গৃহ নির্মাণের রূপায়ণ দেখাতে এখানের গত আঠারো বছরের পর কি নব নব পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে তাও দেখাতে, ও সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক 'ডেমাগ' সাহেবের সঙ্গে সম্ভব হ'লে দেখা করানোর ইচ্ছে জানালাম।

সে আজ রবিবারের ছুটীর দিনে আমার খুশী মত কাজ করার অবকাশ দিয়ে গেল।

প্রথমেই কেন জানিনা সিকাগো বলতেই আমার মনে হয় স্বামীজির কথা, সেই সূত্র ধরে 'হেল দম্পতি' ও কন্যাদের কথা, এখানের বিবেকানন্দ সোসাইটীর কথা ; তারপর পৃথিবীর বৃহত্তম জলকল ও ময়লাকলের কথা। আঠারো বছর আগে যখন ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কৈশোর সেই সময় জলকলের পরীক্ষাগারে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণযন্ত্রের ব্যবহার দেখেছিলাম। আজও কোলকাতার জলকলে বহু সামান্যতম পরীক্ষার আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। এখানে বিখ্যাত স্থপতি 'এডলার ও সুলিভ্যানের' (Adler & Sullivan) কথা, এখানের গ্রন্থাগার, মীনাগার প্রাচীন সংগ্রহাগার প্রভৃতির কথা।

বাকিংহাম ফোয়ারা—

পিক কংগ্রেস হোটেলের প্রকাণ্ড সমভূমিক জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম অঝোর-ধারা ঝরণা জলের

অবিশ্রান্ত ঊর্ধ্বগতির রূপ। দেখলাম সন্ধ্যায়, দেখলাম মধ্যরাত্রে, দেখলাম ভোররাত্রে, তীব্র দিবালোকে, ঈষৎ বর্ষণমুখর অপরাহ্নে। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি রঙিন আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত অবিশ্রান্ত ঊর্ধ্বমুখী জলধারার পাশে দাঁড়িয়ে দর্শকেরা। তবে এখন তাদের সংখ্যা অতি সামান্য। গতিশীল মোটরের ধ্বনির নিরন্তরতা কিছু ম্লান হয়েছে কিন্তু শান্ত পরিবেশে তা' কিছু উগ্রতর। ফোয়ারাটী দেখলে মনে হয় যেন এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ জন্মক্ষণের প্রদীপ শিখাটী ধারাময় ঊর্ধ্বস্রোতে অনির্বাণ রেখেছেন। কোথাও যেন শৈথিল্য নেই, মন্থরতা নেই, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, ছেদ নেই। মিনিটে ১৫,৭০০ গ্যালন জল ১৩৩টী তীক্ষ্ণ ধারায় উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় পরিবেশের মত সাড়ে চারকোটী দীপের দ্যুতি (Candle Power) দিয়ে আলোকিত ও রঞ্জিত করা হচ্ছে। এটী ভার্সাই প্রাসাদের 'লেটোনা ফোয়ারা'র চেয়ে আকৃতিতে বৃহৎ। টেলিফোনের ডিরেক্টরীটা দেখে বের করলাম বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটীর ঠিকানা ও ডায়েরীতে লিখে নিলাম। রাতের আহার সারতে গেলাম YMCA তে। পায়ে হেঁটে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। এখানে নানা বিষয়ের বিরাট ব্যবস্থা। আমেরিকার নানা জায়গায় Y তে সংবাদাদি দেওয়া-নেওয়া, খেলাধূলা, আহারাদির বন্দোবস্ত, সামান্য টুকিটাকির দোকান, নাপিতের দোকান সবই লাগোয়া। সেই মেয়েটীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম যে আমার আগেকার সফরে যাই জিজ্ঞেস করি তারই যেন মুখস্থ উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। মুখে উজ্জ্বল হাসি আর মগজে চালু সংবাদ ভাণ্ডারের যেন জীবন্ত অভিধান। সে নেই তবু সে আছে আর এক রূপসীর রূপে কাউন্টারে বসে। তাকেও ওপরে দু' একটা I. Q. প্রশ্ন করলাম। সেও তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল। ফিরে গেলাম আপন ঘরে। দিনের নিয়মিত পত্রলেখা জরুরী লেখায় মন দিলাম। চেয়ারটা টেনে নিলাম জানালার ধারে। সামনেই গ্র্যাণ্ড পার্ক। তলায় গাড়ীর পার্ক উপরে মানুষের অবসর বিনোদনের পার্ক। মিচিগান এ্যাভিন্যুর সমান্তরাল রেল লাইনের খানিকটা দেখা যায় আর খানিকটা সবুজ তৃণ ও তরুর আস্তরণে ঢাকা।

ডলটন সাহেব গত কাল আমায় পিক কংগ্রেস হোটেলে নামিয়ে দেবার সময় মহানগরীর একটা সুন্দর মানচিত্র দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটী বইয়ের মত। ভেতরে রাস্তার তালিকা ও সেগুলো বার করবার ইঙ্গিতও গায়ে গায়ে লেখা আছে। হোটেল ও হাসপাতালের তালিকা, হ্রদ সৈকত ও ভোজনালয়ের তালিকা, সিনেমা হল ও গল্‌ফ ক্লাবের তালিকা, বিশ্ববিদ্যালয়, ও স্কুলের তালিকা। সিকাগোর এক্সপ্রেসওয়ে ও টোল্‌ওয়ের বিবরণী, এখানের দর্শনীয় বস্তুর তালিকা প্রভৃতি। এই Standard Oil Division American Oil Companyর গাইড টু সিকাগো থেকে খুঁজে বেড় করলাম 'ইষ্ট এলম্‌ ষ্ট্রীটের সংবাদ। মিচিগান এভিন্যু, যেখানে লেক শোর ড্রাইভে' মিশেছে তারই সামান্য পরে। এলম্‌ ষ্ট্রীটের মোড়ে 'ওক ষ্ট্রীট সৈকত।' বহু নরনারী এসেছে নগ্নপ্রায় দেহে। কেউ নিয়েছেন বালুকা শয্যা, কেউ সামান্য কার্পেট পেতেছেন, কেউ বা ডেক চেয়ার। ওদিকে দৃষ্টি না দিয়েই চলে গেলাম ধর্মীয় পরিবেশের দিকে।

[ক্রমশঃ

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ফুল পাঞ্জাব বডির একটা লরীতে সর্দারজী ড্রাইভারের পাশে বসে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সুহাস চলেছে রানীগঞ্জে কয়লা বোঝাই করে আনবার জন্যে। সঙ্গে আছে আর একজন কুলি।

খালি গাড়ী নিয়ে অতটা পথ গেলে খরচে পোষায় না বলে এখান থেকেও গাড়ীতে মাল বোঝাই করে অন্যত্র চালান দেবার ব্যবস্থা করে ফিরতি পথে আনা হয় কয়লা। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী সুহাসের গাড়ীতে বোঝাই করা হয়েছে সরষের বস্তা। ওগুলো যাবে বর্দ্ধমানের এক আড়তদারের কাছে। সেখানে গাড়ী খালি করে, যাবে রানীগঞ্জের কোলিয়ারীতে। সেখানে কয়লা বোঝাই করে আবার ফিরে আসা।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রথম দিকটায় যানবাহন বেশী চলাচল করার জন্যে মন্থরগতিতে হুঁসিয়ার হয়ে সর্দারজী গাড়ী চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রাস্তা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা হওয়ায় সর্দারজী যেন একটু বেপরোয়া হয়ে উঠল। গাড়ীর বেগ যত বাড়তে থাকল, পেছনের বস্তার ওপর শুয়ে থাকা কুলির কণ্ঠস্বর ততই চড়তে লাগল। খোলা হাওয়ায় খোলা মনের প্রাণফাটা চীৎকারে সে গান জুড়ে দিয়েছে।

সর্দারজী এক মনে গাড়ী চালিয়ে চলেছে। কোন কথা নেই তার মুখে।

সুহাস তাকিয়েছিল দূর প্রকৃতির দিকে—আকাশ যেখানে নুয়ে ভূপৃষ্ঠকে চুম্বন করছে, সেই দিকে। হঠাৎ তার মনে হল সে যেন বাঙলাদেশের বুক চিরে এগিয়ে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। সে মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল সর্দারজীর ওপর। সুদূর পাঞ্জাবের মায়া কাটিয়ে চলে এসেছে বাঙলা দেশে। কিন্তু সুহাসের অনেক আগে সে চিনেছে বাঙলা দেশকে, চিনেছে তার পথঘাট, অলিগলিকে। তাই আজ সর্দারজীর কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে কোলকাতা থেকে রানীগঞ্জ যাবার অচেনা পথের সঙ্গী হয়ে। তাই বোধহয় সর্দারজীর এত গর্ব, এত বেগ।

বস্তার ওপরে শোয়া কুলিটাও আনন্দের গানে ম্লান করে দিচ্ছে সুহাসের অস্তিত্বকে।

কয়েক ঘণ্টা চালাবার পর সর্দারজী গাড়ী এনে দাঁড় করালো মেমারীতে।

মেমারী। লরী চলাচল ইতিহাসের বিখ্যাত স্থান—বড় জংশন। এখানে আছে হোটেল আকৃতির অনেকগুলো সরাইখানা। সরাইখানাগুলোর আশে পাশে বহুসংখ্যক খাটিয়া বিছানো। দূরপাল্লার লরী চালকরা ঐ খাটিয়াগুলোতে শুয়ে দূর করে দেহের ক্লান্তি।

জলের অভাব নেই মেমারীর সরাইখানাগুলোতে। লরী যন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানুষগুলোর অবসাদ দূর করার চেষ্টায় ঘটি, গাড়ু বা মগে সব সময় জল ভর্তি রাখা থাকে। তাছাড়া সেখানে পাওয়া যাবে ভাত-তরকারী, রুটি-মাংস এমন কি মদও।

গাড়ী থামাবার পর সর্দারজী মাথার পাগড়ি খুলতে খুলতেই একটা খাটিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল তাতে।

সুহাস কাৎ হয়ে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বসেছিল লরীর ভেতরেই।

কুলিটাকে দেখতে পাওয়া গেল না অনেকক্ষণ। সে খাটিয়াতেও নেই, নেই বস্তা বোঝাই বিছানার ওপর। এখানে যে যার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজেকে ঝালাই করে নেয় সামনে এগোবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে।

সর্দারজী অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে পড়ার পর একটু নড়ে চড়ে উঠল।

জায়গাটায় ক্রমশই মানুষের আর লরীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। মাতৃভাষায় সর্দারজী স্বজাতিদের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিল খাটিয়ার ওপর উঠে বসে।

তারা কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সুহাসের দিকে ইঙ্গিত করে কি যেন বলাবলি করছিল আর মাঝে মাঝে তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে হৈ চৈ করে উঠছিল।

সুহাস বুঝল, লরী যাত্রার জীবনে ড্রাইভারই হচ্ছে প্রধান। অন্যান্য লরীর বাবুদের হাল কুলির মতই। ড্রাইভারের নির্দেশ ও গালাগালির অধীন হয়ে খাটিয়ার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে তারা। মদ খাচ্ছে, মাংস খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে গোপন সলাপরামর্শের বৈঠক বসিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে।

বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে যাবার পর অনেকগুলো লরী পর পর সারি বেঁধে ধীর গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের সোজা পথ ধরে। জায়গাটা একরকম ফাঁকাই হয়ে গেল। এবার সর্দারজী নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা ঘটি হাতে নিয়ে বেশ করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে কোমরে জড়ানো গামছায় মুছতে মুছতে সে এসে বসল খাটিয়ায়।

এবার কুলির সাক্ষাৎ মিলল। সেও এসে বসল সর্দারজীর পাশে। সরাইখানার লোক এসে এদের হাতে দিয়ে গেল রুটি আর মাংস।

এমন সময় কুলি কি যেন বলল সর্দারজীকে। সর্দারজী সুহাসের দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় একবার হেসে নিয়ে সরাইখানার একটা ছোক্‌রাকে হেঁকে সুহাসকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, এ মুণ্ডিয়া, বুদ্ধুকো পুছো কুছ খায়গা কি না?

দোকানের একটা ছোক্‌রা এক দৌড়ে চলে এল সুহাসের কাছে। বলল, খানা লে আই?

সকলেই যখন খাচ্ছে আর অন্য গাড়ীর সকলেই য খেয়ে নিয়ে যাত্রা সুরু করল, সুহাস ভাবল, তারপ খেয়ে নেওয়া বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে। তাই সে খ নিয়ে আসবার জন্যে ছোক্‌রাকে সম জানালো।

খানা পর্ব শেষ হতে সুহাস দেখল সর্দারজী বো থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছে আর এ ব্যাপারে সহযোগিতা ক গাড়ীর কুলি।

আরো খানিকটা পরে সর্দারজী হঠাৎ দাঁড়ালো সে হয়ে, তার লম্বা-চওড়া দেহটাকে স্বাভাবিক করে। তার হাতে তুলে দিল খাটিয়ায় পড়ে থাকা পাগ তোলা কাপড়টাকে। সর্দারজী সেটাকে গুছিয়ে মাথায় বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসতে লাগল গা দিকে।

তারপর তাচ্ছিল্যভরে গাড়ীর দরজা খুলে উঠে সর্দারজী। আবার আপন বেগে গাড়ী তার গতি করে নিল সামনের দিকে।

আসার এই পথের মধ্যে সর্দারজী একটিও বলেনি সুহাসের সঙ্গে। গাড়ী চালাতে চালাতে অ মনে গুণগুণ করে গান করার অবসরে এইবার সুহাসের সঙ্গে কথা বলল।

সে প্রশ্ন করল আধা বাঙলায়, বাবুজীকো কে মিলবে?

সুহাস বলল, কোলকাতার বাইরে এলে রোজ টাকা। নইলে তিন টাকা।

—আউর কাজ না হোলে, বিনে পোয়সা?

এবার সুহাস বুঝল, লরীর সঙ্গে হয়ত অনেক যাবার মত কাজ থাকবে না। তখন বসে থাকতে হ সেই সময় রোজের টাকা পাওয়া যাবে কিনা, সর্দা হয়ত সেই কথাই জানতে চাইছে।

গোবিন্দবাবু সুহাসকে এ ব্যাপারে সঠিক কিছু দেননি তো। তাই ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্যে সর্দারজীকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা সর্দারজী, কাজ না কি মালিকরা রোজ দেয় না?

সর্দারজী ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠল, ঐ কথাই

হামভি পুচ্ছি। হামি তুমার মালিক আছি না গোভিন্দ্ বাবু তুমার মালিক আছে?

বলে, একেবারে থেমে গেল সর্দারজী।

সুহাসও চুপ করে গেলো সর্দারজীকে রাগান্বিত দেখে।

আবার খানিকটা পথ অতিক্রম করল গাড়ী। দু'-ধারে বড় বড় গাছের সারি বাতাসের উদ্দামতায় হেলে দুলে উঠছে বারে বারে। মনে হচ্ছে চলন্ত গাড়ীটাকে তারা যেন আস্তে আস্তে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে এগিয়ে চলার।

সর্দারজী হঠাৎ যেন সুহাসের ওপর আবার সদয় হয়ে বলে উঠল, মাহিনাতে পোনারো রোজ কাজ হলে রোটি খরিদ করাভি চলবে না। এ দুসরা রকম লাইন আছে। এখানে আখের তৈরী করে নিতে হোবে। বোসবাবু তো নিজেই একটা 'ট্রেন্সপোর্ট কোম্পানী' খুলে নিল।

সুহাস অবাক হয়ে সর্দারজীর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতার জন্যে কিছু বলতে সাহস পেল না।

সর্দারজী বলে যেতে লাগল, লেকিন বোসবাবু মাফিক 'এস্পার' হোতে কুছু সময় লাগবে। তবে পয়লা শিখে নিতে হোবে। নেই তো খাবার পোয়সা মিলবে না।

বলতে বলতে হঠাৎ যেন সর্দারজীর আবেগ বেড়ে গেল। তাই সে গাড়ীটা থামিয়ে সুহাসের মুখোমুখি ঘুরে বসে বলে উঠল, হামি সাফ্ কোথা বোলে দিচ্ছি লোরীবাবু, আউর তিন মাইল চল্লে পোরে মাল খালাস কা আড়ৎ পোড়বে। শো বস্তাসে দো বস্তা মাল হামারা বের করে লিব। ও দো বস্তা বিক্রী করে যো পয়সা মিলবে, হামারা ভাগ করে লিব, কুলীকো ভি কুছ বখ্শিস্ দিতে হোবে।

বলে সে একরকম জোর করেই সুহাসের হাত ধরে টেনে নামিয়ে গাড়ীর পেছন দিকে নিয়ে গেল। সুহাস দেখল, কুলিটা ইতিমধ্যেই সব বস্তায় লোহার বড় নৌকো জাতীয় একটা যন্ত্র দিয়ে ঘা মেরে মেরে সরষে বের করে খালি বস্তায় ভরতে সুরু করে দিয়েছে।

সর্দারজী তার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, জলধি কোরবে?

কুলি তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগল। দু'টো বস্তা ভরতি না হওয়া পর্যন্ত গাড়ী দাঁড়িয়ে রইল পথের পাশে।

তারপর একসময়ে বস্তা বোঝাই হল। তার মুখ সেলাই করে বন্ধ করা হল।

কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে দেখে, সর্দারজী খুশির আমেজে সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলল, ছোক্ড়া বহুৎ 'এস্পার' আছে বাবু।

তারপর সুহাসকে নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠে সে সুরু করল যাত্রা।

মাইল খানেক চলার পর সর্দারজী একটা জায়গায় গাড়ী থামাল। কুলি গাড়ীর ওপর থেকে দু' বস্তা সরষে, বস্তা সমেত ফেলে দিল একটা মাঠের ওপরে। লুঙ্গিপরা একটা লোক এসে সুহাসের হাতে টাকা দিতে গেল। সুহাস সর্দারজীর মুখের দিকে তাকাতে, সর্দারজী হেঁকে উঠল, রাখ্ দো আভি।

সুহাস একরকম ভয় পেয়েই টাকাগুলো হাতে নিয়ে নিল।

সর্দারজী, লুঙ্গিপরা লোকটির উদ্দেশ্যে বলল, কেত্না রুপেয়া?

—দেড় শো।

সর্দারজী কোন কথা না বলে, গাড়ী ছেড়ে দিয়ে দ্রুতবেগে চলতে সুরু করল।

সুহাস মনে মনে ভাবতে লাগল, এই নিয়মেই এদের গাড়ী চলে। তাই মেমারিতে চলছিল সকলের অত সলা পরামর্শ। আর নতুন আমদানি সুহাসকে ঘিরে চলছিল তাদের কৌতুকের আলাপন।

আবার কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এসে থামল গঞ্জের মত একটা জায়গায়।

কুলি গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ঢুকল একটা আড়তের মধ্যে। তারপর আরো দু'জন লোকের সঙ্গে বেরিয়ে এসে লেগে গেল বস্তা নামাবার কাজে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ী খালি হয়ে যেতে কুলি সুহাসকে ডেকে নিয়ে আড়ৎ বাবুর কাছে গেল। সুহাসের চালানে আড়ৎবাবু একশো বস্তা সরষে প্রাপ্তির রসিদ সই করে দিলেন।

সকলে ফিরে এসে গাড়ীতে উঠতে সর্দারজী আবার গাড়ী চালাতে সুরু করল।

• গাড়ী চলেছে দ্রুত গতিতে। আর থামবার বা দাঁড়াবার কোন প্রশ্নই নেই। একেবারে রাণীগঞ্জ। সেখানে কয়লা বোঝাই। তারপর ফিরে আসা।

রাস্তার দু'ধারে দুর্ভেদ্য শালবন। রাস্তা চড়াইয়ের দিকে উঠে গেছে। সর্দারজী নিবিষ্ট মনে গাড়ী চালিয়ে চলেছে।

সুহাসের মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে দেড়শো টাকা সঙ্গে থাকায়। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এটা অন্যায়, এটা পাপ। দু'বস্তা সরষের যে মূল্য এরা পেলো তা বিনা মূলধনে। আর যে নিল, সে সামান্য মূলধনে। লাভের অঙ্কটা বোধহয় দু'পক্ষেরই সমান।

সর্দারজীর ভাষায়, এ লাইনের দস্তুরই এই, নইলে পরিশ্রমের পয়সায় রুটিও কেনা যায় না।

সুহাস ভাবল, তা হোক. রোজগারে রুটি না মিললেও এটা অন্যায়। এমন সময় মন্থর হয়ে এলো গাড়ীর গতি। উঁচু রাস্তার ধারে, নীচে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে সর্দাজী সুহাসকে বলল, এহি জায়গাকে ভাল করে চিনে রাখ বাবুজী।

বলেই আবার গাড়ীর গতি বাড়িয়ে সর্দারজী বলল, ওহি জায়গায় এক 'ডেরাইভার' লাথ সে লরীবাবুকো পটক্ দে ছিল।

সর্দারজী কথাগুলোকে সহজভাবে বলে গেল বটে কিন্তু শুনে সুহাসের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে ভাবল, সাঙ্ঘাতিক ধরণের সঙ্গী নিয়ে সে সুরু করেছে জীবনের যাত্রাপথ। এই তো সুরু! আরো কি ঘটতে বাকী আছে কে জানে?

সামনের হেড লাইট দু'টো আলো ছড়াতে সুরু করেছে সামনের দৃষ্টিপথে। সর্দারজীর সতর্ক গোল চক্ষু দু'টো যেন রক্ত ছড়াতে সুরু করেছে আলোর ওপরে।

হঠাৎ সুহাস যেন ভয় পেল মনের ভেতর। সর্দারজী যদি কোন অঘটন ঘটাবার চেষ্টা করে তাহলে এই জনশূন্য পরিবেশে দ্বিতীয় প্রাণী থাকবে না তাকে উদ্ধার করার জন্যে। একমাত্র একজন কুলি আছে এই গাড়ীতে। কিন্তু কোন বিপদ দেখা দিলে কুলি সর্দারজীর পক্ষই অবলম্বন করবে। এটাও লরী জীবনের রীতি, বুঝছে সুহাস। সুতরাং কোলকাতায় না ফেরা পর্যন্ত সর্দারজীকে যে কোন কাজের সহায়তা করে খুশি করার মনস্থ করল সুহাস।

অবশেষে একটানা রাস্তা আর গাড়ীর চাকার রবার সোলের সঙ্ঘর্ষ বেদনার অবসান ঘটল।

গাড়ী এসে দাঁড়াল রাণীগঞ্জের কয়লার ডিপোর সামনে। যার যার গাড়ী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা লরী ভর্তি হচ্ছে, বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার পেছনেরটা এগিয়ে যাচ্ছে। এই নিয়মে এখানে ভর্তি হচ্ছে কয়লা।

সর্দারজী লাইনের পেছনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে দিয়েই নেমে গিয়ে বসল একটু দূরে একটা চট বিছিয়ে দু' চার জন পাঞ্জাবী যেখানে গল্প ব্যস্ত, সেখানে।

একটু পরেই কুলিটা নেমে সর্দাজীর জায়গায় বসল সুহাসের গা ঘেঁষে।

লাইনের প্রথম গাড়ীটা মাল বোঝাই হতে বেরিয়ে চলে গেল। পেছনের গাড়ীগুলো একটু একটু করে এগিয়ে নিল গাড়ীকে। এ গাড়ীর কাজ কুলিই সারল। তারপর আপন মনেই সে বলে উঠল, আভি বহুৎ টাইম মিলেগা।

বলে, সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, হামার হিস্সামে আভি পাঁচঠো রূপেয়া দেও।

সুহাস ভাবল, সর্দাজীকে না জিজ্ঞেস করে কুলিকে টাকা দেওয়া উচিত হবেনা। আবার কুলিকেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে সে রাজী নয়। তাই সুহাস অনেক ভেবে চিন্তে কুলিকে বলল, ভাই, হাম্ তো একদম নয়া আদমি হ্যায়, কিস্‌কা হিস্সা কেতনা ও তো হাম নেহি জানতা। চলিয়ে সর্দারজীকা পাশ, জিস্‌কা যেতনা হোগা হাম্ লোক ভাগ করকে লেগা।

বলে, সুহাস গাড়ী থেকে নেমে কুলিকে সঙ্গে নিয়ে সর্দারজীর কাছে এসে দাঁড়াল।

সর্দারজী উঠে এসে সব শুনে বলল, কুলিকা পাঁচ রূপেয়াই মিলবে। লেকিন আভি দু' রূপেয়া দে দিন সব হাতমে মিললে গাঁজামে খতম করবে।

বলে, সর্দারজী সুহাসকে পঁচিশ টাকা নিতে বলে বাকী টাকা নিজে নিয়ে নিল।

কুলি দু'টাকা পেয়ে মুখর্টা কঁচুমাচু করে সুহাসের সঙ্গে আবার লরীতে এসে বসে বলল, বাকী তিন রূপেয়া আউর নেহি মিলেগা উস্‌সে। ফিন্‌ যব আপ আইয়েগে পয়লেই হামারা হাত মে পাঁচঠো রূপেয়া দে দিজিয়েগা।

সুহাস কুলির ব্যথার সুযোগ নিয়ে গল্প সুরু করে দিল তার সঙ্গে।

সুহাস জানতে পারল, কুলির রোজ দু'টাকা আর ড্রাইভারের আট টাকা। এ টাকায় এ ধরণের কাজ কারুই পোষায় না। তাই বাধ্য হয়ে কিছু বাড়তি পয়সা এইভাবে এদের রোজগার করতে হয়। কিন্তু কুলি বেচারার ভাগ্যে ঐ পাঁচ টাকার নামে দু'টাকা। তাই এই ধরণের কাজ গায়ে গতরে পোষাতে গিয়ে তাকে গাঁজারই শরণাপন্ন হতে হয়। কুলি এও জান'ল দিনরাত এভাবে গতর খাটাতে গেলে সর্দারজীর মত মদ না খেলে চলে না।

বল্‌তে বলতে কুলি আগের লরীবাবু, বোসবাবুর প্রসঙ্গে এসে পড়ল। বোসবাবুর মত 'একস্‌ পার্ট' লোক নাকি এ লাইনে নেই। যেমন সে পয়সা রোজগার করতো তেমনি তার দিল্‌ও ছিল মস্ত বড়। সর্দারজী এঁটে উঠতে পারতোনা বোসবাবুর সঙ্গে। যা রোজগার হত ড্রাইভার আর বোসবাবু দু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নিত। কুলির দরকার হলে বোসবাবু নিজের থেকেই দু'পাঁচ টাকা বের করে দিতেন।

আর কুলি এবং বোসবাবুর মধ্যে সমান ভাগের ছিল আলাদা কারবার।

গাড়ীটাকে আবার একটু এগিয়ে দাঁড় করাল কুলি।

অন্য কারবারের গল্প শুনতে উৎসুক হয়ে উঠল সুহাসের মন।

কুলি জানাল, ফেরার পথে চড়ে বেড়ানো বেওয়ারিশ ছাগল গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে কলকাতার মাংসের দোকানে বিক্রী করা। আর সেই টাকা ভাগ করে নেওয়া। এইভাবে তখন সকলের দিন বেশ ভালই চলছিল। শেষে বাবুদেরই সিমেন্টের বস্তা লোপাট করতে গিয়ে বোসবাবুর চাক্‌রী গেল।

কুলির কথা শুনে শিউরে উঠল সুহাস। ছাগল চুরি করে মাংসের দোকানে বিক্রী করতেও কুণ্ঠিত হয়না এরা।

সুহাস ভাবল, কোন গতিকে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে কোল কাতায় ফিরে গেলে আর লরীতে কাজ করার নাম উচ্চারণ করবে না সে।

এবার এই লরীতে কয়লা বোঝাই-এর পালা এল।

গাড়ী ভর্তি হতে সর্দারজী এসে গাড়ীতে উঠে আবা যাত্রা সুরু করল। তবে আশ্বাসের কথা এই যে ফেরা পথে। তবু কুলির কাছ থেকে নতুন অভিজ্ঞতার বর্ণ শুনে কোন প্রকারেই এদের বিশ্বাস করা চলে না।

আবার সেই মেমারীতে এসে গাড়ী থামল। সর্দারজী বিশ্রাম নেওয়া ও পুনরায় যাত্রা করার ইতিহাসের ঘট পুনরাবৃত্তি।

সর্দারজীর মুখে আর কথা নেই। আপন মনে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

সর্দারজীর গাড়ী চালানোর ভঙ্গী দেখে সুহাস ভাব ছাগল চুরি করার অভিসন্ধি নেই বোধহয় তার মনে।

ছাগল চুরি না করেই কয়েক ঘন্টা পরে সর্দারজী ভা মানুষের মত বি, টি রোডের ধারে গ্যারেজের সামনে এ গাড়ী দাঁড় করাল।

সুহাস গ্যারেজ বাবুর কাছে চালানগুলো জমা দি যাতায়াতের দিন হিসেবে তিন দিনের রোজগার পকে নিয়ে সোজা চলে এল গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে।

দৈবক্রমে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল গোবিন্দবা সঙ্গে।

সুহাসকে দেখেই গোবিন্দবাবু বলে উঠে আর আমার সঙ্গে কোন ব্যাপার নে এখন যা কিছু সব গ্যারেজ বাবুর সঙ্গে। থাক জায়গা না থাকলে অত বড় গ্যারেজটা পড়ে আ একটু জায়গা বেছে নিলেই চলবে। আর খাওয়ার ব্যব নিজেকেই করে নিতে হবে।

সুহাস বলল, না, সে জন্যে আমি আসিনি। আ এসেছি আপনার সঙ্গে একটু জরুরী আলোচন জন্যে।

অনিচ্ছার বিরক্তিতে গোবিন্দ বাবু বাধ্য হয়েই সুহাস সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

কিন্তু সব শুনে, সুহাসের সতাহার জন্যে তিনি এ

সদয় হলেন সুহাসের ওপরে। তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, ওরা যে মাল চুরি করেছে তাতে আমার যে বিশেষ ক্ষতি হয়েছে, তা নয়। আমাদের ভাড়া নিয়ে মাল পৌঁছে দেবার দায়িত্ব। তবে মালের ওজন কম বেরুলে আমার ব্যবসায়ের নামে বদনাম হবে অবশ্যই। কিন্তু আপনি ফৌজদারী আদালতের মুহুরী হয়ে ওদের ম্যানেজ করতে পারলেন না।

সুহাস একটু লজ্জার দৃষ্টি নিয়ে তাকাল গোবিন্দবাবুর মুখের দিকে।

গোবিন্দ বাবু বললেন, সে যাই হোক, যা হবার হয়েছে। লোক হিসেবে আপনি সৎ। আর আপনি যখন লরীতে একেবারেই যেতে চাইছেন না তখন আমার ছেলের ব্যবসাতেই পাঠিয়ে দেব। খালি বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে কিন্তু।

সুহাস সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে আসার সময় হিসসার সেই পঁচিশ টাকা গোবিন্দ বাবুকে ফেরৎ দিতে গেল।

গোবিন্দবাবু বললেন, অপরাধ স্বীকার করার পর আর পাপ হয়না। ওগুলো আপনিই নিয়ে নিন।

বলে গোবিন্দবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুহাসও অন্য পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

পথিক

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

থামে না তো কভু তা'রা মত্ত-পারা চলে।
মুক্ত চিত্তে চলে তা'রা; চলে স্থলে—জলে—
অতি-দূর অন্তরীক্ষে দীপ্ত কৌতূহলে।
চলে তা'রা অবিশ্রান্ত; চলে দলে দলে
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত লঙ্ঘি' দুর্বারিত বলে!
সিন্ধুর সঙ্গম বেয়ে অতন্দ্র সকলে
সাগ্রহে সোল্লাসে চলে। ফুল্ল ফুলে-ফলে
কুঞ্জপুঞ্জে যেথা বায়ু স্নিগ্ধ পরিমলে,
অরণ্য-সংঘর্ষে যেথা দবোনল জ্বলে,
স্তম্ভিত তুষার যেথা প্রাণ রঙ্গে গলে,—
চলে তা'রা গর্ব্ব-ভরে সদা সর্ব্ব-স্থলে।
চলে তা'রা নিরন্তর জঙ্গম ভূতলে
অন্তরে আনন্দ নিয়া; দণ্ডে—পলে—পলে
পান্থ-ধর্ম্ম উদযাপিতে তা'রা নিত্য চলে।

২

এসো চলি,—তাহাদের সঙ্গে রঙ্গে চলি;
তুরন্ত তরঙ্গ সম উল্লাসে উচ্ছলি;
বন্ধুর পন্থার যত বাধা-বন্ধ দলি;
নদী-নৃত্যে তটে ঢালি সঞ্জীবনী পলি;
উথলিত হ'তে হ'লে উঠিব উথলি'।
প্রাণোচ্ছ্বাসে নির্ব্বারিত কল্লোল-কাকলি
তুলিয়া আহ্লাদে যেন সকলেরে বলি
মর্ম্মের দুর্ম্মর কথা—যেন কুতূহলী
পুষ্পপুঞ্জপূর্ণ কুঞ্জে গুঞ্জরিত অলি।
শষ্পাগ্র-শিশির সম যেন সূর্য্যে ঝলি;
যেথায় গলিতে হবে যেন সেথা গলি;
যেথায় জ্বলিতে হবে যেন সুখে জ্বলি;
নির্দ্ধারিত লক্ষ্য হ'তে যেন নাহি টলি'।—
এসো চলি,—তাহাদের সাথে সাথে চলি।

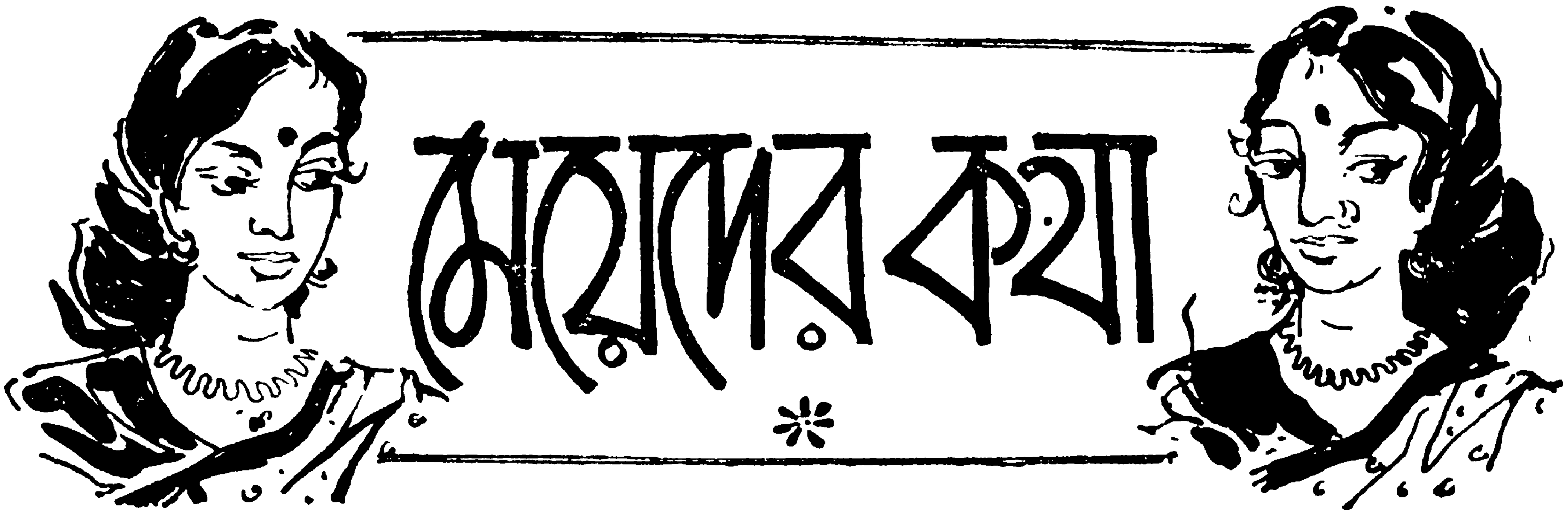

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবি বলেছেন মেয়েদের চোখের জলে বীরের অধিকার। মেয়েদের চোখের জলে ভিজে পথ বেয়েই চলে বীরের কঠিন পথে যাত্রা। তিনসঙ্গী বইতে কবি অচিরা আর বৈজ্ঞানিকের গল্পে এই কথা বলেছেন। বৈজ্ঞানিক নবীনমাধবের সাধনা স্বদেশের গোপন খনিজ ঐশ্বর্যকে সে উদ্‌ঘাটন করবে। সাঁওতাল পরগণার কোন এক স্টেটে সে কাজ নিয়ে এসেছে। সে এক জায়গায় পেয়েছে মেংগানিজের সন্ধান, তাই নিয়ে চলল তার পর্য্যবেক্ষণ। একটি মেয়ে দূর থেকে তার নিবিড় নিবিষ্টতা দেখেছে। দূর থেকে এই বিজ্ঞানের সাধককে সে শ্রদ্ধা করেছে। অবশেষে যখন পরিচয় ঘটল দুজনের, তখন একদিন বৈজ্ঞানিক বিয়ের প্রস্তাব করল ওই মেয়েটির কাছে। সেদিন ওই মেয়ে (অচিরা) তাকে বলেছে—আপনার বয়েসের হিসেব করে দেখেছি, আমাদের দেশের হিসেব মতে বিয়ের বয়েস অনেক আগেই হয়েছে। কিন্তু আপনি বিয়ে করেন নি। বিলেত থাকতে আপনার মহিলা সহকর্মিণীদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ না কেউ আপনার কাছে এসেছে। কিন্তু তাকে আপনি বিয়ে করেন নি—এই জন্যে যে আপনার সাধনা শুধু তো বিজ্ঞানের সাধনা নয় সে সাধনা যে স্বদেশেরও। তাই সেই বিদেশিনীর প্রেম আপনি উপেক্ষা করে এসেছেন। তার পরেও আপনি বিয়ে করেন নি এই জন্যে যে পাছে আপনার সাধনায় বি ঘটে। ইতিমধ্যে আপনার মা নিশ্চয় অনেক অনুনয় বি করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। ক আপনাকে কিছুদিন থেকেই দেখছি যে আপনার নিবিড় নিবিষ্ট ভাবনার মাঝখানে এসেছে ব্যাঘাত তখনই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, "ছি ছি, একি পরাজ বিষ এনেছি আমি নারী"। এই বলে অচিরা বিদায় নি বৈজ্ঞানিকের কাছে—"মেয়েরা চোখের জল ফেলুক কি আপনারা চলে যান।"

সেদিন বৈজ্ঞানিক তার ল্যাবরেটরীতে ফিরে এ বসল তার কাজ নিয়ে। আগেকার সেই তন্ময়তা সে ফি পেল। সে পেল এক মুক্তির আনন্দ। কিন্তু শেক ছেঁড়া পাখীর পায়ে জড়ানো থেকে গেল সেই শেকল একটি টুকরো। নড়তে-চড়তে সেটা বাজে, বীরে হৃদয় আছে, ব্যথা তাকেও বাজে, কিন্তু তবু তাকে চ আসতে হয়। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী নি কবি যে নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন সেখানে ক বলেছেন—চিত্রাঙ্গদা বীর নারী। বীরের বীর্য্যের মূল্য বোঝে কিন্তু মায়া না হলে সে অর্জুনের প্রেম আক করতে পারে না। কুরূপ দেহ নিয়ে সে তাকে মুগ্ধ কর পারল না। তাই, মদনের কাছ থেকে সে ক্ষণিক লাব

বর চেয়ে নিল এক বছরের জন্যে। অর্জুন যখন নারীর এই মায়াময় রূপের মোহপাশে ধরা দিতে এলো, তখন বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার প্রাণে বীরের এই পরাভবের গ্লানি বাজল। সে বলল—

তুমি বিশ্ববিজয়ী বীর আর আমি মায়াময়ী নারী। তুমি কি আমার কাছে ধরা দেবে? তোমার বীর্য্যকে কি নারীর রূপের কারাগারে বাঁধা পড়তে দেবে?

এই নাটকে কবি দেখিয়েছেন—নরনারীর মিলন প্রথমে মোহাবেশে ঘটলেও, তার শেষ সার্থকতা রয়েছে বীর ও বীরাঙ্গণার মিলিত জীবনের মহিমার মধ্যে। এক বৎসর কাল সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আবেশে, আলস্যে, রহস্যে দিন কাটাবার পর বীরের মন ক্লান্ত হয়ে উঠল। অর্জুন যখন প্রজাদের মুখে বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদার কথা শুনল তখন তার বীরের প্রাণ খুশী হয়ে উঠল এই বীরাঙ্গণার পরিচয় পাবার জন্যে। প্রজারা চিত্রাঙ্গদার কথা অর্জুনকে বলল—

"স্নেহ বলে তিনি মাতা
বাহু বলে তিনি পিতা"।

তখন অর্জুনের বীরের প্রাণ মুগ্ধ হ'ল। তিনি বললেন—সে যেন সিংহাসনা সিংহবাহিনী, যেন কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা। সে দারুণ, সে সুন্দর। "নহে সে ভোগীর লোচন লোভা, ক্ষত্রিয় বাহুর ভীষণ শোভা"। সে ভোগীর বিলাসসঙ্গিনী নয়। সে বীরের পার্শ্বচারিণী বীরাঙ্গণা। কবি মোহময়ী নারীর চেয়ে বীর্য্যবতী বীরঙ্গণার প্রশস্তি গেয়েছেন। নর নারীর মিলনের উদ্দেশ্য এই বীর্যের দ্বারা সংসারের কল্যাণ করা। নারী তার বীর্য্য দিয়ে জাগিয়ে তোলে পুরুষের পৌরুষ। তাই নারীকে যে পুরুষ কখনো দেবী বলেছে, কখনো বলেছে দাসী, তাতে কবি বলেছেন নারী দেবীও নয় সে দাসীও নয়। সে পূজা বা অবহেলার কোনটারই পাত্র নয়। তাকে পূজো করে মাথায় রাখাও চলবে না, তাকে অপমান করে পিছনে রাখাও চলবে না। তার স্থান পুরুষের পাশে। সংসারের কঠিন বীর্য্য পরীক্ষায় নারী পুরুষের পার্শ্বচারিণী। যেখানে পুরুষ কঠিন বীর্য্যের পথে নারীকে পার্শ্বচারিণীর গৌরব দান করেছে, সেখানেই সে নারীর সত্য পরিচয় পেয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো পুরুষ নারীকে দুইপ্রান্ত সীমানায় রেখে দেখেছে। হয় সেনারীকে একটা মিথ্যা মূল্য আরোপ করে তাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো করতে গেছে, নয়ত তাকে একেবারে দাসী বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু সে এর মধ্যে কোনটাই নয়। নারীর মধ্যে রয়েছে সেই গুণ যা নিয়ে সে বিঘ্ন বিপদে সংকটে পুরুষের পাশে থেকে বিঘ্নকে জয় করতে, সংকট থেকে উত্তীর্ণ হ'তে তাকে সাহায্য করতে পারে। তাই নারীকে যদি পুরুষ তার নিজের পাশে, তার যথাস্থানে রাখে তবেই সে নারীর আসল পরিচয় পাবে। কিন্তু অনেক সময়ই নারীকে কাল্পনিক দেবীত্ব অথবা দাসীত্ব এই দুই চরমের বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। তাই নারীর স্বরূপ অনেক সময় চাপা পড়ে থাকে। সে আপনার পরিচয় দেবার ক্ষেত্র পায় না। (চিত্রাঙ্গদা)

সংসারে অনেক সময়ই নারীর অবহেলা ঘটে পুরুষের হাতে। নারীর সে আনন্দ-রূপ পুরুষ চোখ মেলে দেখে না। পুরুষের কাছে স্ত্রী যেন ঘরকন্নার একটা উপকরণ মাত্র, সংসার চালাবার জন্যে, খাওয়া পরার সুবিধার জন্যই স্ত্রীকে যেন দরকার।......

একটি কবিতায় কবি লিখেছেন—মরণ দিনে স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে—কেমন করে তার জীবনটা সংসারের মধ্যে কেটেছে। সে এসেছিল যখন, তখন সে নয় বছরের মেয়ে। তার পরে তার জীবনটা কেটে গ্যাছে দশের চিন্তা বোঝাই হ'য়ে। তার নিজের চিন্তা বলে যেন কিছু ছিল না। তার জীবন ছিল কেবল রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা। তার জীবনটা এই রান্না আর খাওয়ার আবর্তিত শেকলে বাঁধা থেকেই কেটে গেছে। তার নিজের ইচ্ছা, নিজের আনন্দ বলে কোনো কিছু ছিল না বলেই সবাই তাকে প্রশংসা করে বলেছে— "লক্ষ্মী সতী, ভালো মানুষ অতি।" কিন্তু এতে করে সে নিজে কী পেয়েছে? আজ মরণ দিনে তার মনে পড়ছে যে জীবনটা তার শূন্য হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে। তার স্বামী তার আনন্দ রূপের প্রতি দৃকপাত করেনি। তার সন্ধ্যেবেলাটাও কেটেছে গৃহ কর্মে। আনন্দের অবকাশ তার জীবনে আসেনি। সে বলছে তার স্বামীকে— "তুমি যেতে অপিস, আসতে সন্ধ্যেবেলায়," আর তারপরে চলে যেতে "পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ খেলায়।" স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়া, তাকে নিয়ে খুশী হওয়া, তার আনন্দ রূপের পরিচয় নেওয়া—এ কথা স্বামীর মনেও আসেনি। এমনি

করে পুরুষ নারীর আনন্দ রূপের প্রতি উদাসীন থেকে নারীর জীবনকে ব্যর্থ করে আর নিজেকেও বঞ্চিত করে। কিন্তু কবি দেখেছেন নারীর আনন্দ রূপকে। শুধু ঘরকন্নার উপকরণ বলে তিনি তাকে দেখেন নি। কবি লিখেছেন—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না রাতের নিদ্রা বিহীন শশী।
আমি না হ'লে মিথ্যে হত
সন্ধ্যা তারা ওঠা,
মিথ্যে হত কাননে ফুল ফোটা।"

জগতে যত শোভা, নারীর আবির্ভাব তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে রেখেছে। নারী রয়েছে বলেই প্রকৃতি এমন সুন্দর। সে না থাকলে এই সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রাণহীন হয়ে যেত। যে আনন্দ সুরে শুক্লপক্ষের চাঁদের সুর বাঁধা, সে সুরের মিল যেন আছে নারীর মাধুরীর মধ্যে। নারী না থাকলে এই জ্যোৎস্নার সুর বেসুরা হয়ে যেত। সন্ধ্যার শুকতারা আর ভোরের ফুল যে এমন সুন্দর তার অন্তরালে আছে নারীর আনন্দিত উপস্থিতির কথা। সে আছে বলেই সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করে। পুরুষ সমস্ত সৌন্দর্য্যানুভূতির পটভূমিতে নারীর অস্তিত্বের কথা অনুভব করে।

অনেক সময় পুরুষ নারীকে তার ভোগের সামগ্রী বলে মনে করে, তখন সে তার আনন্দরূপকে চিনতে পারে না। এমনি করে অনেক সময় নারী নিজেও তার নিজের পরিচয় জানতে না পেরে পুরুষের ভোগের কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যদি কেউ নারীকে বাসনামুক্ত সত্য দৃষ্টিতে দেখতে পায়, আর তাকে তার আনন্দরূপের কথা জানিয়ে দেয় তারপরে নারী আর নিজেকে কামনার ইন্ধন হতে দেবে না। রামায়ণের ঋষ্যশৃংগ মুনির কাহিনীতে আছে যে মুনি আগে কখনও নারীকে দেখেননি। তাই তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রচলিত সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্ত। তিনি যখন নারীর রূপ প্রথম দেখলেন তখন তিনি তাকে দেবতা বলে মনে করলেন। এই কাহিনী নিয়ে কবি তার 'পুরস্কার' কবিতায় এই কাহিনীর মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কবি বলেছেন—সংসারের অভিজ্ঞতা মুনির ছিল না, তাই সংসারের কামনার ধূলো তাঁর চোখে লাগেনি। তাই মুনি যে চোখে নারীকে দেখেছেন, সেই হ'ল নারীকে সত্য করে দেখা। মুনি নিষ্কাম মন নিয়ে নারীকে দেখেছেন বলেই তিনি তার আনন্দরূপের সত্য পরিচয় পেয়েছেন। নারীর প্রতি অঙ্গে যে আনন্দধারা বয়ে চলেছে মুনি তাকে প্রত্যক্ষ করে খুশী হয়েছেন। কবি লিখেছেন—

"আনন্দময়ী মূরতি তুমি
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

... ...

"কোন দেব তুমি আনিলে দিবা,
তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

কবি কল্পনা করেছেন, মুনি যে দিন নারীর মধ্যে দেবতাকে দেখলেন, পতিতা নারী সেদিন নিজের মধ্যেকার দেবতার পরিচয় পেল। নারীর সমস্ত মাধুর্য্য তার মনের মিলিত রাগিণীতে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

"রমণীর দয়া জননীর স্নেহ
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার প্রাণের বীণায় বীণায়
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি!"

এই দয়া এই স্নেহ প্রেম ও প্রীতি এই তো নারীর মধ্যে কার দেবতা। এ দিকে দৃষ্টিপাত না করে যে নারীকে ভোগ্যপণ্য মনে করে, নারীর দেহের প্রশস্তি তাকে শোনায়, সে যে কত মিথ্যে, পতিতা নারী আজ তা বুঝতে পারল।

"মধু রাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি
তখন শুনেছি বহু চাটু কথা
শুনিনি এমন সত্য বাণী।"

তখন পতিতা নারী বলল এতদিন যারা ভোগের লালসা নিয়ে আমার কাছে এসেছে, তারা আমার মধ্যে যা নিকৃষ্ট তাই নিয়ে চলে গেল। যা আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার খবর তারা পায়নি বলেই আমিও তা জানতে পাইনি।

"দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা
দূর দুর্গম মন বনবাসে
পাঠাইল তারে করিয়া হেলা।"

কিন্তু একদিন এল তরুণ তাপস সেই গোপন নির্জন পথে, যার প্রান্তে নারীর মধ্যেকার দেবতা আপন নির্জন-বাস যাপন করছিল। নারীর মধ্যেকার দেবতা কখনো মরে না। ভোগের ব্যর্থতার মধ্যেও সে নারীর মনের গভীরে প্রতীক্ষা করে থাকে। কোন শুভদিনে ভক্তের হাতে পূজো পেলে সেই দেবতা আবার জেগে ওঠে। পতিতা বলছে—

সেইখানে এল অমর তাপস
সেই পথ হীন বিজন গেহ
... ...
সেথা কোন দিন আসেনি কেহ।
... ...
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
জাগে আনন্দ ভক্তপ্রাণে,
সে বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

পতিতা বলছে—তাপস যে দেবতাকে জাগিয়ে তুলেছে, সেই মন্দিরে আর অপবিত্র মানুষ কোনদিন প্রবেশের অনুমতি পাবে না।

"সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার—
যতদিন বেঁচে রহি এ ভবে।

যদি কোন পুরুষ পতিতা নারীকে কোন শুভদিনে তার সত্য রূপে, তার আনন্দরূপে দেখে তাহলে আর সেই নারী মিথ্যার হাটে, ভোগের বাজারে আত্মবিক্রয় করতে পারবে না—কবি এই কথা বলতে চান। কবির এই আইডিয়াই আমরা পেয়েছি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। সেখানেও আমরাও দেখেছি পতিতা নারী যে মুহূর্তে সত্যিকারের ভালোবাসা পেয়েছে, সত্যি করে কারোকে ভালবেসেছে, তখনি সে নিজেকে বিলাস ব্যসন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। তখন তার ভোগের ঘনান্ধকার ভেদ করে জ্বলে উঠেছে প্রেমের আলো।

একবার ভালোবাসার স্বাদ পেলে আর নারীর পক্ষে নিজেকে ভোগের পণ্য করে রাখা সম্ভব হয় না। দেবদাসে—চন্দ্রমুখী, শ্রীকান্ততে রাজলক্ষ্মী, চরিত্রহীনে সাবিত্রী এরা সবাই শরৎচন্দ্রের ওই একই আদর্শকে প্রকাশ করছে। যতদিন নারী ভালোবাসেনি, ততদিনই সে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পেরেছে। ভোগের বাজারে নিজেকে পণ্যের মত বেচতে বসেছে। কিন্তু এই ভালোবাসাই তার অন্তরের দেবতাকে জাগিয়ে তোলে। তারপর থেকে শুরু হয় তার কঠিন ব্রত, নির্জন সাধনা, তখন সে প্রেমের জন্য যোগিনী সাজে। এমন কি যাকে সে ভালোবাসে তাকেও সে আর ভোগের মধ্যে টেনে নামাতে চায় না। দূর থেকে তাকে পূজো করেই সে আনন্দিত হয়। চরিত্রহীনের সাবিত্রী দূর থেকে সতীশকে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করবার কথা সে ভাবতে পারে না, সে বলে যেমন করেই হোক, যে দেহ নিয়ে আমি অনেক লোককে ভুলিয়েছি তা দিয়ে আর তো দেবতার পূজো করা চলে না।

চোখের বালি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন বিনোদিনীর চরিত্রে। বিনোদিনী অতৃপ্ত যৌবনের ক্ষুধা নিয়ে সংসারের সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে যে দিন সে বিহারীকে ভালো বাসল, সে দিন বিহারীর বিবাহের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করল। সে বলল আমি যা পেয়েছি সেই আমার অনেক। এতেই আমার চলবে আর কিছু চাইনে।

নারীর প্রেম যতদিন তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি, ততদিনই ভোগের ক্ষুধা নিয়ে সে সংসারের অমঙ্গল ঘটায়। কিন্তু পূর্ণ পরিণত প্রেম তার মনে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত করে তোলে। তখন সে ত্যাগ করেই খুশী হয়, প্রেমের পায়ে সে আপনাকে উজাড় করে দান করে, নিজের জন্য কিছুই চায় না। সে শুধু ভালোবেসেই সুখী, পূজো করেই পরিতৃপ্ত, প্রতিদানে সে নিজের সুখ চায় না।

[ক্রমশঃ]

——

রূপচর্চ্চা

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েরা মায়ের জাত—বংশের মা, সমাজের মা। মায়ের সুঠাম দৈহিক স্বাস্থ্যে, সন্তানের সুগঠিত স্বাস্থ্য, সমাজের ও দেশের জন-স্বাস্থ্য গড়ে ওঠে সুষ্ঠুভাবে। তাই পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-আধুনিক চিকিৎসক ও রূপচর্চ্চা বিশারদেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে—"Women are the backbone of the nation !"

বাস্তবিকই, নারীর দেহ সুস্থ-সবল এবং সুছাঁদে গড়ে ওঠা চাই সকল দিক দিয়ে। কারণ, তার উপরেই সমাজ-দেহের সুস্থতা নির্ভর করে সবিশেষ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ও লক্ষ্যহীন। তাই বাঙলার অন্তঃপুর আজ অস্বাস্থ্যের আবহাওয়ায় ভরে উঠেছে। নারীর রূপে অকাল-জীর্ণতার রেখা, দেহে তাঁর স্বাভাবিক সুঠাম-সুছাঁদের একান্ত অভাব—বাঙলার নারী আজকাল আর "লক্ষ্মীবিম্বং অমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ" হয়ে সংসারে বিরাজিতা নন্।

এ সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যেই আমরা নিয়মিতভাবে দৈহিক স্বাস্থ্য-গঠন ও রূপচর্চ্চা প্রসঙ্গে বিবিধ তথ্য-আলোচনা করে চলেছি।

দেহের সুছাঁদ রক্ষা সম্বন্ধে অবহেলা-ঔদাসীন্য বা সচেতনতার অভাবে এবং নিয়মিত ব্যায়াম-অনুশীলন ও আহার-বিশ্রাম-নিদ্রা প্রভৃতির দিকে সযত্ন-দৃষ্টিদান না করার ফলে, আমাদের দেশের মেয়েদের অনেকেরই তলপেট মেদ-প্রাচুর্য্যে নিতম্ব অকালেই স্থূল-বিরাট ও বর্ত্তুলাকৃতি-পিণ্ডের মতোই কুৎসিত হয়ে ওঠে যে দামী শাড়ী-সেমিজে, সে দৈহিক-গলদ ঢাকা পড়ে না। এ ধরণের দৈহিক-গলদের উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে, একালের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসকেরা এবং রূপ-চর্চ্চাবিশারদের দল সচরাচর সহজ-সরল যে সব বিশেষ-ব্যায়াম পদ্ধতি অনুশীলনের সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন, আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি। এ সব ব্যায়াম-বিধি নিতান্তই সহজসাধ্য এবং ঘরোয়া-ধরণের। কাজেই ধারণা হয় যে সংসারের নানা রকম কাজকর্ম্মের অবসরে, প্রত্যহ মাত্র দশ-পনেরো মিনিটকাল নিয়মিত-ভাবে এ সব সহজ-সরল এবং 'ঘরোয়া' ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলি অভ্যাস-অনুশীলন করা, আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে খুব তেমন অসুবিধাজনক বা কঠিনসাধ্য কাজ বলে ঠেকবে না।

মেয়েদের তলপেটের গঠন সুন্দর-সুঠাম ও সুস্থ-স্বাভাবিক রাখবার উপযোগী প্রথম ব্যায়াম-ভঙ্গীটি হলো, —সমতল ঘরের মেঝে বা মজবুত খাট-পালঙ, ডিভান্ (Divan) বা তক্তাপোষের উপর বসে দেহটিকে সটান-সিধা ও খাড়াখাড়ি ভাবে রেখে সুমুখদিকে দুই পা প্রসারিত করে দিন। বসবার সময় পা দুটিকে এমনভাবে প্রসারিত করে দেবেন যেন সামনে দেয়ালের ঠেশ্ (Support) পান। এবারে এমনি ভঙ্গীতে সুমুখের দেয়ালে পায়ের ঠেশ্ দিয়ে পিঠকে সটান ও সিধা-খাড়া রেখে বসে, কান ও মাথার দুই পাশ দিয়ে হাত দুখানি উর্দ্ধে তুলে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পিছন-দিকে দেহটিকে হেলিয়ে দেবেন…যতখানি নীচে সম্ভব হয়। যেন শুয়ে পড়ছেন, এমনিভাবে দেহটিকে পিছন-দিকে হেলিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণভাবে না-শুয়ে পড়ে, যতখানি পারেন এভাবে দেহটিকে পিছন-দিকে হেলিয়ে রাখার সামান্যক্ষণ পরেই, আবার ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহটিকে ক্রমশঃ সামনের দিকে সিধা-খাড়াভাবে তুলে নিয়ে ব্যায়াম-ভঙ্গীটির প্রথম-পর্য্যায়ের বসা-অবস্থায় ফিরে আসবেন।

এমনিভাবে খাড়া-পিঠে উপবেশন, তারপর ধীরে ধীরে পিছন-দিকে দেহ হেলানো এবং পরক্ষণে আবার খাড়া-সিধাভাবে বসা—এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অভ্যাস করবেন অন্ততঃপক্ষে দশ-বারো বার। এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনে—তলপেটের গড়ন হবে সুঠাম-সুন্দর

এবং অভ্যন্তরস্থ পেশী-স্নায়ু প্রভৃতিও ক্রমেই সুস্থ-সাবলীল হয়ে উঠবে।

মেয়েদের তলপেটের সুঠাম-গড়নের উপযোগী দ্বিতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীটি হলো—ঘরের সমতল মেঝে বা মজবুত খাট-তক্তাপোষের উপর দেহটিকে আগাগোড়া সটান্ রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। এভাবে শোয়ার সময় দুই হাত দেহের দুই পাশে প্রসারিত করে রাখবেন। এবারে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের হাঁটুটিকে ঈষৎ বাঁকিয়ে-মুড়ে ক্রমশঃ বুকের উপর তুলে আনুন। তারপর জঘনদেশের উপর দেহের ভার ন্যস্ত করে এবং জঘনদেশকে স্থির-অবিচল রেখে ডান-পাখানি চক্রাকারে ঘোরান। এভাবে ঘোরানোর সময় বাঁ পাখানি যেন সমতলভূমি বা শয্যা স্পর্শ করে থাকে—এতটুকু উর্দ্ধে না ওঠে বা না নড়ে, সেদিকে নজর রাখবেন। সামান্যক্ষণ ব্যায়ামের এই বিশেষ-ভঙ্গীটি অভ্যাসের পর, ডান-পা'খানিকে ধীরে ধীরে বুকের উপর থেকে সমতল জমি বা শয্যায় নামিয়ে রেখে, পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে বাঁ-পাখানি উর্দ্ধে তুলে এই ভঙ্গীটি অভ্যাস করবেন। এমনিভাবে একবার ডান-পা উর্দ্ধে তুলে এবং পরক্ষণে বাঁ-পাখানি উর্দ্ধে তুলে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার নিত্যনিয়মিত এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলন করা চাই। তাহলে আর তলপেটের কদর্য-গঠন বা আভ্যন্তরিক অস্বাস্থ্যের বিশেষ তেমন সম্ভবনা থাকবে না।

তলপেটের সুঠাম-সৌন্দর্যের উপযোগী তৃতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের রীতি হলো—উপরোক্ত দ্বিতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অনুরূপ ধরণে সমতল মেঝে বা শয্যার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবং দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে তলপেটের দুই পাশে কোমরের সঙ্গে সেঁটে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীটির মতোই হাঁটু না মুড়ে ডান-পাখানিকে সরাসরি-ভাবে সিধা-খাড়া ও সটান্ রেখে বাঁ-দিকের কাঁধ লক্ষ্য করে পদাঘাতের ভঙ্গীতে দ্রুত-তালে উপর্য্যুপরি কয়েকবার (অন্ততঃপক্ষে পাঁচ-ছয় বার) লাথি ছুড়বেন। ডান-পা উর্দ্ধে তুলে এভাবে লাথি-ছোড়ার সময়, বাঁ-পা কিন্তু সমতল মেঝে বা শয্যায় সুপ্রসারিত-অবস্থায় থাকবে। কয়েকবার এমনিভাবে ডান-পায়ের সাহায্যে উর্দ্ধে পদাঘাত-ভঙ্গীটি অভ্যাসের পর, ধীরে ধীরে ডান-পাখানি নামিয়ে সমতল মেঝে বা শয্যার উপর ন্যস্ত করে রেখে, পূর্ব্বোক্ত-রীতিতে বাঁ-পাখানি উর্দ্ধে তুলে ডান-কাঁধ লক্ষ্য করে পদাঘাতের-ভঙ্গীটি কয়েকবার অভ্যাস করবেন। এভাবে পদাঘাত-ভঙ্গী অভ্যাসের সময়, পা যতখানি উর্দ্ধে তুলতে পারেন, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন ও সযত্নে চেষ্টা করবেন। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে, দশ মিনিটকাল নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা চাই।

তলপেটের সুঠাম-গড়নের উপযোগী চতুর্থ ব্যায়াম-ভঙ্গীটির রীতি হলো—উপরোক্ত তৃতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীরই অনুরূপ। তবে, চতুর্থ-ভঙ্গীটি অনুশীলনে তৃতীয়-ভঙ্গীর মতো তলপেটের দুই পাশে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কোমরের সঙ্গে সেঁটে রাখার আবশ্যকতা নেই। বরং তার বিপরীত—অর্থাৎ, চতুর্থ-ভঙ্গী অনুশীলনকালে হাত দুখানি মাথার দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে সুপ্রসারিত করে রাখতে হবে। পদাঘাতের ভঙ্গীটি কিন্তু অবিকল পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীরই মতো এবং অন্যান্য রীতিও তাই। তৃতীয়টির মতোই, চতুর্থ ব্যায়াম-ভঙ্গীটিও প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে দশ-মিনিটকাল নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা আবশ্যক।

স্থানাভাবের কারণে, আপাতত: তলপেটের সুঠাম-গঠনের উপযোগী অন্যান্য ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলির হদিশ দেওয়া সম্ভবপর হলো না—আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় দেবো। [ক্রমশঃ]

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যে সব

মহিলা নিজেদের হাতে সৌখিন এবং নিত্য আবশ্যকীয় নানা রকম সূচীশিল্প-সামগ্রী রচনা করেন নিত্য-নতুন হরেক ছাঁদের নক্সা-নমুনা সংগ্রহের দিকে তাঁদের বিশেষ ঝোঁক। এবারে তাই তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য, 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের উপযোগী সহজ সরল অথচ সৌখিন-সুন্দর ছাঁদের দুয়েকটি নক্সা-নমুনা প্রকাশ করা হলো।

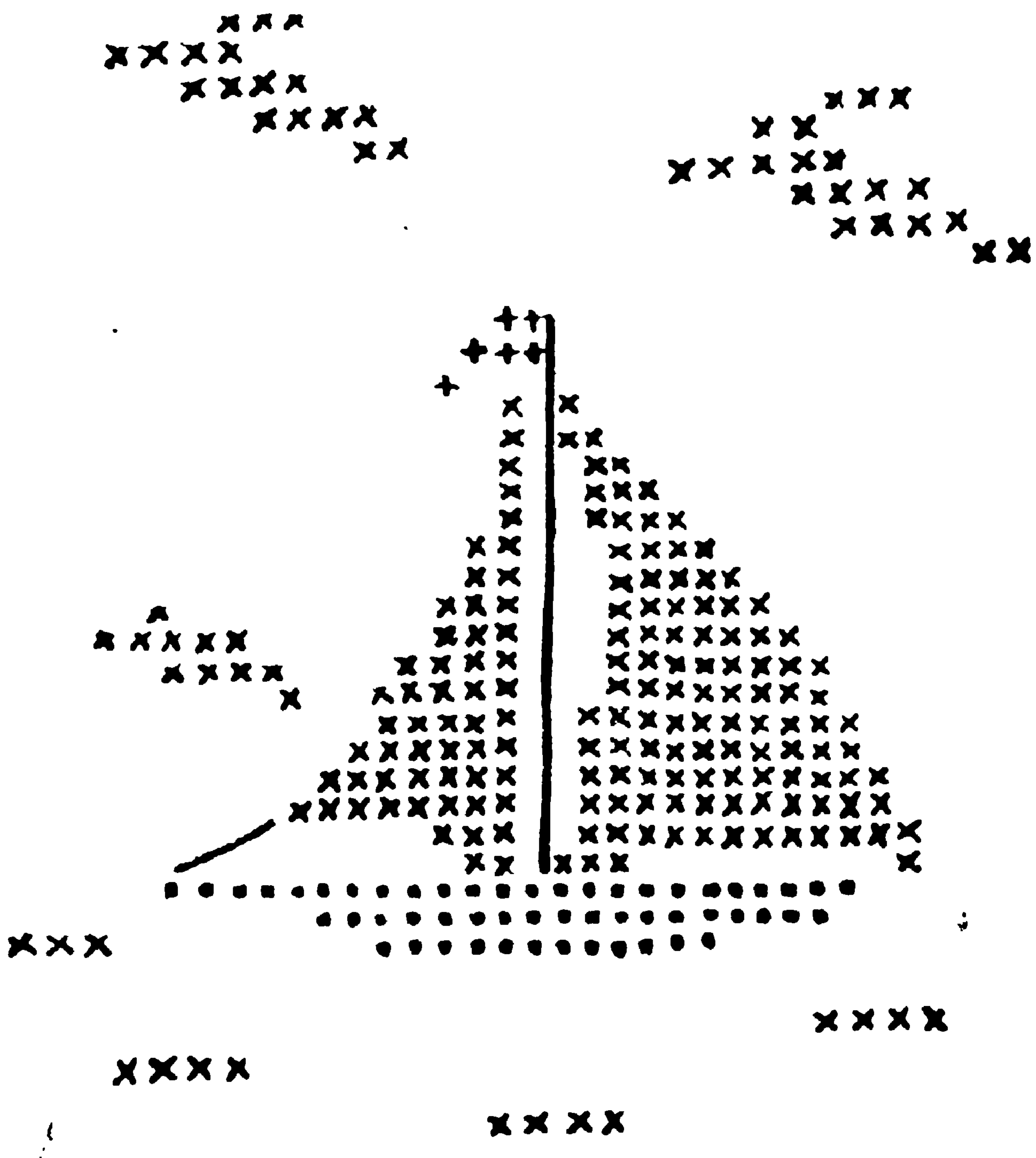

× — শাদা সুতো
• — বাদামী সুতো
+ — লাল সুতো

উপরের নক্সাটিতে খুব সহজ উপায়ে রচনা করা যায়, 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের উপযোগী এমন একটি 'পাল-তোলা বিদেশী নৌকার' নমুনা প্রতিলিপি দেখানো হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক, রম্পার, নিকার-বোকার, সান্-স্যুট, হাওয়াই-শার্ট, বিব্, রুমাল, স্কার্ফ্ প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও, এ নক্সাটিকে পর্দা, টেবিল-ক্লথ, ন্যাপ্কিন্, টেবিল-ম্যাট্, বালিশের ওয়াড়, কুশন-কভার, কাপড়ের ব্যাগ ইত্যাদি আরো নানা ধরণের ঘরোয়া সামগ্রী অলঙ্করণের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কোথায়, কিভাবে এবং কোন রঙের কাপড়ের উপর কি ধরণের রঙীন সুতোর সাহায্যে এ নক্সাটি সুন্দর-ছাঁদে রচনা করা যাবে, সে কাজটুকু অবশ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সূচীশিল্পানুরাগিণীদের ব্যক্তিগত বাসনা, প্রয়োজন ও রুচির উপর। কাজেই এ বিবেচনাটুকু তাঁদের ইচ্ছা, সুবিধা-সুযোগ আর শিল্প-দক্ষতার উপর ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। তবে মোটামুটিভাবে হদিশ দেওয়া যেতে পারে যে—নক্সার 'পশ্চাৎপট' (background) অর্থাৎ আকাশের জন্য যদি ফিকে নীল বা আশমানী (Light Blue) এবং সাগর জলের জন্য যদি ঈষৎ-গাঢ় নীল (Deeper Shade of Blue—Cobalt বা Ultramarine) রঙের সুতো ব্যবহার করা হয়, তাহলে নৌকার পাল রচনার জন্য ধবধবে শাদা বা পাতিলেবুর মতো হাল্কা হলুদ রঙের সুতো বেছে নেওয়াই মানানসই হবে। নৌকার খোল এবং পাল টাঙানোর দণ্ডটি রচনার জন্য গাঢ় বা হাল্কা বাদামী রঙের সুতো ব্যবহার করা যেতে পারে। দেয়াল-চিত্র হিসাবে নক্সাটি ব্যবহার করার জন্য ধবধবে শাদা সুতোর সাহায্যে আকাশের মেঘের টুকরোগুলি এবং সাগরের ঢেউয়ের রেখাগুলি রচনা করা চলবে।

ক্রশ্-ষ্টিচের এই নক্সাটিকে রূপায়ণের সময় সেলাইয়ের কাজের সুবিধার জন্য কাপড়ের উপর একখণ্ড 'কার্পেট' (Carpet-Cloth) সুতো দিয়ে টেকে নিয়ে নক্সার নমুনাটিকে 'ক্রশ্-ষ্টিচে' তুলে, কার্পেটের টুকরোটির টাঁকা-সেলাইটুকু খুলে ফেলে পাশের খোলা-কার্পেটের সুতোটি ধরে টানলেই কার্পেট খণ্ডটি হাতে উঠে আসবে কিন্তু কাপড়ের উপর নক্সার প্রতিলিপিটি পরিপাটি-ছাঁদে রচিত হয়ে যাবে। প্রসঙ্গক্রমে, বলে আরো রাখা যায় যে এমনি উপায়েই শুধু উপরোক্ত নক্সাটিই নয়, অন্যান্য যে কোনো নমুনারই সুস্পষ্ট পরিপাটি প্রতিলিপি রচনা করা যেতে পারে খুব সহজে এবং অনায়াসেই।

এ ধরণের 'ক্রশ্-ষ্টিচের' নক্সা রচনার পক্ষে, সাধারণতঃ খদ্দর, দোসূতী, সেলুলা বা ম্যাট্ ধরণের মোটা-বুননের সেলাইয়ের কাপড়ই বিশেষ উপযোগী হয়। আগামী সংখ্যায় 'ক্রশ্-ষ্টিচের' উপযোগী আরো কয়েকটি নতুন ধরণের নক্সা-নমুনা প্রকাশের ইচ্ছা রইলো।

* * *

বৃত্ত

—কুমারবসু

> একটি সংবাদ :
>
> 'গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।' 'যীশুখৃষ্ট পোরবন্দরে জন্মেছিলেন'। 'খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক অশোক জরথুষ্ট্র।' 'ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম ইবরাহিম লোদি।' —কয়েকজন চাকুরিপ্রার্থী একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই ধরনের উত্তর লিখেছেন। এইসব পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বোম্বাই-এর দাদরা ও নগরহাভেলির বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করবেন।

কোন একটি অফিস হতে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে একজন ক্লার্ক নেওয়া হবে। তারই ইন্টারভিউ চলেছে। প্রচুর দরখাস্ত পড়েছে। এর আগে আরও একদিন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েগেছে। এখন অবধি কেউ মনোনীত হয় নি। আজ দ্বিতীয়দিন। অনেকক্ষণ ধরেই ইন্টারভিউ চলেছে। আর জন পাঁচেক বাকী আছে। এদের হয়ে গেলেই ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ হবে।

বড়সাহেবের ঘরে ইন্টারভিউ হচ্ছে। ঘরের বাইরে ঠিক সামনের করিডরেই বসবার জন্য দুটি বেঞ্চ রয়েছে। দুটি বেঞ্চই লোকে বোঝাই। দু চারজন এদিক ওদিক ঘুরছে। কেউ সিগারেট খাচ্ছে, কেউ নোটিশ বোর্ড দেখছে। বড়সাহেবের ঘরের বাইরে দরজার এক পাশে একটি টুলে একজন বেয়ারা বসে খৈনী টিপছে। একজনের ইন্টারভিউ হয়ে গেলে ভিতরে যাচ্ছে ও নাম জেনে এসে নতুন লোককে ডেকে দিচ্ছে।

বাঁ দিকের বেঞ্চে আরও অনেকের সঙ্গে বিমল বসে আছে। বয়স বছর পঁচিশেক হতে পারে। বিমল আপনার আমার মতই একটি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। খুবই সাধারণ চেহারা। পরনে পরিষ্কার সার্ট ও ফুলপ্যান্ট। চাকরীটা বিমলের খুবই দরকার। বিমলের বাঁ দিকে বসে আছে মলয়। বছর কুড়ি বয়স। গায়ে নানারকমের ছবি আঁকা কাপড়ের একটি হাওয়াই সার্ট, পরনে সরু প্যান্ট, পায়ে চটি, অ্যামেরিকান ধরনে চুল কাটা। একটি পা বেঞ্চে তুলে বসে "ফিল্মজগৎ" নামে একটি সিনেমা পত্রিকা পড়ছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে গালের ব্রণগুলো এক আধবার খুঁটছে।

বড়সাহেবের ঘর। আধুনিক ফ্যাশান অনুযায়ী খুব ছিমছাম ভাবে সাজানো। ঘরের অপর প্রান্তে একটি বিরাট সেক্রেটেরিয়েট টেবল। টেবলের পিছনের চেয়ারে বড়সাহেব বসে রয়েছেন। বয়স হয়েছে। একটু রাসভারী হবার চেষ্টা সর্বদাই। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মুখে পাইপ। টেবিলের দুদিকে আরও দুটি চেয়ার এবং সামনের দিকেও খানতিনেক চেয়ার রয়েছে। বড়সাহেবের বাঁ দিকের চেয়ারে একজন মাঝ-বয়েসী লোক বসে রয়েছেন। এই সেকসনের বড়বাবু নিবারণ হালদার। টেবিলের ওপর তার সামনে গোটা কয়েক ফাইল খোলা অবস্থায় রয়েছে। ফাইল হতে application বেছে নিয়ে candidate -দের তিনিই প্রশ্ন করছেন। বড়সাহেব কোন কথা বলচেন না। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুপচাপ পাইপ টানছেন ও দেখছেন।

নিবারণবাবু সামনের খোলা ফাইলটির ওপরের কাগজটিতে হাতের লাল-নীল পেনসিল দিয়ে কি লিখলেন। লেখা হয়ে যাওয়ার পর সামনের চেয়ারের পিছন দিকে

দাঁড়ানো লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনার হয়ে গেছে, আপনি এবারে যেতে পারেন।

লোকটি—"আজ্ঞে!"

নিবারণ—আপনি এখন যেতে পারেন, পরে খবর পাবেন।

লোকটি—আজ্ঞে আচ্ছা, নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার করে Swing Door ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল।

লোকটি বাইরে আসবামাত্র বিমলের ডান দিক হতে শমিত বসু উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো "এই যে দাদা, হয়ে গেল আপনার? কি জিজ্ঞেস করলে?"

লোকটি রুক্ষভাবে বললে "গেলেই বুঝতে পারবেন। কিসের যে ইন্টারভিউ দিলাম তাই বুঝলাম না।" বলেই হনহন করে চলে গেল।

শমিত একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারপরে একটা ঢোঁক গিলে টাইয়ের নটটা একটু ঠিক করে বসতে বসতে বলল "যাঃ বাব্বা"। বলে বিমলের দিকে একবার তাকাল। বিমল একটু হাসল। শমিতও একটু হাসল। বিমলকে জিজ্ঞেস করল "আপনার কাছে চিরুণী আছে?"

বিমল—না তো, চিরুনী কি হবে?"

শমিত—(একটু নার্ভাসভাবে) "না, মানে—আচ্ছা, কি জিজ্ঞেস করবে বলুন তো?"

বিমল—কি করে বলব বলুন? আপনিও যেখানে আমিও সেখানে।

বিমলের বাঁ দিকে মলয়ের এসবে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। আগেকার মতই খুব মনোযোগ দিয়ে সে ফিল্ম-জগৎ পড়েছিল। হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল—"মার দিয়া, দিল কি ডাকু, মিলা সেন।"

বিমল চমকে মলয়ের দিকে তাকাল। "কি বলছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

মলয়—কি লিখেছে দেখেছেন?

বিমল—কোথায়?

মলয়—এই যে ফিল্মজগতে, লিখেছে "মিলা সেনের ঠাকুরদার বড় ভাইয়ের আপন বাবা ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেন, বুঝলেন! যা তা ব্যাপার নয়!"

বিমল—তা তো নয়ই।

মলয়—মিলা সেনের Latest খবর জানেন?

বিমল—"না তো!"

মলয়—মিলা সেন With Swaraj Kumar and Dilip Kapoor, বম্বের ১২৪ খানা হিট ছবির ডিরেকটার জালরাম শর্মা তুলছেন।

বিমল—তাই নাকি?

মলয়—হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, জালরামদা এরই মধ্যে তার দলবল নিয়ে ম্যাডাগাস্কারএ চলে গেছেন, যাবার পথে অবশ্য হনুলুলুতে ঘুরে গেছেন।

বিমল—ও তাই বুঝি?

মলয়—হ্যাঁ। জালরামদা আরও বলেছেন তার এবারকার ছবিতে ৪৯টা বিলিতি মেয়ের সুইমিং কস্টিউম পরা টুইষ্ট থাকবে। আর সবকটা মেয়েরই Figure যাকে বলে একেবারে Stremlined, (একবার ঠোঁট চাটল) ছবিটা হবে কিসে জানেন?

বিমল—না তো!

মলয়—Westmancolour ও.৭০ MMতে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার, ভাবতেই—

বেয়ারা—বিমোল বেনারজি?

বিমল উঠে দাঁড়াল। "এই যে আমার নাম" বলল সে। "অন্দর যাইয়ে" বলে বেয়ারা আবার তার টুলে বসে খৈনীতে খানিকটা চুন দিয়ে রগড়াতে লাগল।

বিমল দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপরে হঠাৎ কি মনে করে সে আবার বেঞ্চের কাছে ফিরে এল। মলয়কে বলল "কিন্তু একটা খবর আপনার ফিল্মজগৎও জানেনা বোধহয়?"

মলয়—(খুব আগ্রহভরে) কি বলুনতো?

বিমল—সান ইয়াৎ সেনের নাম শুনেছেন?

মলয়—না তো, কে তিনি?

বিমল—চীনদেশের একজন লোক ছিলেন। সেই Doctor সান ইয়াৎ সেন মিলা সেনের মামার আপন পিসেমশায় ছিলেন।

মলয়—এ্যাঁ।

বিমল বলল আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেই সটান গিয়ে Swing door ঠেলে বড়সাহেবের ঘরে ঢুকে গেল। মলয় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

বড়সাহেবের ঘর। বাঁ দিকে নিবারণবাবু মুখ নীচু করে ফাইলের ওপর অন্য একখানা কাগজ দেখছেন। হাতে পেন্‌সিল। বিমল এসে সামনের দিকে চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল।

বিমল—(দুজনকেই) নমস্কার।

নিবারণবাবু ফাইল হতে মুখ তুলে বিমলের দিকে তাকালেন। পেন্‌সিলশুদ্ধ হাতটা একটু তুললেন। বড়সাহেব ডানহাতে পাইপটি ধরে টানছিলেন, সেই অবস্থাতেই মাথাটা সামনের দিকে একটু নাড়লেন।

নিবারণ—আপনার নাম?

বিমল—শ্রীবিমল ব্যানার্জি।

নিবারণ—বাবার নাম?

বিমল—Late অমিয়মাধব ব্যানার্জি।

নিবারণবাবু ফাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনার applicationএ লিখেছেন আপনি graduate, (মুখ তুলে) certificateটা সঙ্গে এনেছেন?"

বিমল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে।" বুকপকেট হতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। ভাঁজ খুলে নিবারণবাবুর দিকে এগিয়ে ধরল। নিবারণবাবু বড়-সাহেবকে দেবার জন্যে ইশারা করলেন।

বড়সাহেব ডানহাতে পাইপ টানতে টানতে বাঁ হাত দিয়ে certificateটা নিলেন। একটু দেখলেন। মুখ হতে পাইপটা সরিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন "ঠিক আছে।" certificateটা বিমলের দিকে ঠেলে দিলেন।

বিমল certificateটা তুলে ভাঁজ করে পকেটে পুরতে লাগল। বড়সাহেব যে অবস্থায় বসেছিলেন সেই অবস্থা হতে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার নিবারণবাবুর দিকে তাকালেন। নিবারণবাবু একটু অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়লেন।

নিবারণ—আচ্ছা, আপনি এখানে এলেন কিসে?

বিমল—(একটু বিস্মিতভাবে) কেন ট্রামে!

নিবারণ—ও, যে ট্রামটায় আপনি এলেন সেটার নম্বর কত ছিল বলুন তো?

বিমল—লক্ষ্য করিনি।

নিবারণ—ট্রামে টিকিট কেটেছিলেন নিশ্চয়ই?

বিমল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিবারণ—টিকিটটার নম্বর কত ছিল?

বিমল—তা তো দেখিনি।

নিবারণ—ও, দ্যাখেননি বুঝি, আচ্ছা, বাংলা মাসের আজ কত তারিখ বলুন তো?

বিমল একটু মাথা চুলকোল।

নিবারণ—চিত্তরঞ্জনের নাম শুনেছেন?

বিমল—আজ্ঞে হ্যাঁ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

নিবারণ—না, তাঁর কথা বলিনি, বলছিলাম যে চিত্তরঞ্জন নামে একটা জায়গা আছে শুনেছেন?

বিমল—ও হ্যাঁ, Locomotive Engine তৈরী হয় যেখানে?

নিবারণ—হ্যাঁ, এই চিত্তরঞ্জনের আগে কি নাম ছিল বলুন তো?

বিমল—মিহিজাম।

নিবারণ—কলকাতা হতে বম্বের Railway Distance কত?

বিমল—ঠিক জানিনা।

নিবারণ—আচ্ছা, আপনি Cinema দ্যাখেন নিশ্চয়ই!

বিমল—আগে মাঝে মাঝে দেখতাম।

নিবারণ—অধমকুমারের বাড়িতে কত টন সিমেন্ট লেগেছে বলতে পারেন?

বিমল—আজ্ঞে, না।

নিবারণ—শকুন্তলা কার লেখা?

বিমল—কালিদাসের।

নিবারণ—তিনি আর কি লিখেছিলেন।

বিমল—কুমারসম্ভব, মেঘদূত ইত্যাদি।

নিবারণ—আচ্ছা, স্বাধীন ভারতে প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে?

বিমল—লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

নিবারণ—ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী কে?

বিমল—গুলজারীলাল নন্দ।

নিবারণ—সুভাষচন্দ্রের গুরু কে?

বিমল—রাজনৈতিক জীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

নিবারণ—নিউক্যাশল্ কি জন্যে বিখ্যাত?

বিমল—কয়লার জন্যে

নিবারণ—ইলেকট্রিসিটি কে আবিষ্কার করেন?

বিমল—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

নিবারণ—কোন পলিটিক্যাল কারণে অথবা অন্য কোন কারণে আপনি কখনও জেল খেটেছেন ?

বিমল—আজ্ঞে না।

নিবারণ—ঠিক আছে, আপনি এবারে যেতে পারেন আপনার হয়ে গেছে।

বিমল নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। বড়বাবু পকেট হতে পানের ডিবে বের করে দুটো পান মুখে পুরলেন। বড়সাহেব পাইপ টানতে গিয়ে ছাখেন সেটা নিভে গেছে। নতুন করে পাইপটা আবার ধরাতে লাগলেন। নিবারণবাবু ফাইল দেখতে দে'তে বললেন "মন্দ নয়, ছোকরার কথাবার্তা ভালই, B. A. পাশ করেছে, genaral knowledgeটাও খুব খারাপ নয়, মোটামুটী এরকম লোক হলেই আমাদের কাজ—

বড়সাহেব—চলবে না, আপনি Next fileটা খুলে শুরু—(টেলিফোনটা বেজে উঠল) আঃ জ্বালালে, (ফোনটা ধরলেন) yes, Sahib and Sons, না, না, এটা accounts নয়, Imporl section, Accountsএর নম্বর ? জানি না, আপনি Telephone directory দেখে নিন।" ফোনটা কেটে দিলেন।

বাইরে করিডরে যারা বসেছিল তারা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। শমিত ও মলয় এখন পাশাপাশি বসে। মলয় আগেকার মতই মনোযোগ দিয়ে ফিল্মজগৎ পড়ছে শমিত অলসভাবে একটা হাই তুলল। পকেট হতে একটা চারমিনার বের করে ধরাল। সিগারেটে দু একটা টান আলতোভাবে দিয়ে বলল "আর পারা যায় না। দু ঘণ্টার ওপর বসে রয়েছি।" হঠাৎ দরজার কাছ হতে বেয়ারা হাঁক দিল "মালয় দাশগুপ্তা।"

মলয় একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠল "আঃ, আর সময় পেলে না, সবে বম্বের খবরটা ধরেছি।

বেয়ারা আবার ডাকল "মালয় দাশগুপ্তা।"

মলয়—খেলে কচুপোড়া, চাকরীটা হোক আগে তারপরে তোমাকে দেখে নেব। চল যাচ্ছি।" খুব বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

নিবারণবাবু পান চিবোতে চিবোতে ফাইলের ওপরের কাগজটি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। বড়সাহেব চেয়ারে সিধে হয়ে বসে খুব গম্ভীরভাবে Telephone Directoryটা দেখছেন। মুখে পাইপ। ফিল্মজগৎ হাতে নিয়ে মলয় দাশগুপ্ত এসে সামনের চেয়ারের কাছে দাঁড়াল। মুখে বিরক্তির ছাপ। নিবারণবাবু মুখ তুলে মলয়ের দিকে তাকালেন।

নিবারণ—আপনার নাম ?

মলয়—মলয় দাশগুপ্ত।

নিবারণ—বাবার নাম ?

মলয়—বাবার নাম ? বাবার সঙ্গে কি দরকার মশাই ? ইণ্টারভিউ তো হচ্ছে আমার।"

নিবারণ—(খুব চটে গেছেন। কিন্তু শান্তভাবে বললেন) আপনাকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার উত্তর দিন।

মলয়—বটে ? উত্তর দেব! (বড়সাহেবের দিকে ঘুরে) জামাইবাবু, এ কি রকম ব্যাপার ? ইণ্টারভিউ দিতে এলে বাবার নাম জিজ্ঞেস করবে এ তো আপনি বলেন নি ?"

বড়সাহেব—(মুখ হ'তে পাইপটা নামিয়ে মলয়ের দিকে তাকিয়ে একটু চাপা গর্জন করে বললেন) Nonsence, যা জিজ্ঞেস করছেন তার উত্তর দাও।

নিবারণ—(মলয়কে) ওঃ আপনি বুঝি ? ঠিক আছে, বসুন, বসুন।"

মলয় সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। বড়সাহেব আগেকার মতই Telephone Directory দেখতে লাগলেন।

নিবারণ—আপনার Academical qualification ?

মলয়—(খুব বিরক্তভা'বে) Application-এই তো লেখা আছে।

নিবারণ—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম (ফাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন) School final পাশ করেছেন, এই বছরেই না! বাঃ বেশ—

মলয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন ?

নিবারণ—আচ্ছা, কালিদাস কে ছিলেন বলুন তো ?

মলয়—কালিদাস ? কালিদাস, কালিদাস, ও কলিদাস "এক ঝলকের" ডিরেক্টার।

নিবারণ—(বিস্মিতভাবে) "এক ঝ'কের" ডিরেক্টার ?

মলয়—হ্যাঁ, "এক ঝলক", দ্যাখেন নি? শাম্মী কাপুর ও বৈজয়ন্তীমালা!

নিবারণ—ও বুঝেছি, বুঝেছি, আচ্ছা অশোক কে ছিলেন? কি জন্য তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন?

মলয়—অশোক? নাঃ, আপনি দেখছি কোন খবরই রাখেন না। অশোককুমারকে পৃথিবীশুদ্ধ লোক চেনে আর আপনি—

নিবারণ—আচ্ছা, গ্রীনল্যাণ্ড জায়গাটা কোথায় জানেন?

মলয়—গ্রীনল্যাণ্ড? কেন ইংলণ্ডের উল্টো দিকেই তো!

নিবারণ—এঁ্যা!

মলয়—হ্যাঁ, এপারে ইংল্যাণ্ড ওপারে গ্রীনল্যাণ্ড, মাঝখানেই সুয়েজ ক্যানেল।

নিবারণ—ওঃ তা হবে। ইন্দিরা গান্ধীর নাম শুনেছেন?

মলয়—কেন শুনব না, গান্ধীজির পিসিমার কথা বলছেন তো?

নিবারণ—আপনার হয়ে গেছে আপনি যেতে পারেন।

মলয় উঠে দাঁড়াল। বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল "জামাইবাবু একটা টাকা দিন তো।"

বড়সাহেব কোন কথা না বলে টেবিলের ড্রয়ার হতে একটা টাকা বের করে মলয়কে দিলেন।

মলয়—শুক্রিয়া, খবরটা সময় মত পাঠিয়ে দেবেন। জয়হিন্দ।

শিষ দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মলয়। বড়সাহেব পকেট হতে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে শুরু করলেন।

বড়সাহেব—নিবারণবাবু

নিবারণবাবু হাত থামিয়ে বললেন "আজ্ঞে!"

বড়সাহেব—মিঠু, মানে মলয় একটু বেশী সিনেমা ত্থাখে। আমার স্ত্রীর একমাত্র ভাই কিনা—

নিবারন—আজ্ঞে তাতে কি হয়েছে? সোনার টুকরো ছেলে। ও আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, ক্লার্কের কাজ তো! খুব পারবে, আমি নিজেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।

বড়সাহেব—তাহলে Appointment letter-টা আজকেই Post—

নিবারণ—আজ্ঞে Post করে আর কি হবে? আমি টাইপ করিয়ে এখুনি আপনার হাতেই এনে দিচ্ছি।

বড়সাহেব—সেই ভাল।

নিবারণবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

---

* এই রচনার সমস্ত টীকা, ঘটনা, ও সব কিছুই সম্পূর্ণ কল্পিত। যদি কাহারও সহিত বা কোন ঘটনার সহিত বা অন্য কিছুর সহিত কোন সাদৃশ্য থাকে তাহা হইলে সম্পূর্ণ আকস্মিক বলিয়াই তাহা ধরিতে হইবে।

কুমারবসু

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব্ব

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়

বঙ্গানুবাদঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভীষ্ম উবাচ।

নিত্যোত্থিতেন বৈ রাজ্ঞা ভবিতব্যং যুধিষ্ঠির।

প্রশস্যতে ন রাজা হি নারীবোদ্যমবর্জিতঃ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! রাজাকে সর্বদা উদ্যোগশীল হতে হবে। যে রাজা উদ্যোগ পরিত্যাগ করে স্ত্রী লোকের মত কর্ম হীনভাবে বসে থাকে তার প্রশংসা কেউ করে না।

ভগবানুশনা চাহ শ্লোকমত্র বিশাম্পতে।

তদিহৈকমনা রাজন্ গদতস্তং নিবোধ মে॥ ২

প্রজানাথ! এ বিষয়ে শুক্রাচার্য এক শ্লোক বলেছেন তা বলছি। তুমি একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার নিকট থেকে সে শ্লোক শ্রবণ কর।

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।

রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥ ৩

বিলের ইঁদুরদের যেমন সাপ খেয়ে ফেলে—তেমনি অপরের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত রাজা আর বিদ্যার্থে অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ উভয়কে ধরিত্রী গ্রাস করে ফেলে।

তদেতন্নরশার্দূল হৃদি ত্বং কর্তুমর্হসি।

সংধেয়ানভিসংধৎস্ব বিরোধ্যাংশ্চ বিরোধয়॥ ৪

অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি একথা সব সময় হৃদয়ে ধারণ কর, যে সন্ধির যোগ্য তার সঙ্গে সন্ধি করবে, আর যে বিরোধের যোগ্য তার সঙ্গে বীরত্বের সহিত বিরোধ করবে।

সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য বিপরীতং য আচরেৎ।

গুরুর্বা যদি বা মিত্রং প্রতিহন্তব্য এব সঃ॥ ৫

রাজ্যের হচ্ছে সাত অঙ্গ (যথা—রাজা, মন্ত্রী, মিত্র, খাজানা, দেশ, দুর্গ, সেনা)। যে এই সাত-অঙ্গ যুক্ত রাজ্যের বিপরীত আচরণ করবে, সে গুরুই হোক, আর মিত্রই হোক, তাকে হত্যা করবে।

মরুত্তেন হি রাজ্ঞা বৈ গীতঃ শ্লোকঃ পুরাতনঃ।

রাজাধিকারে রাজেন্দ্র বৃহস্পতিমতে পুরা॥ ৬

রাজেন্দ্র! পূর্বকালে রাজা মরুত্ত এক প্রাচীন শ্লোক গান করেছিলেন,—যা থেকে বৃহস্পতির মতানুসারে রাজার অধিকার বিষয়ে আলোকপাত হয়েছে।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাশ্বতঃ॥ ৭

কার্যাকার্য জ্ঞানহীন, পাপ পথে লিপ্ত, অজ্ঞতায় পূর্ণ গুরুরও শাস্তি দিতে হবে, এই সনাতন রীতি।

বাহোঃ পুত্রেণ রাজ্ঞা চ সগরেণ চ ধীমতা।

অসমঞ্জাঃ সুতো জ্যেষ্ঠস্ত্যক্তো পৌরহিতৈষিণা॥ ৮

বাহুর পুত্র বুদ্ধিমান্ রাজা সগর পুরবাসীর হিতের জন্যে নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জাকে ত্যাগ করেছিলেন।

অসমঞ্জাঃ সরয্বাং স পৌরাণাং বালকান্ নৃপ।

ন্যমজ্জয়দতঃ পিত্রা নির্ভর্ৎস্য স বিবাসিতঃ॥ ৯

হে নৃপ! অসমঞ্জা পুরবাসীর বালকদের ধরে সরযূর জলে নিমজ্জিত করত, তাই তার পিতা তাকে ভর্ৎসনা করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

ঋষিণোদ্দালকেনাপি শ্বেতকেতুর্মহাতপাঃ।

মিথ্যা বিপ্রানুপচরন্ সংত্যক্তো দয়িতঃ সুতঃ॥ ১০

উদ্দালক ঋষি নিজের প্রিয় পুত্র মহাতপস্বী শ্বেতকেতুকে কেবল এই অপরাধে ত্যাগ করলেন যে তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কপটাচরণ করেছিলেন।

লোকরঞ্জনমেবাত্র রাজ্ঞাং ধর্মঃ সনাতনঃ।

সত্যস্য রক্ষণং চৈব ব্যবহারস্য চার্জবম্॥ ১১

অতএব শুধু লোকরঞ্জনই রাজার সনাতন ধর্ম। সত্যরক্ষা আর ব্যবহারের সরলতা রাজোচিত কর্তব্য।

ন হিংস্যাৎ পরবিত্তানি দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ।

বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ ক্ষান্তো নৃপো ন চলতে পথঃ॥ ১২

পরের ধন নষ্ট করবে না। দেয় বস্তু যথাসময়ে দান করবে। পরাক্রমী সত্যবাদী ও ক্ষমাশীল রাজা কখনও পথভ্রষ্ট হন না।

আত্মবাংশ্চ জিতক্রোধঃ শাস্ত্রার্থকৃতনিশ্চয়ঃ।
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ সততং রতঃ ॥১৩
ত্রয্যাং সংবৃত্তমন্ত্রশ্চ রাজা ভবিতুমর্হতি।
বৃজিনং চ নরেন্দ্রাণাং নান্যচ্চারক্ষণাৎপরম্ ॥১৪

যিনি মনকে জয় করেছেন, ক্রোধ জয় করেছেন, শাস্ত্রের অর্থ জেনেছেন, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে যিনি সতত রত, তিন বেদের জ্ঞান যাঁর আছে, নিজের গুপ্তমন্ত্র যিনি প্রকাশ করেন না। তিনিই রাজা হবার যোগ্য। প্রজাদের রক্ষার কাজে অবহেলার চেয়ে বড় পাপ আর রাজাদের নেই।

চাতুর্বর্ণ্যস্য ধর্মাশ্চ রক্ষিতব্যা মহীক্ষিতা।
ধর্মসংকররক্ষা চ রাজ্ঞাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১৫

রাজাকে চারবর্ণের ধর্মরক্ষা করতে হবে। ধর্মসংকরতা থেকে প্রজাদের রক্ষা করা রাজাদের সনাতন ধর্ম।

ন বিশ্বসেচ্চ নৃপতির্ন চাত্যর্থং চ বিশ্বসেৎ।
ষাড়্‌গুণ্যগুণদোষাংশ্চ নিত্যং বুদ্ধ্যাবলোকয়েৎ ॥১৬

রাজা কারো উপর বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বসনীয় ব্যক্তিদেরও খুব বিশ্বাস করবেন না। রাজনীতির ছয়গুণ ও দোষ নিজের বুদ্ধিদ্বারা সর্বদা পর্য্যালোচনা করবেন।

দ্বিট্‌ছিদ্রদর্শী নৃপতির্নিত্যমেব প্রশস্যতে।
ত্রিবর্গে বিদিতার্থশ্চ যুক্তচারোপধিশ্চ যঃ ॥১৭

শত্রুদের ছিদ্রদর্শনকারী রাজা সর্বদাই প্রশংসা পেয়ে থাকেন। যিনি ত্রিবর্গের তত্ত্ব জানেন ও শত্রুর গুপ্ত খবর জানবার জন্যে, তার মন্ত্রী প্রভৃতির ভেদ জানবার জন্যে চর নিযুক্ত করে রেখেছেন তিনিও প্রশংসার যোগ্য।

কোশস্যোপার্জনরতির্যমো বৈশ্রবণোপমঃ।
বেত্তা চ দশবর্গস্য স্থানবৃদ্ধিক্ষয়াত্মনঃ।

রাজার উচিত নিজের ভাণ্ডার সর্বদা পূর্ণ রাখা। তাঁকে ন্যায় কার্যে যমরাজের সমান, আর ধনসঞ্চয়ে কুবেরের সমান হতে হবে। তাঁকে স্থান, বৃদ্ধি, তথা ক্ষয় হেতুভূত দশ বর্গের জ্ঞান সর্বদা রাখতে হবে।

অভৃতানাং ভবেদ্ ভর্তা ভৃতানামন্ববেক্ষকঃ।
নৃপতিঃ সুমুখশ্চ স্যাৎ স্মিতপূর্বাভিভাষিতঃ ॥১৯

যাদের ভরণপোষণ করবার কেউ নেই তাদের ভরণপোষণ করবেন রাজা। যারা ভরণপোষণক্ষম তাদের তিনি দেখাশোনা করবেন, সর্বদা মুখ প্রসন্ন রাখবেন, হাসিমুখে কথা বলবেন।

উপাসিতা চ বৃদ্ধানাং জিততন্দ্রিরলোলুপঃ।
সতাং বৃত্তে স্থিতমতিঃ সংতোষ্যশ্চারুদর্শনঃ ॥২০

রাজার উচিত বৃদ্ধদের উপাসনা করা, আলস্য ও লোভকে জয় করা। সৎপুরুষের সেবায় মন রত করবেন। সন্তুষ্ট থাকবার মত স্বভাব রাখবেন—সর্বদা সুদর্শন বেশ ধারণ করে থাকবেন।

ন চাদদীত বিত্তানি সতাং হস্তাৎ কদাচন।
অসদ্ভ্যশ্চ সমাদদ্যাৎ সদ্ভ্যস্ত প্রতিপাদয়েৎ ॥২১

রাজা কখনও ভাললোকের ধন হরণ করবেন না। দুর্জনের ধন বলপূর্বক কেড়ে নেবেন, আর সাধুদিগকে ধন দান করবেন।

স্বয়ং প্রহর্তা দাতা চ বশ্যাত্মা বশ্যসাধনঃ।
কালে দাতা চ ভোক্তা চ শুদ্ধাচারস্তথৈব চ ॥২২

ক্ষেত্রে বিশেষে রাজা নিজেই প্রহার করবেন, নিজের হাতেই দান করবেন, সংযত চিত্ত হবেন, সৈন্যদের বশীভূত রাখবেন, উপযুক্ত পাত্রে দান করবেন,—উপযুক্ত সময়ে ভোগ করবেন, শুদ্ধাচারে থাকবেন।

শূরান্ ভক্তানসংহার্য্যান্ কুলে জাতানরোগিণঃ।
শিষ্টান্ শিষ্টাভিসম্বন্ধান্ মানিনোঽবমানিনঃ ॥২৩
বিদ্যাবিদো লোকবিদঃ পরলোকান্ববেক্ষকান্।
ধর্মে চ নিরতান্ সাধূনচলানচলানিব ॥২৪
সহায়ান্ সততং কুর্যাদ্রাজা ভূতিপরিষ্কৃতঃ।
তৈশ্চ তুল্যো ভবেদ্ভোগৈ শ্ছত্রমাত্রাজ্ঞয়াধিকঃ ॥২৫

যাঁরা বীর ও ভক্ত, প্রতিপক্ষ যাঁদের উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করতে পারে না, যাঁরা সৎকুলজাত, নীরোগ, শাস্ত্রানুসারী, শাস্ত্রানুচারী, পরিজনযুক্ত, যাঁরা তেজস্বী, কিন্তু পরের প্রতি আজ্ঞাশীল নন, যাঁরা বিদ্বান্ ও লোক-চরিত্রবিদ্, যাঁরা অন্যের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ, যাঁরা ধার্মিক ও সচ্চরিত্র, যাঁরা পাহাড়ের মত ধীর, স্থির, ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা তাঁদেরই ওপর নির্ভর করবেন। ভোগ বিলাস ও তাঁর তাঁদের তুল্যই হবে। কেবল রাজচ্ছত্র আর আদেশ এই দুটি মাত্র তাঁর কাছে অধিক থাকবে।

প্রত্যক্ষা চ পরোক্ষা চ বৃত্তিশ্চাস্য ভবেৎ সমা।
এবং কুর্বন্নরেন্দ্রোঽপি ন খেদমিহ বিন্দতি ॥২৬

প্রত্যক্ষেই হোক আর পরোক্ষেই হোক প্রজাদের উপর

রাজার ব্যবহার সমান হবে। এরূপ করতে থাকলে রাজা কখনও রাজ্যশাসনে কষ্ট পাবেন না।

সর্বাভিশঙ্কী নৃপতির্যশ্চ সর্বহরো ভবেৎ।

স ক্ষিপ্রমনৃজুলুঃ স্বজনেনৈব বধ্যতে ॥২৭

যে রাজা সকলের উপরই আশংকা করেন, দুষ্ট বা শিষ্ট সকলের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে ধন হরণ করেন, কপট স্বভাব ও লোভী সেই রাজাকে তাঁর আত্মীয়রাই হত্যা করে।

শুচিস্তু পৃথিবীপালো লোকচিত্তগ্রহে রতঃ।

ন পতত্যরিভিগ্রস্তঃ পতিতশ্চাবতিষ্ঠতে ॥২৮

যে রাজা নির্দোষ ব্যবহার করেন, লোকচিত্তরঞ্জনে নিযুক্ত থাকেন—সে রাজা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলেও উৎসন্ন যান না। উৎসন্ন প্রায় হলেও সকলের সহায়তা লাভ করে তিনি রক্ষা পেয়ে যান।

অক্রোধনো হ্যব্যসনী মৃদুদণ্ডো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

রাজা ভবতি ভূতানাং বিশ্বাস্যো হিমবানিব ॥২৯

অক্রোধ, ব্যসনবিহীন, কোমলদণ্ডধারী ও জিতেন্দ্রিয় রাজা হিমালয় পর্বতের ন্যায় সকল লোকের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে থাকেন।

প্রাজ্ঞস্ত্যাগগুণোপেতঃ পররন্ধ্রেষু তৎপরঃ।

সুদর্শঃ সর্ববর্ণানাং নয়াপনয়বিত্তথা ॥৩০

ক্ষিপ্রকারী জিতক্রোধঃ সুপ্রসাদো মহামনাঃ।

অরোষপ্রকৃতির্যুক্তঃ ক্রিয়াবানবিকত্থনঃ ॥৩১

আরব্ধান্যেব কার্য্যাণি সুপর্য্যবসিতানি চ।

যস্য রাজ্ঞঃ প্রদৃশ্যন্তে স রাজা রাজসত্তমঃ ॥৩২

যে রাজা বিচক্ষণ, ত্যাগী, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধানী, সৌম্যমূর্তি সমস্ত বর্ণের সুনীতিদুর্নীতিজ্ঞ, যিনি ক্ষিপ্রকারী, ক্রোধজয়ী, প্রশান্তচিত্ত, আত্মশ্লাঘা করেন না, যাঁর আরব্ধ কার্যসকল সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়, সেই রাজাই নৃপগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পুত্রা ইব পিতুর্গেহে বিষয়ে যস্য মানবাঃ।

নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৩

পুত্রেরা যেমন পিতার গৃহে নির্ভয়ে বিচরণ করে, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা সেই রকম নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অগূঢ়-বিভবা যস্য পৌরা রাষ্ট্রনিবাসিনঃ।

নয়াপনয়বেত্তারঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥৩৪

যে রাজার রাজ্যে পুরবাসী ও দেশবাসীরা আপন আপন সম্পদ লুকিয়ে রাখে না, ও সকল সুনীতি দুর্নীতির জ্ঞান রাখে, সেই রাজাই রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

স্বকর্মনিরতা যস্য জনা বিষয়বাসিনঃ।

অসঙ্ঘাতরতা দান্তাঃ পাল্যমানা যথাবিধি ॥৩৫

যে সকল রাজ্যবাসী নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকে, পরস্পর অনিষ্ট সাধনে রত না হয়, ইন্দ্রিয় বশীভূত রাখে তাদের যথাবিধি পালন করা রাজার কর্তব্য।

বশ্যা নেয়া বিধেয়াশ্চ ন চ সংঘর্ষশীলিনঃ।

বিষয়ে দানরুচয়ো নরা যস্য স পার্থিবঃ ॥ ৩৬

যে রাজার প্রজারা বশীভূত, সৎপথে চালন যোগ্য, সর্বদা রাজার আদেশের অধীন, পরস্পর বিবাদশীল নয়, ও দানপরায়ণ—সেই রাজাই রাজার মত রাজা।

ন যস্য কূটং কপটং ন মায়া ন চ মৎসরঃ।

বিষয়ে ভূমিপালস্য তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৭

যে রাজার রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে কুটিলতা, কপটতা, মিথ্যা ব্যবহার ও পরশ্রীকাতরতা নেই—সেই রাজার ধর্মই সনাতন ধর্ম বলে গণ্য হয়ে থাকে।

যঃ সৎকরোতি জ্ঞানানি যঃ পৌরহিতে রতঃ।

সতাং বর্ত্মানুগস্ত্যাগী স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥ ৩৮

যে রাজা গুণের আদর করেন, পুরবাসিগণের হিত সাধন করেন, সৎপথে চলেন, ও ত্যাগী হন, সে রাজাই রাজত্ব করবার যোগ্যতা রাখেন।

যস্য চারাশ্চ মন্ত্রাশ্চ নিত্যঞ্চৈব কৃতাকৃতাঃ।

ন জ্ঞায়ন্তে হি রিপুভিঃ স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥ ৩৯

যাঁর গুপ্তচর, মন্ত্রণা, কৃত ও অকৃত কাজগুলি বিপক্ষেরা জানতে পারে না—সেই রাজাই চিরকাল রাজত্ব করে থাকেন।

শ্লোকশ্চায়ং পুরাগীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।

আখ্যানে রামচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত ॥ ৪০

হে ভরতনন্দন! ভৃগুর পুত্র মহাত্মা শুক্র রাজার বিষয়ে রামচরিত্র উপাখ্যানে এই শ্লোকটি বলেছেন—

রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।

রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥ ৪১

প্রজারা প্রথমে রাজাকেই লাভ করে, তারপরে ভার্য্যা

তারপরে ধন। তাই রাজাই যদি না থাকে, তবে প্রজারা কি করে ভার্যা আর ধন লাভ করবে?

তদ্রাজ্যে রাজ্যকামানাং নান্যো ধর্মসনাতনঃ।
ঋতে রক্ষস্তে বিস্পষ্টাং রক্ষা লোকস্য ধারিণী ॥ ৪০

রাজ্যাভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের রাজ্য মধ্যে সুস্পষ্ট রাজ্য রক্ষা ছাড়া অন্য কোন সনাতন ধর্ম নেই। রাজশক্তিকৃত রক্ষাই প্রজা ধারণ করে।

প্রাচেতসেন মনুনা শ্লোকৌ চেমাবুদাহৃতৌ।
রাজধর্মেষু রাজেন্দ্র। তাবিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৪৪

হে রাজেন্দ্র! প্রচেতার পুত্র মনু রাজধর্ম সম্বন্ধে দুটি শ্লোক গান করেছেন।—তুমি একমন হয়ে শ্রবণ কর।

ষড়েতান্ পুরুষো জহ্যাদ্ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে।
অপ্রবক্তারমাচার্যমনধীয়ান মৃত্বিজম্ ॥ ৪৪
অরক্ষিতারং রাজানং ভার্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্ ॥ ৪৫

মানুষ যেমন সাগর মধ্যে দীর্ণ নৌকা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই ছয়টিকেও মানুষ পরিত্যাগ করবে—যথা:—অবাক্ পটু আচার্য, অবেদাধ্যায়ী পুরোহিত, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী, গ্রামকামী রাখাল, বনকামী ও নাপিত ॥

—

সে যে মোর কাছে নেই

শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আট বছরের নয়নের মণি
নাম ছিল ভবানী।
আগে ছিল বটে, এখন আর নেই,
নামটী মাত্র শুনি ॥
দেনা পাওনা, হিসাব নিকাশ
সব যে বুঝিয়ে দিয়ে।
কোন সুদূরে বিধি নির্দ্দেশে
কে যে গেল তারে নিয়ে ॥
ছোট্ট সে পিঁড়ে, চুম্‌কী ঘটিটী
ছোট্ট থালাটী তার।
কত নশ্বর এই যে জীবন
বুঝায় রে পরিষ্কার ॥
আড়াই প্যাচের সোনার তাগাটি
সোনালী বাহুতে পরি,
ছোট্ট মেয়েটি সারা বাড়ীময়
করিত যে ঘোরাঘুরি,
মনে হত যেন স্বর্গের দেবী,
আলো করিতেছে গৃহ।
সে যে আজ আর, মোর কাছে নেই
লীন হ'য়ে গেছে দেহ ॥

আড়াই প্যাচের তাগা, প'ড়ে আছে
কোথা গেল সেই বাহু।
আটগাছি চুড়ি, আছে তার পড়ি
চাঁদেরে গ্রাসিল রাহু ॥
যদিও গহনা, অচেতন ধাতু
তবুও যে কথা কয়।
বলে নশ্বর! নশ্বর!! জেনো
স্থায়ী হেথা কিছু নয় ॥
তাই বলি মন! স্মৃতি প্রতারিত
আর হ'য়ে থেকো না।
বিস্মৃতি মাঝে ডুব দিয়ে থাক
বিপথেতে যেও না ॥
ফরাসডাঙ্গার মাতুল আলয়ে
সেই গঙ্গার কূলে।
(মোর) গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা
নিয়েছে গঙ্গা তুলে ॥
ঈশ্বরের কাছে, নিবেদন করি—
অন্তর্যামী ভগবান্!
এ মায়ার বাঁধন, ছিন্ন করি—
কর মোরে ভাগ্যবান্!!

কলেজের কলরবে

শ্রীজ্ঞান

পরীক্ষার পালা এবারকার মত প্রায় সাঙ্গ হয়ে আসছে। ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা পরীক্ষায় সফল হয়েছ, তারা নব উদ্যমে নতুন পাঠের জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। যারা স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে রয়েছ, তারা উচ্চ ক্লাসে ওঠার আনন্দে উল্লসিত, উৎফুল্ল। আর যারা স্কুল ছেড়ে পেরিয়ে কলেজে পড়বার সুযোগ পাচ্ছ, তাদের আনন্দ আজ অনেক বেশী, অনেক আশায় ভরা। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে আজ তোমরা, যারা কলেজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, যে আনন্দ, আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলেজের ক্লাসে বসতে যাচ্ছ, তোমাদের সে আশা, সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক—তোমাদের আনন্দ আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হোক, তোমরা সুখী ও সফলকাম হও, এই প্রার্থনাই আমি আজ করছি। তোমাদের আনন্দে উদ্ভাসিত সরল, সুন্দর কিশোর মুখগুলি আমার চোখের সামনে এখন ভেসে উঠছে, আর মনে পড়ছে আমার নিজের কিশোর বয়সের কথা। কলেজের কলরবের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলির কথা।

স্কুলের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে কলেজের এই কলরবের ডাক আজ তোমাদের অনেকের কানেই বাজছে। অনেকেই তোমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছ কবে কলেজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এক নতুন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেবে—নতুন শিক্ষা, নতুন শিক্ষক, নতুন সখ্য, নতুন সঙ্গ—এই সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে, —তাই নয় কি? অনেকেই তোমরা আজ এই সব আশায়, আনন্দে মশগুল হয়ে আছ। কিন্তু তোমাদের আরও কিছু ভাববার আছে। তোমাদের অভিভাবকদেরও অনেক বিষয়ে তোমাদের উপদেশ দেবার, সতর্ক করে দেবার, বুঝিয়ে দেবার আছে। তোমরা এখন আর এক ভিন্ন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। অভিভাবক এবং স্কুল শিক্ষকের সতর্ক চোখের বাইরে এবার তোমরা পদক্ষেপ করতে যাচ্ছ, প্রবেশ করছ স্কুলের পরিধির চেয়ে অনেক বিস্তৃত ও ভিন্ন পরিবেশে। এখানে যেমন ভাল আছে, অনেক কিছু মন্দও আছে তেমনি। এই মন্দগুলির সম্বন্ধেই তোমাদের সতর্ক হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। তোমাদের অভিভাবকদেরও উচিত এইগুলির সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া, কি ভাবে তোমাদের চলা উচিত সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া, কোন্‌টি তোমাদের পক্ষে ভাল, আর কোন্‌টি তোমাদের ক্ষতি করবে সে বিষয়ে তোমাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। তা নইলে তোমাদের মধ্যে অনেকে, যাদের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি একটু কম, যারা মানসিক দিক দিয়ে একটু দুর্ব্বল, যারা সহজে প্রলুব্ধ হয়, যারা হৈ চৈ-এ মত্ত হতে ভালবাসে, যারা কলেজ জীবনকে আরও কঠোর অধ্যয়নের জীবন বলে মনে করে না—মনে করে একটি আড্ডাখানা বা হৈ-হুল্লোড়, খেলাধূলা ও নিম্নস্তরের রাজনীতির পীঠস্থান, তাদের বিপথে যাবার যে

যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কলেজে প্রবেশকামী এইসব তরুমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে অভিভাবকদের যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ও সতর্ক থাকা উচিত। তা না হলে ভবিষ্যতে এরা মন্দ সংসর্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এবং তাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে অভিভাবকদেরও সকল আশা, আকাঙ্ক্ষাকেও ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। সৎ সংসর্গ সব সময়ে পাওয়া যায় না, কিন্তু যারা বলিষ্ঠ মনের অধিকারী এবং সৎ উপদেশ পেয়ে এসেছে তারা যদি সংকল্পে স্থির ও সৎসাহসী হয়ে উঠে থাকে, তাহলে তারা কখনও মন্দ সংসর্গে যাবে না এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদেরও বিপথে যেতে নিবৃত্ত করবে।

এবারে তোমরা ভেবে দেখ তোমরা কোন স্তরে পড়। যদি তোমাদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তোমরা সজাগ থাক এবং অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সৎ উপদেশ অনুযায়ী চল, তাহলে তোমাদের কলেজ জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে উঠবে। আর তা না করে যদি তোমরা কলেজের কলরবের মধ্যে পড়ে প্রগলভতা প্রভৃতিতে মত্ত থাক, সস্তা রাজনীতি ও হৈ চৈ নিয়েই সময় কাটাও, তাহলে তোমাদের ছাত্র-জীবন কি সুন্দর, সুষ্ঠু হয়ে উঠবে? না তোমরা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবারবর্গের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে?

আজ তোমরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চলেছ, নতুন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করতে চলেছ, নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছ, তোমাদের সামনে আজ নতুন নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হতে চলেছে—তোমরা তার স্বাদ গ্রহণ কর, পূত করে তোল তোমাদের মনকে, মস্তিষ্ককে সেই জ্ঞানের সাগরে ডুব দিয়ে।

কলেজ জীবন জ্ঞান আহরণের জীবন বলেই ধরে নিও—কলেজের কলরবে হারিয়ে যেও না—তোমার মনকে, হারিয়ে ফেল না। সদাই সতর্ক থেক।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—সাত—

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তীকে শুধু বোকা বল্‌লেই যে তার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয় তা নয়। যদিও সে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, কিন্তু ভস্মে যেমন ঘৃত—বিদ্যার অবস্থাও প্রশান্তর পক্ষে ঠিক তেমনি হয়েছিল। সে মনে করল বরুগিরি, ঘোড়দৌড়ের বাজি এবং গোপনে জুয়াখেলা; এ সকল না থাকলে মানুষ মানুষই নয়। তার বিশ্বাস ছিল যে সে একজন বড়লোক। সুতরাং বড়লোক হ'তে হলে এ সকল ব্যসন যে নিতান্তই প্রয়োজন তা' সে মনে মনে ভেবে নিল এবং সেই ভাবে জীবনটা চালাতে আরম্ভ করল। বড়লোক প্রশান্ত—তার বন্ধুরা তার কাছে কিছু চাইলে সে "না" করবে কিরূপে? তা করলে কি বড় মানুষী চলে?

প্রশান্ত একবারও ভেবে দেখ্‌ল না যে তার জ্যেঠতুতো ভাই বিমল চক্রবর্ত্তী মাসে মাসে যে মাসোহারা দেন, তা নিয়েই তার তুষ্ট থাকা উচিত। সে ভাবল তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কাজেই সময়ে অসময়েই রাজকুমারের কাছে গিয়ে আরও কিছুটা নিয়ে আসতো। তার উৎপাতে বিরক্ত হয়ে রাজকুমার আত্মগোপন ক'রে শ্যামল চক্রবর্ত্তী নামে পরিচয় দিয়ে বঙ্গলক্ষ্মী মিলে চলে গেলেন।

ব্রণে যেমন মাছি এসে জুটে, প্রশান্তরও তেমনি বন্ধু জুটেছিল বিশু, কালু ও রঘু। প্রশান্তর সঙ্গে শ্যামপুকুর প্রাসাদে যাতায়াত ক'রতে ক'রতে তারা রেডিয়ামের খনিটার সন্ধান যেদিন পেল, সেই দিন থেকে তাদের চোখের ঘুম, পেটের ক্ষুধা পর্যান্ত দূর হল। কি করলে নির্ব্বিবাদে খনিটা হাত করা যায়, সেই দিন থেকে তিনবন্ধু তারই উপায় চিন্তা করতে সুরু করল। সৎলোক এরূপ কিছু একটা আবিষ্কার করলে পৃথিবীর উপকার হয়, কিন্তু অসতের হাতে পড়্‌লে এই আবিষ্কারের ফল হয় সর্ব্বনাশ। এদের ব্যাপারটাও তা-ই হ'য়ে উঠ্‌লো।

একবার যে বড়লোক বনেছে সে কি আর গরীবানা ভাবে চল্‌তে পারে! প্রশান্তও তা পারল না। সেই ঘোড়দৌড়, সেই জুয়া, সেই থিয়েটার-সিনেমা, সেই সব আগেকার মতই চল্‌তে লাগল। বন্ধু বিশু অভাবের সময় টাকা এনে দিত বটে, কিন্তু ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আদায় ক'রে নেবার ফিকির খুঁজতে লাগলো। ঋণ আগুনের মত, ধরে উঠ্‌লে সহজে যায় না। বিশুর কাছে প্রশান্তর ঋণ দিনের পর দিন বেড়ে

উঠ্‌তে লাগল। বিশু একদিন হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে টাকার জন্ম কড়া তাগাদা সুরু করল।

বড়লোকী নেশায় মশগুল প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী ভাবল—'কি, এত বড় অপমান! আজই টাকা শোধ ক'রে দেব।' কিন্তু টাকা তো নাই! প্রশান্ত তার দ্বিতীয় বন্ধু কালুর কাছে হাত পাতল। কালু প্রশান্তকে টাকা দিল বটে, কিন্তু জানিয়ে দিল যে তেজারতিতে বিশু তার অংশীদার। কথাটা শুনেই প্রশান্তর মাথা ঘুরে গেল।

"তবে উপায়?" তৃতীয় বন্ধু রঘুর হাত ধরে প্রশান্ত বলল—"তবে উপায়?"

রঘু বলল—"ভাবনা কি? যেখানে মুস্কিল সেইখানেই আসান। ভয় কি? রাজকুমার নিজের নাম ভাঁড়িয়ে নূতন নামে বঙ্গলক্ষ্মী মিলে ভর্তি হ'য়েছেন, তাকি জানো না?"

"জানি বৈ কি। তা'তে আমার লাভ?"

রঘু বললল—"বল কি? খুব লাভ। তুমি যদি রাজি থাকো তা হলে বিমল চক্রবর্ত্তীর নাম, উপাধি, সম্পত্তি এখনই যে তোমার হ'তে পারে।"

প্রশান্ত হাতে স্বর্গ পেল। রঘুর পরামর্শে সে শ্যামপুকুরের রাজকুমার সাজতে সে কথাতেই রাজি হ'য়ে গেল, বিশু ও কালু তখন বিনা আপত্তিতে প্রশান্তকে টাকা ধার দিতে আরম্ভ ক'রল। তারা স্থির করল যে, যে কোন রকমে প্রশান্তর নামে একখানা দানপত্রে বিমল চক্রবর্ত্তীর সই আদায় করতে পারলেই হয়। তারপর আর একখানায় প্রশান্তর সই। তখন প্রশান্তকে সরাতে আর কতক্ষণ? ঠিক এমনি সময়ে বিশু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার ক'রে ফেলল যে বাউলীর মধ্যে রেডিয়াম আছে। তখন বিমল চক্রবর্ত্তীর সইটা এবং প্রশান্তকে পৃথিবীর খাতা থেকে মুছে ফেলা বড় বেশী দরকার হয়ে প'ড়ল।

কালু বলল—"ভায়া, তবে আর বিলম্ব কি?"

একটু গম্ভীর হয়ে বিশু বলল—"রাজকুমার যদি সহজে রাজি না হন।"

চড়াগলায় রঘু বলল—"সহজে না হন, বলে তো হবেন। বাউলীটা আছে কেন? একবার সেই খাঁচায় পুরলে হাড়-মাংসের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না।"

"ঠিক বলেছ রঘু।" টেবিলের উপর একটা ঘুঁসি মেরে বিশু বল—"ঠিক বলেছ। আগে রাজকুমার, তারপর প্রশান্ত।"

কালু ব'ল্‌ল—"এতক্ষণে দেখ্‌ছি বিশুর মাথায় বুদ্ধি গজিয়েছে।"

উত্তেজিত হয়ে বিশু বল—"তবে কালই।"

কালু বলল—"নিশ্চয়। মিলে ঢোকার আগেই কাজ শেষ ক'রতে হবে। কাল খেলার মাঠ থেকেই রাজকুমারকে নিয়ে আস্‌তে হবে। তবে প্রশান্তর একখানা চিঠি চাই।"

রঘু বলল—"সে ভার আমার উপর রইল।'

পরদিন খেলার মাঠে গিয়ে তারা স্থির করল যে, খেলা শেষ হলেই প্রশান্তর চিঠিখানা শ্যামল ওরফে বিমলকে দিবে এবং তাকে মোটরে তুলে সঙ্গে ক'রে আনবে। একটু অপেক্ষা করতেই বিশু দেখ্‌ল যে একজন টেলিগ্রাম পিওন শ্যামল চক্রবর্ত্তীর একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে ঘুরছে। কি উপায়ে টেলিগ্রামখানা তাকে দেওয়া যায় সেই কথাই পিওনটি বিশুকে জিজ্ঞাসা ক'রল।

বিশুর হঠাৎ মনে হল যে টেলিগ্রামখানায় কি আছে একবার দেখ্‌লে মন্দ হয় না। সে পিওনটাকে বলল—ওখানা আমায় দিয়ে যাও। আমি হচ্ছি শক্তিসংঘের সেক্রেটারী। এখন তো মাঠে যাওয়া যাবে না—খেলা শেষ হতেই টেলিগ্রামখানা শ্যামলকে দেবো'খন।" বিশু সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে পিওনকে বক্‌শিশ দিতেও ভুল করল না।

টেলিগ্রাম পিওন সেলাম ক'রে চলে যাওয়া মাত্র বিশু টেলিগ্রামখানা পড়্‌ল। সর্ব্বনাশ! এ যে ঘোর দুঃসংবাদ! রাজকুমারের ছোট ভাই অমল চক্রবর্ত্তী শীঘ্রই শ্যামপুকুরে আস্‌ছেন। অমল জানিয়েছেন 'শীঘ্রই আসছেন।' "শীঘ্র" মানে কী—বিশু মনে মনে ভাবল—শীঘ্র মানে আজও হতে পারে—কালও হতে পারে—আবার দু'দিন দেরীও হ'তে পারে। কিন্তু যদি আজই হয়!

খেলার শেষ পর্য্যন্ত বিশু আর অপেক্ষা করতে পারল না। তখনই প্রশান্তর চিঠিখানা শ্যামলের অর্থাৎ রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তীর কাছে পাঠিয়ে দিল। তার পরের ঘটনার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

নৃপেন ও দেবেশকে বাউলির মধ্যে বন্ধ করে

বিশু ও রঘু একটু নিশ্চিন্ত হ'ল বটে, কিন্তু পণ ক'রল যে যেরূপেই হোক, সেই রাত্রেই সকল কাজ শেষ করতে হবে—নতুবা এই বিপুল ধন ভাণ্ডার তাদের হাত থেকে খসে পড়্‌তে পারে।

নৃপেন ও দেবেশ যখন যমের দণ্ডটা ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছিল, প্রাসাদের নীচতলার একটি কক্ষে তখন বিশু, কালু, রঘু ও প্রশান্তর কথা হচ্ছিল। দৃঢ়স্বরে বিশু বলল—

"ও সব আমরা শুনতে চাইনে। তুমি এই কাগজ খানায় সই দেবে কিনা বল। তোমার বাজে কথা শুনে শুনে আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি।"

প্রশান্ত তার ভীতিপাণ্ডুর বিমর্ষ মুখখানা তুলে ধীরে ধীরে বলল "তোমরা যে কি চাও তা'ও বুঝতে পারিনে; আর বিমল যে কোথায় তা-ও জানিনে।"

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিকট মুখভঙ্গী ক'রে কালু বলল নিজের চরকায় তেল দাও—বিমলের খবরে আর কাজ নেই। লেখ, লেখ বিমল চক্রবর্ত্তী। আমরা আর দেরী করতে পারিনে। যদি না লেখ জানত তোমায় জেলে পাঠাবার সব অস্ত্র শানিয়ে রেখেছি। বিমলের কাছে লেখা তোমার সেদিনের সেই চিঠি থেকে আর সবই—।"

বিশু পিশাচের মত হেসে বলল—"আর কেন যাদু! লিখে ফেল, লিখে ফেল। নইলে জানতো সেই মণিকোঠাটা আমরা খুলে দেখে এসেছি। দু'টোর একটা আমরা এখনই চাই। হয় এই কাগজখানায় বিমল চক্রবর্ত্তীর নাম—না হয় সেই মণিকোঠায় শিকল পায়ে তোমার বাস।"

প্রশান্তর পাণ্ডুবর্ণ মুখ একেবারে সাদা হয়ে উঠল। তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। সে কাতরস্বরে বলে উঠলো—

"দোহাই তোমাদের—মণিকোঠায় কাজ নেই। এই আমি এখনই লিখে দিচ্ছি।"

প্রশান্ত কলমে কালি নিয়ে যেই লিখতে যাবে, অমনি পিছনের জানালার কাঁচ ঝন ঝন ক'রে ভেঙ্গে পড়ল। সকলে সভয়ে চেয়ে দেখল জানালার ভিতর দিয়ে দুইটী রিভলবারের নল দেখা যাচ্ছে। পরমুহূর্ত্তেই নৃপেনের গম্ভীরস্বর শোনা গেল।

"হাত তোলা—চারজনেই হাত তোলো, নৈলে এখনই গুলি করবো।"

নৃপেনের কণ্ঠস্বরে এমনই একটা দৃঢ়তা সূচিত হ'ল যে প্রশান্ত ও তার তিনটি বন্ধু মাথার উপর হাত তুলে বসে রইল। কেউ আর নড়া চড়া করতে সাহসী হল না।

রিভলভার ধরে রেখে নৃপেন দেবেশকে সঙ্গে নিয়ে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং প্রশান্তকে লক্ষ্য করে বললেন "যুবক, তুমি হাত নামাতে পারো আমরা তোমাকে চাইনে,—তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি।"

দেবেশ দেখে যে নৃপেনের কথা শুনে প্রশান্তর চোখে সহসা আশার আলো ফুটে উঠেই আবার নিভে গেল।

গম্ভীরস্বরে নৃপেন বল্লেন "যুবক তুমি জানো না যে তোমার প্রাসাদের কাছে একজন সম্রাটের সাম্রাজ্য পড়ে আছে। তোমার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বসেছ। যদি সত্যিই হস্তান্তর কর তাহলে জেনো যে রাজার রাজ্য হারাচ্ছ।

বিশুদের দিকে ফিরে নৃপেন বল্লেন "মশাই, আপনারা এখন এখান থেকে যেতে পারেন। দেরী করবেন না,—তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন। ভালো কথায় যাবেন না আপনাদের যা যোগ্য তেমনি ফুল-জল দিতে হবে?

কালু আর রঘু ব্যাপার বুঝে চোখ মিট মিট করতে লাগল। ভাবল কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু বিশু সে জাতের লোক নয়, শক্ত ধাঁচে গড়া। সে সাহস করে বলল "না এখন আমরা যেতে পারিনে। এখানে আমরা চার বন্ধুতে বসে নিজেদের বিষয় সম্পর্কে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলেম। যদি কাউকে বেরিয়ে যেতে হয় সে আমাদের নয় তোমাদেরই যেতে হবে। পিস্তলের ভয় কি দেখাচ্ছ! আহাম্মক কোথাকার! ও খেলনাটা তোমার জামার পকেটেই সাজে ভালো। যদি গুলি ছুঁড়তে চাও ছুড়তে পার। তোমার গুলিতে নির্দ্দোষ লোকেরই প্রাণ যাবে। মনে রেখো যে ফাঁসীর দড়িটা তারপর তোমার গলাতেই ঝুলবে।

বিশুর কথা শুনে নৃপেনের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। পূর্ব্ববৎ পিস্তল ধরে তিনি বললেন -"কিছুক্ষণ আগেই যে সামান্য ঘটনা ঘটেছে; ভেবেছিলাম সে কথা আর তুলবো

না, কিন্তু তোমার দম্ভ আমাকে বাধ্য করছে সে কথা তুলতে। তুমি কিছুক্ষণ আগেই একটা নরহত্যা করবার চেষ্টা করছিলে,—সেই জন্য তোমাকে আমি পুলিশে দেব।

বিশু ব্যঙ্গের সুরে বলল "তুমি এসব বলছ কি? ভেবেছ কি এটা পাগলা গারদ? আর তা নইলে নিশ্চয়ই আজ তোমার নেশার মাত্রা একটু বেশী হয়েছে হয় পাগল, না হয় মাতাল ছাড়া এমন কথা তো কেউ বলতে পারবে না। কে তোমাদের খুন করবার চেষ্টা করেছে?"

এতবড় মিথ্যাকথা শুনে দেবেশ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বজ্রনাদী কণ্ঠে সে বলল—কে হত্যা করতে চেয়েছিল? তুমি —তুমি—আর তোমার ঐ বন্ধু রঘু। এরই মধ্যে ভুলে গেলে যে তোমরা বাউলীর মধ্যে আমাদের আটক করেছিলে!"

দেবেশের কথা শুনে বিশু এমন ভাব দেখাল যে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার সুন্দর অভিনয় কৌশল দেখে দেবেশ একেবারে বোবা হয়ে গেল। এতটুকু বিব্রত না হ'য়ে বিশু বলল—"অবাক ক'রলে দেখ্‌ছি। কে তোমাদের বাউলির মধ্যে আটকে রেখেছিল? আমরা? তোমরা যদি অনুমতি না নিয়ে সেখানে গিয়ে থাক, তবে তারজন্য তোমরাই দায়ী। এখনি গিয়েদেখ্‌ছি,যদি বাউলির কোন রকম ক্ষতি ক'রে থাক, তবে অনধিকার প্রবেশের দায়ে তোমাদের পুলিশে যেতে হবে। আমি ত এই জানি যে বিকেল থেকে এ পর্য্যন্ত আমরা এখান থেকে এক পা-ও নড়িনি।"

নৃপেন বল্লেন—"খুব হয়েছে! এখন ওই খোলা জানালাটা দিয়ে ভালমানুষের মত সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে বেড়িয়ে যাও। এ বাড়ির ত্রি-সীমানায় থাক্‌তে পারবে না। ওঠো—যাও।"

বিশু তখন বেগতিক দেখে তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশান্তকে বলল—"চক্রবর্ত্তী, ওরা কি আর সত্যিই গুলি চালাবে—তা নয়। তুমি না হয় একবার সত্যি কথাটা বলেই ফেল না। তুমি যে নিজেরই সুবিধার জন্য কাগজখানায় সই করছিলে সে কথাটা তো ঠিক। সেই কথাটা বল্‌লেই তো সব গোল চুকে যায়।"

নৃপেন বিশুর এই চালাকী বুঝতে পেরে তার চোখে চোখ রেখে বললেন—"বেশত, রাজকুমারের যদি কিছু বলবার থাকে, তিনি বলুন না।"

প্রশান্ত জড়িত স্বরে বলল—"হাঁ—তা—আমি যে সই করছিলাম, ওতে আমার নিজেরই সুবিধাটা অনেক। আর তা ছাড়া সত্যি সত্যি আমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়নি নৃপেনবাবু।"

নৃপেন এ কথায় একেবারে বোবা বনে গেলেন। তিনি বুঝ্‌তেই পারলেন না যে ভিতরের কাণ্ডটা কি। তাঁর শুধু এই কথাই মনে হ'তে লাগল যে এই যুবক যদি সত্যিই রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী হয়, তবে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণে শয়তানদের জালে এমন ভাবে জড়িয়েছে যে মুক্তি পর্য্যন্ত চায় না—নইলে বিনা আপত্তিতে অতবড় একটা ধন-ভাণ্ডার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে! নৃপেনের মন বল্‌ল—অসম্ভব—এটা একেবারেই অসম্ভব। নিশ্চয়ই এই যুবক রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী নন। হয় ত এ সেই প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী—রাজকুমারের খুড়তুতো ভাই।

নৃপেন তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি সত্যিই রাজকুমার? আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন যে আপনি প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী নন?

প্রশান্ত অকম্পিত স্বরে বলল—"নিশ্চয়—নিশ্চয়—এখনি শপথ ক'রতে পারি। আর অতটাই বা করতে হবে কেন? ওই যে দেওয়ালের গায়ে দু'খানা ছবি ঝুলছে—একবার সেদিকে চেয়ে দেখুন না। তা হ'লেই আর এতটুকু সন্দেহ-ও থাকবে না।"

প্রশান্তের কথা মত নৃপেন তাকিয়ে দেখ্‌লেন দেওয়ালের গায়ে দু'খানা ফটো ঝুল্‌ছে—তারই একখানার নীচে লেখা আছে বিমল চক্রবর্ত্তী। তিনি যাকে প্রশান্ত মনে করছেন তার চেহারার সঙ্গে ছবির কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! কে বল্‌বে যে কোথাও এতটুকু পার্থক্য আছে! দ্বিতীয় ছবিখানির দিকে তাকিয়ে নৃপেন দেখলেন তার নীচে লেখা আছে—প্রশান্ত। সে ছবির সঙ্গে জীবন্ত প্রশান্তের চেহারার একটুও মিল নেই।

নৃপেনবাবু হাতের পিস্তল নামিয়ে নম্রস্বরে বললেন—"আর আমায় কিছু বলবার নেই। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি যুবক। এ স্থানের মালিক তুমি। তোমার নিজের সম্পত্তির—তুমি যা খুশী ক'রতে পারো। তবুও শেষ বার

বলি যে, তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী। কোন দলিলে সই করবার আগে একবার বিশেষ ক'রে আমার কথাটা ভেবে দেখো। যদি সম্ভব হয়, একজন ভালো উকিলকে বরং জিজ্ঞাসা ক'রো।"

ইঙ্গিত করা মাত্র দেবেশ খোলা জানালা দিয়ে বাহিরে চলে এলো। পরক্ষণেই নৃপেনও তার পিছনে পিছনে ঘরের বাইরে এসে অন্ধকারে মিশে গেলেন। যেতে যেতে শুনলেন বিশু উচ্চৈঃস্বরে জয়ের হাসি হাস্‌ছে! তার হো—হো—হো—শব্দ নৃপেনের কানে তপ্ত সীসার মত বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো। [ক্রমশঃ]

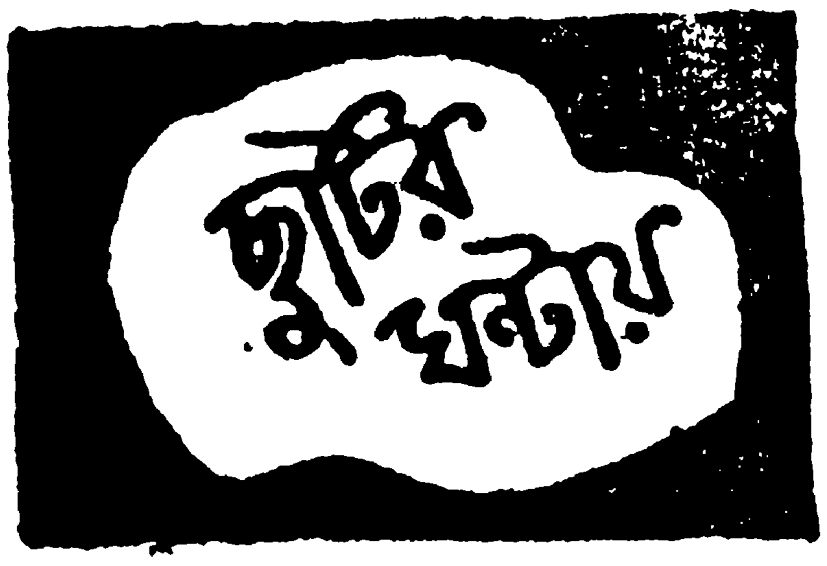

চিত্রগুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এবারে তোমাদের নতুন ধরণের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা বলছি। এ খেলাটির নাম—"ভৌতিক-রোশ্‌নির ভেল্‌কী।" খেলার নামটি অদ্ভুত-ধরণের, আসল-কারসাজিও তেমনি অভিনব-কৌতূহলোদ্দীপক। তবে এ কারসাজি দর্শক-সমাজে দেখানো সম্ভব শুধু বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে। কি উপায়ে আজব মজার এই'ভৌতিক রোশ্‌নীর ভেল্‌কী' দেখিয়ে ছুটির আসরে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের তাক্‌ লাগিয়ে দিতে পারো, আপাততঃ তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

খেলার কলা-কৌশলের কথা বলবার আগে, এ কারসাজি দেখানোর জন্য টুক্‌টাকি যে সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করা দরকার, তার একটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, দর্শকদের আসরে নিখুঁতভাবে এ খেলা দেখাতে হলে, চাই—এক ঠোঙা সাধারণ নুনের গুঁড়ো (Grains of common Salt), এক শিশি স্পিরিট বা অ্যাল্‌কোহল (Spirit of wine or Alchohol), প্লাটিনাম, ষ্টেন্‌লেস্‌-ষ্টীল (Platinum or Stainleas Steel) বা ঐ ধরণের কোনো ধাতুনির্ম্মিত একটি বাটি (Metalic Cup), একটি স্পিরিট-ল্যাম্প (a Sprit-Lamp), এক টুক্‌রো তারের জাল (a piece of Wire-net frame), ল্যাম্পের পাশে ঢাকা দেবার উপযোগী খান-চারেক টিনের পাত (a few pieces of Galyanized-Tin Sheets for inclosing the glowing lamp during the experiment), তারের জাল দিয়ে বানানো একটি চালুনী এবং এক বাক্স দেশলাই।

ফর্দ্দমতো সাজসরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, খেলা দেখানোর আসর হিসাবে বেছে নাও এমন একটি ঘর—যেখানে সচরাচর দিনের কড়া রোদ বা প্রচুর আলো প্রবেশ করে না, এবং দরজা-জানালা বেশী না-থাকার দরুণ বেশ খানিকটা আবছা-অন্ধকারভাব বজায় আছে। কারণ আলোর প্রাচুর্য্যের আবহাওয়ায় আজব এই কারসাজির মজা তেমন খুব জমজমাট হয়ে ওঠার সুযোগ মেলে না··· বরং খেলার আসরটি যত বেশী অন্ধকার থাকে, 'ভৌতিক-রোশ্‌নির ভেল্‌কীও' ততখানি উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তাই আলোকোজ্জ্বল-আসরের চেয়ে আবছা-অন্ধকার ঘরেই দর্শকদের সামনে এ কারসাজি দেখানো যুক্তিযুক্ত। তা ছাড়া এ খেলা দেখানোর সময় আরো একটি বিষয়ে নজর রাখা একান্ত দরকার······কেবল মাত্র আবছা-অন্ধকার ঘর বেছে নিলেই চলবে না, কারসাজি দেখানোর আগেই সে ঘরের দরজা-জানালাগুলিকেও আগাগোড়া ভালোভাবে ভেজিয়ে বন্ধ করে কিম্বা পর্দ্দায় ঢেকে নিতে হবে—যেন বাইরের আলোর কণামাত্রও না সেখানে সেধুতে পারে কোনক্রমে।

যাই হোক, উদ্যোগ-পর্ব্বের এ সব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সেরে নিয়ে, খেলার আসরে দর্শকদের সামনে হাজির হয়ে, প্রথমেই ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে খানিকটা স্পিরিট বা অ্যাল্‌কোহল ঢেলে, তার সঙ্গে মিশিয়ে দাও দু'এক মুঠো সাধারণ নুনের গুঁড়ো। তারপর সযত্নে-সাবধানে দেশলাই-কাটির সাহায্যে স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে জ্বালিয়ে, সেই জ্বলন্ত ল্যাম্পের অগ্নিশিখার উপর তারের জালের টুক্‌রোটিকে বসিয়ে রেখে ল্যাম্পের চারপাশে এমনভাবে সাজিয়ে দাও

টিনের পাতগুলিকে—যেন জ্বলন্ত-ল্যাম্পের আলো-ছটার কণামাত্রও সে আবরণী-প্রাচীর ভেদ করে আবছা-অন্ধকার ঘরের কোথাও না ছড়িয়ে পড়ে এতটুকু।

এ কাজটুকু সারা হবার পর, এবারে ঐ জ্বলন্ত-ল্যাম্পের আঁচের উপর নুনের গুঁড়ো মেশানো অ্যাল্‌কোহলের পাত্র-টিকে বসিয়ে 'রাসায়নিক-মিশ্রণটুকু' গরম করো। আগুনের আঁচে কিছুক্ষণ এভাবে রেখে 'মিশ্রণটুকু' উত্তপ্ত করে নেবার ফলে, অচিরেই দেখবে ধাতুনির্মিত-পাত্রের ভিতর থেকে অদ্ভুত-ধরণের হলুদ-রঙের আভায় উজ্জ্বল অভিনব রহস্যময় এক 'ভৌতিক রোশ্‌নির' ছটায় সারা অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠেছে এবং সে আলোর বিচিত্র-আভায় ঘরের ভিতরকার যাবতীয় সামগ্রী···আসবাবপত্র, পর্দা, কুশন, ছবি, ছাদ-দেওয়াল, এমন কি লোকজনের চেহারা, দেহের-বর্ণ, পোষাক-পরিচ্ছদ···সব কিছুই কেমন যেন উদ্ভট-অপার্থিব পাংশে-ধরণের দেখাচ্ছে! আসরে দর্শকদের পরণে লাল-নীল-সবুজ-বেগুনী রঙের পোষাক-পরিচ্ছেদ বাহারী-ছিটের তৈরী কার্পেট, পর্দা, চাদর, টেবিল ক্লথ, সবই ঐ আজব-মজার 'ভৌতিক-আলোর' পাংশে-হলুদ রঙের বিচিত্র রোশ্‌নির আভায় আগাগোড়া অদ্ভুত আর কেমন যেন একটা ছম্‌ছমে-ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।—একালের উন্নত-আধুনিক বড়-বড় সহরের পথে-ঘাটে সচরাচর হলুদ-রঙের আলোর রোশ্‌নিওয়ালা 'মার্কারি-ভেপার ল্যাম্পের' (Mercury-Vapour Lamps) আভায় আশেপাশের দৃশ্যাবলী যেমন অদ্ভুত-পাংশে দেখায়, অনেকটা ঠিক তেমনি-ধরণের।

দর্শকদের আসরে 'ভৌতিক-রোশ্‌নির' এই আজব-ভেল্‌কীর মজা আরো বেশী জমজমাট করে তোলার আরেকটি সহজ উপায় আছে। সেটি হলো—'ভৌতিক-রোশ্‌নির' আধার-পাত্র এবং জ্বলন্ত স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে সযত্নে-সাবধানে খেলার আসরের একপ্রান্তে সরিয়ে রেখে, অপরপ্রান্তে, সাধারণতঃ যে শাদা-আলো (Ordinary White Light) ব্যবহার করা হয়, তেমনি-ধরণের একটা টেবিল্‌-ল্যাম্প জেলে দাও। তাহলেই দেখবে—আসরে দর্শকদের দেহের একদিকে পাংশে-হলুদ রঙের ঐ অ-সাধারণ 'ভৌতিক রোশ্‌নি' এবং অপর দিকে সদ্য-সাজানো টেবিল-ল্যাম্পের শাদা-আলোর সাধারণ-আভা··

এ দুটি আলাদা-আভায় শুধু আসরের লোকজনের চেহারা নয়, তাঁদের রঙীণ পোষাক-পরিচ্ছেদ আর ঘরের যাবতীয় সামগ্রী সব কিছুই যেন নিমেষেই কোন রহস্যময় যাদু-মন্ত্রে অভিনব-অদ্ভুত বিচিত্র এক 'আধো-ভৌতিক' ও 'আধো-বাস্তব' রূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। অর্থাৎ, যে অংশে হলুদ-রোশ্‌নি পড়েছে, সেটুকু দেখাচ্ছে পাংশে আর ভয়ঙ্কর··· এবং যে অংশে পড়েছে সাধারণ শাদা-আলোর আভা, সে সব অংশ আবার দেখাচ্ছে সম্পূর্ণ-স্বাভাবিক ও বাস্তব ধরণের—যেন একই অঙ্গে 'হর-গৌরী' বা 'অর্দ্ধনারীশ্বর' ভাব!

এ কারসাজিটুকুও আরো বেশী মজাদার করে তোলা যায় দর্শকদের আসরে, যদি কশরৎ-দেখানোর সময় শাদা-আলোর সামনে তারের জাল দিয়ে বানানো চালুনীটিকে খাড়াখাড়িভাবে হাতে ধরে রাখো। শাদা-আলোর সুমুখে চালুনীটিকে এভাব ধরে রাখার ফলে, আসরে দর্শকদের দেহের, পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং ঘরের অন্যান্য সামগ্রীর যে সব অংশে তারের জালের চালুনীর ফোকরের ভিতর দিয়ে শাদা-আলোর আভা পড়ছে, সেখানে আলো-ছায়ার বিচিত্র লীলায় অচিরেই আরো অভিনব-অদ্ভুত এক রহস্যময়-রূপ সৃষ্টি করে তুলবে।

রাসয়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে আজব-মজার 'ভৌতিক রোশ্‌নির ভেল্‌কী' দেখানোর এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি মজার খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

ধাঁধা ও হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১। মজার হেঁয়ালী ঃ

তিন আখরে নাম—
গাহে কীর্ত্তি-গুণ মান,

উল্টাইলে, নৃত্য-তালে
মুগ্ধ করে প্রাণ !

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

	২৫	
২৫	২৫	২৫
	২৫	

উপরের নক্সাচিত্রের মতো পাঁচটি ঘরে বিভক্ত একটা আস্তাবলের প্রত্যেকটি ঘরে ২৫টি করে ঘোড়া থাকে। মোট ঘোড়ার সংখ্যা ১২৫। পাশাপাশি (Horizontal) অথবা খাড়াখাড়িভাবে (Vertical) একই সারিতে তিনটি ঘরের মোট ঘোড়ার সংখ্যা ৭৫। ধরো—যদি মোট ঘোড়ার সংখ্যা ১২৫ না হয়ে, মাত্র ১০০ হয়, তাহলে কি উপায়ে আস্তাবলের ঐ পাঁচটি ঘরে ঘোড়া সাজানো যাবে, যাতে পাশাপাশি অথবা খাড়াখাড়িভাবে একই সারির তিনটি ঘরের ঘোড়ার মোট সংখ্যা ৭৫ হয়।

রচনা : অমলকুমার সাহু,
বিভা দাশগুপ্ত ও সেজদি
(ঝাড়গ্রাম)

গত মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :

১। নদীর মুখ বা মোহনা

২। চাঁদ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : গত বৈশাখ সংখ্যায় ২নং ধাঁধার উত্তরটি দৈবাৎ ভুল প্রকাশিত হইয়াছে। সেটির সঠিক উত্তর হইবে—

ভ্রমরের সংখ্যা—৪

পদ্মফুলের সংখ্যা—৩

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

নমিতা, সুবোধ, শীতল, চন্দনা, কুসুম ও ছোট্টু বসুমল্লিক (দুর্গাপুর), অমিত, অধীশ ও কবি হালদার (লক্ষ্ণৌ), কুমুদ, পরেশ, সীতানাথ, অমূল্য হারাধন ও চামেলী (কলিকাতা), পুরন্দর, অরিন্দম, অরবিন্দ, মাধুরী, শোভনা, অমৃতা, লতু ও সীমা রায়চৌধুরী (আসানসোল), তিনু, হারু, চারু, নরু ও সুস্মিতা বসু (কলিকাতা), দীনেন্দ্র, বরেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অলকেন্দ্র ও চন্দ্রিমা সিংহ (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু, নীপু ও সঞ্জীবকুমার (হাওড়া), দোলন, পিণ্টু ও ফণীন্দ্র সাহা (কলিকাতা), রাজা, ভুটিন, বুড়ো ও পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় (ইছাপুর), অতু, অরু ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা), কুলু ও গজু মিত্র কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, লক্ষ্মী, নমিতা, সুনীল, অমিয়, অমিয়া, মুরারি, সঞ্জয় ও রুবি (ভিলাই), বুজু ও বিজু ভাদুড়ী (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), অলক, তিলক ও সুপর্ণা রায় (কৃষ্ণনগর)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

আশুতোষ, শিবতোষ, প্রাণতোষ ও মনতোষ হাজরা (কানপুর), শ্রাবণী, মিনতি, নন্দিতা, মোহন, ছক্কু, ছোটন, পানু, ও দানু (রাঁচী), ডলি, পলি, নেলী, শেলী ও পাপু বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), অমিয়, প্রশান্ত, রাণা, ভাস্কর, কৃষ্ণলাল, অনিল, অমৃত, ভুবন-মোহন, সুনীত, কমল ও ঋষিকেশ (গড়িয়া), রেণু, বিশু, দেবকী, কমলা ও চাঁদু সেন (কলিকাতা), বাচ্চু, লালু, খোকন ও লাবণ্য দাসগুপ্ত (গয়া), জোনাকী বাগচি, পূর্বপুঠিয়ারী।

গল্প

প্রহেলিকা

শ্রীযমুনা ঘোষ

অস্তমিত রবি। আঁধারে সুসজ্জিত কক্ষে পিয়ানোর সামনে বসে সুললিত ছন্দে বিহ্বল চিত্তে একটি তরুণী গাইছে—

“জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে’।”

তন্ময় চিত্তে রবীন্দ্র সাধনায় সে তখন বিভোর। কে যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা সে জানতেও পারেনি।

যে এসেছে, সে তখন সংগীত শ্রবণে কিছুক্ষণ অপেক্ষমান হয়ে একটু হেসে বল্লে,—“তোমাকে আর ব্যথা ছাড়াতে হবে না! তোমার ব্যথা ছাড়াতে আমি সশরীরে আবির্ভূত হয়েছি” বলে একেবারে তরুণীর পাশে এসে তরুণীর গলাটা জড়িয়ে ধরে।

অতর্কিতে গান বন্ধ করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে চেয়ে বলে,—“উঃ! এমনি করে আসতে হয়! মাইরি বলছি, আমি এমনি চম্‌কে উঠেছি—

—“কি আর করি বলো? দেখলুম সংগীত সাধনায় তুমি এখন ডুবে আছ, তাই লোভটা আর সামলাতে পারলুম না। চম্‌কে দেবার ইচ্ছে হলো। বাব্বাঃ! কতক্ষণ যে এসেছি তা তোমার হুসই নেই।” ব’লে হাসতে হাসতে বলে, ‘সত্যি ভাই, কি মিষ্টি তোর গলা! এমন চমৎকার গাইতে পারিস! আমি যখনই তোর গান শুনি, তখনি আমার বেশ ভাল লাগে।’

তরুণী হেসে ফেল্লে। আহা! যেন মধু ঝরছে! তোমার একটুতেই বাড়িয়ে বলা।

—তার মানে?

—তার মানে? তার মানে—হচ্ছে নিঃশব্দে তোমার চোরের মত আসা, এবং তার দোষস্খালন করা, বলে সে হেসে উঠলো।

—তুমি বলতে চাইছ, তাহলে আমি একটি চোর!

—নিশ্চয়! তবে ধন চোর নয়, মন চোর। বল্লে তার হাতটা ধরে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে,—“কি সংবাদ দেবী, কেন আজি হেথা আগমন তব?

—সংবাদ? সংবাদ অতি উত্তম। আমি হেথা ‘দূতরূপে পাঠায়েছে মোরে, ফাল্গুনী তব—’

—কহ বার্তা—

—আজি হইবে এক বিরাট সভা। আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। বলে দুই বন্ধুতেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

তারপর তরুণী বলে,—বলনারে কেতকী, কেন ডাক্‌ছে?

—আজ যে ‘তরুণী সংঘের’ মিটিং, সেটা কি তুমি একেবারেই ভুলে গেছ?

—ও সরি! আমি একেবারেই ভুলে গেছি ভাই। কিন্তু যাব কি করে? মা যে বাড়ী নেই!

—কেন? মাসীমা কোথায় গেছেন?

—মা গেছেন মামার বাড়ী।

—তবে কি হবে ভাই? তুই এক কাজ কর। মেসোমশাইকে বলে চল্ দেওয়ানী—

—তুই জানিস তো ভাই কেতকী, আমার কোথাও যাওয়া-আসার ব্যাপারে বাবা কোন মতামত দেন না—!

—তবে কি হবে? আচ্ছা কেতকী তুই একটা কাজ কর—

জিজ্ঞাসুনেত্রে কেতকী বান্ধবীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে,—কি কাজ?

—তুই ফাল্গুনীদের এইখানে আসতে বল। আজকের

আলোচনা মিটিং এইখানেই হোক, আমার বাড়ীতে—তাহলে তোদের সঙ্গে আমারও উপস্থিত থাকা হবে। সেই বেশ ভাল হবে। তুই যা ভাই কেতকী লক্ষ্মীটি—বলে দেবযানী বন্ধুর হাতের ওপর একটা মৃদু চাপ দিলে।

একটু সন্দিগ্ধ স্বরে কেতকী উত্তর দেয়,—ফাল্গুনীরা কি আসতে চাইবে— ?

—কেন ? না আসার তো কোন কারণ নেই! আমার মা বাড়ী নেই, বাবা এসব কিছু দেখেন না! তিনি থাকেন তাঁর মক্কেল আর কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

আমি কি করে যাব ? তুই বল কেতকী—

নীরস স্বরে দেখি বলে কেতকী যেমন ঘর থেকে বেরুতে যাবে অমনি শ্রাবণীর সঙ্গে দেখা। শ্রাবণীকে দেখেই কেতকী সুরেলা ছন্দে বলে,—"আজি শ্রাবণ ঘন গহন বনে" এসে গেছে যে—

কেতকীর কথা শুনে দেবযানী তাড়াতাড়ি পিয়ানোর টুল থেকে উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে,—কেতকী, তোরা দুজনেই যা না—

উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে শ্রাবণী জিজ্ঞেস করে,—কোথায় যাব আমরা— ?

কেতকী উত্তর দেয়,—দেবযানী বলছে, ফাল্গুনীদের এখানে এসে আজ মিটিং করতে—কারণ দেবযানীর মা আজ বাড়ী নেই, সেইজন্য ও যেতে পারবে না।

কেতকীর কথাগুলো শুনে শ্রাবণী বলে, আমাকে তো ফাল্গুনীদি সেইজন্যেই পাঠালেন। বল্লে,—শ্রাবণী, তুমি একবার যাও তো দেবযানীদের বাড়ী, কেতকী আর দেবযানীকে ডেকে আন। আমাদের মিটিং-এর দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—কেতকী উত্তর দিলে,—"তবে চল্ শ্রাবণী, আমরা দু'জনেই ফাল্গুনীর কাছে গিয়ে বলি—

মিনিট পাঁচসাত পরে ফাল্গুনীর রেজিমেন্টের দল দেবযানীর ড্রয়িংরুমে উপস্থিত হলো।

তরুণী সঙ্ঘের সেক্রেটারী ফাল্গুনী বোস ছিল সকলের বড়; বি, এস, সি পাশ করে কি একটা সরকারী অফিসে কাজ করে। তাই দেবযানীর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, আজ "তরুণী সঙ্ঘের" মেম্বারদের দেবযানী তার বাড়ীতে ইন্‌ভাইট্ করেছে, অতএব তাদের সকলকে দেবযানী চা পানে আপ্যায়িত করবে।

"তরুণী সঙ্ঘের" যুগ্মসম্পাদিকা দেবযানী চৌধুরী। নিশ্চয়! নিশ্চয়! বলে সে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজকের সভায় প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, "তরুণী সঙ্ঘের" যে গ্রন্থাগারটী খোলা হবে, তার একটা খস্‌ড়া প্রস্তুত করা, এবং সদস্যরা কে কেমন সাহায্য করবে এবং মাসিক চাঁদার হারটাই বা কেমন হবে তারই একটা আলোচনা বিলোচনা চলছে। এমন সময় দেবযানীর বাবার চাকর মুরারি, একটা বড় ট্রেতে চা এবং কিছু গরম সিঙাড়া, কচুরী এনে হাজির হলো। তার পেছনে দেবযানী দাঁড়িয়ে—

আহার্য্য বস্তুগুলির দিকে চেয়ে সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, 'একি করেছিস দেবযানী—! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?'

ফাল্গুনী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে,—"দেবযানী, আমি তো তোমায় এসব খাবারের কথা বলিনি! আমি কেবল চা'এর কথা বলেছি। তা তুমি এ সমস্ত করলে কেন? এগুলি করতে কি কোন খরচ নেই ?

মৃদু হেসে দেবযানী উত্তর দেয়,—আপনি অত সংকুচিত হচ্ছেন কেন ফাল্গুনীদি। এসব আমি কিছুই করিনি, সব মা করেছেন।

জিজ্ঞাসু নয়নে কেতকী বলে,—"তবে যে তুই বল্লি মা মামার বাড়ী গেছেন ?

—"হ্যাঁ! ঠিক কথাই তো বলেছি। মা তো পরে এসেছেন।

পরম সন্তোষের সঙ্গে আহার্য্য বস্তুগুলি গলাধঃকরণ করতে, করতে ভারতী বলে,—"আজ কি মজা হয়েছে জান ফাল্গুনীদি—

ভারতীর দিকে চেয়ে ফাল্গুনী জিজ্ঞেস করে,—কিসের মজা ?

ভারতী উত্তর দিল,—"আজ "মিলনী"দের প্ল্যান ছিল, আমাদের যখন মিটিং হবে, সেই সময় ওদের ক্লাবে খুব জোর গানবাজনা চালিয়ে আমাদের সভাটা পণ্ড করে দেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় "মিলনী"দের সে প্ল্যানটি ভেস্তে গেল। মিটিংটা এখানে হয়ে—

দেবযানী উত্তর দিলে,—তাহলে আমি একটা ভাল কাজ করেছি বলব মিটিংটা ডেকে—

—"নিশ্চয়! খুব ভাল কাজ করেছ তুমি।' ভারতী বলে।

কেতকী জিজ্ঞেস করলে,—"ওরা জানলে কি করে, আজ আমাদের মিটিং হবে?"

—সেইটাই তো হচ্ছে কথা! ভারতী উত্তর দেয়,—

—কেন জানতে পারবে না? কল্যাণী বলে,—আমরা যখনই ক্লাবঘর খুলে বসি, তখন ঘরের সামনে দিয়ে ওদের আনাগোনা একটু বেড়ে যায়।

বান্ধবীদের বাক্যালাপগুলো শুনে ফাল্গুনী মন্তব্য করে,—আহা! তোরা বুঝতে পারছিস না, ওরা মনে করেছে, "তরুণী সঙ্ঘ" আর ক'দিনই বা টিঁকবে। কারণ "তরুণী সঙ্ঘের" জন্মই তো হলো মাত্র দুটো বছর। আর আমরা? আমরা সকলেই কেউ কাজ করি, কেউ বা কলেজে পড়ি! সব সময় আমাদের আসার সুযোগ সুবিধা হয় না। তার ওপর গার্জেনদের অনুমতি, কত কি? এটা তো এরা বোঝে—তাই আমরা এটাকে আর বেশীদিন হয়তো চালাতে পারব না। এর অকাল-মৃত্যু ঘটবে।

শ্রাবণী উত্তর দেয়। অকাল মৃত্যু ঘটবে বল্লেই ঘটবে? আমরা তা কিছুতেই হতে দেব না। অকাল-মৃত্যু হয় তো ওদেরই হবে—

ফাল্গুনী বলে,—ওদের হবে কি করে? যতই হোক, ওদের ক্লাবটা তো দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক দিনের পুরোণও তো হলো। কিন্তু আমরা যদি সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এই সঙ্ঘটাকে দাঁড় করাতে পারি, এর ভাল গঠন দিতে পারি, তাহলে ওরা যত প্ল্যানই করুক না কেন, আজকের মত সবই ওদের পণ্ড হয়ে যাবে।

অমনি দেবযানী বলে ওঠে,—নিশ্চয়! নিশ্চয়! খুব ঠিক কথা ফাল্গুনী—আমরা আজ সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি! প্রমিস্ করছি। আমোদের এই প্রতিষ্ঠানকে আমরা বিরাট রূপ দেবার প্রয়াস যথাসাধ্য করব। আমরা একটা আদর্শ স্থাপন করব। সকলেই হাত তোল—

* * *

"তরুণী সঙ্ঘের" খানতিনেক বাড়ীর পরই "মিলনী ক্লাব"।

মিলনী ক্লাবের সদস্যের, এই কিশোর, তরুণ, যুবকদের, কর্ম্মবীরত্বের পরিচয় কিছু কিছু প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়। সদাসর্ব্বদাই তারা পরোপকারে তৎপর হয়ে থাকে। কোথায় কারা শব বহন করে যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তাদের পাশে গিয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞেস করে। যদি কারুর বাড়ীর বর বা কনে অন্তর্হিত হয়, তখনি বর বা ক'নে যোগাড় করে তাদের মা-বাপকে উদ্ধার করে থাকে। পাড়ায় কাজকর্ম্ম হলে যজ্ঞি তোলার ভার পড়ে মিলনীর ছেলেদের ওপর। পথে-পড়া রোগী দেখলে তাকে তুলে ওরা সেবাশুশ্রূষা করে হাঁসপাতালে পাঠানর ব্যবস্থা করে দেয়। বন্যা পীড়িত খরায় সাহায্য দান করা ইত্যাদি কাজে তারা নিত্যই নিয়মিত লেগে থাকে। এত কাজ সত্ত্বেও ভারতীর বরাভয় হস্ত তাদের ওপর কিছু কম প্রসারিত হয় না। অত যাঁরা পরোপকারী, এত উদারচিত্ত, সকলের প্রীতি-ভাজন তারাই বা কেন এই 'তরুণী সঙ্ঘের' ওপর এত মাৎসর্য্যভাব পোষণ করে? তাহলে নিশ্চয়ই এর মাঝে কোন একটা গলদ আছে।

"মিলনী"র বক্তব্য, অতিরিক্ত স্বাধীনচিত্ত নারী জীবনে চলার পথে বাধাই সৃষ্টি করতে থাকে। যাদের মধ্যে বিলাসিতার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তারা আবার হবে পরোপকারী! তারা আনবে আদর্শ! তারা দেবে নীতি!

এমনি কিছু বিচার বিশ্লেষণের মাঝে অন্তরে যে তুষানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, সেটা থেকে মাঝে মাঝে যে ধূম উদ্গীরণ হয় তারই উত্তাপ মাঝে মাঝে "তরুণী সঙ্ঘের" ওপর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এত সত্ত্বেও "তরুণী সঙ্ঘের" ধৈর্য্যের বাঁধন দেখে "মিলনীর" ছেলেরা নিজেরাই মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে পড়ে।

একদিন এই কথাটিই "মিলনীর" সেক্রেটারী শৈবাল রায়ের শ্রুতিগোচর হতেই সদস্যরা কিছু কিছু তিরস্কৃতও হয়েছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর "মিলনী"র জন্মবার্ষিকী

উপলক্ষে ক্লাবে কিছু উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। সকল সভ্য এবং বহু গণ্যমান্য অতিথিও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। ক্লাবের সেক্রেটারী শৈবাল রায়ও প্রতিবেশী "তরুণী সঙ্ঘ"কেও একখানি কার্ড পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু উৎসব ক্ষেত্রে দেখা গেল, "তরুণী সঙ্ঘের" কোন সদস্যই উপস্থিত হয় নি। এমন কি তাদের সেক্রেটারী অবধি নিমন্ত্রণটি অগ্রাহ্য করে অনুপস্থিত হয়েছে। এই সংবাদটি শাখা প্রশাখা বিস্তার করে অবশেষে "মিলনীর" প্রেসিডেণ্ট শ্রীঅম্বর ব্যানার্জ্জী 'বার, এট, ল,র' কর্ণকুহরে যেতেই তিনি বললেন,—"তোমরা নাকি এই ফাংসনে "তরুণী সঙ্ঘে"র মেয়েদের ইন্‌ভাইট করেছ,কিন্তু আমি এই কাজটা একেবারেই পছন্দ করি না, ক্লাবের মধ্যে মেয়েদের আসন দাও—তোমরা এমন ছেলেমানুষ। ওদের জ্ঞান হলো সংকীর্ণ! তোমরা জান না ওরা কিরকম ডেঞ্জারাস্‌। নিজেদের কেরিয়ারটাকে নষ্ট করতে ওদের জুড়ি পাবে না। সমস্ত কিছু থেকে রেহাই পাবে রেহাই পাবেনা কেবল ওদের কাছ থেকে। কত প্রতিভাবান্‌কে ওরা করে নষ্ট! কত সুখের সংসারে দেয় ওরা আগুন! কত বাপ-মার বুকে হেনে দেয় শক্তিশেল। সেই জন্যই আমি বলি, যে পথে ওরা থাকবে, সে পথ তোমরা করবে ত্যাগ। অবশ্য আমার কথা হয়ত অনেকেরই ভাল লাগছে না। কিন্তু জীবনে যদি চলার পথে জয়যুক্ত হতে চাও, তবে তোমাদের ত্যাগ করতে হবে ওপথ।

• ০ ০

"তরুণী সঙ্ঘ" গ্রন্থাগারের আজ দ্বারোদ্ঘাটন। সকল সদস্যই একে একে উপস্থিত হয়েছে। বহু গণ্যমান্য অতিথিরও আবির্ভাব ঘটেছে। আজকের সভার অধ্যক্ষা লেডী মুখার্জ্জী এবং প্রধান অতিথি ট্রেডইউনিয়নের নেতা মিসেস্‌ চৌধুরী। গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করে উল্লসিত চিত্তে বল্লেন—আজ আমি আন্তরিকতার সহিত কামনা করি, তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি দিনে দিনে উন্নতি লাভ ক'রে প্রসারতা লাভ করুক। এবং আমার সামনে বসে আছে এই যে সব স্থলপদ্মের দল, তারাও যেন শিক্ষায় দীক্ষায় জীবনে বিজয়মাল্য অর্জন করে। বর্ত্তমান যুগে অনেকেই শিক্ষালাভ করে বটে, কিন্তু তাদের সেই শিক্ষার সঙ্গে থাকে নৈতিক জীবনের অবনতি। তাকে শিক্ষালাভ বলা চলে না। তাকে অশিক্ষা নামেই অভিহিত করা চলে। কারণ অনেকে মনে করেন, স্কুল, কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করলেই জীবনের সকল শিক্ষাই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা নয়। শিক্ষা বলতে সমস্ত জগতের সকল ক্ষেত্রের শিক্ষাকেই গ্রহণ করতে হবে; তবেই হবে শিক্ষা লাভ। এত অল্প বয়েসে দৃঢ়চেতা হয়ে চরিত্র-মাধুর্য্যের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার যে ইচ্ছা তোমরা প্রকাশ করেছ, তারই মূল্য অনেকখানি। তোমরা যদি নিজেদের আদর্শ সুপরিকল্পিত করে তুলতে পার তবেই হবে জগতে একটা কীর্ত্তিস্থাপন। জান তোমরা,—সিষ্টার নিবেদিতা কি বলে গেছেন? তিনি বলেছেন, "পাশ্চাত্য দেশের নারীজাতির পারিবারিক সভ্যতা ভারতীয় নারীজাতির পারিবারিক সভ্যতার কাছে আধ্যাত্মিক ও পবিত্রতা অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। আর ভারতীয় নারীজাতির নাগরিক সভ্যতা পাশ্চাত্যের কাছে অর্জন করা উচিত।" আমি বলি,—তোমরা সিষ্টার নিবেদিতাকে আদর্শ জ্ঞানে তাঁর শিক্ষাকেই অনুসরণ কর। একজন পাশ্চাত্য দেশের মহিলা সিষ্টার নিবেদিতা আমাদের ভারতে এসে যেমন মনীষীবৃন্দের প্রাসাদোপম গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতেন, আবার তেমনি তিনি কৃষক মজুরের জীর্ণ-কুটিরেও আনন্দের সঙ্গে বাস করে ঢেঁকিতে ধানভাঙা, মুড়ি ভাজা, তাদের সঙ্গে বসে আহার করা ইত্যাদি তিনি করতেন। তোমরাও তেমনি ধনী-দরিদ্র সমান জ্ঞানে দেখবার প্রয়াস করবে। তবেই মানুষ হবে। জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

পরের দিন কলেজে কেতকীর সঙ্গে দেবযানীর দেখা হতেই কেতকী বললে—"কাল মিসেস্‌ চৌধুরী কেমন বললেন, দেখলি—? এখনকার মেয়েরা নাকি শিক্ষার সঙ্গে তাদের নৈতিক জীবনকে হারিয়ে ফেলে বলেই দেশের এত অবনতি।"

দেবযানী উত্তর দিলো—"কথাটা যে খুব খারাপ বলেছেন মিসেস্‌ চৌধুরী তা নয়! তুই দেখবি যত সব বড় বড় ক্লাব, সমিতি বা সঙ্ঘ আছে, তারা সামনে দেখায় সমাজ কল্যাণ, দেশের কাজ, ছেলে মেয়েদের কাছে নীতি-জ্ঞান প্রচার করছে। পেছনে কিন্তু দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ

হয়ে আছে। আমার বাবা তো ওই সমস্ত ক্লাব, সমিতি, সঙ্ঘগুলোর নামে হাড়ে চটা। বাবা বলেন, এখনকার এই কো-এডুকেশন সৃষ্টি করে ছেলে-মেয়েদের মাথাটা একেবারে খেলে! দুর্নীতির পথটা এত বেশী খুলে দিয়েছে, যে কোথাও আর বাঁধ মানতে চাইছে না।

এত গোঁড়ামী, এত পবিত্রতা, এত জ্ঞানার্জ্জনের পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, মিলনীর সেক্রেটারী শৈবাল রায়ের সঙ্গে দেবযানীর বন্ধুত্বটা একটু নিবিড় হয়েই জমে উঠেছে। তা নিয়ে উভয় দলের মধ্যেই একটা চাপা গুঞ্জনও চলে। কিন্তু মুখে কেউই সেটা বিশেষ প্রকাশ করে না।

ইদানীং "তরুণী সঙ্ঘের" যোগাযোগটা দেবযানীর একটু শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। তাই নিয়ে বান্ধবীর দল ঠাট্টা, বিদ্রূপ, রঙ্গ-রহস্য করতেও ছাড়ে না। দেবযানী কিন্তু এসব কথার কিছুই গায়ে মাখে না। কেবল মাত্র হাসে।

কেতকী তো একদিন বলেই বসলো,—দেবযানী তুই আমাদের "তরুণী সঙ্ঘের" আদর্শটা একেবারে নষ্ট করে দিলি। অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বি, এস, সি পাশ করে তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস।

—তুই ভুল করলি কেতকী, গোল্লা যে তোদের সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছেরে, বলে দেবযানী হাসতে লাগলো।

দেবযানীর হাতটা ধরে কেতকী জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দেবযানী, আমাদের এই বিবাদ, এত মন কষাকষির মাঝে শৈবালের সঙ্গে তোর এমন করে আলাপটা হলো কি করে?

একটু হেসে দেবযানী উত্তর দিলে,—কেতকী আজকাল আর মণ নেই, সব কিলো, তুই আজ কেবলই ভুল করছিস।

—আজকাল কিলো বলেই তো তোকে আমার কিলোতে ইচ্ছে করছে। এখন দয়া করে বলো, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও—উড়িয়ে দিলে চলবে না।

দেবযানী উত্তর দিলে,—আহা! তুমি যেন জান না! অমন ন্যাকামী ক'রোনি কেয়া—

—আমি কি করে জানব! তোর সঙ্গে কি আমি ঘুরে বেড়াই?

গম্ভীরস্বরে দেবযানী উত্তর দেয়,—তবে শোন, বলে কীর্ত্তনের সুরে গাইল,—

"শ্যামশুক পাখী সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ান ফাঁদে।
হৃদয়ে পিঞ্জরে, রাখিল যতনে
মনহি শিকলে বেঁধে॥"

অমনি কেতকী সুর ধরলে,—

ধিক্ ধিক্ ধিক্
তোরেরে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল॥"

দু'জনেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

দেবযানীর হাতটা ধরে আব্দারের সুরে কেতকী জিজ্ঞেস করে,—বল না ভাই দেবযানী—

দেবযানী উত্তর দিলে—কি করে আমাদের আলাপটা হলো তবে বলি শোন। সেদিন শৈবালবাবু কি একটা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাবার কাছে এসেছিলেন। আমি তখন বসে বই পড়ছি। ঘরে ঢুকতেই আমি মুখ তুলে চাইলুম, অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে হাতজোড় করে আমাকে একটা নমস্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা কোথায়?

—আমি উত্তর দিলুম,—বাবা লাইব্রেরী ঘরে।

বল্লেন,—আমি একটা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার বাবার কাছে এসেছি। আমার বন্ধু আপনার বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

—উত্তর দিলুম,—বেশ তো! আপনি লাইব্রেরী ঘরে যান, সেখানে বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। তারপর থেকেই মামলার জন্যে উনি মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতেন। আমায় বল্লেন,—দেখুন মিস্ চৌধুরী, আমাদের ক্লাবের ছেলেদের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত! ক্ষুব্ধ! তাদের জন্য লজ্জিত হয়ে আমি আপনার কাছে এ্যাপলজি চাইছি।

আমি উত্তর দিলুম,—না! না! এতে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। যে যা খুসী বলুক। আমরা কিন্তু কালাপাহাড়ের মত অটল-অচল।

শৈবালবাবু বল্লেন,—যাক্ ও সমস্ত কথা। এখন

আপনাদের ক্লাবের কি হলো? কতদূর অগ্রসর হলো তাই বলুন।

—আমি উত্তর দিলুম,—দেখুন শৈবালবাবু, আমাদের সঙ্ঘের কি হলো না হলো সে সম্বন্ধে আপনার জানবার কোন অধিকার নেই। এবং তা জানবার প্রয়াসও করবেন না।

আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,—জানেন মিস্ চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছাটা বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে পোষণ করছিলুম। কিন্তু সুযোগ সুবিধে হয়ে উঠত না। আজ দেখি ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন, তাই হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কেতকী জিজ্ঞেস করলে—তুই কি বল্লি?

আমি একটু হাসলাম। তারপর গম্ভীর স্বরে বল্লুম,—ভাগ্য আপনার সুপ্রসন্ন কি অপ্রসন্ন তা আপনিই জানেন। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। শৈবাল কিন্তু আমাদের বাড়ী ত্যাগ করেনি।

কেতকী জিজ্ঞেস করলে,—ভদ্রলোক উপস্থিত কি করেন?

—দেবযানী উত্তর দেয়—এম-এস-সি পড়ছেন?

—তাহলে এম, এস, সি পাশ করলে তুই বিয়ে করবি?

—কপট বিদ্রূপের সুরে দেবযানী উত্তর দেয়,—দেখি! বন্ধু দেখি! প্রিয়া যদি থাকে মোর পাশে, তবে বাধবে না কোন বাধা।

তুমি একেবারে উচ্ছন্ন গেছ। বলে কেতকী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

০ ০ ০

মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন তা হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। পেছনের দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পায় না। ভাল কি মন্দ সে বিচার বুদ্ধি বিবেচনা সব কিছু লুপ্ত হয়ে পড়ে। সমুদ্র মন্থনে অমৃত পাচ্ছে, কি গরল উঠছে সে বোধশক্তি অন্তর্হিত হয়ে যায়।

শৈবাল রায়ের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম হয়েছিল।

মা, বোন, আত্মীয় স্বজন সকলের কাছ থেকে শৈবাল অনেক দূরে সরে গেছল। দেশ থেকে বহু চিঠির পর চিঠি আসে শৈবাল, বহুদিন তোমার চাঁদমুখ দর্শন করিনি; পড়ার চাপ! ছুটি নেই। সব বুঝি, কিন্তু একমাত্র সন্তানের দর্শন লাভে যদি বঞ্চিত হতে হয়, তবে জীবনের আর প্রয়োজন কি?

কনিষ্ঠা লেখে,—"দাদা, তুমি আর আমার বাড়ী আস না। একেবারে পথ ভুলে গেছ। কবে আসবে? প্রস্তরে বীজ নিক্ষিপ্ত হত। কোন উত্তরই পেত না?

শৈবালের এখন সময় কোথায় যে পত্রের উত্তর দেবে! সে যে দেবযানীর প্রেমে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। বৌ নিয়ে একেবারে মার কাছে যাবে প্রণাম করতে।

শৈবালের দিক হতে প্রায়ই তাগিদ আসত দেবযানীকে বিবাহের জন্য।

এদিকে দেবযানীর গর্ভধারিণীরও ইচ্ছে শৈবালকে জামাতারূপে পেলে আদর যত্ন করতে পারবে। হ্যাঁ! রূপে গুণে জামাই হবার যোগ্য বটে। কন্যা যাকে পছন্দ করেছে, তাকেই যদি বিয়ে করে আপত্তি কি হতে পারে! কোথায় আবার সৎপাত্রের সন্ধান তিনি করতে যাবেন! তবে কন্যা যেন বিবাহটা আনুষ্ঠানিকরূপেই করে। একদিন তো দুহিতাকে বলেই বসলেন, সে যেন বিয়ের তারিখটা জননীকে জানিয়ে দেয়। তা না হলে উৎসবের আয়োজনটা কেমন করে হবে!

দেবযানী তখন বেশ পরিবর্তনে ব্যস্ত। শৈবালের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট আছে লাইট হাউসে যাবার। জননীর কথায় হেসে বলে, এরি মধ্যে? তুমি তা হলে একেবারেই ঠিক করে ফেলেছ?

"ওমা! সে আবার কি কথা? এরি মধ্যে—

* * *

রাত্রে পানের ডিবে হাতে সুচেতা ঘরে শুতে এসে দেখলে স্বামী তখনও আইনের বইতে মনঃসংযোগ করে আছে। ডিবেটা টেবিলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি সারাদিনই ওই মামলা মোকদ্দমা নিয়ে থাকবে? একবার কি সংসারের দিকে চেয়েও দেখবে না?

হাতের বইখানা বন্ধ করে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে সুহাসবাবু উত্তর দেয়,—কি? হঠাৎ আজ আবার বেসুরে বাজছে কেন?" হলো কি?

—"হবে আবার কি? না ভাব একবার সংসারের কথা, না কর একবার মেয়ের বিয়ের চিন্তা—

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! ভাল কথা মনে পড়েছে। মেয়ের বিয়ে বলতে মনে পড়ে গেল। শোন বলি, আজ মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার ছেলেটির সঙ্গে দেবযানীর বিয়ের কথা বলেছি। ছেলেটি বেশ ভাল। মাস তিনেক হলো ব্যারিষ্টারি পাশ করে বিলেত থেকে ফিরেছে।

কিন্তু দেবযানীর তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সেই কথাই তো তোমায় বলতে এসেছি।

—তার মানে?

বিস্মিত স্বরে ভ্রূকুঁচকে পত্নীর দিকে চেয়ে সুহাসবাবু জিজ্ঞেস করেন,—কোথায় ঠিক করলে? কই আমায় তো কিছু বলোনি—আমি তো কিছু জানি না—

—তোমায় বলবার অবসর কোথা? আমার কথা শোনবার সময় কি তোমার একবারও হয়—

—গম্ভীরস্বরে সুহাসবাবুর বলেন—"তাই যদি তোমার কথা শোনবার সময় আমার না থাকে, তবে আজই বা বলতে এসেছ কেন? না বললেই পারতে—

স্বামীর কথাটাকে লঘু করার নিমিত্ত সুচেতা একটু হেসে বলে, আজই তো ঠিক হলো গো—

আজ ঠিক হলো? বিয়ে—কি বলছ তুমি—

—হ্যাঁ, আজই ঠিক হলো। সুচেতা বলে।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে সুহাসবাবু বলেন, একথা আমায় আগে একবারও জানাওনি তো—তাহলে তো আমি আর মল্লিকের সঙ্গে কথা বলতুম না। দেবযানীর বিয়ের কথাটা আমায় জানাবার প্রয়োজন বোধ কর না বোধ হয়?

—আমিও জানব কি করে? তোমার মেয়ে আগে তার সঙ্গে প্রেম করে রেখেছে। সে কথা কি আমি জানি—ছেলেটি আসে, দেখতে শুনতে ভাল, দেবযানী বলে আমার বন্ধু, তার মধ্যে যে এত গোল আছে সে কথা আমি বুঝব কি করে? কাল যখন দেবযানী আমায় বললে,—ওই ছেলেটাকে সে বিয়ে করবে, তখন আমি জানতে পারলুম।

—"তবে আর কি"

আমার মাথাটা কিনে নিয়েছ—আমাকে একবার জানালে না! কেন তুমি আমায় বলনি -। তোমরা সব জানতে—মা মেয়ে গোপনে কাজ সারতে গেছলে, তখন ভাবনি আমি একটা মানুষ আছি! ছিঃ! ছিঃ! আমার মাথাটা একেবারে নামিয়ে দিলে তোমরা? এখন আমি মল্লিককে কি বলব—কি উত্তর দেব তাকে—

সুচেতা নীরব।

—মা-মেয়ে ক্লাব, সোসাইটী, কলেজ নিয়েই ব্যস্ত। তোমার ওপর বিশ্বাস রেখেই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, অথচ তুমি—

কি একটা কথা সুচেতা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুহাসবাবুর একটা ধমকীতে তার মুখের কথাটা মুখেই রয়ে গেল, বলা আর হলো না।

*　*　*

কথাটা কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, দেবযানীর বাবা তার বন্ধুর ছেলের সঙ্গে দেবযানীর বিয়ে দেবেন। তাই দেবযানীকে আর বাড়ী থেকে বাইরে পা দিতে দেন না। এই সংবাদটায় "মিলনী"র ছেলেদের মাঝে একটা চাপা গুঞ্জন চলছে। এইবার শৈবালবাবুর কি অবস্থা হবে। তখন তো খুব বলেছিলেন,—আমাদের মত অসভ্য বর্বর নাকি তিনি আর কোথাও দেখেননি। তা নিজের কি হলো; খুব তো প্রেমিকাকে নিয়ে আজ এ সিনেমা, কাল ও সিনেমা, হোটেল, গড়েরমাঠ করে বেড়াতেন!

ফাল্গুনী জিজ্ঞেস করল,—দেবযানীর কি হলো বলো তো? গানের রিহার্শল দেবে—কিন্তু সে যে আর আসেই না। সময় তো ফুরিয়ে এলো—

কেতকী উত্তর দিলে,—ফাল্গুনীদি, আপনি বুঝি জানেন না? শৈবালের সঙ্গে দেবযানীর যে বিয়ের ঠিক ছিল, তা ভেঙ্গে গেছে। দেবযানীর বাবা দেবযানীকে আর বাড়ী থেকে বেরুতে দেন না।

—কেন? দেবযানীর বাবা কি জানতেন না, দেবযানীর সঙ্গে শৈবালের বিয়ে হবে?

—না! দেবযানীর বাবা জানতেন না। দেবযানীর মা সব জানত, কিন্তু ওর বাবাকে বলেনি কিছু।

ফাল্গুনী উত্তর দেয়,—দেবযানীটা অত ভাল মেয়ে হয়ে শেষে কিনা এই রকম একটা কাজ করে বসলো! কিন্তু শৈবালের সঙ্গে দেবযানীর আলাপটা হলো কি করে ?

কেতকী বলে,—শৈবাল যে দেবযানীর বাবার কাছে একটা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আনাগোনা করত; সেইখান থেকেই ওদের আলাপ।

ফাল্গুনী উত্তর দেয়,—"আহারে! বেচারা! সত্যি দেবযানীটার জন্যে বড় দুঃখ হচ্ছে। কেন যে অমন কাজ করতে গেল—মেয়েটা কি ভাল গান গায়—

"মিলনীর" দরজা খুলতে খুলতে ফাল্গুনীকে দেখতে পেয়ে শোভন একটু চেঁচিয়েই ফাল্গুনীকে শুনিয়ে বলে,—এই রঞ্জিত, শুনেছিস, আজ আমি শৈবালবাবুর বাড়ী গেছলুম, গিয়ে শুনলুম, আজ পাঁচদিন হলো ভদ্রলোক নাকি কলকাতা ত্যাগ করে মেদিনীপুরে বাস করছেন।

বিস্ময়ের সুরে রঞ্জিত বলে,—সত্যি! আর যাবে না তো কি করবে—সুহাসবাবু যা কড়া মেজাজের লোক। গেছলেন তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে! ভদ্রলোককে এইবার দেশছাড়া করেছেন। বলে দু'জনে ঘরে এসে বসলো।

আজ ক'দিন হলো দেবযানীদের বাড়ীতে খুব হৈ-হৈ সমারোহ চলছে। দেবযানীর বিবাহ সাতাশে আষাঢ়। ম্যারাপ বাঁধা, সামিয়ানা খাটান, চারিদিক নেমন্তন্ন চলছে। পাড়াতেও নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে। মিলনীর ছেলেদের সুহাসবাবু নিজে গিয়ে মুখে বলে এসেছেন খাটাখাটুনি করে সব দেখাশোনা করে যজ্ঞি তুলবার জন্য।

দেবযানী বাবার গাড়ীতে করে কার্ড দিয়ে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে এসেছে।

বন্ধুরা তাকে আর কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। দেবযানী চলে যেতেই সকলেই মুখ টিপে হেসেছে। মন্তব্য করেছে, দেবযানীকে আর একলা ছাড়ে না। তাই গাড়ীতে করে নেমন্তন্ন করতে এনেছে।

বিবাহের দিন রাত্রে নিমন্ত্রিতের দল সকলেই উপস্থিত। "মিলনী"র ছেলেরাও এসেছে। "তরুণী সঙ্ঘের" মেয়েরাও! এসে সব অবাক! বিস্ময়ান্বিত! একি! আমরা সব ভুল দেখছি নাকি ? বরাসনে যে বসে আছে সে যে আর কেউ নয়, শৈবাল রায়।

———

পশ্চিমবঙ্গে অতিবর্ষণ—

এ বৎসর জুন মাসের প্রথমদিকে অর্থাৎ দশহরার দিন হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে বর্ষা নামিয়াছিল একমাসের উপর তাহা চলিয়াছিল। সর্বদা আকাশ এত মেঘাচ্ছন্ন ছিল যে, এই সময়ের মধ্যে লোক প্রায় সূর্যের মুখ দেখে নাই। এই অসময়ে বর্ষণও খুব বেশী হইয়াছে। এবং তাহার ফলে পশ্চিমবাংলায় কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমে কলিকাতা ও শহরতলীর কথা ধরা যাউক।

শহরের অধিকাংশ রাস্তা বহুদিন ধরিয়া অধিকাংশ সময় জলে ডুবিয়া থাকায় রাস্তার পিচ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সকল রাস্তার হাড় বাহির হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের জঞ্জাল পরিষ্কারের লরীচালকগণ ধর্মঘট করায় শহরে বহুস্থানে জঞ্জাল পচিয়া এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর নিজে সৈন্য বিভাগের সাহায্যে সৈন্য বিভাগের গাড়ী দিয়া জঞ্জাল পরিষ্কার করাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

গত ১লা জুলাই তিনি দুপুরে পাঁচ ঘণ্টাকাল নিজে শহরের সকল অঞ্চলে ঘুরিয়া যেসব স্থানে বেশী জঞ্জাল পচিয়াছিল সেসব স্থানে যাইয়া সৈন্যদিগকে জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত করেন। তাহার পূর্বে ও পরে তিনি কয়েকদিন সৈন্য-বিভাগের লোক দিয়া কয়েকটি রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করেন কিন্তু কলিকাতাবাসীর দুর্ভাগ্য তাহার পর আবার অতিবর্ষণ হওয়ায় সে মেরামতের কাজ সফল হয় নাই। অতিবর্ষণে কলিকাতার বহু নীচু পল্লী জলমগ্ন হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া হালতু, তপসিয়া, টালিগঞ্জ, নাগতলা, আলিপুর, বিজয় গড়, নূতন লবণ হ্রদ প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার গৃহ নষ্ট হওয়ায়, বহুলোককে সৈন্য-বিভাগের নৌকা দিয়া তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল।

গত ৬০ বৎসরের মধ্যে শহরের এইরূপ দুরবস্থা হইতে আর কখনও দেখা যায় নাই। শহরের মধ্যস্থলে ঠনঠনিয়া, বাদুরবাগান, মেছুয়াবাজার, ইণ্টালি, প্রভৃতি অঞ্চলেও শুধু রাস্তায় জল জমে নাই, বহু বাড়ীর এক তলার ঘরে জল ঢুকিয়া অধিবাসীদের দারুণ বিপন্ন করিয়াছে।

গঙ্গায় বানের ফলে কলিকাতা হাওড়া ও ২৪ পরগণার বহু পল্লীতে গঙ্গার জল ঢুকিয়া অধিবাসীদের বাস করা কষ্টকর করিয়াছে। শহরের দুরবস্থা তো বহুদিন হইতেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার উপর হঠাৎ এই অতিবর্ষণ শহরকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতার বহু রাস্তায় ট্রাম চলে নাই এবং বাসগুলিকে নির্দ্ধারিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথে চলিতে হইয়াছে।

শিয়ালদহ হইতে বজবজ ক্যানিং, ডায়মণ্ড হারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুরের রেলপথ স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ও বহুস্থান জলে ডুবিয়া থাকায় ট্রেনগুলিও নিয়মিত যাতায়াত করিতে পারে নাই। এমন কি শিয়ালদা-বনগাঁ, শিয়ালদা-নৈহাটী প্রভৃতি লাইনের রেলপথ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় ট্রেনের সংখ্যা কমাইতে হয়। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল, হাওড়া-তারকেশ্বর, হাওড়া-খড়্গপুর প্রভৃতি লাইনেও ট্রেনের সংখ্যা কমাইতে হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা এই অতিবর্ষণে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম, হুগলি জেলার প্রায় সমগ্র আরামবাগ মহকুমা, বীরভূমের রামপুরহাট, বর্দ্ধমানের সদর, কালনা ও কাটোয়া, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, মেদিনীপুর জেলার তমলুক প্রভৃতি অঞ্চল কয়েকদিন জলমগ্ন থাকায় একদিকে যেমন অধিবাসীরা গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল অন্যদিকে শস্য ক্ষেত ডুবিয়া যাওয়ায় প্রায় এক কোটি টাকার ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোথাও পাটের চাষ ভাল হয় নাই।

অনেক স্থানে আউশ-ধান প্রায় পাকা অবস্থায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমন-ধানেরও বহু চারা জলে ডুবিয়া পচিয়া গিয়াছে, তরীতরকারীর ক্ষতিও অপূরণীয়।

বাংলাদেশে বর্ষাকালে সাধারণভাবেই তরিতরকারীর অভাব হয়। এবার ঝিঙা, পটল, কলা, কচু প্রভৃতির গাছ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শ্রাবণ, ভাদ্রমাসে লোক কী খাইবে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। সরকারী কর্ম্মচারীরা দুঃস্থ অধিবাসীদিগকে কিছু কিছু সাহায্য দান করিতেছে এবং কৃষকদিগকে বিনা মূল্যে সার ও বীজ দিয়া আবার জমি চাষে উৎসাহ দিতেছে। ঠিক ঐ সময়ে গত ১০ই জুলাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়া একদিন বাস করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য রাজনীতির কাজে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা দলে-দলে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কলিকাতার দুরবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন।

ঠিক তাহার পূর্বদিন ৯ই জুলাই কলিকাতায় সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হওয়ায় ১০ই তারিখে কলিকাতার অধিকাংশ পথ-ঘাট জলে ডুবিয়াছিল এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সকলে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার একটি উচ্চ-বাসে চড়িয়া দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে রাজভবনে আসিতে হয়। বিকালে কলিকাতা-ভবানীপুরের পথগুলি জলমগ্ন থাকায় সন্ধ্যাতেও তিনি একটি স্টেশনওয়াগনে চড়িয়া কালিঘাটে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সহিতদেখাকরিতে গিয়াছিলেন। এই দুর্যোগের মধ্যেও ইন্দিরাজী তাঁহার পিতামহ মতিলাল নেহরুর বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী ৯০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা বাসন্তী দেবীর সহিত দেখা করিবার কথা ভুলিয়া যান নাই।

ইন্দিরাজী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। বাংলা ভাষা ভাল জানেন, কাজেই বাসন্তী দেবীর সহিত বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। যাহা হউক ইন্দিরাজী নিজ চক্ষুতে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্র হইতে অধিক অর্থ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন।

বর্ষণের আরম্ভ হইতে ৪০ দিন চলিয়া গেলেও ১৫ই জুলাই আবার কলিকাতায় অতিবৃষ্টিতে পথ-ঘাট ডুবিয়া যায়। এ অবস্থায় পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই চিন্তিত আছেন।

আগামী নির্ব্বাচন

গত মার্চ মাসে পশ্চিমবাংলার বিধানসভা ভাঙিয়া দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর পরবর্ত্তী নির্বাচনের দিন এখনও ঠিক হয় নাই, একদল রাজনীতিক নভেম্বর মাসে যাহাতে নির্বাচন হয় সেজন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন। কিন্তু নভেম্বরে ধান কাটার সময় বলিয়া কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সে সময়ে একদিনও বৃথা নষ্ট করিতে পারেন না। সে সময়ে গ্রামাঞ্চলের পথ ঘাট জলে ডুবিয়া থাকায় ভোটদাতাদেরও ভোটদানে যথেষ্ট অসুবিধা হতে পারে বলিয়া অপরদল ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে নির্বাচন করিতে চান। ওদিকে বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিধান সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ দুই রাজ্যে ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। কাজেই একদলের যুক্তি হইতেছে এ একই সময়ে নির্ব্বাচনগুলি হইলেই ভাল হয়।

সে যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দল ইতি মধ্যেই ২৮০টি আসনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বাদ দিয়া সর্বত্র প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। ১৭ই জুলাই বিরোধীদলেরও প্রায় অর্দ্ধেক আসন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচন যেদিন হউক না কেন যেসব প্রার্থীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে তাহারা নিজনিজ এলাকায় কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসদল অর্দ্ধেক অপেক্ষা ১৫টি আসন কম পাওয়ায় সকলে মিলিত হইয়া যুক্তফ্রণ্ট গঠন করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করে। সে মন্ত্রী সভাটি টিকে নাই। এবারে ভোটদাতারা অনেক বেশী সচেতন হইয়াছেন এবং তাঁহারা বুঝিয়া সুঝিয়া এবারে ভোট দিবেন বলিয়া মনে হয়।

জুলাই মাসের মধ্যেও বিরোধীদলগুলি তাহাদের নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি ব্যবস্থায় একমত হইতে পারে নাই। বিরোধীদলের মধ্যে দলাদলি ক্রমেই প্রকা[শ] হইতেছে। ডান কমিউনিষ্টরা বাম কমিউনিষ্ট দলে[র] প্রার্থীদের আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিবেন না। এব

বামেরা তাঁহাদের নিজেদের দলের প্রার্থীদের ছাড়া অপরের কথা চিন্তা করে না বলিয়া অনেকেই মনে করেন। পি, এস, পি দল শেষ পর্য্যন্ত যুক্তফ্রণ্টে যোগদান করিবে না। এস-এস-পি, এস-ইউ-সি, ওয়ার্কাস পার্টির প্রভৃতি প্রার্থীর সংখ্যা অতি নগণ্য।

ভোটদাতাদিগকে এবারে বিশেষ সাবধানতার সহিত ভোট দিতে হইবে। শুধু প্রার্থীর যোগ্যতা কাহাকেও কাজের লোক করে না পিছনে দল না থাকিলে ভাল লোকেরাও কাজ করে না। বাম কমিউনিষ্টদের ভিতর হইতে একটিপৃথক দল বাহিরহইয়া তাহাদের প্রার্থীর। বাম কমিউনিষ্ট প্রার্থীদিগকেবাধাদান করিবে। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মত রাষ্ট্রপতি শাসনে যে সুফল ফলিয়াছে তাহা আরও কয়েকমাস রাষ্ট্রপতি শাসন চালাইতে দিলে দেশবাসীর বহু কল্যাণ সাধন করিবে। দেশের অরাজকতা, খাদ্যাভাব সমস্যা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা নিবারণ, কারখানাগুলির মধ্যে ধনিক শ্রমিক বিরোধ কমাইয়া দেওয়া প্রভৃতি না করা হইলে বাংলার অধিবাসীদের জীবন আরও বিপদ সঙ্কুল হইয়া উঠিবে। যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গের এবারকার নির্বাচন যে বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনও সন্দেহই নাই।

ডাক্তার কনকচন্দ্র সর্বাধিকারী

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ কনকচন্দ্র সর্বাধিকারী সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। কনকচন্দ্র হুগলীজেলার আরামবাগের বসু-সর্ব্বাধিকারী বংশের সন্তান, তাঁহার পিতামহ ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্বাধিকারী ও পিতা ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ঐ বংশের প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সাহিত্যিক মুনীন্দ্রপ্রসাদ, খেলোয়ার সুশীলপ্রসাদ ও তাঁহার পুত্র বেরী সর্ব্বাধিকারীর নাম সর্ব্বজন বিদিতা। আমরা ডাঃ কনকচন্দ্রের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য—

১৯৬৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে. কলা (হিউম্যানিটিজ) বিভাগে প্রথম দশটি স্থানই ছাত্রীরা অধিকার করিয়াছেন, বিজ্ঞানও কলা দুই বিভাগ মিলে সর্বোচ্চ সংখ্যাও একজন ছাত্রী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞানবিভাগের প্রথম দশজনের নাম :—

(১) সমর ঘোষ—নবদ্বীপ বকুলতলা হাই স্কুল। (২) অরুণকুমার বিট—এন, সি, মন্মথনাথ হাই স্কুল। (৩) সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—জলপাইগুড়ি এফ, ডি, ইন্‌স্টিটিউশন। (৪) সোমনাথ বিশ্বাস—চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু বিদ্যালয়। (৫) অভিজিৎ মিত্র—হিন্দি হাই স্কুল। (৬) সমরকুমার গুহরায়—ঢাকুরিয়া রামলাল একাডেমি, উৎপল সিংহ—রাহারা রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল; অভিজিৎ বসু রায়-চৌধুরী—দমদম বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশন; পার্থসারথি মিত্র—সাউথ পয়েণ্ট হাই স্কুল; (৭) মাণিক্যকিশোর রায়—গঙ্গাপুরী শিক্ষাসদন। (৮) সন্তোষ পাণ্ডে—দুর্গাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। (৯) অসিতবরণ চক্রবর্তী—অশোকনগর বালক বিদ্যালয়; জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য—সাউথ পয়েণ্ট হাই স্কুল। (১০) দীপঙ্কর ঘোষ ও সত্যব্রত কুণ্ডু—হিন্দু স্কুল।

হিউম্যানিটিজ বিভাগের প্রথম দশজনের নাম :—

(১) মালবিকা চক্রবর্তী—মডার্ন হাই স্কুল। (২) জয়ন্তী ঘোষ—মডার্ন হাই স্কুল। (৩) জয়শ্রী কোনার—গোখলে মেমোরিয়াল। (৪) ঝর্ণা ঘোষ—কুমুদিনী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। (৫) ছন্দা চট্টোপাধ্যায়—সেণ্ট জনস ডায়োসেসন বালিকা বিদ্যালয়। (৬) কুঙ্কুম গুপ্ত—বাঁকুড়া মিশন বিদ্যালয়; অশোককুমার লাহিড়ি—হিন্দু স্কুল। (৭) কৃষ্ণা ভট্টাচার্য—এস, পি, এইচ, স্কুল। (৮) তপতী চট্টোপাধ্যায়—লেক বিদ্যালয়। (৯) ইয়াসমেন আক্রম—সখাওয়াত মেমোরিয়াল। (১০) অনুরাধা রায়—এস, পি, এইচ, স্কুল।

ভারতবর্ষ পত্রিকার নিয়মিত লেখক অধ্যাপক ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী ছন্দা চট্টোপাধ্যায় হিউম্যানিটিজ শাখায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ছন্দার বয়স মাত্র পনেরো বৎসর এবং তিনি নিজেও একজন সুলেখিকা। তাঁর এবং অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদিগের পাঠ্যজীবন আরও কৃতিত্বপূর্ণ হইয়া উঠুক এই প্রার্থনাই আমরা করি।

———

বর্তমান ভারতের যুবকগণ কেন বিপথে যাচ্ছে?

সবিনয় নিবেদন,

যুবকগণ যে কেন সুপথে চালিত হচ্ছে না, এ সম্বন্ধে এক্ষুণি ভাববার বিশেষ প্রয়োজনীতা রয়েছে। পথে ঘাটে উচ্ছৃঙ্খলতা, রাহাজানি যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতেও দেশের ও দশের নায়কগণ যে কি করে নিশ্চিন্ত-ভাবে বসে আছেন তা ভাবতেই বিস্ময় জাগে।

প্রত্যেক বিভাগের নায়কদের মুখে বড় বড় কেবল কথা শোনা যায়। আজকালকার ছেলেমেয়েদের যে কী হচ্ছে! এক খেলার নায়-কের মুখে শুনতে পেলাম, অমুক পুরের খেলার মাঠে ২২জন খেলোয়াড়. একত্রিত করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে খেলার নায়কেরা কখনও ভেবেও দেখেন না যে অমুক পুরে মাত্র ২২জন খেলোয়াড়ই খেলতে পারে শুধু এমন বন্দোবস্ত রয়েছে। ২২০০ ছেলে যারা খেলাধূলা করতে পারে,—খেলাধুলা করতে পারে না বলে যারা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়—নানারূপ অকার্যে লিপ্ত হচ্ছে তাদের দেহ মন বিকাশের কোন সুযোগ নেই। অমুকপুরে কথা বাদ দিন—ক'লকাতা মহানগরীতেও উৎসাহী ছেলেরা রাস্তার মাঝখানে খেলা করতে বাধ্য হয়। ছেলেমেয়েদের জন্যে যত দিন খেলাধুলা ও লেখা-পড়ার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত সম্ভবনা হবে ততদিন আজকালকার ছেলেমেয়েরা গোল্লায় যাচ্ছে একথা বলার বিন্দুমাত্র অধিকার আমাদের তথাকথিত নায়কদের নেই। শুধু খেলার কথা এখানে বলছি, লেখাপড়া, চাকুরী, জীবন বিকাশের অন্যান্য ক্ষেত্রের পক্ষেও একই প্রকার দুরবস্থা। ইহার দিকে সকলের সচেতন দৃষ্টি না থাকলে দেশের অধঃপাত অনিবার্য। আর যতদিন না তাঁরা এবিষয়ে গঠনমূলক কিছু না করছেন ততদিন নায়ক হবার অধিকারও তাঁদের হবেনা। সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করতে চাই।

বিনীত—
বরুণ চক্রবর্তী (পাইকপাড়া)

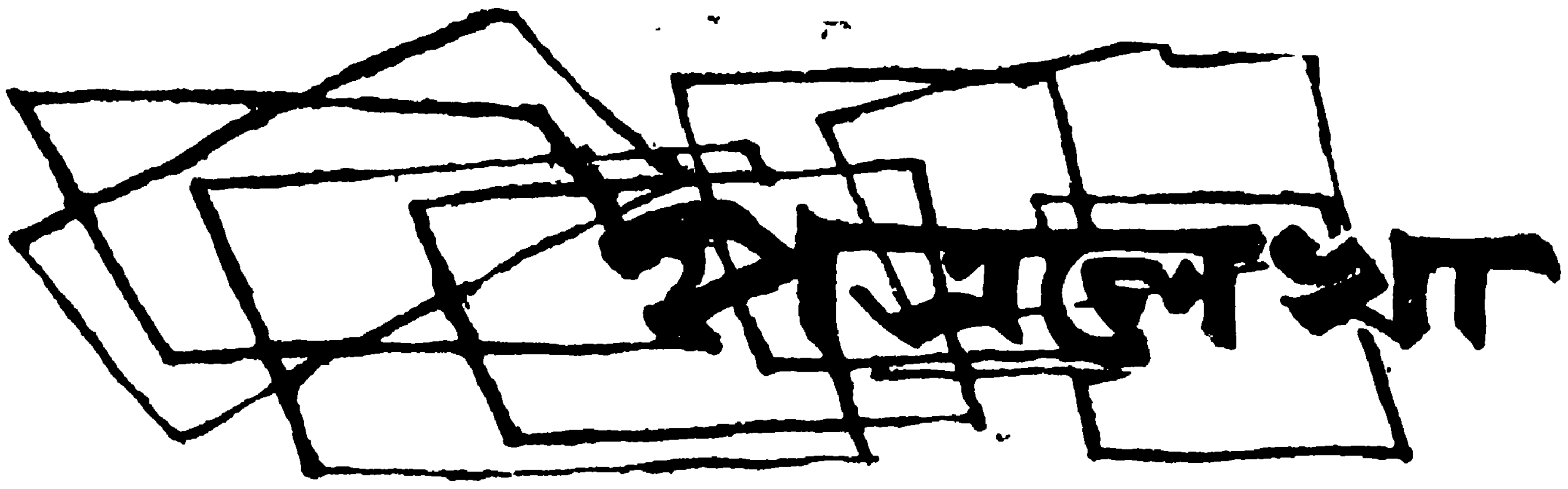

নেতাজী জীবিত কি না?

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুজন পঠিত পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নির্মল চৌধুরী লিখিত নেতাজী সম্বন্ধীয় পত্র-খানা পাঠ করিয়া মর্মাহত হইলাম। তিনি যে-সকল উদ্ধৃতি-দ্বারা নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য সমর্থনের প্রয়াস করিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই বিস্ময়কর। নেতাজী জীবিত নেই এ মিথ্যা সংবাদ রটনাদ্বারা এক শ্রেণীর লোকের যে অনেক স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব তাহা আমরা জানি। পত্রলেখকও সেই দলে ভিড়িয়া পড়িবেন তা আশা করি নাই। নেতাজী সম্বন্ধে যখন তাঁহার অনুসন্ধান করার উৎসাহ রহিয়াছে, তিনি নেতাজী জীবিত কি না সে-সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করিয়া সম্পূর্ণ তথ্য "ভারতবর্ষ"এর পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপিত করিলে সকলে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বিনীত—
রাখালদাস মিত্র
(কোচবিহার)

জনসংখ্যা

সবিনয় নিবেদন,

বৈশাখের "ভারতবর্ষ"তে শ্রীঅমৃত রায় লিখিত পত্রখানা দেখিয়া খুশী হইলাম। কিন্তু আমার মনে একটি কথা জাগিতেছে তাঁহার এই পত্রখানা সেই সব ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেদের নজরে আসিবে কি না—যাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষ সত্যসত্যই জনবাহুল্যের চাপে পীড়িত কিনা তাহা বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। "ভারতবর্ষ" কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন শ্রীরায়ের পত্রখানা যথাযোগ্যস্থানে অবগতির জন্য উপস্থাপিত করেন।

বিনীত—
শ্রীত্রিপুরেশ্বর সেন।
(বেহালা)

সন্তানের জন্ম

সবিনয় নিবেদন,

বৈশাখের ভারতবর্ষে সন্তানের জন্ম বিষয়ক পত্রখানা পড়ে বিস্মিত হলাম। একটা অভিনব বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে নীতি-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বাধা সৃষ্টি করার মধ্যে কি যুক্তি থাকতে পারে বুঝতে পারলাম না। গ্যালিলিওর আবিষ্কারকে নীতি-শাস্ত্রীরা যেমন ভাবে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল, এ দেখছি সেই রকমই অপচেষ্টা। সকলেরই উচিত এ অপচেষ্টার নিন্দা করা, আর এই গবেষণাকে, যার দ্বারা সন্তান স্ত্রী কি পুরুষ তা পূর্ব্বেই জানা যাবে, তাকে অভিনন্দিত করা।

বিনীত—
ধরিত্রী রায়
কলিকাতা—৩৩

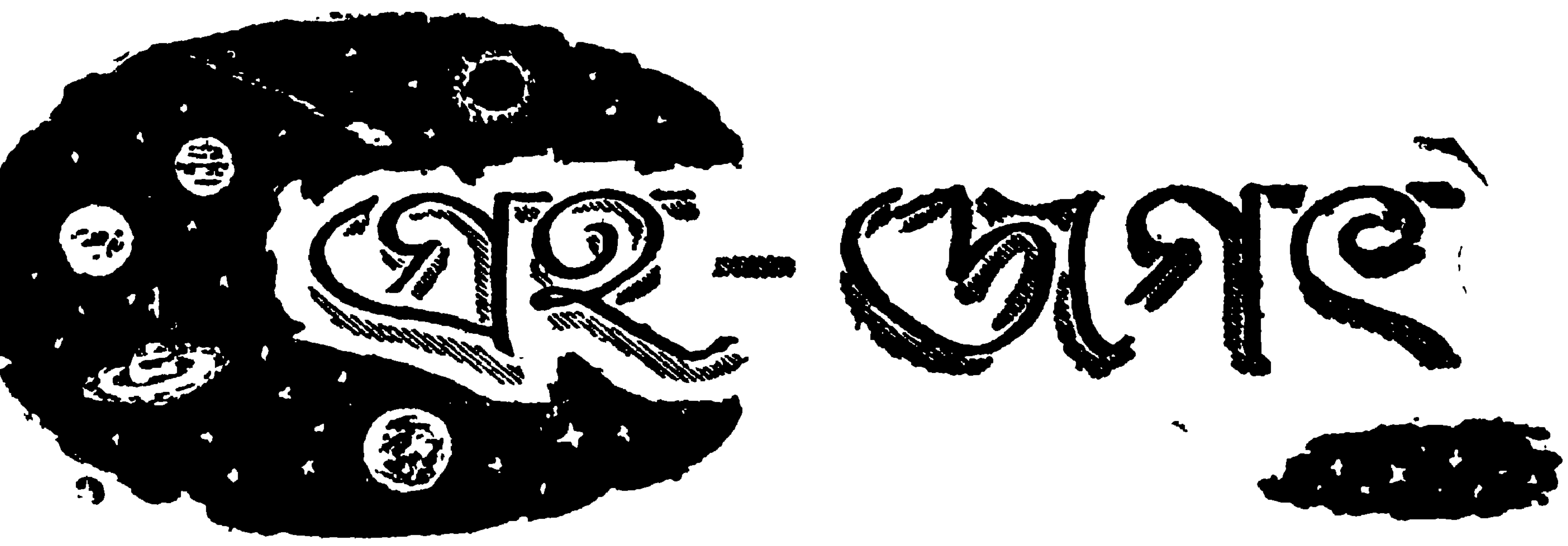

গ্রহ-জগৎ

শ্রীবিমলকুমার সুর

যাঁদের জন্মমাস বৈশাখ অথবা জন্ম লগ্ন বা রাশি মেষ তাঁদের শ্রাবণ মাস এইরকম যাবে।

আপনার ঘাড়ে ক্রমশঃ দায়িত্ব বাড়ছে বটে তবে আপনি আপনার দায়িত্ব ঠিকই পালন করে যেতে পারবেন। সংসার বা পারিবারিক কারণে এ মাসে আপনার ভালই খরচ হবে, তার জন্য আগে থেকে সব সময় জানতে পারবেন না। মা'র শরীরও মধ্যে মধ্যে ভাল থাকবে না। ঘরবাড়ী প্রভৃতি কারণে যে ব্যয় করবেন, সেটা সদ্‌ব্যয় বা উপযুক্ত ব্যয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আপনার জ্ঞাতি-আত্মীয়ের সহিত যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে, তাঁদের কারণে কতকটা দুশ্চিন্তা এড়াতে পারবেন না।

আপনার তেজ বিক্রম বহাল থাকবে এবং বুদ্ধির তৎপরতারও পরিচয় দিতে পারবেন। সন্তানাদির কারণে বাড়ীতে কোন প্রকার উৎসব সম্ভব দেখছি। রোগ বা শত্রুর চিন্তা বেশী করবেন না। আপনার শরীর মোটামুটি ভালই থাকার কথা।

যাঁদের জন্মমাস জ্যৈষ্ঠ অথবা যাঁদের জন্মলগ্ন বা রাশি বৃষ তাঁদের শ্রাবণ মাস এইরকম যাবে। আপনি যতই ভাল থাকুন, শনিঠাকুর আপনার দ্বাদশে বসে আপনার ভাগ্যের ও কর্ম্মের ভিতে হাত দিয়েছেন। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কোন জিনিসে অবহেলা চলবে না। এখনই যে অবহেলার কুফল পাবেন তা নয়, সুদ আসল পরে ঘাড়ে চাপবে। রাহু কিন্তু আপনার স্বপক্ষে রীতিমত লাঠি ঘোরাচ্ছে কাজেই আপনার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হচ্ছে না। এ মাসটা আপনার ভ্রাতা ভগ্নীদের পক্ষে লাভজনক। আপনারও তাদের তরফ থেকে লাভ বই লোকসান নাই। তাঁদের সঙ্গে আপনার প্রীতি সৌহার্দ্দ্য ভালই দেখি। যদি আগে কোন কারণে মতানৈক্য বা গোলমাল হয়ে থাকে ত এ মাসে মেটার কথা। আপনার আয় ভালই হবে, কিন্তু উদারতা বশতঃ অনেক খরচ করে ফেলবেন। যদি মনে করেন বিদেশে বদলী হলে ভাল হয় তাহ'লে তার চেষ্টা করুন।

যাঁদের জন্মমাস আষাঢ় কিংবা যাঁদের জন্মলগ্ন বা রাশি মিথুন তাঁদের শ্রাবণ মাসের ফল এইরকম বিবেচনা করি।

আপনার আয় ভাল চলবে, শত্রু কবলিত থাকবে। নিজের তেজ ও বিক্রম দিয়ে যে কাজ করতে যাবেন তাতে ফল লাভ হবে। কর্ম্মে প্রসারতার দিকে এগিয়ে যান। পাঁচজন সাধারণের সঙ্গে কাজে যোগাযোগ রাখলে ভালই। বিবাহের যোগাযোগ এলে রাজী হয়ে যাবেন। মাথা গরম করে ভাল প্রস্তাব নষ্ট করবেন না। বন্ধুর ব্যাপারে উদ্বেগ হবে মাঝে মাঝে। মা'র শরীর তেমন ভাল দেখি না। ঘরবাড়ী সংক্রান্ত যদি কিছু গোছগাছ করতে চান, চেষ্টা করুন, বিলম্ব হলেও ফল পাবেন।

যাঁদের শ্রাবণ মাসে জন্ম বা যাঁদের জন্মলগ্ন বা রাশি কর্কট তাঁদের শ্রাবণ মাসের ফল এই রকম। বিনা চেষ্টায় বা অযাচিত টাকাকড়ি এসে পড়বে। বড় ভাই বা বোনের কাছ থেকে লাভ হবার সম্ভাবনা দেখি। বিবাহের বাসনা হলে এগিয়ে যান। যদি দেশ-বিদেশে ভাগ্যের সন্ধানে বা বেড়াতে বা তীর্থের ইচ্ছায় যান তা'হলে তোড়জোড় চটপট করুন। কাজের

দায়িত্ব বাড়ছে, করবেন কি? ধৈর্য্য ধরুন, তাতে আখেরে ভালই হবে। এ মাসে ব্যয় আপনার বড্ড বেশী, ভাই বোন, পিতা, সন্তান, বিদ্যা—এই সকলের জন্য খরচা এসে পড়বে, উপায় কি? বুদ্ধিটা আপনার চঞ্চল থাকবে, লেখাপড়ায় ভাল ফল লাভ করা শক্ত।

যাঁদের ভাদ্রমাসে জন্ম বা যাঁদের জন্মলগ্ন বা রাশি সিংহ তাদের শ্রাবণ মাসের গ্রহবার্ত্তা এই—

আপনি ত ভালই আছেন গুরুর আনুকূল্যে। কিন্তু আপনার বদলী হবার জোর কথাবার্ত্তা এসে পড়ছে। আর যদি চাকরী না করে ব্যবসায়ী হন, আপনার বাইরে যাবার ইচ্ছা বলবতী হবে। জ্ঞাতি-আত্মীয়ের জন্য অনেক ব্যয় করবেন দেখছি। আপনার আয় ভালই হবে। ঘরবাড়ী সংক্রান্ত আয় বাড়াতে হলে এটা ভাল সুযোগ। আপনার অর্থের উদ্বেগ তবুও চলবে এবং মধ্যে মধ্যে মোটা চোট্ আপনার তহবিলের উপর পড়বে, তার জন্যে পূর্ব্বসতর্কতা অবলম্বনের উপায় নাই। আপনার স্ত্রীর বা স্বামীর মেজাজ মাঝে মাঝে গরম হয়ে উঠলেও ধর্ম্মের দিকে তাঁর মনটা এগোচ্ছে দেখছি।

যাঁদের জন্মমাস আশ্বিন বা যাদের জন্মলগ্ন বা রাশি কন্যা তাঁদের শ্রাবণ মাসের গ্রহফল শুনুন।

আপনার রবিরাশিতে প্রজাপতি গ্রহ বসে আছেন। 'প্রজাপতি' অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের গ্রহ, তিনি ভয়ানক স্বাধীনচেতা ও শক্তিশালী। তিনি হঠাৎ বিস্ফোরণ করে উঠেন। কাজেই আপনার পারিপার্শ্বিক বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। বিশেষ করে যাঁদের জন্ম ২৫শে ভাদ্র থেকে ৮ই আশ্বিনের মধ্যে তাঁদের কখন কোন দিকে থেকে উৎপাত বা ঝঞ্ঝাট এসে পড়বে তা বলা শক্ত। কাজেই তাঁদের, এবং মোটামুটি ভাবে ১লা থেকে ১৫ই আশ্বিনের লোকের সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। আশ্বিন মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের রবি রাশিতে কেতুগ্রহ অবস্থান করছেন। কাজেই তাঁদের উদ্বেগ, অশান্তি, ভীতি চলছে। কিন্তু অযথা উদ্বেগ করে লাভ কি হয়? আশ্বিন মাসের লোকের উচিত এই শ্রাবণ মাসে কর্ম্মজীবনে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাতে অনেক ছোটখাটো দুশ্চিন্তা এড়িয়ে যেতে পারবেন। আয় ভালই হবে, চিন্তার কারণ নেই। যদি ব্যবসায়ী হন; তাহ'লে এমাসে প্রসারের চেষ্টা দেখুন। আপনার বিদ্যায় ব্যাঘাত হতে পারে এবং আপনি পিতৃপদে বা মাতৃপদে আরূঢ় বা আরূঢ়া হলে, সন্তান সংক্রান্ত উদ্বেগ অশান্তি না ভোগ করে উপায় নেই। সাহস ও চিত্তের প্রফুল্লতা আপনার অনেক উপকার করবে।

আপনার যদি কার্ত্তিক মাসে জন্ম হয় বা আপনার জন্মলগ্ন বা রাশি যদি তুলা হয় তা'হলে আপনার শ্রাবণ মাসের গ্রহফল এইরূপ আশা করতে পারেন। কর্ম্মে ভাল উন্নতি করতে পারবেন। যশঃ, মান, প্রতিষ্ঠা, যোগ্যতা এইসব আপনার অধিকারে। কর্ম্মাধিপতি ষষ্ঠস্থ হওয়ায় উদ্যম উৎসাহ দেখিয়ে তবে সুফল পাবেন। আপনার দৌড়ঝাঁপ ঘোরাঘুরি কিছু বেশী হতে পারে; এবং মধ্যে মধ্যে এমন অবস্থার সম্মুখীন হবেন যে তখন আপনার ভিতরে যে steel আছে তার পরিচয় দিতে হবে। আয়ের পথ আপনার ভালই বাঁধান আছে। কিন্তু ব্যয়ের রাস্তায় এত খানাখন্দ আছে যে মাঝে মাঝে হোঁচট না খেয়ে উপায় নেই। যাঁদের ২৭শে আশ্বিন থেকে ৮ই কার্ত্তিক মধ্যে জন্ম তাঁদের শনিঠাকুর বেশ চেপে রাখবার চেষ্টা করবেন! কাজেই তাঁদের উচিত ধৈর্য্য ধরে শনিঠাকুরের ধৈর্য্যকে হারিয়ে দেওয়া।

আপনার যদি অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম হয় বা যদি আপনার জন্মলগ্ন বা রাশি বৃশ্চিক হয়, তাহলে শ্রাবণ মাস আপনায় এই ধারায় চলবে। আপনি দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, কারণ তাতে অযথা বিপদ্ ক্রয় করা হবে। আপনি স্থিরবুদ্ধি পছন্দ করলেও, অস্থির বুদ্ধির কাজ করে ফেলে পস্তাতে পারেন। আপনাকে বরুণগ্রহ অনেক প্রেরণা দিচ্ছে সত্য, কিন্তু সেই প্রেরণা কাজের দিকে বা বেকাজে ঠেলে দিচ্ছে সেটা ভাল করে তলিয়ে দেখে নেবেন। এত আর চিন্তা বা ঋণচিন্তা করে হবে কি? অর্থ ব্যাপারে আপনি তত বেকায়দায় নয় যতটা আপনি ভাবছেন। অবশ্য খরচ ভাল হচ্ছে, মানি। পারিবারিক ব্যাপারে যে সুখসুবিধা এতদিন ছিল, এখন যেন অনেক ঢিলে হয়ে যাচ্ছে বলে আপনার মনে হতে পারে। পড়াশোনার পক্ষেও তেমন অনুকূল আবহাওয়া দেখছিনা। আপনার সন্তানেরা এমাসে কিছু চঞ্চল ও অশান্ত থাকবে। আপনার জামাই বা পুত্রবধূ

কিছু বেকায়দায় আছে কি? হলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। আপনার একদিকে ব্যয়ের রাস্তা খুলেছে, এটা বাড়তে থাকবে। অল্প কয়েক মাসের কথা নয়, বৎসর দুই লাগতে পারে, কাজেই এই নূতন ব্যয় যাতে সঙ্কুচিত হয় সে বিষয়ে নজর রেখে চলবেন।

আপনার যদি পৌষ মাসে জন্ম হয় বা যদি আপনার জন্মলগ্ন বা রাশি ধনু হয় তাহলে শ্রাবণমাসের গ্রহফল শুনুন। মা'র শরীরটা ভাল থাকবে না, পারিবারিক সুখ শান্তি তেমন দেখিনা, বরং মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে সব ওলট পালট করে দেবে। এমাসে ধর্ম্ম চর্চ্চার সুবিধে করে উঠতে পারবেন না। ভাগ্যোন্নতি ব্যাপারে আশাহত হতে হবে।

অনেক সময় প্রত্যক্ষ সমর এসে পড়বে, কর্ম্মে বদলী হবার আশঙ্কা দেখি। আপনি ভ্রাতা, ভগ্নী বা অন্য কোন আত্মীয়ের সাহায্য পাবেন। যদি ওকালতি করেন বিচারালয়ে কড়া তর্কের উত্থাপন করে মক্কেলকে জিতিয়ে দেবার ভাল চেষ্টা করুন। আপনার পিতার উদ্বেগ চলছে। তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব নজর রাখলে ভাল হয়। তাঁর অধিক পরিশ্রম বা অনিয়ম বাঞ্ছনীয় নয়।

আপনার যদি জন্মমাস মাঘ হয় কিংবা জন্মলগ্ন বা রাশি মকর হয়, তাহলে আপনার শ্রাবণমাস এইরকম যাবে।

আপনার এমাসে বিবাহের ভাল যোগাযোগ দেখি। তবে ব্যাপারটা কতকটা আটকে থেকে হঠাৎ হয়ে যাবে। প্রেম বা প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে এ মাসটা ঘটনাবহুল বলা যেতে পারে। আপনার পারিবারিক সুখশান্তি তেমন দেখছি না। মা'র শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা। বন্ধুবান্ধবের ব্যবহারও প্রীতিপদ হবেনা। আপনার প্রয়োজন স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ও সুবিবেচনা। ধর্ম্ম, উচ্চ চিন্তা, ভাগ্যকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। দূর ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখুন। ব্যবসা সম্ভব হলে বাড়াবার চেষ্টা করুন।

যাঁদের ফাল্গুন মাসে জন্ম বা যাঁদের জন্মলগ্ন বা রাশি কুম্ভ তাঁদের শ্রাবণ মাস এই রকম যাবে।

শনিঠাকুর আপনার বিক্রমস্থানে। এটা ভাল আপনার দিক দিয়ে, জ্ঞাতি আত্মীয়ের পক্ষে নয় কারণ তাঁরা দেবে থাকবেন নানান্ অবস্থার পরিপাকে। আপনার তাঁদের সম্বন্ধে Interest আছে সত্য, কিন্তু আপনি মধ্যে মধ্যে মাথা গরম করে ফেলছেন। উত্তাপটা কম রাখুন। অনেকে আপনাকে দাম্ভিক বা অহঙ্কারী মনে করছে। ব্যবসায়ী হলে, আপনার ব্যবসার প্রসার হবে। আপনারও চেষ্টা করা উচিত যে জন্যে আপনার অষ্টমে প্রজাপতি ও কেতুগ্রহ আছে কাজেই আপনার পতি বা পত্নী সুখের অভাব হচ্ছে। এ ছাড়া রাস্তা ঘাটে সাবধানতার সঙ্গে চলবেন। আপনার যদি বয়েস হয়ে থাকে মধ্যে মধ্যে অযথা মৃত্যুভয় হতে পারে। অযথা উদ্বেগ বাড়াবেন না। গুরু আপনার রবিরাশিতে ও আপনার রাশ্যধিপতি শনিগ্রহকে পূর্ণরূপে অবলোকন করে আপনার সর্ব্বপ্রকার সুবিধার বন্দোবস্ত করছেন। সংসারিক পারিবারিক সুখ এমাসে তেমন পাবেন না। মা জীবিত থাকলে, তাঁর শরীর সুৎসই থাকবে না। আপনার বুদ্ধির প্রখরতা এমাসে দেখা যায়।

যাঁদের চৈত্রমাসে জন্ম বা যাঁদের জন্মলগ্ন মীন তাঁদের গ্রহবার্তা এই:—

আপনার এমাসে চিত্ত চাঞ্চল্য ও ভাবাবেগ বেশী। পেটের গোলমাল হবে কতকটা আপনার নিজের অবহেলাতে। ভোগবিলাসের এবং speculation এর দিকে ঝোঁক হবে বেশী। জেনে রাখুন আপনার ষষ্ঠে গুরু, দ্বিতীয়ে শনি। কাজেই ফাঁকের ঘরে মাদ্দা ওড়াতে পারবেন না। উদ্যম, উৎসাহ, পরিশ্রম এইসব পাওনা মিটিয়ে তবে লাভের অঙ্কর দিকে চাইতে পারেন। এ মাসে আপনার মাথায় ভাল ideas আসতে পারে। কিন্তু সেই সব idea গুলিকে সূক্ষ্ম বিচারের অধীনে ফেলে যাচাই করে নিন। তা না হলে নিজেই নিজের প্রশংসা মুখর হয়ে ভুলটা কোথায় হচ্ছে বুঝতেই পারবেন না। বিবাহ করবেন কিনা আপনার এক মহা সমস্যা থাকতে পারে, কারণ আপনার ভীতি থাকতে পারে এ বিষয়ে আপনি বেকায়দায় ফেঁসে যেতে পারেন। যাই হোক্ এমাসে প্রণয় যোগাযোগ ঘটতে পারে। দেখে শুনে পা বাড়াবেন, কারণ এ রাস্তায় আপনার হোঁচট খাবার কিছু সঙ্কট দেখা যায়। হোঁচট তবু ভাল, চোট না এসে পড়ে সেইটেই আসল আশঙ্কার কথা। অপরের সঙ্গে ব্যবহার যতটা সম্ভব ভাল রাখবেন। বাক্‌বিতণ্ডা, ঝগড়া যতটা পারেন এড়াবেন।

—

খেলা ধুলা

শৈল চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

—তৃতীয় টেষ্ট—

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার এজ্‌বাষ্টনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হল। শেষ হল ইংলণ্ডের সেই চিরাচরিত বৃষ্টির জন্যে, যে বৃষ্টি অনেক টেষ্ট দলকে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত করেছে—অনেক দলকে আবার নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করেছে। ইংলণ্ডের সেই বৃষ্টি এজ্‌বাষ্টনের মাঠের ওপর ঝরে পড়ে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে এই টেষ্টে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল, আর ইংলণ্ড শিবিরের আসন্ন জয়োল্লাসকে স্তব্ধ করে দিল!

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৪০৯ রাণের উত্তরে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করতে পেরেছিল মাত্র ২২২ রাণ। তারপর দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড তিন উইকেটের বিনিময়ে ১৪২ রাণ করে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করল। এর অর্থ হল ইংলণ্ড অধিনায়ক কলিন কাউড্রে অষ্ট্রেলিয়াকে ৩৭৩ মিনিট বা ছয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৩৩০ রাণ সংগ্রহ করে জয়লাভের সুযোগ দিলেন বা 'চ্যালেঞ্জ' জানালেন। অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া যদি ঘণ্টায় ৫৫ রাণ করে সংগ্রহ করতে পারে তাহলে জয়লাভ করতে পারবে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া'র খেলার ধরণ থেকে মনে হয়, অষ্ট্রেলিয় অধিনায়ক বিল্ লরী ইংলণ্ডের এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেন নি। ঘণ্টায় ৫৫ রাণ তুলতে গেলে বেশ দ্রুততালে রাণ তুলতে হবে এবং তা করতে গেলে ইংলণ্ডের প্রচণ্ড বোলিং-এর মুখে অষ্ট্রেলিয় ব্যাটস্‌ম্যানরা হয়ত দিশেহারা হয়ে পড়ে চটপট সব 'আউট' হয়ে যাবেন। এই ধারণা করেই বোধ হয় বিল্ লরী ঝুঁকি নিয়ে দ্রুতগতিতে রাণ তুলতে তাঁর ব্যাটস্‌ম্যানদের নির্দেশ দেন নি। বিল্ লরী যে ঠিক পথই নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেটের পতন ঘটে মোট রাণ যখন মাত্র ৪৪। এই সময় 'আউট' হন অষ্ট্রেলিয়ার 'ওপ্‌নিং' ব্যাটসম্যান আয়ান্ রেডপ্‌াথ ইংলণ্ড ফাষ্ট বোলার জন স্নোর বলে এল-বি-ডবলু হয়ে। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ওপ্‌নার বব্ কাউপার গোড়ার দিকে জোরে 'কাট্' মার মারতে গিয়ে বলকে একটু তুলে ফেলে কট্ আউট্ হবার একটি সুবর্ণ সুযোগও দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যবশতঃ বলটি সজোরে ব্যারি নাইট-এর হাতে আঘাত করে এবং নাইট্ ক্যাচটি ধরতে পারেন না। কাউপার কিন্তু এই 'লাইফ্' পাবার পর বেশ সতর্ক হয়ে যান এবং যখন টম্ গ্রেভনী (কাউড্রের অনুপস্থিতে গ্রেভ্‌নী ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব করেছিলেন) 'স্পিন্' বোলার ইলিংওয়ার্থ ও আণ্ডারউড্‌কে বল করতে দিলেন, তখন এই বাঁয়া ব্যাটস্‌ম্যান বব্ কাউপার বাঁয়া বোলার আণ্ডারউড্‌কে খুব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে খেলতে থাকেন, কারণ এই সময় আণ্ডারউড্-এর বল খুবই ভাল হচ্ছিল। ওদিকে আয়ান্ চ্যাপেল্‌ও অফ্‌স্পিন্ বোলার ইলিংওয়ার্থকে ঠেকিয়ে রাখেন। বৃষ্টি নামার

সময় পর্যান্ত অষ্ট্রেলিয়ার এই দু'জন ব্যাটস্‌ম্যান্ অপরাজিত থেকে ২৫ ও ১৮ রাণ যথাক্রমে করেন। রেডপাথ্ আগেই ২২ রাণ করে বিদায় নিয়েছিলেন। তিনটি 'এক্সট্রা' যোগ হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার যখন এক উইকেটের বিনিময়ে ৬৮ রাণ উঠল তখনই বৃষ্টি এসে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটায়।

ইংলণ্ডের প্রশংসনীয় খেলা

এই টেষ্টে কাউড্রের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল জয়লাভের জন্য যে কতটা ভাল খেলেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ড দলের ৪০৯ রাণ করার থেকে। এই ইনিংসে কৃতিত্বপূর্ণ রাণ করেন—কাউড্রে ১০৪, গ্রেভ্‌নী ৯৬ এবং এড্‌রিচ্ ৮৮ রাণ। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ২২২ রাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাণ করেন চ্যাপেল ৭১, কাউপার ৫৭ এবং ওয়াল্টারস ৪৬ রাণ। বোলিং-এ অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রিম্যান ৭৮ রাণে ৪টি ইংলণ্ড উইকেট পান এবং ইংলণ্ডের ইলিংওয়ার্থ ৩৭ রাণে তিনটি ও আণ্ডারউড্ ৪৮ রাণে তিনটি অষ্ট্রেলিয় উইকেট দখল করেন।

কাউড্রের কৃতিত্ব

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার এই তৃতীয় টেষ্ট খেলাটি যে রকম আশা করা গেছিল সে রকম উৎসাহ, উত্তেজনার মধ্যে শেষ না হলেও একটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল। ইংলণ্ড অধিনায়ক কলিন্ কাউড্রে এই খেলায় তাঁর ব্যাটিং শৌর্য্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের এক স্বর্ণ স্বাক্ষর রাখলেন। এই টেষ্ট খেলাটি ছিল কাউড্রের শততম টেষ্ট খেলা এবং এই খেলায় তিনি শতাধিক (১০৪) রাণ করে এই শততম টেষ্ট খেলার মুহূর্ত্তগুলিকে আরও গৌরবোজ্জ্বল করে তুললেন। শুধু এই নয়, কাউড্রের যখন ৬০ রাণ হয় তখনই তিনি টেষ্ট খেলায় ৭০০০ রাণ পূর্ণ করে টেষ্ট খেলায় বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ রাণ সংগ্রহকারীরূপে পরিগণিত হয়েছেন। স্যার লিওনার্ড হাটন্ ও স্যার ডোনাল্ড ব্রাড্‌ম্যানএর ৬৯৯৬ রাণকে তিনি অতিক্রম করেছেন, এখন শুধু ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াল্ডার হ্যামণ্ড-এর ৭২৪৯ রাণের পিছনে আছেন। তবে মনে হয় কাউড্রে অদূরভবিষ্যতে আরও ২৫০ রাণ করে (এখন কাউড্রের রাণ সংখ্যা ৭০৪৪) হ্যামণ্ডের এই রাণ সংখ্যা অতিক্রম করে টেষ্টে বিশ্বেরশ্রেষ্ঠ রাণ সংগ্রহকারীরূপে অভিনন্দিত হবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এর আগের দ্বিতীয় টেষ্টে 'ক্যাচ' ধরায় কাউড্রে টেষ্ট ম্যাচে হ্যামণ্ডের ১১০টি ক্যাচ ধরার রেকর্ড অতিক্রম করেছেন।

এই টেষ্টের পর কেণ্টের কাউণ্টির পুরস্কার মেইড্‌ষ্টোনের একটি নাগরিক ভোজসভায় কলিন্ কাউড্রেকে তাঁর ১০১-তম ইংলণ্ড ক্যাপ্ উপহার দেওয়া হয়। তবে এই টুপিটি সাধারণ টুপি ছিলনা—এটি পুরো রূপার তৈরী! এই টুপিটি কাউড্রে যে ইংলণ্ড ক্যাপ্ পরে সাধারণতঃ খেলে থাকেন, সেই টুপির ঠিক মাপে তৈরী করা হয়েছিল বলে তাঁর মাথায় ঠিক মত বসেছিলও।

এ ছাড়া এই তৃতীয় টেষ্টে কাউড্রের কৃতিত্বপূর্ণ শতরাণের জন্য তাঁকে ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ইংলণ্ড দলের বোলার ডেরেক্ আণ্ডারউড্ও তাঁর চমৎকার বোলিং এর জন্য ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেছেন। অষ্ট্রেলিয় দলের ব্যাটস্‌ম্যান্ আয়ান্ চ্যাপেল ও বোলার এরিক্ ফ্রিম্যান্ও ১০০ পাউণ্ড করে পেয়েছেন এই টেষ্টে সফরকারী দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান ও বোলার রূপে।

এই তৃতীয় টেষ্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া এখনও প্রথম টেষ্ট জিতে একটি খেলায় এগিয়ে রয়েছে। ইংলণ্ডকে এই টেষ্ট পর্য্যায় অমীমাংসিত রেখে সম্মান রক্ষা করতে হলে যেমন করে হোক বাকি দু'টি টেষ্টের একটি টেষ্টে জয়লাভ করতে হবে। আর 'রাবার' লাভ করতে হলে বাকী দু'টি টেষ্টেই জিততে হবে। কিন্তু খেলার গতি প্রকৃতি এবং বৃষ্টির বহর দেখে মনে হয় না যে ইংলণ্ড বাকি দুটি টেষ্টই জিততে পারবে। হয়ত একটিতে জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু আর একটি টেষ্ট খুব সম্ভব অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হবে। তবে অষ্ট্রেলিয়ার জেতার সম্ভাবনা-কেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

— চতুর্থ টেষ্ট —

ইতিমধ্যে লীড্‌স মাঠে চতুর্থ টেষ্ট খেলাটিও শেষ হয়েছে। ফলাফল সেই অমীমাংসিতই রয়ে গেল। সুতরাং ঐতিহাসিক সেই "অ্যাসেজ্‌" রয়ে গেল অষ্ট্রেলিয়ার দখলেই। এই "অ্যাসেজ্‌" গত নয় বৎসর ধরে অষ্ট্রেলিয়ার অধিকারেই রয়েছে। ইংলণ্ড এবারও তা ছিনিয়ে নিতে পারল না। ইংলণ্ডের সত্যই দুর্ভাগ্য; কারণ এবারকার ইংলণ্ড দল কোনও অংশেই অষ্ট্রেলিয় দলের চেয়ে হীন ছিল না, বরং কয়েক ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ে শক্তিশালীই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ড ভাল খেলেও দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভ করতে পারল না—বৃষ্টির জন্য খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই। এখন বাকি পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ড যদিও জয়লাভ করে তবুও তারা "অ্যাসেজ্‌" ফিরে পাবে না, কারণ "রাবার" অমীমাংসিত থেকে যাবে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্টে জয়লাভের জন্য।

ফলাফল

লীড্‌স-এর হেডিংলী মাঠে অনুষ্ঠিত এই চতুর্থ টেষ্টের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আঘাতের জন্য দুই দলের অধিনায়কই খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না। এই টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া প্রথমেব্যাট করবার সুযোগ পায় এবং তারা প্রথম ইনিংসে ৩১৫ রাণ তোলে। ইংলণ্ড দল এর প্রত্যুত্তরে করে ৩০২ রাণ। মাত্র ১৩ রাণে এগিয়ে থেকে অষ্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিস-এর খেলা সুরু করে এবং দৃঢ়তাপূর্ণ ভাবে খেলা এই ইনিংসে ৩১২ রাণ করে। অষ্ট্রেলিয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌রা গোড়ার থেকেই খুব দৃঢ়তাপূর্ণ ভাবে খেলতে থাকে রাণ সংখ্যা বাড়ানর সঙ্গে সময় কাটাবার জন্যও। এই হেডিংলী 'পীচ্‌' ইংলণ্ড স্পীনার রে, ইলিংওয়ার্থকে এই সময় খুবই সাহায্য করছিল। তাই অষ্ট্রেলিয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌রা খুবই সতর্কতার সহিত খেলতে থাকেন।

প্রশংসনীয় খেলা

আয়ান্‌ রেডপাথ, ডগ্‌ ওয়াল্টার্স এবং আয়ান্‌ চ্যাপেল্‌ এই সময় প্রশংসনীয় ভাবে ব্যাটিং করে অষ্ট্রেলিয়ার রাণ সংখ্যা বর্দ্ধিত করে অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। রেডপাথ, ওয়াল্টার্স এবং চ্যাপেল্‌ যথাক্রমে ৪৮, ১৬ ও ৮১ রাণ করেন। আর, ইন্‌ভেরারিটি ও এ, পি, সিহানও ২৪ ও ৩১ রাণ সংগ্রহ করেন। ইংলণ্ডের স্পীন্‌ বোলার রে, ইলিংওয়ার্থ এই ইনিংসে ৫১ ওভার বল ক'রে ৮৭ রাণ দিয়ে ছয়টি অষ্ট্রেলিয় উইকেট দখল করে বেলিং-এ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ইংলণ্ডের ব্যর্থ চেষ্টা

ইংলণ্ড দল এর পর ৩২৫ রাণের পশ্চাতে থেকে তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংস্‌ এর খেলা আরম্ভ করেন। জয়লাভের জন্য ৩২৬ রাণ করতে হবে মনে রেখেই ইংলণ্ড ব্যাটস্‌ম্যানেরা খেলতে আরম্ভ করেন বটে কিন্তু চার উইকেটের বিনিময়ে যখন তাঁদের রাণ সংখ্যা ২৩০ ওঠে তখনই খেলার নির্দ্ধারিত সময় শেষ হয় এবং চতুর্থ টেষ্ট অমীমাংসিত থেকে যায়। সময় থাকলে ছয়টি উইকেটে আরও ৯৬ রাণ সংগ্রহ করা ইংলণ্ডের পক্ষে মোটেই দুরূহ হত না এবং বিজয়লক্ষ্মী তাদেরই অঙ্কশায়িনী হতেন। কিন্তু ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য এবং অষ্ট্রেলিয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌দের কৃতিত্ব ইংলণ্ডকে জয়লাভে এবং "অ্যাসেজ্‌" পুনরুদ্ধার থেকে বঞ্চিত করল।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল খেলেছেন জন, এড্‌রিচ (৬৪), টেড ডেক্সটার (৩৮), টম্‌ গ্রেভনী (৪১) কেন্‌ ব্যারিংটন (অপরাজিত ৪৬) এবং কেন্‌ ফ্লেচার (অপরাজিত ২৩)।

পঞ্চম টেষ্টে কি ইংলণ্ড জিতবে ?

এখন বাকি রইল একটি মাত্র টেষ্ট খেলা। এই পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ড যদি জয়লাভ করতে পারে তাহলে "অ্যাসেজ্‌" পুনরুদ্ধার করতে না পারলেও 'রাবার' অমীমাংসিত রেখে সম্মান রক্ষা করতে পারবে। আর তা না হলে রাবারও হারাবে এবং সেই সঙ্গে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিজয়ের গৌরবও ম্লান হয়ে যাবে। তাই মনে হয় এই পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ড মরণপণ সংগ্রাম করবে।

— উইম্বলেডন বিজয়ী —

এবারকার প্রথম উন্মুক্ত উইম্বলেডন্‌-এ পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলেন অষ্ট্রেলিয় পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভর। লেভরই ছিলেন এক নম্বর সিডিং বা বাছাই

খেলোয়াড়এবংফাইনালে তাঁরপ্রতিদ্বন্দ্বীছিলেন তাঁর দেশেরই আর এক পেশাদার খেলোয়াড় টনি রচ, যাঁর 'সিডিং' ছিল পনের নম্বর। কিন্তু টনি রচ্ ফাইনালে উইম্বলেডন্ ফাইনালের উপযোগী দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেন নি। লেভর তাঁকে সহজেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-২ সেটে পরাজিত করেন। ২৯ বৎসর বয়স্ক কুইনস্ল্যাণ্ডের এই খেলোয়াড় এর আগে অপেশাদার রূপে দু'বার ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে উইম্বলেডন্ বিজয়ী হন। ছয় বৎসর পরে আবার পেশাদার রূপে সর্ব্বপ্রথম উন্মুক্ত উইম্বলেডন্ বিজয়ী হলেন—এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। রড্ লেভরও খেলার শেষে তাই নিজ মুখে বলেছেন—'আমার টেনিস্ জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল এই উন্মুক্ত উইম্বলেডন্-এর সর্ব্বপ্রথম বিজয়ী হওয়া।'

বিলি জিন্ কিং-এর দ্বিমুকুট লাভ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদার মহিলাখেলোয়াড় ও মহিলা বিভাগের প্রথম'সিড' বা বাছাই বিলি জিন কিং এইপ্রথম উন্মুক্ত উইম্বলেডন্প্রতিযোগিতার একমাত্র খেলোয়াড় যিনি দু'টি খেতাব জয় করলেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার জুডি টেগাটকে ৯-৭ ও ৭-৫ সেটে পরাজিত করে উপর্য্যুপরি তিনবার উইম্বলেডন্ চ্যাম্পিয়ন্ হবার গৌরব অর্জন করেছেন। তাছাড়া মহিলাদের ডাবলস্ ফাইনালে তিনি তাঁর স্বদেশীয়া পেশাদার খেলোয়াড়রোজমেরী ক্যাসল্স্-এর সহযোগিতায় ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া দুর ও বৃটেনের অ্যান্ জোন্স্ জুটিকে ৩-৬, ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে পরাজিত করে এই প্রথম উন্মুক্ত উইম্বলেডন্-এ দ্বিমুকুট অর্জ্জনের গৌরবে ভূষিত হলেন। গত বছরের বিজয়িনী এঁরাই ছিলেন এবারকার প্রথম বাছাই (Seed)।

অন্য বিভাগের ফলাফল

পুরুষদের ডাবলস্-এ চার নম্বর বাছাই অষ্ট্রেলিয় জুটি জন্ নিউকোম্ব ও টনি রচ্ তাঁদের স্বদেশীয় দুই নম্বর বাছাই জুটি কেন্ রোজ্ওয়াল্ ও ফ্রেড্ ষ্টোল্-কে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৩-৬, ৮-৬, ৫-৭, ১৪-১২ ও ৬-৩ সেটে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। তাঁদের খেলার 'সেট্ স্কোর' থেকেই বোঝা যায় খেলাটি কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল।

মিক্সড্ ডবলস্ ফাইনালে চার নম্বর বাছাই অষ্ট্রেলিয় জুটি কেন্ ফ্লেচার ও মার্গারেট কোর্ট ৬-১ ও ১৪-১২ সেটে রাশিয়ার জুটি আলেক্স মেট্রিভেলি ও ওল্গা মোরোজোভা-কে পরাজিত করে এই খেতাবটি দ্বিতীয়বার জয় করেন। উল্লেখযোগ্য যে এই প্রথম রুশীয় খেলোয়াড়রা উইম্বলেডন্-এর সিনিয়র বিভাগের ফাইনালে খেলার সুযোগ লাভ করলেন।

— অলিম্পিকের হকি দল —

জলন্ধরে তিনদিনের ট্রায়াল খেলার পর আগামী মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় হকি দলের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় দশজন নতুন খেলোয়াড়ের নাম দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ চার বৎসর পূর্বে টোকিও অলিম্পিকে যাঁরা খেলে ভারতকে বিশ্বজয়ী করেছিলেন তাঁদের দশজন এবার বাদ পড়লেন। ভারতীয় হকি ফেডারেশন্-এর সভাপতি শ্রীঅশ্বিনী কুমার দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করবার সময় বলেছেন—"It is a wondaerful blend of youth and experience."

নীচে খেলোয়াড়দের নামের তালিকা দেওয়া হল :—

গোল—আর, ক্রীষ্ট (মহিশূর) ও মুনির শেঠ (মাদ্রাজ)।

ব্যাক্—পৃথিপাল সিং (পাঞ্জাব), গুরবক্স সিং (বাংলা) এবং ধরম সিং (পাঞ্জাব)।

হাফ-ব্যাক—বলবীর সিং (সার্ভিসেস্), জগজিৎ সিং (পাঞ্জাব), অজিতপাল সিং (পাঞ্জাব), হরমিক সিং (পাঞ্জাব) এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তি (মাদ্রাজ ও রেলওয়েস্)।

ফরওয়ার্ডস—বলবৎ সিং (রেলওয়েস্), ভি, জে পিটার (সার্ভিসেস্), হরবিন্দর সিং (রেলওয়েস্) ইন্দর সিং (রেলওয়েস্), তারসিম্ সিং (পাঞ্জাব), ইনম্ উর-রেহমান্ (বাংলা ও রেলওয়েস), বলবীর সিং (পাঞ্জাব এবং গুরবক্স সিং (রেলওয়েস্)।

ষ্ট্যাণ্ড-বাই—

গোল—সতিন্দরপাল সিং (সার্ভিসেস্)।

ব্যাক্—বি, এস, গিল্ (সার্ভিসেস্) এবং

সি, এস, ধিলন (সার্ভিসেস্

হাফ ব্যাক্—হরপাল সিং (সার্ভিসেস্) এবং
এ, ডি, ক্রুজ্ (বোম্বাই)।

ফরোয়ার্ড—গনি মহিউদ্দিন্ (মহীশূর) এবং
শাহীদ নূর (ভূপাল ও ইণ্ডিয়ান্ এয়ারলাইন্স্)

দলের অধিনায়কের নাম এখনও ঘোষণা করা হয় নি। উটাকামণ্ডের লাভডেল্-এ এক্‌জিকিউটিভ্ কমিটির মিটিং-এর পর অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক, কোচ্ বা শিক্ষক এবং ম্যানেজারের নাম ঘোষণা করা হবে।

গর্ব্বের সহিত এখানে আবার উল্লেখ করছি যে সর্ব্বপ্রথম ১৯২৮ সালে অলিম্পিক হকি খেলাতে যোগদানের পর থেকে, একবার মাত্র ১৯৬০ সালে পাকিস্থানের কাছে ফাইনালে পরাজিত হওয়া ছাড়া, ভারত একাদিক্রমে প্রতিবারই বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করে এসেছে। এবারও ভারতের অগণিত ক্রীড়ামোদি জনতা, হকি খেলায় অনুরক্ত হন বা না হন, সকলেই আশা করে আছেন এবারও ভারত মেক্সিকো অলিম্পিকে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করে ফিরতে পারবে।

—টেনিস খেলোয়াড়দের ভ্রমণ—

অষ্ট্রেলিয় টেনিস এসোসিয়েশনের নিকট ভারতীয় টেনিস এসোসিয়েশন্ ভারতের তরুণ টেনিস খেলোয়াড়দের অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টেনিস শিক্ষা ও সফরের ব্যবস্থা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। অষ্ট্রেলিয় টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ বিল্ এডওয়ার্ডস এবং শিক্ষক মিঃ হ্যারি হপ্‌ম্যান্ এই ভ্রমণের ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হবেন বলে জানিয়েছেন। এই ব্যবস্থা যদি কার্য্যকরী হয় তাহলে তিনজন তরুণ খেলোয়াড় আগামী নভেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় যাবেন এবং সেখানে হ্যারি হপ্‌ম্যানের শিক্ষা থেকে এবং সফরের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যে যথেষ্ট উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

— এশিয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা —

দ্বিতীয় এশিয় ব্যাডমিণ্টন্ প্রতিযোগিতা ম্যানিলায় আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের তিন তারিখে আরম্ভ হয়ে ১৫ তারিখ অবধি চলবে। এই প্রতিযোগিতায় মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল এই সাতটি দেশ যোগদান করবে বলে জানিয়েছে। এ ছাড়া জাপান, হংকং, তাইওয়ান্ দক্ষিণ কোরিয়া, বর্ম্মা, কাম্বোডিয়া, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, এবং নেপাল প্রভৃতি দেশেরও যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

প্রতিযোগিতাটিকে ২টি ভাগে ভাগ করা হবে প্রথম ভাগটি হবে (Iuter-nation) আন্তর্জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয় ভাগটি হবে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা (Open taurona-ment)। ফেব্রুয়ারী মাসের তিন থেকে আট তারিখ পর্য্যন্ত "ইণ্টারনেশন" প্রতিযোগিতা এবং দশ থেকে পনের তারিখ পর্য্যন্ত "ওপেন্ টুর্ণামেণ্ট" অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস, মিক্সড ডাবলস ছাড়া জুনিয়ার ছেলে ও মেয়েদেরও সিঙ্গলস, ডাবলস, মিক্সড ডাবলস বিভাগ থাকবে। জুনিয়র বিভাগের বয়স সীমা ধার্য্য করা হয়েছে আঠার বৎসর।

———

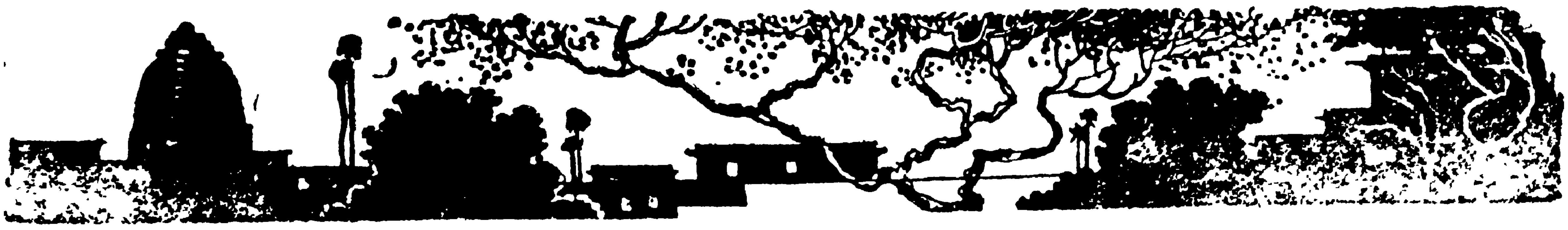

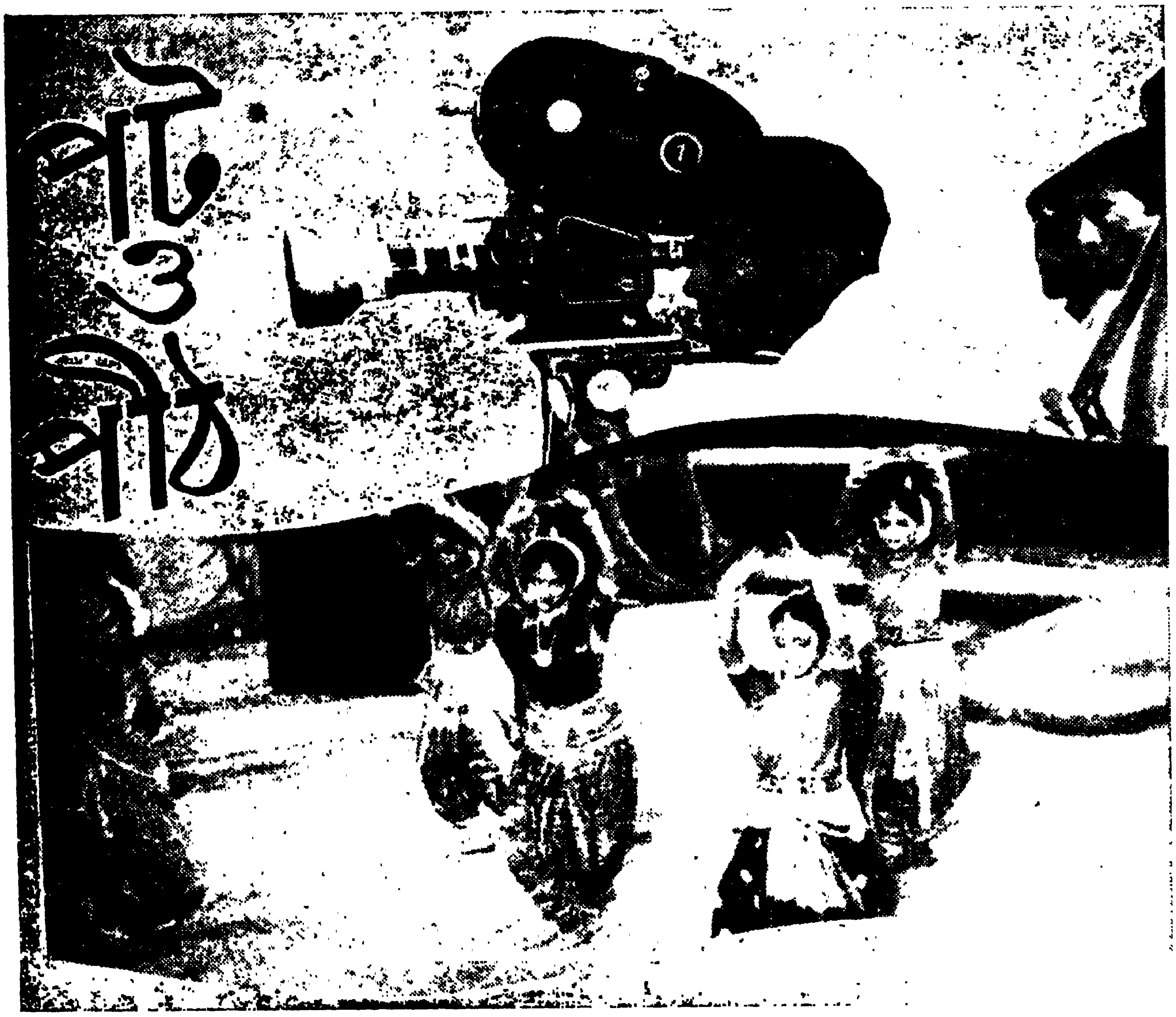

সমস্যা ও সমাধান

‘স্ম’

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যে সঙ্কট চলছে তার সমাধান হবার আশু সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না। বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের চিত্র-প্রদর্শন গৃহগুলির দরজা বন্ধ থাকবার পর যখন তা এক এক করে খুলতে লাগল, তখন সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে এখনও দেরী আছে। তাই কয়েকটি চিত্রপ্রদর্শন গৃহের সামনে এখনও পিকেটিং চালু রয়েছে; সভা, সমিতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে; প্রচার, প্রতিবাদ চলছে। অর্থাৎ এই শিল্পক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা এখনও ফিরে আসে নি—আর কবে যে আসবে তা কেউই বলতে পারবেন না। তবে এইটা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন যে এরকম একটা অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর অবস্থা, চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে তো নয়ই, কোনও শিল্পের ক্ষেত্রেই বেশী দিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। এতে হয়ত কোনও পক্ষের কিছু লাভ হলেও হতে পারে, কিন্তু

শিল্পের ক্ষেত্রে যে একটা আঘাত এসে পড়ে তা অনস্বীকার্য্য এবং সেই আঘাতের জের চলবে অনেকদিন—ক্ষত শুকাতে সময় তো লাগেই, তার ওপর রেখে যায় একটা গ্লানি আর তিক্ততা।

এ অবস্থার মধ্যে বিবদমান দু'পক্ষ ছাড়া আর একটি যে তৃতীয় পক্ষ রয়েছেন তার কথা মনেহয় কোনও পক্ষই ভাবছেন না। অথচ এই তৃতীয় পক্ষই হচ্ছে এই শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা প্রাণ, আর এই প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দেয় অর্থেই চলে এই শিল্পের চাকা। এই পৃষ্ঠপোষকটি আর কেউ নয়, এ হচ্ছে বাংলা দেশের অগণিত দর্শকবৃন্দ। এই দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্থাৎ বক্স-অফিসের সাফল্যের উপরই নির্ভর করে আছে সকল দেশেরই সিনেমা-শিল্প। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা আজকাল আর এই দর্শকদের দিকটা যেন দেখবার দরকার আছে বলে মনে করা হচ্ছে না। দীর্ঘ তিন মাস বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত সিনেমা গৃহ বন্ধ যাবার পর যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে তখন এল আবার একটা আঘাত। এ আঘাত হানার যুক্তি নিশ্চয়ই আছে এবং সে যুক্তিকে অবহেলা না করে মেনে নিয়েই বলছি, এ অবস্থার শীঘ্র অবসান হওয়া দরকার। কারণ চলচ্চিত্র দর্শকরা কোনও পক্ষেই নেই, তাঁরা চান নির্মল আনন্দ পাবার জন্য এই প্রমোদ শিল্পটিতে অর্থ ব্যয় করতে এবং সেই অর্থেই এই শিল্প চালু থাকে। যদিকোনও বিশেষ শ্রেণীর, যেমন বাংলা চিত্র দেখতে তাঁরা বাধা পান তখন তাঁরা অন্য শ্রেণীর বা অন্য ভাষী চিত্র দেখতে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবেন না। তার ফলে হবে বাংলা চিত্রের ক্ষতি এবং অন্য ভাষী চিত্রের লাভ। এ রকম হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? আমরা বাংলার দর্শকদের বাংলা চিত্র বেশী করে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে আসছি এবং এ অনুরোধে অনেকেই সাড়া দিচ্ছেন, কিন্তু হঠাৎ যদি আবার উল্টো রকম হাওয়া বইতে থাকে তাহলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে সেটা সবাইকে অনুধাবন করে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। অনুরোধ জানাচ্ছি সকল পক্ষকেই শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষ করে সিনেমার মতন একটি সুকুমার শিল্পক্ষেত্রের সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ শান্তিপূর্ণভাবে, সুস্থতার মাধ্যমে, কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করে, ধৈর্য্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে। কারণ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সকল সমস্যা, সকল সঙ্কট একদিনে দূর হতে পারে না। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে বাংলা চিত্রের মান আরও উন্নত করতে হবে আরও বেশী সংখ্যায় চিত্র নির্মাণ করতে হবে, আরও বেশী করে প্রদর্শন করতে হবে, আরও বেশী করে দর্শক আকর্ষণ করতে হবে, আরও বেশী মূলধন নিয়োগ করতে হবে। আর অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে আরম্ভ করে সকল-স্তরের কলাকুশলী ও শিল্পীদের এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলকেই কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে—করতে হবে আরও অনেক কিছুই। সকল মতবিরোধ, সকল মনোমালিন্য, সকল মনকষাকষি দূর করে এই শিল্পের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে সুস্থ, সুন্দর আবহাওয়া। আর সকলকে কাজ করতে হবে একযোগে—একপ্রাণ, একমন হয়ে। তবেই হয়ত বাংলা চলচ্চিত্রের সকল সমস্যার সমাধান হবার পথ তৈরী হবে।

* * * * * *

প্রশ্নোত্তর

অশোক ঠাকুর—কলিকাতা-৩৬

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তা শুধু আমাকে কেন, প্রত্যেক বাংলা ছবির অনুরাগীদের চিন্তান্বিত করেছে। হিন্দী ছবি আমি দেখি না। শুধু-মাত্র বাংলা ছবি দেখেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং তা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দ পাই। এর কারণ বাংলা আমার মাতৃভাষা বলে নয়, বাংলা ছবি অন্যান্য ভাষায় তোলা ছবি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বলে। তাই আজ মাস ছয়েক বাংলা ছবি দেখা থেকে বঞ্চিত থাকাতে

স্বভাবতঃ মনে প্রশ্ন জাগে এই সংকট কবে শেষ হবে।

বাংলা ছবিকে বাঁচানোর জন্য সংরক্ষণ সমিতির প্রথম দাবীটি (আয়ের ৫০% প্রযোজক এবং কলাকুশলীদের দিতে হবে) অবশ্য যুক্তিপূর্ণ কিন্তু দ্বিতীয় দাবীটি (প্রত্যেক ছবিকে রিলিজের গ্যারাণ্টি দিতে হবে) আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কেননা আজ যে কথা হচ্ছে প্রত্যেক সিনেমা গৃহে বৎসরে কয়েক সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখাতেই হবে এবং বাংলা চিত্রগৃহের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে, তা যদি কাজে পরিণত হয় তখনতো সব বাংলা ছবিই মুক্তি পেতে পারবে। তাছাড়া তারকাহীন অনেক উৎকৃষ্ট এবং বাজে ছবিও তো মুক্তি পেয়েছে। তারকাহীন ছবি "ছুটি" ও" বালিকা বধূ" প্রদর্শকদের যে টাকা এনে দিয়েছে তাই থেকে মনে হয় প্রদর্শকরা উৎকৃষ্ট তারকাহীন ছবি দেখাতে আর কুণ্ঠিত হবেন না। এর জন্য আন্দোলন করে সিনেমা গৃহ বন্ধ করে বাংলা ছবির মুক্তি বন্ধ রেখে কি লাভ বুঝতে পারি না। আমাদের এখন লক্ষ্য রাখা উচিত কি করে কম খরচে ভাল ছবি তৈরী করা যায় এবং বাংলা চিত্রগৃহের সংখ্যা বাড়ানো যায়। তা না করে শুধু শুধু সিনেমা গৃহ বন্ধ করে কোন লাভ হবে না। এ বছর মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা দশও হবে কিনা সন্দেহ।

তাই সমস্ত প্রদর্শক গোষ্ঠী এবং চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির নিকট আমার অনুরোধ, তাঁরা যত শীঘ্র পারেন এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বাংলা ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করুন। এতে হয়ত তাঁদের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হবে, কিন্তু তার বদলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প বাঁচবে এবং লক্ষ লক্ষ বাংলা চলচ্চিত্রানুরাগীদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ তাঁরা পাবেন।

আমি একজন বাংলা ছবির দর্শক। সেই হিসাবে এর সংকটের কথা লিখবার চেষ্টা করলাম। যদি কোথাও ভুল থাকে ধরিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন এবং এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় কি আপনার মতে তা জানাবেন। নমস্কার জানবেন। বিনীত

অশোক ঠাকুর
৫, ময়রাডাঙ্গা রোড
কলিকাতা—৩৬

* * *

* আপনার পত্রের কিছুটা উত্তর "সমস্যা ও সমাধান" লেখাটির মধ্যেই পাবেন। সংরক্ষণ সমিতির যুক্তি নিশ্চয়ই আছে এবং তাঁরা বাধ্য হয়েই এই সংগ্রামে নেমেছেন, তবে দর্শকদের, বিশেষ করে যাঁরা বাংলা ছবিই দেখে থাকেন, তাঁদের যে অসুবিধা হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং অনেকেই হয়ত বাংলা ছবি না দেখতে পেয়ে ইদানীং হিন্দী ও ইংরাজী চিত্র দেখেই চিত্তবিনোদন করছেন। এটা বাংলা চিত্রের পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। তবে আশা করি শীঘ্রই এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া কেটে গিয়ে বাংলার চিত্র শিল্পে সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

* * * * *

— চিত্রলেখা —

"এই রাস্কেল দু'টো আমাকে জ্বালিয়ে খেলে, কাল হতে তোমরা দুজনে উজ্জলায় থাকবে, তোমাদের মত ভলান্টিয়ারের আমার কোন দরকার নেই।" ক্ষেপে গিয়ে বললেন পূর্ণ সিনেমার G. O. C. পরিচালক পিনাকী মুখার্জী।

চিত্রশিল্পী মনীশ দাসগুপ্ত ও সহকারী কালী ব্যানার্জির কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলনা। মমীর মত শূন্য দৃষ্টিতে তাঁরা দুজনে তাকিয়ে রইলেন পিনাকীবাবুর হাতের সিগারেটের প্যাকেটের দিকে।

দুজনকে দুটো সিগারেট দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন পিনাকীবাবু।

"Zero hour isadvansing, get ready boys, এখুনি গেট খুলবে।"

কর্কশ ধাতব শব্দ করে গেট খুলে যেতে লাগল।

শুরু হবে এখানে লোকের আনাগোনা। কলাকুশলী ও শিল্পীরা সবাই এতদিন ধরে সিনেমাহাউসগুলোর সামনে ও আশেপাশে দাঁড়িয়ে কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করেছেন কতক্ষণে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হবে জনতায়, যে জনতা তাঁদের ভাগ্যবিধাতা, যে জনতার সামান্য আঙুলের ইশারায় নির্দ্ধারিত হয় তাঁদের ভবিষ্যৎ, সেই জনতাকে আজ বলতে হবে, বোঝাতে হবে তাঁরা যেন ছবি না দেখেন। নিজের সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে স্রষ্টাকে বলতে হবে "তোমরা একে বর্জন করো।" কোন উপায় নেই। কর্ত্তব্য, তা সে যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন তা পালন করতেই হবে।

উত্তমকুমার কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী, রাধা ও পূর্ণ সিনেমার সামনে দাঁড়ান নির্ভীক সংগ্রামীরা। যা হবে তা ভালভাবেই হবে। মরতে হলে ভালভাবেই মরব, বাঁচতে হলে ভাল-ভাবেই বাঁচব। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ আর নয়।

রাজনীতি অথবা এ জাতীয় কোন সংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোথাও মালিক ও শ্রমিক একই সঙ্গে একই প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন বলে আমার জানা নেই। অন্ততঃ সৃষ্টিমূলক কোন শিল্পের ক্ষেত্রে বোধহয় নয়। তাই আমার মনে হয়েছিল যে এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত্ত। প্রযোজক, পরিবেশক, কলাকুশলী, শিল্পী কেউ পিছিয়ে ছিলেন না এ সংগ্রামে। সবাই একই সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজপথে। সবায়ের মুখে একই রকমের দৃঢ়তার ছাপ "আর নয়।"

এ এক অগ্নিপরীক্ষা বটে! জনতার সামনে এগিয়ে এলেন জনতার প্রিয়শিল্পীরা নিজ অভিনীত "অগ্নি-পরীক্ষা"-র ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে উত্তমকুমার বললেন "যতদিন না সিনেমা কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবী মেনে নিচ্ছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ দয়া করে ততদিন আপনারা এ হলে কোন ছবি দেখবেন না। এমন কি আমার ছবি হলেও না। সিনেমা কর্তৃপক্ষ বারো আনা আর গোটা সিনেমা ইণ্ডাষ্ট্রী পাবে চার আনা, এরকম অদ্ভুত ব্যবস্থা চলতে পারে না।"

কফি খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে উঠছিল অরুণ। Common Sence বলে কোন পদার্থ মেয়েজাতটার মগজে যদি থাকে! কখন থেকে হা পিত্যেস করে বসে রয়েছে সে এদিকে এখনও অবধি শীলার কোন পাত্তাই নেই। ওর আর কি, যত গরজ যেন অরুণেরই। এদিকে দুজনেরই বাড়ীতে 'কারফিউ অর্ডার', ওদিকে পার্কে বসলে পুলিশে ধরবে। একমাত্র এই কফি হাউস ও সিনেমাগুলো এখনও অতটা নিষ্ঠুর হয়নি।

একরাশ সুগন্ধ ছড়িয়ে সামনের চেয়ারটায় ঝুপ করে বসে পড়ল শীলা। অরুণ খুব রেগে আছে তার ওপর কিন্তু কি করবে, নিরুপায় সে। জীবনে এরকম একটা রোমাঞ্চকর মুহূর্ত্ত ছেড়ে কি করে সে—

"এই শুনছ"

"কি?"

"আমার ওপর খুব রেগে গেছ জানি, কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না লক্ষ্মীটি।"

"রাগ করবারও একটা অধিকার থাকা চাই, সে অধিকার তোমার ওপর আমার নেই।" সিগারেট ধরাল অরুণ।

বিকাশ রায়

রবি ঘোষ

সবিতাব্রত দত্ত

অনিল চট্টোপাধ্যায়

"লক্ষ্মীটি, Please, আর কখনও এরকম হবে না।"
"মনে থাকবে কথাটা?"

"থাকবে, থাকবে, থাকবে, তিন সত্যি।"
"উঠে পড়, আর সময় নেই।"
"কেন, কোথায় যাবে?"
"বাঃ, নিজেই বললে কাল সিনেমায় যাবে; আর দেরী করলে টিকিট পাওয়া যাবে না, উঠে পড় শিগ্‌গির।"
"কিন্তু সিনেমা দেখতে বারণ করলে যে!"
"সিনেমা দেখতে বারণ করলে? কে?"
"উত্তমদা"
"উত্তমদা!—তোমার শরীর কেমন আছে?"
"খুব ভাল আছে, একটু আগে সিনেমা হাউসের সামনে দিয়ে আসছি দেখি খুব ভীড়, কাছে গিয়ে দেখি—উত্তেজিতভাবে অরুণের কাছাকাছি আরও নিবিড় হয়ে এগিয়ে এল শীলা।

সময় কোনদিন কারুর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে না। যথা নিয়মে সে এল আবার চলেও গেল। যে সব প্রেক্ষাগৃহে জনসাধারণ এতদিন হেসেছেন-কেঁদেছেন তারা আজ পড়ে রইল শূন্য, ফাঁকা। বাঙালী দর্শকবৃন্দ যে ভাবে কলাকুশলী ও শিল্পীদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাকে একক আর অভূতপূর্ব বলা যায়। এ ব্যাপারে সবচাইতে এগিয়ে রয়েছেন ভবানীপুরের জনসাধারণ। বারোই জুলাই হতে একজনও ছবি দেখতে আসেন নি। অবশ্য এর মধ্যে দু-একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। যেমন ধরন উজ্জ্বলা সিনেমার কথা। চোদ্দই জুলাই দুপুরের শোতে এক দম্পতি এলেন ছবি দেখতে। শিল্পী ও কলাকুশলীদের অনুরোধ-উপরোধ কোন কিছুতেই তাঁরা কর্ণপাত করলেন না। ছবি তাঁরা দেখবেনই, দেখতে হবেই। শেষ অবধি উপায়ন্তর না দেখে আন্দোলনকারীরা মাটিতে শুয়ে পড়ে অবরোধ করলেন। কিন্তু এতেও তাঁদের টলান গেল না। আন্দোলনকারীদের বুকের ওপর পা দিয়ে হেঁটে গিয়েই বুকিং কাউন্টারে উপস্থিত হলেন। বাঙালী হয়ে বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে সহজেই তাঁরা দু'পায়ে মাড়িয়ে গেলেন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই। ১৪ই জুলাই সন্ধেবেলা পূর্ণ সিনেমার সামনে আর একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল। কিছু সংখ্যক উৎসাহী যুবক এসে

দাবী করেন তাঁদের ছবি দেখতে দিতে হবে। তাঁরা পয়সা দিয়ে ছবি দেখতে এসেছেন এবং এ সমস্ত কোন আন্দোলনের ধার তাঁরা ধারেন না। গোলমাল সৃষ্টি করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন এমন কি শেষ অবধি "বাঙলার সংস্কৃতি ধ্বংস হোক, বাঙলা ভাষা ধ্বংস হোক" এ ধরণের শ্লোগান দিতেও তাঁদের একটুও বাধেনি। অবশ্য ছবি তাঁরা দেখতে পারেন নি, স্থানীয় জনসাধারণের সময়োচিত সাবধানতার জন্যে। ব রই জুলাই হতে আসল সংগ্রাম শুরু। সম্পূর্ণ সার্থকভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করলেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্ত্তী (চিত্রশিল্পী), পিনাকী মুখার্জী (পরিচালক), অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী (পরিচালক), সত্যেন চ্যাটার্জী (শব্দ-যন্ত্রী) ও প্রভাত মুখার্জী (পরিচালক)।

সহকারী পরিচালক মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে। বিয়ের আসরে কি ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে তা সবিস্তারে বর্ণনা করে গেলেন পূর্ণ সিনেমার ফুটপাথে বসে সহকারী চিত্রশিল্পী কালী ব্যানার্জী। মহেন্দ্রবাবু বিয়ের আসরে বসে আছেন এমন সময় হবু শ্বশুর মশায় এলেন। লগ্নের সময় এগিয়ে আসছে বাবাজীকে এবারে উঠতে হবে। মহেন্দ্রবাবু উঠলেন। ভেতরে এসে জামা-কাপড় বদলালেন। নতুন ধুতি ও রেশমের চাদর গায়ে দিলেন। শ্বশুর মশায় দেখে খুশী। কারণ শীতের সময় জামাইকে আর কোট দিতে হবে না শুধু গোটা কয়েক বোতাম কিনে দিলেই হবে। যাই হোক মহেন্দ্রবাবু ছাদনাতলায় এসে বসলেন। অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের পর এবারে মালা বদল হবে। মহেন্দ্রবাবু গলা হতে মালা খুলে কনের গলায় পরিয়ে দিলেন। কনের পালা এবারে। মালা এগিয়ে নিয়ে এসে কনের হাত দুটো থেমে গেল! ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল কনে। দৌড়ে এলেন শ্বশুর মশাই। কাঁদতে কাঁদতে কনে বলল "বাবা, তোমার কাছে আমি কি দোষ করেছিলাম যে তুমি আমাকে দোজবরে বিয়ে দিচ্ছ!" শ্বশুর মশায় মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন "দোজবরে নয় মা প্রথম-পক্ষই, আমি ভালকরে খোঁজ-খবর নিয়েছি।" মহেন্দ্রবাবুর টাকের দিকে তাকিয়ে কনে এবারে বলল "কিন্তু বাবা, মাথায় হাত বুলাবার দরকার হলে আমি কি করব? কার মাথায় হাত বুলোব?"

উপায়ন্তর না দেখে শ্বশুর মশায় বললেন "তুমি এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যেয়ো মা এখন দয়া করে

পরিচালক—সুশীল মজুমদার

পরিচালক—তরুণ মজুমদার

পরিচালক—হীরেন নাগ

তরুণকুমার

বাবাজীর গলায় মালাটা দিয়ে দাও।" বলে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে কোন রকমে ঠাণ্ডা করলেন। মহেন্দ্রবাবু

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন আর মনে মনে বলছেন—"কোন রকমে বিয়েটা একবার চুকুক তারপর তোমাকে আলু-কাবলী বানিয়ে ছাড়ব।"...

এইঅব্দি বলা হয়েছে এমন সময়ে মহেন্দ্রবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। "আমার বউকে আলুকাবলী বলবার কি অধিকার আছে এই চাষা'টার! একেবারেই গরু এটা।" কালীবাবু হাত দুয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে বললেন 'একি, একি, একি, মানুষকে গরু বলাটা কোথাকার সভ্যতা; আমি G. O. C.-র কাছে Complain করছি মহেনদা আমাকে গরু বলে অপমান করেছেন। Complain শুনবেন কি কালীবাবুর বর্ণনা শুনে উপস্থিত সবাই হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

আন্দোলন চলছিল কিন্তু ষ্টুডিওর কাজকর্মও সব চালু রাখা হয়েছিল। এইভাবে ঝড়, জল, রোদ ও সব বাধাকে উপেক্ষা করে আন্দোলন এগিয়ে চলল। বার, তের, চোদ্দ, পনের ষোল, সতের, আঠারো তারিখ হতে প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা দরজা বন্ধ করলেন। বোধ হয় উপায়ন্তর ছিল না। কারণ আঠারোই তারিখ হতে সমস্ত ষ্টুডিও ও ল্যাবরেটরীর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্যে। ঐদিন বিকেলে আরও একটি ঘটনা ঘটল যেটাকে নিঃসন্দেহে বলা যায় জয়ের প্রথম পদক্ষেপ। রূপবাণী, ভারতী ও অরুণা চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ সমিতির সর্ত মেনে নিলেন ও তাঁদের সিদ্ধান্ত সমিতিকে জানিয়ে দিলেন। সমিতির অফিসে চিঠি আসামাত্র অসিত চৌধুরী, সত্যনারায়ণ খাঁ, বিকাশ রায় ও অজিত বসু ছুটে গেলেন আন্দোলনকারীদের কাছে এই সুসংবাদ দিতে। একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম সেদিন যেটা আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। যারা একদিন পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছুকে তুচ্ছ করেছেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাদের কারুকেই বিহ্বল হতে দেখিনি। তাঁরা কাঁদছিলেন, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুধুই অঝোরে কাঁদছিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরে অবিচার সহ্য করবার পর আজ এই প্রথম তাঁরা নতুন সূর্যোদয়ের একটু আভাস পূর্বদিগন্তে দেখতে পেলেন। আবার তাঁরা ফিরে যেতে পারবেন তাঁদের কাজের মাঝে, আবার তাঁরা ডুবে যেতে পারবেন সৃষ্টির মাঝে, যে শিল্পকে তাঁরা এতদিন ধরে কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নিজেদের ব্যক্তিগত সব স্বার্থত্যাগ করে। আবার তাঁরা বাঙলাদেশের জনসাধারণকে দিতে পারবেন নতুন নতুন উপহার। রূপবাণী, অরুণা, ও ভারতী সিনেমার কর্তৃপক্ষের সময়োচিত এই সিদ্ধান্ত বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পকে নতুন গৌরবে ভূষিত করল।

এরপর জনসাধারণের হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এলেন বাঙলাদেশের প্রতিটি সঙ্গীত পরিচালক ও নেপথ্য কণ্ঠ সংগীত শিল্পীরা। গান গেয়ে সমস্ত শহর পরিক্রমা করলেন তাঁরা। "একটি শিল্পের মৃত্যু ঘটতে চলেছে যে শিল্প আপনার আমার সবায়েরই। তাকে বাঁচাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আজ আপনাদেরই।" তাই নিজেরই সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবীকে জনসাধারণের সামনে বলতে হল যতদিন না আমাদের সংগ্রাম সফল হয় ততদিন আমরা থামব না। এবং এখানে আমার সেই সহকর্মীরা আন্দোলন করছেন তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আপনাদেরই। আপনারাই আমাদের সকলের ভাগ্যবিধাতা।"

—শ্রীকান্ত

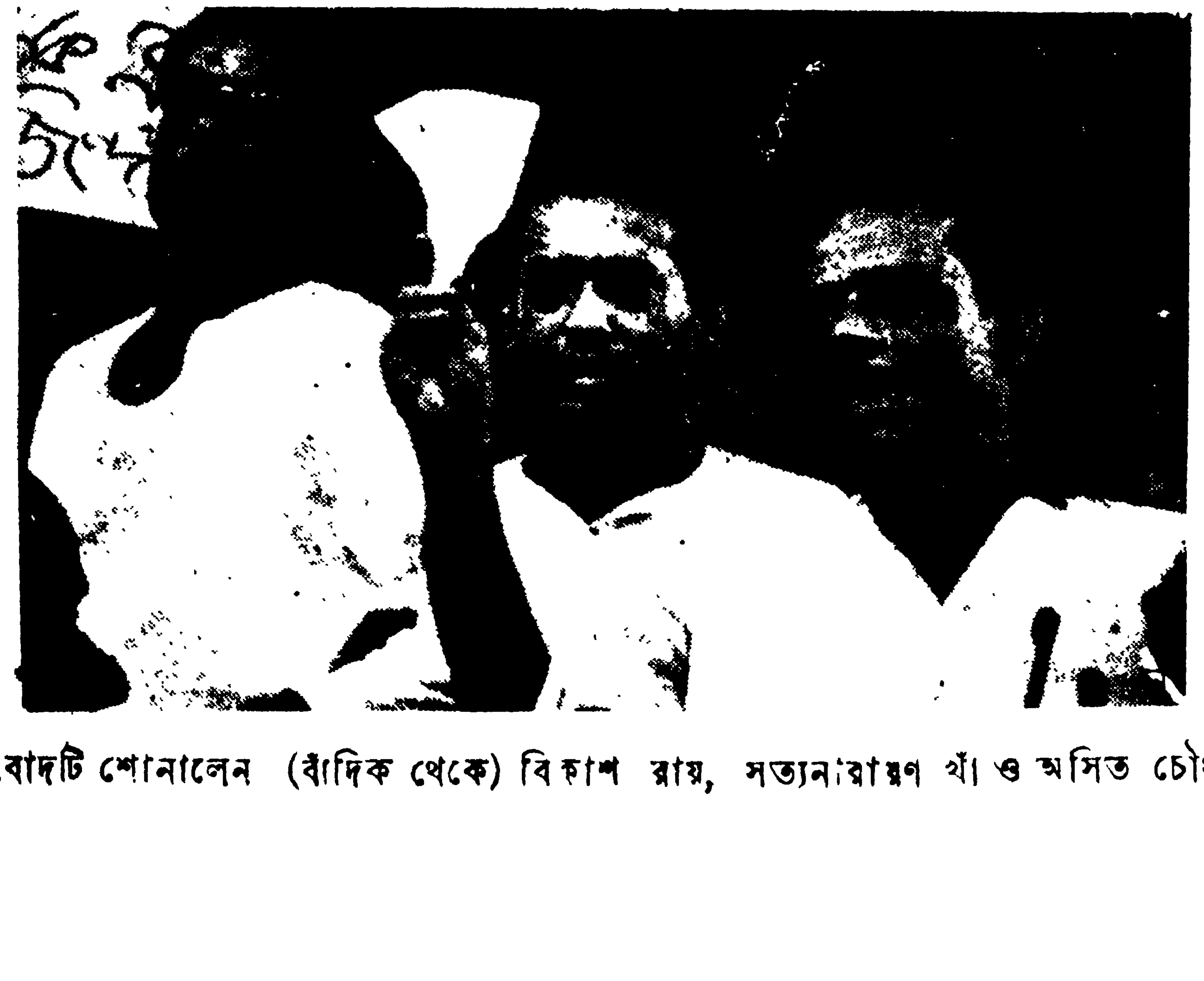

জয়ের প্রথম সংবাদটি শোনালেন (বাঁদিক থেকে) বিকাশ রায়, সত্যনারায়ণ খাঁ ও অসিত চৌধুরী